	সাহিত্য-সমালোচনা	
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	কবি শ্রীমধুসূদন	৮৲
	বঙ্কিম-বরণ	৬৲
	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)	৮৲
	রবি-প্রদক্ষিণ	৬৲
	শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র	৮৲
	সাহিত্য-বিতান (২য় সং)	৮৲
	বাংলা কবিতার ছন্দ (২য় সং)	৫৲
	কাব্য	
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	স্বপন-পসারী (২য় সং)	৬৲
	স্মর-গরল (২য় সং)	৬৲
	প্রবন্ধ	
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	জীবন-জিজ্ঞাসা	৬॥০
শ্রীপ্রমথনাথ বিশি	বিচিত্র-উপল	৪৲
	অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান	
৺ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ	মার্ক্সবাদ	৩৲
শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথা	৪৲
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়	ভারতের নব রাষ্ট্ররূপ	৪৲
	জীবনী	
শ্রীপ্রমথনাথ বিশি	চিত্র-চরিত্র	৬॥০
এমিল লাড্‌উইগ	ষ্ট্যালিন	২৲
	গল্প	
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	আলেখ্য	৩৲
শ্রীঅমলা দেবী	সমাপ্তি	৪৲

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম—কুলগাছিয়া ; পোঃ—মহিষরেখা ; জেলা—হাওড়া।

MRS. P. DEVEE'S (F.D.S.)

—কুমারী—

(Tablets.)

কুললক্ষ্মীগণ সাধারণতঃ মাসের পর মাস যে সব উপসর্গাদির জন্য নানাবিধ কষ্টভোগ করে থাকেন প্রায় সকল অবস্থাতেই প্রয়োজন বোধে ব্যবহার্য্য। হাজার হাজার রোগীতে পরীক্ষিত এবং ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ঔষধ। নর্ম্যাল্ ৩৲, স্পেশ্যাল্ ৫৲ ও একষ্ট্রা স্পেশ্যাল্ ৮৲ (ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র)। বড় বড় ডাক্তারখানায় প্রাপ্তব্য।

একমাত্র পরিবেশক—পি, ডেভী এণ্ড কোং, কলিকাতা—৩৩

স্থানীয় ষ্টকিষ্ট—এল, এম, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স লিমিটেড,

১৩৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

নূতন গল্পের বই পথের দেখা—মূল্য ১।০

দেয়ালের আড়াল ২।০

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অলখ ঝোরা—মূল্য ৩৲

সিঁথির সিঁদুর—মূল্য ২৲

শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবীর সুবিখ্যাত গল্পের বই

হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) মূল্য ৩৲

শিশুপাঠ্য সচিত্র সাতরাজার ধন—মূল্য ২৲

প্রাপ্তিস্থান—পি ২৩, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী—১০নং কলেজ স্কোয়ার এবং

কমলা বুক ডিপো—১৫ বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমল আননের
কোমল প্রসাধন
মীরা স্নো

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

রামায়ণ (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় — ১০৷৷০

সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় — ।৹

সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ — ।০

চাটার্জ্জির পিক্‌চার এল্‌বাম ১—১৭
(১—৯ নাই, ১০—১৭ আছে) প্রত্যেক সংখ্যা ৪৲

উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ — ২৲

সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী — ২৷৷০

আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ — ১৲

বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ — ২৲

উদ্যানলতা (উপন্যাস)—
শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী — ২৷৷০

কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক — ৪৲

গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক — ১৷৷০

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার — ১৷৷০

কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার — ৷৷০

চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন)
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত — ২৷৷০

মেঘদূত (সচিত্র)—
শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য — ৪৷৷০

অল্পনা—শ্রীহেমলতা দেবী — ১৷০

খেলাধূলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার — ১৷০

বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য — ১৶০

ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ — ১৷৷০

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০৷২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

=প্রবাসী=

১২০৷২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত পাকিস্তানী সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাসিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১।০ টাকা অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল, বাহিরের ব্যাঙ্কের চেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ।৶০ ব্যাঙ্ক কমিশনও দেয়। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যসাধনে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য ঃ—

মাসিক মূল্য—সাধারণ পূর্ণ একপৃষ্ঠা (৮ইঃ × ৬ইঃ) ৬০৲
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (৪ইঃ × ৬ইঃ)
বা এক কলম (৮ইঃ × ৩ইঃ) ৩২৲
" " সিকি পৃষ্ঠা (২ইঃ × ৬ইঃ)
বা অর্দ্ধ কলম (৪ইঃ × ৩ইঃ) ১৮৲
" " অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা (১ইঃ × ৬ইঃ)
বা সিকি কলম (২ইঃ × ৩ইঃ) ১০৲

বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রে জ্ঞাতব্য

প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'বিজ্ঞাপন' অগ্রিম মূল্যসহ কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মূল্যসহ বিজ্ঞাপন প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে কার্য্যালয়ে পৌঁছিলে প্রুফ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রুফ দেখার দোষে যদি কোন ভুল থাকে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখার ভার আমাদের উপর দিবেন, তাঁহারা সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। এক বৎসরের জন্য কণ্ট্রাক্ট করিলে এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম জমা দিলে টাকায় ৵০ হিসাবে বাদ দেওয়া হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্য্যালয়

প্রবাসী, ৫১শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৮

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

গণেশ-জননী

শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
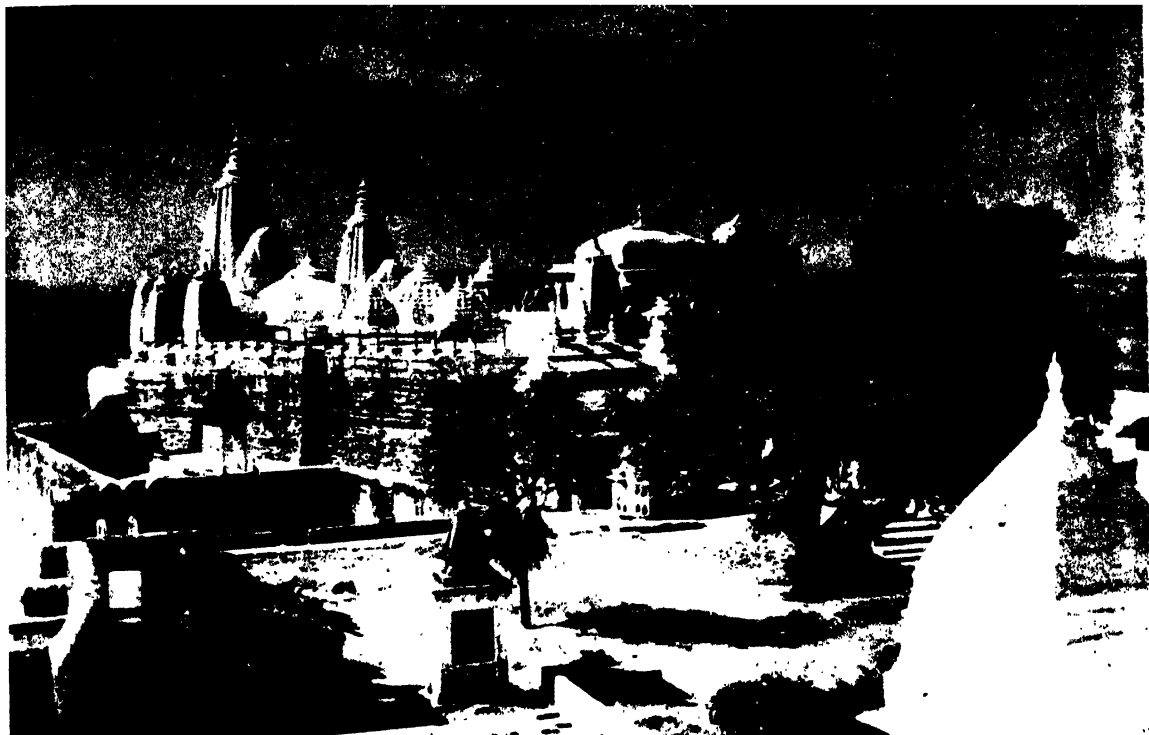
রামটেক মন্দির

রামটেক মন্দির হইতে অম্বা হ্রদের দৃশ্য

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৮ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূজা

পূজা আগতপ্রায়। বাঙালীর ঘরে আগমনীর সুরের সঙ্গে নিরানন্দ দূর হয়, নগরে পল্লীতে—গ্রামে গ্রামে উৎসবের আনন্দ-স্রোত বহিয়া যায়। আজ সে উৎসবের মধ্যে দেখি যেন বিষাদের ছায়া, সে আনন্দ যেন মনে হয় কষ্টসাধ্য। দেশে রহিয়াছে অভাবের ক্ষত, লোকের মুখে অসন্তোষের অভিশাপ। শান্তি নাই কোথায়ও, সন্তুষ্টি নাই কাহারও ঘরে।

ঘোর দাসত্বের দিনেও বাঙালীর ঘরে "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ" ছিল, এবং সে সকল পূজাও তো উৎসবের পুলকে পূর্ণ হইত। আজ স্বাধীনতার দিন, চার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে আমাদের স্বাতন্ত্র্যলাভের পর। তবে জনগণের কেন এ অবস্থা, কারণ কি এই নিদারুণ দৈহিক ও মানসিক অবসাদের? আজ কেন মনে হয় বৃথাই এই শক্তির আবাহন, নিরর্থক এই দেবতার বোধন?

ছিল এক দিন সুদূর অতীতে, যখন বাঙালীর শক্তির আরাধনা ছিল সার্থক। তখনও বাংলামায়ের সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও জর্জ্জরিত হয় নাই, তাহার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিতের প্রবাহ ছিল। নিজের জন্মগত ও ব্যক্তিগত অধিকার ও সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্বের মানমর্য্যাদা, সম্পত্তি রক্ষার্থে জীবনমরণ পণ করিয়া সে শোণিততর্পণে কুণ্ঠিত বা বিচলিত তখন হইত না। দুর্জ্জয় শক্তিতে সে অতিক্রম করিত দারুণ দুঃখকষ্ট, বিষম বিপদ, অর্থ বুঝিত সে দেবীর ঐ আবাহনের:

"অহং জনায় সমদং কৃণোমি"

দেবতা তখন ছিলেন জাগ্রত, তাঁহার পূজারী ছিল তেজাগ সতেজ, বজ্রসম কঠোর নির্ম্মম। মায়ের সন্তান তখন মাতৃপূজা করিত সমরাঙ্গনে, শত্রুর রক্তে অসিফলক রঞ্জিত করিয়া, আত্মবলিদান দিয়া। শৌর্য্য ছিল তাহার, বীর্য্য ছিল তাহার, তিতিক্ষা ছিল তাহার অঙ্গের ভূষণ। উদাত্ত স্বর ছিল সেই পৌরুষদৃপ্ত শক্তির পূজারীর। তখনই ছিলেন দেবতা জাগ্রত।

সেদিনের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য রহিয়াছে পঞ্চভূমের ইতিহাসে, সে পূজারীর পরিচয় আছে বারোভূঁয়ার ইতিবৃত্তে। তাহারও পূর্ব্বে তাহার বিবরণ আছে "দুষ্ট শশাঙ্কের" অভিযানে, শত বিদ্রোহ-বিপ্লবের কিম্বদন্তীতে।

তাহার পর বাঙালী গা ঢালিয়া দিল বিলাস-ব্যসনের স্রোতে। পূজারী ভুলিল পূজার অর্থ, দেবতার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া উন্মার্গগামী ও লালসাগ্রস্ত হইয়া চলিল সে ধ্বংসের পথে। দেশ হইল শত্রুকবলিত।

তার পর গিয়াছে যুগযুগব্যাপী দাসত্বের বন্ধন, ক্লীবত্বের অভিশাপ। অযোগ্য অধম সন্তানের অপোগণ্ড শিশুবৎ ক্রন্দন, আবেদন-নিবেদন, অভিমান-আবদার তত দিন বৃথাই গিয়াছে। দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হইল কখন?

আবার আসিল একে একে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী পূজারী, সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, সহায়সম্বলহীন। কিন্তু তাহাদের চিত্ত ছিল সবল, সিদ্ধান্ত ছিল অটল। বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিয়া তাহারা শোণিততর্পণে সন্তুষ্ট করিল দেবতাকে; দেশের লোক বুঝিয়াও বুঝিল না, ভাবিল বৃথাই এ আত্মবলিদান, অনর্থক এই নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন। সাধারণ লোক পূজার সেই প্রাচীন সনাতন অর্থ তখন ভুলিয়াই গিয়াছে। শুল্ক দান ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব, এ কথা কেহই জানে না।

আজ দেশের ভাগ্যচক্র ফিরিতেছে, ঐ চক্রের পেষণ সহ্য করিবার ধৈর্য্য ও পৌরুষ কি আমাদের আছে? যদি

থাকে, তবে কিসের এই বিলাপ-প্রলাপ, কেন এত ক্রোধ-ঈর্ষা ও দ্বেষ? স্বাধীনতার মূল্যদানে যদি আমরা অসমর্থ, তবে অনর্থক সকল পূজার আয়োজন, বৃথাই এই শক্তির আবাহন।

স্বাতন্ত্র্যের মূল্য নিরবচ্ছিন্ন সজাগ সতর্কতা এবং শক্তি পূজার অর্থ শঙ্কাহীন, নির্ম্মম কঠোর হৃদয়ে বীরগতি কামনা, এ কথা যেদিন দেশ বুঝিবে সেদিনই হইবে পূজা সম্পূর্ণ সার্থক।

পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীর শেষ দুর্গ একথা বহু বার আমরা বলিয়াছি। এই দুর্গ জীর্ণ ও ভগ্ন এবং ইহার অধিবাসিগণ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী বিদেশীর উৎপীড়নে ক্লিষ্ট। ইতিহাস-বিখ্যাত পঞ্চভূমের মধ্যে সিংহভূম, মানভূম ও শিখরভূম আজ বিদেশীর চক্রান্তে ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের অতি হীন মনোবৃত্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উহার অধিবাসিগণ অবাঙালীর অত্যাচারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। পশ্চিম-বঙ্গের সন্তানগণের আশাভরসা যাহা কিছু ছিল—স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে যাহা যথেষ্টই বর্দ্ধিত হয়—সে সকলও ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও কি আমাদের পূর্ব্বেকার মনোভাবই থাকিয়া যাইবে?

দাসত্বের যুগে, ক্লীবত্বপ্রাপ্তির ফলে "পাঁঠাবলি দলাদলি" দিয়া দুর্গাপূজা, কালীপূজা চলিত। আজ স্বাধীনতার আলোয় আমাদের সে সকল কলঙ্ককালিমা আরও ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার অবসানের কোনও চিহ্ন তো দেখা যাইতেছে না।

দেশ ত বিভক্ত। শুধু পূর্ব্ববঙ্গই বিচ্ছিন্ন হয় নাই—যদিও এক দল লোক চীৎকার করিয়া তাহাই জানাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল, যেখানে অমূল্য খনিজ সম্পদ রহিয়াছে, তাহা গিয়াছে। পূর্ণিয়া, করিমগঞ্জ ইত্যাদি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের বাঙালীও এখন বিহারী ও অসমীয়ার অধীন। সুতরাং বাংলার আছে কি?

অথচ এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিকার ও সম্পত্তি লইয়া কাড়াকড়ি ও টানাহেঁচড়া চলিতেছে। দেশের যাহা কিছু ভবিষ্যৎ আশা ছিল তাহাও সেই সঙ্গে রসাতলে যাইতেছে। যদি বুঝিতাম যে দেশের লুপ্ত সমৃদ্ধি উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, যদি বুঝিতাম তাহার শ্রী ফিরাইবার পথ লইয়া মতদ্বৈধ হইয়াছে, তবে ঐ দলাদলির একটা অর্থ পাইতাম।

বাঙালীর অস্তিত্ব লইয়াই প্রশ্ন। ভিন্ন প্রদেশে আমাদের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে শূন্যে মিলাইতে চলিয়াছে। এই দরিদ্র প্রদেশে যাহা আছে তাহাতে দেশেরই সন্তান যাহারা তাহাদেরই সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। অথচ এদেশের পরিধি বিস্তার বা ভারতের অন্য ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার বৃদ্ধির কোনও সম্মিলিত প্রচেষ্টা নাই। আছে শুধু "উহাকে বঞ্চিত করিয়া আমাকে দাও" অথবা "উহার সন্তানের মুখের গ্রাস আমার সন্তানকে দাও।" চাকুরীর ক্ষেত্রে তাই, জমিজমার ক্ষেত্রে তাই, এখন পার্লামেণ্টে এবং ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনেও তাই। যদি বুঝিতাম শুধু যোগ্যতার মাপকাঠিতে ব্যবহার, বা যদি বুঝিতাম শুধু সঠিক অধিকার নির্ণয়ে বিচারের প্রশ্ন, তবে বলিতাম তথাস্তু।

পথে ঘাটে ফাঁকা কথার ছড়াছড়ি চলিতেছে। "বিপ্লব বিদ্রোহ", "গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র", "গণমত গণবিপ্লব" ইত্যাদি গালভরা শব্দ ও শ্লোগানে আকাশ মুখরিত। কাগজে সত্য-মিথ্যার বালাই নাই, কিসে উপকার-অপকার হয় তাহার বিচার নাই, এক দল যাহা করে অন্য দলে বলে বা লেখে যে সে সবই মিথ্যা, কপট ও অনাচারপূর্ণ এবং তাহার পাল্টা জবাবও সঙ্গে সঙ্গে আসে।

দেশের অবস্থা ত অবনতির দিকেই যাইতেছে? ইহার প্রতিকারই ত প্রার্থনীয়? তবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বা পরকে দোষ দিয়া কি লাভ হইবে? বিদেশী সরকার যত দিন ছিল তত দিন তাহাকে দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। এখন ত স্বাতন্ত্র্য আসিয়াছে, যদি বর্ত্তমান সরকার না পছন্দ হয়, নূতন সরকার গঠনে অবহিত হউন। যাহাকে চিনেন, যাহার ইতিবৃত্ত জানেন, তাহাকেই বলুন অগ্রসর হইতে এবং তাহাকে সাহায্য করুন দেশের নূতন সরকার গঠন করিতে।

দেশের লোক যদি উৎসাহ উদ্যম দেখায়, যদি যেখানে তাহার অধিকারচ্যুতি হইতেছে সেখানে দৃঢ়চিত্তে বাধা দিতে অগ্রসর হয় তবে এই জীর্ণ দুর্গই বিজয়ের আকর হইবে। দেশের প্রাচীন গৌরব ও পুরাতন শ্রী ফিরিয়া আসিবে। হতোদ্যম হইয়া নির্বিষ সর্পের মত গর্জ্জাইলে শত্রু হাসিবে, কার্য্যোদ্ধার ত হইবেই না। শ্রমকাতর বা উদ্যমহীন লোকের স্থান আজিকার জগতে অতি অল্প, এবং যে দেশে প্রতি বর্গমাইলে ৯৫০ জন লোক সেখানে বিন্দুমাত্রও স্থানের অভাব। এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অভিযান করিতে হইবে। যদি তাহা হয় বাঙালী গৌরবের সহিত বাঁচিয়া থাকিবে, অন্যথায় তাহার দাসত্ব ও অস্তিত্ব লোপ সুনিশ্চিত।

যদি শক্তির বোধন কাম্য হয়, যদি সার্থক করার ইচ্ছা থাকে এ পূজা, তবে প্রথমে দূর কর মনের দৌর্ব্বল্য, অন্তরের কলুষ-কালিমা, শরীরের আলস্য। দেবতার আশীর্ব্বাদ তাহারই প্রাপ্য যাহার আত্মনিবেদন ঐকান্তিক।

খাদ্যসমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা ক্রমশ: গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এ বৎসর প্রথমটা অনাবৃষ্টির জন্ত ফসলের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। চাউলের দরও অনেক চড়িয়া গিয়াছিল। পরে বৃষ্টি হওয়ায় শেষ রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাউলের দর কমিতে চাহিতেছে না। গত চার বৎসরে চাউলের দর ক্রমশ: বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী গেজেটে ইহার যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা একত্র করিয়া দেখিলে আশঙ্কা হয় যে বাংলাদেশে খাদ্যের অবস্থা সত্যই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। এবার আর এক বিপদ হইয়াছে—বহু ধান-জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ পাট পচাইবার ও ধুইবার জলের এখানে একান্ত অভাব। স্রোতের জল ছাড়া বদ্ধ পচা জলে ভাল পাট ওঠে না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানে পাট হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে পাট গাছ ভালই হইয়াছে কিন্তু জলের অভাবে ভাল পাট বাহির হইতেছে না। এবার ধানের জমিতে পাট চাষ করায় খাদ্যসমস্যা বাড়িয়াছে, ডলার সমস্যার সমাধান কতটা হইবে বলা যায় না। পাট বা তুলায় নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়াও যে বৃহত্তম বস্ত্রশিল্প এবং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চটকল চালানো যায় ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের খাদ্যের উপরেই বেশী ঝোঁক দেওয়া দরকার।

খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব গেজেট হইতে সঙ্কলন করিয়া নীচে দেওয়া হইল। ইহাতেও ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যর্থতাই সূচিত হইতেছে :

জেলা	জুলাই '৪৮	জুলাই '৪৯	জুলাই '৫০	আগষ্ট '৫১
বর্দ্ধমান (কালনা)	২০৲	২০'/০	২২৸/৮	২৯/৫
বীরভূম	১৬৲	১৭৸৫	২২/০	১৬।৵০
বাঁকুড়া	১৮৲	১৬৲	১৯৲	১৬৷৷৵০
মেদিনীপুর	১৭৷৷০	১৭৸৫	২১৲	২২৸/০
হুগলী	২৬৷৷৵০	২৬৲	২৪৲	৩২৲
হাওড়া	২১'/৪	২৯/৫	২৯/৫	৪০৲
২৪ পরগণা	২৬৷৷৵০	৩২৲	৩২৲	৪৪৸/০
নদীয়া	২৪৷৷/০	২২৸/৮	৩০।৶৭	৩২৲
মুর্শিদাবাদ	২১।/০	২২৸/৮	৪০৲	২২৸/০
পশ্চিম দিনাজপুর	২৪৲	২০৲	২৩৲	৩৫৷৷/০
মালদহ	৩৩৸০	২৪৲	২৪৲	৩৩৷৷৶০
জলপাইগুড়ি	৩০৷৷০	২২৸/৮	৩২৲	৪২৷৷৵৮

এই সমস্ত দর ঐ সব জেলার সর্ব্বোচ্চ মূল্য। কতকগুলি বাড়তি কর্ডন এলাকা ছাড়া অধিকাংশ স্থলেই উহাই চাউলের মূল্য। এই ভাবে উত্তরোত্তর প্রতি বৎসর দাম বাড়িতেছে ইহা খুব আশঙ্কার কথা।

খাদ্যের অপচয়ও বড় বেশী হইতেছে। গত বৎসর শ্রীরজনী প্রামাণিকের সভাপতিত্বে অপচয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্য শ্রীমাখনলাল হালদার মফস্বলের প্রোকিউরমেণ্ট গুদাম দেখিতে চাহিলে তাঁহার সহিত কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর মতভেদ হয়। শ্রীযুক্ত হালদার অপচয় খুব বেশী হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি অপচয় ধরিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীদেবেন সেন খাদ্যসচিবকে প্রশ্ন করিয়া যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে অপচয় অতি সাংঘাতিক রকমের হইতেছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী চাউলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন :

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
	মণ	মণ
বর্ষারম্ভে মজুত ধান	১৮,১২,৭৫৩	১৭,২১,২৯২
ঐ চাউল	১৫,১৭,৩৩৩	৩১,৭৩,৫৬৭
বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান	৭১,৪০,০৩৬	৯৮,৭০,০৫৪
ঐ চাউল	১,৫৩,৮৫,১৬০	১,৩৭,২৪,৩৮৮
বৎসরের মধ্যে বিক্রীত চাউল		
এ গ্রেড	২,১২,৭১০	১,২৩,৭৮৭
বি "	১,৩২,৮৫,৪২০	১,৩৪,৪৬,৯৯৬
বৎসরান্তে মজুত ধান	১৭,২১,২৯২	৩৩,০৩,০৪২
চাউল	৩১,৭৩,৫৬৭	৩০,৪২,৮৩৫

বৎসরান্তে মজুত ও বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান চাউলের পরিমাণ বৎসর মধ্যে বিক্রীত ও বৎসরান্তে মজুত ধান চাউলের সমান হইত। সামান্য অপচয় হইতে পারে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫০,৫১,৬৭৪ মণ চাউল ঘাট্‌তি হইতেছে এবং ১৯৪৯-৫০ সালের ঘাট্‌তির মাত্রা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইতেছে ৫৮,০১,৮৭৫ মণ। শ্রীদেবেন সেন খাদ্যমন্ত্রীকে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাঁচ মিনিট সময় চাহেন। কিন্তু মিলাইতে পারেন না, কোন কৈফিয়ৎও দিতে পারেন না, অগত্যা তখনকার মত দায় এড়াইবার জন্য তিনি নোটিশ চাহেন এবং সে নোটিশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে ঐ আলোচনা হইতে দিলেই ভাল হইত। খাদ্যমন্ত্রী ভদ্রপলকে হিসাবের এই মারাত্মক গলদ বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাইতেন।

খাদ্যসমস্যা লইয়া বিরোধী পক্ষ আলোচনা করিতে

চাহিতেছেন আর সরকার পক্ষ কেবলই উহা এড়াইয়া যাইতেছেন ইহা উচিত নহে। বাংলার খাদ্যসমস্যা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া উহার সমাধান সুদূরপরাহত। খাদ্যসমস্যাকে রাজনীতির বাহিরে রাখিয়া উহার সমাধানের জন্য সকলের সমানভাবে চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যক।

একটি মহৎ প্রচেষ্টা

"খাদ্য উৎপাদন" (পাক্ষিক) পত্রিকার ১লা আশ্বিন সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তার লেখক শ্রীরামপুর মহকুমার এগ্রিক্যালচারাল অফিসার :

"কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, অধিক খাদ্য উৎপাদনে যিনি নূতন পথের সন্ধান দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ একজন লোকের কথাই এখানে বলিতেছি। তিনি হইতেছেন তারকেশ্বরের অন্তর্গত বৈদ্যপুরের বসু-শ্রী সরকারী কৃষি প্রদর্শনী-কেন্দ্রের অন্যতম মালিক শ্রীগোলোক বন্দ্যোপাধ্যায়। চীন ও জাপানে মানুষের মল ব্যবহার করিয়া সেখানকার চাষীরা যে আমাদের দেশের অপেক্ষা দুই-তিন গুণ অধিক ফলন পান, কৃষি-কর্ম্মচারীদের নিকট একথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন এবং মলের প্রতি স্থানীয় কুসংস্কার, ও চাষীদের রক্ষণশীলতা ও বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা জানিয়াও তিনি তাঁর জমিতে মল সার ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হন। তারকেশ্বর শহর হইতে তাঁহার বাড়ী এক মাইল। মেথরদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত শহরের মল তিনি তাঁর জমিতে এক-দেড় হাত অন্তর ছোট ছোট গর্ত্তে গত মাঘ মাস হইতে ফেলা আরম্ভ করেন। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মল ফেলা হয়। মেথরদিগকে তিনি প্রতি জালা মল বহনের জন্য চারি আনা করিয়া দিতেন। জ্যৈষ্ঠের শেষে তিনি উক্ত জমি চাষ করিতে মনস্থ করিলে, মজুরেরা উক্ত জমিতে মল ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া চাষ করিতে অস্বীকৃত হয়। স্থানীয় লোকের ও কৃষি-কর্ম্মীদের চেষ্টায় অতঃপর তাহারা চাষ করিতে রাজী হয় এবং আষাঢ় মাসে জমিটি ভালভাবে চাষ করা হয়। শ্রাবণ মাসে 'পাটনাই ২৩' নামক কৃষিবিভাগের নির্ব্বাচিত ধান রোপণ করা হয়। ইতিমধ্যেই উক্ত জমির ধান অন্যান্য ধানকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে এক একটি ঝাড়ে ৭০টি পর্য্যন্ত গাছ হইয়াছে।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হউক।

ময়ূরাক্ষী নদী ও খাল

"আগে অন্ন ছিল, এখন নাই। কিন্তু আগের লোক-সংখ্যার চাইতে এখন যে কারণেই হোক, লোক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যে হারে উৎপাদন হইত, এখন তাহা শতাংশের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছে। নদী-মাতৃক দেশ, তাই বাংলা ছিল শস্যশ্যামলা। আজ নদী-খাল-বিল সব মজিয়া গিয়াছে—আজ উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন সেই নদী-প্রবাহ অব্যাহত রাখা। আজকের গবর্মেণ্ট তাই সকল কাজ ফেলিয়া সেই দামোদর-ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্ম্মাণে ব্যস্ত।

এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে, বীরভূমে মুড়ারই নলহাটি, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, মোল্লারপুর মহম্মদবাজার, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, নানুর, লাবপুর, ইলমবাজার ও বোলপুর থানার অঞ্চল—মুর্শিদাবাদে সাগরদীঘি, নবগ্রাম, খরগ্রাম, ভরতপুর, বড়ঞাম ও মির্জ্জাপুর থানার অঞ্চল এবং বর্দ্ধমানে কেতুগ্রাম থানার অঞ্চল সেচের জল পাইবে। এই সমস্ত এলাকা ১৩৪০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘায় ধানক্ষেত জল পাইবে। তাহা ছাড়া রবিশস্যের কালে প্রায় তিন লক্ষ বিঘায় সেচের জল যাইবে। পতিত জমি উদ্ধার হইবে ৭৫০০০ বিঘা। সেচের জলের মূল খাল ১৪০ মাইল ও শাখা-প্রশাখা প্রায় ৭০০ মাইল কাটা হইতেছে এবং অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে : এই কাজ শেষ হইলে, বাংলার খাদ্যশস্যের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ৯০ লক্ষ মণ বেশী জন্মাইবে। আর দামোদর ভ্যালির কাজ সম্পূর্ণ হইলে সমগ্র বর্দ্ধমান ও হুগলী জল পাইবে।"

"দৈনিক" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১০ই আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উপর যেসব আশা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সার্থক হউক।

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যাবলী

গত শ্রাবণ মাসে ডায়মণ্ড হারবারে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলের নানা সমস্যাবলী আলোচনা করিবার জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তথায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার চুম্বক উদ্ধৃত হইল :

হাসনাবাদ, সন্দেশখালি ও হাড়োয়া পুলিশ থানার অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ বিঘা ধান-জমির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক স্থানে বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় উক্ত জমিগুলিতে লোনা জল ঢুকিয়া পড়ে। সাগর, কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, জয়নগর ও ক্যানিং থানার অন্তর্গত কয়েকটি ইউনিয়নও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইয়াছে এবং অবিলম্বে সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র কুটীর বিধ্বস্ত হইয়াছে ও বহু গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে এবং বন্যা-বিধ্বস্ত কয়েকটি এলাকায় কলেরা

মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। উক্ত অঞ্চলে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে।

(১) প্রথমেই প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত অনতিবিলম্বে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং উক্ত তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

(২) "বাঁধ" রক্ষার সমস্যাই হইল সুন্দরবনের সমস্যা। বাঁধের ক্ষতি হইলে যে কেবল বৎসরের শস্তই নষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্ত দুই তিন বৎসরের জন্ত জমির উৎপাদনী শক্তিও চলিয়া যায়। এই কারণে দেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা ধানজমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সুতরাং বাঁধগুলি যথোপযুক্তভাবে নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং যে সব বাঁধের অবস্থা খারাপ সেইগুলি যথাযথভাবে মেরামতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কেবল খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইবে না, পরন্ত অনশনক্লিষ্ট কৃষিজীবিগণ উপকৃত হইবে কারণ তাহারাই এই বাঁধগুলিতে কাজ করিবে এবং জীবিকানির্ব্বাহের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

(৩) প্রত্যেক ইউনিয়নে ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত দোকান খুলিতে হইবে, অসহায় ও জরাগ্রস্ত লোকেদের খয়রাতি সাহায্য দিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে সাহায্যকেন্দ্র মারফত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) স্থানীয় এজেন্সী মারফত জনগণকে কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) পানীয় জলের জন্ত পর্য্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) চাষ-আবাদের জন্য বীজ ও বলদ ক্রয়ের নিমিত্ত কৃষি-ঋণ দিতে হইবে। ইহাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান সহায়তা লাভ করিবে।

(৭) সুন্দরবন এলাকার মধ্যে অবাধে ধান চলাচলের অনুমতি দেওয়া উচিত।

(৮) সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত গোসাবা ইউনিয়নের সাতজেলিয়া গ্রামে এবং হাড়োয়া ও ক্যানিং পুলিস থানার মধ্যবর্তী দেওলী নামক স্থানে পুলিসী জুলুমের যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৯) সুন্দরবন অঞ্চল বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু কৃষিজীবীর পুনর্ব্বসতির উপযুক্ত স্থান। কারণ উক্ত অঞ্চলে শ্রমশক্তির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।

(১০) সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা হিসাবে সুন্দরবনের সমস্ত এলাকা সরাসরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা উচিত এবং জমিদারী প্রথা বিলোপের পরীক্ষা এখানেই হইতে পারে। সুন্দরবন অধিবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশা লাঘবের জন্য যৌথ কারবারের ব্যবস্থা করা উচিত।"

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা নির্দ্দেশ বা দাবি আছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোকসমষ্টি কি করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা জানাও প্রয়োজন মনে করি। কোন কোন সমস্যা রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া মিটিতে পারে না, ইহা সত্য। ততোধিক সত্য নাগরিকের দায়িত্ববোধ। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ নির্দ্দেশ থাকা উচিত ছিল। ঐ অঞ্চল হইতে ধান চাল ও বস্ত্র চোরা পথে পাকিস্থানে ব্যাপক ভাবে চালান হয় এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। ৭নং প্রস্তাব অনুযায়ী অবাধ ধান চলাচল হইলে তাহা বাড়িবে না কমিবে তাহা বলা বাহুল্য। বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় লোকের উদ্যম কতটা প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহারও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ৩৫ লক্ষ পরিবারের বৃত্তি-ব্যবসায়গত সংখ্যা মোট কত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ তিন বৎসর অনুসন্ধানে তাহা স্থির করিয়াছেন। এই হিসাবানুযায়ী ২ লক্ষাধিক পরিবার কৃষি-কার্য্য করে, ৮৬ হাজার মাছ ধরে, ৬০ হাজার তাঁত বোনে, ১৭ হাজার ছুতারের ও ২২ হাজার কুম্ভকারের কাজ করে, ১৬ হাজার বাঁশ ও বেতের কাজ করে, ১১ হাজার স্বর্ণকারের ও ৩৪ হাজার মুচির কাজ করে। কাঁসা-পিতলের কাজ, সোনা ও শাঁকের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, রেশম কীট পালন, দর্জির কাজ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এমন পরিবারের সংখ্যাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার সংখ্যা দুই হইতে দশ হাজারের মধ্যে। পরিবার পিছু পাঁচ জন হিসাবে লোক-সংখ্যা ধরা হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই কোটি দাঁড়ায় ইহার মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কত, নারী ও শিশু কত, কত লোক এই সকল বৃত্তি ব্যবসায় অনুসরণ করে এবং পরিবার পিছু মাসিক বা বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কত, এগুলি নির্দ্ধারিত হইলে তবে পল্লী-বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এতৎসম্পর্কে এক 'দৈনিক' সহযোগী বলিতেছেন যে শেষোক্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে বুঝা যাইবে কেন আমাদের দেশের লোক শহরের দিকে ধাওয়া করিতেছে, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া সহর ও নগরের বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পথ খুঁজিতেছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, এই সমস্যা উদ্ভব হইয়াছিল প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে; এবং ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে ১০০

বৎসর পূর্ব্বে। এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই। অনেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে পল্লী অঞ্চলের অবনতি প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের অঙ্গ। এই ভাবে ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিলে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজী শিক্ষার ফল

"শিক্ষাব্রতী" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে দু'চার কথা" প্রসঙ্গে যে ঐতিহাসিক তথ্য শুনাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইংরেজী শিক্ষার অশেষ দোষ। কিন্তু সর্ব্বদোষ হরণ করিয়া ইহা এমন একটি অঘটন ঘটাইয়াছে যে, তাহা উল্লেখ না করিলে ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করা হইবে। প্রফুল্লবাবুর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা আলোচনা করিব। কারণ তাঁহার ভাব বা মত পরাধীন দেশের সাধারণ জনমতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

"ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজ শাসন এ দেশে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সে কারণে তাহা কখনও জাতীয় উন্নতির সহায়ক হয় নাই। এ শিক্ষা কখনও জাতির প্রাণশক্তিকে জাগায় নাই, বরং এই নিষ্পেষিত দেশকে আরও নিষ্পেষিত করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শাসন ও শোষণের বাহক উক্ত বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতিকে সর্ব্বাগ্রে পরিবর্ত্তন করা দরকার। ইহা জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রাথমিক প্রয়োজন। যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তথাপি উক্ত প্রাথমিক কার্য্যের অসম্পূর্ণতার জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে এদেশে গত তিন বৎসরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।"

ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্রিটিশ-রাজ নিজেদের পরীক্ষিত শিক্ষা এদেশে আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তাহাই এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ফলে ব্রিটিশ-রাজের অবসান হয়। এদেশে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাহারা ভাবে ভাবনায়, আচার আচরণে পাশ্চাত্ত্য দেশীয়। কিন্তু ইহারাই স্বরাজ আন্দোলনের স্রষ্টা এবং জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষক। এই সংস্কৃতির উপর তাঁহাদের কোন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মমতা ছিল এবং এই মমতার প্রেরণায়ই নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। "ইয়ং বেঙ্গলে"র আদি ও অন্তের ইহাই হইল সত্য ইতিহাস।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গত ৫ই আশ্বিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী"—তাঁহার সাধনার ধন নব-কলেবর ধারণ করিল। এই উপলক্ষে "বিশ্বভারতী"র হিতৈষীরা আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিবে। তাহার নানা কারণ আছে। "বিশ্বভারতী"র বীজমন্ত্র ছিল—"সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্"। ভারতরাষ্ট্রের বিধান পরিষদ, অজ্ঞাত কারণে, খামখেয়ালি বশে—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করিবার কালে "সত্যমকে" দিয়াছেন বিসর্জ্জন। এই খেয়াল কাহার তাহা জানি না।

সেইজন্যই নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং এই বিষয়ে "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" ৮ই আশ্বিন সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা বাঙালী মনের ক্ষোভের পরিচায়ক: "...রবীন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টায় যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, সহস্র শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহার বিরোধিতা করিয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই প্রচেষ্টাকে বিকৃত করিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে পিষ্ট করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যে পথে চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বংসের গতিকে তিনি রোধ করিতে পারেন নাই।

"বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীর যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, আমাদের আশঙ্কা, সেই পরিবর্ত্তন কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সফল করিবার সহায়তা করিবে? আজ যাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে, যাঁহাদের নির্দ্দেশে বিশ্বভারতী পরিচালিত হইবে, তাঁহারা কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাস করেন? যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-আদর্শের মূল ভিত্তি, তাহা কি তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে চূড়ান্ত অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে না? যে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সৃষ্টি, সেই যান্ত্রিকতাই কি বর্ত্তমান কর্ণধারদের অনুভূতি, চেতনাকে প্রস্তরীভূত করে নাই?"

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। একজন পেন্সনপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ, পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্ত্তৃক তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন আর আর সভ্যগণও 'মনোনীত' বলিলে সত্য কথা বলা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত; বিশ্ব-ভারতী কর্ত্তৃক অনুমোদিত, সরকারের খেয়ালমাফিক মনোনীত; উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃক মনোনীত; কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ বা তাঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় শিক্ষাবিদগণ, অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী, এই লোকসমষ্টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্ণধার, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার নিয়ামক, যে শিক্ষা এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত।

প্রারম্ভিক সংগঠন হিসাবে ইহার বেশী গণতন্ত্রমূলক কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়ত বর্তমানে সম্ভব হয় নাই। কারণ ১৯৫২ সাল হইতে আমাদের পরিচিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার খেলা শেষ হইল। আরম্ভ হইল নূতন নামের 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষা। 'স্কুল ফাইনাল' নামের অর্থ হইল স্কুলের শিক্ষার অন্তে যে পরীক্ষা। ইহা পরিচালনা করিবেন এই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। কোন্ শিক্ষার অন্ত, তাহা এই নূতন নামে বুঝা যায় না।

এই সব শাব্দিক চুলচেরা প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া, এখন এই শিক্ষা বোর্ডের কার্য্যপদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। সম্পাদকীয় মন্তব্যের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে তাহা হয়ত সম্ভব নয়, এবং এই বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য্য ও নানা অধিবেশনের নানা আলোচনার গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। সেইজন্ত শোনা কথার উপর নির্ভর করিতে হয়; বোর্ডের সভ্যগণের কথাবার্ত্তা হইতে অনেক তথ্যের আঁচ করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানই আমাদের বর্ত্তমান মন্তব্যের উপকরণ।

এই সব কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে বোর্ডের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। এক দলের দলপতি নাকি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্ত দলের দলপতির নাম এখনও শুনি নাই। সভ্যগণ কে কোন্ দলের তাহা জানি না। কারণ দলাদলির ও ভোটাভুটির সংবাদ এখন পর্য্যন্ত অতি যত্নে গোপন রাখা হইয়াছে।

কিন্তু এই দলাদলি বা ভোটাভুটির সংবাদে আমরা বিচলিত হই নাই। আজকাল পল্লীগ্রামে যত্রতত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরী ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যেমন লোকে ইংরেজী শিক্ষার মোহে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারাইয়াছিলেন সেইরূপ এখন পল্লীবাসীরা করিতেছেন। ইংরেজী আমলের পেন্সনপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ্‌গণ একদিক হইতে চাহেন শিক্ষার প্রসার, অন্ত দিকে দাবি করিতেছেন স্কুল-ঘরের এমন কতকগুলি সৌষ্ঠব যাহাতে এই শিক্ষার নিশ্চিত গতিরোধ হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এগুলির উল্লেখ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি শিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে এমন অনেক কিছু সর্ত্ত আরোপিত হইতেছে যে পল্লীবাসীর শক্তি নাই তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। বি-টি শিক্ষক চাই, বিলাত ফেরত হইলে আরও ভাল। ব্যায়ামের জন্ত চাই গ্রাজুয়েট শিক্ষক। ব্যায়ামের শিক্ষক মহাশয় গ্রাজুয়েট হইবার প্রয়োজন কি? আমাদের জিজ্ঞাস্য, স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা কি হওয়া উচিত; মাধ্যমিক শিক্ষার মান কি হইবে; কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপযোগী হইবে; বিদ্যালয়ের বাড়ী-ঘর, খেলার মাঠ, জিমনাসিয়াম, টিউব ওয়েল কতখানি আবশ্যক? বোর্ডের সম্পাদকের নিকট হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে কি?

গ্রেস মার্ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'যুগান্তর' আপিসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে এক নম্বরের জন্ত ফেল করা লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে তাহা ঠিক নহে। বস্তুত: দশ নম্বর গ্রেস দিবার পর ইহারা এক নম্বরের জন্ত ফেল করিয়াছে, অর্থাৎ পাস মার্ক অপেক্ষা আসলে ইহারা ১১ মার্ক কম পাইয়াছে। ইহাদিগকে পাস করাইলে আবার এক দল এক নম্বরের জন্ত ফেল করিবে, সুতরাং ইহার শেষ কোথায়? তিনি পরে একটি কথা এই বলিয়াছেন যে ১৪ জন হেড এগজামিনার তাঁহাকে লিখিত ভাবে জানাইয়াছেন যে খাতা উদারভাবে দেখা হইয়াছে।

ভাইস্-চ্যান্সেলারের উক্তি আমরা মানিতে পারিলাম না। তিনি ইংরেজীর কথা বলিয়াছেন, ইংরেজী ভিন্ন আর কোন বিষয়ে গ্রেস দেওয়া হয় নাই, সুতরাং সাধারণ ভাবে গ্রেস মার্কের প্রশ্ন উঠে না। ইংরেজীতে একটি পেপারের প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছিল এবং ইহা হেড এগজামিনারেরা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রেস নম্বর দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা ঐ পেপারে ১০ পাইয়াছে, প্রশ্ন সাধারণত: যাহা হইয়া থাকে সেরূপ হইলে ইহারাই হয়ত ৩০ পাইত। সুতরাং ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা যায় না। এক প্রশ্ন কঠিন, তাহার উপর খাতা দেখার নির্দ্দেশও খুব কঠোর রকমের দেওয়া হইয়াছিল। প্রশ্নে এবং খাতা দেখার অতিরিক্ত কড়াকড়ি করিয়া ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল ইহা মনে করা অবিচার।

বাংলার প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছে। অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ হইয়াছে। ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ তিন পরীক্ষাতেই বাংলার প্রশ্ন সব রকমে খারাপ হইয়াছে। বি-এতে যে রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়েরা দুই ঘণ্টায়ও লিখিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার জন্ত বহু পরীক্ষার্থী ফেল করিয়াছে। যে ছাত্র সব বিষয়ে ৬০০-র বেশী পাইয়াছে তাহাকে বাংলায় ১ নম্বরের জন্ত ফেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ছেলে মোট ৬০০-র বেশী পাইয়াছে, পদার্থবিদ্যায় শতকরা ৯০ পাইয়াছে, তাহাকে বাংলায় ২।১ নম্বরের জন্ত ফেল করাইবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আগে নিয়ম ছিল যে কোন ছাত্র সব বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়া এক বিষয়ে অল্প কয়েক মার্কের জন্ত ফেল করিলে ঐ বিষয়টি উদার ভাবে দেখিয়া তাহাকে পাস করাইয়া দেওয়া হইত, যে নম্বর কম পড়িত তাহা মোট নম্বর হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। এই

নিয়ম পালনে বাধা কিসের? কেমিষ্ট্রির প্রশ্নে যে সব ভুল ছিল তাহা কলঙ্কজনক। এর জন্য যে সমস্ত ছাত্র ফেল করিয়াছে তাহারা অন্য বিষয়ে পাস করিয়া থাকিলে উদার ভাবে খাতা পুনঃ পরীক্ষা করিয়া পাস করাইয়া দেওয়া যাইত। তাহা না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে পুনঃ পরীক্ষার মার্ক আরও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। হেড এগজামিনাররা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা উদারভাবে খাতা দেখিয়াছেন। ইহার কোন ষ্টাণ্ডার্ড আছে কি না জানি না। যে হেড এগজামিনার পরীক্ষকের দেওয়া ৮ কমাইয়া ১ করিয়াছেন তিনিও ত উদারভাবে খাতা দেখিয়াছেন বলিয়া সহি করিয়াছেন? পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার একসঙ্গে আমূল পরিবর্তন না হইলে বর্তমান অনিশ্চয়তা আরও বাড়িবে। ইহাতে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও দেশবাসী তিন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়ের এ বিষয়েও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে শিক্ষার মান ও পরীক্ষার মান অসম হইলে ছাত্রের প্রতি অবিচার করা হয়। সে জ্ঞান তাঁহার আছে বলিয়া মনে হয় না। এবারে পরীক্ষার অন্যায় ও অবিচার অতি সুস্পষ্ট, সুতরাং ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়ের "চূণ প্রলেপ" চেষ্টা অসমীচীন হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী গ্রন্থ

গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে যে পরিচালন-সমিতি গঠিত হয় তাহার কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস রচনা এই উৎসবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক। উপযুক্ত গবেষক ও ঐতিহাসিকের হাতে তাহার ভারার্পণ করা হয়। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল আমরা পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য পরিচালন-সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যে সব বাঙালী ঐতিহাসিক এই আড়াই শত পৃষ্ঠার পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সংকলন করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালী শিক্ষিত সমাজে সম্মানিত। এই পৃষ্ঠা-সংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। বঙ্গভাষায় সংকলিত অংশে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাহিত্যে বঙ্গনারী" ১৯৫-২১১ পৃষ্ঠা তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা" প্রবন্ধে ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা ও ক্রমোন্নতির বিবরণ আছে (২১২-২২৪ পৃষ্ঠা)। বেথুন কলেজের অনেকা ছাত্রী শ্রীমতী ভারতী রায় শতবার্ষিকী উৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। "রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বঙ্গমহিলা"—রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালী নারীর যোগদানের বিবরণ; লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর অবদানের সত্যকার প্রমাণ পাওয়া যাইবে জাতির সংগঠনকার্য্যে। সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

এই পুস্তকের প্রধান অংশ ইংরেজী প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ। ১-১২৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সমসাময়িক সরকারী দলিল-পত্র, এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রাদির উপর নির্ভর করিয়া বেথুন স্কুল ও কলেজের প্রামাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ বর্তমান যুগে বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস বলিলে তাহার প্রকৃত বর্ণনা করা হইবে। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে যোগেশবাবুর একটা স্থান আছে। শতাধিক বর্ষব্যাপী নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাসমূহের একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ (পৃ. ১২৯-৬১)।

বাঙালী সমাজ এক শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিদেশী শাসনের ও পরদেশী সংস্কৃতির সম্মুখীন হইয়া কি করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, আত্মস্থ হইয়া এই দুইটি বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এখনও প্রায় প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্রের স্তম্ভে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে তার মধ্যে বাঙালী সমাজের অনেক দোষ গুণের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেই দোষ-গুণ সর্ব্ব-ভারতীয়।

আমরা সুখী হইতাম যদি সর্ব্বভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস এই উপলক্ষে নূতন করিয়া সংগৃহীত হইত। ১৯৪৯ সালে যখন এই উৎসবের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় উৎসব পরিচালন-সমিতির নিকট তখন আমরা এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম যে, পরিচালন-সমিতি সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ তৎসম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখান নাই। পত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। স্ত্রীশিক্ষার সেবায় আত্মনিবেদিত শিক্ষিত মন এরূপভাবে কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা বর্তমান যুগের অনুপযোগী এবং ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণের পরিপন্থী।

সাধারণ নাগরী লিপি

ভারতরাষ্ট্রে লিপি-সমস্যা—নানা অঞ্চলে ও নানা সমাজে বিভিন্ন অক্ষর থাকার জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বিনোবা ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা সরল উপায়ের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। গত ৫ই আশ্বিনের বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় তাহার অনুলিখন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম:

"দৃষ্টান্তস্বরূপ বিনোবা ভারতবর্ষের ভাষাসমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন, হায়দরাবাদ রাজ্যে মারাঠি, কানাড়, তেলুগু,

উর্দু ও হিন্দী প্রভৃতি যে পাঁচটি ভাষা বলা হয় তার সবগুলির জন্যই নাগরী লিপি অবলম্বন করিলে তাহারা ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধানের দিকে সাহায্য করিতে পারে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর হইতে বেশী পৃথক নয়; কিন্তু তাহাদের লিপিগুলি পৃথক এবং এক হইতে অন্যকে আবৃত রাখিবার পক্ষে সেগুলি দেওয়ালের মত কাজ করে। সকল-গুলির পক্ষে এক সাধারণ লিপি থাকিলে তাহাদের লেখাপড়ার সুবিধা হইবে এবং তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে আনিয়া দিবে। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, লিপির বিভিন্নতায় তাঁহাকে অশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। এই রাজ্য অথবা কোন পুস্তকপ্রকাশক যদি প্রত্যেক ভাষার সৎসাহিত্য নাগরী লিপিতে প্রকাশ করার ভার নেন, তবে ভারতের মহা উপকার করা হইবে।

"উর্দু যদি নাগরী লিপি গ্রহণ করে তবে তাহার দ্বারাই ইহা হিন্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহা হিন্দীকে সংস্কৃতের কৃত্রিম প্রভাব হইতে রক্ষা করিবে। বিনোবা একথা বলিতে চান না যে, উর্দু বা কানাড় লিপিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু যদি এগুলির সঙ্গে তাঁহারা নাগরী লিপিও গ্রহণ করেন এবং তাহা ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা কালক্রমে এমন এক আদর্শ হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি করিতে পারিবেন, অন্ত সকলে খুশী হইয়া যাহার অনুসরণ করিবে। বর্ত্তমানে যদিও তাঁহারা জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত, তবুও সে ভাষা দেখিতে যে কেমন হইবে তাহা কেহই জানেন না এবং সেজন্যই তীব্র অথচ নিষ্ফল আলোচনার সৃষ্টি হয়। তাহাদের আদর্শ হিন্দুস্থানী এই সকল তীব্রতার অবসান ঘটাইবে। উর্দুর যেখানে ব্যবহার চলে এবং তাহার বেশ উন্নতিও হইয়াছে। তাঁহাদের কেবল ইহাকে একটু সহজ করিতে হইবে এবং ইহাকে নাগরী লিপিতে লিখিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহারা জাতীয়-ভাষা-সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য দান করিতে পারিবেন। ভারতের সমস্যা সমাধানে কেমন করিয়া তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।"

আচার্য্য ভাবের প্রস্তাব কোন রাজ্যের সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লোকের মিথ্যা ভীতি ভাঙ্গিবে। ভীতি অপেক্ষা পরের লিপির প্রতি সহজাত সংস্কারই বর্ত্তমান সমস্যা উৎপাদন করিয়াছে। এক আদর্শ, এক ভাষা, এক লিপি এই ত্রয়ীর সংযোগ না হইলে মহাভারত সৃষ্টি হইতে পারে না। তবুও আমাদের মন এই আদর্শের আশা ছাড়িতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গে বাধ্যতামূলক উর্দ্দু শিক্ষা

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি এক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের স্কুলসমূহে মুসলমান ছাত্রদের বর্ণ পরিচয় উর্দ্দু ভাষায় সুরু করিতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত তাহারা কেবল উর্দ্দু ভাষাই শিখিবে এবং চতুর্থ শ্রেণী হইতে ইচ্ছাধীন বিষয়রূপে বাঙ্গলা লওয়া চলিবে। উর্দ্দু বরাবরই অবশ্যপাঠ্য ভাষা রূপে পরি-গণিত থাকিবে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এই আদেশে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। এই আদেশ যদিও মুসলমান ছাত্রদের প্রতি প্রযোজ্য, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রেরাও এই আদেশের আওতায় পড়িবে। কারণ পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্র একই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের উর্দ্দু শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু ছাত্রদের বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ কোন কথা ঐ আদেশে নাই, সুতরাং হিন্দু ছেলেদেরও ঐ সঙ্গে উর্দ্দুতে বর্ণ পরিচয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ফলে হয় তাহা-দিগকে স্কুল ছাড়িতে হইবে নতুবা উর্দ্দু পড়িতে হইবে।

রাজনীতি ও নিষ্ঠুরতা

গত ১লা আশ্বিনের "অভয়" পত্রিকায় (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পল্লীসমাজের সাপ্তাহিক মুখপত্র) "অপপ্রয়াস" শিরোনামায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে পৃথিবীর ধ্বংসের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে:

"সহযোগী সংগঠন পত্রিকা একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সহযোগী বলিতেছেন, 'আমরা জানি দেশে দুর্ভিক্ষ হইতেছে না দেখিয়া কোন কোন নেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্ত বিমর্ষ হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ না হইলে লোকে যে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকেই আবার ভোট দিবে, এই আক্ষেপ কাহারও কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের পরাজয় দেখিবার সুযোগ লাভের লোভে নিজেকে একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলিতেও ইহাদের আপত্তি নাই।"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নির্ব্বিকার চিত্তে আমাদের শুনাইতে-ছেন যে তাঁহাদের গবেষণাগারে এমন সব বিষ আবিষ্কৃত হইয়া গুদামজাত হইয়া আছে যে তাহা বাতাসে ছড়াইয়া দিলে ২।১ ঘণ্টার মধ্যে এক একটা জনপদ—পশ্চিম ইউরোপ বা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনপদ—প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে; তাহার গাছপালা পুড়িয়া যাইবে। আমাদের পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে যে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাবে সৃষ্টি পুড়িয়া যাইবে এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী পাঠ করিয়াছি, তাহা নিজেদের জীবনে দেখিবার সুযোগ হইবে না কি?

আগামী নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতীক

আগামী পৌষ-মাঘ মাসে ভারতরাষ্ট্রে নূতন নির্ব্বাচন

হইবে। প্রায় ১৭ কোটি নরনারী এক কি দু'দিনের জন্য দেশের নিয়ামক হইবেন। কারণ তাঁহাদের পছন্দ বা খেয়াল মত যেসব সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে মন্ত্রিমণ্ডলী মনোনীত হইবেন এবং এই ভাবে তাঁহারাই আগামী পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া দেশের শাসনকার্য্য চালাইবেন। এই ভোটাভুটিতে নানা দল প্রতিযোগিতা করিবেন, এবং অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত নর-নারীর সুবিধার জন্য নানা চিহ্ন নানা দল পছন্দ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নির্ব্বাচন পরিচালক শ্রীসুকুমার সেন সকল দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। নিম্নে তার তালিকা দিলাম :

ফরওয়ার্ড ব্লক—	দাঁড়ান সিংহ
ঐ (রুইকার পন্থী)—	মানুষের হাত
অখিল ভারত হিন্দুমহাসভা—	ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার
কিষাণ-মজদুর-প্রজাদল—	কুঁড়ে ঘর
অখিল ভারত রামরাজ্য পরিষদ—	উদীয়মান সূর্য্য
ভারতীয় তপশীলী ফেডারেশন—	হাতী
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—	জোয়ালে বাঁধা এক জোড়া বলদ
ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল (সোশ্যালিষ্ট পার্টি)—	গাছ
ভারতীয় সাম্যবাদী দল (কম্যুনিষ্ট পার্টি)—	ধানের শীষ ও কাস্তে

কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলের পরিণাম

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখের "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র যে "স্বাধীনতা" সংখ্যা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে শ্রীঅমলেন্দু সেনগুপ্ত একটি মন্তব্য করিয়াছেন যার ফলে কোন ভুল কমিয়া যায় নাই বা কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বর্ত্তমানের সঙ্কট অবস্থা ৪ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলেরই পরিণাম, ইহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। এই প্রকাণ্ড ভুল কয়টির মধ্যে ভারত-বিভাগে স্বীকৃতি সর্ব্ব প্রধান। এই মন্তব্যের মধ্যে যে যুক্তি আছে তাহা মার্কিনী সাংবাদিক হ্যানসন বল্ডউইনের সমপর্য্যায়ের। রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল ইয়াল্টায় যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিলেন তার ফলে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা নাকি বিপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ নেহরু ও প্যাটেল ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া ৩৫ কোটি বা ৪০ কোটি নরনারীর জীবন, সম্মান ও বিত্ত বিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ বক্তব্যাদির যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতাম যদি ইয়াল্টায় রুজভেল্ট-চার্চ্চিল আর কি করিতে পারিতেন তাহা বল্ডউইন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার-গণের প্রবন্ধে দেখিতে পাইতাম। সেইরূপ দিল্লীতে নেহরু-প্যাটেলের গত্যন্তর কি ছিল, তাহা দেখাইতে পারিলে অমলেন্দু বাবুর বক্তব্যের মূল্য ছিল। নেহরু ও প্যাটেলের নীতির সমর্থক না হইয়াও তাঁদের হইয়া এই কথা বলা যায় যে 'পাকিস্থান' প্রতিষ্ঠায় সম্মতি না দিলে আমাদের কোটি কোটি নর-নারীর অবস্থা বর্ত্তমানের অপেক্ষা উন্নততর হইত তাহা প্রমাণা-ভাবাৎ অগ্রাহ্য।

একই ডালে পেচক ও দাঁড়কাক

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত 'পূর্ব্বাচল' (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ২৩শে ভাদ্র সংখ্যায় আসাম রাজ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিতালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁরা আসামের রাজ-নৈতিক হালচালের সন্ধান রাখেন তাঁরা এই 'নিকাহ' বিবাহের সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে ধান তুলিবার সময়, পাট তুলিবার সময় এরূপ অগুনতি বিবাহ হয়। প্রায়ই ২।৩ মাস পরে 'তালাকে'র ধুম পড়িয়া যায়। আমাদের কেবল জানিতে কৌতূহল হয় যে এই ব্যাপারে কে বর ও কে কনে—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা।

"...ভারতবর্ষকে 'সেক্যুলার' রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টায় জওহরলালজীকে সাহায্য করাই হইল তাহাদের কংগ্রেসে যোগদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাহাতে লীগ-নেতা জনাব সৈয়দ সাদউল্লা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন, যেন ভারতবর্ষ বাস্তব ক্ষেত্রে আচার-আচরণে কার্য্যত: 'সেক্যুলার' বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে বা অনুরূপ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ হীন ইঙ্গিত একমাত্র লীগ-নেতা ও তাঁহার সাঙ্গাতদের পক্ষেই সম্ভব। ইহা 'সেক্যুলার' বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হইয়া যদি পাকিস্থানের ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা-বাদী ধর্ম্মান্ধ মুল্লা রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে চারি কোটি মুসলমানকে শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে দেখা যাইত না। আজও যে চারি কোটি মুসলমান সসম্মানে ও শান্তিতে এই রাষ্ট্রে বাস করিতে পারিতেছেন, তাহাই ভারতবর্ষের সেক্যুলারিজম এর জলন্ত নিদর্শন।

"প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও লীগের মিলন কিরূপে সম্ভব হইল? মুসলীম লীগ উৎকট সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস সাম্প্র-দায়িক প্রতিষ্ঠান না হইলেও ইহা বর্ত্তমানে ঘোর প্রতিক্রিয়া-শীল। সমস্বার্থের ভিত্তিতেই এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিগত কারণেও এই দুইটি দুষ্ট গ্রহের মিলন ঘটিয়াছে। একটি স্থলে দুইটি প্রতিষ্ঠানের যে অপূর্ব্ব চারিত্রিক সাদৃশ্য আছে তাহা হইতেছে উভয়েই প্রতিক্রিয়া-শীল।"

"প্রতিক্রিয়াশীল" শব্দটি স্থানে অস্থানে এত অধিক ব্যবহার করা হইতেছে যে তার কোন মানে নাই। ক্রিয়ার বিরুদ্ধে হয় প্রতিক্রিয়া। ভারতরাষ্ট্রে কিসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে? প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন আজ বিশ্ব-জনীন হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কংগ্রেসই তৎকর্তৃক অভিভূত হয় নাই। কিন্তু আসাম রাজ্যে যাহা ঘটিতেছে তাহার গভীরে যাইতে হইবে এবং তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে ভাষা-বিদের আশ্রয় লইতে হয়। এরূপ একজন ভাষাবিদ ডক্টর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে আসামের ভাষা-সঙ্কট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা সত্য; আজও ভাষার দ্বন্দ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের চিরশত্রু মুসলিম লীগের সঙ্গে মিতালী রাষ্ট্রদ্রোহের সমান।

সুনীতিবাবুর বক্তব্য এইরূপ ছিল :

"...উপস্থিতকালে আসামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ভাষা অসমীয়া ; ইহা কেবল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম অংশে গোয়ালপাড়া জেলায় বাংলাও প্রচলিত। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন পাহাড়ী ভাষা প্রচলিত—যথা গারো খাসিয়া মিকির উমাসা বা কাছাড়ী নাগা এবং মণিপুরী কুকী ও লুসাই। ইহাদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খাসিয়া ও মণিপুরীরা বিশেষ উন্নত এবং আমি নিজে মণিপুরে ও শিলং-এ যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে আসামের এই সকল পার্ব্বত্যজাতি নিখিল-আসামের রাজভাষা হিসাবে বরং হিন্দীকে চায়—মণিপুরীদের অনেকের বাংলাতেও আপত্তি নাই—কিন্তু অসমিয়া কেহই চাহে না। আসামের পার্ব্বত্য জাতিসমূহ এখনকার আসামের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ আসামের বাংলাভাষী। কোন্ ন্যায়ে এক-তৃতীয়াংশের ভাষা (এবং সেই ভাষার সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ব্যাপারিক ও রাজনীতিক প্রাধান্য অন্য আর একটি তৃতীয়াংশের ভাষা অপেক্ষা গুরুতর ইহা কেহ বলিবে না) অন্য দুই-তৃতীয়াংশের উপরে জোর করিয়া চাপানো যাইতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীর অন্যতম মৌলিক অধিকার হইতেছে যে সে ভারতের যে অংশেই বাস করুক না কেন, তাহার ভাষা এবং ভাষাগত সংস্কৃতি সে অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।...

আসাম প্রদেশের যুক্তিসঙ্গত নাম হওয়া উচিত "পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ এবং এই পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের চারিটি বিশিষ্ট খণ্ড, ইহার প্রত্যেকটির অধিবাসী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র—(১) হিমালয়ের সানুদেশের পার্ব্বত্যজাতি আবর, মিরি, মিশমি ও ডফলা প্রভৃতি দ্বারা অধ্যুষিত, বালিপারা ও সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চল ; (২) অসমিয়া ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, এই অঞ্চলের পশ্চিমে বাঙালীদেরও বাস ; (৩) পার্ব্বত্য অঞ্চল—গারো, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, নওগাঁ জেলার মিকির পাহাড় এবং নাগা পর্ব্বত অঞ্চল, মণিপুর ও লুসাই পাহাড় ; (৪) সুর্মা উপত্যকার কাছাড় ও শ্রীহট্টের অংশ—যেখানে বাংলাভাষা প্রচলিত।"

শতকরা ৩৩ জন লোক যদি নিজেদের স্বার্থ বাকী ৬৭ জনের উপরে স্থাপিত করিতে চায় তবে এরূপ অস্থায়ী নিকাহ" ছাড়া অন্য গতি কি আছে !

ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ

গত ১৮ই ভাদ্রের "জনশক্তি" (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় "শ্রীবাস্তব" এই ছদ্মনামে এক জন লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় কেন ত্রিপুরার প্রজাবর্গ পাকিস্থানীর আশঙ্কায় দিন কাটাইতেছে। পুরাতন কথায়, আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের অকর্ম্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিতে চাই না। এখন "যাত্রা" শেষ হইলে রাষ্ট্রের মঙ্গল।

"ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আসাম-কাছাড়ের সংযোগ নিয়ে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে, তা সর্ব্বজনবিদিত।

সংযোগের পরিকল্পনা প্রস্তুত হ'ল, নতুন নতুন ইঞ্জিনীয়ার এসে আস্তানা গাড়লেন ত্রিপুরায়। কত কনট্রাক্‌টার এলেন, তাদের দিয়ে কাজও আরম্ভ হ'ল, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে লাগল। কিন্তু তার পর? যখন কনট্রাক্‌টাররা বিলের টাকা নিয়ে ঘরে উঠেছেন, তখন দেখা গেল, পথের যাত্রা হয়েছে ভুল পথে আর টাকাগুলো গেছে মাঠে মারা! ইঞ্জিনীয়াররা স্থান ত্যাগ করলেন অথবা করতে বাধ্য হলেন, এলেন নতুনের দল, আবার আরম্ভ হ'ল নতুন রাস্তা, এলেন নতুন কনট্রাক্‌টার। এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল।..."

বর্ম্মী আরাকানে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা

গত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের শেষে একটি সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার মর্ম্মার্থ এই : পাকিস্থানের সাহায্যে এবং সমর্থনে একদল মুসলিম 'মুজাহিদ্' বা ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিক ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলে 'জেহাদ' চালাইতেছে এবং বুথিডং এ তাহারা সম্প্রতি একটি 'শরিয়তী সাধারণতন্ত্র'ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

উক্ত 'সাধারণতন্ত্রের' প্রধান হইতেছেন আবুল কাশিম নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক 'ল' গ্রাজুয়েট। আরাকানের তিনি একজন ধনী জমিদার। তাঁর দলে কয়েক শত সশস্ত্র 'মুজাহিদ্' আছে। যে 'সাধারণতন্ত্র' তাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেটি অবশ্য একটি 'ভ্রাম্যমাণ সাধারণতন্ত্র'। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদলের দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপরই ইহা নির্ভরশীল। নাফ নামে যে নদীটি ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চল এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সেই নদীর কূলে কাশিম দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল শক্ত ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছে। কাশিম-বাহিনীর কার্য্য-কলাপ এখন মউডঙেই জোর চলিতেছে.

কাশ্মীরের কায়দা এখানেও চলিতেছে, আরাকানের এই সমস্ত 'মুজাহিদ'কে গোলাবারুদ কে জোগাইয়াছে—অবশ্য প্রকাশ্যে ও সরকারীভাবে নহে—তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নাই। সম্প্রতি পাকিস্থান হইতে মুজাহিদগণ চায় ইকি

মর্টার এবং অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, গত যুদ্ধের সময় আরাকানের জঙ্গলে লুকান ব্রিটিশের কিছু অস্ত্রশস্ত্রও মুসলিম মুজাহিদের হাতে পড়িয়াছে।

একটি 'বাহিনী'ও তাহাদের আছে। এই দ্বিতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হইতেছে ব্রহ্মদেশীয় পুলিসের জনৈক প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর, নাম জাফর। বিমানযোগে জাফর কয়েকবার করাচী যাতায়াত করিয়াছে। কিছু কাশ্মীরী যোদ্ধা সে আরাকানে আমদানী করিয়াছে।

কিছুদিন হইল কাশিম ও জাফর মিলিত অভিযান চালাইতেছে।

আরাকানের এই মুজাহিদ্‌দের স্থানীয় মুসলমান বা ব্রহ্মের বিদ্রোহীদের সহিত কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই; সংযোগও কিছু নাই। এই 'জেহাদের' উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আকিয়াব পর্য্যন্ত চাউল-উৎপাদনকারী সমগ্র অঞ্চলটি পাকিস্থানের আওতায় আনা। আকিয়াব বন্দরের সামরিক গুরুত্বও রহিয়াছে।

ব্রহ্ম সরকার এই 'জেহাদকে' তাঁহাদের 'ঘরোয়া' ব্যাপার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন, তাই পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপন করে নাই।

'মুজাহিদ্‌দের' লড়াইয়ের কায়দা এই: ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদল দেখা গেলেই তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ঢুকিয়া পড়ে এবং নিজেদের পরিচয় দেয় আরাকান হইতে আগত মুসলিম উদ্বাস্তু বলিয়া। তাহারা বলে, আরাকানীদের অত্যাচারে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সম্প্রতি আরাকানীদের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে চাউল চোরাই-কারবার প্রসিদ্ধ।

এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা—এই কর্ম্মের ফলে পাকিস্থানী মনোভাব দুনিয়ার চোখে আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। কম্যুনিষ্ট "পঞ্চমবাহিনী"র মত পাকিস্থানীদের নিজেদের রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনে তৎপর দেখা যাইবে।

ভারতরাষ্ট্রে অভ্রের খনি ও ব্যবসায়

"যুগান্তর" পত্রিকায় অভ্রখনি ও ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এখন পর্য্যন্ত এই খনিজ দ্রব্যের বাজার বিদেশে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বিলাতে। যুদ্ধের সময় অভ্র অনেক সামরিক প্রয়োজনে লাগিয়াছে। সুতরাং তাহার মূল্য বাড়িয়াছে।

"ভারতীয় অভ্রের বেশীর ভাগই পাওয়া যায় বিহারের অভ্রখনি অঞ্চল থেকে। হাজারীবাগ জেলার কোডারমা, গাঁওয়া, সাতগাঁওয়া, ডোমুয়া প্রভৃতি থানা, গয়া জেলার রজৌলি থানা ও মুঙ্গের জেলার ঝাঁঝা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কতকাংশ নিয়ে গঠিত ষাট মাইল লম্বা ও বার মাইল চওড়া বিহারের এই অভ্রখনি অঞ্চল। ছোট বড় অসংখ্য অভ্রখনি আছে এই অঞ্চলে। বিহার তথা ভারতবর্ষের অভ্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হাজারীবাগ জেলার কোডারমা ও তার পরেই গিরিডি। ছোটনাগপুরের তরঙ্গায়িত ভূমিতে অবস্থিত এই দুটি জায়গা পৃথিবীর সমস্ত অভ্র-ব্যবসায়ীর কাছে সুপরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশের নেল্লোর জেলা ও রাজপুতানার কিষণগড় প্রভৃতি ষ্টেটেও অভ্র পাওয়া যায়। গুডুর ও ভিলওয়ারা যথাক্রমে মাদ্রাজ ও রাজপুতানার অভ্র-ব্যবসায়ের কেন্দ্র।"

খনি বিজ্ঞানে বলে বালুসার কোয়ার্টজ খনিজের গলিত স্রোত যাহাকে "পেগমেটাইট" বলে, যখন অভ্রধারক "মাইকা সিষ্ট" স্তরকে ভেদ করে, তখনই অভ্রের জন্ম হয়। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ দ্রবময় আগ্নেয় স্রোত বহিয়াছিল। আজ নানা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের পরে ঐরূপ ঘটনাস্থলগুলি অভ্রখনিতে পরিণত হইয়াছে। অভ্রখনিতে দেখা যায় পেগমেটাইটের মধ্যে পাথরের ভিতরে চাপ চাপ অভ্রের "পকেট" রহিয়াছে।

"অবশ্য সব পেগমেটাইটেই সমান অভ্র পাওয়া যায় না। কোনও জায়গায় খুবই সামান্য পাওয়া যায়—আবার কোনও জায়গায় বেশী পাওয়া যায়। অভ্রখনি অঞ্চলে অনেক জায়গায়ই অভ্রখণ্ড-মিশ্রিত এই 'পেগমেটাইট' ভূপৃষ্ঠে দেখতে পাওয়া যায়। বিস্ফোরক ব্যবহার ও হাতুড়ি, শাবলের সাহায্যে এই পেগমেটাইট কেটে মানুষ নীচে নেমে যায়, আর ভাঙা পাথরের ভিতর ঝকঝকে অভ্রখণ্ডগুলি বেরিয়ে পড়ে। এমনিভাবে সোজা পঁচিশ তিরিশ ফুট কেটে আবার পেগমেটাইটের ভিতর দিয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ কাটা হয়, আর পাথর কাটিয়ে অভ্রখণ্ডগুলি উপরে নিয়ে আসা হয়। এমনি করে এক একটি অভ্রখনি পাঁচশ' ছ'শ ফুট নীচে পর্য্যন্ত যায় এবং তাতে পঁচিশ ত্রিশ ফুট অন্তর অনেকগুলি সুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যায়, বেশ লম্বা লম্বা। অভ্রখনিগুলি বেশী চওড়া হয় না। কারণ পেগমেটাইটের দুই পাশেই সাধারণতঃ থাকে মাইকা সিষ্টের দেওয়াল। এই 'সিষ্ট'-এর মধ্যে অভ্র পাওয়া যায় না বলে এগুলিকে আর কাটা হয় না।

মাটির নীচে অমনি সুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। মাটির নীচে যত যাওয়া যায়, ততই গরম—আর ওখানে ত উপরের মত এমনি মুক্ত হাওয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বায়ু চলাচলের জন্য প্রত্যেক খনিতে দুই বা ততোধিক মুখ করতে হয়—মাটির নীচে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় মোমবাতি বা লণ্ঠন—তাতে খনির নীচে গরম গুমোট জায়গা আরও গরম হয়ে ওঠে। তার পর উপর থেকে মাটি-পাথর চাপাও পড়তে পারে, তারও যথোচিত ব্যবস্থা করতে হয়। পাথরগুলোকে কাটাবার জন্য ব্যবহৃত

হয় ডিনামাইট। বিস্ফোরণে পাথরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায় আর পাথরের খণ্ড ছিটকে আসে বুলেটের চেয়েও জোরে। শ্রমিকেরা কিন্তু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে পালাক্রমে দিনরাত এই সব পাতালপুরীতে কাজ করে যাচ্ছে, আর ভূগর্ভ থেকে উঠিয়ে আনছে অতি প্রয়োজনীয় এই সম্পদ। অনেক যন্ত্রপাতি দরকার হয় বড় বড় খনিতে কাজ করার জন্যে—যেমন খনির নীচে জল হয়—সে সব জল উপরে তুলে ফেলবার জন্য চাই বড় বড় পাম্প। অভ্র ও পাথর উপরে তোলবার জন্য চাই বড় বড় 'হয়েষ্ট'—তা ছাড়া এইসব পাম্প ও হয়েষ্ট চালাবার জন্যে থাকে বড় বড় এঞ্জিন ও বয়লার। 'এয়ার কম্‌প্রেসার' চাই এই সব শক্ত পাথরে গর্ত্ত করবার জন্য ব্যবহৃত হয় যে মেসিন ড্রিল তার জন্ত।

অভ্র স্বচ্ছ ও মসৃণ—কিন্তু ভূগর্ভে অন্যান্য জিনিষের সংস্পর্শে এসে এর স্বচ্ছতার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে ও অনেক সময় নানা দাগ পড়ে এবং ভূগর্ভে পাথরের চাপে থাকে বলে কিছু কিছু অভ্র অমসৃণও হয়। যত বেশী দাগযুক্ত বা অমসৃণ হবে, ততই তার দাম যাবে কমে—কারণ এগুলির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ রোধ করার শক্তি কমে যায়। তাই এরূপ শ্রেণীবিভাগ দরকার হয়ে পড়ে। প্রধানত: নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে অভ্রগুলিকে ভাগ করা হয়:—সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, দাগমুক্ত মসৃণ যে অভ্রখণ্ডগুলি সেগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে দামী ও প্রয়োজনীয়—এগুলিকে বলা হয় ইংরেজীতে 'ক্লিয়ার এস এস'। তারপরে পর্য্যায়ক্রমে 'গুড ষ্টেনড্', 'ফেয়ার ষ্টেনড্', 'হেভিলি ষ্টেনড্', 'ব্যাডলি ষ্টেনড্' ইত্যাদি। এমনই শ্রেণীবিভাগ করে অভ্রগুলিকে গুদামজাত করে রাখা হয়। তারপর বিদেশ থেকে যেমন যেমন চাহিদা আসতে থাকে, বাক্স ভর্ত্তি করে এগুলিকে চালান দেওয়া হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনা

প্রতি যুগে এক একটা শব্দের ব্যবহার মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তাহাদের কর্ম্মশক্তি হরণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগে, যেদিন হইতে মার্কিণের ধন ও বৈভব দুনিয়ার উপরে খবরদারি করিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে "প্ল্যানিং পরিকল্পনা" শব্দটি বর্ত্তমান জগৎকে পাইয়া বসিয়াছে। যেন একটা অদ্ভুত আবিষ্কার এই শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।

অথচ সাধারণ লোকে ভাবিয়া পায় না যে শব্দটির ব্যবহার কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছে। তাহারা ত তাহাদের "অশিক্ষিত" বুদ্ধি দিয়াও বুঝে যে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত "পরিকল্পনা" ছাড়া কোন কাজ করে না। বর্ষার জন্ত খাদ্য সঞ্চয় ও আবাসস্থানের ব্যবস্থা একরূপ, শীত ও গ্রীষ্মের ব্যবস্থা অন্যরূপ। খাদি-প্রতিষ্ঠানের মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য শুনাইয়াছেন; তাঁহার আশ্রিত মক্ষিকার নানাবিধ কৌশলের গল্প বলিয়াছেন। এই জ্ঞানশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিবার জন্ত বিরাট কলকারখানার বা গবেষণাগারের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্ত অনেক সময় ভাবি "পরিকল্পনা" শব্দটি জপিতে জপিতে আমরা এরূপভাবে আত্মহারা হইলাম কেন।

তবুও অস্বীকার করি না যে গবেষণাগার ও কল-কারখানার প্রয়োজন আছে; অতীতেও ছিল। সেইজন্ত ভারতরাষ্ট্রের পরিচালক শ্রীজবাহরলাল নেহরু যখন অনবরত তাহার "পরিকল্পনার" গুণকীর্ত্তন করেন, তখন মন দিয়া শুনিতাম। আজ তাহাও নূতনত্ব হারাইয়াছে। একটা নূতন শব্দ আবিষ্কার না করিলে ব্যবসায় অচল হইয়া যাইবে যে!

গত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দিল্লী হইতে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

ভারতীয় কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-বিষয়ক গবেষণা পরিষদের গভর্ণিং বডি ভারত-সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাউন্সিলের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের পর পূর্ব্বোক্ত সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি সাধনের জন্ত পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা হিসাবে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু আমাদের আত্ম-প্রশংসারও অনেক কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট পরিষদের কার্য্যকলাপ প্রশংসার্হ। ইতিমধ্যেই দুইটি বীক্ষণাগার খোলা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ চলিতেছে। যেভাবেই হউক, আমরা ভাল কাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।...আর্থিক অনটন হেতু গবর্ণমেণ্ট গবেষণা এমন কি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে তিনি পরিষদকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলেখ্য প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার বৃদ্ধির জন্ত উৎসাহ দানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

ভারতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শক্রমে একটি পরি-কল্পনা রচনার জন্ত পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে ইহার পর এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি নক্সা প্রস্তুত করা হয়।

পরিষদ এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যত সত্বর সম্ভব এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। অর্থ-নৈতিক কারণে অন্তরায় ঘটান আদৌ উচিত নহে। কপার্স ইন্‌ ইউ এস এ যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরিষদ

ভারত-সরকারকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় ২২ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে ভারত ৭০ হাজার টন বিমান চালনার পেট্রল, ১৫ লক্ষ টন পারিবারিক ব্যবহার্য্য কয়লা, কিছু পরিমাণ পেট্রলিয়ামজাত দ্রব্য লাভ করিবে।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে কর্ণাস ইজের রিপোর্ট পরীক্ষার জন্য পরিষদ নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন; যথা—শ্রী জে আর ডি টাটা, শ্রী জি ডি বিড়লা, শেঠ কস্তুরভাই লালভাই, লালা শ্রীরাম, ডাঃ এস এস ভাটনগর, ডাঃ জে সি ঘোষ এবং ডাঃ ডি এন ওয়াদিয়া। তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে স্বাভাবিক পেট্রোলিয়ম পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের জন্য পরিষদের উদ্যোগে ভারত-সরকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধানের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন। তদুপরি খনিজ পেট্রোলিয়ম খরিদ করিয়া ভারতীয় বন্দরসমূহে দুইটি বা তিনটি শোধনাগারে উহা শোধন করা সম্ভবপর কিনা, তাহাও তাঁহারা পরীক্ষা করেন। ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে এ পর্য্যন্ত দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকার সন্ধান মিলে নাই; তদুপরি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকা হয়তো থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা পরিষ্কার করিতে ও কাজে লাগাইতে বহু বৎসর অতীত হইবে। সুতরাং এইরূপ কোনও সূত্র হইতে পেট্রল সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রয়োজন মিটাইবার আশু সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পরিষদ এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের পরিচালক সমিতি গবেষণা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় হইবে।

তারপর ৫।৬ মাস অতীত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ভরসার কথা এখনও শুনি নাই।

দুনিয়ার বাণিজ্য পোতের হিসাব

সম্প্রতি আমেরিকা ম্যারিটাইম কমিশন (U. S. Maritime Commission) বিভিন্ন দেশের সমুদ্রপোতের 'টনেজ' বা মালবহন ক্ষমতার এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা কি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যুদ্ধের বিষম ক্ষয়-ক্ষতি কাটাইয়া জাহাজী টনেজ অতি কষ্টে ১৯৩৯ সালের পরিমাণ সামান্যমাত্রায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বারুদের গন্ধ দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। যদি বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া উঠে, তবে সমুদ্রপোতের অবস্থা যে আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই হিসাবে দেখা যায়:

			১৯৩৯	১৯৫০
মোট বাণিজ্যপোতের সংখ্যা			১২,৬৬৫	১০,৭০৮
জাহাজী টনেজ		হাজার	৭,৯১,৩৯	৮,১৮,১২
ইংলণ্ড	...	"	২,১৫,৮৭	২,২০,১৮
আমেরিকা*	...	"	১,০২,১৯	১,৩৯,৯১
নরওয়ে	...	"	৬৯,৩১	৭৫,৬৭
পানামা	...	"	—	৪৯,৮৪
নেদারল্যাণ্ড	...	"	৩৪,২৫	৩৬,৭২
ফ্রান্স	...	"	২৯,৯৯	৩৫,৯৫
সুইডেন	...	"	২০,৩৩	২৭,০৫
গ্রীস	...	"	২৭,৯১	১৯,৩৩
সোভিয়েট রুশ	...	"	—	১৮,২৪
অপরাপর সম্মিলিত	...	"	—	১,৬১,৪১
জাপান	...	"	৭১,৪৫	—
জার্ম্মাণী	...	"	৫১,৭৭	—
ইটালী	...	"	৩৯,১০	৩৩,৮২

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় জাহাজ মালিক সমিতির সভাপতি শ্রী জি. টি. কামদার ইহার বার্ষিক অধিবেশনে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্রের টনেজ মাত্র ৪ লক্ষ টন। ভারতের জাহাজী-বাণিজ্য সুচারু ভাবে চালাইতে হইলে উপকূলের জন্য আরও ১,৭৫,০০০ টন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ১,৫০,০০০ টনের জাহাজ প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৩০,০০০ টনের জাহাজ যাত্রী বা যাত্রী ও মাল ভারত সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য প্রয়োজন। এই জাহাজ ক্রয় করিতে ৭ হইতে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। সমস্ত উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইলে আরও ১৪ কোটি হইতে ১৬ কোটি টাকা এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং দূরপ্রাচ্যে গমনাগমন ও বাণিজ্যপোতের জন্য আরও কমবেশী ১,২০,০০০ টনের জাহাজ কিনিতে ১২ হইতে ১৩ কোটি টাকা প্রয়োজন।

এই অভাব মিটাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এককালে বিদেশী জাহাজী কোম্পানীকে ভারতে আনিয়া কাজকারবার আরম্ভে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ৩৫ কোটি টাকার ৭৫ ভাগ শতকরা ২ টাকা সুদে

---

* ইহা ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক কমিশনের তাঁবে যে ১৯,৯৫,০০০ টনেজ আছে বা সেনাবিভাগের অন্তর্গত যত টনেজ আছে, তাহা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে।

অগ্রিম দিলে বাকী টাকা শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেশের মধ্যে সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই প্রসঙ্গে আত্মবশের সুখের ও পরবশের দুঃখের কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তবেই দেশের মঙ্গল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সাহায্য

নিম্নলিখিত বিবরণটি "আমেরিকান রিপোর্টার" (বাংলা সংস্করণ) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুবেরের দেশ বলিয়া পরিচিত কেন তাহা এই সাহায্যের পরিমাণ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়।

এতৎসম্পর্কে দুই-তিনটি কথা আমাদের মার্কিনী বন্ধুবর্গের জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম—যাঁহারা উপকৃত হইতেছেন, তাঁহারা এই দানে সুখী নন। একটা অব্যক্ত ভীতি তাহাদের মনকে নাড়া দেয় যে দাতা এই দানের প্রতিদানে কিছু উশুল করিয়া লইবেন। দ্বিতীয়—এরূপভাবে দান করিয়া মানুষের মন জয় করা যায় না। চীনদেশ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বহু কোটি টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে পড়িয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই টাকার সুদ লওয়া হইল না। তাহা ব্যয় করা হইল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চীনদেশীয় যুবকবৃন্দের শিক্ষার উন্নতিকল্পে।

তার ফলে তাঁহারা মার্কিনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিলেন, ভাব ও চিন্তায় হইলেন মার্কিনী, যেমন ইংরেজের আমলে আমরা হইয়াছিলাম। চিয়াং-কাই-শেক, মাও-সে-তুং ছাড়া চীনের নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই ছিলেন এইরূপ ভাবে মার্কিনের নিকট ঋণী।

আজ দেখিতেছি কি? এই নিঃস্বার্থ দানের কথা চীনদেশের কেহ কি মনে-প্রাণে স্বীকার করেন? সেইজন্যই বলিতে চাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এশিয়া ও আফ্রিকাকে কম অর্থসাহায্য করিতেন তবে তাহা কল্যাণপ্রদ হইত বেশী এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই শান্তিতে থাকিতে পারিতেন।

"আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও আর্থিক সমস্যা সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদ জানিয়েছেন যে, ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি মোট ৫০০ কোটি ডলার সাহায্য পাইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।

কোন্ দেশ কত ডলার সাহায্য পেয়েছে তার হিসেব এইরূপ:—

ভারত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ব্রহ্মদেশ ৫০ লক্ষ ডলার, চীন ১৭৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, ইরাণ ৩ কোটি ডলার, ইস্রাইল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, জাপান ২ শত কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া) ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, ফিলিপাইন ৭৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, রিউক দ্বীপপুঞ্জ ৬ কোটি ডলার, সৌদি-আরব ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, থাইল্যাণ্ড ৬০ লক্ষ ডলার এবং তুরস্ক ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

আফ্রিকার দেশসমূহ: মিশর ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, লাইবেরিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ১০ লক্ষ ডলার।

ওশেনিয়া: অষ্ট্রেলিয়া ২ কোটি ডলার, নিউজীল্যাণ্ড ৭০ লক্ষ ডলার এবং ওশেনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ৪০ লক্ষ ডলার।

পরামর্শদাতা পরিষদ নিম্নলিখিত সুপারিশও করেছেন:

(১) ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় যদি কোনও দেশ যোগ দেয় তা হলে সে দেশকে "পরিবর্ত্ত আমানত" জমা রাখতে হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় সম্পদ্ হস্তান্তরের ভিত্তিতে। তবে কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ভিত্তিতে হয় না।

(২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৌকর্যার্থে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই যাতাতে সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত এই "পরিবর্ত্ত আমানতে"র অর্থ পাওয়া যায়, তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত আর্থিক বছরে যে সব বিশেষ ধরণের বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হবে, তাও হবে ঐ সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে, সামরিক সাহায্যও ঐ একই ভিত্তিতে দিতে হবে। কখনই ঋণ দানের ভিত্তিতে ঐ সাহায্য দেওয়া চলবে না।

(৪) বৈষয়িক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য যে অর্থ দেওয়া হবে, তা হবে ঋণের ভিত্তিতে। তবে এরূপ সাহায্য দেওয়া হবে শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই, যেখানে দেখা যাবে যে, ঋণ গ্রহণ করে ঐ পরিকল্পনা সফল হতে পারে এবং সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও যথোপযুক্ত ধরণের।

(৫) সম্পদ হস্তান্তরের (দান) ভিত্তিতে যে বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হবে, সেই সাহায্যকে "কোনও মতেই স্বর্ণ ও ডলারের মজুত তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলবে না এবং বিপরীত পক্ষে যে সব দেশ দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেবে, তাদের বর্ত্তমান মজুত তহবিল হ্রাস করা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যলাভের প্রাথমিক সর্ত্ত বলে ধরা হবে না।

উক্ত পরামর্শদাতা পরিষদ আরও দেখিয়েছেন যে, গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক ৩৩০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাগজ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১০৭ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিস্মৃত বিপ্লবী

মহারাষ্ট্র দেশে বসুদেব বলবন্ত ফাড়কের (Phadke) নাম আদ্যবিপ্লবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৭৯ সাল বা

Uttarpara Jaikrishna Public Library

অদূরবর্ত্তী কালে মহারাষ্ট্র দেশে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতি শিক্ষিত নেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সময়েই এই প্রায় অশিক্ষিত যুবক সশস্ত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই চেষ্টাকে কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষের (agrarian discontent) ফল বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট প্রমাণ আছে যে, ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন চলিতেছে। ফাড়কের বিদ্রোহ তার প্রথম প্রকাশ। আজ মহারাষ্ট্র বলবন্তের যোগ্য সম্মান দিতেছে।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বাঞ্চলে অনুরূপ চেষ্টা হইয়াছিল প্রায় ১৮৬০ সালে, 'সিপাহী বিদ্রোহে'র ২।৩ বৎসর পরে। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন 'মধুবন'—সোনারাম আওলেন। তিনি কাছাড়ী ছিলেন। গঞ্জুর ছিল তখন মহকুমার সদর শহর। সুতরাং 'মধুবন' ধ্বনি তুলিলেন—'চল গঞ্জুর'। পাশাপাশি একটি সরকার স্থাপিত করিলেন। প্রায় ১২ বৎসর এই অসম যুদ্ধ চলিল। শেষে 'মধুবন' বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে ধরা পড়িলেন। তখন তিনি কোন গ্রামে কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছিলেন। তাঁর জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া অনেক পল্লীগাথা রচিত হইয়াছিল। তাহা সংগৃহীত হওয়া উচিত।

"বিশ্ব-ভাগবতী ও ভক্তি-নিকেতন"

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় আসামের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশন ছিলেন। সরকারী দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বৃন্দাবন বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি যে বিরাট কর্ম্মভার মাথায় তুলিয়া লইতেছেন, তাহা যৌবন-সুলভ কর্ম্মশক্তির উপযোগী। সেই সঙ্গে থাকা চাই ভক্তি ও পাণ্ডিত্য। একটি বিবরণে দেখিতেছি যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া তিনি ভক্তিশাস্ত্র, ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে প্রায় ১৯০ খানি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করিতেছেন।

এই বিরাট কার্য্য একার দায়িত্বে সম্পন্ন হয় না। সতীশবাবু নবদ্বীপধাম, কলিকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানের ভক্ত, পণ্ডিত ও লোকনায়কদের আশীর্ব্বাদ ও অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি

এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীসুভদ্রা হাক্‌সার ও যুগ্ম-সম্পাদিকা শ্রীকুলদীপ এইচ সিং ও শ্রীঅশোকা গুপ্তার বিবৃতি হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সংকলন করা হইয়াছে:

"পঞ্জাব হইতে আগত লক্ষ লক্ষ গৃহহারা উদ্বাস্তু যখন উত্তর ভারতের নিদারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছিল তখন তাহাদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তৈরী জামা পোশাক দেওয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপালের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নারীসঙ্ঘের আন্তরিক সহানুভূতি এবং আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার কার্য্যাবলী বিভিন্ন দিকে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিম্ন কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইতেছে: (১) সমিতি ১৮টি চরখাকেন্দ্রের পরিচালনা করিতেছে এবং এই ১৮টি কেন্দ্রে বর্ত্তমানে ৫৪২ জন মহিলাকে বোনা ও সূচী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই সব চরখাকেন্দ্র হইতে ইতিমধ্যেই ১৩০৪ জন শিক্ষার্থিনীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। (২) তিনটি কেন্দ্রের সূচী শাখায় প্রায় ১৩০ জন মহিলাকে সূচী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; এই তিনটি কেন্দ্র হইতেছে বেহালা, কালু ঘোষ লেন ও সরকারী ভবন। (৩) বয়ন শাখায় ১৫ জন বালিকাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই শাখায় খাদি, ধুতি, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। (৪) বয়নে শিক্ষয়িত্রীগণকেও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এ পর্য্যন্ত তিন দফায় ৪১ জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৩ জনকে সরকারী বিভিন্ন শিবির ও অন্যান্য সমিতিতে নিয়োগ করা হইয়াছে। (৫) হিন্দী শিক্ষা ক্লাসে চতুর্থ দফায় শিক্ষার্থিনীগণকে শিক্ষাদান করা হইতেছে। (৬) সমিতির সাধারণ সেবাকার্য্যের মধ্যে উদ্বাস্তুদের ভিতরে বিতরণের জন্য জামা-পোশাক সংগ্রহ, উদ্বাস্তু রোগীদিগকে চিকিৎসা সাহায্য-দান, উদ্বাস্তু বালিকাদের বিবাহের জন্য আর্থিক সাহায্য, উদ্বাস্তু শিশু ও মহিলাদিগকে উৎসব উপলক্ষে শিবিরে মাঝে মাঝে আহার্য্য দান ইত্যাদি রহিয়াছে। একার্য্যে স্বেচ্ছাসেবিকাদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।"

কলিকাতা নগরীর মধ্যে এইরূপ সেবা-সমিতির সংখ্যা অগণিত। সাময়িক প্রয়োজনে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ নূতন সমাজ-গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। সেই জন্য "জরুরী" শব্দটি অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে সমিতির পরিচালকবর্গ ও কর্ম্মীবৃন্দ গঠনমূলক কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত হইবেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) হইতে ২রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"প্রবাসী"

যুক্তি ও জিগির

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের মূলে রয়েছে যুক্তি। যুগে যুগে যাঁরা মানুষের মনকে নূতন নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রগতিতে তার পথ নির্দ্দেশ করেছেন, তাঁদের সবারই প্রেরণা ছিল যুক্তি, আর আবেদনও ছিল একান্তভাবে সাধারণ মানব-মনের ঐ সহজ যুক্তি-প্রবণতার প্রতি।

যুক্তির প্রতিধ্বনি হচ্ছে জিগির। এতে যুক্তির আলো নাই, আছে শুধু হুঙ্কার। জনগণের মন এতে শুধু মোহাচ্ছন্নই হয়, বিন্দুমাত্রও সমৃদ্ধ হয় না। জিগিরের বহুল প্রচলনে উন্নতির প্রবাহ বরং ব্যাহতই হয়ে থাকে। এর প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

প্রাচীন যুগের বেদ-উপনিষদের বাণী যাগযজ্ঞের জিগিরে পর্য্যবসিত হয়েছিল। প্রতিবাদ এনেছিলেন বুদ্ধদেব। পরবর্ত্তী যুগে জিগিরের প্রতিধ্বনিতে তাঁর বাণীও বিকৃত হতে বেশী দিন লাগে নি। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য সবার সম্বন্ধেই অল্প-বিস্তর একথা খাটে। তবু জিগিরের জয়যাত্রার বিরাম নাই।

কলিকালে নাকি নামেই মুক্তি। নাম ছাড়া অন্য গতি নাই—ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারেরা তিন সত্যি করে বেশ জোরের সঙ্গে একথা বহুপূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন। শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নয়, সম্প্রতি জীবনের সর্ব্বত্র আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা অক্ষরে অক্ষরে এই আপ্ত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছি। কর্ম্মের প্রেরণার স্থান অধিকার করেছে এখন এদেশে নামের জিগির। সংযম এবং নিষ্ঠা, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা যা অধিগত হবার কথা, আমরা তাকে কেবলমাত্র আবৃত্তি দ্বারাই আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি।

শুধু মাত্র আবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রবোধ হয় কি না সে বিষয়ে মতভেদের বিস্তর অবকাশ রয়েছে। কিন্তু শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভেজে না এটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। শাস্ত্রবোধ সূক্ষ্ম ব্যাপার; তার অভাবের অন্ধকার আবৃত্তির ধোঁয়ায় আলোকিত না হলেও হয়ত দরকার মত চাপা দেওয়া যেতেও পারে। চিঁড়ে কিন্তু অতি স্থূল পদার্থ। ওর বেলায় শিশুকেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

বর্ত্তমানে আমরা সেই অসাধ্যসাধনেই ব্যাপৃত আছি। নবার্জ্জিত স্বাধীনতার দীপ্তি, তার সহজ প্রেরণা, তার একাগ্র আহ্বান ও উদ্দীপনাকে অনায়াসে ধূম্রলোকে নির্ব্বাসিত করে সবাই আমরা আগে ও পাছে, দক্ষিণে ও বামে দল বেঁধে দলে দলে কেবলমাত্র কথার জোরেই আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাস্তু, শিক্ষা-আদি করে সমুদয় সমস্যারই সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতে করে কর্ম্মপ্রচেষ্টা থেকে অবচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধি আমাদের শুধু একাগ্রতাকেই হারায় নি, বেশ খানিকটা তমসাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের কাছে অধর্ম্মই ধর্ম্ম বলে মনে হবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।

মাত্র কয়েক বছর আগে এই দেশেই ত জনগণের একান্ত সাধনায় ও সমবেত শক্তিতে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সেই উচ্ছ্বসিত ধারা সহসা কোন্ মরুপথে হারিয়ে গেল! স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখনই আমরা রাষ্ট্রের হাতে দেশের গঠনমূলক সমস্ত কর্ম্মের দায়িত্ব নিঃশেষে সমর্পণ করে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির সাধনায় লেগে গেলাম, সেই দিন থেকেই এই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে। বৈদেশিক শাসনের অজস্র প্রতিকূলতা, সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, শুধু জনগণের আগ্রহে, ত্যাগ আর সেবার পাদপীঠের উপর যে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, স্বরাজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ের পর্য্যায়ে পড়ে গেল। চরকা-সঙ্ঘ, গ্রাম-উদ্যোগ-সঙ্ঘ, তালিমি-সঙ্ঘ প্রভৃতি অখিল ভারতীয় অনুষ্ঠানগুলি কর্ম্মিগণের ঔদাসীন্যে অসৎকৃত, অবজ্ঞাত হয়ে কোনমতে বেঁচে মরে রইল।

যাঁদের নেতৃত্বের দিকে সমস্ত দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাঁদের অধিকাংশেরই মনের দুয়ার খুলে গেল মন্ত্রিসভা, আইনসভার সোনার মন্দিরে। খাদি, কুটীর-শিল্প, বনিয়াদি-শিক্ষা, হরিজন-উন্নয়ন, জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞান—এ সব তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অপহৃত হয়ে প্রবেশ করল সরকারী দপ্তরে। ভাড়াটে ঘোড়া দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ টানাবার ব্যবস্থাও বোধ করি এর চেয়ে খুব বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ত না!

ভারতের বিপুল গণ-আন্দোলনের যিনি ছিলেন ভগীরথ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। অহেতুকী ভাবপ্রবণতা কখনও তাঁর মনকে আবিষ্ট, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ভক্তগণের জিগির তাঁর যুক্তিকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করবার সম্ভাবনা মাত্রেই তিনি

উদ্ধত আন্দোলনের গতিবেগ পুনঃপুনঃ প্রশমিত করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেননি। ভাবোন্মত্ত জনতাকে তিনি বারম্বার কর্ম্মের পথে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। অবসাদগ্রস্ত কর্ম্মসঙ্গিগণকে তিনি নিজ আচরণ দ্বারা কর্ম্মের পথে অবিচলিত রেখেছেন। স্বাধীনতার অর্থ ছিল তাঁর কাছে সেবার পূর্ণ অধিকার। জীবন পণ করে তিনি সারা ভারতের জন্য সে অধিকার অর্জ্জন করে গেছেন। কি সদ্ব্যবহার করেছে ভারত তার?

বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বহু আবর্জ্জনা এদেশের ঘরে বাইরে জমেছে। এক দিকে বর্ণজ্ঞানহীন পল্লীবাসী জনসাধারণের বিরাট অজ্ঞতা, আর এক দিকে বৈদেশিক শিক্ষায় অভিমানী মুষ্টিমেয় শহরবাসীর বুদ্ধির বিকৃতি, দেশাত্মবোধের অভাব। এ দুইটি পরিস্থিতিই অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ে এ দেশে যে সমস্যা ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্ত্ত থেকে এ পর্য্যন্ত, তার তুলনা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। শোনা যায়, চীনদেশে নাকি অল্প কিছু দিন আগেও রণ-দুর্ম্মদ নেতারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রায় অন্নবস্ত্র বিবর্জ্জিত, বিপুল বাহিনী নিয়ে সমস্ত দেশটা তোলপাড় করে বেড়াতেন, নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করবার জন্যে। ব্যাপারটা নিতান্ত অশান্তিকর হলেও মোটেই জটিল ছিল না। আর, ও রোগের ওষুধও ওর ভেতরেই হয়ত ছিল। আমাদের সমস্যা কিন্তু ওর চেয়ে লক্ষ গুণে জটিল।

দলাদলির জিগিরে স্বাধীন ভারত আজ প্রপীড়িত। কয়েকটা বছর আগেই কিন্তু পরাধীন ভারতের আপামর সাধারণ সমবেত হয়েছিল একচ্ছত্র জাতীয় মহাসভার পতাকাতলে—স্বাধীনতার সংগ্রামে। জাতীয় মহাসভা ছিল জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহার মূর্ত্ত প্রতীক। সেই স্পৃহা প্রয়াসশূন্য মিথ্যাচারের জিগিরে পরিণত হতে পারে নি, তার কারণ জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে ওতঃ-প্রোতভাবে গাঁথা ছিল ত্যাগ, সেবা ও গঠনমূলক কর্ম্মের তপস্যা। জাতীয় মহাসভার শক্তির উৎস ছিল সমস্ত জাতির সমবেত সমর্থন। ঐ সমর্থন জিগিরের হাওয়ায় চড়ে আসে নি, এসেছিল কর্ম্মের বাহনে। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়েছে; কিন্তু সেই আরব্ধ কর্ম্মের রথচক্র যেন কুরুক্ষেত্রে রণক্লান্ত কর্ণের রথচক্রের মতই নিশ্চল হয়ে পড়েছে। আর এতে বহেই নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

২

স্বরাজ-প্রাপ্তির পরে নবলব্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহিরে, ভারতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃমণ্ডলীর যে কর্ম্মশৈথিল্য তার প্রতিক্রিয়া এক দিকে যেমন সমগ্র জাতির মনোজগতে বিভ্রান্তি এনেছে, অপর দিকে তেমনি মহাসভারও প্রচুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে। যে মহাপুরুষের অতন্দ্রিত নেতৃত্বে জাতীয় মহাসভার কর্ণধারগণ লোকসেবা কর্ম্মে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হয়েছিলেন, তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে তাঁদের অনেকেরই কর্ম্মোৎসাহ এ দিকে যেন মন্দীভূত হয়ে যেতে লাগল। বোধ হয়, তাঁদের অজ্ঞাতসারেই অবস্থাটা দাঁড়াল 'বামুন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর' কতকটা সেই ধরণের। এঁদের মধ্যে যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা বিভাগের নিয়ামক হলেন তাঁদের সমগ্র কর্ম্মশক্তি এবং মনোযোগ সম্ভবতঃ প্রধাবিত হ'ল আমলাতন্ত্রের বশীকরণে আর প্রজাতন্ত্রের সম্প্রতিষ্ঠায়। আর সরকারী দপ্তরের বাইরে যাঁরা রইলেন তাঁদের হাতে সুপরিকল্পিত গঠন-কর্ম্মসূচী এবং সম্মুখে সদ্য রাজনৈতিক পরাধীনতা-পাশমুক্ত ভারতের সুবিশাল কর্ম্মভূমি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় হয় সতৃষ্ণনয়নে, নয় সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন—মন্ত্রিসভা, আইনসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দিকে, মিশ্র মনোভাব নিয়ে।

সাতচল্লিশ সালের মার্চ্চ মাসে এলাহাবাদ নগরে ভারতের বিভিন্ন কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক-গণের সম্মেলনে যে গঠনকর্ম্মসূচী গৃহীত হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন পেয়েছিল তাকে কার্য্যে পরিণত করবার যদি আন্তরিক চেষ্টা দেশে হ'ত, তা হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের হাওয়া বদলে যেত, এবং অনেক দুর্গতির হাত থেকে দেশ রেহাই পেত। কিন্তু তা হয় নি। যার স্থান হওয়া উচিত ছিল সবার আগে তাই রইল নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে সবার দৃষ্টির অগোচরে। স্বাধীনতা আর সাম্প্রদায়িকতার জিগিরে দেশের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আর নেতৃবর্গের দৃষ্টি গ্রামে জনসাধারণের দিকে প্রসারিত না হয়ে নিবদ্ধ রইল নগরীর বিধান সভায়, আইনসভায়, মন্ত্রণাসভায়। সেবা ও কর্ম্মযজ্ঞের স্থান নিঃশেষে-অধিকার করল জিগির ও জটলা।

এমন ধারা ব্যাপক নৈষ্কর্ম্ম্যের ফল যে কি হতে পারে তা ত গীতাকার বহুপূর্ব্বেই শ্রীভগবানের জবানিতে বলে গিয়েছেন:

> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

প্রজার দুঃখ যে আজ চরমে উঠেছে সে বিষয়ে আশা করি দুই মত হবার কোনোই আশঙ্কা নাই। সঙ্করের শোভাযাত্রাও যেমন সাড়ম্বর চলেছে তাতে তাও যে

কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সবার আগে চলেছে লাঠিসোটা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবকসঙ্ঘ, সঙ্গে সঙ্গে বোমা বাল্‌ব নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর সবার পিছনে রয়েছে সর্ব্বোদয়ের শিঙা হাতে কৃষক-মজুর-প্রজা পার্টি। এই সব সঙ্ঘ-সভা, ব্লক-পার্টির যাঁরা অগ্রণী তাঁদের অনেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে জাতীয় মহাসভায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেই ছিলেন। বর্ত্তমানে এঁদের জিগির আলাদা আলাদা, রীতিনীতি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক কিন্তু লক্ষ্য এক। সেটা হ'ল জাতীয় মহাসভার মোহ থেকে দেশকে মুক্ত করা, জাতীয় মহাসভার হাত থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র নিজেদের হাতে নেওয়া। এ কাজে শোনা যায় তাঁরা নাকি পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে এ এক নূতন অধ্যায়, সন্দেহ নাই। সিন্ধিয়া-ভোঁসলা-গায়কোয়ার-হোলকার মহারাজদের যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমনধারা সুবুদ্ধি হ'ত তা হলে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের যে এ দশা হ'ত না এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে।

যখন বহিঃশত্রুর গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সংহতির একান্ত প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের সেই সব নেতারা পরস্পর হানাহানিতে শক্তি ক্ষয় করে বিদেশী শাসনকে এদেশে কায়েম করেছিলেন। তারও আগে বিদেশী যখন স্বপ্নেও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভাবে নি, তখন এই বাংলা দেশেরই ধনিক আর সৈনিকে মিলে তুলে দিয়েছিল দেশটাকে বিদেশী বণিকের হাতে। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অকাজে একতা আর কাজের বেলায় অনৈক্যের দৃষ্টান্ত যুগে যুগে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করেছে। আর আর দেশে সঙ্কট সময়ে অনৈক্যের মাঝে ঐক্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। জাতির বিপদে দলাদলি ভুলে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এমনটি কদাচিৎ হয়েছে; আর এর বিপরীত দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের ইতিহাসে প্রচুর। স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মনে হয় ইতিহাস তার পুরাতন অভিশাপের পুনরাবৃত্তি করতেই আবার চলেছে।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গণদেবতার সাধন এ দেশে সবেমাত্র সুরু হয়েছে। এ পথে এখনও আমাদের বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। পথের সন্ধান যিনি দিয়েছেন তিনি পুনঃ পুনঃ দেখিয়েছেন ও পথ পল্লী অভিমুখীন, দিল্লী অভিমুখীন আদৌ নয়। ঐ পথেই আসবে জাতির প্রকৃত কল্যাণ। যতদিন না জনমত জাগ্রত হবে ততদিন পুরাতন অভিশাপের ভূত, যা কি না এদেশে পাঠান, মোগল, ইংরেজ একে একে সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিল, সে আমাদের স্কন্ধ থেকে এক পাও নড়বে না—এ সুনিশ্চিত। এ ভূত জিগিরে যাবে না। ফাঁকা আওয়াজে পাখী ত দূরস্থান, গাছের পাতাও পড়ে না—নড়েও না। আওয়াজ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, রেখে যায় খানিকটা ধোঁয়া; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভারতের রাজনৈতিক গগন আজ সমাচ্ছন্ন।

৩

কথা উঠেছে ভারতের পার্লামেণ্ট এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না এবং তার কারণ হচ্ছে সর্ব্বত্র কংগ্রেসী সদস্যগণের আত্যন্তিক সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু তা না হলেও গণতন্ত্র সার্থক হবার সম্ভাবনা ছিল না। তন্ত্র আছে, তন্ত্রধারীও আছে এদেশে বহু, কিন্তু গণ কোথায়? মাথা না থাকলে মাথা ধরার প্রশ্নই ওঠে না।

দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যাঁরা চান, প্রাথমিক কাজ তাঁদের পার্লামেণ্টেও নয়, ব্যবস্থাপক সভাতেও নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাম হ'ল তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। কুমোর যখন প্রতিমা গড়ে, তখন প্রথমে গড়ে খড়ের ধড়, তারপর করে একমেটে, পরে দোমেটে, সর্ব্বশেষে মুণ্ড বসায়। পার্লামেণ্ট, আইনসভা এ সব হ'ল গণতন্ত্রের মুণ্ড। ধড়ের উপরেই মুণ্ডের প্রতিষ্ঠা। মুণ্ড থেকে ধীরেসুস্থে ধড় বেরুলে, সে ইরাণী রূপকথা যতই বিস্ময়কর হোক না, নিতান্ত অচল হবে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। অপরপক্ষে, গণদেবতা যদি উদ্বুদ্ধ হন, তবে তাঁর মুণ্ড যেমনই হোক, জাতির সিদ্ধির পথ থাকবে অবারিত। কাজেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশ-সেবকের প্রধান কাজই হবে জনমতের উদ্বোধন।

এ কাজে উত্তেজনার অবকাশ নাই। দলাদলির আশঙ্কা নাই। জাতীয় মহাসভা যখন জাতির মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে, শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, শত নির্যাতন সহ্য করে জাতির মনকে স্বাধীনতা সমরে একাগ্র করে তুলছিল, তখন কংগ্রেস একটা দল ছিল না। কংগ্রেসের যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জীবনপাত করে যাঁরা এতে শক্তি সঞ্চার করেছেন, তাঁরা কোনো দলেরই ছিলেন না। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র, আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি, এক কথায় এর উদ্দেশ্য এবং বিধেয় ভারতের সার্ব্বজনীন। বিদেশী শাসনের ভেদনীতির অজস্র কূটকৌশলও সে সার্ব্বজনীনতা খুব বেশী ক্ষুণ্ন করতে পারে নাই। আর, আজ যখন স্বাধীন ভারতের অগণিত নরনারী মুক্তির আলোকের অংশ পাবার জন্য অপেক্ষমান, যখন যুগ যুগ

ব্যাপী দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জাতির সমবেত শক্তির বিজয় অভিযানের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত, তখন কংগ্রেসের সেই সার্ব্বজনীনতা বিধ্বস্ত হতে চলেছে তারই বহু বিশিষ্ট কর্ম্মীর কথায় ও কাজে।

সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে, কায়মনোবাক্যে এঁরা কংগ্রেসের অহিতসাধনে তৎপর হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল স্বদেশ সেবায় যাঁরা ছিলেন সতীর্থ, যাঁরা ছিলেন গুরুভাই, স্বদেশপ্রেমের অমৃত ধারায় পূত হয়ে যাঁরা বৈদেশিক রাজরোষ অগ্রাহ্য করে এক সঙ্গে কারাবরণ, অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন, আজ তাঁরাই অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিজ রোষ সম্বরণ করতে পারছেন না। তাঁদের সাম্প্রতিক ভাষণে ও আচরণে সর্ব্বত্র তাঁরা তাঁদের এই নবজাত ক্রোধের নগ্ন পরিচয় দিচ্ছেন। ও-সবে যুক্তি এত কম আর জিগির এত বেশী যে স্বভাবতই মনে হয় যুক্তির অভাবকে জিগিরের হুঙ্কার দিয়েই তাঁরা পূরণ করছেন।

কিন্তু কেন এই ক্রোধ! শাস্ত্রে বলে কামনা থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। কিসের কামনা প্রতিহত হয়ে, কোন বিষয়ে নিরাশ হয়ে তাঁদের এই ক্রোধ? দেশমাতৃকার সেবাই যদি তাঁদের কাম্য, তার ত সহস্র পথ খোলা ছিল। আজ চার বছর হতে চলেছে, বিদেশী শাসক আমাদের পথের দাবী মেনে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, আমরা সে পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছি?

কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ আর সম্মোহ থেকে জন্মে স্মৃতিবিভ্রম। মোহের বশেই আমরা মনে করি শাসনযন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনা আর ব্যবস্থাপক সভার সূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক দিয়ে দেশের দ্রুত উন্নতি অতি সহজেই সম্ভব হবে। অর্থাৎ কিনা, ওদের বদলে আমরা যদি ওখানে যাই তবে রাতারাতি দেশের হালচাল, রীতিনীতি দরকার মত রদবদল করে সব সমস্যারই সমাধান অচিরে করে ফেলতে পারি!

বহুকালের পরাধীনতার ফলে রাজশক্তির সার্ব্বভৌমিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস স্বতঃই জন্মে গেছে। আমরা মনে করি, রাজা যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তখন দেশের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি তাঁরই ইচ্ছায়, ইঙ্গিতে বা আদেশে সম্ভব। এমনতর ধারণার কোনোই ভিত্তি নাই। ওরকমটা যদি সত্যিই হ'ত তা হলে সুদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বের পরে এ দেশে একজনও হিন্দু থাকত কি না সন্দেহ। প্রজার উন্নতি-অবনতি যতটা না রাজার উপরে নির্ভর করে, রাজার উন্নতি অবনতি তার চেয়ে ঢের বেশী সুনিশ্চিত ভাবে প্রজার উপরে নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধেও এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কাজেই যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রশক্তি অধিগত হলেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির রথ 'দুই দণ্ডে চলে যাবে ছ'মাসের পথ' তাঁরা নিতান্তই ভুল ধারণা পোষণ করেন।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রশক্তি প্রজাশক্তিরই প্রতীক। পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রজার প্রতিনিধি; জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাকে ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত করাই তাঁর কাজ। জনসাধারণের নিয়ন্তা, প্রভু বা গুরু হিসাবে সেখানে তিনি প্রেরিত হন না। জনসাধারণ তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত হবে না, তিনিই জনসাধারণের ইচ্ছা যাতে কার্য্যে পরিণত হয় ব্যবস্থাপক সভায় তার ব্যবস্থা করবেন। সেই উদ্দেশ্যেই জনসাধারণ তাঁকে সেখানে পাঠায়। এর ব্যতিক্রম হলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়।

কাজেই দেশের শাসন যন্ত্রই হোক, অথবা পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভাই হোক, সব প্রতিষ্ঠানেরই কার্য্যকারিতা এবং সম্ভাবনা সুনির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই এ কথা সুস্পষ্ট হবে যে প্রজার শক্তিতেই দেশ বড় হয়েছে, আর তার পার্লামেণ্ট শক্তিমান হয়েছে।

মন্ত্রিসভা, পার্লামেণ্ট, ব্যবস্থাপক সভার মহিমায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাঁদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৬-এর "হরিজন পত্রিকায়" প্রকাশিত মহাত্মাজীর স্বাক্ষরিত বাণী থেকে নীচের ক'টি পংক্তি তাঁদের উপহার দিচ্ছি:

"জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহা যদি আমরা ভাল করিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারিব যে আইনসভার বাহিরে যাহারা থাকে তাহারাই দেশকে সত্য সত্যই চালায়। যদি তাহা না হইত, তবে প্রতি দেশের শাসনযন্ত্র আশু অচল হইয়া যাইত; কারণ দেশের জীবনকে পরিচালিত করার কাজ সুবিশাল এবং তাহার তুলনায় আইনসভার শক্তি নিতান্ত নগণ্য। ঠিক কথা হইল এই যে, সমুদ্রের সহিত জলবিন্দুর যে সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের সহিত পার্লামেণ্টের সম্পর্ক তাহার চেয়ে বেশী নয়।"
(ইংরেজীর অনুবাদ। নিউদিল্লী, ২০-৪-৪৬)

৪

ঐ যে কথা উঠেছে, পার্লামেণ্টে বলিষ্ঠ একটি বিরুদ্ধ দল না থাকলে গণতন্ত্র ঠিকমত কাজ করবে না ওর মধ্যে যুক্তির চাইতে জিগির আছে ঢের বেশী। আমরা জানি, গিরিজায়ার ঝাঁটা পিঠে না পড়লে দিগ্বিজয়ের মনে ভালবাসার আমেজ জমত না,—তাই বলে সর্ব্বত্রই প্রণয়ের পক্ষে সম্মার্জ্জনী অপরিহার্য্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না নিশ্চয়ই।

দেশপ্রেমের একটা বলিষ্ঠ সাধারণ চেতনা, দেশের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ, এক

কথায় জাতীয় বিবেকবুদ্ধির উন্মেষ না হলে তথাকথিত গণ-তান্ত্রিক দলাদলিতে লাভের চাইতে আমাদের লোকসানই হবে বেশী। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে শত অনৈক্যের মধ্যেও যে জাতীয় স্বার্থগত একটা সহজ ঐক্যবোধ আছে, আমাদের দেশে এখন সেটা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। সেই ঐক্যবোধই হবে জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। তার উপরেই হবে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতিষ্ঠা। দেশের যাঁরা নেতা, দেশসেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে নেবার অধিকার এবং অবসর যাঁদের আছে, তাঁদের কাজ হবে স্বাধীনতার সেই পাদপীঠকে সুদৃঢ় করা, সমুন্নত করা। আর তাঁদের পক্ষে অকাজ হবে এমন কিছু করা যাতে করে জাতির বিবেক বিভ্রান্ত হয়ে সেই ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে আসে।

যুগব্যাপী পরাধীনতায় যে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মনোভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা নিতান্তই বাতিল হয়ে গেছে। তবু অভ্যাসের বশে তাই আঁকড়ে ধরে আমরা আছি। লোকায়ত্ত শাসনের আনুগত্য কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে, স্বাধীনতার দায়িত্ব এবং শৃঙ্খলাবোধকে আমরা সহজভাবে অঙ্গীকৃত করতে যেন পারছিনে। ফলে, একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ সমালোচনার স্রোত দেশের সর্ব্বত্র বয়ে চলেছে, অন্যদিকে গঠনাত্মক সহযোগিতারও তেমনি অভাব হয়েছে। পরাধীন ভারতের অসহযোগের জের যেন স্বাধীন ভারতে এসে আজও শেষ হয়নি। আর এতে করে প্রতিপদে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির মন্থরতায় যাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে, আগামী নির্ব্বাচনে ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে তাঁদের মত উষ্ণ মনোভাবাপন্ন লোক যাতে সমধিক সংখ্যায় প্রবেশলাভ করতে পারে তারই সাধনায় তৎপর হয়েছেন, তাঁরা খুব সম্ভব মনে করেছেন সোয়ার বদ্‌লালেই আজকার বেতো ঘোড়া কাল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু তা হয় না, হবেও না।

আর, উগ্র সাম্যবাদীর দল যাঁরা বোমা-বারুদ দিয়ে কেল্লাফতে করবার চেষ্টায় আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই; তবে উপায়টা যে তাঁদের সদুপায় নয় তা ত তাঁরা নিজেরাই বলেন। আমরা শুধু বলি অমন সরাসরি উপায়ে স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। ও উপায় বাইবেলের আদি-কাণ্ডে পৃথ্বীব্যাপী প্লাবনের অনুপান দিয়ে ভগবান নিজেই একবার পরখ করেছিলেন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় কতকটা ঐ রকমই তিনি করেছিলেন যুগোপযোগী উপকরণ দিয়ে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি উভয়ত্র কোথাওই হয়নি। কিন্তু ফল যা হয়েছে, তা ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতার বশে দেশের যত সমস্যা, যত দুর্ভোগ সবকিছুর দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে খানিকটা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাতে করে দুর্ভোগের বোঝা আমাদের এতটুকুও হালকা হবে না, সমস্যাও সমাধানের পথে এক পদও অগ্রসর হবে না। বরং বোঝা আমাদের আরও ভারী বোধ হবে, সমস্যাও আরও নূতন নূতন আকারে দেখা দেবে।

যেখানে রোগ, চিকিৎসাও সেইখানেই প্রয়োজন। সত্যিই দেশের দ্রুত অগ্রগতি যাঁদের লক্ষ্য হবে, তাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে 'বলিষ্ঠ বিরুদ্ধ দল' গঠনের নিষ্ফল চেষ্টায় মন না দিয়ে, ও সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে, গঠন কর্ম্মের ভিত্তির উপরে, বিশাল ভারতের বুকে কোটি কোটি নর-নারী নিয়ে বিশাল ভারতীয় সেবাদল গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করলে অনেক সমস্যার উপরেই সমাধানের আলোক পড়বে—এ অতি সুনিশ্চিত। আর, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

কবিতার দুঃখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বটি মানুষের সুখ দুখ ভাগী,
বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে
প্লীহা কি কম্পজ্বরে।
দেখি তাহাদের অন্নকষ্ট,
নানা দিকে ক্ষতি-ক্ষয়,
কিন্তু তাদের দৈনন্দিন
দিই না কো পরিচয়।
তাতে কি সার্থকতা,
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের
কহি হাঁপানীর কথা?

২

দাবানলে মৃগ-মরকের কথা
বলে না'ক মৃগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ-জলের
প্রতিনিধিত্ব দাবি,

রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে,
সন্দেহ নাই অণু,
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়,
রামধনু, রামধনু।
পঙ্কেতে রয় বোঁটা,
কি দোষ, যদি না রহে পঙ্কজে
পঙ্কের ছিটা-ফোঁটা?

৩

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর
কয়লা কালিমা লেশ,
অকথিত থাকে খনির আঁধার,
খনি-শ্রমিকের ক্লেশ,
সাপের মাথার মাণিক—তাহারো
আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয় নাকো বিষদংষ্ট্রার
গরলের সংবাদ।
শুভ শঙ্খ স্বন—
শম্বুকদের 'শুঁড়ের' কাহিনী
করে না তো নিবেদন?

৪

'চোক গেল' বলে পাপিয়া ফুকারে,
সেটি হয় সঙ্গীত,
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জ্জন করে
সেটা তার বিপরীত।
অতিক্রম যে করে সঙ্গীত
সব যাতনার সীমা,
ছন্দে ও সুরে রাজে তার চির
বাসন্তী পূর্ণিমা।
তিক্ততা রহে দূর
গীত যে সাগর-উত্থিত সুধা
সব তার সুমধুর।

৫

এসেছে দারুণ মন্বন্তর,
মানুষ করিবে কি?
লাভ তো কিছুই হবে না, করিয়া
মনকে হতশ্রী?
সুধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে
যদি বলা হয় 'খেটে',
পড়িবে কি একমুঠা বেশী ভাত
তাতে ক্ষুধিতের পেটে?
কে হবে তাহাতে ধনী?
খুলে লও যদি ধরাগাত্রের
সুষমার আবরণী।

৬

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে,
কি বলিবে মহাজনে?
কাশ্মীরী শাল, না বুনে, শিল্পী
'গামছা'ই যদি বোনে?
যারা অজন্তা 'মাদুরা' গড়েছে,
খ্যাত যারা চরাচরে,
কলালক্ষ্মীই কাঁদিবে—তাহারা
যদি শুধু 'ঢেঁকি' গড়ে।
বাড়িবে বিড়ম্বন,
সকল লেখনী লাঙল হইলে
উপবাসী রবে মন।

৭

ভেব না নেহাৎ উদাসীন আমি,
নাহিক সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি,
জোগাতে না পারি ধুতি।
আমি তোমাদেরি আশা-আকাঙ্ক্ষা
বেদনার কথা কই,
সুরপুরে তাহা পাঠাবার শুধু
যোগ্য করিয়া লই।
বুঝিতে করো না ভুল,
বাণী-অর্চ্চনা হয় নাকো দিয়া
গোবরের বর্ত্তুল।

৮

যুগ-উপযোগী হতে কহ মোরে
তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশ, কাল, জাতির আমি যে
মর্য্যাদা পেতে চাই।
ধনিক, বণিক, শ্রমিক ক্ষণিক,
কারো প্রীতিকামী নহি,
আমি জগতের যজ্ঞের চরু
দেবতার তরে বহি।
আর কিছু নাহি পারি,
আমি তোমাদিকে করি আনন্দ
অমৃতের অধিকারী।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শ্রীহরিহর শেঠ

মানবদেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা যাহা আবশ্যক তাহা শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত জীবনলাভ করা। এই দুইটির মধ্যে যে গুরুত্ব নিহিত এবং তাহা কাহার কতটা আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহার পরিমাপক কোন আখ্যা নাই, মাপিয়া দেখিবার কোন যন্ত্র বা পন্থা নাই। যেমন বিদ্যার মাপ-কাঠি এখন মুখ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি তেমন কিছু নাই। তবে এখন মানুষের পরিচয় অনেকটা তাহার ধনসম্পদের বহিঃপ্রকাশে। আর তাহার সঙ্গে যদি সংযোগ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা। অতি অল্পক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনশালী ব্যক্তিগণই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রায় সকল বিভাগেই প্রাধান্য পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারাই প্রধানতঃ মানব-সমাজে প্রখ্যাত। শিক্ষিত ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে নাই বা থাকিতে পারেন না একথা কেহই বলিবেন না। দুঃখের বিষয়, সে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বা মানবতার মর্য্যাদা আজ কোথায়! মনুষ্যত্বসম্পন্ন বিত্তহীন মানুষ সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন এমন সৌভাগ্যবান অধুনা কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়?

মনুষ্যত্ব বা মানবতাবিহীন 'মনুষ্য' নামধারী জীবের সঙ্গে বনচারী পশুর খুব বেশী পার্থক্য নাই। মানুষই একমাত্র জীব যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বসবাস করিয়া থাকে। সেখানে মানবোচিত ধর্ম্ম লইয়া জীবনযাপন করিতেই হয়। অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া জগতের কল্যাণে রত হওয়াও মানুষের ধর্ম্ম। সেই জন্য আমারা নানাবিষয়ক বিদ্যার সাধনা করিয়া থাকি। বিদ্যার প্রভাবে জগতের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে সত্য। আজ বিজ্ঞানবলেই জগতের এই রূপ—অসম্ভব বলিয়া এতাবৎ যাহা কল্পনার অতীত ছিল তাহা এখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এসব যে বিদ্যার প্রভাবেই, একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু মানবজীবনে এই সব স্কুল-কলেজী বিদ্যাই যে শুধু মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে তাহা নহে। বিদ্বান ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া থাকি। বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি যে যে বিষয়ে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে তিনি সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায় তিনি যে তাহা হইবেনই এমন কোন কথা নাই। বর্ত্তমানে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র পথ। তথা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতিতে অনেক কিছু লাভ হয় সত্য। বিদ্যালোচনা জ্ঞানলাভের সহায়ক। কিন্তু সমাজে থাকিয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য তাহাই যথেষ্ট নহে। সেজন্য যাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহা তথায় পাওয়া যাইবেই এমন কথাও বলা যায় না। সেই জানার নামই শিক্ষা। সেই জানা এবং জানিয়া সেই মত চলা বা প্রয়োগ করাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, মানবতার প্রতীক এমন শ্রেষ্ঠ মানুষের উদ্ভব যে অসম্ভব বা তথাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই যে তিনি মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হইবেন একথা কেহই বলিবেন না। এরূপ শিক্ষিত লোক যেমন অনেক পাওয়া যায়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শহীন এমন কি নিরক্ষর-দিগের মধ্যেও জ্ঞান ও মানবতার উচ্চ সীমায় আরূঢ় লোকের দৃষ্টান্তও জগতে বহু আছে। মানুষের ইন্দ্রিয়-গোচর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাহ্য শক্তির সহিত অন্তরেন্দ্রিয় স্থূল, সূক্ষ্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত মানবোচিত প্রচ্ছন্ন গুণাবলীর বিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না। মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালনই তাহার ধর্ম্ম। মানুষের মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে হিংসা, দ্বেষ, লোভাদি রিপুর তাড়না হইতে প্রথম মুক্ত হইতে হইবে। ত্যাগের অনুশীলন, আত্মসংযম অভ্যাস, দেশের কল্যাণ-চিন্তা ও তাহাতে রত হওয়া দরকার, ইহাই মনুষ্যত্ব। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র এই মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

> "চৌম্বকের ধর্ম্ম কি?—লৌহাকর্ষণ। অগ্নির ধর্ম্ম কি?—দাহকতা। জলের ধর্ম্ম কি?—দ্রাবকতা। বৃক্ষের ধর্ম্ম কি?—ফলপুষ্পের উৎপাদকতা। মনুষ্যের ধর্ম্ম কি?—মনুষ্যত্ব।"

এই মনুষ্যত্বেই যখন মানবজীবনের সার্থকতা, সুতরাং উহাই চরম সম্পদ, তখন মানবতার সাধনার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সে দিকে যে লক্ষ্য রাখা উচিত, মনে হয় এ বিষয়ে নেতৃবর্গের উদাসীনতা আছে। আধুনিক ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে হারে মানুষ জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে যখন এ শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, আক্ষরিক শিক্ষা স্বল্পলোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল বা যখন গুরুমহাশয়ের

পাঠশালা টোল অথবা গুরুগৃহই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র ছিল, তখন অনেক মানুষই এখনকার মত বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত না হইলেও শিক্ষিত জ্ঞানীর সংখ্যা যে কম ছিল তাহা নহে। পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিতে হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, এখনকার মত তখন জীবনযাপন এত জটিল হইয়া উঠে নাই। তখন যে-সব শিক্ষার তত প্রয়োজন ছিল না এখন তাহা আছে। যাহার প্রয়োজন আছে তাহার অনুশীলন চাই-ই, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্বের বিসর্জ্জন দিয়া নহে।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণাদিতে আমার কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু গল্পে-কথায়, যাত্রা কথকতায়, থিয়েটারের পৌরাণিক কাহিনী হইতে এবং বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে যে ধারণা মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহাতে এখনকার মত মনুষ্যত্বের এমন লাঞ্ছনা, এমন অবমাননা আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদান করিতে, বিদ্যার নানা দিকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি। বঙ্গভাষার অবাধ প্রচলন, উন্নতি এবং উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদের মনীষীরা সর্ব্বদা সচেষ্ট; এমন কি আমাদের এই বঙ্গভাষা যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিতে পারে সেজন্য আমরা উদ্যোগী হইয়াছি। ইহা অবশ্য ভালই। ইহার দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মনুষ্যত্বই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাহার অভাবে আজ আমাদের পারিবারিক জীবন বিপর্য্যস্ত, সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, নূতন রাষ্ট্রিক জীবন কলঙ্কিত তাহা লাভের জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ত দেখি না। বিদ্যা ও শিক্ষা, মানুষ ও মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্য বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও পালন করিবার জন্য তাঁহাদের ঔদাসীন্য পরিহারের বিশেষ চেষ্টা কি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পরিদৃষ্ট হয়? এই অপূর্ণতা দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের কত সম্পদ হৃত হইয়া সর্ব্বনাশের পথ সুগম হইতেছে কে তাহা নির্ণয় করিবে।

আমার এই সব মন্তব্য হইতে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট এক সংখ্যালঘু বিদ্বান সম্প্রদায় হইতে হয়ত কথা উঠিবে, সে শিক্ষা এবং তাহার পরীক্ষা কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্ভব হইতে পারে। যদি একথা উঠে, ইহার ঠিক মত উত্তর দেওয়া বা পথ নির্দ্দেশ করার মত ক্ষমতা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তদুত্তরে এই কথাই শুধু বলিতে চাই, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস ও শিক্ষা এসব যাহা এখন কল্পনার বিষয় হইয়াছে, লোক শিক্ষার পুরাতন ব্যবস্থাদি যখন আজ লুপ্তপ্রায়, যখন সরকারনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের এখন অন্য পথ নাই, তখন তাহার মধ্য হইতেই আমাদের মানুষ হইবার মত শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে, কি উপায়ে তাহার পরীক্ষা লওয়া সম্ভব এসব কথা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রের নয় রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষভাবে লিখিত পুস্তক পঠনব্যবস্থা, কি পোষ্ট গ্রাজুয়েটের অপর কোন নূতন বিভাগ খোলার দ্বারা এ কার্য্য সুগম হইবে বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট স্কুল কলেজের শ্রেণী ছাড়াও তৎসহিত কথকতা যাত্রাদি অথবা ঐ সকলের স্থলাভিষিক্ত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের সহায়তা দ্বারা লোকশিক্ষার অন্য পথ গ্রহণ আবশ্যক সে সকল বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে।

আমার এই যে আলোচনা ইহা হয়ত 'ছোট মুখে বড় কথা'র মতই প্রতীয়মান হইতে পারে। আমাদের চরম পরীক্ষার দিন সম্মুখে। আমি দীর্ঘদিন হইতে যাহা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি, শিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তৃতা অথবা প্রবন্ধাদিতে বা সভাসমিতিতে বলিয়া আসিতেছি তাহাই একটু বিশদ ও স্পষ্ট করিয়া এখানে বলিলাম মাত্র। আমার কথা, যদি আমার এই চিন্তাধারা যাহা আমার বিশ্বাস বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভাবিয়া থাকেন—তাহার কোন সার্থকতা থাকে তবে জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ বিষয় অবহিত হইতে হইবে। ইহার সারবত্তা অনুভূত হইলে সরকার সে শিক্ষার পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

এক্ষণে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হইয়াছে। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত এই অবর্ণনীয় দুর্দ্দিনে রাষ্ট্রনায়কগণ বহু চিন্তা-প্রসূত পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন। আশা করা যায়, ইহার সুফল এক দিন পাইবই; কিন্তু ভয় হয় স্বাধীনতা পাইবার মাত্র এক যুগ পূর্ব্বেও মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে আমরা যাহা ছিলাম এক্ষণে তাহা হইতে কত নামিয়া গিয়াছি, এই নিম্নগামীর গতিরোধ করিয়া আমাদের মধ্যে নূতন করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে না পারিলে সম্যকভাবে তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একটা বড় কারণ যে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিলোপ-প্রাপ্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা স্বাধিকার লাভ ত সকলেরই কাম্য, কিন্তু সে স্বাধীনতা মানুষের হইলেও মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত মানুষের যদি হয় তাহা অনিষ্টেরই মূলীভূত কারণ হইবে। বহু কাম্য বিপুল ত্যাগলব্ধ স্বাধীনতা হয়ত স্খলিত হইয়া যাইবে। অমানুষের হস্তে অধিকার পাওয়ায় কখনও কল্যাণ হইতে পারে না।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

সকালবেলা গোপাল মুখুজ্জে তাহার ছোট মনিহারী দোকানের সামনে একখানা তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। মাঠের উপর অজস্র সোনালী রোদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাতাসে একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে অথচ গোপাল মুখুজ্জের মন যথেষ্ট প্রফুল্ল নয়। গ্রামের বাজারে একাধিক মনিহারী দোকান, বেচাকেনা খুবই কম, একটা লোকের মোটা ভাতকাপড় জোটানও মুশকিল, এ অবস্থায় গোপালের মন প্রফুল্ল থাকিতে পারে না।

সংসারে গোপাল একা, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে কাছাকাছি কেহ নাই। অবিবাহিত গোপালের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, শৈশবে কিছুদিন স্কুলে গতায়াত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্যালাভ বিশেষ ঘটে নাই।

সৃষ্টিকর্তা এক একটি মানুষের সৃষ্টির ভিতর দিয়া এক একটি রসসৃষ্টি করিয়াছেন। কোন মানুষটি আদিরসপ্রধান, দেখিতে কন্দর্পের মত সুন্দর, কোন মানুষটি বীররসপ্রধান, সর্ব্বদাই যুদ্ধং দেহি ভাব, কোন মানুষটি করুণরসপ্রধান, চোখ দুটি ছল ছল মুখে হাসি নাই, একটা অদৃশ্য দুঃখের বোঝায় বিনত, আবার কোনটি হাস্যরসপ্রধান—যেমন এই গোপাল মুখুজ্জে। শ্যামবর্ণ গোপাল বেঁটে মানুষ, হাত-পা শীর্ণ অথচ পেটটি মোটা, উপরের দাঁতগুলি উঁচু থাকায় মুখখানি সব সময়ই হাসি হাসি।

তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া গোপাল আনমনে বিড়ি টানিতেছিল—আজ সকালে খরিদ্দার যেন অন্যদিনের চেয়েও কম। পথ দিয়া যে দুই-চার জন চলিতেছে তাহারা দোকানের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। বিড়িটি পুড়িয়া গেলে সেটি ফেলিয়া দিয়া গোপাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটির ভারসমতা রক্ষা করিয়া পা' দুটি তুলিয়া টুলের উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসে এবং মনে মনে দেনা-পাওনার হিসাব খতায়।

হঠাৎ একখানা মস্ত বড় ঝকঝকে মোটর পথ ছাড়িয়া তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া থামে এবং ভিতর হইতে দুটি সুটপরা ভদ্রলোক নামিয়া আসেন। গোপালের মানসাঙ্ক গোলমাল হইয়া যায়, সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটি হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়। প্রথম ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করেন, "দেখুন, আপনি শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জ্জীকে চেনেন?" গোপাল মাথা নাড়ে, কেননা নামটা তাহার হইলেও সে বুঝিতে পারে মোটর গাড়ীর বাবু দুটি তাহার মত নগণ্য লোককে খুঁজিতেছে না। পিছন হইতে দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করেন, "হাঁ মশায়, বলুন ত এ গ্রামের নামটা কি?" এইবার গোপাল কতকটা নির্ভয় হয়, সসম্ভ্রমে জবাব দেয়, "আজ্ঞে এ গ্রামের নাম বেলগাছি।"

শুনিয়া ভদ্রলোক বলেন, "গ্রামের নামও মিলে যাচ্ছে, মনিহারী দোকানও মিলে যাচ্ছে, অথচ দোকানের মালিক শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জ্জীকে আপনি চিনেন না—আশ্চর্য্য!" প্রথম ভদ্রলোক হাসিয়া বলেন, "নাও চিনতে পারেন, সবটা পরিচয় ত দেওয়া হয়নি, সবটা দিলে হয়তো চিনতে পারবেন, আমরা খুঁজছি ৺কৃষ্ণদাস মুখার্জ্জীর প্রপৌত্র, ৺হরিদাস মুখার্জ্জীর পুত্র শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জ্জীকে।" শুনিয়া গোপালের মুখটা প্রথমে লাল হইয়া ওঠে, তারপরে সেই পরিমাণে কালো হইয়া যায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোক এইবার হতাশ হইয়া বলেন, "তা হলে আপনি গোপাল মুখুজ্জেকে চিনেন না দেখছি।"

থতমত খাইয়া ভীত গোপাল এইবার বলিয়া ফেলে, "আজ্ঞে আমিই গোপাল মুখুজ্জে।"

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এক কলসী টাকা পাইলে মানুষের অবস্থা যেমন হয় গোপালের উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক দুইটির সেই অবস্থা হইল, তাঁহারা সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "পেয়েছি—পেয়েছি।" তারপরে প্রথম ভদ্রলোকটি দুই হাত জোড় করিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে নমস্কার করেন, আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক বাঁ হাতে নেকটাই সামলাইয়া একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গোপালের পদধূলি লন।

ইতিমধ্যে দুই-চারি জন করিয়া গ্রামের অনেকেই আসিয়া পড়েন। প্রথম ভদ্রলোক সেই সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ আমাদের এক মহা আনন্দের দিন, এক মাস ধরে আমরা যে রত্নের সন্ধান করছিলাম আজ তা এইখানে এই মুহূর্তে পেয়ে ধন্য হলাম। আপনারা নিশ্চয়ই শক্তিপুরের জমিদারদের নাম শুনেছেন, আমি হচ্ছি সেই জমিদারীর উকিল, আর ইনি হচ্ছেন ম্যানেজার। আপনারা হয় তো জানেন না যে, শক্তিপুরের জমিদার শ্রীরণেন্দ্রনারায়ণ রায় বিলেত থেকে আসবার পথে এরোপ্লেন ভেঙে মারা গেছেন—সে আজ ছ'মাসের কথা। রণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অবিবাহিত এবং তাঁর নিকট-আত্মীয়ও কেউ নেই—এ অবস্থায় আমরা তাঁর দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারীর সন্ধান সুরু করি এবং যথাসময়ে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জ্জীর নাম ঠিকানা পাই। গোপালবাবুর মাসীর শ্বশুরের মামা হচ্ছেন শক্তিপুরের জমিদারদের দৌহিত্র। এক মাসের খোঁজাখুজির পর আজ আমরা শক্তিপুর জমিদারীর শূন্য সিংহাসনের মালিককে পেয়েছি।" শুনিয়া সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে—গোপালের মাথা ঘুরিয়া যায় এবং পা কাঁপিতে থাকে।

ইহার পরে কি অবস্থায় এবং কেমন করিয়া গোপালকে মোটরে তোলা হয় তাহা তাহার খেয়াল নাই।

নূতন জমিদারের আগমন উপলক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া শক্তিপুরে মহোৎসব চলে। গোপালের দিনগুলি একটা স্বপ্নাতুর অবস্থার ভিতর দিয়া কাটিতে থাকে; প্রকাণ্ড রাজ-বাড়ী, সাজান বড় বড় ঘর, আসবাবপত্র, ঝাড়, গালিচা, আমলা গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা, দাসদাসী ইত্যাদির মালিক সে, এবং কেন্দ্রস্থল। অবশ্য বেলগাছির ছেঁড়া হাফশার্ট-পরা গোপাল আর সে নাই, পোশাকে-আষাকে তাহারও ভোল একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

সেদিন সকালবেলা গোপাল সপরিষদ রাজবাড়ীর বাগানে বেড়াইতেছে এমন সময় কে একজন ভদ্রলোক ধুতি-চাদর বেসামাল অবস্থায় হুড়মুড় করিয়া তাহার পায়ের কাছে দণ্ডবৎ হইয়া পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মূর্ত্তিটি উঠিয়া মাকের উপরকার সুতা-বাঁধা চশমাজোড়া সংযত করিয়া জোড়হাতে কহিতে থাকেন, "আহা কি সৌম্য সমাহিত ভাব, বদন মণ্ডলে কি দিব্যজ্যোতি, দর্শনে মহাপুণ্যলাভ হয়। মহারাজ আপনি মহাপুরুষ, মহাপুরুষ।" গোপাল পরিচয় পাইল ভক্তটি স্থানীয় পণ্ডিত এবং মহা ধর্ম্মপ্রাণ। পণ্ডিতবর উপস্থিত অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "এই যে এত লোক তোমরা এখানে উপস্থিত আছ, কৈ, কাউকে দেখে ত মন আকৃষ্ট হচ্ছে না; অথচ যেই মহারাজকে দেখলাম অমনি ভক্তিতে মাথা ওঁর পায়ে আপনিই নুয়ে পড়ল।" পণ্ডিত মশায় অনেকক্ষণ ধরিয়া বেদবেদান্ত হইতে কন্যার বিবাহসঙ্কট ও পুত্রের শিক্ষাসমস্যা পর্য্যন্ত অনেক কথা বলেন। বিদায় লইবার সময় আবার পদধূলি লইয়া কহেন, "রাজা অনেক দেখেছি কিন্তু রাজর্ষি এই প্রথম দেখলাম।"

জমিদার বাড়ীর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলা আসর জমিয়াছে, মাঝখানে তাকিয়া ঠেস দিয়া গোপাল সমাসীন, চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সভাসদ্‌বৃন্দ, সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভরপুর। সাহিত্যিক আনন্দবাবু কথা কহিতেছেন, বলিতেছেন, "বারিপাত না হলে যেমন ফসল ফলে না তেমনি রাজার কৃপাদৃষ্টিপাত না হলে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, রাজা বিক্রমাদিত্য অনুগ্রহ করেছিলেন বলেই কালিদাস কাব্য লিখতে পেরেছিলেন।" শ্রোতারা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়ে, আনন্দবাবু উৎসাহিত হইয়া বলেন, "আরও দেখুন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ইতিহাস, কৃষ্ণ-চন্দ্রের কৃপাতেই তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। মহারাজ, আপনিই বলুন একথা যথার্থ কি না?" মহারাজ কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পান না, অথচ একটা কিছু বলিতেই হয়—অবশেষে মৃদুহাস্য করিয়া বলেন, "হ্যাঁ, কথা ঠিক, কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় কালিদাস যশস্বী হতে পেরেছিলেন।"

শুনিয়া সভায় সকলে চমৎকৃত হয়, কেহ বলে, "কি অগাধ পাণ্ডিত্য," কেহ বলে, "কি সূক্ষ্ম রসবোধ"। আনন্দবাবু গদগদ কণ্ঠে বলেন, কি গভীর গবেষণা, কালিদাস যে বাঙালী ছিলেন এক কথায় মহারাজ তা প্রমাণ করে দিলেন—মহা-রাজের চরণতলে বসে কত যে শিখলাম, কত যে শিখব।"

দেউলে ব্যবসায়ী সত্যপদবাবু একটু দেরিতে আসিয়া পিছনে বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতক্ষণে ঘষিতে ঘষিতে সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন, আনন্দবাবুকে এক রকম থামাইয়া দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "সাহিত্য তো সামান্য বিষয়, আমাদের মহারাজের ব্যবসায় বুদ্ধি এত প্রখর যে টাটা বিরলা ওঁর চরণতলে বসে শিক্ষালাভ করতে পারে।" মহারাজ যে ইতিপূর্ব্বে একটা ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ খবর উপস্থিত সকলেরই জানা ছিল, সত্যবাবুর কথায় সকলেই

তাই একবাক্যে সায় দিয়া উঠে। সত্যবাবু সোৎসাহে বলেন, "মহারাজের মত প্রতিভাবান মানুষ যদি আজ ব্যবসায়ক্ষেত্রে নামেন তা হলে একটা বিপ্লব ঘটে যায়।" আনন্দবাবু হটিবার পাত্র নহেন, কথায় তাঁহার উপর। তিনি বলেন, "প্রতিভার ক্ষেত্র ব্যবসায় নয়, প্রতিভার ক্ষেত্র সাহিত্য, বিরলা টাটা দু'দিনের কিন্তু কালিদাস রবীন্দ্রনাথ চিরকালের।" ইহার পরে আনন্দবাবু ও সত্যবাবুতে হাতাহাতি হইবার আগেই সভা ভঙ্গ হয়।

নিস্তব্ধ রাত্রি, আলবোলায় শেষ কলিকা চড়াইয়া দিয়া খাস চাকর বিদায় লইয়াছে, পালঙ্কে শয্যা প্রস্তুত, শুইলেই হয়, অথচ গোপাল জানালার ধারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর দিকে তাকাইয়া আছে। ধরণীর দিকে তাকাইয়া আছে বলায় ভুল বলা হইল, কেননা গোপাল আসলে তাকাইয়া আছে তাহার ব্যক্তিত্বের দিকে। কি আশ্চর্য্য, এতদিন সে নিজেই জানিত না কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাহার। সে মহাপুরুষ, রাজর্ষি, সে একটা বিরাট প্রতিভা! বেলগাছির বাজারে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, পারিবেই বা কেন? গুণীজনের আদর গুণীসমাজেই হইয়া থাকে। ভগবানকে সম্বোধন করিয়া সে মনে মনে কহিল, "হে প্রভু, আমাকে লইয়া কি মহান্ খেলা তুমি খেলিবে তা তুমিই কেবল জান।"

আপিস ঘরে ম্যানেজারবাবু গোপালকে জমিদারী সংক্রান্ত দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও গোটা কয়েক সই লইতে আসিয়াছেন। মহারাজের এত প্রখর বুদ্ধি যে ম্যানেজার যাহা বুঝাইতেছেন তিনি তাহাই বুঝিতেছেন, আইনের বড় বড় ধারাগুলিতে পর্যান্ত আটকাইতেছে না। আশ্চর্য্য হইয়া ম্যানেজারবাবু বলিতেছেন, "মহারাজ আইন পড়েন নি জানি, কিন্তু না জানলে কিছুতেই বলতে পারতাম না আইন পড়েন নি।" মহারাজ একটু একটু হাসিতেছেন এবং কাগজে সই করিতেছেন এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর জানাইল আনন্দবাবু দরজায় উপস্থিত—মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে চান। ম্যানেজার কাগজপত্র গুছাইয়া বিদায় লইলে আনন্দবাবু ঘরে ঢুকিয়া পদধূলি লইলেন এবং হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "আজ একটা মহাকাব্যের সূচনা করব তাই মহারাজের পায়ের ধুলো নিতে এলাম।"

মহারাজ বসিতে অনুরোধ করিলে আনন্দবাবু চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং একটা গভীর ভাবমগ্ন অবস্থায় তাঁহার মহাকাব্যের মোটা কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া ইহা লেখা হইবে, মহারাজের কীর্ত্তি, খ্যাতি ও প্রতিভার কথায় প্রত্যেকটি অধ্যায় ঠাসা থাকিবে। অবশেষে উপসংহারে বলিলেন, "অতীতকালে রাজামহারাজাকে কেন্দ্র করে যদি মহাকাব্য লেখা সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে একালে কেন হবে না—নিশ্চয় হবে, আমি দেখিয়ে দেব হবে।"

ইহার পরে সাধারণ কথা সুরু হয়। আনন্দবাবু বলেন, "একখানা উপন্যাস ছাপতে প্রেসে দিয়েছি, কিন্তু টাকার যোগাড় হচ্ছে না, মহারাজের কাছে তাই সামান্য হাজারখানেক টাকা প্রার্থনা করছি।" সেদিন টাকা না পাইলেও আনন্দবাবু আশা পাইয়া উঠিলেন।

বিকালের দিকে পদধূলি ও সেই সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ লইতে সত্যপদবাবু একটা মস্ত বড় ফাইল বগলে করিয়া উপস্থিত হন। এদিকে কোন কাপড়ের মিল নাই, একটা মিল খুলিবার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে, কেবল টাকার ব্যবস্থা হয় নাই, এই বিষয়ে মহারাজের উপদেশ চাই। টাকা ঘরে রাখার চেয়ে কারবারে খাটানো যে লাভজনক একথা মহারাজের মত ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে বলিয়া দিতে হইবে না, তিনি অগ্রণী হইয়া মিলের অর্দ্ধেক শেয়ার কিনিয়া লইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন বাকি রহিল মহারাজের আশীর্ব্বাদ, তাহা পাইলেই মিলের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ বিষয়টা ভাবিয়া দেখিতে রাজী হইলেন।

ইহার পরে রাজবাড়ীতে সত্যপদবাবুর আনাগোনা ক্রমেই বাড়িয়া যায়, লোকে গোপনে বলাবলি করে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা ছাড়া আরও একটা কথা চলিতেছে। শেষে যেদিন সত্যপদবাবুর সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী ভগ্নী মালিকা দাদার ফাইল হাতে করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন সেদিন কথাটা আর গোপন থাকে না। অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই, কেননা মহারাজের বয়স হইয়াছে এবং পাত্রীটিও ভাল।

মালিকাকে গোপালের সত্যই ভাল লাগে। সেদিন সন্ধ্যার দিকে মালিকার শাড়ীর রং, চুলের গন্ধ এবং হাসির সুর এমন একটা আশ্চর্য্য পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, গোপাল তাহার মনের কথাটা বলিয়া ফেলে। মালিকা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল কি না বলা যায় না, তবে মত দিতেও সময় নষ্ট করে না। অতঃপর দুই জনে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। গোপাল রহস্য করিয়া বলে, "আমার মত বুড়ো বরকে তোমার পছন্দ হবে মালিকা?" মালিকা জবাব দেয়, "পৃথিবীতে আপনার মত সুন্দর কে?"

আকাশে অগণ্য তারা, পৃথিবী নিদ্রিত, রাজবাড়ীর তেতলার ছাদে একাকী পদচারণ করিতেছে গোপাল। তিন মাস অতীতের ইতিহাস, অখ্যাত দরিদ্রজীবন, বেলগাছির বাজার, মনিহারী দোকান, এ সব তাহার কাছে আজ স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। এমন একটা কুৎসিত অতীত তাহার জীবনে

আদপেই ছিল কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হয়। সাধারণ সে নহে, হইতেই পারে না। পায়ের নীচে ঐ যে ধূলিময় ধরণী, উহা যেন দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাথার উপর ঐ যে তারকাখচিত বিরাট আকাশ উহা যেন কাছে, আরও কাছে নামিয়া আসিতেছে। গোপাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, আপনার বিরাটত্বকে আপনি অনুভব করে। জ্ঞানে সে বড়, গুণে সে বড়, দেখা গেল রূপেও সে বড়। পৃথিবী যদি তাহার কাছে যোড়হাত করিয়া না দাঁড়ায় তবে দাঁড়াইবে কাহার কাছে? তবে একটা কাঁটা তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে খচখচ করিয়া বিঁধে, সেটাকে সে আর দেরি না করিয়া তুলিয়া ফেলিবে, গোপাল নামটাকে বদলাইয়া হয় মহীপাল না হয় ভূপাল করিবে।

অনেক রাত্রে শোওয়ায় ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিতে গোপালের সেদিন বেশ বেলা হয়। উঠিয়া দেখে চাকর নিত্যকার মত আলবোলার নল লইয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া নাই, ডাকিয়াও সাড়া পায় না। গোপাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠে, স্থির করে জুতা মারিয়া তাহাকে আজই তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু এতক্ষণে একটা চাকরও কি আসিতে পারে না? না—ইহারা অত্যন্ত আশকারা পাইয়া গিয়াছে, একটাকে তাড়াইলে হইবে না, সেট্ কে সেট্ তাড়াইতে হইবে। গোপাল ক্ষেপিয়া বাহিরে আসে, মনে মনে ভাবে হাতের কাছে যাহাকে পাইবে তাহাকেই মারিয়া ফেলিবে, কিন্তু হাতের কাছে কাহাকেও পায় না। গোপাল তারস্বরে চেঁচাইতে থাকে, এইবার সাড়া দেন স্বয়ং ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজার বাবু সামনে আসিয়া দাঁড়ান এবং মৃদু হাসিয়া গোপালের সমস্ত রাগ জল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃথা, ম্যানেজারের হাসিটুকু জলের কাজ না করিয়া বরং তেলের কাজই করে—ম্যানেজারের বেয়াদপীটাও তো কম নয়, পায়ের ধুলা লইতে ভুলিয়া যায়!

গোপাল একটা কঠিন কথা বলিতে যায়, কিন্তু রাগে গলা দিয়া কোন আওয়াজ বাহির হয় না। ম্যানেজার-বাবুর মৃদুহাস্য বিস্তৃততর আকার ধারণ করে, তিনি বলেন, "এই যে, উঠে পড়েছেন গোপালবাবু।" গোপালবাবু! একি মহা অপমানজনক সম্বোধন! ম্যানেজারটা নেশা করিয়াছে নিশ্চয়—গোপাল দু'পা পিছাইয়া যায়। ম্যানেজারবাবু সেই দু'পা আগাইয়া আসিয়া বলেন, "পালাবেন না, শুনুন, একটা খুব জরুরি কথা বলবার আছে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের জমিদার শ্রীরণেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা যান নি, কাল তিনি কায়রো থেকে হেঁটে কলকাতা পৌঁছেছেন, এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হচ্ছে আর কালবিলম্ব না করে এখান থেকে সরে পড়া।" সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, মাতলামিরও একটা সীমা আছে, গোপাল আর সহ্য করিতে পারে না, ধমক দিয়া উঠে—বলে, "থামুন, থামুন, ঢের বেয়াদপি সহ্য আর সহ্য করব না, বেরিয়ে যান আমার সামনে বেরিয়ে যান।"

ম্যানেজারবাবুর মুখ হইতে হাসিটুকু এবার যায়—নরম হইয়া বলেন, "বেরিয়ে যাওয়াটা সম্প্রতি দ দরকার হয়ে পড়েছে গোপালবাবু, জানেন না তো জমিদারটিকে, চব্বিশ ঘন্টা মদ খান, হাতের কাছে পেলে ধরে চাবুক মারবেন। ভাল কথা, যাবা পোষাকটা বদলে ফেলুন তো, আয়তঃ রাজবাড়ী জিনিষই আপনি নিয়ে যেতে পারেন না, পরনের ঐ খানাও না, অতএব ওগুলো রেখে আপনার সেই হাফশার্ট আর ধুতি পরে নিন, অনেক কষ্টে এ দুটো করে এনেছি, দুঃখের বিষয় ছেঁড়া চটি জোড়ার কো পেলাম না। নিন, একটু তাড়াতাড়ি করুন।"

ম্যানেজারের পুঁটলিটি হইতে হাফশার্ট আর ধুতি হইল—গোপাল দেখিয়াই তাহাদের চিনিল।

পুরোনো হাফশার্ট আর ধুতি পরিয়া খালি পায়ে পথে বাহির হইয়া পড়ে। রাগে, দুঃখে ও লজ্জায় ম করিয়া সে পথের একটি ধার দিয়া চলিতে থাকে অবস্থায় কেহই তাহাকে চিনিতে পারে না, মাত্র লোক চিনিতে পারে তাহারা হইতেছে ভক্ত পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক আনন্দবাবু। আজ গোপালের আশাতিরিক্ত ধূলি থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় পদ লইয়া হাসিয়া পাশ কাটান, আনন্দবাবু মহাকাব্যে চরিত্রকে হাতের কাছে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া

পথ চলিতে চলিতে গোপাল ভাবে সে কোথায় কি করিবে! ভাবিতে ভাবিতে সত্যপদবাবুকে মনে গোপালের একটা সমস্যার সমাধান হয়, সে সত্যবাবুর যাইবে এবং নিজের অমূল্য ব্যবসায়-বুদ্ধিটা তাঁহার ধরিয়া দিবে। সত্যবাবু তখন চা খাইতেছিলেন, গো প্রস্তাবটা শুনিয়া হাসিয়া বলেন, "ওটা নিজের কাছেই মনিহারী দোকানটা আবার চালাতে হবে তো।"

গোপালের চোখে দুনিয়া অন্ধকার হইয়া আসে, পা চায় না, ধূলিময় ধরণীকে বড় কাছে, বড় আপনার বলিয় হয়—সে বসিয়া পড়ে। মনের মধ্যে চিন্তা তালগোল পা যায়, কত মুখ ভাসিয়া আসে, ভাসিয়া চলিয়া যায়। হঠা হাসি হাসি মুখ ফুটিয়া ওঠে, তাইতো, গোপাল এতদ মুখটিকে কেমন করিয়া ভুলিয়া ছিল? সর্বাগ্রে মালিকার কাছেই ছুটিয়া আসা উচিত ছিল, মালি তাহাকে ভালবাসে। এ দুর্দিনে সে তাহাকে হি পরিত্যাগ করিবে না, দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া মালিকা হা তাহার হাত ধরিয়া এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা সুরু করিবে

বাগানের ভিতর দিয়া আবছায়া অন্ধকারে গোপাল জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। হাঁ, সে ঠিকই আসিয়াছে, এই তাহার প্রিয়তমার মন্দির। গোপাল চাপা গলায় ডাকে, "মালিকা, মালিকা।" হৃদয়ের আহ্বান কখনও ব্যর্থ হয় না, মালিকা জানালা দিয়া উঁকি মারে। গোপাল আকুল কণ্ঠে বলে, "আমি এসেছি মালিকা।" মালিকা জবাব দেয়, "আমিও আসিতেছি প্রিয়," তারপরে ছুটিয়া চলিয়া যায়। গোপাল উদ্বেল হৃদয় লইয়া অপেক্ষা করে। হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া যাহা বেগে আসিয়া পড়ে তাহা মালিকা নয়, এক থান ইট। বিদ্যুৎ-বেগে মাথা সরাইয়া লইলেও গোপালের নাকটা কিঞ্চিৎ জখম হয় এবং থান ইটখানা পায়ের বুড়া আঙুলের উপর আসিয়া পড়ে—গোপাল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।

বেলগাছির বাজারে সাধুময়রার দোকানের সামনেই গোপাল মুখুজ্জের মনিহারী দোকান। তিন মাসকাল যাবৎ সে দোকান বন্ধ, তালায় মরিচা ধরিয়াছে, সাইনবোর্ডখানা কাত হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন সকালবেলা সাধু দোকানের ঝাপ তুলিতে গিয়া দেখে পথের ওপাশের দোকানটির দরজা খোলা, সাইনবোর্ডখানা সোজা হইয়া ঝুলিতেছে এবং চির-পরিচিত গোপালের মূর্ত্তি তিনপায়া টুলটির উপর বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

ধর্ম্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের নূতন ইঙ্গিত

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

কি করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার সনাতন সূত্রটি পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মননে, ব্যাখ্যানে ও আচরণে চলেছিল তারি সন্ধান। সে সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ধর্ম্মের তাত্ত্বিক কিম্বা ব্যবহারিক দিকে নয়, পেয়েছিলেন অভিনব একটি দৃষ্টির সাহায্যে। "কালান্তর" গ্রন্থের ছোট ও বড় প্রবন্ধে তিনি সেই দৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেছেন: "বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অবাধ দৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের পক্ষে অবরুদ্ধ বা কলুষিত না হয়, আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্য্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই।"

জীবনের অপরাহ্ণে এসে "মানুষের ধর্ম্ম" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও আর একবার রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন—"বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই শিল্প সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়।"—ইহাও সেই "ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অবাধ দৃষ্টি"র কথা। এর মধ্যেই বিশ্বমানবের মিলন-সাধন-সূত্রটির ইঙ্গিত মেলে। সেটি পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া দরকার।

গোটা মানব-সমাজের পথের বিবিধ পরীক্ষার কথা রয়েছে তার ইতিহাসে। এই ইতিহাসই তার সভ্যতার বাহন। মহা-কালের বুকে সভ্যতারই জয়যাত্রা চলেছে। কালে কালে তার সঙ্কটটা যত বড়, যত সাংঘাতিক, যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক, তবু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সেটা সাময়িক। সেটা গ্রহণ মাত্র, সূর্য্যশূন্যতা নয়।

স্বার্থের বাধায় বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র দেশকালে লোকে মিলতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট পটভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাই যে মানুষ মানুষের চিত্তে আত্মীয়তার আবেদন আনে দেশকাল অতিক্রম করে। এমন কি, মহা অত্যাচারীও সেখানে ক্ষমার্হ হয়ে উঠে।

মানুষের মিলনধর্ম্মী মহান্ আত্মার দেখা পাই সকল ধর্ম্মেই, তাদের উদার মিলন-বাণীরও অভাব নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ বাণীর প্রভাব সফল করা নিয়েই যত সমস্যা। আচার বা নীতির চেয়ে মূল সত্যটিকে গ্রহণ করাই আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, এ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল ধর্ম্মব্যবস্থাতেই এসে দাঁড়িয়েছে বহু ছক্‌কাটা নীতির নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অভ্যাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়া কিন্তু নীতিগত নয়, বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গিগত। তা হচ্ছে অখণ্ড ইতিহাসকে বা চিরন্তন বাস্তবকে দেখা। কালোত্তীর্ণ মানবকীর্ত্তির নিদর্শন— জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্পদগুলি দেশকাল নির্ব্বিশেষে মানুষের কি আকুল অনুভূতির বিষয়, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারে তা বিলক্ষণ দেখা গেছে। মানুষ ঘরোয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য তুচ্ছ ঘটিবাটির গায়ে করেছে চিত্রালঙ্করণ। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য্য ঐ সব শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ তাতে দেখেছে একালের সঙ্গে স্মরণাতীত সুদূর সেকালের যোগ। তার মনের মধ্যে পেয়েছে কোন্ সেই অচেনা মানুষের অন্তর্বেদনার মিল, সুকুমার সমধর্ম্মিতা। রাজা-সাম্রাজ্য তলিয়ে যায়, 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে থাকে এই বেদনাই। বেদনাতেই মানুষ এক, এইটেই তার চিরন্তন আকৃতি। যে সব কাজে এর প্রকাশ হয়ে চিরকাল মানুষকে আনন্দ দান করছে

পারে, সেই সকল কাজের সাধনাই মানুষের যথার্থ ধর্ম্মসাধনা।

রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কিছু-দিন আগে। রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। উত্তরায়ণে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর শিল্পগৃহ "চিত্রভানু"তে তখন তিনি বাস করছিলেন। সেই সময় তাঁর "বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল। প্রেস কপিতে তথ্য সংশোধনের সঙ্গে কোনও কোনও ফর্ম্মার প্রুফও দেখে দিচ্ছিলেন তিনি নিজেই।

বইটির "সৌরজগৎ" অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে, সৌরমাণ্ডলিক গবেষণায় একটি সংবাদের অপেক্ষায় ঠেকে গিয়েছিল বিজ্ঞানী ডা: ডগলাসের একটি সিদ্ধান্ত। "গ্রীনিচ মানযন্ত্র বিভাগ থেকে সংবাদ নিয়ে" সেই তথ্যটি জানা যায়। এই গবেষণার তথ্যটি সেবারে বইয়ে নূতন যোগ করা হয়। প্রুফের এই স্থলে এসে কবির সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের একটু আলোচনা চলল। ডা: ডগলাসের সেই হারানো তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা কোথায় গেছে তলিয়ে, কিন্তু তাঁর সাধনার ফল চিরকালের জন্যে মানব-সমাজের উত্তরাধিকারের সম্পদ হয়ে রইল। আজ যিনি পরিচিত, সেই ডা: ডগলাসও হয় ত একদিন যাবেন তলিয়ে কালে কালে এই ভাবে নাম-হারানো কত ব্যক্তির সাধনা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছে নব-নব আবিষ্কারে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে পূর্ণতার পথে বিস্তৃততর করে। মানুষের সাধনা বিজ্ঞানে যত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে; এমন যেন আর কিছুতে নয়।—এমনি ধরণের কথাই বলেছিলাম।

শুনে কবি বললেন, সাধনা মাত্রেরই বিশ্বরূপ আছে; মানুষের বিশ্বরূপও তার মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান। দেশে, জাতিতে, বর্ণে, ধর্ম্মে, আমরা আজ যে পৃথিবীব্যাপী স্বার্থ-সংঘর্ষের মধ্যে লোকের ক্ষুদ্র রূপ দেখছি এ তার ব্যক্তিগত সাময়িক রূপ। তার যা চিরন্তন রূপ, তার মহৎ প্রকাশ এরূপ নৈর্ব্যক্তিক বিকাশেই হয়েছে। বিজ্ঞানের মত সব কাজেরই সেইরূপ বিকাশ দেখা যায় ইতিহাসের পটে। উক্ত বিজ্ঞানাচার্য্য সাহেবটির নিকটে তাঁর হারানো সূত্রটি প্রকাশ পেয়ে অকূলে তাঁকে সাহায্য দিয়ে আনন্দিত করেছিল। বিস্মৃত অতীত থেকে মহেঞ্জোদারোর অখ্যাত লোকেদের যে শিল্পনিদর্শনগুলি মিলল, সেগুলো মানুষকে তার মানব-ধারায় উদ্বর্তন-ইতিহাসের তথ্যের সন্ধান দিয়ে তাকে করছে তেমনি অভিভূত। দান আছে, দাতা নেই, বুঝা যায়, সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র পেরিয়ে এক বিরাট অনন্ত অখণ্ড মানব-সাধনা চলেছে। এই ইতিহাসই ত মানুষের আসল স্বরূপ, যথার্থ সত্তার আধার, —তার সত্য পরিচয় এখানেই নিহিত।

কবি উজ্জ্বল মুখে বলে চলেছিলেন; হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে বেদনার সুর বাজল, তিনি বললেন, "কোথায় মানুষ তাকে দেখবার দৃষ্টি নিয়ে বড় হবে, তা নয়, ক্ষুদ্র দলাদলি চুলোচুলি নিয়েই সকলে ব্যস্ত। সব জাতির দান, সব দেশের দান, সব ব্যক্তির দানই একটি সংহত সমগ্ররূপে দেখা দিয়েছে এই মানব-সভ্যতার অভিযানের মধ্যে। নূতন নূতন কীর্ত্তির যোগান দ্বারা এই সভ্যতার সেবায় লেগে থাকা, এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের হাতে সেই সভ্যতাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্রতই হচ্ছে মানুষের আসল কর্ত্তব্য। স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে হলে এই অখণ্ড অপৌরুষেয় মানব-সভ্যতারই ধ্যান করতে হবে, সেই ধ্যানই নিয়ে যাবে তাকে পরার্থতায়।

আমরা দেহরক্তধারা-যোগে ঘরবাড়ী সম্পত্তিতে বা চিন্তা-ধারায় নিজের ছাপ এঁটে দিয়ে সব কিছুকে অক্ষয় করে রাখতে চাই। বেঁচে থেকে জীবিতকালে এখনও যেমন ভোগ করব, আমি বেঁচে না থাকলেও আমার ছাপমারা কীর্ত্তির মধ্যে আমি চিরকাল সেই গৌরবাধিকার নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকব, এইটি দেখে যাবার, বুঝে নিয়ে যাবার জন্যই স্বার্থের ব্যাকুলতা। কিন্তু মহাকালের ধর্ম্মে কি দেখছি? সে লোককে কেবলই সকল কিছু থেকে ছাড়িয়েই নেয়—কেড়ে নেয় তার কীর্ত্তিকেও। মানুষের কাজগুলি যদি বা এই দেখা পৃথিবীতে দু'দিন স্থানও পায়, মহাকালের খেলার স্রোতের মুখে এই পৃথিবী, এই তার ইতিহাস—সব যায় ভেসে।"

আগে থেকেই কবির ভাবনায় ও লেখায় এই চিন্তারই প্রবাহ চলেছিল। "মানুষের ধর্ম্ম" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, "পুরোনো সভ্যতার মাটি-চাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্য মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্ব্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্ত্তিতে, ঘরে ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্ম-পরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।"

চিত্রবহুল মহেঞ্জোদারোর বইগুলি কবির দপ্তরে আসার পর থেকে সেগুলির প্রভাব তাঁর অনেক রচনার উৎস হয়েছে। প্রায় একটা গোটা কাব্য—"শেষ-সপ্তক" সৃষ্টি হ'ল মহেঞ্জোদারোর প্রেরণা থেকে। তার পর থেকে অনেক কবিতায় এবং ভাষণেই এসে গেছে মহেঞ্জোদারোর সেই প্রভাবই। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মৃত্যুর

মাস আগেকার ১৩৪৭ সনে প্রদত্ত ৭ই পৌষের সর্ব্বশেষ ভাষণ—"আরোগ্য"। তাতে না-ধর্ম্মী মানব-সাধনার পাশে বেদের বর্ণিত হাঁ-ধর্ম্মী সাধনার আদর্শরূপে কবি ধরে রেখেছেন চীনকে, আর প্রাগৈতিহাসিক আদর্শরূপে মহেঞ্জোদারো-শ্রেণীর নামহীন অচেনা মানব-সাধনাকে। কবিকে জীবন-সায়াহ্নে ইতিহাস ও বিজ্ঞান—বাস্তব বিদ্যার এই দুই শাখাই—অধ্যাত্ম-উদ্দীপনায় বিশেষ সহায়তা করেছে। ইতিহাসের প্রেরণার কথা এখানে বলা হ'ল—এমনি খাঁটি বিজ্ঞানের প্রেরণা নিয়েও বলার কথা কবির জীবনে আছে। কবি বলেন, "যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্ম্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।" 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "আজ বয়সের শেষ পর্ব্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে।"

বিশ্বভারতী পরিষদের ভাষণেও পূর্ব্বে কবি বলেছেন: "বৃহৎ কালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরী পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ—কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে।" (১৩৩২)।

ইতিহাসও আজ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। বিশেষতঃ মাটি খুঁড়ে ধাতু, জাতিতত্ত্ব বা ভাষার সূত্র ধরে পুরাতত্ত্বের সাহায্যে ইতিহাসের যে অংশ সক্রিয়, তাকে বিজ্ঞানের অঙ্গ বলেই ধরা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারোর পুরাবিদ্যা ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে ভাবের ও ভাষার বিনিময় হচ্ছে একালে-সেকালে। দুই কালের আচার-বিচার ছাপিয়ে উঠেছে এই ভাষা। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাভবনে' ও 'কলাভবনে' এই চিরকালের ভাষাকেই করেছেন তাঁর সাংস্কৃতিক ধর্ম্মের সাধনমন্ত্র। বিশ্বভারতীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ফুটেছে এই দুটি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেই একথা বলেছেন।

হিন্দু মুসলমান দুই ধর্ম্মের থেকেই শীর্ষস্থানীয় রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছেন কম। কিন্তু তারই মধ্যে কবির সমকালে 'বিদ্যাভবনে'র পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এবং মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মধ্যে যে প্রীতিভাব ও হৃদ্য আচরণ লক্ষ্য করা যেত, তা ছিল আদর্শস্থানীয়। দুই ধর্ম্মের দু'জনের মধ্যে ছিল মানবিক প্রীতি। কবির আশ্রমের পরিবেশে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতিধর্ম্মের হাজার নীতি-বৈচিত্র্যের উপরেও তারি প্রভাব দুটি মানুষকে মিলিয়েছিল আপন ক'রে। স্বপাক ছাড়া যিনি আহার করেন নি, এমন মহাপণ্ডিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান পাদ্রী দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পদধূলি নিতেন। মেথরের মাল্যজলও সেই ব্রাহ্মণের কাছে সমান প্রীতিতেই গ্রহণীয় হয়েছিল। এ ঘটনা শান্তিনিকেতনে সহজেই ঘটেছে। এখানে ধর্ম্মের বাহন পূজা-অর্চ্চনা নয়—মানবিক ব্যবহার। মত ছেড়ে ব্যক্তিগত জীবনেও যে বাস্তবতা কিরূপ কার্য্যকর হতে পারে, বিদ্যাভবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ এঁদের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক-পরিষৎ-সভার ১৩৩২ সনের অধিবেশনে "আচার্য্যের অভিভাষণে" বিশ্বভারতীর সাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন—"মহাজাতিক ঐক্য সম্বন্ধে দেশে বাক্যগত সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয় কিন্তু ওদিকে জাতি-সঙ্ঘাত লেগেই আছে।" আকালী শিখ আন্দোলন ও মালাবারের মুসলমান মোপলা দৌরাত্ম্যের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন—"যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনি তারা মহাজাতি হতে পারবে। সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি।" এ সাধনায় শাস্ত্রীমহাশয় কবির আদি সহায়ক ছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "একদা যেদিন সুহৃদ্বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদার ভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষ ভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম এই ঔদার্য্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য এইটাই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়—সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছে থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছ গুরুদের ঋষিকল্প ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।"

জিয়াউদ্দিন সাহেবের মধ্যেও ধর্ম্মের কোনো আড়ম্বর ছিল না। তিনি ছিলেন সহজ সাদাসিধে ভাবের, অথচ সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিরহঙ্কার লোক। তাঁর কাছে গেলে ধর্ম্মের কোনো

অনুষ্ঠানের কথা মনে হ'ত না, কিন্তু ধর্ম্মের সার-রস যে প্রীতি ও আনন্দ—তাঁর সান্নিধ্যে তা পাওয়া যেত, অনুভব করা যেত সংস্কৃতির উজ্জ্বলতা। কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন, "ধর্ম্ম-গণ্ডির বহির্বর্ত্তী পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর ব'লে জানে কিন্তু সেই পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মত ধরে টেনে আটক করতে পারলেই সে খুসী।" সেই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিমূলক প্রাণবান ধর্ম্মপ্রেরণা পৌঁছেছিল এবং মানুষের মত মানুষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আপন স্বভাবের মধুর স্পর্শ বিলিয়ে মৌলানা নিজ ধর্ম্মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

এই মৌলবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বন্ধুত্বের 'সম্বন্ধ' এ সম্বন্ধই মানব-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রেরণাই—মানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেরই বাণী "যিনি বেদনীয় সে পূর্ণ মানুষকে জানো ;—অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।"

কবির জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখি জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন ধরে চলছে তাঁর বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে জ্ঞানকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন ; এখানে দেখা যাচ্ছে সব ছাড়িয়ে উঠেছে বেদনার কথা। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রেও কর্ম্ম হচ্ছে জ্ঞান-অনুশীলনের স্তর মাত্র।

কবির আহ্বানে আশ্রমে আরও যাঁরা এসে মিলেছিলেন, ইংরেজ পিয়ার্সন এবং এণ্ড্রুজ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এঁরা সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থেকেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মানুষের এক বেদন-বোধযুক্ত অখণ্ড মানবধর্ম্মে।

চীনাভবন হিন্দীভবন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাধনার বিস্তারের সঙ্গে। নানা সাধক ও শিল্পী বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে আসা-যাওয়া করেছেন ; রবীন্দ্রনাথের সাধনার মন্ত্র ও তার আয়োজন দেশ-দেশান্তর থেকে এঁদের যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি এঁরাও আশ্রমের আদর্শকে নানাভাবে রূপায়িত করেছেন।

অবশেষে একটি অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। প্রবন্ধের অতন্ত্র ধর্ম্মসাধনার উপায়স্বরূপ কবির যে ঐতিহাসিক যোগ-দৃষ্টির ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হ'ল শান্তিনিকেতনে আজ ঠিক সেরূপ সাধনারই ধারা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের সাধক স্বামী শঙ্করানন্দ শান্তিনিকেতনে চীনাভবনে সম্প্রতি গবেষক হয়ে এসে একটি কঠোর সাধনায় রত হয়েছেন। তাঁর সাধনার বিষয় হচ্ছে—মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও শিল্পকলার কাঠামোয় বিভিন্ন মানব-সভ্যতার মূলসূত্রের আবিষ্কার।

আরও একজন সংস্কৃতি সাধকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন—তিনি হিন্দী-ভবনে মাসেককাল মাত্র যাপন করেন। চীনাভবনেরই কক্ষে এক সন্ধ্যায় তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। দেশে দেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে শাশ্বত এক মানব-ধর্ম্ম পথ করে চলেছে ; তার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাতে ইনিও নিরত। বলেছিলেন—রাশিয়াতে তিনি ভ্রমণ করছেন। ট্রেনের কামরায় দুঃসহ শীতের এক রাত্রি। ওদেশের এক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা পরস্পর কুলগত যোগের সন্ধান পেলেন। সুদূর দুই দেশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দের মূল ধাতু সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা ট্রেনে অবস্থিতির স্বল্পকালটুকুর মধ্যেই সে ঘনিষ্ঠতা আরও দানা বাঁধে। রাশিয়ার একটি মন্দির এবং মূর্ত্তির কথাও রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের আধুনিক গবেষণা-গ্রন্থ 'গোর্খবিজয়ে'র মধ্যেও সেই মন্দিরের উল্লেখ সম্প্রতি চোখে পড়ল। গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিত আছে: "অনুমান হয়, মহাজ্ঞান সাধক-গণের তপঃপ্রভাব…হিমালয়কেও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রতিবেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। …ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরব পারস্য এমন কি রাশিয়া পর্য্যন্ত এককালে বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়।" পাদটীকায় আছে: "রাশিয়ার বাকুতে জ্বালামুখী দেবীর মন্দির শৈব নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি আছে।" নানা ক্ষেত্রে ঐক্যের এরূপ অনুসন্ধান যেমন বিদ্যাভবন চীনাভবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলছে, কলা-ভবনেও শিল্পের বেদীতে মানবধর্ম্মের সেই সন্ধান ও সৃষ্টির একই অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। আশ্রমের অন্যান্য বিভাগে পুরা-কালীন সন্ধানের চেয়ে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও সৃষ্টির তাগিদই বড়।

* * *

কবি তাঁর "মানুষের ধর্ম্ম" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টিতে একটি বৌদ্ধ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তার তাৎপর্য্য হচ্ছে সংসারের সর্ব্ব-জীব-কল্যাণ। সেই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশেষ কামনাটি যুক্ত করে বলেছেন, "দুঃখ আসে ত আসুক, মৃত্যু হয়তো হউক, ক্ষতি ঘটে ত ঘটুক, মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হউক, সমুদ্র দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক—"সোঽহম্।"

বুদ্ধদেব যে সর্ব্বজীব-কল্যাণ চেয়েছিলেন, কিভাবে তা সাধন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই মর্ম্মে বলেছিলেন—'একপুত্রবতী মাতা যেমন করে নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করে, সেই মমতা ও প্রযত্নে সকল জীবকে সেবা করতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হতে সমগ্র জগতের প্রতি আমরা সেই বেদনাটিরই প্রবাহ উৎসারিত দেখতে পাই।

---

* শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কৃত।

কে. নেহ্‌রু কর্তৃক মিসেস গুইরকে ভারতীয় পরিচ্ছদের একটি মডেল প্রদান

কোরিয়ায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের ভারতীয় সভ্য ডক্টর অনূপ সিংহকে
কোরিয়ান বালিকার ফুলের তোড়া উপহার

সান ফ্রানসিস্কো, ক্যালিফোর্ণিয়া — এখানে জাপ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে
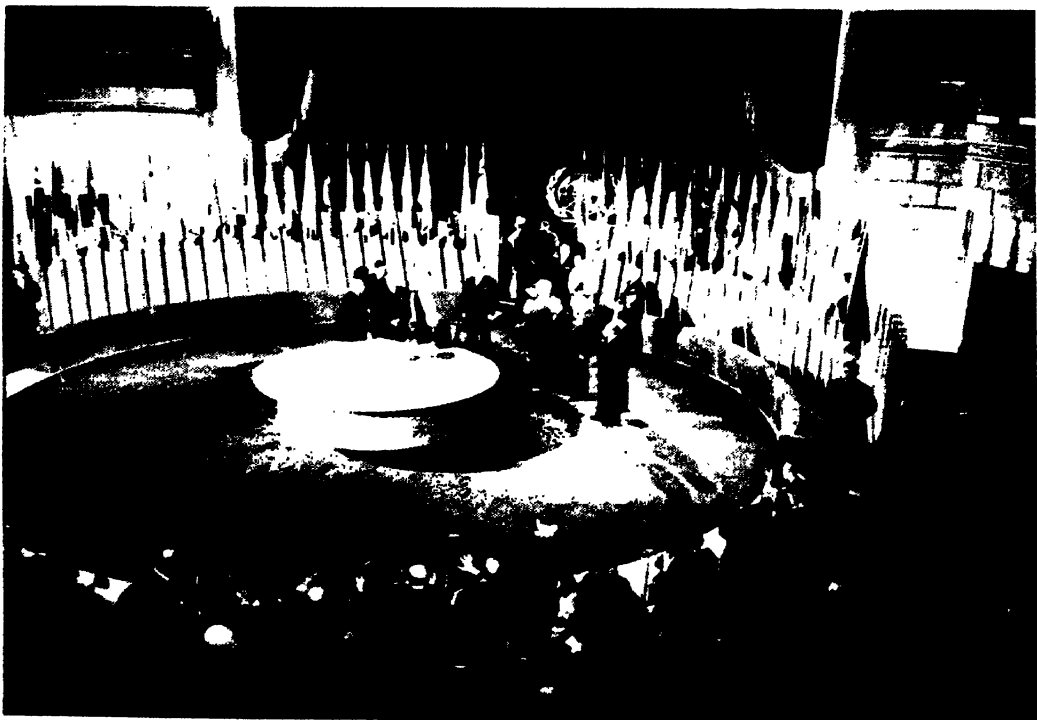
১৯৪৫ সালে সান ফ্রান্‌সিস্কোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সৃষ্টি

মেয়েদের কাছে লেখা দু'একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বেদনা-অনুভূতি-প্রবণ মনটির পরিচয় মেলে। স্নেহ, সেবা, ধৈর্য্য দিয়ে মেয়েরা নিজের মনে বিশ্বমনকে অধিকার করবে, বহুকে এক ক'রে বাঁধবে এবং বহুর মধ্যে এক বিস্তৃত হয়ে অদ্বৈতের বিশিষ্ট রসটিকে নানা ভাবে আস্বাদন করবে—এই ভাবটিই তাঁর সেই পত্রগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই নামান্তরে তাঁর পরিণত জীবনের উপলব্ধ 'সোঽহম্' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রায় মধ্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি এক-একখানি পত্রে এ সব অনুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর পরিজনমণ্ডলীকে। অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেন বিকশিত হয়ে উঠছে রসনির্ঝর মহীরুহের প্রাণসুধা। মহাবাক্য প্রাত্যহিক মানব-সম্বন্ধে অবলিপ্ত হয়ে তাত্ত্বিকতার শুষ্কতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কবি তখন বিলাতে। খুব সম্ভব ১৩১৮ সনই হবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষক অজিত চক্রবর্ত্তীর প্রথমা কন্যার সুমধুর লীলাময় শৈশব-বিষয়ে কবি পত্র পেয়েছেন এবং অজিতবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য দেবীকে তিনি তার যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কবি মাতৃত্বের শিখাটিকে কোথায় তুলে ধরতে বলেছেন তা আছে পত্রের কয়টি পঙ্‌ক্তিতে।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

লাবণ্য, এবার আশ্রম থেকে কেবল তোমাদের দু'জনের চিঠি পেয়েছি। তোমার চিঠিতে অমিতার জীবনবৃত্তান্তের কতকটা আভাস পেয়ে খুব খুসি হলুম। তাকে দেখবার জন্তে আমার মনের মধ্যে খুব ঔৎসুক্য আছে। তার সঙ্গে পূর্ব্ব-রাগের পালা আমি পূর্ব্বেই শেষ করে এসেছি—এবার ফিরে গিয়ে রাগবৈচিত্র্য সুরু করতে হবে।

তোমার হৃদয় প্রদীপে যে মাতৃত্বের শিখাটি জ্বলে উঠেছে সেটি কেবল তোমার কন্যার মুখের উপর পড়লে চল্‌বে না—তাতে বিশ্বজননীর আরতি করতে হবে—যখন সকল ছেলের উপর এই আলো বিকীর্ণ করতে থাকবে তখনি সেই জননীর আরতি হবে।...আমরা নরনারী যে কেউ আশ্রমে এসে জুটেছি প্রত্যেকেই পূজার অর্ঘ্য নিজের জীবন দিয়ে পূর্ণ করব এই সেবার ভারই আমাদের উপর আছে—কারো বা শতদল পদ্ম কারো বা পাঁচটি পাতার করবী। সেই অর্ঘ্যের থালা তোমাদের দ্বারের কাছে অপেক্ষা করছে—বেলা বয়ে যেন না যায়।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি পত্র লিখেছিলেন এই লাবণ্য দেবীকেই। তখন কবি শিলাইদহে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সংসারে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিতা দেখতে চান, সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে কবি পত্র লিখেছেন। কবির চিত্ত সকল সময়েই সকল বিষয়ে অসীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আছে; এই কয়েকটি ছত্রে আমরা পাই তাঁর সংসারের কল্যাণময় এই অনুষ্ঠানটিকে কোন্ অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের জন্তেই তাঁর মঙ্গল-কামনা চিরদিন এমনি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

ওঁ

শিলাইদা

নদীয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। আমার সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হবে, আমি অনুভব করব তিনিই একে চালনা করছেন, তাঁরি প্রসন্নতায় আমার গৃহ আলোকিত হয়ে থাকবে—সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে তাঁরি প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বিনম্র সেবাপরতার কাছে ভোগসুখের ঔদ্ধত্য নত হয়ে রইবে এই আমি আশা ধরে আছি। তাঁকে মনে প্রাণে অত্যন্ত নিকটে উপলব্ধি না করলে শুচিতা থাকে না, শৈথিল্য এসে পড়ে, কথায় কথায় আত্মবিস্মৃতি ঘটে—সংসারের পবিত্রতা এবং শান্তি নষ্ট হয়। এইজন্ত প্রতিদিনই তাঁকে পাবার সাধনা এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা চাই। মেয়েদের মনে ঈশ্বর যখন ভক্তিরসকে উৎসারিত করে দেন তখন যে মাধুর্য্য, যে শ্রী, যে সাধ্বীতার বিকাশ হয় প্রতিমার মধ্যে আমি সেইটি দেখব এই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের মধ্যে যে কল্যাণময় মাতৃভাব আছে, যা সংসারের সমস্ত কালিমা ধুয়ে দেয়, সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে, সমস্ত ক্ষুধা মেটায়, দাহ জুড়ায়, অভাব দূর করে, যার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, যা সকলের উপরে থেকেও সকলের কাছে নত, যা সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েও সকলের শেষে আপনাকে স্থান দেয়, যার অভিমান নেই, ঔদ্ধত্য নেই, নিজের অধিকার নিয়ে অন্যের উপরে দাবি করতে চায় না, নিজের অধিকারকে খর্ব্ব করেও অন্যের দাবি যে প্রসন্ন মুখে মিটিয়ে দেয়—বিশ্বমাতার সেই সুধাময় মাতৃত্বকে আমি বৌমার মধ্যে আমার ঘরে আবির্ভূত দেখব। এই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে ধনে রত্নে নয় এই অমৃতেই আমার ঘর পূর্ণ হবে।...বৌমাকে ও মীরাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অমৃতত্বের সাধনা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন যোগে। কোনো বিষয়ই তা থেকে বাদ পড়ে নি। তাই না তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এমন একটি তত্ত্ব যা শুষ্কতা ত্যাগ করে এক পরম অধ্যাত্মলোকের সিংহদ্বার আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬

এত বড় উৎসবের ধাক্কাতেও বড় বাড়ীটা সরে গেল না। ওখান থেকে চলে আসার পরও প্রভাতের চিন্তারাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল বাড়ীটা। ওই বাড়ীতে লক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একদা—আজও ভক্তিভরে ওঁরা প্রণাম করেন লক্ষ্মীরূপিণী সেই শক্তির উদ্দেশে। কিন্তু লক্ষ্মী কি সত্যই ওখানে অধিষ্ঠিত হয়ে ওঁদের প্রাণে প্রেরণা দেন? লক্ষ্মীকে হারিয়ে কিংবা না পেয়ে—লক্ষ্মীপূজার ঘটা যেমন প্রভাতদের মত মধ্যবিত্ত সংসারে—তেমনি আচার-উপকরণের বোঝার ভারী হয়ে ভক্তিটা প্রকট হয়ে উঠেছে কি ওখানে? এই ভক্তির অর্থ আজও প্রভাতের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তার মনে প্রশ্ন রয়েছে সত্যই কি ভগবানকে ভালবাসি আমরা? এই যে সংসারে এত আচরণ নিষ্ঠা পবিত্রতার অনুষ্ঠান—ধ্যান ধারণা পূজা পাঠের আড়ম্বর—বর্দ্ধিত ভক্তির চাপে চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়া—কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হওয়া—বায়ুতাড়িত বেতসপত্রের মত সারা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠা—এ সবই কি ভিতরের জিনিস? হয়তো তাই—হয়তো তা নয়। হয়তো মনের মধ্যে ভাবলোকের ভূমিতে এই গাছগুলি সহসা সতেজ হয়—শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে সংসারকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করে রাখে। তবু এই ভক্তিকে প্রভাত ভাবে—শীতকালের ধোঁয়ার মত। সে ধোঁয়া ঘন এবং সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও ঊর্দ্ধের বায়ুস্তর ভেদ করতে পারে না। উপরের হিমকণার চাপে মাটির সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর। সংসারী মানুষের বারব্রত পূজা-পার্ব্বণ নিত্য গৃহস্থ ঘরে যা অনুষ্ঠিত হয়, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্তোত্রপাঠ পুষ্প চয়ন ধ্যান মন্ত্রের জপ প্রণামের নিষ্ঠা অশ্রুর দরদর ধারা বেদকম্প এই সবও বুঝি ঊর্দ্ধতর স্তর ভেদ করে অনন্ত শূন্যের সহযাত্রী হতে পারে না: এই সংসারের শত পাকে জড়িয়ে ভক্তির মুহূর্ত্তগুলি হয় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ভাবের আয়ু বাষ্পের চেয়েও লঘু সংক্ষিপ্ত। যাই হোক বাড়ীটা স্পষ্ট হয়ে রইল মনে। তৈলচিত্রের মানুষ এখনও কায়া ধারণ করে তৈলচিত্রের নীচের এসে দাঁড়ায়। তাঁর মুখে প্রসন্ন দীপ্তি—কণ্ঠে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা। ওই বর্ষীয়সী যেন প্রভাতের জগতে চেনা মানুষগুলির থেকে আলাদা। ও বাড়ীর পিলসুজের ওপর যে তেলের প্রদীপটি জ্বলছিল তারই মত স্থির—আপন বৃত্তের মধ্যে সুসম্পূর্ণ একটি শিখা। প্রচারের আতিশয্য নাই—তমঃনাশের শক্তিও রাখে।

বাড়ীতে মা তো এমন করে কথাগুলি বলতে পারেন না। সেকালের যে গল্প মা করেন—তার মধ্যে একালের বঞ্চনার ক্ষোভটাই বেশী ফোটে।

একালে তোদের না আছে খাওয়ার ভোগ—না আছে পরবার সুখ। মনের আনন্দ থাকবে কি করে! তখন টাকায় পনেরো সের আধমণ চাল, দুধ দশ সের আর ভাল মাছের সের খুব মাগ্‌গি হ'লো তো আট আনা। লোকের পাপে পাপে সব নষ্ট হয়ে গেল!

—পাপ করছে কারা—এর সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল। অভিযোগকারী ছাড়া পাপ হয়তো সবাই করে। কিন্তু উনি গল্প বললেন কি সুন্দর করে। একালের শিক্ষা যাদের সেকালকে ঘৃণা করতে শেখায়, ঘৃণা না হোক খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটে—তাদের সবাইকে ডেকে ওই গল্প শোনাবার ইচ্ছা হচ্ছে প্রভাতের। ওর ইচ্ছা হচ্ছে বলে—সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সেকালেও দুর্লভ ছিল না—শক্তির অর্থ তাঁরা ভুল বুঝতেন না—সর্ব্বোপরি রাখতেন দৃঢ় বিশ্বাস আপনার উপর। কিন্তু আত্মপ্রচারে অহঙ্কার আসে বলে—সেই বিশ্বাস ন্যস্ত করতেন ঈশ্বরের উপর। এই ঈশ্বরকে পিছনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলেছে আজ। কিন্তু শূন্যং, শূন্যং,—অমিতাভের বাণীর মত একটা কিছু আঁকড়ে ধরে একটা কিছুতে স্থির হয়ে থাকতে চায়—চারদিক থেকে স্রোত উত্তাল হয়ে ঠেলে দেয় তাকে সামনে। শূন্যং, শূন্যং, সেই পথ দিয়ে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সুরু।

পর পর কয়েকদিন প্রভাত গেল ওখানে। শুভঙ্কর প্রত্যেক বারেই ওকে ডাকতে আসে। বলে, চলুন মেজ জ্যেঠাইমার হুকুম।

প্রভাত সে হুকুম মানে। সেই ঘরটিতে গিয়ে বসে। মেজ জ্যেঠাইমা আসেন মিষ্টির রেকাবি নিয়ে। সবদিন সন্দেশ নয়—ঘরে তৈরি নারকেল নাড়ু—সরের নাড়ু—কোন দিন বা চিঁড়ের পায়স। বলেন—মিষ্টি মুখ কর তবে গল্প বলব। অফুরন্ত তাঁর গল্পের ভাণ্ডার। সেকালের ঐশ্বর্য্য যেন সঞ্চিত রয়েছে গল্পগুলিতে। এই বাড়ীর গৌরবগাথা নয়—অপকীর্ত্তিও—এদের অতিথি সৎকারের পাশে প্রজা নির্য্যাতনের কথা—দানের সঙ্গে শাসনের নিষ্ঠুরতা—ভক্তির সঙ্গে ভোগ-পঙ্কিলতার আবর্ত্ত—মনুষ্য চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে। কালের পৃষ্ঠে গ্রন্থির পর গ্রন্থি পড়ে—কালের স্রোত শিথিল করে গ্রন্থির বন্ধন—ভেসে যায় মানুষ—তার ধর্ম্ম—তার অধর্ম্ম—হিংসা খ্যাতি দম্ভ ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রভৃ-

হিংসা—ভক্তি ও ভেদবুদ্ধি ফুল পাতা খড়কুটা সব নিয়ে স্রোতের গতিতে ভেসে চলে সংসার। তবু মানুষ চায় থামতে—একবার পিছন ফিরে দেখতে—যা ছিল অথচ পায় নি তাই নিয়ে কল্পনার ফুল ফোটাতে—কি সুন্দর সে কল্পনা—তেমনি রামরাজ্য প্রভৃতি মানুষের মনকেই বুঝি প্রলুব্ধ করে। কোন একটি বিশেষ কালে নয়—সর্ব্বকালে।

একদিন প্রভাত শুভঙ্করকে বললে, আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতে তো পরদা-প্রথা এখনও ? কেন রয়েছে ?

শুভঙ্কর আরক্ত মুখে বলে, আমি মানি না।

কি মানিস না রে শুভ ? রেকাবি-হাতে মেজ জ্যেঠাইমা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শুভঙ্কর সলজ্জে উত্তর দিলে—এই পরদা-প্রথা—যা তোমরা আজও মান।

মেজ জ্যেঠাইমা হাসলেন, আমরা যে বড় দুর্ব্বল আর আমাদের কালটাও ছিল রাজা-বাদশার, তাঁরা ইচ্ছে করলেই প্রজার সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারতেন।

এখন তো আর সে কাল নেই।

অভ্যাস আর সাহসের অভাব। কিন্তু হঠাৎ বাইরে গিয়ে ঘোমটা ঘুচিয়ে দাঁড়ালেই কি আমাদের সব দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে রে! আগুন আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দেয়—সে তার ধর্ম; বাহাদুরি নেবার চেষ্টা তার মধ্যে নেই।

তা যাই বল—তোমাদের কালের পোশাকগুলোও কি বিশ্রী! যেমন মোটা—তেমনি জবরজঙ্গ।

—ওরে ওগুলো তৈরি হ'ত আমাদের রুচিতে—তোদের নয়।—তোদের পরেও রুচি বদলাবে—নতুন লোকেরা হাসবে তোদের পোশাক দেখে। এমনি হয়—না হলে মানুষ যে পুরোনো হয়—পৃথিবী যে একঘেয়ে হয়।

একথা স্বীকার করে প্রভাত। পৃথিবী তাই আজও পুরাতন হ'ল না—আজও আকাশের নীল, গাছের সবুজ, পাখীর কাকলি—ঋতুদের আসা-যাওয়ার হিসাব হ'ল না পুরাতন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ভাবে এই যে বহু যুগের পৃথিবী পুরাতন হয় না মানুষের কাছে—একি শুধু তার বাহ্য বৈচিত্র্যের প্রভাবে—না মানুষের মনে নিত্যকালে সৃষ্ট হচ্ছে যে পৃথিবী তারই রঙে তারই বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতে অপরূপ হয়ে উঠছে চির পুরাতন বস্তু? স্রষ্টা শুধু মানুষকে সৃষ্টি করেন নি—সৃষ্টি করেছেন মন। সেই মনের নিত্য রসাস্বাদন-ক্রিয়ার মূলে রয়েছে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা। ক্ষুদ্র শিশু মাটির ঢেলা গড়ে আনন্দ পায়—বড়দের সাজানো জিনিস ভেঙে-চুরে বিশৃঙ্খল করেও তার আনন্দ! পরের সৃষ্ট জগতে বাস করতে সে পীড়া অনুভব করে—সে নিজের হাতে কিছু গড়তে—নিজের সৃষ্ট আনন্দ-লোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার সর্ব্বোত্তম উপভোগ। এই বীজ মানুষের] জন্মের ক্ষণে উপ্ত হয়—জ্ঞানের সঙ্গে হয় অঙ্কুরিত; পৃথিবী ও জীবন নূতন বৈচিত্র্যে ও লীলায় সমৃদ্ধ হয়।

আশ্চর্য্য, এই একটি কালের মধ্যে বাস করে আর একটি কালকে প্রত্যক্ষ করতে পারে খুব কম লোকেই। বর্ত্তমানের শব্দ ও আলো অতীত বা ভবিষ্যতের মৌন ভাষাকে বাঙ্‌ময় হতে দেয় না—ওই শব্দ-আলোর সমারোহ নিয়ে মানুষ মত্ত হয়ে ওঠে—সে পিছনে চায় না, সামনেও অল্প দূর পর্য্যন্ত তার দৃষ্টির প্রসার। যেন চোখে ঠুলি পরানো ঘোড়া চাবুকের স্পর্শভয়ে চালকের ইঙ্গিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে—দিগ্‌বিদিক্ হারা হয়ে।

ওঁর মুখে সেকালের গল্প শুনে সেকাল সম্বন্ধে নতুন করে জানবার শ্রদ্ধা জেগেছে প্রভাতের মনে। সেকাল সভ্যতায় অনেক পিছনে পড়ে নাই। এই কালের মতই মানুষ প্রভুত্বে মহত্ত্বে স্বৈরাচারে ব্যসনে ও জনসেবায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। সেকালের অত্যাচার ছিল স্থূল—তার প্রতিরোধ-চেষ্টাও তেমনি স্থূল। একাল রাজনীতিতে সূক্ষ্ম কলা-কৌশল বিস্তার করে মানুষকে হাসি ও ভ্রূকুটির মধ্য দিয়ে কখন কাছে টানছে, কখন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একালের কর্ম্মী মানুষের দুটি রূপ। কখনও খর্পর, কখনও বা বরাভয় তার প্রহরণ। রাজনীতির খেলায় দক্ষ মানুষের এ ছাড়া গতি নাই।

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ।

দ্বৈত-জীবনের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চায় মানুষ! আশ্চর্য্য, এই দ্বৈত-জীবনের রহস্য সেকালের বড় বাড়ীতেও প্রকাশ পেল একদিন। প্রভাতের স্বপ্ন ভেঙে গেল—চলতে চলতে ওর সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক গহ্বর—অতলস্পর্শী মৃত্যুপুরী।

মাত্র দু'দিন আগের কথা। প্রভাত আর শুভঙ্কর মেজ জ্যেঠাইমার আসর থেকে গল্প শুনে ফিরছিল সেই গলিপথ দিয়ে। গলিপথ শেষ হলে বৈঠকখানা ঘরে ওরা পৌঁছল; হঠাৎ শুভঙ্কর চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, একটু দাঁড়াবেন স্যার—আমার একটা জিনিস ভুলে ফেলে এলুম ওখানে।

কি জিনিস—কবিতার খাতা নয় তো?

হাঁ—লজ্জায় মাথা নামিয়ে শুভঙ্কর উত্তর দিলে। খাতাটা কাল সিপ্রা নিয়েছিল—ফিরিয়ে দেয় নি।

আর একটা দিন বেশী রইলই বা তাঁর কাছে—

না—সেজন্য নয়। কাল কলেজ ম্যাগাজিনে একটা কবিতা দেব, আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। একটু দাঁড়ান আসছি।

ও চলে গেল। প্রভাত একলা দাঁড়িয়ে ঘরের আসবাব সজ্জা দেখতে লাগল। বেশী কিছু নাই ঘরে তবু যা আছে তা সাধারণতঃ আজকালকার ঘরে থাকে না। এর ছাদ এত উঁচু, মেঝে এত চওড়া আর দৈর্ঘ্য এর এমন অদ্ভুত যে স্বতঃই প্রশ্ন

জাগে মানুষকে তুচ্ছ করে দেওয়ার এই আয়োজন কেন? প্রথম দিন এই ঘরে বসে প্রভাতেরও মনে হয়েছিল এত ক্ষুদ্র আমি। আর কি নগণ্য! ওঁরা ঘর তৈরি করে মানুষকে করেছেন অসহায় অর্থাৎ ঘরের মহত্ত্বে মানুষ অভিভূত হয়ে কোথায় মিশিয়ে যায়।

কোথায় ছিলেন ত্রিলোচন সেন—সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, প্রভাত এই অপরাহ্ণে তুমি কি মনে কর হে?

আজ্ঞে মেজ জ্যেঠাইমার কাছে এসেছিলাম।

গুড—গুড। ত্রিলোচন সেন হর্ষধ্বনি করলেন। প্রভাতের মনে হ'ল ওঁর স্বর ঈষৎ জড়ানো—উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রখর। মনে হ'ল অস্বাভাবিক।

ত্রিলোচন সেন বললেন, নিজে দেখে-শুনে কাজ করা ভাল। আমাদের কাল ছিল আলাদা। গুরুজনেরা বললেন, অমুক দিন তোমার বিয়ে—তথাস্তু। কোথায় বিয়ে—পাত্রী কেমন—কত বয়স এসব জানবার অধিকার আমাদের ছিল না, এসব জানানও ওঁরা কর্ত্তব্যবোধ করতেন না। এক কথায় বিয়ে হয়ে যেত—আর আমরা যে ঠকতাম তাও নয়। কর্ত্তাদের দূরদৃষ্টি ছিল আশ্চর্য্য রকমের। ঠিকুজী কোষ্ঠী—রাশি গণ যোটক এসব বিচারের উপরেও নিজেদের চোখে দেখতেন লক্ষণ, পায়ের গড়ন, চলন, মাথার চুল কপাল চোখ আর ভ্রূ ঠোঁট চিবুক গলার স্বর হাসির আওয়াজ গায়ের লোম তন্ন তন্ন করে মিলিয়ে ঘরে আনতেন সুলক্ষণা কন্যা। বোধ করি আমরা ঠকিনি তাতে। তুমি তো দেখেছ কয়েকখানা অয়েল-পেন্টিং ছবি। ভাল লাগে নি তোমার?

প্রভাত অস্বস্তি বোধ করছিল। এ প্রসঙ্গ কেন তুললেন উনি? ওঁর অস্বাভাবিক স্বরের প্রভাব কি?

কি হে—চুপ করে রইলে যে—ভাল লাগে নি? কণ্ঠে জোর দিয়ে প্রশ্ন করলেন। আদেশের সুর সেই প্রশ্নে।

প্রতিকূল মন্তব্য অভদ্রতার নামান্তর। তা ছাড়া অভদ্রতার কারণও ঘটেনি নাই। ওঁদের ছবি কতখানি শ্রদ্ধা আদায় করতে পারত সে প্রভাত জানে না কিন্তু গল্প ছবিগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শক্তিময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী নারী।

প্রভাত শ্রদ্ধান্বিত স্বরে বললেন, চমৎকার। ওঁদের যে শক্তি—

শুভঙ্কর ফিরে এল।

ত্রিলোচন সেন বললেন, ভাল স্ত্রী শুধু সংসারের সম্পদ নয়, জাতিরও সম্পদ। মুসোলিনীর আত্মজীবনী পড়েছ তো? ভাল গৃহিণী গড়তে চেয়েছিলেন তিনি—জাতিকে তুলবেন বলে। হিটলারও চেয়েছিলেন ভাল মা যিনি প্রসব করবেন স্বাস্থ্যবান ছেলে—জাতির সম্পদ।

শুভঙ্কর প্রভাতের হাত ধরে বললে, আসুন।

মানে?—ত্রিলোচন সেন উচ্চস্বরে বললেন, সবটা না শুনেই? ভাল লাগছে না বুঝি? প্রভাতের পানে ফিরে বললেন, আমি চাই—তোমাদের নিজের পছন্দ মত···মানে আমাদের কাল তো আর নাই যে, পিতার আদেশে···তবে তোমাদের চোখ—অর্থাৎ দৃষ্টিও তো পরিষ্কার নয়—একটু ঘোলাটে। তা হয়ই—কালে সবাইয়ের দৃষ্টি অমন হয়ই। তাই ভাল-মন্দ বিচারের একটা খেই ধরিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য আমাদের। নয় কি?

প্রভাত হতভম্বের মত বললে, আজ্ঞে হাঁ।

গুড্। ত্রিলোচন সেন হুয়ার চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত তোমার কথা শুনে। ভেরি গ্ল্যাড টু হিয়ার—

শুভঙ্কর তখন প্রভাতকে টেনে নিচে নিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে মেজ জ্যেঠাইমার গলার স্বর প্রভাত শুনলে।

ছি, জ্ঞান হারিয়েছ? যারা তোমার ছেলের মত—

ছেলের মত? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ছেলের মত? আজ বাদে কাল যে জামাই হবে—জামাই আর ছেলেতে তফাৎ আছে কিছু? তোমার জ্ঞান খুব টনটনে, নয়? ত্রিলোচন সেনের উচ্চকণ্ঠ একতলা থেকে শুনলে প্রভাত।

একটা রূঢ় আঘাতে ওর স্বপ্ন ভেঙে গেল। এই জন্যই কি সাহিত্য-সভাশেষে শুভঙ্কর ওকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল? মহিমময়ী নারীর ভূমিকায়—সামনে এলেন মেজ জ্যেঠাইমা—হাতে তাঁর মিষ্টির থালা। তাঁর আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে বললেন সেকালের গল্প। কেন বললেন? এই বাড়ীর ঐশ্বর্য্য মহত্ত্ব বীরত্ব মহানুভবতা সবকিছু দিয়ে প্রভাতকে অভিভূত করে দেবেন বলে?

প্রভাত হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল।

শুভঙ্কর পিছন থেকে ডাকলে, প্রভাত-দা?

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে চাইলে না।

শুভঙ্কর পিছনে চলতে চলতে বললে, রাগ করলেন?

প্রভাত ফিরে চাইলে। অকালবর্ষার মত থমথমে ওর আকৃতি—গলার স্বরটাও বেশ ভারি। বললে, রাগ করবার কারণ কি নেই?

শুভঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কি কারণ?

এই মাত্র ওপরে যে-কথা হ'ল তা বোধ করি শোন নি? বল, এ ব্যাপারের কিছু জান না?

প্রভাতের শ্লেষোক্তিতে শুভঙ্কর থতমত খেয়ে বললে, আমি—আমি কি করে জানব।

ওর বিব্রত ভাবে প্রভাতের মায়া হ'ল। সত্য এ অবোধকে ভর্ৎসনা করে লাভ নাই। কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ—মনের উচ্ছ্বাস কবিতার পত্রপুটে সঞ্চয় করেই ওর আনন্দ—সংসারের কুটিল পথরেখার সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা সম্ভব নয়।

সস্নেহে শুভব্রতের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, বোসো এক

দিন আমাদের বাড়ীতে তোমার খাতা নিয়ে—যাবে তো ?

যাব। আপনি আমার ভুল শুধরে দেবেন তো ?

দেব।

শুভব্রত অকস্মাৎ আনন্দে অধীর হয়ে প্রভাতের পায়ের কাছে অবনত হ'ল।

১৭

খানিকটা দেরিতেই ঘুম ভাঙল। দিনের আলো প্রখর হয়ে চোখে লাগছে। কানে আসছে তরকারি রান্নার শব্দ, একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুমের আলস্য ভেঙে গেল। প্রভাত উঠে বসল।

আহ্নিকগতিতে পৃথিবী পুরাতন দাগেই পৌঁছেছে—চারিদিকের ঘটনাপুঞ্জ সময়ের স্রোতে একই জায়গায় জমবে, ক্লান্ত নয়ন যা থেকে সংগ্রহ করবে অবসাদ। ছোট উঠানের মাথায় এক ফালি বর্ণহীন আকাশ—চারিদিকের রুদ্ধ প্রাচীরে প্রতিহত ক্ষীণ বাতাস—মাছ তরকারি বাসি ডালের কটু অম্ল গন্ধ—আর ওপাশের কলহপরায়ণা গৃহিণীর একটানা অভিযোগ-অভিশাপের ক্লেদ—জীবনকে বিস্বাদ করে দেবার সুপ্রচুর উপকরণ বলেই জানে প্রভাত। জীবনের স্রোতধারা এর মধ্যেই বিলুপ্ত হবে না। ওই কালি আকাশে উদয়াচলের শোভা না ফুটলেও তার বাণী বহন করে আনে কোমল রঙ; বাতাস সাগরপারের উদার স্পর্শে নূতন উদ্যমে সঞ্জীবিত করে আশাকে; সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে সুধার পাত্র। জীবনরসায়নে জীবনযাত্রা ছন্দোবদ্ধ হয়।

মুখহাত ধুয়ে গলিটার দিকে চাইলে—উৎসব-ক্লান্ত আসরের মতই সেটা ম্রিয়মাণ। গত কালের অপরিমিত বাগ্‌বাহুল্যে ওর পুঁজি ফুরিয়েছে। নিশানগুলি এখনও গৃহ-অলিন্দে জানালায় বারান্দায় নানা ভঙ্গীতে টাঙানো রয়েছে—ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে, দীপের শোভাও নাই। কয়েক দিন আগে সরবে যে বার্ত্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—আজ তা অন্তর আশ্রয় করেছে। স্বাধীনতার মর্য্যাদাকে অন্তঃপুর আসন দিতে হবে অন্তঃপুরে।

একটা রেশন-ব্যাগ নিয়ে মা ঘরে ঢুকলেন। একবার বাজারে যেতে হবে বাবা—ওঁর পেটে ব্যথা উঠেছে।

নিরাপত্তিতে ব্যাগটি হাতে নিলে প্রভাত।

মা একটি টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, এইতেই যা হয় আনিস।

প্রভাত বললে, মাছ, আলু সব তো এতে হবে না।

চুনোমাছ আনবি—আর আলু না এনে বরং কচু আর পেঁপে আনবি। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ক'দিনই এটা ওটায় খরচ হয়ে গেল বেশ—আজ তো মাসের শেষ।

প্রভাত বললে, তবে থাক না বাজার।

পাগল! ঘরে এক ছিলকে তরকারি নেই—খাবি কি দিয়ে ভাত!

প্রভাত বললে, সেদিন বল নি কেন আমায় যে সংসার-খরচ থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা যাবে না।

এমন জিনিস যা কস্মিন্‌কালে কেউ দেখে নি—তা বারণ করতে পারি। দিন যে ভাবে হোক চলে যাবে।

তাই হয়ত যাবে। এই আশ্বাসে মা চল্লিশ বৎসর সংসারের হাল ধরে আছেন—বাবা দশটা পাঁচটায় জীবন বাঁধা রেখেছেন। অন্যেরা যেখানে উৎসবে বেপরোয়া আনন্দে মাতল—এ সংসার সেই পরম ক্ষণেও হিসাবের অঙ্কপাত করল মনে মনে। চারিদিকের ঝড়ঝঞ্ঝা বাঁচিয়ে অতি কষ্টে কোথা থেকে ছিনিয়ে আনা হ'ল আনন্দকে—ক্ষীণ আয়ু—উপরে থিতানো অল্প জল নীচেয় তার জমে আছে পাঁক।

থলি হাতে সে বাজারে বেরিয়ে গেল। বাজারের রাস্তায় বহু রকমের পণ্য নিয়ে বসেছে কত লোক—বহু কণ্ঠের বিভিন্ন ঘোষণায় ক্রেতাকে করছে বিভ্রান্ত। আজ এদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে প্রভাত। এরা কি উপভোগ করেছে স্বাধীনতার আনন্দ? যে পরম বার্ত্তা রেডিও যোগে বিঘোষিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাসাদে কুটীরে—শহরে পল্লীতে—এরা কি ভাবে নিয়েছে সে ঘোষণা?

না—উৎসব অন্তে এরা ম্রিয়মাণ নয়—নীচের জমা পাঁক উপরে থিতানো জলের বর্ণকে মলিন করে নি। এরা চিরকাল বেহিসাবী বলেই—পরিণাম নিয়ে মাথাব্যথা করে না। এই যে একটি পরিবার পথের ফুটপাতে বেচছে লেবু, আমড়া, কচি শশা আর চালতা। বর্ষীয়সী গৃহিণী ঝুড়ি থেকে জিনিসগুলি দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের হাতে—ছেলেমেয়েরা কেউ বা ন্যাকড়ায় কেউ বা ফুটের রকে কেউ বা হাতে করে চেঁচাচ্ছে—আনামে তিন—বাবু আনামে তিন। মাখন লে যাও বাবু—আমার রাজাবাবু লে যাও। বিচিত্র সুর—হৃদ্যতার ভঙ্গিতে ফিরে চাইছে ক্রেতা—জিনিস হাত থেকে গিয়ে উঠছে থলিয়ায়। এ পরিবারটিকে জানে প্রভাত। গেল ভাদ্রে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে প্রাণ দিয়েছে বৈজু।

তার জন্য কয়েকদিন মাত্র হা-হুতাশ করেছে মনিয়া। দিনের পর দিন শোককে টেনে জীবনযাত্রাকে পঙ্গু করে তোলে নি। বৈজু থাকতেই ওরা বিক্রেয় নিয়ে পথের ধারে এমনি করে চেঁচাত—সংসার-চালনার কৌশল ছিল আয়ত্তে। ওদের সংসারে একটি লোক কমলে—মনে খানিকটা আঘাত লাগে—কিন্তু সংসারের গায়ে তার আঁচ পৌঁছায় না। একটি মানুষের উপার্জ্জনে বহুপোষ্যভারগ্রস্ত সংসার নির্ভর করে না।

সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে দারিদ্র্য আছে—কিন্তু জীবনযাপনের সমস্যা তেমন জটিল নয়। সর্ব্বরিক্ত দারিদ্র্যের জটখোলা প্রণালীতে সামাজিক মানদণ্ডের গঠনটি ভিন্নতর।

এদের বাড়ীর কুলবধূরা পায়ে হেঁটে এক বাড়ী থেকে অন্ত বাড়ীতে কিংবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেলে পথ তাদের মর্য্যাদা হরণ করে না—নূতন অতিথির আগমনে—বিয়েতে বা শ্রাদ্ধবাসরে লৌকিকতার দণ্ড দেওয়া না-দেওয়ার উপর মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে না—কিংবা সংসারের কলঙ্ক নিয়ে সমাজে অচল হবার ব্যবস্থাও নাই। সূর্য্যের আলো অকৃপণ ভাবে যেমন পূজাবেদীতে আর নর্দামায় পড়ে—স্থান বিচার করে না—এদের বেঁচে থাকবার চেষ্টাও সেই জাতীয়। আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাকে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে—দুর্ভিক্ষে—জলপ্লাবনে—ভূমিকম্পে—যুদ্ধে কিংবা ব্যাধিতে হাজারে হাজারে এরা নিশ্চিহ্ন হয়—তবু সেই মৃত্যুর অগৌরব কম। মধ্যবিত্তের সংসারে মৃত্যু—দিনের পর দিন যে ভাবে উঁকি মারে যে ভাবে আধিপত্য বিস্তার করে—ক্ষয় করে জীবনী শক্তিকে···প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ভাবলে এরা মধ্যবিত্ত নয় বলেই এদের সমস্যা হয়ত বুঝতে পারছি না—এদের মৃত্যুকে ভাবছি তেমন ভয়াবহ নয়—তবু আকাশ আচ্ছাদনে ও দর্ভশয়নে—শুধু অন্ন বা ছাতু-আটার সংযোগে—এদের জীবনযাপন-প্রণালী যে গ্রন্থিহীন একথা অস্বীকার করি কেমন করে। শুধু প্রাণধারণের নীতিতে এরা রাম্নালতা নয়—পথের দূর্ব্বাদল পদতলে পিষ্ট হলেও সহজে বিনষ্ট হয় না। দুটি যুদ্ধের অভিশাপ পৃথিবীতে ছায়া বিস্তার করেছে, আগামী যুদ্ধেও ছায়া গাঢ়তর হবে। সর্ব্বহারা আর সর্ব্বময়দের দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র রূপ পরিবর্ত্তন করছে—যারা ঘরের নয়—ঘাটেরও নয়—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত—তাদের কথাটা ভাবছে কি কেউ? না, তারা থাকবে না—। তাদের চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, আকাশ আর পাতালকে বেঁধে রেখে মাধ্যাকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত করছে। তাদের নিয়েই পৃথিবী, অথচ পৃথিবী থেকে তারা মুছে যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় অনন্ত আপিস থেকে ফিরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

প্রভাত এলে বললেন, তুমি উপযুক্ত ছেলে—তোমার কাছে আমি এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। বুঝতে পারছ না? কাল ত্রিলোচন সেনকে অপমান করেছ তুমি।

আমি? বিস্মিত প্রভাত পিতার পানে চাইলে।

নয় ত কি। উনি আদর করে তোমায় ডেকেছিলেন, তুমি ভদ্রতার মর্য্যাদা রাখনি। ওঁর বাড়ীতে গিয়ে ওঁকে অপমান করার সাহস হ'ল তোমার!—আশ্চর্য্য!

পিতার ভর্ৎসনায় প্রভাত আলো দেখতে পেলে। কখনও সে পিতার কথার প্রত্যুত্তর করে নি—আজ সে পারলে না মৌন থাকতে। বললে, উনি ত মাত্রা রেখে কথা বলেন নি।

থাম। অনন্ত গর্জ্জন করে উঠলেন। জান উনি কত বড় মানী লোক? নিজে এসেছিলেন—আত্মীয় হবার দাবী নিয়ে—শুনেছেন লেখাপড়ায় তোমার কেরিয়ার ভাল—তাই—

প্রভাত বললে, বেশ ত—সে কথা আপনার সঙ্গে কইলেই যথেষ্ট হ'ত—আমাকে টানবার কারণ বুঝলাম না।

ওঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাবছ সব শেষ হয়েছে? এখনও যা, আছে সেই সব একজন বুদ্ধিমান বিদ্বান ছেলের তত্ত্বাবধানে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। ছেলে নাই—দুটি মাত্র মেয়ে। একটি মারা গেছে, আর একটিকে কাছে রেখেই—অর্থাৎ যত দিন উনি বেঁচে থাকবেন—

প্রভাত বললে, স্পষ্ট করে যদি বলতেন এ কথা তা হলে অসম্মানের কারণ ঘটত না।

অনন্ত নরম হয়ে বললেন, অত বড় মানী লোক—সরাসরি কথাটা পাড়তে কতখানি লজ্জা তাব দেখি! আমি অবশ্য বুঝেছিলাম—ভেবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমান—তুমিও বুঝবে।

প্রভাত নম্রকণ্ঠে বললে, হাঁ বাবা—আমিও বুঝতে পেরেছিলাম।···তাই কিছু অভদ্রতা করে ফেলেছি। কিন্তু উনি একথা কেন বুঝলেন না যে ওঁর মানসম্ভ্রম যেমন উঁচু, অন্তের মানসম্ভ্রম তেমন উঁচু না হলেও খানিকটা আছে। কোন আত্মমর্য্যাদাশীল ছেলে ওঁর প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। কথা শেষে প্রভাত আর সেখানে অপেক্ষা করলে না।

স্তম্ভিত অনন্তের বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবকাশ রইল না। চিরদিনের নম্র নিরীহ প্রভাত বলে কি! তার স্বতন্ত্র একটি মর্য্যাদা আছে একথা কোন দিন তো অনন্তের ধারণাতে ছিল না। স্বতন্ত্র মত, এও বিচিত্র বটে! তাঁদের কালে···কিন্তু সে কালের দৃষ্টান্তে এ কালের তরুণরা অনুপ্রাণিত হয় না, কতকটা উপহাসের ভঙ্গিতে তারা সে কালের কাহিনী শোনে। তাঁর নিজের সংসারে আজ্ঞা-অবহেলার মনস্তাপ এ যাবৎ ভোগ করতে হয় নি—আপিসের সহকর্ম্মীদের কাছে শোনা বহু কাহিনী মনে গাঁথা আছে। সে সব কাহিনী শুনেছেন মাত্র—মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় নি। পৃথিবীটা বেয়াড়া রকমে বদলে যাচ্ছে এই ধরণের ক্ষোভ কিছু প্রকাশ করেছেন, কতকটা তাচ্ছিল্য কতকটা মজা-দেখার মত বার্ত্তাগুলি মনের উপভোগ-রসে পরিপাক হয়ে গেছে, নিজ কালের গৌরব প্রচারে সত্য বলতে কি আনন্দ লাভই করেছেন এতদিন—আজ ছেলেবেলায় পড়া পদ্যপাঠের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে:

> কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
> কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!

সুনয়নী ঘরে ঢুকে দেখলেন, দু'হাতে বুক চেপে ধরে অনন্ত বালিশে উপুড় হয়ে শুয়েছেন। বললেন, বুকের ব্যথাটা কি বাড়ল?

হুঁ।

গরম জল এনে দেব?

না। শোন, এদিকে এস।

সুনয়নী কাছে এসে বসতেই বললেন, আর কোন আশা নেই, বুঝলে?

কিসের আশা?

প্রভাতের বিয়ে দিয়ে বউ আসবে—বুড়ো বয়সে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বউয়ের সেবা খাবে—

সুনয়নী বললেন, সে আশা করি নে।

নিশ্চয় কর—মিথ্যা বলো না। প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন অনন্ত। আশা কর না তো সংসার কিসের জন্ত? কার জন্ত ভূতের ব্যাপার খেটে মরছ!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুনয়নী বললেন, যা দেখি চারদিকে তাতে ভরসা হয় না যে বউয়ের সেবা পাব!

কি দেখ?

কেন—মিত্তিরদের বাড়ী—মুখুজ্জেদের বাড়ী—দত্তদের বাড়ী—শীলেদের বাড়ী—যে দিকে তাকাবে সব শেয়ালের এক রা। কেউ বলে না যে ছেলের বিয়ে দিয়ে সুখী হয়েছি।

তোমাদের কালেও এ ব্যাপার ছিল তো। মুখ নামিও না—আমি জানি—মার কাছে অনেক কথা শুনেছ তুমি—অনেক সয়েছ—

সে হয়ত অভাবের জন্য—

ঠিক তা নয়। তবু মা তোমাকে ভালও বাসতেন যথেষ্ট। নিজের গায়ের গহনা তোমায় পরিয়েছেন—নিজের মুখের খাবার তোমায় তুলে দিয়েছেন।

দু'জনেই খানিকক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। অতীত যত করুণই হোক—স্মৃতির কিনারে কোমল রঙ একটু লেগেই থাকে। হয়ত সে বর্ণ বিলাসের—তবু তা আনন্দদায়ক।

অনন্ত বললেন, এতটুকু বেলায় এ সংসারে এসেছিলে। মা বলতেন—একটা বিড়াল ছানাকে নাড়লে চাড়লে মায়া পড়ে যায়, আর মানুষের ওপর মায়া পড়বে না? কিন্তু আজ যারা আসে—তারা আলাদা সংসারের রীতি নীতি নিয়ে—আলাদা সংসার গড়বে এই সঙ্কল্প নিয়েই আসে। তাদের এক ঘরে বাঁধতে পারা কি তেমনি সহজ ভাব?

যাক—ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করো না—।

না—বুড়ো বয়সে নিজের পায়ে বল থাকে না বলেই ভাবনা। আমাদের কালে কর্ত্তব্যটা ছিল বড়—এরা মানুষকে চায় তার ওপরে। তারা—তারা—। দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে কথার ইতি টানলেন না—কথা ছাড়লেন অনন্ত।

তুমি প্রভাতকে পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকতে বলেছিলে?

হাঁ—কিন্তু ভেবে দেখলাম ভুল করেছিলাম। ওকে ত আর রাঙাতে পারি না যে পড়াবার ক্ষমতা আমার নাই। ছেলে পড়িয়ে টাকা রোজগার করছে—ও স্বাধীন।

না—না—প্রভাত তেমন নয়। সবাই ওর সুখ্যাত করে। আশ্বাস দিলেন সুনয়নী।

অনন্ত প্রত্যুত্তর না করে ললাটে তর্জ্জনী স্পর্শ করে হাসলেন।

১৮

এর পর পুজো এল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শারদীয়া। কাগজে কাগজে এর বার্ত্তা বিঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু সন্দেহ জাগে, পঞ্জাবে আর বাংলায় বাস্তুত্যাগীর বিপুল সংখ্যায় শরতের আনন্দকে ফুটতে দেবে না এবার। বিভক্ত পঞ্জাব আর বাংলাতে সংখ্যালঘু হিসাবে যারা পড়ে রইল—তাদের ত্রাস দূর করতে পারে এমন অভয়পাণির সন্ধান কে দেবে? বরাভয়দায়িনীর মহিমা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে কি?

সাহিত্যের বাজারে নূতন শারদীয়া সংখ্যার আবির্ভাব—আর সব অভাব মোচন করবে এ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন লেখকদের যে যেমন পেরেছেন নূতন নৌকায় টেনে তুলেছেন উদ্যোক্তারা।...যেমন বেলুড় মঠের পারাপারের নৌকায় হাঁকডাক করে যাত্রী বোঝাই করা হয়। আর প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে কুমারটুলির কারিগর দখলের। কে কত ভাল প্রতিমা আনতে পারেন তারই উদ্যোগ আয়োজন চলছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছে উৎসবটাও সেই গৌরব অনুযায়ী হওয়া চাই—টাকার হিসাব রাখার প্রয়োজনই বা কি! পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহের ধুম লেগে গেছে।

প্রভাতদের বাড়িতে চাঁদা আদায়কারীরা এল। এক দল নয়, দু'দল।

অনন্ত বললেন, গেল বার তো এক জায়গায় চাঁদা দিয়েছি, এবার দু'জায়গায় কেন?

এবার একটা নতুন পুজো হচ্ছে স্যার।

তা হলে চাঁদাটা ভাগ করে নিও।

তা কি করে হয় স্যার। আর গেল বারে যা দিয়েছেন এবারে তার চেয়ে বেশী না দিলে...বুঝতেই তো পারছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম পুজো—

অনন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ভারত স্বাধীন হয়েছে, আমাদের আয় তো বাড়ে নি বাপু।

স্বাধীনতার জন্ত কত দেশের লোক কত কষ্ট সহ্য করেছে স্যার—সামান্ত দু'টাকা চাঁদা—

অনন্ত চটে উঠলেন, যখন উপার্জ্জন করবে তখন এসব লম্বা লম্বা কথা বল, আছ তো বাপের হোটেলে—

ছেলেরা চটে উঠল, আমাদের ইন্‌সল্ট করছেন। আচ্ছা দেখ্ লেঙ্গে।

সবাই একযোগে চীৎকার করে উঠল, জয় হিন্দ্।

প্রভাত বেরিয়ে এসে বললে, শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ কেন?

দেখুন প্রভাত-দা—আপনার বাবা আমাদের অপমান করেছেন—উনি যতক্ষণ না মাপ চাইছেন ততক্ষণ আমরা

স্লোগান আওড়াব। বলে ছেলেটি দলের দিকে ফিরে চীৎকার করে উঠল।

দেশের শত্রু—

সমস্বরে সকলে প্রতিধ্বনি তুলল, মুর্দাবাদ।

প্রভাত হাত জোড় করে বললে, আমি ক্ষমা চাইছি।

ছেলেদের দলপতি সামনে এসে বললে, আচ্ছা—সে যা হয় হোক—চাঁদাটা এখন পাব কি?

পরশু এসো।

সবাই জয় হিন্দ্ ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

অনন্ত ততক্ষণ ক্রোধে ক্ষোভে কাঁপছিলেন। বললেন, তুই ওদের টাকা দিবি বললি কেন? যত সব গুণ্ডার সর্দার—পুজোর নামে গুণ্ডামি!

প্রভাত বললে, আপনি নেয়ে নিন গে—আপিসের বেলা হ'ল।

অনন্ত বললেন, কিন্তু বলে রাখছি প্রভাত—ওদের নিয়ে যদি আমরা স্বাধীনতার বড়াই করি সে বড়াই বেশী দিন থাকবে না।

প্রভাত বললে, বাবা, ডাইরেক্ট একশনে এরা পাড়া বাঁচিয়েছে।

হুঁ—তাই গুণ্ডামিতে হাতটি হয়েছে পাকা! এসিড বাল্ব, বোমা তৈরী, ষ্টেনগান চালানো, ছোরা মারার কায়দা আর সেই সঙ্গে গুণ্ডাদের মত স্ স্ উচ্চারণ—!

প্রভাত তর্ক তুললে না। শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি নেয়ে নিন্ গে।

অনন্ত গজ গজ করতে লাগলেন।

বাড়ীর মধ্যে আসতেই সুনয়নী বললেন, ওরা চেঁচাচ্ছিল কেন গো?

পুজোর চাঁদা চায়—যত সব মা-মরা বাপে-খেদান ছেলের মাতৃভক্তি দেখলে পিত্তি শুদ্ধ রি রি করে জ্বলে!

সুনয়নী বললেন, তা ওদের যেন বিদেয় করলে—মেয়ে জামাইকে তো—

তত্ত্ব করতে হবে—নয়? তিন বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে—এখনও তত্ত্ব? সাধ-আহ্লাদ যে থই থই করে উথলে উঠছে!

অনন্তর তিক্ত হাসি দেখে সুনয়নী আপনাকে সামলে নিলেন। নরম গলায় বললেন, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ না হোক—আপন সন্তান—

পরগোত্রের মেয়ে আবার আপন হয় কখনও! ওদেরও দেহি দেহি রব। আমাদের মত যারা—তাদের ধর্ম্ম নেই—সমাজও নেই—আমরা সব সৃষ্টি ছাড়া—কালাপাহাড়। বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন অনন্ত।

সুনয়নী চুপ করে রইলেন। স্বামীর মনের বেদনা তাঁর মনেও যে সঞ্চারিত হয় নি তা নয়—কিন্তু শারদীয়ার দিনে মেয়ের ম্লান মুখখানি—তার কল্পনাকে পীড়িত করে তুলছে। বৎসরান্তে একখানি কাপড় দিয়ে স্নেহ প্রকাশেরও সুযোগ বুঝি তাঁর ঘটবে না।

অনন্ত বললেন, সন্তান দিয়েও শ্বশুর মশার তিন বছরের বেশী কাপড় দিতে পারেন নি—আমাদের গায়ে নিশ্চয় সে দুঃখ লেগে নেই। সুনয়নীর মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে সে ব্যথা। অদৃশ্য কাঁটা—চোরা বেদনা। সে গভীর দুঃখ আজও অনুভব করেন তিনি তাই নিজের মন দিয়ে মেয়ের মনকে স্পর্শ করেন বার বার। দুঃখ গায়ে লেগে থাকে না সত্য কথা—কিন্তু বাইরেটা যদি মানুষের সব হ'ত!

মেয়েকে আনবে না এবার? অনেক দিন দেখিনি তাকে।—অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে সুনয়নী বললেন।

সে স্বর অনন্তর মনকে স্পর্শ করল—একটি নিঃশ্বাস বুকের মাঝে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, মেয়েকে কে আর না দেখতে চায় বল! কিন্তু রেশনের বাজার—চাল জোগাব না কচি ছেলের দুধ জোগাব! মা আসেন বটে বছর বছর—কিন্তু কি দেখতে যে আসেন!

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা আর চাপতে পারলেন না।

মা এলে যারা খুসী হয়—তেমন তেমন লোকের সংখ্যাও বাংলায় কম নয়। সেটা মাকে দেখবার আগ্রহ নয়—বৈচিত্র্য-সন্ধানী মনেরই খেলা হয় ত!

এর মধ্যে অনিমেষ দিন তিনেক প্রভাতদের বাড়িতে এসে ফিরে গেছে—প্রভাতের সঙ্গে দেখা হয় নি। এক দিন একটা চিঠি দিয়ে বলে এসেছিল—বিশেষ দরকার, তাকে এক বার অবশ্য করে পাঠিয়ে দেবেন। বলেছিল নেপথ্যচারিণী সুনয়নীকে উদ্দেশ করে'।

সহজ মেলামেশার মধ্যেও বৃহৎ একটি ব্যবধান ছিল দু' বাড়ীর। প্রভাতের সঙ্গে দীপা বা অনিমেষের অন্তরঙ্গতা থাকলেও ওরা কোন দিন প্রভাতদের অন্তঃপুরে আসে নি। এ বিষয়ে ওদের সঙ্কোচ কতটা ছিল বলা কঠিন, কিন্তু প্রভাত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত ওদের ডাক শুনলে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ওদের টেনে নিয়ে যেত অন্যদিকে। এ বাড়িতে ওদের অভ্যর্থনা করবার সাহস কোন দিনই প্রভাতের হয় নি। বাড়ীর সুপ্রকটিত দৈন্য অথবা অভাবগ্রস্ত মানুষের মাত্রাজ্ঞানহীন আলাপের অসৌজন্য—কোন্‌টাকে ভয় করত প্রভাত, কে জানে। ওদের যা কিছু আলাপ পথের দিকের একমাত্র জানালার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হ'ত।

ইদানীং প্রভাতের সঙ্কোচটা বেড়েছে। বিশেষ করে টিউশানি না নেওয়ার পর। ওরাও এই প্রসঙ্গটিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন—তবু মনে হয়েছে ওদের আলাপের স্বচ্ছন্দ সুরটি ঠিক মত আর বাজছে না। অনিমেষের কাছে ও বেশ খানিকটা অপরাধী হয়ে আছে।

প্রভাত বাড়ী ফিরলে মৃন্ময়ী বললেন, বড় বাড়ির ছেলে সেছিল—এই যে চিঠি। বলেছে বিশেষ দরকার, দেখা রবে। একটু থেমে বললেন, তুই বুঝি আর ওদের ওখানে াস নে ?

প্রভাত বললে, যাবার সময় হয় নি।

সে কি রে—তোর কি এত কাজ যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা রতে সময় পাস না! ওরা তোকে ভালবাসে বলেই না াকে! বড়লোকের সঙ্গে অসদ্ভাব করলে নিজেরাই কষ্ট াবি—

প্রভাত আহত হয়ে নিজের ঘরে এসে বসলে। ফুলের ালাপের এমন অর্থ কোন দিন ওর কাছে স্পষ্ট হয় নি। দের আলোয় প্রাসাদ ও কুটীর স্বপ্নপুরীর সৌন্দর্য্যে ঝলমল রে—বন্ধুত্ব তো চাঁদের আলোর সমগোত্রীয়। প্রত্যাশার মূর্ত্তি ওরই সৌন্দর্য্যে লুপ্ত হয়ে ছিল—আর সত্যিই তো ান প্রত্যাশা ছিল না প্রভাতের মনে। সত্যিই ছিল না কি াশা ? সুন্দর রুচি ও সংস্কৃতির মহামূল্য মণিমাণিক্যের ে ওকে দুর্নিবার আকর্ষণ করেছে। ও লোভীর মত ছুটে ে—লোভীর মত কাটিয়ে দিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই াপ-আলোচনার পরিমণ্ডলে।

—সেই লোভের চেহারা এমন কুৎসিত নয়—চিত্তাসক্ত ও জমত না গ্লানি। টিউশানি পাবার প্রত্যাশায় একবার তার স্থূলমূর্ত্তিটা প্রভাতকে রূঢ় আঘাত করেছিল। সেই ঘাতিক মুহূর্ত্তও নিঃশব্দে সরে গেছে—কিন্তু অভাবগ্রস্ত ারের ক্লেদরাশির কিছু অংশ প্রভাতের মনে সঞ্চিত হয়ে ছে। ও তেমন সহজ ভাবে অনিমেষদের সঙ্গে মিশতে ছে না।

পরের দিনও ও অনিমেষদের বাড়ীতে গেল না। অনিমেষ ই সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় পথের মাঝে ওকে ধরলে। র—একেবারে উধাও ? চিঠিটা পাসনি তো ?

পেয়েছি।—

তবে ? ওবেলায় বহুক্ষণ অবধি অপেক্ষা করলাম—এলে —শুনলাম কি একটা সমিতি নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছ।

একটা কিছু চাই তো। প্রভাত হাসলে।

এবার বোধ করি পূজোতে কোথাও বেরুবে না ?

পূজোতে বেরুবার সাহস আমাদের—

এ যেন সেকালের দেশভ্রমণ! পায়ে হাঁটা পথ—পথে ডাকাত! অনিমেষ শব্দ করে হাসলে।

তা ছাড়াও সাহসের দরকার হয় না ?

ই—ট্রেন কলিশন ? আচ্ছা প্রভাত—প্রাণের মায়া তোর বেশী হ'ল কবে থেকে ?

প্রাণ রাখিতে প্রাণাস্ত বলেই তো—

ঠেঁপোমি রাখ। অনিমেষ তাড়া দিলে। তোর কাছে একটা পরামর্শের জন্ত দু'বেলা হাঁটছি—তোর কিন্তু গ্রাহ্যই নেই।

কি এমন পরামর্শ ?

এবার পূজোটা কি কলকাতায় কাটাতে হবে ? মা কিছুতে নয়। আমি বলছিলাম দিল্লীতে বেড়িয়ে আসা যাক—

মন্দ কি—রাজধানী-দর্শন।

দীপা বলছে দার্জ্জিলিং।

আরও ভাল। একেবারে মামার বাড়ী।

মামার বাড়ী ?

নয় ? মা তো কি বছর ওখানেই আসেন এই সময়ে। —ওই হিমালয়ে।—ওটা আমাদের মামার বাড়ী নয় ?

অনিমেষ হো হো করে হেসে উঠল—তাই ভাল—কি বলিস ?

মন্দ কি। প্রভাত নিরুৎসাহ গলায় জবাব দিলে।

মানে ? সবিস্ময়ে প্রভাতের পানে চেয়ে হেসে উঠল অনিমেষ। যেন তোর পক্ষে কলকাতাতে থাকাও যা— পাহাড়ে যাওয়াও তাই।

উদাস দৃষ্টিতে অনিমেষের পানে চেয়ে প্রভাত বললে, তা ছাড়া কি।

তা হলে তুই যাবি নি ?

প্রভাত স্পষ্ট না বলতে পারলে না। বছর দুই আগে ওরা শিলং গিয়েছিল—সুখস্মৃতির মত তার রেখা এখনও সমস্ত স্মৃতিতে লেগে রয়েছে। পাণ্ডুঘাটে ষ্টীমার থেকে মোটরে ওঠা —নাংপোর ক্রসিং-এ আপ্-ডাউন দু'ধারের মোটরগুলির সাক্ষাৎকার—পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের কাছে কমলালেবু কেনা আর সর্পিল পাহাড়ের পথে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে মন্থর গতি মোটরের দক্ষ অভিযান আজ স্বপ্নে দেখা দৃশ্য বলে মনে হয়। সেদিনও তা স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। পর্ব্বতসানুতে তরঙ্গায়িত যোজন-বিস্তৃত শ্যাম-সমারোহ—নীলের চন্দ্রাতপের সঙ্গে তার মিতালী—সে যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও কোন পৃথিবীর বার্ত্তা! প্রত্যহের ধূম-ধূলিমলিন পৃথিবী নয়—কলহ-কোলাহল মাখা গৃহাঙ্গনও নয়, শাণিতমুখ তীরের আঘাতে বিদ্ধ জীবন ধারণের বিচিত্র সমস্তাও নয়—স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত উৎসের মত সুরের ঝঙ্কার তুলে দৃষ্টি থেকে নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়েছে এবং নেপথ্য থেকে অন্তরে আশ্রয় নিয়েছে সে জগৎ। সে জগৎ স্বপ্নে পাওয়া অথচ চিরজীবী।

ফিরে—যাবি তো ? অনিমেষ ওর ঘাড় ধরে নাড়া দিল।

প্রভাত ঘাড় নাড়লে।

দীপা বললে, মনে আছে সেবার বিশপস ফলস থেকে ফিরতে পাহাড়ের মাথায় এক ঝাঁক রডোডেনড্রন দেখে তোমার আবৃত্তি, 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।'

দীপা ডেকে নিয়ে গেল চায়ের টেবিলে—নিপুণ হাতে খাবার-ভরা প্লেট রাখলে সামনে—পেয়ালায় পেয়ালায় ঢাললে চা—পিয়ানোয় তুললে সুর। হাসিতে গল্পে কল্পনায় মশগুল হয়ে কেটে গেল দীর্ঘ সময়।

বাড়ীতে ফিরে এসেও স্বপ্নের ঘোর আর সুরের মোহ কাটল না প্রভাতের। মনে হ'ল পৃথিবীর তপস্যাই হ'ল এই জগৎকে আয়ত্ত করা। স্বপ্নের মাধুর্য্য স্থায়ী হয় বাস্তবের উপকরণ নিয়েই। বস্তুকে বাঁধবার কৌশল যার আয়ত্ত নয় তার পক্ষে স্বপ্ন শুধু বিলাস নয়—পীড়নও বটে। বহ্নি-সমর্পিত পতঙ্গের জ্বালা···

জানালাটি খুলে দিলেই গলির ওপ্রান্তে তেতলা ঘরখানি দৃষ্টিতে পড়ে। সন্ধ্যার মুখে ও ঘরে নীলবাতির আলো জ্বলে—সে আলো রাত্রির মধ্যযামেও জ্বলে—রাত্রিশেষে প্রভাত-তারার সঙ্গেও পাল্লা দেয়। কাচে-ঘেরা ফানুসের আলোর চারধারে পতঙ্গেরা ডানা ঝাপ্‌টায়—ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে প্রায় মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তবু আলোর মোহ তাদের ঘোচে না।

কত বিনিদ্র নিশীথে তেতলা ঘরের ওই আলো দেখে প্রভাতের মনে হয়েছে—ওই আলো জ্বালার তপস্যাই পৃথিবীতে সার্থক হওয়ার মানদণ্ড। যশ—সৌভাগ্য—সুখ—কল্পবৃক্ষের ফলের মতই অনায়াসে চয়ন করে নেওয়া যায়—সম্পদের দক্ষিণা যদি করতলগত হয়। সে সম্পদ বিধাতা দেন না—ভাগ্যও দেয় না—বুদ্ধি আর উদ্যমের আঁকশী দিয়ে পেড়ে নিতে হয়।

ক্রমশঃ

যুগসন্ধি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বসুধা তেমনি বিচিত্র আর আকাশ তেমনি নীল,
হারিয়েছে শুধু প্রকৃতির সাথে মানুষ মনের মিল।
জ্যোৎস্না ত আর হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারে না তার,
অরুণ পারে না পুঞ্জীভূত সে দূরিতে অন্ধকার।

সৌন্দর্য্যের সন্ধানে কেহ যাত্রা করে না সুরু,
স্নেহ-করুণায় অন্তর কারো কাঁপে নাকো দুরু দুরু।
প্রতিহিংসায় মত্ত মানব, অন্তরে পুষি' ভয়
জগৎবিচারসভায় করে সে বিচারের অভিনয়।

মানুষ জানে না—কি তার ইচ্ছা, জানে না কি-বা সে চায়,
পৃথিবী এ কোন্ অনিশ্চিতের রয়েছে প্রতীক্ষায় ?
কোথা আনন্দ ? ছন্দবিহীন জীবনে বাজিছে ব্যথা।
কোথা প্রশান্তি ? অনুভব করে দারুণ অস্থিরতা।

কুলু কুলু কুলু কল-ধ্বনিত এ নহে শান্ত নদী,
আপনার মনে একটানা স্রোত বহে নাকো নিরবধি।
এ যে সীমাহীন ক্ষুব্ধ সাগর, থামে না আন্দোলন,
বায়ুর আঘাতে বার বার বারি ক'রে ওঠে গর্জ্জন।

দেখিয়া শেখেনি, ঠেকিয়া শেখেনি ; কে তারে সভ্য কহে,
আদি-মানবের আদিমতা আজো রক্তে যাহার বহে।
বিচূর্ণ হ'ল—ছিল যাহা-কিছু সুকুমার সুন্দর।
শোনা যায় শুধু যুদ্ধের রথ-চক্রের ঘর্ঘর।

প্রলয়-সাধনা-মগ্ন মানুষ প্রীতির প্রার্থী নয়,
চাহে দুর্ব্বার বিপুল শক্তি, চাহে নির্ম্মম জয়,
চাহে প্রভুত্ব, একাধিপত্য, ক্ষমাহীন সংগ্রাম,
জীবনচিহ্ন-বিলুপ্তি—বুঝি শান্তি তাহার নাম।

প্রকৃতির স্নেহ, শোভা ও সুষমা মুগ্ধ হৃদয়ে ভরি'
জীবন-সাধনা করিতে হবে যে আবার নূতন করি।
কেন বিক্ষোভ ? কেন এ বিরোধ ? কেন এত সংঘাত ?
বন্ধু, নিজের অন্তর-পানে কর গো দৃষ্টিপাত।

আকাশে আকাশে সূর্য্য-তারায় যে সুর স্পন্দমান,
সেই সুরে আজ বাজিয়া উঠুক জীবনের নব গান।
যুগের সন্ধ্যা এসেছে—জান না ? এল সন্ধিক্ষণ,
আর দেরী নয় মনোমন্দিরে কর পূজা-আয়োজন।

কিন্নর-দেশ

শ্রীধর্ম্মদেব শাস্ত্রী
অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[কিন্নর বা কিন্নরভূমি সাহিত্যিকদের কল্পনার সৃষ্টি নহে। কিন্নর-দেশ কটি আছে—হিমালয়ের কোলে, তিব্বতের গায়ে। কিন্নর ও তিব্বতের যাগাযোগ অতি প্রাচীন ও অতি ঘনিষ্ঠ। আকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও াচারগত সাদৃশ্য এতদুভয়ে অনেকটা। কিন্নর-পল্লীতেও লামা আছে। ন্নরেরা অত্যন্ত গরীব হরিজনশ্রেণীর লোক—নিপীড়িত। তিব্বতে ম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এতাবৎ অজ্ঞাতপ্রায় কিন্নরদের কিন্নরভূমির কথা যে-কোন দিন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইয়া উঠিতে পারে। লেখক কিন্নরদের অর্দ্ধদেব বলিয়াছেন। এমনই অভিনব তাহাদের হিক সৌন্দর্য্য, আর অপূর্ব্ব তাহাদের মিহি কণ্ঠস্বর। পাঠক অজ্ঞাত- য় এই হিমাচলবাসী আদিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার, জীবিকার, মাজিক রীতি-নীতি ও আর্থিক অবস্থার চিত্র এই লেখায় পাইবেন।

লেখক এগার মাস আগে লিখিয়াছিলেন—"হিমাচলপ্রদেশের রাজ- নী শিমলার সহিত এই সীমান্তপ্রদেশের মোটর ও টেলিফোন দ্বারা যোগবিধান রাষ্ট্ররক্ষার দিক হইতেও প্রয়োজন।" আজ এই প্রয়োজন বিশেষ উপলব্ধ হইতেছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কামরূপের সহিত হাজার মাইল পশ্চিমে [অবস্থিত ন্নরের প্রাচীন রাজধানী কামরুর কোন সম্বন্ধ ছিল কি? আবার খিতে পাই চীনীতে বাণাসুরের দুর্গ ছিল—অনুবাদক।]

এক সময়ে লোকে মনে করিত হিমালয় অলঙ্ঘ্য। কিন্তু জ্ঞানের উন্নতির এই যুগে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গও আর অলঙ্ঘ্য নহে। জ্ঞানের প্রসাদে স্থান-কালের ব্যবধান আজ প্রায় মালুম হয়। কিন্তু কিন্নর-দেশ-যাত্রীর কাছে বিজ্ঞানের সব চমৎকারিতা কবারে ঝুটা মনে হয়। এ কথা যে বলিতেছি তাহার কারণ মলা হইতে ১৪০ মাইলের দূরত্ব, মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব অপেক্ষা কম মনে হয় নাই। কিন্নর প্রদেশের প্রধান স্থান চীনী মলা হইতে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৯৪৮ সালে শিমলা ও পূর্ব্ব-পঞ্জাবের রাজ্যগুলি লইয়া াচলপ্রদেশ গঠিত হয়। অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধান স রামপুর, বুশহর, সিরমোর, মণ্ডী ইত্যাদি। ভারত- কার হইতে ইহাদের ভাতা দেওয়া হয়। মণ্ডীর রাজা ার সকলের অপেক্ষা বেশী পান। এই প্রদেশের ক্ষেত্রফল ৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৩৫০০০। হিমাচল- দেশে বিলীন বুশহর রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৩৮০০ বর্গমাইল, কসংখ্যা ১১২০০০। বুশহরের কিন্নর-অধ্যুষিত ভূ-ভাগের ত্রকল ২০৬০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৩৫০০০। কিন্নর- দেশকে 'কুনৌর' এবং কিন্নরদের 'কুনৌরা' বলা হয়। মরা কিন্নর শব্দটি ব্যবহার করিব। কিন্নরের পূর্ব্ব-পশ্চিমে বত; পশ্চিমে কুল্লু (পঞ্জাব); উত্তরে—লাহোল; দক্ষিণে রামপুর রাজ্য। কিন্নর-দেশ ভারতের সীমান্তপ্রদেশ। ইহার সীমা তিব্বতের নগম্যা গ্রামে মিলিয়াছে। সংলগ্ন গ্রাম শিবকী তিব্বতের সীমায় অবস্থিত; এই স্থানে দুই দেশের সীমানা মিলিয়াছে। এই পথেই প্রাচীনকাল হইতে দুই দেশের আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে তিব্বত ও কিন্নরের মধ্যে খুব সাদৃশ্য বর্ত্তমান। কিন্তু

কিন্নর প্রদেশের অশোক আশ্রমের কর্ম্মীবৃন্দসহ
শ্রীধর্ম্মদেব শাস্ত্রী ও শ্রী আর. এস. মিশ্র

তিব্বতীয়গণের অপেক্ষা কিন্নরবাসীদের উন্নততর মনে হয়। এই সীমান্তপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বেশ বুঝা যায়। পান-আহারে, রীতিনীতিতে ও বেশভূষায় তিব্বতবাসীদের সহিত এদের অনেকটা মিল; সব চাইতে বড় ব্যবধান, তিব্বতে বর্ণ-ভেদ নাই, কিন্তু কিন্নরদের মধ্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তেমনি তিব্বতীয়দের অপেক্ষা কিন্নরদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধি সমধিক বিকশিত। তাহা প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের দান। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উহারই এক শাখা। আর উভয় ধর্ম্মের মূলসিদ্ধান্ত অহিংসার ও তপস্যার বিস্তার জনসাধারণ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদেই হইয়াছে।

দেব-জাতি কিন্নর

সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বাদ দিলে, কিন্নর ও তিব্বতীয়দের আকার-প্রকারের ভেদ সুস্পষ্ট। কিন্নরেরা দীর্ঘাকৃতি, তিব্বতীয়েরা অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়। আকৃতিতে কিন্নরেরা প্রাচীন আর্য্যদের মত। কালিদাস কিন্নরদের অশ্বমুখ বলিয়াছেন। তাহা ঠিকই মনে হয়? যে অর্থে বানর অর্দ্ধ-নর, কিন্নর সে অর্থে অর্দ্ধদেব। ইহারা মানুষ ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী। এত প্রাচীনত্ব, এরূপ অতিমানব দেহ-সৌষ্ঠব, এমন অপূর্ব্ব

কণ্ঠস্বর আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু দারিদ্র্য অপরিসীম। অথচ চুরি এখানে নাই-ই। রাস্তার ধারে গম কেহ ফেলিয়া গেলে, অপর কেহ তাহা ছোঁয়ও না। ব্যভিচার নাই বলিলেই হয়। বহু-পতি-প্রথা থাকিলেও কোন স্ত্রীলোক মদ্যপান বা অন্য নেশা করে না। এখানকার লোক কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকাল হইতে এই জাতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। পুরাণে, মহাভারতে, এমন কি উপনিষদে পর্য্যন্ত কিন্নরদের উল্লেখ আছে; প্রাচীন সাহিত্যকারেরা কিন্নরদের গন্ধর্ব, যক্ষ আদি

কিন্নর সেবাসঙ্ঘের দুই জন সভ্যসহ শ্রীধর্ম্মদেব শাস্ত্রী

দেবজাতিতে ভুক্ত করিয়াছেন; নৃত্য, গীত ও সঙ্গীতকলার সহিত তাহাদের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। চিরদিন ইহারা শান্তিপ্রিয় ও কলা-প্রেমিক। তাহাদের প্রাচীন রীতি-নীতি আজও সুরক্ষিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে আর্থিক ও মানসিক দৈন্য পরিব্যাপ্ত। জীবনধারণোপযোগী আহারও তাহাদের মিলে না। অনেককে আমরা জঙ্গলে ঘাস-পাতা খাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

কালসীতে যাতায়াত করে এমন বহু কিন্নর বন্ধু গত তিন বৎসর আমাকে চীনীতে যাইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। মিকাস কর্মচারী ঠক্কর বাপার পরামর্শে জগমলালভাই পরীখের সঙ্গে এবার কিন্নর-দেশে যাত্রা করি। শীতকালে কিন্নরেরা ভেড়া-ছাগল লইয়া নীচে চলিয়া আসে। যে সব স্থানে তাহারা আসে তন্মধ্যে কালসী প্রধান। কিন্নর-কালসীর এই সম্বন্ধ পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কালসী এক সময়ে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আর সংস্কৃতির দিক হইতে, ইহারই নদীর ধারে মহারাজ অশোকের চৌদ্দ শিলা-লেখ বিদ্যমান। তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন।

গত দুই বৎসর এক আদিবাসী হরিজন কিন্নর-দম্পতি শীতকালে আশ্রমে আসিয়া থাকিতেছে। তাহাদের নিকট হইতে আশ্রমবাসীরা নিরলস কর্মের মূক প্রেরণা পাইয়াছে। কিন্নরেরা নিয়ত এখানে যাতায়াত করে। তাহাদের দেখিয়া পর্ব্বতবাসী সাদাসিধা মেষ-ছাগ পালক কিন্নরদের স্মৃতি সদা মনে জাগরিত হয়। ভ্রমণকালে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এখানে দিতেছি।

এই হতভাগ্য প্রদেশের দিকে যদি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ত আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। এক সময়ে যে জাতি উন্নত ছিল আজ তাহারা অনুন্নত—অবস্থা তাহাদের শোচনীয়। অন্য সব আদিবাসীর মত আদিবাসী বলিয়া গণ্য হওয়ার ও আদিবাসীদের বিকাশের নিমিত্ত যে সব সুযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পাওয়ার পূর্ণ দাবি তাহাদেরও আছে। স্বাধীন ভারতের সরকার ও জনসাধারণের নিকট হইতে এ দিকে অনেকটা আশা করা যাইতে পারে।

বেশভূষা

পশম উৎপাদন ইহাদের জীবিকা। পরিধেয়ও ইহাদের পশমে তৈরী। ছোট বড় সকলের হাতেই কাঠের তকলি; অবসর পাইলেই তাহাতে তাহারা পশমের সুতা কাটে; পায়ে ক্রোশের পর ক্রোশ চলিতেছে, আর হাতে তকলি ঘুরাইতেছে। মেষ-পালন প্রধান ব্যবসায়। নরনারী উভয়েই কেল্ট ক্যাপের মত এক প্রকার টুপি পরে। টুপিতে একটি পট্টি সংলগ্ন—শীতকালে তাহা দিয়া কান ঢাকে। কিন্নরীরা বেণী বাঁধে। বেণী টুপির নীচ হইতে ঝুলিয়া থাকে। পর্দা যে কি তাহা তাহারা জানে না। স্ত্রীলোকেরা কম্বলের মত মোটা পশমী শাড়ী পরে। অভাবে পড়িলে তাহা ধুইয়া কম্বল রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। মেয়েদের পরিধেয় বলিতে বুঝায়, দোড়ু (শাড়ী), টেপা (টুপি) ও চোলী (হাতাবিহীন ব্লাউজ বিশেষ)। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ স্থলে শাড়ী দিয়াই চোলীর কাজ সারিয়া লয়। পুরুষেরা পশমী পায়জামা ও আচকান পরিধান করে—নীচে কোন কোর্ত্তা থাকে না। তাহারা পশমে তৈরি জুতা ব্যবহার করে—নাম স্পল্‌। আচকান (ছুওয়া) এখানকার প্রাচীন বেশ। বরফের উপর দিয়া চলার জন্য যে জুতা তাহারা ব্যবহার করে তাহা ছাগলের লোমে তৈরি হয়। স্ত্রীলোকেরা কানে রৌপ্যভূষণ ধারণ করে—দেখিতে কাঁটার মত। ধনীদের অলঙ্কার সোনার তৈরী, গরীবদের নিকৃষ্ট ধাতুতে।

ভাষা ও সাহিত্য

কিন্নরদের ভাষা স্বতন্ত্র—নাম হমস্কত। লিপি ভিন্ন নহে। সাহিত্য বলিতে কিছু নাই। লোকগীতি খুবই সুন্দর। নাগরী লিপির প্রচলন হইতেছে। কয়েকটি শব্দ:

কিন্নর	হিন্দী	কিন্নর	হিন্দী
তী	পানী	মংগ	খাব
কিম্	মকান	দাউচ	বহন
বোলংগ	পেড়	তেতে	দাদা
রঙী	ঘোড়া	অমা, ওবু	মাতা

কিন্নরদের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই। সংস্কারাদি নিজেরাই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। সংস্কার অনুষ্ঠানে অগ্নির স্থান নাই। ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের গুরু লামারাও সংস্কার নিষ্পন্ন করাইয়া থাকে। কিন্নর-গ্রামেও লামা আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠভূমি

কিন্নরদের পুরাতন রাজধানী কামরু। যখন বুশহরের রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন তথায় ঠাকুর রাজত্ব করিতেন। এখানে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কেল্লা আছে। আজীবন কয়েদীদের সেখানে রাখা হইত। চারিদিকে বন্ধ প্রাচীর; দরজা একটিও নাই। দড়ি দিয়া কয়েদীদের ভিতরে নামাইয়া দেওয়া হইত। খাদ্যও ঐ ভাবেই দেওয়া হইত। ভিতরে যে যাইত, জীবনের জন্য যাইত। 'চীনী' কিন্নর-প্রদেশের মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান ও কেন্দ্র। এখানে বাণাসুরের দুর্গ বর্ত্তমান। চীনী হইতে আঠার মাইল দূরে শতদ্রু-তীরে মোরংগ নামক স্থানে পাণ্ডবদের একটি দুর্গ আছে: লোকে বলে অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা এক রাত্রে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম ৩২ মাইল দূরে লামরংগে এইরূপ আর একটি দুর্গ আছে।

পাণ্ডবদের বাসর-গীত বিবাহ-রাত্রে কিন্নরেরা গাহিয়া থাকে। লোকে বলে এখানকার বহুপতি-প্রথা পাণ্ডব-সংস্কৃতিরই ফল।

'দেবতার' গোলামি

উত্তরাখণ্ডকে লোকে দেবভূমি বলে। 'কিন্নরে'ও এই কথার ইঙ্গিত মেলে—অসংখ্য দেবদেবীর পূজা তার সাক্ষ্য। প্রত্যেক গ্রামের দেবতা ভিন্ন। আর তাদের নামে সম্পত্তি ও জায়গীর রহিয়াছে। পাছে দেবতা বিরূপ হন এই আশঙ্কায় লোকে সদা ভটস্থ। দেবতার আধিপত্য সর্ব্বক্ষেত্রে। দেবতাদের দাসত্বে কিন্নররা আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। কোনও স্কুলের কথাপ্রসঙ্গে জনৈক শিক্ষক আমাকে কোনও দেবতাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে আমি বলি—"পরমাত্মাই এক মাত্র দেবতা, আর সবই অর্থোপার্জ্জনের বাহানা।" এ কথায় লোকটি বলিয়া বসিল—'দেবতার বিরুদ্ধে এখানে বলা চলবে না। সে অধিকার কারও নেই।' এক গ্রামে দেখিলাম, দেবতা পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া এদিক-ওদিক হেলিতে দুলিতেছেন। আর দেবতার এদিক-ওদিক হেলা দোলাকে ভক্তেরা নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। কোঠীর দেবী হইতেছেন মুখ্য দেবতা। বদরীনাথ, মহেশ্বর, নাগল আদিকেও প্রধান স্থান দেওয়া হয়। জনশ্রুতি, সরহান বাণাসুরের রাজধানী ছিল।

পিতার মৃত্যু হইলে কোন পরিবারের ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া ঝগড়া বাধে। কোঠীর দেবী নাকি দুয়া-দুয়ি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া বিবাদের রফা-নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এখানকার দেব-দেবী বীরের রূপে পরিকল্পিত। সব দেবতার কাছেই মদ্য আর মাংস নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধমন্দিরের দেবতারাও বাদ যান না; তাঁহাদের কাছে পর্য্যন্ত মাংস ভোগ চড়ান হয়। দুই দেবতার মধ্যে এইটুকুই

একটি আশ্রম বিদ্যালয়ের কিন্নর বালক-বালিকাবৃন্দ

মাত্র পার্থক্য যে বৌদ্ধ-দেবতা মেলা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মন্দিরের বাহিরে যান না। এই দেবতার নাম ছোকী-ই-মোজ—রক্ষক দেব। চীনীর বৌদ্ধ মন্দিরে মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর বিশাল মূর্ত্তি আছে। ভগবান বুদ্ধের রঙীন চিত্র দিব্য সুন্দর—শিল্পকলার উত্তম নিদর্শন। ভূত-প্রেতের হাত হইতে রক্ষার জন্যও অনেক মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়াছে। অনাবৃষ্টি হইলে দেবতাদের সন্তোষ বিধানের জন্য লোকে উদ্বৃত্ত অন্ন (ধান বা গম) পর্য্যন্ত পূজারীদের দিয়া দেয়। সরহানের ভগবতী-মন্দিরে প্রত্যহ দশ-বারটা ছাগ ও ছাগ-শিশু বলি দেওয়া হয়। ঐ মন্দির হইতে প্রায় দুই মণ রূপা ও পঞ্চাশ তোলা সোনার তিনটি ছাতা চুরি গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। ইহা হইতে মন্দিরের সম্পত্তির পরিচয় মেলে। মন্দিরের খাজানা নাই। মন্দিরের সম্পত্তি হইতে অনায়াসে বহু স্কুল চলিতে পারে। এখানে হরিজনদের ছায়া পর্য্যন্ত পড়িতে পায় না। দত্তনগর গ্রামের মন্দিরের কার্য্যকরী সমিতিতে দুই জন সংস্কারপন্থী যুবক আছে। তাই তথায় একটি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। উপরেই বলিয়াছি, মন্দির মাত্রেরই প্রভূত সম্পত্তি। এখানকার সার্ব্বজনীন মন্দিরগুলি এখন হিমাচল-প্রদেশ-সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। সরকার ইচ্ছা করিলে এদিকে অবশ্যই কাজ করিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা নিঃসন্দেহ পাওয়া যাইবে। পশু-বলি বন্ধ হওয়া ও হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার স্বীকার করা আশু কর্ত্তব্য। দেব-দেবতা স্বার্থপর লোকের উদরপূর্ত্তির উপায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার সংস্কার হওয়া দরকার। সাধারণের মনের পরিবর্ত্তন-সাধন কঠিন কাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া কিন্নরদের উন্নতি হইবার নহে। সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কারের ইহা ব্যাপক ক্ষেত্র। সংস্কারের জন্য কিন্নরেরা

উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হইবে। ইহারা দেবতা ও গোমস্তাদের মাকড়সা-জালে আটক পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন জাতির বিকাশ-কল্পে আধ্যাত্মিক দিক হইতে সবিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

বহুপতি-প্রথা

পরিবার-প্রথার বিকাশক্রমে এক সময়ে স্ত্রী পরিবারভুক্ত সব ভাইদের পত্নীরূপে আসিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই বহুপতি-প্রথার সূত্রপাত হয়। পাণ্ডবদের সময়ে হয় তো তাহা সাধারণ প্রথা ছিল। আজও যেখানে এই প্রথা প্রচলিত সেখানে লোকে লোকগাথায় আদরপূর্ব্বক পাণ্ডবদের কথা স্মরণ করিয়া থাকে।

শিমলা হইতে রওনা হইয়া আমরা কুমারসেনে পৌঁছি। তার পরে কোঠগড় রামপুরে যাই। এই প্রথা তথায় নাই। কিন্তু সেখান হইতে নয় মাইল দূরে গোরা নামক স্থানে রাজপুতদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা বর্ত্তমান; হরিজনদের মধ্যে নাই। আশ্চর্য্যের ব্যাপার। জৌনসারবাওর ও রওয়াই-এ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে, তথায় এই প্রথা সকল জাতির মধ্যেই বর্ত্তমান। এ স্থানের (গোরার) আশপাশে চাষ-আবাদের জমি নাই, আর্থিক স্বাতন্ত্র্যও লোকের নাই তাই কোলী আদি হরিজনেরা সম্মিলিত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। যাহাদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা প্রচলিত তাহাদের চিন্তাধারা এইরূপ: ভাইয়েরা পৃথক পৃথক বিবাহ করিলে পৃথক ভাবে থাকিতে আরম্ভ করিবে, জমি-জমা ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া যাইবে, আয় কমিবে। কঠোর ছন্নছাড়া পাহাড়ী জীবন সুগম করার জন্ত বহুপতি-প্রথা প্রয়োজন একথা তাহারা মনে করে। শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার হওয়ার পূর্ব্বে এই প্রথার অবসান ঘটাইলে কিন্নরদের আর্থিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবে, আমারও ইহাই বিশ্বাস। শিক্ষা পাইলে তাহারা বুঝিবে, এক পরিবারে এক অন্নে থাকিতে হইলে সম্মিলিত বিবাহ যে করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এখানে এই প্রথার অর্থ ইহা নয় যে, কোন স্ত্রীর সব পতি সকল সময়েই বাড়ীতে থাকে। ভেড়া-ছাগল চরাইবার জন্ত তাহাদের আলাদা আলাদা থাকিতে হয়। সকলে যখন একত্র হয় তখন গোরা নামক স্থানের প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ভাই ক্রম-অনুসারে দুই দিন করিয়া পায়। দুই ভাইয়ের এক পত্নীও থাকে। দুইয়ের অধিক ভাইদের পৃথক পত্নীদের সহিত ভাইদের সহবাস তেমন নিন্দার নহে।

কিন্নর-দেশে এই প্রথা রীতিস্বীকৃত ও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সব ভাইয়ের একই পত্নী—আট নয় ভাই হইলেও। পত্নীর উপরে সকলের সমান অধিকার। বিবাহও এক সঙ্গেই হয়। জৌনসারবাওর ও রওয়াই-এ পত্নীর উপর জ্যেষ্ঠের অধিকার বেশী। ফল তার ভাল নহে। কিন্নরে এইরূপ নহে; এখানে স্ত্রীর ঘর পৃথক এবং যখন কোন পতি ভিতরে যায় তখন দরজায় টুপি রাখিয়া যায়। ঐ নিদর্শন দেখিলে অপর কোন ভাই-স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে না। ইহাই এখানকার ব্যবস্থা। অন্যত্র এই ব্যবস্থা নাই। জৌনসারবাওর ইত্যাদি স্থানে যে ভয়ঙ্কর রোগ দেখা যায় তার কারণ এই ব্যবস্থার অভাব। কিন্নরে এই ব্যাধি নাই।

বিবাহ-পদ্ধতি

বিবাহ বেশী বয়সে হইয়া থাকে। সুরক্ষিত হইলে কন্যা আঠার বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী থাকিতে পারে। ব্যভিচার নগণ্য। বিবাহ মাতাপিতার সম্মতিক্রমে হয়। পরস্পরের সম্মতিক্রমেও কখনও কখনও হয়। পিতামাতার অনুমোদিত বিবাহে অধিক ব্যয় হয়। তাই যে যুবকের অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই সে সোজা যুবতীর সহিত কথা বলিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। মাতাপিতা সব ছেলের একটিই মাত্র বিবাহ দেয়। এই নিয়ম এখন কতকটা শিথিল হইয়াছে।

'বধূ'-যাত্রার রীতি

উরণীর (শিমলা হইতে এই গ্রাম ১২৫ মাইল দূরে) ঠাকুর সিং নামক রাজপুত জমিদারের বিবাহ দশ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে হয়। কনে ও বরের বয়স যথাক্রমে কুড়ি ও একুশ ছিল। পিতা সম্বন্ধ স্থির করে। বরপক্ষ যখন কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কন্যাপক্ষ টীকা (তিলক) বাবদ এক টাকা আদায় করিল। কনেকে লইয়া লাড়া (বর) যখন নিজ বাড়ী রওনা হইবে তখন কনে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাশুড়ীকে কুড়ি টাকা দক্ষিণা দিতে হইল, আর পিতার কাছ হইতে কনেকে ছাড়াইতে আরও কুড়ি। শালী এবং শ্যালক পত্নীকেও দশ দশ টাকা অনুরূপ দক্ষিণা দিতে হইল। জামাতার কাছ হইতে টাকা আদায়ের এই এক রীতি। অগ্নি, সপ্তপদী ইত্যাদি সংস্কার-অনুষ্ঠান বিবাহে নাই। বরপক্ষে ছিল চার, আর কনেকে লইয়া ফেরার সময় সঙ্গে আসিল আশী। চার বেলা তাহাদের আদর-সমাদর করিতে হইল। কিছু আয়োজন ত পূর্ব্বেই ছিল। তার উপর আরও আটটা ভেড়া ও তিনটা ছাগ কাটা হইল। বধূযাত্রা এমনই ব্যয়সাপেক্ষ।

ঘরে আসিয়া বধূ অন্ত পতিদের তিলক পরায়। তার মানে সে এখন তাহাদেরও পতিত্বে বরণ করিল। বিবাহের জন্ত কেবল বড় ভাই-ই কনের বাড়ী যায়। বিবাহ বস্তুতঃ কনের বাড়ীতে হয় না, হয় বরের বাড়ীতে। এইরূপ বিবাহে মদ্য-মাংসের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়। ধূপ জ্বালান আর তিলক ছাড়া বিবাহের অন্ত কোন সংস্কার পালন করা হয় না।

পিঠের বোঝা

ট্রংডার নিকটে ঘরাট (জল স্রোত চালিত জাঁতা) আছে। আমাদের আগে আগে এক যুবক-যুবতী চলিয়াছে। যুবতীর পিঠে গমের বোঝা, যুবক খালি হাতে। ঘরাটে পৌঁছিয়া যুবতী ভিতরে গেল; যুবক হুঁকা টানিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম:

'এ কে?'

সে কহিল—'স্ত্রী'

—তোমার বয়স?

—বলতে পারি না, কুড়ি হবে।

—তোমরা ক' ভাই?

—পাঁচ।

—পাঁচ ভাইয়ের ক' স্ত্রী?

—এক জনই।

—জাতে তোমরা?

—লোহার।

—তোমার স্ত্রী ঘরাট চালাচ্ছে। পিঠে যে গম বয়ে এনেছে সে ত নিজ চক্ষেই দেখেছি। সাহায্য বুঝি তুমি একটুও কর না? তামাক টান্‌তে বসে গেছ।

—আমাদের পাহাড় অঞ্চলে মেয়েরাই সব কাজ করে। আমি বোঝা বইতে যাব কেন?

দেখিলাম যুবতীটি শীলবতী ও পরিশ্রমী। মূক ভাষায় সে যেন বলিতেছিল—'পিঠের বোঝা যত দিন না আমাদের হাল্‌কা হবে তত দিন স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের নাই।'

স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য ও 'জোমো'

এখানে বহুপত্নী-প্রথা নাই। কচিৎ কোথাও কোন পুরুষ যে একাধিক বিবাহ কোনক্রমেই করে না তাহা নহে। কিন্তু তাহা একান্তই বিরল। ফলে শত শত মেয়ে অবিবাহিত থাকিয়া যায়—আজীবন কুমারীও থাকে। এইরূপ অবিবাহিত মেয়েরা অধিকাংশ স্থলে লামাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'জোমো' হয়। বাংগতুর পরের চড়াইয়ে দুইটি 'জোমো' স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী বলিতে পারিত। মস্তক দুই জনেরই মুণ্ডিত। এক জনের পরিধানে লাল বস্ত্র। উভয়ের গলাতেই মালা। টুপির পরিবর্ত্তে মাথায় রুমাল জড়ানো। স্বাভাবিক বহুপতি-প্রথার দরুন বাধ্য হইয়া এদের 'জোমো' হইতে হয়; আর দুর্ব্বল এবং কম সুন্দরী হইলেও। তাহাদের কতক ত স্বভাবতঃই ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া থাকে—তাহারা স্বেচ্ছায় 'জোমো' হয়। 'জোমো' হওয়ার পরে পিতৃগৃহেই তাহারা থাকে। লামাদের কাছে তিব্বতী ভাষা শিখিয়া, ঐ ভাষায় একখানি বই রাখে ও তার পূজা করে।

বিনা পয়সার মজুর

'জোমো' হইয়া দীক্ষা গ্রহণের পরেও কুমারীরা মাতা-পিতার কাছেই থাকে—বাড়ীর কাজ করে। মাতাপিতা ইহাতে খুবই খুশি, কারণ 'জোমো' জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় খাটিবে।

বহুপত্নী-প্রথা

ভাই যখন পৃথক হয়, গৃহে 'জোমো' না থাকিলে, চাষ-বাসের জন্ত সে আর একটি বিবাহ করে। কিন্তু ইহা নিয়মের

একটি জোমো স্ত্রীলোক

ব্যতিক্রমের মতই। বহুপত্নী-প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। চীনী যাওয়ার পথে সড়কের উপরে মেষ-রক্ষকদের তাঁবু সারি সারি। তাঁবুর এক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'না, এখনও হয় নি।' তাহার কণ্ঠস্বরে ও চেহারায় বেদনা ফুটিয়া উঠিল। পাশে তার ভাই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—'আমাদের পাহাড়ী মেয়েদের বিয়ে চব্বিশের আগে হয় না।' তরুণীর বয়স কুড়ির কাছাকাছি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বহুপতি-প্রথা যেমন কিন্নর-দেশে প্রচলিত, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদও। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পতি-পত্নী উভয়েরই আছে। বিচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহারা নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া লয়। বিচ্ছেদের অনুমতি লইতে হয় স্ত্রীর পিতার কাছ হইতে। অতএব মেয়ে যখন বাপের বাড়ী যায় তখন তালাক হয়। কেহ যদি পতিগৃহ হইতে কোন স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লইয়া যায় ত তাহাকে পূর্ব্বপতির প্রার্থিত টাকা দিতে হয়—দুই শতও হইতে পারে। তালাক মাতাপিতার অনুমতিতে হইলে লাগে পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা মাত্র।

স্ত্রী বিক্রয়ের বস্ত

ভারতীয় সংবিধানের ২৩: ১ অনুচ্ছেদে আছে: 'মানব-পণ্য (স্ত্রী ও বালকের ক্রয়-বিক্রয়), বেগার খাটান, অথবা

তবিধ জোর-জবরদস্তি শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করা যাইতেছে। এই বিধির উল্লঙ্ঘন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত ও আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।'

মনে হয় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের প্রতি হিমাচল প্রদেশ-সরকারের দৃষ্টি আজও আকৃষ্ট হয় নাই। আজও সেখানে স্ত্রী-বিক্রয় এবং বেগার খাটানো ইত্যাদি সবই চলিতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য টাকা আদায় স্ত্রী-বিক্রয়েরই সামিল। এ কথা যখন লিখিতেছি তার মাত্র দুই দিন আগে আশ্রমের সম্মুখ দিয়া ক্রোন্দমানা একটি মেয়েকে পুলিস ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট ছিল এই : তার একাধিক পতি থানায় অভিযোগ করিয়াছে,—সে না বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। তরুণীর পতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্যাপার কি ?' উত্তর পাইলাম :

'স্ত্রী অপর কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাই বাপের বাড়ী চলে গেছে।'

'তোমরা তাকে রাখতে চাও, এই না ?'

'না।'

'তবে কি চাও ?'

'যার কাছে এ যেতে চায় তার কাছ থেকে আমাদের টাকা নিয়ে দিক ; ব্যস্, এই আমাদের কথা।

'কত টাকা ?'

'শাস্ত্রীজী, আপনি ত জানেনই যে আজকাল সব জিনিষই মাগ্‌গি ; ছোট একটা ছাগী তা-ও এক শ' টাকার কম মেলে না। বিয়েতেও খরচ হয়েছে। টাকার অঙ্কের কথা ধরতে যান ত এই স্ত্রীর জন্ত আমাদের দাবি কম পক্ষে দু' হাজার।

'স্ত্রী ত গরু-ঘোষ নয় যে এরূপ দাম তুমি করছ ? বিয়েতে খরচ হয়েছে ত তার জন্তে স্ত্রী দায়ী কেন হবে ? তাল, সে ত তোমাদের ঘরে অনেক দিন ছিল। সে তোমাদের কাজ করেছে। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। মূল্যই যদি ধার্য করবে ত এ সবের মূল্যও তোমায় ধরতে হবে।'

'শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি নূতন আইনের কথা বলছেন। আমাদের পাহাড়ে চিরকাল যে আইন চলে এসেছে তাই চলবে। স্ত্রীদের কাছ থেকে যদি এরূপ আদায় না করা হয় ত তারা স্বাধীন হয়ে যাবে। একের অধিক পতির কাছে থেকেও স্ত্রী আজ তালাক চাচ্ছে। আপনি ত সবই জানেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্ত এখন মেয়ে ও ঘোষের দাম বড্ড আক্রা।'

এ কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার কানে ধ্বনিত হইতেছে 'মেয়ে ও ঘোষের দাম বড্ড আক্রা।" ইহা স্ত্রী-বিক্রয় নয় ত কি ? স্ত্রীদের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিতেই হইবে ; স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে রচিত নূতন সংবিধানোক্ত সুবিধাও এদের দিতে হইবে।

হিমাচল প্রদেশ প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রশাসিত স্থান। অতএব এই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারেরই দৃষ্টি দিতে হইবে। নূতন বিধানে দেশের পুরানো আইন-কানুনের রদবদল করা হইয়াছে। তদ্রূপ পুরাতন দেশীয় রীতি-প্রথারও আবশ্যিক পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই সব প্রথা আদালতে আইনের মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। যে সব স্থানীয় প্রথা নূতন সংবিধানের বিরোধী যাহাতে সেগুলি আদালতে গ্রাহ্য না হয়, অন্ততঃপক্ষে এ নির্দ্দেশ ত আদালতগুলিকে দেওয়া চাই-ই।

অভিশপ্ত নারী

অর্থোপার্জ্জনের উপায় হিসাবে কিন্নর-দেশে নারীর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার নিজের স্থান নেহাতই হীন। পুরুষ লাঙ্গল ধরে ও কুড়াল চালায়। ব্যস্, ইহার অধিক কিছু সে করে না। সব কাজ স্ত্রীলোকদেরই করিতে হয়। ক্ষেতে জল ধরার পালা যদি রাত্রিতেও পড়ে ত সারা রাত জাগিয়া স্ত্রীদেরই সে কাজ করিতে হয়। এ কাজটাও মেয়েদেরই ! হুঁকা টানিতেই পুরুষেরা সমধিক ওস্তাদ। যে পুরুষ নিজে ক্ষেতে কাজ করে, লোকে তাকে কৃপার চক্ষে দেখে—ভাবটা এই : আহা ! গরীব বেচারা কি করে ! ঘরে ত তার মেয়েমানুষ নাই, তাই নিজ হাতেই করতে হয়।' সকাল পাঁচটা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও স্ত্রীর নিস্তার নাই। রাত্রে নিজ ঘরে একাধিক পতির সন্তোষবিধান তাহাকে করিতে হয়।—যে নারী এত কাজ করে, যাহার আর্থিক গুরুত্ব এত বেশী, সে স্বয়ং নিঃস্ব। ভাল-মন্দ কোন রকমের ধাত্রী এখানে নাই যে প্রসব-কালে সহায়তা পাইবে। সুতরাং প্রসব-কালে বহু স্ত্রীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে।
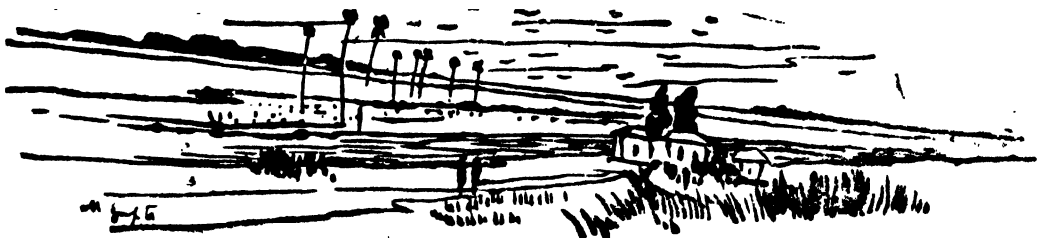
কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা সত্যই আত্মবিস্মৃত। শুধু তাই নয়, ভুলে যাওয়া আমাদের যেন স্বভাব। নইলে মাত্র বারো বছর পূর্ব্বে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মারা গেছেন, এর মধ্যেই আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। অথচ তিনি ছিলেন বাংলার একজন খাঁটি কবি।

কবি ভুজঙ্গধরের পিতৃনিবাস চব্বিশ-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটি গ্রামে। ১৮৭২ সনের আগষ্ট মাসে পিতার কর্ম্মস্থান মেদিনীপুরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে পুরীতে। পুরীর সমুদ্র-সৈকতেই ভুজঙ্গধরের কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হয়। এগার-বারো বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।

পুরী থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। তারপর কল্‌কাতায় আসেন কলেজে পড়তে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজ কবিদের কাব্যের প্রতি তাঁর মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। শেলী, বায়রণ, কীট্‌স ছিলেন তাঁর নিত্য-সঙ্গী। তাঁর বহু কবিতার রচনাকাল ১৮৯৩ সন। এই সনেই ভুজঙ্গধর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর বছর ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাস করেন।

ভুজঙ্গধর আইন পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে ওকালতী করবার জন্য ১৮৯৭ সনে জলপাইগুড়িতে যান। সেখানে ছিলেন ১৯০০ সন পর্য্যন্ত। ভুজঙ্গধরের কবি-মানস কিন্তু সর্ব্বত্রই সক্রিয় ছিল। এই জলপাইগুড়িতে বসেই শশীভূষণ নিয়োগীর সহায়তায় "ত্রিস্রোতা" নামক একখানা মাসিক পত্রিকা তিনি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেছিলেন। এর পর তিন মাস মাত্র হাজারিবাগে ছিলেন, ওকালতীতে সেখানে সুবিধা হয় কিনা পরখ করবার জন্যে। এর পরেই তিনি নিজ মহকুমা বসিরহাটে চলে আসেন।

বসিরহাটে ভুজঙ্গধর ওকালতী আরম্ভ করলেন। তিনি যদি শুধু ওকালতীই করতেন, ধনৈশ্বর্য্যে অন্য দশ জনের মত তথাকথিত বড়লোক হতে পারতেন। কিন্তু এতে তাঁর মন উঠল না। কাব্যলক্ষ্মীর সেবাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পল্লী-জননী তাঁর সমগ্র মন-প্রাণ জুড়ে ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বসিরহাটেরই স্থায়ী বাসিন্দা রইলেন। দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্য শেষ সময়ে মাস দুয়েক তাঁকে কল্‌কাতায় থাকতে হয়। ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হলেই তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবেন এই ছিল তাঁর কামনা। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর অসুখের আরোগ্য হ'ল না। ১৯৪০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ভুজঙ্গধর বসিরহাটে বাস করেছিলেন। তিনি এখানে থেকেই বরাবর সার্থকতাবে কাব্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত নারায়ণে, এবং মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতী, হিন্দু পত্রিকা ও অন্যান্য বহু খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সন থেকে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি অবিরত কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত কবিতা ও কাব্য-সমূহের কিয়দংশ মাত্র পুস্তকে গ্রথিত হয়েছে।

কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

বসিরহাট ক্রমে বাণী-চর্চ্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভুজঙ্গধর 'বাণী-সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জলধর সেন, নিখিলনাথ রায়, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী ও ঔপন্যাসিক বসিরহাটে গিয়েছেন। ভুজঙ্গধরই ছিলেন তাঁদের প্রধান আকর্ষণ। তিনি 'পল্লীবাণী' নামে একখানা মাসিক পত্রও অতি যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর ধরে সম্পাদনা করেন। পল্লীবাসীর আধি-ব্যাধি, আশা-আশঙ্কা, সুখ-দুঃখের কথা "পল্লীবাণী" দিকে দিকে প্রচার করত।

ভুজঙ্গধর পণ্ডিত-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রীতিলাভ করেন বিশেষভাবে। তাঁর আধুনিক বৈষ্ণব কবিতাবলী দেশবন্ধুর বড়ই প্রিয় ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে ভুজঙ্গধরের পাণ্ডিত্য দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর "গীতা"র (পদ্যানুবাদ, প্রকাশকাল ১৩৪৩) ভূমিকাই শুধু লেখেন নি, এর পূর্ব্বে

১৩২০ সালে প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক 'ছায়াপথে'র ভূমিকায় তিনি ভুজঙ্গধরের কবি-প্রতিভারও প্রশস্তি গেয়েছিলেন।

এবার আমরা তাঁর কবিতাবলীর আলোচনায় আসি। ভুজঙ্গধরের কবিতাকে আমরা প্রধানতঃ দু' ভাগে ভাগ করতে পারি—মৌলিক কবিতা এবং অনুবাদ কবিতা। আগেই বলা হয়েছে, যেমন ইংরেজী তেমনি সংস্কৃত সাহিত্য তিনি গভীর ভাবে অনুশীলন করেছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে, অনুবাদের ভিতর দিয়ে এর সারবস্তু সরস করে পরিবেশন করতে তিনি সমর্থ হন।

ভুজঙ্গধর কবিতা রচনা করতে গিয়ে শিশু ও কিশোরদের ভোলেন নি। আমরা স্কুলে পাঠকালে একবার এবং কলেজে দ্বিতীয়বার গ্রে'র 'এলিজি' পড়েছি। ভুজঙ্গধর এর যে রসসিক্ত অনুবাদ "পল্লীসমাধি-গাথা"য় (১৩২৫) দিয়েছেন তা সত্যই অনুপম। এর দুটি স্তবক মাত্র আপনাদের শোনাব। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।—

"কত নিরমল রতন উজল অগাধ অতল আঁধারময়
রহে জলধির গোপন গরভে লোক-লোচনের দূরে,
নয়ন আড়ালে ফুটিয়া বিরলে মধুভরা কত কুসুমচয়,
বিলায় সুরভি উদাস পবনে বিফল মরুর পুরে।

হেথা চিরতরে হয়ত বা কোন ঘুমাল গ্রাম্য শিবাজীবীর
অসম যাহার দমিতে ক্ষেত্র-স্বামীর অত্যাচার,
হেথায় মৌনী অধ্যাত্ম-নামা কবি কালিদাস রাখিল শির,
স্বজন-শোণিত-ক্ষরণ-মুক্ত প্রতাপাদিত্য আর। (পৃ. ৪)

এই অনুবাদে 'ক্রমওয়েলে'র বদলে 'শিবাজী,' 'মিল্টনে'র পরিবর্তে 'কালিদাস' ও হ্যাম্পডেনের স্থলে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ লক্ষণীয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকেও তিনি বিস্তর পদ্যানুবাদ করেছিলেন, এর ভিতরে মাত্র 'সতী' (১৩৩৪), 'গীতা' (১৩৪৩) ও চণ্ডী (১৩৪৯) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ 'গীতা'র ভূমিকায় বলেছেন, ভুজঙ্গধর আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এর ভাল-মন্দ দু'দিকই আছে। কিন্তু ভুজঙ্গধরের অনুবাদ, নিজে কবি বলে, বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। শারদীয়া সমাগতা। ভুজঙ্গধর-কৃত চণ্ডীর অনুবাদ থেকে একটি স্তবক মাত্র আপনাদের শোনাচ্ছি:

মঙ্গল যাহা তারি মঙ্গল-রূপ
কল্যাণি! তব কল্যাণতম রূপ
পরম শান্তি অহর তুমি শিবা
নিশান্ত রূপা তুমি আনন্দ দিবা।
অর্থ-সাধিকা অমৃতের তুমি দাত্রী
তুমি মা জীবের পরম শরণ পাত্রী।
তুমি মা গৌরী জ্যোতির তুমি মা জ্যোতি
ত্রিলোক ত্রিগুণ ত্রিদেবের তুমি গতি।
জয় জয় ত্রিনয়নী!
নমি তোমা নারায়ণি! (পৃ. ১৫৯)

ভুজঙ্গধরের মৌলিক কবিতার মধ্যে 'শিশির' (১৩১৮) কিশোরদের জন্য রচিত। 'মঞ্জীর' (?), 'গোধূলি' (১৩১৮) 'ছায়াপথ' (১৩২০), 'রাকা' (১৩২৩) তাঁর কয়েকখানি প্রসিদ্ধ কবিতা পুস্তক। শেষ পুস্তকের নামানুসারে তিনি 'রাকার কবি' নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। 'মঞ্জীর'-এর কবিতানিচয় অধিকাংশই ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ সনের ভেতরে রচিত। বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে ৯।৩।৯৩ তারিখে রচিত 'মাধবীলতা' শীর্ষক কবিতার প্রথম ক'পংক্তি এই:

"কোমল ও তনু দিয়ে জড়া'য়ে
সমস্ত শরীরখানি নিম্ব-বিটপীর
তিক্ত প্রাণ সিক্ত কর প্রেমরস ঢালি'
কে তুমি গো প্রেমময়ি?" (পৃ. ১৩৬)

আবার 'গোধূলি' কাব্যে 'শরৎ' শীর্ষক কবিতায় পাই:

আকুল করিছে মহী সুন্দর পবন বহি'
পুষ্পভার-নত শাখে মধুপ-ঝঙ্কার,
মধুর পিয়াসে অলি ফুটাইছে ফুল-কলি,
প্রিয়া-বিরহিত চিতে জনমে বিকার।

মেঘ-গুণ্ঠ মুক্ত করি' চন্দ্রমুখী বিভাবরী
জোছনা-দুকূল পরি' করে ঝলমল,
কণ্ঠেতে তারার মালা মরি কি রূপসী বালা
বিকচ যৌবন-রসে করে টল টল। (পৃ. ৭৮)

'রাকা'র কবি-চিত্ত যেন সকল দিকেই পরিণতি লাভ করেছে। অধ্যাত্ম-চিন্তা তাঁর মনকে সাধারণের অনধিগম্য স্তরে নিয়ে যায়। আবার বৈষ্ণব সাহিত্যও তাঁকে দীন হতে দীনতর করে তোলে। তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসা বেড়ে চলে। এখানে এসব কথা বিশদ ভাবে আলোচ্য নয়—মাত্র 'রাকা'র প্রথম কবিতাটি (পৃ. ৩) আপনাদের শুনিয়ে স্বভাব-কবি ভুজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ সাঙ্গ করি:

"না ফুরাতে সঙ্গীতের দ্বিতীয় চরণ
কেন গেল থামি?
না আসিতে অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন-তপন
কোথা গেল নামি?
কেন ফুল পড়ে খসি না হইতে বাসি,
কার অভিশাপে?
বসন্তের মাঝখানে কেন বর্ষা আসি
সহসা বিলাপে?"

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও— কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও বেতার-কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে বাঁকুড়া জেলার স্থান। এই জেলা এক দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অনুপম, অন্য দিকে ইহার অধিবাসিগণ যুগব্যাপী অনাবৃষ্টি, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ ও নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। জেলার আদি অধিবাসীদিগের এক অংশ দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মানভুম ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খাদে কাজের চেষ্টায় চলিয়া যায়, অন্য দিকে দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ায় আরও বহুলোক সর্ব্বস্ব বেচিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

শুশুনিয়ার দাঁড়ার সেচনালীর মুখ
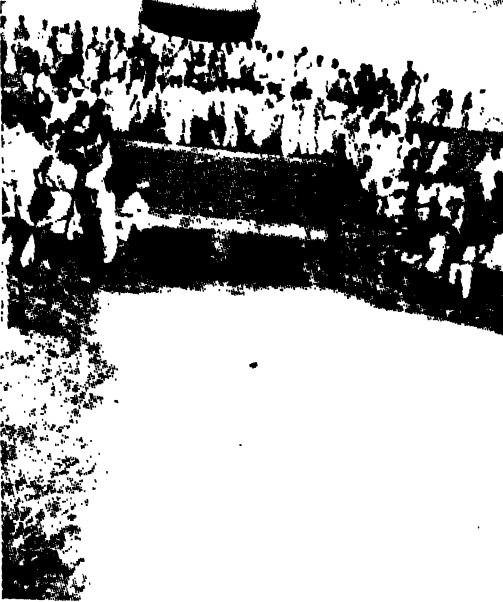
এইভাবে লোকক্ষয় হওয়ার ফলে ঐ জেলার অনেক জমি পতিত হয় এবং দেশের সাধারণ শ্রম-সম্পদ ক্রমেই কমিতে থাকে। বর্ত্তমানে জেলার আয়তন অনুপাতে কৃষিক্ষেত্র শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এবং উহার কম্বল ও রেশমী কাপড়, তামা-লোহা-পিতলের বাসন ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ কুটীরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

বিষ্ণুপুর-রাজের অধীনে এই অঞ্চল শৌর্য্যবীর্য্যে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া ইতিহাস-প্রখ্যাত ছিল। মোগল-পাঠান, বর্গী-মরাঠা, কেহই ইহাকে বশে আনিতে পারে নাই, এবং সেই গৌরবময় অতীতের স্মারক গাথা-কাহিনী ও স্মৃতিচিহ্ন আজও ঐ দেশের রাজধানীর আশেপাশে রহিয়াছে। কিন্তু ১৯০৫

শ্রীভূপতি মজুমদার কর্তৃক শুশুনিয়ার দাঁড়ার জলমুখ উদ্‌ঘাটন

সালে বি. এন. রেলওয়ের লৌহবর্ত্ম দেশের জলনিকাশের পথ নষ্ট করে এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারীর ন্যায় দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যে বাঁকুড়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও হাজারিবাগ ছোটনাগপুরের ন্যায় স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাগদি, রজপুত, মাল, লোহার ইত্যাদি জাতি অতি সবল ও শক্তিশালী ছিল, আজ সেখানকার লোক রোগক্লিষ্ট, উদ্যমবিহীন, জীর্ণশীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হয় বাঁকুড়াবাসীর এই নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ কি?

বাঁকুড়ার শ্রীসম্পদ ছিল কৃষি, কুটীরশিল্প, অরণ্য ও পশুচারণ ভূমিতে। বাঁকুড়ার ভূপৃষ্ঠ বাংলার অন্যান্য জেলার মত সমতল নহে, রাঢ়ের অন্য অঞ্চল অপেক্ষাও ইহা অধিক গিরি-উপত্যকা ও পার্ব্বত্য নদ-নদীপূর্ণ। জমি সমতল না হওয়ায় বর্ষাকালের জল কৃষিক্ষেত্রে অল্পই দাঁড়ায়,

শুভঙ্কর দাঁড়ার বাঁধ

জমির বুক চিরিয়া ফাটল দেখা দেয়, প্রশস্ত ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের চিহ্নে—"খোয়াইয়ে" ভরিয়া যায়, পথ-ঘাট লোপ পায়—ঐরূপ ভাঙন ফাটলের ফলে ক্রমে শস্যের ক্ষেত্রও যায় খোয়াইয়ের কুক্ষিতে। এই ভূমিক্ষয় (erosion) ও জলাভাব বাঁকুড়ার চাষীর মারণাস্ত্র।

অতীতেও ছিল এই জলসমস্যা, কেননা বন-জঙ্গল জলধারার গতিবেগ হ্রাস করে, জল ধরিয়া রাখিতে পারে না। অথচ জল পাইলে চাষী একই জমিতে দুই ফসল, এমন কি তিন ফসল ফলাইতে পারে। সেই কারণে আগেকার দিনের রাজা ও বিত্তশালী লোকেরা দরিদ্র প্রজার সহায়তার জন্য ঐ জলের পথে বিরাট জাঙ্গাল বাঁধিয়া বিস্তৃত জলাধার "বাঁধ" রচনা করিয়াছিলেন।

ডাঙ্গা বা ঢালু জমিতে একেবারেই থাকে না। সেইজন্য এই অঞ্চলের চাষী জল ধরিয়া রাখিবার জন্য উঁচুনীচু জমি ধাপে ধাপে বাঁধিয়া রাখে (terrace cultivation) এবং বিষম কায়িক পরিশ্রমে জলের আগম-নির্গমের পথ সুসংবদ্ধ করে। এ অঞ্চলের নদ-নদী স্রোতস্বতীতেও জল বেশী দাঁড়ায় না, কখনও বা নদীতে প্রচণ্ড বন্যা, কখনও বা তাহার জলরেখা শীর্ণ ও ক্ষীণ।

পূর্ব্বেকার দিনে বাঁকুড়ার গিরিমালা ও অধিত্যকা বনরাজিপূর্ণ ছিল। বর্ষার জল বনের বৃক্ষগুল্মের পাতায় ডালে ও শিকড়ে বদ্ধ হওয়ায় ধীরে ধীরে মুক্ত হইত, ফলে নীচের জমি ঐ জল অনেক দিন পাইত ও সরস থাকিত। সে সকল বন মানুষের অদূরদর্শিতার ফলে আজ নির্ম্মূল হইয়াছে, শালের বন রেলের স্লিপার, কয়লার খাদের খুঁটি ও জ্বালানি কাঠে পরিণত হইয়াছে। যে কাটিয়াছে সে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় নাই, সুতরাং চারা রাখিয়া বন বাঁচাইবার চেষ্টা হয় নাই। এখন বর্ষার প্রবল বারিপাতের জল দ্রুত গড়াইয়া নদী-নালায় জোরে পড়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড গতিতে বান ডাকাইয়া সমুদ্রের দিকে ধাইয়া যায়—চাষার প্রয়োজনের সময় নদীতে থাকে বিশাল বালুতটের মধ্যে অতি ক্ষীণ জল-রেখা। শুধু তাই নয়, ঐরূপ প্রচণ্ড বেগে জল নামিবার ফলে উঁচু

উপরন্তু ঐ সকল জলাধার এবং বর্ষার জলে স্ফীত নদ-নদীবক্ষ হইতে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সেচখাল—যাহা এ অঞ্চলে "দাঁড়া" নামে পরিচিত—কাটা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ান গণিতশাস্ত্রবিশারদ, কায়স্থকুলতিলক শুভঙ্কর রায়ের "শুভঙ্কর দাঁড়া" বিখ্যাত।

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে চাষী সম্বৎসর জল পাইত এবং পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে তাহার গোলা ধান, সরিষা, গম, কলাইমটরে পরিপূর্ণ থাকিত। চাষীর অর্থের অনটন ছিল না, সুতরাং কামার, কুমার, কাঁসারী, ছুতারের ক্রেতার অভাব
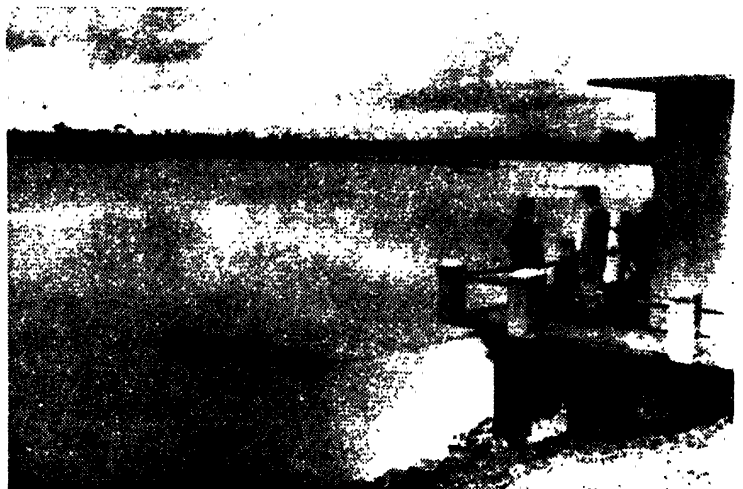
শুভঙ্কর দাঁড়া—জলাধার

ঘটিত না; বনে প্রান্তরে পশুচারণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল, সুতরাং দুধ ঘি ছাড়াও ভেড়ার পশম প্রচুর পাওয়া যাইত; বনে তসরের গুটি ছিল অপর্য্যাপ্ত, উপরন্তু নিপুণ কুটীরশিল্পী ঘরে তুঁত পাতায় গরদ-রেশমের গুটি-পোকা পালন করিত। কার্পাস জন্মিত বড় নদ-নদীর পাড়ের জমিতে। সুতরাং দেশে অন্ন-বস্ত্র এমন কি শীতবস্ত্র ও উৎসবের বস্ত্রও ছিল প্রচুর। মাত্র বিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঁকুড়ার কম্বল, বিষ্ণুপুর সোনামুখীর গরদ-তসর ছিল প্রসিদ্ধ, সস্তা ও টেকসই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন ভাবী দুর্দ্দিনের ছায়ামাত্র দেখা দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি বাঁকুড়ার চাষীকে উন্নতদেহ, সবল সুপুষ্ট ও শ্রমপটু, গৃহস্থকে দেখিয়াছি অভাবমুক্ত ও প্রসন্ন, যদিও তখনই অতীতের উত্তরাধিকার আমরা হেলায় ও নিশ্চিন্ত ভাবে দ্রুত খোয়াইতে চলিয়াছি।

এই সেদিন এক বিদেশী-শিক্ষার ছাপযুক্ত, বিচার-বুদ্ধি-হীন বাচাল উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিলেন, "চতুর্দ্দিকে, বাজারে বার-লাইব্রেরীতে, লোকে বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা বিদেশী সরকার ছিল শতগুণে ভাল।" যদি তাঁহার ক্ষীণ মস্তিষ্কের ক্ষমতা থাকিত বিগত দেড় শতাব্দীর স্মৃতি ধারণ করার, যদি তাঁহার চপল বুদ্ধির শক্তি থাকিত বিদেশীর শেখানো বুলি উচ্চারণ করার বাহিরে, তবে তিনি বুঝিতেন ঐ কথা বলা কত বড় মূর্খতার পরিচায়ক।

বিড়াই খালের সেচনালীর মুখ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ ইংরেজ কোম্পানীর সহজ অর্থাগম ও ইংরেজ বণিকের ধনলুণ্ঠনের পথ সুগম করিবার জন্য নির্ম্মিত হয়, ঐ রেলের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের পথঘাট অবহেলায় নষ্ট করা হয়, কেননা যদি পথ-ঘাট ঠিক থাকে তবে দরিদ্র দেশের শ্রমপটু লোক পয়সা খরচ করিয়া রেলে চড়িবেই বা কেন, মালই বা রেলপথে পাঠাইবে কেন? যাঁহারা প্রসিদ্ধ "অহল্যাবাঈয়ের সড়ক" ও বীরভূমের শিউড়ি-হেতমপুর-ইলমবাজারের পথ অল্পদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন তাঁহারা একথার মর্ম্ম বুঝিবেন। তারপর ই. আই. রেলপথ বাঁচাই-বার জন্য দামোদরের বর্দ্ধমানের পাড়ে উঁচু বাঁধ দেওয়া হইল। ইহাতে জল চলাচলের পথ নষ্ট হওয়ায় বর্দ্ধমান ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইল। সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি জলবদ্ধ হইয়া রোগের আকর হইল, শস্যের ফলনও গেল রসাতলে। অন্য পক্ষে বাঁকুড়ার দিকে বাঁধ দেওয়া হইল না, কেননা সেদিকে রেলপথ বা অন্য বিদেশী স্বার্থের নিদর্শন ছিল না। দামোদর এক পারে বাধা পাইয়া অন্য দিকে রুদ্রলীলা আরম্ভ করিল। বাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চল বৎসরের পর বৎসর বন্যায় ভাসিল। শুধু তাই নহে, বাঁকুড়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেচখাল বন্যার বালি ও পলিমাটিতে মজিতে লাগিল।

বিড়াইয়ের জলাধারের এক অংশ

দেশের বিশাল দীঘি-বাঁধের সংস্কার পূর্ব্বেকার দিনে রাজ-কোষ হইতে চলিত। বিদেশী-রাজের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা আরও কঠোর হইল, কিন্তু রাজস্ব-ব্যয়ের খাতে চাষী বা গৃহস্থ-সাধারণের প্রয়োজনের কথা উপেক্ষিতই ছিল। সুতরাং সংস্কার অভাবে সেগুলিও মজিল। দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে আমাদেরও উদ্যম ও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, সুতরাং আমরাও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিলাম না, কেবলমাত্র বিদেশীকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আজও সেই দাসত্বের বীজাণু আমাদের শিরায় শিরায় রহিয়াছে, তাই গালি ও নিন্দায় আমরা পঞ্চমুখ।

ভালুকা-জোড়ের জলাধার

সমগ্র রাঢ়ের মধ্যে বাঁকুড়ার এই জলসেচ ও পথ ঘাটের সমস্যা অতি জটিল, কেননা এই অঞ্চলে সমতল ভূমি অল্প, গিরি-অধিত্যকা উপত্যকাই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। সুতরাং ঐ সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন, সেই সঙ্গে চাই প্রাদেশিক সরকারের সজাগ ও ক্ষিপ্র কার্য্যকারিতা এবং দেশের লোকের সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা। কোন একটি বিরাট সেচ-পরিকল্পনায় সমস্ত জলসেচ-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, কেননা জল নীচের দিকে যায়, উপরের জমিতে জলপ্রবাহ সাধারণভাবে লওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সমস্ত জেলা অনেকগুলি ছোট-বড় অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির জন্য পৃথক জলাধার গঠন ও ছোট-বড় জলনালী কর্ত্তন ভিন্ন উপায় নাই। পথ-ঘাটের ব্যাপারে প্রাচীন, সহজে নির্ম্মিত গ্রাম্য পথগুলির কিছু অংশ সংস্কার এবং সম্পূর্ণ নূতন সুগঠিত রাজপথ (Arterial Roads) গঠন নিতান্তই প্রয়োজন।

বহুদিন হইতে জেলার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন। "প্রবাসী" সেই আন্দোলনের মুখ-পত্র ছিল ও আছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বিদেশীর ও বিদেশীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লীগ সরকারের অবহেলায় এবং আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় কিছুই হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহার ভার সেচমন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদারের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে সেচ ও পথ-ঘাটের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি এই দুই বৎসরের কাজের ফলাফল দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। প্রায় আড়াই শত মাইল ঘুরিয়া যাহা দেখিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

ভালুকা-জোড়ের বাঁধ

প্রথমেই বলি সেচের কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি বাঁকুড়ায় ভূপৃষ্ঠ যেরূপ অসমতল তাহাতে এই জেলায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা-জাতীয় একটি বিরাট সেচ-পরিকল্পনায় কৃষিসমস্যা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য অসংখ্য ছোট-বড় বাঁধ ও সেচ-খালের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে দুইটি মাঝারি ও কয়েকটি ছোট পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে বা শেষ হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি, "শুভঙ্কর দাঁড়া"র দশ-আনি ছয়-আনি অংশ ও বিড়াই-খালের এক অংশ।

ভালুকা-জোড় সেচপথ

শুভঙ্কর দাঁড়ার দামোদরমুখী অংশ "দামোদর উপত্যকা" পরিকল্পনার অংশ, সুতরাং তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। যে অংশের নাম "দশ আনা ছয় আনা" তাহারই উদ্ধার, তাহার জন্য বিশাল জলাধার গঠন ও নালী-প্রণালী সংযোগের কার্য্যই এ বৎসর শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন কীর্ত্তির নিরর্থক ধ্বংসাবশেষ মাত্র ছিল। এখন চতুর্দ্দিকের জলপথের মুখ বাঁধিয়া ও ফিরাইয়া, একটি বড় বাঁধ দিয়া, জলাধার গঠিত হইয়াছে এবং সেই জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেচ-খালের পথে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। এ বৎসরই প্রায় ১৮০০০ বিঘা জমিতে উহার সাহায্যে চাষ হইয়াছে।

আমরা যখন ঐ অঞ্চল দেখি তখনও বৃষ্টির অভাবে চতুর্দ্দিকের ক্ষেত খাঁ খাঁ করিতেছে, মাত্র চার-ছয় আনা জমিতে চারা রোপণ হইয়াছে বা হইতেছে। শুভঙ্করের দাঁড়ার দুই পাশের জমিতে কিন্তু পূর্ণ আবাদ হইয়া বহুদূর-ব্যাপী হরিৎ ক্ষেতের শোভা দেখা যায়। আমরা উহার যেখানেই গেলাম চাষী দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

বিড়াইয়ের জলাধার আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে। এ বৎসরই ১৫০০০ বিঘায় জল পাইয়াছে ও আবাদ হইয়াছে। বিড়াইয়ের পথে ওন্দা থানার নিকট দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জলাভাবে আবাদ হয় নাই দেখিলাম। বিড়াইয়ের জলাধারের নীচে আবার দেখিলাম ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা। বিড়াইয়ের বিস্তারের ব্যবস্থাও দ্রুত চলিতেছে নজরে পড়িল।

তালডাংরা-বামলা রাজপথ

ঐ দুইটি ছাড়াও দেখিলাম ছোট বড় অনেকগুলি বাঁধ, যাহা ছোট ছোট জোড় বা নালায় বাঁধ দিয়া জলাধার প্রস্তুত করিয়া জল-নিয়ামক যন্ত্র বসাইয়া সেচকার্য্যে লাগানো হইয়াছে। ঐরূপে ভালুকা জোড়ের মুখে বাঁধ গঠন করা হই-

য়াছে যাহাতে এ বৎসরই প্রায় ৩০০ বিঘায় পূর্ণ জলদান সম্ভব হইয়াছে।

ইহা ভিন্নও বহু ছোট বাঁধ ও নালা দেখিলাম, তাহার কিছু কৃষি-বিভাগ হইতে নির্ম্মিত বা পুনর্গঠিত হইয়াছে। এগুলিতেও বহু গ্রামের ক্ষেত জল পাইয়াছে ও পাইতেছে।

এই সকল অঞ্চল পরিদর্শন করিতে কয়েক ক্ষেত্রে পথের অভাব বুঝিলাম। সেখানে জিপগাড়ীকে নদী-নালার পাড় বাহিয়া ডাঙ্গা ময়দানের উঁচু নীচু জমির উপর দিয়া চলিতে হইল। কিন্তু বড় বড় রাজপথগুলির সংস্কার করা হইতেছে দেখিলাম এবং কয়েক স্থলে, যেখানে কখনও পথ ছিল না সেখানে দেখিলাম সেতু ও কজওয়ে-যুক্ত প্রশস্ত রাজপথ তৈয়ারী হইয়াছে। তালডাঙরা-বানদা রাজপথ উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। তাহার এক অংশে ১৪ মাইল পথ সরলরেখার মত পাহাড়-উপত্যকার উপর চলিয়া গিয়াছে। উহা যেখানে জয়পাণ্ডা জোড়ের উপর গিয়াছে সে স্থানটি বড়ই সুন্দর।
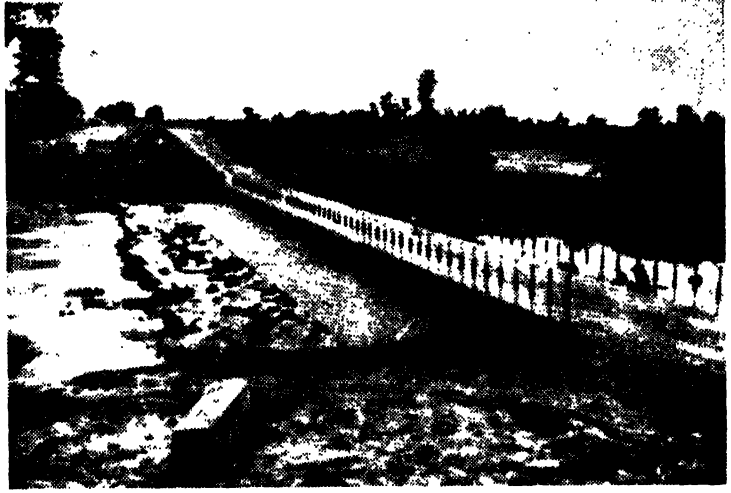
জয়পাণ্ডা 'কজওয়ে'

দেখিলাম অনেককিছু, আর বুঝিলামও অনেককিছু। সে সকল কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

কোজাগরী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

স্বচ্ছ সুদূর নভপ্রান্ত মত্তে পূর্ণ চাঁদিনী লেখা,
মৌন প্রকৃতি নীরবে দাঁড়ায়ে কা'র আগমন লাগি';
জ্যোৎস্না-প্লাবিত বসুধার বুকে কা'র পূত পদ-রেখা,
পুষ্পিতা ধরা বরিতে তাহারে তাই কি র'য়েছে জাগি'।

অসীম উছলি' ঝরিছে চাঁদিনী শ্যামল বনানী-শিরে,
তরল স্বর্ণ-ধারার আকুল ধরণী যে অবগাহি'।
শারদ-রাণীর শুভাশিস্ ঝরে স্নিগ্ধ শিশির-নীরে,
অলখ-অমিয়া নামিছে ধরায় দীপ্ত জোছনা বাহি'।

বনপথে ফোটে শুভ্র শেফালি স্বপ্নিল বাসে ভরা,
মনে পড়ে যায় দূর অতীতের বিস্মৃত যত স্মৃতি,
মালতী রজনীগন্ধা-সুবাসে সুরভিত আজি ধরা,
সারাটি পৃথিবী ছাপিয়া উঠিছে শান্ত প্রাণের গীতি।

জোছনা-উছল আজি এ নিশায় শারদ-লক্ষ্মী নাকি,
নামিবে মরতে মানবের লাগি' দীপ্ত-কনক-রথে;
কল্যাণ-দানে ভরিবে ভুবন কিছুই রবে না বাকি,
কত না শান্তি, সুষমা জাগিবে ধরণীর ধূলিপথে।

কোন্ সে অতীতে কোন্ সে ললনা এমনি জাগিয়া নিশি,
পেয়েছিল তাঁর বহু-বাঞ্ছিত দুর্লভ দরশন;
কে আছ জাগিয়া এমনি সাধিয়া কত শত দিশি দিশি,
শারদ-লক্ষ্মী ফিরেছিল যবে গৃহে গৃহে অগণন।

আবার এসেছে আজি সেই নিশা, ওগো বধূ তুমি আজ,
নিদ্রাবিহীন নয়নে তোমার জেগে থাক সারা রাতি;
মন্দির তব মুক্ত থাকুক রেখে দিও শত কাজ,
ঝরুক শেফালি, ফুটুক দোপাটি, জ্বলুক কনক-বাতি।

পূর্ব্বপুরুষের নামকীর্ত্তন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পিতৃপক্ষে পূর্ব্বপুরুষের নামে জলাঞ্জলিদান আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই অনুষ্ঠানের একটা মূল্য আছে যাহা উপেক্ষণীয় নহে। সম্বৎসরের মধ্যে এক পক্ষকাল কিম্বা অন্ততঃপক্ষে মহালয়ার একদিন পূর্ব্বপুরুষের নামমালা যথাযথ স্মরণ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের মূল উপাদান অংশতঃ পরিরক্ষিত হয়। সারা বৎসরটা বিষয়কর্ম্মে মগ্ন থাকিয়া, ক্ষণকালের জন্ম এই পবিত্র কার্য্যে সকলেরই রুচি হওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অথবা বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম ঠিকমত খুঁজিয়া বাহির করা এখন ঘরে ঘরেই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সেকালে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে এক পৃথক ঘটকসম্প্রদায় এই সকল নামমালা রীতিমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ অধুনা বিলুপ্ত ও অনাদৃত হওয়ায় পারিবারিক ইতিহাসের প্রামাণিক ও মূল্যবান্ উপকরণরাজি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার স্থান অপ্রামাণিক ও কৃত্রিম রচনাদ্বারা পূরণ হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামমালা কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৮)। তদ্দৃষ্টে যাঁহাদের কৌতুহল উদ্রিক্ত হইয়াছে তাঁহাদের গোচরার্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চারিজন বাঙালী মহামনীষীর পূর্ব্বপুরুষের নামমালায় যে অনুপেক্ষণীয় ভ্রম চলিয়া আসিতেছে তাহা সংশোধন করিয়া লিখিত হইল। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনীর অংশবিশেষও ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিত হইল—ও তত্তৎ পরিবার মাত্রের মনস্তুষ্টির জন্য নহে।

১। ভূদেবের পূর্ব্বপুরুষ

স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১২৩৩-১৩০১ বঙ্গাব্দ) মহাশয়ের কুলপরিচয় ছিল "কামদেব পণ্ডিতের সন্তান"। মুখবংশের এই ধারার সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা "বিং মুং" সমস্ত কুলপঞ্জীতে পরিগৃহীত হইয়াছে—বিশ্বেশ্বর (সংক্ষেপে বিশো) নাম হইতে তাহার উৎপত্তি। আমরা পূর্ব্ববৎ রাঢ়ীয় সামাজিক ইতিহাসের যুগত্রয় ধরিয়া নামমালা বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সর্ব্বারম্ভে একটি মারাত্মক ভ্রমের কথা বলা আবশ্যক। ভরদ্বাজগোত্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিপুরুষ "শ্রীহর্ষে"র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং এক সময়ে এই শ্রীহর্ষ নৈষধকার কিনা তদ্বিষয়ে বহু বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার যে আজ শতাধিক বৎসর মধ্যে একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেন নাই, প্রামাণিক লেখানুসারে এই শ্রীহর্ষ মোটেই গৌড়দেশে আসেন নাই। সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিলেন শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র "মেধাতিথি" এবং এই মেধাতিথির শ্রীহর্ষ নামে কোন পুত্র ছিল না। সুতরাং আদিশূরের সভাগত মেধাতিথি হইতে নামমালা কীর্ত্তিত হইলে শ্রীহর্ষের নাম তন্মধ্যে পড়ে না। নবদ্বীপে আমরা ধ্রুবানন্দ-রচিত অতি-দুর্ল্লভ "মহাবংশাবলী" নামক গ্রন্থের কতিপয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ "মুখয়টীকুল" প্রায় সম্পূর্ণ আছে। এড়ুমিশ্রের কারিকানুসারে (১৫ শ্লোক) মেধাতিথি আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের উক্ত গ্রন্থানুসারে বল্লালী আদিকুলীন উৎসাহ মেধাতিথির অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, মেধাতিথি—আবর ত্রিবিক্রম—কাক—ধাধু ("মুখে খ্যাতঃ")—জলাশয়—বাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—গুঞি—আচার্য্য মাধব—উৎসাহ ; লক্ষ্য করা আবশ্যক, মেধাতিথির পঞ্চম পুরুষে প্রথম 'গাঞি' সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক কুলপঞ্জীতে যাহা পাওয়া যায়, এড়ুমিশ্র-ধ্রুবানন্দের নবাবিষ্কৃত লেখাদ্বারা তাহা অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ১৪১) দুই জন "মেধাতিথি" কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মেধাতিথির নাম বলপূর্ব্বক ছন্দোভঙ্গ করিয়া পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক হরিমিশ্রও মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের নাম লিখিয়া যান নাই। এই ১১ পুরুষের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। কেবল উৎসাহের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "উৎসাহস্য সমঃ পৃথ্বিরুৎসাহো ভুবি বিশ্রুতঃ।

লক্ষ্মণ সেনের অভিষেককালে উৎসাহ জীবিত ছিলেন না। তন্নিমিত্ত প্রথম সমীকরণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহিতের নাম শীর্ষস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসাহের ১৬ পুত্র ছিল—তন্মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছিলেন "মহাদেব"। তিনি পঞ্চম সমীকরণে ভ্রাতুষ্পুত্র লোলিকের সহিত একসঙ্গে পূজিত হইয়াছিলেন। মহাদেবের কুলকারিকায় ধ্রুবানন্দ (মহাবংশ, পৃঃ ৫) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া-

ছেন—"দনুজমাধবেনাসৌ রাজ্ঞা পূর্ব্বং পুরস্কৃতঃ।" এড়ু-মিশ্র প্রভৃতি সামাজিক-প্রধান ব্যক্তির সহিত লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন "তুরুষ্কের" ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া "বঙ্গে" দনুজমাধবের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন—এই অতি-মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য স্বয়ং এড়ুমিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন (৩২-৩৩ শ্লোক)। সম্প্রতি (দামোদরদেবের পুত্র) "অরিরাজদনুজ-মাধব শ্রীদশরথদেবে"র একাধিক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় কেশবসেনের সমকালীন ঐ রাজার সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এড়ুমিশ্র ও ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যদের গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইয়াছে। অথচ অদ্যাপি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই কুলপঞ্জীর প্রামাণ্যে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন।

মহাদেবের অধস্তন ৮ম পুরুষ কামদেব। যথা, মহাদেব —বিশ্বেশ্বর (মহাবংশ, পৃ. ৭)—ভব (পৃ. ১২)—পশো (পৃ. ১৮)—কৃষ্ণ (পৃ. ৩৩)—মহেশ্বর (পৃ. ৫৮)—হরি (পৃ. ৮৪)—কামদেব (পৃ. ১০৭)। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সমীকরণভুক্ত প্রধান কুলীন ছিলেন। কামদেবের ১১ পুত্র, তন্মধ্যে মধুসূদনের কারিকা ধ্রুবানন্দ লিখিয়া গিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, ধ্রুবানন্দ মধুসূদনের পুত্রদ্বয়ের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ঐ পুত্রদ্বয় (অনন্ত ও সন্তোষ) ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কুলপঞ্জী-সমূহে কামদেবের অধস্তন বংশধারার অতি বিস্তৃত পারি-বারিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া "ভূদেবচরিতে" যে নামমালা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বিস্ময়জনক ভ্রম পরিদৃষ্ট হয়। বিস্ময়ের হেতু হইল এই যে, ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কুলগ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ১৬) এবং স্বয়ং ভূদেবও বহু ঘটকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আমরা সংশোধনপূর্ব্বক একটি বিশুদ্ধ নামমালা সঙ্কলন করিতেছি। কামদেবের উপাধি ছিল "পণ্ডিত" এবং তাঁহার একমাত্র উপাধিধারী পুত্র ছিলেন "মধুসূদনাচার্য্য"। মধুসূদনের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তোষের উপাধি ছিল সমস্ত কুলগ্রন্থানুসারে "মুকুট রায়"—তৎকালে এই উপাধি রাজকার্য্যে মন্ত্রিত্বাদি প্রধান পদাধি-কারীর জন্য প্রচলিত ছিল। তিনি আলিবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধে "ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত মিলিত হন" (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ৩)—ইহা সম্পূর্ণ প্রমাদকল্পিত একটি আকাশ-কুসুম। সন্তোষ আলিবর্দ্দীর আয় ২০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এবং তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ধ্রুবানন্দকর্ত্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ ব্যতীত অপর একটি মূল্যবান্ প্রমাণ কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি। সন্তোষের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র অপুত্রক "চণ্ডীদাসে"র নাম কুলপঞ্জীতে প্রায়শঃ লিখিত পাওয়া যায় না। বর্দ্ধমান অঞ্চলের একটি পুথিতে (১২২।১ পত্রে) তাঁহার নাম ও বিবরণ আছে—"হড়সার্ব্বভৌমস্য কন্যাবিবাহঃ।" এই হড়-সার্ব্বভৌম ছিলেন ইছাপুরের চৌধুরীবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম এবং রামভদ্রের পৌত্র প্রতাপশালী "রাজা রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী"র প্রদত্ত ১০৭০ সনের (১৬৬৪ খ্রীঃ) দানপত্র আমরা দেখিয়াছি (নদীয়ার ৪৩২৮৩নং তায়দাদ)। চৌধুরীদের পরমাত্মীয় সন্তোষ মুকুট রায় চৌধুরীদের সঙ্গে মোগল-পাঠান সংঘর্ষকালে কোনপ্রকারে বিপন্ন হইয়া থাকিতে পারেন, যদি বস্তুতঃ ঐরূপ কোন কিম্বদন্তী সন্তোষের সম্বন্ধে প্রচারিত থাকে।

সন্তোষের দ্বিতীয় পুত্র রমাকান্ত (রামকান্ত নহে) এবং তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গোপীবল্লভ (অথবা গোপীজনবল্লভ) প্রথম কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। যথা, "পশ্চাৎ চং কামদেব রায়স্য কন্যাগ্রহণাদ্ভঙ্গঃ ততঃ কন্যা অপাত্রে গতা" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ১৫৭।২ পত্র)। "বিভো-চট্ট" বংশীয় এই কামদেব রায় নদীয়ার চৌধুরী ছিলেন, তখনও নদীয়ায় বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। গোপীবল্লভের পুত্র রামকানাই কুলভঙ্গ করেন (ভূদেব-চরিত, পৃ. ৩)—এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গোপী-বল্লভের রামকানাই নামে কোন পুত্রই ছিল না এবং গোপী-বল্লভ স্বয়ংই কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই ভুলের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী "সম্বন্ধনির্ণয়" (৩য় সং, পৃ. ৬৪১)। গোপী-বল্লভের সাত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন "নকড়ি" (নামান্তর কানু)। একটি গ্রন্থে তাঁহার বাসস্থান লিখিত আছে "সাং চানক"। বোধ হয় গোপীবল্লভই কুলভঙ্গ করিয়া সমাজস্থান "খড়দহ" পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্রগণ নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন। নকড়িরও সাত পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র "রামনাথে"র দশ পুত্রের অন্যতম "রামকানাই ন্যায়বাগীশ"ই ভূদেবের পূর্ব্বপুরুষ। যথা, রামকানাই—রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ—হরিনারায়ণ সার্ব্ব-ভৌম—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (১১৯৯-১২৭৩ বঙ্গাব্দ)—ভূদেব। গণনানুসারে আদিশূর আনীত মেধাতিথি হইতে ভূদেব হইলেন ঠিক ৩০ পুরুষ। হরিনারায়ণ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন (ভূদেবচরিত, পৃ. ৫)। ভূদেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৯৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হন (ঐ, পৃ.৬-৭)। কিন্তু ইহা ঠিক কিনা সন্দেহ। হরিনারায়ণের ৮ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথের জন্মকালে তাঁহার বয়স হইয়া পড়ে ৪৬—ইহা একান্তভাবে অসম্ভব না হইলেও

অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা এবং বিশ্বাস করা কঠিন। ভূদেবের ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'সঞ্জীবনী-সুধা'য় লিখিয়াছেন: "অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।" এই ক্ষুদ্র পরিচয় তিনি নিঃসন্দেহ লালমোহন বিদ্যানিধির নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টে (বংশাবলী, পৃ. ২৪৩-৪৪) এই পরিচয়ই বিবৃত হইয়াছে, কেবল বিদ্যানিধির মতে "ইহারা হরিপালের অধিবাসী ছিলেন।" বিদ্যানিধি প্রকাশিত নামমালা স্বভাবতঃ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থেও (২য় সং, পৃ. ২৬৩) তাহাই লতাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থে (বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০) একটি অতিরিক্ত পুরুষের নাম ("পীতাম্বর") দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলার যে কোন সমাজের যে কোন কুলগ্রন্থ একবার দেখিলে এই বহুকাল প্রচারিত বংশলতার বিস্ময়জনক ভ্রম সংশোধন করা যায়। গঙ্গানন্দ অতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধরের বহু বিবরণ কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য।

আদিশূর আনীত কাশ্যপগোত্র বীতরাগের বংশে প্রথম বল্লালী কুলীনের নাম "বহুরূপ" (মহাবংশ, পৃ. ১)। তাঁহার ৮ পুত্রের অন্যতম ছিলেন "গাহী" (পৃ. ৫)। তৎপুত্র সর্ব্বেশ্বর "অবসথী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন:

> নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ খ্যাতো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
> অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ। (পৃ. ৯)

ঘটনাটি এই—ঘোষালবংশীয় "আভোক" নামক সামাজিকের যজ্ঞশালায় সর্ব্বেশ্বর ও তাঁহার সমকক্ষ কুলীন ঘোষালবংশীয় "পণ্ডিতে"র শাস্ত্রীয় বিবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি উভয়েরই "অবসথী" খ্যাতি হয়। কিন্তু পণ্ডিত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া একা সর্ব্বেশ্বরই ঐ মর্য্যাদাভাজন হইয়াছিলেন।

> পণ্ডিতস্ত সমানোঽসৌ চট্টসর্ব্বেশ্বরঃ কৃতী।
> আভোক-যজ্ঞশালায়াং বিবাদেন দ্বয়োরপি।
> অবসথীতি বিখ্যাতিস্তস্ত পুত্রো ন চাভবৎ। (পৃ. ৮)

ইহা খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা এবং তখনও সময় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলন চলিত ছিল। কুলগ্রন্থের এই সকল প্রামাণিক কথা বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে অবসথী শব্দের নানারূপ কল্পিত ব্যাখ্যা অনেকে করিতেছেন। গঙ্গানন্দ ছিলেন সর্ব্বেশ্বরের অধস্তন নবম (অষ্টম নহে) পুরুষ। যথা, সর্ব্বেশ্বর—তেকড়ি (পৃ. ১৫)—সিধো (পৃ. ২৫)—লখো বা লক্ষ্মীধর (পৃ. ৪৫)—দিগম্বর (পৃ. ৭২)—জগন্নাথ (পৃ. ৯৬-৯৭)—শ্রীগর্ভ (পৃ ১১৮)—ভগবান্ (পৃ. ১৪২)—গঙ্গানন্দ। ভগবানের কারিকায় গঙ্গানন্দের নাম ধ্রুবানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ সর্ব্বশেষ সমীকরণের কুলীন ছিলেন।

গঙ্গানন্দের অধস্তন নবম পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। যথা, গঙ্গানন্দ কৃষ্ণবল্লভ—নন্দরাম (ভঙ্গ)—রামজীবন—রামকান্ত—রামহরি—শিবনারায়ণ—যাদবচন্দ্র (১২০২-৮৭ বঙ্গাব্দ)—বঙ্কিম (১২৪৫-১৩০০)। রামজীবন পর্য্যন্ত নাম বহু কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে নন্দরাম (নন্দগোপাল নহে) ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি কুলভঙ্গ করিয়া নানাস্থানে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে এমন গ্লানিকর কথা আছে যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার পুত্রসংখ্যা বারোর কম নহে—তন্মধ্যে কুত্রাপি রামকান্তের নাম নাই, আছে রামজীবনের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথিতে রামজীবনের সাত পুত্রের মধ্যে রামকান্ত এবং তাঁহারও চারি পুত্রের নাম আছে—"রামহরিশ্রীহরিগঙ্গানারায়ণজগন্নাথাঃ" (২৭০-৭১ পত্র)। সুতরাং যিনি রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়া কাঁটালপাড়া আসিয়াছিলেন তিনি রামজীবনের পুত্র রামকান্ত, নিশ্চিতই রামকান্তের পুত্র রামজীবন নহেন। ঘটকের প্রামাণিক লেখা অগ্রাহ্য করিয়া, কি করিয়া এই অদ্ভুত নাম-বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। যাদবচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামজীবন নিশ্চিতই রঘুদেব ঘোষালের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কোন গ্রন্থেই পীতাম্বরের নাম নাই।

গঙ্গানন্দের বাসগ্রাম ঠিক কোথায় ছিল এখন নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহার এক পুত্র "বিশ্বেশ্বর" ফুলিয়ার রামেশ্বর ঠাকুরের কন্যা "গঙ্গা"কে বলপূর্ব্বক স্বগৃহে আনিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থে কৌতুকজনক কথা আছে—"তস্যাং মৃতায়াং বিশ্বেশ্বরপুত্রেণ রামনাথেন বিমাতৃমৃতত্বাৎ 'দীর্ঘগঙ্গে' শ্রাদ্ধং কৃতং" (কামালের পুথি, ফুল্যাপ্রকরণ, ১৬।২ পত্র)। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, গঙ্গানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ অধুনাতন বৈদ্যবাটীর সংলগ্ন প্রাচীন দীর্ঘগঙ্গ অথবা দিগঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

আশুতোষের পূর্ব্বপুরুষ

কুলশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ সুসাহিত্যিক স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষের নামমালা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ

করিয়াছিলেন (সন্দর্ভসংগ্রহ, ১৩০৫, ৫ম প্রস্তাব)। তাহাই সম্বন্ধনির্ণয়ের ৩য় পরিশিষ্টে (১৩২১, পৃ. ২৬০) সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ব্বতন বংশলতার সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সংশোধনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ নামমালা লিখিতেছি। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ভরদ্বাজগোত্র মেধাতিথির অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ আহিতের পুত্র "উধো" (মহাবংশ, পৃ. ৪), তৎপুত্র শিয়ো "শঙ্ক" (পৃ. ৮), শিয়োর তিন পুত্র হইতে মুখবংশের তিনটি প্রসিদ্ধ সমাজস্থানের উৎপত্তি—নৃসিংহের ফুলিয়া সমাজ, রামের 'স্বল্পফুলিয়া' ও দ্যাকরের কাঁচনা। রামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ "গোপাল ঘটক" স্বনামে মেল করিয়াছিলেন। যথা, রাম (পৃ. ১৪)—সুজো)পৃ. ২২)—জয়পতি (পৃ. ৪০)—গদাধর ঘটকাচার্য্য (পৃ. ৬৬ ৭)—গোপাল (পৃ. ৯১)। তৎপুত্র মাধব "লস্কর" (পৃ. ১১৪) এই বংশেরই ধনপতির পুত্র মাধব হইতে পৃথক ব্যক্তি। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ ধনপতির পুত্র হইতেই বংশ বর্ণনা করিয়াছেন (লালমোহন মুখোপাধ্যায়-রচিত মুখবংশ, পৃ. ৮২)। ঘটকের পুত্রের "লস্কর" উপাধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক, ধ্রুবানন্দও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পাঠান আমলে রাজ্যতন্ত্রের সেনাবিভাগে মাধবের উচ্চপদাধিকার সূচিত হইতেছে। ধ্রুবানন্দের কারিকায় (পৃ. ১১৪) মাধবের ছয় পুত্রের নাম আছে। বিদ্যানিধির মতে (সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট, বংশাবলী, পৃ. ১৩১) জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরানন্দের ধারায় আশুতোষের জন্ম। ইহা কোন পুথিতেই পাওয়া যায় না, সুতরাং ভ্রমাত্মক। পরবর্ত্তী ঘটক গ্রন্থানুসারে মাধবের পুত্র "রঘু লস্কর" ভিন্ন অপর পাঁচ পুত্রের "কুলাভাব" ছিল। রঘু সম্বন্ধ করিয়া মালাধরখানী মেলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 'কুমুদে'র সম্বন্ধে লিখিত আছে, "কুমুদস্য বিবাহদোষঃ কন্যা অপাত্রস্থা" (অস্মদীয় পুথির ৮৯।১ পত্র), অর্থাৎ, তিনিই প্রথম কুলভঙ্গ করেন।

কুমুদের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ "পুরুষোত্তম তর্কবাগীশ" দিগ্‌সুই নিবাসী ছিলেন। নামমালা যথা, কুমুদ—হরিদেব—রামনারায়ণ—কৃষ্ণবল্লভ—পুরোষোত্তম। কোন কোন গ্রন্থানুসারে হরিদেব ছিলেন কুমুদের ভ্রাতা দেবীদাসের পুত্র (কুলকল্পদ্রুম, মুখবংশ, পৃ. ২১৫)। হুগলী কালেক্টরীর ৪৫২৯৭নং তাম্রদানে পাওয়া যায়, (সাবর্ণ-চৌধুরবংশীয়) বিদ্যাধর রায় মুখবংশীয় পুরুষোত্তম তর্কবাগীশকে দীর্ঘসুই গ্রামে ভূমি দান করিয়াছিলেন—১২০৯ সনে তাহার অন্যতম দখলকার ছিলেন "হরেকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর"। পুরুষোত্তমের এক পুত্রের নাম রাজারাম—রাজারামের জ্যেষ্ঠপুত্র বলরামও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে তাঁহার উপাধি ছিল "ন্যায়ালঙ্কার", কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথিতে (৩৫৬।১ পত্রে) আছে "বলরাম ন্যায়বাগীশ"। এই পর্য্যন্তই কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়। অতঃপর মহেন্দ্রনাথের পরিশ্রমসাধ্য লেখাই আমাদের উপজীব্য, বলরামের তিন পুত্র—হরেকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগর), রামজয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্মৃতির পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। রামজয়ের ১১৯৬ সনে অল্প বয়সে মৃত্যু হয়—তৎপুত্র বিশ্বনাথ (জন্ম ৪ কার্ত্তিক ১১৯৪, মৃত্যুও ১ কার্ত্তিক ১২৫৬) গঙ্গাপ্রসাদের পিতা এবং আশুতোষের পিতামহ। মেধাতিথি হইতে আশুতোষ ঠিক ৩২ পুরুষ।

রামানন্দের পূর্ব্বপুরুষ

স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীতে যে বিস্তৃত বংশাবলী লতাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রথমাংশ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই বংশের প্রকৃত পরিচয় হইল "নান্দোর চট্ট" সংক্ষেপে ('নাং চং'), কিন্তু ঐ চট্টবংশ ঠিক কোন্ ধারার অন্তর্গত তাহা অনায়াসে নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও আমরা তাহাতে অসমর্থ। যে ধারা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। নাং চং মহাকালের পুত্র পদ্মগর্ভের নাম ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন (মহাবংশ, পৃ. ১২৫)। পদ্মগর্ভের পুত্র হরিরাম। হরিরামের ছয় পুত্র—রামশরণ রামনারায়ণ (ভঙ্গ), সীতারাম (ভঙ্গ), যাদু (নিঃসন্তান), মাধব ও সন্তোষ। এই সন্তোষ রামানন্দের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি "নিকষ" কুলীন এবং নামমালা কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য। যথা, সন্তোষ—রামচন্দ্র—বিশ্বনাথ—ধনঞ্জয় প্রভৃতি ছয় পুত্র (বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল)। সকল গ্রন্থানুসারেই রামচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র ছিল বিশ্বনাথ। যদি সন্তোষের পুত্র রামচন্দ্র এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া চিরপ্রচলিত প্রবাদ বা প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুমান এই সন্তোষ পূর্ব্বোক্ত পদ্মগর্ভের এক বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইতে পারেন। যথা, পদ্মগর্ভ—অভিরাম (ভঙ্গ)—লোকরাম—সাতু বা কৃষ্ণজীবন—সন্তোষ। কিন্তু এই সন্তোষের পুত্রাদির নাম আমাদের পরীক্ষিত কোন গ্রন্থে নাই। পদ্মগর্ভের উর্দ্ধতন পুরুষের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে সুপ্রাপ্য—তিনি আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, বহুরূপ—গোবিন্দ—চক্রপাণি (চাকু)—পুরুষোত্তম (পুরো)—নন্দন—জগন্নাথ—ত্রিলোচন (তিলাম্বী)—চন্দ্র (চাঁদ)—মধু—মহাকাল—পদ্মগর্ভ। কুলগ্রন্থানুসারে পুরো নদীকুলবাসী ছিলেন বলিয়া 'নান্দো' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের টাকাকড়ি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতের টাকাকড়ি তিব্বতে চলে; কিন্তু তিব্বতের নিজস্ব মুদ্রাও আছে। তিব্বতের বাজারে আমাদের টাকার কদর আছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকা বা ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকার আদর সবচেয়ে বেশী। আমাদের আধুলি সিকি বড় দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি পূর্ব্ব-তিব্বতের কোথাও কোথাও নাকি একমাত্র ভারতীয় টাকার সাহায্যেই কেনাবেচা হয়। উহাকেও নাকি তিব্বতীয় প্রথায় কাটিয়া অল্পমূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়।

তিব্বতের মুদ্রা আগে নেপাল হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিত। খাদের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে এখন লাসাতেই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার টাঁকশাল যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তিব্বতের টাঁকশালও ইহার অনুরূপ তাহা হইলে ভুল করিবেন। উহা বাংলা দেশের কামারশালার বড় সংস্করণ।

তিব্বতে প্রচলিত মুদ্রার নাম "ত্রঙ্কা"। উহা পাতলা ও গোলাকার—রূপা ও তামা মিশাইয়া তৈয়ারি হয়। এক ত্রঙ্কার ক্রয়মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। তিব্বতের অবস্থানকালে কিন্তু আমি হাটেবাজারে ভারতীয় এক টাকায় তিন ত্রঙ্কা পাইতাম। তিব্বতে কয়েকপ্রকার ত্রঙ্কার প্রচলন আছে, যথা (১) গ্যান্‌ডেন্ পোডঙ্গ ত্রঙ্কা, (২) কোঙ্‌প্যার ত্রঙ্কা, (৩) টুঙ্‌-ট্যাঙ্ ত্রঙ্কা (৪) চোতঙ্গ্‌ ত্রঙ্কা, (৫) পা-নিয়ঙ্‌ ত্রঙ্কা। এগুলির মধ্যে প্রথম প্রকারের ত্রঙ্কারই প্রচলন বেশী। উহার এক পিঠে লেখা আছে "গ্যান্‌ডেন্ পোড্যঙ্গ্‌ চোলে ন্যান্ গ্যাল্"। ইহার অর্থ বাংলায় করা যাইতে পারে—"সকল দিক হইতে বিজয়ী পবিত্র প্রাসাদ"। অপর পিঠে লেখা থাকে "ট-পি টগ্যু" অর্থাৎ সৌভাগ্যের অষ্ট লক্ষণ।

একবার লাসা গবর্ণমেণ্টের সহিত রেটিং গোম্ফার বিবাদ বাধে। তাহা মিটাইতে আসেন চীন হইতে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। টুঙ্‌-ট্যাঙ্ ত্রঙ্কা তাঁহারই নাম অনুসারে হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বোক্ত ত্রঙ্কার মত ইহারাও এক পিঠে সৌভাগ্যের অষ্টলক্ষণ আছে, কিন্তু অপর পিঠে কিছু লেখা নাই। আছে কেবল শোভাবর্দ্ধক কারুকার্য্য।

কোঙ্‌প্যার ত্রঙ্কাতেও কোন লেখা নাই। কেবল এক পিঠের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ আঁকিয়া উহার মধ্যে একটি তিব্বতী সংখ্যা লেখা আছে।

চো-ট্যাঙ্‌ ত্রঙ্কা আসলে নেপালী মুদ্রা। ইহা নেপাল হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। উহাতে নেপালের রাজার নাম, সন, তারিখ ইত্যাদি লেখা আছে। ইহার নেপালী নাম 'মোহর'।

তিব্বতে ত্রঙ্কা কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়। গ্যান্‌ড্যেন্ পোডঙ্গ্‌ ত্রঙ্কা সাধারণতঃ কাটা হয় না। চোতঙ্গ্‌ ত্রঙ্কাকেই বেশী কাটা হয়।

এক ত্রঙ্কার মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। কাজেই উহাকে ঠিক অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া তিন আনার মুদ্রা করা হয়। তখন উহার নাম হয় "চি-ক্যে"। তিন ভাগ রাখিয়া কাটিলে উহা চারি আনার কাজ চালায়, এবং তখন 'সো-কঙ্গ' নামে পরিচিত হয়। এক-তৃতীয়াংশ মাপে কাটিলে উহার নাম হয় "কর্ম্মা" বা "করমঙ্গা"। উহার মূল্য দুই আনা।

ত্রঙ্কাকে কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রা তৈয়ারি করিবার সময় কর্ম্মকার যে লোভে পড়িয়া কিছু ধাতু না রাখে তাহা নহে। উহাতে বাস্তবিকই অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিব্বত গবর্ণমেণ্ট দুই পয়সা (খক্‌-চে) ও এক আনা মূল্যের (খ ক্যঙ্গ) তাম্রমুদ্রার প্রচলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এক টাকা দুই আনা মূল্যের "স্যঙ্গ-চেড্‌" এবং দুই টাকা চারি আনা মূল্যের "স্যাঙ্গ-ক্যঙ্গ" এই দুই শ্রেণীর রৌপ্যমুদ্রারও চলন হইয়াছে।

চীন হইতে আমদানি করা রৌপ্য-পিণ্ডও তিব্বতে মুদ্রার কাজ চালায়। ধাতুর ওজন হিসাবে উহার মূল্যের তারতম্য হয়।

তিব্বতে পণ্যবিনিময়েও কেনাবেচার কাজ চলিতেছে। মৃগনাভি, গমচূর্ণ, যব, চা প্রভৃতি মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে চলে। যেমন, প্রায় নয় পোয়া যব এক টাকার প্রতীক। পণ্যবিনিময়ে কেনাবেচা করা বিষম ঝকমারি ব্যাপার। প্রথমতঃ কাহার কি প্রয়োজন তাহা বাহির করিয়া যোগস্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর দরকষাকষি। ইহাতে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই স্ব স্ব পণ্যের গুণকীর্ত্তন ও অপরের দ্রব্যের গুণহীনতা প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য বক্তৃতা করে।

জনৈক তিব্বতী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুদ্রাসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি আপনারা এখনও অনুভব করেন না?"

তিনি বলিলেন, "অনুভূতি জাগিয়াছে—সংস্কারের বেশী দেরী আছে বলিয়া মনে হয় না।"

বর্ত্তমানে তিব্বত চীনের তাঁবে আসিবার পর নূতন চীনের মুদ্রাও তিব্বতে চলিতেছে।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

১

বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালোকের বাংলা ও বাঙালী আজ ধ্বংসের পথে। আনন্দমঠের ব্রহ্মচারীকে যখন মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মা কে", তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন "আমরা তাঁহার সন্তান।" মহেন্দ্র আবার যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কে তিনি"? ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন "সময়ে চিনিবে।" পরে মহেন্দ্র এক "অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি" দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইনি কে ?" তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন "মা যা ছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রহ্মচারী যখন বলিতেছিলেন "আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী" তখন তাঁহার চোখে দর দর ধারা পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে সেই ব্রহ্মচারীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী নেতা কোথায় ? আর মহেন্দ্রের ন্যায় সেই দেশপ্রেমিকই বা কোথায় যাঁহারা আবার বাংলার রূপ বদলাইতে পারেন ?

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা প্রদেশই প্রকৃতিদত্ত সম্পদে অধিক সমৃদ্ধশালী হইলেও ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙালী জাতি আজ দরিদ্র। বাংলার সহস্র সহস্র কার্য্যক্ষম উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না। যে জাতি এতদিন সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র ভারতের চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছিল সে আজ অন্য প্রদেশবাসীর নিকট সকল বিষয়ে অবহেলিত। রাজনীতিবিদ্ সুরেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র এক সময় সারা ভারতবর্ষে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার মত নবীন বাংলায় কাহাকেও আজ দেখা যাইতেছে না কেন তাহা ভাবিবার কথা।

একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, এই যুগে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা একই সূত্রে গাঁথা। পূর্ব্বে পরাধীন ভারতের কখনও পুরাপুরি ভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এ যুগে যে জাতির অর্থনৈতিক শক্তি নাই রাজনীতিক্ষেত্রে সে জাতি কখনও মাথা তুলিতে পারে না। এই কারণেই আজ বাংলা ও বাঙালী অন্যান্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অনেক পিছনে পড়িয়া আছে এবং দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে আগাইয়া যাইতেছে।

ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসী ও নেতারা অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ অগ্রে বজায় রাখিবার পর তবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করেন। তাঁহারা এ মনোবৃত্তিকে "প্রাদেশিকতা" বলিয়া মোটেই মনে করেন না। কিন্তু অধুনা বাংলার প্রায় সকল নেতাই বঙ্গমাতাকে ভুলিয়া একমাত্র ভারতমাতার বন্দনায় ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে বাংলার স্বার্থ অগ্রে রক্ষা করিলে উহা নিছক "প্রাদেশিকতা" হয়।

বাঙালী জাতিকে যদি আবার মাথা তুলিয়া বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইতে হয় তাহা হইলে অগ্রে এই কাল্পনিক "প্রাদেশিকতার" কলরবকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ব্যবসা ও বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাকে বাংলার বাহির হইতে ও ভারতের বাহির হইতে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে বাংলাদেশের অর্থ যাহাতে বাহিরে চলিয়া না যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম তখনও বাংলাদেশ হইতে যত টাকা বিদেশীরা লইয়া যাইত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ টাকা ভারতের অপরাপর প্রদেশে চলিয়া যাইত। ইহার মোটামুটি হিসাব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ইহা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা বরং এই টাকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থার জন্য কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের দোষ দেওয়া কোনমতেই উচিত হইবে না। যদি গুজরাট, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসীরা বাংলাদেশে আসিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতে পারে তবে বাংলার অধিবাসীরা কেন তাহা পারিবে না ? একটা জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমুন্নত করিয়া তোলা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রাণের সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকা একান্ত আবশ্যক। এজন্য বাংলার প্রত্যেক সন্তানকে মানসপটে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার আরাধনা করিতে হইবে। তবেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী ;
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি ॥

বাংলার নবীনেরা কি এখনও কবির এই মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতে পারিতেছে না ?

নারায়ণী সেনা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত দিন সমস্ত রাত গাছের উপর কেটে গেল।

সমস্ত দিন বলাটা একটু ভুল, কেননা দুপুর পর্য্যন্ত আমরা ছিলাম হাতীর হাওদার উপর। আমি আর নলিনীবাবু। পূজার ছুটিতে আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে এসেছিলাম আমাদের উভয়ের বন্ধু আনন্দের বাড়ী, নলিনীবাবু কলকাতা থেকে আর আমি এদিক থেকে।

আনন্দের পুরো নামটা হচ্ছে আনন্দকিশোর থাপা। ওরা তরাইয়ের নেপালী জমিদার। ওর পাঠ্য জীবনের কতকটা কাটে পাটনায়, এবং কতকটা কলকাতায়। বরাবরই বাঙালী-ঘেঁষা, তাইতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় পাটনায়, আমরা উভয়েই তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বি-এ পাস করে আর আমার কাছে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। সেখানে এম-এ পড়ে চার বছর, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তাই বোধ হয় সরস্বতীর উপর ভক্তিটা মরে এসেছিল। কিন্তু এম-এ না পাস করে ও বাড়ী ফিরে গিয়ে আমায় যে চিঠিটা লিখেছিল সেটি একেবারে ঘরোয়া বাংলায়। তাইতেই প্রথম কাঁদুনী গাইলে—একলা পড়ে গেছি, বনবাস, নিশ্চয় আসবি একবার, যত শীগ্‌গির পারিস—শিকারের লোভ দেখান ছিল, আবার ঐ একই চিঠিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে 'বনবাসে'র শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনের উচ্ছ্বসিত গুণগানও ছিল।...বি-এ ক্লাসেই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লেখক হবার পায়তারা ভাঁজছি, আনন্দকিশোর সেটা জানত।

তারপর এক বছর ধরে এই রকম চিঠি মাঝে মাঝে বরাবর এসেছে; কিন্তু চারদিক দিয়ে প্রলুব্ধ হলেও এতদিন গিয়ে উঠতে পারি নি।

আর কখনও যাওয়ার দুর্ম্মতিও না হয় যেন। প্রথমতঃ দূরত্ব এবং পথের দুর্গমতা। রূপনগর নিকটতম রেল-ষ্টেশন থেকে আঠার মাইল। রাস্তা নেই বললেই চলে। ভারতের সীমানার মধ্যে মাইল তিনেক একটা কাঁচা সড়ক, তারপর সীমানার একটা খাল পেরিয়ে তার আদলটা কিছুদূর পর্য্যন্ত গেছে বটে, কিন্তু সেই কোন্ যুগে প্রথম তোয়ের হবার পর তাতে আর কখনও মাটি পড়েছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, অল্পপরিসর, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর খরস্রোতা। জঙ্গল পড়ে গোটা-পাঁচেক, তার মধ্যে দুটো অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। রাস্তা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় নি বটে, তবুও খানিকটা ভেতরে যাবার পরই গভীর অন্ধকার; কতকটা এই থমথমে অন্ধকারে, কতকটা একটা অজানা আশঙ্কায়, বেরিয়ে আসবার পর মনে হয় যেন পুনর্জন্ম হ'ল। গ্রাম খুব দূরে দূরে, পাহাড়ের দিকে যতই এগুনো যায় আরও এসেছে কমে, আর এই যে নিজের-মনে-গড়ে-ওঠা রাস্তা এটা হয়ে উঠেছে উঁচুনীচু, জায়গায় জায়গায় পাথুরে, আর সেটাকে খণ্ডিত করে যে সব নদী বয়ে গেছে তাদের সংখ্যা গেছে বেড়ে।

যানবাহন হাতী, ভারতসীমানা পেরিয়ে খানিকটা পর্য্যন্ত একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, বৈচিত্র্য হিসাবে। হাতীই চরম বৈচিত্র্য মনে করে আমরা যাবার সময়ে ষ্টেশন থেকে নেমে তাইতেই সওয়ারী হই; ভুলটা যখন বোঝা গেল তখন আর গরুর গাড়ির পথ নেই।

কতকটা সুবিধা আছে শেষের দিকে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রায় মাইল চার পর্য্যন্ত থাপা-পরিবারের জমিদারির তরফ থেকে একটা আবার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে, বিজুরিয়া বলে একটা নদীর ধার পর্য্যন্ত; বাড়ীর দিকে রাস্তাটা মাইলখানেক পাকাও। এইটুকুতে আনন্দ-কিশোরদের মোটরটা যাতায়াত করে। মোটরটা আদৌ এখানে পৌঁছেছিল কি করে সে একটা আলাদা কাহিনী।

এই হাড়ভাঙা অভিযানের পর কিন্তু আমরা যে দশটা দিন ওখানে ছিলাম, বড় আনন্দেই ছিলাম। রূপ-নগর জায়গাটা খুব মনোরম। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে, তারপর স্তরে স্তরে উঠে একেবারে শেষ দিকে তুষারমুকুট। সকালে, আর বিকেলে একটু নরম হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর যে রক্তাভা পড়ে তার উপমা হিমালয়ের এদিকে কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আনন্দকিশোরের পিতা জগৎ-কিশোর সৌখীন লোক, নিজের গ্রামটুকুও বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শরতের স্বচ্ছ আকাশের নীচে রূপনগরকে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীলাম্বরীপরা কোন্ মায়ের কোলে সাজগোজ করা একটি শিশু যেন শুয়ে রয়েছে। এখানে থাকাই আনন্দ, তার উপর নিত্য হুজুগ। আজ শিকার, কাল বিজুরী-অভিযান, পরশু পাহাড়ের উপর গিয়ে পিকনিক; ছোট ছোট শিকার ছাড়া একদিন হাতী নিয়ে, লোকলস্কর সঙ্গে করে একটা বড় শিকারও হয়ে গেল—দুটো চিতাবাঘ গোটা পাঁচ হরিণ, দুটো বুনো শুকর। এর উল্লাস সামলাতেই দু'দিন গেল কেটে। আহার তো শেষ পর্য্যন্ত একটা দুশ্চিন্তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জল অত ভাল হওয়া সত্ত্বেও।

তবুও যে কেন বলছি আর যাবার দুর্ম্মতিটা যেন না হয় তার দ্বিতীয় কারণটা এবার বলি।

সাতটা দিনের প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। ওঁদের অনুরোধ-উপরোধে সেটাকে আর একটু বাড়িয়ে আমরা দশম দিন সকালে যাত্রা করলাম। বিজুরী নদী পর্য্যন্ত পরিবারের এক রকম সকলেই মিলে আমাদের মোটরে পৌছে দিলেন—পর্দ্দা নেই, আনন্দকিশোরের স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি কয়েকজন মেয়েছেলে পর্য্যন্ত। নদীর মাঝখানটুকু নৌকায় পেরিয়ে আমরা এপারে এসে হাতীর ওপর চড়লাম।... শেষ দৃশ্যটুকু যেমন অপূর্ব্ব তেমনি বিষাদময়। হিমালয়ের তুষারমুকুট, তার নীচেই ঘনারণ্যের নীল রেখা, তার পর খানিকটা সমতলভূমি, বিজুরীর উত্তরতটে আনন্দকিশোরেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, গৌরকান্তি মেয়েদের রংচঙে পোশাক, আনন্দকিশোর আর কয়েকজন রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, নীচেই বিজুরীর উপলাহত উচ্ছল জলস্রোত আর সমস্তটুকুর উপর শরৎপ্রভাতের ঝলমলে রোদ।

হাতীটা খানিকটা এগিয়ে এলে নলিনীবাবু বললেন, "এবার ঘুরে বসুন শৈলেনবাবু, যা ছেড়েই আসতে হবে তার দিকে এরকম করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা বীর ধর্ম্ম নয়।"

নলিনীবাবুর কথা বলা হয় নি। একটি জটিল চরিত্র, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে চমৎকার; আমুদে, গল্পপ্রবণ, যে অবস্থাতেই পড়ুন তার মধ্যে থেকে রস বের করে সেটাকে উপভোগ্য করে নেবার ক্ষমতা আছে; মোটের উপর নামে-ধামে-স্বভাবে এক জন আদর্শ কলিকাতার মানুষ, আসবার সময় উনি না থাকলে যে কি অবস্থা হ'ত, আর যাবার সময়ও যদি উনি না থাকতেন তো...

কিন্তু সেকথা পরে হচ্ছে; এখানে মাত্র এইটুকু বলে রাখি যে ওঁর থেকে থেকে ঐ 'বীর-ধর্ম্ম' কথাটা ব্যবহার করবার বাতিক আছে। একবার রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করতে বললেন, "শৈলেনবাবু, ভেতো বাঙালী, এসেছি এমন দেশে যেখানে সবার কোমরেই একটা খুরকি ঝুলছে, এখানে জিভের ডগায় অন্ততঃ একটা ধারালো কথাও না নিয়ে থাকলে মানাবে কেন?"

বললাম, "কিন্তু আনন্দ তো আমাদের স্বরূপ চেনে।"

উত্তর করলেন, "জিগ্যেসও করেছিল এ নতুন মুদ্রাদোষের কথা, বললাম, খেটে অভ্যেস করেছি, নইলে তোর মান থাকবে কেন?"

আরও কীর্ত্তি আছে নলিনীবাবুর, কিন্তু সে কথাও যথাস্থানে। সকালের দিকটা আমাদের বেশ কাটল। স্নানাদি সেরে বেশ ভালভাবে জলযোগ করে বেরুনো গিয়েছিল, হাওদার উপর দুলতে দুলতে, গল্প করতে করতে, সিগরেট পোড়াতে পোড়াতে আর নস্যি নিতে নিতে আমরা দুপুর পর্য্যন্ত গ্রাম থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে রামফেরী জঙ্গলের ধারে এসে পড়লাম।

খিদে পেয়েছে, খাবার সময়ও হয়েছে, তা ভিন্ন জায়গাটা এমন অপরূপ যে এইখানে বসে হিমালয় তরাইয়ের শেষ নিদর্শন হিসাবে এটাকে মনে গেঁথে নেবার ইচ্ছাটাও প্রবল হয়ে উঠল। আমাদের ডান দিকে উঁচু-নীচু জমির উপর নিবিড় শালবন, সেটা যেখানে পাতলা আর সরু হয়ে এসেছে সেইখান দিয়ে আমাদের রাস্তাটা। আমাদের বাঁ দিকে একটা ছোট পাহাড়, সমস্ত জায়গাটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে এসে যেন এই শেষ ঢেউয়ে থেমে গেছে, এর পরেই তরাইয়ের সমতল, উঁচু জমিতে রয়েছি বলে কতদূর পর্য্যন্ত যে দেখা যায় তার হিসাব নেই। সমস্ত জায়গাটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে একটি ছোট নদী। জায়গাটা উঁচু-নীচু বলে মাঝে মাঝে তার স্রোত গেছে আটকে, জল হয়েছে জমা, তার পর সেই সঞ্চিত জলের চাপেই সেটা তোড়ে বেরিয়ে এসেছে; চার দিকে ঝরঝর, ঝরঝর শব্দ; একটি নদীই ঝরণার মালা গেঁথে চলেছে, একটি নৃত্যচপল মেয়েরই পায়ে নূপুর, হাতে তালি, কণ্ঠে সঙ্গীত।

মাহুত করন্ বাহাদুরকে বললাম, "হাতীটাকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে চল, ঐ গাছতলাটায় নেমে আমরা আহারটা সেরে নেব।"

ঠিক যে বললাম তা নয়, খানিকটা ইঙ্গিত, খানিকটা হিন্দী আর এইখানে দশ দিনের চেষ্টায় ওদের ভাষার গোটাকতক শব্দ যে আয়ত্ত করেছিলাম তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু দিয়ে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম। বেশ বুঝল, কিন্তু না এগিয়ে খানিকটা ভাষায় আর খানিকটা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে যে সমতলে নেমে খানিকটা এগিয়ে ওর একটা ভাল জায়গা জানা আছে, সেইখানেই যাচ্ছে। সাধারণতঃ নেপালীদের মুখটাই হয় অত্যন্ত গম্ভীর আর ভাবলেশহীন; সেইজন্যেই, আর তার বক্তব্যটা পুরোপুরি বুঝতে না পারার জন্যেও নিশ্চয়, আমাদের মনে হ'ল লোকটা অযথাই জিদ করছে। তাই আমরাও গম্ভীর হয়ে গিয়ে ওকে আমাদের নির্দ্দেশ পালন করতেই হুকুম দিলাম। এদের আর একটা দোষ চট্ করে চটে যায়। আর কিছু বললে না, হাতীর মুখ ঘুরিয়ে গাছটার দিকে চালিয়ে দিলে, তার পর বেশ যখন কাছাকাছি এসেছি, এই হাত পঞ্চাশেকের মধ্যে, হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জানালে যে জায়গাটায় বাঘের ভয় আছে, বনের শেষে এই ঝরণা, প্রায়ই ওরা জল খেতে আসে এখানে।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক এইভাবে সঙ্কটের

সামনে এনে ফেলে কথাটা প্রকাশ করার জন্যে লোকটার উপর একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু ঠিক এই ধরণের লোককে আর চটানো বিবেচনার কাজ হবে না বুঝে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

নলিনীবাবু বললেন, "শাস্ত্রে এর ভাল ব্যবস্থা আছে শৈলেনবাবু—যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু এ হতভাগা আমাদের পরীক্ষা করছে, তায় সেদিন একটা বাঘ মারবার যশটা আমিই নিয়েছিলাম, মারি আর নাই মারি—তাই ভাবছি কি করে অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যায় যাতে বীর-ধর্ম্ম রক্ষা হয়।"

সাহসী বলে আমারই যে খুব নাম আছে এমন নয়, তবে ভরা মধ্যাহ্ন, জঙ্গল প্রায় নেই বললেই চলে, এমনই কেমন ভয় আসে না, তার উপর একটা ভাল বন্দুক রয়েছে শৈলেনবাবুর হাতে। আমি একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করলাম, "এক কাজ করা যাক না মাঝামাঝি, গাছ-তলাটাতেই যাই, তার পর হাতীর পিঠ থেকে না নেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেই হবে।"

মনের কথাটাও বললাম, "শেষে জলখাওয়াটা শুধু ঐ ঝর্ণার জলে সারবার ইচ্ছে আছে নলিনীবাবু, নইলে আপশোষ থেকে যাবে।"

নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন, বললেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে ক্যাণ্টের ক্রিটিক্ অব পিওর রিজন্—এতগুলি বইয়ের মধ্যে আসল বই কথামালাটাই আপনার বাদ পড়ে গেছে শৈলেনবাবু? আমরা নীচে জল খাচ্ছি, আর উপর থেকে বাঘ যদি বলে—ওরে অর্ব্বাচীন, তুই আমার পান করিবার জল ঘোলা করিতেছিস কোন্ সাহসে?—তখন?"

হো হো করে হেসে উঠলাম। হ'লও ভাল, বিপদের মুখেই হাসি, বীর-ধর্ম্ম ভাল করেই বজায় রইল, সঙ্গে সঙ্গেই করণ বাহাদুরকে ইসারা করলাম হাতীটাকে এগিয়ে দিতে।

করণ বাহাদুর হাতীর কানের গোড়ায় হাঁটু দুটো চেপে 'অঘঃ' না ঐরকম কি একটা শব্দ করলে—সামনে যাবার। হাতী কিন্তু এগল না। তিন-চার বার ঐরকম করবার পরও যখন অগ্রসর হ'ল না তখন কান থেকে অঙ্কুশটা খুলে নিয়ে মারলে উল্টো দিক দিয়ে একটা বাড়ি, তার পর তাতেও নড়ে চড়ে না দেখে দিলে খোঁচার দিকটা খানিকটা বসিয়ে। হাতীটা আর্ত্তনাদ করে উঠল, কিন্তু নড়ল না। তার পরই তার ভঙ্গি গেল বদলে, শুঁড়টা চালাতে লাগল, শরীরটাতে আস্তে আস্তে দোল দিতে লাগল, একটা যেন ঐ রকম নূতন ধরণের ভাব। করণবাহাদুর সামনে গলাটা বাড়িয়ে কি যেন পরীক্ষা করছিল, হঠাৎ হাতীটা সামনে হন্ হন্ করে এগুতে আরম্ভ করলে।

করণ বাহাদুর মাথাটা একবার ঘুরিয়ে বললে—"হুজুর, কষে হাওদা ধরে থাকুন..."

"কেন রে?"

"হাতী পাগল হবে...হয়েছে..."

বলতে বলতেই হাতীটা গাছের নীচে এসে পড়েছে, ধারেই একটা নীচু ডাল ছিল, হাওদায় লেগে মটাস্ ক'রে গেল ভেঙে, আমরা হাওদার পাদানের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম বলে বেঁচে গেলাম, সরু ডাল বলে হাওদাটাও নষ্ট হ'ল না, কিন্তু বেশ খানিকটা একপেশে হয়ে গেল। করণ বাহাদুর মার ছেড়ে আদর খোসামোদ ধরেছে, আমরা গাছের মাঝখানে একটা বেশ মোটা ডালের নীচে এসে পড়তেই বললে—"এই ডালটা ধরে উঠে পড়ুন হুজুর, আর কোন উপায় নেই, ক্ষেপেই উঠেছে।"

আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বাহাতটা পেছনে করে ক্রমাগতই তাগাদা করতে লাগল—উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাল ধরে উপরের মোটা ডালটায় চলে যান —নইলে ..."

আমরা আর বিলম্ব না করে ডালটা জড়িয়ে উঠে পড়লাম। সেই ডালটা থেকে একটা ফ্যাকড়া বেরিয়ে উপরে একটা বেশ মোটা ডাল ঘেঁসে উঠে গেছে, সেইটে বেয়ে আমরা তার উপর গিয়ে বসলাম। হাতীটা তখন একেবারে ক্ষেপে গেছে, প্রথমে শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাওদা আর মাহুত দুটোকেই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, হাওদাটা একেবারে পেটের কাছাকাছি নেমে এল, করণ বাহাদুর কিন্তু ঝুঁকে পড়ে ওর কানের গোড়া দুটো ধরে চেপে পড়ে রইল। হাতীটা শুঁড়টা আছড়াচ্ছে ওকে ধরবার জন্যে, কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে যে ওকে স্পর্শই করতে পারছে না ভাল করে।

আমরা প্রায় উঠে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এ ডালটার তলা থেকে সরে গিয়েছিল, ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার ফিরে এল, তারপর আমরাও চেঁচিয়ে উঠেছি 'তুমিও উঠে এসো করণ বাহাদুর' বলে, সেও ঘাড়টা কি ভেবে একটু তুলেছে, এমন সময় হাতী ডালটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, বার তিন চার দুলিয়ে দুলিয়ে যেন দেখে নিলে কতটা শক্ত, তারপর একটা প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে মড় মড় করে ডালটা ভেঙে ফেললে। নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—"শাস্ত্রবাক্যের মূল্য আছে শৈলেনবাবু।"

বললাম—"ভাবছি, করণ বাহাদুরও উঠে এল না কেন—"

"বোধ হয় শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ বলে··আমাদেরই প্রথম চান্স নিতে দিলে, মূর্খের নানা দোষ তো···"

ডালের গোড়াটা তখনও গুঁড়ির সঙ্গে লেগে রয়েছে, হাতীটা সেইটে চেপে চেপে ধরতে লাগল নিজের গায়ে, অর্থাৎ করণ বাহাদুরকে পিষে মারতে চায়, হাওদাটা দিতে লাগল বাধা, পেট থেকে ঝুলে পড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে আর সেইজন্যেই শরীরের সঙ্গে ডালটার একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছেই। শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু কতকটা এই রকম টানাটানিতে এবং কতকটা নিজের ভারে ডালটা এক সময় আলাদা হয়ে গিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। হাতীটা আবার দুলিয়ে দুলিয়ে তুলে নিয়ে দেখলে সদ্ব্যবহার করা যায় কি না, তারপর আবার একটা চীৎকার করে হন্ হন্ করে গাছের তলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। করণ বাহাদুর একবার ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে কি বললে—'আঙ্গু-ইঙ্গু' দিয়ে হলেও বেশ বুঝলাম, বলছে—ভয় ক'রো না আছি।

নলিনীবাবুরও পরিহাস-প্রিয়তা বন্ধ হয়ে গেছে, বললেন —এত ভয়ের মধ্যে লোকটা এখনও শুধু আমাদের ভয়ের কথাই ভাবছে মশাই! কি কাণ্ড! কি ধাতু দিয়ে এরা তৈরি!"

হাতিটা বাড়ীর দিকেও না, ষ্টেশনের দিকেও নয়, রাস্তা একেবারেই ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের সমতলের দিকে এগিয়ে চলল। শেষ যা দেখলাম—একখানি প্রায় মণখানেকের পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে পেছন ঘেঁষে ছুঁড়ে মারলে। পাথরটা করণ বাহাদুরের হাতকয়েক দূর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাওদাখানিকে চুরমার করে দিলে। এর পর গোটা দুই আওয়াজ ছাড়া হাতীর খবর আর কিছু পাওয়া গেল না, শেষটা মনে হ'ল, মাইল দুয়েক দূরে কোনখান থেকে এল যেন।

এবার চিন্তা হ'ল কি করা যায়। হাতীর আওয়াজ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যা দেখা গেল তার পর নামতে আর কারুর সাহস হচ্ছে না। করণ বাহাদুর ভরসা দিয়ে গেল, কিন্তু সেও নিতান্ত অনিশ্চিত একটা ব্যাপার, হাতী যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাকে শেষ করে না ফেলে, তবু ও-হাতীতে চড়ার আর কথাই উঠতে পারে না। এক, যদি ওটাকে কোনরকমে রূপনগরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেখান থেকে তাঁরা তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করবেনই।

গাছেই বসে আছি, শরতের ছোট বেলা, দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে পড়ল, রোদ হয়ে উঠল হলদে। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু উপায় কিছু নেই। যতই সময় যেতে লাগল, আলোর সঙ্গে আশাও হয়ে আসতে লাগল স্তিমিত; এই ভয়টাই মনে অধিকার বিস্তার করতে লাগল—নিরম্বু উপবাস দিয়ে সমস্ত রাত্রিটা গাছের উপর কাটাতে হবে নাকি! একটা কোন ব্যবস্থা করে নিতেই হবে যে।

গাছটা চেনা গাছ নয়, কোনও ফলও নেই যে চেনা না হলেও পরীক্ষা করে দেখা যেত। গাছের নীচেও মাত্র লম্বা লম্বা ঘাস, মত্ত হাতীর দাপটে বিমর্দ্দিত হয়ে রয়েছে। সম্বলের মধ্যে সিগারেটের টিন, আর আমার নস্যির ডিবে। এক সময় একটা সিগারেট টানতে টানতে নলিনীবাবু বললেন—"এ অবস্থায় নিশ্চিন্দি হয়ে সিগরেট টানার মধ্যে একটা বীরভাব আছে বটে, কিন্তু তাতে চলবে না। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এল, একবার নেমে একটু সন্ধান নিতেই হবে। পাহাড়ে আতা থাকা খুব সম্ভব, তার কয়েকটা গাছও আমি দেখেছি আসতে আসতে···দাঁড়ান হয়েছে, একটা জায়গাও আমার মনে পড়ছে, পথের ধারেই, বেশী দূরও নয়···"

এ ডালটা বেশ মোটা, মাঝখান থেকে অনেক ছোট বড় ডাল বেরিয়ে যাওয়ায় পড়বারও ভয় নেই। নলিনীবাবু একটা ডাল ধরে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীচের দিকে দৃষ্টি পড়তে এক রকম চেঁচিয়ে উঠলেন—"শৈলেনবাবু জোর বরাত—উদ্যোগিনপুরুষসিংহম্—কি যে বলে·· ঐ দেখুন!"

ওঁর তর্জ্জনী অনুসরণ করে দেখি অস্তপ্রায় সূর্য্যের রাঙা আলো পড়ে ঘাসের ভেতর কি একটা চিকচিক্ করছে। একটু লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম—আমাদের টিফিন কেরিয়ারটা। তার একটু দূরেই আর একটা কি চিকচিক করে উঠল, ঠাহর করতেই বোঝা গেল আমাদের বন্দুকটা —হাওদা কাৎ হতেই দুটো নিশ্চয় নীচে পড়ে গিয়েছিল।

আমি নলিনীবাবুকে ধরে ফেললাম, বললাম, "আপনি কলকাতার মানুষ, মনুমেণ্ট হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু গাছে উঠা-নামা করাটা আমারই এলাকার মধ্যে পড়ে, বসুন আপনি।"

একটু অনুযোগের দৃষ্টিতে চাইলেন নলিনীবাবু, বললেন, "আমি দেখলাম, আর আপনি আত্মসাৎ করবেন, তার পর 'আমার কলকাতা আর আপনার বেহারের পেট' এই ছুতোয় বড় ভাগটা দখল করবেন—এ বীর-ধর্ম্ম হয় না শৈলেনবাবু···"

ডালপালার মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি পর্য্যন্ত বেশ গেলেন নলিনীবাবু, তার পরে নামতে যাবেন, কি যেন একটা দেখে

থমকে গেলেন, তার পর যেভাবে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ফিরে এসে আবার বসলেন আমি বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপারখানা কি নলিনীবাবু, ফিরে এলেন যে।"

বেশ বোঝা গেল গলা শুকিয়ে গেছে. টিনটা আমার কাছে ছিল, বললেন, "সিগারেট একটা।"

দু-একটা টান দিয়ে বললেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে শৈলেন-বাবু, আর ফিরে যেতে হবে না—"

"সে কি!"

একটা চরম ভয় আর নিরাশার জন্যেই বোধ হয় নলিনী-বাবুর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা আবার ফিরে এসেছে, সিগারেটেও বোধ হয় একটু কাজ হয়েছে, বললেন, "পুরুষ-সিংহ চিতার পাল্লায় পড়েছেন, সুন্দরী আবার সদ্য-প্রসূতি…"

"কোথায়?"

নলিনীবাবু নীচু হয়ে এক দিকে চাইলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি প্রায় শ'খানেক হাত দূরে একটা ছোট, হাতত্তিনেক উঁচু টিলার উপর হামাগুড়ি দিয়ে একটা চিতা বসে মাঝে মাঝে লেজ আছড়াচ্ছে আর দুটি বাচ্চা সেই লেজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে।

অস্তমিত সূর্য্যের আভায় একটা দুর্লভ-দৃশ্য, কিন্তু সে দেখবার আর সময় নেই। আমরা যে ডালটা ধরে উঠে-ছিলাম এই বড় ডালে, তাড়াতাড়ি সেটি ধরে নীচের ডালে নেমেই কোমরের র‍্যাপারটা খুলে ডালে বাঁধতে আরম্ভ করলাম। শৈলেনবাবু প্রশ্ন করলেন—"ব্যাপারখানা কি? অভ্যর্থনায় যাচ্ছেন? আরে, সেই রাজা কি, তাঁর মতন অতিথি-সৎকারটাই তো ভালভাবে করা যাবে—"

বললাম, "আপনিও নেমে আসুন তাড়াতাড়ি এই ডালে, গেরোটা চেপে ধরুন, বন্দুকটা নিয়ে আসি, অত ঘুরে যাবার সময় নেই।" উনি আসতে আসতেই আমি র‍্যাপার ধরে পা-টা নামিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর এগুনো গেল না।

এখান থেকে দৃষ্টির আর কোন প্রতিবন্ধক নেই; মনে হয় হাতীর ব্যাপার থেকেই চিতাটার বোধ হয় এই জায়গাটির উপর লক্ষ্য ছিল, র‍্যাপারটা ঝুলে পড়তেই বোধ হয় একটু সতর্ক হয়ে পড়েছিল, আমার পা নামতে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তার পরেই হনুমানের মত আগে পিছে দুলে দুলে অগ্রসর হ'ল। আমি যে উপরের ডালটা পর্য্যন্ত পৌছুতে পারলাম, তার কারণ নিশ্চয় বাচ্চারা পিছু ডেকে দিয়ে থাকবে। একটু পরেই শাবক দুটিকে সঙ্গে করে আধ-ছোটা হয়েই এসে ঘাড় তুলে একটা আওয়াজ করলে।

নলিনীবাবুর চরিত্র দেখে বিস্মিতই হয়ে গেলাম, সম্মুখ বিপদের মধ্যে ওঁর কৌতুকপ্রিয়তাটুকু যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। বোধ হয় এইটে বজায় রেখে উনি চিন্তার পথটা রাখছেন পরিষ্কার। বললেন, "শৈলেনবাবু, মশাই, সামান্য একটা চিতা-বাঘিনীর ভয়ে হাত-পা আলগা হয়ে পড়ে যাওয়া বীর-ধর্ম্ম হবে না, তার চেয়ে এক একটা ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখি আসুন র‍্যাপার দিয়ে।"

বললাম, "চিতা তো কিন্তু গাছে ওঠে।"

"জানি, বাঁধা থাকলে আমাদের লড়বারও সুবিধে হবে, 'উই স্যল ফাইট উইথ আওয়ার ব্যাক টু দি' ডাল।… নিন্ এইবার এই ক'টা হাত দিয়ে বেশ ভাল করে গুঁড়ো করুন দিকি। আপনার তো বেহারের খৈনি দলা হাত।"

টিনে গোটা চল্লিশ সিগরেট ছিল, অর্দ্ধেকগুলো আমায় দিলেন, প্রশ্ন করলাম, "একি হবে?"

"বারুদ, আপনার নস্যির ডিবেটাও উজোড় করতে হবে। কিছু নাও হতে পারে, তবু কোন জিনিসই অবহেলার নয়, একেবারে সামনাসামনি এলে, দু'মুঠো ঝেড়ে দেব, চোখে নাকে যদি যায় তো দিতেও পারে কাজ। বেটি তো পণ্ডিতবংশের মেয়ে নয়—নস্যি নাও বরদাস্ত হতে পারে।"

নীচে থেকে একটা আওয়াজ হ'ল, "হুম্!" একটু গা ঢাকা হলে বোধ হয় বেশী খোলে।

নলিনীবাবু চাপা গলায়ই উত্তর করলেন, "বেশ তো, বসে বসে শাস্ত্র আলোচনা করা যাবে।"

আমরা বেরিয়েছিলাম ত্রয়োদশীর দিন। দিনটাও শুভ, আর অন্তত পূর্ণিমাটা বাড়ীতে কাটাব এই রকম ইচ্ছা ছিল। সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ হয়ে উঠল স্পষ্ট।

সৌন্দর্য্যে ভীষণতায় অত অপরূপ পৃথিবীকে আর কখনও দেখি নি। আমার মনে হয় সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতর করে বিকশিত করবার জন্যে তার পেছনে চাই একটা ট্রাজেডি। তাই হয়েছিল সে রাতে, আর তো তোমায় ছেড়েই যাচ্ছি হে মুগ্ধে ধরণী—হে চির-নবীনা পুরাতনী…

না, এ কথাটা বোধ হয় একটু বেশী রকম ভাবালু হয়ে পড়ল। আমরা যে এত নিবিড়ভাবে সেদিন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলাম তার আরও একটা কারণ ছিল—যতই রাত এগুতে লাগল ততই বুঝতে লাগলাম বাঘিনীর গাছে উঠবার কোন অভিসন্ধি নেই। আশ্চর্য্যই বোধ হতে লাগল—প্যান্থারই হোক, লেপার্ডই হোক, গাছে উঠা চিতাবাঘের স্বপ্ন, কিন্তু সেদিকে আমাদের নৈশ অতিথির কোন রকম তাগিদ নেই। একবার সুধু গোড়ার দিকে গুঁড়ির কাছে এসে ঘাড় উঁচুনীচু করে যেন তদারক করে গেল, তারপর আর কিছু নয়। ঠিক বুঝতে পারা

যাচ্ছে না; হতে পারে, উপরে যখন শত্রুই রয়েছে, বাচ্চাগুলোকে একা ফেলে রেখে যেতে চায় না, এও হতে পারে যে মানুষ-শত্রুরই অভিজ্ঞতা আছে। কিংবা এও হতে পারে ভেবেছে—শিকার ত মুঠোর মধ্যে কিসের তাড়া এত, অবরোধের দ্বারা শত্রুকে করতলগত করা যাক্ না।

জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, আমাদের সামনে গভীর অ-গ্য, ওদিকে বিস্তীর্ণ সমতল, মাঝখানে আমাদের এই কতকটা পাতলা পাহাড়-বন। আমাদের গাছটা খুব পুরনো, কিন্তু খুব ঘন ডালপালার নয়, দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত সমস্তটুকুই আমাদের দৃষ্টির সামনে ঝলমল করছে। রাত্রির প্রথম অংশটা ছিল শুদ্ধ, তারপর যতই গভীর হতে লাগল ততই এদিকে ওদিকে এক একটা যে আওয়াজ উঠতে লাগল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর।

আমাদের পায়ের নীচে আমাদের মৃত্যু। সুনিশ্চিত, বেশ জানি, একটু যে অনিশ্চয়তার কথা ভাবছি সেটা একটা সান্ত্বনা মাত্র, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশও তো।

নলিনীবাবু বললেন, "শৈলেনবাবু, বাঘিনীই তো, নোলা আছে, আমাদের জ্যোৎস্নায় জারিয়ে নিয়ে তারপর খাবে।"

এক সময় ডি. এল. রায়ের সেই গানটাও ধরলেন—আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো···বেশ উন্মুক্ত গলাতেই।

নীচে থেকে মাঝে মাঝে বাঘিনী—হুম্ হুম্ করে সায় দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সঙ্গত।

এক সময় ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন—"শৈলেনবাবু, মরবার আগে ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই আর যেন মানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়। বড় কুৎসিত আমরা! চেয়ে দেখুন নীচে, কি অদ্ভুত সুন্দর! ভাবছি, মানুষ আমরা কাপড়-জামার ফাঁকিবাজির সৌন্দর্য্য নিয়ে লোপাটই হয়ে গিয়ে ওদের জায়গা ছেড়ে দিই না কেন এবার, বুদ্ধির যুগের বোকামিটা দেখাও তো হ'ল অনেক, এবার একটা সৌন্দর্য্যের যুগই আসুক না।"

ভোর হ'ল। আমরা মানুষের জগতে ফিরে এলাম। আবার একটা অদ্ভুত ধরণের আশা বাঁচতে হবে, উপায় বের কর।···আদি যুগ থেকে যে বিবস্বান্ মানুষকে এসেছেন বাঁচিয়ে, বেদ-সঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন পূজা, তাঁকে যুক্তকরে অভিনন্দন করলাম ।···হে দেব, যাচ্ছি, তবু মানুষের হয়ে তোমায় যে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার অবসর পেলাম, এও তো পরম সান্ত্বনা।

আজও বাঁচালেন, দিবালোকে রহস্যটা প্রকাশ পেল। সকাল হতে বাঘিনীর চেহারা গেল বদলে।···এ কি রকম কথা!—সমস্ত রাত ছাঁ-পো নিয়ে উপোসী বসে আছি, কিনা স্রেফ গান গেয়ে রাত কাটিয়ে দিলে!

লেজ আছড়াতে লাগল আর উপরে চেয়ে চেয়ে হুঙ্কার, তার পরেই ছুটে গিয়ে তর তর করে গুঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে গেল। তার পর কিন্তু সেখান থেকে এক লাফে নেমে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে থাবা দিয়ে মুখ আঁচড়ে আবার বাচ্চাদের মধ্যে এসে বসে হাঁকাতে লাগল। আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়, দু'জনেই কাঠ হয়ে বসে আছি।

বারচারেক এ রকম হয়ে গেলে, নলিনীবাবু উঠলেন, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনলেন না, বললেন, "এ বীর-ধর্ম্ম নয় শৈলেনবাবু, সুন্দরী আসতে পারছেন না, দেখতে হয় তো সিংহদ্বারে কি বাধা পাচ্ছেন।"

পরে টের পেলাম আন্দাজটা করে নিয়েছিলেন বলেই এত সাহস। নিষ্কম্প পদে প্রায় ডালের গোড়ার কাছাকাছি পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন, তার পর খানিকক্ষণ ধরে দেখে দেখে চীৎকার করেই উঠলেন একরকম—"শৈলেনবাবু, নারায়ণী সেনা! শীগ্গির দেখে যান—ভয় নেই···"

বাঘিনীও খানিকটা এগিয়ে এল, কিন্তু তারপর আর কেন এল না বলতে পারি না, সেইখান থেকেই একটা হুঙ্কার ছাড়লে। নলিনীবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন—"থাম্ মাগী, বোঝা গেছে মুরোদ!"

এমন কিছুই নয়, কাঠপিঁপড়ে, কিন্তু এত যে সমস্ত গুঁড়িটি যেন হলদে করে রেখেছে। একটা চাপ, আস্তে আস্তে উপরেও যাচ্ছে নীচেও আসছে, কিন্তু প্রয়োজন হলে যে কত ক্ষিপ্র—তাও দেখে নিলেন নলিনীবাবু, পকেট থেকে রুমালটা দিলেন সেই চাপের গায়ে ছুঁড়ে। কে যেন লুফে নিলে রুমালটা, মিনিটখানেকের মধ্যে সেটা একটা হলুদের স্তূপ হয়ে গেল।

নলিনীবাবু বললেন আর ভয় নেই। এইবার শুধু যুদ্ধটা আরম্ভ করে দেওয়া।

বিস্মিতই হয়ে গেছি, প্রশ্ন করলাম, "সেনারা তো আমাদের দিকেও আসতে পারে, আসেই নি বা কেন?"

নলিনীবাবু বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না মনে হয় মাঝের গুঁড়িটার উপরই কোন বড়গোছের ভোজ পেয়েছে···আমাদের সন্ধান পায় নি এখনও এটাও ঠিক। যাক, তাড়াতাড়ি লড়াইটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক।···খুব কিন্তু তরস্ত হতে হবে আর খুব সাবধান···"

একটা লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে তার মাথাটা পিঁপড়ের চাপের উপর ধরলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সামনের পাতার অংশটা হলদে হয়ে গেল; নলিনীবাবু গোড়াটা

আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললেন—"আলগোছে ধরে নিয়ে গিয়ে শীগ্‌গির বেটির সামনে ফেলে চলে আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডাল ভেঙে নিলেন।

বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডালটার উপর, কে জানে, বোধ হয় আমাদেরই একজন পড়ল ভাবলে।

অবস্থাটা বুঝতে না বুঝতে একেবারে গোটা চার ডাল তার ঘাড়ে পিঠে গিয়ে পড়ল ঝপ ঝপ করে।

তার পরই সে কি আছড়ানি আর চীৎকার! গাছের গোড়াটা যেন চষে ফেললে, তার পর উঠে আর বাচ্চাদের দিকে নজর না দিয়ে সোজা দৌড়, ঝর্ণা ডিঙিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলের দিকে, তার পর ভুলটা বুঝতে পেরে ঘুরেই সোজা শালবন।

আর দেরি করা নয়, বন্দুকটি আগে হাত করা দরকার। ডালে আলোয়ান বেঁধে আমরা নেমে এলাম, খুলে আনবার উপায় পরে ভাবা যাবে।

বাচ্চা দুটো কিরকম হকচকিয়ে গেছে, মায়ের অবস্থা দেখে ওদিকে এগোয়ও নি, একটাকে তুলে নিয়ে নলিনীবাবু বললেন, "গেরো দেখুন না, এখন ওঁর ছেলেমেয়ে মানুষ কর তোমরা ব'সে ব'সে!..."

আগে চল

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে বিশ্বজন, শোন শোন আজ নিয়ত চলার গান,
গেয়ে চলে কবি, কণ্ঠে কণ্ঠে হউক সে চলমান।
বিদ্যুৎগতি সপ্ত অশ্ব সূর্য্যের রথ টানে
চলে অবিরাম দিগ্‌দিগন্তে আঁধারের সন্ধানে।
রথচক্রের ঘর্ঘরে ওঠে গতিবেগ চঞ্চল
আলোকের ধূলি ঠিকরিয়া পড়ে আলোকিয়া নভোতল।
দিনের সূর্য্য নিশীথে দীপ্ত উদয়-অস্ত নাই,
আকাশ হইতে পৃথিবীতে পড়ে আলোক সর্ব্বদাই।
অবিরাম গতি অক্ষয় জ্যোতি পৃথিবীর সম্বল
চলমান ধরা, মধুআস্বাদী চলার অমৃত ফল।
সূর্য্যের পানে চেয়ে দেখি তার অয়ন অব্যাহত
অচলায়তনে জাগে সন্ত্রাস, তমিস্র পরাহত।
সৃষ্টির আদি হ'তে চলা তার নিমেষেও বিরাম নাই,
অতএব চল আগে চল সবে, আরো আগে চলে যাই।

যে নদী বহিয়া চলে অবিরাম নির্ম্মল তার বারি
যে বীণার তারে অনাহত সুর মহাকাশে ঠাঁই তারি;
যে ফুলের রঙে দাগ ধরে নাকো, সে ফুলে দেবতা পূজি'
অন্তর মাঝে আমার আমিরে তন্ময় হয়ে খুঁজি।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন দেয় সুগন্ধ মনোলোভা।
প্রবল প্রবাহ ক্ষীণ তরঙ্গে বাড়ায় নদীর শোভা।
শয়ানে থাকারে বলি কলিকাল, দ্বাপর জাগিয়া ওঠা,
উঠিয়া দাঁড়াই সেই ত্রেতাযুগ, সত্যযুগই ত ফোটা।
দেহ-আত্মার চরম বিকাশ নিয়ত চলার মাঝে
সব পাপ সব হীনতা নাশিয়া আপনি মুক্তি রাজে।
বসিয়া বসিয়া দিন গণে যারা হারায় শ্রেষ্ঠ ধন
পাপ ঢোকে তার জীবন-রন্ধ্রে, শ্রীহীন শ্রান্ত জন;
অগ্রগামীর সখা সহচর দেবতা দাঁড়ান পাশে
যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্য বসিয়া বসিয়া হাসে;
যে উঠে দাঁড়ায় তার সাথে তার ভাগ্য দাঁড়ায় উঠে
হারানো দিনেরে ফিরায়ে আনিতে মূর্খ যে বৃথা ছুটে।
অতএব চল, আগে চল ভাই, চেয়ো না পিছনে ফিরে
দেখ সম্মুখে উদয় সূর্য্য, জীবন-সাগর-তীরে।

রাজা রঘুনাথ মল্লের বয়স ও শক্তি অনুযায়ী ক্রমান্বয় বিভিন্ন ওজনের ব্যায়াম সরঞ্জাম, যে লৌহদণ্ডে গাঁট লাগাইয়া আবার খুলিয়াছিলেন তাহা এবং হাতের চাপে যে লৌহদণ্ডকে বক্র করিয়াছিলেন তাহার আলোকচিত্র [ফটো—লেখক

রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালষণ্ডদেব বাহাদুর

শ্রীবিধুভূষণ জানা

ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। অতীত কালে ইহা উড়িষ্যাধিপতির শাসনাধীনে ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা রঘুনাথের পূর্ব্বপুরুষ রাজা সর্ব্বেশ্বরনারায়ণ মল্লদেব সিক্রী ফতেপুর অঞ্চল হইতে পুরীর শ্রীক্ষেত্র পর্য্যটন করিতে আসিয়া এই মহকুমায় বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে তিনি ঝাড়গ্রামে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা উগালষণ্ডদেব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইঁহার বংশধরেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিজেদের বাহুবলে রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে নাম মাত্র রাজস্বে ইঁহারা ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করেন।

এই বংশের রাজা সর্ব্বেশ্বর একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে ও শক্তি-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া রাজন্যবর্গের দ্বারা 'মল্ল' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অধস্তন প্রায় অষ্টাদশ পুরুষের রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালষণ্ডদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়।

রাজা রঘুনাথ একজন অমিত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শক্তি-ক্রীড়ার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এদেশের শরীরচর্চ্চার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। বর্ত্তমান কালের ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বলদেহীদের নিকট তাহা বিস্ময়কর মনে হইবে। কারণ আজকাল সাধারণ ভাবে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ত মানুষ বাংলাদেশে অতি বিরল। রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীর-শ্রেষ্ঠদের কাহিনী আমাদের নিকট এখন নিছক গল্পে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকে পাশ্চাত্যের স্যাণ্ডো ও রাশিয়ার ক্রোমারের শক্তির পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন। এবং আমাদের দেশের শ্যামাকান্ত, ভীম ভবানী ও রামমূর্ত্তির কাহিনীগুলিও গল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। এমন কি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোবর বাবুর কথাও যেন লোকে ভুলিতে বসিয়াছে।

আমি রাজা রঘুনাথের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। রাজপরিবার ও প্রতিবেশী প্রাচীন মাতব্বরদের দ্বারা তাহা যাচাই করিয়া লইয়াছি। আমি আরও দুই জন অসাধারণ শক্তিশালী

বাজগ্রাম রাজপরিবারের প্রাচীন ব্যায়ামাগার। উচ্চ-উগাল পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে অবস্থিত [ফটো—লেখক

ব্যায়াম-সরঞ্জাম। প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃহৎ নাল। ইহা ভার-উত্তোলনের ব্যায়ামে ব্যবহৃত হইত। ১ম দিকের এক জোড়া মুগুরের ওজন একমণ পঁচিশ সের, ২য় জোড়ার ওজন একমণ বত্রিশ সের। রাজা রঘুনাথ এই সরঞ্জামগুলি লইয়া ব্যায়াম করিতেন। [ফটো—লেখক

পুরুষের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। এ সমস্ত আমার সংগৃহীত তথ্যের পরিপোষক। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষে এরূপ আরও শক্তিমান্ পুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইবে।
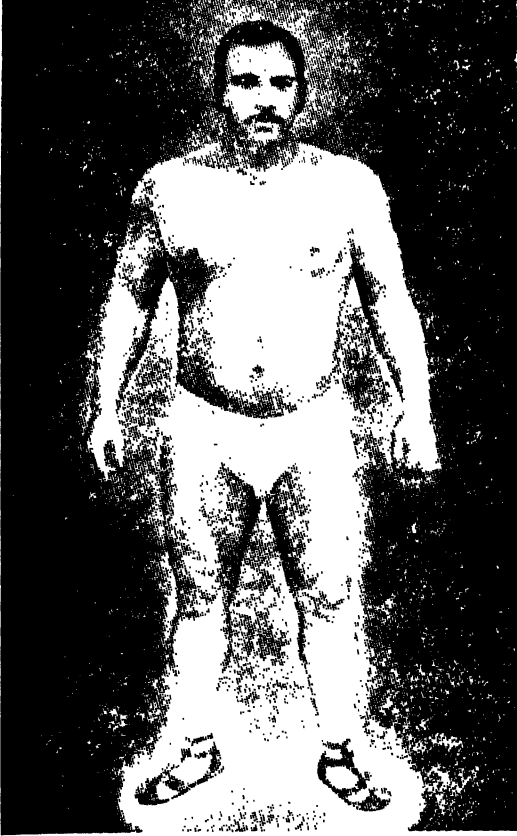
রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালষণ্ডদেব বাহাদুর

রাজা রঘুনাথ ১২৭২ সালে আষাঢ় মাসে রথোৎসবের পূর্ব্ব-দিন ঝাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় এক দিন তিনি কোন কারণে ঝাড়গ্রামে ফিরিবার গাড়ী ধরিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরে রাত্রি-যাপনের অসুবিধা বুঝিয়া পদব্রজে ঝাড়গ্রামে রওনা হইলেন। মেদিনীপুর হইতে ঝাড়গ্রামের পথ জঙ্গলাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসস্থল, সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার জন্ত তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দৌড় বন্ধ করিলেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে রাত্রি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে অবিরাম দৌড়াইতে হইয়াছিল। তিনি নিজ গড়ে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে সকলে বিস্ময়াভিভূত হইয়া যায়। ইহা সহপাঠী ও প্রতিবেশীগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায়, তিনি একাধিক বার অবিরাম দৌড়ে এই সুদীর্ঘ ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী।

রঘুনাথ আঠার বৎসর বয়স হইতে ঝাড়গ্রাম গড় পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ ও সু-উচ্চ উগালের বহির্ভাগে 'ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে' তাঁহাদের প্রাচীন আখড়ায় নিয়মিত শক্তিচর্চ্চায় মনোযোগী হন, তিনি প্রথম মথুরার অধিবাসী ছয়ারী চোবে নামক একজন প্রসিদ্ধ মল্লকে নিযুক্ত রাখিয়া মল্ল-ক্রীড়ার সঙ্গী করেন এবং ক্রমে ক্রমে শক্তি-চর্চ্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পঞ্জাবের গোলাপ খাঁ ও সাহাদালী খাঁ, গুজরাটের বখরি মিঞা, এটোয়ার সুন্দর সিং এবং কাশীর শালগ্রাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে প্রায় পনর-কুড়ি বৎসর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁহার শক্তিপরীক্ষা হইত। রাজবাড়ীতে যে-কোন উৎসবের সময় মল্লযুদ্ধ ও নানাবিধ শক্তি-ক্রীড়ার প্রদর্শনী একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা রঘুনাথ প্রায় এক মণ করিয়া দুইটি মুগুর দুই হাতে ভাঁজিতেন। আড়াই মণ ওজনের পাথরের 'পাল' এক হাতে মস্তকের উপর উত্তোলন করিতেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ 'জাঙ্গাল' (প্রায় তিন মণ) দুই হাতের সাহায্যে মাথার উপর তুলিতে পারিতেন।

রাজা রঘুনাথ এক মণ ওজনের মুগুরকে একটি হস্তাঙ্গুলির উপর রাখিয়া খেলা দেখাইতেন। খোট খেজুর ও তাল গাছের জট ধরিয়া অনায়াসে উৎপাটন করিতেন। বৃহৎ তাল ও শাল গাছের উপরের কিছু শিকড় ও মাটি উঠাইয়া মূলদেশে শিকল বাঁধিয়া অবনত দেহে তাহা নিজ স্কন্ধদেশে জড়াইতেন এবং সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া বৃক্ষটিকেও উৎপাটিত করিতেন। চারিটি অনুচ্চ গুঁড়িকাঠের খুঁটির উপর দুইটি বৃহৎ কাঠের বীম সমান্তরালভাবে রাখা হইত। তাহার উপর হাতী উঠাইয়া, বীমের নীচে নামিয়া—বীম দুটিতে পৃষ্ঠদেশ লাগাইতেন। অতঃপর বীম সহ হাতীটিকে পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া ভারসাম্য বজায় রাখিতেন। দুই হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য ও ½" ব্যাসের লৌহদণ্ডে দড়ির ন্যায় গাঁট দিতেন। এক সময় মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত মহাশয় ঐ প্রকার একটি লৌহদণ্ড আনিয়া রাজা রঘুনাথকে গাঁট দিতে বলিয়াছিলেন—রঘুনাথ অনায়াসে তাহাতে গাঁট দিয়া ক্ষীরোদ বাবুকে হতবাক্ করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবু এই গাঁট দেওয়া লৌহটিকে পাশ্চাত্যের কোন এক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য যতটুক তদপেক্ষা একটু অধিক ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি থামে, দুইটি বৃক্ষে অথবা দুইটি বৃহৎ খুঁটির মধ্যে উপুড় ভাবে শয়ন করিয়া পদদ্বয় দ্বারা ও হস্তদ্বয়ে থাম দুইটিকে ঠেলিয়া ফাঁক করিয়া দেওয়ার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির সহিত সমান্তরাল

ভাবে শরীরকে থাম দুইটির শীর্ষদেশে উত্তোলন করিতেন ও ভূতলে নামাইতে পারিতেন। একবার একটি বিশাল নিম্ব-বৃক্ষের দুইটি বিপরীত দিকে প্রসারিত শাখার ব্যবধানে এই প্রকার প্রচাপন দেওয়ায় বৃক্ষের মূল কাণ্ডটি দুই শাখার সহিত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বুকের উপর পনর-ষোল মণ ওজন গ্রহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইতেন। তিনি টাগ্-অফ-ওয়ারে একক একদিকে থাকিয়া প্রায় একশত সাধারণ ব্যক্তির গতিরোধ করিতেন।

তিনি কেবলমাত্র শক্তি-সাধনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে, বস্তুতঃ তিনি বিভিন্ন বিদ্যায়ও সফলতা-লাভ করিয়াছিলেন—জ্যোতিষ বিদ্যায়, সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

রঘুনাথের দৈহিক ওজন ৩ মণ, উচ্চতায় ৫''-১১'' ইঞ্চি, বাহু ২০ ইঞ্চি, ছাতি ৫২ ইঞ্চি ছিল। তিনি বাং ১৩১৭ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা রঘুনাথের পৌত্র রাজা নরসিংদেব নিজ বদান্যতা গুণে বাঙালী মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনিও একজন কৃতী ব্যায়ামবীর এবং শিকারী, তিনি প্রগতিমূলক ও জাতীয় কল্যাণকর বহু প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা এবং একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার তুল্য দাতা ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৭

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন, সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন, অসহযোগের ভীতি, বাংলার হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে বাঙালীর আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি, কিছুই সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। ১৬ই অক্টোবর হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলা বিভক্ত হইবে স্থির হইল।

বাঙালী জাতির একতা ও অবিভাজ্যতা প্রমাণ ও স্মরণ করিবার জন্য ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) বাঙালীকে রাখীবন্ধন উৎসব ও প্রতিগৃহে অরন্ধন ব্রত পালন করিবার উপদেশ দিয়া রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির স্বাক্ষরে সংবাদপত্রে এক আবেদন প্রচারিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা দিলেন, উভয় বঙ্গের মিলন-চিহ্নস্বরূপ পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া মন্ত্র বলিতে হইবে—

> ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই—
> আমরা এক, আমরা অখণ্ড।

বাংলার সর্ব্বত্র হিন্দুরা ৩০শে আশ্বিন শোক-দিবস পালন করিলেন। কোন গৃহে উনুন জ্বলিল না।

কলিকাতায় কি ভাবে ৩০শে আশ্বিনের রাখীবন্ধন-উৎসব পালন করা হইল জানিবার জন্য দেবানন্দ ও তাহার বন্ধুরা ব্যগ্রভাবে সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতার সংবাদপত্র আসিলে দেবানন্দ আগে একখানি কাগজ সংগ্রহ করিয়া এই বিবরণ পড়িতে বসিল। সে পড়িল রাজধানীতে দোকানপাট, বাজার, যানবাহন চলাচল সব বন্ধ ছিল। সকালের দিকে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, ছাত্র, মাষ্টার, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, ভদ্র ও সাধারণ উভয় শ্রেণীর অসংখ্য লোক খালি পায়ে গান করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। গোটা কলিকাতা শহর যেন রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। মোড়ে মোড়ে সওয়ার পুলিস, সার্জ্জেণ্ট, কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া, তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন শহরে একটা বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছে তাহারা।

ফেডারেশন ষ্ট্রীটের মাঠে বিরাট সভায় অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী আনন্দমোহন বসুকে আরাম কেদারায় শয়ান অবস্থায় সভাস্থলে আনা হইল। সভাশেষে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ চৌধুরী। ছাত্র ও ছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে গান করিল—

> বাংলার মাটি, বাংলার জল,
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
> বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
> বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
> সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
> বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
> বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে বালক ও যুবকগণ প্রভাতী সঙ্গীত গাহিয়া নগর ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করিল; বালক,

বৃদ্ধ, যুবক পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। সকলে মিলিয়া স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। বাংলার আকাশ-বাতাস সেদিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের বেদনায় গোষ্ঠীগত ভাবে সেই প্রথম অভিভূত উভয় বঙ্গের বাঙালী দেশের হাটে, মাঠে, ঘাটে ঘোষণা করিল :

ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই ভেদ নাই।

প্রাদেশিক ও অর্থনৈতিক রূপ অতিক্রম করিয়া বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সর্ব্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল সেই স্মরণীয় ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন হইতে।

বাংলার প্রবল উত্তেজনার তরঙ্গ উৎকল, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাবে শিক্ষিত-সমাজ ও ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা আনিল। দূর নৌশেরা, রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর হইতে স্বদেশী সভার সংবাদ আসিতে লাগিল। একখানি কাগজ লিখিল—স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবে মনে হইতেছে।

মাদ্রাজে ছয় হাজার ছাত্র সভা করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইল। মধ্যপ্রদেশ হইতে খবর আসিল অমরাবতী সরকারী স্কুলের কয়েকজন ছাত্র স্বদেশী-সভায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া শিক্ষকগণ তাহাদিগকে বেত্রপ্রহার করিয়াছেন ও স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। খালি পায়ে স্কুলে যাইবার অপরাধে ঢাকা কলেজ ও স্কুলের ২৭৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দিবার ও বাকী ছাত্রদের নিকট কৈফিয়ত চাহিবার খবর পৌঁছিল। বাংলার ছাত্রমহলে বিক্ষোভ দেখা দিল।

দেবানন্দ বরিশাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কলেজের দুইটি ছেলের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইহাদের নাম মহেন্দ্র ও অতুল। অতুল ছিল শক্তিমান, স্পষ্টবাদী ও সাহসী, ইংরেজের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। মহেন্দ্র ছিল নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপ্রবণ ছেলে। সে ভাল গান করিতে পারিত। রাজনীতি চর্চ্চাতেও তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহার প্রিয় কাগজ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা। তাহা ছাড়া হিতবাদীতে কাব্যবিশারদ কি স্বদেশী কবিতা লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কোন্ নূতন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন—এ সকল সে সাগ্রহে সংগ্রহ করে ও বন্ধুদের পড়িয়া শোনায়।

কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে স্বদেশী প্রচারের জন্য ছাত্রকমিটি গঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার কমিটি ছাত্র-সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিবৃতি প্রচার করিল। এই বিবৃতি প্রকাশের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষভাবে ছাত্র-সমাজের উপর পড়িল এবং কুখ্যাত লায়ন ও কারলাইল সারকুলার বাহির করিবার প্রস্তাব উঠিল।

নূতন বৎসরের প্রথম দিকের কথা।

কলেজের হোষ্টেলে অতুল ও মহেন্দ্রের ঘরে অথবা হোষ্টেলের পিছনের দিকে বকুলতলায় মাঝে মাঝে স্থানীয় ছাত্র কমিটির বৈঠক বসিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা হোষ্টেলের ঘরে বৈঠক বসিলে অতুল পকেট হইতে কয়েকখানা হ্যাণ্ডবিল বাহির করিল। বলিল, দেবানন্দ, তুমি কেবল খুঁতখুঁত কর কোন কাজ হচ্ছে না, এই দেখ।

সে চেঁচাইয়া একখানি হ্যাণ্ডবিল পড়িতে লাগিল—

"বাংলার ঘরে ঘরে স্বদেশীমন্ত্রের প্রচার!

স্বদেশীব্রত পালনের উদাত্ত আহ্বানে দেশবাসীর অপূর্ব্ব সাড়া!

বঙ্গভঙ্গে মর্ম্মাহত বাঙালীর বজ্রকঠোর পণ!

মিশনরী স্কুলের খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীগণ জুতা ও মোজা ত্যাগ করিয়া খালি পায়ে স্কুলে যাওয়াতে পাদ্রীপুঙ্গবের ক্রোধ। মৈমনসিংহের মুচীগণ বিলাতী জুতা মেরামত করিতে অস্বীকার করিল। ধোপাদের নূতন বিলাতী কাপড় কাচিতে অস্বীকার। কালীঘাটের ধোপারা আর বিলাতী কাপড় কাচিবে না। বাখরগঞ্জের উড়িয়া পাচক ও ভৃত্যেরা সভা করিয়া জানাইয়াছে যে সকল বাড়ীতে বিলাতী জিনিস ব্যবহার হয় তাহারা সেখানে কাজ করিবে না।

আরও শুনুন—বিলাতী সিগারেটের ধূমপায়ী বাবু-ভায়াকে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। বিলাতী কাপড় বেচিতে না পারিয়া মাড়োয়ারীদের মাথায় হাত। বঙ্গ-কুলললনাগণ কাঁচের চুড়ি ও চীনা মাটির খেলনা ভাঙ্গিলেন। নেটিভ খ্রীষ্টান সমাজ বিরাট সভা করিয়া ঘোষণা করিলেন—বিলাতী জিনিস বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ! ভাটপাড়ার পণ্ডিতকুল-চূড়ামণির বিহারের জেলায় জেলায় স্বদেশী প্রচার।"

অতুলের পড়া শেষ হইলে সকলে হাততালি দিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিল। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এ হ্যাণ্ডবিল কোথায় পেলে?

অতুল—নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেরা বিলোচ্ছিল।

নির্ম্মল নামে একটি ছেলে বলিল, অতুলদা, আজকের 'প্রতিজ্ঞা' কাগজে একটা গ্র্যাণ্ড কবিতা বেরিয়েছে, শুনবেন?

অতুল—কি বলেছে কবিতায় আগে বল শুনি।

নির্ম্মল—বলেছে বিলাতী মার্চেন্টদের মালভর্ত্তি জাহাজগুলো বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়ে দাও।

অতুল হাসিল। বলিল, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া বটে! কবি ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুত বল? ইণ্ডিয়ান মিরর এই কবিদের সম্বন্ধে কি বলেছে শুনবে? বলেছে, বাবা-সকল, স্বদেশীর জন্য, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন কর, ভালই কিন্তু বস্তা বস্তা বালু ঢেলে সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ করবার, পল্টন মেরে ফোর্ট উইলিয়ম দখল করবার প্রস্তাবগুলো আর করো না,

বক্তৃতা-মঞ্চে উঠে পাগলা দরবেশের নাচ দেখিও না আর। সবাই হাসে এতে।

নির্ম্মল অতুলের হাসিতে ও কথায় ক্ষুণ্ণ হইল। অতুল বলিল, তুমি চটো না নির্ম্মল, তোমার এই "নাচ নাচ চামুণ্ডা" আর "হে মাতঃ দুর্গা অসুরদলনী" এই জাতীয় আস্ফালন আমি সহ্য করতে পারি নে। মা মা করে চীৎকার করলে লিভারপুলের লবণ আর ম্যানচেষ্টারের কাপড় বোঝাই জাহাজগুলো ভুস্ করে তলিয়ে যাবে বঙ্গোপসাগরে?

নির্ম্মল চটিয়া গেল। বলিল, আপনার কানে এ ছাড়া আর কিছু পৌঁছায় না দেখছি। ভাল কাজ দুটো তৈরি করেছেন অতুলদা। রাজপুত বীরদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্ত আবেদন, বাংলা মায়ের দুঃখমোচন করবার জন্ত চীন ও জাপানের পথে চলবার আবেদন—এ সব কানে পৌঁছয় না। শিবাজী মহারাজের গৌরবগাথা আপনি শুনতে পান না।

নির্ম্মলকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মহেন্দ্র বলিল, অতুল ঘোর নাস্তিক, ওর কথা ছেড়ে দাও। স্বদেশীব্রত সফল করবার জন্ত কালীঘাটে পূজা এবং হোমের কথা শুনে ও হাসে। মা কালীর সামনে স্বদেশী ব্রত পালন করবার প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে শুনে ওর হাস্তের উদ্রেক হয়। কিন্তু ইংলিশম্যান কাগজ রাগে কাঁপছে, বলছে—বাঙালী বাবুর দল স্বদেশী ভাঁওতা দিয়ে নিরক্ষর জনসাধারণকে বিপথে চালাচ্ছে, গবর্ণমেন্টের উচিত এর প্রতিবিধান করা।

দেবানন্দদের ছাত্র কমিটির কাজ তেমন ভাল চলিতেছিল না। ফুলারী-শাসনে দমননীতির চাকা জোরে ঘুরিতে লাগিল। শীঘ্রই ফুলারের বন্দেমাতরম-বিরোধী সারকুলার জারি হইল। তারপর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের লয়ালটি সারকুলার, কারলাইল ও লায়নের সারকুলার। অনেক অভিভাবক ভয় পাইলেন, অনেক ছাত্রের উৎসাহে ভাটা পড়িল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এণ্টি-সারকুলার সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ও মফস্বলের অনেক শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। দেবানন্দ, অতুল ও মহেন্দ্র পুরাতন ছাত্র-কমিটির কয়েকজনকে লইয়া একটি শাখা স্থাপিত করিল।

ইহার কয়েকদিন পরে লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে তাঁহার বিখ্যাত অসহযোগের বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আইন-সভার দেশী সভ্যরা, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ম্যুনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের সভ্যগণ এবং ইউনিয়ন পঞ্চায়েৎগণ পদত্যাগ করুন, দেশের সকল লোক এক বৎসরের জন্ত শোক-চিহ্ন ধারণ করুন, সকল রকম আনন্দ-উৎসব বন্ধ রাখুন।—এই বক্তৃতা কয়েকদিন খুব উত্তেজনার সঞ্চার করিল দেশের মধ্যে। কিন্তু উত্তেজনা কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিল না।

দমননীতির চাকা আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রংপুরের কীর্ত্তিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সন বদলী হইয়া আসিবার পর হইতে শহরের হাওয়া গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেদিন সমস্ত শহরময় উত্তেজনার ঝড় বহিতে লাগিল। মিঃ এমার্সনের আদেশে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিবার অপরাধে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলেকে বেত্র-প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইয়াছে, খবর রটিল।

সন্ধ্যার দিকে হোষ্টেলে অতুলদের ঘরে কয়েকজনের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল। দেবানন্দকে সকলের অপেক্ষা বেশী উত্তেজিত দেখাইতেছিল। অতুল গুম হইয়া তাহার তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিল।

মহেন্দ্র বলিল—ফুলার, এমার্সন ও কেম্প মিলে বরিশালকে শেষ করবে ঠিক করেছে। শুনলাম সেদিন কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে সেটলমেণ্ট অফিসার মিঃ জ্যাকের বোট লক্ষ্য করে নদীতে নাকি মাটির ঢেলা ছুঁড়েছিল। এই অপরাধে বানরীপাড়ায় পিটুনি পুলিস বসাবার আদেশ দিয়েছে ফুলার সাহেব। বরিশালে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করবার জন্ত গুর্খা সৈন্ত আমদানী হচ্ছে। তাও শুনেছি।

দেবানন্দ বলিল—ছেলেরাও চুপ করে বসে নেই। বন্দেমাতরম্ বলায় ধমকে দিলে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ঢাকায় চার হাজার ছেলে সরকারী স্কুল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে। আসানসোল স্কুলের ষাট জন ছেলেকে এই অপরাধে বের করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু ছেলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবানন্দ আবার বলিল—তোমরা এমার্সনের আদেশে বন্দেমাতরম্ বলবার জন্ত ছেলেদের বেত মারার ব্যাপার শুনে উত্তেজিত হয়েছ, কিন্তু তোমরা জান না সেদিনকার স্বদেশীসভায় যোগ দিয়েছিল বলে জেলা স্কুল ও টেকনিকাল স্কুলের প্রত্যেক ছেলেকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করবার আদেশ দিয়েছে এমার্সন। এদিকে মাদারিপুরে কি হয়েছে জান? এক সরকারী চাপরাশির সঙ্গে বন্দেমাতরম্ বলা নিয়ে ছেলেদের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। চাপরাশির ধমকানিতে উত্তেজিত হয়ে ছেলেরা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে ফুলারের আদেশে ছাত্রদের প্রকাশ্যে বেতমারা হ'ল আর জরিমানা হ'ল দেড়শো টাকা।

খানিকটা রাত করিয়া দেবানন্দ সে দিন বাড়ীতে ফিরিল। জীবানন্দ আপিসঘরে তখনও কাজ করিতেছিলেন। পুত্রকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। ধীর স্বরে বলিলেন—কাল থেকে সকাল সকাল বাড়ী ফেরবার চেষ্টা করো। সময় ভাল নয়।

দেবানন্দ দাঁড়াইয়া পিতার কথা শুনিল, তার পর ভিতরে

পরদিন জীবানন্দ চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া জীবানন্দ রাজনগর হইতে চাকুরিস্থলে ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে জগদ্ধাত্রীর অসুখের আবার বাড়াবাড়ি হইল। ইহাতে হরিনারায়ণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

বড় ছেলে প্রসন্নের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে জগদ্ধাত্রীর শরীর ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান নাই। কিছু দিন হইতে হরিনারায়ণের স্বাস্থ্যও একটু একটু করিয়া ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ফল বাহির হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বৈষয়িক কাজে মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। জগদ্ধাত্রী প্রস্তাব করিয়াছিলেন ইন্দ্রকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া এবার বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার কাজে বসাইয়া দাও। হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন —শুধু শুধু কেন তার লেখাপড়া বন্ধ করব? আমি যতদিন আছি সে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করুক।

স্বামীর শরীর খারাপ হইতে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর আগে যেন তিনি যাইতে পারেন ভগবানের কাছে মনে মনে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন। মাঝে মাঝে ভাবিতেন ইন্দ্রের বৌ আনিয়া তাহাকে সংসার বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিবেন। বড় ছেলের কথা তাঁহার মনে পড়িত। বিবাগী হইয়া সে না চলিয়া গেলে এত দিনে তাহার বৌ আসিয়া সংসারের হাল ধরিত। তাঁহার গত জন্মের পাপের শাস্তি পাইয়াছেন! এ জন্মে ত কোন পাপ করেন নাই—আগের জন্মের পাপ না থাকিলে কপালে এত শাস্তি লেখা ছিল কেন?

ইন্দ্রের সম্বন্ধে স্বামীর কথার উপর তিনি আর কিছু বলিলেন না। স্থির হইল, পাস করিলে সে সদরে পড়িতে যাইবে।

ইন্দ্র এখন উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ তরুণযুবক। আগেকার উচ্ছ্বাস-প্রবণতা খানিকটা চলিয়া গিয়াছে, তাহার জায়গায় আসিয়াছে চিন্তাশীলতা ও গভীরতা। অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, চাপা হাসিতে ঝলকাইয়া উঠে, চিবুকের তীক্ষ্ণতা কোমল হইয়া আসে। বাহিরের কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার মনে হয় ইহার কৈশোর এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই।

জগদ্ধাত্রী অসুস্থ হইয়া পড়িবার দিন দুই আগে নিজের ঘরে বসিয়া দেবানন্দের সঙ্গে চিঠি-পত্রে যে সব আলোচনা চলিতেছিল ইন্দ্র তাহাই ভাবিতেছিল। পুলিসের অত্যাচারের ফলে স্বদেশী আন্দোলনে যেন ভাটা পড়িয়াছে, এখন কি করা কর্ত্তব্য দেবানন্দ সেই কথা লিখিয়াছিল। দেবানন্দের কথাগুলি নিজের মনে আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সর্ব্বমঙ্গলার মৃত্যুর দিনকয়েক আগেকার কথা।

তাঁহার অসুখের সময় ইন্দ্র প্রতিদিন খবর লইবার জন্ত টোলপাড়ায় যাইত। প্রথম দিন গিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া সে একটু অবাক হইল চিনির বিয়ের পরে লক্ষ্মী আর তাহাদের বাড়ীতে বিশেষ যায় না। কয়েক মাস পরে ইন্দ্র তাহাকে দেখিল।

লক্ষ্মী এখন আর অনর্গল কথা বলে না। তাহাকে দেখিলে —এই যে ইন্দির দাদা বলিয়া সম্ভাষণ করা অনেক দিন হইল সে ছাড়িয়াছে। আজকাল দেখা হইলে চকিতে একবার চাহিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে দুই-একটি কথায় জবাব দেয়। তাহার এই নূতন গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে হয়ত কখন-সখন একটু ঠাট্টা করে। ঠাট্টা শুনিয়া সে মৃদু হাসে, আগের মত পাল্টা ঠাট্টা করিবার চেষ্টা করে না। পথে-ঘাটে হঠাৎ দেখা হইলে সে যেন একটু জড়সড় ভাব দেখায়। পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ডাকিলে দাঁড়ায়, কিন্তু মাথা নীচু করিয়া এমন অস্বস্তির ভাব দেখায় যে, ইন্দ্র আশ্চর্য্য বোধ করে।

প্রথম যেদিন সে সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিবার জন্ত টোলপাড়ায় গেল সেদিন তাহাকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণ না করিয়া লক্ষ্মী এমন ত্রস্তভাবে সরিয়া গেল যে ইন্দ্র বিস্মিত হইল। পরের দিন লক্ষ্মীদের বাড়ীতে ঢুকিতে গিয়া সে দেখিল লক্ষ্মী বাহিরে কোথায় যাইতেছে। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, ইন্দ্র তাহাকে ডাকিল। লক্ষ্মী দাঁড়াইল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, লক্ষ্মী, তোমার কি হয়েছে? আমার সামনে তুমি অমন কর কেন? - বিস্মিত হইয়া সে দেখিল লক্ষ্মীর মুখ সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। অতি ধীরে সে বলিল, কিছু ত হয় নি। তারপর যাইবার জন্ত পা বাড়াইল। কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি কি রাগ করেছেন আমার উপর? ইন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল, না না, রাগ করব কেন? লক্ষ্মী ফিরিয়া চলিল। কয়েক পা গিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল। ইন্দ্র দেখিল তাহার চোখ-মুখ খুশীতে ঝলমল করিতেছে। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল ইন্দ্র সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই সামান্ত ঘটনাটা প্রায়ই ইন্দ্রের মনে পড়ে। তাহার মনে হইত একান্ত সহজ ব্যাপারটার আড়ালে কি যেন একটা ঘটিয়া গেল। লক্ষ্মীর এত খুশী হইবার কি ছিল, সে রাগ করে নাই এই কথা কয়টি শুনিয়া? আর সেই-বা এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এত মাথা ঘামাইতেছে কেন? কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিলেও কথাটা প্রায়ই তাহার মনে পড়ে।

জগদ্ধাত্রীর অসুখের বাড়াবাড়িতে এ সব চিন্তা কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। সদর হইতে সাহেব ডাক্তার আসিল,

চিন্ময়ীর শ্বশুর বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনা হইল। চিন্ময়ীর বড় বোন মৃণ্ময়ীর গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। নিজের সংসার ফেলিয়া সে মাতার রোগশয্যার পাশে দিন-রাত বসিয়া রহিল। দিদি শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদে, চিনি ছেলে-মানুষ, ইন্দ্র নিজে চৌলপাড়ায় গিয়া ত্রিনয়নীকে ডাকিয়া আনিল। হরিনারায়ণ স্ত্রীর অসুখে কেমন অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিজের শরীরও ভাল নয়। সমস্ত দায়িত্ব ইন্দ্রের কাঁধে আসিয়া পড়িল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া ত্রিনয়নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কয়েক দিন যমে মানুষে টানাটানি করিয়া জগদ্ধাত্রী এই ধাক্কা একটু যেন সামলাইয়া লইলেন। হরিনারায়ণ স্ত্রীকে বলিলেন, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি! তোমার শরীর আর একটু ভাল হলে বাইরে গিয়ে মাস কয়েক থাকব। চুনার কিংবা বিন্ধ্যাচলে বাড়ী নেব ঠিক করেছি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন, তুমি যত ওষুধ খাওয়াও, ডাক্তার দেখাও—আমার শরীর আর ভাল হবে না। তা ছাড়া রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কাল রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

হরিনারায়ণ—কি স্বপ্ন?

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত: করিলেন। তারপর বলিলেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি মৃত্যুশয্যায়। কিসের আশায় যেন প্রাণ বেরুচ্ছে না, অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। হঠাৎ চোখ মেলে দেখলাম ছায়ার মত কে একজন এসে আমার শিয়রে দাঁড়াল। তোমাদের কারো নজর পড়ল না তার উপর, আমি দেখেই চিনলাম তাকে। আমার বড় খোকা। বললাম, খোকা ফিরে এলি বাবা? আমি যে তোর হাতের আগুনের পিত্যেশে মরতে পারছি নে। আমি উঠে বসে তাকে আদর করতে যাব এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। খোকা নিশ্চয় ফিরে আসবে। রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আজ কত বৎসর হইল প্রসন্ন চলিয়া গিয়াছে, জগদ্ধাত্রী এখনও দিন-রাত কেবল তাহার চিন্তা করেন।

ত্রিনয়নী প্রতিদিন আসিয়া তদ্বির করিতেন। তিনি ভার লওয়াতে ইন্দ্র নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিল। এখন মাতা একটু সুস্থ হইয়া উঠায় সে কিছু অবসর পাইল। সে সকালের দিকে কিছুসময় বিষয়-সম্পত্তির কাজ দেখিত, তারপর সারা-দিনের অবসরে রাজ্যের চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিত।

ইন্দ্র নিজের মনে দু:খ করিত দেবুদার মত তাহার মনের জোর নাই। সে বড় দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। বাপের কথা ভাবে, মায়ের কথা ভাবে, সংসারের কথা লইয়া মাথা ঘামায়। সংসারের ভাবনা এত বেশী ভাবিলে কি আর দেশের কাজ করা যায়? তাহার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইত। ভাবিত—হয়ত তাহার আর পড়াশুনা করা হইবে না। সকালে বিকালে কাছারিতে বসিয়া নায়েবের সঙ্গে বকাবকি, মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ, মোড়লদের দরবার শোনা এই করিয়া তাহাকে সারাজীবন কাটাইতে হইবে। তাহার পিতা অবসর সময়ে পড়াশুনা, সঙ্গীতচর্চ্চা, শিকারচর্চ্চা করিয়াছেন। আপদে-বিপদে গরীব লোকেদের সাহায্য করিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে সালিশী করিয়াছেন। সমাজ, সংসার সকলের দাবি তিনি সাধ্যমত মিটাইয়া দিয়াছেন বরাবর। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের দাবি উপস্থিত হইলে তাহাও পূরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার কোথাও কোন ত্রুটি নাই। সে ভাবিত, তাহা হইলে সে কেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সে এই প্রশ্নের একটা সমাধানের সূত্র পাইল দেবানন্দের কয়েকদিন আগের এক পত্র হইতে। দেবানন্দ নিজের মনের দ্বন্দ্বের কথা তুলিয়া লিখিয়াছে, তাহার পিতার মত বয়সের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের কাছে দেশের দাবি যে ভাবে আসিয়াছে তাহার কাছে ত সেভাবে আসে নাই। শুধু তাহার কাছে কেন, তাহার যুগের, নূতন শতাব্দীর কোন বাঙালীর ছেলের কাছে সেভাবে উপস্থিত হয় নাই। তাহার পিতা যে যুগের মানুষ সে যুগের মানুষদের কাছে স্বদেশী আন্দোলন আসিয়াছে মরা গাঙে হঠাৎ আসা জোয়ারের মত। আর দেশ যখন এই জোয়ারের জলে প্লাবিত তখন তাহাদের জন্ম। জোয়ারের জল সরিয়া যাইতেছে, এই প্লাবনের মধ্যে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, বাঁচিবার জন্য তাই আজ তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইন্দ্র ভাবিল—ঠিক কথা, কিন্তু রাজনগরে বসিয়া, সংসারের ভার কাঁধে লইয়া সে কি চেষ্টা করিতে পারে? দেবুদা কি চেষ্টা করিতেছে তাহাও সে কিছু খুলিয়া লেখে নাই।

ইন্দ্র সংসারের কাজকর্ম্ম করে, পিতার কাছে, মাতার কাছে দুই বেলা নিয়মিত বসে, ত্রিনয়নী রোগীর সম্পর্কে যাহা করিতে বলেন তাহা করে, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার মাথায় এক চিন্তা থাকে—সে কি করিবে? ত্রিনয়নীর সঙ্গে লক্ষ্মী তাহাদের বাড়ীতে আসে, হরিনারায়ণের সঙ্গে আলাপ করে, জগদ্ধাত্রীর আরামের জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করে। নিজের চিন্তায় ইন্দ্র এত অন্যমনস্ক থাকে আজকাল যে, কোনদিন তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা বলে, দুই-চারি দিন আবার তাহাকে লক্ষ্যই করে না। মাঝখানে কিছুদিন লক্ষ্মীর কথা যখন তখন তাহার মনে পড়িত, মাতার অসুখে, নিজের মনের অশান্তিতে সে সব কবে চাপা পড়িয়াছে। ইন্দ্রের সম্বন্ধে লক্ষ্মীর মনোভাব অনুমান করা কঠিন, সে নিজে যে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল তাহা তাহার ব্যবহারে কিছু বুঝা যাইত না। কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি

সে যে দৃষ্টি রাখিত তাহার পরিচয় পাওয়া গেল শীঘ্রই। সে লক্ষ্য করিত যে ইন্দ্র সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, কি একটা ভাবনা রহিয়াছে তাহার মনে। একদিন সে চিন্ময়ীকে বলিল,

—চিনু, ইন্দ্রদাদা সারা দিন কি ভাবেন এত? জ্যেঠাইমা ত অনেকটা ভাল হয়েছেন তবু কি ভাবেন এত?

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিল—তুই জিজ্ঞেস করলেই পারিস। দাদা কি ভাবে তা নিয়ে তোর এত ভাবনা কিসের?

লক্ষ্মী একটু বিব্রতভাবে বলিল, ভাবনা আবার কিসের? কথাটা মনে হ'ল তাই বলছি। তুই ছোট বোন, তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস নে?

চিনি—ছোট বোন গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, হাঁ দাদা, তুমি দিবানিশি কার ধ্যান কর বল না শুনি? তাই না? দাদা যদি বলে, যা যা কাজিল মেয়ে, তোর অত খবরে কাজ কি, তখন?

লক্ষ্মী—তা কেন বলবেন? তুই ভাল করে জিজ্ঞেস করবি।

চিনি—ভাল করে জিজ্ঞেস করব মানে? গলায় আঁচল দিয়ে হাত জোড় করে বলব? না পা জড়িয়ে ধরে বলব? বরং তুই গিয়ে একটু মিষ্টি করে হেসে বললে কাজ হবে। দেখবি হয়ত বলে ফেলবেন, লক্ষ্মী গো, আমি দিবানিশি তোমারই—

লক্ষ্মী চিনির মুখে হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, তুই বড় যা তা বলিস চিনু। মুখে কিছু বাধে না।

চিনি লক্ষ্মীর হাত সরাইয়া দিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, একটা কথা বলবি ভাই? দাদা—

লক্ষ্মী বলিল, দাঁড়া ভাই, যদু জ্যোঠামশাইকে তামাক দিয়েছে না পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে দেখে আসি। চিনির হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল।

চিন্ময়ীর শ্বশুরবাড়ী হইতে হঠাৎ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য। তাহার শাশুড়ী বড় কড়া লোক। অসুস্থ পিতামাতাকে দেখিবার জন্য তিনি পুত্র-বধূকে পনর দিনের ছুটি দিয়াছিলেন। তাঁহার হুকুম ছিল পনর দিনের দিন বাপের বাড়ীর লোক যেন তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। চিন্ময়ী একথা বাড়ীর কাহাকেও বলে নাই। সতের দিনের দিন কড়া পত্র লইয়া লোক আসিতে তাহার খেয়াল হইল। মাতা এখনও শয্যাশায়ী, পিতার শরীর ভাল নয়, তাহার এখন যাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পত্রে শাশুড়ীর মেজাজের আভাস পাইয়া সে আপত্তি করিবার সাহস পাইল না। ইন্দ্র চটিয়া লোক ফিরাইয়া দিতেছিল, সে নিষেধ করিল। বলিল, ছোড়দা, যাদের ঘরে আমাকে দিয়েছেন তাঁদের চটিয়ে কি হবে? শুধু আমার লাঞ্ছনা গঞ্জনা বাড়বে বই ত নয়?

রওনা হইবার আগে চিন্ময়ী মাতার কাছে গিয়া বসিল কিছুক্ষণ একথা ওকথা বলিয়া শেষে বলিল, মা, আমার একটা কথা শোন। সংসারের এই অবস্থা। তোমাকে, বাবাকে দেখবার লোক নেই। দিদির নিজের সংসার আছে, সে আর ক'দিন করবে? আমার অবস্থা ত জানই, ছোড়দার বিয়ে দাও।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, আমি সে কথা ভেবেছি চিনু। ওঁকে দেখবার এক জন লোক না হলে চলছে না। আমি বিছানা পড়ে আছি, ধমক-ধামকে ঝি চাকর দিয়ে কাজ করাতে হয় নিজে হাতে কিছু করতে পারি নে। ওঁর কি হবে ভেবে মরতে ভরসা পাচ্ছি নে। ভাল মেয়ে পেলে ছোট খোকার বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু খোঁজখবর করে কে?

চিন্ময়ী—এত খোঁজখবরের দরকার কি মা, ভাল মেয়ে তোমার হাতের কাছেই রয়েছে। রূপেগুণে ওরকম মেয়ে কোথায় পাবে?

জগদ্ধাত্রী অনুমান করিলেন মেয়ে কাহার কথা বলিতেছে তবু তিনি বলিলেন, কার কথা বলছিস তুই?

চিনি—তোমার কি চোখ নেই? লক্ষ্মীর কথা বলছি।

জগদ্ধাত্রীর মুখ বিরস হইল। কিছুক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না, শেষে বলিলেন, ছেলের বৌ করব সমান ঘরের মেয়ে এনে। টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না, তা মেয়ে যত ভালই হোক। বংশের গৌরব নষ্ট করব?

চিন্ময়ী রাগ করিল। বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। তা ছাড়া কাকাবাবু ত টুলো পণ্ডিত নন্, তিনি বড় চাকুরে।

জগদ্ধাত্রী—চাকুরের আবার ছোট বড় কি? যে চাকুরে সে-ই চাকর। ও-ঘরের মেয়ে আমি আনব না।

চিন্ময়ী রাগ করিয়া বলিল, যেমন তুমি তেমনি দিদি। তাকে বলতে সেও তোমার মত নাক সিটকালো। কি যে বংশের বড়াই তোমাদের! অমন সোনার প্রতিমার মত মেয়ে—। আমি চললাম, কিন্তু এই বলছি তোমাকে, দেখো গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে। এক দিন হয় ত ঐ মেয়েকেই যেচে—

জগদ্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, যাবার সময় কি যে অলক্ষুণে কথা বলিস চিনি!

চিন্ময়ী উঠিয়া পিতার ঘরের দিকে যাইতে দেখিল লক্ষ্মী আসিতেছে। কাছে আসিয়া লক্ষ্মী বলিল, আমার দেরী হয়ে গেল ভাই আসতে। ভয় হয়েছিল তুই বুঝি চলে গেছিস।

চিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুই যে আবার আসবি আমি ভাবি নি। সকালে কাকীমাকে প্রণাম সেরে তোর সঙ্গে দেখা করে এলাম, কি জানি সময় যদি না পাই, যা তাড়াহুড়ো।

লক্ষীর হাত ধরিয়া সে নিজের ঘরে আনিল। বলিল, যাবার আগে তোকে একটা কথা বলব বলে এ ঘরে আনলাম। শোন, মুখ তুলে তাকা দেখি আমার দিকে।

লক্ষী মুখ তুলিয়া চাহিল। চিন্ময়ী বলিল, তুই ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো, ব্রত, নিয়ম কত কি করছিস। ঠাকুরের কাছে বর চাইবি—ঠাকুর, এতদিন ধরে তোমাকে কত ফুল দুব্বো দিলাম, চিনুর ছোড়দার সঙ্গে আমার বিয়ে ঘটিয়ে দাও। পারবি বর চাইতে?

লক্ষীর মুখ হইতে যেন সবটুকু রক্ত সরিয়া গেল, সে কোন উত্তর দিল না।

চিন্ময়ী তাহার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, জবাব দে। বর চাইতে পারবি না?

দেখিতে দেখিতে লক্ষীর চোখ হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। চিন্ময়ী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল। বলিল, তোর মনের কথা আমি জানি। মনে মনে ঠাকুরের কাছে এই বরটা চাস ভাই। আমি যাবার সময় তোকে মাথার দিব্যি দিচ্ছি।

একটু পরে তাহারা দুই জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া হরিনারায়ণের ঘরে ঢুকিল।

ক্রমশঃ

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়। ইহার বৎসরেক কাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সার্থক হইতেছে না দেখিয়া, একবার বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মূল সূত্রের অন্বেষণ, দুর্ভাগ্য-বশতঃ বাঙালী জাতির পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবন যে সমসূত্রে গ্রথিত, ইহা তলাইয়া না বুঝিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার এই যুগ-পর্ব্বটা চির অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। বেদান্তের কেশরীগর্জ্জন তুলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন, অল্পকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ সব্যসাচীর ন্যায় বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম ভারতেরই ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম ভারতের সনাতন যোগতত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র দুইকেই আশ্রয় দিলেন; কেননা রাষ্ট্রও ভারতের রাজধর্ম্ম। ভারতের স্বাধীনতা অভিনব উপায়ে আসিবে—মহাত্মা বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-সাধনা ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-যোগপথে সেই সময় হইতেই মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী সামসুল আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ ধৃত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বীরেন্দ্রের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বন্দী হইয়া ইংরেজের আদালতে অভিযুক্ত হন। বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী। শ্রীঅরবিন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। যতীন্দ্রনাথ প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত করার প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর "কর্ম্মযোগিনে"র প্রবন্ধের জন্য রাজ-দ্রোহের মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। সেই প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহা "An open letter to my countrymen" শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীঅরবিন্দের "Last political will and testament" বলিয়া জাতীয়তাবাদিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। তদানীন্তন ব্রিটিশরাজ ইহা রাজদ্রোহ-মূলক বোধে শ্রীঅরবিন্দ ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। নিম্ন আদালতের বিচারে মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের দণ্ড হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারে তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। উপরন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নহে বলিয়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি রায় প্রদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রতিদিন অপরাহ্নে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎকার হইত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু অনেক সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার মুখে তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার আয়োজনের কথা শ্রবণ করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে কোনও বিদেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। পরে নিজ অন্তর-বাণী পাইয়া উক্ত প্রস্তাব তিনি সিদ্ধান্তরূপে

বরণ করিয়া লন। রামচন্দ্র মজুমদার ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগিন্ আপিসে শ্রীঅরবিন্দের সহকারীরূপে কাজ করিতেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে এক পান্সী ভাড়া করিয়া তাঁহার চির প্রস্থানের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গী হন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই চন্দননগরের রাণীর ঘাটে তাঁহার নৌকা আসিয়া পৌছিয়াছিল। চারুচন্দ্র রায়ের নিকটে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মারফত তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়। চারুচন্দ্র আমাদের লইয়া সম্প্রতি সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সামসুল আলমের মৃত্যুর পর চন্দননগরে এই প্রসিদ্ধ সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হওয়ায়, বিপ্লবিগণ এই কার্য্য চারুবাবুর অতীত বিপ্লবকর্ম্মের উপর চুণকাম করার নীতি বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন। মনে হয়, চারুচন্দ্র জেল হইতে ফিরিয়া স্বদেশ-সাধনের সাংস্কৃতিক পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সারস্বত উৎসব তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দের আত্মগোপন ব্যাপারে চারুবাবু আর কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের থাকা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই সুরেশচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কানাইলাল দত্তের অতি-নিকট বন্ধু। এই দুই জনেই চারুচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই কথা চারুচন্দ্র রায়ের মুখে শুনিয়া অতি দ্রুত আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমি তাঁহার কাছে সকল কথা শুনিয়া, শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাড়ীতেই আশ্রয় দিই। এই কথা অনেক ক্ষেত্রে উক্ত হওয়ায়, তাহা আর এখানে বিস্তৃত করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ করি না। আমার ন্যায় একজন অপরিচিত মানুষের হাতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিয়া সুরেশচন্দ্র ও শ্রীনলিনীকান্তও যে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিদায় লইয়াছিলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যয় আমার উপর কতখানি হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কোথায় ভবিষ্যতে যাইবেন, তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই বাস করিতে চাহেন। ইহাই আমার রাজনৈতিক বিপ্লবীদের চন্দননগরে আশ্রয়-দানের প্রথম দীক্ষাস্বরূপ হয়। শ্রীঅরবিন্দ আমার বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, তাঁহার অনুরাগের স্পর্শ আমি পাইয়াছিলাম। লোক-জানাজানির ভয়ে তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিতে হইয়াছে। তিনি এক রাত্রি আমার এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন। কিন্তু একরাত্রি বাসের পরই বিরক্ত হইয়া পরদিনই আমার ভবনে চলিয়া আসেন। তারপর গোন্দলপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে তাঁহাকে রাখিয়া আসি; সে বিবরণ অতিশয় বিচিত্র।

কেমন করিয়া নিজের আস্তাবল হইতে গাড়ী-ঘোড়া বাহির করিয়া, নিজেই চালক হইয়া গাড়ী ছুটাই, তাহার বৃত্তান্ত আমার "জীবন-সঙ্গিনী" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। গোন্দলপাড়া হইতে কটকগোড়ায় করের বাগানেও তাঁহাকে কিছুদিন রাখা হয়। সেখানে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথাই হইয়াছিল। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনার কথাই শুধু বলিতেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন। আমার অন্তরের প্রবণতা কোন দিকে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেন।

গোপনে রাখার দায়িত্ববোধে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহাকে লইয়া আসা হইত। করের বাগানের পর আমারই বাড়ীর নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীখানি ছিল তাহা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বশেষে সেখানে গোপনে রাখা হয়। তাঁহাকে এই সময় বিপ্লবী সুদর্শন চক্রবর্ত্তী নামে এক তরুণ যুবককে লইয়া আসা হয়। সুদর্শন কলে চাকুরী করে বলিয়া এই বাড়ী ভাড়া লয়। প্রত্যহ প্রাতঃ ৯টা বাজিলে সে সদর দরজায় তালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত ও সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিত। শ্রীঅরবিন্দ সারাদিন এইখানে বন্দী থাকিতেন। এই সময়ে তিনি আহার করিতেন কিস্‌মিস্, বাদাম আর পেস্তা। সারাদিন বন্দীজীবনের পর রাত্রে চন্দননগরের বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই অজ্ঞাত-বাসকালের তিনটি ঘটনা আমার মনে বিশেষ ভাবে আঁকা আছে।

আমার বাড়ী হইতে তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে গোন্দলপাড়ায় প্রস্থান করেন। এই কয়দিন আমি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার প্রাণপণ প্রয়াস করি। কিন্তু এক জনের নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই কথাই এখানে ব্যক্ত করিতেছি।

সেদিন আমার বাড়ীর কয়েকটি অব্যবহার্য্য গৃহ বে-মেরামতে চেয়ারের গুদামে পরিণত হইয়াছিল। গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতাম। এক দিন ইহা ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। আমি শ্রীঅরবিন্দকে একটি

ক্ষুদ্র কক্ষে রাখিয়া আমাদের চেয়ারের কারখানায় যথারীতি কর্ম্ম করিতে গিয়াছি। উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। যথাসময়ে তাঁহাকে বাহির করিয়া বৈঠকখানায় আনিলাম। তাঁহাকে সেযুগে দেখিয়াছি আত্মভোলা শিবের ন্যায়; চলিতেছেন যেন মাটিতে পা পড়িতেছে না। যখন খাইতেন তাহাও শব্দহীন। হাত-পা নড়িতেছে; কিন্তু কে যেন তাঁহার নিয়ন্তা। শ্রীঅরবিন্দকে আনিয়া অবধি এইরূপ আত্মহারার ন্যায় দেখিয়াছি। তিনি এই সময়ে আত্মসমর্পণ-যোগের কথাই বলিতেন। নিজের হাতখানি উপরের দিকে উঠাইয়া বলিতেন, তুমি মনে করিও না আমি হাতখানি উঠাইতেছি, আমার মধ্যে কোন এক তৃতীয় শক্তি কাজ করিতেছে—আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার অপূর্ব্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতাম—তিনি আর ইহজগতের মানুষ নহেন; শুধু দেহটা এই বিশ্বে বিচরণ করে ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধনে। সেদিন তাঁর চোখের দৃষ্টি আরও অপলক। আমি তাঁহার অপরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নত শিরে তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। ভুলিয়া গেলাম তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছে। এই ঘরেই তাঁহাকে স্নান করাইতে হইবে। নতুবা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িলে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার এত প্রয়াস সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে যে; শ্রীঅরবিন্দের মুখে বাণী সরিল,—তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মতি! আমার কালী-দর্শন হইয়াছে। আজ মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি।"

এই দিন হইতে শ্রীঅরবিন্দ আমার নিকট "কালী" রূপে পরিচিত। তাঁহার অসংখ্য পত্রের শিরোদেশে "ডীয়ার এম্" (Dear M); তাহার পর পত্র শেষ করিয়া "Kali" এই শব্দটি লিখিলেন। তখনও বুঝি নাই শ্রীঅরবিন্দ এই "কালী"-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতেই চলিতে সুরু করিয়াছেন। এদিকে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করামাত্র আমার পত্নীর মুখে শুনিলাম—তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে চেয়ার বোঝাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে চেয়ার সাজানো, তাহার মধ্যে অরবিন্দের আসন পাতা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে সেইখানে উপবিষ্ট ছিলেন। চেয়ার সরানোর শব্দে চাহিয়া দেখিলেন। আমার স্ত্রী তখন অসম্বৃতা। তাঁহার হাতে সম্মার্জ্জনী ছিল। তিনি অকস্মাৎ এই গৃহমধ্যে এক পুরুষমূর্ত্তিকে দেখিয়া সলজ্জ বিস্ময়ে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই সসঙ্কোচে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হন। এই গোপনতার ব্যবস্থা যে আমারই কীর্ত্তি, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সব কথা শুনিয়া তিনি অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের সেবায় অকুণ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দেরই অনুরোধে সস্ত্রীক পণ্ডিচেরী যাই। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। বাল্যকাল হইতেই কিছু-না-কিছু লেখার অভ্যাস আমার ছিল। তখন সবে "উদ্বোধন" নাটকখানি লিখিয়া এক রাত্রে বাড়ীতেই আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দিব্য সম্বন্ধের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আত্মসমর্পণ যোগের কথাই এই নাটকে লিখিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া তাহা শুনিলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, "তোমার লেখার অভ্যাস আছে; আমার ইচ্ছা 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় তুমি নিয়মিতভাবে লিখিবে।" রামচন্দ্র মজুমদার তখন সাপ্তাহিক "ধর্ম্মে"র পরিচালক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে আমি 'ধর্ম্মে' লিখিতে আরম্ভ করি। রামচন্দ্র হয়তো মনে করিতেন লেখাগুলি শ্রীঅরবিন্দের। বস্তুতঃ লেখার দীক্ষা শ্রীঅরবিন্দই আমায় প্রদান করেন। এইবার সর্ব্বশেষ ঘটনার কথাই বলি। আমার বাড়ীর অতি নিকটেই তিনি বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি বেশী দেখা সাক্ষাৎ করিতাম না' নিজের সাধন-ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার সকল প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বটুকুই আমার ছিল। সুদর্শনের মধ্য দিয়া তাহা যথারীতি সম্পন্ন করিতাম। একদিন শ্রীঅরবিন্দ আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন আছ?" আমি বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তখন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়াছি। সংযমের মাত্রা যেন আর রক্ষা হয় না! অন্তর-দর্শী শ্রীঅরবিন্দ যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি আমার অবস্থার কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনিও অনেক উপদেশ দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কালই চলিয়া যাইতেছি। শ্রীশচন্দ্র কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোমাকেও কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।"

আমি শুনিলাম—তিনি পণ্ডিচারী যাইবেন। পণ্ডিচারী ফরাসী রাজ্যের রাজধানী। সেখানে তিনি নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। শুনিয়া বুকটা যেন ভাঙিয়া গেল; দুই মাস তিনি ছিলেন, হৃদয় যেন পূর্ণ থাকিত। অকস্মাৎ

তাঁহার মুখে প্রস্থানের কথা শুনিয়া অমি সবিশেষ বিচলিত হইলাম।

তার পর দিন তাঁহার বিদায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া; সহজভাবেই রাত্রিযাপনের জন্য যথাসময়ে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। শয্যাও গ্রহণ করিলাম। নিদ্রা হইল না। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিল। অন্ধকার-গৃহ, নতুবা পত্নীর নিকট ধরা পড়িতাম। মধ্যরাত্রে শ্রীশচন্দ্রের গলা শুনিলাম। পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিকালেও কি তোমার অবসর নাই?" আমি তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মানুষটির শেষ বিদায়ের দিনে তোমার এইরূপ নিশ্চিন্ততা—সকল কাজেই শেষ রক্ষা করতে পার না!"

আমি ঘরের বাহির হইলাম। জ্যোৎস্নায় সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত। শ্রীশচন্দ্রের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি দুই বাহু দিয়া আমায় বুকে ধরিলেন। সেই স্পর্শ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তার পর বাঁধন খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার হবে। যোগ তুমি পাবে। আমার কথা মনে রাখিও।"

মর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া ভাষা বাহির হইল, "আপনার সহিত আবার কি দেখা হবে?"

তিনি সস্নেহে উত্তর দিলেন, "হবে হবে। অনেক কাজ তোমার সঙ্গে আমার করার আছে।"

তার পর তিনি নৌকায় গিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, যতদূর দৃষ্টি চলে—নৌকাখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তার পর ঘরে ফিরিলাম ভগ্ন হৃদয়ে। কি হইল, তাহা অবর্ণনীয়!

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাস শেষ হয়। সংবাদ না পাইয়া শ্রীশচন্দ্র আসিয়া জানাইল, "ব্যাপার কিছু বুঝা যাইতেছে না, সুদর্শনকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিব মনে করিতেছি।" সুদর্শন পণ্ডিচারী গেল। যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে তাহার একখানি আঁটা-খাম। খামের উপরে আমার নাম লেখা। খামখানা খুলিলাম, সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনটি মন্ত্র তাঁহারই হাতে লেখা—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের। মনে পড়িল তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে পার্শ্বের কক্ষে পল্লী-বালকদের লইয়া হাজার বার চীৎকার করিতাম—'জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে।' এ সেই জ্ঞানের মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র ও প্রেমের মন্ত্র। তিনি নির্দ্দেশে দিয়াছেন—"প্রত্যেক মন্ত্রটি ১০০৮ বার জপ করিতে হইবে।" শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই সময়ে ধ্যান করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও গুরুমন্ত্র ছিল, সাধনাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মন্ত্রদানে আমার অন্তরে দ্বন্দ্ব বাধিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রই সাধিলাম। সেই পত্রের পাশে একটি ঠিকানা লেখা ছিল, ইহা পণ্ডিচারীর কোন ভদ্রলোকের ঠিকানা। সুদর্শন বলিয়াছিল, "অতঃপর এই ঠিকানায় তিনি পত্র দিতে বলিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম সকল বিষয়ক নির্দ্দেশই আপনার নিকট আসিবে, আপনি শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।" সে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন—আমি পূর্ব্ব-দীক্ষিত হইলেও, শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষা সর্ব্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করিলাম।

দেবতা হইয়া জাগো

শ্রীনীলরতন দাশ

শরৎ প্রভাতে শেফালিকা ঝরে শিশিরসিক্ত ঘাসে,
সবুজ ধানের নবীন শীর্ষে স্বর্ণ-কিরণ হাসে।
চারণের দল চন্দনা-শ্যামা বন্দনা গায় বনে,—
অন্তরে কত কামনা যে জাগে, কত ভাব আসে মনে!

কত না ছন্দে সে ভাব প্রকাশ করি আগমনী গানে,—
তবু কি জননী সাড়া দাও তা'তে? জাগো কি মোদের প্রাণে?
তোমার প্রতিমা গড়িয়া বোধন করি মাগো দশভুজা,—
ষোড়শোপচারে মহাসমারোহে করি মোরা তব পূজা।

মুখে ভক্তির বন্যা যে বহে, অন্তরে মরুভূমি;
সকলি ছলনা, সকলি মিথ্যা, সব ফাঁকা,—জানো তুমি।
লালসা-কামনা-কলুষকালিমা-হিংসায় জর্জ্জর
অসুরের লীলা-ক্ষেত্র আজিকে মানুষের অন্তর।

অসুর সেথায় নাচে তাণ্ডব হাসিয়া অট্টহাস,
প্রেত-পিশাচেরা উল্লাসে ফেলে কলুষিত নিঃশ্বাস।
শুষ্ক পাষাণ ঊষর হৃদয়ে নাহি ভক্তির ঠাঁই,—
দেবতারে দূরে পরিহরি' মোরা দানবেরে পূজি তাই।

অসুর-নাশিনী! দনুজদলনী! সন্তানে করি' ক্ষমা
করুণারূপিণী জননীর বেশে এস মাগো নিরুপমা!
মৃন্ময়ীরূপে নূতন চেতনা দাও চিন্ময়ী মাগো,—
দানবীয় এই মানবের বুকে দেবতা হইয়া জাগো!

তপোগিরি বা রামটেক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে হয়, দূরত্ব ও প্রচারের অভাবেই মধ্যভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থান রামগিরি বা রামটেক সারা ভারতের তীর্থযাত্রীর কাছে বিশেষ পরিচিত হয় নি। পুরাতন বিবরণীর মন্দিরে এই রামটেক যে-কোন বড় তীর্থস্থানের সমপর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে।

মধ্যভারতের প্রধান শহর নাগপুরে পৌঁছেই মনে হ'ল রামচন্দ্রের রামটেক যেতে হবে। ক'দিন আগে কার্ত্তিক মাসে উৎসব হয়ে গেল, কিন্তু উৎসবের ভিড়ে সব জিনিষ ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়, তাই সে সময়ে যাওয়া হয় নি। ধ্যান করতে হলে নির্জ্জনতার প্রয়োজন। যেখানে বহুলোকের হৈ চৈ সেখানে দেবতা অপেক্ষা তার পাণ্ডা ও তাদের আড়ম্বরই মনকে দেবতার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়।

রামটেকের দূরত্ব নাগপুর থেকে উত্তরপূর্ব্বে ২৮ মাইল। এই ক্ষুদ্র শহরটি জঙ্গলাকীর্ণ আস্নাগড় পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত। রামটেক পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটি শাখা লাইনের যোগ আছে। রেলপথ ছাড়া ভাল রাস্তা দিয়েও যোগাযোগ আছে—নির্দ্ধারিত সময়ে বাস চলাচল করে। শহরটি রামটেক পাহাড়ের পাদদেশে বেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে—দেখে মনে হ'ল ক্রমবর্দ্ধমান। শহরের ভিতর সরকারী তহশিল আপিস আছে। রেল ষ্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় দু' মাইল।

বহুদূর থেকে রামটেক পাহাড়ের উপরে সাদা সাদা মন্দিরগুলি দেখতে পাওয়া যায়—রামটেক ষ্টেশনে নেমেই এই মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে কিছুক্ষণও অতিবাহিত করা যাবে এই ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গী জৈনধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুটি বললেন, শান্তিনাথের বিখ্যাত মন্দির, বিগ্রহ, গুরুকুল ইত্যাদি দেখে সোজা পথে পাহাড়ে উঠা যাবে। শান্তিনাথদেবের বিগ্রহাদি দেখে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

শান্তিনাথদেবের মন্দির ও গুরুকুল রামটেক পাহাড়ের পরেই একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে বর্দ্ধমান মহাবীর আর্য্যধর্ম্মের শাখা বিশেষরূপে জৈন-মতাবলম্বী এক সম্প্রদায় গঠন করেন—অহিংসাই তাদের মূলমন্ত্র। কথিত আছে, ঋষভদেব এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীরই শেষ তীর্থঙ্কর।

তিন শ' বছর আগেও শান্তিনাথদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালে সেখানে স্থানীয় কয়েক ঘর আদিবাসী ছাড়া বিশেষ লোকজনের বসতিও ছিল না। প্রায় সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তখন ঐ সকল স্থান নাগপুরের ভোঁসলে মারাঠাবংশের আপ্পা সাহেবের অধীন ছিল। আপ্পা সাহেব একদিন মন্ত্রী বর্দ্ধমান শাহজীর সহিত শ্রীরামজীর দর্শনে রামটেক আসেন। ভোঁসলে রামসীতার পূজা শেষ করার পর প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু মন্ত্রী শাহজী বলেন যে, কোনও জৈনমূর্ত্তি দর্শন না হলে তিনি জলগ্রহণ করতে পারেন না। শাহজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিকটেই কোথাও ভগবান তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে, কারণ জৈনশাস্ত্রে লেখা আছে, শ্রীরামচন্দ্র একজন ভক্ত জৈন ছিলেন। আপ্পা সাহেব শাহজীকে তাঁর হাতী নিয়ে কমাটির জৈনমন্দিরে যেতে বললেন, কিন্তু শাহজী মনের বিশ্বাসবশে আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন যে, ছোট পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক নগ্নমূর্ত্তি আছে। শাহজী জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যে লোক নিযুক্ত করেন এবং ভক্তের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়। পর দিন প্রায় ২০ ফুট উচ্চ শান্তিনাথদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথদেব-মূর্ত্তি আবিষ্কার করার পর শাহজী জলগ্রহণ করেন। এই লুক্কায়িত তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আবিষ্কার করায় শাহজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপ্পা সাহেব এই মন্দির-সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। বর্ত্তমানে এই মন্দির নাগপুরের দিগম্বর জৈন-সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, আদিনাথ—এই সকল তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিসমেত আটটি মন্দির আছে। প্রধান মূর্ত্তি শান্তিনাথ-দেবের। মন্দিরগুলির বয়স দু'শ বছরের কিছু বেশী হবে, কিন্তু শান্তিনাথদেবের মূর্ত্তিটি আনুমানিক দু' হাজার বছরের পুরাতন। কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি যখন রামটেকে মেলা হয় তখন এখানেও মেলা বসে এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দিগম্বর জৈনসমাজ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য মন্দির-সংলগ্ন একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শ্রীশ্রীশান্তিনাথদেব গুরুকুল (বিদ্যালয়) ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। এই গুরুকুল ১৯৪৩ সালের ১৪ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারই প্রধান লক্ষ্য নয়—প্রাচ্য সংস্কৃতি, বিশেষ করে জৈনশাস্ত্র শিক্ষাদানই প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্র-সংখ্যা কম, বর্ত্তমানে ত্রিশটির বেশী নয়। ছাত্রদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির জন্য কিছু খরচ দিতে হয়। অবশ্য গরীব ছাত্ররা এই খরচা দেওয়া থেকে রেহাই পায়। আমাদের নিজস্ব আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার যে মহতী প্রচেষ্টা এখানে চলছে তা

দেখে খুব আনন্দ হ'ল। ছাত্ররা ইংরেজী অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বা কাশীর 'বিশারদ' পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়, নাগপুরের বিখ্যাত সমাজভূষণ শেঠ কিশোরীলাল ঘারেকীর অর্থে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

সারা সকাল শান্তিনাথদেবের আশ্রয়ে কাটল। মন্দিরের সেবক ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধুর ব্যবহারে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল। প্রধান দ্রষ্টব্য রামগিরি, তার সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল।

আমরা রামগিরি অভিমুখে রওনা হলাম। ছোট পাহাড়টির পরেই বড় রামটেক পাহাড়। শহরের বর্ত্তীসীমানা এখান পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা সরু রাস্তা উপরে উঠেছে। এটা ঠিক তীর্থযাত্রীদের রাস্তা নয়, স্থানীয় লোকেরা এই রাস্তায় পাহাড়ে উঠানামা করে, গোচারণ করে নজরে পড়ল। পাহাড়ের গা ঘেঁসে ছেলেরা খেলা করছে, বিদেশী নূতন লোক দেখে কোন কৌতূহল নেই। এ রকম যাত্রী দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণতঃ তীর্থস্থানে অভ্যস্তভাবে হাত পাতার নমুনা দেখে বিরক্তি জাগে। কিন্তু এরাও দরিদ্র তবু আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে, মা-বাপের কাছে হাত পেতে দাঁড়াবার শিক্ষা পায়নি।

পাহাড়ের গা ঘেঁসে রামজীর দর্শনে এগুনো গেল। রামটেক পাহাড় বিভিন্ন নামে পরিচিত—রামগিরি, সিন্দুরাগিরি, তপোগিরি ও শৈবালগিরি। উইলসন সাহেব প্রভৃতির মতে রামটেকই মেঘদূতের রামগিরি। সেখানে :

> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

কেহ কেহ অবশ্য বলেন, রামগড় বা অমরকণ্টক পাহাড়েই কালিদাসের রামগিরি আশ্রম। যা হোক, দৃশ্য দেখে মনে হয় সত্যই কালিদাসের মত কবির কাব্যপ্রেরণা জাগাবার উপযুক্ত স্থান। 'কান্তা বিরহগুরুণা' যক্ষ 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' বর্ষকাল এই পাহাড়ে অবস্থান করেন। সেই 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী' বিরহী যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীর কাছে 'প্রিয়ায়াঃ সন্দেশং মে হর' এই বলে অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট মনের ভাব প্রেরণের বাসনা জানান। অনবদ্য মন্দাক্রান্তা ছন্দে এরূপ কাব্যরস-পরিবেশন স্থান-মাহাত্ম্যেই সম্ভব মনে হয়। রামটেকের নিকটেই নন্দর্দ্ধন বা নগর্দ্ধন নামে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামটি চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। মনে হয়, এটি সেই সময়ে কিছুকাল বিদর্ভদেশের রাজধানী ছিল। বিদর্ভদেশের এই রাজধানীতে অবস্থানকালেই কবি কালিদাস রামটেক পরিদর্শন করেন ও সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে মেঘদূত রচনা করেন।

পাহাড়টির অপর এক নাম সিন্দুরাগিরি। পাহাড়ের পাথর ভাঙলে পাথরগুলি লাল রঙের মনে হয়—প্রবাদ হিরণ্যকশিপুর রক্তে এগুলি লাল হয়ে গেছে। হিরণ্যকশিপু ও তাঁর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের পৌরাণিক কাহিনী সুপরিচিত।

রামটেক পাহাড়ের প্রধান দ্রষ্টব্য—'তপোগিরি' এই নামের সঙ্গে যুক্ত। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে শম্বুক নামে এক ভক্ত শূদ্র এই পাহাড়ের উপর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। শূদ্রের পক্ষে এরূপ কঠোর তপস্যা করা তখন ছিল অশাস্ত্রীয়, এবং এই অশাস্ত্রীয় কাজের জন্তে এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকালমৃত্যু হয়। রামরাজত্বের সময়ে রাজার নিকট যে-কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাবার অধিকার প্রজার ছিল। বহু অনুসন্ধানের পর শম্বুকের সেই অশাস্ত্রীয় তপস্যার কথা রামচন্দ্র জানতে পারেন ও রাজা রামচন্দ্র তাঁর চন্দ্রহাস তরবারির সাহায্যে শম্বুকের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ছিন্ন মস্তক ঊর্দ্ধে উঠে রাম নাম জপতে থাকে। ভক্ত শম্বুককে রামচন্দ্র বর প্রদান করতে চাইলে শম্বুক প্রার্থনা করেন তাঁর তপস্যার দ্বারা উন্নত এই পাহাড়—যা তপোগিরি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেইখানে রামজী যেন চারি যুগ বসবাস করেন। অন্য বরে শম্বুক নিজ দেহের শিবলিঙ্গত্বপ্রাপ্তি কামনা করলেন। রামচন্দ্র ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। সেই শিবলিঙ্গই এখন ধুম্রেশ্বরশিব নামে প্রসিদ্ধ। রামজীর অবস্থিতির নিদর্শন হিসাবে এই মন্দিরের উপরে মাঝে মাঝে সকালের শুকতারার ন্যায় এক জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। ভক্ত হিন্দু এই জ্যোতিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আকুলতাবে শ্রীরামচন্দ্র ও ভক্ত শম্বুকের কথা স্মরণ করেন।

এই পাহাড়টিকে শৈবগিরি বা শৈবালগিরিও বলা হয়, কারণ শঙ্কর মহাদেব এই পাহাড়ে অবস্থানের জন্ত আপন ভক্ত বহু শৈবকে আনেন। শূদ্র শম্বুকের শাস্তিবিধানের পর শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসেন, কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃমূর্ত্তি ও পদচিহ্ন নিদর্শন হিসাবে সেখানে থেকে যায়। রামগিরি পাহাড়ের উপরে যে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন ছিল তা কালিদাসের মেঘদূত পাঠে জানা যায়। যক্ষ তাঁর অলকাপুরীতে অবস্থিতা প্রিয়ার নিকট সন্দেশবাহী মেঘকে বলছে —বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু। এই পদচিহ্ন কালিদাস কর্ত্তৃক পূজিত হয়েছিল অনুমান হয়। এই পদচিহ্নের কথা আরও স্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় প্রভাবতী গুপ্তার তাম্রফলক থেকে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের) কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয় বিদর্ভের ভেকটরাজবংশের দ্বিতীয় রুদ্রসেনার সহিত। বিবাহের কয়েক বৎসর পরই রুদ্রসেনার মৃত্যু হয় এবং প্রভাবতী গুপ্তা শিশু পুত্রের নামে রাজত্ব চালাতে থাকেন। বেরারের বাধমপুরের এক তাম্রফলকে আছে যে, ১২ই কার্ত্তিক শুক্ল তারিখে রামগিরির ভগবানের পদচিহ্নের পূজার উদ্দেশ্যে প্রভাবতী দেবী জমি দান করছেন। মহা-

কবি কালিদাসের রচনা ও প্রভাবতী গুপ্তার বিবরণ থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও এই পাহাড়ের উপরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কালক্রমে তা লোপ পেয়েছে, অথবা প্রত্যক্ষ চিহ্ন বিলুপ্ত করে তারই উপর মন্দির তোলা হয়েছে। এরূপ প্রত্যক্ষ চিহ্নের বিলুপ্তির কথা বহু প্রাচীন তীর্থের পূর্ব্ব-ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামসীতার মন্দিরের পরে অন্যান্য বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এটাই সাধারণের অনুমান। রামজী ও সীতাদেবীর পুরনো বিগ্রহ দুটি মুসলমানগণ কর্তৃক ভগ্ন ও কলুষিত হলে দেবতার স্বপ্নাদেশের ফলে এই মূর্ত্তি দুটি পাওয়া যায় দুধওয়ালা পুষ্করিণী থেকে। তাম্রফলকের তারিখ অনুসারে শুক্লা কার্ত্তিকের শেষে এখনও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সময়ে রামটেকে প্রায় এক সপ্তাহকাল মেলা হয়। মধ্যপ্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কিছু কিছু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। প্রধান উৎসব দিনে মধ্যরাত্রে হলুদে রঙের (পীতাম্বর) বস্ত্র রামচন্দ্রের মন্দিরের উপরে পোড়ান হয়। পুরাণে আছে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে হত্যা করেন, সেই পীতাম্বর দাহ ব্যাপারটি সম্ভবতঃ মহাদেবের 'ত্রিপুরাসুর-হত্যার স্মারক হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিবস রামনবমীতেও এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়।

শান্তিনাথদেবের মন্দিরে আগে না গিয়ে ষ্টেশন ছেড়েই সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যে পথ ধরেন সেই পথে শহর পার হয়েই পড়ে অম্বালা নামে জলাশয়। এই জলাশয়টি বনানীশোভিত পাহাড়-পরিবেষ্টিত ও জলাশয়টির চতুর্দ্দিকে সাদা সাদা অনেকগুলি মন্দিরের সমাবেশ। এ স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। প্রবাদ আছে যে, একদা সূর্য্যবংশীয় রাজা অম্ব এই পার্ব্বত্যাঞ্চলে শিকারে আসেন। রাজা অম্ব ছিলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত. রাজবৈদ্যরা তাঁকে নিরাময় করতে পারেন নি। সে সময়ে এখানে জলাশয় ছিল না, ছিল মাত্র একটি ঝরণা। তৃষ্ণার্ত্ত অম্ব ঝর্ণার জলপানে পরিতৃপ্ত হয়ে হাত পা ধুতে থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর দেহের যে যে স্থানে সেই ঝর্ণার জল লাগে সেই সেই স্থানে কুষ্ঠরোগের চিহ্ন লোপ পেয়ে যায়। এতে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রাজা সেই জল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় —তারপর রাজার দেহে কুষ্ঠরোগের আর লেশমাত্র চিহ্নও রইল না। রাজা অম্ব কুষ্ঠরোগীদের উপকারের জন্য সেই জল বদ্ধ করে জলাশয় সৃষ্টি করেন। এই জল স্বর্গের মন্দাকিনী ও মর্ত্ত্যবাসীর গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। এখানে পূর্ব্ব-পুরুষের অস্থি বিসর্জ্জন বিশেষ পুণ্যকৃত্য বলে গণ্য হয়। রাজার নামানুসারে জলাশয়ের নাম হয়েছে অম্বালা হ্রদ।

অম্বালা হ্রদে স্নান-পূজা সেরে রামটেক পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে। পাথরের সিঁড়িগুলো কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নীচু, রাস্তাটি বেশ মনোরম। পাহাড়ের উপর বিরাট দুর্গপ্রাকার বেষ্টিত স্থান, তারই ভিতর মন্দির। শিবাজীর মারাঠাশক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে, রামটেক প্রভৃতি স্থান নাগপুরের ভোঁসলের অধীনে আসে। সেই সময়ে মুসলমানদের প্রতাপ মন্দীভূত হয়ে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। তাই ভোঁসলেরাজকে সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হ'ত। এই পাহাড়ের উপর এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করার দুই উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ স্থানটিকে অন্যতম প্রতিরোধ-ঘাঁটিতে পরিণত করা, আর দ্বিতীয়তঃ রামজীর পদাঙ্কিত ও মন্দিরাদি-শোভিত হিন্দু-তীর্থকে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।

বেষ্টনীর প্রবেশ-পথের আগে একটু বাঁ দিকে গেলেই শম্বুকের লিঙ্গমূর্ত্তি ধুম্রেশ্বর মহাদেব। মন্দিরের কাছেই একটি ক্ষুদ্র বস্তী ও দোকান—খাবার জিনিষ বেশ পাওয়া যায়। এর কাছেই প্রায় সম্পূর্ণ একটি ছোট মসজিদ নির্জ্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান-অভিযানের সাক্ষ্যরূপে। এই মসজিদটি নাকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক সেনাপতির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, দেশের বুকের উপর কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু পরধর্ম্মসহিষ্ণু হিন্দু এই স্মৃতিচিহ্নকে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস করেনি। ভক্ত শম্বুকের ধুম্রেশ্বর মন্দিরটি অনাদৃত অবস্থায় আছে, লোকসমাগমও কম হয়।

দুর্গপ্রাচীরের নিকটেই ভগবানের নরসিংহমূর্ত্তি। হিরণ্যকশিপুকে হত্যার পর নৃসিংহাবতার তাঁর বৃহৎ গদা যেখানে নিক্ষেপ করেন সেখানে একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই অতিক্রম করতে হয় বরাহ-দরজা, এখানে একটি বৃহৎ বরাহমূর্ত্তি আছে। ভগবানের এই বরাহমূর্ত্তির উদরের নিম্নভাগে হামাগুড়ি দিয়ে পার হবার মানত থাকে অনেকের, কিন্তু পার হতে গিয়ে কৃতকার্য্য না হলে তাকে পাপী বলে ধরে নেওয়া হয়। বরাহ-দরজার পর সিংহপুর দরজা এবং তারপর মারাঠা-কামানশোভিত ভৈরব দরজা। সেদিনের রক্ষিগণ সম্ভবতঃ মহাদেবের আশিস্ লাভ করে অমিত বিক্রমে এই দরজা রক্ষা করতেন। ভৈরব-দরজার পরেই প্রধান দরজা— গোকুল দরজা, অভ্যন্তরভাগে গোকুলের অধীশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ। এই দরজা পার হয়ে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশ নিষেধ। ক্যামেরা নিয়ে যাবারও নিয়ম নেই—এই সীমার ওপারে। তাই তপোগিরির রামসীতার ছবি পাওয়া যায় না।

উচ্চ পাহাড়ের উপর সুন্দর শুভ্র রামসীতার মন্দির টি— শান্তিনাথদেবের মন্দির বা দূরবর্ত্তী স্থান থেকে দেখা যায়

শ্বেত কপোতের মত মনে হয়। বিগ্রহের সামনে নাটমন্দিরে ভক্তেরা সমবেত হন, মন্দিরে পূজা হচ্ছে, কেউ কেউ ভজন গান করছেন মনের আনন্দে। নাটমন্দিরটিতে ভোঁসলে রাজাদের ছবি আছে আর আছে দোদুল্যমান কয়েকটি তরবারি, মনে হয় একদা সঙ্কটকালের জন্য এ'দের কিছু প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন কেবল শোভাবর্দ্ধন করছে। কষ্টি-পাথরের তৈরী এই বিগ্রহদ্বয় ভক্তের প্রাণে আনন্দ জাগিয়ে তুলছে কত যুগযুগান্তর ধরে।

রামসীতার মন্দির ছাড়া লক্ষণ, কৌশল্যা, হনুমান প্রভৃতির ছোট ছোট মন্দির আছে, সেগুলি বেশী পুরনো মনে হয় না। বামনদেবের মন্দিরটি বরং অপেক্ষাকৃত পুরনো মনে হয়। এই মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ায় উপস্থিত পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। ভৈরব-দরজার উপরে ছোট ঘর ও ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে বসে শহরের দৃশ্য, বিশেষ করে অম্বালা হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম বলে প্রতিভাত হয়। মনে হয় যেন এক অপরূপ রাজ্যে এসে পড়েছি।

রামজী ও অন্যান্য মন্দির দেখা শেষ হ'ল, ইতিমধ্যে সূর্য্যদেবও অনেকটা পশ্চিম দিকে নেমে এসেছেন। তাই ধূম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পথ ধরে অবতরণ করতে হ'ল। রামটেক শহরটি ছোট, কিন্তু লোকসংখ্যা দশ হাজারের বেশী। পোষ্ট-আপিস ইত্যাদি সবকিছুই আছে, ডাকে দু'খানা চিঠি ফেললাম। রামটেক ষ্টেশনের কিছু দূরে ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে—ষ্টেশনের প্রয়োজন এই কারণে আরও বেশী। ষ্টেশন-মাষ্টার একজন বাঙালী ভদ্রলোক দেশ ছেড়ে সবে প্রবাসী হয়েছেন চাকরিসূত্রে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে গাড়ী প্ল্যাটফরমে হাজির হ'ল। তারপর রাত দশটায় নাগপুরের পান্থনিবাসে পৌঁছে, সে রাত্রির মত আশ্রয় নওয়া গেল।

শিল্পীর ব্যথা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমারে চেনো না তুমি,—তোমারেও নাহি আমি চিনি ;—
সুদুস্তর পারাবার আমাদের মাঝে
কল্লোলিছে রাত্রি-দিন।
তোমার হৃদয়মন মোর কাছে চির অন্ধকার !
তবু আমি আপনার আনন্দবেদনা, জীবনের অনুভূতি,
আবেগ-উচ্ছ্বাস
ছন্দায়িত ক'রে তুলি সযতনে বসি'
তোমারি লাগিয়া শুধু হে আত্মার আত্মীয় আমার !
যে-পুলকে উচ্ছলিয়া উঠে এ হৃদয়,—
তব মর্ম্মতটমূলে সে কি কভু তোলে কলতান ?
সঙ্গোপনে
যে দুঃখ নীরবে সহি আপনার মনে,—
তোমার অন্তরে কিগো লাগে তার তীব্র বহ্নিতাপ ?
অথবা কি সব ভুল ?
যার হর্ষ, যার ব্যথা তার তাহা একান্ত আপন ?
বিশ্বজন
নাহি পায় কভু তার নিগূঢ় আস্বাদ !
এ অক্ষম সীমাবদ্ধ ভাষা
কতটুকু পারে তোমা দিতে পরিচয়
মোর স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার ?
কি আকুতি জাগে প্রাণে প্রকাশের লাগি'—কেমনে
বুঝিবে তুমি
বলিবারে চাই যাহা, কতটুকু অভিব্যক্তি তার—এ ক্ষুদ্র
কবিতাখানি মোর
বাণবিদ্ধ পক্ষী যথা মরে বৃথা পক্ষ ঝাপটিয়া—ঊর্দ্ধে উঠিবারে
ঐ মতো উঠে হিয়া আকুলি' ব্যাকুলি'
অভ্রভেদী ভাবলোকে করিতে বিহার,—
উড়ে যেতে সুদুর্গম মনোলোকে তব
এ দুর্ব্বল কল্পনার পক্ষভরে মোর।
কোথা তুমি—কোথা আমি !
আমার এ ব্যাকুলতা, অশ্রান্ত প্রয়াস
তাহার করুণ ইতিহাস—কেমনে জানিবে তুমি !
কেমনে বুঝিবে তুমি ওগো বন্ধু মোর,—
এ শুধু কবিতা নয়—মর্ম্মের মুকুর,—
জীবনের অবিকল প্রতিবিম্ব মোর,—
এ কেবল ছন্দ নয়—হৃদয় স্পন্দন !
ধূপের নীরব দাহ দেখ নাই চোখে ; শুধু তার ঘ্রাণ
মাতায়ে তুলেছে তব প্রাণ।
আমি শিল্পী—আমার জীবন
তিলে তিলে পুড়ে-মরা আরতির ধূপের মতন ;—
দাহটুকু মোর শুধু—সৌরভ তোমার !

আমার চীনভ্রমণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

আমার চীনভ্রমণের কিছু ভূমিকা আছে। এই ভ্রমণ-ব্যাপারটি আসলে রফার ব্যাপার। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই। রফা করে চলায় আমরা অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত। যা চাই তা পাই না, খুশি থাকতে হয় তার পরের

ল-চং-গী

জিনিসটিতে। ইংরেজীতেই কথাটি শোনায় ভাল—next best। অর্থাৎ যেটি পাওয়া গেল না, তার বদলে তার অনুকল্প আর একটি জিনিস। চালের অভাবে যেমন গম, ধুতির অভাবে হাফ-প্যাণ্ট। কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি, তার পর নিশ্চিন্তমনে সব মেনে নিই।

আমার চীনভ্রমণও এই অগত্যা মেনে নেওয়া। বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) যে সব সৌভাগ্যবান চীনদেশে রওনা হচ্ছেন, বলা বাহুল্য আমি তাঁদের দলভুক্ত নই, অথচ আমারও চীনদর্শন-বাসনা প্রায় চীনের মতই প্রাচীন। হয় তো এই বাসনা হাজার দুই বছর আগেকার চীন-ভারত মৈত্রীর প্রভাব। যাঁরা সে যুগে চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত থেকে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের অদৃশ্য হাত আজও চীন-ভারত মৈত্রীগঠনে সাহায্য করছে। তাই শুধু আমার নয়, সম্ভবত ভারতবাসীমাত্রের মনে চীনভ্রমণের একটি চেতন বা অবচেতন বাসনা আছে অথচ বর্তমান সময়ে এ বাসনা পূরণ করায় অসুবিধা আছে খুবই। বর্তমান চীন তপ্ত তৈলকটাহ, ভবিষ্যৎ চীনগঠনের মশলা ভাজা হচ্ছে সেখানে। এ চীন নিশ্চিন্ত মনে দেখা চলে না। নিশ্চিন্ত মনে দেখতে হলে দেখতে হয় কনফিউসিয়াস বুদ্ধ লাওৎ-সের চীন, ফা-হিয়েন হিউয়ান-সাঙের চীন। অর্থাৎ প্রাচীন চীন।

সৌভাগ্যবশত একটা সুযোগ জুটে গেল বাংলাদেশের

ধাপার জলা অঞ্চলে চীনাদের চামড়ার কাজ
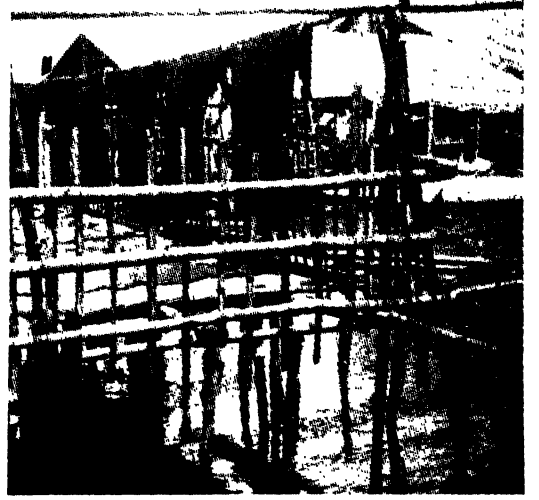
নিমন্ত্রিতদের চীন রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে—ল-চং-গী নামক এক চীনা যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাকে দেখেই মনে এল সেই ইংরেজী কথাটি—next best।

অবিলম্বে চীনভ্রমণ আয়োজন শেষ করে ফেললাম। এক দিন সকালে গলায় লাইকা ঝুলিয়ে দু'জন রওনা হলাম ধাপা অভিমুখে। আমার এ চীন ধাপার জলাভূমির চীন, কলুটোলা, ছাতাওয়ালা গলি, টেরিটিবাজার, ফিয়ার্স লেনের চীন। ল-চং-গী বলল ধাপা থেকেই শুরু করা যাক আমাদের প্রথম পর্ব। ঐখানে এক চীনা শহর গড়ে উঠেছে চামড়ার কাজ উপলক্ষে। রওনা হতে বেলা প্রায় ন'টা হ'ল। বেলেঘাটার পথে বাস্-এ গিয়ে হাঁটতে হবে মাইলখানেক। পথ অত্যন্ত খারাপ। রিক্সা চলা প্রায় অসম্ভব। ভাঙা উঁচুনীচু পথ মেরামত হচ্ছিল,

সর্বত্রই পাহাড়সমান উঁচু খোয়ার গাদা। তদুপরি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। চলতে পা ক্ষতবিক্ষত হ'ল, তদুপরি কাদা এবং জল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু রোদ তা প্রায় আগুনের মতো গরম।

ল-খে-হং

ক্রমে এগিয়ে চলেছি আর বড় বড় কারখানা সব চোখে পড়ছে। সবই চামড়ার কারখানা। সমুদ্রের মতো জলা-ভূমি। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে পুঁতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে প্রকাণ্ড এক একটা মাচা করা হয়েছে। মাচায় একের পর এক চামড়া বিছিয়ে মজুরেরা তাতে রং মাখাচ্ছে। পাশে কতক চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রোদে শুকানোর জন্যে। কিন্তু ঘন বর্ষণে কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না।

দুঃখের পথ অতিক্রম করে ল-চং-গী ও আমি গিয়ে উঠলাম ল-চং-গীর এক পরিচিত বাড়িতে। সেখানকার সব বাড়িই ট্যানারির সঙ্গে যুক্ত। আশা ছিল কতকগুলো কারখানা ঘুরে দেখব। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই অপ্রসন্ন, যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে এল এবং একটু পরেই প্রবল বৃষ্টি। আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছেই বাঁশের মাচার এক অংশের মাত্র একখানি ছবি নিয়েছিলাম, দেরি করলে তাও হ'ত না। চলার পথে কারখানাগুলো বাইরে থেকে দেখেছিলাম, তার বেশি আর দেখা সম্ভব হ'ল না। কল চলেছে সব কারখানায়। কোথাও চামড়া পালিশ হচ্ছে, কোথাও ঘষা হচ্ছে শাদা সোয়েড তৈরির জন্যে। দু'এক জন (অসুস্থ সম্ভবত) লেপের মত চামড়া গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চামড়ার গন্ধ সমস্ত বাতাসে, তবে জায়গাটা একান্তই খোলা বলে গন্ধ উগ্র নয়। বৃষ্টির মধ্যে ঘরের আশ্রয়ে বসে বসে যেটুকু সংবাদ শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, চামড়ার কাজে অথবা জুতো তৈরিতে যারা নিযুক্ত তাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাদের নাম হচ্ছে "খে"। এই খে-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন

চান-চুই-তীর কাঠির সাহায্যে খাওয়া

কাল থেকে চামড়ার কাজে হাত পাকিয়েছে। ক্যান্টনের খে নামক জায়গা থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

চীনদেশের এক একটা এলাকার লোকেরা এক একটি বিশেষ শিল্পকাজে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেমন ক্যান্টনের আর এক সম্প্রদায় দারু-শিল্পে ওস্তাদ। ড্রাই ক্লীনিং এবং ডায়িং-এর কাজে ওস্তাদ সাংহাইবাসীরা। এমন কি দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধাইয়ের কাজেও একটি বিশেষ জায়গার লোকেরা বিশেষজ্ঞ। এরা ক্যান্টনের ওপাম নামক জায়গার অধিবাসী। এই যে প্রদেশ বা সম্প্রদায় ভেদে কর্মভেদ এটা এমনই এদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের কাজ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যারা পথে পথে কাপড় ফেরি করে বেড়ায় তারাও একটা বিশেষ এলাকার লোক। এরা নাকি শানটুংবাসী এবং অধিকাংশই মুসলমান।

আমার সঙ্গী ল-চং-গীর পরিচয় কৌতূহলোদ্দীপক। এর পৈতৃক বাড়ি চীনদেশের আময় প্রদেশে, কিন্তু চীন সে

দেখে নি, বাংলাদেশেই তার জন্ম, বরিশালে। এর পিতার নাম ল-খে-হং। ল-খে-হং-এর বর্ত্তমান বয়স প্রায় সত্তর বছর। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি তাঁর পিতা ল-চিন-খি-র সঙ্গে আময় থেকে কলকাতা আসেন এবং

কলেজের ছাত্রী ছায়-হ

ছ'বছর কলকাতা বাসের পর বরিশাল যান তাঁরই সঙ্গে। ল-চিন-খি বরিশালে সুপারি, তামাক ও লঙ্কা চালানের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ল-খে-হংও সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের এই তিনটি জিনিস সিঙাপুর, পেনাং প্রভৃতি জায়গায় চালান হয়। দীর্ঘকাল বরিশালে কাটাবার পর, দেশ বিভাগ হলে তিনি গত ১৯৪৮ সনে কলকাতা চলে এসেছেন। সুতরাং ল-চং-গীও এসেছে পিতার সঙ্গে। ল-চং-গী বাইশ বছরের যুবক, আজন্ম বাংলাদেশে থেকে বাঙালী হয়ে গেছে, বাংলা লেখে, বাংলায় কথা বলে। গত আই-এস্‌সি পরীক্ষায় পাস করে এখন 'স্পেশাল বেঙ্গলী' নিয়ে বি-এ পড়ছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃত পড়েছিল। এদের পৈতৃক ব্যবসা এখনও চলছে, সঙ্গে আছেন আর এক জ্ঞাতি ভাই—নাম চান-চুই-তী। ল-খে-হং বৃদ্ধ কিন্তু এখনও অসাধারণ পরিশ্রমী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমার চীনভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'ল এঁদের তিন জনের সঙ্গে। কলুটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৌছলাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের এক আধুনিক চীনা বাড়িতে। ল-খে-হং এবং চান-চুই-তী এঁরা দু'জনেই বাংলা বলতে পারেন, ল-চং-গীর বাংলা অবশ্য আরও মার্জ্জিত। সুতরাং এঁদের সঙ্গে আলাপে আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না। যে পরিবারটির কাছে গেলাম তাঁরাও যথাসাধ্য আমাকে তাঁদের ঘরের খবর জানায় সাহায্য করলেন। এঁরা প্রায়

আধুনিক চীনা ছাত্র
আং-ম-বা

চার পুরুষ যাবৎ বাংলাদেশে আছেন। গৃহকর্তা বুন-চং বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী এখন বৃদ্ধা, বয়স তিরাশী বছর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ। বুন-চংও সুপারি তামাকের ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর ছ'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা। দু'টি পুত্র পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং অন্যরা বিদেশে চাকরি করে। একটি কন্যার তিন কন্যা ও এক পুত্র। এই তিন কন্যার এক জন বি-এ পাস, এক জন ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ছেলেটিও ইণ্টার-মিডিয়েট পড়ে। কলেজের মেয়েটির নাম ছায়-হু এবং ছেলেটির নাম আং-ম-বা। বুন-চং-এর ছয় পুত্রের তিন জন ক্রিশ্চান। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীরা সবাই ক্রিশ্চান। দেখলাম একটি টেবিলে মাতা মেরি, দুটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি হাস্যরত বুদ্ধমূর্তি (Laughing Buddha) সাজানো রয়েছে, একই সঙ্গে যার যেমন ইচ্ছা পূজা বা উপাসনা চলে। দুটি

ধর্ম পাশাপাশি, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই এবং উপাসকেরাও একই পরিবারভুক্ত। এই ঘটনাটি আমার বড়ই ভাল লাগল।

'পা' ঢাকনার চিত্র

ঘরে নানারকম চীনা-শিল্প আছে, তার মধ্যে একটি পাত্র দেখতে বড়ই সুন্দর। চীনাভাষায় এর নাম পা। টিফিন-কেরিয়ারের মতো চারটি গোল কাঠের পাত্র পর পর সাজানো—এবং সেই রকমই হাতে ধরে তোলা যায়। পাত্রগুলি দেড় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। উপরের ঢাকনায় সুন্দর ছবি। ঢাকনাটা খুলে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি ছবি তুলে নিলাম।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হ'ল।

আমার চীনভ্রমণ পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ এখানকার চীনা মন্দির দেখার। এইখানে আবার আমার সহায় হলেন চান-চুই-তী। ল-চং-গী তো সর্বদাই সঙ্গে আছে।

আমরা তিন জন নানা গলিঘুঁজি পার হয়ে পৌঁছলাম গিয়ে ডেমজেন লেনের প্রাচীনতম চীনা বৌদ্ধমন্দিরে। মন্দিরটির নাম থান-ও-বিও। প্রকাণ্ড বাড়ি। মন্দিরটি দোতলায় অবস্থিত। একটা অদ্ভুত শান্ত আবহাওয়া। দোতলায় খোলা প্রশস্ত ছাদ। তার পর মন্দিরের দালান, তার পর মন্দির। তিনটি সুসজ্জিত দরজা। প্রত্যেকটি দরজায় সুরুচিসঙ্গতভাবে সিল্কের চিত্রিত পর্দা ঝোলানো। একটি দরজার সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "হাক্-কি-ই-পাব।" শুনলাম এর অর্থ "প্রবাসীদের কল্যাণার্থে"।

মন্দিরের ভিতরটা চীনা কাগজের ফুল ও নানারকম চীন-মাটি ও ধাতুনির্মিত মূর্তিতে সাজানো। এক দিকে উঁচুতে ঝোলানো ড্রাম, অন্যদিকে ঘণ্টা। বিশেষ উপলক্ষে এ দুটি বাজানো হয়। মন্দির কেন্দ্রে দু'ধারের ফুলের সজ্জার পিছনে একটু উঁচুতে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটাবার পরেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে এক শীর্ণ বৃদ্ধ চীনা উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তার বয়স ৯৩ বছর। এমন

থান-ও-বিও মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি

শান্ত এবং করুণ তার চাহনি যে দেখলেই মনে হয় এই থান-ও-বিও'র প্রশান্ত তথাগত মূর্তির আবহাওয়ায় আশৈশব বাস করার ফলে সে নিজেই শান্ত এবং আত্মগত হয়ে উঠেছে। কিংবা সেই করুণ চাহনি সম্পূর্ণ আফিং-এর কৃপায় কি না কে জানে। এই বৃদ্ধ বিশেষ উপলক্ষে মন্দিরের ড্রাম ও ঘণ্টা বাজায়।

ইতিমধ্যে চান-চুই-তী কয়েকটি মোমবাতি নিয়ে মূর্তির সম্মুখে জ্বালিয়ে দিলেন। এই বাতিগুলি মন্দিরেই থাকে, চীনে তৈরি, গায়ে ছবি আঁকা। মন্দিরের ভিতরের বাঁ পাশের দেয়ালে কতকগুলো তাক আছে। সেখানে চীনাভাষায় লেখা কাঠের অনেকগুলো স্মৃতিফলক খাড়া

করে রাখা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর মন্দিরে যদি কোন অনুষ্ঠান হয় তবে তাঁর নাম-সম্বলিত এই স্মৃতি-ফলক এখানে রাখার নিয়ম আছে। একে বলে "চিন চ্যঃ।"

অতঃপর আমরা টেরিটি বাজার ষ্ট্রীটের আর একটি মন্দিরে গেলাম। এটির নাম "কোয়ান-ইম-কো-বিও"। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—প্রবেশদ্বারে লেখা আছে। এই মন্দিরটি আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী হলেও

থান-ও-বিও মন্দিরের ১৩ বৎসর বয়স্ক ঘণ্টাবাদক

এর মধ্যেও চীনা শিল্পের বিচিত্র সংগ্রহ আছে। সজ্জা সবই প্রায় ধাতুনির্মিত। মন্দিরে বাইরের লোকের প্রবেশ বা ফোটো নেওয়ার সম্পর্কে কোথায়ও কোন বাধা-নিষেধ নেই বলেই মনে হ'ল, অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

এইখান থেকে বেরিয়ে খাঁটি চীনা পল্লীতে এসে দাঁড়ালাম। চীনা দাঁতের ডাক্তার, ওষুধের দোকান, চীনা-মাটির জিনিসের দোকান। চীনা কাঠের মিস্ত্রী কাঠের কাজে নিযুক্ত আছে কোনো কোনো ঘরে। চীনা ওষুধের দোকানে গিয়ে উঠলাম। দোকানে মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ করে। সিঁড়ির উপর রোদে মাছ শুকানো হচ্ছিল। ভেষজালয়ে শুকনো মাছও বিক্রি হয়। ছবি নেওয়ার সময় মাছগুলো তাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কতক-গুলো দোকানে চীনামাটির পুতুল বুদ্ধমূর্তি চায়ের পাত্র
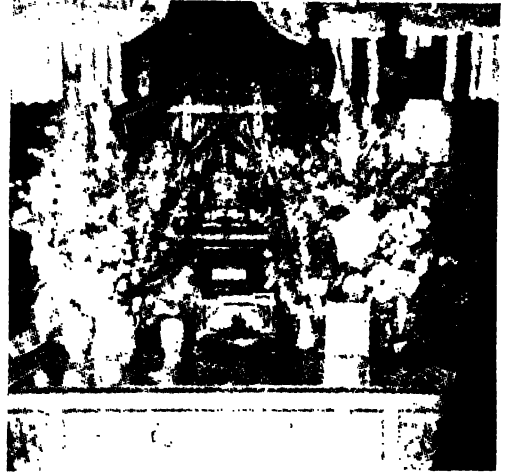
থান-ও-বিওর ভিতরের দৃশ্য

পেয়ালা ইত্যাদি আছে। কিন্তু দাম যা শুনলাম তাতে চমকে উঠতে হয়। এই চীনা পল্লীতে কোনো কোনো চীনা

মন্দিরমধ্যস্থ ধাতুনির্মিত সিংহমূর্তি

সুপারি হলুদ চীনাবাদাম প্রভৃতি ব্লীচ করার কাজ করে। গুদামের মধ্যে এক শ দেড় শ দু'শো বস্তা সুপারি বা বাদাম

রেখে সেখানে গন্ধক জ্বালানো হয়। গন্ধকের ধোঁয়ায় (সালফার ডাইঅক্সাইড) ঐ সব জিনিসের রং পরিষ্কার করে দেয়, তাতে বেশি দামে বিক্রী করার সুবিধা হয়, কারণ দেখতে ভাল হয়। এক শ বস্তা সুপারি ব্লীচ করতে সের দশেক গন্ধক লাগে।

বুন-চং পরিবারের কর্ত্রী

চীনারা কলকাতা শহরের অন্তত দু'শো বছরের বাসিন্দা। ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সময় মুর্গীহাটা এলাকা ইংরেজ, ফরাসী, গ্রীক, আরমেনিয়ান, পোর্টুগীজ প্রভৃতির প্রধান ঘাঁটি ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীট, এজরা স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতির মাঝখানে ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীটটি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে শুধু 'চীনাবাজার' নয়, সেটি 'ওল্ড চীনাবাজার'। সে যুগের ব্যবসায়ী চীনাদের মধ্যে চীনজীবনের খারাপ দিকটাও জাহাজ বোঝাই হয়ে অবশ্য এদেশে এসেছিল, এবং হয় তো এখনও একটা স্তরে তার অস্তিত্ব আছে। জুয়াখেলা, নেশা করা, দাঙ্গা করা ইত্যাদি। অনেক গল্প শোনা যায় এ বিষয়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনেছি কোন কোন বাঙালীও নাকি চীনাভাষা আয়ত্ত করে নিম্নস্তরের চীনা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করেছে।

কিন্তু আমি আমার এই চীনভ্রমণ শেষ করেছি মাত্র তিন দিনে। এই তিন দিনে এদের ভাল দিকটাই দেখার চেষ্টা করেছি একান্তভাবে। চিত্রশিল্পে, দারুশিল্পে, চামড়ার কাজে, ডায়িং-এর কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চীনাদের স্বভাবগত যে নৈপুণ্য আছে এদেশে তার পরিচয় যথেষ্ট মিলবে। এরা আমাদেরই মতো প্রাচীন জাতি এবং বহুকাল আমাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও আমরা ওদের চিনি না, সহজে চেনবার উপায়ও হয় তো কিছু নেই। কিন্তু তবু আকস্মিকভাবে ল-চং-পীদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগল এবং পরিচয়ও কিছু পেলাম। ল-খে-হং, চান-চুই-তী এবং ল-চং-পীর অক্লান্ত সাহায্য এবং সবিনয় ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি এঁদের ভিতর দিয়ে চীনা জীবনের মধুর দিকটির যে একটুখানি স্বাদ পেয়েছি তা আমার কাছে অবশ্যই অমূল্য।

সাহিত্যের ফুল

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্যবাজারে নাই ফুলের আদর
একথা যে বলে সে ত আসল বাঁদর।
সাহিত্য রসের বস্তু রসনার বশ,
নাসা শুধু গন্ধ বুঝে বুঝে নাক রস।
ফুলকপি, দেখ গিয়ে বিক্রী হয় ঢের,
বিকায় সজিনা ফুল আট আনা সের।

কুমড়ার রাঙা ফুল গোছাবাঁধা হয়ে
আনা-জোড়া বিক্রী হয়, যায় সবে লয়ে।
বকফুলও বিক্রী হয় সেথা মুঠোমুঠো।
বিকায় কদলীফুল দু'আনায় দুটো।
বাকি যত ফুল ছিল সবি বিলকুল,
অভিধানে হয়ে গেল ডুমুরের ফুল।

রামানন্দ-স্মরণে

শ্রীঊষা বিশ্বাস

৩০শে সেপ্টেম্বর ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণের দিন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর দেহাবসানের পর অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীর পুণ্যতিথিতে তাঁর বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করি সেই অক্লান্তকর্ম্মী সাধকের কাছে দেশের ও জাতির অশেষ ঋণ। ভারতের পরাধীনতার নাগপাশ আজ উন্মোচিত হয়েছে। যে সকল মহাপুরুষ আজীবন ভারতের মুক্তিকল্পে কঠিন সংগ্রাম করে গিয়েছেন শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর মহাপ্রয়াণের পুণ্য দিনটি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।

আজ আমাদের "সোনার বাংলা"র ঘোর দুর্দিন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে বাংলা-মায়ের যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মূর্ত্তিটি প্রতিভাত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্ত্তমান বাংলার বাস্তব রূপের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সারা দেশ জুড়ে আজ নিদারুণ অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব। অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আজ আর একটি দুর্ভিক্ষও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেটি হচ্ছে দেশে প্রকৃত মানুষের দুর্ভিক্ষ। আজকের দিনে সেই জন্যেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা তরুণদের চোখের সামনে বিশেষ করে তুলে ধরতে হবে খাঁটি মানুষদের জীবনাদর্শকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ—যাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল "ব্রাহ্মণের মনীষা" ও ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর জীবনের ছোট বড় অনেক কাজে ও ঘটনায় পরিস্ফুট। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছিল। যে কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর অন্তরটি কত কোমল—কত স্নেহমমতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে তাই তাঁর পরিচিত অনেকেই আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করেছিলেন। আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সেই সৌম্য, শান্ত, আত্মসমাহিত ঋষি-প্রতিম মানুষটিকে! তাঁর স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আজও যেন কানে বাজে! ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত স্নেহশীল—মাতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক, সন্তানবৎসল ও বন্ধুবৎসল। অথচ সাংবাদিক ও সংস্কারক রামানন্দ ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কুলীশ-কঠোর—বজ্রের চেয়েও কঠিন এবং অনমনীয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি একজন আদর্শ সাংবাদিক মাত্র, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কই ছিলেন? তিনি কি শুধুই একজন একনিষ্ঠ দেশসেবক ছিলেন? তা বললে তাঁকে ছোট করে দেখা হবে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হলেও সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। মানুষ রামানন্দ সাংবাদিক রামানন্দের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। আজ সেই আদর্শ মানুষের চরণোদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। কবির ভাষায় বলি—

> "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
> তাই তব জীবনের রথ
> পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
> বারম্বার।"

স্বদেশপ্রেমই ছিল এই কর্ম্মযোগী সাধকের জীবনের মূলমন্ত্র। স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে শুধু ভাববিলাস মাত্র ছিল না। নিঃস্বার্থ জনসেবাই ছিল তাঁর কর্ম্মময় অনলস জীবনের ব্রত। এই স্বার্থলেশহীন জনকল্যাণ-কামনাই তাঁর জীবনে সকল কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর স্বদেশপ্রেমে উন্মাদনার আতিশয্য বা ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যেমন সরল, অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জ্জিত ছিল, তাঁর কর্ম্মজীবনেও তেমনি এই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনায় ও বক্তৃতায়—কোথাও বাহুল্য বা আড়ম্বরের স্থান ছিল না। কেউ তাঁকে কোনও দিন আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সভা মাতাতে দেখেন নি। স্বদেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন সাংবাদিক। স্বদেশপ্রেমের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তিনি হয়েছিলেন সমাজ-সংস্কারক—দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্ম্মী। আজ তাঁর তিরোধানের পর বিচার করবার সময় এসেছে দেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি কি অমূল্য দান রেখে গিয়েছেন।

প্রথম জীবনে শিক্ষাব্রতী রামানন্দের কাম্য ছিল অধ্যাপনার মাধ্যমে দেশে প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলে দেশসেবা করা। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। কোনও অবস্থাতে পড়েই তিনি তাঁর জীবনের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। তাই রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটল। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি হলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক রামানন্দ জনশিক্ষার ভিতর দিয়েই গ্রহণ করলেন স্বদেশসেবার সুমহান্ ব্রত। সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র, মানুষের সেবা ও স্বদেশসেবার প্রশস্ততর পথ।

শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী 'রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' নামক পুস্তকে লিখেছেন—"শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্রের সেবায় তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। তিনি যে গভীর জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে নানা বিদ্যার সম্মোহিনী বংশীধ্বনি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, দেশব্যাপী যে দুর্গতি, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা তাঁহাকে মর্ম্মে

মর্ম্মে পীড়িত করিতেছিল, তাহাতে শুধু কলেজের কক্ষে চারিটি দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া ছাত্রদের কেবল ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্য পড়াইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। জন্মভূমির প্রতি আপনার কর্ত্তব্য করিয়াছি এ সান্ত্বনা তিনি নিজেকে দিতে পারিতেছিলেন না। যে সেবাব্রতের জন্ত যৌবন প্রারম্ভে তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সেবার জন্তই তিনি পরেও বার বার লেখনী গ্রহণ করিলেন—সেবার ক্ষেত্র তাঁহার বৃহত্তর হইয়া পড়িল।" "The pen is mightier than the sword."—এ উক্তির সত্যতা আজ সকলেই স্বীকার করবেন। দেশের লোকের চিন্তাশক্তি জাগাতে ও জনমত গঠন করতে সাংবাদিকের দায়িত্ব যে কত বেশী তা আজকের দিনে সকলেরই জানা আছে। দেশের পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি স্বাধীনচেতা রামানন্দের ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে অহরহ বেদনা জাগাত। সেইজন্ত তিনি শক্তিশালী বিদেশী শাসক-মণ্ডলীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আজীবন লেখনী চালনা করে গিয়েছেন। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল না। তিনি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তাই স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও কাম্য। দেশের এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের আদর্শ মনে হয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। সংস্কারক ও সাংবাদিক রামানন্দ সামাজিক দুর্নীতি, অসাম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও চিরদিন লেখনী চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতে—"সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ" ও "জাতীয় উন্নতি সর্ব্ববিধ সংস্কার-সাপেক্ষ"। ভাঙার চেয়ে গড়ার দিকেই তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। দেশের প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক অনুরাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসা-ধারণ যুক্তিবাদী। পুরাতনকে ও অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে নূতনের বিপুল সম্ভাবনাকে তিনি কোন দিনই অস্বীকার করেন নি। প্রকৃত প্রগতিমূলক আন্দোলনে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস, শুধু তার "বিকৃতিতেই আপত্তি"। তাঁর চির তরুণ মন নূতনকে অকুণ্ঠ ভাবে বরণ করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি। এখানেও তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের, দৃঢ়তার ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্তেই তিনি দেশের যাবতীয় গঠন-মূলক ও সংস্কারমূলক কাজ এবং আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী—আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখ।

সাংবাদিক রামানন্দ ছিলেন অন্যায়ের কঠোর সমালোচক এবং ন্যায় ও সত্যের পূজারী। স্পষ্টবাদিতা, নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা ও সুযুক্তিই ছিল তাঁর সমালোচনার বিশেষত্ব। অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, নিরপেক্ষতা ও স্পষ্ট-বাদিতা, তীক্ষ্ন বিচারবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি দে[শে] বিদেশের সুধীবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি নির্ভীক সমালোচনা ও স্বাধীন মতামতের সাহায্যে দে[শের] দেশবাসীর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী বহন করে দেশের স্বাধীনতার পথকে [সুগম] করতে অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সাংবাদিক [ক্ষেত্রে] তিনি যুগান্তর এনেছিলেন—এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের [প্রবর্তন] করেছিলেন। তাঁর তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, ন্যায় ও স[ত্যের] প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংবাদি[কদের] অনুকরণীয়। সাংবাদিক রামানন্দ চেয়েছিলেন তাঁর প[ত্রিকার] সাহায্যে দেশসেবা করতে—বিদেশী শাসকবর্গের হাত [থেকে] স্বদেশীয়দের স্বার্থ রক্ষা করতে—স্বদেশের শিল্প, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিকে নূতন করে গড়ে তুলতে—স্বদেশবাসীদের বিষয়ে উন্নত করতে। ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সমা[লোচনা] নারীপ্রগতি প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ পত্রিকা দুটি তখনকার দিনের মাসিকপত্রের ধারাই [বদলে] দিয়েছিল।

আজ আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হ[য়েছি]। প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার পরে ভারত আজ রাজ[নৈতিক] স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও [অর্থ]নৈতিক স্বাধীনতা আজও সে পায় নি। আজ সময় [এসেছে] দেশকে নূতন করে, সুন্দর করে গড়ে তুলবার। আজ [আমা]দের দেশে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত আদর্শ সাংবা[দিকের] বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অগণিত মূক জনগণের [সেবাই] তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁর নশ্বর দেহের মৃত্যু [হয়েছে] কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর আদর্শের মৃত্যু নেই। তাঁর সেই অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত আজও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন তাঁর আদর্শের মধ্যে—সেই কর্ম্মী সাধক অবশ্য তাঁর জীবিত কালে স্বীয় সাধনার [পূর্ণ] সাফল্য দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সেই আদর্শ, সেই দুষ্কর তপস্যা ও কঠোর সংগ্রাম কখনই ব[্যর্থ হতে] পারে না। সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত, জ্ঞানে, শিক্ষায় ও স[ংস্কৃতিতে] গরীয়ান্ যে গৌরবময় স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দে[খেছিলেন] —তাঁর সেই বিরাট স্বপ্ন যেদিন তাঁর স্বদেশবাসী রূপায়িত করে তুলতে পারবেন সেইদিনই তাঁর স্ব[প্ন দেখা] করা সার্থক হবে। আজ সমগ্র দেশ আদর্শে মহীয়ান্, মনুষ্যত্বে সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানেই ব্যাকুল [হয়ে] চেয়ে আছে।

একতারা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১

মানুষের অন্তরে যে এত মধু আছে রাজকুমারী শোভা তা জানত না। ভ্রমরের মত নিত্য সে ছুটে আসে জীবন-কবির পাশে।

অতিবৃদ্ধ জীবন-কবি একতারা বাজিয়ে গান গায়। যৌবনের গান। উন্মাদনা ও উদ্দীপনার গান। শোভা শোনে। তার রক্ত-প্রবাহে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন ও যৌবনের চাঞ্চল্য। আনন্দের আতিশয্যে খুঁজে পায় বেঁচে-থাকার সার্থকতা।

ধনীর দুলালী শোভা—প্রচুর ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। শোভার মা রাণী বসুন্ধরা চান শোভা তার ধন-সম্পদের মাদকতা অনুভব করুক। দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতে শিখুক। কিন্তু শোভা চায়—অতি দীন জীবন-কবির ভাঙা কুটিরে গিয়ে বসে থাকতে। প্রকৃতির পূজারিণী হতে ও কাব্য-রসে প্রাণমন অভিষিক্ত করতে। মা ও মেয়ের এ মতবিরোধের মীমাংসা হয় না।

শোভা বলে—কবিকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গ আমার ভাল লাগে…

অতিবৃদ্ধের প্রতি মেয়ের এই অনুরাগকে অন্য কোন উপায়ে বিঘ্নিত করতে না পেরে মা বলেন—তা হলে কবিকে ডেকে আন্ এখানে। তুই কেন যাবি সেই নোংরা গরীবের আস্তানায়?

এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শোভা কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবে—কবি কি এখানে আসবে?

বিরাট্ সৌধ। পুষ্পোদ্যানে ঘেরা। কৃত্রিম ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত জলধারার গায়ে রামধনুর সাতরঙা খেলা। নারী ও পুরুষের প্রস্তরমূর্তি দিকে দিকে সাজানো। মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ ও পুষ্পবীথি সুগন্ধি সুষমায় স্নিগ্ধ। বসুন্ধরার ইচ্ছা—শোভা এই প্রাচুর্য্যের দোলায় দোলে। কিন্তু শোভার মন কেন বাহ্য সুখৈশ্বর্য্যে ভোলে না?

নিঃসঙ্গ অষ্টাদশী শোভা চারদিকে ঘুরে বেড়ায় যেন এক চঞ্চলা হরিণী। বসুন্ধরা তাকে সাজান—নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার দিয়ে। কিন্তু তার মন চায় দেহের বিলাস নয়, মনের খোরাক। সেকথা বসুন্ধরা বোঝেন না। রাজপ্রাসাদে শোভার মন-প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বসুন্ধরার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ছুটে যায় কবির কুটিরে।

জীবন-কবির হাত দুখানা চেপে ধরে শোভা বলে—কবি! চলো আমাদের বাড়ীতে। সেখানেই তুমি থাকবে…

কবি হেসে জিজ্ঞাসা করে—কেন বল তো?

—আমি আর ছুটোছুটি করতে পারি না…

—তাই নাকি? কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—না, তা হয় না। এই কুটীরের দীনতাই ভাল লাগে আমার। প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারি না।

শোভা দুঃখিত হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! রাজপ্রাসাদের সুখৈশ্বর্য্যকে তুমি এত মূল্যহীন মনে কর কেন? জীবনধারণের সুখ-সুবিধা কি নিরর্থক?

শুভ্র কেশে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করে জীবন-কবি বলে—অর্থ যদি তার কিছু থাকে, সে শুধু অনর্থ ঘটাবার জন্যেই…

—তার মানে?

—বলতে পার জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি? মানুষ কি চায়?

শোভা ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু অনুভব করে। এই লতাপাতা-ঘেরা দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীর্ণ কুটীরে এসে কবির পাশে বসলেই তার প্রাণে জাগে আনন্দ! এই আনন্দই ত মানুষের কাম্য। প্রাসাদে কেন আনন্দ নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শোভা বলে—বুঝতে পেরেছি কবি! তুমি কি বলতে চাও।

—কি বল তো?

—তোমার মনে আছে দৈন্যের অহঙ্কার, তাই তুমি প্রাসাদের প্রাচুর্য্যকে ঘৃণা কর।

—ঠিক বলেছ। দৈন্যের অহঙ্কারই আমার মনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই ত এত পাকা চুলেও বেঁচে আছি আমি। কাঁচা চুল নিয়ে তুমিও এখানে ছুটে আস—সেই বাঁচার তাগিদে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মরে যাচ্ছ তুমি। আমাকেও সেখানে নিয়ে মারতে চাও কেন? বাঁচতে দাও—আমায় বাঁচতে দাও…

—কি সর্বনাশ! এতদিন সেকথা বল নি কেন? কাল থেকে আমি এখানে আসব একেবারে নিরাভরণা! সেই পাথরের মূর্তিগুলির মতই নিখুঁত অঙ্গ-সৌষ্ঠব নিয়ে! কি বল? তা হলে তুমি আমাকে খুব সুন্দর দেখবে তো?—বলেই শোভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়ে কবির গায়ের উপর।

জীবন-কবির একতারার তার ছিঁড়ে যায়। ব্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত কবি বিরক্তি প্রকাশ করে। একান্তে সরে গিয়ে, তার-ছেঁড়া একতারাটা তুলে নেয়। গভীরভাবে কান বুজেতে আবার সুর বাঁধে।

আকুল আগ্রহে জীবন-কবির হাতখানা ধরে শোভা বলে—দোহাই কবি! অন্তত একবার চল আমার সঙ্গে। প্রাসাদে নয়!

—তবে কোথায়?

—বাইরের ফুলবাগানে।

—কেন?

—তুমি যা চাও, সেখানে তা আছে?

—কি চাই? কি আছে?

—অটুট যৌবন মূর্ত্ত হয়ে আছে—নিখুঁত তারুণ্যে। প্রাণবন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! পোশাক নেই, পরিচ্ছদ নেই, একেবারেই নিরাভরণ শিল্প-চাতুর্য্য! বলেই হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায় শোভা। কবিকে জড়িয়ে ধরে।

বিপন্নভাবে জীবন-কবি বলে—ছিঃ! সেখানে প্রাণ নেই, আছে শুধু চোখঝলসানো রূপের ঠাট···আমি যাব না।

২

জীবন-কবি একদিন জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা শোভা! তোমার নাকি বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—বিয়ের পর তুমি এখান থেকে চলে যাবে?

—কেন যাব?

—বর বুঝি এখানেই থাকবে?

—তাই বা কেন থাকবে?

—তবে?

—তবে আবার কি? সেও থাকবে না—আমিও যাব না।

—তবে ত বিয়ের কোন মানেই হবে না।

—মানে না হলেও মজা ত হবে খুব? বিয়ের পর দু'জনেই দু'জনকে নমস্কার জানাব প্রতিপদের চাঁদের মত, তিনি হবেন উদয়, আমিও যাব অস্তে।

জীবন-কবি হেসে বলে—আর, আমার এই চোখ বুঝি সন্ধ্যাতারার মত চেয়ে থাকবে—তোমাদের সেই উদয়াস্তের সাক্ষী হয়ে?

একটু অন্যমনস্ক ভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বলতে পার—চাঁদে কি আছে?

—জ্যোছনা আছে···

—আর কি?

—কেন?

—সেখানে সাপ আছে, কি বাঘ আছে, তা জেনে আমার কি লাভ?

—তুমি তো দেখার ব্যবসাদার?

—কেন?

—এত লাভ-লোকসানের হিসেব কর কেন?

—তোমার ভিতরে কি আছে—জান শোভা?

—কি?

—অতি বিশ্রী কঙ্কাল!

—তাই যদি সত্যি হয়, তুমি তা দেখতে চাও না কেন? ভয় পাও বুঝি?

—হ্যাঁ ভয় পাই। শুধু ভয় পাই না—কঙ্কালকে অত্যন্ত ঘৃণাও করি। তোমার চেয়ে, তোমার কঙ্কালটা সত্যিও নয়, সুন্দরও নয়। তোমার ওই কমনীয় চোখ দুটি উপড়ে ফেলে, সেখানে একটি কুৎসিত গহ্বর তৈরি করার কি কোন মানে হয়! তোমার ওই রাঙা ঠোঁট দুখানি বাদ দিলে, দু'পাটি মুক্তোর মত দাঁত যে কত বীভৎস দেখাবে—তা আমি জানতে যাব কেন?

—তুমি জানতে না চাইলেই কি সে মিথ্যে হয়ে যাবে?

—সত্যিও হবে না। যা অসুন্দর তাই তো মিথ্যে! কঙ্কাল যখন মানুষের ভিতর থেকে বাইরে এসে সত্যি হতে চেষ্টা করে তখনি আসে তার বার্দ্ধক্য। জরা বা বার্দ্ধক্য মিথ্যে বলেই প্রাণ তাকে ত্যাগ করে। প্রাণের প্রাচুর্য্য নিয়ে সর্ব্বাঙ্গের যৌবন যখন মেতে উঠে তখন কঙ্কাল থাকে চোরের মত লুকিয়ে!

—তুমি অনুভব কর বুঝি?

—নিশ্চয়ই! তাই তো আমার নাচের ছন্দ আর গানের সুর আজও বেঁচে আছে···

—তা হলে আমাকে নাচ শেখাও, গান শেখাও—আমিও বেঁচে থাকতে চাই···

জীবন-কবি গায়—

তেল ফুরানো প্রদীপ আমার
ক'দিন বলো জ্বলবে আর?
তোমার আলো করবে না দূর—
আমার বুকের অন্ধকার।

শোভা বুঝল—যৌবনই সত্য, আর বার্দ্ধক্য মিথ্যা। প্রাণ চায়—জল, বাতাস, আর আলোর পরমায়ু। বার্দ্ধক্যকে অগ্রাহ্য করে যৌবনকে আঁকড়ে থাকাই প্রাণের ধর্ম্ম। আনন্দই যৌবনের উপজীব্য। নিরানন্দ বার্দ্ধক্য কেন আসবে কবিকে প্রাণহীন করতে? যৌবন কেন ক্ষণস্থায়ী?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বলতে পার—

—কি করে বলব? তাকে তো দেখি নি এখনো? সে যদি এসে জিজ্ঞাসা করে—আমার বধূটি কেমন হবে? তা হয়ত বলতে পারি…

—বলো তো?

—কাকে বলব?

—আমাকেই বলো…

—প্রশস্তি শুনতে চাও?

—তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। তবে, তোমার ক্ষতি করে তোমার বরের লাভ আছে। আমার কি?

—আমার ক্ষতি করে আমার বরের লাভ আছে? বলো কি?

—বিয়ে মানেই তো তাই। বিয়ের পর দেখবে—হয় সে জিতেছে, তুমি হেরেছ—আর না হয়, তুমি জিতেছ, সে হেরেছে…

দু'জনাই জিতবো না?

—দৌড়ের ঘোড়া আগু-পিছু হবেই। তবে বধূরা অনেক সময় হেরেও জেতে। বরেরা জিতেও হারে। বিয়ের হারজিত বুঝা বাইরে থেকে খুব সোজা নয়। তার হিসেব নিকেশ অন্তরের অনুভূতি দিয়ে—মানে ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায়…

—তা হলে আমি বিয়ে করবো না…

তা কি হয়? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। যৌবন ক্ষণস্থায়ী হলেও—বিয়ের কামনা মিথ্যে নয়। ফুলের পরিণতি যে ফল, তা ফলবেই…

—তা হলে বলো, আমার বর কেমন হবে?

—আমি তো গণৎকার নই?

—তবু বলো…

—একই মাটিতে তেতো নিম, আর মিঠে আঙুর ফলে। ঘেঁটুও ফোটে, গোলাপও ফোটে। তোমার বর নিম হবে কি আঙুর হবে—ঘেঁটু হবে কি গোলাপ হবে—বিয়ের আগে তুমিও তা বুঝবে না…

—যদি নিম হয়?

—হতে পারে, আঙুরের স্বাদ যে জানে না, যৌবন-রাগে নিমকেই সে মনে করবে আঙুর! বিয়ে নিষ্ফল হবে না…

—কি ভয়ানক কথা!

—কথাটা মোটেই ভয়ানক নয়। জন্ম মৃত্যু বিয়ে—অন্ধকারের অদৃষ্টলিপি! জন্মের আগে কেউ যদি সে লেখা পড়তে পারতো, তা হলে দরিদ্র মা-বাপ সন্তানের মুখ দেখত না। সর্প-দংশনে কারও মৃত্যু হ'ত না। বর-বধূর সুখ-স্বপ্নও ভেঙে যেত না…

৩

শোভার বিয়ের বাজনা বেজে উঠে। জীবন-কবি কান পেতে শোনে। দূরাগত শানাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে সেও গায় গান। একতারাও বাজে। কিন্তু তার ঝঙ্কার উঠে না। তবু চলে আঙুলের কসরৎ। আনন্দে চোখের জল বেরিয়ে আসে।

সূর্য্য অস্ত গেছে। রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে রেখে গেছে পশ্চিম আকাশ। এই তো গোধূলি? বোধ হয় বরের হাতে শোভার হাত বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন কত নিবিড়—কত মধুর! সে ত শুধু হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধন নয়—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের।

জীবন-কবি ভাবছে—নিশ্চয়ই শোভা এখন বসেছে বরের পাশে। পাতলা ওড়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে দেখছে বরের মুখ! কি সুন্দর বর! কি সুন্দরী বধূ! সার্থক এই যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন। কত পবিত্র এই শুভ মিলন-মন্ত্র! বর-বধূ সুখী হোক।

একতারা হাতে নিয়ে জীবন-কবি একলাই নাচে আর গায়—

জাগো, বর-বধূ যৌবন-কুঞ্জে—
অন্তর-মধু-সন্ধানী!
সার্থক এ যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন
সার্থক এ মিলনের বাণী।

পরের দিন অতি প্রত্যুষেই শোভা ছুটে আসে জীবন-কবিকে প্রণাম করতে। ঢিপ্ করে পায়ের উপর মাথাটা রাখতেই—রাঙা রং লাগে কবির পায়ের পাতায়। কপালের সিঁদুর লাগে তার পায়।

কবি আশীর্ব্বাদ করে—এ সিঁদুর অক্ষয় হোক…

শোভা বলে—স্বামী যে এত সুন্দর, এত মধুর, তা তো জানতাম না কবি!

—তাই নাকি? স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যে কত, তাও কি স্বামী জেনেছেন?

আনন্দে উৎফুল্ল কবির মুখে হাসি ধরে না। শোভা লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে।

কিছুক্ষণ কবির মুখের দিকে চেয়ে শোভা বলে—তা হলে এখন আমি আসি?

—কোথায়, কতদূরে যাচ্ছ—তা তো বললে না? দুঃখিত ভাবে কবি জিজ্ঞাসা করে।

—আমি তা কি করে জানব? এখন যদি তিনি যমের বাড়ী নিয়ে যান—তাও যেতে বাধ্য হব—এইটুকু জানি…

বলেই সে চুপ করে যায়। আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! স্বামী কি নেশার মত?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তার চেয়েও বেশী, তোমার মত মেয়ের কাছে…

—আমার মত মেয়ে, কেন বলছ?

—দোষটা তোমার নয় আমার এই একতারার। এই

সুরেই যে তোমার সুর বেঁধেছি আমি। বেশ বুঝতে পারছি—তোমার স্বামী নিম্ন হলেও, তোমার মুখে হবে আমুর।

একতারা বাজিয়ে জীবন-কবি নেচে নেচে গায়—

যৌবন-জোয়ারে ভাসে তরী।

শোভা জিজ্ঞাসা করে—বল ত কবি! আমার স্বামীও তোমার মত নাচতে-গাইতে জানে কি না?

—নাচ-গান সবার ভিতরেই আছে। তুমি যদি নাচাতে পার, তাহলেই নাচ্‌বে। গাওয়াতে পারলেই, গাইবে। আত্মহারা হয়ো না—তুমি যে প্রকৃতি! পুরুষকে নাচানো আর গাওয়ানো যে তোমারি কাজ···

—তোমাকে নাচায়-গাওয়ায় কে?

—তুমি···

—আমি?···

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোভা চলে যায়। জীবন-কবি উদাসভাবে চেয়ে থাকে। তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

জীবন-কবির মনে অনুশোচনা জাগে—এই ত সে চলে গেল। কোন্ দেশের সুপুরুষ রাজকুমার এসে তাকে নিয়ে গেল। যৌবনের গান গেয়ে গেয়ে কেন সে শোভার ঘুমন্ত মনটাকে জাগিয়েছিল। শোভাও তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেয় নি। কিন্তু আজ?

ঘুমিয়ে পড়লেই ত কঙ্কালটা জেগে উঠবে? কি সর্ব্বনাশ! জীবন-কবি ভয়ে শিউরে ওঠে! না, না, না, তা হতে পারে না। এখনও তাকে জেগে থাকতে হবে, ভাবীকালের আগমনী গাইবার জন্যে। নূতন আগন্তুক যখন আসবে তাকে কোলে তুলে নাচতে হবে—গাইতে হবে। একতারাটা হাতে তুলে নিয়ে জীবন-কবি নাচে আর গায়—

ওরে আসবে কে তা জানি—
ফুলের বুকে কচি হাতে করের ও হাতছানি,
তারে মানি রে ভাই, মানি।
আমার হাতের একতারা সে—হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে,
জান্‌ছি আমি হারবো—তবু করবো টানাটানি।

৪

কিছু দিন পরে। জীবন-কবি তার একতারাটা দূরে ঠেলে ফেলে দেয়। নাঃ, আর পারি না···

কুটীরের বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে, চোখ বুঁজে পড়ে আছে কবি। তার ভিতর থেকে কঙ্কালটা যেন মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে—য়্যয় ভুখা হুঁ!

জীবন-কবি বলে—ওরে অসুন্দর! ওরে মিথ্যে! যৌবন তোর আবেদন গ্রাহ্য করবে না। প্রাণ তোর কুৎসিত আচরণ সহ্য করতে পারবে না। তোকে দেখলেই সে পালিয়ে যাবে। তবু তোর বাইরে আসার এ দুরাশা কেন? শোভার কোলে যে নবীনের শুভাগমন হবে, জীবন ছাড়া তাকে অভিনন্দিত করবে কে? সে যে হবে এই জীবন-কবির অন্তর-মধু! ওরে বীভৎস কঙ্কাল! আমাকে বাঁচতে দে—বাঁচতে দে···

দুটো বছর চলে যায়, জীবন-কবি চালায় কঙ্কালের সঙ্গে বুঝাপড়া।

হঠাৎ শোভা আজ ফিরে এসেছে—ক্লিন্ন বেশ, রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ! এ কি! কেন সে এমন নিরাভরণা? কোথায় গেল তার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার? সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য? রাজকুমারীকে এমন দীন-দুঃখিনী ভিখারিণী সাজিয়ে দিয়েছে কে?

কবির কঙ্কালসার দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টেনে তোলে শোভা। কেঁদে কেঁদে বলে—কবি ওঠ! ওঠ তোমাকে বাঁচতে হবে! নাচতে হবে, গাইতে হবে। আমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি যে ফিরে এসেছি!

—ফিরে এসেছ? কেন—কেন শোভা? জীবন-কবি বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে শোভার মুখের দিকে।

শোভা কেঁদে কেঁদে বলে—সে পালিয়ে গেছে চিরদিনের মত আমার নাগালের বাইরে। তাকে তো আর ফিরে পাব না কবি!

শোভা বলে কি? জীবন-কবি যেন কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শোভার নিষ্প্রভ মলিন মুখের দিকে।

শোভা কাঁদে। জীবন-কবি সান্ত্বনা দেয়।

হঠাৎ শোভার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন কবির কাঁধটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে—আমাকে সে ভালবাসে নি সত্যি! কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতিদানে আমাকে সে কি দিয়ে গেছে জানো?

—কি?

—তার স্মৃতি! সে কত সুন্দর দেখবে?

—দেখব! দেখব! তাকে দেখবার জন্যেই তো বেঁচে আছি!

জীবন-কবি লাফিয়ে ওঠে। তার বুকটা দুলে ওঠে। শুষ্ক ধমনীতেও স্পন্দন অনুভব করে চোখ মুছে ভাঙা একতারাটি আবার মেরামত করতে বসে। কণ্ঠে জাগে সুর। পায়ের বল ফিরে পায়। গানের তালে নাচতে চায়। না, না, কবি এখন মরবে না। মরতে সে পারবে না। কঙ্কালকে বলে—সাবধান! আর চীৎকার করিস নে।

দুঃখিত ভাবে শোভা বলে—কবি! খোকা তো তোমার কাছে আসবে না। তোমাকেই যেতে হবে তার কাছে···যাবে?

—আমাকেই যেতে হবে?

—তা ছাড়া আর উপায় কি?

একটু চিন্তা করে জীবন-কবি বলে—বেশ, তা হলে তাই

হোক্। আমাকেই নিয়ে চল তোমাদের প্রাসাদে—আমি যাব।

—তুমি যাবে? শোভা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জীবন-কবির হাত দুখানা চেপে ধরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—সত্যই কি তুমি যাবে আমাদের প্রাসাদে?

—তোমার জন্তে যাইনি, কিন্তু তার জন্যে যাব। তোমার মনের মত করে তাকে গড়ে তুলব আমি। সে যে হবে আমারই অন্তর-মধু—আমার এই একতারার মালিক—আমার সুর, আমার গান, আমার ঝঙ্কার—এ সবই তো হবে তার···

—প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারবে?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তোমাদের সেই অহঙ্কার চূর্ণ করতেই যাব। ঐ হবে আমার হাতের হাতিয়ার! বহু গরীব-দুঃখীকে বঞ্চনা করে, তোমার বাপ-ঠাকুরদা যে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণ আহরণ করেছিলেন, সে সবই সে বিলিয়ে দেবে। নিজের বলে কিছুই রাখবে না।

—তা কি করে জানলে?

—সেই কথাই তো বলছি—সে হবে তোমার নয়, আমারও নয়, সকলের। আমি তাকে খাঁটি-মানুষ তৈরি করব। এই হাতে তারও সুর বাঁধব আমি। তা যদি না পারি মিথ্যে আমার এই একতারার কান-মোচ্‌ড়ানো।

বৈধব্যের জ্বালা সইতে না পেরে—শোভা বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ফেলে দিয়েছিল হাতের বিষ। কিন্তু মন যে এখনো বিষিয়ে আছে। বুকের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে উঠেছে।

কবির কথা শুনতে শুনতে—হঠাৎ তার চোখের দীপ্তি ফিরে আসে। দেখে যেন কোন্ এক নূতন আলো আর নূতন জগৎ! যে জগতের খাঁটি মানুষ হবে তার সন্তান। শোভা কি আর মরতে পারে?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বলতে পার—মৃত্যুর পর সে এখন আছে কোথায়?

—কোথায় আবার থাকবে? তোমার কাছেই আছে···

শোভা চম্‌কে উঠে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কাছেই আছে, মানে?

জীবন-কবি হেসে বলে—হাতের চুড়ি ভেঙে গলার হার তৈরি করলে সোনা তো সোনাই থাকে। তোমার ভালবাসার আতিশয্য সইতে না পেরে, সে সরে গেছে। গলার হার হয়ে আজ সে তোমার বুকে দুলবে! দেখবে—কত ভালবাসতে পার তুমি? আজ তার দাবি—তোমার স্নেহ। ভালবাসার চেয়ে স্নেহের গভীরতাও বেশী, মধুরতাও বেশী! স্বামীকে যা দিয়েছিলে, তার প্রতিদানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তোমার মনে। আজ তুমি দেউলে হয়ে শুধুই দেবে। পাবে না কিছুই।

—কেন পাব না? খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি যে আনন্দ পাই—তা কি মিথ্যে?

—কেন তা মিথ্যে হবে? সেই তো সত্যি আনন্দ! সে আনন্দ পাওয়ার জন্তে নয়—দেওয়ার জন্তে ভোগের জন্যে নয় ত্যাগের জন্তে। সে আনন্দ মর্ত্তের নয়, স্বর্গের। ছেলে যখন তোমাকে মা বলে ডাকে—তোমার বুক উথ্‌লে উঠে। তুমি কি পার তাকে বাধা দিতে?

জীবন-কবি একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গায়—

> এই কুটীরে, ফাগুন দিনের প্রান্তে—
> বাজবে আমার 'একতারা' তার হাতে!

৫

রাজকুমারী শোভার মা রাণী-বসুন্ধরা পুত্রহীনা বিধবা। শোভা বিধবা হলেও, পুত্রবতী। শোভার পুত্র নরেশ এই দুই বিধবার একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তি!

নরেশকে খাঁটি মানুষ তৈরি করবার ভার নিয়েছেন জীবন-কবি। বসুন্ধরার আপত্তি ছিল। শোভা ছাড়ে নি। জীবন-কবিকে টেনে নিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদে। কবির অভিমত—শিশু-নরেশ শুধু নেচে গেয়েই মানুষ হবে।

নরেশ দাঁড়াতে শিখলেই—কবি তাকে নাচতে শেখালেন। মুখে কথা ফুটলেই, সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শেখালেন। গুরুর হাতের একতারার দিকে শিষ্য খুব নজর রাখে। কখনও বেসুরো গায় না, বা তালও কাটে না।

ক্রমে নরেশ বড় হয়ে উঠল। তার কৌমারকে ছাপিয়ে যৌবন জাগল। এতদিন গুরুও নেচেছেন শিষ্যের সঙ্গে। এখন আর গুরুর পায়ে বল নেই। শিষ্য একাই নাচে। গুরুর দম ফুরিয়ে আসে—শিষ্য সুর টেনে রাখে।

চলনে ও রূপসজ্জায় ধীরে ধীরে নরেশ যেন হয়ে উঠে জীবন-কবির একটি প্রতিচ্ছবি। কবির পাকা চুলের চূড়ার মত—সেও বাঁধে একটা কাঁচা চুলের চূড়া।

রাণী-বসুন্ধরার চোখ জ্বলে। শোভার চোখ জুড়ায়। বিরক্ত বসুন্ধরা শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন—বলি, তোর উদ্দেশ্য কি? নরেশ কি রাজকুমার সাজবে না? পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য নেই। বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি নাই। ওই নোংরা জীবন-কবির মত নরেশও কি শুধু গান গাইবে, আর নাচবে?

শোভা হাসে। বসুন্ধরা রেগে যান। জীবন-কবির শিক্ষকতায় নরেশের এই রুচি-বিকার বসুন্ধরা আর সইতে পারছেন না। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী নরেশ। ধন-সম্পদের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও আত্মসুখে অমনোযোগিতা, বসুন্ধরা খুবই অসঙ্গত মনে করেন।

উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা একদিন বলেন—না, না, শোভা! এ চলবে না···

—কি চলবে না মা ?

—নরেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাতে হবে···সে শুধু নাচ-গান শিখবে—এ ব্যবস্থা মানব না আমি।

—বেশ তো জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাও। নাচ-গানের সঙ্গে তো তার কোন বিরোধ নেই। বন্দোবস্ত কর—একজন বিজ্ঞানী এসে রোজ দু'ঘণ্টা ওকে বিজ্ঞান শেখাবে···

—কবিকে তাড়িয়ে দাও···

খোকা চমকে উঠে। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—তা হতে পারে না মা! কবি আছে—তাই নরেশ আছে, কবি না থাকলে, নরেশও থাকবে না···

বিস্মিত ভাবে বসুন্ধরা বলেন···কবি না থাকলে নরেশও থাকবে না? বলিস কি? ওকে আমি বেঁধে রাখব, উচ্ছৃঙ্খল হতে দেব না···

কোটপ্যান্ট-পরা একজন বিজ্ঞানী আসে। হাতে তার বেত্রদণ্ড।

পড়ার ঘরে বসে নরেশ জিজ্ঞাসা করে আপনার হাতে ওটা কি সার ?

—বেত!

—বেত দিয়ে কি হবে ?

গম্ভীরভাবে বিজ্ঞানী বলে—আমার নির্দেশমত না চললে, বা লেখা-পড়ায় অমনোযোগী হলে—তোমাকে আমি বেত মারব।

—বেত মারবেন ?

—হ্যাঁ, তোমার দিদিমার আদেশ···

—দিদিমা বলেছে, আমাকে বেত মারতে? নরেশ বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁ বলেছি—আড়াল থেকে সামনে এসে, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বসুন্ধরা।

—কেন দিদিমা? আমার অপরাধ কি ?

—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছ! বহু বার বারণ করেছি—ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। গাছে উঠো না। নদীতে সাঁতার কেটো না। যখন তখন, যেখানে সেখানে নাচগান করে বেড়িয়ো না। আমার এ আদেশ কেন শুনছ না ?

—আমাকে রাজপুত্তুর সাজতে হবে ?

হ্যাঁ, তুমি একজন কোটিপতির বংশধর। এই রাজৈশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বংশমর্য্যাদা আর আভিজাত্যবোধ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে ঐ মাষ্টার তোমাকে বেত মারতেও দ্বিধা করবে না।

নরেশের মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। মুখে কিছু বলে না।

বিজ্ঞানী মাষ্টার একটা চেয়ার পেতে বসে। নরেশকে ইঙ্গিত করে—সামনের টুলটার উপর বসতে। মাঝখানে একটি ছোট টেবিলের উপর খাতা, কলম আর বই।

বইখানি হাতে নিয়ে বিজ্ঞানী-মাষ্টার বলে, শোনো—সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়···

নরেশ বলে—সেকথা আমি স্বীকার করি না। মাপ করবেন···

—তার মানে? বিজ্ঞানী বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে নরেশের মুখের দিকে।

নরেশ বলে—আয়তনে বড় হলেই সে বড় হয় না! সূর্য্য একটা আগুনের পিণ্ড! দূরে আছেন তাই রক্ষে। তবুও মাঝে মাঝে কাছে এসে পৃথিবীকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন···

একটু হেসে বিজ্ঞানী বলে—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কবির কাছে শুনেছি—প্রতিপদ থেকে চাঁদকে তিনি ঢাকতে সুরু করেন। অমাবস্যার রাত্রে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেন। এ নীচতার কারণ কি? বারো মাস পূর্ণিমা থাকলে আমাদের কি ক্ষতিটা হ'ত শুনি? চাঁদ আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

—ভুল বুঝেছ। কবি তোমাকে অবৈজ্ঞানিক ভুল কথা বুঝিয়েছেন। সূর্য্যরশ্মি আছে বলেই আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে!

—কি করে জানলেন? ধরুন সূর্য্য নেই। দিনটা হ'ল রাত্তির। রাত্তিরে পেলাম আমরা অফুরন্ত জ্যোৎস্না! শুধু চাঁদ থাকলে, এই পৃথিবী কি সুন্দর হ'ত? কত ঠাণ্ডা থাকত পৃথিবীর আবহাওয়া! কবি বলেছেন—মানুষের মনে সব দুরাকাঙ্ক্ষা আর দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার কারণ হচ্ছে—ঐ সূর্য্যতেজ! চাঁদ আছে—তাই পৃথিবীতে এখনও আছে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি! স্নেহ, দয়া ও মায়া!

—একেবারেই অবৈজ্ঞানিক!

—বিজ্ঞান কি একথা স্বীকার করে না ?

—কখনো না। চাঁদের যে আলো জ্যোৎস্না, তাও সূর্য্যের কাছ থেকে ধার করা। সূর্য্য না থাকলে চাঁদও থাকে না।

—বুঝলাম···

—কি বুঝলে ?

একটু হেসে নরেশ বলে—কবির কাছে শুনেছি—আমার দাদামশাই নাকি টাকা ধার দিয়ে, সুদের সুদ আদায় করে বড়লোক হয়েছিলেন, সূর্য্য তা হলে আমার সেই দাদামশায়ের মত? আলো ধার দিয়ে, অমাবস্যার অন্ধকারে সুদ আদায় করেন? তার চেয়ে চাঁদকে তিনি মুক্তি দিন না? কিছু আলো চাঁদের নিজস্ব হয়ে যাক। আমরাও চাঁদের আলোয় নেচে গেয়ে সুখে থাকি। সূর্য্য-তেজের এ দাম্ভিকতা সহ্য করি কেন বলুন ত?

বিজ্ঞানী উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ায়। চীৎকার করে

বলে—শুধু চাঁদের আলোয় বাঁচতে হলে পৃথিবীর লোকগুলো সব 'থাইসিসে' মরে যাবে!

বসুন্ধরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে, কি হয়েছে?

বিজ্ঞানী বলে—আপনার নাতিকে বিজ্ঞান শেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়···

—কেন?

—কবি ওর মাথাটি খেয়ে বসে আছে···

কবি ছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে। বয়সের ভারে মেরুদণ্ড ভেঙে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া দেহটাকে খাড়া রাখবার জন্যে দরকার হয়েছে তৃতীয় পা—একটা মোটা লাঠি।

অষ্টাবক্রের মত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে, কবি বলে—মা! তা হলে এখন আমি আসি। বিদায়···

খোকা ছুটে এসে বাধা দিয়ে বলে—কেন কবি?

—আর ত দরকার নেই খোকা! নরেশকে আমার চেয়েও ঢের বেশী পণ্ডিত করে দিয়েছি। আমার বিদ্যেও ফুরিয়ে গেছে, আমিও ফুরিয়ে গেছি···

—না না, তুমি যেয়ো না···খোকা অস্থিরতা প্রকাশ করে।

বসুন্ধরা গম্ভীর ভাবে ডাকেন—খোকা!

—কি মা?

—কবিকে যেতে দাও···

—কেন?

—কবির কুশিক্ষা নরেশকে চরম উচ্ছৃঙ্খল করে গড়ে তুলেছে। আর নয়। কবিকে আর সহ্য করব না আমি···

—দোহাই তোমার, কবিকে তাড়িয়ে দিও না···

—সেদিন নরেশ কি করেছে জান?

—কি?

—একজন প্রজা এসেছিল—খাজনার টাকা পরিশোধ করতে। শুনলাম—নরেশ নাকি ম্যানেজারের হাত থেকে দাখিলাখানা কেড়ে নিয়ে—তাকে দিয়ে দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে—টাকা দিতে হবে না তাকে···

উৎফুল্ল ভাবে নরেশ বলে—আর একটা কাজ কি করেছি জান না?

খোকা জিজ্ঞাসা করে—কি?

—সেই বুড়ো প্রজাটা, এই পৌষের শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। দিদিমা আমাকে যে শালের জোড়া দিয়েছিল—তাই দিয়ে তাকে জড়িয়ে ঐ গেটের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি? আনন্দের আতিশয্যে জীবন-কবি নিজের বুকের ভিতর চেপে ধরে নরেশকে। আত্মহারা হয়ে বলে—বাঃ, বাঃ! তার পর, একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে ওঠে—

কে জানে মোর চারা-গাছে,
ধরবে এ ফল অকালে?
তোদের রবি উঠবে না, মোর—
চাঁদ উঠেছে সকালে!

বসুন্ধরা ধমক দিয়ে বলেন—কবি! থাম···

—কেন থামবে? নরেশ প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—গাও কবি! আমি নাচব···

—না! এ প্রাসাদে আর নাচ-গান চলবে না···বসুন্ধরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

একটু হেসে নরেশ বলে—আচ্ছা দিদিমা! আয়তনে বড় হওয়াই কি সত্যি বড় হওয়া?

—তার মানে?

—মা সেদিন বলছিল—তোমার ওজন নাকি দু'মণ ছত্রিশ সের! কবি আর বৈজ্ঞানিক দু'জনকেই যদি দাঁড়িপাল্লার এক দিকে তোলা যায়—তবু ওঁরা তোমার সমান হতে পারেন না। তবে আর দরকার কি? তাড়িয়ে দাও—দু'জনকেই। তুমিই পারবে আমাকে শিখিয়ে দিতে—কি ভাবে গরীবের টাকা কেড়ে নিয়ে, দুধ-ঘি খেতে হয়, আর মুটিয়ে যেতে হয়···

নরেশের সেই মারাত্মক মন্তব্য শুনে জীবন-কবি চমকে ওঠে। ধন-গর্ব্বিণী বসুন্ধরাকে আঘাত করবার জন্যে নরেশের তূণে আর কত বাণ আছে তাই বা কে জানে? না না, এখানে আর নয়। জীবন-কবি মাথা নীচু করে চলে যায় নিজের কুটীরে। মনে মনে আর একবার বলে যায়—বাঃ বাঃ!

৬

রাগে বসুন্ধরার চোখ মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ঐ একরত্তি ছেলে তাঁকে ঘি-দুধ খাওয়ার পরিহাস করে? খোকা পর্য্যন্ত তাঁর সামনে মাথা তুলে কথা বলতে সাহস করে না। সেই খোকার ছেলে নরেশ! সে করে রাণী বসুন্ধরাকে অসম্মান?

মাষ্টারের হাত থেকে বেতখানা টেনে নিয়ে বসুন্ধরা বলেন—মাষ্টার! এই বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। তুমি ওকে পড়াও···

—পড় নরেশ! বিজ্ঞানী আবার চেয়ার পেতে বসে। নরেশও ভয়ে ভয়ে গিয়ে বসে টুলের উপর।

বিজ্ঞানী বলে—পড় নরেশ! উত্তর মেরুতে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত্রি···

নরেশ বলে—সেখানে বোধ হয় ছ'মাস থাইসিস্ আর ছ' মাস কলেরা!

—আঃ! বাজে ব'কো না···

—বাঃ রে! কিছু আগে, আপনিই ত বললেন, সূর্য্য-রশ্মি না থাকলে থাইসিস্ হয়···

—আচ্ছা, এ বই এখন থাক্। খাতা কলম নাও, আঁক্ কষ···

বসুন্ধরা বলেন, হ্যাঁ ঠিক্‌! আঁক্‌ কষাও। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব শেখাও···আমি একটু ঘুরে আসছি···

বসুন্ধরা চলে গেলে নরেশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। দু'বণ ছত্রিশ সের দিদিমার হাতে বেত দেখলে, কোন্‌ নাতির পিলে না চমকায়?

নরেশ বলে, শুনুন সার! আঁকগুলো যেন পচা নর্দমার পোকার মত, আমার মাথার ভিতর গিয়ে কিলবিল করে! তার চেয়ে গুন গুন করে একটা গান গাই শুনুন···

—রাণী বসুন্ধরা আমাকে মাইনে দিচ্ছেন, তোমাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্তে। তোমার গানের তারিফ করবার জন্তে নয়···বলেই বিজ্ঞানী তার পকেট থেকে সিগারেট-কেস্‌টা বের করে। একটা সিগারেট ধরায়।

হাত পেতে নরেশ বলে, আমাকেও একটা দিন্‌ না সার!

—তুমি সিগারেট খাবে?

—দোষ কি?

—সিগারেট খেলে লাঙ্‌স খারাপ হয়···

—আপনার লাঙ্‌স নেই?

—বড্ড অসভ্য ছেলে তুমি···

—বাঃ রে! সিগারেট খাচ্ছেন আপনি, আর অসভ্য হচ্ছি আমি?

জানালা-পথে দূর থেকে বসুন্ধরাকে আসতে দেখে বিজ্ঞানী তার সত-ধরানো গোটা সিগারেটটা জুতোর তলায় মাড়িয়ে দেয়।

নরেশ একটু হেসে বলে, আমার পায়েও খড়ম আছে সার্‌! আমিও ও ভাবে লুকোতে পারতাম···

বসুন্ধরা এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি হচ্ছে?

বিজ্ঞানী বলে, নরেশ আঁক কষতে রাজী নয়···

চোখ রাঙিয়ে বসুন্ধরা কৈফিয়ৎ তলব করেন, কেন নরেশ?

যন্ত্রণার অভিনয় দেখিয়ে নরেশ বলে, বড্ড পেটব্যথা করছে দিদিমা!

—পেটব্যথা করছে? থাক, থাক, তা হলে আজ আর পড়াশুনোর দরকার নেই। ওষুধ খাবে এস···বলেই বসুন্ধরা ঘর থেকে বেরিয়ে যান্‌।

নরেশ ভাবে, তাই ত! এখন কি করা যায়? পিঠ বাঁচিয়েছি পেটের দোহাই দিয়ে। এখন পেট বাঁচাবার উপায় কি?

শোভার কাছে ছুটে গিয়ে, নরেশ তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে, মা! আমি মিছে কথা বলেছি। সত্যি পেট-ব্যথা করছে না আমার! তবু দিদিমা আমাকে তেতো ওষুধ গেলাবে···

—কেন মিছে কথা বললে?

—সত্যি কথা বললে দিদিমা বেত মারত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। শোন মা! আজই আমি কবির কাছে চলে যাব। যেখানে সত্যি কথার শাস্তি বেত আর মিথ্যে কথার শাস্তি তেতো ওষুধ, সেখানে আর একটি দিনও থাকব না আমি।

শোভার চোখ জলে ভরে ওঠে। চোখ মুছে নরেশের মাথায় হাত রেখে সে বলে—আচ্ছা এসো।

—যাব?

—হ্যাঁ, এখানে থাকলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে, চোর হবে, ডাকাত হবে।

—তুমি যে আমার জন্তে কাঁদবে!

—না বাবা! একটুও কাঁদব না। তুমি কবির কাছেই যাও। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব। এখানে যদি থাক তা হলে আমাকে দিনরাত কাঁদতে হবে।

নরেশ শোভার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সে তার মুখখানা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে কপালে চুম্বন করে। নরেশ চলে যায়।

এক হাতে ওষুধ আর এক হাতে বেত নিয়ে বসুন্ধরা এসে জিজ্ঞাসা করেন—নরেশ কই?

—চলে গেছে।

—কোথায়?

—কবির কাছে।

—তোমাকে বলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বাধা দাও নি?

—না।

—কেন?

—কবিই তার মা-বাপ। আমি কেউ নই। এখানে সে থাকবে না।

—সে কথার মানে?

—মানে তোমাকে বোঝাতে পারব না মা! নরেশের আশা তুমি ছেড়ে দাও।

—আশা ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ।

—তা হলে শোন শোভা! তোমাকে আবার বিয়ে দেব আমি।

শোভা চমকে ওঠে। কি ভয়ানক কথা! চোখ দুটো বড় করে দারুণ বিস্ময়ে শোভা জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি বলছ মা?

—তোমার এ বৈধব্যের কোন মানে হয় না। পুরো দুটো বছরও তুমি স্বামী নিয়ে সুখী হও নি। আবার তোমাকে আমি বিয়ে দেব এ সঙ্কল্প আমার স্থির! বিজ্ঞানী! এ

দিকে এসো··· দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসুন্ধরা বিজ্ঞানীকে ডাকেন।

বিজ্ঞানী এসে ঘরে ঢোকে। বসুন্ধরা তাকে বলেন—শোভাকে বুঝিয়ে দাও তার মত বাল-বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত কি না ?

সসঙ্কোচে ও সবিনয়ে বিজ্ঞানী নিবেদন করে—সে বিষয়ে আলোচনা করতে উনি যদি রাজী না হন ?

শোভা বলে—হ্যাঁ রাজী আছি। বসুন আপনি।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উৎসাহিত ভাবে বিজ্ঞানী বসে। বসুন্ধরা বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

শোভা বেশ বুঝতে পেরেছে—প্রস্তাবটা খুব হঠাৎ আসে নি তার কাছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীর সঙ্গে বসুন্ধরার আলোচনা হয়েছে পূর্ব্বেই। বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নরেশের শিক্ষকতা হলেও, পরোক্ষে তার লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে শোভার প্রতি! শোভাকে পেলেই ত রাজৈশ্বর্য্য পাওয়া হবে? শোভার মনে জেগেছে বিজ্ঞানীকে একটু যাচাই করবার কৌতুহল! তাই জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন ?

—নিশ্চয়ই। বিশেষত: আপনার মত বাল-বিধবার বিবাহ না হওয়া অত্যন্ত অশুভ ও অসঙ্গত ?

—আপনি কি বিবাহিত ?

—আজ্ঞে না···

—একটি বাল-বিধবার দুঃখ দূর করবেন ?

—নিশ্চয়ই করব। আমার জীবনের একটা পবিত্র সঙ্কল্পই তাই। বহু কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আজও অবিবাহিত আছি···

—ধন্যবাদ। আজ, আসুন তা হলে। কাল আবার আসবেন। আমার পরিচিত একটি বাল-বিধবা আছে। মা-বাপহারা অসহ্য:খিনী! তাকে উদ্ধার করবেন ?

—দেখুন, আমি···আপনা'কেই···

— বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে···শোভার চোখে-মুখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বিজ্ঞানী বেরিয়ে যায়।

৭

কবির কুটীরে গিয়ে শোভা দেখে—কবি মৃত্যু-শয্যায়। নরেশ তার সেবাযত্ন করছে। গান গেয়ে শোনাচ্ছে। কবির একতারা আজ নরেশের হাতে! চোখ বুজে ঝঙ্কার শুনতে শুনতে কবি বলছে—বা: বা: !

চাষী-পল্লী থেকে নরেশের সমবয়সী বন্ধুরা সবাই এসে জুটেছে সেখানে। কবির কুটীরে আজ কোনও কিছুর অভাব নেই। কত ফুল, কত ফল! মৃত্যু যেন মহোৎসব। জীবন-কবি তার অনুরাগীদের নিকট থেকে চির-বিদায় নিচ্ছে। সকলের চোখ সজল। কিন্তু কবির বিশীর্ণ মুখে হাসি যেন ধরছে না। এ কি মৃত্যুর আনন্দ!

শোভা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। কবি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কেঁদ না শোভা! আমার কঙ্কাল আজ পুড়বে—আমার হবে মুক্তি! দুঃখ করো না। মৃত্যু কিছুই নয়। আমি ত বেঁচে থাকব তোমার নরেশের মনের মধ্যে।

চোখ মুছে শোভা ফিরে আসে। বহু মূল্যবান আসবাব-পত্রে সাজানো একটি কক্ষের এক কোণে বসেছে সে। খোলা-জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। চলেছে জীবন-কবির শববাহী শোভাযাত্রা!

হঠাৎ পিছন থেকে বসুন্ধরা ডাকলেন—শোভা!

শোভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—বসুন্ধরার সঙ্গে একটি অপরিচিত লোক।

বসুন্ধরা লোকটিকে দেখিয়ে বলেন—ইনি এসেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে।

—কে উনি ?

—একজন বিখ্যাত দার্শনিক ··

দার্শনিক প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—না না, কথাটা আপনার ঠিক বলা হ'ল না, বসুন্ধরা দেবী!

—কেন ?

—বলুন আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন, আলাপ-পরিচয় করাতে আপনার মেয়ের সঙ্গে···

—একই ত কথা···

—আজ্ঞে না—কথাটা এক নয়···তবে, বিজ্ঞানী আমার বন্ধু। তার সঙ্গে ওঁর বিয়েটা যখন ঠিক হয়ে গেছে···তখন··· আমি নিজে এলেও···

উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে শোভা বলে—মা! এ সব কি? তুমি আমাকে কি ভেবেছ বল ত ?

—কি ভেবেছি ?

—আমি বিধবা নই। আমাকে আর বিরক্ত করো না···

বিস্মিতভাবে বসুন্ধরা বলেন—বটে! তুমি বিধবা নও ?

—না। তোমরা আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছ না। আমি দেখছি—আমার এই বুকের ভিতর বেঁচে আছেন তিনি ···তাঁর স্পর্শ আমি অনুভব করি···

—কি সর্ব্বনাশ! এই মেয়েকে বিয়ে দিতে চান আপনি ? দার্শনিক বিস্ময় প্রকাশ করেন।

বসুন্ধরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—বিয়ে ওর দিতেই হবে—সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ শুনতে চাই না।

দার্শনিক শোভার বিশ্বাসকে সমর্থন করে বলেন—যাঁর মন বিধবা হয় নি—তিনি কখনই বিধবা নন···একথা আমি বলবই···

বিজ্ঞানী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বসুন্ধরা তাকে ভিতরে

ডাকেন। ভৎর্সনার সুরে বলেন—কেন তোমার এই দার্শনিক বন্ধুকে নিয়ে এসেছ?

দার্শনিক বলে—বিজ্ঞানী মূর্খ বলেই রাজকুমারী শোভাকে চিনতে পারে নি। জিজ্ঞাসা করি—কেন ওঁকে আপনি বিয়ে দিতে চান বলুন ত?

—আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে কে?

—যারা ভোগ করবে—তারা আসছে!

—কারা আসছে?

—যারা এই শোভা দেবীকে মা বলে ডাকবে। তারা একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার ক্ষুধিতের দল···

—কোথায় তারা?

—দেশে কি দেখছেন না দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস? অনাবৃষ্টি ও অজন্মা আরম্ভ হয়েছে! শীগ্‌গিরই শুনতে পাবেন অন্নহীন প্রজা-সাধারণের হাহাকার। যাদের কায়িক শ্রমের মূল্য আহরণ করে গড়ে উঠেছে আপনার এই রাজপ্রাসাদ!

উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেন—বিজ্ঞানী! কেন এই দার্শনিককে নিয়ে এসেছ এখানে?

বিভ্রান্ত বিজ্ঞানী বলে—ভুল করেছি···

—ভুল কর নি বন্ধু! এই শোভা দেবীকে তুমি চিনতে পার নি। আমার দৃষ্টি নিয়ে ওঁকে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা কর স্বার্থ-চিন্তা মানুষকে অবুঝ ও অসংযত করে···ক্রুদ্ধভাবে দার্শনিক বলে।

বসুন্ধরা বুঝেছেন—এই দার্শনিক একটা বিশিষ্ট মতবাদের সমর্থক, যারা বলে—ধনীর সম্পদে নির্ধনের দাবি আছে। কারও বলত—দার্শনিকও বলছে—ধনীরা পরস্বাপহারী দস্যু! দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাব ঘটলে ধনীর ভাণ্ডারদ্বার খুলতে হবে। নিরন্নকে অন্ন দিতে হবে। কিন্তু কেন? এই সব মতবাদী যে অত্যন্ত পরশ্রীকাতর সে বিষয়ে বসুন্ধরার মনে কোনও সন্দেহ নেই। উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেন—দার্শনিক! তোমার উদ্দেশ্য কি?

—কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ত এখানে আসি নি···?

—শোভার দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন?

—দেখছি···

—কি দেখছ?

—অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি! ক্ষুধিতের দল যখন মা, মা, বলে আপনার দ্বারে এসে কাঁদবে, তখন এই শোভা দেবীর মাতৃ-হৃদয় নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবে! ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিতে বাধ্য হবেন আপনি···

—বাধ্য হব?

—নিশ্চয়ই। শোভার ছেলেমেয়েরা অনাহারে শুকিয়ে মরবে, তা কি হতে পারে?

—যাদের অন্ন জুটবে না, তারা মরবে। সে মৃত্যু তাদের বিধি-নির্দিষ্ট শাস্তি! আমার কি?

—বিধি-নির্দেশের কথা ভুলবেন না। সে নির্দেশ চিরন্তন নয়, পরিবর্ত্তনশীল। আজ যারা মরবে, মরার আগে তারা জানতে চাইবে—কেন মরছে? কে তাদের বাঁচার অধিকার হরণ করেছে? এ প্রশ্নের সমাধান যদি তারা করতে চায়, তা হলে আপনারাও বাঁচবেন না···

—আমরাও বাঁচব না?

—নিশ্চয়ই নয়! মা মা, বলে কেঁদেও যদি মাকে জাগাতে না পারে তা হলে সে ডাইনী-মাকেও তারা মারবে···

—তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে!

—যে আজ্ঞে, যাচ্ছি···কিন্তু তুমি কি করবে বন্ধু? বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করে দার্শনিক।

—বসুন্ধরা দেবী যদি শোভাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেন, তা হলে এই রাজৈশ্বর্য্য রক্ষার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করব···

—পারবে?

—কেন পারব না? এমন সব মারণাস্ত্র ব্যবহার করব, যাকে অগ্রাহ্য করা কোন আক্রমণকারীর পক্ষেই সম্ভব হবে না···

—মানুষ-মারা খুব সোজা। কিন্তু তার মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন। উপস্থিত তুমি যে আক্রমণ চালাচ্ছ, তার ফল যে কি হবে, তাও ভাব একবার।

—আমি আক্রমণ চালাচ্ছি?

—নিশ্চয়ই। রাণী বসুন্ধরার সাহায্যে বন্দুক দিয়ে ঘিরে, শোভাকে হয়ত বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু তার মনকে তুমি পাবে না বন্ধু! সে থাকবে তোমার নাগালের বাইরে··· নমস্কার বসুন্ধরা দেবী! আসি তা হলে।

দার্শনিক চলে যায়। শোভার কাছে গিয়ে বসুন্ধরা দেখেন, শোভা মূর্চ্ছিতা।

৮

বন্দিনী-শোভার বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। কবি বেঁচে নেই। কবির সেই নিরানন্দ কুটীরে বসে নরেশ শোনে সে বাজনা।

অদূরে চাষীপল্লী। সেখানেও আনন্দ নেই। অনাবৃষ্টির ফলে মাঠের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। চাষীরা লাঙল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কঙ্কালসার গরুগুলি কাঁধের লাঙল কাঁধে নিয়েই শুকনো মাটিতে শুয়ে পড়ে। টানতে পারে না। গরুর অপরাধ কি? তারা মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও এক গাছি সবুজ তৃণের সন্ধান পায় না। পুকুর-ডোবার জলও শুকিয়ে আসছে! পল্লীমেয়েরা উলু দিয়ে আর শাঁখ বাজিয়ে পর্জ্জন্য-দেবের পূজা করছে। হে ঠাকুর, জল দাও—জল দাও!

কবির মৃত্যুর পর দু' মাস কেটে গেছে। শোভা ত আর একটি বারও আসে নি কবির কুটীরে। মা তার সন্তানকে

ভুলে গেছে? অনাবৃষ্টি ত হবেই। শোভা যে বন্দিনী তা ত নরেশ জানে না। সেই স্নেহময়ীর এই আচরণের কথা ভেবে ভেবে নরেশের মনে বিস্ময়ের অন্ত নেই। আজ শোভার বিয়ের বাজনা শুনতে শুনতে নরেশের মন বিস্ময়ে ভরে যায়। না না, পর্জ্জন্যদেব! তুমি এক ফোঁটা জলও দিয়ো না। এ দেশ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তোমার ত বজ্র আছে? তার একটা ফেলে দাও ঐ রাজপ্রাসাদের চূড়ায়।

নরেশ শুনল চাষীপল্লীতে বিরাট জনসভার সমাবেশ হয়েছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নরেশও যায় সেখানে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে।

সমবেত চাষীদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন দার্শনিক।

—ওরে অন্নহীন বস্ত্রহীন, মূক ও বধিরের দল! তোরা কি শুনতে পাস্ না—রাজপ্রাসাদের নহবতে আজ কিসের বাজনা বাজে? কান পেতে শোন্—বন্দিনী বিধবা রাজকন্যার বিবাহোৎসব!

নরেশ চিৎকার করে বলে ওঠে—রাজকন্যা বন্দিনী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্দিনী! দার্শনিক উত্তেজিত ভাবে বলেন—রাজপুরী আজ সঙ্গীনধারী সৈনিক দিয়ে ঘেরা। আমি জানি শোভা দেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহের আয়োজন। ভুরি-ভোজনের বিরাট ব্যবস্থা। দেশ-দেশান্তরের ধনী-মহাজনরা এসে বিবাহসভার শোভাবর্দ্ধন করবেন। তোমরা অন্নহীন! কিন্তু রাজপুরীতে মণ্ডা-মিঠাই গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল পাও না তোমরা, রাজপুরীতে বয়ে যাচ্ছে অতি উগ্র ও তীব্র পানীয়ের ঢেউ! তোমাদের শ্রমের মূল্য দিয়েই ঐ রাজপ্রাসাদটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কই? কোনো উৎসবেই ত তোমরা নিমন্ত্রিত হও না সেখানে?

একজন বৃদ্ধ চাষী কপালে করাঘাত করে বলে—আমাদের অদৃষ্ট!

দার্শনিক বলেন—অদৃষ্টকে দেখতে চেষ্টা কর, বুঝতে চেষ্টা কর। ঐ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ আছে। রাণী বসুন্ধরা কে? তাঁর নিমন্ত্রণের অপেক্ষা কেন করবে? হাজারে হাজারে গিয়ে হাজির হও ঐ রাজদ্বারে। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও বলে চীৎকার কর। এই দুর্ভিক্ষের দিনে বিলাসী-ধনীদের আনন্দোৎসব কি তোমাদের অদৃষ্টকে পরিহাস করছে না? সে পরিহাস তোমরা কেন সহ্য করবে? অনাবৃষ্টির প্রতিকারের জন্যে যদি পর্জ্জন্যদেবের কাছে জল চাইতে পার, ধনী-মহাজনদের কাছে বেঁচে থাকার দাবি জানাতে পারবে না কেন? তাদের সুখৈশ্বর্য্য কাদের জন্যে?

নরেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দার্শনিকের দিকে। খুব কাছে গিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কে?

—তুমি কে—আগে তাই বল…

—বিধবা রাজকন্যা আমার মা। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।

দার্শনিক চমকে উঠেন। বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকেন নরেশের মুখের দিকে। অস্ফুট স্বরে বলেন—তুমি তাঁর ছেলে? তিনি ছেলের মা?

—বিধবা যে পুত্রবতী, তা কি আপনি জানতেন না?

—না। আমার বিজ্ঞানী বন্ধুর কাছে শুনেছি—তিনি নিঃসন্তান! কি আশ্চর্য্য! তুমি এ বিবাহে প্রতিবাদ করছ না কেন?

নরেশ একটু লজ্জিত ভাবে বলে—কেন করব? আমার মায়ের মনের অবস্থা যে কি তা ত আমি জানি না? বিবাহে যদি তাঁর আগ্রহ থাকে, আমি কেন বিঘ্ন ঘটাব?

—তুমি বুঝি রাজপ্রাসাদে থাক না?

—না। রাণী বসুন্ধরার অত্যাচার সইতে না পেরে এই কৃষক-পল্লীতে বাস করছি। এই চাষীরাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদের আমি ভালবাসি…

—তাই নাকি? দার্শনিক উৎফুল্ল ভাবে বলেন—তা হলে চল—ঐ হাজার হাজার ক্ষুধিত অন্নহীনের দল তোমার নেতৃত্বেই প্রবেশ করবে রাজপ্রাসাদে। তোমার দাবি মায়ের সঙ্গে দেখা করা।

জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বহু কণ্ঠের কোলাহলে প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। সাজ, সাজ রব পড়ে যায়।

কেউ কেউ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানায়—আমরা নিরস্ত্র। সঙ্গীনধারী সৈনিকেরা যদি আক্রমণ করে—তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? সেকথাটা ভাব। যেতেই যদি হয়—চল, তৈরি হয়ে যাই! খোন্তা কোদাল, দা-কুড়ুল, যার যা আছে নিয়ে এস…

দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে নরেশ বলে—না, কেউ কোন অস্ত্র নিতে পারবে না। শুধু আমার হাতে থাকবে—এই একতারা! তোমাদের সবার আগে থাকবে আমার এই বুক। বুক দিয়ে সঙ্গীন ঠেলে এগিয়ে যাব আমি। আমার মৃত্যু না দেখে, তোমরা কেউ পিছু হটতে পারবে না।

নরেশের সে ঘোষণায় সমর্থন জানিয়ে অহিংস অভিযানের মাহাত্ম্য প্রচার করে দার্শনিক। চারদিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বন্যা বয়ে যায়। জনস্রোত যাত্রা করে রাজপ্রাসাদের দিকে।

৯

বহুমূল্য অলঙ্কারে আর বেশভূষায় শোভা আজ রূপসজ্জা করেছে—যেন রাজরাজেশ্বরী! কি অনিন্দ্যসুন্দর তার মুখশ্রী! সে যেন মূর্তিমতী সৌন্দর্য্য! মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী চেয়ে থাকে শোভার মুখের দিকে।

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বিজ্ঞানী! কি মনে কর এই দেহটাই আমি?

—না।

—তবে?

—তোমার মনও আমি চাই···

– চাও? তাই নাকি? কি করে পাবে?

বিভ্রান্ত বিজ্ঞানী বলে—দেহকে পেলেই ত মনকে পাওয়া যাবে···

শোভা হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করে—তোমার বিজ্ঞান তাই বলে বুঝি?

—হাঁ, শুধু বিজ্ঞান কেন ইতিহাসও তাই বলে। ব্যক্তি বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসে শুধু দৈহিক সামর্থ্যের জয়-ঘোষণা ছাড়া আর কি আছে? কত বিদ্রোহী মন শক্তিমানের কাছে নত হয়ে অধীনতা স্বীকার করেছে।

—সে বর্ব্বর যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। এ যুগে দৈহিক প্রাধান্ত কেউ মানবে না। এখনও সাবধান হও বিজ্ঞানী! মনকে উপেক্ষা করো না। মা-বসুন্ধরার রক্ত চক্ষু আর তোমার কোমরের ঐ পিস্তলকে ভয় করব না আমি!—শোভা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—সত্যিই কি তুমি আমার হবে না শোভা? কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞানী।

—আমি যদি এক টুকরো মাংস হতাম—তা হলে তোমার মত হ্যাংলাকে বিলিয়ে দিতে পারতাম। আমি যে কি তা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না···

—কি তুমি? কেন এমন ভুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরী সেজেছ?

বসুন্ধরা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন—বিজ্ঞানী! সর্ব্বনাশ হয়েছে···

—কি হয়েছে মা?

—হাজার হাজার ভিখিরি আসছে রাজপুরী আক্রমণ করতে···

—বেশ ত, আসুক না। ভয় কি? রাজপ্রাসাদ খুব সুরক্ষিত আছে। কেউ ঢুকতে পারবে না। আমিও যাচ্ছি তাদের অভ্যর্থনা করতে—বলেই কোমরের পিস্তলটা হাতে বাগিয়ে নিয়ে, বিজ্ঞানী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বসুন্ধরা চিন্তিতভাবে একটা আসনে বসে পড়েন। মাথাটা চেপে ধরেন।

শোভা কাতরভাবে বলে—মা! ভিখিরিদের রক্তে স্নান করে খুব পুণ্যসঞ্চয় করবে, মা?

—উপায় কি? বোধ হয় নরেশও আছে ওদের সঙ্গে! তাই ত ভাবছি—কি হবে?

হাঁ হাঁ, নরেশ নিশ্চয়ই আছে—শোভা ছুটে যায় জানালার ধারে। বাইরে উঁকি দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। চীৎকার করে বলে—মা! দেখে যাও—দেখে যাও—আমার নরেশ কি সুন্দর সাজে সেজে এসেছে···

চাষী বালকেরা ফুল-সাজে সাজিয়েছে নরেশকে। গলায় তার বিচিত্র ফুলের মালা। চূড়াবাঁধা কেশগুচ্ছ ফুল দিয়ে জড়ানো। কানে ফুলের কুণ্ডল। হাতে ফুলের কঙ্কণ। তপ্ত-কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল তার সুকুমার দেহের দীপ্তি! পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মত জলভরা আয়ত চোখ দুটি টলমল করছে। মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। ছেলে তার মাকে দেখতে এসেছে!

শোভা তার অঙ্গের অলঙ্কার খুলে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে। খোঁপা খুলে চুল এলিয়ে দেয়। মূল্যবান বেশভূষা ছেড়ে পট্টবস্ত্র পরে। বসুন্ধরা চুপ করে বসে দেখেন। কোনও প্রতিবাদ করেন না।

নরেশের পাশে দাঁড়িয়ে, দ্বাররক্ষীদের সম্বোধন করে দার্শনিক বলে, এই তরুণ-কিশোর কে? তোমরা কি চিন্‌তে পারছ একে?

নরেশকে দেখেই তারা চিনেছে। তার মুখখানি যে শোভার মুখের প্রতিচ্ছবি! দ্বাররক্ষীরা অভিবাদন জানিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

পিস্তল-হাতে বিজ্ঞানী এসে হুকুম দেয়, সদরের গেট বন্ধ কর···

দ্বাররক্ষীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে অন্তায় হুকুম তারা মানবে কেন? তাদের ভাবীমনিব রাজকুমার নরেশকে তারা বাধা দেবে কার হুকুমে? বিজ্ঞানী ফিরে যায় বসুন্ধরার কাছে। দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটির খবর শুনে, বসুন্ধরা ম্যানেজারকে পাঠান, একা নরেশকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে আন্‌বার জন্তে।

নরেশ সে প্রস্তাবে রাজী হয় না। যারা তার সঙ্গে এসেছে, তাদের সবাইকে দিতে হবে প্রবেশাধিকার। রাজকন্তা শোভা ত আজ একা নরেশের মা নন্? হাজার হাজার সন্তান তাঁর। সবাই এসেছে তাদের মাকে দেখতে। কোন বাধা কি তারা মানবে? বসুন্ধরার হুকুম অমান্ত করে সবাইকে নিয়ে নরেশ ঢুকে পড়ে, সদরের গেট পার হয়ে, প্রাসাদের সম্মুখে, বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানে।

প্রাসাদের দরজায় গুলিভরা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানী। দূর থেকে তাকে দেখে নরেশ একটা নমস্কার জানায়। তার পর কয়েক জন সাহসী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে ওঠে সোপান বেয়ে।

বিজ্ঞানী বলে, যদি প্রাণের মমতা থাকে, আর অগ্রসর হয়ো না···

উপেক্ষার হাসি হেসে নরেশ বলে, প্রাণের চেয়েও, মা যে সন্তানের কাছে কত বেশী প্রিয়—তা কি আপনি জানেন না? আপনার বোধ হয় মা নেই? বাকি [illegible]

বসুন্ধরা এসে বলেন, নরেশ ! তুমি একলা ভিতরে এস। ওদের ফিরে যেতে বল…

—তা কি হয় ? তা হলে আমরা কেউ ভেতরে যেতে চাই না। আমাদের মাকে একবার বাইরে আসতে বল। তার পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা সবাই ফিরে যাব…

বসুন্ধরা উত্তেজিত ভাবে বলেন, সে এখানে আসবে না, আসতে পারবে না…

—কে তাঁকে বাধা দেবে ? আমি যাব তাঁকে আনতে, এই চাষীদের তিনি আশীর্ব্বাদ করবেন…

—সাবধান নরেশ ! সে আমার মেয়ে…

—কিন্তু আমার মা। আমি তোমার সুখৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী নই। আমার মা যদি আমার কুটীরে গিয়ে ভিখারিণী সাজতে চায়, তোমার কোন অধিকার নেই তাকে বাধা দেবার…

দ্বিতলে শোভার কক্ষটিকে বাইরের দিক থেকে রুদ্ধ করে এসেছেন বসুন্ধরা। গবাক্ষ পথে একটি পরিচারিকা এসে উঁকি দিয়ে দেখে। গলার বহুমূল্য হারছড়া পরিচারিকার গায়ে ছুঁড়ে মেরে শোভা মিনতি জানায়—দরজাটা খুলে দে—খুলে দে—তোর পায় পড়ি খুলে…

পরিচারিকাও পুত্রবতী। নরেশের মুখের দিকে চেয়ে তারও মনে পড়ে নিজের ছেলের মুখ। কিন্তু কি করবে ? বসুন্ধরার ভয়ে সে কাঁপে। তবু হঠাৎ যখন দেখে, বিজ্ঞানীর পিস্তলটা নরেশের বুকের উপর—তখন আর স্থির থাকতে পারে না। জানলা দিয়ে হারছড়া ফিরিয়ে দিয়ে, দরজাটা খুলে দেয়। তার পর পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

উন্মাদিনী শোভা ছুটে যায়। শাবকহারা সিংহিনীর মত আক্রমণ করে বিজ্ঞানীকে।

বসুন্ধরা নির্ব্বাক ভাবে চেয়ে থাকেন শোভার সেই তেজোদৃপ্ত মুখের দিকে। কোন কথায় বা কাজের প্রতিবাদ করবার সাহস নেই তাঁর…

নরেশ এসে শোভাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা !

কোশী-বাঁধ

শ্রীশিশিরকুমার কর

গত ১৫ই জুলাই হইতে কোশী নদীতে জল বাড়তে থাকে এবং বিহারের যে-সব অঞ্চলে দারুণ অন্নাভাব তারই কতকটা অংশ কোশীর বন্যায় সম্প্রতি জল-প্লাবিত হয়ে তাদের দুর্ভাগ্যের উপরে আরও দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এইভাবে সাহার্সা এবং পূর্ব্ব-দ্বারভাঙ্গার এক শতের উপর গ্রাম জলপ্লাবিত এবং লক্ষাধিক লোক বিপন্ন হয়, সমস্ত জায়গায় বুকসমান জল দাঁড়িয়ে যায়। প্লাবন শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে আগামী বৎসরেও দুর্ভিক্ষের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে চলেছিল। একমাত্র নৌকা ভিন্ন অন্য সমস্ত যানবাহন চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বন্যার ফলে মৃত্যু ছাড়া, বহু লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যুরও সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। মাধেপুর থানার তিনটি গ্রাম—যা কোন দিন বন্যায় বিধ্বস্ত হয়নি, কোশী এবার তাদেরও আক্রমণ করেছিল।

এবারকার বন্যায় অপূরণীয় ক্ষতি এই হয়েছে যে, মাধেপুর নারাথ ভিৎতগবানপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত রাঘবাচারী শাস্ত্রীর বাড়ীটা সম্পূর্ণ ধুয়ে-মুছে গেছে। সেই সঙ্গে তালপাতার উপর হাতে লেখা বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথি নষ্ট হয়। তার মধ্যে একখানা পুথি ছিল যা সাত শত বৎসর আগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বামদেব উপাধ্যায় কাশ্মীর থেকে মিথিলায় এনেছিলেন।

প্রথম পর্য্যায়

কোশীর এই দুর্দমনীয় বন্যাকে প্রতিরোধ করবার জন্যই কোশী-বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারত-সরকার এই কোশী পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় শেষ করবার জন্য সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। এটা বিহারবাসীর পক্ষে সত্যই সুসংবাদ। বিহারের অর্থসচিব ডাঃ অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ কিছু দিন পূর্ব্বে বলেছেন যে, অক্টোবর মাসে এই কাজ হাতে নেওয়া হবে। প্রথম পর্য্যায়ে যোগবাণী থেকে নেপালের বরাহক্ষেত্র পর্য্যন্ত ৪০ মাইল রেল-রাস্তা, কোশীর উপরে একটা ব্যারাজ, কয়েক মাইল দীর্ঘ সেচের খাল, প্রত্যেকটি দশ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র সমেত একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র এবং বিহারে ও নেপালে বিদ্যুৎ-পরিবাহক তার লাগানো হবে। এই কাজগুলি শেষ করতে চার বছর সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

কোশী ও তার বন্যা

দুর্দ্দান্ত কোশী তার ধ্বংসলীলার জন্য বিহারের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোশীর প্লাবন এমনই দুর্দ্দান্ত যে, ২৪ ঘণ্টায় ৩০ ফুট জল বেড়ে উঠতে দেখা গেছে। এই প্লাবনে বছরের পর বছর কত মানুষ, কত গৃহপালিত পশু, কত গরীবের কুঁড়ে ঘর, কত ধনীর প্রাসাদ, কত গোলাভরা শস্য, কত শস্যক্ষেত্র ভেসে যায় তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। সময় সময় এই প্লাবন প্রায় কুড়ি মাইল চওড়া একটা চলমান সমুদ্রের আকার ধারণ করে। তখন প্রতি সেকেণ্ডে ৯,৪০,০০০ ঘন ফুট জল সবেগে বয়ে যায়। এই প্লাবনের ফলে বিহার ও নেপালের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কয়েক মাস যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় চাষ-আবাদের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে থাকে। চলাচলের রাস্তা ঘাট

হয়ে যায়। বহু জায়গা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়ে মশক ও ম্যালেরিয়ার আকর হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয় যে, দু'হাজার থেকে তিন হাজার বর্গমাইল উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রের উপর বালি জমে' তাকে বহু বৎসর পর্য্যন্ত কৃষির সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে রাখে। এইজন্যই কোশীকে "বিহারের দুঃখের নদী" এবং "বিহারের আতঙ্ক" ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৩৭ সালে এই প্লাবন নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি বসে। তাতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"দেশের এমন সর্ব্বনাশ না করে এই অতিরিক্ত জলরাশিকে বের করে দেওয়ার কি কোন উপায় নেই? একটা কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে এই বিরাট জলরাশিকে দরকারের সময় সেচের কাজে লাগানো কি সম্ভব হতে পারে না?" তার উত্তরে শ্রীযুক্ত জে. বি. সেন বলেন—"কোশীর এ দারুণ বন্যা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যেখানে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই নদী নেমে এসেছে সেখানে একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া, এবং জলরাশিকে একটা 'উইয়ারে'র মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, তেমন জায়গা শুধু নেপালের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে এবং এটা বহু ব্যয় সাধ্য।" দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারত-সরকার এদিকে সম্যক্ অবহিত হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা শুধু বিহারবাসীর নয়, সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

কোশীর ধ্বংসলীলা

কোশীর ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে প্রথমে যে আভাস দেওয়া হয়েছে সেটা সাময়িক এবং অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। এই ধ্বংসলীলা অত্যন্ত ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং এর মূল গভীরে। তাই এটা সম্যক্ ধারণা করতে হলে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

কোশীর তিনটি উপনদী আছে। (১) সান কোশী পশ্চিমদিক থেকে ৭,৪২৪ বর্গমাইল জায়গার, (২) অরুণ উত্তরদিক থেকে ১৪,১০৬ বর্গমাইল জায়গার ও (৩) তিমুর পূর্ব্বদিক থেকে ২,২৭৮ বর্গমাইল জায়গার বৃষ্টির এবং বরফগলা জল বয়ে এনে নেপালের পবিত্র তীর্থ বরাহক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে একই জায়গায় এসে মিশেছে। এই ২৩,৮০৮ বর্গমাইল জায়গার মধ্যে ২,২২৪ বর্গমাইল জায়গা চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের অংশ। নেপালের পার্ব্বত্য অঞ্চল পার হয়ে কোশী যেখানে ভারতের সমতল ক্ষেত্রে এসে নেমেছে সেখানে এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, হিমালয় থেকে উদ্ভূত বড় বড় নদ-নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্রের পরই তার স্থান। তারপর বেলে এবং দো-আঁশলা মাটির প্রায় সমতল জমির ভিতর দিয়ে কতকগুলি চওড়া নদীগর্ভের (channels) সৃষ্টি করে তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। জলের সঙ্গে কোশী যে বালি এবং পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে তা জমে জমে শীঘ্রই এই নদীগর্ভগুলি ভরে ওঠে। কয়েক বছর পরে আবার যখন দিনকয়েক ক্রমাগত অতিবৃষ্টি হতে থাকে তখন কোশী তার পুরাতন পথ ছেড়ে নূতন জমি কেটে নূতন পথ তৈরি করে নেয়। এমনই করে কোশী পূর্ব্বদিকে পূর্ণিয়া থেকে পশ্চিম দিকে দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত বিহারের ২০০০ থেকে ৩০০০ বর্গমাইল উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন করেছে। এ ছাড়া নেপালের নষ্ট করেছে ৩০০ থেকে ৫০০ বর্গমাইল উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র। এই জায়গায় জন-বসতির পরিমাণ হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে ৯০০ জন। তাই কোশী বছরের পর বছর ১৮ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ লোকের সমূহ ক্ষতি করছে।* এর পরও কি বিহারের দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে অন্যত্র যাওয়ার দরকার হয়?

বহুমুখী পরিকল্পনা

এটা একটা বহুমুখী পরিকল্পনা। এতে নেপালের বরাহক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে, যেখানে কোশী ছাত্রা নামক পাহাড়ের খদের মধ্য দিয়ে সরু পথ করে নেমে এসেছে, সেখানে ৭৮৩ ফুট উঁচু একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া হবে। এতে লক্ষ একর ফুট+ বন্যার জল ধরে রাখবার বন্দোবস্ত থাকবে।

নেপালে এবং বিহারে দুইটা ব্যারাজ, আর সেই সঙ্গে ছোট শাখা খাল বাদে ১,৬৯৩ মাইল দীর্ঘ বড় খাল কাটা হবে। এই সবগুলি মিলে বন্যার উদ্দাম প্রবাহকে আয়ত্তে আনতে পারবে। ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে—তার মধ্যে অনেক জমিতে বছরে দুইটা ফসল ফলানো সম্ভব হবে। সব সময়ের জন্য নব্বই হাজার কিলোওয়াট এবং ঋতু অনুযায়ী আরও পঁয়তাল্লিশ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। জমির ক্ষয় বন্ধ হবে। বন্যায় বালি এসে জমি নষ্ট হওয়া বন্ধ হবে। যে-সব জায়গা বদ্ধ জলায় পরিণত হয়ে রয়েছে সে-সব জায়গার সংস্কার হয়ে চাষের উপযুক্ত হবে। ম্যালেরিয়া দূর হবে। বিরাট আকারে মাছের চাষ সম্ভব হবে। উপরে নীচে জলযান চলাচলের সুবন্দোবস্ত হবে। তা ছাড়া এতে করে প্রভূত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে বিহারের লোকে পেট ভরে খেতে পাবে। সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়ার বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং কৃষিক্ষেত্রে বহু লোক কাজ পাবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

---

* শ্রীদীপনারায়ণ সিংহের মতে উত্তর-বিহারের এই জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৫ জন একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল এবং গড়ে মাত্র দুই বিঘা জমির উপরে তাদের জীবিকা নির্ভর করে।

+ এক একর জমির উপরে এক ফুট পরিমাণ উঁচু হলে তবে 'এক একর ফুট' বলা হয়।

এ সমস্ত বাদ দিয়েও শুধু বন্যা নিরোধের জন্য এই পরিকল্পনার পেছনে যত টাকা খরচ হবে তা সার্থক হয়ে উঠবে।

কয়েকটি আপত্তি এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা

বর্তমানে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি তোলা হচ্ছে। অনেকে হয়ত এটা করেছেন এই বিরাট পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য না জানার জন্য। আবার কেউ কেউ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে করেছেন বলে মনে হয়। প্রথম আপত্তি হচ্ছে—বাঁধ ধ্বসে পড়ে কয়েক হাজার বর্গমাইল জায়গা ধ্বংস হবে এবং হাজার কয়েক লোক মরবে। কেউ কেউ আমেরিকার সাণ্টা ফ্রান্স নদীর উপরের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকাও দেখছি অনেকটা সেই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা বিহারের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন—"অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। এ বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায় তা হলে ভাগলপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কলিকাতারও ক্ষতি হতে পারে।" সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার সৎপরামর্শ অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। আমার মনে হয়, এই সব অহেতুক আশঙ্কা ভারতীয় ইঞ্জীনিয়ারদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষমতার প্রতি অনাস্থাপ্রসূত। বর্তমানে ইঞ্জীনিয়ারীং বিদ্যা এত দূর উন্নতিলাভ করেছে যাতে এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এমনি ধরণের ব্যাপার ঘটে তখনই যখন বাঁধের ওজন তার ভারবহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী হয়; অথবা বাঁধের নীচে কিম্বা দু'পাশে এমন পাথর থাকে যার ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে যেতে পারে এবং চোয়াবার সময় ঐ পাথরেরও কিছু অংশ ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে। অথচ ঐ সব ক্ষেত্রে জলনিরোধ করবার এবং পাথরের শক্তি বৃদ্ধি করবার মত বিজ্ঞানসম্মত কোন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। আজকালকার দিনে কোন বাঁধ তৈরি করার আগে এই সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জীনিয়ার ও অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সমবেত ভাবে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করে এবং মডেল তৈরি করে তার উপরে পরীক্ষা চালিয়ে সমস্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নক্সা তৈরি এবং বাঁধের স্থান নির্ণয় করেন।

কোশী বাঁধ লম্বায় হবে ১,৯৮৫ ফুট, ভিতের সবচেয়ে নীচু জায়গা থেকে উঁচু হবে ৭৮০ ফুট। চওড়া হবে তলাতে ৮৪৮ ফুট; উপরে ৩৫ ফুট। বাঁধের ভিৎ এতখানি কংক্রিটের ভার সইতে পারবে কিনা সেটা পরীক্ষা করেছেন শ্রীযুত কে. কে. দত্ত, এম-এস্‌সি সহকারী ভূতত্ত্ববিদ্‌; মিঃ জে. বি. অডন্‌ তত্ত্বাবধারক ভূতত্ত্ববিদ্‌ এবং শ্রীযুক্ত পি. সি. দে হাজরা বি-এস্‌সি, (লণ্ডন), এ-আর-সি-এস বর্তমান তত্ত্বাবধারক ভূতত্ত্ববিদ্‌। আমেরিকার বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণ সম্বন্ধে হাজরা মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বাঁধের ভিত্তির নীচে থেকে ড্রিলিং করে পাথরের নমুনা তুলে এনে এবং বাঁধের দু'পাশের দিকে বহু ছোট ছোট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, সেখানকার পাথর পরীক্ষা করে তাঁরা যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই:—"বাঁধের ভিত্তির নীচে ৫০ ফুট পুরু কোয়ার্টজাইট্‌ পাথরের স্তর আছে। তার ভিতরে ভিতরে সামান্য শ্লেটের পরদা এবং কনগ্লোমারেট চুণ-

SECTION UPSTREAM AXIS
(NOT TO SCALE)

পাথর আছে। এর ভার-বহন-শক্তি যথেষ্ট।* এই পাথরের স্তরগুলির অবস্থান এমনি যে তাদের ধ্বসে পড়ার বা তাদের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এটা সত্য যে, কোশী অত্যন্ত দুর্দান্ত নদী এবং যে জায়গায় বাঁধের স্থান নির্বাচিত হয়েছে সেটা ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে। তাই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কোশীগর্ভের নিম্নতম স্থান থেকে ৩০ ফুট নীচে দিয়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ৪২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট উঁচু একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। এ কাজটা কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছে (চিত্র দেখুন) এটা হয়ে গেলে ভূতত্ত্ববিদ্‌ এবং ইঞ্জিনীয়ারগণ, বাঁধের সম্পূর্ণ ভিৎটা পরীক্ষা করে নিখুঁত ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন। পাথরের ভিতর তখন সামান্যমাত্র দুর্বলতার নিদর্শন পেলে মানুষের শরীরে ইন্‌জেক্‌শনের ন্যায় পাথরের ভিতর তরল সিমেণ্ট চালিয়ে (Grouting) তাদের একীভূত করে ভিতের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া চলবে। তা ছাড়া এই সিমেণ্ট চালানোর ফলে ভিত্তির এবং দু'পাশের চারদিকে জল-নিরোধক সিমেণ্টের একটা পাতলা পরদা গড়ে উঠবে। কাজেই এই ধরণের আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে ঘটবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

---

* পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই পাথর প্রতি ঘন ইঞ্চিতে ১৪.৪৪ টন ভার সহ্য করতে পারে।

একথা এখানে বলা উচিত যে, বাঁধের ভিত্তির সামর্থ্য পরীক্ষার জন্ত নদীর নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দেখার মত নিখুঁত অনুসন্ধান অন্ত কোন বাঁধ তৈরির আগে করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। এ সত্বেও এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এরূপ ভীতি-উৎপাদক প্রচারকার্য্য সত্যই পরিতাপের বিষয়।

দ্বিতীয় আপত্তি—যেখানে বাঁধ তৈরি হবে তা ভূকম্পনের উৎপত্তি-স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। তাই এক দিন হয়ত ভূ-কম্পনের ফলে বাঁধ ভেঙে অনর্থ ঘটাবে। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারগণ—যাঁরা এরূপ বৃহৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাঁরা এত বড় একটা বিষয় ভুলে যাবেন এমন ধারণা লোকের মনে আসা সমীচীন নয়। যা হোক, প্রত্যেক বাঁধের পরিকল্পনা করার সময় এর জন্ত অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ভাখড়া বাঁধের জন্ত ভূমিকম্প নিরোধের নিমিত্ত অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২০ বছর আগে মাণ্ডি ষ্টেটে যে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তাতেও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা যে এ বিষয়টা ভুলে যান নি তা এই থেকে বুঝা যাবে যে, ভূতত্ত্ববিভাগ এবং আবহাওয়া বিভাগ (Meteorological Department) সমবেত ভাবে এই জায়গার ভূকম্পন বিষয়ক অনুসন্ধান (Seismological Survey) করেছেন। বর্ত্তমানে ঐ জায়গা থেকে অনতিদূরে একটা ভূকম্পন রেকর্ড করার কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে।

তৃতীয় আপত্তি—বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল নিয়ে। কোশী জলের সঙ্গে যথেষ্ট বালি এবং পলি নিয়ে আসে। তাই এই জলকে বলা চলে যে, "পান করার পক্ষে বড্ড গাঢ় কিন্তু চাষ করার পক্ষে অত্যন্ত পাতলা।" সেইজন্ত কেউ কেউ বলেছেন যে, মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই বাঁধ বালি ও পলিতে ভরে যাবে। তার মধ্যে দশ বছর ত বাঁধ তৈরি করতেই লেগে যাবে। তাই তাঁরা বলেন যে, এ বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর। জানি না এটা তাঁরা কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করে বলছেন।

ভারত-সরকারের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর অযোধ্যানাথ খোসলা ভারতের এবং ভারতের বাইরে মিশর, আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশের নদনদীর পলিবহন বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি ১০০ বর্গমাইল জায়গা থেকে প্রতি বৎসর যে ধোয়ানী নেমে আসে তা থেকে ৭৫ একর জমির উপরে এক ফুট পলি জমতে পারে। কোশীতে এই ধোয়ানী আসে ২৩,৮০৮ বর্গমাইল জায়গা থেকে। কাজেই কোশী প্রতি বৎসর পলি বয়ে আনে $\frac{২৩৮০৮ \times ৭৫}{১০০}$ = ১৭,৮৫৬ একর ফুট।

কোশী বাঁধের দ্বারা যে জলাশয় তৈরি হবে তার পরিমাণ হবে ৭৩·৭৬ বর্গমাইল। এতে জল ধরবে ১ কোটি ৯ লক্ষ একর ফুট। তার মধ্যে নীচের ২৪ লক্ষ একর ফুট হবে বদ্ধ জল (dead storage)। এই ২৪ লক্ষ একর ফুট যায়গা পলিতে ভরে গেলেও বাঁধের কার্য্যকরী ক্ষমতার কোন ইতর-বিশেষ হবে না। প্রতি বৎসর ১৭,৮৫৬ একর ফুট করে পলিতে ভরলে এই বাঁধের অকেজো ২৪ লক্ষ একর ফুট অংশ ভরতে লেগে যাবে ১৩৪ বৎসর। তা ছাড়া যে-সব জায়গা থেকে ধোয়ানী আসে তার মধ্যে চির-তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় গাছ লাগিয়ে দিলে জমির ক্ষয় বন্ধ হবে, ফলে ধোয়ানীর সঙ্গে পলি, বালি, মাটি ইত্যাদি কম আসবে। তা ছাড়া বাঁধের জলের উচ্চতম সীমার (highest pond level) উপরে কোশীর ঐ তিনটা উপনদীতে কয়েকটি ছোট ছোট বাঁধ (Check Dams) বেঁধে দিলে এই প্রধান বাঁধের কার্য্যকরী জীবন বহুদিন বেড়ে যাবে; কারণ ঐ বাঁধগুলি পলিতে না ভরে যাওয়া পর্য্যন্ত প্রধান বাঁধে পলি আসতে পারবে না।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত হয়েছে যে, ৬৮০ ফুট উঁচু ভাখড়া বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হচ্ছে ৩০০ বছর। তখন লোকে কি করে মেনে নিতে পারে যে, ৭৮৩ ফুট উঁচু (পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ) কোশী বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর ?

	ভাখড়া বাঁধ	কোশী বাঁধ
উদ্দেশ্য	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ বন্তা নিরোধ	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ, বন্তা নিরোধ
কতটা জায়গায় ধোয়ানী আসে	২২,০০০ বর্গমাইল	২৩,৮০০ বর্গমাইল।
বন্তায় কত জল আসে	সেকেণ্ডে ১৩,২,০০০ ঘনফুট	সেকেণ্ডে ৯,৪০,০০০ ঘন ফুট।
জলাশয়ের পরিমাণ	৫২ বর্গমাইল	৭৩·৬৭ বর্গমাইল।
বাঁধে জলের পরিমাণ	৭৩,৮০,০০০ একর ফুট	১,০৯,০০,০০০ একর ফুট।
বাঁধের উচ্চতা	৬৮০ ফুট	৭৮৩ ফুট।
সেচব্যবস্থা	৬০ লক্ষ একর	৩০ লক্ষ একর।
প্রধান খাল	২৪০ মাইল	১,৬৯০ মাইল।
বিদ্যুৎ-উৎপাদন	৪ লক্ষ কিলোওয়াট	৯০ হাজার কিলোওয়াট (সর্ব্বদা) ৪৫ হাজার কিলোওয়াট (কোন কোন ঋতুতে)

কাছের মানুষ শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ ঠিক বাইশ বছর হতে চলল তাঁর চরণছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার। ২২শে নবেম্বর ১৯২৮ থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০। এতদিন ছিলাম তাঁর আলোক-পরিধির মধ্যে, তবু কোন স্বচ্ছ উত্তর পাই নি এই প্রশ্নের যে কি কারণে এমন অসম্ভব সম্ভব হ'ল—কেমন করে আমার মতন চ্যুতিভরা অপূর্ণ সত্তার মন টানল তাঁর মতন অচ্যুত সত্তা? শুধু টেনে আনা নয়, ধরে রাখা। তাঁর প্রতিভার দরুন? তাঁর হাতে ছিল "দেবতার দীপ", মুখে উপলব্ধির জ্যোতি—তাই কি? না, বহুদিন ধরে স্বেচ্ছাবৃত বিজনবাসের ফলে রহস্যের যে এক অনামী মহিমা-মণ্ডল গড়ে ওঠে তার হাতছানি? না, তাঁর চারদিকে যে অপরূপ নৈঃশব্দ্যের ঘেরাটোপ গড়ে উঠেছিল তার অভিভূতি—না, তাঁর শক্তিসান্নিধ্য, দৃষ্টির আলো অলোক-লোকের বাণী যে আনত বহন করে? না, সেই শান্তিসমুদ্রের মৌনকল্লোল যা তাঁকে ঘিরে থাকত যেমন প্রলয়পয়োধি নারায়ণকে? সংসারে শান্তির কাঙাল নয় কে? অথচ—লীলা বটে লীলাময়ের—শান্তি কাছে আসতে না আসতে উঠি আমরা অশান্ত হয়ে:

স্বভাববিমুখ ধরা ভাবরূপান্তর-সাধনায়;
চিরন্তনের স্পর্শ সুদুঃসহ মরতার কাছে:
ব্যোম ও বহ্নির সাথে চিরবিসম্বাদ তার—হেন
বিমুখতা সহে না দেবতা—তাই তার দেবত্রয়;
গুমরে সে অমরার দুঃখহীন সুখে—আলোকের
বর তার যেন প্রায় দ্বেষভরে করে প্রত্যাখ্যান...
আপনার পঙ্কে করে দ্যুলোকের দেবদৌত্যে ম্লান:
তারিণী শুভদা করুণার কর সাথে সাথে বাদ,
অমৃতের পুত্রগণে সম্বর্ধিয়া হত্যায়, লাঞ্ছনে।*

কিংবা জীবন ও নিয়তি সম্বন্ধে যে গভীর পাঠ তিনি দিয়েছিলেন এসেছিলাম তারই টানে—এই বিশ্বাসে যে, ব্যাধির এমন নিদান দিতে পারে যে মহামানব তারি তো নাম ধন্বন্তরি:

নিগূঢ় বৈরিতা এক বিশ্বপ্রগতিরে নিরন্তর
করে আক্রমণ; চিন্তা ভাষা কর্মে যার চিহ্ন রেখে:
প্রতি সাধনায় চ্যুতি কলঙ্কের ছাপ চিরাঙ্কিত;
তাহার অন্ত্যেষ্টি বিনা রবে শান্তি নিষিদ্ধ ধরায়।†

মনে এ ধরণের প্রশ্ন আজও ওঠে বৈ কি—যদিও জানি না এ-সবের জবাব কি। এক সময়ে ভাবতাম বুদ্ধির আলোয় চরম মুশকিল আসানের হদিস পাওয়া যাবেই যাবে। কিন্তু তখন আমার মন ছিল খতিয়ে বুদ্ধিরই পূজারী বলব। কিন্তু আজ নেই আর বুদ্ধিতে সে অটল আস্থা। থাকবে কেমন করে—এই বাইশ বৎসর ধরে এমন একটি মানুষের সঙ্গে লড়াই করার পরে (বুদ্ধির) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে যাঁর জুড়ি ছিল না। আমি ত আমি, বুদ্ধির তর্কদ্বৈরথে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন কোন্ মহারথী? কার তূণীরে ছিল অমন যুক্তিহন্তা উপলব্ধির, দৃষ্টির নারায়ণাস্ত্র?

যুক্তির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আশ্রমবাসের সেই প্রথম দিককার কথা—যখন ভগবানে সবে একটু ভক্তিবিশ্বাস এসেছে—অথচ মন তবু কেন জানি না খুশি হয়ে ওঠে ভগবানকে কেউ যুক্তিবাণ দিয়ে বিঁধছে দেখলে। শ্রীঅরবিন্দ বহু পত্রে আমাকে লিখেছেন ভাগবতী চেতনাকে মানবিক চেতনা বুঝতে পারে না যদি সে তার মানবিক চেতনাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই ত আমরা পদে পদে ভগবানকে ভুল বুঝি। মনে পড়ে শ্রীমার কথা। বুদ্ধের দর্শন তিনি প্রায়ই পেতেন—বলেছিলেন আমাকে। একবার বুদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন:

"আজ
ওঠো ঝলকিয়া আপনার কিরণের গরিমায়।
ঝটিকায় কেন ভয়?
সমীরণ আমাদের তট হতে দূরে ল'য়ে যায়
শুধু
এসে দিতে আরো ব্যাপ্ত বিশ্বপরিচয়।
ঈশ্বরী করুণা তব উজাড়িয়া দিবে না দু'হাতে?
—প্রেমের ঐশ্বর্য্য-উৎস পারে কি ফুরাতে?
কেন কুণ্ঠা তবে?
পাছে ভুল বোঝে সবে?
কবে হায়
দেখেছ—মানবমন বুঝিয়াছে তবে দেবতায়?"‡

সাবিত্রীতে গুরুদেবও একথা বারবারই লিখেছেন—যে

---

* Hard it is to persuade earth-nature's change;
Mortality bears ill the Eternal's touch:
It fears the pure divine intolerance
Of that assault of ether and of fire;
It murmurs at its sorrowless happiness,
Almost with hate repels the light it brings . . .
It sullies with its mire Heaven's messengers:
Its thorns of fallen nature are the defence
It turns against the saviour hands of Grace;
It meets the sons of God with death and pain.
—*Savitri*, Book I, Canto I—Sri Aurobindo

† A secret enmity ambushes the world's march;
It leaves a mark on thought and speech and act:
It stamps stain and defect on all things done;
Till it is slain peace is forbidden on earth.
—*Savitri*: The Book of Fate—Sri Aurobindo

‡ শ্রীমার ফরাসী অনুলেখন থেকে অনূদিত। সমস্ত প্রার্থনাটি "অর্ঘ্য" নামক কাব্যগুচ্ছে ছাপা হয়েছে আশ্রম থেকে।

মানুষ মানুষ বলেই ভগবানকে চায় না বুঝতে। মুখে বলে পারি না বুঝতে। কিন্তু গুরুদেব বলতেন (যে কথা বারবার ঠেকে শিখেছি) যে, আমাদের 'পারি-না'-র মধ্যে প্রায়ই 'চাই-না' থাকে লুকিয়ে। তাই ত ভগবানের ভাগবতী শক্তিকে ব্যঙ্গ করে মানুষের এত তৃপ্তি, তাঁর লক্ষ সৌরজগৎ-চালিনী প্রতিভার ক্রিয়াকলাপকে আমাদের দেড়পোয়া বুদ্ধির বাটখারা দিয়ে মাপবার এত স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার! তার উপরে আমি বিজ্ঞান একটু-আধটু পড়েছিলাম, কাজেই ঈশ্বর অসিদ্ধ—"প্রমাণাভাবাৎ" এ জাতীয় বৈজ্ঞানিক আদিমন্ত্রে সাড়া একটু দিয়েছিলাম বৈ কি? ভাবটা—বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু বিশ্বাস না করতে পারলেই বেশি খুশি হই। শুনতে হয়ত একটু অদ্ভুত, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এহেন দু'নৌকায় পা দিয়ে যখন পার হতে চেষ্টা করছি সেই সময়ে আনাতোল ফ্রাঁসের Dieux Out Soif (দেবতারা তৃষার্ত) উপন্যাসটি হাতে পড়ে। তাতে ব্রতো বলে একজন রসিক ভাগবত-ক্রিটিক বলে :

"Ou Dieu veut empecher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant; s'il le peut et ne le veut, il est pervers; s'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers; s'il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon pere?"

অর্থাৎ—

"হয় ঈশ্বর করতে পারেন দুঃখ নিবারণ,
শুধু শক্তি নেই—তা হলে অক্ষম সেজন।
পারেন তিনি খুবই, শুধু চান না—যদি হয়,
বলতে হবে এমন হরি হিংসুক নিশ্চয়।
চান না এবং পারেন না এই কথাই যদি ঠিক,
বলব তিনি অক্ষম এবং হিংসুক—ধিক, ধিক!
পারেন তিনি করতে, তথা চানও—যদি হয়,
করছেন না কেন—পারেন বলতে মহাশয়?"

গুরুদেবকে ফরাসী প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে লিখি : "গুরু! কি বলেন? একটু হাসলেনই বা। আর যদি সম্ভব হয়—একটা জবাব দিন না এ মোক্ষম প্রশ্নের।"

পরদিনই এল জবাব—মোক্ষমের উত্তর মোক্ষম প্রত্যুত্তর :

"আনাতোল ফ্রাঁসের কথা সর্ব্বদাই মজার বৈকি—তা তিনি ভগবানের সম্বন্ধেই লিখুন, বা খ্রীশ্চানিটির সম্বন্ধেই লিখুন বা বুদ্ধিবাদী পাশবিক মানবতার বুদ্ধির তথা আচরণের বোকামির সম্বন্ধেই লিখুন। কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে যখন ভগবানের দেখা হয় (কোন এক বিদ্রূপের স্বর্গেই হবে, কার্ল মার্কসের স্বর্গে হবার কথা নয়—মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও) তখন ভগবান তাঁর নিষ্ক্রিয়তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা তুমি শোনো নি বুঝি? ভগবান তাঁর কাছে সরাসর গিয়ে বললেন : 'ও আনাতোল! তোমার নাস্তিক ঠাট্টাটি মোক্ষম হয়েছে, মানতেই হবে; কিন্তু হয়েছে কি, আমার নিষ্ক্রিয় থাকার খুব সঙ্গত কারণ ছিল। একদিন যুক্তিদেবী এসে আমাকে বিষম ধমকালেন : 'দেখ হে, তুমি আছ এ ভান কর কেন? তুমি বেশ জান তুমি নেই এবং কোনদিনই ছিলে না। আর যদি তুমি সত্যিই থাক তা হলেও তুমি তোমার সৃষ্টি নিয়ে যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড করেছ তারপরে তোমাকে আমরা আর বাহাল রাখতে পারি নে। যেই তুমি সরে যাবে সেই জগৎ হয়ে দাঁড়াবে চমৎকার—সাবাস যাকে বলে। আমার মেয়ে বৈজ্ঞানিকা দেবী ও আমি সব তোড়জোড় ঠিক করে রেখেছি। তুমি যেতে না যেতে মানুষ তার দীপ্ত শির উঁচু করে চলবে—'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই তকমা পরে, মহিমান্বিত ও স্বাধীন হয়ে; সাম্যভাবাপন্ন, ভ্রাতৃভাবাপন্ন, গণতান্ত্রিক হয়ে, নিজের বাইরে আর কারুর মুখ না চেয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজের চেয়ে আর কাউকে বড় বলে না মেনে। তখন না থাকবেন ভগবান না দেবদেবী, না পাণ্ডাপুরুত, না ধর্ম্মাচরণ। তখন লুপ্ত হবে সব অত্যাচার, দারিদ্র্য, যুদ্ধবিগ্রহ। যন্ত্রতান্ত্রিকতার বরে জগৎ প্রাচুর্য্যে উঠবে টইটম্বুর হয়ে, বাণিজ্যের হাওয়ায় লক্ষ্মীর সোনার পাখা হবে সর্ব্বগামী; বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুণে অজ্ঞান হবে নিশ্চিহ্ন, মানুষের মস্তিষ্কে মূঢ়তার বা অযৌক্তিকতার পদার্পণ হবে অবাস্তব। মানুষ হবে বিদগ্ধ, স্বায়ত্ত, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক, প্রাজ্ঞ—সবকিছুর সবটা জেনে শুনে ও বিচার করে পৌঁছবে ক্রমে ক্রমে যথাযথ সিদ্ধান্তে। বৈজ্ঞানিক তথা বিশেষজ্ঞদের তারস্বর সর্ব্বত্র পড়বে ছড়িয়ে—ছাড়বে না মানুষকে পার্থিব স্বর্গে সরাসর পৌঁছে না দিয়ে। একেবারে নিখুঁৎ সমাজ! জনে জনে হবে স্বাস্থ্যবান্ অতিবিকশিত; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধানের গুণে; সবকিছু হবে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, বিজ্ঞান উঠবে চূ ধাপে, হবে অভ্রান্ত, সর্ব্বক্ষম ও সর্ব্বজ্ঞ সব প্রহেলিকার হয়ে যাবে সমাধান; বিশ্বমানবতার আমদরবার, নিখিল জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা; বিবর্ত্তনের ফলে মানুষ, মহত্তো মহীয়ান্ মানুষ, চলবে প্রকৃতির পথে যার চরম পরিণতি হবে মহান্ শ্বেতজাতিদের মধ্যে, মানবিক দয়াবশে হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনবে তারা তাদের কৃষ্ণ তাম্র ও পীতাভ ভ্রাতৃগণকে; শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ! মুক্তি, ব্যবস্থা, ঐক্য হবে বিশ্বতোমুখ।' আনাতোল! এইভাবে আরও কত কি যে তিনি করলেন ঘোষণা! শুনে আমার মনে হল, 'বা, বা! কি চমৎকার!'—আর সুবিধেই কি কম? ভেবে দেখ, আমাকে না হবে কিছু করতে, না হবে কিছু দেখতে শুনতে। কাজেই আমি সব কাজ থেকে নিলাম নিজেকে গুটিয়ে—কারণ তুমি জান, আমি বরাবরই স্বভাবে একটু প্রস্থান-প্রবণ, সুদিনের যুগেও নিজেকে একটু পর্দানশীন

করে বা পিছন দিকে রাখতে ভালবাসি। কিন্তু এ কি শুনি আজ? যে-সব খবর কানে আসছে তাতে ত মনে হচ্ছে না যে, এমন কি বিজ্ঞানের সাহায্য পেয়েও যুক্তিদেবী তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে কেন করেন নি বলবে আমাকে? কারণ কি এই যে তিনি করতে চান নি, না পারেন নি? না, তিনি চানও নি, পারেনও নি? না, তিনি চেয়েছিলেনও বটে, পারতেনও বটে, কেবল যে-জন্তেই হউক হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া দেখ আনাতোল, বিজ্ঞান ও যুক্তিদেবীর এই সন্তানগুলি—রাষ্ট্র, যন্ত্রতান্ত্রিকতা, ধনতান্ত্রিকতা—এদের রকমসকম যেন কেমন কেমন লাগে: যেন এক অতিকায় রাক্ষস, তার উপর হাতে পেয়েছে বুদ্ধির শক্তিসামর্থ্য তথা বিজ্ঞানের সরঞ্জাম, সাজসজ্জা! অথচ আশ্চর্য্য, কই মনে ত হয় না যে, রাজা ও ধর্ম্মের যুগে মানুষ যতটা স্বাধীন ছিল তার থেকে সে আজ বেশী স্বাধীন হতে পেরেছে! ব্যাপার কি? কিংবা এও কি সম্ভব যে যুক্তিদেবী না সর্ব্বেসর্ব্বা, না অভ্রান্ত—এমন কি আমার চেয়েও বেশী অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বসেছেন তিনি নবসৃষ্টি করতে গিয়ে? তাঁদের কথালাপের রিপোর্ট এই পর্য্যন্তই পেয়েছি আমি; জানি না এর কতটা সত্যি—কারণ যে ভগবানের ছবি আনাতোল ফ্রাঁস এঁকেছেন তাঁকে আমি নিজে চিনি না।"*

কিন্তু এই যে দীপ্ত মনীষা, মহ'ন্ ব্যক্তিরূপ তার দিশা দেব কেমন করে তাদেরকে যারা জানে নি এ অপরূপ মানুষটিকে কোন দিনও? না জানলে তাদের জানানো যাবে কি করে কেন তাঁর পাশে অত সব দীপ্ততম তুঙ্গতম প্রতিভাকেও মনে হ'ত বামন? তা ছাড়া জানাতে চাই এ স্পর্দ্ধাই বা কেন—যখন নিজেই ভাল করে জানি না কিসে কি হয়—এমন কি কোন্ টানে এসেছিলাম তাঁর কাছে তারও পুরো খবর পাই নি মনকে প্রশ্ন করে? মৌমাছি ফুলের কাছে আসে মধুর টানে, কিন্তু তার পিছনে থাকে তার প্রাকৃতিক সহজাত সংস্কার। কিন্তু আমি? আমি কেমন করে টের পেলাম তাঁর ভাণ্ডারে আছে অক্ষয় অমৃত? কোন্ সংস্কার এ? অন্তত বুদ্ধির নয় এ নিশ্চয়—কেননা বুদ্ধিই ত ছিল আমার এ বিশ্বাসের পরম ও চরম বৈরী যে একলা যে-মানুষ রয়েছে বছরের বছর, না করে দেখা, না কয় কথা, না লেখে চিঠি—এহেন মানুষ কোনও কাজে আসতে পারে বিশ্বমানবের। রাসেলের ভক্ত আমি চিরদিন। তাঁর কথা চিরদিনই মনে হয়েছে অকাট্য যে, "প্রকৃতি মানুষকে গড়ে তোলেন নি একলা দাঁড়াবার জন্তে।"† অথচ কি বলা যাবে এহেন অদ্ভুত মানুষের সাধনাকে যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়ে দিল একটিমাত্র ঘরে—কারুর সঙ্গে দেখাশুনা না করে বললেই হয়! জগতে কত কি কাণ্ড ঘটে গেল অথচ তিনি জানলেন না কিছুই। শুনেছিলাম তিনি নাকি কোনও দিন সিনেমা পর্য্যন্ত দেখেন নি। জলময়ী ভেনিস নগরীতে এমন মানুষ নাকি আজও মেলে যে চর্ম্মচক্ষে কোনও দিন ঘোড়া দেখে নি। শ্রীঅরবিন্দের কখনও সিনেমা না দেখা আমার কাছে তার চেয়েও অকল্পনীয় মনে হ'ত। মনে হ'ত বাস্তবপরাঙ্মুখ। এহেন বপ্রাণ্ মুনির মৌন ব্যাখ্যানে ছিন্নসংশয় হবে ক'জন মেধাবী?* এভাবে একলা থেকে জগতের উপর কি প্রভাবই বা তিনি বিস্তার করতে পারবেন? অবিশ্যি কখনও কখনও ভক্তির জোয়ারে—মনে হ'ত: পারবেন না বলি কেন? চোখের দেখাকে ত বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে না। কাজেই সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়পুষ্ট বুদ্ধির রায়কে প্রামাণ্য মনে করতে গেলাম কি দুঃখে? কিন্তু উঁহুঃ, ব্যবহারিক বুদ্ধিকে এত সহজে নাকচ করা চলে না। তাই ভক্তি-বিশ্বাসের রঙীন প্রহর কেটে যেতে না যেতে আসত নেশাভাঙার পরের অবস্থা—the morning after—তখন ছেয়ে আসত মনে বর্ণাঢ্য আবেগের প্রতিক্রিয়া—কিনা ধূসর সংশয়। মনে হ'ত তখন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা: "বিশ্বাসের কি একটা লিমিট থাকবে না দিলীপ?" মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের কথা: "কবির মুশকিল এই যে অতীন্দ্রিয়লোকের গুজবের আভাস না পারে সে বিশ্বাস করতে, না অবিশ্বাস করতে।"

এই নিয়েই বা ভুগেছি কি কম? এক দিকে অবিশ্বাসীর জেরা শুনে পায় হাসি, মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের আমাকে লেখা একটি চিঠি:

"But if the intellectual mind is inferior (to spiritual experience), how can it challenge, judge, make the Divine stand as an accused or a witness before its tribunal, summon Him to appear as a candidate for admission before a Board of Examiners or pin Him like an insect under its examining microscope?"†

("বুদ্ধি যদি অধ্যাত্মের চেয়ে ছোট হয় তবে কোন্ স্পর্দ্ধায় সে ভগবানকে আসামী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে

---

* শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজী পত্রটি আমেরিকান সংস্করণ *Among the Great*-এ ২৫১-৫৩ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

† "Nature did not construct human beings to stand alone."—*Marriage and Morals*, Chap. 9.
—Bertrand Russell

* চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥ (শঙ্করাচার্য্যের দক্ষিণমূর্ত্তি স্তোত্র)

বড়ই আশ্চর্য্য যে বটবৃক্ষের মূলে শিষ্যেরা দেখি বৃদ্ধ, আর গুরু হলেন যুবা!

গুরুর মৌন যেই হ'ল কিনা ব্যাখ্যা—অথচ তাতেই কিনা শিষ্যদের সংশয় হ'ল ছিন্ন!

† মূল পত্রটি আছে আমেরিকান এডিশন *Among the Great*-এ ছাপা হয়েছে: ২৪৫-৫০ পৃষ্ঠা।

চায়—যেন ভগবান উমেদার, তাঁকে যথাবিধি জেরা করে তবে বাহাল করা যেতে পারে, অথবা পিন দিয়ে বিঁধে বৈজ্ঞানিক মাইক্রোস্কোপের সামনে ধরে তবে পরীক্ষা করতে হবে।") অন্য দিকে অতিবিশ্বাসীরা দেখি ভাবে শ্রীঅরবিন্দ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন (যদিও শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, "I do not deal in miracles." "আমি ভোজ-বাজি নিয়ে কারবার করি না।") ধরে নেয়—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান। এক মাড়োয়ারির কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভু এসেই আশ্রমের এক সাধককে জিজ্ঞাসা করলেন: "কৌন্ কামরা?"

—"ঐ দোতলায়। জানলা খোলা?"

—"বিস্ বরস্?"

—"তব্ ক্যা?"

চোখ বড় বড় করে মহাবিশ্বাসী বললেন চুপি চুপি: "ক্যা? উড় যাতা?"

এ ধরণের বিশ্বাস শ্রীঅরবিন্দ চাইতেন না এ কথা আমি শুধু জোর করে বলা নয়—প্রমাণ করতে পারি—কিন্তু তবু বহু বুদ্ধিমানের মধ্যেও দেখেছি যা তা বিশ্বাস করার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি—তা আবার বড় বড় শ্লোকের খাঁড়া উঁচিয়ে—সাবধান, নইলে—! এঁরা ভাবেন এরই নাম যথার্থ গুরুভক্তি, আনুগত্য—লয়ালটি। শুনতে শুনতে প্রায়ই আমার মনে হ'ত—আমার মতন ডিসলয়াল শিষ্য বুঝি ভূভারতে ছুটি নেই। বহু ভুগে ও পোড় খেয়ে ক্রমশঃ বুঝেছিলাম—গুরুদেবের আশ্বাস পেয়ে আরও—যে উদ্ভটপৌরাণিক ও অধ্যাত্মবাদী সমার্থক নয়। কিন্তু তবু বুদ্ধির অহঙ্কারে আঘাত লাগতে না লাগতে মন ভুলত নিরূপা—তথাকথিত মানবপ্রকৃতির ধরণধারণ যে খুব ভরসাপ্রদ নয় জেনেও এ প্রকৃতির অদলবদল করতে চাইত না কিছুতে। অথচ মজা এই যে, শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্র বা তাঁর চিঠিপত্র পেতে না পেতে মনে জেগে উঠত এমন এক ভাবের জোয়ার যে তখনকার মত সব সংশয়ের খড়কুটো পলিমাটি কোথায় যে যেত ভেসে! উচ্ছ্বাসের সে-ক্ষণায়ু লগ্নে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বা লৌকিক বুদ্ধিতে আস্থা হারানোর জন্যে নিজেকে একটুও মনে হ'ত না নিরাশ্রয়। বাইরের জগতে হিংসার তুফান চলেছে ত চলেছেই—মাঝে মাঝে বাঁধ ভাঙে, তার পর সুরু হয় ফের মারণ-স্রোতের বিরুদ্ধে কি ধরণের অতিকায় বাঁধ দেওয়া যায় তার জল্পনা-কল্পনা। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা খায়ত্ত হতে না হতে সত্যিই যেন দেখতে পেতাম যে বুদ্ধির মেরামতে কোনো স্থায়ী শোধনের বা সৃজনের কাজ হবে না হতে পারে না। অমনি মনে হ'ত—তা হলে বুঝি বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো বন্দরে এনে-ছেন তিনি অজান্তে আমার নাকেহাল খেয়াকে টেনে! একথা যার মনে হয় সে যা জানে বলে মনে করে তার চেয়ে বেশি জানে না ত কি? অন্য ভাষায়, আমি নিজেকে যা ভেবে এসেছি যদি সত্যি আমি তাই হতাম তা হলে আমার মনোবাসী বুদ্ধি-মন্তের আপত্তিকে নিরস্ত করে আমারই মধ্যেকার কোন্ শক্তি? কেন আমি এমন অভিভূত হই শ্রীঅরবিন্দের সাধনলব্ধ বাণীতে:

মানব! বহন করো এ বিশ্বের বেদনাবিধান,
দুঃখার্ত্তা ধরার অতি-দুর্গম এ যাত্রাপথে তব
অধরার মহাশক্তি হোক তব আত্মার নির্ভর,
হও ঊর্দ্ধ্ব সত্যমুখী, প্রেমের শান্তির অনুরাগী।
অল্পায়ু আনন্দ তুমি লভিয়াছ নভোলোক হতে,
ক্ষণিকের দিব্যস্পর্শ—দৈনন্দিন মানব-জীবনে,
প্রতিদিন হোক তব তীর্থব্রত-উদযাপন সম।*

বুদ্ধির অভিমানে ঘা লাগলে যখনই বাজত তখনই মনে হ'ত তিনি যে বুদ্ধিলোকের মন্ত্রীকে চরম দিশারি মনে করেন না একথা জেনেও তাঁর শরণাপন্ন হতে গেলাম কি দুঃখে? বুদ্ধি যতই কেন 'না না' করুক এতে ওতে তাতে—যতই কেন না মনে করি এ নিষেধের রাশ ধরে আছে সাবধানী মন—তবু সেই উল্টো পথেই উধাও হতে চাই কেন জেনেশুনে যে এ পথের দিশারি বুদ্ধি নয়—এ ডাক বুদ্ধির বোধগম্য নয়? তাই না এ ডাকে আমি সাড়া দিয়েছিলাম সাড়া দিতে না চেয়েও। কেমন ক'রে দিলাম তার কিছু হদিস দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে এই বিচিত্র উপলব্ধির উপর একটু জোর না দিয়েই পারছি না যে আমার সত্তার যে অংশ তাঁর এ ডাকে সাড়া দিয়ে-ছিল—আমার অনিচ্ছুক পার্থবুদ্ধি সেই পাথসারথিকে মানতে না চেয়েও মানতে বাধ্য হয়েছিল না মেনে উপায় ছিল না বলেই।

---

* O mortal, bear this great world's law of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul's support on Heaven's strength,
Turn towards high Truth, aspire to love and peace.
A little bliss is lent thee from above,
A touch divine upon thy human days:
Make of thy daily way a pilgrimage.
—*Savitri*: Book of Fate—Sri Aurobindo

"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস"

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরিমাণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সমগ্র সাহিত্যের অর্দ্ধেকের উপর ইহার আমলে পড়ে। কিন্তু শুধু পরিমাণের দিক্ দিয়া নহে মূল্যের বিচারেও ইহার গৌরব কম নহে। সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা বাদ দিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনে ইহার প্রভাবের অন্ত নাই। ধর্ম্মেকর্ম্মে আনন্দে উৎসবে কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্তও ইহা ছিল অপরিহার্য। নানা উপলক্ষ্যে অগণিত লৌকিক দেবতার পূজা-প্রসঙ্গে দেবতাদের অলৌকিক কাহিনীপূর্ণ কথা বা পাঁচালি পাঠ বা গান পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বা মঙ্গলকাব্যের গান ত মস্ত বড় আড়ম্বর ও উৎসবের বস্তু ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের প্রচলন কিছু কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই—গ্রামাঞ্চলে ও প্রাচীনপন্থী সমাজে ইহারা এখনও অল্পবিস্তর পরিচিত। শহরের আধুনিক ধরণের লোকের নিকট ইহারা ও ইহাদের সমগ্র পরিবেশ অপরিচিত হইয়া পড়িলেও ইহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—নানা মঙ্গলকাব্য প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে—বিশ্ববিদ্যালয় ইহাদের কোন কোনটিকে সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করিতেছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের মধ্যেই ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা সীমাবদ্ধ—শিক্ষিত সমাজে ইহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের তেমন কোনও উৎসাহ, আগ্রহ বা সুযোগ নাই। মঙ্গলকাব্যে বিহিত আচারানুষ্ঠান যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অব্যাহত ধারায় বিরাজমান তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে—কোন কোন স্থলে সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের দরুন বহু জিনিষের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ দুঃসাধ্য। ফলে এই বিশাল সাহিত্যের অনেক অংশ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অস্পষ্ট—ইহার যে সামান্য অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের বৈজ্ঞানিক রীতি যথাযথ ভাবে অনুসৃত না হওয়ায় আলোচনার পথও সুগম হয় নাই।

এই সব অসুবিধার মধ্যেও যাঁহারা অসামান্য ধৈর্য ও নিষ্ঠা-সহকারে এই সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় এবং বিবরণ সংকলন ও প্রচার করিতেছেন তাঁহারা শিক্ষিত সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই সাহিত্যের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। স্বতন্ত্রভাবে ইহার ব্যাপকতর আলোচনার প্রয়োজন কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন—'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' নাম দিয়া তিনি মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন—প্রসঙ্গক্রমে তিনি মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবতাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। সুখের কথা এই যে, বাঙালী তাঁহার দীর্ঘ সাধন'র এই ফল সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে—কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে এবং পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকারকে সরোজিনী পদক প্রদান করিয়া পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

শিব, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, কালিকা, শীতলা, ষষ্ঠী, সারদা, দক্ষিণরায়, সূর্য প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে যে সকল কাব্য বিভিন্ন কবি কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাদের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া রচিত যে সব ছড়া ও কাহিনী প্রচলিত আছে, গ্রন্থকারের মতে 'প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের মর্য্যাদায় ইহাদের আর একখানিও উন্নীত হইতে পারে নাই'—তাই তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে করেন নাই। পক্ষান্তরে গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্য ও বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল এই তিনখানি ঐতিহাসিক কাব্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অথচ মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পরিচিত-অপরিচিত বিভিন্ন দেবদেবী-বিষয়ক কাব্য ছড়া কাহিনীর সহিত ইহার সম্পর্ক অন্ততঃ বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া ঘনিষ্ঠতর সন্দেহ নাই। এই সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়ক কৃষ্ণমঙ্গল এবং দেবসদৃশ যোগীদের মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক গোরক্ষবিজয়, গোপীচাঁদের পাঁচালি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য দিয়া নিতান্ত কম হয় নাই। কিন্তু শনির পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষমঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলচণ্ডী, ক্ষেত্রপাল, শুভচনী, অসময়নারায়ণী, নিরাকুল বাসদেব, ইঁধু প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক দেবতার যে সমস্ত কাহিনী এখনও মহিলাদের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচলিত সেগুলির সামান্য কিছু কিছু বিবরণ বিভিন্ন অনতিসুলভ পত্র-পত্রিকায় স্থান রহিয়াছে—এসম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশেষ কোন আলোচনা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অথচ কোন কোন পাঁচালির রচনার মধ্যে কবিত্ব-

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না এমন নহে—ইহাদের ছন্দের চাতুর্য ও শব্দসন্নিবেশের নৈপুণ্য পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কালিদাসের সত্যনারায়ণের পাঁচালির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাহিনীগুলির মধ্যেও অনেক স্থলে প্রাচীনকালের বাঙালী-সমাজের সুখ-দুঃখের অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালীর লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য সর্বোপরি। এইরূপে নানা দিক দিয়া মূল্যবান এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত হইলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের আলোচনার উপক্রমে গ্রন্থকার লৌকিক দেবতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা১ করিয়াছেন, লৌকিক ধর্ম সম্বন্ধে যে আগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য জানিবার আশা ছিল।

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থগুলি যে অবস্থায়, যে আকারে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহাদের আসল রূপ, রচনাকাল ও রচয়িতাদের পরিচয় নির্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। আলোচনাকারীদের অশোভন পক্ষপাতিত্বের জন্য এসকল আলোচনার ফল কোন কোন ক্ষেত্রে বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। যেমন, একজনের বদ্ধমূল ধারণা—'সংস্কৃতিবিহীন' পূর্ববঙ্গে কখনও কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই বা হইতে পারে না—প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহা পশ্চিমবঙ্গের অথবা যাহা কিছু পশ্চিমবঙ্গের তাহাই উৎকৃষ্টতর। এই অদ্ভুত ধারণা তাঁহার শ্রমবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাকে অনেক স্থলে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে—পরমত সম্বন্ধে তাঁহাকে অসহিষ্ণু ও উগ্র করিয়া তুলিয়াছে। সুখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থকারের লেখার মধ্যে এইরূপ ত্রুটির সন্ধান পাওয়া যায় না—বিরোধী মত খণ্ডনের সময়েও তিনি অসংযত ও অসঙ্গত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তবে অনেক স্থলেই তিনি অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের মত খণ্ডন ও সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রতিষ্ঠা করিলেও মাত্র বার দুই পাদটীকায় (পৃ. ৫১৫,৬৭১) অন্য প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। অবশ্য সেন মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে একবারও ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম বা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সে স্বতন্ত্র কথা।

১। অবশ্য এই আলোচনার সকল অংশের যুক্তি, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও তর্কাতীত বলিয়া মনে হয় না।

হিন্দুর ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই শাস্ত্র ও প্রচলিত রীতিবিরোধী কথা বলিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা এই সব কার্যে অপরিহার্য। ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থেও এ জাতীয় ত্রুটি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ধ্যান অবরূপে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৫, ১৪৭), কাত্যায়নীকে ষোড়শ-মাতৃকার অন্যতম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (পৃ. ৬৭২)। খুঁটিনাটি হইলেও এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। তাহা ছাড়া, 'জয়ষষ্ঠী' নামটি কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ সূতিকাষষ্ঠী নামে অধিকতর পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথা বলিয়া গ্রন্থকার কোন্ বস্তুর ইঙ্গিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। রঘুনন্দনের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত তিথিতত্ত্বকে 'রঘুনন্দনের রচিত বলিয়া পরিচিত' এইরূপে উল্লেখ করায় (পৃ. ৫৬) হেতু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। আজকালকার বাংলা গ্রন্থসমূহে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য যেন একটা নিয়মের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এই সব সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সুলিখিত এবং সুপাঠ্য। ইহার পত্রে পত্রে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্বামোদীর ত কথাই নাই, সাহিত্য-রসিক বাঙালী পাঠকমাত্রই ইহা পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।*

* বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম-এ প্রণীত। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩৫৭। কলিকাতা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি

দেশ-বিদেশের কথা

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতি

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন

গত ৬ই আশ্বিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ হলে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সঙ্গীতির একাদশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। অধ্যক্ষ শ্রীসুধাংশুকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্যের সমর্থনে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে পরিচালক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্গীতির একাদশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। সঙ্গীতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কবি ভারত-

সভাপতিসহ সাহিত্য-সঙ্গীতির কয়েকজন সদস্য

চন্দ্র স্মরণোৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্র স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে সঙ্গীতির প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য্য-বিবরণ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীতির আদর্শ বর্ণন-প্রসঙ্গে আধুনিককালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধনা ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি লেখক, পাঠক, গ্রন্থপ্রকাশক এবং সভা সমিতির উদ্যোক্তৃবর্গকে সমবেতভাবে ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্কট ও তাহা দূরীকরণের উপায় নির্দ্দেশ করেন। এই বিষয়ে সাধারণের কর্ত্তব্যের কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীমতী বৈজয়ন্তী সান্যাল, শ্রীমতী মঞ্জু সান্যাল, শ্রীমতী রেণু ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী মাধুরী আচার্য্য ও শ্রীমতী মীনা চক্রবর্ত্তী কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত গাহিয়া সভায় সকলের আনন্দবিধান করেন।

৭ই আশ্বিন সন্ধ্যায় এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু 'হিন্দু সমাজ' বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ধামুয়াতে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন

বাংলাদেশের আদিবাসী ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন-কল্পে গত জুন মাসে কলিকাতায় ভারত মহাজাতি মণ্ডলী নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ধামুয়ায় সাধনাশ্রমে মহাজাতি মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে একটি সভা হয়। মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি মহাজাতি মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা বিবৃত করিয়া এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির অনুরোধে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র আদিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, "মহাত্মা গান্ধী তাঁর গঠনমূলক কর্ম্মবিধির ষোল নম্বর ধারায় আদিবাসী-দের সেবাকার্য্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কর্ম্মীর অভাব দেখে তিনি "The harvest is rich but the labourers are few"—অর্থাৎ, 'ফসলের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু কর্ম্মীর সংখ্যা বড়ই কম', বলে আক্ষেপ করে-ছিলেন। তাঁর এই আক্ষেপ মেটানোর জন্যে দলে দলে কর্ম্মীদের আজ এই সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।"

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, অবিলম্বে এই শিক্ষাকেন্দ্রে আদিবাসী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষাদান, কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন, আশ্রমের পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য্য, লোকসঙ্গীত প্রচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই শিক্ষাকেন্দ্রে কর্ম্মী তৈয়ার করিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, আদিবাসী ও অনুন্নত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। এই আশ্রমে একটি নারীশিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে নারীদের, বিশেষভাবে আদি-বাসী স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির স্বামী ভবেশানন্দের উপর ধামুয়ার শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী গত ১৫ই আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৩০২ সালে নদীয়া শান্তিপুরের সূত্রাগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সহিত কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হন। পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের

পরে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্য-সাধনা করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু দক্ষ শিক্ষাব্রতীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সুবক্তা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বাংলার বহু বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং "বিশ্ব বৈতালিক" ও "পাদপাদপ" নামক কবিতার বই দুইখানি বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তাঁহার সভাপতিত্বে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সিঁথিতে বহু বৈষ্ণব মহাজনের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়

গত ২রা ভাদ্র রবিবার চুঁচুড়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায় স্বর্গত হইয়াছেন। ১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়ার সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র রায় চুঁচুড়ার কবিরাজ ছিলেন। ব্রজবল্লভ সহজাত কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কয়েক বৎসর চুঁচুড়ার ফ্রী চার্চ স্কুলে ও পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া তিনি কাব্যকণ্ঠ উপাধি অর্জন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ লোকনাথ মল্লিকের নিকট তিনি চরকাদি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে বাংলার একজন শীর্ষস্থানীয় কবিরাজরূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আনুকূল্যে তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে সাপ্তাহিক "সুবোধিনী" পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ১৪ বৎসর মাত্র। পরে তিনি "বহুদর্শী" নামে পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তিনি পিতৃতর্পণ, সুধাংশু সম্মিলন, সন্তপ্ত সহোদর, শারদ-শবন প্রভৃতি নাটক, উষামঙ্গল, চূয়া ও চন্দন প্রভৃতি খণ্ডকাব্য

ব্রজবল্লভ রায়

এবং আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস ইত্যাদি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাসমূহে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাময়ী বসু

গত ২১শে শ্রাবণ সিটি কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকেশবেশ্বর বসুর সহধর্ম্মিণী জ্যোৎস্নাময়ী বসু মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে পরিবারের এক ভৃত্যের হস্তে নিহত হন। তখন তাঁহার স্বামী নিজের কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজেও আহার করিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল হাওড়ার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। শোকতপ্ত কেশবেশ্বরকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

বীরেন্দ্রনাথ দাস

গত ২৪শে ভাদ্র বীরেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার হাইলাকান্দিস্থিত বাসভবনে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ী শ্রীহট্ট শহরের নিকটবর্ত্তী আখালিয়া গ্রামে ছিল। তিনি বহু বৎসর শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া শ্রীহট্টের যে সব দেশসেবক দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, বীরেনবাবু তাঁহাদেরই অন্যতম। ত্যাগ, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ দেশসেবা দ্বারা তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের নূতন বই

আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

(সচিত্র) মূল্য—২৲

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইহাতে আছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, বিশেষতঃ বাংলা ও আসামের আদিবাসীদের রীতিনীতির বর্ণনা আর খাসিয়া, কাছাড়ী প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের বিবরণ। আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী এই পুস্তকের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। অন্ধ্রের 'কেতা ডোরা'দের এবং খাসিয়া সামন্ত-রাজা তীরত সিং-এর সশস্ত্র বিদ্রোহ, ভীল-নেতা মোতীলাল তেজাবৎ পরিচালিত মুক্তি-আন্দোলনের কথা বাংলা ভাষায় প্রথম এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। নাগা-রাণী গাইডিলিউ, মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবান সম্বন্ধেও বহু অজ্ঞাত তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দেশবন্ধু বুক ডিপো—৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ ৬

পদার্থবিদ্যার নবযুগ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় সাধারণের উপযুক্ত করে লেখা কঠিন কাজ। একটি কারণ—পারিভাষিক শব্দ যথেষ্ট নেই, যা সম্প্রতি সংকলিত হয়েছে তাও সাধারণের পরিচিত নয়, এবং বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রকাশের রীতিও ভাল করে গড়ে উঠে নি। আর একটি কারণ—বিজ্ঞান (বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান) চর্চার জন্য যে ভিত্তি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যক তাও অনেকের নেই। যাঁরা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখেছেন তাঁদেরও অনেকে বাংলা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ দুর্বোধ মনে করেন। বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যান অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য, কারণ দর্শন-চর্চার উপযুক্ত ভাষা এবং বহু পারিভাষিক শব্দ আমাদের আছে।

যাঁরা আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান লিখে থাকেন তাঁদের অনেকে রচনায় প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন নি। এঁরা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখেছেন, ইংরেজীতেই ভাবেন, এবং ইংরেজী বাক্যরীতির যথাযথ অনুকরণ করেন। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ অসম্ভব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যরীতির পরিবর্ত্তন করতে হয়, অনেক শব্দের প্রতিশব্দ না দিয়ে অন্য ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়, এইসব বিষয়ে অবহিত না হলে রচনা উৎকট হয়ে পড়ে। Sensitized paper স্থানে 'স্পর্শকাতর কাগজ', low protein diet স্থানে 'নীচু প্রোটিন খোরাক' ইত্যাদি অদ্ভুত অনুবাদ অনেক দেখা যায়। সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন, যেমন 'কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে'। 'যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলোকণায় থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে'।

যে অল্প কয়েকজন বাংলা ভাষায় সার্থক বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লিখে যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের শীর্ষে আছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বহু লোকের মুখে এঁর অধ্যাপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। এঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, ইনি কলেজের গণ্ডির বাইরে এসে চুপ করে বসে নেই, ধর্ম্মেকর্ম্মেও ডুব দেন নি; নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থেকেও মনোহর মাতৃভাষায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে বিজ্ঞান বিতরণ করছেন।

চারুবাবুর নবতম গ্রন্থ পদার্থবিদ্যার নবযুগ। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত যেসব তথ্য আজকাল অসংখ্য লোকের অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়, যেমন ইলেক্ট্রন, বেতার, রেডিয়ম, অ্যাটম ভাঙ্গা-গড়া, অ্যাটম-বোমা, আপেক্ষিকতা-বাদ প্রভৃতি, তারই বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে আছে। পদার্থবিদ্যা অঙ্ক অর্থাৎ মাপজোখের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনেকে লেশমাত্র অঙ্ক সইতে পারেন না। তাঁরাও নির্ভয়ে এই বইটি পড়তে পারেন। গ্রন্থকার অঙ্ক পরিহার করে অতি সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থ পড়লে পাঠক বিস্ময়াবিষ্ট হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দলাভ করবেন।

শ্রীরাজশেখর বসু

সুকোমল কমনীয় কেশরাশি

সযতন পরিচর্য্যার অপেক্ষা রাখে

ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল

কেশ পরিচর্য্যার অপরিহার্য্য সম্পদ।

CASTOROL
Sweetly Scented Hair Oil from Pure Cold Drawn Deodorised
CASTOR OIL
WITH VITAMIN'S

ক্যাষ্টরল

সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা

কতিপয়—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত। ভারতী গ্রন্থ-ভবন। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

যে প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিণতিতে মানুষের বহুবিচিত্র রীতিনীতির উদ্ভব, কার্য্যকারণ সম্পর্কের বিচারে সব সময়ে সেগুলি হয়তো স্পষ্টতর হয় না, কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছু বা রহস্য কোথায় যেন লাগিয়াই থাকে। এই সব জট-পাকানো আচার-আচরণ বিস্ময় এবং কৌতূহলের বস্তু। মনস্তত্বের এই সূত্রের মধ্যেই কথা-সাহিত্যের পরিপুষ্টি। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সংঘাত দুয়ের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। অবশ্য লেখকের দর্শন ও অনুভূতির রসে সিক্ত হইয়া বিষয়বস্তু সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় না করিলে—গল্প উতরাইয়াছে বলিয়া রসিকজন স্বীকার করেন না।

আলোচ্য গল্প-সংগ্রহখানি পড়িয়া এই কথাটিই মনে হয়—লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীমনও যথেষ্ট সচেতন। অতি সূক্ষ্ম তুচ্ছ ঘটনা বা বৃত্তিসমূহের স্বরূপ তিনি জানেন এবং সেগুলি সুন্দর করিয়া, পুষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও রাখেন।...এগুলিতে গল্পের রস আছে—কিন্তু বাঁধুনিটা নাটকীয়—যদিও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত বা চরিত্র-বিকাশের অবকাশ ইহার মধ্যে নাই। কঠোর বাস্তব এবং অবাধ কল্পনা দুটিকেই লেখক চরম পর্য্যায়ে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন রচনা হঠাৎ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গীর যাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ সংলাপ তাহার গতি একটুও ব্যাহত হয় নাই, তাবকে অনায়াসে বহন করিয়া সে রসলোকে পৌঁছিয়াছে। চিত্রগুলির বেদনা, আনন্দ বা কৌতুক সমজাতীয় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাসব' ও 'বনান্তরালে' দুইটি চিত্রের বেদনার তুলনা দেওয়া যায়। একটিতে অতি-বাস্তব ঘটনার রূঢ় আঘাতে মন ভারাতুর হইয়া উঠে, সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিতে মন বিষাইয়া উঠে, অন্যটি স্বপ্নজগতের মধুর একটি আঘাতে মনকে মেদুর করিয়া তুলে। 'রাজপুত্তুর' গল্পে উদ্ভিন্ন-যৌবনা অতিসাধারণ একটি মেয়ের মনের কামনা নিখিলের নারী-চিত্তেরই প্রতিবিম্ব। 'ভূতের দেশে' পাই যুদ্ধোত্তর যুগের বিকলাঙ্গ ভগ্নমনোরথ বাসনাদিগ্ধ কতকগুলি মানুষকে। 'তিনটে বেজে সাত মিনিট'-এ আছে আসক্তি-জড়ানো জীবনের একটি দিকের সত্যকার পরিচয়। আসলে এগুলি রেখাচিত্র। সমগ্র জীবনের না হোক—জীবনের কোন অংশের সামান্যতম বৃত্তির অথবা বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাঙা-চোরা টুকরা—যেগুলিকে একত্র করিয়া লেখক চিন্তা করিবার ও রস উপভোগের যথেষ্ট অবকাশ পাঠককে দিয়াছেন। সমস্ত ছবির রং বা রেখা সমান নহে—রসও হয়তো সর্ব্বত্র গাঢ় হইতে পারে নাই, তথাপি এইগুলিতে লেখকের সৃজনী-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে—ভবিষ্যতে পূর্ণতর জীবন-চিত্র অঙ্কনের প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১

ইঙ্গিত—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি-৫৮, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। দাম ২।০ টাকা।

এই উপন্যাসখানিতে বর্ত্তমানকালের রাজনীতির ও রাষ্ট্রনায়কদের গতি ও চরিত্রের বহু অংশ প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী অর্থবান ব্যক্তি—সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করিবার আয়োজনে যে বুদ্ধি-কৌশলের আবশ্যক তাহা ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রচুর পরিমাণেই আছে। সুতরাং পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহার কার্য্যকলাপ সমর্থন করেন, লেখকেরা তাঁহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরূপে কিনিয়া লওয়াও তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত বুঝিতে পারে, সমাজ বা অর্থনীতির মূল সূত্রটি কোথায় বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে শ্রীমন্তের অন্তরের দ্বন্দ্ব, তাহার ভাগ্যকে কোন্ পথে লইয়া গিয়াছে—'ইঙ্গিতে'র প্রতিপাদ্য তাহা নহে। নেতায় নেতায় আত্মঘাতী কলহ, দ্বৈতনীতির প্রয়োগ, লোভ ও ক্ষমতালাভের মত্ততা জাতীয় জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, ইঙ্গিতের মূল উপজীব্য সেইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাঁহার বক্তব্য ভালভাবেই গুছাইয়া বলিয়াছেন। উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে, নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করিতেছি। আজিকার দিনে যে তিক্ত সত্য মানুষকে প্রায় নিরাশাবাদী করিয়া তুলিয়াছে, ইঙ্গিত তাহারই মর্ম্মকথার উদ্ঘাটক এবং এই কারণে ইহার চরিত্রগুলিও বাস্তবানুগ। শ্রীমন্ত, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী, কালীকিঙ্কর, সুভদ্রা দেবী প্রভৃতিকে আমরা সকলেই কমবেশী জানি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

= পূজার উ

অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ প্রণীত

তাজীর মত ও পথ

নেতাজীর মত ও পথ নিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সাথে মত-বিভেদ ও তার কারণ নিয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ। সংবাদপত্রসমূহে ও পাঠকমহলে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য ৩।০

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ছেলেদের হাতের কাজ

বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে যে সব জিনিস তৈরী করা যেতে পারে তাদের কথা গল্পের মত সরস ও সাবলীল ভাষায় লেখা : বহু চিত্রে সুপরিস্ফুট। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীভীমাপদ ঘোষ প্রণীত

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৷৷০

যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রণীত

রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য ১৸০

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

নীল আকাশের অভিযাত্রী ১৸০

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

যাঁরা ছিলেন মহীয়সী ২৲

পূজার পড়া ১।০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

সীমান্ত-পারে ১৸০

পি. সি. সরকার প্রণীত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বহুদিন পরে এর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। রঙিন প্রচ্ছদ শোভিত। মূল্য ১৷৷০

নলিনী দাশগুপ্ত প্রণীত

হাসির দেশ ১।০

শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত

রবিনহুড ২৲

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

দুঃসাহসী ১৸০

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত রমেশ-গ্রন্থমালা

বঙ্গ-বিজেতা ১।০

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ১।০

রমেশচন্দ্র দাশ প্রণীত

সাগরিকা (১ম) ১৷৷০

সাগরিকা (২য়) ১৷৷০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

(১ম) ১৲

শঙ্কর (২য়) ১৲

বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সুবিস্তৃত পদার্থ-বিজ্ঞান

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত

বিজ্ঞানের চিঠি

আচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা সম্বলিত

কতকগুলি পত্রের মাধ্যমে এতে আলোচিত হয়েছে—আলোকের বিকিরণ-লীলা, বিদ্যুচ্চৌম্বক মতবাদ, আলোকজ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, পরমাণবিক তত্ত্ব, মহাজাগতিক রশ্মিতত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক পরিমাণবাদ ও বিজ্ঞানের আরো অনেক তত্ত্ব।

আচার্য্য বসু বলেন—"সহজসাধ্য ক'রে লেখা জটিলতম নানা পদার্থ-বিজ্ঞান-তত্ত্ব পরিবেশিত এ গ্রন্থখানা বাঙলাভাষী প্রত্যেককেই ভাল ক'রে পড়বার জন্য অনুরোধ করছি।"

১৫৭ খানা বর্ণ ও রেখাচিত্রে ভূষিত :: মূল্য ৮৲ টাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী—পি

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ○ ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ○ ৭৮।১, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

মারকে লেঙ্গে—শ্রীপরিমল গোস্বামী। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম চারি টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালে, আর আজ '৫১ সালের শেষ ভাগ। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল আজও তাহার জের চলিতেছে। এই এক যুগ ধরিয়া যে জীবন আমরা যাপন করিতেছি তাহা সুস্থও নহে, স্বাভাবিকও নহে।

আমাদের এই বিপর্য্যস্ত এবং বিকৃত সমাজ-জীবনেরই ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে 'মারকে লেঙ্গে'র গল্পগুলিতে। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ এই ছয় বৎসর গল্পগুলির রচনাকাল। যুদ্ধকালীন ব্ল্যাকআউট, চোরাকারবার, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালের মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ও 'এক হো' ফিগীর তুলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের জাপ্টাজাপ্টি, কাপড় ও ছাতার কণ্ট্রোল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় লইয়া লেখক এই পুস্তকে কতকগুলি রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—"গল্পের চেহারা থাকলেও সবগুলি ঠিক গল্প নয়, ক্যারিকেচার বা কার্টুন চিত্র।"

১৯৪১-এর মাঝামাঝি ব্ল্যাকআউটের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত একই নীতি অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে। তাহা বহু লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের স্বার্থসিদ্ধির নীতি। ইহাই "মারকে লেঙ্গে" নীতি এবং আজ এই অপধর্ম্মই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যুগধর্ম্ম। চোরাকারবারের প্রসার, পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রভৃতি এই অপধর্ম্মের অন্যতম ফল। যাহারা এই অপধর্ম্মের আচরণ দ্বারা মানুষের দুর্গতির বোঝাকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে তাহারা "সবাই এক একটা মুখোশ পরে বেড়াচ্ছে, যে যা নয় তাই সে দেখাবার জন্তে ব্যস্ত।" (মারকে লেঙ্গে—'অভিনেতা গাধা')।

পরিমলবাবু তাঁর গল্পগুলিতে এই সমস্ত স্বার্থান্বেষীর মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন, মানুষের অত্যুগ্র স্বার্থবুদ্ধি, ন্যাকামি এবং ভণ্ডামিকে তিনি তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। 'গুহ এণ্ড পাল' গল্পের গোবর্দ্ধন গুহ এবং প্রদ্যোত পাল 'পরাধীনতার ফলে'র মহাদেববাবু প্রভৃতির লোক-দেখানো দেশহিতৈষণার মূলে কোন্ প্রবৃত্তি, লেখক তাহা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

পরিমলবাবু ব্যঙ্গ-রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং তাঁর রসিকতাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মারকে লেঙ্গের 'ছাতা' প্রভৃতি কোন কোন গল্প রসরচনার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। গল্পগুলির এই বাহ্য রূপই হয়তো সাধারণ পাঠকের আনন্দবিধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই বহিরাবরণ ভেদ করিয়া যিনি গল্পগুলির মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে পারিবেন তিনিই উপলব্ধি করিবেন যে, গভীর বেদনাবোধ হইতে ইহাদের জন্ম।—লেখক জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতাসমূহকে রসিকতার প্রলেপে মিষ্টস্বাদযুক্ত করিয়া পাঠকদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। মনে হয় যেন দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, ধনিকের শোষণ, চোরাকারবারীর দুর্নীতি এই সমস্তের ফলে অগণিত সাধারণ মানুষের শোচনীয় দুরবস্থা তাঁহার মর্ম্মস্থলে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, হাল্কা হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি সেই ক্ষতের জ্বালাকে ভুলিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু 'নবঘোষণা', 'নূতন পরিচয়' প্রভৃতি গল্পে মর্ম্মবেদনাকে তিনি লুকাইতে পারেন নাই। তাঁহার বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের ক্ষত-স্থানটি আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বইয়ের 'কবি-শিল্পী-কথা' শীর্ষক গল্পটির চেহারা আলাদা —ইহা ব্যঙ্গ-রচনা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেমন লেখকের কবি-মানসের, তেমনি তাঁর আদর্শবাদী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আজিকার দুর্য্যোগই যে ভবিষ্যতে নবযুগের সূচনা করিতেছে—গল্পটিতে এই আশ্বাস আছে। লেখক বলিতেছেন—"রত্নেশ্বরও কবি সেও স্রষ্টা, কিন্তু তার বিষয়বস্তু মানুষ—যে মানুষ মাটির কাছাকাছি বাস করে। যাদের সে দেখে পায়ে চলার পথে, যাদের সে দেখে নীচের ধাপে। মানবতার দুঃখে মানবতার অপমানে সে ক্ষুব্ধ হয়। সে দাঁড়ায় জীবনের কারখানার ঘরে। নিজ হাতে সে নূতন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগে।"

পরিমলবাবু জাত-লেখক। তাঁর রচনা মিতবাক্। তিনি যেমন চমৎকার লিখিতে পারেন, তেমনি কোথায় থামিতে হয় সে কৌশলটিও তাঁর আয়ত্ত। তাঁর রচনা মেদবর্জ্জিত, নিরলঙ্কৃত, অথচ সূক্ষ্ম সাহিত্যিক কারুকার্য্যমণ্ডিত —তাহাতে যতটুকু প্রকাশিত হয় তাহার চেয়ে ব্যঞ্জনা থাকে অনেক বেশী রচনার এই সমস্ত গুণ 'মারকে লেঙ্গে'তে সুপরিস্ফুট। পুস্তকখানি বাংলা-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া রসিকজনের স্বীকৃতিলাভ করিবে। বিশেষ একটা কাল-সীমার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাসমূহ লইয়া গল্পগুলি রচিত বটে, কিন্তু কতকগুলি গল্প এমনি প্রাণময়তায় পরিপূর্ণ যে, সেগুলি কালোত্তীর্ণ হইবার দাবি রাখে।

বইয়ে সংযোজিত শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা কার্টুন চিত্রগুলি যেমন ব্যঞ্জনাময়, তেমনি সেগুলিতে আছে স্বাধীন কল্পনার খেলা। লেখায় যে ছবিটি মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠে, রেখায় তা সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত দেখিয়া মনে পুলক-সঞ্চার হয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিংশতি মহামানব—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। পৃ. ২৭৭, মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "প্রকাশকের কথা"র বলিয়াছেন:— "পুরুষসিংহ রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত যে বিংশতি মহামানব অনাগত বাংলার জন্ম নূতন ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-কাহিনী বাংলার শিশু এবং কিশোরদের হাতে দিবার জন্ত 'বিংশতি মহামানবে'র পরিকল্পনা।" রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, পরমহংস, বঙ্কিম, গুরুদাস, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র মণীন্দ্রচন্দ্র (মহারাজ), রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ রামানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অবনীন্দ্র, অরবিন্দ, শরৎ চন্দ্র, সুভাষচন্দ্র এই কুড়ি জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে বাদ দেওয়া ঘোর ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ত্রিবর্ণ চিত্র সন্নিবেশ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের দিক দিয়া বইখানি যত চমৎকার হইয়াছে, তথ্যের দিক দিয়া ততখানি নিখুঁত হইলে আমরা আরও খুশী হইতাম। তথাপি মহতের বিষয় আলোচনা এবং দেশের কিশোরদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই আলোচনা সর্ব্বদাই প্রশংসনীয়।

ব.

অর্ঘ্য—শ্রীসরলাবালা সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীসরলাবালা সরকার সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-সেবা করিতেছেন। পনর বৎসর বয়সে তাঁহার কবিতা "ভারতী ও বালকে" প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর। এমন দীর্ঘ এবং অক্লান্ত কাব্যসাধনার দৃষ্টান্ত বিরল। আশ্চর্য্য এই, বয়সের সঙ্গে তাঁহার কবিতা সজীবতা হারায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু খ্যাতনামা

১৯৫০ সর্ব্বদাই পুরোভাগে

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে "হিন্দুস্থান" সর্ব্বদাই পুরোভাগে রহিয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সঙ্গতি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা	৬৩,১৬,৬০,৫৯৭৲ টাকা
মোট সংস্থান	১৭,৭০,৭০,৬২৪৲
বীমা তহবিল	১৫,৯৭,৪৭,৫৪৮৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৪০,৪৭,৩৩৮৲
দাবী শোধ (১৯৫০)	৪২,৯২,৮৫০৲
নূতন বীমা	১৩,৭৫,৩৯,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্ব্বাপর তাহার ক্রমোন্নতির পথে পাথেয় রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারই জন্ম হিন্দুস্থানের প্রকৃত গৌরব। হিন্দুস্থানও তাহার ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে, নূতন বৎসরে ইহাই তাহার প্রতিশ্রুতি।

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১৩

নারী-কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। লেখিকা আধুনিককাল পর্য্যন্ত সেই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন। সরলাবালা শুধু কবি নন, বহু গল্প এবং প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। সারাজীবনের কাব্যসঞ্চয় "অর্ঘ্যে" নিবদ্ধ হইয়াছে। মীরার প্রার্থনা, নিবেদিতা, বাল্মীকি, অহল্যা, রক্তজবা, রমণীর ব্রত, গভীর নিশীথে প্রভৃতি কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল। বিবেকানন্দের উপর লিখিত 'পৌষ-কৃষ্ণা-সপ্তমী' এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে লিখিত 'তুমি আমাদেরি লোক'—দুইটি বিশিষ্ট কবিতা। বহু কবিতাই স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল।

"ভালবাসা বিনা নাহি পারে কেহ মরতে দেবতা হ'তে।"

অথবা—

'তপস্যা মূরতি ধরে এসেছিলে ধরা 'পরে
তপস্বিনি অয়ি'।'

অথবা—

'আকাশে যে তারে তারে গাঁথা তারা-হার
অপূর্ব্ব সে বীণাযন্ত্রে, শুনেছ কি কোন দিন
অপূর্ব্ব ঝঙ্কার?'

প্রভৃতি বহু পংক্তিই মনের উপর একটি গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। "জাগরণী" খণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত কবিতাই একটি অপূর্ব্ব জাগরণের সুরে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে। "অর্ঘ্যে" পাঠক প্রকৃত কবিত্বের সন্ধান পাইবেন।

অনাগত—প্রফুল্লকুমার সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রফুল্লকুমার সরকার শুধু প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি খ্যাতনামা উপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিকও। "অনাগত" উপন্যাস। ১৩৩৪ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। 'প্রকাশকের নিবেদনে' শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার বলিতেছেন, "পরাধীনতার দুঃসহ বন্ধনমোচনের জন্য একদা বাংলার যে সব তরুণতরুণী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুরধার পথে যাত্রা করিয়াছিল, তাহাদের জীবন-কথা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। পরাধীনতার পটভূমিতে এই উপন্যাসের ঘটনাসংস্থান হইলেও স্বাধীন-ভারত-গঠনের ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ ইহাতে আছে।" উপন্যাস হিসাবে যাঁহারা "অনাগত" পাঠ করিবেন তাঁহারাও কাহিনীর বৈচিত্র্যে এবং ঘটনার সাবলীলতায় আনন্দলাভ করিবেন, প্রতিমা এবং অনিন্দিতার চরিত্রে মুগ্ধ হইবেন। কিন্তু "অনাগত" শুধু উপন্যাস নয়, ইহাতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আছে, ভাবী রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্কেত আছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত এই উপন্যাসখানির রাজনৈতিক পটভূমিকা এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। রসানুভূতির সহিত মননশীলতার সংমিশ্রণ পুস্তকখানিকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কারাকক্ষে মোহিতের সহিত প্রতিমার শেষ সাক্ষাৎ বড় করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। "অনাগত" আজিকার দিনের তরুণ পাঠককেও প্রেরণা দিতে পারিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন। সাহিত্য-মন্দির, পাবনা, মূল্য দশ আনা।

'কবির স্বপ্ন' রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল বাজারে বহু সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দুই-একখানির কথা বাদ দিলে ঐ ধরণের সমালোচনা গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই সরল কথার জটিল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

ইহাতে সমালোচকের পাণ্ডিত্যাভিমান তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু পাঠক ও লেখকের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হইয়া উঠে। অথচ সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য রচনার মর্ম্মার্থকে পাঠকের নিকট সহজ ও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা—লেখক ও পাঠকের মধ্যে রসোপলব্ধির সংযোগসেতু রচনা করা। আধুনিক অনেক সমালোচনায় ধার আছে, পাণ্ডিত্য আছে, বুদ্ধির শাণিত ঔজ্জ্বল্য আছে, কথার তীক্ষ্ণ চাবুক আছে, ভঙ্গীর চটক আছে—নাই শুধু আন্তরিকতা। প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'খেয়া' কাব্যের এই দরদী সমালোচনা পড়িয়া তাই চমক লাগিল। কি অনাড়ম্বর বলিবার ভঙ্গী, কি সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা—রসাস্বাদনের জন্ত কি অকৃত্রিম এবং আন্তরিক আলোচনার ধারা। পড়িতে পড়িতে কাব্যরসের মন্দাকিনীপ্রবাহে পাঠকের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এইখানেই চরম সার্থকতা। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে লিখিত হইলেও এই নিবন্ধ-পুস্তকখানি আজও সমভাবে কুতূহলী পাঠকের চিত্তকে রসানুভূতির সহস্রধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক ভূগোল—পৃষ্ঠা ১৪০। মূল্য দুই টাকা।
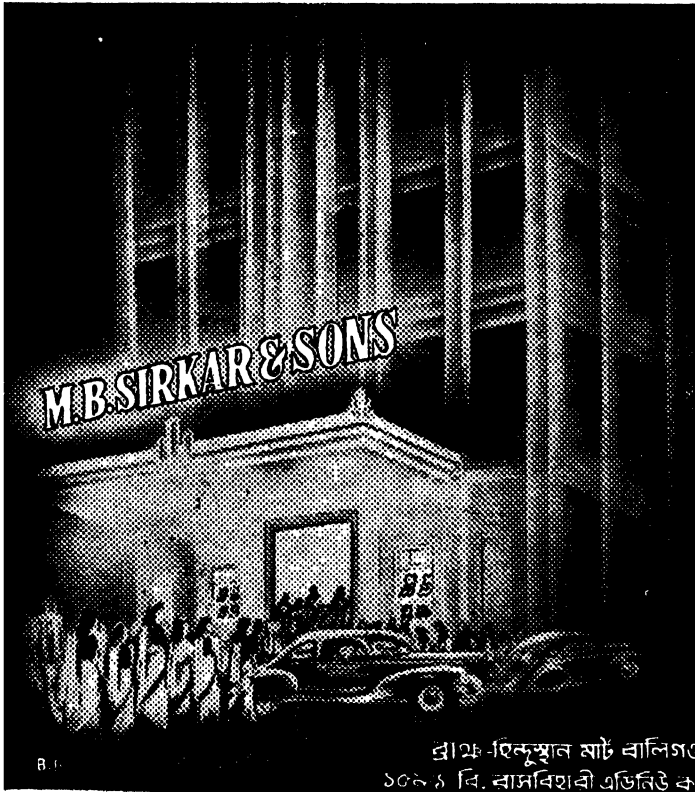
ভারতবর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৪। এইচ. চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

দেশ-বিভাগের পরে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অনেক জিনিষই নূতন করিয়া গড়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্য্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে খণ্ডিত বাংলা ও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার একটি সম্পূর্ণ ধারণা না লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সফলতালাভ সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ভূগোলসমূহে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি, বাণিজ্যসম্পদ, খনিজ ও আরণ্যসম্পদ, শিল্প, পরিবহন-ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পাঠক যে জ্ঞানলাভ করেন ব্যবহারিক জীবনে তাহা খুবই আবশ্যক। বাংলাভাষায় এ ধরণের পুস্তকের প্রকাশ সম্ভ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা খুবই সময়োচিত ও সুলক্ষণ। লেখকের রচিত ইংরেজী বইয়ের আলোচনাকালে আমরা তাঁহাকে এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। গ্রন্থকার বাংলাভাষায় অর্থনৈতিক ভূগোলবিদ্যার প্রচারে ব্রতী হইয়া দেশবাসীর একটা অভাব দূর করিলেন এবং শিক্ষার্থিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পুস্তকখানি সুলিখিত এবং জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। ইহার বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

লেখকের দ্বিতীয় পুস্তকখানি পরিবহন সম্বন্ধে। এই বইখানি লিখিয়া লেখক বাংলাভাষায় একটা অভাব দূর করিলেন। ইহাতে রাজপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথের বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে এবং ছয়টি মানচিত্র দ্বারা বিষয়বস্তু বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, এদেশের পরিবহন-ব্যবস্থা খুবই অসম্পূর্ণ। লেখক সরকারী পরিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু আশার কথা আছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অন্তরীপ—শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনী, ১৫।৭, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

যুদ্ধোত্তর অতি সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের পটভূমিতে উপন্যাসখানির চরিত্রগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডি ছাড়াইয়া রাতারাতি 'আলট্রা মডার্ণ' হইতে যাওয়ায় রাসবিহারীর সংসারে যে বিপর্যয় দেখা দিল তাহা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলের পুরাতন বনেদী পরিবারের রাসবিহারী হঠাৎ একদিন তার পূর্ব্বপুরুষের ভিটা বিক্রয় করিয়া দিয়া বালিগঞ্জে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। মা বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু ফল হয় নাই। যৌবনের আশা আর স্বপ্নে তার মন ছিল আচ্ছন্ন, কিন্তু এই আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাইতেই এক দিন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে কালের গতির সহিত সমানতালে পা ফেলিয়া চলিতে তিনি সক্ষম হন নাই—এমন কি তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়েরাও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাসবিহারী আক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু নিজেকে এই আধুনিক আবেষ্টনী হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

এই অতি-আধুনিক কতকগুলি মেয়ে এবং পুরুষের চরিত্র আঁকিতে বসিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। মাতৃত্বের পবিত্র মহিমাকে পর্য্যন্ত এই উপন্যাসে কলুষিত করা হইয়াছে। কালিঘাটের বক্সেশ্বরতলার গলির একটি বাড়ীতে যে শুকারজনক দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। অথচ এই অংশটিকে অনায়াসে বাদ দেওয়া চলিত। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সার্থক রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ সংযম। তাহার অভাব এই লেখকের রচনায় দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গীতায় স্বরাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ২৭৯। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করায় ত্রিশ বৎসর ব্রিটিশের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের পর তিনি কলিকাতার আলিপুর জেলে প্রেরিত হন। আলিপুর জেলে থাকাকালে তিনি সমালোচ্য পুস্তকখানি রচনা করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী 'পরিচিতি'তে এই গ্রন্থকে 'গীতার টীকা' বলিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র গীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলির সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ত্রৈলোক্য মহারাজের গীতাব্যাখ্যা কোন প্রচলিত ভাষ্য বা টীকা অবলম্বনে লিখিত না হইলেও ইহা সত্যই অভিনব এবং যুগোপযোগী। ব্যাখ্যাতা উপক্রমণিকায় গীতোক্ত মূলতত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ব্যাখ্যাতা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীন ভারতকে গীতার আদর্শে না গড়িতে পারিলে দেড় শত বৎসরের পরাধীনতার যে কুফল আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। গীতোক্ত আদর্শ সদ্য-স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রূপায়িত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশব্যাপী কাপুরুষতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি অপগত হইবে না এবং আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশও ঘটিবে না।

লেখকের ভাব প্রাণস্পর্শী এবং ভাষাও সাবলীল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১। সাধন বাণী ২। জীবন সাধনার পথে—স্বামী আত্মানন্দ। ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। মূল্য যথাক্রমে আট আনা এবং এক টাকা।

প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার মানবের বিশেষ কল্যাণপ্রদ এক শতটি স্বাচন্তিত বাণী পরিবেশন করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে 'জীবন লক্ষ্য', 'প্রার্থনা-মন্ত্র ও প্রার্থনার নির্ণয়' শীর্ষক বিয়াল্লিশটি অধ্যায়-আলোচনা স্থান পাইয়াছে। আদর্শ জীবনগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অতীব সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বৌদ্ধগান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

সে কাল আর এ কাল—রাজনারায়ণ বসু। মূল্য ১৲।

পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ১৲।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬।

আলোচ্য তিনখানি পুস্তকই শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র প্রথম সংস্করণ (১৩২৩) বাহির হইবার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. শহীদুল্লাহ্, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ পুস্তকের চর্য্যাপদগুলি সম্পর্কে বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। ফলে এ সমুদয়ের কিছু কিছু পাঠ-সংস্কারও সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে বাংলাভাষায় চর্য্যাপদগুলির কোন ব্যাখ্যা ছিল না। পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বহু আয়াসে উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকগণের গবেষণার নিরিখে এবং নিজ বিচার-বুদ্ধিমত এ সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় পদগুলির অন্তর্নিহিত রস ও ভাবগাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একারণ ইহা পাঠে বাংলাভাষা শিক্ষার্থীর, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের উচ্চতম ছাত্র-ছাত্রীর সাহায্য হইবে। পরিষদ এই প্রয়োজন সংস্করণটি প্রকাশে বাংলাভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসুর "সে কাল আর এ কাল" সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। এখানিও দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ 'জাতীয় সভা'র রাজনারায়ণ উক্ত শীর্ষক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাই পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া বক্তা কর্ত্তৃক পরে পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে এখানির দুইটি সংস্করণ মাত্র বাহির হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচাত্তর বৎসরের বাঙালীর হালচাল, শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতির গতি-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা ইহাতে আছে। রাজনারায়ণ বসুর মনস্বিতার পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায় সুপ্রকট। বাংলাদেশের নব-জাতীয়তার উদ্বোধকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানে। যে 'জাতীয় সভা'য় তিনি এই বক্তৃতা দেন তাহা হিন্দু মেলারই অন্তর্গত, আর ইহার ভাব-প্রেরণা রাজনারায়ণ যোগাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সমালোচকের 'রাজনারায়ণ বসু' এবং 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' পুস্তক দুইখানিতে রাজনারায়ণের মনস্বিতা এবং স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যের একটি অমূল্য বস্তু সাধারণের নিকট সুলভ হইল।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি বাংলা কাব্যে পরিবেশন করিয়া সেযুগে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে জাতীয়ভাবোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এইরূপ একখানি কাব্য। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" শীর্ষক পংক্তিগুলি এই উপাখ্যানের 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্যে'র অন্তর্ভুক্ত। ইহার একটি অংশ এই:

"অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।"

স্বল্পমূল্যে এসকল পুস্তক সাধারণের নিকট সহজপ্রাপ্য হওয়ায় বাংলা-ভাষী ও বাংলা-সাহিত্যসেবী বিশেষ উপকৃত হইবেন নিঃসন্দেহ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিকারী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

নিউ দিল্লীতে চীনা সংস্কৃতি-মিশন, মধ্যস্থলে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পার্শ্বে শ্রীজবাহরলাল নেহরু
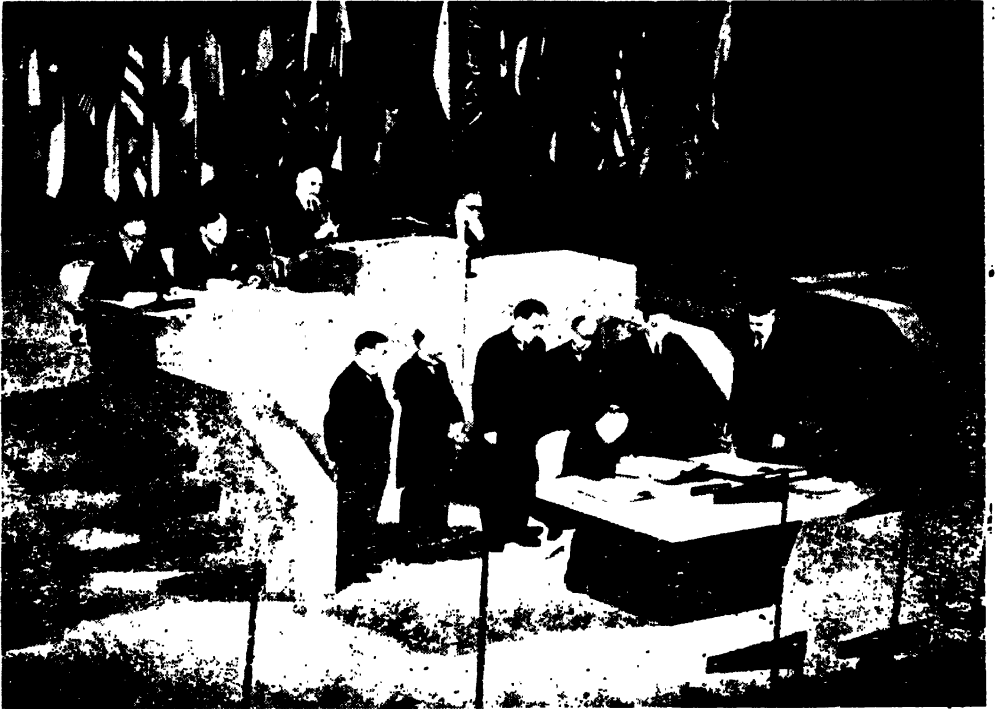
শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর-রত জাপানের প্রধান মন্ত্রী। একচল্লিশটি রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ ২য় খণ্ড } অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রার্থী

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে সকল দলের প্রার্থী-মনোনয়ন তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস-তালিকা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই তালিকা দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। প্রার্থী বাছাই করিবার জন্ত পাঁচটি 'চালুনী কমিটি' (Screening Committee) গঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাচাইয়ের ফল দেখিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় নাই বলিলে কম বলা হইবে, সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং কংগ্রেসের উপর অনাস্থা ইহার পর আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ এলাকাতেই লোকে দেখিতেছে যে, তাহাদের অঞ্চলের সুপরিচিত, দুর্নীতিপরায়ণ এবং রাজনৈতিক অপাংক্তেয় ব্যক্তি তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছেন। সেখানকার কোন যোগ্য লোক মনোনয়ন তো পানই নাই, প্রার্থী-নির্ব্বাচনের আগে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই।

প্রার্থী-নির্ব্বাচন প্রথমেই করিয়াছে জেলা-কংগ্রেস কমিটিগুলি। গত পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে অধিকাংশ কমিটি দুর্নীতিপরায়ণ লোক কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল একথা পণ্ডিত নেহরু নিজেই বলিয়াছেন এবং বাবু পুরুষোত্তমদাস টণ্ডনের সহিত তাঁহার বিরোধেরও ইহাই ছিল মূল কারণ। নাসিক কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন লইয়াই নেহরু-টণ্ডন বিরোধের সূত্রপাত। জেলা কমিটিগুলি দুর্নীতির প্রধান ঘাঁটি, চোরাকারবার এবং জালজুয়াচুরির কেন্দ্র বলিলেই হয়—ইহা আজ দেশশুদ্ধ লোক জানে। প্রাথমিক প্রার্থী বাছাইয়ের ভার ইহাদের উপর পড়িয়াছিল। প্রথমেই ইহারা সেই সেই অঞ্চলের ভাল লোকদের বাদ দিয়া নিজেদের লোক লইয়া প্রার্থী-তালিকা রচনা করিয়াছে। কংগ্রেসের কোন্ উপদল কয়টা আসন পাইবে ইহাই লইয়া যা কিছু ঝগড়া হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু বাহিরের ভাল লোক আনিবার জন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহারা তাহা যথাযথভাবে করে নাই। যে কয়জন বাহিরের লোক আসিয়াছে তাহারা হয় একই শ্রেণীর নহিলে প্রায় অকর্ম্মণ্য। কোন একটি ক্ষেত্রেও আমরা দেখি নাই যে, জেলা কংগ্রেস মনোনয়নে ভাল লোক ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক লইয়া মতভেদ হইয়াছে। সর্ব্বত্র একই কথা—প্রার্থী কংগ্রেসের কোন্ উপদলের লোক, অমুক মার্কা অথবা তমুক মার্কা। এই ছাঁকাই শেষ হওয়ার পর তালিকা গেল প্রাদেশিক কংগ্রেসে। সেখানেও এই একই ভিত্তিতে তালিকাকে প্রাদেশিক রূপ দেওয়া হইল। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার সময় যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল জেলখাটা। এবারকার মাপকাঠি হইয়াছে প্রধানতঃ টাকার থলি। তাহার পর স্থান পাইয়াছে, দুর্নীতিপরায়ণতা ও কুটিল রাষ্ট্রনীতির কুপোষ্য। দেশের গবর্মেণ্ট পরিচালনের ক্ষমতা ইহাদের আছে কিনা সেদিকে কোন প্রদেশেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট নিজে যাহাদিগকে কর্পোরেশন বা জেলা-বোর্ড পরিচালনের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তার জন্ত কর্পোরেশন অধিকার করিয়াছেন বা জেলা-বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবিয়াছেন তাহারাও কংগ্রেসপ্রার্থী তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে।

এই মনোনয়ন-তালিকা তৈরি করিবার পর চালুনির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চালুনির কাজ ভালোর সঙ্গে মিশানো মন্দ ছাঁকিয়া মন্দকে বাহির করিয়া দেওয়া। আমরা সমস্ত প্রদেশের বেলাতেই দেখিতেছি ঠিক তার উল্টা হইয়াছে। চালুনি কমিটি সব কয়টি ভেজালকে সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেলায় অন্ততঃ দেখিলাম যে প্রাথমিক তালিকা এবং চূড়ান্ত তালিকায় অতি সামান্য রদ-বদল হইয়াছে। চালুনি কমিটি বসাইয়া ভেজাল বাহির করিয়া দেওয়ার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে উহা বসানো উচিত ছিল জেলা কংগ্রেসে। তাহা না করিয়া শেষপ্রান্তে বসাইয়া চালুনির সার্টিফিকেট দিয়া ভেজাল তরাইবার চেষ্টায় ইহাই সন্দেহ হয় যে এক্ষেত্রে বাছাই করা আসল উদ্দেশ্য নয়, মূল অভিপ্রায় সাফাই গাহিয়া জনমত বিভ্রান্ত করা। নির্ব্বাচনী চালাকির ইহা একটি বড় অঙ্গ।

কংগ্রেস-তালিকায় কংগ্রেসের নিজের মূলনীতিও রক্ষিত হয় নাই। নেহরু দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তালিকায় তাঁহারই হাত দিয়া কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, অতিশয় সুপরিচিত দুর্নীতিপরায়ণ, চোরাকারবারী প্রভৃতি পার হইয়াছেন। মতপার্থী কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভ্য হইতে পারে না। এই শ্রেণীর অনেকে তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছেন। কংগ্রেসকে কোন নির্ব্বাচনে কেহ পরাজিত করিয়া থাকিলে তাঁহাকে কখনও কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া হয় না। এই শ্রেণীর একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। বড় বড় ধনিক শ্রেণী, বড় বড় জমিদার যাঁহাদের কোনরূপ খ্যাতি কোন কালেও নাই তাঁহারা নিজেরা, তাঁহাদের কর্ম্মচারী, উকীল, সলিসিটার, ম্যানেজার প্রভৃতিও কংগ্রেস-মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। কোনরূপ নীতি, ন্যায় বা যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া কংগ্রেস-তালিকা রচিত হয় নাই। অসাধু লোকদের লইয়া উহা প্রস্তুত হইয়াছে, যাহারা বড় ও শক্তিশালী উপদলের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারাই অধিকতর পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু সেদিন বলিয়াছেন যে, তালিকায় বহু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি এখন তাহা বুঝিয়াছেন তবে আর করার কিছু নাই, কারণ বড্ডই দেরি হইয়া গিয়াছে। আমরা এই কথাও মানিতে পারিলাম না। তালিকা রচনায় যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহা জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে হইয়াছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ ছিল। কাজেই এইরূপ সাফাই আসিবে ইহা আমরা আগেই ভাবিয়াছি এবং পণ্ডিত নেহরুর ঐ বক্তৃতার আগে নবেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' এ লিখিয়াছি। অন্যায় বুঝা গেলে তাহার সংশোধনই নিয়ম। অন্যায় বুঝিয়া ও জানিয়া সংশোধন না করা অপরাধ। অন্যায় সংশোধনের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে অন্যায় বুঝিবামাত্র যে লোক তাহা সংশোধন করিতে পারে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী। আজ যাহাদিগকে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে তাহারা পাঁচ বৎসর গবর্ন্মেণ্ট চালাইবে ইহা ভাবিয়াই তাহা করা হইয়াছে। অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকের হাতে গবর্ন্মেণ্ট পড়িলে দেশের কি অবস্থা হয় বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট তাহার প্রমাণ। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় প্রার্থীর যোগ্যতা দেখা হয় নাই, দেখা হইয়াছিল কেবল কংগ্রেসের ছাপ। স্বাধীনতার পর এই শ্রেণীর লোকের মূল্য লোকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। কাজেই আজ এই ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী কংগ্রেস হইতে দেওয়া উচিত ছিল। পণ্ডিতজী যে মুহূর্ত্তে বুঝিলেন যে এই নীতি কংগ্রেস-তালিকায় রক্ষিত হয় নাই তৎক্ষণাৎ যদি তিনি উহা বাতিল করিয়া দিতেন এবং নূতন তালিকা রচনায় সময় দেওয়ার জন্য দুই বা তিন সপ্তাহ নির্ব্বাচন পিছাইয়া দিতেন তবে এই ভুল শোধরাইবার ব্যব[স্থা] হইত। পাঁচ বৎসর এক দল অযোগ্য লোকের হাতে গবর্ন্মে[ণ্ট] সমর্পণ করা অপেক্ষা তিন সপ্তাহ নির্ব্বাচন পিছানো অনে[ক] ভাল দেশশুদ্ধ লোক ইহা বুঝিত। ইহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা অনেক বাড়িত। কিন্তু নেহরু তাহা করিলেন না। আ[জ] তাঁর এই স্বীকারোক্তিকে লোকে সত্তাপূর্ণ উক্তি বলি[য়া] মানিবে না, ইহাকে বরং অধিকতর অপরাধের প্রমাণ বলি[য়া] গ্রহণ করিবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি নূতন একটা অন্যায় কা[জ] করিবার আগে পূর্ব্বকৃত কার্য্য ভুল হইয়াছে বলিয়া প্রচা[র] করিয়া জনমত শান্ত করিতে চায়, দলের দুই-চারিটি লোককে বিতাড়িত করিয়া জনমতকে ধাঁওতা দিতে চেষ্টাও করে। পণ্ডিতজী এই পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন ইহা খুবই দুঃখে[র] বিষয়। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার মতে প্রেসিডেণ্ট কাজ করিবেন। বর্ত্তমান তালিকায় না[ম] লেখা লোকেরা নির্ব্বাচিত হইলে আগামী পাঁচ বৎসর দেশে কুশাসন ঘটিবে বলিয়া তিনি নিজে যেখানে বুঝিতে পারিতে[ছে]ছেন সেখানে তার সংশোধনের জন্য অনায়াসে তিনি প্রেসি[ডে]ণ্টকে দুই-তিন সপ্তাহ নির্ব্বাচন পিছাইবার পরামর্শ দিতে পারিতেন। ইহা না করায় আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় নাই, প্রমাণিত হইয়াছে এই যে তিনি মনের মধ্যে পাপ লইয়া এ[ই] কাজ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ও এই দোষে দোষী।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ বাম ঊর্দ্ধ অধঃ ঈশান কোণ নৈঋত কো[ণ] ইত্যাদি সর্ব্বস্থানের পার্টিবৃন্দ তাহাদের মনোনীত প্রার্থী[র] তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। যাহার একটা প্রার্থী তরাইবা[র] সাধ্য নাই সেও একশ'টি নাম ছাপাইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রা[য়] এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন সুগঠিত রাজনৈতিক দল নাই, কাজেই আ[র] কাহারও পক্ষে গবর্ন্মেণ্ট গঠন করা সম্ভব নহে। বামপন্থী দলগুলি একমত হইতে পারিতেছে না এ কথাও তিনি বলিয়া[]ছেন। আগামী ব্যবস্থা-পরিষদে যে ভিত্তিতে বাছাই হইয়া কংগ্রেসপ্রার্থীরা আসিতেছেন তাহাতে কোন 'Stable' বা স্থা[য়ী] গবর্ন্মেণ্ট গঠন সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথে[ষ্ট] সন্দেহ রহিয়াছে। দেশসেবা, দেশের উন্নতি ইহাদের লক্ষ্য হইবে না, হইতে পারে না, ইহারা তার অনুপযুক্ত। কংগ্রে[স] দলের একমাত্র লক্ষ্য হইবে স্বার্থসিদ্ধি। ইহাতে বিরো[ধ] এবং দল ভাঙাভাঙি অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থী মনোনয়নে[র] বেলাতেই দেখা যাইতেছে যে, যিনিই মনোনয়ন লাভ করে[ন] নাই তিনিই কংগ্রেস ছাড়িতেছেন এবং নূতন দল করিতেছেন। নির্ব্বাচনের পর পরিষদ-গৃহের ভিতরে সিবিল সাপ্লাইয়ের মধু পাইলে ইহা আরও সহস্র গুণ বাড়িবে। প্রার্থী মনোনয়নে বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলি আরও শোচনীয় স্বার্থপর

মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে। নিজের দলের স্বার্থ কেহই ছাড়িবে না। এই সুযোগে ইউ-এস-ও এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্ত দলগুলিকে সঙ্গে রাখিয়া কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছে, উহা আদৌ সম্ভব কিনা, তাঁওতা কয়দিন টিকিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই। ফরওয়ার্ড ব্লক চার-পাঁচ টুকরা হইয়াছে। বামপন্থী একটা দল যেখানে নিজেরা একত্র থাকিতে পারে না, সেখানে তাহারা প্রদেশব্যাপী ঐক্য গড়িয়া তুলিবে ইহা আশা করাও বাতুলতা। কম্যুনিষ্ট দল বাহিরে কতকটা নরম ভাব রাখিয়া ভিতরে রীতিমত দরকষাকষি করিতে গিয়া তালগোল পাকাইয়া বসিয়াছে। বামপন্থী ঐক্যের নামে এখন ইউ-এস-ওর অন্তর্ভুক্ত গোটা দুই উপদল এবং কম্যুনিষ্ট দলের জোটকে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। দল হিসাবে অধিকাংশ বামপন্থী দলই ইহাদের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আই-এন-এ পার্টির দোহাই ইহারা দিয়াছে, কিন্তু এই দলের কোন অস্তিত্ব এখন আর নাই। তোঁসলে অনেক দিন কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইয়াছেন। শাহনওয়াজ কংগ্রেস মনোনয়ন লইয়াছেন, মহবুব গবর্মেণ্টের চাকরীতে গিয়াছেন, শাহনওয়াজ এবং ধীলন কলিকাতায় দুই উপদলের হইয়া লড়িয়া গিয়াছেন। ইহার পরেও আই-এন-এ পার্টি আছে—বলিতে হইবে? সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে কম্যুনিষ্ট দল নেতাজী সুভাষকে দেশদ্রোহী বলিতে ছাড়ে নাই, তাঁহার সংগ্রামের যাহারা সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, নেতাজীর ঐতিহ্যের দাবিদার ফরোয়ার্ড ব্লক বা ইউ-এস-ও এবং আই-এন-এ দলের সহিত সেই কম্যুনিষ্ট দলের মিলন ও ঐক্য কি করিয়া হইতে পারে? কোন আদর্শের ভিত্তিতে এই মিলন ঘটিতে পারে না, ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থ এবং লোভের ভিত্তিতেই ইহা সম্ভব।

দেশবাসীকে আজ আর বাম বা দক্ষিণ টিকিট দেখিলে চলিবে না। ভোট দেওয়ার সময় পার্টি টিকিট অগ্রাহ্য করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। ইহা না করিলে আগামী পাঁচ বৎসরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাঁদিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নানা ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাবনার অন্ত নাই। ডাক্তারী করিবার সময় তিনি ব্যক্তিবিশেষের রোগের নিদান করিতেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। রোগী ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে দেখাইতে পারিয়াছি, এই আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাইতে পারিত। কিন্তু আজ সমাজদেহের নানা রোগ লইয়া তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না, এবং কাহাকে সন্তুষ্ট করিলে যে চেঁচামেচি কম হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

গত ২৪শে কার্ত্তিক নিজের বাসগৃহে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে বিবৃতি দান করেন তাহার মধ্যে আমরা উপরোক্ত দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিতেছি। এই বিবৃতির চুম্বক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমাদের মন্তব্য হইবে তাহা অবলম্বন করিয়া। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তর্কের বিষয়। আমরা তাঁহার বিবৃতির চুম্বক প্রকাশ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যুক্তিগুলি বিচার করিবার জন্ত পাঠকবর্গকে সুযোগ দিব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন—দেশের লোক আজ ভুলিতে পারেন না যে, মধ্যবিত্ত সমস্তা এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বিপুল-সংখ্যক মধ্যবিত্ত উদ্বাস্ত সমস্তাই ভারতের এই সমস্তাবহুল রাজ্যের প্রধান সমস্তা। অনেক রাজনৈতিক দল কৃষক-প্রজা-মজদুর, পুঁজিপতি প্রভৃতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু কেহই মধ্যবিত্তের কথা বলিতেছেন না।

ডাঃ রায় বলেন, কিষাণ ও মজদুরের জীবিকার ব্যবস্থা আছে; তাহাদের উপার্জ্জনের পথ আছে। কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের উপায়হীন মধ্যবিত্তের কথা কেহই চিন্তা করেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্ভূত বুদ্ধিজীবীরা যদি খাগ ও আশ্রয় না পান, যদি তাঁহাদের সর্ব্বদাই জীবিকার জন্ত চিন্তিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ জড়বুদ্ধিতে পরিণত হইবেন এবং তাহার ফলে দেশের ক্ষতিই হইবে। সুতরাং এখন হইতেই মধ্যবিত্তদের জন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

ডাঃ রায় বলেন, তিনি এই মধ্যবিত্ত সমস্তা সমাধানের জন্ত একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলকথা হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্ত বসতি স্থাপন করা। তিনি আশা করেন যে, উত্তর কলিকাতা বিদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা দ্বারা যে অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে সেই এলাকার মধ্যে তিনি কয়েকটি মধ্যবিত্ত বসতি স্থাপন করিতে পারিবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রকৃত সমস্তা হইতেছে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী জমির সমস্তা। সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায়, এই রাজ্যের বহু-সংখ্যক চাষীকে বৎসরের প্রায় তিন-চারি মাসের খাদ্য বাজার হইতে কিনিতে হয়। কাজেই এই সমস্ত চাষীকে অন্ত কাজে নিযুক্ত করিবার সমস্তাও আছে। চাষীদের জন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহারকল্পে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি উন্নয়নের দ্বারা চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্ব্বণ্টনের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিবণ্টনের প্রশ্নটি এই রাজ্যে কি পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে তাহার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যে অবস্থিত জমির পরিমাণ খুবই স্বল্প। জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে হিসাব অনুযায়ী অন্ততঃ প্রত্যেক চাষীকে ৫০ বিঘা করিয়া জমি দিতে হয় এবং ঐ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে বহু চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করিতে হয়। কাজেই ইকনমিক হোল্ডিংয়ের ভিত্তিতে জমি পুনর্ব্বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে সরকারকে জমি হইতে উৎখাত চাষীদের বিকল্প বৃত্তিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্য যে সকল রাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে তিনি তাহাদের কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং চাষীদের জীবিকার উপযুক্ত পরিমাণ জমি অথবা বিকল্প বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার সমস্যা তাঁহারা কিভাবে সমাধান করিতে পারেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি সরকার এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আজও পর্য্যন্ত তাহার সমাধানের পথ বাহির করিতে পারেন নাই।

"পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করিয়া দিতে বিশেষ উৎসাহী—একথা আজ আমি বলিতে পারি। জমিদারী বিক্রয়ে তাঁহারা খুব খুশী হইবেন।" তিনি বলেন—কিন্তু জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা চাষীদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা যাইবে কিনা তাহাও সরকারকে এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী রাষ্ট্রীয়করণের প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সাময়িকভাবে তিনি অন্ততঃ জমির ফলন বাড়াইবার একটা উপায় করিয়াছেন। অনেকেই জানে না যে, সরকার গত ৫।৬ বৎসরে সেচ ও উন্নত ধরণের বীজ এবং ভাল সার বিতরণের ক্ষেত্রে সাত কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। জমির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষীদের আর্থিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পথ খুলিয়া দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য ছিল। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার এই নিজস্ব সমাধানের উপায় লইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। খাসমহলের জমি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ তিনি দিয়াছেন।

এই বিবৃতির মধ্যে ডাঃ রায় 'মধ্যবিত্ত' সমস্যাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। দুষ্ট লোক বলিবে যে, আগামী ভোট-যুদ্ধে তাঁহাদের ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি তাহা করিয়াছেন। আমরা মনে করি, মধ্যবিত্তের সমস্যা বঙ্গ-বিভাগ দ্বারা জটিলতর হইয়াছে মাত্র। তাহা গত ৮০।৯০ বৎসরের নানা কার্য্যের ফল। তৎসম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপর প্রদেশবাসীদের মত গ্রাম ছাড়িয়াছিল অভাবের তাড়নায় বা স্বাস্থ্যের অন্বেষণে। এই ব্যাখ্যা সহজে বুঝা যাইবে যদি আমরা মোগল রাজত্বের অবসানের ফল পর্য্যবেক্ষণ করি। আমীর-ওমরাহ, সেনানী-সৈন্য বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে বা পশ্চিমে ইংরেজের কল্যাণে যেসব নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা নগরীতে ও জাহাজঘাটায় এবং রেলওয়ের কর্ম্মীরূপে তাহারা ভিড় করিল। অনুরূপ অভাবের তাড়নায় শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আজ উত্তর-ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রমাণ সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্ততঃ গত এক শত বৎসর হইতে এই দুই অবস্থার দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছিল। কলিকাতার সওদাগরী আপিস, লালদীঘির উত্তর দিকে সরকারী দপ্তর, গঙ্গাতীরে অবস্থিত হাইকোর্টের দৌলতে প্রায় ৫০ বৎসর তাঁহারা একপ্রকার সুখে ও স্বস্তিতে কাটাইয়াছে। আপদ জুটিল ম্যালেরিয়া রূপ ধারণ করিয়া; তাঁহাদের গ্রামছাড়া করিল। স্বাস্থ্যের অন্বেষণে তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন বাংলাদেশের বাহিরে।

একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, সাঁওতাল পরগণা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বাঙালী স্বাস্থ্যান্বেষীরা যে সব বাড়ীঘর করিয়াছিলেন তার মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ৩০।৪০ কোটি টাকা। মনে হয়, বি. এন. রেলওয়ের ষ্টেশন ও উড়িষ্যার বাঙালী বসতি এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। আজ এ সব বাড়ীঘর, সম্পত্তির মূল্য কত তাহা সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সমাজদেহের এই ব্যাপক রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। কেবল 'বসতি' স্থাপন করিলে রোগ দূর হইবে না এবং সরকারী 'বসতি' স্থাপন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তাহা খুব আশাপ্রদ নয়। 'যুগান্তর' পত্রিকায় গত ১৩ই কার্ত্তিকে প্রকাশিত এক পত্রে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের জন্য ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ার 'আর্কাম' কলোনী গড়িয়া উঠিতেছে এবং ইতিমধ্যেই এখানে বহু পরিবার সরকার কর্তৃক নির্ম্মিত দুই কামরাযুক্ত বাড়ী পাইয়া তথায় বসবাসের চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বাড়ী এখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকে বাড়ী পাইবার পর সরকারের নিকট হইতে বাড়ীর অধিকার লইয়া বাস করিবার পরিবর্ত্তে তালা লাগাইয়া বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়াছেন। অনেক বাড়ী এখনও বিলি-বণ্টন করা হয় নাই। বাড়ীগুলি খালি পড়িয়া থাকিবার ফলে, পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদের লোকাভাবে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এই সকল গৃহের

মালিক যে কবে আসিবেন অথবা একেবারেই আসিবেন কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

যাহারা এখানে বসবাস সুরু করিয়াছে, তাহাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় কর্তৃপক্ষ দেখিয়া শুনিয়াও এই সকল অসুবিধা দূর করিবার দিকে মোটেই নজর দেন না। অনেক বাড়ীর সম্মুখে পুরাতন রাস্তা ভাঙিয়া ফেলিবার ফলে যে গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভরাট করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অনেক বাড়ী এত নীচু যে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই জল জমিয়া থাকে।

প্রায় পাঁচ শত পরিবার বসবাস সুরু করিলেও আজ পর্য্যন্ত এখানে পোষ্ট আপিস, স্থায়ী বাজার, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। শোনা যায়, শীঘ্রই স্কুল, বাজার হইবে, টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু কবে যে ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে, তাহা কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। তাহা ছাড়া কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগের অভাবই শহর-পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবার প্রধান অন্তরায়। এখানে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হয় নাই, কাজেই এখানকার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই কলিকাতা মহানগরীতে চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ষ্টেট-বাস সার্ভিস চালু করিয়া অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। কলিকাতা যাতায়াতের সহজ উপায় না থাকাতে বাধ্য হইয়া অনেকের পরিবারবর্গকে এখানে রাখিয়া কলিকাতায় থাকিতে হয়। ফলে, দুই জায়গায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা এই বাজারে যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হইলে তালা-দেওয়া বাড়ীগুলির দরজা খুলিয়া যাইতেও দেরি হইবে না এবং পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনাও তখন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আর একটি অসুবিধা পানীয় জলের। ২০।২৫টি বাড়ীর পর মাত্র একটি করিয়া টিউবওয়েল রাস্তার ধারে বসাইয়া পুনর্ব্বাসন-কর্তৃপক্ষ জলের সমস্যা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে কলোনীবাসীদের যে কিরূপ কষ্টকর অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবেন কিনা সন্দেহ। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য অসুবিধা রহিয়াছে।

এই 'আর্ব্বান' কলোনী দুই বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে...।"

পত্রলেখক নিজের নাম দিলে ভাল করিতেন। তিনি যে সব অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অত্যুক্তি আছে। এই কলোনীবাসী কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন জানি না। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যে পরিবার-পরিজন ছিন্নভিন্ন হইয়া [illegible] আপন-বিমুখ না হইলে 'গভীর গর্ত্ত' বুজিয়া যাইত; তাঁহারা সরকারী কোন বিভাগের দিকে চাহিয়া থাকিতেন না। আমাদের এ সব অক্ষমতা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করি যে, পুনর্ব্বসতি বিভাগ নিজের কর্ত্তব্যপালন করেন নাই। সরকারী লাল ফিতার মধ্যে তাঁহারা যেমন আটকাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বেসরকারী সাহায্যকারীকেও সেই ভাবে জড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া দুঃখ হয় এবং যাঁহারা এই বেড়াজাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার স্পর্দ্ধা করেন, ডাঃ রায় ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁহাদিগকে কৌশলে সরাইয়া দেন। তাহার উদাহরণ—১৯৪৯ সালে ইউরোপে যাইবার পূর্ব্বে খুব ঘটা করিয়া তিনি একটি পুনর্ব্বাসন বিভাগ স্থাপন করেন। তাহার পরিণতি কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা তিনি কখনই এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য ডাঃ রায়ের বিবৃতির মধ্যে আমরা বিশেষ কোন আশার আলোক দেখি না এবং মনে করি যে, কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "কলোনী" বসাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান হইবে না।

ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি করিতে হইবে। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষক যে তিন-চারি মাস কর্ম্মহীন বসিয়া থাকে তাহাদের জন্যও; তবেই বাঙালী সমাজ আত্মস্থ হইবার সুযোগ পাইবে। নানা পরিকল্পনা আছে জানি। ডাঃ রায়েরও একটা থাকিবে না কেন? কিন্তু সে সব পরিকল্পনাকে রূপ দিবে কে বা কাহারা? একজন গুলজারীলাল নন্দ বা একজন বিধানচন্দ্র রায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মত সহস্রবাহু হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না যদি না "ত্রিসপ্ত কোটি ভুজ" এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করে। অনেকেই তাহা করিতে উৎসুক। কিন্তু সরকারী দপ্তরখানার উত্তপ্ত বাতাসে তাঁহারা মুষড়াইয়া পড়েন। ইহা ত বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বাঙালী কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি সত্য। তাহাদের জমি যথেষ্ট নাই; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেককে "৫০ বিঘা করিয়া জমি" দিবার পরিকল্পনা অত্যন্ত অবাস্তব। পাঁচ বিঘা করিয়া দিলে দেশের লোক তাঁহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিবে এবং সেই পরিমাণ জমিও পশ্চিমবঙ্গে আছে কি না তাহা সন্দেহজনক। আমাদের মনে হয় যে, শ্রেণীবিরোধে বিশ্বাস না করিয়াও ডাঃ রায় শ্রেণীবিভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার অদ্ভুত পরিকল্পনাদির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছি। সমগ্র বাঙালী সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় সমাজ নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইবে। অধিবাসী শিল্পবর্গের জন্য গান্ধীজীর সে স্বপ্ন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। সেজন্য "পণ্ডিত" জবাহরলাল নেহরু প্রধানতঃ দায়ী। ডাঃ রায় কখনও গান্ধীনীতি [illegible]

বর্তমান যুগের "বৃহৎ যন্ত্র"—কলকারখানায় বিশ্বাসী। নিজের জীবনে তাহার পরিচয় দিয়াছেন বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাহাদের সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়া। সেইজন্য তিনি "মধ্যবিত্ত" শ্রেণীর সন্তান হইলেও পুঁজিপতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে সদা ব্যগ্র।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে ভারতরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদের একজন—নিজেদের কথা অনুসারে কাজ করিতে পারিতেছেন না এবং গান্ধীনীতি কার্য্যকরী করিতে উৎসাহ পাইতেছেন না। ইহাই পণ্ডিত নেহরু ও ডাঃ রায়ের মত লোকের দুর্ভাগ্য। বর্তমান ভারতের, স্বাধীন ভারতের, নানাবিধ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপাল

নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বন্ধবালা দেবীকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবন আরম্ভ হয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে। কলিকাতা সিটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশ। তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। আমরা মনে করি যে, তাঁহার শিক্ষক-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তাঁহার বিরাট দানের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল মিত্র—এই তিন জন বাঙালী দাতার পরেই ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র "ক্যালকাটা রিভিউ" (মাসিক) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মনে হয় সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নাম প্রকাশ পাইত। সেই সূত্রে সাংবাদিকগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। তাহা মধুর ছিল ও আছে। আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। সাক্ষাৎভাবে তিনি কিছু করিতে না পারিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী ও সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ পরিচালিত হইবেন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

শিক্ষকের কর্তব্য ও শিক্ষকের দুঃখ তিনি বুঝেন। আমরা আশা করি যে, তিনি তাঁহার বৃত্তির সম্মান বর্দ্ধন করিতে সাহায্য করিবেন। শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে যে হা-হুতাশের বন্যা বহিয়াছে তাহা রোধ করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না এ কথা আমরা জানি।

নেপালের মন্ত্রিসভা

মহারাজা শ্রীমোহন শামশের জঙ্গের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তাহা পদত্যাগ করিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে নেপালের অধীশ্বর শ্রীত্রিভুবনদেব শাহ নেপাল কংগ্রেসের নেতা শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালাকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চূড়ান্ত মন্ত্রিসভাও গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী মাতৃকাপ্রসাদকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

কি কারণে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হইল এবং আর এক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল তাহা জানি না। মোহন-মন্ত্রিসভার কংগ্রেস পক্ষীয় সচিববৃন্দ প্রথমাবধি—১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস হইতে—প্রকাশ্যে অভিযোগ করিতেছিলেন যে, রাণাবংশের মন্ত্রিবৃন্দ গণতন্ত্রের বিধানাদি অমান্য করিতেছেন, নানাভাবে প্রাচীন "রাণা-শাসন" ও তাহার কৌশলাদি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। রাণাপক্ষের বক্তব্য আমরা জানিতে পারি নাই। সেইজন্য দুই দলের অভিযোগ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিব না। তবে ইহা জানি যে, নেপালের কংগ্রেস ও রাণাবংশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মন-কষাকষি চলিতেছিল।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সম্পদ লইয়া বিরোধ নেপালে নূতন নয়। প্রায় ২০০ বৎসর রাণাবংশ কি করিয়া রাজবংশকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা জানি। গণ-জাগরণের কল্যাণে এবং রাণাবংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে আজ মহারাজা ত্রিভুবনদেব হৃত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছেন। তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় কয়েকজন রাণাবংশের মন্ত্রীর নাম যাঁহারা কংগ্রেসী তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু হইতে ২১শে কার্ত্তিক যে বার্ত্তা প্রেরিত হয় তাহার মধ্যে আছে এই কয়টি নাম—সুবর্ণ শামশের জঙ্গ, জেনারেল কেশর শামশের জঙ্গ, মেজর-জেনারেল শর্দা শামশের—রাণা বংশের। একজন যেন রাজপরিবারের প্রতিনিধি—শ্রীমহেন্দ্রবিক্রম শাহ। অন্যান্যেরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি কে বা কাহারা তাহা বুঝিতেছি না।

রাণাবংশের শাসনের অবসান হইল। এই বিরাট বিপ্লবে তাহাদের কল্যাণ হউক; নেপালের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই আশা ভারতরাষ্ট্রের সকলেই করিবেন। মহারাজা ত্রিভুবনদেব শাহ নূতন কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজা হইবার শক্তি ও বুদ্ধি তাঁহার কার্য্যকলাপে ফুটিয়া উঠুক, এই প্রার্থনা করিতেছি। কংগ্রেসীদলের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতেছে, বাস্তববুদ্ধির প্রেরণায় তাহা চালিত হউক। তাহা না হইলে ভারতীয় কংগ্রেসের মত তাঁহারা নিন্দাভাজন হইবেন।

রামমোহন রায়

"দেশ" পত্রিকার ১৯শে আশ্বিন সংখ্যায় চিন্তাশীল বাঙালী

লেখক জনাব সৈয়দ মুজতবা আলী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

"তার পর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসায় সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী কোনগতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তার পর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এবং আমাদের পরম রাখার সম্পদ এই বাংলাদেশেই জন্মালেন এক বাঘা পণ্ডিত, এক জবরদস্ত মৌলবী—যিনি কি আল-বীরূনী, কি দারা-শীকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে সত্যশিব-সুন্দর আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যসুন্দরশিবকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফারসী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হিব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে, যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল তাই নয়, সে শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে যে নব নব অভিযানের পথ বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অজকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক্ চর্চা এখনো হয় নি।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন এ কথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিপীড়ন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।"

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধ

এই দুই দেশের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে কেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রাদিতে হইতেছে। আমাদের দেশের মনোভাব অনেকটা "পণ্ডিত" জবাহরলাল নেহরুর সমর্থক। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্রগুলি চায় যে, আমরা তাহাদের কম্যুনিষ্ট-নীতি দ্বারা পরিচালিত হই এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী হইয়া উঠি। মতবাদ সম্বন্ধে কখনও ভারতবাসীর কোন গোঁড়ামি ছিল না, এখনও নাই। সেইজন্যই প্রধানমন্ত্রীর নির্বিরোধী নীতি আমরা সমর্থন করি।

যুক্তরাষ্ট্র এই মনোভাব বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই মনে করে যে, টাকা-পয়সা ধার দিয়া বর্তমান বিজ্ঞানের নানা কৌশলাদি শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে দলভুক্ত করা অধিকতর সহজ হইবে। এই ভ্রম ভাঙিবে কিনা বুঝিতেছি না। আর্থিক সাহায্য দিয়া কোন জাতির মন যে বেশী দিন বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাহার প্রমাণ চীন দেশ। ১৯৪১ সাল হইতে মার্কিন রাষ্ট্র প্রায় দশ-বারো শ' কোটি টাকার দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। তাহার ফলে কি পাইয়াছে আজ তাহা অজানা নয়। মার্কিনী অর্থ ও বিদ্যা-বুদ্ধি চীনদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল; চীনা যুবক-যুবতীকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিল; হার্ভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন, কর্নেল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বৃত্তি দিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। বর্তমান চীনের শাসকবর্গের মধ্যে এক চিয়াংকাই-শেক ও মাও-সে-তুঙ ছাড়া প্রায় সকলেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

এত বড় বিরাট সাহায্যের কথা আজ চীনদেশ ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সংবাদপত্রে যেসব মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয় তাহার ভঙ্গী সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রের ধরন-ধারণ হইতে কম অসংযত নয়।

এই পরিণতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মার্কিন চিন্তানায়কগণ ও শাসক-শ্রেণী বুঝিতেন কেন চীনদেশবাসীরা চটিয়াছেন। মার্কিন জাতি তাঁহাদের স্বার্থ-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দিতেছে না। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে কিছুই করে নাই, এই কথা আমরা মনে করি না। তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, সভ্যতার অভিমান—এই মনোভাবের প্রেরণায় তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে বর্তমান যুগোপযোগী অনেককিছু দিয়াছিল প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। সেইরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পৃথিবীর সকল "অনগ্রসর" দেশে অনুরূপ চেষ্টা করিতেছে এবং মার্কিনী সাংবাদিকেরা নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, এরূপ দানে সকলকে তাঁহাদের অনুগামী করা উচিত। তাহা যে হয় না, এরূপ আশা যে দুরাশা তাহা যদি চীনের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা বুঝিতে না পারেন, তবে আর কিরূপে বুঝিতে পারিবেন ?

সেইজন্য নূতন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোলস্ গত ১৯শে কার্তিকের একটি বিবৃতিতে যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত নূতন পন্থার নির্দেশ করিলে আমরা সুখী হইব। যাহাতে আমাদের "সুপ্রাচীন সংস্কৃতি" নির্বাধে থাকিতে পারে তার জন্যই ভারতরাষ্ট্রের সংখ্যাধিক [illegible]

দুর্নাম বা সুনাম আছে—"শান্ত হিন্দুজাতি" (mild Hindu)—এটম বোমার যুগে এই বিশেষণ সম্মানের নয়। এটম বোমার ভয় হইতে মুক্ত হইবার কৌশল ভারতীয় সংস্কৃতি শিখাইতে পারে—অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লোক কিন্তু এই বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন যখন-তখন। চেষ্টার বোলসের এরূপ কোন ধারণা আছে কিনা জানি না। তিনি অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা ভাবে আমাদের "সুপ্রাচীন সংস্কৃতির" প্রশংসা করিয়াছেন যেমন করিয়াছেন নিজেদের সমাজ ও সভ্যতার।

আমরা এই দুই সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা কদাচ আমেরিকায় হইয়া থাকে। আমরা অনেক প্রচারপত্রিকা পাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের আনুকূল্যে। দুইখানি দৈনিক ইংরেজী ও বাংলা পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার মধ্যে পাই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপের নানা কারণের ব্যাখ্যা এবং দুইখানি পত্রিকারই ভারতীয় লেখক তাহার প্রশংসা করিয়া যে-সব পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিতে হয়। মার্কিন সংস্কৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই দেখি না। এমারসন (Emerson) প্রভৃতি "বোষ্টন ব্রাহ্মণগণ" (Boston Brahmins) হইতে আরম্ভ করিয়া যে আদান-প্রদান চলিয়াছিল রামমোহন রায়ের সময় হইতে, তাহার কোন উল্লেখ দেখি না। অনুরোধ করিয়া ও—দিল্লী নগরীর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়াও, ফল হয় নাই, দুই-এক জন বাঙালী সাংবাদিক এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা রাজনৈতিক আলোচনা করিতে চান নাই। কিন্তু দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং প্রথমে মার্কিন সংস্কৃতির পরিচয় দিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে হয়ত ভারতীয় সংস্কৃতির ভক্তও নিজের কথা বলিতেন।

পরস্পর ভাসা ভাসা প্রশংসা করিলে কোন ফল হয় না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। চেষ্টার বোলস্ তাহা করিতে পারিবেন কি ?

চীন ও ভারতের সম্বন্ধ

সম্প্রতি চীনদেশের পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃতি মিশন ভারত-রাষ্ট্রের নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী নগরীতে এক সভায় (গত ১৩ই কার্ত্তিক) ভারতের পক্ষ হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতি ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডক্টর জাকির হসেন। বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বলেন : "আমাদের ভারতীয়গণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর একটি জাতির, অথচ আমাদের সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র অপেক্ষাও নবীনতর একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে আপনারা এখানে অভিনন্দিত হইতেছেন। তাহা ছাড়া আপনাদের এই ভারত পরিদর্শন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার নূতন যুগের সূচনাস্বরূপ; এজন্য আপনাদিগকে দ্বিগুণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইতেছে।"

এই অভিনন্দনের উত্তরে মিশনের নেতা ডিং সি লিন্ বলেন, "ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দীর্ঘজীবী হউক। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দেশগুলির প্রতিটি লোকের সমৃদ্ধি এবং দেশের নিরাপত্তা কামনা করি। ইহার জন্য চাই উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর করা। ইতিহাস ইহার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিগত দুই বৎসরে আমাদের উভয় দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাই এই দুই দেশের পূর্ব্বোল্লিখিত মৈত্রীর জাজ্বল্যমান প্রমাণ।"

এরূপ শুভ ইচ্ছার মূল্য আছে। কিন্তু তাহা রাজনৈতিক নয়। আমরা বড়াই করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জন্ম, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম আমরা চীনকে দিয়াছি। চীন-দেশের পক্ষ হইতে এই ঋণ অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু চীনদেশীয় নর-নারীর মনে একটা অভিমান আছে যে, তাহারা কেবলমাত্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক-সমষ্টির অধিকারী নয়, তাহাদের দেশ শিল্প-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির অভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে জনসাধারণ অনেককিছু দান করিতে পারে। এক জন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, যে জাতির নরনারী যে-কোন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে পারে, যাহারা যা-তা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে, তাহারা অজেয়।—সেই কথাই এখন প্রমাণিত হইতেছে। ভারতরাষ্ট্র হইতে সংস্কৃতি মিশন চীনদেশে গিয়াছিল। তাহার এক জন সদস্য—শ্রীহাতী সিং যাহা বলিয়াছেন তাহা এই মতের সমর্থক :

"...উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী বিদ্যা জানা না থাকা সত্ত্বেও চীনারা কাজ করিয়া যাইতেছে। চীনের বিরাট জনসম্পদকে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ২০ লক্ষ লোক কোদালি হাতে লইয়া হুয়াই নদীর বন্যানিরোধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় বেকার নাই। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের সহিত অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে। ভূমি-সংস্কারের পর চীন খাদ্যে স্বাবলম্বী হইয়াছে। এখানে নিষ্প্রাণ একতরফা মতবাদের স্থান নাই। কৃষককে আরও ২০ বৎসর ব্যক্তিগত পুঁজির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।

চীনা জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে, সম্মুখে দুর্বৎসর। তবে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করে যে, অতীতের তুলনায় বর্ত্তমান উন্নত। সরকারী অফিসারেরা অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করেন। তাঁহারা বেতন পান না, খাদ্য ও সাধারণ ভাতা

পান। চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং মাত্র ৮ শত টাকা ভাতা লইয়া থাকেন।"

এই উক্তির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

চীন ও ভারতবর্ষের পার্থক্য

নব-প্রকাশিত "নিশান" পত্রিকা এই দুই দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা দিয়াছে তার নিদান অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিতেছেন :

"আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই, চীনের বেলায় অস্বাভাবিক কোন কিছুই হয় নাই। চীন লক্ষ লক্ষ জাতি-দ্রোহীকে বলি দিয়াই আজিকার কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; বুলডজার ও ষ্টীম রোলারের সাহায্যে দেশ পালিশ করিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এখানে তাহা হয় নাই। গান্ধীনীতি অনুসরণ করিয়া বিনা রক্তপাতে আপোষে স্বরাজ আসিয়াছে। তাই মুখে বলিলেও কার্য্যত: একজনও কালো-বাজারী বা জমিদারকে ল্যাম্প-পোষ্টে ফাঁসি দিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেকের জীবন ধন-সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য-মান দিয়া তবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছে, ইনকামট্যাক্স ফাঁকিদাতাকে তাহারা সময় দিয়া দিয়া আপোষে একচল্লিশ কোটি আঠার লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছে। সুতরাং বিপ্লবের পথে চলিয়া দুই বৎসরে চীন যাহা করিয়াছে, গতানুগতিক নিয়মনিষ্ঠার পথে ততখানি অগ্রসর হইতে ভারতের লাগিবে অন্তত: ২০ বৎসর। সুতরাং সম্মুখে শুধুই অন্ধকার।"

এই "আত্মশ্লাঘবকারী পরমোৎসাহ" (রবীন্দ্রনাথ) সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। চীন যে মূল্য দিয়াছে "স্বরাজ" পাইবার জন্য, আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলাম কি? এখনও আছি কি? গান্ধীজী আমাদের প্রকৃতি বুঝিতেন বলিয়াই অহিংসার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে উৎসাহী যাঁহারা তাঁহারা ত নেতাজীকে সাহায্য করেন নাই। করিলে হয়ত তিনি দেশত্যাগ করিতেন না।

তারপর এই চারি বৎসর আমরা কি করিতেছি? সকলেই যে আমরা অহিংসাবাদী, বাক্যে, মনে ও কর্ম্মে অহিংস এমন কথা বলিতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি কোন কালোবাজারীকে নিজ হস্তে শাস্তি দিয়াছেন? একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। যেমন প্রজা তেমন রাজা হয়। জোর করিয়া মানুষকে সৎ করিলে হিটলারের দশা ঘটে। সেইখানেই গান্ধীনীতির শ্রেষ্ঠত্ব।

বস্ত্রশিল্পে ভারত ও জাপান

কয়েক মাস পূর্ব্বে জাপানী বস্ত্রশিল্প পরিচালক সমিতির কোন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—বস্ত্র সম্বন্ধে জাপান এই দাবি করিতে পারে যে, সে বস্ত্র-রপ্তানী জগতে 'এক নম্বর' স্থান অধিকার করে। ইহার প্রত্যুত্তরে সরকারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগের কোন দায়িত্বশীল কর্মচারী বলেন যে, এই কথা সত্য নয়; ভারতরাষ্ট্রই এই দাবি করিতে পারে। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি এই তথ্য উপস্থিত করেন, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে স্থল ও জলপথে প্রায় ১২০০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল; সেই বৎসরে জাপানী হিসাবমতে ঐ দেশ ১০৬৪ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানী করে।

সংখ্যাতত্ত্বের এই যুদ্ধ আমাদের কোন উপকারে আসে না, ভারতের সাধারণ নাগরিক তাহাতে কোন আনন্দ পায় না। সরকারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগ যতই বড়াই করুন, দেশের লোক যখন দেখে যে একখানি ধুতী বা শাড়ী অথবা এক গজ 'মার্কিন' কিনিতে তাহাদের লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং ২।৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর খালি হাতে ফিরিতে হয় তখন জাপান ও ভারতের এই প্রতিযোগিতার সংবাদে তাঁহারা কেবল গালি দিতে পারে অদৃষ্টকে এবং তাহাদের অর্থে পুষ্ট সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বিভাগকে।

ইহার মধ্যে আবার সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে বিজলী-শক্তি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বস্ত্রাভাব, কালোবাজারীর লাভ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণকারীর উপরিপ্রাপ্তি কিছু হইবে। এই একটি মাত্র কারণে নেহরু সরকার তথা কংগ্রেসী সরকার ভোটযুদ্ধে হারিয়া যাইতে পারিতেন যদি দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর না হইত।

ভারতীয় ভাষা-নীতি

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নানা স্থানে ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন। ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই সমস্যা ক্রমশ:ই যেন জটিল হইয়া উঠিতেছে। আদিতে দেবনাগরী ও উর্দ্দু লিপি সম্বন্ধে যে তর্ক ছিল তাহা রহিয়া গিয়াছে। এখন প্রতি রাজ্যের স্থানীয় ভাষা ও লিপি নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। যতই শিক্ষাকেন্দ্রে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া হিন্দী স্বীকৃত হইতেছে, ততই বিক্ষোভ বাড়িতেছে এবং নানাভাবে তাহা রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছে। "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ" ইহার কারণ। আমাদের মনে হয় যে, প্রতি রাজ্যে আগামী ভোট-যুদ্ধে এই বিষয়টি কংগ্রেস শাসনের কলঙ্ক বলিয়া প্রচারিত হইবে।

সেজন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি হইতে সমস্যা সমাধানের একটি উপায়ের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

"প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষার বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে প্রাচীন ও অর্বাচীন সকল প্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার করিয়া তুলিতে হইবে, সকল প্রকার শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যতদূর সাধ্য এই কার্যে সাহায্য করিতে হইবে। বর্তমানে ভাষার যে রূপ ও শব্দসম্পদ আছে তাহারই উপর গঠন করিতে হইবে এবং অন্য সমজাতীয় ভাষা হইতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্পদ গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। ভাষার আদি উৎসে পাওয়া যায় না—অতএব নূতন কথাভঙ্গী বা ব্যাকরণের নূতন কোন কিছু গ্রহণ করিব না, এরূপ শুচিতা-বিলাস ব্যর্থ হইবে। তাহাতে ভাষা সমৃদ্ধ না হইয়া তাহার দৈন্যই বৃদ্ধি পাইবে।

তাহা ছাড়া, দুষ্ট নাও যদি হয় তথাপি এই সকল অনাবশ্যক ব্যাপারে ক্ষয় করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য আমাদের সর্ব-প্রকারে নিজ শক্তি রক্ষা করিয়া তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষার ব্যাপারে শুচিতা রক্ষার চেষ্টার কোন অর্থ নাই, কারণ ভাষা ত ভাবের বাহন, আর কোন শব্দ-প্রতীক যদি কোন ভাবকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে, তবে সেই শব্দ বৈদেশিক কোন ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কোন অঞ্চলের ভাষার বিকাশ সেই দিকেই হওয়া চাই যে-দিকে সেই ভাষা জনসাধারণের নিকট অধিকতর গ্রাহ্য ও বোধগম্য হইবে। ভাষার বিষয়বস্তু, লেখনভঙ্গী ও শব্দসম্পদ সাধারণ লোকের জীবন ও কথনের যত সন্নিকট হয় ততই ভাল। আমি মনে করি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত ভাষাও যদি মানুষের বুকের কাছে পৌঁছে তবেই সম্যক্ উপকার হয়।

আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যাহাতে পরস্পরের সহিত এবং সমগ্র জাতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য আমাদের একটি সাধারণ ভাষা চাই-ই। সম্যক্ বিবেচনার পর বিধান-পরিষদ্ ভারতীয় সংবিধানে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকে ভারতের এই সাধারণ ভাষা বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। ভারত ইউ-নিয়নের সরকারী ব্যাপারে সংখ্যার অঙ্কগুলি হইবে বর্তমানে সর্বভারতে চলিত অঙ্ক।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কোন অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রত্যেক ভাষাগত অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা উচিত—ইহার চেয়ে বেশি কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে যাহাদের ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের কোথাও কোনও কারণে অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।"

ভারতরাষ্ট্রে "জাহাজী" কর্ম্মী

ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায় লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট চিন্তান্বিত হইয়াছেন। এতদিন যে-সব পুঁজিপতি, শেঠ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রভৃতি ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় করিতেন তাঁহারা হঠাৎ "লাভ হয় না" বলিয়া হাত গুটাইতেছেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানী ঘটা করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন বিশাখাপত্তম পোতাশ্রয়ের নিকটে (Vizagapattam Port & Naval Base)। এখন তাহা সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং সংবাদাদি পাঠে মনে হয় যে, গত্যন্তর নাই বলিয়া সরকার তাহা করিতে বাধ্য হইবেন।

কিন্তু এই স্বার্থের লোক ছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ লোক এই জাহাজী ব্যবসায় উপর জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য নির্ভর করে। তাহাদের সংখ্যা অন্তত: ৯০,০০০ হাজার এবং শতকরা ৮০ জন পাকিস্থানী—পূর্ব্ববঙ্গ, সিন্ধুদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবের মুসলমান। একটা পররাষ্ট্রের নাগরিকের হাতে জাহাজী ব্যবসায়ের জীবনমরণের কাঠি রাখিয়া দিবার বিপদ কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবুও বাধ্য হইয়া এই অব্যবস্থা আমাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে। কারণ পাকিস্থানীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা করিতে সময় লাগিবে; এই অভিজ্ঞতা ও কৌশল শিখাইতে সারেঙ্গণ বিলম্ব করিবে।

আমরা জানি যে, বহু হিন্দু যুবক চেষ্টা করিয়া নিজের নানা সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া জাহাজী (খালাসী) হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু "সারেঙ্গের মুখানির" অপকৌশলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহাদের ফিরিতে হয়। সে আজ বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা—বিপ্লবী যুগের কথা। আজ ভারতরাষ্ট্রের অনেক নাগরিক এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু ইহারা মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের সন্তান। তাহাদের শ্রম ও কষ্ট করিবার শক্তি ইহাদের নাই। "সারেঙ্গ মুখানির" অত্যাচার সহ্য করিবার ধৈর্য্য ও প্রবৃত্তি নাই। সেইজন্য কৃষক শ্রেণীভুক্ত পাকিস্থানী খালাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক—পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক কৃষক-শ্রেণী এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের খাওয়া-পরার সংস্কার আর একটা বাধা। অথচ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল রাষ্ট্রের রক্ষাকল্পে নয়, বিরাট উপার্জ্জনের উপায় এই বৃত্তির মধ্যে আছে। তাহার একটা ধারণা পাওয়া যায় গত ২৩শে কার্ত্তিকের এক সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণে। ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে:

"বর্ত্তমানে এক জন নাবিকের মূল বেতন মাত্র ৩৬৲ টাকা। এই আক্রার বাজারে এই টাকায় পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করা অসম্ভব। কাজেই বেতন বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য ভাতাসহ সর্ব্বনিম্ন ১২৫৲ টাকা ধার্য্য করা উচিত।

কর্মচারী নিয়োগের পূর্ব্বে ডাক্তারী পরীক্ষার কোন বাঁধা-ধরা, সুষ্ঠু নীতি এই ব্যাপারে অনুসরণ করা হয় না। প্রত্যেক নাবিককে দুই বার করিয়া বোর্ডের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি সরকার কর্তৃক নবনিযুক্ত বোর্ড, অপরটি জাহাজের কর্তৃপক্ষের তৈরি বোর্ড। আসলে দেখা গিয়াছে, সরকারী বোর্ডের মতামত মালিকের বোর্ড আমল দেয় না। প্রথমোক্ত বোর্ড কাহাকেও কাজের উপযুক্ত ঘোষণা করিলে শেষোক্ত বোর্ড তাহা মানিয়া লয় না।

মোট ৯০ হাজার নাবিকের নাম এই পর্য্যন্ত রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জন পাকিস্থানী এবং বাদ বাকী ভারতীয়। ইহাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ জাহাজের কাজে নিযুক্ত এবং আরও এক-তৃতীয়াংশ কাজের জন্য বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের কোন ভাতা দেওয়া হয় না। বাকী ৩০ হাজার ছুটিতে থাকে। বর্ত্তমানে নাবিকদের দৈনিক প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়।"

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে ৭০।৭২ হাজার পাকিস্থানী নাগরিক কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। সেই অর্থ ভারতরাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনে লাগে না।

ভারতরাষ্ট্রে পাটের চাষ বৃদ্ধি

ইংরেজী সাংবাদিক বাংলাদেশে উৎপাদিত এই দ্রব্যের নাম দিয়াছেন "সোনার তন্তু"। সুতরাং ভারত-বিভাগের পর ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। কারণ পূর্ব্ববঙ্গের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। মানুষের সকল কাজের মত এই প্রচেষ্টার ভাল-মন্দ দুই দিক আছে। তাহাই "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বাণিজ্য-সম্পাদক গত ১৩ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় বলিয়াছেন। শেষ মন্তব্যটির প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আজ পাটচাষের ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা দুই সতীনের মান।—

"প্রথম পূর্ব্বাভাস

জমির পরিমাণ

১৯৫০-৫১	...	১২,২৭,৪৩৫ একর
১৯৫১-৫২	...	১৮,২০,১৮১ „

বৃদ্ধির হার—৪৮·৩%.

"শতকরা ৫০ ভাগ পাটচাষের জমি বৃদ্ধি চাষী, পাটকল-মালিক ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা। পাটের দাম এখন খুবই চড়া এবং ধানচাষে যেমন সরকারী বাধ্যতা-মূলক ফসলের পরিমাণের সংবাদ দেওয়া বা সরকারী দাবি মিটাইবার হাঙ্গামা আছে, পাটচাষে সে সম্ভাবনা নাই, বরং সরকারী উৎসাহ আছে, সুতরাং চাষীর পক্ষে পাট চাষ বৃদ্ধিতে আনন্দ আছে।

পাটকল-মালিকদের আনন্দ—আর পাটের অভাবে কল বন্ধ রাখিতে হইবে না ; যতই মাল উৎপন্ন হউক এবং যে দরই নির্দ্ধারিত করা হউক, ক্রেতার অভাব নাই, সুতরাং লাভের অঙ্ক স্ফীত হইবার সুযোগ উপস্থিত।

গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইবে। পাটজাত দ্রব্যাদির উপর যে হারে শুল্ক বসিয়াছে, তাহাতে এই খাতে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হইতেছে, সুতরাং পাটচাষ বৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আনন্দিত হইবার কথা।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবসায়ী প্রকাশ্য ও তাহা অপেক্ষা অধিক অপ্রকাশ্য লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় পাট সংক্রান্ত ব্যবসা একেবারে তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষের সমতুল।

ভাবিতেছে তাহারা যাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, পয়সার অভাবে সামনে বিক্রয়ার্থ চাউলের স্তূপ দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া অনাহারী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি লইয়া কুটীরে দিন যাপন করে। ধান ফলিলে হয়ত এক সময় বাজারে চাউলের দর কম হইত, এখন ধানের জমিতে পাট ফলিলে যাহারাই লাভবান্ হউক, তাহার অর্থ-সামর্থ্যের মধ্যে চাউল ক্রয় করিবার সম্ভাবনা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে।"

খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী শস্যের মধ্যে কি অনুপাত রাখিলে একটা সামঞ্জস্য থাকে সেটা নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা বা চেষ্টা তো বাংলা-সরকারের নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের তাঁবেদারী করিয়া আর কতদিন চলিবে ?

পশ্চিমবঙ্গ কি ঘাট্‌তি অঞ্চল ?

এই বিতর্ক বহুদিনের ; অন্তত ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে তাহা নানাভাবে আলোচিত হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের বর্ত্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই ঘাট্‌তি-তত্ত্ব প্রচারে বিশেষ উৎসাহী। তাঁর দেখাদেখি তাঁর বিভাগ তথ্য-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করেন। অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীও ঐ পথের পথিক হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। খাদ্যের গুণাগুণ বিচারে তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক ছিলেন। উপরোক্ত প্রশ্ন করিয়া সম্প্রতি তিনি একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

এই বিতর্ক 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় অনেক হইয়াছে। আমরা এই ঘাট্‌তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও বর্ত্তমানে মন্ত্রী শ্রী আর. কে. সিদ্ধ মহাশয়ের মতেও ভারত-রাষ্ট্র খাদ্যবিষয়ে ঘাট্‌তি নয়। তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাণিজ্য-সম্পাদক লিখিত বিশেষ প্রবন্ধ সিদ্ধ মহাশয়ের মতের সমর্থক। ইন্দুবাবুর পুস্তিকা সম্বন্ধে এক সংখ্যাতত্ত্ববিদের মন্তব্য আমরা নিম্নে প্রকাশ

করিতেছি। ইন্দুবাবুর সংখ্যার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :

"১-২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোন মন্তব্য নাই, কারণ এই কয়েকটি পৃষ্ঠাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাবস্থা বুঝাইবার জন্ত ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। ২৫ পৃষ্ঠায় ১৩নং তালিকাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গের ১৫ আউন্স হিসাবে তণ্ডুল খাদ্যের পরিস্থিতি দেখাইয়াছেন। খাদ্যপরিস্থিতি আলোচনা করিতে হইলে মোটামুটি তিনটি জিনিষের সঠিক হিসাব প্রয়োজন—(১) মোট ফসলের পরিমাণ, (২) লোকসংখ্যা, (৩) খাদ্যের হার। এই ভিত্তিতে উপরোক্ত তালিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। লেখক প্রথমেই ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সালের গড়পড়তা উৎপাদন ধরিয়াছেন, ইহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উক্ত পুস্তিকায় ৯নং তালিকাতে পশ্চিমবঙ্গের চাউল উৎপাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় :

পশ্চিম বাংলার চাউল উৎপাদন

(হাজার টন)

১৯৪৬	২৮৯৫
১৯৪৭	৩৬৫৮
১৯৪৮	৩৪৫২
১৯৪৯	৩৩৪০
১৯৫০	৩৫৩৮

যদি কোন বৎসরে অস্বাভাবিক ভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে তাহা হইলে গড় কষিবার সময় তাহা ধরা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ এক বৎসরের সংখ্যা সমস্ত হিসাব সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাইবে। বর্ত্তমান তালিকাতে ১৯৪৬ সালে দেখা যায় যে, উৎপাদন অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক কম, ইহার জন্যই ১৩ নং তালিকাতে মোট চাউলের উৎপাদন পরিমাণ এত কম আসিয়াছে। চাউলের ঘাটতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রতি বৎসরের আমদানী-রপ্তানীর হিসাব লইয়াই করা উচিত, গড় লইয়া হিসাব করিলে তাহার সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয় না। তাহার উপর দেখা যায়, ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ১৬৮৮৩ হাজার টন, অতএব তাহার গড় ৩৩৭৬'৬ হাজার টন, কিন্তু ৯নং তালিকাতে তাহা ৩৩৩০ হাজার টন দেখান হইয়াছে। ১৯৫১ সালের হিসাব অনুযায়ী লোকসংখ্যা ধরা হইয়াছে ২,৪৮,১৪,০০০। লোকসংখ্যার মধ্যে শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে, যাহাদের প্রত্যেকের খাদ্যের হার বিভিন্ন। লেখক যে এখানে ১৫ আউন্স গড় হিসাবে ধরিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। লোকসংখ্যা "population studies" হইতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ত কত খাদ্য প্রয়োজন তাহা হিসাব করিতে হইবে, নচেৎ প্রদেশে খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ নির্ণয় করা মোটেই সম্ভব নয়।"

সংখ্যা বিশ্লেষণের ভুল দেখাইয়াও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মহাশয় মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে ঘাটতি অঞ্চল। বর্ত্তমানে এই তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাই না। "মুরশিদাবাদ সমাচার" নামক "অ-দলীয়" পত্রিকায় গত ১লা আশ্বিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমাদের যুক্তি মোটামুটি সমর্থন করে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যচাষ বিভাগের পক্ষে প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বসুন্ধরা'। ইহার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এক খণ্ড হাতে আসিয়া পড়ে। পাতা খুলিতেই ৫ম পৃষ্ঠায় দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা—পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না ও তাহার নীচে বিভিন্ন ফসলের আবাদের পরিমাণ একর হিসাবে দেওয়া আছে। আমন ধানের আবাদের পরিমাণ ৭৭,৯৫,১১০ একর ; আউশ ধান ১৪,৬৯,৬৩২ একর ; বোরো ধান ৫৪,৭৮৮ একর ও গম ১,০০,৯০৪ একর। প্রতি একরে আমন চাউল ১২ মণ, আউশ ১০ মণ ও বোরো ৭ মণ এবং গম ৯ মণ ধরিলে মোট উৎপন্ন চাউল ও গমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,৯৫,২৯,২৯২ মণ। বর্ত্তমান সেনসাস অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। গড়ে লোকের দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে বৎসরে প্রয়োজন হয় প্রত্যেকের সাড়ে চার মণ সমগ্র প্রদেশের জন্ত বৎসরে ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ মণ চাউল ও গমের প্রয়োজন। দেখা যায়, এ হিসাবে সমগ্র প্রদেশে উদ্বৃত্ত হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মণ। উৎপন্ন চাউল ও গমের অপচয় শতকরা ১০ ভাগ ধরিলেও ঘাটতি হয় না। প্রদত্ত লোকসংখ্যার হিসাবের মধ্যে ২ বৎসর বা অনধিক বয়স্ক শিশু রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও প্রায় ৫০ হাজার হইবে। মোট লোকসংখ্যা হইতে ইহাদের বাদ দিলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও আড়াই লক্ষ মণ বেশী হয়। ভুট্টা, যব ও জোয়ার আবাদের পরিমাণ ৫,২৫,৩৪৪ একর ; মসুর ১৯৮,২৮৫ একর। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বাঞ্চল নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে জোয়া, যব ও মসুরের 'মিশলা' রুটি খাওয়ার প্রচলন আছে। এই ৫ লক্ষ বিঘা জমি হইতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের সরবরাহ ধরা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট না ভরার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা, সরকারী কর্ম্মচারীদের অনেকের অসাধুতা এবং মহাজন ও জোতদার প্রভৃতির অতি লোভ ও চোরাকারবারই এই দেশব্যাপী অনটন ও অভাবের জন্ত দায়ী···।"

যে সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মহাশয়ের মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তিনিও বলেন, "খাদ্য ঘাটতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অব্যবস্থা সমভাবে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশন নীতি, পরিদর্শকের অনিয়মানুবর্ত্তিতা ও

অসাধুতা খাদ্য-পরিস্থিতির জটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। লেখক বর্তমান পুস্তিকাতে তাহা সম্পূর্ণ আলোচনার বাহিরে রাখিয়াছেন। আমার ধারণা এই সমস্ত বিষয় আলোচনা না করিলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।"

আমরা খাদ্য-বিভাগের উত্তরের প্রত্যাশায় আছি। কারণ ইন্দুবাবু তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট" প্রবন্ধটির প্রতিও আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

'বাঁকুড়া-দর্পণ' পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সকলের জানিয়া রাখা প্রয়োজন :

"বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, দেশের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ অরণ্যাবৃত থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগের ১৪ শতাংশ মাত্র অরণ্যাবৃত এবং এই বনভূমি দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বনভূমিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) সরকার-সংরক্ষিত বনভূমি এবং (২) ব্যক্তিগত বনভূমি। সমগ্র বনভূমির মোট আয়তন ২৪,৬৯,৬৮০ একর (৩,৮৫৯ বর্গমাইল) এবং ইহার মধ্যে সরকার-সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন ১৬,৯৭,০৬৮ একর (সমগ্র স্থলভাগের ৯.৭ শতাংশ মাত্র) ও ব্যক্তিগত বনভূমির আয়তন ৭,৭২,৬১২ একর (স্থলভাগের ৪.৩ শতাংশ মাত্র)। নিম্নে ইহাদের জেলাগত বণ্টন দেওয়া হইল :

শ্রেণী বিভাগ (Types of forest)

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—(১) পত্র-পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest), (২) পার্ব্বত্য অরণ্য (Hill forest) এবং (৩) উপকূলীয় অরণ্য (Tidal or Littoral forest)।

(১) পত্র-পতনশীল বা পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest)—শাল, সেগুন, লোহাকাঠ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ এই বনের বৈশিষ্ট্য। মূল্যবান আসবাবপত্র ও যানবাহনাদি প্রস্তুত করিতে এই সকল পর্ণমোচী বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হয় বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের পশ্চিমাংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বর্তমান।

পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ শিল্প—বিশেষতঃ কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্প—বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই প্রদেশে বনভূমির গুরুত্ব অত্যধিক। সুতরাং এই বনভূমির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সরকার এবং জনসাধারণের কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। সুখের বিষয়, সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বনবিভাগের পর সরকারী বনবিভাগ ৫,১২৪ একর জমিতে পরিকল্পনানুযায়ী বৃক্ষোৎপাদন করিয়াছেন এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর বনভূমির পরিমাণ ৮,০০০ একরে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি সমগ্র ভারতব্যাপী যে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু বৃক্ষোৎপাদনে উৎসাহদানের জন্য বাঁকুড়া জেলায় তিনটি নার্স'রি স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল নার্স'রি হইতে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের এক লক্ষ চারা গাছ স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।"

বনমালী খাল

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সক্রিয় পরীক্ষাগার হইয়া আছে। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের অর্থ ও চেষ্টা এই প্রসিদ্ধির মূলে বর্তমান। সেই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের কর্ম্মিগণও ঐ অঞ্চলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বনমালী ঘোষ তাঁহার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য স্থানীয় লোক নূতন করিয়া একটি খালের নামকরণ করিয়াছেন। সেই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া "গ্রামের ডাক" পত্রিকা নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :

"ডাঃ ঘোষ সিঙ্গুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মধারাকে সরকারী ফাইল দপ্তরে বদ্ধজলা হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রামসেবার খাতে প্রবাহিত করার স্বপ্ন লইয়া শহরের আরামপ্রদ চাকুরী ছাড়িয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সিঙ্গুর অঞ্চলে তাঁহার কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সে স্বপ্ন তিনি বহুলাংশে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন শতাধিক গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা রচনা করিয়া তদনুযায়ী যে কর্ম্মপ্রবাহের সৃষ্টি তিনি করিয়াছিলেন তাহা সাধারণভাবে যে কোনো সরকারী কর্মচারীর চরিত্রে একান্ত দুর্লভ। গ্রামকে ভালবাসিয়া, গ্রামের মানুষকে আপন করিয়া এবং গ্রামের মানুষের আপন হইয়া তিনি কাজ করিতেন। সরকারী দীর্ঘসূত্রতা, জড় মনোভাব ও শাসকের অভিমান সম্পূর্ণভাবে বাতিয়া তিনি গ্রামের মাটির সন্তান হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে কর্ম্মী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের লইয়া, গ্রাম্য স্বাস্থ্যকমিটি গঠন করিয়া, নিজে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখিয়া সরকারী পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

ডাঃ ঘোষের ছিল সত্যিকারের গ্রামমুখী মনোভাব। কর্ম্মীদের সহিত নিজহাতে কাজ করিয়া, বিশ্রামের ফাঁকে খবরের কাগজ পাতিয়া মুড়ি-ছোলার জলযোগ করিয়া আপনভোলার মত গ্রামের কাজ করিয়াছেন। গ্রামের পথের ধুলায়

পরিবারের পোশাক খারাপ হইবার সংকোচ তাঁহার ছিল না, শাসকের মিথ্যা আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইবার ভয় তাঁহার ছিল না, গ্রামের রোগক্লিষ্ট অবহেলিত মানুষজন হইতে কৃত্রিম পার্থক্য বজায় রাখিবার কষ্টকল্পিত প্রয়াস তাঁহার দেখা যায় নাই। সাধারণ প্যাণ্ট-কোটের আড়ালেও যে একজন গ্রামিক মানুষের মন বাস করিতে পারে, তাহা বুঝিতে কাহারও এতটুকু কষ্ট হইত না। তিনি যে একজন পরাধীন যুগের সরকারী কর্মচারী, তাহা কেহই মনে করিবার সুযোগ পাইত না।

'গ্রামের কথা'র নিয়মিত পাঠকপাঠিকাবৃন্দ সিঙ্গুর অঞ্চলের টুঁটাখালী, চুলকাটী নামে প্রায় হাজার বিঘা পরিমাণ হাজা-মজা-ডুবো জমির কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। এই ডুবো মাঠের জল নিকাশের সুযোগ না পাইয়া মাঠের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত সরস্বতী নদীতে না পড়িয়া মাঠেই জমা হইয়া থাকিত এবং বহু কৃষকের সোনালী স্বপ্নকে আঘাতের পর আঘাতে চুরমার করিয়া দিত। বিশ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে একবার এই মাঠের সংস্কারের চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহা আদৌ ফলপ্রদ হয় নাই। ডাঃ ঘোষ উক্ত মাঠ দুইটির জলনিকাশ করিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং স্থানীয় কর্ম্মীদের এই কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। তিনি পরলোকে; নতুবা দেখিয়া তীব্র আনন্দ বোধ করিতেন যে, স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদের নেতৃত্বে, জাতীয় সরকারের সাহায্যে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় মাঠ দুইটির মজা খাল সংস্কার করা হইয়াছে, ডুবো জমিতে ফসল ফলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দ তাঁহার স্বর্গত মহান্ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার ও তাঁহার কর্ম্মময় পল্লীপ্রাণ জীবনধারাকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য টুঁটাখালী-চুলকাটী মাঠের নব সংস্কৃত খালের নামকরণ তাঁহার নামানুসারে করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সত্যিকারের কর্ম্মীমনের পরিচয় দিয়াছেন।"

পরাজিত বাংলা

এই মাসের একখানি ৪১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। লেখক এক জন সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সাত বৎসর কাজ করিয়া (পেশোয়ার হইতে ইম্ফল পর্য্যন্ত) তিনি কাজে ইস্তফা দিয়াছেন এবং পরাজিতের মনোভাব লইয়া বইখানি লিখিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না ইহা কিরূপ শিক্ষা যাহা যোদ্ধাকে এমন ভাবে মানসিক জরাগ্রস্ত করে।

এই পুস্তিকা আজকালকার দ্বিধা-বিহ্বল বাঙালী মনের পরিচয় দেয়। সেইজন্য লেখকের মনোভাবের সঙ্গে ১৩-১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "ছাত্রকর্ম্মী"র মনোভাবের সাদৃশ্য নাই। এই কর্ম্মী "খুব বেশী মাত্রায় আশাবাদী"। তিনি বলেন—"নৈরাশ্য ছড়ানোর চেয়ে যুক্তিহীন আশাবাদকেও আমি ভাল মনে করি...।"

তার পর আমরা দেখা পাই—মনঃপূত অভয় ব্রহ্মচারীর। তিনি খুলনার অধিবাসী। 'সাধক'—পরাজিত বাংলার সাধক। পিরোজপুরের আলতাফ মিঞার সঙ্গে শ্যামবাজারে হঠাৎ দেখা। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—"আমার স্বদেশ আমার বিদেশ হয়ে গেল...ঈশা খাঁ আলিবর্দির জাত আপন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে করাচীর দাসত্ব মেনে নিল।..." এই হইল চুনীবাবুর "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার"। সুতরাং তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবেন, এই ভরসা আমরা করিতে পারি। তখন "পরাজিত বাংলা" লেখার জন্য লজ্জিত হইবেন।

জনশিক্ষা

সরকারের জনশিক্ষা বিভাগ সরকারী চালে এই শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। তার জন্য মাত্র একটি বিভাগ পুষিবার নিমিত্ত তিন-চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ—রামকৃষ্ণ মিশন, নারীশিক্ষা সমিতি, সরোজনলিনী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বয়স্কশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—তাহার দশ গুণ কাজ করিতেছে। অবশ্য সরকারপক্ষ বৎসরে দু' হাজার হইতে বার হাজার টাকা সাহায্যবাবদ দিতেছেন। তাহার মোট পরিমাণ সরকারী বিভাগ পুষিবার ব্যয়ের পরিমাণ হইতে অনেক কম। সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণ না পাইয়াও আমরা এই কথা বলিতেছি।

সরকারী চাল যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি। সেইজন্য ১৯৪৯ সাল হইতে আমরা বলিতেছি যে, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহার উপর এই ভার দেওয়া হউক। পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে দেখা যাইত যে, তাঁহারা এই শিক্ষার বিস্তার করিতে পারেন কিনা যেমন করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়টি বয়স্ক শিক্ষা কমিটিতে আলোচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সভ্য ভয়ে তাহা গ্রহণ করেন নাই এ সংবাদ পাইয়াছিলাম। ভয়ের কারণ এই যে, এই নূতন ব্রত গ্রহণ করিতে বেসরকারী লোক কেহ আগাইয়া আসিবেন না। অথচ তাঁহারা জানিতেন যে সরকারের বহু পূর্ব্বে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের ক্ষুদ্র অর্থশক্তি অনুসারে জনশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। আজ যখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, জনশিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ হইতে পারে না তখন এই শিক্ষার ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দিলে সঙ্গত হইত।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘ

গত ১৯১৯ সালে 'লীগ অব নেশনস'-এর সহযোগী স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের উদ্ভব।

ভের্সাইয়ের সন্ধি ও অন্যান্য শান্তিচুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহার মূল নিয়ম-কানুনগুলি রচিত।

কর্ত্তব্য

সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে সত্যিকারের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা করাই আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের লক্ষ্য। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্ত এই প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত কার্য্যধারা গ্রহণের চেষ্টা করে :

১। কার্য্য-সময় নির্দ্ধারণ (সারাদিনের ও সপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য-সময় স্থির করাও এর অন্তর্গত);

২। শ্রমিক যোগান এবং বেকার সমস্যা প্রতিরোধ;

৩। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্ত প্রয়োজনীয় উপার্জ্জন;

৪। অসুস্থতা, রোগ ও কার্য্যকালে আঘাতপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের রক্ষা করা;

৫। নারী, শিশু ও যুবকদের রক্ষা করা;

৬। আহত ও বৃদ্ধদের জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭। নিজ দেশের বাহিরে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা;

৮। একই কাজের জন্ত একরূপ পারিশ্রমিক দেবার নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা;

৯। সঙ্ঘবদ্ধতার স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া;

১০। কারিগরী ও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

১৯৪৪ সালে ফিলাডেলফিয়ার অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের এক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, জাতি-ধর্ম্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ও সম্মানজনক ভাবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাজে এবং আর্থিক নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এই ঘোষণা পরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সংযোজিত হয়। এই ঘোষণার আরও বলা হয় : শ্রম কোন পণ্য নয়, স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও সঙ্ঘবদ্ধতা উন্নতির সহায়ক। কোন স্থানের দারিদ্র্য প্রত্যেক সমৃদ্ধ স্থানের বিপদ সৃষ্টি করে এবং অভাবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া অমিত বিক্রমের সঙ্গে কাজ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নীতি হওয়া উচিত। এই ঘোষণায় সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন মানিয়া লইয়া পৃথিবীব্যাপী এক ব্যাপক কর্ম্ম-তালিকা গ্রহণ ও তাহা রূপায়িত করার জন্ত নিয়রূপ কাজ করিয়া যাওয়ার কথাও স্বীকার করা হয় :

১। পূর্ণ কর্ম্ম সংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা;

২। কর্ম্মী তার নৈপুণ্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এমন জীবিকা সংস্থান;

৩। শ্রম শিক্ষা ও শ্রম বদল করার সুযোগ রাখার ব্যবস্থা করা;

৪। মজুরীর নীতি, সময় ও সকলের উন্নতির সহায়ক কাজকর্ম্মের ন্যায়সঙ্গত সর্ত্ত এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সর্ব্বনিম্ন মজুরী;

৫। উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত কার্য্য পরিচালন ব্যাপারে সহযোগিতার স্বীকৃতি;

৬। সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;

৭। প্রত্যেক বৃত্তির শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা;

৮। শিশুকল্যাণ ও প্রসূতিদের রক্ষা ব্যবস্থা;

৯। পুষ্টিকর খাত, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসগৃহ এবং সাংস্কৃতিক ও আমোদ-প্রমোদের সর্ব্বরকম সুযোগ-সুবিধা দান;

১০। পুঁথিগত ও কারিগরী শিক্ষা ব্যাপারে সমান সুযোগ দান।

এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসঙ্ঘ শ্রমিক, পরিচালক ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল সভ্যের জন্ত সর্ব্বনিম্ন মান স্থির করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রধান সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুই প্রবল শক্তির মধ্যে পড়িয়া ব্রিটেনের কি দশা হইবে, তৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ চিন্তানায়কেরা পর্য্যন্ত ভাবিত হইতেছেন। গত অক্টোবর মাসের "এম্পায়ার রিভিউ" পত্রিকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে দার্শনিক ডক্টর জোয়াডের একটি বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, "পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পূর্ব্বে রাশিয়ার বৃহৎ জাঁতাকলের (great mill-stones) মধ্যে পড়িয়া আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইব—যুদ্ধ ক্ষেত্রে যতটা নয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ভাসাইয়া দিয়াছে তাহার ছায়াচিত্র, তাহার বেতার বক্তৃতা, তাহার খাতশস্য ও বিলাস দ্রব্যের বন্যার দ্বারা।" ইহার ফলে "ব্রিটিশ যুবক-যুবতী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিবে; তাহার উপর আছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়।" এই মনোভাব রোধ করিতে যিনি বা যে দল পারিবেন, এই পরাজিতের মনোভাব রূপান্তরিত করিতে পারিবেন, তাঁহারাই হইবেন নব-ব্রিটেনের স্রষ্টা। ৭৬ বৎসর বয়সে উইনষ্টন চার্চ্চিল এই দুরূহ কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছেন আর আমাদের দেশে ৭০।৭১ বৎসর বয়সে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, বিত্তশালী লোক ভোট-যুদ্ধে নামিতে সাহস পান না। এ পার্থক্য কেন জন্মিয়াছে? এই নিস্পৃহভাবের সঙ্গে মায়াবাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি? স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবনকথা অনুধাবন করিয়া তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

ঋণশোধ উপলক্ষে দরকষাকষি

যুদ্ধের সময়ে ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে সকল সমর-সরঞ্জামাদি দিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনখানি বরফভাঙ্গা জাহাজও ছিল। উহার মধ্যে দুইখানি ফেরত দেওয়া হইবে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়াছে। আগামী মাসে জার্মানীর অন্তর্গত ব্রেমারহ্যাভেন নামক বন্দরে জাহাজ দুইখানি ফেরত দেওয়া হইবে।

জাহাজ দুইখানির নাম 'নর্থ উইণ্ড' ও 'ওয়েষ্ট উইণ্ড'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের উত্তরে রাশিয়া কয়েকবার জানাইয়াছিল যে, জাহাজ দুইখানি ল্যাপল্যাণ্ড সমুদ্রে বরফে আটক পড়িয়াছে। ১৯৪৪ সালে উত্তর মহাসাগরের তুষারাবৃত প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এই তিনখানি জাহাজ দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় জাহাজখানি ইতিপূর্ব্বেই ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে আমেরিকা কর্তৃক রাশিয়াকে প্রদত্ত যে সকল দ্রব্য যুদ্ধের পরেও অবশিষ্ট ছিল এবং যাহা শান্তিকালীন কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা ফেরত চাহে এবং তাহা লইয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলে। বরফভাঙ্গা জাহাজ কয়খানি ছাড়াও চুক্তি অনুসারে আমেরিকা রাশিয়াকে আরও ৬৭২ খানি জাহাজ ও অন্যান্য প্রকারের জলযান প্রদান করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলিও ফেরত চাহিয়াছে।

ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করে তাহার মোট মূল্য হইবে ১০৮০ কোটি ডলার (প্রায় ৫ টাকায় এক ডলার)। যুদ্ধের পরে শান্তিকালীন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ যে সকল দ্রব্য রাশিয়ার ছিল তাহার মূল্য বাবদ ৮০ কোটি ডলার ও ঐ জাহাজগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেরত চাহে; এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দ্রব্যাদির সঙ্গত মূল্য বলিয়া আমেরিকা যে পরিমাণ অর্থ দাবি করিয়াছে রুশ প্রতিনিধিগণ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই।

ইরাণ ও মিশর

এই দুইটি রাষ্ট্র লইয়া পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছেন। ইহা বুঝিবার জন্য পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশরাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার উত্তরাধিকারী রূপে দেখা দিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ইংরেজ তার স্বগোত্র উত্তরাধিকারীকে হিংসা ও ভয় করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্ত্তী সোভিয়েটকে ভয় করে। কিন্তু তার স্বগোত্রকে হাঁটিয়া ফেলিতে পারিতেছে না, কারণ দুর্ব্বল ব্রিটেনের বুদ্ধিবল ও অভিজ্ঞতা এখনও তার কাজে লাগিবে—এই আশায় সে ইরাণ ও মিশরের সদ্যজাগ্রত ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে আমল দিতেছে না। সোভিয়েট রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধের সুযোগ লইতেছে।

ইহাই হইল বাহ্যিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণ। ইরাণ ইংরেজের হাত হইতে তার তৈল মুক্ত করিতে চায়। বর্ত্তমান শাহের পিতা রেজা শা পহ্লবী চাপ দিয়া ইংরেজ তৈল কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিশক্তির বলে ও কৌশলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাষ্ট্র এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই অপমানের স্মৃতি ইরাণী নরনারী ভুলে নাই।

মিশরের বিবাদ ইংরেজের সঙ্গে। ১৮৮২ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজের দাপট নীল নদের তটভূমির অধিবাসী সহ্য করিয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে মিশর "স্বাধীন রাষ্ট্র" বলিয়া ঘোষিত হয়। এই অনুগ্রহ-প্রদত্ত স্বাধীনতা মিশরের আত্মসম্মানে আঘাত করে। অন্যান্য কারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক ছিল মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি। সেই সৈন্যবাহিনী আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহারা সুয়েজ খালের তীরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে সরিতে চাহিতেছে না।

কেন—তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার জন্য নূতন ভাবে জোট পাকাইতেছে। এই আয়োজন-উদ্যোগে যোগদান করিবার জন্য তুরস্ক ও আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী নিমন্ত্রিত হইতেছে। মিশর দর-কষাকষি করিতেছে নিজের বিশেষ স্বার্থের প্রয়োজনে। অন্য আরব রাষ্ট্রগুলি তাহাকে পূর্ণ সমর্থন করিতেছে না। বাহিরের দর্শক আমরা মিশরের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে যোগ দিতে পারি না। বিশেষ করিয়া সুদান দেশের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্ক্ষায় আমাদের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। সুদানের জনসংখ্যার মধ্যে হাবশীরা সংখ্যাগুরু। তাহারা মিশরের প্রভুত্ব চায় না। এই অবস্থায় ইংরেজ এক নূতন সুযোগ পাইয়াছে। তাহারা হাবশী জাতির স্বাধীনতার রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং রাষ্ট্রপুঞ্জ-পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশন উপলক্ষে প্যারিস হইতে অনেক মুখরোচক সংবাদ পাওয়া যাইবে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আপোষের চেষ্টা হইবে নিশ্চয়। তার ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও, ভারতের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ সামগ্রিক শান্তি ছাড়া এই অঞ্চলে আমাদের কোন স্বার্থ নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের প্রাধান্য বিশেষ কিছু নূতন কথা নহে। বাংলা দেশের বহু শিক্ষকই রেমণ্টের *Principles of Education* নামক পুস্তকে বহুকাল পূর্ব হইতেই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন:

Incessant activity is a law of the child's being, and the first requisite of a wise system of control is that this activity should be directed into desirable channels.

ডিউই, ব্যালার্ড, এবট, উড প্রভৃতি শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মনীতির অপরিহার্যতা বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকেরাও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে এই সত্য একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি যখন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকা হইতে হাতের কাজ, সেলাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বর্জন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল তখন ব্রিটিশ সরকার এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন:

There are strong objections to the omission of these subjects from the course. The three R's are only a means to an end. To attempt nothing more than Reading, Writing and Reckoning would create a dislike in the mind of the child for other works which would be sufficient to combat in later years.

প্রকৃত পক্ষে শিশুশিক্ষায় কাজের নীতি (activity) বহুকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্মিগণ সেই নীতিকেই ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন।

কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষায় দৈশিক কর্মের উপর অর্থাৎ হাতের কাজের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কর্মপ্রধান অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক ততটা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যধারার বিশিষ্ট ধারক ডাক্তার কুমারাপ্পা লিখিয়াছেন:

The whole of basic education was founded on and woven round work for the young, work for the adult and work for the old; work developed human personality and when they neglected it they sank to the level of life that sustained on violence.

ইহার সহজ অর্থ হইল এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মই হইতেছে একমাত্র মুখ্য বস্তু এবং এই কর্মের 'by-product' বা অনুসিদ্ধান্ত রূপে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার অতিরিক্ত আর কিছু শিক্ষণীয়ও নয়, গ্রহণীয়ও নয়। আর সকলই একান্ত গৌণ। শিক্ষণীয় যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই হাতের কাজের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে, কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া আর একমাত্র কাজের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা এক কথা নয়। এবট অথবা উড, ডিউই অথবা ব্যালার্ড হাতেকলমের কাজকে শিশু-বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু শুধু হাতেকলমের কাজকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত খুব সুস্পষ্ট নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের দাবি স্বীকৃত হওয়ার পর ইংলণ্ডের সাফোকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে, চিলিতে, গুয়াতিমালায়, অষ্ট্রেলিয়ার ট্যাসমানিয়া ও ভিক্টোরিয়ায় 'এরিয়া স্কুল' নামে যে সকল আদর্শ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে সেগুলির সকল ক্ষেত্রেই গ্রাম্য শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই শুধু শিল্প বা হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নাই। তবে বুনিয়াদি শিক্ষায় অন্ততঃ নীতিগতভাবে তাহাই করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনার সমর্থনে বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। কিন্তু যাঁহারা এই নূতন বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রবর্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুনিয়াদি শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের অনেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু তথাপি মনে হয়, তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষার সমর্থনে যে সকল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই একদেশদর্শী এবং ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

কাজ করা শিশুজীবনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি, সুতরাং কাজকে কেন্দ্র করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ হইবে। এই যুক্তি বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু কাজ বলিতে যখন শুধু হাতেকলমের কাজকেই বুঝান হইয়া থাকে তখনই যুক্তিটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। শিশুর কর্মপ্রাচুর্যের পশ্চাতে শৈশব হইতেই যে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এমন কি বিশেষ এক প্রকারের

মানসিক শক্তি অনবরত কাজ করিয়া থাকে, এই মনস্তত্ত্বটুকুকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন ; শারীরিক ক্রিয়ার মত মানসিক ক্রিয়াও যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির একটি অঙ্গ একথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

বুলার সাহেব তাঁহার *From Birth to Maturity* বইয়ে শিশুদের ক্রিয়ার যে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, দেড় বৎসর বয়স হইতে শিশুর পৈশিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শিশুর পৈশিক কার্যকলাপের এই পর্যায় ছয় বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময় সে ইটের ঘর, কাঠের পুল, কাগজের নৌকা এবং আরও কত কি বস্তু তৈয়ার করে। ইঁটের ঘর যখন সে তৈয়ার করিতে বসে তখন প্রতিদিনকার দেখা ঘরের একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠে। সেই অস্পষ্ট ছবি হইতেই সে ঠিক করিয়া লয় কোন্ ইঁটখানার উপর কোথায় কি ভাবে অপর একখানা ইঁট রাখিলে তাহার পৈশিক ক্রিয়ার ফলটি তাহার মানসছবির অনুরূপ হইয়া উঠিবে। এই সময়কার শিশুজীবনের অধিকাংশ পৈশিক কর্মই এইরূপ কোন-না-কোন মানসিক ছবি ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ চিন্তা বা কল্পনার ফল। এই সময় হইতেই শিশুর মানস-ক্রিয়ার উদ্ভব হয় ; লক্ষ্যহীন পৈশিক বিক্ষেপ ক্রমশঃ লোপ পায়। অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য তাহার পৈশিক ক্রিয়াকে সচেতন করিয়া তোলে। পৈশিক চাঞ্চল্য শিশুর পক্ষে যতখানি স্বতঃস্ফূর্ত, এই মানসিক ক্রিয়াও তাহার পক্ষে ততখানি স্বাভাবিক। হাতের কাজ যদি শিশুশিক্ষায় মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে হয় তাহা হইলে এই মনের কাজও তাহার পক্ষে মনস্তত্ত্ববহির্ভূত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া হেয় হইতে পারে না। এ যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজ তথা শারীর-ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করায় এক প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মনের কাজকে উপেক্ষা করিলে শিক্ষায় অপর একপ্রকারের দোষ বর্তিবে। এই উভয়বিধ কর্মকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ আপাততঃ যতই সুষ্ঠু ও সুন্দর হউক কালক্রমে ইহার ভিতরে পুনরায় পঙ্গুত্ব দেখা দিবে। পৈশিক ক্রিয়ার জন্য যেমন হাতের কাজের প্রয়োজন, মানসিক শিক্ষার জন্যও সেইরূপ বিশ্বের জ্ঞানী ও গুণী লোকদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার আবশ্যক। এইখানেই শিক্ষাকে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষায় হাতের কাজের মত ইহাও অপরিহার্য।

মনস্তাত্ত্বিকগণ বলেন, শিশুর মধ্যে প্রচুর সহজাত শক্তি (instinctive energy) রহিয়াছে। শিশুর কাজের মধ্য দিয়া তাহাই স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশলাভ করে। এই কাজ যাহাতে সমাজ-পরিপন্থী বা অসামাজিক না হইয়া সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় তাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হওয়াই মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু কাজের যে একটা মানসিক দিকও আছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পৈশিক কর্ম বা হাতের কাজই শুধু শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। জীবনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির তুলনায় মানসিক কর্মও শিশুর কাছে কম প্রয়োজনীয় নহে। ১৯৩৭ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শ্রীযুত অনাথনাথ বসু বলিয়াছেন :

Contemplative gratification (of instinct) is relatively passive in as much as it utilises other people's experiences in a second hand manner.

কিন্তু অপর লোকের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে বলিয়াই কর্মশক্তির মানসিক তৃপ্তি যে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গৌণ বস্তু মাত্র এবং পৈশিক কর্মের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা স্বীকার করিতে কষ্ট হয়। প্রাক্তন অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে কাজে লাগাইবার যোগ্যতাই সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। উৎপাদনমূলক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও এইরূপ অভিজ্ঞতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে না পারিলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তুলা কতখানি পিঁজিয়া লইলে উহার পাঁজ করা যায় তাহা ঠিক করিয়া লইবার জন্য অপরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। নচেৎ উপযুক্ত পাঁজ তৈরি হওয়ার পূর্বে প্রচুর পরিমাণ তুলার অযথা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং পুনঃপুনঃ ব্যর্থতার দীনতা শিক্ষার্থীর মনে গভীর বিতৃষ্ণাও হয়ত সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে। তাই হাতের কাজ করিতেও অপরের অভিজ্ঞতাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় এবং অপরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করারই নাম পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা। ইহা "অগ্রাহ্যম্" এবং "অপেয়ম্" কোন অবান্তর বস্তু নহে।

আবার কতকগুলি সহজাত বৃত্তি রহিয়াছে যাহা শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়া, শুধু স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া আদৌ পরিপুষ্ট বা পরিত্যক্ত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। আনুগত্য, বিরক্তি, সঙ্গলিপ্সা, আবেদন, সহানুভূতি, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আনন্দ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তিকে সমাজহিতকর করিয়া তুলিতে হইলে মুখ্যতঃ যে বস্তুটির সহায়তা প্রয়োজন তাহা হইল মন। শিক্ষক এতৎসম্বন্ধীয় বহুজনলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কতখানি আবেগময় করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিলে শিক্ষার্থীর অনুভবশক্তি প্রতিক্রিয়া-চঞ্চল হইয়া উঠিবে—তাহারই উপর এই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ ("sublimation")নির্ভর করিবে।

অপরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীর মন এখানে গৌণ ত নহেই বরঞ্চ অত্যন্ত প্রধান।

শিশুর স্বভাব আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণাত্মক শিশু-প্রকৃতির সঙ্গে বহির্জগতের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহার ফলে শিশুমনে একপ্রকার অপরাধ-বোধের সঞ্চার হয়। এই অপরাধবোধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে শিশু-মন বৃদ্ধির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজ শিশুর এই অপরাধ-বোধ বা দুঃখ-বোধের লাঘব করিয়া মনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি পূরণ করিয়া দেয়। শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন :

Constructive work gratifies one of the deepest needs of child.—namely the needs of restitution.

কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ একমাত্র হাতের কাজের মধ্য দিয়াই হয় না। যে শিশু অন্যায় করিয়া তাহার ছোট বোনটিকে ব্যথা দিয়াছে তাহাকে যদি দশটি অঙ্ক করিতে বা দুইটি জ্যামিতিক কূট সমাধান করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলেও অন্যায় করিবার ফলস্বরূপ তাহার মনে যে অপরাধ-বোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনেকখানি লাঘব হয়। অবশ্য হাতের কাজের বা পৈশিক কর্মের ক্রিয়া এই ব্যাপারে গভীরতর এবং ত্বরিৎফলপ্রসূ।

কিন্তু অপরাধ-বোধ ও তজ্জনিত অনুশোচনাকে পরিপূর্ণ ভাবে মন হইতে ঝাড়িয়া-মুছিয়া ফেলিবার নীতিটি সামাজিক মনের সুস্থ গঠনের পক্ষে সহায়ক কিনা সেকথা ভাবিবার আজ সময় আসিয়াছে। অতিরিক্ত অপরাধ-বোধ মনের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করিয়া মনকে বিকার-গ্রস্ত করে ইহা যেমন সত্য, অপরাধ-বোধের ঐকান্তিক অভাব, অপরাধের প্রতি অপরাধীর ঘৃণা হ্রাস করিয়া দিয়া তাহার মনের অপরাধপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় ইহাও তেমনই সত্য। দেখা গিয়াছে, যাহারা দিনের অধিকাংশ সময় কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে তাহারা নিঃসংকোচে যে পরিমাণ অপরাধ করিতে পারে অপর লোকেরা ততটা নিঃসংকোচে তাহা পারে না। ইহার মনস্তাত্ত্বিক কারণ এই যে, নিরন্তর পৈশিক কর্ম তাহাদের অপরাধ-বোধ লোপ করিয়া দেয় এবং তাহাদের কার্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অপরের যতই ক্ষতি হউক অথবা নীতির মানদণ্ড যতই অবনমিত হউক তৎপ্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠে। সুতরাং অপরাধ-বোধ হইতে মানুষকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষার মাধ্যমে করা উচিত হইবে কিনা সেই বিষয়ে আজ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় পৈশিক কর্মের আতিশয্য আছে। ইহার ফলে মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জন করিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে নিঃসংকোচ অপরাধপ্রবণতাও নৃশংস ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আতিশয্যে পৃথিবীর মানুষ কর্মঠ, লাভজনক, উৎপাদনবহুল অথচ হৃদয়হীন একটি বৃহৎ যন্ত্রে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। আধুনিক জগতে যে সকল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা উল্লেখ-যোগ্য। রাশিয়া সম্পর্কে নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টকর। কিন্তু আমেরিকা যে ক্রমশঃ একটি নিয়মনিষ্ঠ প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ আছে। বহু পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতে মিসেস্ ম্যানিং বলিয়াছেন, আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, কিন্তু তাহার হৃদয় নাই। এই পরিণতির জন্য হাতের কাজের প্রাচুর্য কতখানি দায়ী তাহা ভাবিবার অবকাশ আমেরিকা-বাসীদের জীবনে আজ দেখা দিয়াছে। তাই জীবনযাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন শিল্পশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমেরিকা যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনযাপনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। আজ সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বোধ করিতেছে মানবতার ক্ষুধা।

আধুনিককালে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই মহীশূরে অনুষ্ঠিত ১৯৪৮ সনের সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি রামস্বামী মুদালিয়ার এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আজ যদি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি এই অশোভন পক্ষপাতিত্ব হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সুদীর্ঘ পদ্ধতির মধ্যে যে দানবীয় মনোভাবের সৃষ্টি হইবে তাহা আমাদের সমগ্র সভ্যতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে। একদা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিদেশী বর্বরদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসের দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই স্কন্ধে আসিয়া বর্তিবে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ রবার্ট হাচিন্‌স্ সত্যই বলিয়াছেন:

Other civilisations were destroyed by barbarians from without we creed our own.

বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষা এবং যে-জন্য শিক্ষা, এই দুইটি বস্তু নাকি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। ইহার ফলে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, শিক্ষা প্রীতিপ্রদ এবং সহজ হয়। যে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদের ধারণা

অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মনে হইবে, নচেৎ মানব-জীবনের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করিতে হইবে। কাপড় বোনা বা অনুরূপ দুই-তিনটি হাতের কাজই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে শিক্ষায় বর্তমান পৃথিবীর সার্থক মানুষ তৈয়ার হইবে কিনা সন্দেহ। মাধ্যম রূপে নির্ধারিত কর্মকে শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিলে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভব হইলেও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর আকর্ষণ বেশী। তাহার ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য উহার প্রতি তীব্রতর হয়। ইহার একটি কারণ এই যে, কর্ম শিশুর সহজাত শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ-মাত্র। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, কর্ম অর্থ শুধু হাতের কাজই নহে; কর্মের একটা মানসিক দিকও রহিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষ্য শিক্ষার সমগ্র লক্ষ্যের একটি দিক মাত্র; সমগ্র লক্ষ্য নহে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত লক্ষ্য চোখের সম্মুখে অহরহঃ সুস্পষ্ট থাকিলে দৈনন্দিন একঘেয়ে কর্মতালিকার মধ্যেও উৎসাহ এবং আগ্রহের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পথটি যদি সুদীর্ঘ হইয়া উঠে তাহা হইলে লক্ষ্য যতই না সুনির্দিষ্ট হউক, পথ চলাটা শিশুর পক্ষে কৌতূহল ও উৎসাহ-জনক না হইয়া একান্তভাবে যান্ত্রিক হইয়া যাইবে এবং কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক বুনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে। সুস্পষ্ট লক্ষ্যের গেরো যখন ছিঁড়িয়া যায় তখন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কর্মও একঘেয়ে হইয়া উঠে। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে ইহার আর তখন বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ঠাকুর-পূজা যখন দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে পরিণত হয় তখন ঐ পবিত্র কর্মটির প্রতি সাধারণ মানুষের না থাকে নিষ্ঠা না থাকে অন্তরের গভীরতা। তখন বেতনভুক্ পুরোহিতের উপর এই ভারটি ন্যস্ত করিয়া দিতে সে উৎসুক হয়। তুলার পাঁজ করা যখন বহুদিন ধরিয়া দৈনন্দিন কাজে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ কাজ করার মধ্য দিয়া যখন শিশুকে প্রত্যহ একই প্রকারের কড়াকিয়া, সেরকিয়া প্রভৃতি শিখিয়া লইতে হয় তখন তাহার ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ বজায় রাখিতে কোনও প্রকার নূতন প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ শিশুরা ভালবাসে, ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু একই কাজ পুনঃ পুনঃ করিতে বা একাদিক্রমে বহুদিন ব্যাপিয়া করিতে শিশু বিতৃষ্ণা অনুভব করে। ইহাও মনস্তাত্ত্বিক সত্য। বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তি শুধু পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষারই প্রাপ্য নহে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে কোনও শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক ও সুখকর হইবে কিনা তাহা শিক্ষাপদ্ধতির উপর যত না নির্ভর করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষাপদ্ধতিটি মাটির ঢেলা মাত্র। কুম্ভকারের কৃতিত্বানুযায়ী তাহা হইতে ভয়ঙ্কর দানবও নির্মিত হইতে পারে আবার কোলে-তুলিয়া-লওয়া কোমল পেলব লক্ষ্মীরও সৃষ্টি হইতে পারে। পদ্ধতিটা করণ কারক। শিক্ষকই প্রকৃত কর্তা।

শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের প্রচলন অপরিহার্য। শিক্ষাকে সকল দিক দিয়া সুন্দর ও মঙ্গলময় করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পৈশিক কর্মকে একটা বিশেষ স্থান দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু হাতের কাজ বা পৈশিক কর্মের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার যে পরিকল্পনা তাহা ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে পুরাপুরি কল্যাণকর হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার যে সকল দোষত্রুটি রহিয়াছে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও তাহা হইতে মুক্ত নহে। ইহার একটি মানুষকে যন্ত্র-দানবে পরিণত করিবে, অপরটি মানুষকে সমাজ জীবন-যাপনে একান্ত অনুপযুক্ত একটি জীবে রূপান্তরিত করিবে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই মাত্র শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। হাতের কাজ ও মনের কাজের মধ্যে এমন সঙ্গতি রাখিতে হইবে যেন একের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া অপরের গুরুত্বকে হ্রাস করা না হয়। পুস্তককেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক এই উভয়বিধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষাকে মুখ্য এবং অতীতের বহুজনলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাকে গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমরা হয়ত আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার সংস্পর্শ হারাইয়া এমন একটি স্তরে গিয়া পৌছিব যেখান হইতে ইউরোপ ও আমেরিকা সভয়ে পশ্চাৎপদ হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

ভারত-মহিমা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ধন্য আমি এ পুণ্য-বিশাল
ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি আমি
পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি
আমি করি তর্পণ,
করি যে সর্ব্বকর্ম্মের ফল
শ্রীহরিরে অর্পণ,
মধু রাত্রিন্দিব।
গোটা ভারতের আরতি করিয়া
জ্বলে মোর গৃহদীপ।

২

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি
শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ পরশে নিত্য
সে অপাপবিদ্ধ।
এখানে বৃথায় অপ-শক্তির
দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিবে
বাসুকী নাড়িলে মাথা।
নাহি কোনো ভয় নাহি।
জ্বালামুখী-শিখা সর্ব্বারিষ্ট
সর্ব্বদর্প দাহী।

৩

মন্দির ভাঙি উপলখণ্ড
যাহারা গিয়াছে লয়ে,
সে দেশ সে জাতি রহিবে না। সে য
যাবে আপনার হয়ে।
শ্রদ্ধা তাদের থাক্ বা না থাক্
না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে
শিবের প্রতিষ্ঠা।
অশেষ কষ্ট সহি'
বিফলে তাহারা পাষাণের ভার
লয়ে যায় নাই বহি।

৪

ভারতের ধনরত্ন লইয়া
যাহারা করিছে ফেরী,
ক্ষতি কিছু নাই বিনিময়ে তারা
হয়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্ত নদীর বন্যার জল
প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির
প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী,
হরণ করেছে, বরণ করিতে
করিবে না বেশী দেরী

৫

আনন্দ মোর কতই নিবিড়
কি বিপুল হর্ষ,
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু
এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া, কাশী, আমি অযোধ্যা
পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর,
সোমনাথ পত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি,
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি
আমার গোত্রপতি।

৬

ভারত-তনয় অমৃতপুত্র
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্যবাহিনী গঙ্গা আমাকে
আদরে অঙ্কে লয়।
হোক ইউরোপ, হোক আফ্রিকা
হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিতার অগ্নি যেখানে
সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ
হয়ে যাবে সেই ঠাঁই।

পিতৃস্নেহ ও তার স্বরূপ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

মানুষের মন সীমাহীন গহন অরণ্যের মতই রহস্যময়; কোথায় এর আরম্ভ আর কোথায়ই-বা এর শেষ কিছুই বুঝবার উপায় নাই। এ অরণ্যের ভিতর সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না, কাজেই স্পষ্ট করে কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়। শুধু অন্তঃসন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের নিজের মনের যে অংশটুকু দেখা যায় তা অবলম্বন করেই মানুষ অপরের মনঃপ্রকৃতি সম্বন্ধেও অনুমান করে নেয়। নিজের মনের উপর আত্মানুসন্ধানের আলো ফেলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানব-মনের কত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের খোঁজখবর সংগ্রহ করেন। মানুষের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণের উৎস সন্ধান করতে গেলে মনের নিবিড় গহনে প্রবেশ করতে হবে। যে নদী আমাদের ঘরের কাছ দিয়ে কুলুকুলু স্বরে বয়ে যায়, তার উৎস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে বহু দূরের তুষারক্ষেত্রে; যে শতদল জলের উপর পাপড়ি বিকাশ করে সৌরভে বাতাস মন্থর করে দেয়, তার মূল খুঁজতে হবে জলের তলায়, মাটির নীচে। তেমনি আমাদের আচরণও অদৃশ্য সংযোগসূত্রে মনের বিভিন্ন ভাব-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-নৈরাশ্য, কল্পনা-বাসনার যে ভাব-বুদ্বুদ নিরন্তর মনের তলায় আলোড়ন তুলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ মানুষের আচরণে। এই ভাব-কামনাগুলির তীব্রতা কমবেশী থাকলেও সকল মানুষের মানসক্ষেত্রেই এগুলি বিরাজ করে। তাই আমরা নিজের মন দিয়ে অপরের মন বুঝতে পারি, নিজের ভাবাবেগের অনুভূতি থেকে অনুরূপ অবস্থায় অপরের ভাবাবেগ কিরূপ হতে পারে তা অনুমান করে নিই। এ অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হয় এইজন্য যে, মনের মৌলিক উপাদানগুলি সকলেরই এক; একই রূপ সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রক্ষোভ বা ভাবাবেগ (emotion) মনের গভীরে থেকে মানুষকে নানা আচরণে উদ্বুদ্ধ করছে। এদের স্বরূপ বুঝতে পারলে জীবের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞাননেত্র খুলে যায়; তখন অন্যের মনের গহনেও সে আলোকপাত করতে পারে।

স্নেহের উৎস কোথায়

সন্তানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি, জীবের রক্তের সঙ্গে এ মিশে আছে। অপত্যস্নেহ জীব-মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যে এই সন্তানবাৎসল্য এমন মাত্রায় দিয়েছেন যাতে তারা সন্তান-সন্ততি বাঁচিয়ে রেখে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে পশুমাত্রেই সন্তান পালন করে। যাদের পালনীশক্তি কম তাদের সন্ততির সংখ্যা দেখা যায় প্রচুর। মাছ-ব্যাঙ প্রভৃতি নিম্ন স্তরের প্রাণীর অসংখ্য ডিম হয়—এক-একটি মাছ বা ব্যাঙের ডিমের পরিমাণ হবে কয়েক কোটি! এদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা এরা করে, কিন্তু এই সংগ্রাম-সঙ্কুল জীব-জগতে বেঁচে থাকা বা শৈশব পার হয়ে আসা অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষেই সম্ভব হয়। ইতর প্রাণীদের জগতে দেখা যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীজাতীয়দের মধ্যেই বেশী প্রবল। জনকের কবল থেকে সন্তানদের বাঁচাতে জননী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শিশুসন্তান নিয়ে সে কিছু-কাল লুকিয়ে কাটায়—প্রাণিজগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সন্তানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জীবের সত্তায় মেশানো রয়েছে; বাইরে থেকে এ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে হয় না। সন্তানের জন্ম হলে স্বাভাবিক নিয়মে জনক-জননীর মনে এর স্ফুরণ ঘটে। তখন সন্তানকে অবলম্বন করেই এই আদিম প্রবৃত্তি একটি নূতন রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। সন্তানলাভের পূর্বে অপত্যস্নেহ পুরুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও একথা খাটে, তবে তাদের মন স্বভাবতঃই কোমল বলে এদিকে প্রবণতা বেশী এবং সন্তানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে সন্তানকে কোলে পাবার আগে থেকেই বাৎসল্যরসে তাদের মন স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে।

অপত্যস্নেহ মাতৃহৃদয়ে কতকগুলি প্রবল প্রেরণা জাগিয়ে তোলে; তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল সন্তানকে রক্ষা করার তীব্র বাসনা ও উদ্যম। অসহায় কচি শিশুটি যেন তাঁরই দেহমনের একটি অংশ, যেন তাঁরই অভিনব সৃষ্টি। এটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, স্তন্যপান করিয়ে তাঁর পরিতৃপ্তি। স্তন্য-পায়ী শিশুটি একান্তভাবে যে তাঁর উপরই নির্ভরশীল এ ভাব নিজের অজ্ঞাতসারেই জননীর মনে গর্বমিশ্রিত পুলক-শিহরণ সঞ্চার করে। সন্তান সুশ্রী, কি কুৎসিত, সুঠাম কি অঙ্গহীন এ সব বিচার করে মাতৃস্নেহ কম বা বেশী উৎসারিত হয় না। জননীর স্নেহকাজল মাখানো চোখে সন্তানমাত্রেই অপূর্বসুন্দর দেবদূত; এদের মঙ্গলকামনাই তাঁর অন্তরের নিত্যকার জপমন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে

সন্তানের প্রতি নির্মল উদার আশীর্বাদ শুনতে পাই কবির কথায়—পুত্রনামা আত্মা অসি ত্বং জীব শরদাং শতম্। তুমি আমার আত্মা, পুত্ররূপ ধরে এসেছ; তুমি শতবর্ষজীবী হও।

পিতৃস্নেহের বৈশিষ্ট্য

সন্তান যখন অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে থাকে তখন ক্রমে ক্রমে তার উপর মাতৃস্নেহ কমে আসে। জীব-জগতের এই নিয়ম। শিশু স্বাবলম্বী হয়, তাকে পালন করার, রক্ষা করার দায়িত্ব আর জননীর উপর থাকে না। সুস্থ সবল আত্মনির্ভরশীল সন্তান অপেক্ষা দুর্বল, রুগ্ন, আত্মশক্তিহীনের প্রতিই মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃ প্রবলতর ভাবে প্রবাহিত হয়।

পিতৃস্নেহের স্বরূপ কতকটা ভিন্ন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে দেখে তার প্রতি জনকের মমতার উদ্রেক হয় সত্য, কিন্তু তা জননীর স্নেহের মত এত প্রবল এবং সক্রিয় নয়। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পিতার স্নেহ তাকে অবলম্বন করে দানা বেঁধে উঠতে থাকে; পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই কামনার মধ্যে দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটে—নিঃস্বার্থ ভাবে পুত্রের কল্যাণ কামনা ও আত্ম-অহমিকা পরিতৃপ্তির কামনা। পিতৃস্নেহের মধ্যে এই দুইটি কামনা এমন ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে যায় যে, পিতা ক্রমে পুত্রকে নিজ থেকে অভিন্ন করে ভাবতে থাকেন। পুরুষ কারও কাছেই পরাজিত হতে চায় না; তথাপি পিতা পুত্রের কাছে পরাজয় কামনা করেন, তার কারণ পুত্র বিজয়ী হলে সে বিজয়গৌরব তার নিজেরই। পুত্রের গুণগরিমার জন্য তিনি যেমন আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, তার দোষত্রুটি এবং পরাজয়ের গ্লানিও তাঁর বুকে সমান ভাবে বাজে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন:

> . . . whatever is admitable about it (child) brings satisfaction to his (father's) positive self-feeling; whatever is defective humbles him, excites his negative self-feeling; its shame or disgrace is his shame, its triumphs are his triumphs.—William McDougall: *Social Psychology*, p. 143.

অর্থাৎ, সন্তানের মধ্যে যা-কিছু প্রশংসনীয় তা পিতার মনে আত্মগৌরবের সন্তোষ আনে, সন্তানের দোষত্রুটি তাঁর আত্মশ্লাঘাকে হীন করে; সন্তানের লজ্জা ও অপমান তাঁর পক্ষে লজ্জা ও অপমান, সন্তানের সাফল্যে তাঁর সাফল্য।

পুত্রকে অবলম্বন করে পিতৃস্নেহ এবং পিতৃহৃদয়ের বাসনা মূর্ত হতে চায়; প্রয়োজন হলে পুত্রের সঙ্গে একই দুঃখসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুত্রের সমদুঃখভাগী হতেও পিতা কুণ্ঠিত নন। রহস্যময় মনোজগতের এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রের বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনন্যকরণীয় ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কপটদ্যূতে রাজ্যলাভ করে দুর্যোধন পিতাকে প্রণাম করতে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মৃদু তিরস্কারে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বনবাসে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন:

> হায় বৎস অভিমানী। পিতৃস্নেহ মোর
> কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি সুকঠোর
> সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ।
> অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
> এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর
> এত স্নেহ।...
> মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা
> দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা
> অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
> চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
> চলিয়াছি।...
>
> আসন্ন বিপদে
> কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ় করে
> ভয়ঙ্কর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
> বায়ুবেগে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
> ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
> উল্কার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—
> ... ...
> কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর
> শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
> আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
> আর বিধাতার শাপ আর নহে কেহ।

(গান্ধারীর আবেদন—"রবীন্দ্র-রচনাবলী", ৫ম খণ্ড; পৃ. ৭১)

ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়তঃ রাজ্যের অধিকারী হয়েও শুধু অন্ধের বিকলতার জন্য সিংহাসন থেকে বঞ্চিত। তাঁর রাজ্য-লোভাতুর অন্তরের চিরবঞ্চিত কামনা পুত্রের সাফল্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। দুর্যোধন এই অন্ধ পিতার রুদ্ধ কামনারই মূর্ত বিগ্রহ; পিতা এবং পুত্র এদিক দিয়ে অভিন্ন।

গান্ধারী যখন ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে পাপী দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে আবেদন জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন:

> পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
> তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
> একমাত্র, উন্মত্ত তরঙ্গ-মাঝখানে
> যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
> ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
> তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
> তারি সাথে এক সাথে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
> এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি

অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধ ফল ভোগ করি তার ভুল ভির;
সেই তো সান্ত্বনা মোর,—

পিতা যখন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে পুত্রকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকেন তখন থেকে পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ঘনীভূত হতে থাকে। পুত্রের সার্থক আত্মবিকাশে তাঁর চেষ্টা, উদ্যম, স্বার্থত্যাগ তাঁকে নিবিড় ভাবে পুত্রমুখী করে তোলে। তিনি যেন কোন একটি বড় ব্যবসায়ে তিলে তিলে মূলধন নিয়োজিত করছেন। এর সাফল্য পিতাকে যেমন আনন্দিত করে তেমন আর করবে কাকে ? তেমনি এর ব্যর্থতার বেদনা পিতার চেয়ে আর কারো বুকে এত নিদারুণ হয়ে বাজে না।

শিক্ষক হিসাবে পিতা

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি—কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—পিতা নিজ সন্তানের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। এর কারণ এ নয় যে, তিনি সন্তানের শিক্ষায় উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ। আসল কারণ বরং এর বিপরীত। তিনি কামনা করেন তাঁর সন্তান দ্রুত সকল বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠুক—পুত্রের সাফল্যে তাঁর অহং ভাব হয় পরিতৃপ্ত। সন্তান তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে পিতার অহংবোধ আহত হয়; তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে বিষয়টি তাঁর কাছে এত সহজ সেটি সন্তান কেন বোঝে না এবং এটুকু বুঝতে না পারলে সে কি করে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করবে এ চিন্তা তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই মনের আকাশে ঝিলিক দিয়ে যায়; অধীর হয়ে তিনি ছেলের বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দেন আর না হয় মারমুখো হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ পিতার সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; সন্তানের মঙ্গলের জন্য যিনি অতিমাত্রায় আগ্রহী তাঁর পক্ষে আরও বেশী প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে সন্তান যদি মোটামুটি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তো পিতা মনে করতে পারেন, তাঁর পুত্রের মত বুদ্ধিমান শিশু খুব কমই আছে। তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পুত্র যদি পিতার এই মনোভাবের আভাস পায় তবে সেও মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠতে থাকে। এতে ফল ভাল হয় না। স্নেহ ও শাসন এ দুটির মধ্যে মধুর এবং সুসমঞ্জস মিলন সাধিত না হলে সক্রিয় পিতৃস্নেহ অনেক সময় মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের অমঙ্গলই সাধন করে বেশী। পুত্রের কল্যাণকামী পিতাকে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।*

* শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে" শীর্ষক প্রবন্ধের ক্রমানুবর্তন।

স্মরণীয়

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

স্মরিয়া আজিকে আপনার মনে তোমার নামটি প্রিয়,
পেয়েছি তাহার অমিয় মাধুরী সুন্দর রমণীয়;
তুমি কাছে নাই, দূরে চলে গেছ, তবু ত তোমার লাগি,
আপনার মনে তোমারেই ডাকি, তোমারি বিরহে জাগি।

আকাশে যে তারা জাগিয়া সেদিন দেখেছিল অনিমিখে,
মোদের দেহের কানায় কানায় সুধার পাত্রটিকে,
আজি রজনীতে খুঁজিতেছি বৃথা, কোথাও না পাই তারে,
ছায়াপথ ছাড়ি, অতল সুনীলে, ডুবায়েছে আপনারে।

আমার কুঞ্জ-কাননে সেদিন যে ফুল ফুটিয়াছিল,
মোদের মিলন-সুরভির রেণু বাহারা লুটিয়া নিল,
তোমার আমার প্রেম-পারিজাত বেসেছিল যারা ভালো;
তারা আজি হায় স্পর্শ আমার ব্যথার বিষেতে কালো।

আমার বুকের 'পরেতে যখন সেদিন আছিলে তুমি,
অণু পরমাণু হয়েছিল লয় অঙ্গে অঙ্গে চুমি';
অতনু সে প্রেম উছসি উঠিছে তোমার নামেতে প্রিয়,
লুকায়েছে তারা, শুকায়েছে ফুল, তবু তুমি স্মরণীয়।

বাঁশী

শ্রীতারাপদ রাহা

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমনই যেন হয়ে গেল। মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। বাসটা আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে থামল। বুকের মাঝে অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া একটা পুরানো বেদনা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল : একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার সুর, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখ আর চেহারা। সাতাশ আটাশ বড়জোর ত্রিশ বৎসর বয়সের এক যুবক, কপালে ছোট একটা কাটার দাগ, কাঁধে ঝুলান একটা থলে ভরতি নানা সাইজের নানা রকমের বাঁশী। বিক্রী করতে এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু বিক্রীর কথা তার মনেও নেই। আশে পাশে তার যেসব লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—তাদের মাঝে ক্রেতা লোক দু'চার জন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাদের দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না একবার—চক্ষু মুদ্রিত করে দেহের উর্দ্ধাঙ্গে ভাবের তরঙ্গ উৎক্ষেপ করে সে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে।

বাঁশীওয়ালারা পথে কতই ত বাঁশী বাজিয়ে থাকে, কিন্তু কৈ মনটা ত ঠিক এমনি করে ওঠে না! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী, তাই বলে কি? না, তাও নয় : বংশীবদন কত বাঙালীরই ত বাঁশী শুনেছি, মনটাকে এমনি করে আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিতপ্রায় করে তুলতে পারে নি ত কেউ, তা ছাড়া শিল্পকে ছেড়ে প্রাদেশিকতাকে বড় করে দেখবার মত মন ত আমার নয়।

চক্ষু দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনা বোধ করছিলাম। এই সব অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই মন বিচার করে চলেছিল কেন এমন হ'ল, এ কি? হঠাৎ মনে হ'ল, এই সুরটা—সুরটারই এই গুণ। ছেলেবেলায় একটু-আধটু সঙ্গীত-চর্চ্চা করেছিলাম, বুঝতে কষ্ট হ'ল না লোকটা আশোয়ারী বাজাচ্ছে, হাঁ ঠিকই, আশোয়ারী নইলে মনকে এমনি উদাস করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে আর কোন সুর পারে? কিন্তু আশোয়ারীও ত আরও কত শুনেছি—কত বড় বড় ওস্তাদের মুখে, মনটা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়ে নি ত কোনদিন!

আরও ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করলাম। হাঁ, আশোয়ারীর সঙ্গে আরও কি যেন মেশানো রয়েছে, ঠিক যে কি ধরতে পারছিলাম না, তবে আছে, তাতেই সুর বুঝি এত মধুর হয়ে উঠেছে। হয়ত এ ছাড়া আরও কিছু আছে : শিল্পীর হৃদয়, তার তন্ময়তা অথবা তার নিজের মনের গোপন কোন ব্যথা, হয়ত এও সব নয়, এ ছাড়া আরও কোন কিছু যার ঠিক সন্ধান পাচ্ছি না আমি—

বাস ষ্টার্ট দিলে। চলতে সুরু করলে বাস। নিজের বয়সকে শত ধিক্কার দিলাম মনে মনে : কিশোর বা যৌবনের প্রথম দিক হলে এই ডবল ডেকারের উপর থেকে খটাখট শব্দ করে এক দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে বাঁশীওয়ালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম!

বাঁশীর সুর ক্রমে আমার শ্রবণের আয়ত্তের বাইরে হয়ে গেল, কিন্তু মনের মাঝে সে তখনও তরঙ্গ তুলছে। সেদিন রাত্রে শুয়ে কারও সাথে একটি কথা বলতে পারি নি—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারি নি।

এর পর থেকে মহানগরীর পথে ট্রামে-বাসে যেতে বাঁশীর সুর কানে গেলেই লোকটাকে খুঁজি। সুর শোনার পর অবশ্য আর লোক খোঁজার প্রয়োজন থাকে না, কারণ মন জানে ও সুর শুধু একজনের বাঁশী থেকেই বেরুতে পারে। ভাগ্যচক্রে আর একদিনও বাসে আসতেই লোকটার দেখা মিলল। দূর থেকে বাঁশীর সুর কানে যেতেই বুঝতে পেরেছিলাম—এ সেই! বাঁশীতে বাজছিল সেদিন পুরিয়া, রাত্রি আটটার কাছাকাছি মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্সের নূতন-কেনা বাড়ীটার সামনে। যাত্রীতে ডবল ডেকার ঠাসা, বেশিক্ষণ দাঁড়াল না বাস। তা ছাড়া প্রথম দিনের মত অতটা শিহরণও জাগে নি মনে। বাঁশীওয়ালা অতটা আত্মহারা হয়ে বাজাচ্ছে না সেদিন, বিক্রীর দিকে বেশ খানিকটা মন রাখতে হয়েছে তার। বেশ একটু রাগ হচ্ছিল লোকটার উপর, কিন্তু তখনই বিচারবুদ্ধি এসে মনকে ধমক দিলে : খেতে হবে না ওর—রোজগার না করে কেবলি তোমায় বাঁশী শোনাবে।

বাসে আসতে আসতে আমি বেশ উপলব্ধি করলাম—বাঁশী শুনে লোকটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, আরও বুঝলাম প্রেমের দ্বিতীয় স্পর্শ প্রথম স্পর্শের মত অত মারাত্মক নয়!

আমার এই নূতন ম্যাগনেটটিকে আরও দু'দিন পথে দেখলাম বাঁশী বাজাতে নয়—বিক্রী করতে। বাজনা হয়ত একটু আগে শেষ হয়ে গেছে, সেটা সম্ভবত: ওর পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। শিল্পীকে ব্যবসায়ীর মূর্ত্তিতে কল্পনা করতে স্পর্শকাতর মন নারাজ হয়ে ওঠে, তবু লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ একেবারে যায় না।

একদিন রাত্রি দশটার কাছাকাছি—গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকেই ওর বাঁশী শুনছিলাম—সেদিন বেহাগ বাজাচ্ছিল। বাস মোড়ে থামতেই ওর বাজনা থেমে গেল: কে একজন বাঁশীর দর-দস্তুর করছে। সুতরাং বাস থেকে নেমে আমিও যন্ত্র-চালিতের মত এগিয়ে গেলাম কাছে। ক্রেতাকে দরদস্তুর করতে দেখে ও মৃদু হেসে বললে, এক দামে বিক্রী ভাই, এই সময় কি দর-কষাকষি করবার ফুরসৎ পাবেন আপনারা?

এই কথাগুলির মাঝে লোকটার শিক্ষা ও রুচির যেন বেশ খানিকটা পরিচয় পেলাম আমি। হাসিটাও বড় মধুর, দাঁতগুলিও সুবিন্যস্ত ঝকঝকে। লোকটিকে এত কাছে পেয়ে কথা বলার আগে তার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে একবার দ্রুত চোখ বুলাবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। চেহারাটা এমন কিছু কন্দর্পের মত নয়—তবে সুন্দর। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, আর শিল্পপ্রতিভার জৌলুস। গায়ের রংটা হয়ত একদিন ফরসাই ছিল, কিন্তু এখন তামাটে। মাথায় চুল ঘন এবং অনেক দিন কাঁচি পড়ে নি—তাই একটু দীর্ঘ, অবিন্যস্ত। এসব দিকে তার খেয়াল আছে বলেই মনে হয় না।

যে ছেলেটি বাঁশী দর করছিল সে পাঁচ সিকে দিয়ে একটা 'বি-ফ্লুট' কিনে নিয়ে চলে গেল। এর পরই আমার পালা। একটু লজ্জা করছিল। মনকে কষে ধমক দিলাম, অন্যান্য যন্ত্রের মত বাঁশীও একটি সুর-যন্ত্র, বেহালা তুমি বাজাও, আর বাঁশীতেই এমন দোষ করলে!...আগে অবশ্য আমার ধারণা ছিল বয়স কুড়ি পেরুলেই আর কারও বাঁশী বাজান উচিত নয়! ঐ বয়সের পর আমি নিজেও বাঁশী ছেড়েছি কিনা!

যাই হোক শিল্পের দোহাই দিয়ে মনে জোর এনে সঙ্কোচ কাটিয়ে কোন রকমে বলে বসলাম, "G" আছে?

উদারা না মুদারা, বাবু?

উদারা।

আজ ত উদারা আর নেই বাবু—দুটো ছিল বিক্রী হয়ে গেছে, বলেন ত কাল এনে দিতে পারি।

কত দাম?

ভাল বাঁশের ভাল জিনিস করা যোটা 'জি' একটা দু' টাকা পড়বে, আর অর্ডিনারি সাত সিকে।

বেশ, ভালটাই আনবেন—

লোকটা কেমন একটু ম্লান সলজ্জ হাসি হেসে বললে, আমাকে আপনি বলছেন?

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন, আপনি বলব না কেন, না বলবার কারণ কি?

লোকটা আর একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, বড় কেউ বলে না কিনা, তাই বলছি।

না বলবার ত কোন সঙ্গত কারণ নেই—চেহারা দেখে মনে হয় আপনি ভদ্রলোকের ছেলে।

লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

তা ছাড়া মনে হয় লেখাপড়াও কিছু করা হয়েছে—

বলেই একটু হকচকিয়ে গেলাম: আমার বাক্যবিন্যাসটা আপনি আর তুমির মাঝামাঝি হয়ে গেল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা শুধরে নিতে বললাম, দেশ কোথায় আপনার—পূর্ববঙ্গে বোধ হয়?

ম্লান হেসে লোকটি বললে, আজ্ঞে হাঁ।

আশে-পাশে তেমন লোক ছিল না, ক্রেতাও কেউ আসছিল না, সুতরাং আমার এই নূতন ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচয়ের এই সুযোগ। বললাম, আপনাকে আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, বাজনাও শুনেছি। বৌবাজারের ওদিকেও আপনি যান।

আজ্ঞে হাঁ, কলিকাতার সর্ব্বত্রই আমার যাতায়াত, দুবার্দেও মাঝে মাঝে যাই—

বুঝলাম অনুমান আমার মিথ্যা নয়—লোকটা লেখাপড়া সত্যিই জানে। বললাম, হাঁ, একদিন ডবল ডেকারে আসতে বৌবাজারের মোড়ে আপনাকে বাঁশী বাজাতে শুনেছি, আশোয়ারী বাজাচ্ছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল আমার। 'এমন বাঁশী আমি'—বলতে যাচ্ছিলাম 'জীবনে আর শুনি নি', কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, 'জীবনে কম শুনেছি'—

কথাটা শুনে দেখলাম গ্যাসের আবছা আলোতেও মুখটা তার একটু লাল হয়ে উঠল। যুক্ত করে চক্ষু দুটি অর্দ্ধমুদ্রিত করে সে কাকে প্রণাম জানাল।

বুঝলাম না এ আমাকে, না তাঁর গুরুকে, না কোন দেবতার উদ্দেশে। বললাম, বেশ শিখেছেন আপনি। এ কোন্ গুরুর কাছে শেখা—না শুধু নিজের চেষ্টাতেই?

প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা ক্রমে কেটে আসছিল লোকটির। বললে, এ আমার বাবার কাছে পাওয়া, বাবু। শিখেছি আমি অবশ্য নিজের চেষ্টাতেই, কিন্তু প্রেরণা পেয়েছি, উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমি এ বাবার কাছ থেকে। তিনি খুব গুণী লোক ছিলেন, প্রায় সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন, বাঁশী অবশ্য তিনি বাজাতেন না, বাজাতেন সব তারের যন্ত্র—রাগ-রাগিণী সবই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। বাঁশী বাজানো আর বানানো অবশ্য আমি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছি—

এই সময় একজন খরিদ্দার এসে দরদস্তুর করে কয়েক মিনিট সময় আমাদের নষ্ট করে দিয়ে গেল,—কারণ বাঁশী সে কিনলে না। বাঁশী না কিনে শুধু শুধু কথা বললে যদি ব্যাপারীর সময় নষ্ট করা হয়,—তবে আমার বেলায়ও এ সত্য।—মনে হতেই একটা ডি-বাঁশী বের করতে বললাম লোকটিকে।

দাম কত ?

দেড় টাকা।

পকেট থেকে টাকাটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, বাঁশীটায় একবার এক কলি বাজিয়ে দিন আপনি, আওয়াজটা একবার দেখে নি।

কথাটা বলা হয়ত আমার ঠিক হয় নি। লোকটি মৃদু হেসে বাঁশীটা একবার মুখে তুলে নিলে। পরক্ষণেই মনে হ'ল—আকাশ থেকে আমার কানে যেন এক পশলা সুধাবৃষ্টি হয়ে গেল।

বেশী শুনতে চাওয়া উচিতও নয়, তার সুযোগও মিলল না। আর একটা ডবলডেকার এসে গেল, তা থেকে যাত্রী নামল এবং দুটি তরুণ এসে বাঁশীর দরদস্তুর সুরু করলে। নিজের বাঁশীটি হাতে নিয়ে, পরের দিন মোটা ভি-বাঁশী আনবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি সেদিনকার মত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় লোকটির কাছ থেকে মোটা 'ভি' কেনবার সময় তার নামটি জেনে নিয়েছিলাম। পুরো নামটা অবশ্য প্রথমে সে আমায় বলতে চায় নি। প্রথমে বললে বি. গুহ।

হেসে বললাম, এ ত ঠিক দেশের দস্তুর হ'ল না—বংশের নামের চেয়ে বাপমায়ের দেওয়া নামটারই এখানে কদর বেশী—

সামান্য একটু সংকোচ—তার পরেই সলজ্জ হাসি হেসে বললে, ভৈরব গুহ।

নামটা একটু সেকেলে ভেবে হয়ত লোকটি সংকোচ বোধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল অন্য কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্ম হয়েছিল বুঝি প্রভাতে ?

হাঁ, কি করে জানলেন ?

আর নাম রেখেছিলেন বুঝি আপনার বাবা ?

লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হাঁ, কিন্তু সব আপনি ঠিক ঠিক বলছেন কি করে বুঝছি না ত!

সেকথার জবাব না দিয়ে বললাম, বড় সুন্দর নাম রাখা হয়েছে আপনার, নামদাতার শিল্পজ্ঞান আর রুচির প্রশংসা করতে হয়।

কথাটা শুনে লোকটি তেমন খুশি হয়েছে বলে মনে হ'ল না। ভ্রু-দুটি তার ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বললে, কেন বলুন ত ?

বললাম, আপনি এত সঙ্গীতচর্চ্চা করেছেন আর এটা বুঝলেন না ? ভৈরব হচ্ছে প্রভাতের একটা রাগের নাম, অন্য কথায় যাকে বলে ভায়রো, প্রভাতের বন্দনার সুর—বিশ্বদেবতার বন্দনা, বড় দিব্য গম্ভীর এর রূপ।

এক মুহূর্ত্তে লোকটির মুখের বিরক্তি আর অস্বস্তির রেখাগুলি নিঃশেষে মুছে গেল, বললে, তাই ত, এতদিন ত কথাটা ভেবে দেখি নি—

কয়েকটি নূতন ক্রেতা এসে দাঁড়িয়েছিল, আর বিশেষ কথা সেদিন হতে পারল না; কথার প্রয়োজনও আমার তেমন নয়, প্রয়োজন আমার ওর বাঁশী শোনা, আর সে-ও যে সে রাগ-রাগিণী নয়—সেদিনকার মত সেই আশোয়ারী—কিন্তু সে ত ফরমাস দিয়ে যেখানে সেখানে হতে পারে না, লোকটির সঙ্গে ভাব রেখে একদিন তাই শোনার সম্ভাবনাটুকু শুধু বড় করে রাখতে চাই।

আর এই সম্ভাবনাই আর একদিন আমার জীবনে কেমন আশ্চর্য্য রকমে সফল হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

ভৈরবের সঙ্গে আরও দু-এক বার আমার অবশ্য দেখা হয়েছে, তার কাছ থেকে আমি আরও দুটো বাঁশী কিনেছি, আমার পরিচয়ও সে কিছু কিছু পেয়েছে, কিন্তু কোথায় থাকে সে, সে খবর আর আমি রাখি নি।

বিজয়ার দু'দিন পর একটা কলোনীতে গিয়েছিলাম প্রণাম করতে আর প্রীতি জানাতে। সেখানে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় আস্তানা গেড়ে বাস করছেন। আত্মীয়-বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগ সেরে এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখছিলাম। এসব জায়গায় ঘুরতে আমার বেশ লাগে। বাইরের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল আত্মশক্তি মাত্র সম্বল নিয়ে মানুষ নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যে আয়োজন করছে তা দেখে সত্যিই আনন্দ লাগে। অথবা নাগরিক কৃত্রিমতার খোলস-খসা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র রূপের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ এখানে দেখতে পাই।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরার পর বাস-ষ্টপের সামনে এক চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। বাস আসতে একটু দেরী আছে—তা ছাড়া সন্ধ্যার দিকে বাসে ভিড়ও থাকে খুব। একটু দেরী করেই যাব ঠিক করেছিলাম। আসল কথা এখানে এই চায়ের দোকানে বসে লোকের কথা শুনতেও আমার বেশ ভাল লাগে। সুতরাং পেয়ালার পর পেয়ালা করে অন্ততঃ তিন চার কাপ চা আমার এখানে অনায়াসে চলতে পারে।

দোকানে বসে সবে প্রথম পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি এমন সময় 'ও নরেন্দর'—বলে ঘরে ঢুকল কে! কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত। চেয়ে দেখি ভৈরব। মুখ থেকে অমনি বেরিয়ে গেল—আরে আপনি!

ভৈরব আমার দিকে চাইতেই খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকেও বেরুল—বাবু, এখানে!

ভৈরবের মুখে বাবু কথাটা অবশ্য আমার তেমন ভাল লাগল না। তার সঙ্গে যত পার্থক্য আমি রাখতে চাই, অথবা

আমার বিচারমতে যতটা পার্থক্য হওয়া উচিত, বাবু কথাটা যেন সে সব ওলটপালট করে দেয়। তবু তখনকার মত কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে বললাম—হাঁ আমার কয়েকজন আত্মীয় থাকেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—বিজয়ার পর—

ভৈরব মিনতির সুরে বললে—তা বাবু আমার ওখানেও একটু পায়ের ধুলো দিতে হচ্ছে যে, আপনি এসে দোকানে—

বললাম, তা কি হয়েছে—এখানে আমার বড় ভাল লাগে।...আপনার বাড়ীও এখানে বুঝি ?

ভৈরব হাসল : বাড়ী আর কি করে বলি, বাবু, একটু মাথা গুঁজবার স্থান করে নিয়েছি।

দোকানের মাঝে আর প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছিলাম না ভৈরবের সঙ্গে। চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে আসতেই ভৈরব আবার চেপে ধরল, চলুন বাবু—কাছেই আমার বাড়ী —পেয়েছি যখন আপনাকে, কিছুতেই ছাড়ছি না।

ভৈরবের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হচ্ছিলাম আমি—কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না—এমন কি পেয়েছে সে আমার কাছ থেকে যাতে সে আমার এমন ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক— ভৈরবের আহ্বানে 'না' করতে পারলাম না, তা ছাড়া মনে মনে কৌতূহলও হয়ত ছিল—বাড়ীতে কি জীবন সে যাপন করে তা দেখতে।

গড়িয়াহাটা মেন রোড ছেড়ে গলিতে ঢুকে ভৈরব আর এক বার বাবু বলতেই আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—দেখুন ভৈরববাবু, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া জানেন— আমাকে এমনি বাবু, বাবু—করা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিচয়ও আপনি পেয়েছেন—তেমন কিছু হোমরা-চোমরা আমি নই। দরকার হলে আমাকে কল্যাণবাবু ডাকতে পারেন—আর যদি বেশী আপনার বলে মনে করতে পারেন—তা হলে দাদা বলতে বাধা দেখি না।

বেশ, তা হলে আমাকেও আপনি বলবেন না আপনি, শুধু ভৈরব বলে ডাকবেন—আমি ত আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাই হবে।

মনটা খুশি হয়েই উঠল : ভৈরবের সঙ্গে এই রকম অন্তরঙ্গতাই চাইছিলাম আমি। কিন্তু একটু পরেই মনটা আমার আবার হঠাৎ খিঁচড়ে গেল—যখন কানে এল ভৈরব ডাকছে—দাদু, ডাইনে—এইবার এইদিকে ফিরতে হবে আমাদের।

মনের উষ্মা আর চেপে রাখতে পারলাম না—বললাম, দেখ ভৈরব, এই দাদু, দাদুটা বিশ্রী লাগে আমার কানে, তুমি আমায় কল্যাণ-দা— অথবা শুধু দাদা বলে ডাকলে খুশি হব।

ভৈরব আমার উপর রাগ করলে কিনা কে জানে। কথা বললে সে একেবারে বাড়ীর সামনে এসে : এসে গেছি, দাদা, আপনি এক সেকেণ্ড দাঁড়ান—দেখে আসি আমি কি অবস্থায় আছে !

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না আমায়—প্রায় পরক্ষণেই ফিরে এসে কেমন একটু হেসে বললে, আসুন দাদা, আসুন—

হাসছ যে !

আর বলবেন না—কাপড়টা পালটাতে বলছিলাম—তা ও কিছুতেই শুনলে না, বলে—যেমন আছি তেমনি থাকব— কাপড় পালটানো ত আর্টিফিসিয়ালিটি—

আমিও হাসতে হাসতে ওদের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই যাকে দেখলাম তাকে দেখেই কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না— ভৈরব এরই মুখের কথাটা হুবহু আবৃত্তি করে শুনিয়েছে আমায় অর্থাৎ ইংরেজী শব্দটিও এরই উচ্চারিত। দেখেই মনে হ'ল আধ ময়লা কাপড় পরে দেবী সরস্বতী দাঁড়িয়েছেন আমার চোখের সামনে।

মুখে মধুর স্মিত হাসি। হাত জোড় করেই নমস্কার করলে মেয়েটি। প্রতিনমস্কার করলাম। ভৈরবের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে সুরু করেছি, কিন্তু বয়সে এত ছোট হলেও রীতিমত ভাবতে হয় এর সঙ্গে কথা বলতে মধ্যম পুরুষের কোন্ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত—শিক্ষা এবং রুচির এমন একটা দীপ্তি রয়েছে এর মুখে।

ভৈরবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললাম, ভৈরব, আমার এ ছোট বোনটির নাম কি ?

মেয়েটি হাসল। বড় মধুর সে হাসি। সে-ই জবাব দিলে, আমার নাম শান্তি।

শান্তিই বটে—মনে মনে ভাবলাম আমি : চারদিকে তখন দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি আমি। রাণীগঞ্জের টালি ছাওয়া বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ঘরখানির এক পাশে এক তক্তপোষে মাতিশুভ্র একটা বিছানা পাতা—তারই নীচে একটা জলচৌকীতে সোনার মত করে মাজা থালা বটী বাটি গেলাস, ঝকঝকে পেয়ালা ডিশ। বেড়ার গায়ে ছাদ থেকে একটা ঝুলান বাঁশের আলনায় আধময়লা ও ফরসা কয়েকটা জামা কাপড় সাড়ী ব্লাউজ সায়া। যেদিকে তক্তপোষ তার উল্টো দিকে একটা ছোট মেজে ঢাকনা দেওয়া একটা হারমোনিয়ামের বাক্স ও একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরে একটা টাইমপীস্ ; আর ওদিককার দেয়ালে ঢাকনা দেওয়া একটা সেতার ঝুলানো। ওদিকে নজর পড়তেই বলে বসলাম, বউমা বাজান বুঝি ?

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এই যে একটু আগে বললেন, আমার বোন, বলে মৃদু হাসল।

বোন আর বউমাতে তফাৎ কি আছে ?

তা আছে বই কি—বউমা বললে ওঁর সম্পর্কটাই বড় হয়ে ওঠে, আমি হয়ে যাই ছোট।

ওঃ—

বলে হো হো করে হেসে উঠলাম—হার মানলাম দিদি।

শান্তি বললে, আর একটা ভুল করলেন দাদা, আমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'বাজান' বলা আপনার উচিত হয় নি, বলা উচিত ছিল, বাজায়; বোনের সঙ্গে আপনি আপনি করে কেউ কথা বলে না।

শুনে মনটা যেমন জুড়িয়ে গেল, বিস্ময়বোধ করলাম ততোধিক। হেসে বললাম, হার মানতে হ'ল, বোনটি!

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভৈরব হাসতে হাসতে বললে, হার মানতেই হবে আপনাকে, উনি যে সরস্বতীর মানসকন্যা, যুক্তিতে পেরে উঠবেন না ওর সঙ্গে, আমাকে কথায় কথায়—

ভ্রূ কুঁচকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শান্তি শাসন করলে ভৈরবকে, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিছানা দেখিয়ে বললে, বসুন, দাদা আপনি, আমি একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি—

ভৈরব অমনি টিপ্পনি কাটলে, দাদা, দাদা ত করছ, কিন্তু এদিকে যে হাত জোড় করে নমস্কার করলে দাদাকে, বিজয়ার পরে একটা—

শান্তি অমনি লজ্জা পেয়ে ছুটে এসে পায়ের কাছে এক সভক্তি প্রণাম করে গেল।

শান্তি বারান্দায় চায়ের জল গরম করতে গেল, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, শান্তি গান বাজনা দুই-ই জানে বুঝি?

ভৈরবের চোখ মুখে যেন একটু লাল আভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, বললে, গান বাজনা মোটামুটি এক রকম সবই জানে, তবে সবচেয়ে বড় কথা, সুরের একেবারে পাগল। একটা ভাল সুর শুনলে একেবারে কাঁদতে বসে যাবে।

বারান্দা থেকে ঝঙ্কার এল, দেখ, ভাল হবে না বলছি—

ভৈরব মৃদু হেসে উত্তর দিলে, না না, ও সব আর বলছি না আমি। তার পর আমার দিকে চেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, ওর পরিচয় শুধু এইটুকু নয়, লেখাপড়া ওর কাছে বসে দশ বৎসর আমি শিখতে পারি: ও গ্রাজুয়েট আর আমি আই-এ অবধি পড়েছি—

শান্তি এবার জলন্ত একখানা কাঠ নিয়ে উঠে এল, দেখুন ত দাদা!

আমি হেসে উঠলাম, না না, শান্তি তুমি ফিরে যাও, আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি: একজন গ্রাজুয়েট কখনও একজন আই-এ পড়া ছেলেকে দশ বৎসর পড়াতে পারে, যত সব ইয়ে—

'আপনিও ওর পক্ষ নিলেন'—বলে অভিমানের কান্নার সুর নিয়ে শান্তি বারান্দায় ফিরে গেল—

আমি হাসতে হাসতে তাকে সান্ত্বনা দিতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দেখি শান্তি হেঁট মুখে উনুনের ধারে বসে সত্যিই কাঁদছে—

বিস্ময়ে আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে ভুলে গেলাম, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি আজ যেন এক স্বপ্নলোকে এসে গেছি, অথবা সত্যিই স্বপ্ন দেখছি।

কয়েক সেকেণ্ড পর আমি আমার পূর্বসম্বিৎ ফিরে পেলাম, ওকে সান্ত্বনা দিবারও কিছু নেই, ও ত এ দুঃখের কান্না কাঁদছে না। ওর কান্নার মূল কারণ ঘন রহস্যে আবৃত।

এই বার ওর উনুনের দিকে নজর পড়ল। জাল দিচ্ছে ও পাহাড়ে তরল বাঁশের কুচি দিয়ে, যে বাঁশ দিয়ে ভৈরব তার বাঁশী তৈরি করে। বারান্দার অপর পাশে পাঁচ-ছয় হাত লাঠির মত লম্বা ঐ বাঁশেরই বোঝা বাঁধা রয়েছে।

শান্তির এ কান্নায় আমার কিছু করবার নেই বুঝে আমি বেকুবের মত আবার ঘরে ফিরে এসে বসলাম। ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ আর বেরোও নি—না?

না। লক্ষ্মীপুজোর আগে আর বেরুব না। এ সময়টা আমাদের দেশে আত্মীয়স্বজনেরা সব দেখাশুনো করতে আসেন—নিজেদেরও যেতে হয়।

হেসে বললাম, জানি, আমিও ত তোমাদেরই মত ও অঞ্চলেরই লোক!

কোথায় বাড়ী ছিল আপনার?

যশোর।...শান্তির পিতৃকুলের বাস ছিল কোথায়?

ভৈরব একটু গম্ভীর হয়ে উঠল যেন: ওঁরা এইখানেরই লোক।

শান্তি বারান্দা থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, দাদা না, আমাদেরও আদি নিবাস ছিল ফরিদপুরে।

ফরিদপুরে, কোথায়?

মাদারীপুর সাবডিভিশানের রতনডাঙা।

রতনডাঙা! রতনডাঙায় ত আমার মাতুলালয়। রতনডাঙার কারা বল ত?

শান্তি বারান্দা থেকেই উত্তর দিলে, রতনডাঙার সনাতন বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছেন? আমার বাবা তাঁরই বংশধর। সনাতন বাঁড়ুজ্যে ছিলেন আমার প্রপিতামহ—

বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে: সনাতন বাঁড়ুজ্যে! বাঁড়ুজ্যে, আর এ দিকে হচ্ছে গুহ—ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ!

নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তির কথার জবাবে বললাম—হাঁ, সনাতন বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছি বই কি—তিনি ত ওখানকার ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। পরক্ষণেই একটু কৌতূহলের লোভ সংবরণ করতে না পেরে ভৈরবকে বললাম, তোমাদের তা হলে দেখছি এ 'লাভ ম্যারেজ', সবই 'আর্টিষ্টিক'

তোমাদের—বলেই একটু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলাম। ভৈরব কেমন গম্ভীর হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না।

আমিও এর পর—কি বলতে কি বলে বসব—ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলাম। শান্তি পেয়ালা নিতে ঘরে এল। নিজে হাতে তৈরি খাবার বের করলে। একটু পরে একখানা থালার উপর দু' কাপ চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে এল। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর এবার আবার কথা বলবার সুযোগ পেলাম আমি। খাবারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শান্তিকে বললাম, এ সব তৈরি করতে জান তুমি ?

মৃদু হাসল শান্তি : কিছু জানতাম, বাকী শিখে নিয়েছি।

প্রথম দিন এসেই এদের অনেক কিছু জেনে নিয়েছি বলে বোধ হয় একটা অপরাধের ভাব মনে চেপে বসেছিল। আলাপ বেশ সহজ হয়ে উঠছিল না, তবু জোর করে শান্তিকে বললাম, আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বিরক্ত করতে চাই না, এর পর যেদিন আসব গান বাজনা শোনাতে হবে কিন্তু।

শান্তির মুখ থেকে ছেলেমানুষির ভাব কেটে গিয়ে আবার সেই প্রথম দেখা বুদ্ধির দীপ্তি আর গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে। কোন রকম ন্যাকামি না করে শান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আসবেন, যেটুকু পারি শুনতে চাইলে শোনাব বই কি, শুনতে চাইলে যাদের গুমোর বেড়ে যায় আমি তাদের দলে নই।—বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ভৈরবের দিকে চাইলে।

ভৈরব অমনি কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললে, মিছে অপবাদ, কেন, শোনাই নে আমি তোমায় বাঁশী ?

তা বটে !

অভিমানে কে যেন খট্ করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আর দেরী করলে বাস পাব না। শেষ বাসখানা ৯-৪৫এ আসে। সুতরাং উঠতে হ'ল। হ্যারিকেন ধরে শান্তি আমায় এগিয়ে দিতে এসে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে, আবার আসবেন দাদা—রবিবার সন্ধ্যার পর উনি বাড়ী থাকেন—

গান শোনাতে হবে কিন্তু !

—বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শান্তি ওখান থেকেই বললে, শোনাব—আপনার লেখা বই দিতে হবে কিন্তু আমায়, নইলে আড়ি—

কণ্ঠস্বরে আবার সেই বালিকার সারল্য ফিরে এসেছে। যেতে যেতেই হেসে উঠলাম : আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে'খন। মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সম্বন্ধেও কিছু কিছু শুনেছে তা হলে ভৈরবের কাছ থেকে। নিজেও খোঁজ-খবর রাখে নিশ্চয়, লেখাপড়া ত জানে !

ভৈরব আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল—এগিয়ে দিতে এসেছিল। বাসে উঠবার আগে তাকে বলে এলাম, সামনের রবিবারে নয়, এর পরের রবিবারে আবার আসব।...বড় আনন্দে কাটল তোমাদের এখানে—

ভৈরব প্রত্যুত্তরে বললে, আমাদেরও যে কত আনন্দ হ'ল এখন বোঝাতে পারব না—পরে এলে বুঝবেন। আসবেন দাদা—

আসব—

বাস ছেড়ে দিলে। এদের এখানে যা দেখে গেলাম—সে রাত্রে তারই স্মৃতি আমার একটা গানের সুরের মত অভিভূত করে রেখেছিল।

নির্দ্দিষ্ট রবিবারে ওদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের লেখা দুখানা বই দিয়ে এসেছি—শান্তির গান বাজনা শুনে এসেছি। ভৈরবকে বাঁশী বাজাতে বললাম, সে কিছুতেই রাজী হ'ল না, বলে 'মুড' নেই দাদা।—শান্তির গানের সঙ্গে অবশ্য সে বাঁশী ধরেছিল, কিন্তু তাতে ঠিক ভৈরব গুহের সেই বাঁশীর সুর আসে না।

কবে তার মুড আসবে সেই আশায় প্রায় প্রতি রবিবারেই ওদের ওখানে যাওয়া সুরু করলাম। তা ছাড়া ওদের দু-জনকেই আমি দস্তুরমত ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাদের এই অদ্ভুত রহস্যময় জীবনও আমার কাছে কম আকর্ষণের ছিল না। যত দিন যাচ্ছিল ততই যেন আরও বেশী রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

এদের জীবনের অনেক কথাই আমি ধীরে ধীরে জেনে নিয়েছি। এদের বিয়েটা যে অসবর্ণ সেকথা অবশ্য আমি প্রথম দিনই বুঝে গিয়েছিলাম, কিন্তু শান্তির দিক দিয়ে সে যে কি দুঃসাহসিক সাধনার সিদ্ধি ভাবলে অবাক হতে হয়। আমারই মত সেও ভৈরবের বাঁশী শুনেই প্রথম আকৃষ্ট হয়—আকৃষ্ট হয় বললে হয়ত কিছুই বলা হয় না—সে একেবারে পাগল হয়ে যায়। প্রথম দিন ভৈরবের বাঁশী শুনে ড্রাইভারকে বলে সে মোটর থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে রাত্রে নাকি ঘুমুতে পারে নি। পরে সন্ধ্যার পরে বেড়াবার ছলে মোটর নিয়ে সে পথে পথে ভৈরবের বাঁশী শুনবার জন্যে ঘুরে বেড়াত—কোন দিন ভাগ্যে বাঁশী শোনা জুটত, কোন দিন বাঁশী বিক্রয়-রত ভৈরবকে সে দূর থেকে দেখেই ফিরে যেত।

বড় একটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কার্ন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, শান্তির বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতেন। শান্তি আর ভৈরবের মধ্যে কি করে যে আলাপ পরিচয় এবং পত্র বিনিময় সুরু হ'ল সে অনেক কথা। ঘনিষ্ঠতা হবার পর প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পত্র লেখার পালা চলে। ভৈরব জানিয়েছিল তার বৈদ্যের কথা, শান্তি তার উত্তরে বলেছিল, ওসব কোনো

কিছুর দরকার নেই...শান্তি একদিন ভৈরবকে সিভিল ম্যারেজ এক্ট অনুসারে বিয়ে করে বসল।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মিঃ ব্যানার্জি প্রবাসে শান্তির চিঠি পেলেন—বাবা, ভালবেসে আমি এক সুর-সাধককে বিয়ে করেছি। রাগ করো না—আশীর্ব্বাদ করো আমরা যেন সুখী হই।

মিঃ ব্যানার্জি পাকা লোক। অন্তরে জ্বলে গেলেও বাইরে বিরূপ ভাব দেখান নি তিনি। জামাইকে নিজের কার্মে চাকরি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কি কারণে বুঝলাম না তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। ব্যাপারটা খানিকটা রহস্যের মতই রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আর আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে, এদের সব কিছুই রহস্যময়।

ওদের জীবনের কোন কথাই জোর করে জানতে চেষ্টা করি নি আমি। এক দিন হঠাৎ কেন জানি না, সেই দুর্ম্মতি হয়ে গেল। সে রবিবারে কলোনীতে আমার সাবেক আত্মীয়-দের সঙ্গে দেখা করে একটু সকাল সকাল এসে গিয়েছিলাম ওদের ওখানে। ভৈরব সবে মাত্র বাড়ী ফিরল আর শান্তি বেরিয়েছে বাজার করতে। ওদের দু'জনের কাছেই ঘরে ঢুকবার আলাদা চাবি থাকে।

ভৈরব আমার জন্যে নিজেই চা তৈরি করে নিয়ে এল। চৌরঙ্গী থেকে কিছু কাজু বাদাম কিনে এনেছিল ভৈরব; শান্তি না কি এ খেতে বড় ভালবাসে।

বাদাম সহযোগে চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে বসলাম, শান্তি তা হলে কাজু বাদামের কথা ভুলতে পারে নি?

ভৈরব হেসে উঠল: না।

সুযোগ পেয়ে বললাম, আচ্ছা, ভাই, একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠি না।

ভৈরব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

কথাটা হচ্ছে...যাসে দেখতে পাচ্ছি শান্তি তার পূর্ব্ব-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ একেবারে ভুলতে পারে নি, অথচ এ সব ভোগ করবার সুযোগও তার ছিল। তোমার শ্বশুর না কি তাঁরই কার্মে তোমায় চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, সেটা নিলে ত আর—

ভৈরব আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, কি করব, দাদা, ও কিছুতেই রাজী হয় না, বলে তা হলে আমি তোমাকে হারাব, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আপিসের বাবু বা বড় ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে চাইলে ত আমি অনায়াসেই করতে পারতাম। সে ত আমার স্বপ্ন নয়। যে রূপে তুমি আমায় দেখা দিয়েছ— সেই রূপকেই আমি চিরদিন আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে রাখতে চাই। তোমার অন্য মূর্ত্তিতে কল্পনা করতে গেলেই আমি মারা যাব—

অবাক্ হয়ে গেলাম আমি ভৈরবের কথা শুনে। বললাম, তাকে বললে না কেন, এ যে অভাবের জীবন, এ যে দারিদ্র্যের জীবন।

ম্লান হেসে ভৈরব বললে, সে সব বলতে কি কিছু বাদ রেখেছি, দাদা—

কি বলে ও?

ও বলে, তাতে দুঃখ কি, এ জীবন ত আমার স্বেচ্ছাবৃত। ওর ধারণা আমি অন্য কিছু করলেই ওর স্বপ্ন ভেঙে যাবে, আমি আর ওকে তেমনি করে বাঁশী শোনাতে পারব না।

কিন্তু এ জীবনেও ওকে ঠিকমত বাঁশী শোনাতে পার কি, না ক্লান্ত হয়ে আস—

আবার ম্লান হাসি দেখা দিলে ভৈরবের মুখে: পারি কি না জানি না—তবে চেষ্টা করি—

কবে, কখন?

মাসে একবার, পূর্ণিমার রাত্রিতে—রবিবার সন্ধ্যার ছাড়া পূর্ণিমার রাত্রেও আমি ঘরের বার হই না, সেইদিন আমি ওকে বাঁশী শোনাই, ও আমাকে—

বলতে গিয়ে একটু থেমে গেল ভৈরব।

থামলে কেন, বল, বল—

আপনি দাদা, তবু আপনার কাছে আমাদের গোপন কিছুই নেই, সেইদিন ও আমাকে নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভালবাসে, আর উনত্রিশ দিন ও আমার শুধু অতিপ্রিয় বন্ধু, সাথী—

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। তার পর এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললাম, ভাই ভৈরব একদিন আমি তোমার বাঁশী শুনেই তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম—বহুদিন আমি তোমার সে রকম বাঁশী শুনি নি—একদিন পূর্ণিমার রাতে শান্তির মত আমাকেও শ্রোতা করবে তোমার বাঁশীর?

হাসল ভৈরব: আপনার কোন অনুরোধে কি আমি 'না' বলতে পারি—

কি, কি অনুরোধ হচ্ছে দাদার? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল শান্তি। সহসা আমার কৌতুকবোধ জেগে উঠল— বললাম, বলো না বলো না ওকে ভৈরব, হঠাৎ আমরা ওকে একেবারে চমক লাগিয়ে দেব।

এর দিন পাঁচেক পরেই এক পূর্ণিমা পাওয়া গেল। মাঘের পূর্ণিমা। সন্ধ্যার একটু পরেই আমি ওদের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। রাত্রির রান্না শান্তি আগেই সেরে রেখেছিল। আমি গেলে শুধু আর এক বার চা করলে।

সবাই যেন কেমন গম্ভীর। আমি নিজেও তেমন বেশী

কথা বলতে পারছিলাম না। বহুপ্রত্যাশিত দিনের আকাঙ্ক্ষায় যেন মনে নেশা ঘনিয়ে আসছিল।

বাইরে সেদিন—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' আমাদের প্ল্যান ছিল—এই মধুর, ভরা জোছনায় রেল লাইনের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে বাঁশী শুনব, কিন্তু বিদায় নেবার আগে শীতটা সেদিন আবার একটু জেঁকে পড়েছিল তাই প্ল্যানটা আমাদের পালটে দিতে হ'ল।

গরম কাপড়ের শার্টের উপর একটা জাম্পার এঁটে ভৈরব খাটের এক পাশে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল, আমরা বসলাম তার অপর পাশে দুই কোণে। কথা বলছে না কেউ। ভৈরব চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে বসেছে···ধীরে ধীরে এবার সে বাঁশীটি তুলে নিলে মুখে। আমার পুরানো বুকটা স্পন্দিত হতে চায় যেন—শান্তির দিকে চেয়ে দেখলাম একবার সে হাত দুটি কোলের উপর তুলে নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছে—

ঘরের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সহসা বাঁশী বেজে উঠল। প্রথমে অনেক টানা টানা কেমন যেন এক কান্নার মত···না, না—কান্না বললে ঠিক হবে না, কেমন যেন মন উদাস করা, তাও নয়—কেমন যেন এক গভীর অনুতাপের সুর। ধীরে ধীরে সুর জমতে অগ্রসর হতে থাকলে বোঝা গেল পূরবী বাজছে···

সারা দিনটা কেটে গেল—করবার মত কাজ কিছু করা হ'ল না, সূর্য্য উদিত হয়ে দিব্য আলো বিকীরণ করে তাপ দিয়ে আঁধার-সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। এমনি করে আমাদের জীবনসূর্য্যও অস্তমিত হতে চলেছে, কিছুই যে করা হ'ল না জীবনে—জন্মটা যে বৃথাই কেটে গেল!

সুর উদাত্ত হতে হতে এক সময় হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বুকে রইল শুধু তার ঝঙ্কার।

কিছুক্ষণ শুধু স্তব্ধতা।

মিনিটখানেক পরে ভৈরব আবার বাঁশী মুখে তুলল। এবারের সুরে—আগেকার সেই ভাবটাই যেন গভীর, আরও গভীর করে তুললে, তার সঙ্গে আরও কি যেন মেশানো আছে। বুঝলাম পুরিয়া বাজছে···শেষে বাজল বেহাগ। মিনিট পনের পরে বেহাগের কান্নাও শেষ হয়ে গেল···। ভৈরব বাঁশী থামিয়ে একবার শান্তির একবার আমারে মুখের দিকে চাইল। শান্তি সুপ্তোত্থিতের মত জড়িত কণ্ঠে বললে, সেইটা—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—বৌবাজারের মোড়ে যে সুরটা বাজিয়েছিলে সেই—

কথা বলা আর আমার শেষ হল না,—ভৈরব তখন চোখ বুজে বাঁশী তুলে নিয়েছে মুখে—কম্পিত বক্ষে ভাবতে লাগলাম, আমার নির্দ্দিষ্ট সুর বাজায় যদি শান্তির লাগবে আঘাত, আর শান্তির ইঙ্গিতমত বাজায় ত আমি পাব মনঃকষ্ট—

বেশীক্ষণ ভাবতে সময় পেলাম না। পরমুহূর্ত্তে দেখি ভৈরব আমার সেই অতিপ্রিয় প্রথম দিনের শোনা আশোয়ারী সুরু করেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিরক্তি বা অসন্তোষের আভাস তাতে বিন্দুমাত্র নেই। পরমুহূর্ত্তে শান্তির মত চক্ষু মুদ্রিত করে আমিও এক মহা আবির্ভাবের আশায় দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে রইলাম। বাঁশী বাজতে সুরু করেছে—সুদূর থেকে যেন কার আহ্বান আসছে। সংসারের সকল চাওয়া পাওয়া, সকল বাঁধন ছাড়িয়ে নেওয়ার আকুল আহ্বান। উদাস করা সেই পরম প্রিয় যেন ক্রমেই কাছে আসছে—বড় কাছে এসে গেছে সে। হৃদয়ের সকল বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে, স্নায়ুগুলি সব খুলে খুলে যাচ্ছে, এ কি হ'ল আমার, আর একটু হলে সকল অনুভূতিও যে হারিয়ে ফেলব আমি। বুকটা দুই হাতে চেপে ধরতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে শক্তিও আর নেই ···নিষ্ঠুর বাঁশী বেজেই চলেছে—

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাঁশী থামল। একটু স্থির হয়ে চেয়ে দেখি শান্তি তখনও মাথা উপুড় হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, বাইরে চেপে রাখলেও অন্তরটা আমারও ঠিক অমনি কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল—ভৈরবের দৃষ্টি শুধু স্থির, ধ্যানস্তিমিত।

সে রাত্রে বিদায় নেবার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা আর সম্ভব হ'ল না, মুখ থেকে বেরুল শুধু, 'চলি'—

অসুর জাতি

শ্রীশৈলেন্দ্রবিজয় দাসগুপ্ত

বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর অঞ্চল বহু আদিম জাতির বাসভূমি। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিচিত এবং জনসংখ্যায় লঘু অসুর জাতি। অসুর নাম ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নয়, কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অসুরদের সঙ্গে এই অরণ্যবাসীদের কোনরূপ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

রাঁচি ও পালামৌ জেলা এবং সুরগুজা ষ্টেটের প্রান্তবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ইহারা বাস করে। পল্লী বলিলে অবশ্য এগুলির গৌরবই করা হয়, কারণ অধিকাংশ পল্লী চার বা পাঁচ ঘর বাসিন্দা লইয়া গঠিত। এক ঘর লোক বলিতে সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা বুঝায়। এক পল্লী হইতে অপর পল্লীর দূরত্ব ন্যূনাধিক চার-পাঁচ মাইল এবং উচ্চতার ব্যবধানও স্থানে স্থানে এক হাজার হইতে দেড় হাজার ফুট। বাসস্থানের এই দুর্গমতা অসুর জাতিকে বর্ত্তমান জগৎ হইতে এত দূরে রাখিয়াছে যে, উরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে আমরা যে অর্থে অরণ্যচারী বলিয়া থাকি এই সব জাতি ও অসুরদেরও সেই অর্থে অরণ্যচারী বলা চলে। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ, বন্য পশুপক্ষী শিকার, জঙ্গল কাটিয়া শস্যোৎপাদন, গোচারণ ইত্যাদি জীবনধারণের যাবতীয় কার্য্যে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জঙ্গলের সঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে স্থানীয় অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মিল অনেকখানি। তথাকথিত সভ্য মানুষের সমপর্য্যায়ে স্থান না দিলেও কঠোর সরল জীবন যাপনে রত এই মানুষগুলিকে জঙ্গলের পরিবেশে বেশ মানায়। "বন্যেরা বনে সুন্দর" কথাটি মনে হয় ইহাদের বেলায় খুব ভাল খাটে।

অসুররা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) বীর অসুর বা জাত অসুর এবং (২) সোইবা অসুর অথবা বিরঝিয়া অসুর। উভয় দলের জীবনযাত্রা-প্রণালী এক প্রকার হইলেও বীর অসুরেরা অনেকেই প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহ নিষ্কাশন করে এবং বিরঝিয়ারা কেহ কেহ লৌহ নিষ্কাশন করিলেও জঙ্গল কাটিয়া পাহাড়ের গায়ে বেওড় চাষ করাই ইহাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে এই প্রকারের চাষকে ঝুম চাষ বলে। এই দুই অসুর শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদির আদানপ্রদান নাই।

যে ভাষায় ইহারা কথা বলে পণ্ডিতেরা তাহার নাম দিয়াছেন অসুরী ভাষা। মুণ্ডা ও সাঁওতালী ভাষার সহিত ইহার মিল অনেকটা। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অসুর আবাল-বৃদ্ধবনিতা ছোটনাগপুরী হিন্দীতে কথা বলিতে পারে।

বীর অসুর নিজেকে বিরঝিয়া অপেক্ষা বড় মনে করে। কারণ তাহার পূর্ব্বপুরুষ "বীর অসুর" ঘোড়ার লাগাম তৈয়ার করিবার জন্য ভগবান ছত্রী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় এবং স্বয়ং ভগবান্‌ই বীরকে সেই প্রয়োজনে লৌহ নিষ্কাশন-প্রথা

একটি অসুর রমণী ফুল তুলিতেছে

শিখাইয়া দেন। বীর মুষ্ট্যাঘাতে বড় বড় শালগাছ ভূপাতিত করিয়া তাহা পোড়াইয়া কাঠকয়লা তৈয়ার করিত এবং তাহার সাহায্যে ছোট ছোট চুল্লীতে লৌহময় প্রস্তর গলাইয়া লৌহ নিষ্কাশন করিত। সেই লৌহ পিটাইয়া লাগাম তৈয়ার করিত এবং গলা লোহার পিণ্ডই তাহার খাদ্য ছিল। সেই আদি পিতা বীর হইতেই বংশপরম্পরাক্রমে লৌহ নিষ্কাশন-প্রণালী বর্ত্তমান অসুরেরা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যথাযথ রূপ বাড়িয়াছে। এই সব মূল সিদ্ধ খাইয়াই এক-প্রকার চলিয়া যায়।

এ সকল ছাড়া প্রতি অসুর-গৃহেই পালিত শূকর, ছাগল, গরু, মুরগী ইত্যাদি দেখা যায়। চরম অভাবের সময় ইহারাও কম সাহায্যে আসে না। কেহ কেহ আবার বাঁশের চুবড়ী, শাল, সেগুনপাতার ঝুঁড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করে। ঘরের কাজেও লাগে, হাটে বিক্রয় করিতে পারিলে মদ ক্রয় করিবার পয়সাও যোগাড় হইয়া যায়।

বিবাহযোগ্য অসুর যুবক
(গলায় ময়ূরপুচ্ছের হার)

হাটে যাওয়া ব্যাপারটা সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ অসুরপল্লী হইতে ইহার দূরত্ব ছয় মাইল হইতে পঁচিশ মাইল পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় প্রতি হাটে অবস্থিত সরকারী ভাটিখানা পরম আকর্ষণের স্থান। তাই দেখা যায় কেহ কেহ প্রত্যূষে হাটের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া গভীর নিশীথে অথবা পরের দিন বাড়ী ফিরিয়াছে। অবশ্য এই সময়ের অধিকাংশই কাটিয়াছে পথ হাঁটায়।

মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ কাজ। কিন্তু মহুয়া ফুল ফুটিবার সময় ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া দুই-এক বোতল মদ চোলাই করিয়া রাখে না এইরূপ পরিবার কম। সারা বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া দুই বেলা যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পারে না মদের নামে তাহারা সব ভুলিয়া যায়। মদ কেবল তাহাদের জীবনের কঠোরতায় বিস্মারক নয়, ইহা তাহাদের ধর্ম্মজীবনের অপরিহার্য্য উপকরণ।

অসুররা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে জীব মৃত্যুপূর্ব্ব আকৃতি লইয়াই পৃথিবীতে থাকে। দেহটিই কেবল হাওয়া-বাতাসের মত স্পর্শ করা যায় না। মৃত পূর্ব্বপুরুষেরাই তাহাদের পরম আত্মীয় এবং তাহাদের নিমিত্ত প্রতি অসুরগৃহে একটি প্রকোষ্ঠ পৃথক্ করা থাকে। তাহাকে "ওয়া ভিতর" বা ভিতর-ঘর বলে। এই ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি রাখা যায়, কিন্তু রাত্রে কেহ শোয় না। পরবে-পার্ব্বণে গৃহকর্ত্তা এই প্রকোষ্ঠে মুরগীর বাচ্চা বলি দিয়া মদ পরিবেশন করিয়া মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তিবিধান করে। তাহাদের বিশ্বাস জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত পূর্ব্বপুরুষেরা অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন সন্ততিগণের কল্যাণসাধন করে। ইহা ছাড়া অসুররা বিশ্বাস করে প্রতি গিরিশৃঙ্গ, গভীর জঙ্গল, নদীনালা, বড় গাছ, পর্ব্বতগুহা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রত্যেক জিনিসেরই একটি করিয়া অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে। ইহাদের কেহ কেহ মানুষের শুভানুধ্যায়ী, কেহ কেহ শত্রু-ভাবাপন্ন, আবার কেহ কেহ বা নিরপেক্ষ। সেই জন্য এই সমস্ত দেবতার তৃপ্ত্যর্থে সায়নায় অথবা "ভিতর-ঘরে" প্রতি পরব উপলক্ষে ছোট মুরগীর বাচ্চা বলি দেওয়া হয় ও মদ নিবেদন করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ অপদেবতা দুইটি—(১) বাঘুত ও (২) চুরাইল। প্রথমটি ব্যাঘ্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা এবং দ্বিতীয়টি মৃত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা। ইহাদের পরিতুষ্টির জন্য বইগা নামধেয় বৈদ্য

ভূতপ্রেতের তুষ্টিবিধানেরত বইগা বা পুরোহিত

বা পুরোহিত আছে—তুক্তাক আছে। বস্তুতঃ মদ না হইলে এই সমস্ত কৃত্য হয় না। স্বয়ং ভগবানই নাকি তাহাদের আদিপুরুষকে মদ তৈয়ারীর প্রণালী শিখাইয়াছিলেন। বেওঁর চাষই ত ছিল তখন প্রধান উপজীবিকা। সেই বেওঁড় বড় বড় শশা উৎপন্ন হইত। এই শশার এক মুখ কাটিয়া বাখু (Ferment) সাহায্যে মদ তৈয়ার হইত।

চাউল, ভুট্টা, মহুয়া ইত্যাদি হইতে মদ তৈয়ারি করা পরে শিখিয়াছে।

শুভাশুভ কার্য্যের উপর পরলোকবাসীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ইহাদের জীবনে এত প্রগাঢ় যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদি যাবতীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাদির সংঘটন সমস্যার সমাধান সহজেই হইয়া যায় মহাদেব ও তদীয় সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতীর কাহিনী অবতারণায়।

এত সব সত্ত্বেও আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ত্রুটি কমই লক্ষিত হয় নাই। পরিবারের কর্ত্তার কথাই সর্ব্বোপরি। তাহার কথাই অন্যদের মানিয়া চলিতে হয়। আবার কয়েকটি পল্লীর বৃদ্ধ পুরুষদের লইয়া পঞ্চায়েৎ আছে। পঞ্চায়েতে ঝগড়া, বিবাদ, অন্যায় কার্য্যাদির বিচার হয়, শাস্তিবিধান হয়—সমাজে থাকিতে হইলে এই বিধান শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আবার সামাজিক রীতি-নীতির বিশেষ কোন ব্যত্যয় হইলে "কুটুমায়েৎ" ডাকা হয়। অসুর জাতির সমুদয় পরিবার হইতে বয়স্ক পুরুষ-প্রতিনিধির এই কুটুমায়েতে উপস্থিত থাকা নিয়ম। এই সমাবেশে যাহা ঠিক হইবে তাহাই সমগ্র জাতির নির্দ্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে। কুটুমায়েৎ আহ্বানকারী "লোটাদার" আছে। সে এক লোটা জল লইয়া পল্লীতে পল্লীতে অসুর মাতব্বরদের আহ্বান করিয়া আসিবে। সমাবেশে বয়স, বাকচাতুরী এবং আথিক অবস্থা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। এই তিন বিষয়ে যে ব্যক্তি উচ্চ সে-ই এই সব সমাবেশে নেতৃত্ব করে। সাঁওতালদের মত সুপরিচালিত সমাজ-শাসকগোষ্ঠী ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও শত শত বৎসরের সংস্কার ইহাদের মধ্যে জাতির প্রতি অনুরাগ ও বশ্যতা-স্বীকারের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং জাতীয় সংহতিরক্ষায় ইহাদিগকে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

রাজগৃহ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তথাগত, আজ এসেছি তোমার স্মৃতি-বিপ্লুত দেশে,
আবার কি তুমি নূতন করিয়া দাঁড়াবে সমুখে এসে ?
স্নিগ্ধ শান্ত গভীর কণ্ঠে তোমার অমর বাণী
মনে হ'ল যেন ধ্বনিয়া উঠিবে, ঘুচিবে সকল গ্লানি।

গিরিব্রজেতে গিয়েছি আমরা পঞ্চ পাহাড় ঘেরা,
সুদূর অতীত নিকটে এখনো যেথা করে ঘোরাফেরা।
ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুরে
আসিল গোপনে কি ছদ্মবেশে, কোন্ গিরিপথ ঘুরে।

বিম্বিসারের রাজধানী হেথা—মগধের অধিপতি,
বুদ্ধের রাজশিষ্য প্রধান, পরম ধর্ম্মে মতি,
লভিল তাঁহার অপার করুণা নৃপতি ভাগ্যবান।
গৃধ্রকূটের নির্জ্জন গুহা—সে যে পুণ্য স্থান।

এইখানে সেই অমিতাভ আসি বিতরিল উপদেশ—
অমৃত-ভারতী—শিষ্যবর্গে করিয়া যে উদ্দেশ।
ভাবেছি কি আমি ? মনে হ'ল যেন হেথা বেণুবনে এসে
শুনিতেছি বাণী বুদ্ধের পানে চাহিয়া নির্নিমেষে।

অজাতশত্রু রচিল প্রাকার—আজো যেন দুর্জ্জয়,
কত যে চৈত্য, কত স্তূপ, যুগ-যুগান্তে নাহি ক্ষয়।
যেথা বয়ে যায় স্তিমিত তপোদা দুর্গপ্রাকার-মূলে,
আবাস নিয়েছি সেই মন্থর সরস্বতীর কূলে।

জ্ঞানের তীর্থ—হোথা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
সারা পৃথিবীর বিদ্যার্থীর চিত্ত করিল জয়।
শ্রেষ্ঠ আসন—শীলভদ্রের কোন্ শিলাসনখানি,
প্রাচীরে প্রাচীরে প্রহত আজো কি দীপঙ্করের বাণী ?

প্রাচীন অতীত আজো জীবন্ত এই রাজগৃহ মাঝে,
কত সহস্র বর্ষ হেথায় মূর্ত্ত হইয়া আছে।
লক্ষ রথের চক্রচিহ্ন-অঙ্কিত রাজপথ,
মনের মননে গরিমা তাহার ভাসিছে বপ্নবৎ।

মহাবীর তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করিল হেথায় এসে,
শত সাধকের সাধনার স্মৃতি বাতাসে বেড়ায় ভেসে।
বুদ্ধ, তোমার শরণ লইল কত রাজ-মহারাজ,
খুঁজিতেছি সেই চরণের রেণু এই ধূলিকণা-মাঝ।

নর্ম্মদা অঞ্চলে শারদীয় উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

শরৎ এসেছে তার সোনালী আকাশ আর মিষ্টি বাতাস নিয়ে। চার দিক থেকে যেন আগমনী-গীতি ভেসে আসছে। মনটা হঠাৎ আনন্দে ভরে গেল, কিন্তু তার পরই এল অবসাদ, সুদূর খাণ্ডোয়ার খাণ্ডববনে আনন্দময়ীর আগমন হবে কি? মনে পড়ল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলামায়ের কথা। যদিও আজ রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখণ্ডিত, বাংলার বুকের উপর দিয়ে বহু অত্যাচার, বহু রক্তপাত হয়ে গেছে, তবু সর্ব্বহারা রিক্ত বাঙালীর মুখেও ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠবে।

কিন্তু এদেশে সে উৎসব নেই। শরতের প্রারম্ভে গণেশ-চতুর্থী এল, মহারাষ্ট্রীয় আর হিন্দুস্থানীদের ঘরে ঘরে গণেশ-উৎসব জাঁকজমক করে শেষ হ'ল। তারপর দুর্গাপূজা। বিল্বষষ্ঠী চলে গেল, সপ্তমী চলে গেল, অষ্টমীর দিন মনে হ'ল এক বার খুঁজে দেখতে হবে এ অঞ্চলে শারদোৎসবের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা। জানলাম এ সময়ে শহরের বাইরে সুদূরে একপ্রান্তে ভবানীর মন্দিরে উৎসব চলে। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে সেদিকে চললাম, শহর ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটল মন্দির অভিমুখে। শহরের দৃশ্য তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। অপরিচ্ছন্ন অলিগলির রাস্তাও অনেক আছে; ওগুলো অতিক্রম করে গ্রাম্য রাস্তা ধরে গাড়ী চলল। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর টুকরো টুকরো কালো পাথর বসিয়ে তৈরি, দেয়ালের গায়ে গিরিমাটি দিয়ে বিবিধ চিত্র এঁকে রেখেছে, ঘরের চালে দু'একটা কুমড়ো গাছ, ঝিঙেগাছ লতিয়ে উঠেছে, দু'চারটি শিশু এধার ওধার খেলছে, পরনে হয়ত রাউজ ঘাঘরা, নয়ত ইজের কুর্ত্তা। মন্দির-প্রাঙ্গণে গাড়ী এসে থামল। অর্দ্ধ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের মধ্যে ছোট-খাটো মন্দির।

মন্দিরের সামনেই দীপমালা। পাথরের একটি অনুচ্চ স্তম্ভ, তার চারদিকে দীপ রাখবার জন্য হুকের মত ইট গেঁথে রেখেছে। পুজোয় ও দেওয়ালীতে যখন এর ওপর প্রদীপ জ্বালান হয় তখন বড় সুন্দর দেখায়—ঠিক যেন একটি আলোক-স্তম্ভ। চারদিকের অসংখ্য মাটির প্রদীপের আলোকশিখা হাওয়ায় দুলে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে।

ভবানী মন্দিরটি অতি পুরানো, ছোট ও বিশেষত্বহীন। মন্দিরমধ্যে কালো পাথরের ভবানীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবাদ, কালাপাহাড়ের আমলের এই মূর্ত্তি—কালাপাহাড় নাকি দেবীর নাক কেটে দেয়। তখন থেকে দেবী "নাকটি ভবানী" নামে আখ্যাত হয়েছেন। দেবীর এই নামের কারণ সত্য কিনা পূজারীকে জিজ্ঞাসা করায় বললে, ওগুলো বাজে কথা। বছরের পর বছর দর্শকেরা দেবীর কপালে ও নাকে সিন্দুর হলুদ ঘষে আসছে, ঘষতে ঘষতেই দেবীর নাক ক্ষয় হয়ে গেছে ও দেবী 'নাকটি ভবানী'তে পরিবর্ত্তিত হয়েছেন। দেবী নাকি বড় জাগ্রতা।

বিজয়া দশমী! বাংলাদেশে আজ মায়ের বিসর্জ্জন। সারা বছরের প্রতীক্ষা, আশা আনন্দের অবসান করে আজ মা পতিগৃহে যাত্রা করবেন। বিকেলের দিকে অবসর নেই, প্রত্যেক পূজামণ্ডপে মায়ের আরতি করে পাদবন্দনা হচ্ছে। তারপর বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে জগজ্জননীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল নদীতীরে। সারি সারি বহু সুন্দর প্রতিমা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিসর্জ্জনের জন্য। চারদিকে ভিড়, হৈ চৈ—শিশুরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে এসেছে বিসর্জ্জন দেখতে। ছেলে বুড়ো যুবক হৈ চৈ-এর মধ্যে দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়ে ম্লান মুখে ঘরে ফেরে। সমবয়সী সমবয়সীতে হয় কোলাকুলি, বড়দের করে প্রণাম। মায়েরা সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে আপ্যায়িত করেন। এই দিনে এই ক্ষণে সবাই ভুলে যায় মনোমালিন্য হিংসা-বিদ্বেষ।

কিন্তু এ অঞ্চলে আগমনীগীতিও নেই, বিদায়গীতিও নেই, তাই মাতৃবিদায়ের মুহূর্ত্ত মনকে বেদনায় করুণ করে তোলে না, তার পরিবর্ত্তে এদেশবাসীরা আনন্দে দশেরা উৎসবের জন্য তৈরি হতে থাকে। সুদূর খাণ্ডোয়ায় যে ৮।১০ ঘর প্রবাসী বাঙালী আছেন, তাঁদের মধ্যে তৎপরতা দেখা যায়। শিশুরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নূতন জামাকাপড় পরে। সবাই বেরিয়ে পড়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রবাসে মিলনকে মধুময় করে তোলবার জন্য।

এ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী চামড় ও বরুরা। এদের দশেরার দিনের বিশেষ উৎসব "ভুজরিয়া"। এদের প্রধান দেবী হচ্ছেন শীতলা দেবী। শহরের বাইরে বটের ছায়ায় শীতলা দেবীর মন্দির। যাদের পরিবারে শীতলা মাঈ-এর আবির্ভাব হয়েছে, যাদের মনোমত বিয়ে হচ্ছে না বা যারা নানাবিধ সাংসারিক অসুবিধায় ভুগছে, তারা এই দেবীর কাছে মানত করে। "নওরাত্রের" সময় নবদুর্গা যখন ঘটে অধিষ্ঠিতা হন, তখন এরা নিজেদের গৃহাঙ্গনে জমি নিকিয়ে তাতে একটা নূতন মাটির কলসী রাখে, তাতে সারমাটি, গোবর ইত্যাদি পূর্ণ করে গম বুনে রাখে। বুনবার আগে গমগুলি কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, সারমাটিতে পড়ে শীঘ্রই সেই ভেজা গমের অঙ্কুরোদগম হয় ও সেগুলি নয় দিনের ভিতর সুন্দর সবুজ ছোট কিশলয়ে পরিণত হয়। এই কচি কিশলয়-

গুলিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার জন্য একটি কাপড় পর্দার মত টাঙিয়ে রাখে। ধীরে ধীরে আত্মীয়কুটুম্ব অতিথি অভ্যাগত আসতে সুরু করে, উৎসব জমে ওঠে। পর্দা সরিয়ে লোকেদের এক পাশে বসতে দেওয়া হয়, তাদের গমের সবুজ চারাগুলো দেখান হয়, এগুলোকে "ভুজরিয়া" বলে। ভোগ দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া হয়, গান বাজনা চলে; যে যে বাড়ীতে মানত করা হয়েছে সেই সেই বাড়ীর এক এক জন বয়স্ক পুরুষ বা মেয়ে নয় দিন উপোস করে থাকে—শুধু চা, দুধ, ফল মাত্রমাত্র খায়। যার শরীরে দেবীর আবির্ভাব হয়, সে তখন নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে। নয় দিন পর দশেরার দিন মহা ধুমধাম করে তারা চলে শীতলা মাঈ-এর পূজা দিতে। মাদলের মত বাজনা বাজতে থাকে। মেয়েপুরুষ সবাই স্নান করে আসে। মেয়েরা নূতন রঙীন শাড়ী পরে গয়নাগাঁটিতে সেজে গুজে বের হয়। চার জন বউ বড় কলসীর "ভুজরিয়া" ছোট চারটি মাটির কলসীতে ভাগ করে মাথায় তুলে নেয়। অন্য মেয়েদের কারও হাতে ধুনুচি থাকে তাতে খুব ধূপ ছাড়তে থাকে। কারও হাতে একটা থালাতে থাকে হলুদ, সিন্দুর ও প্রদীপ।

মাদল বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ সবাই শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। যার উপর দেবীর ভর হয়েছে সে বাজনার তালে তালে প্রবলবেগে নাচতে থাকে। বউরা "ভুজরিয়া" মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে, আর যারা মানত করেছিল সেই মেয়েরা রাজপথের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে করতে শীতলা দেবীর মন্দিরে পৌঁছে। সেখানে দেবীর চরণে "ভুজরিয়া" রেখে পুজো দেয়। দেবাবিষ্ট লোকটিকে স্নান করায়, তখন তার শরীর থেকে দেবীর তিরোধান হয়ে যায়—তারপর তারা ঘরে ফিরে আসে।

বিকেলের দিকে রাবণ জ্বালানো উৎসব সুরু হয়। এটা হ'ল জনসাধারণের আনন্দ-উৎসব। আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটি খোলা ময়দান আছে। সামনের রাজপথটা বেঁকে তারি পাশে চলে গেছে, রাস্তার দু' পাশে সারি সারি বড় বটগাছ ডালপালা মেলে রাস্তাটিকে সুন্দর সুশীতল ছায়াকীর্ণ করে রেখেছে, সেই রাস্তা ধরে চললে খোলা ময়দানে পৌঁছান যায়। সেখানেই মেলা বসবে ও সন্ধ্যায় 'রাবণ জ্বালানো' হবে। বিকেলের দিকে টাঙ্গায় ঘোড়ার, বইল গাড়ীর বইলের গলায় ঘুঙুরের টুং টুং আওয়াজ রাস্তা মুখরিত করে তুলল। দলে দলে ছেলে, বুড়ো, যুবক, নারী লেগেছে রাবণ জ্বালানো উৎসব দেখতে। এদেশে সব আনন্দ-উৎসবেই পুরুষদের মত মেয়েদেরও অবাধ গতি। কত দেশের, কত বয়সের মেয়ে, তাদের পোশাকই বা কত রকমের। কেউ বা ঘাঘরা ওড়না পরেছে, কেউ বা কাছা দিয়ে আঠারো হাত শাড়ী পরেছে, কারও বা পরণে সালোয়ার পাঞ্জাবী। তবে অধিকাংশই পরেছে রংবেরঙের শাড়ী হিন্দুস্থানী প্রথায়। নাকে নাকছাবি বা নথ, কানে বড় বড় সোনা রূপার ফুল, পায়ে মোটা মোটা পাইজোর, সিঁথিতে লম্বা করে টানা ডগডগে সিন্দুর, চোখে কাজল, গালভরা পান, মাথায় রঙীন ওড়না, মনে করিয়ে দেয় এরা অবাঙালী।

যানবাহনও বিচিত্র রকমের। বইল গাড়ীগুলি বড় সুদৃশ্য। সযত্নে রক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট বইলগুলি টাঙ্গার ঘোড়ার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ছোট একখানা কাঠের তক্তা চার চাকার উপর মজবুত করে বসান আছে, দু'পাশে লম্বা সরু সরু কাঠের জালি। রংবেরঙের ডোরাকাটা কাপড়, বা ফুলতোলা রঙীন কাপড় দিয়ে চু'কিনারা ও উপরটা ঢেকে দিয়েছে, দূর থেকে মনে হয় একখানা রঙীন নৌকা। গাড়ীর মধ্যে সতরঞ্চি বিছিয়ে, নরম খড়ের বিচালী ছড়িয়ে গাঁয়ের বৌঝিরা বসে উৎসব দেখতে এসেছে। আধ কপাল ঢাকা ঘোমটার নীচে মাঝে মাঝে এক একখানা কোমল মুখ কখনও কখনও ভেসে ওঠে। সেই মুখশ্রী দেখলে অবাক হতে হয়। গরীব চাষীদের ঘরেও কেমন সুন্দর মেয়ে।

কোন কোন বইল গাড়ী দেখতে ভারী মজা লাগে। দু' চাকার উপর সুদৃশ্য একখানা রেলিং দেওয়া কাঠের তক্তা বসানো, তাতে দুটো ঘোড়া জুতে আরোহী বল্গা ধরে গাড়ী চালাচ্ছে, দেখে মনে হয় যেন অতীত যুগে ফিরে গেছি।

উন্মুক্ত প্রান্তরে মেলা বসে গেছে। মেলাতে সুন্দর সুন্দর কাগজের ফুল পাখী, কাঠের তলোয়ার, বাঁশী ও রকমারি মাটির খেলনা ইত্যাদি শিশুদের আনন্দবর্দ্ধন করছিল। মেলাশেষে শিশুরা তাদের কচি কচি হাতে ওগুলো আঁকড়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরছিল।

ময়দানের একপাশে একটা ঝরণার ক্ষীণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে একটা ছোট্ট মন্দির, মন্দিরটি হনুমানজীর। ভিতরে শ্বেত পাথরের তৈরি হনুমান। সেই মন্দিরের একটু দূরে এক বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্ত্তিটি ৩০।৪০ ফুট উঁচু, আর তার পরিধিও প্রায় ১০।১৫ ফুট। মূর্ত্তিটির কাঠামো বাঁশের তৈরি, তার উপর লাল নীল সবুজ কাগজ জড়িয়ে সুদৃশ্য করা হয়েছে। এই বিরাট মূর্ত্তিটি হ'ল দুরাচার রাবণের। দশেরার দিন রামচন্দ্রজী রাবণ বধ করেছিলেন, তারই স্মৃতি-রক্ষার্থে বছরের পর বছর এই বিরাট রাবণ তৈরি করে দশেরার দিনে জ্বালান হয়। যত দর্শক মেলাতে আসে সবাই তাতে ঢিল ছুঁড়ে আনন্দ পায়। সন্ধ্যার সময় তুমুল তাণ্ডবের ভিতর রাবণের মূর্ত্তিতে আগুন দেওয়া হ'ল, লোকেরা গালিগালাজ করে আর ঢিল ছুঁড়ে তাদের মনের রাগ-বিদ্বেষ প্রকাশ করছিল। বহুদূর থেকে রাবণের আগুনের হল্কা আর ধোঁয়া দেখা যেতে লাগল। যুগ যুগ ধরে রাক্ষসরাজ রাবণের কাল্পনিক মূর্ত্তির অপমান করে আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ সীতাহরণের প্রতিশোধ তুলছে। এই অনুষ্ঠান

থেকেই বুঝা যায় রামচন্দ্রজী আর সীতামাঈ-এর উপর জনসাধারণের কি প্রগাঢ় ভক্তি আর বিশ্বাস।

উৎসব শেষ হলে দলে দলে ছেলেরা আর পরিচিতেরা 'চাদিসোনা' (অশ্ম পাতা) মুঠি ভরে নিয়ে এল সকলের হাতে হাতে 'চাদিসোনা' দিয়ে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাতে।

খাণ্ডোয়ার পূজার আনন্দ তখনও মেটে নি, তারপরই এল কোজাগরী পূর্ণিমা তার রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারা ছড়িয়ে। এল অমাবস্যা, গাঢ় আঁধারে নগরী ডুবে গেল, অধিবাসীরা ঘরে ঘরে দীপমালা পরিয়ে নগরী আলো করে তুলল। চারদিকে রোশনাই, পটকাবাজী, আতসবাজী, রকমারি বাজী খাণ্ডোয়ার আকাশ-বাতাস বারুদে ভরে দিলে। বড় বড় শেঠদের আবাসগৃহ আর দোকানপাট আলোকমালা পরে ঝলমল করতে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যাণ্ডপার্টির সুমিষ্ট বাদ্য শহর সরগরম করে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে দোকানে দোকানে ঝাঁকজমক করে পান সুপারির উৎসব চলল। কল্যাণময়ী বোনদের স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে ভাইদোজ (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) উৎসবও শেষ হ'ল।

আবার এক দিন বিকেলে দামামা বেজে উঠল, শিঙার আওয়াজ কানে আসতে লাগল, আজ মোষের লড়াই। আশপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের বলিষ্ঠ মোষগুলোকে নিয়ে এসেছে মোষের টক্করের জন্য। এদেশে বলে "ভেলার টক্কর", মানে মোষের লড়াই।

এক-একটা মোষ দেখবার মত, খেয়ে খেয়ে সুপুষ্ট, মসৃণকান্তি। তাদের মালিকেরা মোষের কপাল মাথা হলুদ আর সিন্দুর দিয়ে রঞ্জিত করে রেখেছে, শিংগুলো রং দিয়ে লাল করেছে, মোষের কালো কুচকুচে রঙের উপর হলুদে আর লাল রং দিয়ে অদ্ভুত চিত্র করে রেখেছে, এক-একটাকে দেখলে আতঙ্ক লাগে, মনে হয় জগজ্জননীর হাতের বর্শামুক্ত হয়ে মহিষাসুর বুঝি খাণ্ডোয়ার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

সারা দুপুর রকমারি বাজনা বাজতে লাগল। লোকেরা মোষগুলোকে বেশ করে দেশী মদ খাইয়ে টক্করের জন্যে তৈরি করতে লাগল। বেলা পাঁচটার মধ্যে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ এসে ময়দান ভরে ফেলল। পুলিসের লোকেরা চারদিক ঘুরে ঘুরে জনতাকে দূরে সরিয়ে ময়দান খালি করে দিলে যাতে মোষগুলি বেশ ভাল করে লড়তে পারে, আর ছুটে গিয়ে জনতাকে আহত করতে না পারে। খেলোয়াড়রা মোটা রকমের বাজী রেখে খেলে, যার মোষ জিতবে, সেই এই বাজীর টাকা পাবে। দু'পক্ষে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলে, নির্দিষ্ট সময়ে শিঙা ফুঁকল, বাজনা তালে তালে বাজতে লাগল। দুটো ভীষণাকৃতি "ভেলা" নিয়ে তাদের মালিকরা রণাঙ্গনে এসে দাঁড়াল। উভয়ে উভয়ের মোষকে পিঠ চাপড়ে নিজ নিজ ভাষায় উৎসাহিত করে সরে দাঁড়াল। দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে খেলা দেখতে লাগল।

ভেলা দুটো ক্রীড়াঙ্গনে চুপ করে মিনিট কয়েক দাঁড়াল, তীব্র দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নুইয়ে শিং বেঁকিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করলে, শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি লাগল। একটা ভেলা আর একটা ভেলাকে শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল প্রাণপণে। দুটো ভেলাই সমান জোয়ান হলে, সাধারণতঃ শিঙের উপরই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। একটা ভেলা আর একটা ভেলার শিঙের ভিতর নিজের শিং আটকে প্রবল বেগে ধাক্কা মারতে মারতে পিছে হটিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। দুটো ভেলার পায়ের দাপটে জমিতে ঠকাঠক আওয়াজ হচ্ছিল, চারদিকে ধুলো ছিটকে পড়তে লাগল, দর্শকেরা ভয়মিশ্রিত আনন্দে চেঁচামেচি সুরু করে দিলে। যারা বাজী রেখে খেলছিল, তাদের মুখ আশা-নিরাশায় উজ্জ্বল ও ম্লান হয়ে যেতে লাগল। মোষের মালিকেরা গ্রাম্য কথায় মোষগুলোকে বাহবা দিতে লাগল, জোরে জোরে বাজনা তালে তালে বাজাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ভেলা এক নিমেষে অপর ভেলাটাকে শিঙের গুঁতো মেরে কাবু করে পিছু হটিয়ে দিল। সেটা প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। তারপর জয়ী ভেলা বিজয়গর্ব্বে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়াল—চোখ দুটো লাল টকটকে, নাসারন্ধ্র স্ফীত। দর্শকেরা জোরে হাততালি দিতে লাগল, মোষের মালিক হাসিমুখে সগৌরবে তার পালোয়ান মোষ আর বাজীর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে চলল—খাণ্ডোয়ার শারদোৎসবের শেষ পর্ব্ব সমাপ্ত হ'ল।

"কে দিল আবার আঘাত..."

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

১

নবপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বিমান। যৌবনের প্রারম্ভে লিখেছে প্রেমের উন্মেষের গল্প, যৌবনে আলোচনা করেছে গভীর প্রেমতত্ত্ব আর আজ অপস্রিয়মান যৌবনে লিখছে বসে উদাস প্রেমের কাহিনী। এত যে লিখেছে নরনারীর প্রেমকথা, এক দিক দিয়ে ধরতে গেলে বলতে হবে তা সবই প্রায় কল্পনাপ্রসূত, শুধু ঐ প্রথম দিকের প্রেম-উন্মেষের অধ্যায়টি ছাড়া। সেটা ছিল তার নিজের বাস্তব জীবনের আলেখ্য।

২

বিমানের বুকে দাগা দিয়ে পালিয়েছে শিখা। যেন সে বিদ্যুৎশিখাই। দীপ্তি তার ক্ষণিকের, কিন্তু তা মর্মমূলস্পর্শী। কত দিনকার কত লুকোচুরি করে পাওয়া তার দেখা! নদীর বাঁক ঘুরে কত গাছতলায় বসে কত সদ্য-রচিত কবিতা, গল্প-পাঠ! পাঠক ও শ্রোত্রীর মন নিবিড় হয়ে মিশে একাকার হয়েছে, সে কি কাহিনীর জমজমাট বিবৃতি অবলম্বনে, না তরুণ-তরুণীর সান্নিধ্যের মোহনমন্ত্রে?

পাহাড়ের পাদদেশে সেই শুভ্র পাথরখানি শিশিরস্নাত হয়ে বুক পেতে আজও যে অপেক্ষা করে আছে তা বিমান দেখেছে মাঝে মাঝে গিয়ে। ঐখানেই তাদের শেষ দেখা। ঐ ধপধপে সাদা পাথরের এক প্রান্তে সেদিন শিখা বসে বিমানকে বলেছিল, আকাশের রং দেখেছ?

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে আবার বললে, বসো একটু এইখানটায়, কাল ত চলেই যাব।

এই চলে যাওয়া যে চিরকালের জন্যেই যাওয়া তা সেদিন কে জানত! সেই সন্ধ্যায় তারা দু'জনে বসে বসে সূর্য্যাস্ত দেখেছে একসঙ্গে। সত্যি কত সৌন্দর্য্যেভরা রাঙা আকাশ-খানি অথচ সাঁঝের ম্লানিমার অন্তরাল ছিল বুঝি কত অব্যক্ত বাণী-সম্বলিত! সেদিন তাদের মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি বেশী, হৃদয় ছিল তাদের বিদায়-আবেগে ভরা। বাতাসও ছিল না মুখর সে সন্ধ্যায়। ঝিরঝিরে মৃদু তাষণের গুঞ্জন ছিল শুধু। কি তার অর্থ কেউ ত বোঝে নি!

৩

তার পরেই সেই মর্মান্তিক রেল-দুর্ঘটনা! পুলের উপর থেকে ট্রেনের পিছনের কয়েকখানা কামরা লাইনচ্যুত হয়ে একেবারে নদীর বুকে! কত লোকের অন্তিম আর্তনাদ, কত ঘরে হাহাকার। পর পর তিন দিন ধরে মৃত ও আহতদের নাম বেরুতে লাগল কাগজে। মৃতদের তালিকায় শিখার নাম!

সেই হতে বিমান জীবনের সম্বল করেছে কলমকে। কিন্তু সে লেখনীনিঃসৃত রস শুধু আর সবুজ নয়, বিবিধ রঙের। এই দীর্ঘ জীবনভোর ভারতীর চরণে কতই না রং-বেরং ছোপ লাগিয়েছে!

খ্যাতি পৌঁছেছে দেশ ছাড়িয়ে সুদূর বিদেশেও। বিদেশেও যে এত বাঙালী পাঠকপাঠিকা থাকতে পারে তা জানা গেল এই বাংলা লেখার দৌলতে। কত সমঝদারের চিঠি আসে, কত লোক দেখা করতেও আসে।

সেদিন অপরাহ্নে দেখা করতে এলেন আমেরিকার একটি ভারতীয় মিশনের ব্রহ্মচারিণী ভগিনী বেদানন্দ বাঈ। এঁর সঙ্গে অনেক দিন হতে পত্রালাপ চলেছে। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। বিমান শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করে বসাল। দীর্ঘ কিন্তু ঘন শুভ্র কেশদামশোভিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অপূর্ব্ব মুখাবয়ব। তাঁর সন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বিমানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট। বিমান অবাক হয়ে তাঁর শান্ত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রইল। গৈরিকপরিহিতা আশ্রমবাসিনীর সঙ্গে শুধু যে গভীর তত্ত্বই আলোচনা হ'ল তা নয়। বিমানের গল্প লেখার কথা সহজেই উঠে পড়ল। বস্তুতঃ তাদের পত্রালাপ ত ঐ গল্প নিয়েই। সন্ন্যাসিনী হলেও সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বিনী যেন নন্ তিনি। সংসারের নরনারীর সুখ-দুঃখের প্রতি দরদকেও তাঁর ধর্মের অন্তর্ব্বর্তী বলে মনে করেন। তাই তিনি তাঁর চিঠিতে বিমানের অনেক বইয়ের সূক্ষ্ম সমালোচনা করে পাঠিয়েছেন। আজও সেই সব আলোচনা চলতে লাগল সাক্ষাতে। বিমান মন্ত্রমুগ্ধের মত এই মহীয়সী মহিলার কথা শুনছিল। এত খুঁটিয়ে এমন মন দিয়ে তার লেখা কেউ পড়ে তা তার জানা ছিল না। নিজের যা কিছু বলবার ছিল তা যেন আজ স্তব্ধ। তার মনে হচ্ছিল কি একটা আকর্ষণে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে তার মন এই মহিলার প্রতি! শ্রদ্ধা? তা হবে। এই রকম একটা শ্রদ্ধার শক্তি তার উপর আরোপিত হয়েছিল—সে বহুকাল আগে। শিখা? হ্যাঁ, শিখারও শক্তিপ্রভাব তার বুকে তীরের মত আজও বিঁধে আছে। যেদিন শিখার প্রতি শ্রদ্ধা তার অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছিল, বিমানের মনে হয়েছিল তার কৈশোরে হারানো মায়ের কথা। আর আজও এই ক্ষণে মনে হচ্ছে মায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিখার স্মৃতিও চিত্তে

জাগে। এ কি অপূর্ব্ব আলোড়ন অন্তরে! সকল প্রশ্ন আবার কি একই সুরে গাঁথা?

হঠাৎ এক সময় ব্রহ্মচারিণী বললেন—আজ উঠি তবে। বিমান চমকে উঠল। তাই ত সে ছিল কোন্ রাজ্যে?

৫

এতক্ষণ ব্রহ্মচারিণী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করেই কথা কয়েছেন যদিও তাতে ঘনিষ্ঠতার স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু একবারটিও তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে নি। প্রথম দর্শনের অভিবাদন দূর হতে জোড় করে মস্তক হেলনেই সমাধা হয়েছে, কিন্তু এখন বিদায়বেলায় ভেদানন্দ যাই উঠে এগিয়ে এসে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিলেন পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রথায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর আবেগভরা হাসির ছটায় সমগ্র আননখানি হয়ে উঠল উজ্জ্বল। বিস্মিত, স্তম্ভিত বিমান সেই উজ্জ্বল হাসির আলোকে চিনে ফেলে চীৎকার করে উঠল—"শিখা!"

পরমুহূর্ত্তেই শিখার প্রসারিত হাতখানি নিজের দুই হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললে, বস বস, ব্যাপার কি বল ত?

৬

বলছি শোন, সব বলছি। সেই যে তুমি হাতব্যাগটা আমায় উপহার দিলে যাবার দিন, সেইটিই প্রথম খবরের গোল পাকিয়েছে। ব্যাগটার মধ্যে টাকাপয়সা নোটবুক সবই পুরে নিয়েছিলাম। ব্যাগটা এত সুন্দর ছিল যে ট্রেনে বসে যেই একবারটি স্যুটকেস হতে বার করেছি, অমনি আমার সামনের বেঞ্চির একটি মেয়ে বলে উঠল "বাঃ! কি সুন্দর ব্যাগটা আপনার? দেখি না একবারটি।" দিলাম ওর হাতে।

তার পরই যে কি হয়ে গেল কে জানে! হঠাৎ যেন এক সঙ্গে পাতালে প্রবেশ করলাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি আমি একটা ডিঙি নৌকোয়। জেলেরা পাল তুলে তর্ তর্ করে নৌকো চালিয়ে চলেছে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি চুড়ি নেই। কানে হাত দিয়ে বুঝলাম দুলও গেছে। জেলে তো নয়, এ যে দেখছি ডাকাত। ওদের রকমসকমেও বুঝলাম দুরভিসন্ধি। ভয়ে আমার আমার প্রাণ উড়ে গেল। চুপ করে পড়ে রইলাম, চোখ রাখলাম নৌকার বাইরের দিকে। একটু পরেই দেখলাম উল্টো দিক হতে একটা নৌকা আসছে। কাছে আসবার একটু আগে থাকতেই চীৎকার করে উঠলাম, "বাঁচাও, বাঁচাও, ডাকাত ডাকাত!" মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা জেলে এসে আমার মুখ ও গলা চেপে ধরলে। আমি তবুও অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলাম। ওদিকে সেই নৌকাও আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। তাদের ঠেকাতে এরা লড়াই যুদ্ধ করে দিলে। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় বেশী। জেলেরা নিরুপায় মুখে আমায় ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে জলে। আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

এবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি একটা হাসপাতালে কিন্তু আমার কথা বলবার শক্তি নেই। আর আমাকে কথা বলাতে চেষ্টাও কেউ করছে না। বোধ হয় ডাক্তারের বারণ ছিল।

পরদিন দুপুরে দেখি নার্স একটা খবরের কাগজ পড়ছে। আমি হাত বাড়িয়ে কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। নার্স তা দেখেও যেন বুঝল না। কিন্তু বুঝেছিল ঠিক, কিছু পরে তার নিজের পড়া শেষ করে আমার হাতে কাগজটা দিয়ে গেল। সেই কাগজে পড়লাম, "রেল-দুর্ঘটনায় আর একটি নারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দেহটা ঘটনার তিন দিন পরে, প্রায় তিন শত মাইল দূরে এত গলিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যে তাহা সনাক্ত করা কঠিন, তবু তাহার হাতের মুঠোয় প্রাপ্ত একটা ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে একটা নোটবুকে নাম লেখা আছে 'শিখা সোম'।"

বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে বিমান অস্ফুট কণ্ঠে বললে, কি আশ্চর্য্য! তার পর?

তারপর যখন আমার কথা বলার শক্তি ফিরে এল, একজন গৈরিকবসন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এসে আমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন। একে আরও কয়েকদিন দেখেছিলাম আগে হাসপাতালে। বুঝলাম হাসপাতালটা কোন আশ্রমের প্রতিষ্ঠান।

আমার মনে তখন আলোড়ন চলেছে। ভাবছি—শিখা সোম ত মরেছে, আপদ চুকেছে। এখন তবে এই নূতন জীবনটা নূতন ভাবে চালাই। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমার কোন নাম নেই, ধাম নেই, আত্মীয়স্বজন আর কেউ নেই প্রভু! আপনারা বাঁচিয়েছেন আমায়, এখন আপনারাই আমার সব। আপনাদের আশ্রমের কাজে যদি দয়া করে আমায় লাগান তবে এ হতভাগিনীর জীবন ধন্য হয়ে যায়।

তিনি এইভাবে বুঝলেন, হিন্দুনারীর সঙ্কটময় অবস্থা। যে বালিকা একবার দুর্বৃত্তের হাতে গিয়ে পড়েছে সে যদি তাদের হাত থেকে উদ্ধারও পায় তবু হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হতে উদ্ধার পাবার যো নেই। সেই ভেবেই হয়ত আমি আর সমাজ বা সংসারে ফিরতে চাইছি না। তাই কোন হদিসও দিচ্ছি না।

বিমান অধৈর্য্য হয়ে এইখানটায় বলে উঠল—কিন্তু আমি ত ছিলাম শিখা!

হ্যাঁ, তুমি ছিলে, কিন্তু—

এইটুকু বলেই উদাস ভাবে জানলায় ফাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে শিখা।

'কিন্তু' কি? বিমানের ধৈর্য্য মানে না—বল বল কিন্তু

কি? ওঃ! তুমি বুঝি ভাবলে সেই পুরাকালে রামচন্দ্রই যদি সীতাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, তবে আমি কি আর—

বাধা দিয়ে শিখা বললে, না না, তা নয়। আমি বিশ্বাস করি অতীতের রামচন্দ্রের চেয়ে আধুনিক অনেক রামচন্দ্র উন্নত। কিন্তু তবু—

এই পর্য্যন্ত বলে একটু থেমে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কোন অতীতের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে ধীরে অতি শান্তভাবে বলতে লাগল, তবে আমার জীবনের আর একটা অধ্যায় তোমার কাছে আজ খুলে ধরি বন্ধু।

আবার চুপ করল। বিমান রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

শিখা আবার সুরু করল, আমি তোমাকে যেমন নিবিড় ভাবে ভালবেসেছিলাম তেমন করে অন্ত মেয়েরা ভালবাসে কি না জানি না। আমি যেন তোমায় গ্রাস করে ফেলতে চেয়েছিলাম কিংবা যেন তোমার পায়ের শৃঙ্খল হয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। কতবার নিজেকে সামলাতে গিয়েছি, কিন্তু পারি নি। কাছে থেকে তা হবার যেন জো ছিল না। কত ধিক্কার দিয়ে নিজেকে বলেছি—যাকে ভালবাস তার উন্নতির পথের কাঁটা হয়ো না। কিন্তু বিফলেই তা বলা। রমণীসুলভ ঈর্ষা এতই প্রবল ভাবে এই চিত্তে সঞ্চিত হতে লাগল ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে তুমি আগ্রহ করে তোমার লেখা যখন শোনাতে আমায়, আনন্দ হ'ত খুবই সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুর্জ্জয় হিংসা ও অতৃপ্তি ভুজঙ্গিনীর মত মাথা তুলতে থাকত। মনে হ'ত তোমার প্রাণমন ত অনুক্ষণ তোমার লেখাতেই পড়ে থাকে, তার মধ্যে আমার স্থান কোথায়? আর যে লেখা লিখছ বসে, যদিও তা আমাকে একবার শোনাচ্ছ, কিন্তু তা ত আমার তরেই নয়। হায়! বিশ্বে দেবে তা বিলিয়ে। আর তোমার খ্যাতির কাছে তুমি যাবে বিকিয়ে। আমি থাকব কোথায় পড়ে? অভিমানে অন্তর গুমরে উঠে বলত, তাই হোক তবে। মনে হতে লাগল আমার এ পোড়া মন যেন মরুভূমি। তোমার কাব্যরস এর উষ্ণ নিশ্বাসে শুষ্ক হয়ে যাবে।

তাই এক এক সময় মনে করতাম দূরে সরিয়ে ফেলি এই হতভাগিনীর জীবনকে। সরিয়ে তোমায় মুক্তি দিই এই সংকীর্ণ মনের বাঁধন হতে। কিন্তু সেও বড় কঠিন। 'ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' সে যে বিষম ব্যথা।

এমন সময় দৈব উপায় করে দিলে। আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। মনকে নিদারুণ শক্ত করে অজ্ঞাত-বাসের এ সুযোগ ছাড়লাম না। বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা ভেদ করে একটা পরম তৃপ্তি—আত্মপ্রসাদের ফোয়ারা এ জীবনকে সিক্ত করতে লাগল আশ্রমের আশ্রয়ে গিয়ে।

এ পর্য্যন্ত বলে থামল এবং দুই হাতের মাঝে মাথাটা গুঁজে দিল বুঝি উদগত অশ্রু সংবরণ-চেষ্টায়।

বিমান পাথরের মত ছিল এতক্ষণ, এইবার আস্তে একখানি হাতে শিখার অবনমিত পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করে চুপ করে বসে রইল—বাক্যহারা। শিখা একটু পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বিমানের দিকে তাকিয়ে সহাস্ত মুখে বললে, আজ সত্যি মনে হচ্ছে তপস্যার আগুনে প্রেমের সব কণ্টকজাল পুড়িয়ে শুধু কুসুমটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। তপঃক্লিষ্ট ভালবাসার এই অবস্থাটা বুঝি জগতে অতুলনীয়!

অশ্রুস্নাত স্মিত ও প্রদীপ্ত মুখখানির দিকে বিমান বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

আকাশের আলো মিলিয়ে যেতে লাগল। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, তাদের জীবনেরও। স্নিগ্ধ সমীরে ভেসে আসছিল দেবদারু শ্রেণীর শাখা হতে বিবিধ বিহঙ্গকাকলি।

প্রণাম

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার প্রণামখানি রেখে যাই তাহাদের তরে,
যাহাদের নাম কেহ কোনদিন করে না স্মরণ;
ইতিহাস যাহাদের নামগুলি রাখেনিকো ধরে,
নিঃশেষে মুছে গেছে তাহাদের সব বিবরণ।

অকরুণ পৃথিবীর বুকে যারা এলো অসহায়,
মানুষের অন্তরে একটুও পেল না সে ঠাঁই;
পড়েছিল এক পাশে অনাদরে আর অবজ্ঞায়,
যাহাদের তরে গান কোনদিন কেহ রচে নাই।

জীবনের সুরু হ'তে যারা শুধু করেছে সংগ্রাম,
নিয়তির পরিহাসে বার বার হয়েছে বিফল;
আলেয়ার পিছে পিছে ঘুরে যারা ফেরে অবিরাম,
সারাটি জীবন ধরে যাদের ঝরেছে আঁখিজল।

কত আশা করেছিল, কিছু যারা পেল নাকো হায়,
যাদের জীবনগুলি ধরণীতে হ'ল ব্যর্থকাম;
ক্লান্ত জীবন বহি' চলে গেল কোন অজানায়,
অজানা তাদের লাগি রেখে যাই আমার প্রণাম।

বাংলাদেশের মন্দির ও মঞ্চলিপি

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

মন্দির দেশ বা জাতির জীবন্ত ইতিহাস। ইহা যেমন প্রতিষ্ঠাতার ধর্ম্মভাব, সুরুচি, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির পরিচয় দেয় তেমনই গঠনবৈশিষ্ট্য, অলঙ্করণ-পদ্ধতি ও পুত্তলিকা-বিন্যাস-কৌশলে সকলপ্রকার সামাজিক বিষয়বস্তুকে নিজদেহে ধরিয়া রাখে। আবার মন্দিরলিপিসমূহ সাহিত্য, ইতিহাস ও সেই সেই কালের অক্ষর-লিখনভঙ্গীকে রক্ষা করে। প্রাচীন পুথিতেও আমরা অতীত যুগের হস্তলিপির নিদর্শন পাই, কিন্তু পুঁথি অপেক্ষা মন্দির-লিপি দৃঢ় পটভূমিতে গঠিত হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া আমরা উহাতে বহু প্রাচীন

হাওড়া জেলার মেল্যক গ্রামের রূপনারায়ণ নদতীরস্থ শ্রীগোপালজীর অষ্টশাল মন্দির। রাজা মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৫৭৩ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত

লিখনভঙ্গীর সহিত পরিচিত হই। মন্দির ও মন্দিরলিপি দেশের গৌরব ও প্রামাণ্য দলিল। এখানে বাংলার কয়েকটি মন্দিরের লিপি ও তাহা হইতে গৃহীত তথ্য সংক্ষেপে লিখিতেছি।

হাওড়া জেলার গড়ভবানীপুরে মণিনাথ মহাদেবের যে অষ্টশাল মন্দির আছে উহার লিপি সম্ভবতঃ বাংলাদেশে প্রাচীনতম। লিপিটি এই: শ্রীভগবতো বাসুদেব নারায়ণস্য। শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৩০৬।২১ শ্রাবণ।

ইহা হইতে আমরা প্রায় ছয় শত বৎসর আগেকার অক্ষর ও সংখ্যালিখনপ্রণালীর সামান্য আভাস পাই। এই লিপি ও নিম্নোক্ত সকল লিপিই বঙ্গাক্ষরে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালস্থ বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে সিংহবাহিনীর চতুঃশাল নির্ম্মিত মন্দিরে লিপিযুক্ত দুইটি ফলক আছে। উহাদের পাঠোদ্ধার কষ্টকর, কিন্তু "শুভমস্তু শকাব্দা ১৪১২" সহজে পড়া যায়। ইহা প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন।

হাওড়া জেলার মেল্যক গ্রামের প্রাচীন গোপালজীর

প্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত। উচ্চে যতখানি নিম্নেও ততখানি প্রোথিত বলিয়া এখনও অটুট আছে। -

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী লালগড়ে পূর্ব্বে যে নবরত্ন মন্দির ছিল তাহাতে কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ সুদীর্ঘ লিপি ছিল। লিপিযুক্ত প্রস্তরফলকটি এখন চন্দ্রকোণার বর্দ্ধমানরাজের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। উহার লিপি:

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭ শাকেহশ্বিমুনি বানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং শুভদিনে শ্রীরভোজভুজাবহ (?)। হরিনারায়ণ-নৃপস্য পত্নী শ্রীলক্ষণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমিদং দদৌ। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানোর্বধূ। খ্যাত-শ্রীহরিনৃপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরায়াত্মজা। মাতা শ্রীযুত মিত্রসেন নৃপতের্বিখ্যাত কীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ। শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী রম্যাং দদৌ মন্দিরম্। গিরিধারিপদাম্ভোজে নবরত্নমিদং শুভম্। নির্ম্মায় বহু যত্নেন সমর্পিতবতী মুদা। পৌরাণিক শ্রীমোহনচক্রবর্ত্তী গোকুলদাস।

লিপিটি চন্দ্রকোণার লুপ্ত স্থান রাজবংশের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। সম্ভবতঃ মোহন চক্রবর্ত্তী উহার রচয়িতা ও গোকুলদাস মিস্ত্রী। লিপির মর্ম্ম: বীরভানুর বধূ, হোলরায়ের কন্যা, রাজা হরিনারায়ণের পত্নী, রাজানারায়ণ মল্লের ভগিনী ও রাজা মিত্রসেনের মাতা শ্রীলক্ষণাবতী ১৫৭৭ শকের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় গিরিধারীর প্রীতির নিমিত্ত সানন্দে এই রম্য মন্দির দান করিলেন। লিপিতে অনুষ্টুপ ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ আছে। শান্ত রস ইহাকে কাব্যের রূপ দিয়াছে। স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রীমতী না লিখিয়া মাত্র শ্রী ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়।

চন্দ্রকোণা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে ঘাঁটাল যাইবার

রাস্তার পাশে নবগ্রামে যে নানা গুপ্ত কক্ষবিশিষ্ট প্রাচীন পঞ্চরত্ন আছে, উহার লিপি: "মবেদরসসংযুক্তেশাকেচৈব নিশাপতৌ। গোপীনাথস্য বেশ্মেদং ভক্তিতো দত্তবানহম্॥" মর্ম—১৬৪০ শকাব্দে গোপীনাথের এই মন্দির ভক্তিপূর্ব্বক দান করিলাম। লিপিটি সরল শান্তরসপূর্ণ ও শিলাফলকে উৎকীর্ণ।

বাংলার বাহিরে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে রাজা হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ভট্টভবদেবের শিলালিপি দুইটি সুপ্রাচীন বাংলা লিপির নিদর্শন।

পুরীধামে মার্কণ্ডেয় সরোবরের ঘাটে বাংলার নিজস্ব রীতির ইষ্টক-নির্ম্মিত চতুঃশাল মন্দিরটি বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র-নির্ম্মিত। উহার বঙ্গাক্ষরে রচিত প্রস্তরলিপিটি এইরূপ: "শ্রীশ্রীহরি। শুভমস্তুশকাব্দা: ১৬৬৬ ষড়সদর্শন মিতেহব্দে। পঙ্কোদ্ধরত (?) সৌধ সোপানং। নৃপ কীর্ত্তিচন্দ্র জননী জনিতং। প্রেষিত হরে কৃষ্ণাত: (?)। লিপির 'ড' 'দ্র' হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়। মর্ম্ম সম্ভবত: এই: রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ১৬৬৬ শকাব্দে এই সরোবরে পঙ্কোদ্ধার, ও সৌধঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া মাতৃঋণ শোধ করেন। জলাশয় খনন ও ঘাট নির্ম্মাণে মাতৃঋণ শোধ হয় প্রাচীনগণ এরূপ ধারণা করিতেন।

মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বাসুদেবপুরের (পো: সঙ্করপুর) মুক্তারাম ভট্টাচার্য্যের পঞ্চরত্ন মন্দিরের লিপি:

দহনবমনগগ্নৌসম্মিতে শাক বর্ষোরুচির নিলয়মেতৎ শ্রীলদামোদরায়॥ কুলকুমুদকলেশ: শ্রীসমুক্তারামো। বসুলপরমভক্তোদত্তভূর্ষোদ মাপ॥ ১৭২৩ শকাব্দাতে কুলরূপ কুমুদেরচন্দ্র মুক্তারাম এই মন্দিরটি দামোদরকে দান করেন। লিপিটি পোড়ামাটির, দুই পংক্তিতে সমাপ্ত। ইহার ছন্দ মালিনী, ভাষা সরল, অলঙ্কারপূর্ণ ও শান্তরসযুক্ত।

নদীয়া জেলার গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী মন্দিরের লিপি:—বেদাক্ষেক্ষণ গোত্র কৈরব কুলাধীপে শকে শ্রীযুতে। কৈলাসপ্রতিরূপ কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ গিরীশোৎসবে॥ নাম্নানন্দময়ী শুভেহহনি মহামায়া (?) মহাকালভৃৎ। রাজা শ্রীল গিরীশচন্দ্র ধরণীপালেন সংস্থাপিতা॥—রাজা গিরীশচন্দ্র ১৭২৬ শকাব্দে কৈলাসতুল্য কৃষ্ণনগরে শুভ গিরীশোৎসবে আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠা করেন।

মেদিনীপুর জেলার রাধাকান্তপুরে (পো: সঙ্করপুর) দাসবংশের সুঠাম, পুত্তলিকাবহুল ও অলঙ্কারমণ্ডিত আলগোছ টুঙ্গী মন্দিরে পোড়ামাটির আটটি ফলকে নয় পংক্তিতে বাংলা পদ্যলিপি:

রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দদাস স্বর্গে বাস এই সে কারণে:
মহা মহা পুণ্যবলে সপ্তপুত্র ক্ষিতিতলে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামদাস নামে:
যিনি দাতা পুণ্যোদয় প্রকাশিত মহাশয় মধ্যম তৃতীয় সহোদরে:
বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়া স্থাপন করিলা এই ঘরে:
নবাব পৃথিবীপতি তার ডরে ব্যস্ত অতি সীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড়:
দামামা দরজা পরে জয় চণ্ডীর কৃপাবরে পুষ্করিণী খুলিলা তার পর:

মেদিনীপুর খাটালের সিংহবাহিনী মন্দির
চতুঃশালরীতি—প্রতিষ্ঠাশক ১৪১২

সন্ধান পাইলা যদি সভাসিংহ নরপতি সেই হেতু কড়া না আইসে:
কম্পবান ক্রোধভরে আজ্ঞা দিলা অনুচরে হান শির পদাতিক রোষে:
বিপক্ষ হইল কাল কাল হৈল পরকাল কিছু না জানিল মহাশয়:
তাহাতে ছেদিল মুণ্ড দুর্গা দুর্গা ডাকে তুণ্ড শুনি রাজা মানিলা বিস্ময়:
কবিতা করিতে তার এই স্থানে আঁটা ভার হ'ল দুই শতেক বৎসর:
রীতি নীতি পিতৃকীর্ত্তি এই বংশে অদ্যাবধি বজনাই হতেছে সুন্দর:
আপদ হইল ইথে বৃক্ষ হৈল মন্দিরেতে সারাইতে সাধ্য নাহি কার:
নারাণদাসের বংশে মধ্যমবাড়ীর অংশে বজেশ্বর জন্মেছিল সার:
সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠীর সহিত মিলে নানাযুক্তি করে জনে জনে:
কেহ বলে লয়া কর কেহ বলে একেই সার বজেশ্বরের কিছুই না লয় মনে:
পিতৃকীর্ত্তি ডুবাইয়া কেমনে করিব ইহা সারাইব যা থাকে ভাগ্যেতে:
ভদ্রলোকে ডাকাইয়া হীর মিস্ত্রী আনাইয়া উদ্যোগ করিল সারাইতে:
সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠীর সহিত মিলে মন্দির করিলা মেরামতি:
হিসাব করহ সবে ইহাতে নিকাস পাবে কবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি:

অর্থ সরল। বাংলার শিবাজী সভাসিংহের আদেশে জনানন্দদাসের মস্তক ছেদন হইলে কাটামুণ্ড দুর্গা দুর্গা

বলিয়াছিল। যে মজুর একটি কড়ি পারিশ্রমিকে কাজ করিত তাহাকে কড়া বলে। লিপিতে কোলন বিরাম চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। লিপির বর্ণাশুদ্ধি শোধন করিয়াছি।

মেদিনীপুর রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথ মন্দির (একরত্ন বা আলগোছ চুনী রীতি অনুসারে নির্ম্মিত সুদীর্ঘ বাংলা পত্তলিপিযুক্ত)

ঐ গ্রামের একটি উৎকলরীতির মন্দিরের লিপি: ৺শ্রীশ্রীকাশীশ্বর মহাদেব স্থাপন। শকাব্দ: ১৭৬৭ সন ১২৫২ সাল মাহ আষাঢ়। জেই হেতু মহাদেব কাশীশ্বর নাম: কমললোচন দত্ত গীয়াছিল গয়াধাম: পিতার কর্ম্মপদে কাশী গমন বাসনা: কিন্ত গ্রিহে ভাত্রিগণ করিল মানা: শ্রীত্যাগমনেতে সিব স্থাপন করিবে: কাশী গমনের ফল তাহাতে পাইবে: এই হেতু প্রকাস হইল কাশীশ্বর: মন্দার সমান কাম মোদক কিংকর: (?)

বর্ণাশুদ্ধি লক্ষণীয়। শেষ পংক্তির অর্থ অস্পষ্ট। কোলন বিরামচিহ্ন রূপে ব্যবহৃত।

চতুয়া বাসুদেবপুরের গুলাব দত্তের শিবমন্দির। মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ গম্বুজাকৃতি বলিয়া ইহা ইসলামীয় রীতিতে নির্ম্মিত

মন্দিরের মত অনেক রাসমঞ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট চুড়া ও পুত্তলিকাবহুল এবং লিপিযুক্ত। মেদিনীপুর-পাশকুড়ার ইটোরা মাজলোই গ্রামের একটি অষ্টকোণ, ত্রিতল, ত্রয়োদশ চুড়ার সুঠাম, সোপানযুক্ত, পুত্তলিকাবহুল মঞ্চের লিপি—শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ। শুভমস্ত শকাব্দা: ১৭৮০ সন ১২৬৬ ইঙরাজি সন ১৮৫৯ সাল। শ্রীঠাকুরদাস মাইতি।

মন্দিরলিপিতে শকাব্দ ও বাংলা সনই ব্যবহৃত হয়। এই লিপিতে খ্রীষ্টাব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা অভিনব।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

২

বাঙালীর আর্থিক ও রাজনৈতিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমে পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক সঙ্কোচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। শিল্পের প্রসারের জন্ত ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশেরই তাহার আয়তন এবং লোকসংখ্যার অনুপাতের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকা দরকার। তাহা না হইলে সেই প্রদেশবাসীর আর্থিক দুর্ব্বলতার প্রতিকার করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

কোনও প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ অর্থাৎ বসতির হার যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় ভূমির অভাবে খাদ্যোৎপাদন ও শিল্পসম্প্রসারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই হেতু সেই প্রদেশকে বিদেশ হইতে এবং অপর প্রদেশ হইতে খাদ্য ও অন্যান্য বহু নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে সেই প্রদেশবাসীর অর্থ অন্য প্রদেশে ও বিদেশে চলিয়া যায়। একমাত্র শর্করাশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার মাটি এই শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও ভূমির অভাবে এই প্রদেশে ইহার প্রসারণ হইতে পারিতেছে না। ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চিনি অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। আয়তনের দিক হইতে বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল:

প্রদেশ	আয়তন বর্গমাইল	১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ
মাদ্রাজ	১,২৬,১৬৬	৩৯১
উত্তরপ্রদেশ	১,০৬,২৪৭	৫১৮
মধ্যপ্রদেশ	৯৮,৫৭৫	১৭১
বোম্বাই	৭৬,৪৩৩	২৭৩
বিহার	৬৯,৭৪৫	৫২১
আসাম	৫০,২৯৬	১৮৭
পূর্ব্বপঞ্জাব	৩৭,০৫৮	৪০৮
উড়িষ্যা	৩২,১৯৮	২৭১
পশ্চিম বাংলা	৩০,৬৮৯	৭৫১ (১৯৪১)
		৮০৮ (১৯৫১)

এই হিসাবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আয়তনের দিক হইতে পশ্চিম বাংলার স্থান কেবলমাত্র সর্ব্বনিম্নেই নহে, অধিকন্তু প্রতি বর্গমাইলে তাহার বসতির সংখ্যাও অত্যধিক। বাস্তুহারাদের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পশ্চিম বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই প্রদেশের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা অপেক্ষাও আয়তন-সমস্যাই গুরুতর। ইহাকে জীবনমরণ-সমস্যাও বলা চলে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর বেশীর ভাগ প্রদেশেরই আয়তন, পার্শ্ববর্ত্তী দেশীয় রাজ্যগুলি সংযুক্ত হওয়ার ফলে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ন্যায়সঙ্গত দাবি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সঙ্গে কেবলমাত্র দুইটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশীয় রাজ্য—কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং একটি ছোট শহর চন্দননগর এই প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। একেই পশ্চিম বাংলায় তাহার প্রয়োজনানুরূপ চাউল উৎপন্ন হয় না, তাহার উপর বঙ্গবিভাগের পর পাটের অভাব হেতু ধানের চাষ কমাইয়া সেই সব জমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে পাট চাষের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকার করিয়াছেন। অধিবাসীদের অন্নাভাব অপেক্ষা পাট-কলওয়ালাদের পাটের অভাবের জন্য তাহারা অধিকতর চিন্তিত। বাংলাদেশে "অধিক খাদ্য ফলাও" অভিযান ও "বৃক্ষরোপণ-উৎসব" একটা প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। ভারত-সরকার পররাষ্ট্র সমস্যা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রদেশ-সরকার নীরব, প্রদেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে মাতিয়া আছেন। প্রবীণ বাংলা উদাসীন এবং নবীন বাংলা এ বিষয়ে একেবারে উদ্যমহীন। যত দিন বাঙালী তাহার দুরবস্থার এই মূলগত কারণ অর্থাৎ স্থানাভাব ঘুচাইতে না পারিবে তত দিন তাহার অন্নাভাব, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতি কোন অভাবই দূরীভূত হওয়া দূরের কথা, বরং দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে।

শ্রমিক সমস্যা বাংলার আর্থিক দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ। অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে বাঙালী জাতি আজ ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে এবং এ কারণে এই প্রদেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা-রোগে প্রাণ হারাইতেছে। বাঙালী জাতি আজ কর্মবিমুখ। এই কারণে চাষের কার্য্যে বেশীর ভাগ বাঙালী শ্রমিক

অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার কলকারখানা ও ক্ষেত্রের কার্য্যে নানা কারণে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল পরগণা ও রাঁচির শ্রমিকদের দ্বারাই বেশীর ভাগ কৃষিকার্য্য আজকাল চালাইতে হয়। পাটকল, কাপড়ের কল ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় প্রায় শতকরা নব্বুই জনের অধিক শ্রমিক অপর প্রদেশবাসী। কলিকাতা শহরে নানা কার্য্যে নিযুক্ত প্রায় সমস্ত শ্রমিকই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত; তাহারা না হইলে চলে না। ১৯৪৮-৪৯ সালের সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বাংলা ও আসাম হইতে প্রায় ৩৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মণি অর্ডারযোগে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে বাংলায় ও আসামে ৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার মণি অর্ডার আসিয়াছে। অর্থাৎ ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা ও আসাম হইতে বাহিরে বেশী পাঠানো হইয়াছে। যদি মোটামুটি ইহার শতকরা ১০ ভাগ টাকা আসাম হইতে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশ হইতে উক্ত বৎসরে এই প্রদেশবাসীর প্রায় ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত টাকা মণি অর্ডার-যোগে পাঠানো হয় তাহার বেশীর ভাগই কৃষি ও শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরাই পাঠাইয়া থাকে। বাৎসরিক প্রায় পাঁচ কোটি টাকা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া যাওয়া কম কথা নহে।

খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্যও পশ্চিম বাংলা হইতে বাৎসরিক মোটামুটি কত কোটি টাকা অন্য প্রদেশে চলিয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে দিব।

স্বাধীনতালাভের পর আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলার আর একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। বহু বিদেশী কোম্পানী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিদেশবাসীরা ভারতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যত দূর জানা যায়, বাংলাদেশেই তাহার সংখ্যা বেশী এবং অপর প্রদেশবাসী ধনীরাই ইহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্বে বহু বাঙালী কেরাণী এবং অনেক ছোটবড় বাঙালী ব্যবসায়ী নানারূপ মাল সরবরাহ করিত। যাহারা ঐ সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিত তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য প্রদেশবাসীদের হাতে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত কাজ এবং ব্যবসা হইতেও বাঙালীদের হটিয়া যাইতে হইতেছে। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শাশ্বত

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জানি জানি মিলাইবে আনন্দের মুহূর্ত্ত চঞ্চল।
আজিকার ফুলোৎসব এক দিন হইবে মলিন,
পুষ্পান্বিত প্রাণলতা মধুক্লান্ত হয়ে যাবে জানি,
এও জানি, আজিকার তুমি আমি রব না নবীন।

যৌবন-চৈতন্যে ভরা উগ্রগন্ধী প্রেম-পরিমল
দুজনে স্মারক্তি করি হবে মৃদু আর মধুময়।
প্রেমের এ পরিণতি সত্য বলে জানি আর মানি।
আজিকার হাস্যোজ্জ্বল এ আনন্দ, এও মিথ্যে নয়।

মিথ্যে নয় মুখোমুখি এই বসা, এই কথা কওয়া,
মিথ্যে নয় চোখাচোখি, আলিঙ্গন, প্রগাঢ় চুম্বন।
সত্য দুটি হৃদয়ের মনোজ্জ্বল ভাব বিনিময়।
অতি সত্য আজিকার পরিপূর্ণ এ আনন্দক্ষণ।

সত্য তুমি, সত্য আমি, সত্য এই আনন্দ চঞ্চল।
সুন্দর এ দাম্পত্য-প্রণয়ের লীলা-শতদল।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট

শ্রীশিবব্রত ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট ক্রমশ যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ রাজ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। রাজ্যে আজ অন্ন নাই, যাহা আছে তাহা জনগণের ক্রয়-শক্তির বাহিরে। জনসাধারণ সরকারের নিকট অন্নের দাবি জানাইয়া ব্যর্থ হইতেছে ; ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষের এবং অনশনে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই খাদ্যসঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের খাদ্য-সমস্যার কারণ জানা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-মন্ত্রিগণের বিবৃতি, বক্তৃতা, বেতার-ভাষণ প্রভৃতি হইতে আমরা জানিতেছি পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসিগণের যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা এ রাজ্যের উৎপাদনের পরিমাণ অল্প এবং এজন্য পরনির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। সরকার ইহাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ বলিয়া প্রচার করেন। খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী অভিমত অভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ হইলে জনগণের এ বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছু থাকে না। এই কারণে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি অঞ্চল কিনা।

কোন্ অঞ্চল ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে ঐ অঞ্চলের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ, উহার জনসংখ্যা এবং জনগণের অনুপাতে চাহিদা স্থির করা প্রয়োজন। অতএব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাৎসরিক উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবস্তু বলিতে প্রধানতঃ চাউলকেই বুঝায়। এ রাজ্যে তিন শ্রেণীর চাউলই উল্লেখযোগ্য। সরকারী হিসাবের সাহায্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কোন্ শ্রেণীর চাউল কি পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ জানিতে পারি। নীচে ঐ হিসাব দেওয়া গেল :

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন
হাজার টন হিসাবে

আউশ	৩৩৬
আমন	৩৫৫৯
বোরো	১৫
মোট	৩৯১০*

* *Indian Trade Journal*, Sep. 8, 1951, page 802.

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০-৫১ সালে মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার টন অথবা ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার মণ। চাউল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও নানারূপ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গম, যব ও ভুট্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ রাজ্যে এই তিন প্রকার শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নীচের তালিকা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে :

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন (হাজার মণ হিসাবে)

গম	১১২৭
যব	৬৭৫
ভুট্টা	৬৪৮
	২৪৫০

দেখা যাইতেছে সকল প্রকার খাদ্যবস্তুর সংযোগে পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটি মণের মত।

ইহার পর আমাদের জনসংখ্যা ও প্রয়োজন নির্ণয় করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ হইয়াছে। এই ২·৪৮ কোটির মধ্যে শিশু কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের লোক রহিয়াছে। উহা ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদিগের মধ্যে বিধবা এবং এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দৈনিক একবার অন্নগ্রহণ করেন। এই কারণে মোট জনসংখ্যা হইতে প্রথমে আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিধবা এবং অন্যান্য যাঁহারা একাহারী তাঁহাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পর ৫ বৎসরের শিশু হইতে ১৫ বৎসরবয়স্ক কিশোরগণের এবং ৫ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের সংখ্যা বাহির করিতে হইবে। জনসংখ্যা স্থির করিবার পর উহাদের চাহিদা নির্ণয় করা যাইবে।

মোট জনসংখ্যা		২ কোটি ৪৮ লক্ষ
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৯·২ জন হিসাবে		১,৪৬,৪১,৬০০
প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা একাহারীর সংখ্যা শতকরা ৮·৩ জন হিসাবে	২০,৫৮,৪০০	
প্রাপ্তবয়স্ক একাহারীর সংখ্যা শতকরা ৬ জন হিসাবে	১৪,৮৮,০০০	
		৩৫,৪৬,৪০০

দৈনিক দুই বার অন্নগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্কের

মোট সংখ্যা ১,১০,৯৫,২০০

৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ২৫'২ জন হিসাবে ৬২,৪৯,৬০০

০ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ১৫'৫ জন হিসাবে ৩৮,৪৪,০০০

বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যার হিসাব উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই। এক্ষণে উহাদের খাদ্যের প্রয়োজন কি পরিমাণ তাহা স্থির করা যাক্‌। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য গড়পড়তা দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক বা আধসের চাউল যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের ৮ ছটাক হইলে যাঁহারা এক বেলা অন্নগ্রহণ করেন তাঁহাদের ৪ ছটাক, ৫ হইতে ১৫ বৎসর-বয়স্কদের ৬ ছটাক এবং শিশুদের জন্য ২ ছটাক বরাদ্দ করিলেই চলিবে। এইরূপ বরাদ্দের ফলে প্রাপ্তবয়স্ক, একাহারী, কিশোর এবং শিশুগণের মাথাপিছু বাৎসরিক খাদ্যের চাহিদা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪½, ২¼, ৩⅜ এবং ১⅛ মণ। এখন হিসাব করিয়া আমরা দেখিতে পাইব পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের পরিমাণ কিরূপ। উহার পর বাৎসরিক উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য করিলে দেখা যাইবে এ রাজ্য প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত না ঘাটতি অঞ্চল :

মাথাপিছু বাৎসরিক ৪½ মণ হিসাবে	প্রাপ্তবয়স্কদের	মোট প্রয়োজন	৪,৯৯,২৮,৪০০ মণ
" " ২¼ " "	একাহারীগণের	" "	৭৯,৭৯,৪০০
" " ৩⅜ " "	কিশোরগণের	" "	২,১০,৯২,৪০০ "
" " ১⅛ " "	শিশুগণের	" "	৪৩,২৪,৫০০ "
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের		মোট প্রয়োজন	৮,৩৩,২৪,৭০০ মণ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১১ কোটি টনের কিছু অধিক এবং চাহিদা ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৪ হাজার টন। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রতিবৎসর আমাদের রাজ্যে প্রায় ২½ কোটি টন খাদ্য-শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য বীজ প্রভৃতির জন্য কিছু অংশ মোট উৎপাদন হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে ধরিয়া ৫০ লক্ষ টন ধরিলেও পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত ২ কোটি টন অবশিষ্ট থাকে।

উপরের সরকারী পরিসংখ্যানগুলি হইতে ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, এ রাজ্যে খাদ্যশস্যের কোন ঘাটতি নাই। ঘাটতির পরিবর্ত্তে উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে অথচ বৎসরের পর বৎসর সরকারী ভাবে এ রাজ্যকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিবার কারণ কি?

ঘাটতি অঞ্চল না হইলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা বহু বৎসর হইতে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কি হইতে পারে? এই খাদ্যসঙ্কটের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী সরকারী অব্যবস্থা, জোতদার ও ব্যবসাদারগণের অতি-লোভ এবং কালোবাজারীদের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য। যে খাদ্যসঙ্কট বর্ত্তমানে বাংলাকে ধ্বংসের দিকে টানিতেছে তাহা মনুষ্যকৃত সঙ্কট বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সরকার ও জনসাধারণ যদি সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ দমন এবং সমাজদ্রোহী ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সঙ্কটের হাত হইতে নিস্তারলাভের আশা সুদূরপরাহত।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৯

অমলেন্দু খবর দিলে—একটা বড় রকমের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাকিস্থানে কাপড় আর চিনির অভাব বড় বেশী—পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওগুলি নাকি কালোবাজারীরা চালান দিচ্ছে পাকিস্থানে।

কেন—সীমানায় পাহারা নেই—শুল্ক-আপিসের কর্ত্তারা করছেন কি ?

পাহারা আছে—তত কড়া নয়—আর শুল্ক অফিসার সবাই তো সাধু নয়। এ ছাড়া চোরাকারবারীরা যা কৌশল করছে তাতে ধরাও নাকি মুশকিল।

একখানি কাগজ বার করে তার পাতাগুলি সামনে মেলে ধরলে অমলেন্দু। এই দেখ জলের ওপর ভাসছে যাত্রী-বোঝাই নৌকো—জলের তলায় দেখ জল আটকানো ট্রাঙ্কের মধ্যে রয়েছে নতুন কাপড়; নৌকার নীচে শিকল দিয়ে ঝোলানো ট্রাঙ্ক দিব্যি জলের তলা দিয়ে হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে। আর এই দেখ ছবি—রেলগাড়ির ল্যাভেটরির মাথায় জলের ট্যাঙ্ক—এতে জল নেই, আছে নতুন কাপড় বোঝাই করা। দিব্যি স্ক্রু খুলে জোড়া জোড়া ধুতি সাড়ি এর মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে। দেখ—গাড়ির তলায় চাকার পাশের লোহার রডে ঝোলানো—বড় বড় বস্তা। এই দেখছ ঘোমটা দেওয়া মেয়েটি—কোলের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি নিয়ে এ সীমানা থেকে ও সীমানায় যাচ্ছে—যাদুমন্ত্রে ওর হৃষ্টপুষ্ট খোকা কাপড়ের বাণ্ডিল হয়ে যাচ্ছে—তেমনি কত রোগা লোক সহসা মেদবৃদ্ধিতে বেমানান হয়ে উঠছে। লুঙ্গির তলায়—উরুতে কোমরে বুকে পিঠে জামার নীচের কোথায় না এই লুকোচুরি খেলা! চোখ এড়িয়ে এপার থেকে ওপারে গেলেই দশ বিশ টাকা লাভ।

প্রভাত বললে, এ তো সবই দেখছি ধরা পড়ে ছবিতে উঠেছে—তবু চলছে ?

হুঁ—। কোথা থেকে কোথায় যায় জিনিষ তার সন্ধান কিছু আমাদের গলিতেই পাওয়া যাবে।

কে—কে—?

কিন্তু তারা চুনোপুঁটি নয়—তাদের ধরতে গেলে জাল শক্ত হওয়া দরকার।

আমরা চেষ্টা করব। যদি কোটিপতিও কেউ থাকেন এর মধ্যে—

কোটিপতিদের সাহসই বেশী। রূপোর তীর মেরে অন্যেকে মারেল করাই তাদের রীতি। অমলেন্দু হাসল।

প্রভাত উত্তেজিত হয়ে বললে, সরকার নিশ্চয় এর চেপ নেবে—কাগজে রোজ বেরুচ্ছে—দেশের শত্রু চোরাকারবারীদের ধরিয়ে দাও—

কিন্তু ধরবে কে ? আইন কোথায়! আটার তেঁতুল-বীচি আর নরম পাথরের গুঁড়ো; হাজার হাজার মণ ধরা পড়েছে—কিন্তু কেউ শাস্তি পেলে কি না জানতে পারি নি। আইনের ফাঁক নাকি ওদের কায়দা করতে পারছে না—নতুন আইন তৈরি হচ্ছে। শোন তা হলে।

একদিন কাগজে দেখলাম—ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনে ক্যাশমেমো চেয়ে নেবেন—মেমো না দেয় নিকটবর্ত্তী পুলিসকে জানাবেন। আপনিও চোরাবাজার দমনে অনায়াসে সহায়তা করতে পারেন যদি ন্যায্য মূল্য দিয়ে জিনিস নেন, আর ক্যাশ-মেমো দিতে বাধ্য করেন দোকানীকে।—ওষুধ কিনে মেমো চাইলাম, দিলে না। পুলিসকে জানালাম সে বললে, থানার ইন্‌চার্জ্জের কাছে যান। ইন্‌চার্জ্জ বললে, আচ্ছা জিনিসটা রেখে যান—এন্‌কোয়ারী করব। পীড়াপীড়িতে একটা ডায়েরিও লিখলে। বললে, আমার অফিসারকে জানাব—কি ভাবে কেসটা টেক আপ করা যায় দু'দিন পরে আসবেন। গিয়ে শুনলাম, কেসটা দায়ের করতে হবে আপনাকেই—আমরা সাক্ষী হিসাবে···বল দেখি ভাই চার টাকার ওষুধ কিনে আদালত করা উকিল মোক্তার এসব পোষাবে কি আমাদের মত গরীবের ?

অমলেন্দুর কথাগুলি ভাববার মত বটে। যারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক ··ব্যবসা বা চাকরি বা ছোটখাটো কাজ করে দিন গুজরাণ করে তারা কেন পোয়াতে যাবে এই ঝঞ্ঝাট! এমনিতেই তো দেখা যায়—পকেটমার ধরা পড়লে কিংবা কেউ ট্রাম বাস বা মোটর চাপা পড়লে সহযাত্রীরা সহজে আইনের আওতায় আসতে চায় না। তাদের সাক্ষীর অভাবে কত দুষ্কৃতি যে চাপা পড়ে যায়! না—জনগণের স্বার্থের জন্য জনগণ কোনদিন সচেতন নয়। তাদের দুঃখপ্রকাশের অজস্রতার মত তাদের উদ্যমের এবং নাগরিক ধবরদার বোধও যদি উগ্র হ'ত ?

অমলেন্দু বললে, আমি অনেক ভেবেছি ভাই—এর একটি মাত্র উপায় আছে, তবে সেটিও খুব প্রীতিকর নয়।

এমন উপায় ? প্রভাত হাসল।

অমলেন্দু বললে, একদিন ক্লাসে লেকচার শুনছিলাম, বিদেশ থেকে এসেছিলেন এক বিশ্বকল্যাণকামী। তিনি বলছিলেন, মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় মানুষকে নিয়ে। প্রাণি-

জগৎ বা পক্ষিজগতেও একটু লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে—পরস্পরের সহযোগিতায় জীবনধারণ সুখের হয়, জীবন পরিপূর্ণ হয়। বাহ্যত কিছু প্রতিযোগিতা চোখে পড়লেও সহযোগিতা না থাকলে সৃষ্টির কোন অর্থই থাকে না।

প্রভাত বললে, ওকথা শুধু খ্রীষ্টানরাই বলেন নি, আমাদের শাস্ত্রেও—

নিশ্চয়। যাঁরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন—তাঁরাই জানেন কাউকে বাদ দিয়ে—

তোমার কথাগুলিও উপদেশামৃতের মত ঠেকছে অমলেন্দু।

অমলেন্দু ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, হুঁ—কারণ আমরা কারুর জন্ত ভাবি না—বড্ড বেশী সেলফ-সেন্টার্ড। কোন কোন দেশের লোকে পোড়া চুরুটের টুকরো—ছেঁড়া কাগজ বা সামান্ত জঞ্জালও পথের মাঝে ফেলে না—আবার কোন কোন দেশে আম বা কলা খেয়ে তার খোসা পথে ফেলে চলে যায় নির্বিকার ভাবে। আমার খাওয়ার সঙ্গে তোমার অস্বাচ্ছন্দ্যের যখন সম্পর্কই নেই—

থাক—থাক। যা নেই প্রকৃতিতে—তা এক দিনে চোখ রাঙিয়ে বা লাঠি পিটে—ঠিক করে দেওয়া যাবে না। সে চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে।

কি করে করবে?

এস না—সমিতি যে গড়লাম—সেকি কতকগুলো নিয়মকানুন খাতায় টুকে রাখবার জন্তে? সেকি ব্রিজ খেলা—আর দশের সমালোচনা কিংবা সৌখিন দুঃখমোচনের টিকেট টা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্তে?

কথাটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল।

এক দিন অমলেন্দুরা ক্লাবে বসে পরামর্শ করছে কোন্ উপায়ে এই দুর্নীতি রোধ করা যায়—এমন সময় শশী হাজরা এলেন সেখানে। তাঁকে দেখে প্রভাতরা রীতিমত বিস্মিত হ'ল। এই কয়েক দিন আগে—ওঁরই এক কর্মচারীকে... কয়েক বস্তা চিনির জন্ত তারা যথেষ্ট অপমান করেছিল—শেষ পর্য্যন্ত কেসটা পুলিসের হাতে তুলেও দিয়েছে এরা, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। পুলিস-তদন্তে ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হ'ল—কিছুই জানতে পারা যায় নি। আটায় পাথরগুঁড়ো তেঁতুলবীচি—চালে কাঁকর মেশানোর তদন্তের মত ব্যাপারটি নেপথ্যেই চলছে। কাগজে এক দিন যে রিপোর্ট পড়ে মানুষ উত্তেজিত হয়—তার ফলাফলের জন্ত আরও কিছুদিন সে হয়ত অপেক্ষা করে—কিন্তু পৃথিবীতে ঘটনা তো ঐ একটিই নয়। জীবনধারণের কত সমস্যা কত দিকে টানছে মানুষের বৃত্তিকে, কাজেই বেশ কিছুদিন পরে সে কৌতূহল কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার ঠিকঠিকানা থাকে না। যারা মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উপরে উঠেছে তারা জানে মনস্তত্ত্বের এই সূত্রটি—তাই কখনও কখনও সত্তেজনার মুহূর্তগুলিকে ঘুম পাড়াবার জন্তে দীর্ঘ নীরবতার দাওয়াই প্রয়োগ করে থাকে। অমলেন্দুরা আগে জানত না এসব তথ্য—আজকাল জ্ঞানের পরিধি তাদের বিস্তৃত হচ্ছে।

শশী হাজরা লোকটি প্রিয়দর্শন না হলেও—হাস্যমুখ। সে হাসি কখনও ব্যবসায়ীসুলভ ধূর্ত্ততায় ঠোঁটের বাঁকা রেখার বাঁকে ফুটে ওঠে—কখনও শিশুসুলভ কৌতুকে হয় উচ্ছ্বসিত। কথাগুলি তাঁর মিষ্ট—বাপু বাছা ছাড়া কাউকে সম্বোধন করেন না—সবাই তার বৈষ্ণববাঞ্ছিত বিনয়ে সর্ব্বদাই বিগলিত হয়ে আছেন। আধ পাকা আধ কাঁচা কদমছাঁট চুল—শ্মশ্রুগুম্ফহীন গোলগাল ভরাট মুখ—নধর কান্তি—মেদে থলথলে নয়—প্রোটিন ভিটামিনে লাবণ্যযুক্ত। গায়ে একটি হাতকাটা ফতুয়া—অধিকাংশ দোকানীর মত আধময়লা নয়—আগে সেটা লংক্লথ বা টুইলের ছিল—এখন খদ্দরে দাঁড়িয়েছে—মাথায় গান্ধী টুপীও একটি; টুপীতে তিন রঙা ফ্ল্যাগ। একখানা আনন্দবাজার আর একখানা বসুমতীও প্রত্যহ নেন। বলেন, দু'রকমের দুখানা কাগজ না নিলে সবকিছু জানা যায় না। বড়বাজারের বাজার চকে—একদা একখানি ছোট ঘর ভাড়া করে ব্যবসায়ের পত্তন করেন—আজ তার লাগাও চার পাঁচখানি ঘরে সে ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যবসায় শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ নয়—পাড়াতেও ছোট মুদিখানার দোকানটি আটা চাল চিনি কেরোসিন তেলের রেশন নিয়ে ফেঁপে উঠেছে। এই দোকানের চিনির কয়েকটি বস্তা নিশুতি রাতের নীরবতায় স্থানান্তরিত হবার কালেই ঘটেছিল বিপত্তি।

শশী হাজরা এসেই বললেন, এই যে বাবারা সব এইখানেই এসেছ—আমিও ভাবতে ভাবতে আসছি—সবাইকে এক জায়গায় পাব তো? চল - শ্রীহরির ইচ্ছায়...

অমলেন্দু অপ্রসন্ন স্বরে বললে, আমাদের সবাইকে কি আপনার দরকার?

'নিশ্চয়—না হলে ছুটতে ছুটতে আসছি কেন।' অভ্যাসবশতঃ হাজরা মশায়ের হাত দুটি জোড় করাই থাকে—অপরিচিত কেউ দেখলে ভাববে অজানা ত্রুটিজনিত অপরাধে সদাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। একটু ভেবে বললেন কেন আসছি জান? শুনলাম—তোমরা একটি সমিতি গড়েছ—

অমলেন্দু ব্যঙ্গমেশান স্বরে বললে, আজ শুনলেন?

না—আজ কেন শুনব। আমার দোকান থেকে যেদিন চিনির বস্তা পাচার হচ্ছিল—সেই দিনই শুনলাম...খুব উত্তম কাজ করেছ বাবা। তোমাদের মত ছেলেরা যদি পাড়া রক্ষা না করবে তো পাড়ায় বাস করব কোন্ সুখে? হরি হে—সবই তোমার ইচ্ছা! উদ্দেশে যুক্ত কর ঊর্দ্ধে তুললেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ওই জন্যেই দোকানটির দফা সেরে

আসছিল—হতভাগা। একটি মন্ত্র বাবাজী—আরও আছে—দুধ কলা দিয়ে যে কালসাপ পুষছি—তা জানি, কিন্তু হাতে-নাতে ধরতে পারি না বলে জবাব দিতেও বাধে। ভাবি কৃষ্ণের জীব—ওকে যদি জবাব দিই—ওর পরিবার ছেলে-মেয়ে খাবে কি? তাদের দুঃখে ফেলে আমি কেন মিছিমিছি ভাগী হই। যাক—যা বলতে এসেছি শোন। তোমাদের কাজ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি—গোবিন্দের ইচ্ছায় এই মতিগতি তোমাদের বজায় থাক—তোমরা দুর্জ্জনকে সাজা দেবার ক্ষমতা লাভ কর।

প্রভাত হেসে বললে, কিন্তু হাজরা মশাই—দুঃখ যে এই দুর্জ্জনরা নিজেদের দুর্জ্জন বলে স্বীকার করে না। তাঁদের দুষ্কৃতির দায়ে আমরাই হয় তো সাজা পেয়ে যাব।

না—কখনও না। হাজরার কণ্ঠস্বর অভয় বাণীর পর্য্যায়ে উন্নীত হ'ল। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে নয়। তোমাদের সমিতিকে যতটুকু পারি সাহায্য করব। অবশ্য প্রকাশ্যে পারব না—সে ক্ষমতা নেই, কিন্তু টাকার জন্যে তোমরা ভেবো না—আমার যথাসাধ্য—

কিন্তু এতে তো আপনারও বিপদ কম নয়?

বিপদ! কিছুক্ষণ বিস্ময়ে চেয়ে থেকে হেসে উঠলেন তিনি। হাঁ—বিপদ অনেক রকমের আছে। তবে এও জানবেন—সৎপথে থাকলে আদেক রাতেও জয় হয়—এ বিশ্বাস আমি রাখি। ব্যবসায়ীর মূলধন হ'ল সততা—গোবিন্দের ইচ্ছায় এই সততা যদি বজায় রাখতে পারি কোন মিথ্যাকে ডরাবার কিছু নেই আমার।

ফতুয়ার জেব থেকে একটা লাল রংয়ের ন্যাকড়ার ব্যাগ বার করলেন হাজরা মশায়। পাকানো সুতোর আলগা ফাঁস খুলে তা থেকে বার করলেন একখানা একশো টাকার নোট। নোটখানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও ধর—আমাকে তোমাদের সভ্য করে নিও। বলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, যদিও আমি ঘোরতর অসভ্য—লেখাপড়া জানি না।

প্রভাতরা বিস্মিত হ'ল। এটা পরীক্ষা নয় তো? হাজরা মশায় কোন্ কৌশলের জাল পাতবার জন্য বদান্যতার অভিনয় করছেন!

অমলেন্দু বললে, আমরা দুঃখিত হাজরা মশায় যে আপনাকে সভ্য করতে পারলাম না।

কেন? বিস্ময়ের ঘোর কেটে মুখে তাঁর বেদনার ছায়া গাঢ়তর হ'ল। এক মিনিট চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, বুঝেছি—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না তোমরা? ভাবছ যার দোকান থেকে ব্ল্যাকমার্কেটে চিনি চলে যায়, যার কর্ম্মচারীর নামে পুলিসে কেস দায়ের করেছে তাকে কি করে…

প্রভাত বললে, সেটা সত্য নয় কি?

হাঁ—খুবই ন্যায্য কথা। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর বাবা—সে কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—তাকে দূর করে দিয়েছি দোকান থেকে। আর তোমরা বল ত চুরির দায়ে তাকে জেল খাটিয়ে সাজা দেওয়াই। মরুক তার স্ত্রী পুত্র বুড়ো মা বাবা—তাদের জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভোগ করুক তারা—অপকর্ম্মের সাজা হোক।

সে যা ইচ্ছা করুন গে—আমরা আপনাকে নিতে পারলাম না—একান্ত দুঃখিত।

হাজরা মশায় সখেদে ললাটে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়ে বললেন, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তবে তোমাদের এ ভুল একদিন ভাঙবে বাবা—তখন বুঝবে শুধু বাইরেটা দেখে মানুষের বিচার করা কত বড় ভুল। আচ্ছা আসি।

তিনি চলে যেতেই শশাঙ্ক বললে, ভুল করলে প্রভাত—টাকাটা নেওয়া আমাদের উচিত ছিল।

তুমি জান না শশাঙ্ক—এও এক রকমের ঘুষ। অমলেন্দু প্রতিবাদ করলে।

ভূপতি বললে, কেন আমরা যদি সত্যে ঠিক থাকি কিসের ভয়? টাকাটাও বিশেষ দরকার।

হাঁ—টাকাটা সব সময়েই দরকার—সব কাজেও। সেই জন্যই তো দুনিয়ায় এত চোরাকারবার চলছে—আর এত রকমের আইনকানুন গড়েও তাদের ঠেকাতে পারা যাচ্ছে না! প্রভাত দৃঢ় স্বরে বললে।

ভূপতি বললে, তুমি একটা দিকই দেখছ প্রভাতদা—কিন্তু দেখ ত দেখি টাকা ছাড়া কোন ভাল কাজ কি হয়েছে পৃথিবীতে!

ওটা এক দিন ডিবেট্ করবার জন্য থাকুক ভূপতি—আর একটা সভা আহ্বান করা যাবে।

ভূপতি লজ্জিত মুখে বললে, যাই বল—এ কথা সবাই স্বীকার করে।

আমরাও স্বীকার করি—তবে এই মুহূর্ত্তে নয়। হাজরা মশায়ের কেসটা শেষ হোক—টাকা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা কাটলে পর কাউকেই বিমুখ করব না ভাই।

২০

মনটায় কি যেন অস্বস্তি লেগে রইল—কিছুই ভাল লাগছে না। সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে নতুন করে সংগ্রাম সৃষ্টি—তাই কি করছে মনের প্রশান্তিকে নষ্ট। এতে কার কতটুকু লাভ প্রভাত জানে না—কিন্তু অকারণে শত্রুবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বা যুদ্ধে মনের মাঝে যে আনন্দের উদ্ভব হয় তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ আনন্দে নিজেকে খানিকটা উঁচুতে মনে হয়। কর্ত্তব্যের কঠিন দায়িত্ব বহন করে মানুষের প্রশংসা অনায়াসে সঞ্চয় করা যায় পরন্তু কষ্টের এই

হয়তো চরম পুরস্কার, তবু মন বলে—এও মিথ্যা। তোমার কাঁপানো গৌরবে পৃথিবী যদি পায়ের তলায় নামল—তুমি কি পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে না! নাই থাকল যদি পৃথিবী তোমার মূল্য স্বীকার করবে কে? গৌরবে উপরে উঠে সবাইকে কাছে টানবে এ দুরাশা জগৎসৃষ্টির প্রত্যুষ থেকে মানুষের মনে আশ্রয় নিয়েছে; কিন্তু শাসন নয়—সেবার দ্বারা মানুষের সন্নিকটে পৌঁছানোর সহজ উপায়টি বার বার ভুলে যাও কেন? সৃষ্টির অহঙ্কারে প্রমত্ত না হলে কুয়াশা-আবিল দৃষ্টিতে তোমার জগৎ স্বরূপেই উদ্ভাসিত হ'ত। তুমি বুঝতে কারও উপরে কেউ নয়—কারও কৃতিত্বেও কারও মঙ্গল নয়—যে সার্থক হবার সাধনা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে, পাওনার ঘর তাকে খালি রাখতেই হবে। সে ঘরের অঙ্ক পূরণ করায় কৃতিত্ব তার নয়।

আসতে পারি কি ভার? মৃদু সঙ্কুচিত কণ্ঠ। প্রভাত বাইরে আসতেই ছেলেটি প্রণামের ভঙ্গীতে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল। প্রভাত তার হাত ধরে বললে, থাক থাক, কিছু দরকার আছে ভাই? ও তোমার নাম শুভব্রত না?

হাঁ। সবিনয়ে বললে ছেলেটি। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?

না কাজ আর কি—বেকুব ভাবছিলাম।

তবে থাক—ওবেলাই আসব। শুভব্রত ফেরবার উদ্যোগ করতেই প্রভাত তার কাঁধের উপর হাত রাখলে। বললে, চল বসবে।

আপনার ক্ষতি হবে না?

ক্ষতি! প্রভাত হাসল।

এ জীবনে সবাই ঘটে ক্ষয়—ক্ষতি তবু হয় না কোনমতে।

সত্যি বলেছেন।

আমি নয়—বলেছেন আমাদের কবি। ক্ষয়ের সঙ্গে ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই—এর চেয়ে বড় আশ্বাস কেউ আমাদের দেন নি ভাই। এস।

দু'জনে ঘরে এসে বসল। ঘরের মধ্যে দেখবার কিছু নেই তবু শুভব্রত উৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালে। বর্ণহারা দেওয়ালে যে ক'খানি ছবি টাঙানো আছে—স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের স্পর্শে তাদের দু-একখানির বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে এবং বাকিগুলিও অচিরে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে তার সূচনা দেখা দিয়েছে। বিবেকানন্দের পাগড়ী থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটি সাদা দাগ নীচের দিকে নামছে—রবীন্দ্রনাথের মুখখানি ঝাপসা হয়ে আসছে তাঁর শুভ্র শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য উপর দিকে প্রসারিত হওয়ার জন্য। বইয়ের সেল্ফটার কোন শ্রী নেই—বাখারির বুননের ফাঁকে সাদা গুঁড়োর প্রলেপ—ঘুণ ধরেছে, আর তারি সামনে যে টিপয়টা রয়েছে তার উপরের বার্নিশটার দুর্দশাও কম নয়। সেটা সস্তা জাপানী টেবিল-ল্যাম্প—পিতলের কলাই উঠে নীচের টিনটা আত্মপ্রকাশ করেছে। একধারে পাতা রয়েছে ছোট একখানি তক্তাপোষ তারই আধ-ময়লা চাদরের উপর দু'জনে বসল।

প্রভাত বললে, কবিদের খোরাক এ ঘরের কোথাও পাবে না—

শুভব্রত মৃদুকণ্ঠে বললে, যুগে যুগে সবকিছু বদলায়, কবিদের রসদও এক থাকে না।

প্রভাত বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ যুগের রসদ কি?

বেশী করে লজ্জিত হ'ল শুভব্রত। বললে, আপনি যেন কিছু জানেন না! আপনার লেখা আমি পড়েছি।

প্রভাত বললে, হাঁ এক সময়ে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যে ছিল ওর রসদ, আজ অন্ন-বস্ত্রের কৃচ্ছ্রতায় জাগছে ওর প্রাণ। অন্নচিন্তা চমৎকারা এ নিয়ম আজ খাটে না।

কিন্তু একি শুধু কান্না নয়? শুভব্রত জিজ্ঞাসা করলে।

কান্না!

হাঁ—কবিতা লিখে আমরা হাসতেও পারি—আবার কাঁদতেও পারি। মানে আমি হয়ত ঠিক বুঝাতে পারব না, তবে আমার মনে হয় কবিতা লেখার উপকরণ বদলে যাওয়াতে উপভোগেও বাধা পড়ছে।

বুঝতে পারলাম না।

মানে—সবাই দুঃখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে দুঃখের কবিতা পড়বার সময়ই বা কই! আজকের জীবন মানুষকে সব সময়ে তাড়না করছে—থামলে পরে কোথায় কি যেন ক্ষতি হয়ে যাবে! কিন্তু না থেমে ছুটতে ছুটতে—

প্রভাত হেসে বললে, তবু আমরা কবিতা লিখি এবং পড়ি আর শুনিও। শুনতে শুনতে আমাদের অনুভূতি দুঃখে বা আনন্দে প্রখর হয়। আমরা উপভোগ করি বৈকি শুভব্রত।

শুভব্রত বললে, এ লেখার কোন সার্থকতা আছে?

সে উত্তর নিজেই আশা করি পেয়েছ। নইলে তুমিই বা কবিতা লিখবে কেন। সৃষ্টিটা এমন অদ্ভুত যে, যে যা চায় না তাকে তাই করতে হয়। আনন্দ সব জিনিসের বীজের মত—সুখেও সে আছে, দুঃখেও আছে। কৈ বার কর তোমার খাতা।

পড়তে পড়তে শুভব্রতের সঙ্কোচ কেটে গেল। গলার সুরে কম্পন জাগল—উচ্ছ্বাস বা আবেগ তাকে ঠেলে নিয়ে চলল মর্ত্ত্য থেকে কল্প-চারণায়। সে লোকে পৃথিবী রইল পায়ের তলায়—দুঃখ রইল থিতিয়ে—গ্রহনক্ষত্রেরা দ্যুতিময় দেহ নিয়ে তার চারিধারে আনন্দ-রশ্মি ছড়াতে লাগল।

সুখ দুঃখের সাগর পারেতে মৃদু তরঙ্গ দলে
জীবনের ব্যথা জীবন-শিল্পী কুটীর যে অবহেলে।
তোমার আমার অতি সাধারণ জীবনের ব্যথা নয়,
নিখিল-মানস ধ্যানলোকে যার জয় এবং লয়।

বন্ধু—তোমার বেদনা আমার মর্ম্মে রহিল লাগি
উদয় অরুণ দেখিব বলিয়া সুদীর্ঘ নিশি জাগি।
শিশিরে গলিয়া দুঃখের মেঘ নদীতে নামেও যদি
রূপালী ঢেউয়েতে বন্দী অরুণ ফিরে দিবে হারানিধি ;
তৈল টানিয়া সলিতার মুখে অগ্নি উজল হয়,
দহনের কালে তিমিরে লেখে সে আপনার পরিচয়।

মায়ের ডাকে স্বপ্ন-জগৎ থেকে বিচ্যুত হ'ল প্রভাত। অপ্রতিভ শুভব্রত তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে বললে, ছিছিছি আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।

প্রভাত হেসে বললে, সময় তো নষ্ট হবার জন্যেই।

দু'জনে বাইরে এল। শুভব্রত হাত তুলে নমস্কার করতেই প্রভাত তার হাত চেপে ধরলে। কোমল হাত—ওর মুখের মতই সুন্দর। স্পর্শে আত্মীয়তার সুর বেজে উঠল। যেন জন্ম-জন্মান্তরের চেনা মানুষ—যাকে পর বলে ব্যবধান সৃষ্টি করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

শুভব্রত আকৃষ্ট হ'ল এই স্পর্শে। বললে, একদিন আসবেন আমাদের বাড়ীতে ?

প্রভাতের মুখে ছায়া নামল—বললে, কিন্তু ওই বাড়ীটাই তো তোমাদের ?

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা শুভব্রতের স্মৃতিপথে এল। বুঝলে ও-বাড়ীতে পা দেবার সঙ্কোচ কেন প্রভাতের। সে মাথা নামিয়ে উত্তর দিলে, হাঁ—ওই বাড়ীটাই। অবশ্য মেজ-জ্যেঠামশাইর সঙ্গে পার্টিশন হয়ে গেছে। বলতে বলতে লজ্জায় ওর সুগৌর মুখখানি লাল হয়ে উঠল।

প্রভাত তাড়াতাড়ি তার পিঠ চাপড়ে বললে, আচ্ছা যাব।

আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল আসব ?

এসো।

প্রভাত বাড়ী ঢুকতেই অনন্ত বললেন, আবার ওর সঙ্গে মাখামাখি কেন—ও পাট তো একদম শেষ করেই দিয়েছ!

প্রভাত বুঝতে পারলে না—পিতা এ ভাবে বক্রোক্তি করছেন কেন।

অনন্ত বললেন, যাও তেল মেখে নেয়ে নাও, আজ আমাদের আপিসে একটা ইণ্টারভিউ দিয়ে আসবে।

প্রভাত দৃঢ় স্বরে বললে, চাকরি আমি করব না।

অনন্ত সহসা চটে উঠলেন, তবে কি লাটসায়েবি করবে ?

না—লাট-সায়েবরাও বেশী দিন এখানে থাকছেন না।

অনন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তুই ভেবেছিস কি বলত ? তোকে যে এতদিন লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করছি সে কি কথার অবাধ্য হবি বলে ? আমাদের অবস্থা তুই বুঝবি না—কি করে সংসার চলে তা কি কোন দিন জানতে চাইবি না ?

প্রভাত বললে, বাবা, সংসার যে করে চলে সে জানি—কিন্তু সংসারের মধ্যে আমাকে নষ্ট করে দেবার জন্যই কি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ?

তোর কথা আমি বুঝতে পারি না প্রভাত। তুই বড় ছেলে—সংসারের অবলম্বন। তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি বেশী করে উপার্জ্জন করতে পারবি বলে—আমাদের মত ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না গোছ সংসার চালানোর জন্যে নয়।

কিন্তু চাকরি করে এর চেয়ে ভাল সংসার চলে না বাবা। আর চাকরিতে খুব বেশী লেখাপড়ার দরকারই বা কি!

সে বুঝবি আপিসে ঢুকে। সায়েবের সঙ্গে হরদম ইংরেজী চালাতে পারি, কিন্তু একটা নোট দিতে গেলে কলম ভেঙে যায়! কত বড় বড় বিষয় মাথাতেই ঢোকে না। ওরে আগেকার দিন আর নেই যে ইয়েস স্যার বলে কাজ চালিয়ে দেবে।

একটা বছর আমাকে মাপ করবেন বাবা—আমি চেষ্টা করে দেখব—চাকরি ছাড়া আমরা দাঁড়াতে পারি কিনা।

চাকরি ছাড়া করবি কি—ব্যবসা ? সে পুঁজি আছে তোর ?

ব্যবসার কথা ত ভাবছি না আমি—

তবে কবিতাপাঠ করে সংসার চালাবে বুঝি ?

প্রভাত তাড়াতাড়ি সরে এল সেখান থেকে। বাবা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। উত্তেজনা বাড়লে ওঁর লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না—যা মুখে আসে বলেন। দু'ঘা মারের চেয়ে তার ব্যথা বড় ভয়ানক। এমনই কল্পলোকের পৃথিবী কুৎসিত হয়ে উঠবে। অন্নবস্ত্রের কৃচ্ছ্রতায় কুৎসিত নয়—শালীনতা ও সম্ভ্রম-বোধ-মুক্ত মানুষের নির্লজ্জ আচরণে কুৎসিত। সৃষ্টির আনন্দ মুহূর্ত্তে বিষিয়ে ওঠে—যখনই স্বার্থের উলঙ্গ প্রকাশ দৃষ্টিকে আঘাত করে। মনে হয় সংসারে জীবনধারণের মত কদর্য্য জিনিস আর নেই। এখানে স্নেহ-ভালবাসার বেসাতি নিয়ে সবাই চলাফেরা করছে।

চলতে চলতে কখন সে এসে পড়েছে দীপাদের বাড়ীর সামনে।...কখন যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনিমেষ তার হাত ধরে টানছে, বলছে—এখনও চোখে তোর কবিতার ঘোর লেগে রয়েছে যে। এত ডাকলাম দোতলার জানালা থেকে একবার মুখ তুলে চাইলি না পর্য্যন্ত!

অনিমেষকে অনুসরণ করে প্রভাত গেল—ফিকে নীলরঙা বসবার ঘরে—একধারে তার বিলাতী ব্রোকেডে মোড়া সুদৃশ্য সোফা—কৌচ—অন্য ধারে ঢাকনাখোলা সুবৃহৎ অর্গান। মাঝখানে পালিশ করা টেবিলে মোরাদাবাদী ফুলদানীতে গোলাপ আর গাঁদার তোড়া—মাথার উপর সাদা রেডের পাখা—আর লাল ফানুষে বিজলী বালব যেন লাল পাপড়ীর মুদৃত একটি ফুল—সাদা কোরকটিকে সযত্নে ঢেকে রেখেছে

তার বুকের মধ্যে। দেওয়ালের ছবিগুলিতে এখনও শুকনো ফুলের মালা জড়ানো—স্বাধীনতা দিনের তিনরঙা নিশান—তাও খুলে নেওয়া হয় নি। কেন খুলে নেবে? ওদের স্বাধীনতা তো একটি দিনের নয়—প্রতিদিনে তাকে চেখে চেখে উপভোগ করছে ওরা। এই করে বসে প্রতিদিনই ভাবতে পারা যায়—আমরা স্বাধীন স্বাধীন। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ—কিংবা সংসার—কোনকিছুর অন্তরালে শৃঙ্খল-ঝঙ্কার শ্রুতি-গোচর হবে না এই ঘরে বসলে। যে ভয় যে সমস্যা প্রভাত-দের গৃহসীমানায় যখন তখন ঝড় তুলছে—এই গৃহ সেই পরিধির বাইরে।

প্রভাতের গাম্ভীর্য্য দীপাকে আঘাত করল। সে বললে, আজকাল বড্ড বেশী গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন প্রভাত-দা—শেষ-কালে না দার্শনিক হয়ে পড়েন।

প্রভাত উত্তর দিলে, বয়স বাড়লে দর্শনের পুঁজিও বাড়ে, দার্শনিক হওয়া আশ্চর্য্য কি!

উক্তিটা বেসুরো লাগল। দীপা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, আচ্ছা প্রভাত-দা—এবার ছাব্বিশে জানুয়ারি হবে ত?

কেন হবে না?

আমরা তো স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম—তাই বলছি।

সত্যিই কি স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা?

বাঃ রে—পাইনি ত ব্রিটিশ এদেশ ছেড়ে যাচ্ছে কেন? এক বছর পরে দেখবেন—ওদের একটি সৈন্যও এদেশে থাকবে না।

তাই নাকি! প্রভাত হো হো করে হেসে উঠল।

দীপা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, কাগজে তা হলে মিথ্যে লিখেছে?

না না, মিথ্যে লিখবে কেন। প্রভাত হাসতে হাসতে বললে, তবে রাষ্ট্র চালানোর জন্যে ওদের রীতিনীতি, আইন কানুন ভাষা—

অনিমেষ বললে, তুই কি রাতারাতি সব মুছে ফেলতে চাস?

আমরা যা চাই—তা পাই কি? আমরা সবকিছুর জন্যে মূল্য দিয়েছি—তবু ঋণ এখনও শোধ হ'ল না!

প্রভাত উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

দীপা আর অনিমেষ দু'জনেই চমকে উঠল। এমন তিক্ত কর্কশ হাসিও হাসতে পারে প্রভাত!

সত্যই এর পর আলাপ জমল না। দীপার কৌতূহল স্তিমিত হয়ে এল—অনিমেষ অন্যমনস্ক হবার ভান করলে। প্রভাতের এই ধরণের হাসিকে ওরা ভয় করে।

দীপার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। যেদিন প্রাইভেট টিউশানি নিতে প্রভাতকে ও বারণ করেছিল—তার পরের দিনের কথা।...

সেদিন সকালে প্রভাত এ বাড়ীতে আসে নি। সন্ধ্যার মুখে দীপাই যেন ওকে ধরেছিল পথের মাঝে। বলেছিল—গেলেন না যে সকালবেলা। ভাবলেন বুঝি কালকের ব্যাপারটা নিয়ে না জানি কি কাণ্ডটাই বাধবে!

বুঝলাম—ম্যানেজ করে নিয়েছ তুমি?

আপনি ত ভেবেছিলেন পারব না।

অকস্মাৎ হেসে উঠেছিল প্রভাত। এমনি উচ্চ আর কর্কশ হাসি। সে ধ্বনিতে দীপার আত্মতৃপ্তি খান খান হয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কথাটা কি আত্মগৌরবের মত শোনাল! ব্যাপারটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি দীপা। শুধু মনে হয়েছিল প্রভাতের মিষ্ট স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

এর পর দিনকয়েক প্রভাত তাদের বাড়ীতে আসে নি। যেদিন বাড়ীতে এসেছিল সেদিনও কথোপকথনের ধারাই ছিল সংক্ষিপ্ত—বাঁকা। হঠাৎ কিছু না বলে ও চায়ের আসর ত্যাগ করেছিল।

আজও হঠাৎ হাসি থামিয়ে প্রভাত বললে, আচ্ছা আসি।

প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে ও বার হয়ে গেল।

দীপা বললে, ব্যাপার কি ছোড়দা?

অনিমেষ বললে, বুঝতে পারলাম না। ও নাকি পড়তে চায়—কিন্ত সুবিধা করতে পারছে না। তার জন্য ওর মেজাজ খিটখিটে হয়েছে।

কেন?

কেন—তুই জানিস না?

ওঃ—দীপা লজ্জিত হয়ে মুখ ফেরালে।

(ক্রমশঃ)

ওয়াশিংটনে টমাস জেফারসন স্মৃতি-সৌধ পরিদর্শন-রত ভারতীয় 'লেবার অফিসার' পাখান
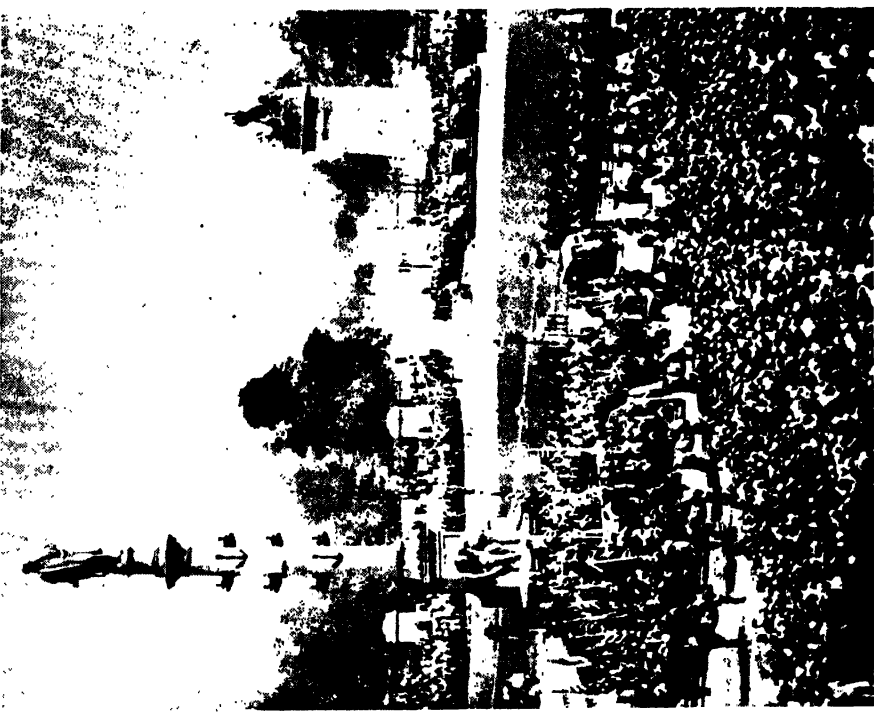
আমেরিকার নিউইয়র্কে কলম্বাসের স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে কলম্বাস দিবস উদ্‌যাপন
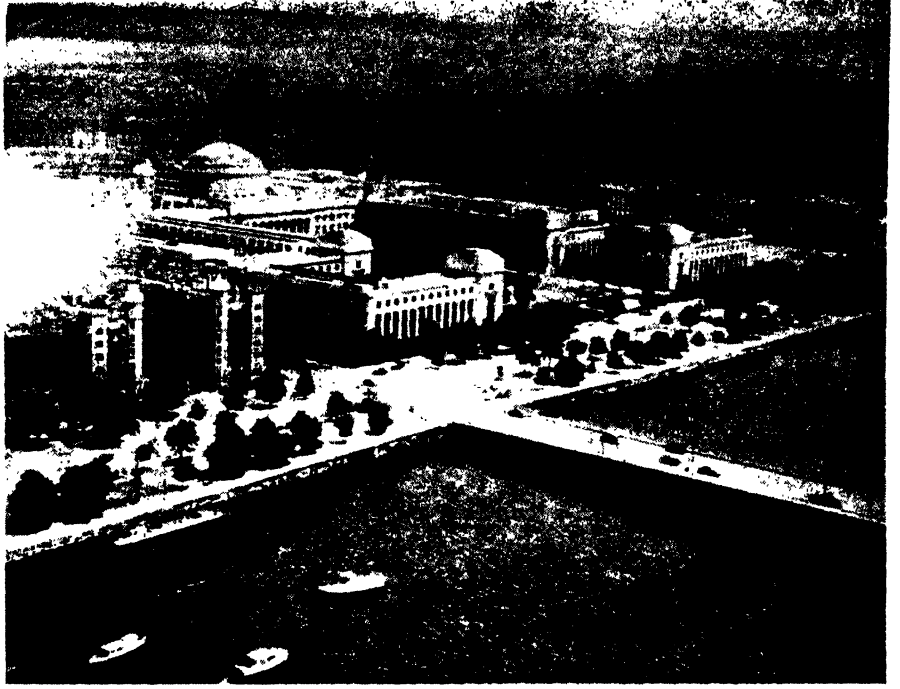
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, ম্যাসাচুসেট্স

সিউলের পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনীত চাল বিতরণ

হলদীঘাটের যুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীনীরদভূষণ রায়

রাজস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেবার দেশ। ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে এই রাজ্য কোটা হইতে চুনারপুর, তথা হইতে সিরোহী এবং সিরোহী হইতে বিওয়ার পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্যে আনুমানিক ১৫০ মাইল ও প্রস্থে ১০০ মাইল বিস্তৃত ছিল। আরাবল্লী ও সাতপুরা পর্ব্বতমালা এবং ইহাদের শাখাপ্রশাখা ইহাকে যেমন সুরক্ষিত, তেমনি কঙ্করময় ও অনুর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। মেবারবাসীদিগকে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শস্য উৎপাদন করিতে হয়। ইহারা যেমন বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান তেমনই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নির্ভীক। এই শিশোদীয় রাজপুতদিগের বীরত্বকাহিনীর এক অধ্যায় বর্ণনা করিতেছি।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের চারি বৎসর পর (১৫৬০) আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ক্রমে মালব, মেড়তা ও গণ্ডোয়ানা (১৫৬২) জয় করিয়া তিনি চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৬৭)। এই চিতোর জয় (১৫৬৮, ২৩ ফেব্রুয়ারী) ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আকবর দুর্ভেদ্য রণথম্ভোর (রণস্তম্ভপুর) ও কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া (১৫৬৮) এবং মারবার-বিকানীর-জয়সলমীর রাজাকে নিজের অধীনে আনয়ন করিয়া ১৫৭৪ সালে সমগ্র রাজস্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপসিংহই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন।

ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথ আকবর-প্রতাপ সংঘর্ষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"Pratap's patriotism was his offence. Akbar had won over most of the Rajput chiefs by his astute policy and could not endure the independent attitude assumed by the Rana who must be broken if he would not bend like his fellows."

বস্তুতঃ স্বদেশপ্রীতিই প্রতাপের কাল হইয়াছিল। নিজের বিচক্ষণতা ও যুক্তিকৌশলে আকবর রাজপুতানার নৃপতিদের মধ্যে অনেককেই বশীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাঁহাদের মত তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকায় আকবর তাঁহার শক্তি চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করেন। পণ্ডিতপ্রবর গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মন্তব্য করিয়াছেন, প্রতাপ মানসিংহের সহিত একত্র আহার না করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করায় আকবর এত ক্রুদ্ধ হন যে, রাণাকে শায়েস্তা করিবার জন্য কচ্ছবাহ সেনাপতিকেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।"[2]

দুইটি মন্তব্যেই আকবরের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্রোধকেই যুদ্ধের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজ্য জয় করা ত রাজধর্ম।

> হফত্ আক্লিমরা বগিরদ বাদশাহ্
> হামচুনান্ দরবন্দ্ অক্লিমে দিগর।

অর্থাৎ, সাতটি রাজ্য জয় করিতে পারিলেও বাদশাহদিগের অন্য রাজ্য জয়ের বাসনা প্রবল হয়। ইহা ত মামুলি কথা। দিল্লী-মেবার যুদ্ধের ইহা অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু স্পেনের দ্বিতীয় 'ফিলিপ' বা প্রতিহিংসাপরায়ণ রুশীয় জার আইভানের ন্যায় আকবর কেবল নিজ শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য লালায়িত ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও ধর্মের লোকদিগকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া সকলকে রাজকার্য্যে সমান অধিকার দিয়া তিনি একজাতীয়তার সৌধ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আর এই মহান্ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে তিনি কত ব্যথা ও লাঞ্ছনাই না মাথায় পাতিয়া লইয়াছিলেন। মৃগয়ার পর আগ্রা প্রাসাদে ফিরিবার পথে সম্রাট আকবর যেদিন পীর বাবা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী সাহেবের ভজনগান-রত এক দল ফকিরকে দেখিতে পান সেই দিনটি তাঁর জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ বৎসরই তিনি আম্বের-রাজ ভারমলের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রায় বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সম্রাট আকবর সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিপ্রসূত তীর্থ-কর ও জিজিয়া করের বিলোপসাধন দ্বারা সকল প্রজাকে একই রাজকীয় বিধান ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করিয়া উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন। প্রতাপ ও অন্যান্য নৃপতিদিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিলোপ ব্যতীত আকবরের পক্ষে নিজের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। ইহাই দিল্লী-মেবার সংঘর্ষের প্রকৃত বা মুখ্য কারণ।

আকবর মেবারাধিপতিকে কূটনীতিবলে নিজের অধীনে আনিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ১৫৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মানসিংহকে গুজরাট হইতে উদয়পুরের পথে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন।[3] মেবারে তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হইয়াছে। রাণা উদয়ের স্বর্গারোহণের পর (১৫৭২) প্রতাপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগমালকে বিতাড়িত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আর জগমল শাহী কৃপায় জাগীর পাইয়া জাহাজ-

---

* V. A. Smith: *Akbar, the Great Mogul*, p. 151.

২ রাজপুতানা-কা-ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৯।

৩ আকবরনামা, মূলগ্রন্থ, এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৪০।

পুরে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।৪ মান উদয়পুরে পৌছিলে প্রতাপ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যান। তথায় অবস্থানকালে মান মেবাররাজের সহিত একত্র ভোজনসময়ে মনের গোপন কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হন। উদয় সাগরের তীরে সুশোভিত মণ্ডপে ভোজনের আয়োজন করা হয়, কিন্তু আহারের সময় উপস্থিত হইলে, প্রতাপ অসুখের ভান করিয়া তাঁহার পুত্র অমরকে অতিথির সহিত একসঙ্গে আহার করিতে প্রেরণ করেন। জয়সিংহ চরিত্রে রামকবি তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

राना सों भोजन समय गही मान यह बान ।
हम बयौ जैंवें आपहू जैंवत हो किन आन ॥
कुंवर आप आरोगिये राना माख्यो हेरि ।
मोहि गरानी सी कछू अबै जैंहूँ फेरि ॥

মান প্রতাপকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি অন্নগ্রহণ না করিলে, আমি কিরূপে আহার করি :" রাণা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি অসুস্থ, আপনি ভোজন করুন, আমি না হয় পরে করিব।"৫

প্রতাপের আচরণে মান ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিয়া ভোজ্যবস্তু ফেলিয়া আগ্রা যাত্রা করেন। এই ঘটনার পরও বাদশাহ আম্বেররাজ ভগবানদাস এবং রাজা টোডরমলকে মেবারে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। ভগবানদাস ১৫৭৩ সালের অক্টোবর মাসে গুজরাট হইতে আগ্রা ফিরিবার পথে রাণার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতাপের রাজ্যচ্যুত ভ্রাতা জগমাল তখন মেবার-সীমান্তে সিরোহী রাজ্য জয়ের চেষ্টায় রত। নিজ রাজ্যপ্রান্তে বিদ্রোহী ভ্রাতার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখিয়া প্রতাপ শাহী খেলাত পরিধান করাইয়া পুত্র অমরকে আগ্রা দরবারে প্রেরণ করেন, কিন্তু নিজে মর্ম্মবেদনায় পীড়িত এই অজুহাতে আগ্রা যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।৬ ১৭ই অক্টোবর, ১৫৭৩ সালে জগমাল যুদ্ধে নিহত হন এবং প্রতাপের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়। তাঁহার মনোভাব লক্ষ্য করিবার জন্য রাজা টোডরমল উদয়পুরে উপস্থিত হন; প্রতাপ তাঁহাকেও স্তোকবাক্য এবং মিষ্টকথা বলিয়া বিদায় করেন।৭

হিজরী ৯৮৪ সালের পবিত্র মহরম মাস। আজমীঢ়ে পীরের দরগাহ্ এই সময় উৎসব-আনন্দে মুখরিত। একদা বাদশাহ তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মানসিংহকে লইয়া পুষ্পসুরভিত পবিত্র সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং 'ফাতেহা'৮ পড়িয়া মর্শিদ পীরের নিকট বরকাত মাগিলেন।৯ বাদশাহ তখন প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কৃতসঙ্কল্প। এক দিন মানকে গোপনে ডাকিয়া তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কচ্ছবাহ সেনাপতি দ্বিধাহীন চিত্তে শাহী যুদ্ধ পরিচালনা করিতে সম্মত হইলেন এবং ঐ বৎসরের (ইং) ১৫৭৬ সালের এপ্রিল মাসে মণ্ডলগড় অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন নামজাদা সেনানায়কগণ—আসফ খান্, খাজা মুহম্মদ রফি বদখ্শী, গিয়াসুদ্দীন ঘুয়ো-পারেন্দা কজাক, আলী মুরাদ উজবক ও বারহা সৈয়দগণের অধিনায়ক সৈয়দ আহমদ ও হাসিম বারহা, জগন্নাথ কচ্ছবাহ ও মধুসিংহ।১০ রাণার বিরুদ্ধে এই অভিযানের সংবাদে গোঁড়া মুসলমানের মধ্যে এক প্রবল জেহাদী মনোবৃত্তি ও রণোন্মাদনার সৃষ্টি হইল। সিক্রীর সেখ সাহেবের বংশধরগণের অনেকেই 'আখেরে'র জন্য 'ছোয়াব' হাসিল করিতে ব্যগ্র হইলেন। আর দেখাদেখি শাহের অন্যতম খাস্ ইমাম 'তারিখ'-প্রণেতা আবদুল কাদের বদায়ুনী সাহেব 'জেহাদ' নেশায় মাতিয়া উঠিলেন। তিনি সকল কথা অকপট ভাবে তাহার 'মুন্ত্খাব-উত-তাওয়ারিখ' বা 'ইতিহাস-চয়নিকা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোল্লা সাহেবের এই জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদানের পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল এই যে, তিনি সবেমাত্র খাস ইমামপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ছুটি পাওয়াই তাঁহার পক্ষে দায়। প্রথমে তিনি সেখ-উল-ইসলাম সেখ আবদুন্নবি সাহেবের নিকট ধরণা দিলেন। তাঁহার গতিমতি ভাব দেখিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর মীর সৈয়দ আবদুল লতিফের পুত্র নকীব খাঁর শরণাপন্ন হন। গোঁড়ামিতে খাঁ সাহেব বদায়ুনীর এক কাঠি উপরে ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মীর গিয়াসুদ্দীন উগ্র মতবাদের জন্য কজবীন শহর হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খাঁটি সুন্নি পরিবেশে বাস করার ফলে এই পরিবারের গোঁড়ামি আরও উৎকট হইয়া উঠে। তাই বদায়ুনীর 'জেহাদী' প্রস্তাব খুশি মনে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই, হিন্দুর সর্দারী না থাকিলে আমিও ত যুদ্ধে যোগদান করিতাম।" বদায়ুনী নিরস্ত না হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সেনাপতি মানসিংহ বা অন্য যে কেহই হউন না কেন, তিনি যদি হজরতের (বাদশাহের) 'বান্দা' ও খাঁটি 'নিয়তে'র লোক হন তাহা হইলে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে। এই যুক্তিতে নিরুত্তর হইয়া নকীব বাদশাহের নিকট বদায়ুনীর ছুটির আরজী পেশ করিলেন। বাদশাহ ইমাম সাহেবকে

৪ রাজপুতানা-কা-ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৬।
৫ " " পৃ. ৭৩৮-৪০।
৬ আকবরনামা, পৃ. ৬৭।
৭ – –

৮ কোর্‌আনের প্রথম অধ্যায়
৯ মুন্তখাব-উত-তওয়ারিখ, মূলগ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২২৭।
১০ ঐ, পৃ, ২২৮

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সত্যি কি আপনি যুদ্ধে যাইতে চান?" বদায়ুনী সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "হাঁ হুজুর, এই যে আমার কালো 'মহাজেন' (দাড়ী), তাহা আপনার খেদমতে রঞ্জিত করিতে চাই" এবং নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :

কারে তু মর্থাত্ম্যা আহত্‌ খাহদ্‌ করদন্‌
তা হোয়ৎ কুনম্‌ রোয়ে আজ তু ইয়া গরদন্‌।

অর্থাৎ, "আপনার সেবার কাজটিতে বিপদ থাকে থাকুক, হয়ত আমার মুখমণ্ডল রক্তাভ, না হয় গ্রীবা রক্তাপ্লুত হইবে।" বদায়ুনীর ভক্তিতে বাদশাহ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "ইন্‌সা আল্লাতায়াল্লাহ আপনি খোশ খবর লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।" এই বলিয়া 'ফাতেহা' পড়িতে পড়িতে বাদশাহ অশ্বচালনা করিতে উদ্যত হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে বদায়ুনী কদমবুছী করিবার জন্য বাদশাহের পদকমলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন, আর বাদশাহ রেকাবস্থিত পা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এক অঞ্জলি আশরফি ইমাম সাহেবের হাতে ঢালিয়া দিলেন। বদায়ুনী বিদায় পাইয়া 'জেহাদী' দলের সহিত মেবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।১১

শাহী ফৌজের মণ্ডলগড় আগমন-সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রতাপ জন্মভূমি রক্ষাকল্পে তৎপর হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের পুণ্যপাদস্পর্শে পূত মেবারের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল তাঁহার নিকট পবিত্র। মেবারই ছিল তাঁহার সকল ধর্ম, কর্ম, চিন্তা ও ধ্যানের মূলে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের মেবার দিল্লীর সমকক্ষ ছিল। রাণা সঙ্গ ভারতের রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও বাবর বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু দুঃখবিগ্রহ ও নানা বিপর্য্যয়ের ফলে রাণা উদয়ের আমলে মেবার এক ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। কি অর্থ-সামর্থ্যে কি লোকবলে শাহী পক্ষের তুলনায় তদানীন্তন মেবার ছিল নগণ্য। তাই প্রবল শত্রুপক্ষের আক্রমণকে কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রতাপ তাঁহার আশ্রিত রাজা ও ভৌমিকদিগকে এক মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে১২ ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগকে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মেবারের গিরিকন্দরের সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে মানসিংহ মণ্ডলগড় হইতে যাত্রা করিয়া মোহীগ্রাম হইয়া প্রতাপের শক্তিকেন্দ্র গোগুণ্ডা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র দশ হাজার সৈন্য।

১১ ঐ পৃ. ২২৮-২৯

১২ রাজপুতানা-কা ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৪২

অরণ্যাকীর্ণ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ 'চুমুখনা' বা চক্রব্যূহের অনুপযোগী মনে করিয়া সুকৌশলী সেনাপতি অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ মেবারসিংহের বিবরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপ গোগুণ্ডায় অবস্থান করিয়া কচ্ছবাহ সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, প্রতাপ এমন গোঁড়া ও বংশাভিমানী ছিলেন যে, তিনি মানসিংহের সহিত কেবল পানাহারে বিরত হন নাই পরন্তু যবনের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ তাঁহার সংস্রব অশুচি মনে হওয়াতে তিনি উদয়সাগরের তীরে যে স্থানে মানসিংহকে ভোজ্যবস্তু পরিবেশন করা হইয়াছিল সেই স্থানটি খনন করাইয়া সেখানে গঙ্গাজল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করেন এবং "আকবর তাঁহার ফুফা" এই গালি দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। "রাজ-প্রশস্তি মহাকাব্য" ও "জয়সিংহ-চরিতে" এই উক্তির উল্লেখ নাই, পরন্তু মেবার রাণাদের রাজচ্ছত্রতলে যে মুসলমান রাজারা, বাজবাহাদুর, গোলন্দাজ অধিনায়ক ইসমাইল১৩ এবং শূররাজবংশীয় হেকিম খাঁ শূর প্রভৃতি রাজ্যচ্যুত মুসলমান রাজারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। যদি তাঁহাদের অবস্থিতিতে ও দানাপানি গ্রহণে মেবারের পূত আবহাওয়া কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কচ্ছবাহ সেনাপতির অন্নগ্রহণে কি করিয়া উদয়-সাগরের তীর দূষিত হয়? স্ব স্ব চৌকায় স্ব-পাকভোজী রাজপুত চারণগণের মস্তিষ্কেই যে এই ধরণের কল্পনা গজাইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। হলদীঘাট রণাঙ্গনে যাহারা প্রতাপের জন্য জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হেকিম খাঁ শূর ছিলেন অগ্রগণ্য। আর তিনি রাণার এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, সৈন্যদলের এক ভাগের কর্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত হয়।

তখন জুন মাস।১৪ প্রখর রৌদ্র-দীপ্ত রাজস্থান তপ্ত কটাহের ন্যায় উত্তপ্ত। পার্ব্বত্য নদী-নির্ঝরিণী তখনও বিশুষ্ক;

১৩ আকবরনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১১

১৪ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড। পৃ. ১৭৪

তিন জন ঐতিহাসিক কর্তৃক রচিত একটি কলেজপাঠ্য পুস্তকে এই যুদ্ধের তারিখ এপ্রিল মাসে দেওয়া হইয়াছে। আর "Pratap was defeated"—এই এক কথায় মেবারাধিপতির সৎকার করা হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথ বলিয়াছেন, "The imperialists narrowly escaped suffering a total defeat."—*Akbar, the Great Mogul.* পৃ. ১৫০।

আবুল ফজলের মতে এক প্রহর বেলায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু মেবারস্থিত জগদীশ মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে ইহা প্রাতঃকালে সুরু হয়।

তৃণাচ্ছাদনশূন্য পর্ব্বতগাত্র রুক্ষ। এই নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৫৭৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি মানসিংহ গোগুণ্ডা দুর্গের অনতিদূরে বনাস নদীর তীরে অবস্থিত খমনোর গ্রামে পৌঁছিলেন।১৫ প্রতাপ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কচ্ছবাহ শিবির হইতে তিন মাইল দূরে হলদীঘাট গিরিসঙ্কটে মাত্র তিন হাজার সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ পরিচালনার ভার রাখিলেন নিজ হস্তে, অন্য ভাগ দিলেন হেকিম খাঁর উপর।

অপরপক্ষে মানসিংহ সৈন্য-সমাবেশ করিলেন পক্ষীর আকারে। এই পক্ষীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বাহিনীর চঞ্চুতে ছিল সৈয়দ হাসিম বারহার অধীনে একদল সৈন্য, মস্তকে জগন্নাথ কচ্ছবা এবং আসফ খাঁর অধীনে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক সৈন্য; পৃষ্ঠে মানসিংহ স্বয়ং, আর দক্ষিণ পক্ষে সৈয়দ আহম্মদ বারহা ও বাম পক্ষে মোল্লা কাজি খাঁ, এবং পুচ্ছদেশে (rearguard) মেহতর খাঁ। ১৮ই জুন (?) তারিখ উভয় পক্ষ হলদীঘাটের প্রান্তরে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল।১৬ প্রথমে আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ হেকিম খাঁ বিদ্যুদ্বেগে পশ্চিম দিক হইতে শাহী১৭ ফৌজের চঞ্চু বা অগ্রগামী দল দুইটির উপর আপতিত হইলেন। স্থানটি ছিল বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তাই বিভক্ত দল দুইটি একত্র সম্মিলিত হইতে না পারিয়া শত্রুসেনার আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যার্থ শাহী মূলবাহিনীর অধ্যক্ষ মানসিংহ দলবলসহ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হেকিম খাঁ অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া প্রচণ্ড আঘাতে এই অংশের বাম পার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্যোপায় হইয়া এই পার্শ্বের সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা লোকরণ স্বপক্ষীর অগ্রগামী দলের ব্যূহভেদ করিয়া আশ্রয়ের জন্য দক্ষিণ পার্শ্বে আহম্মদ খাঁ বারহার অধীনস্থ সৈন্যদলের দিকে ধাবিত হন। তখন ধাবমান প্রতাপসিংহের পক্ষীয় রাজপুত ও পলায়নপর (লোকরণের) অধীনস্থ রাজপুতদের মধ্যে তারতম্য করা কঠিন হইয়া উঠিল।

এদিকে মুজাহিদ মোল্লা বদায়ুনী আসফ খাঁর পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া শান্ত ও সংযত চিত্তে শর নিক্ষেপপূর্ব্বক কাফের-দিগকে "জাহান্নমে" (নরকে) পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু যখন উভয় পক্ষীয় রাজপুত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া গেল, তখন আসফ খাঁ বদায়ুনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, এই সময় আশ্না ও বেগানা (শত্রু ও মিত্র) রাজপুত সনাক্ত করা ত বড় মুশকিল। কি করা যায়?" তিনি উত্তর করিলেন, "আরে তীর ছাড়িতে থাকুন ত; দুশমন কাফের যে পক্ষেই নিপাত হয়, হউক, ইসলামের ত লাভই।"১৮ বদায়ুনী খোশমেজাজে যদৃচ্ছাক্রমে অবিরাম তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 'জেহাদ সোয়াব' হাসিল করিলেন।১৯

মোল্লা সাহেব যখন বিধর্ম্মীকুলের ধ্বংসসাধনে রত, প্রতাপ তখন উল্কার ন্যায় শাহী বাহিনীর বাম পার্শ্বের উপর পতিত হইলেন, আর হেকিম খাঁ দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ তখন চরমে পৌঁছিল। রাজপুত অশ্বারোহিগণের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া বাম পার্শ্বে অবস্থিত সিক্রীর সেখগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সমরাঙ্গন হইতে বহু দূরে পলাইয়া গেল।২০ এই দলের সৈন্যাধ্যক্ষ কাজী খান শত্রুসৈন্যের গতি-রোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দক্ষিণ হস্তে তরবারির আঘাত পাইয়া হজরত মুহম্মদের (দঃ) একটি উক্তি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনিও "মোহাজের" (পলাতক) হইলেন। দক্ষিণ পার্শ্বের অন্যতম সেনানায়ক সৈয়দ হাসিম বারহা হেকিম সুরের আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। সৈয়দ রাজুর সাহায্যে তিনি পুনরায় অশ্বা-রোহণ করিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই এই পার্শ্বকে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে প্রতাপ বাম পার্শ্ব ও কেন্দ্রস্থিত বাম অংশ বিধ্বস্ত করিয়া শত্রুসৈন্য মথিত করিতে করিতে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। মেবাররাজ কচ্ছবাহ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুম সে জহাঁ তক হো সকে বহাদুরী দিখাও, প্রতাপ সিংহ আ পহুচা হৈ।"২১ অর্থাৎ, প্রতাপ আগত। আপনার সমরকুশলতা এখন প্রদর্শন করুন। প্রতাপ তাঁহার প্রিয় অশ্ব চৈতকোপরি উপবিষ্ট, আর মান হস্তীর উপর আসীন। রাজপুতেরা কাছোয়া সেনাপতিকে বধ করিয়া তাঁহার তপ্ত শোণিতে যুদ্ধের জ্বালা মিটাইতে চেষ্টা করিবে এই ভাবিয়া, মান স্বাস্থ্যরশোভিত হাওদা পরিত্যাগ করিয়া হস্তীচালকের স্থানে উপবেশন

১৫ খমনোর গোগুণ্ডা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। রাজপুতানা-কা ইতিহাস, পৃ. ৭৪০। খমনোর হইতে হলদীঘাট তিন মাইল দূরে, এই স্থানের মাটি হলুদবর্ণের। তাই হলদীঘাট নাম। ঐ পাদটীকা, পৃ. ৭৪৩।

১৬ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৪

১৭ "আজ কেবল ক্লইয়া"। লো (Lowe) সাহেবের অনুবাদ ঠিক নয়।

১৮ হর তরফকে কাফের কুশ্ তা শোবাদ, সুদ-ই-ইস্লাম বাশদ।

১৯ "শিহস্ত দর আন্ আবু চুন্ মূহ্ আহলাম্ খতা নমি শোদ্ও সোয়াব-ই-জেহা হাছিল শোদ্" অর্থাৎ, বদায়ুনীর শর-সন্ধান পর্ব্বতোপম বিশাল সৈন্যসমূহের উপর অব্যর্থ হইল এবং ধর্ম্মযুদ্ধের পুণ্য সঞ্চিত হইল। (মুন্তখাব-উত-তাওয়ারিখ, ঐ পৃ. ২২৯)

২০ মুন্তখাব-উত-তওয়ারিখ, ঐ পৃ. ২৩২

২১ রাজপুতানা-কা ইতিহাস — পৃ. ৭৫১

করিলেন।[22] তীর ও বর্শা বারিধারার ন্যায় তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু মান কখনও মস্তক অবনত করিয়া, কখনও ঢালের সাহায্যে শরবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। ক্রমে চৈতক পৃষ্ঠারূঢ় প্রভুর রণোন্মাদনায় উত্তেজিত হইয়া মানসিংহের হস্তীর সমীপবর্তী হইয়া অগ্রবর্তী পা দুটি শুঁড়ের উপর তুলিয়া ধরিল, আর প্রতাপ মানকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যক্রমে লৌহমণ্ডিত হাওদায় প্রতিহত হইয়া উহা মাটিতে পড়িয়া গেল।[23] শাহী সৈন্যের অবস্থা তখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন। সৈন্যব্যূহের 'চঞ্চু' কর্ত্তিত, 'বাম পক্ষ' ভগ্ন, 'দক্ষিণ পক্ষ' অবসাদগ্রস্ত এবং 'পৃষ্ঠদেশের' এক দিক অচল। শাহীপক্ষের এই ঘোর অন্ধকারে একমাত্র মানসিংহই নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। দূর হইতে তাঁহার শৌর্য্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মোল্লা বদায়ূনী বিমোহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হিন্দু শমসের-ই-ইস্লাম জনদ"—অর্থাৎ, হিন্দু ইস্লামের তরবারি চালনা করিতেছেন।

এই দুর্য্যোগের সময় দূরে, বহু দূরে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভৈরবনাদ উত্থিত হইল, তখন প্রতাপের সৈন্যমধ্যে প্রচারিত হইল বাদশাহ সসৈন্যে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু যিনি এই দুর্য্যোগে প্রভঞ্জনগতিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ মেহতর খাঁ। তাঁহার অধীনস্থ তেজোদৃপ্ত সৈন্যদলের যোগদানের ফলে যুদ্ধের গতিতে সহসা এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল।

আবুল ফজলের উক্তি হইতে জানা যায়, "মেহতার খাঁর আগমনের পূর্ব্বে প্রতাপের সৈন্যদের দম্ভ ও আস্ফালনের সীমা ছিল না; তাহাদের স্ফূর্ত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল", কিন্তু অতর্কিতে এই পশ্চাদবর্ত্তী সৈন্যদলের যোগদানের ফলে যুদ্ধের গতি বিপরীতমুখী হইল। এই নূতন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য প্রতাপ তাঁহার রণ-হস্তীগুলিকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। লোনা নামক হস্তীটি অনেক শাহী মাতঙ্গকে পরাভূত ও শত্রুসৈন্য দলিত করিয়া সর্ব্বশেষ গজমুক্তা হাতীটিকে ঘায়েল করিল, কিন্তু সহসা লোনার মাহুত গুলীর আঘাতে নিহত হওয়ায় লোনার আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইল।[24] মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হস্তী রামপ্রসাদ লোনার শূন্য স্থান পূর্ণ করিল। এই মত্ত মাতঙ্গ ভণ্ড আস্ফালন ও শত্রুসৈন্যদের দলিত মথিত করিয়া রণক্ষেত্রে এক প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করিল। শাহী পক্ষের দুইটি হস্তী 'গজরাজ ও রণমদার' ইহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু এবারও শরনিক্ষেপপূর্ব্বক শাহীপক্ষ রামপ্রসাদের চালককে নিহত করিয়া কৌশলে হস্তীটিকে রণক্ষেত্রেই কবলিত করিয়া ফেলিল।

প্রতাপ তখনও রণতাণ্ডবে মত্ত। তাঁহার সহকারী সেনাপতিগণের অনেকেই, যথা—গোয়ালিয়ররাজ রামশাহ ও তাঁহার তিন পুত্র শালিবাহন, ভবানী সিংহ এবং প্রতাপ সিংহ,[25] জয়মলের পুত্র রাঠোর রামদাস, শঙ্করদাস, ঝালা-বীদা ও মানসিংহ, ভীমসিংহ সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন। শত্রুসৈন্যেরা প্রতাপকেও বেষ্টন করিয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় শরনিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত; বাহন চৈতকও ক্ষতবিক্ষত। দেহরক্ষী-পরিবৃত মেবাররাজ এই সমস্ত বিপর্য্যয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। এমন সময় নূতন সৈন্যবলে বলীয়ান শাহী বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব হেকিম খাঁর দলকে তাহার সৈন্যশ্রেণীর উপর ঠেলিয়া ফেলিল। সৈন্যদিগকে রণক্লান্ত অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত দেখিয়া মেবারাধিপতি আর শক্তিক্ষয় না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন।[26] মনে মনে স্থির করিলেন আবার নূতনভাবে প্রস্তুত হইয়া শাহী-বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল—এমনিভাবে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধের যবনিকাপাত হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপপক্ষে নিহত হইল তিন শত আশী জন ও শাহীপক্ষে এক শত বিশ জন হত ও তিন শত জন আহত।

হলদিঘাটের যুদ্ধে মেবাররাজ যে সাহস, বীরত্ব এবং সৈন্যপরিচালনায় যে নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যুগে যুগে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

---

22 মুন্তখাব-উত-তওয়ারিখ, পৃ. ২৩২-৩৩

23 রাজপুতানা-কা ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫১

24 আকবরনামা পৃ. ১৭৪-৭৫।

25 আকবরনামায় ভবানী সিংহকে ভম সিং বলা হইয়াছে। ওঝাজী এই ভুল সংশোধন করিয়াছেন। রাজপুতানা-কা ইতিহাস, ' ।৪৩।

26 মেবারস্থিত জগদীশ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক শ্লোকে প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে। শ্লোকটি দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে এইরূপ বুঝায় যে, প্রতাপ প্রাতঃকালে ভয়বা মহন্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানপক্ষীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

পূর্ব বাংলার ব্রতকথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
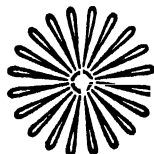
ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, পূর্ব্ব-ভারতের অবৈদিক আর্য্য-ভাষীদিগকে বৈদিক আর্য্যভাষীরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত ও তাহাদের অভিহিত করিত 'ব্রাত্য' বলিয়া। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই ব্রাত্যদের ক্রিয়াকে ব্রত বলিতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, "আমাদের গ্রাম্যসমাজে বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন-শক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসূত্র, কোথাও কোন প্রচলিত ব্রতের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম যে এই ধর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ তথ্য পরিষ্কার।" তাঁহার এই অনুমান ও ঐতিহাসিক যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে পরবর্ত্তীকালে ব্রতকথার মধ্যে যে পুরাণের কথা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয়, পূজার দিক হইতে যত মতবিরোধই থাকুক, ব্রত ও তাহার কথার মধ্য দিয়া যে মেয়েদের মন প্রভাবিত ও প্রকাশিত হইত ইহা পণ্ডিতেরা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রত উদ্‌যাপন করিতে ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। মেয়েরাই এখানে প্রধান। কোন মন্দিরে ইহা অনুষ্ঠিত হয় না; সেইজন্য স্থানের স্থিরতাও নাই। সমস্ত ব্রতই যে সমবেত ভাবে করা হয়, তাহা নহে। সমবেত ভাবে যেগুলি উদ্‌যাপন করা হয়, তাহার স্থান—চৌমাথার রাস্তায় কিংবা বটের তলায়। কিন্তু গৃহের আঙ্গিনার মধ্যেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া মেয়েরা ব্রত উদ্‌যাপন করে।

ব্রত উদ্‌যাপন যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিধবা, সধবা এবং কুমারীরা বিশেষভাবে যোগদান করেন। কতকগুলি ব্রত আবার পৃথক পৃথক ভাবেও আছে।

উপকরণের মধ্যে কোন মূর্ত্তিপূজার প্রচলন নাই। কিন্তু কয়েকটি ব্রতে আলিম্পন দিয়া পুতুল-চিত্র আঁকা হয়। কতক-গুলিতে অস্পষ্ট ভাবে পিটুলী বা ক্ষীর দিয়া গরুবাছুর নির্ম্মাণ করা হয়। সুবচনী ব্রতে গোবরের উপর শিলনোড়ার নোড়া স্থাপন করিবার রীতি আছে; পাটাই পূজায় দেখি বনের গাছ আনিয়া বাঁধিয়া মূর্ত্তির মত করা হয়। মনে হয়, ব্রত উদ্‌-যাপন বিমূর্ত্ত না হইলেও ইহাতে মূর্ত্তির ধ্যান নাই।

ফুল-ফল-মূল, হরিদ্রা, পান, সুপারি, কলা, ধান, দূর্ব্বা প্রায় প্রতি ব্রতেই প্রয়োজন। সুবচনী ব্রতে তেল সিন্দুর বিশেষ উপকরণ। 'ডাল'-এর প্রচলন সব ব্রতে না থাকিলেও কয়েকটি ব্রতে ডালের নৈবেদ্য দিতে দেখা যায়। রন্ধন-দ্রব্যের তেমন স্থান নাই। স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র দানও বিশেষ দেখি না।

গ্রামের পরিবেশ ছাড়া ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। ব্রতের কথাগুলির মধ্যেও গ্রামের দরিদ্র সংসারের কথাই বেশী। তবে গ্রাম ছাড়িয়া ব্রত যখন নগরে রাজপুরীতে স্থান পায় তখন হইতেই ব্রতের দেবী জাগ্রতা হন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রত পালনের ক্রিয়াকর্ম্মের কথা বিশেষ আলোচনা করিব না। আমরা সাধারণভাবে ব্রত-কথাগুলিকে লইয়াই আলোচনা করিব।

এই ব্রতকথার মধ্য দিয়াই বঙ্গনারীর মানস-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মানস-সংস্কৃতি কেন, তদানীন্তন কালের সামাজিক দিকের উল্লেখও ইহাতে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু ব্রতকথার রূপভেদ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই ব্রত-পূজার মূল অর্থের সহিত কথাগুলির বিরোধ। কিন্তু কথাগুলির সৃষ্টি বঙ্গনারীর মনের রুদ্ধ আবেগের দরুন।

ব্রতপূজার দুইটি প্রধান অঙ্গ—(ক) ব্রতপূজা আর (খ) ব্রতকথা। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রতকথাই প্রধান হইয়া উঠিল। এবং সেইজন্যই আজও ব্রতপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতপূজার মূল কারণ ছিল যাদুশক্তির প্রজননশক্তির ও কৃষিকর্ম্মের পূজা। কিন্তু ব্রতকথার উৎপত্তির কারণ হইল, মাতার স্নেহের প্রকাশ, সখীদের সহিত নববধূর প্রাণের কথার বিনিময় এবং নববধূর প্রতি শাশুড়ীর অভিযোগ।

ব্রতকথা অনেকে সঙ্কলন করিয়াছেন। কাশীনাথ তর্ক-বাগীশ একখানি ব্রতমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১৮৬৭ খ্রীঃ), কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত ও পুরাণ ইতিহাসের গল্পই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বাংলার সমাজ হইতে এই কথাগুলির উৎপত্তি হয় নাই। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণদের খাতির করিবার কথাও প্রচুর। ইহা ব্রতপূজার আসল অর্থের সহিত মোটেই খাপ খায় না।

পরবর্ত্তীকালে আরও অনেকে ব্রতকথা সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহিনীটুকুই স্থান পাইয়াছে, গ্রামের মেয়েরা স্থান পায় নাই। অর্থাৎ, এই কাহিনীগুলি সাধুভাষায় রূপান্তরিত হইয়া কতকগুলি সুরবিহীন গল্পের সমষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রতকথার আলাদা এক সুর আছে। ইহার বাক্যগুলি ছন্দে ছন্দে গ্রথিত—খুব সহজে হৃদয় স্পর্শ করিবার মত। কিন্তু

এই ছন্দ আবার আঞ্চলিক ভাষার ছন্দকেই বেশী মাত করে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষাকে বর্জন করিয়া ব্রতকথা সঙ্কলন করা যায় না; করা উচিত নয়।

পূর্ব্ব বাংলার ব্রতকথাগুলিই এখানে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। কিন্তু পূর্ব্ব বাংলা বলিতেও আমরা একটি বিস্তৃত অঞ্চলকেই বুঝিয়া থাকি। এই বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রতকথাগুলির রূপ বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্য এই ব্রতকথাগুলির ক্ষেত্র মূলতঃ পদ্মা-চন্দনা-মধুমতীর তীরের অঞ্চলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইল।

চন্দনা নদীর কথা বর্ত্তমানে অজ্ঞাত থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ব্রোকের নদনদীর নক্সায় এবং রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায়। ব্রোক চন্দনাকে যশোরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। এখন চন্দনা যশোরের অনেক পূর্ব্ব দিয়া গিয়াছে। পদ্মার গতিও পূর্ব্বে অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাজেই ঢাকা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের লোককেই এই অঞ্চলের মধ্যে ধরিতে পারা যায়। এখানকার অধিবাসীদের ইতিহাস আলোচনা করাও বড় কঠিন। ব্রতকথায় কোথায়ও মুসলমান আমলের কথা পাওয়া যায় না বরং বণিকসভ্যতার সময়ের কথাই বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। ধনপতি সওদাগর আর চাঁদসওদাগরের আমল ব্রতকথার মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু নগর-সভ্যতার বিশেষ ইঙ্গিত নাই, সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ। কৃষিকর্ম্মের কথা এগুলিতে প্রধান।

ব্রতকথায় যুদ্ধ-কাহিনীর বর্ণনাও নাই। মনে হয় ব্রতপূজার মূলধারা অনুসরণ করাই ছিল কথার প্রথম প্রয়াস; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অন্তঃপুরিকার ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট কথার মধ্যে একটু একটু স্থান পাইয়া বসিয়াছিল। এই জন্য কাহিনীর সর্ব্বজনীনত্ব আছেই। তবে বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি ভূষণা-মামুদপুর প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাহিনী স্থান পায় নাই।

আঞ্চলিক ভাষাও ব্রতকথার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক নূতন রূপ লইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমার শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়া বা ঢাকা মাণিকগঞ্জের মেয়ে বিবাহিতা হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে আসিত পেঁটরা, বেতের ঝাঁপি আর ব্রতকথার বুলি, হয়ত পাবনা আতাইকুড়ির মেয়ে আসিল কালুখালির বাঁশের ঝাড় আর ক্ষেতের-খোলের দেশে। ইহারা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আসিত না। কাজেই এই উপায়েও ব্রতকথার কল্পনা এবং ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে।

এই ব্রতকথার মধ্যে এমন একটা সুর আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে 'আগমনী' গানের পরিপূরক। আগমনী গানে মায়ের কান্না মেয়ের জন্য। বাংলার মেয়েরে আট বছরে বিবাহ হইয়া পরের ঘর করিতে যাইতে হইত। সেখানে কত কষ্ট! মায়ের প্রাণ বৎসর অন্তে তিন দিনের জন্য মেয়েকে দেখিতে পাইবে বলিয়া কত ব্যগ্র। কিন্তু আগমনী গানে সেই বালিকা বধূটির রণরঙ্গিণী শাশুড়ীর উল্লেখ নাই। আগমনী গানে কন্যার জীবনের এই পৃষ্ঠাটি উহ্য।

কিন্তু ব্রতকথায় সেই কন্যা দজ্জাল শাশুড়ীর ঘরে, যৌথ-পরিবারে, তার অপারগতা লইয়া কি করিয়া দিন কাটাইয়া থাকে, তাহাই চোখের জলে, ছোট ছোট কথায়, অলঙ্কার-বর্জ্জিত ভাষায় বলিয়া থাকে। পাটাই পূজার কথায় আছে, "শাশুড়ী উনেনের থিকে গরম হাতা নিয়ে আসে বউর জিব্-হের ঠা'সে দ'-হোরলেন।" অর্থাৎ, শাশুড়ী উনান হইতে গরম হাতা লইয়া আসিয়া বৌয়ের জিহ্বায় ঠাসিয়া ধরিলেন।

অবশ্য বধূদের সম্বন্ধে খারাপ কথাও যে না আছে তাহা নহে। শাশুড়ীরাও সেই সম্বন্ধে অনেক গল্প তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু কোন বধূ যদি তেমন "অন্নেয়ে"র (অন্যায়) কাজ করিয়াই থাকে তবে তাহা অনেকটা বেতের শীষের মত। তার কাঁটার শক্তি খুব কম, পথিকের পথের বিঘ্নও তেমন ঘটায় না, শুধু আলগোছে একটু উত্যক্ত করিয়া লয় মাত্র। বলিতে পারা যায়, তার অন্তরের বেদনা পল্লবের 'পেলব' ভঙ্গীতে একটু সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে মাত্র। ধাঁকুড় ষষ্ঠীর বৌয়ের দুর্ভাগ্য, অশোকষষ্ঠীর 'বামনী'র দুঃখ, মনসা-ব্রতের 'গিরস্তে'র বউয়ের কাহিনী নানারকম ভাবে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। চৈত্র মাসে হয় অশোক-ষষ্ঠী। অশোকষষ্ঠীর অশোকার মাতা এক বিস্ময়কর মেয়ে। ব্রাহ্মণদের সমাজে যে যুগ হইতে মেয়ের সমস্যা বড় হইয়া উঠিল সেই যুগের চেহারা এই। ব্রাহ্মণের কেবল কন্যা-সন্তানই হইত, পুত্রসন্তান আর হইত না। কিছুদিন পূর্ব্বেও পাড়াগাঁয়ে ইহার জন্য কন্যাপ্রসূতির দুর্ভাগ্যের আর অন্ত ছিল না। ব্রতকথার ব্রাহ্মণ তাই ব্রাহ্মণীকেই দায়ী করিলেন, শাসাইয়া গেলেন এবার কন্যা হইলে ব্রাহ্মণীকে তাড়াইয়া দিবেন।

—একদিন বাউনী পোয়াতী। বাউন বলিছে, 'এই বাউনী! ইবার যদি মিয়ে অয়, তয় মিয়ে দিয়ে আর তোর দিয়ে তাড়ায়ে দেব।'—কিন্তু কন্যাই হইল। ব্রাহ্মণ তখন পূজা করিতে গিয়াছেন।

"উনি কি করেন?"

—মিয়ের দুধ খাওয়ায়ে, তেল-কাজল দি-ই-য়ে, টিপ্যি ক'রে এক নতুন পাতিলির মদ্দি শুয়ায়ে একখেন চেলির কাপড় দিয়ে ঢাক্-এ, সরা ঝুরির উপের দিয়ে, নদীর জলে ভাসায়ে দিলেন।—

কন্যাটিকে বিসর্জ্জনের সময়েও মায়ের স্নেহ কন্যার আনু-কূল্য করিয়া দিল। আজকাল এইগুলিকে আমরা শহরে

বলিয়া বর্ব্বরতা বলিব; বলিব যে, মেয়েদের উপর স্বামীদের এ কি অত্যাচার! কিন্তু তবু বলিতে হইবে—বাংলার সমাজে এই রকম কয়েকটা যুগ গিয়াছে। আজিও কত কারণে, এই গৃহলক্ষ্মীদের আমরা কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হয়ত বৃহত্তর চিন্তার পাকে আমরা ভুলিয়া যাই। যাঁহারা ব্রতকথার ব্রাহ্মণটির মত স্থূল বর্ব্বরতা করেন না, তাঁহারা হয়ত বা ইবসেনের 'ডলস হাউসে'র অনুরূপ সূক্ষ্ম আর সভ্য অত্যাচার করিয়া থাকেন।

যে সব কাহিনী লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেই রকম একটি কাহিনীই এই অশোকষষ্ঠী, এই কাহিনীকে লইয়া হয়ত 'অশোকা মঙ্গল' লিখিয়া ফেলা যাইত।

পারণী সংক্রান্তির কথায় বধূটি ব্রতকথায় মর্য্যাদা বিশেষ। অলক্ষ্মী বা সতীনকে নানা ফন্দী আঁটিয়া তাড়াইল, সন্তানদের মঙ্গলসাধন করিল। ইহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অপূর্ব্ব। শূকরের ব্যবহার দেখিয়া পারণী ব্রতের মর্ম ধরিতে পারিয়াছিল।

—উনি গ-হাটে চাষ করতি গেছেন। যা'য়ে দেখেন যে, একটা শূয়ের বাচ্চা নিয়ে বেড়ায়ে বেড়াতেছে। বেড়াতি বেড়াতি দ-হানের ক্যাতে যা-য়ে দ-হান খা'লো। দ-হান খা'য়ে আ'সে বাচ্চায় দুধ দিল, আর বাচ্চাগুলে সব ম'রে গেল।

তার পর শুয়েরটা আবার কিছুক্ষণ পরে কচু খ্যাতে গেল। যায়ে কচু খায়ে আ'লো। কচু খাইয়ে আইসে বাচ্চাগুলো ভ'কল, আর বাচ্চাগুলো তাজা হ'য়ে উঠল।

বৌ দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঐ দেখল। মনে মনে ভাবল, 'তালি ত পারণীর দিন ভাত খালি সন্তান বাঁচে না; তা আরও আর দ-হাত খাব না।'— অদ্ভুত বুদ্ধির বধূটির বুদ্ধির তারিফ করিতেই হয়। দাসী হরিণের বদলে মানী মানুষের মাংস কাটিয়া রান্না করায়। তাহাই ব্রাহ্মণদের খাইতে দেওয়া হইবে। বধূটি টের পাইয়া এক ফন্দি আঁটিল—দাসীকে বলিল, —তুমি এক কাজ কর। পুঁই নিয়ে আস। পুঁই ছেঁচে গবোরের সাথে ঘর ভজভজে করে লেপে থোও।—দাসী তাই করল।

ব্রাহ্মণরা আস্তে খাতি বসল। পাতা করে করে বসে পড়িছে। বৌ মাথায় কাপড় জড়ায়ে দু-হাতের থালা হাতে করে যাচ্ছেন। খাতি খাতি পিছলেয়ে ঠাস হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যায়ে দাঁত লাগে বৌ অজ্ঞান হয়ে গেল। ভাত অপয়-জাতিতি গৃহয় ভরে গেল। ব্রহ্মভোজ্যি নষ্ট হয়ে গেল।—

ছোটখাটো বুদ্ধির এই পরিচয়, বধূদের এই কৃতিত্ব কথার মধ্য দিয়া ছড়াইয়া নিজেদের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনিত। আত্ম-সাম্মুখ্যের (self-assertion) ইহা এক বিচিত্র প্রকাশ। বাহির হইতে বাধা পাইয়া পাইয়া, কথার মধ্য দিয়া নিজেদের বিশেষ পরিচয় তাহারা রাখিতে চাহে।

এই সব বধূ কোন দিন সাহিত্য রচনা করিতে চাহে নাই। দুঃখের সময়টা তাহারা কি ভাবে, কার কাছে, কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে এ তাহারই ইতিহাস। তাহারা বিপ্লব করিতে পারে নাই।

সখীদের কাছে মনের কথা বলিবার জন্য তাহারা 'খাতর কর', 'পাচালী পচাল পাড়ে' আর 'গোবর-গোলা দিয়ে 'বড়ে বড়ে বেরত কথা' বলে। ব্রত অন্তে 'সধবা' হলে তেল সিন্দুর 'অব্‌ধবা' হলে 'ধান-দূর্ব্বো' দিয়ে ঘরের কাজে লাগিয়া যায়।

এমনি করিয়া ইহাদের জীবন কাটে। গাছে জল পড়িলেও ইহারা আশা পায় না, নদীতে 'চোত' আসিলেও ইহারা ভাবনা করে না। স্বামী প্রবাসে থাকিলে সোয়ামী, ঘরে ফিরিলে ঠাকুরুণের ছেলে। এই 'ব্রতেশ্বর'দের নিকট হইতে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই সান্ত্বনা পায় নাই, পাইয়াছে সতীন। শজারুর মত গায়ে কাঁটা থাকিলেও গলা নরম, অন্তরে অভিযোগ থাকিলেও শজারুর কাঁটার মতই সেইগুলিকে সুন্দর করিয়া বাজাইয়া চলিতে হয়। ব্রতকথাগুলি তাহাদের সেই শজারুর কাঁটা। ইহারই মধ্যে তাহারা সন্তানের জন্য ক্ষীর-ধারা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। 'চাপড়ষষ্ঠী'র বধূটির পুত্রের জন্য মমতা সত্যই অতি করুণ। 'চাপড় যায় ভাসে্য, খোকা আসে হাস্তে।' কথাটির মধ্য দিয়া এমন সকরুণ আহ্বান হারানো সন্তানটির প্রতি রহিয়াছে যে, শাশ্বত মাতৃমূর্ত্তিই ইহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

যত মঙ্গল, তাহা সব 'করে কম্মে' 'গেরস্তর' কল্যাণ বৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ বংশকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। 'অশোকষষ্ঠী' 'সম্পৎ-নারায়ণির' ব্রত, 'বাটষষ্ঠী' সবকিছুর মধ্যে মায়ের প্রাণ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী হয়ত বেহারাদের এক কাঁধের ব্যবধান। কিন্তু 'আবাগীর ঝিউ'রা সেই ডুলি বা সোয়ামীর সন্ধান জানে না; অথচ এক মিনিটের নোটিশে তাহাদের চিরকালের জন্য বাপের বাড়ীতে থাকিতে হইতে পারে। মাথার উপর এই খাঁড়া বহন করিয়া তাহারা সন্তান পালন করিবে, গৃহস্থের কল্যাণ চিন্তা করিবে, পাড়াপড়শীর 'আয়ে 'কাম' করিবে। 'বচরে'র সময় মুনিষজনের হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রাঁধিতে হেঁসেলে আগুন ঠেলিবে, খর্গাদারের মলন-মলার পর তাহারা কুলা লইয়া ধান উড়াইবে, ধান গোলায় তুলিবে, ধান সিদ্ধ করিবে, হড়ুম ভাজিবে, চিঁড়ে কুটিবে। ইহারই মধ্যে সময় করিয়া শীতের সকালে তেমাথায় বা মণ্ডপের আঙিনায় অথবা আগ-দুয়ারে "শীতি চির চির" করিতে করিতে ব্রতের সরঞ্জাম লইয়া বসে।

অথচ ইহাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী নয়, পরম সুখ বুঝিতে ইহারা বুঝিত মায়ের কোল। মনসাব্রতের নাগ পঞ্চমীর দিনে বধূদের ইচ্ছা হইতেই তাহাদের চরিত্র বোঝা যায়। সাতটি

বধূ নিজের নিজের লেরা ইচ্ছার কথা জানাইতেছে। তাহাদের সকলের কথাই প্রায় এক রকমের। নতুন বধূটির কথা—'আজকের মত দিন হয়, বাপ মায় বাড়ী হয়, উথেলে মাছ পুড়া দিয়ে পান্তা ভাত খাএ শুয়ে ঘুম যায়।'—একটু অলসভাবে শুইবার জন্ত ইহারা একান্ত মনে কামনা করিত।

ইতুপূজায় উমনী-ঝুমনী কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মাতৃহীনা ভগ্নী দুইটির অন্তর্দৃষ্টি। পিতার প্রতি তাদের স্নেহ অগাধ, বিবাহ না হইবার দুঃখ পিতাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়াইয়া মিটাইতেছে। উমনী-ঝুমনীর বাবা যদি মনোবিদ্ হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, ইহা তাহাদের সত্যকার কথা নহে ইহা তাহাদের মানসিক অভিক্ষেপ (projection)। এই কথার রাজামহাশয়ের অবিবাহিতা কন্তাকে লইয়াও এক সমস্তা। ইতুপূজাটি অবিবাহিতা কন্তাদের দুঃখকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। তবু ইহারা বাপমায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পোষণ করে না। বরং তাঁহাদের উপর ইহাদের গভীর ভক্তি। বাপমায়ের দুঃখ বুঝিবার মত বুদ্ধি ইহারা বিভিন্ন ছড়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। একটি ছড়ায়—

আম-কাঁঠালের পিঁড়ি খানি
ঘি ম' ম' করে
তাহির উপর বাপ খুড়ো
কন্তা দান করে।
বাপ যায় রে মায় নায়
খুড়ো যায় রে তরে (তীরে)।
শিশু কালে বিয়ে দিলি
সদায় আগুন জ্বলে।

অন্তত্রও দেখিতে পাই—

ঝুমঝুমাঝুম বাস্ত বাজে
সাজিয়ে ক'নে নতুন সাজে
মা বাপে দেন বরের করে
কতই মনের সাধে।
মা-বাপ কামনা করেন—
ভালো ঘরে ভালো বরে
দিবেন ব'লে কি—
কপাল যদি মন্দ হয়
মা বাপে তার করবেন কি ?

ইহাদের এই সব মনের কথা বাহির হইতে প্রকাশ পাইত না। সকল আবেগ রুদ্ধ করিয়া ইহারা পাষাণ-মূর্ত্তির মত হইয়া পড়িত। এইজন্তই বোধ হয় আগমনী গানে আছে, 'পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'ল।'

এই সব ব্রতকথার মধ্যে বাঙালীত্বও অতি পরিষ্কার। বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে মনীষীরা সাধারণতঃ যে কয়টি বিষয়ে একমত তাহা হইতে মনে হয়, বাঙালীর বনিয়াদ নিগ্রোবটু, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ভাষাভাষী, আল্পীয়, আদি নর্ডিকদের লইয়া। এই মিশ্রণ দ্বারাই বাংলার সুদূর অতীতে সমাজ-ভিত্তি গঠিত হয়। অতএব বর্ত্তমান কালের বাঙালীদের নির্জ্ঞান মনে সেই আদিম মনোবৃত্তি স্থান পাওয়া স্বাভাবিক। জাতির এই নির্জ্ঞান মন (unconscious mind) উপেক্ষণীয় নহে। জাতির রক্তধারায় প্রাচীন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে জলের প্রতি মোহ, বনানীর প্রতি আকর্ষণ বেশ পরিলক্ষিত হয়।

নিগ্রোবটু আর অষ্ট্রিকেরা সমুদ্রের ধারে বাস করিতে ভালবাসিত, প্রয়োজনও বোধ করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল শিকারের মাংস, বনের ফলমূল, মাছ ইত্যাদি। ব্রতকথার মধ্যে মাছের আর ফল মূলের উল্লেখ ভূরি ভূরি দেখা যায়। পারনী সংক্রান্তিতে ফলমূলের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। পূজার লাগে, আদা-কাঁচকলাই—তালের আঁটি—ডাবের জল আর ভাতের সঙ্গে চৌদ্দ শাক।

শ্রীপঞ্চমী আর বিজয়া-দশমীতে জোড়া-ইলিস মাছ কুটিয়া ঘরে লইতে হয়। সেই ইলিসের আঁইস নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি আবার ঘরের এক কোণে বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া পুঁতিয়া রাখিতে হয়।

আদি বাঙালী হরিণ শিকার করিতে ভালবাসিত। আঁকুড় ষষ্ঠীতে পুষ্করিণী উৎসর্গ উপলক্ষে হরিণ-মাংস খাওয়ানোর ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। এই আঁকুড় ষষ্ঠীতে দেখা যায়, সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করিত যাহারা গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণ বিশেষ গর্হিত মনে করিত না। অথচ ইহার মধ্যেই দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা শ্রেণীভেদ বিশেষ ভাবে মানিতেন। সমাজের ইহা এক মিশ্র-যুগের কথা।

সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণ মনসা ব্রতের মধ্যে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়।— আড়াইরাজ, মণি-রাজ মা-পদ্মার বাহন, ওঁরা এক ডুবি সাত সমুদ্দুর পার ক'রে মা-পদ্মার কোলে ব'সে দুধ খাবার লাগলেন—'

এই ব্রত কথার অতি সরল করিয়া মানুষ্যজাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ যে কোন্ যুক্তি হইতে জাত তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। মা-পদ্মা বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! ওরা হ'ল মানুষির বাচ্চা; ওরা পেট ভ'রে খায়, মন ভ'রে হাগে—ওরা মাছ খায়, মিছে কয়; উরা কি দেবপুরীর মর্ম্ম বোঝে ? উদের আনে' কাম নাই।' ইহা যেন মেয়েদের আলিম্পন অঙ্কন। হাতের এক একটি লীলায় টাকার থলি, সিন্দুক, দেবীর চরণ আর ফুটন্ত কমল আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের ব্যবহারের প্রতি বিরূপতা কত প্রচণ্ড ভাবে থাকিলে যে এত সংক্ষিপ্ত বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে পারা যায়, তাহার গভীরতা কে মাপিবে ? দেবপুরী কোন্টি জানি না। হয় ত বা নানা শাখাজাতি বা 'কওমে'র প্রাদুর্ভাব আর

উৎপাতে তাহারা ক্রমশঃ তাহাদের যে অতীতকে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে সেই অতীত লোক সম্বন্ধেই তাহাদের এত কল্পনা। অরণ্যকে তাহারা পবিত্র মনে করিত, শুধু আহারের জন্যই জীবন নহে, উদ্দাম আনন্দকে বাঁচাইয়া রাখাই তাহাদের কাম্য। জল, পাহাড়, অরণ্য তাই এত পবিত্র তাহাদের নিকট। মনের দুঃখ বেশী হইলে এই যুগের বাঙালী অরণ্যে গিয়া কাঁদিতে বসিত, পাথরে গিয়া মাথা খুঁড়িত। অরণ্যের প্রতি বৃক্ষপল্লব যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা। এইজন্য বিনা প্রয়োজনে ইহারা পল্লব ভাঙিত না, তাহারা দল পাকাইত না, সংহতিশক্তি তাহাদের ছিল না, আপনার বেদনা আপনি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিত বনদেবীর পায়ে। সেই চরিত্রই পরবর্ত্তীকালে বাংলার বালিকা বধূদের ব্রতপার্ব্বণের মধ্য দিয়া দেখা দিল। নিজের দুঃখ স্বামীকে বলে না, পড়শীকেও বলে না, সন্তানের নিকটও প্রকাশ করে না। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল, এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়াও মৃত হয় নাই।" ব্রতের মেয়েদের স্বভাবেও এই পরিচয় পাওয়া যায়। নাগপঞ্চমীর সপ্তমা বধূটির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে অবাক হইতে হয়। তাহার রূপ এবং আচরণের মধ্যে যেন একটি বৃহৎ মন জাগ্রত হইয়া আছে। ইতু-পূজার উমনী-ঝুমনীর চরিত্রের প্রথম অংশ আজিও বাংলার মেয়েদের মধ্যে অনবিচ্ছিন্ন দেখা যায়।

অষ্ট্রিকদের আর মেডিটেরেনিয়ানদের এই আরণ্য ভাবটি ভাঙিয়া দিল দ্রাবিড় গোষ্ঠী। দ্রাবিড়দের রহস্যবাদ, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, শিল্পবোধের আভাস ব্রতকথার মধ্যে কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। হঠাৎ কুঁড়েঘরের বদলে ইমারত নির্ম্মিত হওয়া, মৃত বস্তুতে প্রাণসঞ্চার সবই সেই রহস্যের মূলে।

একটি ব্রতকথায় আছে, "ঘুমোরা বনে আগুন দেছে। বিষ্টি হয়ে গেছে, চাকচিকেমি জল অইচে মাঠের নদি। তায় নদি আড়াইরাজ মনিরাজ ডুব পাড়তেছেন।' ইহাতে এমনি একটি প্রাকৃতিক চিত্রের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।

যে মেয়েটি ব্রতকথা বলিতেছে সে তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছে শাওনের বৃষ্টির দিনে পথের দিকে। এক নজরায় চারিদিক সে দেখিয়া লইল। মাঠের মধ্যেকার জল যে চিকচিক করিতেছে তাহাও তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

কিন্তু এমনি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া জাতির অতীত বৈশিষ্ট্য বাহির করা সহজসাধ্য নয়। পলিমাটির বালুকণা তুলিয়া কে প্রমাণ করিবে ইহা অমুক পাহাড়ের অমুক পাথরটার কণা? তবু আবহমান কাল ধরিয়া আমাদের মনের মধ্যে যে সংস্কার বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাকে যে আমরা অস্বীকার করিতে পারি নাই—তাহাই প্রমাণ করে এই ব্রতকথাগুলি। অতীত আমাদের মধ্যে এখনও ক্রিয়াশীল, সেই অতীতকে খুঁজিয়া পাইতে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্নর জাতি

শ্রীধর্ম্মদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

২

ক—অস্পৃশ্যতা : অস্পৃশ্যতা দানব

দেখিলাম কিন্নর দেশেও গান্ধীজীর নাম পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তাঁহার হরিজন-উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা পৌঁছায় নাই। মানুষ ঘৃণায় মানুষের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না একথা পড়িয়াই আসিয়াছি এত দিন, স্বচক্ষে দেখি নাই; এখানে তাহা দেখিলাম। কিন্নর দেশে আজও এই ব্যাপার চলিতেছে। সবর্ণ জাতির কোন লোক—স্ত্রী বা পুরুষ—জল ভরিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় তাহার উপর যদি হরিজনের ছায়া পড়ে ত জল অমনি অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাই সবর্ণদের বিশ্বাস। তাই কিন্নর দেশের হরিজনদের রাস্তায় সাবধানে চলিতে হয়। শ্রীপরীখ ও আমি চীনী যাইতেছিলাম। পথে কয়েক জন লোক বেশ খানিকটা ঝুঁকিয়া আমাদের নমস্কার করিল, আর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া নীচে গিয়া দাঁড়াইল। ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, "আমরা হরিজন, ভাই।" উচ্চবর্ণের ঘরে আমার জন্ম একথা মনে হওয়ার অন্তরাত্মা আমার ধিক্কারে ভরিয়া গেল। আমি যদি হরিজন হইতাম তাহা হইলে আমাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়ার গ্লানি ইহাদের ভুগিতে হইত না। যে হরিজন দিনরাত কায়িক শ্রমে পেটের অন্নসংস্থান করে, হিংস্র জন্তুকে যে ভয় করে না, স্বচ্ছন্দে বন-জঙ্গলে একাকী বিচরণ করে, সেই হরিজন যে, কোন আদনা সবর্ণকে দেখিয়া কাঁচুমাচু হইয়া যায়, ইহা সবর্ণদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। ইহা যে তাহাকে হিংস্র জন্তুর অধম করিয়া দেয়।

প্রস্তরস্বরূপ হরিজন

রাজপুত বা অন্য কোন সবর্ণ জল ভরিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। পথে পড়িল হরিজন। উপায়! হরিজনকে যে সোজা ডাকিয়া বলিবে—'সরে দাঁড়াও' সে জো-ও নাই।

তাতেও যে জল অপবিত্র হওয়ার ভয়। তাই রাস্তার পাথরকে লক্ষ্য করিয়া সবর্ণ বলিয়া থাকে, 'ডেরো.' শুনছিস; সরে যা, আমার জল নষ্ট হয়ে যাবে। ইহা হইতে হরিজন বুঝিয়া লয়, জল ভরিয়া কোন সবর্ণ আসিতেছে; তাকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে যে বাওড়ি হইতে সবর্ণ জল ভরে, হরিজনেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিতে পায় না। শুনিতে পাইলাম, রামপুরে কয়েকজন সাহসী দর্জ্জি সবর্ণদের বাওড়ি হইতে জল আনিয়াছিল। এই জন্য সবর্ণেরা মহারাজ পদমসিংহের কাছে নালিশ করে। দর্জ্জিদের বিরুদ্ধে মামলা চলে, আর তাদের প্রত্যেকের দশ টাকা জরিমানা হয়। রামপুরে এখন সেই বাধা নাই, কারণ রাজ্য বিলীন হওয়ার পরে রামপুরের হরিজনেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিয়া পুরাতন প্রথার অবসান ঘটাইয়াছে। রামপুর ত শহর। সেখানে সব ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু সুদূর গ্রামে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভাল কোন বাওড়ি হইতে জল আনিবে এমন হিম্মত কোন হরিজনের নাই। বাওড়ি যে কি তাহা এখানে বলা দরকার। পাহাড়ে যে সব স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ভূমি হইতে উৎসারিত হয়, জল আটকাই-বার জন্য সেই সব জায়গায় খানিকটা গর্ত্ত করিয়া চারিধার একটু উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গা সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান হয়। ইহাকে পাহাড়ের লোকেরা বাওড়ি বলে। কোন পাত্র ডুবাইয়া জল তুলিতে হয়। বাওড়িতে হরিজনদের ছায়াও পড়িতে নাই।

হরিজন ও মন্দির

কিন্নর দেশের প্রায় সব মন্দিরেরই নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি আছে। কমবেশী পঁচিশ হাজার টাকা উহারা মকুব পায়। তাই মন্দিরগুলিকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। রাজকোষ হইতেও উহাদের নির্ম্মাণকার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং ঐ সব মন্দিরে প্রবেশের দাবি হরিজন-দের ষোল আনা আছে। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ আইনতঃ স্বীকৃত হওয়া চাই এ কথা অনেক হরিজনকে জোর দিয়া বলিতে শুনিয়াছি। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এবম্বিধ ভেদাভেদ এখন আর থাকিতে পারে না।

রামায়ণ পাঠও অপরাধ

হিমাচল প্রদেশে রাজ্য বিলীন হওয়ার পূর্ব্বে মহারাজার রাজ্যে হরিজন বালকদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। গোরা হইতে রামপুরের পথে চৈন্তরাম নামে এক হরিজনের সঙ্গে দেখা। চৈন্তরাম বলিল, সে গোরায় এক ইংরেজের চাপরাশী ছিল। কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে সে সময়ে তাহাকে রামপুরের মহারাজের আদালতে হাজির হইতে হয়। প্রতি-পক্ষের লোকেরা মহারাজের কাছে নালিশ করিল, "হুজুর, এই চৈন্তু হুলী মাথায় চড়েছে। জাতে হুলী হইলেও এ পড়াশুনা করে। ইংরেজের নকরি করতে করতে তারও কাছে এ রামায়ণ পড়তে শিখেছে। এর রামায়ণ আছে, আর একে তা আমি পড়তেও দেখেছি।"

এই কথা শুনিতেই মহারাজার মন মোকদ্দমার মূল বিষয় হইতে সরিয়া গিয়া, কোলী হইয়াও চৈন্তু রামায়ণ পড়ে এই অবান্তর ঝ্যাকড়াতে নিবদ্ধ হইল। রক্তচক্ষে তিনি বলিলেন, "বদমাশি সুরু করেছ। রামায়ণ পড়বে ত জেলে পুরব। বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করো এ কথা আবার শুনতে পাই ত বাইরে আর যেতে দেব না—জেলে পাঠাব।"

মরার মাংস খাইতেই হইবে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কিন্নরদের দৃষ্টি নাই। এখানে রাজপুতদেরও মেয়ে পুরুষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই—মলত্যাগের পরে শৌচ করে না। জঙ্গলে দাঁতন মিলে, কিন্তু দাঁতন কেহ করে না। তথাচ এ কথা বলিতেই হইবে যে, হরিজনেরা আরও অধিক অপরিচ্ছন্ন। তাহাদের অপরিচ্ছন্ন-তার মূলে মুখ্যতঃ দারিদ্র্য। স্ত্রী বা পুরুষ কোন হরিজনের পরিধানেই নিখুঁত কাপড় দেখিতে পাইবেন না। তাহাদের চোলিতে পর্য্যন্ত তালি, শাড়ীর ত কথাই নাই। বিছানা ও গায়ে চাপা দেওয়ার কম্বল ছিন্ন চট হইতেও জীর্ণ এবং অধম। কাজের ফাঁকে যখনই ফুরসত পায় তখনই কাপড় হইতে উকুন মারিতে তাহারা বসিয়া যায়। এই উকুন মারার ব্যাপার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকে। হরিজনেরা মরা গরুর মাংস খায়, চামড়া ছাড়ায়, তাই ত তাহারা হরিজনদের ঘৃণা করে, ইহাই সবর্ণদের কথা। মৃত জন্তুর মাংসাহার ভয়াব-জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন হরিজন মরা মাংস খাইবে না ঠিক করিলে সবর্ণেরা তাহাকে তাহা খাইতে বাধ্য করে। পথে এক কোলী যুবকের সহিত আলাপ। কার্য্যব্যপদেশে সে রামপুর গিয়াছিল। কংগ্রেসের কোন বক্তার বক্তৃতায় সে শোনে যে মরা গরুর মাংস খাইতে নাই। কথাটা যুবকের মনে ধরিয়া যায়। বাড়ী ফিরিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে মরা গরুর মাংস আর সে খাইবে না। অমুকে মরা মাংস খাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এই কথাটা গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সবর্ণেরা প্রমাদ গণিল। মরা মাংস খাইবে না, তার মানে চামড়াও ছাড়াইবে না। মরা গরু বলদ তবে অপসারণ করিবে কে? তা বাদে সাফ-সুতরা থাকিতে আরম্ভ করিলে যে তারা স্বাধীন হইয়া যাইবে, নিজ পায়ে দাঁড়াইবে, আমাদের দাসত্ব অস্বীকার করিবে। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত ডাকিল। পঞ্চায়েতের সম্মুখে কোলী যুবকের তলব হইল। পঞ্চায়েত ও কোলী যুবকের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা এই:

'শুনতে পাচ্ছি মরা মাংস আর নাকি খাবি না?'

'হাঁ, ছেড়েছি, হিন্দুদের মরা মাংস খেতে নাই। গরু মায়ের তুল্য।'

'তবে কি তোর বাপ-ঠাকুরদা হিন্দু ছিল না ; তুই নতুন হিন্দু হতে যাচ্ছিস ?'

'বাপ-ঠাকুরদার কথা জানি না। এখন থেকে আর ও মাংস খাব না।'

'মরা মাংস তোকে খেতেই হবে, নয়ত গ্রাম ছাড়তে হবে।'

'মনিব ! গাঁ ছেড়ে যাওয়ার জায়গা আমার আছে কি ? আপনাদের কাছে মিনতি মরা মাংস খেতে আমায় জোর করবেন না।'

'তা হবে না ! কংগ্রেসওয়ালাদের কথায় তুই মাথায় চড়তে বসেছিস। তোর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তারাই করবে।'

যুবককে পরে একঘরে করা হয়। সেলাই কল আনিয়া সে দর্জির কাজ করিতেছে। এখানেও বাদ সাধার—কলটা তার হাতছাড়া করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। মাষ্টার অমূলালজী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় সবর্ণদের উৎসাহে ভাটা পড়িয়া যায়। মাষ্টার অমূলালজী মণ্ডু গ্রামের সম্মানিত সবর্ণ—হরিজন-হিতৈষী নিঠাবান কর্মী।

কোন হরিজন ভাল কাপড় পরিলে অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাকে গালমন্দ সহিতে, ধমক, এমন কি কখন কখনও মারও খাইতে হয়। এরূপ আচরণের কারণ সুস্পষ্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কথা তাহারা ভুলিয়া যাক, চিরদিনের মত নোংরা থাকুক, সবর্ণেরা ইহাই চাহে।

এক হরিজন বনবিভাগে কাজ করিত। তাহার কার্য্যকাল যখন শেষ হইল তখন বন-বিভাগ হইতে সে কতকগুলি দেবদারুর তক্তা পায়। তক্তাগুলি সে তার ঘরে লাগায়। তাহা গাঁয়ের লোকের অসহ্য হইল। বেচারাকে ডাকিয়া তাহারা বলিয়া দিল—'তক্তাগুলি খুলে ফেল।' 'খুলে ফেলতে হবে কেন ?' এই বেয়াদবির জন্য তার প্রহার মিলিল। সবর্ণেরা এ-কথাও বলিল—'তুই ত কোলী। তোর ঘর দেবদারুর তক্তায় তৈরি হয় ত তোর আর আমাদের মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায় ? বাপ-দাদা যেমন চলতো তেমন চলাতেই তোর কল্যাণ লাটসাহেব হতে গিয়েছ ত মরেছ।' আপন হাতে সে তক্তা খুলিল না, দেখিয়া গ্রামের যুবকেরা তার বাড়ীতে গিয়া ঘরের চাল কাটিয়া নীচে লাগান তক্তাগুলি খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

হরিজনেরা জনসভা করিতে পায় না। করিলে পুলিশ ও সবর্ণ-জনতার হাতে তাহাদের মারপিট খাইতে ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মনে হইল সবর্ণদের মধ্যে এখন অনেক এমন বিবেচক লোক আছেন যাহারা হরিজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে চাহেন। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব পুষ্ট হইতেছে।

রামপুরের জনসভায় হরিজনদের আমি বলি, "কোলী ইত্যাদি যাহাদের বৃত্তি চামড়া ছাড়ানো, তাহাদের আমি বলছি, চামড়া ছাড়াইতে আপত্তি করা তোমাদের উচিত নহে। চামড়া দেশের সম্পদ। চামড়ার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। অতএব মৃত পশুর চামড়া যদি নষ্ট হতে দিই ত চামড়ার জন্য লাখো গরুর প্রাণ যাবে। যে সব কোলী এখানে জুতা তৈরি করে তাদের জন্যও ত চামড়া চাই। মৃত গো-মহিষের চামড়া যদি তারা নিজেরা না ছাড়ায় তা হলে নিজেদের প্রয়োজনেই ত বাইরে থেকে তাদের চামড়া আনাতে হবে। তবেই দেখতে পাচ্ছ, দু'দিক দিয়েই ক্ষতি হবে।"

যেখানেই কোন কোলীর সহিত কথা হইয়াছে, বলিয়াছি—"চামড়ার কাজ হীন নহে। সবর্ণেরাও আজি 'শর্ম্মা বুট হাউস', 'অগ্রবাল বুট হাউস', নাম দিয়ে চামড়ার ব্যাপার করছে। তোমরা যারা চিরকাল চামড়ার কাজ করে এসেছ, চামড়া পাকা ও রং করতে শিখে কাঁচা চামড়াকে দামী চামড়ায় পরিণত করাতেই তোমাদের কল্যাণ। তাতে সমাজে তোমাদের স্থান উঁচু হবে।"

কোলীদিগকে চামড়া পাকান ও রং করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রামপুরে স্কুল খোলা দরকার। প্রসঙ্গতঃ বলিব যে সবর্ণদের আচরণ অদ্ভুত। গরু ও বলদের কল্যাণে আজীবন তাহারা লাভবান হইলেও মৃত গো-বলদকে তাহারা অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, ছোঁয়ও না। অথচ গরুকে তাহারা আবার মাতাও বলে। মৃত গোমাতার গতি যাহারা করে তাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখা এবং তাহাদের কাজকে হীন মনে করা তাহাদের শোভা পায় না।

এমন যে আবশ্যক কাজ তাকেও হেয় চক্ষে দেখার সংস্কার সবর্ণদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। অতএব যত দিন এই সংস্কার দূর না হইতেছে তত দিন শিক্ষিত হরিজনেরা তাহাদের এই পুরাতন বৃত্তিকে হীন মনে করিবেই। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মে এমনটি দেখা যায় না।

জনসভা করার অধিকার আইনতঃ সকলেরই আছে। আমরা চাই যে হিমাচল প্রদেশ-সরকার, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগ এই মৌলিক অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত না করে। তজ্জন্য সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

অস্পৃশ্যতার জন্য অস্পৃশ্যেরাও দায়ী

কোটগড়ের এক সভায় রেহ় (তাঁতী) জাতির একটি লোকের বিরুদ্ধে জনৈক কোলী অভিযোগ করে যে, সে তার হাতের জল খায় না। অভিযোগের উত্তরে রেহ় বলিল, 'কোলীরা আমার হাতে জল খায় কি যে আমি খাব ?'

কোলীদের মধ্যেই, যাহারা চামড়ার কাজ করে না তাহারা চামড়ার কাজ করে এরূপ কোলীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—হুকা, জল বন্ধ করিতেছে। বড় বলিয়া

গণ্য হইতে হইলে নিজেদের অপেক্ষা যাহারা ছোট তাহাদের ঘৃণা করিতে হয় এ শিক্ষা বস্তুতঃ অবর্ণেরা সবর্ণদের কাছ হইতেই পাইয়াছে। তাই পরস্পর সমান হইলেও বড় বলিয়া গণ্য হওয়ার তাগিদে ইহারা অপর কাহাকেও ছোট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যে হরিজন নিজে 'অস্পৃশ্য', যাহার ছায়ায় নাকি জল 'অপবিত্র' হয়, সেও পর্য্যন্ত সমপর্য্যায়ের ভাইদের ঘৃণা করিয়া নিজকে বড় দেখানোর স্বপ্ন দেখিতেছে।

হরিজনদের চারি বিভাগ

হরিজন বলিতে সাধারণভাবে কোলীদেরই বুঝায়। আর্থিক অবস্থার দিক হইতে হরিজনদের চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। হালী—জোতদার কোন কোলীকে স্রেফ্ পাঁচ টাকা দিয়া হালী করিয়া লয়। জোতদারের জমিতে সে লাঙল দেয়; অন্ত কয়মাসও তাকে খাটিতে হয়। হালীকে যেদিন জোতদার কাজে লাগায় সেদিন তাহাকে সে প্রতি বেলা দুই-খানা করিয়া তিন সন্ধ্যায় ছয়খানা রুটি দেয়। একখানি রুটি ওজনে প্রায় তিন ছটাক। তা ছাড়া জোতদার শীতের ফসল হইতে বিশ সের ও গ্রীষ্মের ফসল হইতে বাইশ সের গম দিয়া থাকে।

২। রেগড়ু—কোন কোলী বিশ-চল্লিশ টাকার ঋণের দায়ে সুদ-বাবদ যখন জোতদারের কাজ করে তখন তাহাকে 'রেগড়ু' বলে। রেগড়ু এক প্রকারের ক্রীতদাস। রেগড়ুকে জোতদার, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় দুইখানা করিয়া রুটি খাইতে দেয়। পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ও সে পায়। ভোর পাঁচটায় তার কাজ আরম্ভ হয়, আর শেষ হয় রাত্রি দশটায়। সাড়ে সতর ঘণ্টা কাজ করিয়া জোতদারের কাছে সে ছুটি পায়। বাড়ী সে ফিরে খালি হাতে, মলিন মুখে। ললাটের লিখনের দোষ দিতে দিতে সে পথ চলে। নিজ সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তার অন্তরে চাপা ক্রন্দনের রোল উঠে।

রেগড়ু কোলীর অবস্থা বস্তুতঃ পশুরও অধম। অসুখ হইলে বা কাজে না আসিলে জোতদার তাহাকে খাইতে দেয় না। টাকা দিয়া জোতদার তাহাকে খরিদ করিয়াছে. ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেই তবে গোলামি হইতে তার অব্যাহতি। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে অসাধ্য। অন্য কোথাও ত সে কাজ করিতে পায় না। সে উপায়ও নাই। অপর কোন জোতদারের রেগড়ু হইলে তবে ত সে তাহাকে টাকা দিবে।

৩। বৈটু—জোতদার যাহাকে সামান্য কিছু অনুর্ব্বর জমি দেয়—অর্থাৎ নিজ খেতিতে বসায়, আশ্রয় দেয় ও কাজ চলার মত কিছু ঋণও দেয়, তাহাকে জোতদারের বৈটু বলে। হাল দিতে বা অন্য কাজ করিতে জোতদার যখনই ডাকিবে তখনই বৈটু আসিতে বাধ্য—নিজ কাজ ফেলিয়া যদি আসিতে হয় তবুও। অন্যথায় জমির পাকা ফসল কাড়িয়া লইয়া জোতদার তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। কাজের জন্য জোতদার যে দিন বৈটুকে ডাকে সেদিন সারাদিনের আহার বাবদ সে চার ছটাক আটা বা চাল পায়।

৪। ক্বার—জোতদারের বাড়ীতে যে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে তাকে ক্বার বলে। মজুরী বাবদ নগদ কিছু সে পায় না। তিন বেলায় দুইখানা করিয়া ছয়খানা রুটি সে খাইতে পায়। তদতিরিক্ত ছুটির সময়ে আরও দুইখানি রুটি দেওয়া হয়। তাহা সে বাড়ী লইয়া যায়।

একটি গ্রামের সকল লোকের বৃত্তির অনুসন্ধান আমরা করি। গ্রামে চৌদ্দ ঘর কোলীর বাস। তার মধ্যে একটি পরিবারের কেবল নিজ জমি আছে। অবশিষ্ট সকলে হালী বা রেগড়ু। একটি পরিবার পাইলাম—তার চারজন লোকের একজন হালী, একজন রেগড়ু, একজন বৈটু আর চতুর্থ জন ক্বার।

কোন কোন কোলী সম্প্রতি দর্জ্জির কাজও ধরিয়াছে। তাঁতি ও কামারের কাজও হরিজনেরা করে। কিন্তু অবস্থা তাহাদের সকলেরই সমান শোচনীয়। কারিগর হইলেও জমিদারের কবলমুক্ত তাহারা নহে। পরিশ্রমিক বাবদ যে ধান গম তাহারা পায় তাহাতে তাহাদের সংসার চলে না। ঋণগ্রস্ত হরিজনদের কাছে স্বাধীনতার কথা, সমান সুযোগের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন।

বৈষম্য

পাহাড়ে দেশে সবর্ণদের জন্ম-মৃত্যুতে ও তেহার পর্ব্বে বাজনা বাজান হয়। হিমালয়ের দুর্গম স্থানেও বর-যাত্রায় ও শবযাত্রায় বাদ্য বাজিয়া থাকে। কিন্নর দেশে হরিজনেরা বাজনা বাজায়। কিন্তু নিজেদের সমাজে জন্ম-মৃত্যুতে বাজনা বাজাইবার অধিকার তাহাদের নাই। বাদ্যে কেবল সবর্ণদেরই অধিকার। অথচ বাদ্যযন্ত্র পঞ্চায়েতের সম্পত্তি, কারণ সবর্ণ অবর্ণ সকলেরই একত্র চাঁদা দিতে হয়।

কিছু দিন আগের কথা। হরিজনদের একটি বরযাত্রা রাতী হইতে লাড়সা যাইতেছিল। বরযাত্রায় লাঠী ও লাড়া (বর কনে) দুই-ই ছিল। লাড়সা পৌছিতে, জমিদার শোভা-যাত্রা রুখিল—অপরাধ, বাদ্য বাজিতেছিল। বরযাত্রীদের উপর লাঠি চলিল—বরও বাদ গেল না। ধর্ম্মধ্বজীরা তাহার মাথা কাটাইতে বাকী রাখে নাই। রামপুর আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিতেছে।

দত্তনগরে শ্রীস্বামী দত্তাত্রয় মহারাজের মন্দির। মন্দিরের আঙিনায় স্কুল বসে। পাঠশালার শিক্ষক সজ্জন লোক, হরিজন-হিতৈষী। তাঁহার চেষ্টায় এগার জন হরিজন বালক পড়িতে পাইতেছে। পাঠশালায় ঢুকিতে যাইতেছি, দেখি দরজার বাহিরে তিন চারিটি পায়জামা ঝুলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পায়জামাগুলি এখানে কেন?' উত্তর পাইলাম

পায়জামাগুলি হরিজন ছাত্রদের। হরিজন বালকদের পায়জামা পরিয়া মন্দিরের চতুঃসীমানায় প্রবেশ করার অধিকার নাই। নেংটি পরিয়া যাইতে হয়।

মন্দিরের কর্ম্মকর্ত্তাদের অনুরোধ করিলাম, 'বালকদের পায়জামা পরিয়া পাঠশালায় আসিতে দিন।' সানন্দে বলিতেছি তাঁহারা আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

হরিজনদের দাবি

তাহারা চাহে :—

১। জমি তাহাদের হউক। যে জমি তাহারা ভোগ করিতেছে তাতে তাহাদের মালিকানা কাগজপত্রে স্বীকৃত হউক। হস্তচ্যুত জমি তাহাদের ফেরত দেওয়া হউক। আর যেহেতু তাহারা ভূমিহীন সেইহেতু জমির নূতন বিলি-বন্দোবস্তের সময়ে হরিজনদের দাবি সর্ব্বাগ্রে যেন বিবেচনা করা হয়।

২। সর্ব্বসাধারণের কুয়া বা বাওড়ি হইতে জল ভরার সমান অধিকার এবং অপর শ্রেণীর লোকের ন্যায় মন্দির-প্রবেশের ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে বরযাত্রা ও শবযাত্রার সমান অধিকার।

৩। জনসভায় অবাধ অধিকার তাহাদের যেন মিলে।

৪। মরা মাংস খাইতে তাহাদের জোরজবরদস্তি না করা হয়।

৫। এ পর্য্যন্ত হরিজনদের লেখাপড়ায় বাধা ছিল। তাই অধিকসংখ্যক হরিজন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দিয়া সরকার এই দিকে উৎসাহ দান করুন।

৬। সংখ্যানুপাতে পঞ্চায়েতে হরিজনদের জন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৭। হরিজনদের ঘরদুয়ার নিরতিশয় জীর্ণ। ঘর মেরামতের জন্ত বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা।

খ—চাষবাস ও জীবিকা : জমি জঙ্গল

যে মাসে আমি কিন্নর দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়টায় জলের অভাব থাকে না। সারা বছর তথায় পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায় এ কথা যেন পাঠক মনে না করেন। বস্তুতঃপক্ষে কিন্নরদেশে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া জলস্রোত বহিতে থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক ঐ জল ক্ষেতে ধরিয়া রাখে। প্রায় সর্ব্বত্র জুন মাসের মাঝামাঝি বরফ গলিয়া শেষ হইয়া যায়। তখন পানীয় জলের পর্য্যন্ত অভাব ঘটে।

এক বৃদ্ধ চাষীর সঙ্গে দেখা। সে বলিল, 'ভগবান ত সব জায়গায় আছেন। ভগবান অন্ত সব জায়গায় বৃষ্টি দেন। আমাদের এখানে বর্ষা-ঋতুই নাই। বাংলায় তক বৃষ্টি হয়। তার পরে এদিকে কেন যে ভগবান বৃষ্টি দেন না!' বস্তুতঃ উত্তর-পূর্ব্ব সমুদ্রের দিক হইতে দেখিলে এই প্রদেশ কোয়েটা-বেলুচিস্তানের মত শুষ্ক দেশ। সংলগ্ন তিব্বত দেশও অনুরূপ শুষ্ক অঞ্চল। তাই তিব্বতের কৃষির অবস্থা কিন্নর দেশেরই মত। ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া জঙ্গল ও অনুর্ব্বর ভূমি। আবাদী জমি কম। খাড়া উঁচু পাহাড় বেশী। আবার তুষার-পাতও হয় অধিক। সুতরাং খেতির পক্ষে অসুবিধা।

ফলের চাষ

ভগবান এ দেশটাকে যেন ফলের জন্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার এক্তিয়ার থাকিত ত কিন্নর দেশে আমি স্রেফ ফলের চাষই করাইতাম, আর ফলের বিনিময়ে সরকারকে এখানকার অন্নের ব্যবস্থা করিতে বলিতাম। তাহা হইলে শুষ্ক আব-হাওয়ার যে সব ফল জন্মে সে সব ফল কোয়েটা-বেলুচিস্তান হইতে আমদানি করার আর প্রয়োজন থাকিবে না। তার অর্থ রাষ্ট্রগঠনে কিন্নর দেশের যাহা দেওয়ার আছে তাহা দেওয়ার সুযোগ সে পাইবে, আর তার ভিতর দিয়া সে নিজে উন্নত হইবে। চমন (বেলুচিস্তান) অপেক্ষা পাধা-বাঁটিতে অনেক বেশী ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

কিন্নর দেশে বৃষ্টিপাত কম। অতএব কিন্নর দেশ প্রকৃত পক্ষে চাষ-আবাদের বা বন-সৃষ্টির অনুকূল নহে। শুষ্ক আব-হাওয়ার ফল—আঙুর, আপেল, খুরবানী, বাদাম, আখরোট ইত্যাদির চাষের উৎসাহ এখানে দেওয়া উচিত।

কিন্নর সীমান্ত প্রদেশ

সুতরাং চীনী পর্য্যন্ত ত মোটরের রাস্তা হওয়া চাই-ই, আর নচার পর্য্যন্তও তাহা প্রসারিত করা একান্ত দরকার। ফল রপ্তানির সুবিধা তাহাতে ত হইবেই; অন্ত কারণেও তাহা আবশুক। কিন্নর দেশ তিব্বত সীমায় অবস্থিত। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলার সহিত মোটর ও টেলিফোন দ্বারা এই সীমান্ত প্রদেশের সংযোগবিধান রাষ্ট্ররক্ষার দিক হইতেও প্রয়োজন।

কিন্নর দেশ পরিভ্রমণ কালে এ সম্বন্ধে বহু কিন্নরের সহিত কথা হইয়াছে। কিন্নর দেশের ব্যবসায় তিব্বতের সঙ্গে। তিব্বত হইতে রামপুরে সোহাগা, পশম, লবণ ও কিছু ঔষধ আমদানি হয়। আর ভারত হইতে রপ্তানি হয় চাউল, কাপড় ও গুড়। ভেড়া ও ছাগলের পিঠে এই সব পণ্যের আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্নর-ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার টাকা তিব্বতে খাটিতেছে। তিব্বতী ডাকাতেরা সময় সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপরে হামলা করিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় চীনীর আরও ওদিকে ভারত-তিব্বত সড়কের পর অবস্থিত ভারতের শেষ সীমান্ত গ্রাম নগধ্যায় পুলিস-চৌকি সংস্থাপন করা আবশুক। উহার সহিত টেলিফোনের যোগা-যোগ ব্যবস্থা করাও দরকার।

পশম উৎপাদনের পক্ষে অন্তরায়

কিন্নর দেশে দেবদার ও চীড় গাছের বন সৃষ্টি করা হয়।

আমার বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। যে সব গাছের পাতা ভেড়া-ছাগলের খাদ্য এরূপ বৃক্ষের বন সৃষ্টি করাই এখানে সঙ্গত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভেড়া-ছাগল এ দেশের প্রধান সম্পদ। দেশের লোকের শীত নিবারণের নিমিত্ত কিন্নরেরা শত শত মণ পশম উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইহা লাভজনক প্রাচীন শিল্প। দুঃখের বিষয়, কিন্নরদের উন্নতির পথে আজ নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। বন-বিভাগ হইতেছে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ভেড়া-ছাগলকে বনের শত্রু মনে করা হয়। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হওয়া চাই। মেষ ও ছাগ-পালন ব্যবসায় যাহাতে সুরক্ষিত হয় এবং উত্তরোত্তর উহার উন্নতি হয় সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। এই ব্যবসায়ের উন্নতি-কল্পে হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব যাহাতে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে একযোগে কাজ করে, ইহাদের মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্নর দেশ আজও এই ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা রক্ষার জন্য সরকার সচেষ্ট না হইলে, এই ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। নষ্ট হইলে আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করা কঠিন হইবে। তাই এই দিকে সত্বর সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে মেষপাল লইয়া কিন্নরেরা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন মেষের পালে সংক্রামক খুরে-ঘা রোগ দেখা দেয় আর তার ফলে বহু ভেড়া মরিতেছিল, নিজ চক্ষেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। এইরূপ সময়ে একটু ফিনাইল পাইতে পারে রাস্তায় কোথাও রাষ্ট্রের তরফ হইতে সেই ব্যবস্থা নাই। শীতকালে কিন্নরেরা ভেড়া লইয়া নীচে নামে, আর গ্রীষ্মারম্ভে ভেড়া লইয়া তাহারা স্বগৃহে ফিরে। এই দুই সময়ে কিছু দিনের জন্য রাস্তায় চিকিৎসার সাধারণ ব্যবস্থা করিলে শত শত ভেড়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কিন্নরদের সম্পদ পশু

কিন্নরেরা পশু ভালবাসে। পশু তাহাদের সম্পদ। নিজেরা বরং অনাহারে থাকিবে, কিন্তু ওদের তাহারা কখনই অনাহারে রাখে না। নিজেদের শিশুসন্তান পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিয়াছে, আর কিন্নরী ভেড়ার বাচ্চা পিঠে বহিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য চক্ষে পড়িয়াছে। গরু-বলদ দেখিয়া মনে হইয়াছে, ওগুলি সযত্নে পালিত। কিন্নরেরা এক নূতন জাতের বলদ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা হইতেছে তিব্বতী ইয়াক ও ভারতীয় গরুর সহযোগ-জাত সঙ্কর। নাম তার 'জো'। 'জো'-এর পিঠের লোম লম্বা, আর গোটা লেজটা লম্বা লোমে ঢাকা। সাধারণ বলদ অপেক্ষা জো চারগুণ বেশী কাজ করে। কিন্তু মে মাসের পরে জো রামপুরে যাইতে পারে না—রামপুর গরম জায়গা। কিন্নরেরা ঘোড়া এবং গাধাও পোষে। কিন্নর দেশের ঘোড়ার প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়াকে দানা দেওয়া হয় না। জঙ্গলের ঘাস-পাতা খাইয়া তার পেট ভরে। কার্তিক মাসে রামপুরে একটি মেলা বসে। ঐ মেলায় কিন্নর, তিব্বত ও স্পীতির লোকেরা ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসে।

কিন্নর দেশের অন্ন-সংস্থান

বথুওয়া কিন্নরদেশের প্রধান অন্ন। বথুওয়ার রং কাল—রাইয়ের মত ক্ষুদ্র একরূপ শস্যের দানা। যব, গম আর কোথাও কোথাও ধানেরও চাষ হয়। নিজেদের ব্যবহারের জন্য কিন্নরেরা আলুও জন্মায়। কিন্তু এখানে সর্ব্বসাকুল্যে ছয় মাসের খোরাক মাত্র জন্মে। বাকী ছয় মাসের তিন মাস তাহাদের চলে ফলের উপরে, আর তিন মাস তাহারা কাটায় বন্য কন্দমূল-ফল খাইয়া। এরূপ দারিদ্র্য অন্য কোথাও আমি দেখি নাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

সব ভুলে ভুল, গোলমাল করে বসেছি,
মিনার গড়িতে সমাধি নিজে'র রচেছি,
দূর বালুচরে চকচকে রোদ পড়েছিল তাই দেখেছি :
মরীচিকা তাকে নদী বলে ভালবেসেছি,
সব গোলমাল হিজিবিজি করে
অকূল সাগরে ভেসেছি।

রামায়ণে এক পড়েছিনু কবে মায়া হরিণের গল্প,
যে হরিণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যে হরিণ দূর কল্প,
সে সোনা-হরিণে লোভ করে আমি মনে মনে শুধু খুঁজেছি,
মৃগয়া-নেশায় বহুর ছিলের অসংখ্য বাণ ছুঁড়েছি,

তীরগুলি গেছে এদিকে ওদিকে লক্ষ্য হয়নি স্পৃষ্ট,
পিছনের দিকে ফিরে দেখি হায় তূণীর হয়েছে নিঃস্ব।
একদা বিজয় স্বপ্নে স্বপ্নে দিন-রাত ছিনু মগ্ন,
অভিযান শেষে সম্মুখে দেখি বিজয়-তোরণ ভগ্ন,
কোথায় অরাতি ? সন্ধান নেই। এ কি ভুল পথে ছুটেছি,
শুধু আগুনের ফুল্কি হয়েই ফুটেছি।

একটি জীবন পেয়েছিনু তাকে বাজী করে জুয়া খেলেছি,
হেরে গেছি আমি যত বার দান ফেলেছি।

কোনারক

শ্রীগোপী রায়

পুরী থেকে কোনারকে যাবার দুটি পথ আছে। একটি গো-যানে—বিশ-বাইশ মাইল, অপরটি যন্ত্র-যানে—ছাপ্পান্ন মাইল। কোনারকের যাত্রী আমরা মাত্র তিন জন। এতটা পথ নির্জন রাত্রে গরুর গাড়ীতে পাড়ি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল না, বাসে যাওয়াই স্থির হ'ল।

বিকেলে বাস ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে জেনে এলাম বাস ছাড়বে সকাল ছটায়। এখনও হাতে প্রচুর সময়—এই অবসরে জগন্নাথদেবের মন্দির আর একবার দেখলে মন্দ হ'ত না। সঙ্গীরাও আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। মন্দিরে ঢুকে মনে হ'ল এই সময়ে মন্দিরে আসাই সব দিক দিয়ে প্রশস্ত। যাত্রীর ভিড় তত বেশী নেই, পাণ্ডার অত্যাচার নেই, গোল-মালও গা-সহা গোছের, শান্তিতে সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখা যায়। অথচ গত কার্ত্তিক মাসে সকালের দিকে মন্দিরে এসে পাণ্ডাদের অর্থগৃধ্নুতার দরুন বারবার আমাদের কি নাজেহালই না হতে হয়েছিল।
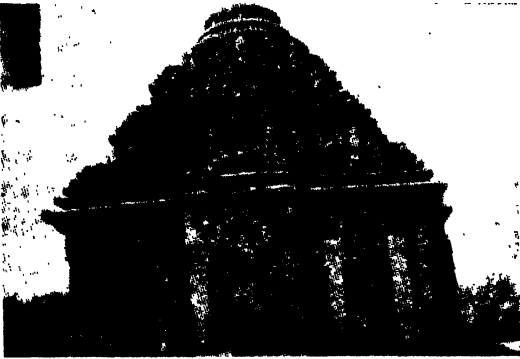
পাথরের গাঁথুনি যারা বহু জগমনের প্রধান কটক

সন্ধ্যার সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে দু'চারটে জিনিস কিনে নিয়ে ন'টা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রিটা এক ঘুমেই পার করে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন হোটেল ত্যাগ করলাম, তখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। সামনে অনন্তপ্রসারিত সমুদ্র চাঁদের আলোয় উচ্ছ্বসিত হয়ে শতসহস্র ঢেউয়ে কূলে আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের অভ্যর্থনা ভারি চমৎকার লাগছে। রোমাঞ্চ লাগছে ভোরের হাওয়ায় পথ হাঁটতে। জ্যোৎস্নাস্নাত জন-বিরল উঁচুনীচু পথ দিয়ে আমরা চলেছি তিন জন—কবিরবাবু, আমি আর শৈলেন্দ্র ভায়া।

বাসে যখন আসন গ্রহণ করলাম, তখন ছ'টা বাজে। শহরে ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। বিরাট থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ চলেছে অস্তাচলের দিকে। বাতাসে এখনও শীতের আমেজ রয়েছে। বাসের হর্ণ বেজে চলেছে। এবার যাত্রা সুরু। আমরা তিন জন ছাড়া ভাটপাড়ার এক ভদ্রলোক এবং একটি তরুণী শেষ মুহূর্ত্তে বাসে এসে উঠলেন। এঁরাও যাচ্ছেন কোনারক।

ঠিক সাতটার সময় বাস ছুটে চলল পিচঢালা রাস্তা দিয়ে। প্রভাতের আবছায়া অন্ধকার আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। গাছপালা সবকিছু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লোকচলাচল সুরু হয়েছে পথে। দোকানপাট খুলছে একটির পর একটি। পথে যাত্রী ওঠে, থামায় থামায় বাস থামে এবং আমরাও এই অবসরে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, টুকরো টুকরো আলাপ চালাই। পথের দু'ধারে ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের শ্রেণী, মাঝে মাঝে দেখা যায় বোরো ধানের ক্ষেত। গত কার্ত্তিক মাসে এই ক্ষেতগুলি জলময় দেখেছিলাম। এখন কি চমৎকার সতেজ সবুজে গাছগুলি প্রাণবান হয়ে উঠেছে। পথে আর কোন বৈচিত্র্য নেই—শুধু মাঝে মাঝে দু-চারখানা চালাঘর দেখা যায়, কোথাও চোখে পড়ে ছোটখাট মন্দির—পথচারী দু'তিন জন পথিক।

পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা পিপলিতে এসে পৌঁছলাম। এইখান থেকেই পথ ডান দিকে বেঁকে গেছে নিমাপাড়া হয়ে কোনারকের দিকে আর সোজা পথ চলে গেছে ভুবনেশ্বরে। কোনারকের যাত্রী এক উড়িয়া ভদ্রলোক পিপলিতে আমাদের সঙ্গী হলেন। ভদ্রলোক খদ্দরধারী এবং অমায়িক প্রকৃতির—বাংলাও মন্দ বলেন না; থাকেন গঞ্জামে।

পিপলিতে গাড়ি দাঁড়াল আধঘণ্টা। আমরা এই অবসরে এক এক গেলাস জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলাম। ভুবনেশ্বর থেকে যে বাস কোনারক যায়, অদূরে তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তখন আমাদের যন্ত্ররথ দ্বার সামনে এগিয়ে চলল। এইবার সুরু হ'ল ধূলিধূসর কাঁচা রাস্তা। কিছুক্ষণ উঁচুনীচু পথ পার হয়ে বাস হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে জানিয়ে দিলে যে, এইবার সাবধান হওয়া উচিত—এই ভাবে যেতে হবে ত্রিশ মাইল। সকালের আলোয় এই যে দীর্ঘ যাত্রা এর কোথায় যেন একঘেয়েমির নেশা লুকিয়ে আছে।

সড়কের দু'ধারে রিক্ত ধানক্ষেত। নীল আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাদাসাদা টুকরো মেঘ। দু'পাশে দেখা যায় ছোট ছোট নারিকেলশ্রেণী—কোথাও কলোনির

হয়েছে, কোনটিতে হয় নি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দেহাতি দু'চার জন লোক, দু'একটা চালা। এর মধ্যে হঠাৎ গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। নীচে দেখা গেল শীর্ণ একটি নদী, নাম ভার্গবী। উঁচু থেকে রাস্তা ক্রমশঃ নীচু হয়ে সাঁকোয় গিয়ে মিশেছে। নদী থেকে এক ফুট উঁচু সেই সাঁকো এবং তা পার হতে হবে যাত্রীপূর্ণ বাসে করে। যাই হোক, ধীরে ধীরে বাস নদী পার হয়ে আরও উঁচুতে উঠল।

সঙ্গীগণসহ লেখক (বাম দিকে)

বাস চলেছে এঁকেবেঁকে। একটা দোলমণ্ডও পার হয়ে গেল। কিছু পরে নিমাপাড়ায় এসে বাস থামল। নিমাপাড়া একটি বড় গ্রাম। থানা আছে, স্কুল আছে, খাবার দোকান আছে আর আছে হোটেল। শুনেছিলাম, এখানে খুব ভাল ক্ষীরকদম পাওয়া যায়। আমাদের চোখে কিন্তু কিছুই পড়ল না।

শরীর ধূলিধূসরিত, মন শ্রান্ত বিপর্য্যস্ত। একঘেয়ে যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে পুনরায় বাস সামনের দিকে ছুটে চলল। এতক্ষণ পর ফকিরবাবুর অধীর প্রশ্ন শোনা গেল— 'আর কত দূর ?'

গোপে এসে পৌঁছান গেল। এটিও একটি বড় গ্রাম। তবে নিমাপাড়ার মত নয়—তার সঙ্গে আকারে না হোক, প্রকারে অনেক প্রভেদ। এখানেও থানা আছে, কোর্টমত

মন্দিরের নকসা এবং চক্র

জাগায় আছে, একটি খাবারের দোকানও আছে। এখান থেকে কোনারক তের মাইল। তালগাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোনারকের মন্দিরের আভাস—অনেকটা শ্যাংগোকার মত। অনেক দিনের সযত্নপোষিত বাসনা তা হলে পূর্ণ হবার পথে!

তার পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে। তার প্রায় সবটুকুই বালি, একটু জল। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে চকিতে দেখা হয়, আবার কোথায় লুকিয়ে যায়। নদীটির নাম কুশভদ্রা। খানিক পরে আবার একটি পুলের উপর এসে পৌঁছলাম—ভার্গবীর পুলের মত। পুল পার হবার পরেই দেখা গেল পথের দু'পাশে চলেছে ঘন ঝাউয়ের সারি। এবার পথে আর ধুলো নেই। যে দিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। আগে সমুদ্র যে কোনারকের মন্দিরের কাছেই ছিল, এই সুদূরপ্রসারিত বালুকারাশি দেখেই তা আন্দাজ করা যায়।

রোদ চড়ছে। প্রভাতের সোনালী আমেজ কেটে গিয়েছে। বাটির মত উপুড় করা আকাশ থেকে সুরু হয়েছে রৌদ্রালোকের অজস্র প্লাবন। বেলা এগারোটায় আমরা পৌঁছলাম মন্দিরের পাদদেশে। খাবারের ঝোলা, 'ওয়াটার বটল' নিয়ে বালি ভেঙে ভেঙে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের চতুঃসীমার ভিতরে। চারদিকে শুধু নিকষকালো পাথর আর পাথর—ভেঙে-পড়া মন্দিরের এককালের সমৃদ্ধির নিদর্শন। কালের সাক্ষী হিসাবে আজও কোন রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগমন মন্দির। জগমন দিয়েই সূর্য্যমন্দিরে ঢুকতে হ'ত।

দূর থেকে জগমনকে একটি অতিকায় রথের মত দেখায়। চব্বিশটি চক্র এবং সাতটি অশ্ব সমন্বিত যে মন্দির ছিল বিরাট আকারের আজ তার সামান্যমাত্র নিদর্শনই অবশিষ্ট আছে। জগমনে বোধ হয় বারোটি চক্র—দু'একটি অবিকৃত, বাকিগুলি ভগ্ন। মন্দিরের এক দিকে দুটি অশ্ব যেন গতির প্রতীক, এক দিকে দুটি হস্তী, অন্য দিকে দুটি ব্যাঘ্র।

এবার আমরা শুন্দর পাথরের সিঁড়ি ভেঙে জগমন মন্দিরের উপরে উঠতে লাগলাম। খানিকদূর গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

নামতে লাগলাম, সূর্য্যদেবতার বেদীর উদ্দেশে একেবারে পাতালপুরীতে। ফুললতাপাতা-শোভিত হস্তীমুখ খোদাই-করা চমৎকার একটি পাথরের বেদী দেখা গেল। গাইড বললে যে, প্রধান মন্দিরের নিদর্শনস্বরূপ এই বেদীটাই বর্ত্তমান আছে। এর উপরেই অধিষ্ঠিত ছিল সূর্য্যদেবতার মনমাতিরাম মূর্ত্তি। অন্যান্য অনেক সুন্দর জিনিসের সঙ্গে সে মূর্ত্তিও আজ অপহৃত। কেউ বলেন—পুরীর জগন্নাথ

সূর্য্যমূর্ত্তি ও তাঁর পাশের মূর্ত্তিগুলি

মন্দিরের একটি কক্ষের অভ্যন্তরে অন্ধকার কোণে যে মূর্ত্তিটি দেখা যায়, সেইটিই আসল সূর্য্যমূর্ত্তি। পুরীর মন্দিরে ঐ মূর্ত্তিটি আমরা দেখেছি। আসল মূর্ত্তি না হলেও ওটি যে কোণারকের মন্দিরের কোন মূর্ত্তি তাতে সন্দেহ নেই। কেননা পাথরের রঙ, মূর্ত্তির গঠননৈপুণ্য কোণারকের মূর্ত্তিগুলিরই অনুরূপ। কোণারকের অরুণ স্তম্ভটিও তার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ-পথের সামনের রাস্তায় এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অন্ধকার কক্ষ থেকে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় উপরে উঠতে লাগলাম। অনেক উঁচুতে উঠেছি, সামনের দিকে অবারিত শূন্যতা, নিচে গাছপালাগুলো ছোট দেখাচ্ছে, মন্দিরগাত্রে অসংখ্য মূর্ত্তি। কোনটি বাসুকীর মত, কোনটি মোহিনীমূর্ত্তি, কোনটি বা স্ত্রী-পুরুষের মিথুনমূর্ত্তি, মূর্ত্তিগুলি গ্র্যানাইট পাথরে খোদাই করা। অধিকাংশই ভগ্ন বা বিগতশ্রী—কতকগুলি মূর্ত্তি অবশ্য অভগ্ন অবস্থায় আছে। এই ভগ্ন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রাচীন

কোণারকের একটি ভগ্নশীর্ষ সূর্য্যমূর্ত্তি

উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যশিল্পের যে নিদর্শন দেখতে পেলাম, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে মন্দিরগাত্রে কি অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টিই না করে গেছেন সেকালের শিল্পীরা! দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সব শিল্পী সৃষ্টির প্রেরণায় ও অক্লান্ত সাধনায় পাষাণকে মুখর করে তুলেছিল, আজ কোথায় তারা আর কোথায় বা তাদের উত্তরসাধক বংশধরগণ!

জগমোহনের উচ্চতা একশ' পঞ্চাশ ফুট। প্রধান মন্দির ছিল এরও চেয়ে উচ্চ। এত উঁচুতে এই বিরাট বিরাট পাথর তাঁরা কেমন করে বহন করে নিয়েছিলেন, তা ভাবতে মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সেকালে ক্রেন ছিল না, সেই সময়ে এত উঁচুতে এই বিশাল আকারের পাথর কেমন করে উত্তোলিত হ'ল! তবে কি এমন কোন যন্ত্র ছিল যা আজকের ক্রেনেরই অনুরূপ?

ছোটখাটো মূর্ত্তি ত হাজারে হাজারে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে। তা ছাড়া মানুষের মস্তকপ্রমাণ কয়েকটি বৃহদাকার মূর্ত্তি—কোনটি মোহিনী, কোনটি মৃদঙ্গবাদিনী নারী, কোনটি মিলন-রত স্ত্রী-পুরুষ—কোনটিই অভগ্ন বা অটুট নয়। আরও কয়েকটি বিরাট আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি নজরে পড়ল, মূর্ত্তিগুলির শিল্পনৈপুণ্য এমনি চমৎকার যে, চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। যেমন দাঁড়াবার সুঠু ভঙ্গী, তেমনি তার ব্যঞ্জনা, প্রকাশ

উপবীত, কটিতে অপরূপ কটিভূষণ, পায়ে পাদুকা। মূর্তিগুলি দেখলে মাথা শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবনত হয়। সেগুলি সবুজ পাথরে খোদাই করা। কারও হাত ভাঙা, কোনটি মুণ্ডহীন।

জগমনের আকার একটি বিরাট রথের মত, যে কয়টি চাকা কালের স্থূল হস্তাবলেপ এড়িয়ে আজও নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সেগুলি বিশাল আকারের। চাকাগুলিতে অনেক রকমের নক্সা রয়েছে। মন্দিরটি সমস্তই কাটা কাটা পাথর দিয়ে তৈরি; একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর; অথচ কি নিখুঁত ভাবেই না মূর্তিগুলি মিল খেয়ে গেছে—শুধু জোড়ের চিহ্নটি ছাড়া। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরে উঠতে হয়। সোপানগুলির শেষভাগেই প্রধান কটক। এটি এখন পাথরের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কটকের

অপর একটি সূর্য্যমূর্তি

দু' পাশে এবং মাথায় সবুজ পাথরে উৎকীর্ণ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি নজরে পড়ল। নীচে থেকে দাঁড়িয়ে মন্দিরশীর্ষের দিকে তাকালে আরও কতকগুলি মূর্তি চোখে পড়ে। মনে হয় একটি গরুড় পক্ষীর, একটি লক্ষীর। স্পষ্ট ভাবে ভূমি থেকে দেখা যায় শুধু বিশাল সূর্য্যমূর্তিগুলিকে।

একটি মূর্তি ভারি ভাল লাগল। এই হাতভাঙা বিরাট মূর্তিটির দুই পাশে ভক্তিনম্রভক্ত দুটি মূর্তি যুক্তকরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে; তার দু'পাশে দুটি দণ্ডায়মান বামনমূর্তি; তার দু' পাশে আরও দুটি মূর্তি। মাথায় মুকুট, কর্ণে আভরণ, সূর্য্য-মূর্তিটির মতই গলায় উপবীত, কটিতে কটিভূষণ। একজনের হাতে উদ্যত অসিবারি, অপরটির হাত ভাঙা। মূর্তিগুলির উপরে নানা অলঙ্করণ, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি। সূর্য্যমূর্তিটির পায়ের তলায় আরও একটি ক্ষুদ্র মূর্তি। শিল্পদৃষ্টির দিক থেকে এটির তুলনা নেই। মূর্তিগুলির গঠন-কৌশল ও শিল্প-সুষমা দেখে মুগ্ধ হলাম।

মন্দিরের উপরকার একটি মূর্তি

জগমন পরিক্রমা শেষ করে এবার নীচে নেমে এলাম। আহারাদির পর পুনরায় উপরে উঠার পালা। হাতে সময় খুব বেশী নেই। এর মধ্যে নাটমন্দির ও ভোগঘর দেখে নিতে হবে। শৈলেন্দ্র তারা বিশ্রামের বাসনা জানালে আমি আর ফকিরবাবু দু'জনে রওনা হলাম ডাকবাংলোর দিকে। মন্দিরের বেষ্টনী-প্রাচীর ছাড়াতেই সামনে চোখে পড়ল অনন্ত-বিস্তৃত বালুকারাশি। সমুদ্রের আভাস দেখা যাচ্ছে দূরে। সমুদ্র এখান থেকে প্রায় তিন মাইল সরে গেছে। নবাসনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রভাগা নদীতট—সেখানে প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীতে এক বিরাট মেলার আয়োজন হয়। দিনকয়েক আগে সে মেলা হয়ে গেছে, এখনও এখানে সেখানে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এবার নাকি লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল এই মেলায়। আর না এগিয়ে আমরা ডাকবাংলোয় ঢুকলাম বাংলোর পশ্চাতে একটি নূতন বসানো সূর্য্যমূর্তি দেখতে।

ডাকবাংলোটি বেশ চমৎকার, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। এখানে দর্শকগণের জন্যে মালী আছে, যে-কেউ এখানে থাকতে পারেন। কিন্তু একটা বিষয় এখানে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে আসতে হলে খাবার-দাবার জলের বোতল বা ফ্ল্যাস্ক প্রভৃতি নিয়ে আসা অবশ্যই উচিত।

এইবার নাটমন্দির এবং ভোগঘর দেখবার পালা। ভোগ-ঘরের ইমারতের কোনও অংশই আজ আর খাড়া নেই। পাথরের ভগ্ন স্তম্ভগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কতকগুলি স্তম্ভ খাড়া আছে, কোন কোনটি ভাঙা, কোনটি বা ।। নাটমন্দিরটিও ভেঙে গেছে। তবে এখনও এর চারপাশের দেওয়াল এবং মেঝে ও সিঁড়ি অটুট অবস্থায় রয়েছে। নাটমন্দিরের রঙ লাল, মন্দির-গাত্রে বাদ্যযন্ত্র-বাদনরতা নারীমূর্তি উৎকীর্ণ। এক দিকে আছে অশ্বারূঢ় সূর্য্যদেবতার বীরত্বব্যঞ্জক একটি মূর্তি। মূর্তিটির বামে একেবারে খুবির কাছেই আছে একটি বিকটাকার দুনীরের মূর্তি। এর কাছেই ছিল এককালে সূর্য্যদেবের সহধর্মিণী ছায়া বা মায়া দেবীর মন্দির। প্রধান মন্দিরের সঙ্গে সে মন্দিরটিও কালের করাল গ্রাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

জগমন মন্দিরের ভিতরে কি ছিল, আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই। পাছে সমগ্র মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সেই কারণে ভিতরটা বালুস্তূপে পূর্ণ করে বাইরে থেকে পাথরের গাঁথুনি দ্বারা প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মায়া বা ছায়াদেবীর মন্দির সূর্য্যমন্দিরের সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশাল বালুকা-স্তূপের মধ্যে বেষ্টনী-প্রাচীরটুকুই বর্ত্তমান রয়েছে। নাচঘরের ভগ্নাংশ এবং জগ-মনের বহিরংশই কারুকার্য্যখচিত। সূর্য্য-দেবের সপ্ত-অশ্বচালিত সুন্দর রথের ততোধিক সুন্দর এবং অপূর্ব্ব কারু-কার্য্যখচিত চক্রগুলির কয়েকটি মাত্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে মাত্র দু-একটি অভগ্ন অবস্থায় আছে, বাকিগুলির কারুকার্য্য নক্শা এবং অলঙ্করণের কিছু কিছু শ্রীহীন হয়েছে, কিছু বা ভেঙেছে। শুধু অভগ্ন অটুট অবস্থায় দেখা যায় নবগ্রহের নয়নাভিরাম মূর্তিগুলি। কলিঙ্গদেশের প্রথানুযায়ী প্রতি মন্দিরের সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত থাকত নবগ্রহের মূর্তি। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহের নয়টি মূর্তি একটি প্রকাণ্ড সবুজাভ পাথরে পাশাপাশি ভাবে উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা ভারি চমৎকার।

এইবার মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি। প্রথম বড় দেউল বা পুরুষ দেউল (গম্ভীরা); দ্বিতীয়—জগমোহন বা স্ত্রী-দেউল (দর্শকের স্থান বা ভদ্র দেউল)। এই দুয়ের মিলনের মধ্য দিয়েই স্থাপত্যের ঐশ্বর্য্য বিকশিত হয়েছে। বড় দেউলের মস্তক গোলাকৃতি, মাথায় শিরস্ত্রাণ; জগমনের মস্তক স্তরে স্তরে বিকশিত, বেণীর চূড়া অধিকতর বিস্তৃত।

ডাক বাংলোর দিক থেকে জগমনের ছবি। সম্মুখের ভগ্ন স্তম্ভগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভোগঘরের নিদর্শন

তিন রকম পাথরে মন্দিরটি নির্ম্মিত। বেলে পাথর, মাকড়া পাথর এবং মুগনি পাথর যথাক্রমে ভুবনেশ্বর ও আটগড়, ভুবনেশ্বর, পুরী ও নীলগিরি থেকে আনীত।

সূর্য্যদেবের রথচক্রের আবর্তন কল্পনা করে মন্দিরটি পরি-কল্পিত হয়েছে। রথের দু'পাশে বার জোড়া বৃহৎ চক্র বার মাসের প্রতীক। এক দিকে বারটি শুক্লপক্ষ, অপর দিকে বারটি

কৃষ্ণপক্ষ। সম্মুখে সাতটি ঘোড়া রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তা সাত রশ্মির বা সাত বারের প্রতীক। কেউ কেউ সূর্য্যের বেদময় রথকে সাতটি বৈদিক ছন্দের—যথা গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতীর সঙ্গে তুলনা করেন।

মন্দিরের নক্সার সারিগুলি অতি মনোরম। তাদের নামও বিভিন্ন। (১) শাকের ডালি বা পাপড়ি ডালি—ফল-ফুল-শোভিত লতাপাতার নক্সা।

(২) নাগবন্ধিছন্দ—মানুষের দেহের নীচে সর্পাকৃতি নাগ-নাগিনী পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

(৩) বন্ধছন্দ—দুই পার্শ্বে বন্ধকাম (স্ত্রী-পুরুষের মিলন) তার উপরে নর্তকীদের মূর্তি।

(৪) গোলবাই ডালি—এতে দেখা যায় একটি লতা বেঁকে ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে, প্রতি ঢেউয়ের মধ্যে একটি শিশু নৃত্য-ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। তার উপরে পৃষ্ঠে পুরুষকে বহন করে পরীকন্যারা উড়ে চলেছে।

(৫) খাকরছন্দ—আলঙ্কারিক নক্সা—উপরে নৃত্য ও বাদ্যরতা নারীমূর্তি।

(৬) শিখরছন্দ—স্ত্রী-পুরুষের মিলন—উপরে নৃত্য ও বাদনরতা নারী।

(৭) বরবাঞ্জরি—এক প্রকার জলজ পুষ্প—মালার আকারে চিত্রিত।

(৮) কান্তি পাখুরা—ফুলের পাপড়ির চিত্র।

(৯) পঠিকাঙ্গুলা বা কেশর পাখুর—আলঙ্কারিক নক্সা।

মন্দিরের নক্সার মধ্যেও নানা রকমের স্থাপত্য ছন্দ আছে, যেমন—

জগমোহনের উপর থেকে নাটমন্দিরের দৃশ্য

(ক) গজগামিনী—নানাভাবে বিচরণরত অনেক বড় হস্তী।

(খ) হংসলহরী—বিভিন্ন ভঙ্গিমায় চিত্রিত হংসের দল।

(গ) মনুষ্যলহরী—বহু মানুষের বিবিধ ভঙ্গিমায় চিত্র।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। বিদায়কালে কোনারকের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—আধুনিক সভ্যতার মোহ কোথায় আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি দেখলাম, উদয়গিরি দেখলাম। দেখলাম কোনারক—যেখানেই গিয়েছি মন শ্রদ্ধাবিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। কয়েক শতাব্দী আগে যাঁরা নীরস পাষাণে এই বিচিত্র রূপসৃষ্টি করে গেছেন আজ কোথায় তাঁদের উত্তর সাধকের দল।*

* আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

স্বর্গ চাহি না আমি

শ্রীনীলরতন দাশ

যুগ যুগ হ'তে এ ধরার সাথে জীবনের বন্ধন,
মাটির পরশে তাই জাগে প্রাণে পুলকের স্পন্দন।
হেরি' পৃথিবীর ঋতু-উৎসব অন্তরে মোর জাগে কলরব,
তার সমারোহ হৃদয়ে আমার তোলে বীণা-ঝঙ্কার—
চন্দ্র সূর্য্য মোর তরে,—হেরে আলোকের পারাবার।

আকাশ কুসুম করি না কামনা; পুষ্পিত এই ধরা
আমারি লাগিয়া রূপে রসে গানে গন্ধে বরণে ভরা।
মানুষের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা পুরায়েছে সাধ, স্বপ্ন ও আশা,
মানুষেরে ভুলি' দেবতারে তাই করি নাই সন্ধান—
মাটি ও মানুষে বন্দনা করি' রচিয়াছি মোর গান।

জীবনের মাঝে আলো ছায়া আছে; তবুও পৃথ্বী নব।
চিত্তের ক্ষুধা নিত্য মিটায় স্বর্গের সুধা সব।
অমৃতের পাশে আছে হলাহল, আছে আবিলতা দুখকোলাহল,
তবুও চিত্ত এ মহাতীর্থে মুগ্ধ দিবসযামী—
মর্ত্যের মায়া মোহ কাটাইয়া স্বর্গ চাহি না আমি।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৮

১৯০৬-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি অনেক তদির-তাগাদা করিয়া জীবানন্দ ছুটি পাইলেন। মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে তাঁহার স্বাস্থ্য যে কতখানি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহা জানিতে পারিলেন রাজনগরে আসিয়া। দিন দশেক যাইতে না যাইতে তিনি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ভয় পাইয়া হিরন্ময়ী দেবানন্দকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। হরিনারায়ণ শহরে টেলিগ্রাম করিলেন ডাক্তারের জন্য। মাতার টেলিগ্রাম পাইয়া দেবানন্দ পরদিন রওনা হইল।

শেষ রাত্রির দিকে জংশন-ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। তাহাদের গাড়ী আসিতে তখনও কিছু দেরী আছে। মালপত্র এক জায়গায় রাখিয়া দেবানন্দ প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতে লাগিল।

সে যে গাড়ীতে আসিয়াছিল তাহা চলিয়া যাইবার পরে কুলিরা প্লাটফরমের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। পান, সিগারেট ও খাবারের ফিরিওয়ালারাও নিজ নিজ জিনিষের বাক্সের পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মত অপেক্ষমাণ যাত্রীরা কেহ প্ল্যাটফরমের উপর সতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়াছে, কেহ বেঞ্চিতে বা নিজের ট্রাঙ্ক, বিছানার উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। অতবড় জংশন-ষ্টেশনটা সারা দিনের ক্লান্তি ও হট্টগোলের পর যেন ঝিমাইতেছে।

গাড়ীতে গরম ও ভিড়ে বড় কষ্ট হইয়াছে। ঝিরঝিরে হাওয়া দিতেছিল প্ল্যাটফরমে। কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার পর দেবানন্দের শরীর জুড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকিট-ঘরের কাছে আসিয়া সে থামিয়া গেল।

টিকেট-ঘরের কাছে একটা বড় কাঠের বাক্স রহিয়াছে। তাহার উপরে দুই জন লোক, বোধ হয় ষ্টেশনের কুলি কি জেতার, পাশাপাশি ঘুমাইতেছে। নীচে বাক্সের গায়ে ঠেস দিয়া দুই জন বিহারী পুলিস ঝিমাইতেছে। একজনের মাথার লাল পাগড়ি কপালের উপর নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে একখানা ময়লা ত্রিপলের উপর চারিটি ছেলে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। ভদ্রলোকের ছেলে। দেখিয়া মনে হয় বার হইতে চৌদ্দর মধ্যে বয়স। কোমরে প্রত্যেকের দড়ি বাঁধা, হাতে হাতকড়া। তাহাদের মুখের উপর টিকিট ঘরের বাহিরের দেয়ালের আলো পড়িয়াছে দেবানন্দ দেখিল একটি ছেলের মুখখানি নিতান্ত কচি। সেইটিকে দলের মধ্যে সকলের ছোট বলিয়া মনে হইল। ছেলেদের কোমরের দড়ির অপর প্রান্তে কনেষ্টবল দুইটি নিজেদের পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আসামীরা পালাইবার চেষ্টা করিলে পায়ে টান পড়িবে, তাহারা জাগিয়া উঠিবে।

দেবানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছেলেগুলিকে দেখিল। কোন স্কুলের নীচের ক্লাসের ছাত্র হয়ত। সম্ভবতঃ বন্দে মাতরমের মত মারাত্মক কথা উচ্চারণ করিবার জন্য অথবা কোন দোকানদারকে "বিলাতী লবণ বেচিও না ভাই" বলিয়া জোড় হাতে অনুরোধ করিবার জন্য প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকারের আদেশে তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে। বিচার হইবে ঘটা করিয়া। শাস্তি হইবে বেত, জরিমানা বা কারাদণ্ড। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ মহামান্য ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে করিবেন রাষ্টিকেশন। দেবানন্দ আবার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কুলি, জেতাররা এবং ঘুমন্ত যাত্রীরা সকলে উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে গাড়ী আসিয়া পড়িল। জিনিসপত্র লইয়া দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে পিছনে শুনিল "বন্দে মাতরম্"! "বন্দে মাতরম্"! কোমরে দড়ি-বাঁধা দুইটি ছেলে কামরা হইতে প্ল্যাটফরমে নামিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিতে লাগিল, তাহাদের হাতেও হাতকড়া। ব্যস্ত যাত্রীরা এদিকে ওদিকে যাইবার সময় চাহিয়া দেখিতেছে। দূরে টিকিট-ঘরের দিক হইতে আবার শব্দ আসিল "বন্দে মাতরম্"। ঘুমন্ত ছেলে চারটিকে কনেষ্টবলরা ধাক্কা দিয়া জাগাইয়াছে। এই গাড়ীতে তাহাদের যাইবার কথা। পুলিস কোমরের দড়ি ধরিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া তাহাদের লইয়া চলিল গাড়ীর দিকে।

দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া প্ল্যাটফরমে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি ছুটাছুটি দেখিতে লাগিল। মাথায় মস্ত পাগড়ী বাঁধা, হাতে ভারী মোট লইয়া একজন যাত্রী হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল। দেবানন্দ জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া ভাবিতেছিল অত বড় পাগড়ী যাহার মাথায়, বোধ হয় সে পঞ্জাবী হইবে। জানালার কাছে আসিয়া লোকটি একবার উপরের দিকে চাহিয়া একটু দাঁড়াইল, তার পর আবার পা বাড়াইল। দেবানন্দ ততক্ষণে লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। সে আগাইয়া গিয়া যাত্রীটিকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—সতীশ-দা!

সতীশ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল দেবানন্দ। মোট নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—আরে, তুই কতটা বড় হয়ে গেছিস দেবু। জানালায় তোকে দেখে মনে হ'ল

যেন চেনা লোক। কম আলোতে ভাল দেখতে পাই নি। ভুল হতে পারে ভেবে ডাকি নি।

দেবানন্দের মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—তার পর যাচ্ছিস কোথায়? কলেজ চলছে না?

দেবানন্দ জানাইল তাহার পিতার অসুখের খবর পাইয়া বাড়ী যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সতীন—আমি যাচ্ছি রাজসাহী, সেখান থেকে আরও অনেক জায়গায় যাব। তোদের বাড়ী এর ক'টা ষ্টেশন পরে বল ত?

দেবানন্দ—তিনটে ষ্টেশন পরে। ঘণ্টা দেড়েক লাগে।

সতীন—বদলি হবার পর আর তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করি। তোর সঙ্গেও কত দিন পরে দেখা হ'ল। ভাবছি—

দেবানন্দ সাগ্রহে বলিল—কি ভাবছেন সতীন-দা? বাবাকে একবার দেখতে যাবেন?

সতীন একটু চিন্তিত ভাবে বলিল—তাই ভাবছি, কিন্তু হাতে অনেকগুলো কাজ আছে। তা থাক্। চল এক দিনের জন্য তোদের ওখানে ঘুরে আসি।

দেবানন্দ আনন্দে যেন আত্মহারা হইয়া গেল। তার পর তাহার মোটটা তুলিয়া লইয়া, নিজে যে কামরায় উঠিয়াছিল সেই কামরায় সতীনকে উঠাইয়া তাহার টিকিট কিনিবার জন্য নামিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া ফিরিল। দুই জন গাড়ীর এককোণে পাশাপাশি বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দেবানন্দ ও সতীন যখন রাজনগর রোড ষ্টেশনে নামিল তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ষ্টেশনঘরের দিক হইতে লণ্ঠন হাতে এক জন লোক আগাইয়া আসিল তাহাদের দিকে। কাছে আসিয়া সে লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া দেবানন্দকে দেখিয়া সেলাম করিল। বলিল—বাবু আইছেন? মাঠান গাড়ী পাঠাইছেন।

দেবানন্দ চিনিল তাহাদের বাড়ীর বাঁধা গাড়োয়ান ইসমাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা কেমন আছেন জান ইসমাইল?

ইসমাইল বলিল—আল্লার দোয়ায় কর্ত্তা ভাল আছেন আজ দুই রোজ। কাল বিয়ানের গাড়ীতে সহরের ডাক্তার সাহেব ফির‍্যা গ্যালেন।

সতীনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইসমাইল বলিল—এ বাবুরে ত চেনলাম না। এনি কি ডাক্তার?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—না, ইনি আমার মাষ্টার মশায়। বাবার অসুখের খবর শুনে দেখতে এসেছেন।

ইসমাইল বলিল—সেলাম বাবু। কর্ত্তার শক্ত ব্যারাম হইছে শুনি। আপুনি দেখতি আইছেন ইটি বড় সরিক কাম হইছে। এখন চলেন। গাড়ীতে শুত্যা ঘুম যান, পরর খানেকের মধ্যি পৌঁছ্যা যাবান। মালপত্তর আমায় মাথায় তুল্যা দ্যান।

দেবানন্দ ও সতীন গাড়ীতে উঠিয়া পাশাপাশি শুইল। মহিষের গাড়ীর ঝাঁকুনি সত্ত্বেও দুই চারিটা কথাবার্তার পরে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। একটা উঁচু কাঠের পুল হইতে গাড়ী গড়াইয়া নামিবার সময়ে দুই জনের দেহে ধাক্কা লাগিতে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা উঠিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল।

চারদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, বিস্তৃত চষা মাঠের ওপারে আকাশের এক অংশ উজ্জ্বল দেখাইতেছে। একটু পরে সূর্য্য উঁকি দিবে। দেবানন্দ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—সতীন-দা, চলুন এবার নেমে পড়ি। ঘুমিয়ে প্রায় অর্দ্ধেক পথ এসে গেছি।

তাহারা দুই জন নামিয়া গাড়ীর আগে আগে হাঁটিয়া চলিল। ঝিরঝিরে হাওয়া দিতেছিল। হাওয়ার সঙ্গে খুব মোলায়েম একটু মিষ্ট গন্ধ।

তাহারা হাঁটিতে লাগিল। রাস্তার পাশে চাষীদের বাড়ী, বাঁশের ঝাড়, আম, কাঁঠাল, কলার বাগান, তামাক, লঙ্কা, বেগুনের ক্ষেত, ধানের মরাই নজরে পড়িল। এই গ্রাম ছাড়াইয়া আবার দুই ধারে খোলা মাঠ। কিছু দূর গিয়া দেবানন্দ বাঁ দিকে মাঠের ওপারে দূরে মুরলী বিলের দিকে সতীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বলিল—ঐ যে দূরে সূর্য্যের আলোতে চিক চিক করছে দেখছেন ওটা মুরলী বিল। মস্ত বড় পদ্মবন আছে বিলে। বিলে খুব মাছ। আর শীতের সময় কত রকমের পাখী যে আসে তার লেখাজোখা নেই।

সতীন বলিল—কি নাম বললি? মুরলী বিল? তোদের বিলের নাম ত বড় কবিত্বপূর্ণ। ভোরের আলোতে কেমন ঝলমল করছে ওদিকটা দেখ।

দেবানন্দ বলিল—আসুন, ঐ বটগাছটার নীচে বসি।

সতীন বলিল—আরে, রাস্তার মধ্যে বিশ্রাম করলে বাড়ী পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

দেবানন্দ বলিল—দেরি হবে কেন? আমরা ত এসে গেছি প্রায়। ঐ যে গায়ে গায়ে গাছের সার দেখছেন ঐ গাছ-গুলোর ওধারে রাজনগর। আর পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে কালীবাড়ী দেখা যাবে।

দুই জনে বটগাছের নীচে মুরলী বিলের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পল্লীর শান্তশ্রী উপভোগ করিতে লাগিল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে পর সতীন বলিল—ওরে, এবার ওঠ দেখি।

দুই জন আবার হাঁটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঝিঙ্গী নদী দেখা গেল। তার পর কালীবাড়ী পিছনে রাখিয়া তাহারা

আরামবাগে পৌঁছিল। সতীন বলিল—গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবি না?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—গাড়ী কখন আসবে ঠিক আছে? ইনস্টাইল ঘুম দিয়ে আর মোষ দুটো খেয়ালমত টুকটুক করে আসছে। চলুন আমরা এগুই।

গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া কিছুদূর আগাইতে দেবানন্দ দেখিল ইন্দ্র আসিতেছে।

ইন্দ্র আসিয়া দেবানন্দকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—কেমন আছ দেবুদা? কাকাবাবু ভাল আছেন।

দেবানন্দ ইন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিল—ইনি কে জানিস? ইনি সতীন-দা, যাঁর কথা তোকে কত লিখেছি।

ইন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইয়া সতীনকে প্রণাম করিতে গেল, সতীন তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিল—থাক্ ভাই, প্রণাম করতে হবে না। তোমাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা মনে ছিল অনেক দিন।

ইন্দ্র খুব খুশী হইল সতীনকে পাইয়া। দেবানন্দকে বলিল—এঁকে কোথায় পেলে দেবুদা?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—তাই না সতীন-দা?

সতীন ঈষৎ হাসিল।

গল্প করিতে করিতে তিন জন চৌধপাড়ায় দেবানন্দদের বাড়ীতে পৌঁছিল। দোতলার বারান্দা হইতে তাহাদের দেখিতে পাইয়া লক্ষী দৌড়াইতে দৌড়াইতে নীচে নামিল। সিঁড়ির নীচে তাহার মাকে দেখিয়া বলিল—মা, দাদা এসেছে। সঙ্গে কে একজন আছেন। বাবাকে বলব?

ত্রিনয়নী বলিলেন—আমি বলছি। তুই নীচের বৈঠকখানা ঘরে বসতে দে। হাতমুখ ধোবার জল দিতে বল্। লক্ষী বাহিরের খোলা রকে আসিয়া দেখিল তিন জন উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে।

লক্ষী বাহিরে আসিতে দেবানন্দ বলিল—সতীন-দা, এই ভদ্রমহিলাটিকে চেনেন কি?

সকলে হাসিয়া উঠিল। দেবানন্দ বলিল—ইনি শ্রীমতী লক্ষী দেবী, এর কথা আপনাকে বহুবার বলেছি।

সতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষীর দিকে চাহিল। দেবকন্যার মত লাবণ্যময়ী সুলক্ষণা মেয়েটিকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। বলিল—তোমাকে আমি চিনি লক্ষী-দিদি। আমাকে ত তুমি চেন না?

লক্ষী সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—আমি আপনার কথা শুনেছি। মা আপনাদের এই ঘরে বসতে বললেন। আপনি বসুন।

রকের এক পাশে রক্ষিত কলসী হত বালতি ও জলচৌকি দেখাইয়া বলিল—আপনি হাত মুখ ধোবেন এখানে। আমি খাবার, গামছা সব আনছি।

লক্ষী ভিতরে চলিয়া গেল।

হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ সারিয়া সতীন ইন্দ্র ও দেবানন্দের সঙ্গে উপরে গেল জীবানন্দকে দেখিতে। সতীন প্রণাম করিয়া বলিল—দেবুর কাছে আপনার শক্ত অসুখের খবর শুনলাম ষ্টেশনে। তাই একবার দেখতে এলাম আপনাকে।

জীবানন্দ শুইয়াছিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে দেখে বড় খুশী হলাম মাষ্টার। অনেক দিন ধরে ভুগে ভুগে শরীরে আর কিছু নেই।

সতীন জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার কি অসুখ বলে?

জীবানন্দ বলিলেন, ডাক্তার তো একটা গালভরা নাম বলে গেল। আমি বলি শরীরের চাইতে মনের অসুখ বেশী। সে কথা যাক। তুমি এসেছ, দেবু এসেছে, তোমাদের কাছে অনেক খবর পাওয়া যাবে। ভাল কথা মাষ্টার, তুমি কি এখনও চাকরি করছ, না চাকরি ছেড়ে কোন দলে ভিড়েছ।

সতীন দেবানন্দের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল, চাকরি ছাড়ব কেন ভয়, এমন ভাল চাকরি! বরং ছোটলাট স্কুলার বলেছেন, ছেলেরা ড্রিল ও ব্যায়াম করুক। তাঁর আপত্তি শুধু বন্দে মাতরমে। আমি ত ছেলেদের বন্দে মাতরম্ বলতে নিষেধ করি।

জীবানন্দ বলিলেন, নিষেধ কর? কেন বল ত মাষ্টার? তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন।

সতীন হাসিতে লাগিল। বলিল, আপনি উঠবেন না, শুয়ে থাকুন। আমরা বসছি।

মেঝেতে শীতল পাটি বিছানো ছিল। সকলে তাহার উপর বসিল। লক্ষী একটা সাদা পাথরের বাটিতে বেদানার রস আনিয়া পিতার শয্যার পাশে দাঁড়াইল। মৃদু স্বরে বলিল, দাদা বেদানা এনেছে, মা রস করে দিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, বেদানার রস? দাও।

পিতাকে রস খাওয়াইয়া বাটি হাতে লক্ষী ঘর হইতে বাহিরে গিয়া তখনই ফিরিল। বলিল, বাবা, জ্যেঠামশাই এসেছেন।

হরিনারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সতীন এই সাল-প্রাংশু মহাভুজ বিরাট পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, তাহার জিমন্যাষ্টিক-করা দেহকে এই মানুষটি ইচ্ছা করিলে এক আছাড়ে ছাতু করিয়া দিতে পারেন। সতীন ও দেবানন্দ হরিনারায়ণকে প্রণাম করিল। হরিনারায়ণ তাহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। দেবানন্দ সতীনের পরিচয় দিল। জীবানন্দ বলিলেন, দেবু মাষ্টারের যে পরিচয়টা দিল সেইটেই তার সবটুকু নয়। এর অন্য একটা পরিচয় আছে। মাষ্টার, যখন এসেছ দু'চার দিন থাকবে ত?

সতীন বলিল, হঠাৎ আসা…

হরিনারায়ণ বলিলেন, যাওয়াটা হঠাৎ হবে না। তোমরা

সব বসো। কি কথা হচ্ছিল আমি আসবার সময় ?

জীবানন্দ বলিলেন—মাষ্টার বলছিল সে ছেলেদের বন্দে মাতরম্ বলতে নিষেধ করে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করছিলাম।

হরিনারায়ণ বলিলেন, সতীশের নিষেধের কারণ কি আমি জানি নে, তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। লায়ন সাহেবের এটি বন্দে মাতরম্ সারকুলার অমান্য করাকে খুব্ধ্য স্থান দিলে আমাদের আন্দোলনকে খুব বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। প্রহার, জেল, জরিমানা, রাষ্টিকেশন, অভিভাবক ও শিক্ষকদের তাতে বারবার ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা হচ্ছে।

জীবানন্দ বলিলেন, সেদিন শুনলাম কোথায় এক বরযাত্রী দলের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে বরযাত্রীরা বন্দে মাতরম বলতে পারে এই ভয়ে।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বরযাত্রী কেন হরিসঙ্কীর্তনও কোন কোন জায়গায় ঐ আশঙ্কায় বন্ধ করা হয়েছে। এদিকে ঢাকায় ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার যে উপায় আবিষ্কার করেছেন তাতে স্বদেশী আন্দোলনের অনেক কিছু ওলটপালট হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিবার পরে হরিনারায়ণ বলিলেন, রোগীর ঘরে এত কথাবার্তা ভাল নয়। এস, আমরা উঠি। সতীশ, আমাদের গ্রামটা বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত ঘুরে দেখনি।

জীবানন্দ মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি ত এখন ভাল আছি।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, বিকেল তক ভাল থাকলে আবার কথা হবে।

পথে বাহির হইয়া সতীশ বলিল, আপনি ফুলারের নূতন উপায় আবিষ্কারের কথা বলছিলেন। কি উপায় আবিষ্কার করেছে ? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধসৃষ্টির চেষ্টার কথা বলছেন কি ?

হরিনারায়ণ বলিলেন, সেই কথা আমার মনে উঠেছে বটে। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার সময়ে এ অঞ্চলের মুসলমানরা কতকটা স্বদেশীভাবাপন্ন হয়েছিল তা আমি লক্ষ্যও করেছিলাম। এখন দেখছি তাদের ধারণা হয়েছে যে, সরকার বাহাদুর তাদেরই সুবিধের জন্যে বাংলাদেশকে দুই খণ্ড করেছেন। কি সুবিধে হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। এই ধারণা থেকে বিলেতী লবণ, চিনি, কাপড় কেনবার জন্যে এদের আগ্রহ বেড়েছে।

গ্রামান্তরে আসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, তোমার দেশে কিছু কিছু খবর আমি ইন্দ্রের কাছে দেবুর চিঠিগুলোতে আগে পেতাম। সে এখানে এক আত্মোন্নতি সমিতি গড়েছিল, পুলিসের উৎপাতে সমিতির কাজ বন্ধ হয়েছে, অনেক ছেলে পালিয়েছে ভয়ে আর অভিভাবকের তাড়নায়। সব জায়গাতে বোধ হয় এই অবস্থা ?

সতীশ বলিল, কোন কোন জায়গায় এই অবস্থা হয়েছে বটে। কাজের পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই উদ্দেশ্যেই আমি কতকগুলো জায়গায় খোঁজ নিতে বেরিয়েছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন, এখানেও খোঁজ নাও। এখানকার হেড মাষ্টার উৎসাহী লোক। ইন্দ্র হেড মাষ্টারের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাবে। আজ বেলা হয়েছে। ইন্দ্র, তুমি বরং রাজেনবাবুকে একটু খবর দিয়ে এস বিকেলে তিনি যেন জীবানন্দের বাড়ীতে আসেন।

ইন্দ্র বলিল, এখন গেলে তাঁকে বোধ হয়, বাড়ীতে পাওয়া যাবে। যাব ?

হরিনারায়ণ—পাবে কি ? দেখে এস। চল সতীশ, আমাদের বাড়ীতে একটু বসবে।

সতীশ—আমিও ইন্দ্রের সঙ্গে একটু ঘুরে আসি না।

হরিনারায়ণ—আচ্ছা যাও। ইন্দ্রের সঙ্গেই ফিরে এসো।

দেবানন্দ, ইন্দ্র ও সতীশ গল্প করিতে করিতে হেড মাষ্টারের বাড়ীর দিকে চলিল। সতীশ স্কুলের ছেলেদের ও মাষ্টারদের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। করণপুকুরের পাশ দিয়া যাইবার সময় ইন্দ্র বলিল, চলুন সতীশদা, মঙ্গলচণ্ডীর বাড়ীতে একটা প্রণাম করে যাই।

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের কাছে গিয়া তাহারা দেখিল মন্দিরের বাহিরে বাঁধানো চাতালের এক কোণে একজন বৈরাগী বসিয়া একতারা বাজাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া সে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল :

> বাবু, বুঝবে কি আর মলে
> তোমার কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে
> একদম দফা সারলে।
> ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করলে সারা
> চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ না বাবু খুলে—
> ধান নিয়েছে, মান নিয়েছে, হাত দিয়েছে কুলে
> বাবু, বুঝবে কি আর মলে।

ইন্দ্র ও দেবানন্দ এই বৈরাগীকে আগে রাজনগরে কখনও দেখে নাই, বৈরাগী-বোষ্টমের মুখে এ ধরণের গান কোথাও শোনে নাই। দেবানন্দ সতীশকে বলিল, রাধেকৃষ্ণ ছেড়ে বৈরাগী নূতন রকমের গান গাইছে শুনছেন সতীশ-দা ?

সতীশ শুনিয়াছে। ইহার আগেও গ্রামাঞ্চলে বেড়াইবার সময়ে এই রকম বৈরাগী দুই চার জনকে সে স্বদেশী গান গাহিতে শুনিয়াছে। মৈমনসিং ও বরিশাল অঞ্চলে ইহাদের বেশী দেখা যায়। গ্রাম হইতে গ্রামে চাষী, মজুর, রাখাল, দোকানী, নৌকার মাঝিদের মধ্যে, দরিদ্র গৃহস্থের কুটীরে

ইহারা জাতীয় আন্দোলনের নূতন বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিতেছে।

সতীন বৈরাগীর কাছে গিয়া বলিল, এ গান কোথায় শিখলে বাবাজী?

বৈরাগী বলিল, লোকের মুখে মুখে শুনে শিখেছি বাবু।

সতীন—এ রকম গান আর ক'টা জান?

বৈরাগী—বেশী জানি না, দু'চারটি বাতর শুনে শুনে শিখেছি। শুনবেন আর একটা?

সতীন মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বৈরাগী আবার গান ধরিল:

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী
মোহের ঘোরে আর থেকো না।

সতীন ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলে ইন্দ্র? বাবাজী, এ গানও কি লোকের মুখে শুনে শিখেছ?

বৈরাগী—আজ্ঞে বাবু। নইলে আর কোথায় শিখবো?

সতীন পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বৈরাগীকে দিল। বলিল, তুমি কি আজই চলে যাবে এখান থেকে?

বৈরাগী—দু'তিন দিন থাকবো বাবু। সারা গাঁয়ে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করব। তারপর ভিন গাঁয়ে যাব।

ইন্দ্র—তুমি এখানে বসে থাক একটু। আমরা এখনই ফিরব। তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। সেখানে গান শুনিয়ে ভিক্ষে নেবে। কেমন?

বৈরাগী হাসিয়া বলিল, জয় রাধে কৃষ্ণ! তাই হবে রাজাবাবু।

মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিয়া তাহারা হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। ইন্দ্র বাড়ীর ভিতরে গিয়া শুনিল তিনি স্কুলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীকে পিতার অনুরোধ জানাইয়া সে ফিরিয়া আসিল। মঙ্গলচণ্ডীর বাড়ী হইতে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া তাহারা বাড়ীতে ফিরিল। হরিনারায়ণ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈরাগীকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এটিকে দুপুরবেলা কোথা থেকে আনলে?

বৈরাগী নিজেই উত্তর দিল। হরিনারায়ণকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, বাবুরা গান শুনে ধরে আনলেন। বললেন, কর্ত্তাবাবুকে গান শোনাবে।—বলেই গান ধরল:

রাধা বলেন, শুন সখি আর আমি যাবো না পথে।
বৃন্দা বলেন, কেন গো রাধারাণী, কেন আর যাবে না পথে?
রাধা বলেন, সখি পথে বড় ভয়—পথে বড় ভয়
জাতি, মান, প্রাণ নিয়ে হবে যে সংশয়।
সাদা বাঁদরে শুনি ছেয়ে গেল দেশ,
লুটে-পুটে কেড়ে ছিঁড়ে করল সকল শেষ।
পথে ঘাটে হাটে মাঠে করে অত্যাচার
রেলগাড়ীতে কত মেয়েরে দিল ছারখার।
শুনলে সে সব কথা লাগে প্রাণে দারুণ ব্যথা,
তবু দেখো দেশের মানুষ অঘোরে ঘুমায়
ওরে অঘোরে ঘুমায়।

বৈরাগী গান শেষ করিয়া বলিল, জয় রাধে কৃষ্ণ! কর্ত্তা বাবু, ছুটি ভিক্ষে দিতে আজ্ঞা দেন। কত জায়গায় ঘুরতে হবে।

হরিনারায়ণ স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছিলেন। বৈরাগীর কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি এই রকম গান কতগুলো শিখেছ, আমি সব শুনব। এখন বেলা হয়েছে। তুমি কাছারি-বাড়ী গিয়ে বসো। শ্যামরায়ের প্রসাদ পাবে। বিকেলবেলা গান শোনাবে। কাল সকালে ভিক্ষে নিয়ে যেয়ো।

তিনি একজন চাকরকে ডাকিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন। সে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া কাছারি-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বৈরাগী চলিয়া গেলে হরিনারায়ণ বলিলেন, এই জিনিসটি নূতন দেখলাম।

সতীন বলিল, এ দিকটাতে বোধ হয়, এই আরম্ভ হয়েছে। কোন কোন জায়গায় স্বদেশী আন্দোলনের সুরু থেকে এর চল হয়েছে। অনেক জায়গায় ভদ্রলোকের ছেলেরা স্বদেশী গান গেয়ে বেড়ায়। মৈমনসিংহে তাদের নাম হয়েছে চারণ-দল, কোথাও বলে ভাট। আরও দুটো জিনিস কোন কোন জায়গায় আরম্ভ হয়েছে—স্বদেশী যাত্রা ও কথকতা। পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে স্বদেশী ভাব প্রচার করা হয়। এখনও পুলিসের চোখ পড়ে নি এদিকে।

হরিনারায়ণ বলিলেন, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে নূতন ভাব প্রচার করবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। বক্তৃতা দেশের ক'জন লোক শুনে আর খবরের কাগজ ক'জনেই বা পড়ে?

কিভাবে রাজনগরে স্বদেশী যাত্রা ও কথকতার প্রবর্ত্তন করা যায় তাহা লইয়া হরিনারায়ণ ও সতীনের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। সতীন বলিল, স্বদেশী পালার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সে পাঠাইবে।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া সতীন ও দেবানন্দ উঠিল।

সন্ধ্যার পরে হরিনারায়ণ ও রাজেনবাবু আসিয়া জীবানন্দের ঘরে বসিলেন। দেবানন্দ ও ইন্দ্রকে লইয়া সতীন রাজনগর স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার যতীনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল। যতীনবাবু যে এক জন দলের লোক সতীন সে খবর রাজনগরে আসিবার আগে পাইয়াছিল।

কথায় কথায় রাজেনবাবু মৈমনসিংহে গোলমালের কথা

তুলিলেন। বলিলেন, আমার এক উকিল বন্ধুর চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, সেখানকার মুসলমানদের ধারণা হয়েছে গবর্ণমেণ্ট তাদের পক্ষে। তিনি এই মর্ম্মে লিখেছেন—মুসলিম নেতারা প্রকাশ্যভাবেই বলেছেন যে, সরকার হিন্দুদের বিদ্রোহী বলে মনে করেন, কাজেই মুসলমানরা কোন শাস্তির ভয় না রেখে তাদের উপর অত্যাচার চালাতে পারে।—মৌলবীরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব শীঘ্র শেষ হবে এবং আবার মুসলমান রাজত্ব কায়েম হবে। কি ধরণের অত্যাচার হচ্ছে চিঠিতে তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে—মিথ্যা অপবাদ রটনা, রাস্তাঘাটে রাহাজানি, ডাকাতি, দোকান লুঠ, আগুন লাগান, হিন্দুদের খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র করা, হিন্দু বিধবাদের জোর করে নিকা করবার ভয় দেখান ইত্যাদি।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে হরিনারায়ণ ও রাজেনবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন।

রাত্রে হরিনারায়ণের গৃহে সতীন ও দেবানন্দের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল।

আহারের পর হরিনারায়ণ আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সতীন, ইন্দ্র ও দেবানন্দ সেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, দেখ সতীন, এখানে বালক-সমিতি নাম দিয়ে একটা সমিতি হয়েছিল তোমাকে বলেছি বোধ হয়। পরে এর নাম হয়েছিল আত্মোন্নতি সমিতি। এই সমিতির ছেলেদের বলা হ'ত ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার দল। লোকের আপদে-বিপদে সাহায্য করা, দুষ্ট লোকেদের উপর নজর রাখা, মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা তুলে স্কুলের গরীব ছেলেদের সাহায্য করা, স্বদেশী গান গেয়ে লোকের মধ্যে স্বদেশী জিনিস বিক্রি করা, হাটেবাজারে বিলাতী জিনিস না কেনবার জন্ত লোককে অনুরোধ করা—এই সব ছিল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ারদের কাজ। পুলিসের অত্যাচারে ও মুসলমানরা খেপে গিয়ে এদের কারো কারো নামে মোকদ্দমা আনাতে ভলান্টিয়ার দল প্রায় ভেঙে গেছে। যে নামেই হোক একটা অরগানাইজেশন না থাকলে স্বদেশী ভাব বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে। তোমরা ত কর্ম্মীলোক, এর কোন ব্যবস্থা করছ?

সতীন—এই পুরোনো ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার দল নিয়ে ঢাকায় পুলিনদা অনুশীলন সমিতি গড়ে তুলেছেন। ফরিদপুরে ব্রতী-সমিতি, বরিশালে স্বদেশবান্ধব সমিতি, মৈমনসিংহে সুহৃদ ও সাধনা-সমিতি এই ভাবে গড়া হয়েছে। কলকাতায় মিঃ মিত্তিরের অনুশীলন সমিতি গোড়ায় এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

কি ভাবিয়া সে থামিয়া গেল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, এখানে দেবানন্দ ইন্দ্র এদের মত ছেলে আছে, ভাবনা কি? নূতন জিনিস গড়ে উঠতে দেরী হবে না।

নানা রকমের আলাপ চলিল। ঘণ্টাখানেক পরে হরিনারায়ণ বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গেলেন। সতীন ও দেবানন্দ চৌধুরীপাড়া রওনা হইল।

দেবানন্দের শয়নঘরে সতীনের বিছানা হইয়াছিল। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত দুই জনের মধ্যে কথাবার্তা চলিল। পিতার অসুখের সংবাদ পাইবার আগে বরিশালে আসিবার সময় নিজের মানসিক অশান্তির কথা দেবানন্দ সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বলিল, সে সময় আপনার ও দেবেন পণ্ডিত মশায়ের কথা বার বার মনে পড়ত। আপনাকে চিঠি লিখে সব জানাব ভেবেছি কতবার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয়ে ওঠে নি। আপনি খানিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন, কোন্ পথে যাব বলে দিলেন না। পণ্ডিতমশাই দীক্ষা দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন, তারপর নিজের সাধনায় ডুবে গেলেন, আমিও চলে গেলাম অন্ত জায়গায়। তিনি দ্বৈপায়ন অসুর-মর্দ্দিনীর আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন। আমি দেখছি দ্বৈপায়ন অসুর সব সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করতে চলেছে, কিন্তু অসুর-মর্দ্দিনীর আবির্ভাবের কোন লক্ষণ নাই।

দেবানন্দের উত্তেজনা দেখিয়া সতীন হাসিল। বলিল, কোন লক্ষণ নেই তাই নাকি ভাবছিল ভাই? ওরে অবিশ্বাসী হোস না। অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ হলে তবে না দেবীর আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত্ত আসবে। তোর পথ তোর সামনে প্রসারিত রয়েছে দেবু, সময় হলে কুয়াশার পর্দ্দা সরে যাবে, সেই পথ দেখতে পাবি।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সতীন আবার হাসিয়া তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, অধৈর্য্য হলেই কি কাজ এগিয়ে যাবে ভাবছিস? অবস্থা অনুকূল, সময় অনুকূল হওয়া চাই। চল্, এখন শুয়ে পড়া যাক, অনেক রাত হয়েছে।

দুই জনে শয্যা গ্রহণ করিল।

পরদিন জীবানন্দ ও হরিনারায়ণের কাছে বিদায় লইয়া সতীন ষ্টেশনের পথে রওনা হইল। দেবানন্দ, ইন্দ্র ও যতীনবাবু গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত আসিলে সতীন তাহাদিগকে ফিরিতে বলিল। বলিল, এবার তোরা ঘরে যা। তারপর ষ্টেশনের পথে পা বাড়াইয়া দিল।

৯

জগদ্ধাত্রীর শরীর খানিকটা সারিয়াছিল মাত্র, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের ধারণা হইয়াছিল যে শীঘ্রই ওপার হইতে তাঁহার ডাক আসিবে। এইজন্ত ইন্দ্রকে পড়াশুনার নিমিত্ত অন্যত্র পাঠাইতে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ত স্বামীর আগ্রহের কথা তিনি জানিতেন, তাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্রের যাইবার প্রস্তাবে মত দিতে হইল।

ইন্দ্রের ইচ্ছা ছিল সে কলিকাতায় পড়িবে। হরিনারায়ণ তাহাতে রাজী হইলেন না। কলিকাতার বর্ত্তমান উত্তেজক পরিবেশে ইন্দ্রকে হোষ্টেলে রাখিয়া পড়াইতে তিনি ভরসা করিলেন না। সদর টাউনে তাঁহার নিজস্ব বাড়ী আছে। স্থির হইল সেই বাড়ীতে থাকিয়া সে কলেজে পড়িবে। মাঝে মাঝে তিনি ও জগদ্ধাত্রী গিয়া সেখানে থাকিবেন। ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন—এফ-এ পাস করিলে তোমাকে কলিকাতায় পাঠাইব।

পিতামাতার অনুমতি পাইয়া ইন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইল। হরিনারায়ণ একটু ভুল করিয়াছিলেন। উত্তেজক আবহাওয়া সে সময়ে কলিকাতার ছাত্রমহলেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বাংলার ছাত্রসমাজ তখন উত্তেজনার মধ্যে বাস করিত। পড়াশুনা যত না হউক, ইন্দ্র শীঘ্রই সব রকম ছাত্র-আন্দোলনের একজন পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইল। মফস্বল শহরে পুলিসের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু খবর পাইয়া পুলিশ তাহার উপর নজর রাখিল। দুই এক বার তাহাকে হাঙ্গামায় জড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের দৃঢ়তার জন্য সফল হইল না। অধ্যক্ষ ইন্দ্রকে স্নেহ করিতেন। তাহার বিপদাশঙ্কা করিয়া তিনি স্থির করিলেন হরিনারায়ণকে পত্র লিখিবেন ইন্দ্রকে অন্যত্র সরাইয়া লইবার জন্য।

পিতাকে সুস্থ হইয়া উঠিতে দেখিয়া দেবানন্দ তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। জীবানন্দের ইচ্ছা ছিল বরিশাল কন্‌ফারেন্স শেষ হইয়া গেলে দেবানন্দ ফিরিবে। কিন্তু দেবানন্দ কলেজ কামাই হইবার অজুহাত তুলিতে তিনি আর কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ যেদিন রওনা হইবে তাহার আগের দিন বন্ধু অতুলের এক দীর্ঘ পত্র পাইল। এই পত্র পড়িয়া তাহার ফিরিবার আগ্রহ আরও প্রবল হইল। অতুল লিখিয়াছে—ভাই দেবু, আমার বোধ হয় আর পড়াশুনা করা হবে না। বাবার অসুখ সারছে না, আর সারবেও না মনে হয়। সবাই বলছেন নিজের চাষবাস, কাজ কারবার দেখ, বোনদের বিয়ে দাও, ছোট ভাইদের মানুষ কর। বাপ অক্ষম হয়ে পড়েছেন সেক্ষেত্রে বড় ছেলে তুমি, সব দায় ত তোমারই। মোট কথা, আস্তে আস্তে সংসারের সব ভার এসে ঘাড়ে চাপছে।

পড়াশুনা হবে না, সেজন্য দুঃখ করি না। পড়াশুনা করে কি বা করব? ফুলার সাহেবের নূতন সারকুলারের কল্যাণে হিন্দুদের চাকুরি জোটা কঠিন হবে। আসল কথা মন যেমন অস্থির হয়ে উঠেছে তাতে সুবোধ ছেলের মত সংসারের ভার কাঁধে বয়ে দিন কাটান শক্ত হবে মনে হচ্ছে।

এক এক দিন এমন সব ঘটনা চোখে পড়ে, এমন সব খবর কানে আসে যাতে স্থির থাকা যায় না। পুলিসের গুণ্ডামির দরুন হিন্দু গৃহস্থেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। কখন কার বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ে, মেয়েদের অপমান করে, জিনিসপত্র চুরি করে—সকলের এই ভয়। এমার্সনের শাসনে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মনে হচ্ছে ঠিক যেন মগের মুলুকে বাস করছি।

সলিমুল্লার কাছারি-বাড়ী গোরাদের আড্ডা হয়েছে। ঢাকা, মৈমনসিং, নোয়াখালি থেকে এসে এখানে আড্ডা গেড়ে তারা আশপাশের জায়গাগুলিতে আনাগোনা করছে। পুলিসের কর্ম্মচারীদের সেখানে যাতায়াত করতে দেখা যায়। শোনা যাচ্ছে মৈমনসিঙে মুসলমানদের মধ্যে জোর হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা রয়েছে এর পেছনে।

ভাই, এমন অবস্থার মধ্যে মানুষ কি করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে? আমাদের পাপের শাস্তি ভালভাবেই আরম্ভ হয়েছে। মনে হচ্ছে দেশে আগুন শীঘ্রই জ্বলে উঠবে। সে আগুনে কত জন পুড়ে মরবে, কত পরিবারের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে ভাবতে ভয় হয় মনে।

সেদিন স্বদেশবান্ধব সমিতির একজন ছেলের কাছে একখানা কাগজ দেখলাম। মাস দুই আগের কাগজ। একটা জায়গায় চোখ পড়ল। জ্যাক (যাকে ঠাট্টা করে 'জ্যাক দি জায়েন্ট-কিলার' বলা হয়), এমার্সন, টমসন, কার্লাইল ও রিজলের উল্লেখ করে লিখেছে লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বৈরিভাব জাগিয়ে তোলার জন্য এদের মত আর কেউ দায়ী নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য রুশিয়ার গবর্ণমেণ্টের মত দমননীতি চালানোই স্থির করে থাকে তা হলে তাদের এ সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হবে যে, রুশিয়ার দমননীতির বিরুদ্ধে রুশিয়ার প্রজারা যেমন প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করেছিল এদেশের লোকেরাও তাই করতে বাধ্য হবে।

ভাই দেবু, তোমার ত অনেক পড়াশুনা আছে। রুশিয়ার প্রজাদের এই প্রতিরোধ-নীতির বিস্তারিত তথ্য দিতে পার? স্বদেশবান্ধব সমিতির অনেক ছেলে আমার কাছে জানতে চেয়েছে।

দেবু, তিন দিন আগে চিঠিটা এই পর্য্যন্ত লিখেছিলাম, আরও কিছু লিখব বলে ডাকে ফেলি নি। একটা লেখবার মত খবর আছে। পরশু খুলনা থেকে একজন আত্মীয় আসবেন বলে ষ্টীমার-ঘাটে গিয়েছিলাম। দেখি ঘাটে পুলিসের বিশেষ সমারোহ। ভাবলাম উচ্চপদস্থ কোন সরকারী কর্ম্মচারী আসবে বোধ হয়। শুনি, তা নয়, কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্দেমাতরমওয়ালা আসবে বলে পুলিস খবর পেয়েছে, তাই এই অভ্যর্থনার আয়োজন। বন্দেমাতরমওয়ালা কে এলেন জানিনে তবে আমার আত্মীয় আর তাঁর সঙ্গে এলেন এক অতি দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন একটি সচল শালতরু। যাত্রীরা নেমে এগুচ্ছে আর পুলিস জিজ্ঞাসা করছে—কাঁহা সে আতা? সেই সাহেব-বেশী শালপ্রাংশু লোকটির দিকে তাকিয়ে পুলিস বুঝি পার্শ্বে বললে—"আপ?" বাজখাঁই গলায় হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জ্জন শোনা

গেল, "হটী লোয়াইন, গেট আউট!" চমকে উঠে পুলিস পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। আশপাশের যাত্রীরা পর্য্যন্ত সে গর্জ্জনে ভড়কে গেল।

ভাবছি এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন আমার আত্মীয়টি? এঁকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠবেন নাকি? পেছন থেকে সেই গলা বললে, এগিয়ে যাও না হে বাপু। ভাল দেখে গাড়ী ঠিক করো আমার জন্ত। বাজে থার্ড ক্লাস গাড়ী করো না।

শুনে আমার পিত্ত জলে গেল। আচ্ছা লোককে সঙ্গে এনেছেন দেখছি।

তিন জন গাড়ী করে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। গাড়ীতে উঠে ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, কি হে ব্রাদার, বাতচিৎ শুনে ভড়কে গেলে? রংটা তেমন কর্সা নয় বটে; কিন্তু আমি এক জন পাকা সাহেব, জন বুলস ওন ব্রাদার।

এই জন বুলস ওন ব্রাদারটি কে জান? মুর্শিদাবাদ নাগরের দিগম্বরনারায়ণ ওরফে দিগুদা। এর বিস্তারিত পরিচয় পরে দেব। আপাততঃ এইটুকু জানাচ্ছি যে এঁর প্রকাশ্য পেশা একটা বিলেতী কোম্পানির ট্রাভেলিং এজেন্টগিরি, আর অপ্রকাশ্য পেশা সিক্রেট প্রোপাগাণ্ডা ও অরগ্যানাইজেশন। আমার আত্মীয় এঁর সত্য পরিচয় জানেন।

দিগুদাকে পেয়ে আমি অকূলে কূল পেলাম। স্বদেশ-বান্ধব সমিতির ছেলেরা তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। পথের নিশানা পাবার জন্ত তারা ব্যাকুল।"

দেবানন্দ বরিশালে ফিরিয়া আসিয়া হোস্টেলে খোঁজ লইয়া জানিল অতুল তাহার গ্রামে চলিয়া গিয়াছে, কবে আসিবে ঠিক নাই।

কনফারেন্সের জন্ত ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হইতেছিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দেবানন্দ ও মহেন্দ্র তাহাদের দলবল লইয়া এই কাজ লইয়া পড়িল। সন্ধ্যার দিকে দেবানন্দ স্বদেশ-বান্ধব সমিতির আড্ডায় কাটাইত, অতুলের চিঠিতে উল্লিখিত দিগুদার সম্বন্ধে সে আরও অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিল। সে বুঝিতে পারিল এই ভদ্রলোক স্বদেশবান্ধব সমিতির সভ্যদের প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ফরিদপুর, ময়মনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নূতন নূতন লোক আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। সমিতির সভ্যদের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় হইল। স্পষ্ট করিয়া কিছু না বুঝা গেলেও চারিদিকে যেন একটা প্রস্তুতির আয়োজন সুরু হইয়াছে দেবানন্দের এই রকম মনে হইল।

পরীক্ষা আসিতেছে, পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই। বিক্ষিপ্ত মনকে গুছাইয়া দেবানন্দ পড়িতে বসিবার চেষ্টা করে। সেদিনও সন্ধ্যার পরে সে বই খুলিয়া বসিয়াছিল এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার বন্ধুরা বড় একটা আসে না। মহেন্দ্রকে এত রাত্রে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মহেন্দ্র, তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

মহেন্দ্র বলিল, এই মাত্র চিঠিতে খবর পেলাম দেবেন পণ্ডিতমশাই মারা গেছেন।

দেবানন্দ শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল, বলিল, মাস দুই থেকে তিনি সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করেছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন এই রকম একটা ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত হতে পারে।

মহেন্দ্র বলিল, আমি শুনেছিলাম তিনি নানা রকম বিভীষিকা দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর শরীরও একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। মৃত্যুর আগেও নাকি তিনি এই রকম বিভীষিকা দেখে অজ্ঞান হয়ে যান।

উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে দেবানন্দ বলিল, দেখ ভাই, আমার কেমন মনে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যু আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত। আরও মনে হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার আগে ঝড় উঠে বিপর্য্যয় ঘটাবে।

দিনকয়েক পরে দেবানন্দ সতীনের একটি চিঠি পাইল। দেবেন পণ্ডিত মশায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া দেবানন্দ যে আশঙ্কার কথা জানাইয়াছিল সেও সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিয়াছে চিঠিতে। ক্রমশঃ
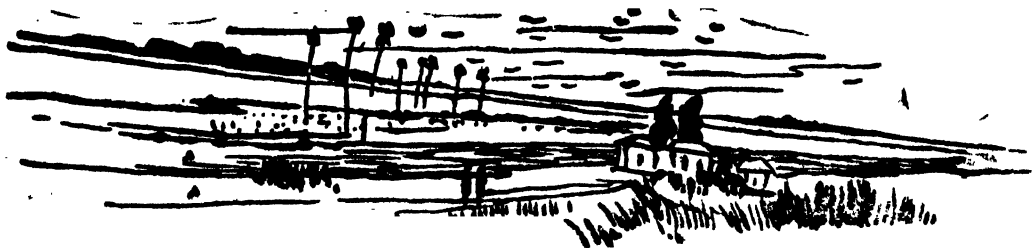
পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। আমি এই দিক দিয়া অতিশয় সতর্কতার সহিত শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কথা বলিতে চাহি, তাহা হয়ত অন্যের অবিদিত। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার মানুষ এক জন আছেন, তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি হইতেই তাঁহার সহিত আমার অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় মতামত প্রমাণিত হইবে। ইহা আজ বাঙালী জাতির জানিবার বিষয় বলিয়া আমার এই বিষয়ে লেখনী ধারণের আগ্রহ।

শ্রীঅরবিন্দ বিদায় লইলেন। চন্দননগরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিল। সুদর্শনের কথামত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পত্র দিলাম। পত্রোত্তরে তিনি জানাইলেন তাঁর পণ্ডিচারী-আগমন-সংবাদ তাৎকালীন সরকারের সংশয়-ভাজন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ভি. ভি. এস্ আয়ার ও তামিল কবি ভারতীর উদ্যোগে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে আসায় ঘটনাটি সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই তিনি যে বাসা-বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর সম্মুখে সর্ব্বদাই ইংরেজ পুলিসের ঘাঁটি বসান হইয়াছিল। তিনি এই পত্রে আরও জানাইয়াছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতা পার্থসারথি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করারও নির্দ্দেশ পত্রে ছিল। পার্থসারথির ছদ্মনামই তিনি পত্রযোগে জানাইয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরুরূপে তিনি এই বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট পুলিস কর্ম্মচারী মিঃ ডেনহাম ভ্রমে মিঃ কাউলির গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি ধৃত হন তাঁহার সঙ্গীরূপে ধৃত অন্য দুই ব্যক্তি উভয়েই চন্দননগরের নিকট প্রতিবেশী। আমার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু এই সময় হইতেই পুলিসের অনুচরবৃন্দ ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিত। কাজে কাজেই তাহাদের ফাঁকি দিতে অনেক সময়ে আমায় কলিকাতার পথে গা ঢাকা দিয়া চলিতে হইত। আমি এই ভাবেই পার্থসারথির সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক কথার পর স্বামী বিবেকানন্দের কোন একখানি পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাতায় অংশবিশেষ হইতে একটি কোড্ অর্থাৎ আক্ষরিক গুপ্তলিপি রচনা করিয়া আমার গোচর করেন, এবং বলেন এই কোডে শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিবেন; আপনিও তাঁহাকে এই কোডেই পত্র দিবেন। যদি পুলিস আমাদের পত্র হস্তগতও করে, তাহারা কিছুই বুঝিবে না। এইরূপ নিরাপদ পত্রব্যবহার শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার অনেক দিন চলিয়াছিল।

চন্দননগর ফরাসী রাজ্য হওয়ায় ফরাসী পোষ্ট আপিসের ভিতর দিয়াই আমি পত্রাদি প্রেরণ করিতাম। পত্র শ্রীঅরবিন্দের নামে যাইত না। এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের নাম দিয়া পত্রগুলি প্রেরিত হইত। তিনি আমায় কোডেই পত্র দিতেন। সেই গুপ্তাক্ষরে লিখিত পত্রাবলী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ টেগার্ট আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করার সময়ে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। নতুবা শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন রাষ্ট্রনির্দ্দেশ কিরূপ ছিল, তাহা প্রমাণ সহ আজ উপস্থিত করিতে পারিতাম। চন্দননগরের বিপ্লবমণ্ডলী শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হয় নাই। সে যুগে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতচেরীতে থাকিয়া চন্দননগরের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্রনির্দ্দেশ দিতেন, তাহাই বাংলার বিপ্লবীদল পালন করিত। পরে তিনি ইহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তাঁহারই নির্দ্দেশে বাংলার বিপ্লবিগণ পরিচালিত হইত। তাঁর এই বৈপ্লবিক নির্দ্দেশের মূলেও ছিল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার অনুপ্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে প্রস্থানকালে শিরিসচন্দ্র ঘোষের নিকট এক ব্যক্তির নাম দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সংযোগসূত্র স্থাপন করি। তিনি পরলোকগত সুরেশচন্দ্র দত্ত। মাণিকতলা সম্পর্কিত বোমা নির্ম্মাণের গুরুরূপে হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) নামই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মাণিকতলার বোমার মামলার পর একমাত্র এই সুরেশচন্দ্র দত্তই বাংলায় বোমা নির্ম্মাণের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি এম্-এস্‌সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তার পর তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হন। তাঁহারই সাহায্যে চন্দননগরে এম্-এস্‌সি ক্লাশের ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক বোমা প্রস্তুতির কৌশল শিক্ষা করেন, এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির গুপ্ত কারখানা স্থাপিত হয়।

সুরেশচন্দ্র দত্তের নাম শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম, পরে বোমা নির্ম্মাণের ব্যাপার লইয়াই তাঁহার সহিত চন্দননগরের সংযোগ স্থাপিত হয়। সুরেশচন্দ্রের শিক্ষাকৌশলে ও মণীন্দ্রনাথের প্রতিভায় চন্দননগরের বোমা শক্তি ও বৈশিষ্ট্যে ভারতের বিপ্লব-কেন্দ্রে ঐতিহাসিক বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে বসিয়া বাংলার বিপ্লবীদের যথারীতি নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষে আমি দুই জন ফরাসী রাজপ্রতিনিধির সহিত পণ্ডিচারীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের আগমনে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের জন্ত শহরে ইংরেজ পুলিসের বিশেষ উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। বিশেষতঃ বাঙালী দেখিলেই এই সকল গুপ্ত পুলিস তাহাদের চক্ষে চক্ষে রাখিত। আমি ফরাসী রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত রুদেগ্রাঁ বাজারের সন্নিকটে রাজাপুলের প্রসিদ্ধ ভবনে অবস্থান করিয়াছিলাম। এক দিন অপরাহ্ণে নিকটবর্ত্তী পণ্ডিচারীর প্রসিদ্ধ ওদঞ্জল মাঠে যে ফুটবল খেলা হইত, তাহা দেখিতে বাহির হই। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনী, সুরেশচন্দ্র ওরফে মণি ফুটবল খেলায় যোগ দিতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দের শ্যালক সৌরীন্দ্রনাথ বসুও এই মাঠে পদচারণা করিতেন। এইখানেই সুকৌশলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। আমার পণ্ডিচারী আগমনের কথা পূর্ব্বেই পত্রযোগে শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়াছিলাম। সৌরীন্দ্র আমাকে দেখিয়াই সঙ্কেতে আমায় মাঠ হইতে দূরে যাইতে আহ্বান করিলেন। কোম্পানী বাগানের এক পথে দুই জনে মিলিত হইলাম। আমরা এক খোলার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। যোসেফ ডেভিড নামে এক মাদ্রাজী ছাত্রের সহিত আমার এই বাড়ীতে পরিচয় হইল। ইনি পরে পণ্ডিচারীর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও মেয়র হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া সৌরীন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি যোসেফ ডেভিডের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একখানি পুশ্‌-পুশ্‌ ভাড়া করিয়া আমায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলেন। তিনি আমাকে এক জন রমণীর মত সর্ব্বাঙ্গে মাদ্রাজী চাদরে মুড়িয়া পুশ-পুশে চড়াইয়াছিলেন। যোসেফ ডেভিড এক জন নারীকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, এই হেতু পুলিস প্রহরীদের এ বিষয়ে কোনই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। আমি দেখিলাম—বাড়ীর অপর ধারে এক দল গোয়েন্দা পুলিস হল্লা করিতেছে, আমার একপ্রকার নারীবেশ হওয়ায় তাহারা কিছুই মনে করিল না। আমরা দুই জনে এই বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলাম। নিম্নতলেই নলিনীকান্তের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহার অপার্থিব সৌহার্দ্দ্য সেদিনও অনুভব করিয়াছি। তিনি বলিলেন, মণি অর্থাৎ সুরেশ-চন্দ্র আজ আমাদের সৈরিন্ধ্রী।

আহার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে শুনিলাম, খেচরান্ন হইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে একটি কেরোসিন তেলের ডিবায় মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছে। সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "রন্ধনের বালাই বিশেষ কিছু নাই। আমরা রাত্রে খেচরান্নেই উদরপূর্ত্তি করি।" ইহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি দ্বিতলে গিয়া উঠিয়া হলঘরের সম্মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলাম। বহু দিন পরে আবার তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ পাইলাম।

সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ? সাধন কেমন চলিতেছে?" ইতিপূর্ব্বে তিনি যৌগিক সাধনের কয়েক খণ্ড টাইপ করা কাগজ চন্দননগরে আমায় পাঠাইয়াছিলেন—তাহার প্রথমেই লেখা ছিল—"you need not make ashan"। কথাগুলি আমার পক্ষে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিত। আমার সাধন ছিল চেষ্টা-প্রসূত। তাহা হইতে বিরত থাকার আদেশ তিনি এই কয়েক খণ্ড কাগজে দিয়াছিলেন। আরও তাঁহার কথা ছিল, "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" এই মন্ত্র আমাকে অনেক কর্ম্মে ভরসা দিত। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। তাঁহার এই কথায় আমার মৃত্যুভয়ও দূর হইয়াছিল। কোন কর্ম্মই প্রচেষ্টায় সাধিত না হয়, তাহার জন্ত নিজেকে সর্ব্বদাই স্থির রাখিতাম। সাধনার কথা বলিতে বলিতে দুই জনে হলঘরের এক পার্শ্বে কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার ও একখানি পুরাতন টেবিলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি টেবিলের এক পাশে উপবেশন করিলেন। আমাকেও তিনি বসিতে বলিলেন। দেখিলাম টেবিলের উপর কয়েকটা মটর ভাজা পড়িয়া আছে। অপরাহ্ণে ইহাই চর্ব্বণ করিয়া তিনি চা পান সমাপ্ত করেন। তাঁহার দিকে আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া মনে হইল—যেন তিনি অনেক শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছেন। চন্দননগরে তাঁহার যে শ্রী দেখিয়াছিলাম, এখানে যেন সে কান্তি বহু পরিমাণে ম্লান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষের দীপ্তি মনে হইল আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি আমার অন্তস্তল ভেদ করিয়া যেন প্রসারিত দৃষ্টিতে সাধনার অবস্থার কথা জানিয়া লইলেন। তার পর বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্মের সকল বিষয়ও

অবগত হইলেন। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, "প্রতিদিন এখানে আসা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে। তোমাকে বাংলায় ফিরিয়া অনেক কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। সপ্তাহে দুই দিন মাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবারে আবার আসিও, অনেক কথা হইবে।"

আমি তাঁহার তৎকালীন অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি নীচে নামিবামাত্র বন্ধুদের হাস্যরবে সব যেন মুখরিত হইল। সুরেশের খেচরান্ন রন্ধন শেষ হইয়াছে। সে হাঁড়ীর কানা ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সৌরীন্দ্র বলিলেন, "নারীর বেশে আপনি যে পরিমাণে নিরাপদে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই অবস্থায় তাহা যদি পুলিসের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহারা আপনার অনুসরণ করিবে এবং আপনাকে পণ্ডিচারীতে থাকিয়া যাইতে হইবে। তিনি আপনাকে গোপন পথেই প্রস্থান করিতে বলিয়াছেন।" নলিনী ও সৌরীন্দ্র আমাকে গোপন পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা একটি গাল পথ। এই দিকটা অন্য লোকের বাড়ীর প্রাচীরে রুদ্ধ হইয়াছে। সেই গৃহের আবর্জনারাশি এইখানেই নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে সোজা পথে উঠা যায়। সৌরীনের কথামত আমি এই গোপন পথ দিয়া বাহির হইলাম এবং নিরাপদে রাজাপুলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময়ে সৌরীন্দ্র বলিয়া দিয়াছিলেন—মধ্যাহ্নে ওঙ্গলের নিকট কোম্পানীর বাগানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য। আমি যথাসময়ে বাহির হইলাম। কোম্পানীর বাগানে গিয়া সৌরীন্দ্রের মুখে তাহাদের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে অবগত হইলাম। সৌরীন্দ্র বলিলেন, "মাদ্রাজের ধনী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-কোন এক ভদ্রলোকের সাহায্য এক বৎসরের জন্য এই কয়েকটি প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে, তাহার পর যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাহায্যে আর তেমন ভাবে মিলে নাই। যৎসামান্য যাহা কিছু তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা একবেলা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিতে পারি। এই বিষয়ে আপনি কি করিতে পারেন আমাদের জানাইয়া যাইবেন।"

আমি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সঙ্গিগণের জীবনোপায় নির্দ্ধারণের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। সৌরীন্দ্রকে বলিলাম, "চন্দননগরে গিয়াই আমি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিব। এই বিষয়ে আমরা এতদিন নীরব ছিলাম। ইহাই আমাদের লজ্জার বিষয়। বাংলার কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দ বিদেশে আসিয়া কিভাবে আছেন, ইহার খবর আমরা রাখি নাই। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।" এদিকে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সেই গোপন পথেই আমি শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা দুই-চারি দিনেই শেষ হইল। তার পর অধ্যাত্মসাধনার কথাই সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার মুখে অনর্গল বাহির হইল। আমি কান পাতিয়া তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। হঠযোগ, রাজযোগ, তন্ত্র, সহজিয়া—সকল সাধনার উপরে তাঁহার মুখে গীতার "আত্মসমর্পণ-যোগ" মন্ত্রে আমার চিত্ত আলোকিত হইল। "You need not do Asan and Pranayam"—তাঁহার কথায় আসন, প্রাণায়াম দূর হইয়াছে। তাঁর দেওয়া ত্রিমন্ত্র জপের সহিত "ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই শ্লোকটিও আমার জপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। "হৃষীকেশ" বলিতে তখন নিত্য শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আমি আর কাহাকেও মনে করিতে পরিতাম না। খাইতাম, শুইতাম তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া। অতি সঙ্কটময় কর্ম্মে আগুয়ান হইতাম এই প্রত্যক্ষ হৃষীকেশেরই আদেশে। রোগ হইলে এই হৃষীকেশকেই অনুসরণ করিতাম। বিদায়-কালে আমার কথা তিনি মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিলেন। তার পরে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমার সাধনার নির্দ্দেশ ইহা হইতে আরও বিশদরূপে পাইবে। পূর্ব্বে যে সাধনার কথা টাইপ করিয়া তোমায় পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আমার নিজের নহে। আমি ধ্যানযোগে রাজা রামমোহন রায়ের বাণী যেমনভাবে পাইয়াছিলাম, তদনুরূপ উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর এই লেখাগুলি আমার নিজেরই উপলব্ধির কথা। তুমি ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।"

আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার টাইপ করা কাগজগুলির মাথায় "Yoga and its object"—এই শিরোনামা লিখিত। এই গ্রন্থই "লীলা" নামে গ্রন্থাকারে আমি বাংলায় তাঁহার প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার প্রথম পুস্তকখানিও যৌগিক সাধন নামে বাংলায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আমি অনেক রাষ্ট্রনীতিক নির্দ্দেশ এবং সাধন-রহস্যের কথা বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। কিছুদিন পরেই তিনি পত্রযোগে জানাইলেন—"Situation just now is that we have Re. ½ or so in hand." অর্থাৎ, অবস্থা এক্ষণে এমন হইয়াছে যে আমাদের হাতে মাত্র আট আনা পয়সা আছে।

আমি আসিবার সময়ে কয়েকটি টাকা সৌরীন্দ্রের

হাতে দিয়া আসিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ সেই টাকায় কয়েক দিন চলার পর শ্রীঅরবিন্দ এমনই ভাবে অভাব-রাক্ষসীর তাড়নায় ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়া আমার চক্ষে জল আসিল। এই সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা চেয়ারের কারবার হিসাবে ছিল। তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা লইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় জানাইলেন—"I must ask you to procure for me by Will Power or any other power in heaven or in earth"। অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে চাহিতেছি যেমন করিয়া পার আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ কর। তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই হউক অথবা স্বর্গের বা মর্ত্ত্যের যে শক্তির সাহায্যেই পার, অর্থ আমার জন্য প্রেরণ কর।"

আমি বিহ্বলচিত্ত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার নিষ্ফল হয় নাই। আমি যে তাঁহার কত আপনার ইহা জানিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ দাবি তিনি আমার উপর করিতে পারিয়াছিলেন। সাধনার ইতিহাসে এই তত্ত্বের মূল্য শুধু আমার কাছে অনেকখানি নহে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে এই দাবির তাৎপর্য্য কতখানি শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া আমি কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিহ্বল হই।

অতঃপর চন্দননগর হইতে যথারীতি তাঁহার জীবনযাপনের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। পরবর্ত্তী সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় তাঁহার পত্রাদির মারফতই কিছু কিছু শুনাইবার প্রয়াস পাইব। ইহা ভারতাত্মার বাণী। ভারত-সংস্কৃতির অসাধারণ ঐতিহ্যের এই অধ্যায়টুকু না জানিলে যেমন শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যময় মহাজীবনের একটি অংশ অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে, তেমনি ভারতের জাতীয় সাধনায় তাঁর সুগভীর অবদানেরও অনেকখানি মর্ম্ম-পরিচয় অপ্রকাশিত থাকিবে।

খুন

কৃষণ দাস

অনুবাদক—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

টিনের পর্দা আঁটা লোহার গেটটার ওপাশে ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে। মানুষ জমছে কাতারে কাতারে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু এক দঙ্গল কালো মাথার অরণ্য।

মাঝখানে গেট, দু'পাশে লম্বা উঁচু পাঁচিল। যেন কোন মফস্বলের জেলখানা। উঁকি দিয়েও দেখবার জো নেই এদিকে কি আছে না আছে, কিই-বা হচ্ছে না হচ্ছে। মধ্যের উঠানের এক পাশে সখের টবের ফুলগাছগুলোর আড়ালে কি একটা চট-ঢাকা পড়ে আছে।

ভর-দুপুরে কাল্লুর ভয়ঙ্কর গর্জনে চার পাশ শিউরে উঠেছিল। কিছুক্ষণ বাদে আর কোন আওয়াজ না পেয়ে যেন কিসের খোঁজে কালো মাথার ভিড় তখন সবে একে একে এগিয়ে আসছিল। অদ্ভুত এক আদিম অনুভূতির আকর্ষণে গেটের সামনে ওরা থমকে দাঁড়াতে লাগল। চোখ টান করে মাথা তুলে এ ওর ঘাড়ে প্রায় লাফিয়ে পড়ে কি খুঁজছিল নাক টেনে টেনে। হাতগুলো সব অদ্ভুত লম্বা—কেমন মাটির দিকে ঝুলে সটান হয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ সারা বাড়ীর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বললে বীরেশ। নিজে অনেক সামলে আলিগড়ের তালা হাতে এগিয়ে গেল গেটের কাছে। তালায় চাবি লাগিয়ে পেছনের পাঁচিলের চোরা-দরজা দিয়ে যখন পিঠ কুঁজো করে গলে বেরুতে গেল—অমনই সারা শরীর অজানা আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে উঠল।

দীনু চাকরটা কাল্লুকে আগেভাগেই পার করে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শক্ত শিকল হাতে ধরে। কাল্লুও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, প্রভুকে দেখে তার আনন্দ প্রকাশের ডাকগুলোও আর গলা দিয়ে বেরুল না। বিষৎপ্রমাণ লকলকে লোভাতুর জিভটাও যেন পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে; চোখজোড়ায় আশ্চর্য্য নীরবতার ছায়া।

দীনু বললে—দাদাবাবু, পাশের গলিতে ট্যাক্সি ডেকে রেখেছে ক্যাস্ত ঝি, সরে পড়েন শীগগির।

—তুই কোথায় চললি।—গলা কেঁপে উঠল বীরেশের।

—দেখে আসি, মেজ মা দরজাগুলো ভাল করে এঁটেছেন কি না।—দ্বিতীয় কথার আগেই ধ্যামুক্ত তীরের মত ছুটল দীনু। পেছনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে অনুমান করলে ভেতর থেকে খিল ভাল রকমেই আঁটা আছে। ঐখানেই দাঁড়িয়ে ডেকে বললে—মেজ মা, বাবুকে কোন করেই আসছি, দরজা যেন কারও কথায় খুলো না।—বলেই দীনু পগারপার।

ভেতরের সাড়ার প্রতীক্ষা না করে দীনু যেমন সরে পড়ল,

ভেতর থেকেও তেমনই সাড়া এল না। তার কথা কারও কানে গেল কিনা তাও বুঝবার জো রইল না।

মাবের ঘরে কণিকা শিউরে শিউরে উঠছিল। দেয়াল ঠেস দিয়ে নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছিল। উপরে নীচে, চার পাশে নিশ্ছিদ্র পাকা ইঁটের মজবুত আশ্রয় অবলম্বনেও যেন তার স্বস্তি ছিল না। ভীতিগ্রস্ত দুশ্চিন্তায় সে সারা হয়ে যাচ্ছিল। একি সর্ব্বনাশ, কালুটা কি করে বসল।

কণিকা ভাবতে পারে না—এমনও ঘটাতে পারে কুকুরে। হোক্ বিলেতী কুকুর, ডাকবি ডাক, চোর-ডাকাত তাড়া কর যত ইচ্ছে। দিন-দুপুরে কি সাংঘাতিক কাণ্ড এ। কণিকার চোখের উপরে ঘটনাটা এখনও ভাসছে,—টেবিলে বসে সে আর বীরেশ খাচ্ছিল। বৌদি-ঠাকুরপোতে আলোচনা হচ্ছিল কাল রাত্রের সিনেমায় যাওয়া নিয়ে। অকস্মাৎ সেই বজ্র-গর্জ্জন আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভেদী আর্ত্তনাদ উঠতে না উঠতেই খাবার-ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলোও যেন চমকে লাফিয়ে উঠল। এঁটো হাতেই ছুটে দেবরের পেছনে পেছনে বাইরে যেতেই দেখলে—চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা একটা বিকৃত মুখ, ক্ষীণ দেহের সরু গলা, দু'পাটি দাঁতালো সাঁড়াশির চাপে শেষ পর্য্যন্ত কেটে বসে গেছে। মুঠো খোলা শির বেরুনো হাতের ফাঁকে দানা দানা এক দলা ভাত—মাংসের টুকরোটা পাশে গড়াচ্ছে। প্রচণ্ড আকস্মিকতার আঘাতে কণিকার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। প্রায়-চেতনালুপ্ত হতভম্ব বীরেশও যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সহসা সে ধাক্কা দিলে বীরেশকে, বললে—দেখছ কি ঠাকুরপো, ছাড়াও।

ততক্ষণে দীনু চাকরটা এসে পড়েছে ছুটতে ছুটতে। আয়া হাঁকাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ভাগ্যিস কেউ ঘরে নেই—সবাই স্কুলে গেছে।

এখনও রক্তে রক্তে যেন ধাক্কা লাগছে। ভাতগুলোর সেই চেহারা। কেবল কোনপ্রকারে হাত দিয়ে ধরেছিল ভিখারী বুড়ী। জোগে এল না, সঙ্গে সঙ্গেই—।

পাশে কি একটা গা ছুঁয়ে যেতেই কণিকার যেন চকিতে শরীরের দোলা থেমে গেল। ও যেন গিয়েও গেল না। গায়ে গায়ে লেগে রইল। নিশ্ছিদ্র কপাট-আঁটা অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না, কিংবা হয়ত মানসিক উত্তেজনায় চোখের কেমন জড়তা এসে পড়েছিল; তার পাশ ঘুরে যে দেখবে সে মনেই হ'ল না। তাই কিছুক্ষণ নিস্পন্দ অন্ধের মত কাটাতে লাগল। তারপর কখন সে শুধু অনুমান করলে—এ ছোঁয়া মানুষের। কিন্তু কি ভীষণ ঠাণ্ডা!

—দিদি নাকি? বীরেশের দূরা বোন ছাড়া এমন ঠাণ্ডা রক্ত এ বাড়ীর আর কার হবে। কিন্তু কোন উত্তর এল না। আরও ঘেঁষে এল যেন সেই শীতাতুর স্পর্শ।

—আয়া নাকি?—আবার অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে কণিকা।

—আয়া নেই।—গলা কাশল খুব করে, যেন আরও কি বলতে চাইছে কিন্তু গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না।

বাইরের কালো মাথায় ঐ অরণ্য এখন দূর থেকে দেখাচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর। একটা অগ্নিকাণ্ডের পরে আধ-পোড়া অঙ্গারের স্তূপ যেন জুড়ে পড়ে রয়েছে পথের ঐখানটায়।

দিদিকে পাশে পেয়ে সাহস আস ছ কণিকার বক্ষে। আগাগোড়া ঘটনার ছবিটা আবার মনের পর্দায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। জেগে উঠছে স্মৃতিতে :

কত করে গেটে রোজ তালা দিতে বলে আসছে; সে কি আজ থেকে, কালুকে আনা অবধি বলছে—দ্যাখ ঠাকুরপো, ও কুকুরকে বিশ্বাস নেই, ওর যা আওয়াজ, ওর হুঙ্কারে তোমার দাদারই ভয় করে! কি জানি কবে কাকে কামড়ে বসবে, হাঙ্গামায় পড়তে হবে। তার চেয়ে গেটে তালা লাগাও—অপরিচিত কেউ আসতে চায়, অপেক্ষা করবে। দীনু তালা খুলে দিলে তবে না হয় আসবে। একটুখানি অপেক্ষা করলে সে তোমার বে না—কিন্তু কালু কামড়ালে জেল-হাজতও ত হতে পারে। কেবল তোমাকেই ত নয়—তোমার দাদাকেও নিয়ে টান না পড়ে ত কি বলেছি।—সেই তালা শেষ পর্য্যন্ত লাগালেই এক দিন আগে লাগালে কি এমন ক্ষতি হ'ত। রোজই ত দেখছে ঠাকুরপো, ভিখিরী বুড়ী গেটটার কাছে জবুথবু হয়ে বসে থাকে —ওর কি তেমন নড়ার সাধ্য আছে। না হয় বুড়ীকে তাড়া, তবে ত নিশ্চিন্দি! ও কথা বললেই ঠাকুরপোর অমনি গলা-বাজি—থাক না বসে বৌদি, তোমার অত মাথাব্যথা কিসের। হ'ল ত এখন।

ঠাকুরপোর কি কিছু কম শয়তানি, অন্তরে বলে উঠল কণিকা। কতকাল লক্ষ্য করেছে—কালুকে খাবার দিলেই বুড়ী মাটিতে শুয়ে কি করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। তলার ওই ফাঁকটুকু দিয়েই যা একটু-আধটু দেখা যায় কালু খাচ্ছে! ওকি এমনি তাকায়, তাকায় ওর পেটের জ্বালায়। পেটের যে কি জ্বালা সে ত দাদা-বৌদির দৌলতে ঠাকুরপো বুঝলে না।

—ও বউ গেট নড়ছে যেন—দীনু গেল কোথায়?

—আর জালিও না দিদি, তুমি যেন কিছু জান না—দীনু গেল কোথায়?—বিকৃত কণ্ঠে কণিকা যেন নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে চাইল।

—মিছে রাগ করিস, আমি কেমন করে জানব, জিজ্ঞেস করলেও বলবি—জ্বালাতন।

ঝগড়া করতে চায় নাকি বীরেশের বিধবা দূরা বোন। কণিকা সামলে নেয়। চার পাশে যেন অদৃশ্য বিপদ তার দিয়ে আসছে। না হলে আশ্রিতাও সামান্য কথায় এমনি ভাবে

টে। অন্তরে অন্তরে গুম হয়ে যায় সে—তার অতগুলো ছেলেমেয়ে, ওই অমন স্বামী, ওদের ভবিষ্যৎ।

নিজের মনের অনুমান যাচাই করে নিতে বুবা আবার লে ওঠে—কেমন যেন আওয়াজ পাচ্ছিস না···ওই ওই যেন ক ঠেলছে।

—রেহাই দাও দিদি, ঠেলে ও গেট ভাঙবে কে শুনি। কণিকার চোখের সামনে মাথা তুলেছে এক প্রচণ্ড বাধা— লোহার গেট, মাথার ওপরে দেড় হাত উঁচু পাঁচিল, ভাঙা কাঁচ আর ছুঁচালো লোহার পেরেক পোঁতা। তা ছাড়া ওরা কি জানতে পেরেছে, বুড়ী ভিখারিণীকে মেরে ফেলেছে কানু। কমন করে জানবে। দেখতে পাবে কি করে। এক গাছে উঠে। কিন্তু ফুলের টবের আড়ালে বুড়ীকে এমন করে ঢাকা দিয়েছে দীনু। এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। ঝুলে-পড়া চামড়ার তলায় ঐ মরা হাড়ে রক্ত আসবেই বা কোথেকে। মনে মনে অনেক যুক্তির অবতারণা করে কণিকা।

গেটের ওপাশে স্তব্ধতা কেটে যেতে চাইছে যেন।

ওদিকে দীনু ছুটে চলেছে। সে কোন করার কথা ভুলে গিয়েই ছুটছে। তার আগে-পাছে কারা যেন আসছে। ভীষণ ঝড়-বন্যার পূর্ব্ব-মুহূর্তের মত ওদের চেহারায় যেন প্রলয়ের আভাস থমথম করছে।

ধীরেশের চেম্বারে গিয়ে ধপাস করে দীনু মেঝের ওপরে বসে পড়ল। পা দিয়ে তার কালঘাম ছুটছে। চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ যেন বেরিয়ে আসছে, হাড় কাঁপছে ঠক ঠক করে।

—কি রে, তোর এমন চেহারা কেন?

উত্তর দিতে পারে না দীনু। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

বিরক্ত হয় ধীরেশ। বেরুবার মুখে যেন এক আপদ এসে জুটল। সে চীৎকার করে উঠল—কি হয়েছে বলতে পারছিস না হতভাগা।

জড়িত কণ্ঠে এবারে বলতে লাগল দীনু—আজ্ঞে···সেই ভিখিরী বুড়ী···কেমন করে গেট দিয়ে ঢুকে—

ধীরেশ হুকার দিয়ে বললে—চুরি করেছে ত।

—আজ্ঞে না···। আজ্ঞে, কানুর খাবারে হাত দিয়েছিল···। কানু কামড়ে দিয়েছে।

—বেশ করেছে!

—আজ্ঞে···বুড়ী মরে গেছে···সঙ্গে সঙ্গে।

অধৈর্য্য হয়ে ধীরেশ চীৎকার ছাড়ল—বুড়ী মরেছে—তা কাঁদছিস কেন?

—বাবু।—কথা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল দীনু। কেমন করে বলবে সে—দাদাবাবু ভিখিরিণী বুড়ীকে পুলিসে দিতে চেয়েছে—ও তাকে পায়ে পড়ে নিরস্ত করেছে। কেমন করে প্রকাশ করবে—কেন ঐ বুড়ীমা তার শহরের সকল বাড়ী ছেড়ে দীনু চাকরের মনিবের বাড়ীর গেটে পড়ে থাকে। বাবু মোটরে হর্ণ দিলেও কেন সরে না। ভিখারিণী কেবল তাকায় ক্যাল ক্যাল করে—কেন দাদাবাবুদের কাছে হাত পেতে ও পয়সা চায় না। কেউ জানে না; সেই আকাল থেকে সে কালা, সে বোবা···একমাত্র দীনু ছাড়া। তার চোখ কেটে চৌচির হতে চাইছে, এখনই বুঝি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে তীরের মত।

ধীরেশ উন্মাদের মত কি যেন বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ দীনুর উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। ওর চোখে যেন হিংস্রতা জ্বলছে।

আত্মরক্ষার জন্যে নিজেকে মুহূর্তে প্রস্তুত করে নিলে ধীরেশ। হয়ত এর কোন প্রয়োজনই ছিল না—দুর্ভিক্ষের বছরে মুঠো মুঠো ভাত দিয়ে কিনে নেওয়া চাকর বৈ ত নয়। তবু বিশ্বাস নেই—দু' বেলা পেট ভোর খেয়ে খেয়ে সেদিনকার জীর্ণ দেহ লোকটা জোয়ান হয়ে উঠেছে।

দীনুর রক্তলোলুপ দৃষ্টি আগুন হয়ে উঠল। প্রাণপণে চীৎকার করে সে কি বলতে চাইছিল। কিন্তু—'ও মা', বলতেই বিকট এক আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ গড়িয়ে পড়ল।

প্রচণ্ড এক ভয়ের শিহরণ আচ্ছন্ন করে ফেলল ধীরেশকে —যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই ভয়ঙ্কর।

ভূমি-সেনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রে "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হইবে। গত ২৪শে জুলাই হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হইয়াছিল। তৎপর ৫ই আগষ্ট কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

আঁটপুরে নবগঠিত ভূমি-সেনা দলকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পাটগাছের পোকার আক্রমণ নিবারণের জন্য ঔষধ ছিটানো দেখাইতেছেন

মহাশয়ের কলিকাতার আবাসে ভূমি-সেনার দ্বিতীয় দল গঠিত হয়। এই দলে কলিকাতাবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) যোগদান করেন। তৃতীয় দল গঠিত হয় ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে, কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে অবস্থিত শ্যামবাজার টেনিস ক্লাবে। প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই দলে যোগদান করেন। গত ২৫শে আগষ্ট বর্দ্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বর্দ্ধমান জেলার প্রথম "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হয়। এই উৎসব খুবই আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য-সচিব মাননীয় শ্রী কে. এম. মুন্সী, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কৃষি ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রম-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, সেচ-মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, স্বায়ত্ত-শাসন-মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন।

গত ২৬শে আগষ্ট হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামেও এক-দল ভূমি-সেনা গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অদ্যাবধি আর কোন স্থানে ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা জানি না। খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক ভাষণে বলিয়াছিলেন "প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলায় এই 'ভূমি-সেনাদল' কৃষি-অধিকর্ত্তার নির্দ্দেশে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে। খুবই আশা হয় যে, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায় অচিরেই আমরা জয়যুক্ত হব ; পন্থা যতই বন্ধুর হোক্ না কেন, লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পৌঁছবই। আজ কৃষির এই দুর্দ্দিনে দেশে চাই ভূমি-সেনা। বিবেকানন্দের দেশে ত্যাগী ও কর্ম্মীর অভাব হয় নি। আজও আশা করি স্বেচ্ছাসেবকের অভাব দেশে হবে না।"

মন্ত্রীমহাশয়ের ভাষণ অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলায় ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা, কিংবা গঠনের চেষ্টা হইতেছে কিনা তাহাও অবগত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে কৃষি ও খাদ্যসচিব মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পল্লী অঞ্চলে যদি "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হয় এবং সেই দলে যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের প্রকৃত কর্ম্মী যোগদান করেন তাহা হইলে সরকারী কৃষিবিভাগের পক্ষে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের ২৫শে আগষ্টের অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

সহায়তা লাভ করা সম্ভব হইবে। তবে ভূমি-সেনাদলকে সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রেরণা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু সেইরূপ শিক্ষা এবং প্রেরণা দিবার ও পরিচালনা করিবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া

মনে হয় না। আঁটপুরে ও কলিকাতায় যে "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত আমি কিয়ৎপরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং ভূমি-সেনাদলের কর্ম্মীরা যাহাতে অতি সত্বর শিক্ষা পায় ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্ত্তার নিকট পত্রও লিখিয়াছিলাম, মৌখিক আলোচনাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দপ্তর হইতে কোন নির্দ্দেশ আসে নাই, "ভূমি-সেনাদলের" গঠন, শিক্ষা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়মাবলী আজ পর্য্যন্ত কোন স্থানে পৌঁছায় নাই। দুঃখের বিষয়, কয়েক মাস হইল আঁটপুরে প্রথম "ভূমি-সেনাদল" গঠিত হইয়াছে, তাহারা 'ব্যাজ' ও কোদাল পাইয়াছে—কিন্তু কোদালের 'সদ্ব্যবহার' হইতেছে কিনা কেহই দেখিবার নাই। এই কারণে অনেকেই বলিতেছেন, ভূমি-সেনা গঠন একটা "হুজুগ" মাত্র। কিন্তু

বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে নবগঠিত ভূমি-সেনার দল

বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে সাঁওতাল রমণীগণের ভূমি-সেনা দলে যোগদান

বাস্তবিক পক্ষে সুগঠিত ও সুপরিচালিত ভূমি-সেনাদলের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত পল্লী-অঞ্চলের অন্যবিধ উন্নতিও সম্ভবপর। ইহাদের সাহায্যে পল্লী-অঞ্চল বহুলাংশে সমৃদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের এক ভাষণ হইতে ভূমি-সেনাদলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। তিনি বলেন, "দেশসেবার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই ভূমি-সৈনিকদল গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায়, প্রতি জেলায় নিয়ে যাবে আশা ও কর্ম্মের বাণী—খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে করবে সাহায্য। ভূমি-সেনা-বাহিনী শুধু যে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করবে বা কৃষিযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার করবে তাই নয়, এরা উদ্ভব করবে কৃষিকার্য্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি, যার অভাবে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজীবী থাকতেও দেশবাসীর খাদ্যের সঙ্কুলান হয় নাই, তাই ভূমি-সেনার কাজ হবে কৃষকের কৃতিত্ব বৃদ্ধি করা—কৃষক-সংখ্যা বাড়িয়ে তোলানয়, উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করা, শুধু পরিকল্পনা করা নয়। অনেক স্কুল-কলেজে যেমন নেশন্যাল ক্যাডেট কোর রয়েছে সেই রকম ল্যাণ্ড এগ্রিকালচারিষ্ট কোর-এর প্রবর্ত্তন করা দরকার। এই দলভুক্ত ভূমি-সেনারাই ত দেশবাসীকে সচেতন করে তুলবে কৃষিকে উন্নততর ভিত্তিতে স্থাপন করতে, তাদের শিক্ষিত রুচি নিয়ে করবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের সাধনা, তারা জাগিয়ে তুলবে দেশের মাঝে কায়িক শ্রমের

মর্য্যাদাবোধ। এরা শিক্ষার আলোক তুলে ধরে দূর করবে সংস্কারের অন্ধকার, সমবায় পদ্ধতিতে গঠনমূলক কাজ করে

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে সাটিকা আউশ ধান

দেশকে জানাবে তার উৎকর্ষ, এমনিভাবে একযোগে দেশের কৃষি, পশু-পালন, সেচ-ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজ করে দেশের এক সর্ব্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি এনে দেবে। দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কৃষির উৎকর্ষমূলক অনেক তথ্য

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ভূমি-সেনাগণ কর্ত্তৃক কম্পোষ্ট প্রস্তুত

আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু গবেষণাগারে উদ্ভূত কর্ম্ম-পদ্ধতির সঙ্গে চাষীর যোগাযোগ সব সময়ে ঘটে ওঠে না। গবেষণালব্ধ ফলের সুবিধা কৃষিজীবীরা ষোল আনা গ্রহণ করে শস্যোৎপাদনে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হতে পারবেন না। আমাদের ভূমি-সেনাদল এই যোগাযোগ রক্ষা করে উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী প্রবর্ত্তনে চাষীদের সাহায্য করবেন। তাঁদের এই কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কৃষি-বিভাগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যথাযথ শিক্ষাদান করবেন। যে সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করে ভূমি-সেনাবাহিনী কাজে অগ্রসর হবে সেগুলো হচ্ছে (১) বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্য্যা, (২) আবর্জ্জনা-সার তৈয়ারী করা, (৩) শাক-সব্জীর চাষ, (৪) ফসলের রোগ ও কীট শত্রু-দমন, (৫) গবাদি পশুর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও উন্নতি-বিধান, (৬) আগাছা দমন, (৭) সম্ভবমত সমবায়-পদ্ধতিতে চাষবাসের সম্প্রসারণ, (৮) ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকরীকরণ, (৯) মাছের চাষ বাড়ানো, (১০) শস্যের ফলন বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সংগঠন, (১১) উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির উপায় প্রভৃতি।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ
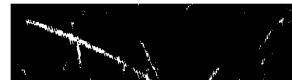
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে সাটিকা আউশ ধান

যে-কোনও লোক এই ভূমিবাহিনীতে যোগদান করতে পারবেন। যে-কোন বিভাগভবনের ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সদস্য হতে পারবেন। স্কুল-কলেজের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সেই অবসরে এক একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাষবাসের অনেক সহায়তা করতে পারেন। দেশের মাটি ও দেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় নিজেদের

জ্ঞানবৃদ্ধির দিক ছাড়াও আর পাঁচ জনকে এতে সহজেই নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলা যায়। গ্রামে বা শহরতলীতে যেখানে স্থানাভাব নেই, সেই সব অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ছুটির অবসরে শাকসব্জী ও ফলের চাষ আরম্ভ করে খাদ্যসমস্যা সমাধানে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার শহরবাসী ছেলে-মেয়েরা এইভাবেই দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন করে তাদের মাঝে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা করে থাকে।"

কৃষি ও খাদ্য-সচিবের ভাষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুগঠিত ও সুপরিচালিত ভূমি-সেনাদলের উপর পল্লী-অঞ্চলের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু কৃষি ও খাদ্য-সচিবের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে ভূমি-সেনাদলের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তাহা তাঁহার বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে পল্লী-অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন স্ব স্ব এলাকায় "ভূমি-সেনা" গঠনের চেষ্টা করেন। পল্লী অঞ্চলে বহু যুবক কর্ম্মের অভাবে আলস্যে দিনাতিপাত করিতেছেন; তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইলে অনেক দিকেই দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। নেতৃত্বের অভাবেই আজ পল্লী অঞ্চলের চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। সকল কাজেই সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে দেশ কস্মিনকালেও উন্নত হইবে না। অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমীচীন নহে।

সে দিন

শ্রীকালিদাস রায়

সে দিন গিয়েছে চলে ফিরিবে না আর,
দীনতার আবরণে সে প্রভুলতার।
কম বটে ছিল আয় ছিনু সুখে তাতে তায়,
ছিল না খাদ্যের খায় এত কারবার।

পদে পদে আইনের ছিল না বাঁধন,
দাম দিয়ে ছিল নাকো সাধ্যসাধন,
জিনিস কিনিতে যেয়ে তখন দেখিনি চেয়ে,
হ'ত না দালদা দিয়ে দুবেলা রাঁধন।

ট্রেণে ট্রামে পথে ঘাটে ছিল নাকো ভিড়,
ছিল না বাহার এত রঙিন শাড়ীর।
মেয়েরা ছাড়েনি লাজ ধরেনি ময়ূরী সাজ,
অকারণে হ'ত নাকো বাড়ীর বাহির।

মানুষ হয়নি এত ধর্ম্মবিমুখ,
কবিতার রসপানে ছিল উৎসুক।
আকাশে আছিল রবি আলোকিত ছিল সবি,
ছিল দেশে রসিকতা হাসি-কৌতুক।

কাব্যে ছন্দ ছিল ভক্তি গানে,
কর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল স্ফূর্ত্তি প্রাণে।
ছিল না সিনেমা মোহ প্রমোদের সমারোহ,
কালো বাজারের নাম শুনিনি কানে।

যুবারা পাজামা নয়, পরিত ধুতি,
ছিল না তাদের কোন সখী বা দূতী।
পথে রথে এত ছবি দিত না ঢালিয়া হবি
তাহাদের মোহানলে নিতি আহুতি।

সার্ব্বজনীন পূজা, ঢোলের মাঝে
ছিল না এ বাড়াবাড়ি ভাইয়ে বাঝে।
অভিনেতা ক্রীড়াবীর ছিল না দেবতা পীর।
তুচ্ছে দিত না কেউ উচ্চদামে।

বাধেনি লড়াই হিঁদু-মুসলমানে,
মেঘনা মুখর ছিল ভেটেলী গানে।
বিহারী উড়িয়া যারা পর ছিল নাকো তারা,
বাঙালীই ছিল প্রভু সকলখানে।

ভাড়াটিয়া হয়নিকো বাড়ীর মালিক,
ভাড়াত না বাসা হতে শুকেরে সালিক।
কুমীর হয়নি ঢেঁকি, চলিত না এত মেকি।
চোখ রাঙাত না এত জালিক হালিক।

সে দিন গিয়েছে চ'লে ফিরিবে না আর।
নাই সেই সুখময় শুভ সংসার।
বক্ষে পাষাণ দলি' ইংরাজ গেছে চলি'
রেখে গেছে তার সেই ভুয়ো কাড়্চার।

ভীলজাতির মুক্তিসাধক মোতীলাল তেজাবৎ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১

ভীলরা ভারতের এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন জাতি। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে এই আদিম জাতির কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে যিনি ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতেন সেই একলব্য ছিলেন ভীলজাতীয়। গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠদানের কাহিনী স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভীলদের বীরত্ব সাহস ও দেশপ্রেম অতুলনীয়। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রাজপুত রাণাদের আমল পর্য্যন্ত এদের বহু বীরত্ব-কাহিনীর সহিত আমরা পরিচিত আছি।
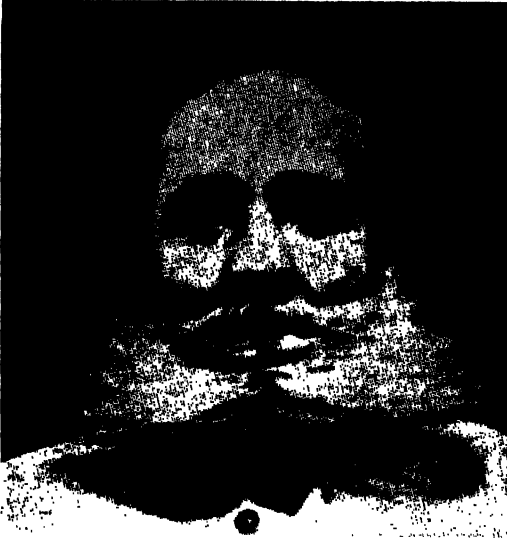
ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবৎ

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রাণা প্রতাপ যেদিন মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন রাজপুতানার আদিবাসী ভীলরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল—রাণার চরম দুর্দ্দিনেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। সেদিন এই আদিম জাতির লোকেরা যে বীরত্ব, ত্যাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান থাকবে।

রাণা প্রতাপের সঙ্গে ভীলদের সম্পর্কের কথাই শুধু সাধারণের জানা আছে। কিন্তু রাজপুত জাতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকাল থেকে ভীলরা কত ভাবে যে তাঁদের সহযোগিতা করেছে তার আর অন্ত নেই। কথিত আছে, যে, রাজপুত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপা রাবলকে মাত্র তিন বৎসর বয়সের সময় ভীলরা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রতি-পালন করে। পরে যথাসময়ে তারাই তাঁকে সিংহাসনে বসায়। ছেলেবেলায় দেবা আর বালিয়া নামে দু'জন ভীল এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করত।*

ভীলজাতির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এদের স্বাধীনতা-প্রীতির উল্লেখ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভীলদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেইজন্যেই আধুনিককালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহ্বানে ভীলজাতির চিত্ত সহজেই সাড়া দিয়েছে। গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভীলরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করে অবর্ণনীয় দুঃখযন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছে, দলে দলে পুলিসের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে। দুঃখের বিষয়, তাদের সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই।

ভীলরা ভারতের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভীলসম্প্রদায়ের মধ্যে বীর দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল রাজস্থানের ভীলদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করব—তাও অত্যন্ত সংক্ষেপে।

আধুনিক কালে ডুঙ্গরপুরের ভীলদের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীশিবলালজী কোঠারিয়া তাঁর ডুঙ্গরপুর রাজ্যের ইতিহাসে+ বলেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে গোবিন্দ গুরু নামক জনৈক সাধুর নেতৃত্বে 'ভীল-সুধার' আন্দোলন সুরু হয়। তিনি স্বজাতীয়দের ধর্ম্মীয় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যখন জাতির মধ্যে জাগরণের সূচনা দেখা দিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে তাঁরা হলেন বদ্ধপরিকর।

কিছুকাল পরে একদিন বানসবড়ের মহাডী নামক স্থানে প্রায় সমগ্র বাগড় (ডুঙ্গরপুর, বাঁশবাড়া আর দক্ষিণ মেবাড়) অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভীল কোনো উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হলে, উপরোক্ত তিনটি স্থানের পল্টনের সৈন্য আমদানী

---

* হমারি আদিম জাতিয়াঁ—শ্রীঅখিল বিনয়, পৃ. ১১২

+ ডুঙ্গরপুর : এক সিংহাবলোকন

করে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হ'ল। এই গুলি চালনার ফলে প্রায় আট শ' লোক মারা গেল, বহু লোক হ'ল আহত। এই প্রকার নৃশংস আচরণ দ্বারা শাসক-সম্প্রদায় সাময়িক ভাবে ভীলদের আন্দোলনের গতিরোধ করতে সক্ষম হলেন।

১৮৯৪ সনে ডুঙ্গরপুরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক রিজেন্সী কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর এই রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে এক নব বিধান প্রবর্তিত হ'ল। এই 'নয়া কানুন' অনুসারে ভীলজাতি এক শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ জাতি (জরায়মপেশা কৌম—Criminal tribe) বলে গণ্য হয়।

প্রস্তরখণ্ডসমূহের বাধা অতিক্রম করে গিরিনির্ঝরিণীর প্রবাহ যেমন সময় সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি মাঝে মাঝে সরকারী বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীল আন্দোলন প্রচণ্ড ভাবে আত্মপ্রকাশ করত, সঙ্গে সঙ্গে সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে সে আন্দোলনের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্তে তৎপর হয়ে উঠতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ব্রিটিশ সরকার ভীলদের উপর পুরোদমে দমননীতি চালিয়েছিলেন। তাঁরা বার বার বহু ভীলকে গ্রেফতার করেছেন, ভীল জননেতাদের নির্ব্বাসিত করেছেন, কোনো কোনো জায়গায় জনতার উপর বিনা নোটিশে করা হয়েছে লাঠি চার্জ্জ, ফলে শত শত লোক আহত হয়েছে। ভীল ভাষায় প্রকাশিত প্রচারপত্র পুস্তিকা ভাষণ এবং বক্তৃতাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে—১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে প্রভাতফেরী হয়েছে নিষিদ্ধ, কোনো কোনো অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে, পুলিসের হস্তে ভীল মহিলারা পর্য্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু এত লাঞ্ছনা অপমান এবং নির্যাতন সত্ত্বেও ভীলজাতি নিজেদের আদর্শে রয়েছে অবিচলিত, তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

২

এই স্বাধীনতাপ্রিয় ভীল জাতির মধ্যে বর্তমান যুগে এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁর আদর্শনিষ্ঠার তুলনা নেই। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য—নাম তাঁর মোতীলাল তেজাবৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি।

১৯৪৩ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে মেবারের তৎকালীন মগরা জেলার এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ভীল-পরিবারে মোতীলালের জন্ম হয়। ইনি মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং হিন্দী ভাষায় মামুলি জ্ঞান অর্জ্জন করেন। কিন্তু নিজের অন্তর থেকে ইনি যে শিক্ষালাভ করেন পুঁথিগত বিদ্যা তার কাছে তুচ্ছ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখেন—দেশপ্রেম এবং মানবতার আদর্শে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জায়গীরদারেরা সকলেই থাকেন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মগ্ন, কিন্তু মোতীলালের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। প্রজাদের উপর জায়গীরদার, তথা সরকারী কর্ম্মচারীদের জুলুমজবরদস্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ করে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল—কি ভাবে দুর্গত প্রজাদের দুঃখমোচন করা যায় তাই হ'ল তাঁর একমাত্র ভাবনা। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম ভীল আন্দোলনের 'বীড়া উঠালেন'।* তিনি বিভিন্ন স্থানে মেলা ও উৎসবাদির আয়োজন করে বক্তৃতাদি দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাদের অপরিসীম অভাব, দৈন্ত এবং দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। 'মেবার পুকার' নামক দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক পুস্তিকা গ্রামে গ্রামে বিতরণ করতে লাগলেন। এই সমস্ত প্রচার-কার্য্যের ফলে অগণিত ভীল নরনারী স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করলে। "মারব না হয় মরব",—এই আদর্শে তারা হয়ে উঠল অনুপ্রাণিত। এমনি ভাবে ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখে জায়গীরদার আর সরকারী কর্ম্মচারীরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। সিরোহী, মেবার আর দাঁতা এই তিনটি অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯২২ সালের ৭ই মার্চ্চ ইডরে বহুসংখ্যক ভীল শহীদ হ'ল।

এই আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে তখন মহাত্মা গান্ধীর তরফ থেকে শ্রীমণিলালজী কোঠারী সিরোহীতে গমন করলেন। মণিলালজীর মধ্যস্থতায় ভীল-নেতা তেজাবৎ আর ব্রিটিশ অফিসার হ্যালিডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষ-রফার ব্যবস্থা হ'ল। হ্যালিডে ভীলদের ন্যায়তঃ দাবি পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় তেজাবৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্রিটিশের চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম হ'ল না—'রাজপুতানা এজেন্সী' বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলেন। ফলে ভীলরা আবার গবর্ণমেণ্টের উপর বিরূপ হয়ে উঠল, আবার তারা মাথা খাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম করলে। এবার

---

* আগেকার দিনে পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কোন দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পানের খিলি তুলে নিয়ে মুখে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একেই বলে বীড়া উঠানো। এর থেকে 'বীড়া উঠানা' কথাটি পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত হয়ে গেছে।

আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্যে সরকার কৃতসঙ্কল্প হলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে যোহেরা ভহলীলে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজ কর্মচারীরা পুনরায় গুলীবর্ষণ করলে—ভুলা আর বলোলিয়া নামে দুটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 'রাজস্থান সেবাসঙ্ঘে'র কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে স্থানীয় লোকেদের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রমুখাৎ এবং অন্যান্য সূত্রে তাঁরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের যে সমস্ত কাহিনী জানতে পারলেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল যে, উক্ত দুটি গ্রামে ৩২৫টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর ১৮০০ লোকের প্রাণহানি হয়েছে, ৬৪০টি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া বা বিনষ্ট করা হয়েছে, ৭০৮৫ মণ খাদ্যসামগ্রী আর ৬০ গাড়ী ঘাস জ্বালানো বা লুঠ করা হয়েছে, নিহত এবং অপহৃত পশুর সংখ্যা ১০৮টি। যে সমস্ত মাল লুণ্ঠন করা বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য ১০,০০০৲ টাকা।

এই অকথ্য অত্যাচার করেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ক্ষান্ত হলেন না, ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্যে তাঁরা মোতীলাল তেজাবৎকে সাত বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মোতীলাল কিন্তু ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যান এবং পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে ধরবার জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। তাঁরা আর এক ব্যক্তিকে মোতীলাল তেজাবৎ মনে করে ধরে নিয়ে এল—ব্রিটিশের ন্যায় বিচারে সে বেচারার হ'ল প্রাণদণ্ড। যাতে ভীলদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় এবং তারা জানতে পারে যে তাদের নেতা আর ইহজগতে নেই, সেই উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্ট সেই ব্যক্তির ছিন্ন মুণ্ড বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করতে লাগলেন।

এবার আর লুকিয়ে থাকা তেজাবতের নিকট সমীচীন বলে মনে হ'ল না—জাতিকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আত্মপ্রকাশ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। ১৯২৯ সালের ৩রা জুন তিনি স্বেচ্ছায় ইডর রিয়াসতের খেডব্রহ্ম নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট ধরা দিলেন। বিচারে তাঁকে সাত বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। উদয়পুর সেণ্ট্রাল জেলে নির্দিষ্টকাল কারাদণ্ড ভোগ করবার পর ১৯৩৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মোতীলাল কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে রইলেন না। ভীলজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। দিনকতক বিশ্রাম করে আবার তিনি নূতন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ১৯৩৮ সালে মেবার প্রজামণ্ডল স্থাপিত হওয়ার পর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, ফলে পুনরায় তাঁর কারাদণ্ড হয়। যথাসময়ে জেল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম বিধাতা এই জননায়কের অদৃষ্টে লেখেন নি। '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় ভীলজাতিও যখন "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তখন তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মোতীলাল। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী পুনরায় তাঁকে উদয়পুর সেণ্ট্রাল জেলে পুরলেন। এবার তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ড হ'ল।

জাতির মুক্তি-সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই ভীল-নেতার জীবন একটানা দুঃখবরণের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সুদীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে তাঁর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আর অজ্ঞাতবাসে। বিত্তশালী জায়গীরদার হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনেই তিনি বিপৎসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথকে বেছে নিয়েছিলেন, তারপর থেকে কণ্টক-মুকুট মাথায় পরে সেই বন্ধুর পথেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। চরিত্রবল এবং আত্মত্যাগের দ্বারা স্বজাতীয় নর-নারীর হৃদয়ে তিনি নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভীল নরনারী তাঁকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তা রাজপুতানার বিখ্যাত লেখক অখিল বিনয়ের উক্তিতে সুপরিস্ফুট। তিনি লিখছেন: "হমেঁ ফরবরী ১৯৫০ মেঁ আপকে দর্শন করনে কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হুয়া থা। আপ কোটরা ভোপট (উদয়পুর) মেঁ ১২-১৩ ফরবরীকো আদিবাসী সম্মেলনকে স্বাগতাধ্যক্ষ থে। আপকী বিনম্রতা ঔর সেবা ভাব দেখ কর হম মুগ্ধ হো গয়ে। হমনে দেখা কি ভীল পুরুষ ঔর স্ত্রিয়াঁ স্বাভাবিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সে আপকে চরণ মেঁ প্রণাম করতী থীঁ; ঔর আপকা আশীর্বাদ পানে কী ইচ্ছুক রহতী থীঁ। ইসসে মালুম হুতা কি ভীল লোগ আপকে দেবতা সমঝতে হৈঁ, ঔর আপকে নাম পর তরহ-তরহ কী মনৌতী মা মন্নত মানতে হৈঁ।"

অর্থাৎ, "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। উক্ত বৎসরের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইনি উদয়পুরের কোটরা ভোপটে অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হন। এঁর বিনম্রতা আর সেবার ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি দেখলাম যে, ভীল স্ত্রী-পুরুষেরা আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করছে—তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্যে তাদের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা! এসব দেখে শুনে আমার প্রতীতি হ'ল যে, ভীলরা তাঁকে দেবতা বলে মনে করে, তারা নানা নামে তাঁর নামে বিবিধ প্রকারের মানত পর্য্যন্ত করে।"

মোতীলাল তেজাবতের নেতৃত্বে ভীলদের অভ্যুত্থানের কাহিনী আধুনিক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সে কাহিনী স্থান পায় নি। ইংরেজ যখন দেশের মালিক ছিল তখন তারা আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্তে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে তারা সেগুলিতে স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে। আদিবাসীদের মুক্তি-আন্দোলনের কথা হয় তারা কৌশলে চেপে রেখেছে নতুবা তার অপব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। খাসিয়া-বিদ্রোহের নায়ক তীরত সিংকে তারা চিত্রিত করেছে 'রক্তপিপাসু', 'বুনো' 'খুনী' রূপে, নাগারাণী গাইডিলিউকে দিয়েছে যাদুকরী আখ্যা, অন্ধ্রের কেণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের নায়ক আল্লুড়ি শ্রীরাম রাজাকে (সীতারাম বাজু) কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে।

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার যথাযথ ইতিহাস রচনার পথে যে সকল বাধা ছিল সেগুলি এখন বহুলাংশে অপসারিত। আজ তাই নূতন করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। এই নূতন ইতিহাসে দেশের জন্তে আদিবাসীদের দুঃখবরণ ও বলিদানকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে হবে। এ কথা ভুললে চলবে না তীরত সিং, গাইডিলিউ, ভারতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবান, নেতা নির্মল মুণ্ডা, আগষ্ট-আন্দোলনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামের কমলা মিরি, কাছাড়ী নেতা মধুবন, ভীল জননায়ক মোতীলাল তেজাবৎ প্রভৃতির সক্রিয় দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের কাহিনী বাদ দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।*

* লেখকের প্রকাশিতব্য 'আদিবাসীদের বিচিত্র কথা' নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়।

চারি বেদের পৌর্ব্বাপর্য্য

শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, বেদান্ত-তীর্থ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর বেদ। অপৌরুষেয় বেদের উপর ভারতের প্রায় সমস্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত। বহু দিন হইতে আমাদের দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যথাযথ আলোচনাদি না হওয়ায় অনেকের মনে এই অখণ্ড বেদ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। আজকাল আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কথা শুনিতে পাই যে, ঋক্‌সংহিতা সকলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং তার পর যজুঃসংহিতা ও সামসংহিতা রচিত হয়। অথর্ব্বসংহিতার রচনা বহু পরবর্ত্তীকালে, যেহেতু ইহার ভাষা ঋকসংহিতা অপেক্ষা সরল ও সহজ। তার পর ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল বহু পরবর্ত্তী, কেননা ইহাদের ভাষা অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা সরল এবং বৈদিক সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ নহে। এই সকল যুক্তি যে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য তাহা আমরা এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া যদি আমরা বেদ সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করি তবে যে তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ভ্রান্তিমূলক হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের বেদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতামত যে যথাযথ অধ্যয়নপ্রসূত নহে তাহা বুঝা যায়। এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঋক্‌মন্ত্র ও সামমন্ত্রে এইমাত্র প্রভেদ যে, ঋক্‌মন্ত্রগুলি গীত হইলে তাহাই সামমন্ত্র হইয়া থাকে। সামগানের আধারীভূত মন্ত্র ঋক্‌মন্ত্রই বটে। সামের আধারীভূত ঋক্‌মন্ত্রকে 'যোনিঋক্' বলা হয়, ঋক্‌মন্ত্রই ষড়্‌জাদি স্বরসংযোগে গীত হইলেই তাহাকে সামমন্ত্র বলে। 'তেষামৃগ্‌ যত্রার্থবশেনপাদব্যবস্থা' (জৈমিনি সূত্র ২।১।৩৫), 'গীতিষুসমাখ্যা' (জৈমিনি সূত্র ২।১ ৩৬), 'শেষে যজুঃশব্দঃ' (জৈ. সূ. ২।১।৩৭)—এই তিনটি সূত্রদ্বারা ভগবান জৈমিনি ঋক্‌মন্ত্র, সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য অথর্ব্বসংহিতার মন্ত্ররাশি ঋক্‌মন্ত্রই বটে। শান্তি, পৌষ্টিকাদি দৃষ্টফল কর্ম্মের অভিধায়ক ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়া অথর্ব্বসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আথর্ব্বনিক মন্ত্র ঋক্‌মন্ত্রই বুঝিতে হইবে।

ঋক্‌সংহিতাতেও যে যে স্থলে মন্ত্রদ্বারা গানের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত স্থলে সামমন্ত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। অপ্রগীত মন্ত্রই ঋক্ এবং প্রগীত ঋক্‌মন্ত্রই সাম। এজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে যে 'তস্মাদ্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে' (ছা. উ. ১. ৬. ৫)।

আমরা এই প্রবন্ধে গীতিযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া ঋক্‌সংহিতাতে সামমন্ত্রের সত্তা দেখাইতেছি।

ঋক্‌সংহিতা পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বেদ সকল পরবর্ত্তীকালীন রচনা এই যুক্তি অত্যন্ত ভ্রান্ত। তাহার প্রথম কারণ 'সামানি' এই শব্দ ঋক্‌সংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যদি সামসংহিতা পরে রচিত হইয়া থাকে তবে ঋক্‌সংহিতার মধ্যে তাহার উল্লেখ কিরূপে সম্ভব? অথর্ব্বসংহিতা বহু পরবর্ত্তী ইহাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। অথর্ব্বসংহিতার ঋত্বিক 'ব্রহ্মা' শব্দ ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত আছে। তিন সংহিতার একত্র উল্লেখ বহুবার ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দেখা যায়।

অথর্ব্বসংহিতার মন্ত্রসকল ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত রহিয়াছে বলিয়া অথর্ব্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত হইল না। অন্যথা ঋক্‌সংহিতার মধ্যে এই দুই সংহিতার এবং এই দুই সংহিতার ঋত্বিকগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋচাং ত্বং পোষমাস্তে পুপুষান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্ব। (ঋ, সং ৮. ২. ২৪)

এই ঋক্‌মন্ত্রে ঋক্, সাম, অথর্ব্ব এবং যজু এই চারি সংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মা অথর্ব্বসংহিতার ঋত্বিক, তাহার নাম এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের ঋত্বিক অধ্বর্য্যুকে যজ্ঞের মাত্রার নির্ম্মাতারূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া যাস্ক বলিয়াছেন—'ঋত্বিক কর্ম্মনাং বিনিয়োগমাচষ্টে' (নিরুক্তম্, উপোদ্ঘাতপ্রকরণ ১।৮)।

ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তের মধ্যে 'তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছান্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত।' (ঋ. সং. ৮. ৪ ১৮।) এই পুরুষসূক্তের মধ্যে ঋক্, যজু এবং সামের কথা একত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

'সাম দ্বিবর্হা মহিতিগ্মভৃষ্টিঃ সহস্ররেতা
বৃষভস্তুবিষ্মান্। (ঋ. সং, ৪, ৫, ৩)
যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্য্যো ব্রতপাবেন
আজনি (ঋ, সং ১,৬,৪)

সামসংহিতার মধ্যে অথর্ব্বসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থতঃ মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ।
তমু ত্বা দধ্যঙ্‌ ঋষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ বৃত্রহণং পুরন্দরম্।
(সাম বেদ ১, ১, ৯)

অথর্ব্বসংহিতা যদি বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া থাকে তবে তাহার উল্লেখ সামসংহিতার মধ্যে পুনঃ পুনঃ কিরূপে সম্ভব হইল? অথর্ব্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত না হইলে সামসংহিতায় অথর্ব্বশব্দ ব্যবহৃত হইল কেন? ঋক্‌সংহিতায়ও এই মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋ. সং. ম. ৬, ১৬. ১৩-১৪), (ঋ. সং. অষ্টক, ৪. ৫. ২৪)।

ঋক্‌সংহিতার বহুস্থানে সামের উল্লেখ হইয়াছে। 'ত্বমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়োঃ' (ঋ. সং. ৬।১।২২) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চ্চনামন্ত্র দ্বারা বর্দ্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে এবং গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে।

'অর্চন্ত অকে মহি সাম মন্বত তেন সূর্য্যমরোচৎ'
(ঋ, সং, ৬।২।৩৭)

এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকে দীপ্ত করেন।

'বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম (ঋ, সং, ৬।৬।১২)

যজ্ঞবর্দ্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই গান দ্বারা দীপ্ত সর্ব্বদা জাগরূক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

'উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি
(ঋ, সং, ২।৮।১২)

অর্থাৎ হে শকুনি! উদ্গাতা যেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় শব্দ কর।'

সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে 'ব্রাহ্মণাৎ শংসী' নামে যজ্ঞের একজন ঋত্বিক ছিলেন।

'প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্য্যশ্বায় গায়ত' (ঋ, সং, ৫।৩।১৫)

অর্থাৎ হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।'

'যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনামিন্দ্রাবিষ্ণূ
কলশাসোমধানা'
প্রবাং গিরঃ শস্যমানা অবন্তু প্রস্তোমাসো গীয়মানাসো অর্কৈঃ
(ঋ, সং, ৫।১।১৩)

অর্থাৎ 'হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্য্যমাণ স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।'

'বি যদ্বাচং কীস্তাসো ভরন্তে
শংসন্তি কেচিন্নিবিদো মনানাঃ' (ঋ, সং, ৫।১।১০)

'যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিৎসমূহ পাঠ করেন।'

অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে
অগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি। (ঋ, সং, ৪।২।২৫)

'সদ্যজাত কোমল প্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সহিত হব্য প্রদানপূর্ব্বক পোষণ করিয়াছেন।'

'বেমি ত্বা পূষন্নৃঞ্জসে বেমি স্তোতব আঘৃণে' (ঋ, সং, ৫।৭।৩৩)

'হে পূষা! তোমাকে প্রসাধিত করিতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত! তোমায় স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।'

ঋক্‌সংহিতার মধ্যে চারি বেদের চারি জন ঋত্বিকের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋত্বিক হোতা, সামবেদের ঋত্বিক উদ্গাতা, যজুর্ব্বেদের ঋত্বিক অধ্বর্য্যু এবং

অথর্ববেদের ঋত্বিক ব্রহ্মা। এই চারি জন ঋত্বিকের নাম ঋগ্বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য সংহিতাসকল ঋক্‌সংহিতার পরবর্ত্তী রচনা নহে। যজুর্বেদের ঋত্বিকের (অধ্বর্য্যু) নাম ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অধ্বর্য্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রা, প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বৈ'—এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, পাঁচ জন অধ্বর্য্যুর সহিত সাত জন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করিতেছেন। এস্থলে যে অধ্বর্য্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যজুঃসংহিতায় উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। এই অখণ্ড বেদের রচনাবিভাগ কেবলমাত্র ভাষার দিক হইতে করিতে গেলে বহু ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

উতিভিস্তমিষনো দ্যুম্নহূতৌনি মায়াবান ব্রহ্মা দস্যুরত'।
(ঋ, সং, ৩।৫।১২)

অথর্বসংহিতার ঋত্বিক ব্রহ্মার নাম ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

'আজুহ্বানা ঘৃতপৃষ্ঠং পৃষন্ত-দধ্বর্য্যবো হবিষার্মর্জযধ্বম্।
'হে অধ্বর্য্যুগণ। ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত বর্হিঃহোমকরতঃ প্রদান কর।'

ঋক্‌সংহিতার ২, ৬, ১৩।১৪ বর্গে যে বারটি ঋক্‌মন্ত্র আছে তন্মধ্যে ১১টি মন্ত্র অধ্বর্য্যুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আম্নাত হইয়াছে।

'অধ্বর্য্যবো ভরতেন্দ্রায় সোম মামত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যগন্ধঃ'—

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর।

'অধ্বর্য্যবো যো অপো বব্রিবাংসং বৃত্রং জঘানাশন্যেব বৃক্ষম্।'
'হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনি দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সোমাভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর।'

এইরূপ ১১টি ঋক্‌মন্ত্রে অধ্বর্য্যু শব্দ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

'অধ্বর্য্যবোহপ ইতা সমুদ্রমপাংনপাতং হবিষা যজধ্বম্।'
'হে অধ্বর্য্যুগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর। 'অপাংনপাৎ' নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর।'

এই সকল বৈদিক মন্ত্র হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিরাট যজ্ঞকে সম্মুখে রাখিয়া এই চারি সংহিতা রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞ ব্যতিরেকে এই চারি সংহিতার কল্পনা করিতে গেলে ঋত্বিক কর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে। চারি ঋত্বিকের একত্র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, চারি বেদ যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা ঋত্বিকগণের উল্লেখ যদি ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় আর সেই সেই ঋত্বিকগণ যে যে সংহিতা অনুযায়ী যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবেন তাহা ঋক্‌সংহিতার পরে রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয় তবে এই যুক্তি অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক হইবে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের ১ম ও ১০ম মণ্ডলকে পরবর্ত্তীকালীন রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, ১ম ও ১০ম মণ্ডলের মন্ত্র সকল সরল ও সহজবোধ্য। এস্থলে আমরা ১ম ও ১০ম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে এগুলি সরল তো নহেই, উপরন্তু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং নিরুক্তকার যাস্ক এগুলিকে দুরূহ বলিয়াছেন।* ঋক্‌সংহিতার ১০ম মণ্ডলে 'সৃণ্যের জর্ভরী তুর্ফরী তু' (ঋ. সং. ১০. ১০৬. ৬) ইহা দ্বারা আপাতঃদৃষ্টিতে কোন অর্থপ্রতীতি হয় না।

'অম্যক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে সনেম্যভ ং মরুতো জুনন্তি'—
(ঋ, সং, ১, ১৬৯, ৩)

ইহাও প্রথম মণ্ডলের মন্ত্র। নিরুক্তকার যাস্ক এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন 'অবিস্পষ্টার্থা ভবন্তি'। এইরূপ বহু মন্ত্র ১ম ও ১০ম মণ্ডলে পাওয়া যায় যাহার অর্থ সহজবোধ্য নহে। অপরপক্ষে ২য় হইতে ৯ম মণ্ডল পর্য্যন্ত ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে বহু সরল ও সহজবোধ্য মন্ত্র আছে। (ঋ. সং. ৩. ৪২. ৪-৫, ৩. ৪৪. ১, ৪. ৪২. ৩, ৯. ১১, ৯. ৮৪, ৫।)

তার পর শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে: 'অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদযজুর্বেদার্থর্বাঙ্গিরসেতিহাসপুরাণ ইত্যাদি। এখানে 'মহতঃ ভূতস্য' শব্দের দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চারি সংহিতার একত্র উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ পূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই। এই চারি বেদ মহানভূত যে ব্রহ্ম তাহারই নিঃশ্বাসস্বরূপ। এখানে বুঝিতে হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বিশিষ্ট রচনাসম্পন্ন বেদ পূর্ব্বেও বিদ্যমানই ছিল, সেই বিদ্যমান বেদই পুরুষনিঃশ্বাসবৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্ব্বক বিরচিত হয় নাই; এই কারণে বেদ স্বার্থ-প্রতিপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; ইহা স্বতঃপ্রমাণ। বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাধিভূত নাম ও রূপই ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জল ও তাহার ফেনার ন্যায় নাম ও রূপকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না। যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই নাম ও রূপ লইয়াই সংসার। এজন্য এখানে কেবল নামকে (শব্দরাশিকে) নিঃশ্বাসবৎ উৎপন্ন বলা হইল। কারণ তাহার নির্দ্দেশেই অপরেরও—

* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০.১০.১২৭ রাত্রিসূক্ত উক্ত হইয়াছে। এই আটটি সূক্তের অর্থ অতীব দুরূহ।

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত। (১) ওর্বপ্রা অমর্ত্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বত জ্যোতিষা বাধতে তমঃ। (২) ইত্যাদি।

রূপেরও নিঃশ্বাসবৎ উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। লোকের নিঃশ্বাস যেরূপ অযত্নপ্রসূত অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য্যের ফলমাত্র তদ্রূপ বেদরাশিও পরমপুরুষের নিঃশ্বাসবৎ অনায়াসপ্রসূত। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যেরূপ লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ, বেদ সেরূপ নহে, এইজন্যই ইহা স্বতঃ-প্রমাণ।

যে কোন মন্ত্রসংহিতা অধ্যয়ন করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে যে, কোন যজ্ঞবিশেষ আরম্ভ করিয়াই সেই যজ্ঞে অপেক্ষিত দ্রব্য-দেবতার গুণকীর্ত্তন, স্তুতি প্রভৃতি এবং যজ্ঞে যজমানের শুভআশংস প্রভৃতি বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্য কোন অর্থ বেদমন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলে নানাবিধ ক্লিষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ আলোচনা করিলে এই কথাই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ঋক্‌মন্ত্র বহুবার সোমযাগের প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন এই তিনটি সবনের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋত্বিকগণের নানাকর্ম্মের উল্লেখ এই ঋকমন্ত্র-সমূহে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের সর্ব্বানুক্রমনি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলেও কোন যজ্ঞে কোন্ দেবতার উদ্দেশে কোন্ সময়ে কোন্ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বানুক্রমণিকারও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যজ্ঞ প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ আলোচিত হইলে বেদের অধিযজ্ঞ অর্থ প্রথমতঃ পরিস্ফুরিত হইবে। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনও এই পক্ষের অনুকূল। অধেম্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম—৮।২।২৪ ঋ. সং. এই ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও ভগবান যাস্ক উপোদ্ঘাত প্রকরণে বেদের প্রাথমিক প্রথমাবগত যজ্ঞরূপ অর্থকেই বলিয়াছেন। অধি-যজ্ঞ ব্যাখ্যা দ্বারা বেদমন্ত্রার্থ গৃহীত হইলে পরে অধিদেবতত্ত্বে বেদার্থালোচয়িতার পরিচয় জন্মিবে। কারণ দেবতার উদ্দেশে হবিঃ ত্যাগই যজ্ঞ। এই দেবতত্ত্বের সহিত পরিচয় হইলে সমস্ত মন্ত্রভাগ যাহা অধিযজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা অধিদৈবতরূপে ভাসমান হইবে। অধিদৈবততত্ত্বে নিষ্ণাতপুরুষ আধ্যাত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিবে। এজন্য বেদমন্ত্রসমূহই সাধারণতঃ ত্রিবিধ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া পরিসমাপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত, অধ্যাত্ম—প্রথমটি উপায় দ্বিতীয়টি উপেয়; এজন্যই উদ্ধৃত মন্ত্রে যজ্ঞ, অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত অর্থকে পুষ্প ও অধ্যাত্ম অর্থকে ফল বলা হইয়াছে। ফুল উপায়, ফল উপেয়। ইহাই সাধারণতঃ বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ। যজ্ঞের ঋত্বিকগণের পৃথক পৃথক কর্ম্ম বিভিন্ন সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে। যেমন ঋক্‌সংহিতায় হৌত্র-কর্ম্ম, সামসংহিতায় ঔদ্গাত্র কর্ম্ম, যজুঃসংহিতায় আধ্বর্য্যব কর্ম্ম এবং অথর্বসংহিতায় ব্রহ্মকর্ম্ম আম্নাত হইয়াছে। প্রত্যেকটি যজ্ঞেই এই ঋত্বিক চতুষ্টয় অপেক্ষিত এবং ইহাদের কর্ম্মও বিভিন্ন রূপ। এজন্য সোমযাগাদি প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতি চতুর্বিধ ঋত্বিককর্ম্মানুসারে মন্ত্রসমূহ চতুর্বিধ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কোন্ মন্ত্র বা ঋত্বিক পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী এরূপ বলার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। অতএব আমরা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রেও অন্য বেদমন্ত্রের ও অন্য ঋত্বিকগণের কর্ম্মের উল্লেখ দেখাইয়াছি। মন্ত্রসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিলে ঋক্-সংহিতাতে পঠিত মন্ত্রসমূহের আনর্থক্য হইয়া পড়িবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদমন্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করেন নাই।
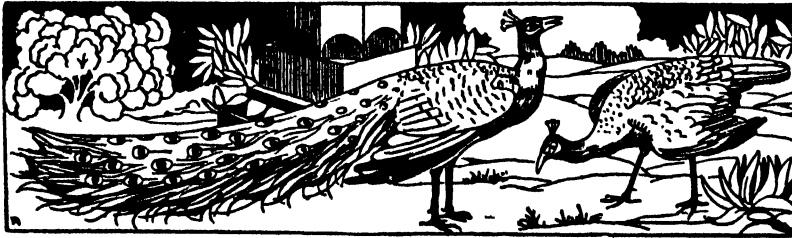
ফরাসী-কবি লেকঁৎ দে লীল্

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত ফরাসী-কবি লেকঁৎ দে লীল্ (Leconte de lisle) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রি-ইউনিয়ন' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ফরাসী-পাঠকসমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন এবং আজও তাঁর কাব্যাবলী বিশ্বের কাব্যরসিকমণ্ডলীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জীবিত কালে কবি লেকঁৎ দে লীল্ ফরাসী-কবিসমাজে বিশেষ আদর ও মর্য্যাদা পেয়েছিলেন; বড় বড় সমালোচক, সাহিত্যবিদ্ পণ্ডিত ও মনীষিবৃন্দের নিকট থেকে তিনি প্রভূত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে এক বিশিষ্ট কবিদলের আবির্ভাব হয়; এঁরা Les Parnassions নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি সুকুমার কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসক ছিলেন এবং অভিনব আঙ্গিকে কাব্যে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সুর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আল্ফঁস্ দে লামার্তিন্ (১৭৯০-১৮৬৯), আল্‌ফ্রে দে ভিঞি (১৭৯৭-১৮৬৩), আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে (১৮১০-১৮৫৭), স্যুলি প্র্যুদম্ (১৮৩৯-১৯০৮), জে.-এম. দে হেরেদিয়া (১৮৪২-১৯০৫), ফ্রাঁসোয়া কপ্‌পে (১৮৪২-১৯০৮) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-কবিবৃন্দ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। লেকঁৎ দে লীল্ এই পার্নাসিয়াঁ (Parnassion) নামক ফরাসী-কবিবৃন্দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, কাব্যে হবে বিজ্ঞান ও কলার পরিমিশ্রণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও ভাবানুভূতির মিলন। যন্ত্রযুগ ও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও তাই তিনি কামনা করেছিলেন ভাবজগতের সঙ্গে, সৌন্দর্য্যলোকের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন; তাঁর কাব্যেও সেইজন্য দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের মহত্তর সংযোগ সাধিত হয়েছে। নিজের যুক্তিবৃত্তি ও চিন্তাধারার সাহায্যে তিনি পৃথিবীর প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং মানবের আশা-আনন্দে সুখে-দুঃখে ভরা এই মর্ত্ত্য-জীবন নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য।

লেকঁৎ দে লীল্ *L'univers Visible* অর্থাৎ দৃশ্যমান বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশির সঙ্গে মনের কল্পনারাজির সংমিশ্রণে অপরূপ কাব্যাবলীর সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু রহস্যময় তা তাঁকে আকর্ষণ করত; তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সেগুলি অপূর্ব্ব কাব্যে রূপায়িত হ'ত; হৃদয়াবেগের রঙীন আল্‌পনায় সুসজ্জিত করে তিনি সে সকল ভাব প্রকাশ করতেন। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন সুখ-দুঃখ তাঁর হৃদয়-বীণায় বিচিত্র সুরে বেজে উঠেছিল; তাই কখনও তাঁর কবিতায় শুনি আনন্দময়ী আশা-রাগিণী, আবার কখনও বা অনুভব করি যে, সেখানে ঝঙ্কৃত হয়েছে নৈরাশ্যের সুর। কখনও তাঁর কবিতা মিলনের আবেগে আত্মহারা, কখনও তা মর্ম্মভেদী বিচ্ছেদের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত। কোথাও তিনি অদৃষ্টবাদের জয়গান করেছেন, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন চূড়ান্ত আশাবাদী, আবার কোথাও তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে আদর্শবাদ, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন দুঃখবাদী, কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সেই আনন্দময় সুন্দরেরই বন্দনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছেন।

লেকঁৎ দে লীল্-এর কাব্যের অগাধ অতলস্পর্শী ভাবরাজি, অন্তঃপ্রসারী অসীম চিন্তাধারা, সুনির্ব্বাচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শব্দসমূহ, পরিমার্জ্জিত স্বচ্ছ সতেজ ভাষা, লালিত্যপূর্ণ ঝঙ্কারময় শ্রুতি-মধুর ছন্দ—এ সমস্তই তাঁকে মহান্ গৌরবের অধিকারী করেছিল ও শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ভাবপ্রবণ কবি, বিচক্ষণ দার্শনিক এবং অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন। প্রাচীন কাহিনীসমূহে ও পুরাতত্ত্বে তাঁর দখল ছিল প্রগাঢ়। প্রাচীন যুগের গ্রীক, লাটিন ও হেব্রায়িক্ সংস্কৃতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলী তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে এ সকলের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এই সকল কারণে ফরাসী-কবিসমাজে লেকঁৎ দে লীল্-এর স্থান ছিল অনেকটা Maitre বা গুরুর মত।

লেকঁৎ দে লীল্ নিজে কিন্তু তাঁর গীতি-কবিতায় পাঠকবৃন্দের মনে কোনরূপ স্থায়ী আবেদন জাগাতে সচেষ্ট হন নি। তাঁর কবিতা যেন অস্থায়ী ইন্দ্রধনুর ক্ষণিক বর্ণসুষমা, বাসন্তী হাওয়ায় সুদূর হতে হঠাৎ ভেসে আসা প্রস্ফুটিত উদ্যান-লতার সুরভি, দক্ষিণের সাময়িক চঞ্চল-বাতাসের হিল্লোল, কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্ণ-চাঁদের জ্যোৎস্না-কিরণ।—যা পড়ে বিমুগ্ধ পাঠকের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে, কিছুক্ষণের জন্য তার মনকে দোলা দিয়ে যাবে কবিতার দোদুল ছন্দ আর অপূর্ব্ব ভাষা। ফুল যেমন রূপে-সৌরভে গৌরবে ফুটে উঠে আবার কিছুক্ষণ পরে ঝ'রে পড়ে যায়—তবু ধরার বুকে রেখে যায় তার সুবাসিত ক্ষীণস্মৃতি—Parnassien কবি লেকঁৎ দে লীল-এর গীতি-কবিতাগুলি হ'ল সেই রকম; হরিদ্রাভ বা শুভ্র ভাব-পুষ্পে বিমণ্ডিত এই কাব্য-লতার এইখানেই হ'ল আসল গৌরব। অস্থায়ী সৌন্দর্য্যবাদই হ'ল এই গীতি-কবিতা কয়টির মূল-কথা।

লেকঁৎ দে লীল্-এর এই অভিনব কাব্যধারা তদানীন্তন

অনেক ফরাসী-কবির মনে সাড়া তুলেছিল; কাব্যে লেকঁৎ দে লীল্-এর অনুগামীর সংখ্যা তাই কম নয়। ঐ কবিগোষ্ঠীর বিখ্যাত কবি স্যুলি প্র্যুদম্ লেকঁৎ দে লীল্-এর মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ-সতেজ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্যুলি প্র্যুদম্ ছিলেন দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; গণিত বিদ্যাতেও তাঁর অগাধ অধিকার ছিল। *Les Stances et Poemes* (১৮৬৫-৬৬) নামক গ্রন্থরচনা করে এই ফরাসী কবি প্রথম বারের নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পার্নাসিয়াঁ-কবি জে. এম. দে হেরেদিয়া লেকঁৎ দে লীল্-এর রচনাভঙ্গী বিশেষ যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। হেরেদিয়া 'কিউবা' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব ভাল সনেট লিখতে পারতেন। *Les Trophees* (১৮৯৩) নামক গ্রন্থরচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন।

লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতার উপর যাঁর সামান্য প্রভাব পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন ফরাসী-সাহিত্যের অমর কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগো। আল্‌ফঁস্ দে লামারতিন্, আল্‌ফ্রে দে ভিঞি ও আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে এই তিন জন কবি ছিলেন উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার রচয়িতা; কাব্যে লেকঁৎ দে লীল্ স্থানে স্থানে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী এই কবিত্রয়ের সামান্য অনুসরণ করেছেন ও তাঁদের গীতি-কবিতার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। লেকঁৎ দে লীল্-এর এই সব কবিতা নিয়ে ভিক্টর হিউগো ও স্যাঁৎ ব্যভ্ মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রতীকতন্ত্রী (Symbolist) দলের বিখ্যাত কবি পোল্ ভের্লেন্-এর লেকঁৎ দে লীল্-এর উপরে লিখিত একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। শক্তিশালী ফরাসী-সমালোচক মাক্সিম্ ফরমঁ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সঙ্গে লেকঁৎ দে লীল্-এর কাব্য বিচার করেছেন। আমাদের দেশের গৌরব—বাঙালী মহিলা-কবি তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) খুব অল্প বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতার চমকপ্রদ সমালোচনা করে এক অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করেন। তবে তা বাংলা ভাষায় লেখা নয় বলে সাধারণ বাঙালী পাঠকেরা রচনাটির রসাস্বাদে বঞ্চিত হয়েছেন।

১৮৫৩ সালে ৩৫ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ আঁতিক্' (*Poemes Antiques*) প্রকাশিত হয়। তার নয় বৎসর পরে ১৮৬২ সালে ৪৪ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ বার্‌বার' (*Poemes Barbares*) বার হয়; সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ১৮৮৪ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ ত্রাজিক্' (*Poemes Tragiques*) ছাপা হয়। কবির শেষ কবিতাগুলি 'দার্ণিয়্যার পোয়েম্' (*Derniers Poemes*) নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। 'শোয়া দে পোয়েজী' (*Choix de Poesies*) নামক পুস্তকে কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাব্যগ্রন্থ রসবেত্তা পাঠকমহলে বিপুল সমাদরলাভ করেছিল, এবং এগুলির কাব্যরস অদ্যাপি রয়েছে অব্যাহত।

খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ব্যুর্‌নুফ্ ছিলেন কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্যুর্‌নুফ্ প্রাচীন ফারসী ও ভারতীয় গ্রন্থ হতে অনুবাদ করে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় ভাব, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। এই ব্যুর্‌নুফের শিক্ষায় ও সাহায্যে লেকঁৎ দে লীল্ ভারতীয় পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন। সেইজন্য লেকঁৎ দে লীল্-এর কাব্যের উপরে ভারতীয় ভাব ও ধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন-বিষয়ের বহু ভাবধারা বা তথ্য লেকঁৎ দে লীল্ অধিগত করেছিলেন। এ সমস্তই ব্যুর্‌নুফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফল, কেননা তাঁর নিকট হতেই লেকঁৎ দে লীল্ পেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির দীক্ষা। ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের উপরে লিখিত লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতাগুলি তাঁর প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে গাঢ়তম পরিচয়ের নিদর্শন। হিন্দুধর্ম্ম তাঁর মনে বিশেষ দোলা দিয়েছিল; তাঁর 'ভাগবৎ' (*Bhagavat*), 'সূর্য্য' (*Surya*), 'ব্রহ্মদৃষ্টি' (*La vision de Brahma*), 'শিব' (*Civa*), 'শিবধনু' (*L'arc de civa*), 'মায়া' (*Le Maya*), প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে তা বুঝা যায়। 'যম', 'অগ্নি', 'কাল', 'ব্রাহ্মণ', 'গঙ্গা', 'সাবিত্রী', 'মৈত্রেয়', 'নারদ', 'অদিয়া', 'কৈলাস,' 'বেদ', 'ভগীরথ', 'ঋষি', 'অপ্সর', 'কিন্নর', 'হিমালয়', 'বাল্মীকি', 'দশানন', 'লঙ্কার রাবণ', 'রাক্ষস', 'দশরথ', 'রাম', 'লক্ষ্মণ', 'সীতা' প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত, আমাদের একান্ত সুপরিচিত নামগুলি যখন লেকঁৎ দে লীল্-এর মত একজন ফরাসী-কবির লেখায় দেখতে পাই তখন কৌতূহল-মিশ্রিত আনন্দে আমাদের বুক ভরে ওঠে। এই সব কবিতায় লেকঁৎ দে লীল্-এর আগ্রহ ও আন্তরিকতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য-সম্পর্কে তাঁর L' Orient ও Bouddha কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। ইস্‌লাম সম্পর্কেও কবি যথেষ্ট উৎসুক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর *Le Suaire* 'de Mohammed-ben-Amer-al-Mancour' ও Les roses d'Ispahan কবিতা দুটির নাম করা যায়। তা ছাড়া 'লয়্‌লা' ও 'মজ্‌নু'র প্রখ্যাত কাহিনী কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর হৃদয়তন্ত্রীতে যে বিচিত্র ঝঙ্কার তুলেছিল তার রেশ তাঁর দু-একটি কবিতায় সুপরিস্ফুট।

বিভিন্ন জাতের পশু ও পক্ষী কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর বিশেষ প্রিয় ছিল। জীবজন্তুর উপরে লিখিত তাঁর কবিতার সংখ্যা তাই কম নয়। পশু-পক্ষীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেকঁৎ দে লীল্ যখন তখন চিন্তা করতেন। তিনি মনে করতেন যে,

পশুরা মানুষের অপেক্ষা নির্দোষ ও সরল মনের অধিকারী। 'জাগুয়ারের স্বপ্ন' "Le reve du Jaguar", 'হস্তীযূথ' "Les Elephants", 'কৃষ্ণ চিত্রব্যাঘ্রী' "La Panthere noire" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।—একটি ঘুমন্ত পশুর স্বপ্ন-বাসনা কেমন নিপুণ হাতে কবি লেকঁৎ দে লীল্ ফুটিয়ে তুলেছেন তার নিদর্শন-স্বরূপ এই সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা'টির "Le reve du Jaguar" কিয়দংশের মর্মানুবাদ দেওয়া গেল :

"শেহালা-জীর্ণ শুষ্ক-দীর্ণ বৃক্ষ-শাখার পাশে—
শ্রান্ত শরীরে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে জাগুয়ার রোজ আসে ;
লেহন করিতে নিজ লাঙ্গুল রাগে দংশন করে,
দীর্ঘক্ষণের ক্ষুধার জ্বালায় স্ফূর্ত্তিটি ওষ্ঠাধরে।—
... ...
সুবিপুল ঘন অরণ্য ; যেথা দিবার দ্বিপ্রহরে
পল্লব আর পত্র-লতিকা রবিরে গোপন করে,
আছাড়িয়া সেথা পড়ে জাগুয়ার নরম মাটির 'পরে,
সমুখের থাবা লেহন করিয়া সুপরিষ্কৃত করে ;
তন্দ্রাতে ক্রমে ঢুলু ঢুলু চোখ, জাগুয়ার বোজে আঁখি,
স্বর্ণাভ দুই নয়নের তারা কাঁপিছে স্বপ্ন মাখি' !
ত্য ভরা প্রয়াস সংজ্ঞা হারায়, শুধুই ঘুমের ভরে
লাঙ্গুল কভু নড়িতেছে তার, মাঝে মাঝে থাবা নড়ে।
... ...
স্বপনে দেখিছে—সুপুষ্ট গাভী হরিৎ-বনেতে চরে ;
বেগে জাগুয়ার পড়ে লাফাইয়া সেই গাভীটির 'পরে !
স্তম্ভিত সেই শান্ত গাভীটি ফুকারে আর্ত্তস্বরে,—
নখরের মাঝে জাগুয়া'র তার থাবাতে শোণিত ভরে !"

লেকঁৎ দে লীল্ যেন নিবিড় আত্মশক্তির বলে কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ; তাঁর অন্তর্লোকের প্রগাঢ় সৌন্দর্য্য-চেতনার দ্বারা তিনি কাব্যের দেহ ছেড়ে প্রাণের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তাই আড়ষ্ট জড়তাপূর্ণ কবিতাকে দিয়েছেন শক্তিপূর্ণ উজ্জ্বল জীবন ; ছন্দের মাধুর্য্যকে, শব্দের ব্যঞ্জনাকে সর্ব্বোৎকর্ষ করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন সুপরিচিত কল্প-বিলাসপন্থী (romantic) কবিতা। লেকঁৎ দে লীল্-এর কবি-প্রাণ অনুভবের, অনুরাগের ও আবেগের কেন্দ্র ; সেই কবি-প্রাণের মাঝে এক বর্ণাঢ্য রঙ্গিনী বৃত্তি, সুগভীর রসলিপ্সা—যা কাব্য-বস্তুকে সুষমভাবে করে রঙীন। মনের উপভোগের জন্য তিনি এমন বর্ণ-বিচিত্র কাব্যবস্তুর সৃষ্টি করেছেন যার মূল-কথা হচ্ছে ছন্দ—যে ছন্দে কবি-প্রাণের অপূর্ব্ব-আনন্দ লাস্য-লীলায় হিল্লোলিত হচ্ছে। লেকঁৎ দে লীল্-এর লঘু-কবিতায় ছিল একটা 'সুতীব্র ভাবোল্লাস' বা Lyric Enthusiasm ; যা তাঁর "Les Elfes" বা 'পরীদল' কবিতায় ইন্দ্রজালের মত বিস্ময়করভাবে ফুটে উঠেছে। তাবে তাহার ছন্দে কবিতাটি রীতিমত মোহকর। প্রথমেই অপরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হয় :

"নিবিড় বনেতে ভ্রমিছে যেথায় হরিণেরা দলে দলে,
কৃষ্ণ ঘোটকে একেলা সেথায় অশ্বারোহী সে চলে।
স্বর্ণখচিত পাদুকা তাহার নিশীথে উজলি' উঠে ;
ঘন অরণ্যে জ্যোৎস্না-কিরণ যেখানে পড়িছে লুটে,
প্রভাসিয়া সেথা দীপ্তি ভাতিছে নীরব বনের মাঝ,
ভেদিয়া তিমির অশ্বারোহীর ঝলসে শিরের তাজ।
বনলতা আর শুভ্র কুসুম বক্ষসে আবরি কেশে,
মোহিনীর দল নৃত্য-উছল বনেতে বেড়ায় হেসে।
... ...
মুকুল-আভাসে বাতাসেতে ভাসে পরীরা নৃত্যরতা
ফিরিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া ঘিরিয়া সাগর-ঊর্মি যথা !
—'ওগো বীর যুবা ! এত পরে তুমি এ হেন নিশীথকালে
বলো, কোথা যাও ?'—অপ্সরী রাণী কহে বিস্ময়-মনে :
'দলে দলে যত অশুভ-আত্মা ফিরিছে ক্ষুধিত-মনে ;
এইখানে রহো, দু'জনে মিলিয়া এসো নাচ করি বনে।'

তরুণ অশ্বারোহী বীর তার বাগ্‌দত্তা-প্রিয়ার গৃহাভিমুখে দ্রুত অশ্ব চালিয়ে যাচ্ছে, তাই নৃত্যরতা পরী-রাণীর সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সে বললে :

'না, না ! মোর প্রিয়া রয়েছে চাহিয়া আমারি আসার পথ,
আগামীকল্য চালাব আমরা মিলনের মনোরথ।
সমুখে যাবার পথ দাও মোরে, বনচারী পরীদল,
পায় পথ যায় চরণ-চিহ্ন ফুলভরা বনতল ;
মোর বিলম্ব করে দিয়ো নাকো, প্রিয় মোর জেগে রয়,
চাহিয়া দেখ গো, ঊষার আভাস জেগেছে রজনীময়।'—
যৌবনমুগ্ধা পরীরাণী তবু মদির-আহ্বান জানান :
—'অশ্বারোহী গো, দাঁড়াও ক্ষণেক ! এনেছি তোমার তরে
পরশ-মাণিক সুগন্ধি-মালা—যাহাতে আলো না ধরে !
গৌরব আর ভাগ্য-রতন দানিব তোমারি করে,
আমার বসন করেছে বয়ন চন্দ্র-কিরণ ধরে' !'—
কিন্তু :
'না !' বলিল বীর।—'যাও তবে !' কোপে তুষার-
আঙুলে পরী
যুবার বক্ষ পরশিল, বীর চমকিয়া যায় সরি'।

এর পরে দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল, এবং চরম রহস্যময় ঘটনায় চিত্রটি বিমণ্ডিত ! তরুণ-বীরের কালো ঘোড়া সবেগে সম্মুখে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু :

চমকিয়া উঠি' অশ্বারোহী সে সহসা সমুখে চায় ;
পথ 'পরে হেরে, আসে সেথা এক মূরতি তুষারকায়
কিছু নাহি বলি' বীরের পানেতে সে যে বাহু মেলি' ধরে
—'প্রেতিনী, দানবী, অশুভ-আত্মা, আটক কোরো না মোরে !'

মর্মভেদী দৃশ্যটি এবার করুণতম হয়ে উঠল :

'ঘোরো না আমারে, দেহহীন ছায়া—অপরা-অপদেবতা।
আমার প্রিয়ার আঁখিটি জাগে যে, কাল মিলনেরি কথা।'
'ওগো প্রিয়তম, বন্ধু আমার।' সে কহে করুণ স্বরে,
'মিলন মোদের হবে অনন্ত সমাধির অন্তরে,
আমি আজ মৃত।'—বার্তা শুনিয়া বীর ওঠে চঞ্চলি',
বাসনার প্রেমে সমাধির 'পরে চিরতরে পড়ে ঢলি'।"

যার উদ্দেশে এই বিপৎসঙ্কুল গহন-অরণ্যে যাত্রা সেই প্রার্থিতা প্রিয়তমা নারী অশ্বারোহীর সম্মুখে প্রত্যাখ্যাতা পত্নীর প্রতিহিংসার ফলে মৃত অবস্থায় দেখা দিল; ভগ্নহৃদয় অশ্বারোহীর জীবন সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির উপরেও পড়েছে রহস্যময় যবনিকা।

লেকঁৎ দে লীল্ শেষ পর্য্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক-লোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। বহির্জগতের ব্যর্থ অনুসরণ না করে মানস-অনুভূতিকে স্থিরভাবে রূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ, আত্ম-প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক-সমুন্নতি লাভ করেছেন, মানসোত্তর চৈতন্যকে কাব্যে রূপদান করেছেন। তাঁর মনের পর্দায় রূপলোক আর অরূপলোকের অপূর্ব মিশ্রণ হয়েছে; সেখানে ফুটে উঠেছে 'সুমহান্ স্বপ্নরাজি'।

দৃশ্যমান প্রকৃতির রূপ-বর্ণনায় কবি লেকঁৎ দে লীল্ বিশেষ সাফল্যলাভ করেছেন; পৃথিবীর বাহ্যদৃশ্য তাঁর যাদু-লেখনীতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। যখন পড়ি :

"দ্বিপ্রহর, অগ্নিরাজ, সুবিস্তৃত ধরিত্রীর বুকে,
উদ্ভূত সুনীলাকাশে বসি' ছড়াইল রৌদ্রকর,
নীরব পৃথিবী। উষ্ণ বায়ু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমুখে,
আগুন-বসনাবৃতা পৃথ্বী সংজ্ঞাহারা নিরন্তর।

বসুন্ধরা সীমাহীন, কান্তার করে না ছায়াদান,
উৎসহীন নদীবক্ষে গাভীদল তৃষ্ণা-বারিহীন;
অরণ্য সুদূরে, যার ক্ষীণপ্রান্ত পরিদৃশ্যমান,
নিস্পন্দ-নিস্তব্ধ আজ, সুগভীরে চির-তন্দ্রালীন।"

কিংবা যখন পড়ি :

"সূর্য্যের রেশ দূর-সমুদ্রে, সন্ধ্যার বায়ু হেমন্তের,
কখন অযথা সহসা ব্যথিত বিদায়ের সুর সঙ্গীতের
ফেলিয়াছে ঢাকি' ধরণীর বুক; নীরব ব্যথার কালিমা ছায়
রক্ত-রঙীন রূপ ধরিয়াছে অস্ত-রবির রক্তিমায়।
বিশাল-বক্ষের বক্ষে শিথিল শাখাদল মৃদু আন্দোলিছে;
সাগরের বুকে রক্তিমা ছায়; সমীরণ-হিয়া কি ক্রন্দিছে;
অলস গতিতে সন্ধ্যা আসিছে, যমার সন্ধ্যা তন্দ্রা সাথে,
বিহঙ্গ-নীড় ম্লান-শাখাদলে অড়ায়ে পড়িছে সুনীল-রাতে।"

তখন লেকঁৎ দে লীল্-এর অসাধারণ বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা তাঁর কল্পনায় সংমিশ্রণে অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে সুপরিস্ফুট এক নূতন সুর, নূতন ছন্দ, নূতন ভাব ও নূতন শ্রী। তাঁর চমকপ্রদ বর্ণনার গুণে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে তাই তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মনে হয় :

"সে যেন সুদীর্ঘশ্বাস সুচির প্রতপ্ত হৃদি হ'তে,
বিভিন্ন শস্তের শীর্ষে জাগিতেছে মর্মরের প্রায়,
কোন এক কলোচ্ছ্বাস ধীর-স্থির মহিমায় রথে,
ধূসর দিগন্তপ্রান্তে অবসন্ন বিমূর্চ্ছিত হায়।"

জীবন-মধ্যাহ্নে প্রাজ্ঞ-কবি লেকঁৎ দে লীল্ মর্ত্ত্য-মানবের প্রতি বলেছেন :

"হে মানব, হৃদি তব আহ্লাদে বা ক্ষোভে পরিপূর,
চলিয়াছ দ্বিপ্রহরে প্রতপ্ত কান্তারে সূর্য্যকরে,
যাও। এ প্রকৃতি নিঃস্ব, পান করে রবি তৃষাতুর :
জীবিত যে দেহ হেথা, দুখে-সুখে যাবে তাহা মরে।"

বিশাল-ধরিত্রীর চরম সত্যটি মর্ত্ত্য-মানবের উদ্দেশে জানিয়ে অমর কবি লেকঁৎ দে লীল্ আবার পরমুহূর্ত্তেই সান্ত্বনার আশ্বাস-বাণীতে বলেছেন :

"অশ্রু আর হাস্য কিন্তু, তুমি যদি পার গো ভুলিতে,
থাকো যদি ভুলে যেতে চপল-পৃথ্বীর এ কামনা,
সমতুল্য জ্ঞান যদি শাপে-বরে, মার্জনা-প্রীতিতে,
বরি' লবে যদি তুমি বিরাট ও বিষন্ন বাসনা,—"

তা হলে :

"এসো হেথা। সূর্য্য তোমা' কহিবে গো বারতা মহান্।"
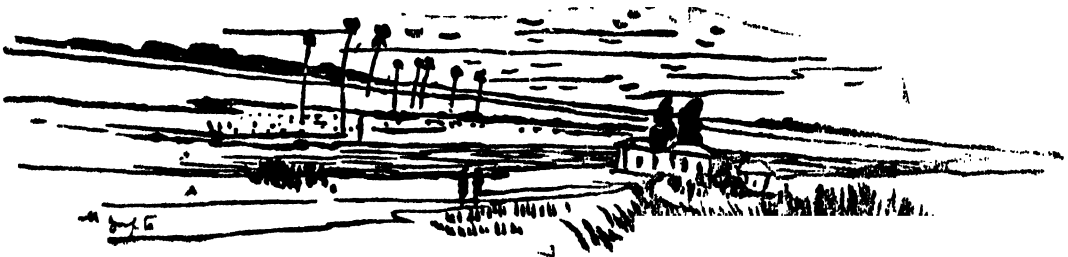
যাত্রী

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা একটানা তীব্র বাঁশী বাজিয়ে সাতক্ষীরার ষ্টীমার যখন খুলনাঘাট ছাড়ে তখনও রাতের অন্ধকার আশেপাশের সব-কিছুকে কুহেলিকার মত জড়িয়ে থাকে। রাত্রের অন্ধকারে যারা আগে থাকতেই ডেকের উপর বাক্স তোরঙ্গ সাজিয়ে নিজেদের গণ্ডি টেনে নিয়ে শুয়ে থাকে, তারা অনেকেই সে শব্দে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। যারা অভ্যস্ত তারা পাশ ফিরে শোয়। কেবিনের সামনে বেতের চেয়ারটার উপর গলা পর্য্যন্ত একটা পাতলা র‍্যাগ জড়িয়ে সুমিত্রা সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ষ্টীমার ছাড়ার সঙ্গে রাত্রির জড়তা ভেঙে সেও একটা ছোট হাই তুলে ঠিক হয়ে বসে। ভৈরব নদীর জলকল্লোলের সঙ্গে ষ্টীমারের চাকার শব্দ, ইঞ্জিনের ঘসঘসানি প্রথমটা তার ভালই লাগে—কিন্তু তারপরই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা এমনি বিশ্রী বিরক্তিকর হয়ে ওঠে—সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর মাঝে এমন একটা অসাড়তা এনে দেয় যে ষ্টীমারের মত সেও যেন কাঁপতে থাকে। এ সুমিত্রার বহু বারের অভিজ্ঞতা।

সুমিত্রা সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—কেমন করে কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে নীল হয়ে ওঠে…কেমন করে সেই নীলের মাঝে আলোর ঢেউ এসে লাগে…পাড়ের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে জমাটবাঁধা অন্ধকারও কেমন করে আত্মগোপন করে। জেলেডিঙিগুলো সব জলের ওপর ভেসে পড়েছে—এক দল দুষ্ট ছেলে তাদের ডিঙি নিয়ে ষ্টীমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড় বাইবার চেষ্টা করে—কিছুক্ষণ পরে না পেরে উচ্চ হাসির সঙ্গে কি যেন বলে দাঁড় ছেড়ে দেয়। দুটি ছেলে একটি ডিঙি নিয়ে ষ্টীমারের পথ আগলে ধরে—ষ্টীমারের বাঁশী বেজে ওঠে—অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তারা পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে কৃতিত্বের নিদর্শন দেখায়—সারেঙ্গের গালাগাল শোনা যায়।

বসে বসে এই বিচিত্র জীবনের ছবি দেখতে খুবই ভাল লাগে। ষ্টীমার যখন ঘাটের ধারে এসে লাগে—সারেঙ্গ হাতের দড়িতে টান দেয়…ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে…বিচিত্র গতিতে কখনও আগে কখনও পরে যায়…ইঞ্জিন করে বন্ধ… এমন কৌতুক লাগে সুমিত্রার, প্রত্যেক বারই মনে হয় ঘাটের কিনারে ভিড়বার সময় কাঠের পাটাতনগুলি বুঝি ভেঙে যাবে। তারপরে জেলেরা মাছ নিয়ে আসে, চাষারা ডিঙি বোঝাই করে নিয়ে আসে তাব। যাত্রীদের সঙ্গে দরকষাকষি সুরু হয়…কেউ কেনে, কেউ কেনে না। ষ্টীমারের ঘণ্টা আবার বাজে, বাঁশীর গভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিলে কাঁপতে থাকে…চাকার শব্দ সুরু হয়…যারা আসে তারা ডিঙি নিয়ে সরে যায়। ষ্টীমার চলে, কাদামাখা উলঙ্গ ছেলের দল কাঁকড়া শিকার ফেলে হাততালি দেয়। প্রতিবারই সুমিত্রা হাতের বইখানি পাশে রেখে এই বিচিত্র বিশ্বলীলা দেখে। বিশ্বভুবনের মাঝে এই যাত্রাটুকু ওর কাছে এক খণ্ডকাব্য বলে মনে হয়।

সেদিনও জলসার ষ্টীমারঘাটে এমনি রেলিং ধরে দেখে—ঘাটে পাল্কী করে বৌ এসেছে, শ্বশুরবাড়ী যাবে বোধ হয় বিয়ের পর প্রথম স্বামীর ঘর করতে। চকচকে টিনের একটা ক্যাশবাক্স আরও কি কি যেন জিনিস দুটি ছেলে ধরাধরি করে ষ্টীমারে তুলে দেয়—হয়ত বৌটির ওরা ভাই। বিচ্ছেদের সময় যত নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে সঙ্গের মেয়েটির সহিত বৌটির কথা বলা যেন আর শেষ হয় না। সুমিত্রা ওদের পরস্পরের সম্পর্ক আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। মা ত নয়ই, কারণ বয়সটা মানায় না…বড় বোন বোধ হয়, ঘোমটা পরা মেয়েটির মুখ ভাল দেখা যায় না, সুমিত্রার তবু মনে হয় ওদের দু'জনের মুখের আদলে মিল আছে, বড় বোনই বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়েটি বৌটিকে ষ্টীমারের উপর তুলে দেয়। তারপর ষ্টীমার আবার ছাড়ে—বৌটির বাপের বাড়ীর গাঁ ছবির মত আকাশের পটে আঁকা থাকে। বিচিত্র কিছু নয়, আকৃষ্ট হবার মত কিছু নেই, নববধূ স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে, তবু কেন জানি না কি একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথায় সুমিত্রার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। বিস্তৃত নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি রোদ লেগে ঝকঝক করে মাছের আঁশের মত। দিক্‌চক্রবালে আকাশের সঙ্গে মাঠ মিশে গেছে—পাকা ধানের ক্ষেতের উপর সূর্য্যের আলো পড়ে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায়। কোথাও ধানকাটা সুরু হয়েছে—কর্ম্মব্যস্ত নিখুঁত পল্লীজীবন। ষ্টীমারের উপর দিয়ে এক ঝাঁক জলচর পাখী উড়ে যায়, ষ্টীমারের শব্দে তাদের ডানার শব্দ ভাল শোনা যায় না—তবু সে তাদের পানে চেয়ে থাকে, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—একটু আগে কি যেন তার হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ পিছনে চেয়ার টানার শব্দে ফিরে যাকে দেখে, সারা দুনিয়ার বিস্ময় এক সঙ্গে মিললেও সে বোধ হয় তার চেয়ে অধিক বিস্মিত হ'ত না। বাইশ বছর আগেকার দেখা—তা হোক তবু তফাৎটুকু ত—নাক চোখ মুখ সব ঠিক তেমনি আছে শুধু পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্যময় মাধুর্য্যে তা থমথম

করছে। চোখে চশমা, তা থাক সুমিত্রা'কেও আজকাল পরতে হয় ; অর্দ্ধেক চুল পেকে গেছে, তা থাক তার নিজেরও ত কম পাকে নি। হ্যাঁ ও শুভাংশু, নিশ্চয়ই শুভাংশু—সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একটা বিহ্বলতা, ঠিক তার রূপ নেই, ভাষা নেই ওকে যেন আচ্ছন্ন করে। একজন অপরিচিত পুরুষকে সম্বোধনের দ্বিধা ও জড়তার কথা ভুলে গিয়ে ও বলে—"শুভাংশু"—কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়। সে লোকটি ওর ডাকে আরও বিস্মিত হয়ে বলে—"হ্যালো, সুমিত্রা তুমি এখানে ?" ওর উজ্জ্বল কণ্ঠস্বরে মনে হয় এ যেন ওর নূতন আবিষ্কার—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কিছু কম নয়। সে ষ্টীমারে উঠে এক ভদ্রমহিলাকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল. কিন্তু সে যে সুমিত্রা, বাইশ বছর আগেকার সুমিত্রা…না না, বাইশ বছর পরের সুমিত্রা তা কি কল্পনা করতে পেরেছিল। পুরুষ হলে এতক্ষণে বোধ হয় বিস্ময় আর আনন্দের আতিশয্যে তাকে জড়িয়ে ধরত। সুমিত্রা সরে এসে বলে—'আমিও যে সেই কথাই জানতে চাই শুভাংশু ! তুমি এখানে ?' মৃদু হেসে একটা চেয়ার সামনে টেনে শুভাংশু বলে—'বস ! বলছি।' সুমিত্রার বুকের ভিতর তোলপাড় করে ওঠে, আবার সেই ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে হাত পাগুলোর বিশ্রী কাঁপুনি। শুভাংশু সুমিত্রার দিকে ভাল করে চেয়ে বলে, "তুমি যে একেবারে বুড়ী হয়ে গেছ সুমিত্রা !" সুমিত্রা হেসে বলে—"আর তুমি ?" শুভাংশু বলে—"বাস্তবিক, উঃ ! ইউনিভার্সিটি ছেড়েছি সেই ১৯২০-এ, আর আজ ১৯৪২। উঃ বাইশ—ব-ছ র ! হঁ্যা কি বলছিলুম। আমি একটা সরকারী কিশারি ষ্টীম নিয়ে বাংলার নানা জায়গায় আপাততঃ সার্ভে করে বেড়াচ্ছি—কিন্তু তুমি ?" সুমিত্রা তেমনি হেসে বলে—"আমি খুলনার ইন্সপেক্ট্রেস অব স্কুলস—সাতক্ষীরায় টুরে যাচ্ছি।" "ও-হ্যাঁ-[illegible]—" ভ্রূ কুঁচকে শুভাংশু বলে, "সতীশ একবার বলেছিল বটে—যে তুমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরী পেয়েছ। ভাল কথা—সতীশ, সতীশের কথা তোমার মনে আছে সুমিত্রা ! যে কলেজের সব কটি মেয়েকে সমান ওজনে ভালবাসত—আর অসীম ধৈর্য্যসহকারে তোমাদের কাছ থেকে সমান ওজনেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করত—সতীশ মারা গেছে।" —ব্যথায় শুভাংশুর গলাটা ভারী হয়ে আসে। সুমিত্রা ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করে—"মারা গেছে ? বল কি ?" "হ্যাঁ ভাই। শুধু কি তাই, ইুপিড বিয়েও করেছিল—বৌ, আর দুটো ছেলেমেয়েকে পথে বসিয়ে হতভাগাটা মলুল।" নারীসুলভ সহানুভূতিতে সুমিত্রার মন ভরে ওঠে, প্রশ্ন করে, "তাদের অবস্থা কেমন ?"

শুভাংশু বলে—"হোপলেস। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ঘরে যা হয় এক্ষেত্রেও হয়েছে ঠিক তাই—বাপের বাড়ী, ভাইদের বিশেষ করে ভ্রাতৃবধূদের গঞ্জনা—বোধ হয় আত্মহত্যাই করত যদি-না ছেলেমেয়ে দুটো থাকত। ভাল কথা"—একটু থেমে শুভাংশু বলে—"মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস—হাতের কাজ সেলাই-টেলাই মন্দ জানে না, তুমি চেষ্টা করলে বোধ হয় তাকে এই দীনতা থেকে রক্ষা করতে পারবে।"

"আচ্ছা দেখব—কিন্তু আপাততঃ তোমার হাত দিয়ে কিছু সাহায্য পাঠালে দোষের হবে কি ?—আহা সতীশ ! বাস্তবিক আমরা তার ওপর ভারী অবিচার করেছি।"

"বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের", একটু হেসে বলে, "কিন্তু 'পেমার্ণ্ট' নাকি ? কিন্তু তাতে কি সুবিধে হবে সুমিত্রা—সে ওই ভাই ব্যাটারাই মেরে দেবে। যাক, ওকথা ছেড়ে দাও, তোমাদের সেই কণা মেয়েটির খবর বল, মোষ্ট ইণ্টারেষ্টিং, সেই যে অদ্ভুত ভাবে নেচে নেচে চলত—আর কলেজের কোন ছাত্রকে দেখলেই চুড়িতে গোঁজা ছোট রুমালটা টেনে মুখটা একবার মেজে নিত।" সুমিত্রা ভাবে—ঠিক সেই আগেকার শুভাংশু—সেই উজ্জ্বল প্রাণসম্পদ যা সঙ্কোচের গণ্ডীকে ভেদে বন্ধুত্বকে নিবিড় করত। হেসে বলে—"তোমার চুলগুলো পাকলে কি হবে তুমি আজও ঠিক তেমনি 'সিলি' আছ। কণা এখন আর সেই কলেজের মেয়ে নয়—বল মেয়ের মা। এম-এ ফেল করেই ওর বরাত খুলে গেল—এখন ব্যারিষ্টারের বৌ, ওর ছেলেই ত থার্ড ইয়ারে পড়ছে—আর মেয়েটি, বাস্তবিক শুভাংশু, চলবার ভঙ্গীটা ঠিক মায়ের মত পেয়েছে, তেমনি নেচে নেচে চলে।"

"আচ্ছা প্রফেসর গুপ্তর কথা শুনেছ ? বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করেছেন—ওঁকে জেলে দেওয়া উচিত ছিল। আর আজকাল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছেলেগুলো একেবারে লাইফ-লেস, আমরা হলে ওঁর প্রফেসরী চাড়াতুম—তবে অত কথা।"

"তা পারতে।" সুমিত্রা মুখ টিপে হেসে বলে—"সেবারে তোমাদের সেই সৌমেন ছেলেটিকে…উঃ ছি ছি…শেষ পর্য্যন্ত তাকে কলেজ ছাড়িয়ে তবে ছাড়লে…আমি কিন্তু তোমার উপর ভারী চটেছিলুম।" দুষ্টামির হাসি হাসে শুভাংশু। সুমিত্রা বলে—"আচ্ছা তোমাদের সানের খবর কি ? রিমলেস চসমা পরে মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লিখত—আর সতীশের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত। একবার একটা মোটা কবিতার খাতা আমায় দিয়ে বলেছিল, পড়ে অভিমত লিখে দিতে—শেষে সাদা পাতা আছে। আমার মনে আছে আমি লিখে-ছিলুম, ইস্পাত না হলেও মাজলে ঘষলে ধার হতে পারে—উঃ বেচারা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। তোমাদের সান কোথায় ?" শুভাংশু হেসে বলে—"সানের খবর রাখ না ? আরে, সে যে এখন মস্ত বড় ব্যবসাদার—শেয়ার মার্কেটের কত বড় দালাল, লাখ টাকা যখন-তখন বার করে দিতে পারে। রিমলেস চশমা

এখন আর পরে না, মোটা লেন্সের চশমা পরে—আর শরীরটি এখন আর তন্বী নেই, একেবারে বপুতে পরিণত হয়েছে। তবে এটা সত্যি সুমিত্রা যে তোমাকে বিয়ে করবার জন্য ও বেচারা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল—আর করলেও বোধ হয় ঠকত না।"—হেসে শুভাংশু কথা শেষ করে।

"সিলি"—কপট ক্রোধের সঙ্গে সুমিত্রা বলে—"কিন্তু বেলা ত বেশ হচ্ছে—আজকে কি আর খাওয়া-দাওয়া হবে না?"

"না হলেও আপত্তি নেই, কারণ আমি ও কাজটা সেরেই উঠেছি—তবে তোমার আতিথ্য নেওয়ার সৌভাগ্যকে"…কথা শেষ না করে সুমিত্রার পানে চায়। সুমিত্রা লজ্জিত হয়ে উঠে যায়।

খাওয়া-দাওয়া সংসামাপ্ত। প্রৌঢ় বয়সের তীর থেকে ওর কলেজ জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলিতে ফিরে এসেছে—কত স্টীমারঘাট এল, গেল—কে উঠল কে নামল তার খেয়াল নেই। সেই হাসি, সেই গল্প, ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপক বোসের মোটা চশমার ফাঁকের মধ্য থেকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকা…প্রোফেসার বানার্জির অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গী…বিনয়ের পশুপক্ষীর গলার ডাক অনুকরণ করা একেবারে হুবহু…হেনাকে বিশুর চিনেবাদাম ছুঁড়ে মারা…সতীশের সঙ্গে মারামারি…মীরা…শোভনা…রঞ্জিত আজ তারা জীবনের কে কোন্ স্তরে অধিষ্ঠিত, এ সকলের মুখর বর্ণনায় বাইশ বছর আগেকার দুটি অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী আবার যেন প্রথম যৌবনের আনন্দ-বেদনা-রসে উজ্জ্বল দিনগুলিতে ফিরে এসেছে। হঠাৎ শুভাংশু বলে—"কি সুমিত্রা আজকাল আর কবিতা লেখ না, আচ্ছা তোমার সেই কবিতাটি মনে আছে—যেটা তুমি আশুতোষ হলে 'বিশ্ব-সাহিত্যের পরিণতি' বলে প্রবন্ধ শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলে, কিন্তু সাহস করে নীচে নাম দাও নি—তোমার মনে আছে সুমিত্রা?" সামনে ঝুঁকে শুভাংশু প্রশ্ন করে। 'যাও জানি না' বলে সুমিত্রা লজ্জিত মুখখানি ফিরিয়ে নেয়।

আমার কিন্তু হুবহু মনে আছে, এমন কি দুটো বানান ভুল করেছিলে তাও—শুনবে, শোন—

> বর্ষার আশীষ তৃপ্ত উদ্বেলিত গিরিনদী তুমি—
> প্রাণের বন্যায় বেগে বাঁচাইবে এই মর্ত্যভূমি

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বলে—"হয়েছে, থাক।"

"থাক কি সুমিত্রা—জান? ইতিহাসে যা কখনও ঘটে নি যা কেউ কখনও কল্পনা করে নি, তুমি তাই করেছিলে…মেয়ে হয়ে ছেলেকে উদ্দেশ করে কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলে। কিন্তু মনে আছে—সেবার তোমায় কি ভীষণ জব্দ করেছিলুম। সেই কবিতা হাতে কোরিডোরে তোমায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলুম, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের সেক্রেটারির কাছে নালিশ করব। সত্যিই তোমাকে সেদিন কি নাস্তানাবুদ হতে দেখেছিলাম সুমিত্রা—যাকে আমরা ভাল বাংলায় বলি বেপথুমতী—একেবারে ঠিক তাই। তার পর তোমায় আশ্বাস দিয়ে আমি যে কবিতা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম—মনে আছে?"

"আছে—দেখতে চাও"—সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে বলে।

"কি পাগল—তুমি কি আজও তা রেখে দিয়েছ"—বিস্মিত হয়ে বলে শুভাংশু।

সুমিত্রা সে কথার উত্তর দেয় না। বলে—ভাল কথা—পাগলামি করতে করতে তোমার আসল কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি—তোমার বৌ, তোমার ছেলেমেয়ে…পূর্ণ দৃষ্টিতে সুমিত্রা শুভাংশুর দিকে চায়।

শুভাংশু হো হো করে হেসে বলে—"ওনলি ইন ড্রিমস্ (কেবল স্বপ্নে) সুমিত্রা—ওনলি ইন ড্রিমস্।" তার পর নিজের আধ পাকা আধ কাঁচা চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে—"কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে!" একটু পরে শুভাংশু কেমন গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—"তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে যে তুমিও বোধ হয় এই কাজটা করবার সুযোগ করে উঠতে পার নি, কিন্তু তবু তোমায় ফ্র্যাঙ্কলি বলি এ দুর্ব্বুদ্ধি না হলেই ভাল হ'ত।"

সুমিত্রা ওর দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। শুভাংশু নিজের খেয়ালে বলে চলে—"দেখ সুমিত্রা, সত্যি কথা বলতে কি—"আই ডোণ্ট সো মাচ ফিল ফর এ ওয়াইফ বাট, বাট আই লং ফর এ চাইল্ড—এ চার্মিং চাইল্ড"—(স্ত্রীর অভাব ততটা আমি অনুভব করি না, কিন্তু ছেলে—একটি সুন্দর ছেলে আমি চাই)। একমাথা কোঁকড়ানো চুলওয়ালা একটি সুন্দর শিশু আমায় 'বাবা' বলে গলা জড়িয়ে ধরছে—ওঃ, হাউ ডু আই ফিল ফর ইট, এণ্ড ফিল হাউ প্যাথেটিক্যালি (আঃ, কেমন করে—কি তীব্র ভাবে আমি এ অভাব বোধ করছি), ছোট সুন্দর শিশুর দিকে চাইলে চোখ ফেরাতে পারি না…'হোয়াট এ পিটি' " (কি শোচনীয় অবস্থা)।

সুমিত্রা শুভাংশুর দিক থেকে মুখখানা একেবারে ফিরিয়ে করে বাইরে জলের দিকে চেয়ে থাকে। শুভাংশু কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে যায়। তার পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কথার সুর পাল্টে বলে—"আচ্ছা! তোমার সেই বদমেজাজী মামাটি এখন কোথায়, যিনি যে-কোন ছেলে আর মেয়েকে কথা কইতে দেখলে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে মনে করতেন।" সুমিত্রার দিক থেকে কোন সাড়া আসে না—শুভাংশুর রসিকতাও ঠিক জমে না, ও আস্তে আস্তে রেলিং ধরে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে কথা আরম্ভ করবার চেষ্টা করে বলে—"ইস্ সুমিত্রা, তোমার চুলগুলি বাস্তবিকই বেশী পেকে গেছে—আমার চেয়েও—আচ্ছা চলত আয়নার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি কার বেশী পেকেছে"—কথাটা একটু ঝুঁকে অনুনয়ের সঙ্গে বলতে গিয়ে দেখে, সুমিত্রার দু' চোখ ছাপিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। ব্যস্ত

হয়ে উঠে শুভাংশু বলে, "ছি ছি—আমি কি তোমার মনে আঘাত দিলাম সুমিত্রা—ভারি অন্যায় হয়ে গেল ত।" একটু প্রবোধ দেবার ছলে বলে, "দেখ, পাকা চুল বলে সত্যিই তোমায় ব্যঙ্গ করতে চাই নি—বরং এই বয়সে চুলগুলোর কাঁচা থাকাই যে অগৌরবের সুমিত্রা।" ওর ইচ্ছে করে সুমিত্রার মাথার উপর হাত রেখে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক সাহস পায় না। এক একবার মনে হয় এই পাকা চুলের প্রাচীর কি এই সহানুভূতির স্পর্শকে তথাকথিত শিষ্টাচারের গণ্ডীকে অটুট রাখবে না। জোলো বাতাস লেগে সুমিত্রার চুলগুলো—বিশেষ করে পাকা চুলগুলোই যেন উড়ছে বলে মনে হয়। সুমিত্রা কান্না আর কিছুতেই চাপতে পারে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে গিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করে। শুভাংশু কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়—ওর কথায় বা আচরণে সুমিত্রাকে কোথায় ব্যথা দিলে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মনে সেই কথাই ভাবতে থাকে। হঠাৎ ষ্টীমারের বাঁশীর গম্ভীর স্বর ঘাট যে অদূরবর্ত্তী সেকথা ঘোষণা করে। আর্দালী এসে বলে, "আসাসুনী এল, নামতে হবে।"

শুভাংশু সুমিত্রার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে বলে, "সুমিত্রা দোর খোল—এবার আমায় নামতে হবে।"

সুমিত্রা দোর খুলে বেরিয়ে আসে—চোখে সুস্পষ্ট জলের দাগ, চাপবার চেষ্টা করে না। ভারী গলায় বলে, "তুমি সাতক্ষীরে যাবে না?"

"যাব, তবে দু' চার জায়গা ঘুরে যেতে হবে"—অল্প হেসে শুভাংশু উত্তর দেয়।

"কেন?" অল্প রুক্ষস্বরে বলে সুমিত্রা।

অদ্ভুত প্রশ্ন। শুভাংশু উত্তর না দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "বাস্তবিক আজকের দিনটি ভারি সুন্দর কাটল—যেন স্বপ্নের মত। উঃ! বাইশ বছর আগেকার দিনগুলোকে ফিরে পাওয়া—আশ্চর্য্য! বাইশ বছর আগের সুমিত্রা......আচ্ছা সুমিত্রা, তুমি যখন ইন্সপেকশনে যাও মেয়েরা তোমায় ভয় করে?"—তার কণ্ঠে বেজে উঠে আসন্ন বিদায়ের সুর।

সুমিত্রা এসব কথার উত্তর দেয় না, বলে, "সতীশের বৌয়ের ঠিকানাটা দাও সে কি বাইরে চাকরি করতে পারবে?" শুভাংশু বলে, "নিশ্চয়ই"—তারপর নোটবুক থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে ঠিকানাটা টুকে দেয়। সুমিত্রা দেখে সেই বাইশ বছর আগেকার লেখা একটুও বদলায় নি। লেখবার সময় নীচের ঠোঁটটাকে ঠিক তেমনি করে কামড়ায়।

ষ্টীমার ঘাটে ভিড়ল। শুভাংশু টুপিটা মাথায় দিতে দিতে বলে, "আসি সুমিত্রা।"

সুমিত্রা জলভরা শ্রান্ত চোখ দুটি তুলে ওর পানে তাকায়, তারপর চোখ নত করে কি যেন বলবার ইচ্ছে করে—ওর ঠোঁট দুটো শুধু কেঁপে ওঠে—কিন্তু কিছুই বলা হয় না। শুভাংশু নেমে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নদীর জলের উপর শেষ সূর্য্যাস্তের আলো ঝলমল করে, আর একটা কোন্ ঘাটে সেই বধূটি নেমে যায়। এবারও সুমিত্রা চেয়ে চেয়ে দেখে বটে, কিন্তু সে আর ওর মনকে স্পর্শ করে না। অন্ধকার হয়ে আসে, ষ্টীমারের সার্চলাইটের আলো ঘুরে ঘুরে দু'পাড়ের উপরে পড়তে থাকে। নদীর উপর নৌকার বুকে দীপ জ্বলে, ষ্টীমারের ঢেউ পৌঁছাবার আগে পর্য্যন্ত আলোর ছায়া জলের তলে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যায়। তারপরে ঢেউ লেগে তারা ভেঙে যায়—নৌকাগুলো দুলতে থাকে···দীপশিখা দূর আকাশে তারার মত মিট্‌মিট্ করে। তীরের উপর গ্রাম থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসে···আকাশে সন্ধ্যাতারা দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে···সুমিত্রা চেয়ে চেয়ে এমনি গ্রামে একটি সংসার রচনার স্বপ্ন দেখে, স্বামী, পুত্র, কন্যা···একমাথা কোঁকড়া চুলওয়ালা সুন্দর শিশু ওর কোল থেকে দৌড়ে গিয়ে কার গলা জড়িয়ে যেন 'বাবা' বলছে···চকিতে মনে পড়ে শুভাংশুর কথা—'আই লং ফর এ চাইল্ড···এ চার্মিং চাইল্ড···।'

সুমিত্রা চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে। তারপরে ভাষাহীন উদাস দৃষ্টিতে ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে; ডেক চেয়ারটায় হেলান দিয়ে—চলৎ-শক্তিহীন রোগীর মত।

নেপালে ভাইপূজা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

নেপাল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বহু দূরে হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে সুরক্ষিত দেশ। কিন্তু যখন এদেশের আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি লক্ষ্য করি, তখন বাংলার সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। এই ঐক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন নেপাল ও বাংলার ভাষা তুলনা করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার ফলে নেপালী ও বাঙালী-দের অতীত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সম্ভাবনার কথা মনে জেগে ওঠে।

আজ 'ভাইপূজার' বিবরণ বলব। বাংলাদেশে যে পার্ব্বণকে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে নেপালে তাকেই 'ভাইপূজা' বলে। এই পার্ব্বণের উদ্দেশ্য ও মাধুর্য্যের কথা ভাবলে স্বতই মনে হয় আমাদের এই নবজাগরণ—এই জাতীয় একতা সাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত।

নেপালে সকল জাতই ঠিক একই প্রথানুসারে 'ভাইপূজা' করে না। ব্রাহ্মণ ছত্রী প্রভৃতির নিয়ম এক রকম, আর নেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ নেওয়ারদের ভাইপূজার কথাই বলব।

ভাইপূজা হয় সন্ধ্যার পর। ভাইপূজার প্রথমে ঘরের মেঝেতে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্ত এক একটি মণ্ডল আঁকতে হবে। মণ্ডল আঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জলের আলপনা দিয়ে তার উপরে তেলের দাগ দিতে হবে। এই তেলের দাগের উপরে আবার শুকনা চালের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা টানতে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে ঠিক মাঝখানে কিছু কিছু ধান রেখে তার উপরে আস্ত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরি করতে খুব সাবধান হতে হয় যেন একটুও না ভাঙে। সেই চালের উপরে ফুল* ও ধুনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে 'যজন্কা'। আঙ্গুলে তৈরি সুতোর ছোট পৈতার নাম ও দেশের ভাষায় বলে 'যজন্কা'।

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে মুখ করে বসবে। বোন তখন 'সগুন্' বা 'সগুন্' এনে একে একে ভাইদের হাতে তুলে দিবে।† মদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে তান্ত্রিক-মন্ত্র পাঠ করে 'সগুন' তৈরি করা হয়। ভাই ভক্তি-ভরে ওটা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন যদি ছোট হয়, তবে বোন ভাইকে প্রণাম করবে। তারপর ভাই সেই সগুন খাবে। খাওয়ার নিয়ম—এক একটি জিনিস নিয়ে তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম। যাঁরা দীক্ষিত তাঁদের প্রত্যেকটি জিনিস খাবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে—প্রথমে ডিম এবং শেষে আদা খাওয়ার নিয়ম। 'সগুন' দেওয়া হলেই বোন ভাইকে 'টীকা' বা 'সিন্' (অর্থাৎ ফোঁটা) দেয়। শ্বেতচন্দন, 'অক্তা' (চাল), দই এই তিন জিনিস দিয়ে ফোঁটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তারপর দই ও অক্ত্য দিয়ে কপালে ফোঁটা দিতে হবে। যাঁরা যজ্ঞ করেন তাঁরা যজ্ঞভস্ম দিয়ে সবচেয়ে আগে ফোঁটা দেন। 'সগুন' খাবার সময় বোন খই এবং নানা ফলের টুকরা ভাইয়ের মাথায় এমনভাবে ঢেলে দেবে যেন সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর মাটিতে যা পড়ল তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটি শালপাতার 'দোনা' বা 'টপরা' বা 'ঠাহয়ে'র (ঠোঙাকৃতি) মধ্যে নানা রকম ফল (তার মধ্যে আখরোট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং 'বিমিরা' লেবু থাকা দরকার), একটি সুপারি, পয়সা, 'যজন্কা' (এটি ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং ফুলের মালা রেখে সেই ঠোঙাটি ভাইকে দিতে হবে। ভাই তা গ্রহণ করে রেখে দেবে।

এর পরে কয়েকটি পলতে একত্র করে তার দুই মুখে আগুন ধরিয়ে বোন তা দু'হাতে ধরে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আগুন স্পর্শ করে হাত মাথায় ছোঁয়াবে। বোন তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আড়াআড়ি করে এমন ভাবে রাখবে যেন চার জায়গায় ধানের উপর জলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাঁট দিয়ে সব পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কিন্তু পলতে রাখবার পরে এবং পরিষ্কার করবার মধ্যে বাতি নিভতে পারবে না।

সব পরিষ্কার হলে ভাই নিমন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়াটা দেবে বোন। কিন্তু এ নিমন্ত্রণে ভাত খাওয়া চলবে না। যে সব জিনিস খাওয়া হয় তার মধ্যে চিঁড়াই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোনকে শাড়ী ও টাকা ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাইপূজার দিন বোন সারাদিন উপবাস করে আচার-পর্ব্ব শেষ হলে তারপর খায়।

---

* যে কোন ফুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে যাকে "ভগারি" ফুল বলে তাই প্রশস্ত। তা না জুটলে "ছাইপত্রি" বা গাঁদাফুল দরকার।

† নেওয়ার ভিন্ন অন্ত জাতের ভিতরে 'সগুন' খাওয়ার নিয়ম নাই।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, "দেখিলাম অনেক কিছু আর বুঝিলামও অনেক কিছু। সেকথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।" এখন বলা যাক সেই সকল কথা।

দেখিলাম যাহা তাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, মানুষের ইচ্ছা যদি সজ্ঞবদ্ধ চেষ্টার সহিত যুক্ত হয় তবে এ জেলার উন্নয়ন অসাধ্য নয়। যাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় যাহা হইয়াছে তাহা সামান্য, কিন্তু তাহা পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্তরূপ অমূল্য। সেচ যেখানে হইয়াছে সেখানেই সোনার ফসল ফলিতেছে এ তো স্বচক্ষেই দেখিলাম, আরও দেখিলাম যে, জলের সমস্যাপূরণও অসম্ভব নয়। সমস্যা এই মাত্র, কি করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখা যায়। অবশ্য এ সমস্যা "এইমাত্র" বলার অর্থ এ নয় যে, উহা অতি সহজসাধ্য। বরং ইহাই বলা উচিত যে, অজস্র অর্থব্যয় এবং প্রভূত পরিশ্রম ভিন্ন তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, পিতৃপিতামহগণ এ বিষয়ে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও সঠিক এবং কার্য্যকরী।

কিন্তু শুধু অর্থব্যয়ে যদি এ কাজ করিতে হয় তবে কুবেরের ধনও তাহার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। বিদেশী ঠিকাদার, বিদেশী মজুর ও সরকারী ধনদৌলতের সাহায্য ও চেষ্টার অপেক্ষায় যদি দেশের লোক বসিয়া থাকে তবে বাঁকুড়ার এ ক্ষয় কোনদিনই যাইবে না। কেননা উহাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা বাংলা সরকারের তহবিলে নাই ও আগমনের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন তাহার এক-দশমাংশও জুটিবে না এবং কেন্দ্রের সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও কম, কেননা কেন্দ্রীয় লোকপরিষদে বাঁকুড়ার কথা বলিবার লোক কেহ নাই।

পথঘাটের ব্যাপারেও দেখিলাম উপযুক্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা যদি থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি সুষ্ঠু ভাবে পূর্ত্ত বিভাগের কাজ চালানো হয় তবে বাঁকুড়ার দুর্গমতম অঞ্চলও সুগম করা সম্ভব হয়। এ জেলার মাটি শক্ত ও কঙ্করবহুল সুতরাং পথঘাট নির্ম্মাণ—বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে—অতি সুন্দর ভাবে হইতে পারে। যে অঞ্চলে নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে সেখানকার কৃষি ও কুটীরশিল্পের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গেই হইবে সুতরাং পথ নির্ম্মিত হইলে পরে তাহা সংস্কার করা দুরূহ হইবে না।

খোয়াই তো চতুর্দ্দিকেই রহিয়াছে এবং বৃদ্ধি পাইতেছে। আজিকার শস্য-শ্যামল ক্ষেত সামান্য কয় বৎসরেই ধূলায় ধূসর অনুর্ব্বর প্রান্তরে পরিণত হইতেছে। চাষীর সাধ্য নাই একাকী খোয়াই রোধ করে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় দেখিলাম দুই-এক স্থলে তাহার সুদৃঢ় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে এখানেও সেই এক কথা, যাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় হইয়াছে অল্পই এবং যে ভাবে ও যে উপায়ে ইহা হইতেছে তাহাতে সমগ্র জেলার সমস্যা-পূরণে যে সময় বা অর্থ লাগিবে তাহা কল্পনারও অতীত। আরও কয়েক স্থলে দেখিলাম, যেখানে চাষী এখনও অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও কর্মঠ আছে এবং যেখানকার স্থানীয় ভদ্র গৃহস্থ শ্রেণী শহরের মোহে পড়েন নাই, সেখানে সেচ ও সংরক্ষণের চেষ্টা গ্রামের লোকেই করিয়া চলিতেছে এবং সেখানে এই দুই বিষয়েই স্থানীয় লোকের অবস্থা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উন্নত। সেখানে সরকারী সাহায্য যথাযথ রূপে প্রদত্ত হইলে তাহার উন্নয়ন সহজ ও দ্রুত হইয়া যায় এবং সরকারী সাহায্যের প্রয়োগ শুধু যে যথাযথ হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে উহা সময়মতও হওয়া আবশ্যক নচেৎ এখানকার চাষীও ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে যেভাবে অন্য অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হইয়াছে।

দেখিলাম স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নও কিছু অসাধ্য ব্যাপার নহে। ম্যালেরিয়া দমনের বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুই-এক অঞ্চলে ঐরূপ কাজ চালানোর ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষভাবে কমিয়াছে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়ায় সেখানকার চাষী পুরাদমে ক্ষেতের কাজ চালাইতেছে এবং তাহাতে তাহার দুর্দ্দশাও দূর হইবার আশা বাড়িতেছে। এ ক্ষেত্রেও সমস্যা একই—অর্থবল, লোকবল ও যথাযথ চেষ্টার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এক দিকে প্রয়োজন মশক-ধ্বংস ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, অন্য দিকে চাই পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপারে বাঁকুড়ার সহায় সম্পদ ছিল গোধন এবং দো-ফসলা জমি, যেখানে ডাল, সরিষা ও গম জন্মাইত প্রচুর। চাষী সুস্থ ও সবল না হইলে বাঁকুড়ার জমিকে সুফলা করা অসম্ভব। আবার সেচ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে দুইটি ফসল স্বপ্নেরও অতীত। জঙ্গল নির্ম্মূল হওয়ায় কাঠের বদলে ঘুঁটের প্রচলনে ক্ষেতে সারের অভাব যথেষ্ট। আবার কৃত্রিম সার শহর হইতে দূরে লইতে হইলে পথঘাটের

অভাব খরচ ও পরিশ্রমও অশেষ এবং ফসল ফলিলেও যদি বৎসরের খরচেই তাহার দাম চরমে উঠে তবে চাষীর আয় হয় কিসে?

সুতরাং সমস্যা বহুমুখী। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা রহিয়া গিয়াছে দেশের লোকের মানসিক অবস্থার মধ্যে। চতুর্দ্দিকের সমস্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য যে প্রচেষ্টার আবশ্যক তাহার একান্ত অভাবই দেখিলাম সর্বত্র।

যদি দেশের লোককে একথা বুঝান যায় যে, তাহারা নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করিলে তাহাতে আরও দশ জনের এবং সরকারী সাহায্যও পাইবে, যদি নির্জ্জীব লোককে সজীব করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে কর্ম্মঠ স্বেচ্ছাসেবক দল জোটে তবে সরকারী হাজার টাকায় এখন যাহা হইতেছে তাহা তাহার এক পঞ্চমাংশেই সম্ভব হইবে। বহুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় ঐ চেষ্টা গুরুসদয় দত্ত মহাশয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী সাহায্য একেবারে না আসায় তাহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ব্যাহত হইয়া যায়। সেচের কাজ, পথঘাট নির্ম্মাণ সবকিছুই মানুষের কায়িক পরিশ্রমে হয় ভাগ, অল্পই হয় যন্ত্র-সাহায্যে, বাঁকুড়ার মত দেশে যেখানে বেশীর ভূমিপৃষ্ঠ অসমতল।

আজ বাঁকুড়ার লোকের যেরূপ মানসিক অবসাদ, যেরূপ নিদারুণ কর্মবিমুখতা, তাহাতে দেশের লোকের মনে নূতন বল আনা সহজ নয়। দেশে নেতৃত্ব নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে একথা আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে।

যে নূতন পথটি বাঁকুড়ার অতি দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া চব্বিশ মাইল সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে তাহার দুই পাশের গ্রামে অসংখ্য দরিদ্র লোকের বসতি। আমরা পথ দেখিতে যখন গিয়াছিলাম তখন এক স্থলে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা জীপ থামাইয়া বর্ষাতি পরিতেছি এমন সময় এক দল স্ত্রীলোক ছুটিয়া আমাদের সামনে পথ পার হইল। তাহাদের সকলেরই বস্ত্রের অভাব—জীর্ণ শতছিন্ন কাপড় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া যাওয়ায় লজ্জা নিবারণের উপায় নাই। এই বস্ত্রাভাবের প্রধান কারণ অর্থের অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা টাকা গুনিলে চোরাকারবারীর কাছে কাপড় পাওয়া যায় এ কথা সকলেই জানে।

যে পথটি ঐ স্ত্রীলোকের দল ছুটিয়া, মুখ ফিরাইয়া পার হইল তাহা সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে এবং নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা কুলিকামিনকে দিতে হইয়াছে। অথচ শুনিলাম, সে সকল মজুরদের প্রায় সবই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনিতে হইয়াছিল। স্থানীয় দরিদ্র লোকের ঘরের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জনে প্রস্তুত নয়।

ঐ একই কথা বীরভূমে শুনিয়াছিলাম ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজে। সেখানে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে গঞ্জাম অঞ্চলের উড়িয়া মজুর ও মজুরনী এবং বাঁকুড়ার লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে মানভূম ও ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুণ্ডা ও কোল।

দেশের অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকের বুদ্ধি অল্প, তাহারা স্বাবলম্বনের পথ তখনই দেখিবে যখন শিক্ষিত গৃহস্থের সন্তান সেকথা তাহাদের বুঝাইবে। সে চেষ্টারও অভাব বেশী স্পষ্ট দেখিলাম, যে কয়জন উৎসাহী লোক এ বিষয়ে চেষ্টিত তাহাদের সাহায্য করা দূরের কথা, সহানুভূতিও কদাচিৎ দু-একজন প্রকাশ করেন।

তবে বাঁকুড়ার উন্নয়ন কি করিয়া সম্ভবপর? সম্ভব তখনই হইবে যখন ইহার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশস্থ কয়েকজন গণসেবক প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবল। তাহার জন্য উভয় স্থলেই তাঁহাদেরই নির্ব্বাচিত লোক থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদের প্রয়োজন জেলা বোর্ডের ও জেলা পরিচালকের ভারপ্রাপ্ত অধিকারীবর্গের সাহায্য। সেজন্যও তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে উপযুক্ত লোকের জন্য দাবি করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি তাঁহাদের প্রয়োজন দেশের লোকের কায়িক ও মানসিক উদ্যম। ইহার জন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন।

যদি উপযুক্ত নেতৃত্ব তাঁহারা লাভ করিতে পারেন তবে সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। তবে বহুদিন যাবৎ বাঁকুড়া ঘুরিয়া দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে নেতৃত্বের একান্ত অভাবই সুস্পষ্ট।

বাঁকুড়ায় কংগ্রেসী দল দুই ভাগে বিভক্ত—নির্জীব ও সজীব। নির্জীব দলে সৎ লোক আছেন যাঁহাদের সদিচ্ছা ও সঙ্কল্প মনের মধ্যেই থাকে। সজীব দলে স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্য কিছু খুবই কম। সুতরাং কংগ্রেসের দ্বারা বাঁকুড়ার সমস্যাপূরণ তখনই সম্ভব হইবে যখন উহার বর্ত্তমান কাঠামো বিসর্জ্জন দিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা হইবে।

অন্য দিকে বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ সম্বন্ধে চিন্তা ও কংগ্রেসের ধ্বংস-চেষ্টার বাহিরে কিছু ভাবিবার অবকাশ এত দিন পান নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

বাঁকুড়া জেলা ক্ষয়ের মুখে চলিয়াছে কেন সে কথা তো বলিলাম। কিন্তু আশার আলোক যে একেবারে নাই তাহাও নয়। ইতিমধ্যেই দু'চার স্থলে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইতেছে শুনিলাম। তাঁহারাই দেশের আশা ভরসা।

অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলন

ষোড়শ অধিবেশন, লক্ষ্ণৌ

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

বিগত ১৬ই আশ্বিন হইতে লক্ষ্ণৌ শহরে অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী ষোড়শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ইন্দোনেশিয়া, চীন, তুরস্ক, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রাচ্যবিদ্যানোদী সদস্যেরা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মূল সভাপতি অধ্যাপক কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী স্বীয় সুচিন্তিত অভিভাষণে দেশে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের আনুষঙ্গিক কুফল, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা ও নৈতিক অবনতি, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের কুয়াসাচ্ছন্ন ধারণা প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা এবং এই সভ্যতা সঙ্কটে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চ্চার উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ পরিহার করিয়া সত্য, ধর্ম্ম ও অহিংসা পূত স্বীয় ঐতিহ্যের উপর জাতিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন—নিখিল ভারতীয় গবেষণা মন্দির স্থাপন এবং প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি কামনা করিয়াছেন—বিচারপূর্ব্বক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণের সপক্ষে ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিপক্ষে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন—পরিশেষে ভারতে এবং বিদেশে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছেন।

স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি আচার্য্য শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চার ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক ঐ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দান শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনগণের উত্থান ও পতন, শক্তি ও দুর্ব্বলতার প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বিবৃত করিয়াছেন।

প্রারম্ভিক বক্তৃতায় উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বর্ত্তমানের পটভূমিকায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া ভবিষ্যতে অনুরূপ সর্ব্বতোমুখী সংস্কৃতিগঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

সম্মেলনে শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং কৃত কর্ম্মের আলোচনা ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা-সভাপতির অভিভাষণসমূহ বিন্যাস করিতে গিয়া প্রত্যেকের জন্য মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অথচ অধিকাংশ অভিভাষণই উক্ত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হওয়ায় সদস্যেরা সকল সভাপতির ভাষণ শ্রবণের পূর্ণ সুযোগ পান নাই। তদুপরি বেশীর ভাগ শাখা-সভাপতির ভাষণ মুদ্রিত না হওয়ায় বিশেষতঃ লৌকিক সংস্কৃত শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রী কে. কে. হাণ্ডিকী মহাশয়ের সুচিন্তিত ভাষণ অতি অল্প সংখ্যায় পরিবেশিত হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হইয়াছিল।

বিভিন্ন শাখায় নানা বিষয়ে প্রায় পৌনে তিন শত প্রবন্ধ পঠিত অথবা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক শাখায় প্রবন্ধসংখ্যা বেশী হওয়ায় পাঠ এবং আলোচনা বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ ও তাহার সারাংশ প্রেরণের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহা যথাযথ ভাবে অনুসৃত হইত না। একত্র সারাংশ মুদ্রণে বিশেষ অসুবিধা হইত। নূতন ব্যবস্থায় প্রবন্ধ ও তাহার সারাংশ অধিবেশনের অন্ততঃ চারি মাস পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। তাঁহারা অধিবেশনের এক মাস পূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত সারাংশগুলি সদস্যদের নিকটে পাঠাইবেন। সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠের ক্রম এবং সময়সূচী নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই নিয়ম অনুসৃত হইলে সদস্যবর্গের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়। প্রবন্ধের সারাংশের সঙ্গে মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদিগের অভিভাষণসমূহ মুদ্রিত হইলে আরও ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় একবার মুদ্রিত ভাষণ সভায় বিতরণ করা হয় এবং পরে কালক্রমে কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়া উহা দ্বিতীয়বার সদস্যদের নিকট পৌঁছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দুই বার ছাপাইবার অসুবিধাও দূর হইতে পারে।

অধিবেশনে হায়দরাবাদের অন্তর্গত পিতলকোরা এবং পাটনার অন্তর্গত কুমারহারের আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে আলোকচিত্র সহকারে দুইটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন সাহিত্যের স্থান এবং রাষ্ট্রভাষার স্বরূপ নির্ণয় ও উন্নয়ন সম্পর্কিত দুইটি আলোচনা সভারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অভ্যাগত সদস্যদের আনন্দবিধানের জন্য লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নামক সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মৌলিক উচ্চারণবিধি সর্ব্বত্র অনুসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশীয় শ্রোতার কাছে স্বাধীন

প্রভাবযুক্ত সংস্কৃত উচ্চারণ শ্রুতিকটু বোধ হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের বিদ্যার্থীবৃন্দ হিন্দী নাটক স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিনয় করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর গ্রন্থশালায় একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহাতে সম্মেলনের সদস্যেরা বহু মূল্যবান্ সংস্কৃত ও ফারসী পুঁথি দেখার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নিম্নতম শ্রেণীসমূহ হইতে বাধ্যতামূলক সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, পুণা ভাণ্ডারকর গবেষণাগার এবং হোসিয়ারপুর বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক গবেষণাগার হইতে প্রকাশ্যমান মহাভারত এবং বৈদিক শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য সাহায্য দান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিংহলে বৌদ্ধবিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সিংহলের জনসাধারণ এবং সরকারকে অনুরোধ, মিথিলা সংস্কৃত গবেষণামন্দির, রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, জয়সওয়াল গবেষণা মন্দির এবং মগধ পালি গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্য বিহার সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, রাজস্থানের ইতিহাস সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উন্মুক্ত করিবার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গকে অনুরোধ এবং রাজস্থান পুরাতত্ত্ব মন্দির স্থাপনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য্য পরিচালন প্রবং এবন্ধ প্রস্তুতিতে ইংরেজীর সহিত হিন্দী ভাষার ব্যবহারও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন আগামী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহ্‌মদাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলন পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত এবং ইহার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে মাত্র তিন দিন সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ইহার সকল কার্য্য সম্পাদন সম্ভবপর নহে। ফলে এবার পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত হারদই ভ্রমণ কর্ম্মসূচী হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেস এবং ইতিহাস কংগ্রেসের সহিত অধিকার বিভাগ করিয়া লইলে সম্মেলনের ভার লাঘব এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিস্তৃতি সম্ভবপর। হস্তলিখিত পুঁথি সম্পর্কে সম্মেলনের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা অনেকেই আবশ্যক মনে করেন। অথচ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার সন্নিবেশ অসম্ভব।

সম্মেলনে বঙ্গীয় সদস্যসমূহের সংখ্যাল্পতা অনেকেই দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহার সহিত যুক্ত হইলে সম্মেলনের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

সমস্যা—পথ কোথায়?

শ্রীবীণা রায় চৌধুরী

কি কঠিন সমস্যা চারিদিকে! অভাব ও দুর্নীতি চলছে পাশাপাশি। মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের চেতনা ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভাবছি অক্ষমতার কি বিপুল বোঝা আমাদের বইতে হবে, যদি না অগণিত ছেলেমেয়ের সামনে তুলে ধরি উচ্চ আদর্শ, যদি না পরিচালিত করি তাদের প্রকৃত পথে।

নিরাশার অন্ধকারে আজ মন আচ্ছন্ন তাই পথ খুঁজছি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায়। বিদ্যালয়ে, গৃহে বা সমাজে যে সব সমস্যা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মনে আশঙ্কার উদ্রেক করে নি, আজ সেই সকল সমস্যা প্রতিনিয়তই আমাদের বিপর্য্যস্ত করে তুলছে। তাই চাইছি পথ-নির্দ্দেশ, খুঁজছি বেদনার প্রতিকার-পন্থা।

যারা কলুষিত মন নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের আর সমাজ এবং রাষ্ট্রের চরম সর্ব্বনাশ করছে—তাদের সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাদের সংস্পর্শ ও কুশিক্ষার প্রভাব থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে হবে। যারা মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দেশ ও সমাজকে ভবিষ্যতে যারা নূতন করে গড়বে তাদের প্রতি আছে আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা। জ্ঞান ও শিক্ষায়, শক্তি ও দৃঢ়তায় এগিয়ে চলেছে, তারা মহান আদর্শের দিকে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ শুধু পিতামাতারই নয় দেশ ও জাতির আশা-ভরসা তারা। তাদের জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু সমস্যা আমাদের দুর্ব্বলমতিদের নিয়ে যাদের মধ্যে হয়েছে অন্যায়ের বীজ উপ্ত, যারা পারছে না সহজ ও দৃঢ় আত্মশক্তি দ্বারা প্রলোভনকে জয় করতে। শিক্ষাক্ষেত্রে আছি দীর্ঘ কাল যাবৎ, আবার বহু পরিবারের সঙ্গেও হয়েছে নিবিড় পরিচয়। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলাম এ জীবনে। এদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবলতা-দুর্ব্বলতা এবং সেই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে

এদের পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হ'ল। দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এদের চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা—এই সমস্ত সদ্‌গুণ ক্রমেই যেন এদের মধ্যে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কত জন হচ্ছে উন্মার্গগামী, তাই আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছি—কি করে রক্ষা করব এদের। কি করে সত্য পথ দেখাব? দেশের যারা প্রধান আশা-ভরসাস্থল সেই ছেলেমেয়েরা যদি সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী না হয়, রাষ্ট্র যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে বিকৃতবুদ্ধি নাগরিকদের অপকর্মের দরুন, তা হলে আমাদের দেশ যে জগতের কাছে কতটুকু হেয় হয়ে যাবে সেকথা মনে করে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলব সেগুলি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। আশা করি, সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে দরদ দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাববেন। প্রথমেই বালিকা এবং কিশোরীদের—যাদের সংস্পর্শে প্রতিনিয়তই আসছি—নিয়ে আলোচনা করি। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন—মেয়েদের বয়স যখন ১১ থেকে ১৩ বা ১৪ তখন তাদের মন স্বভাবত:ই একটু ভাব-প্রবণ হয়ে ওঠে। এই বয়সে তাদের উপর গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ দৃষ্টির দরকার। এই সময় তারা পড়ে ষষ্ঠ, সপ্তম, কখনও বা অষ্টম শ্রেণীতে।

বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্রীদের উপর কঠিন শাসনের বিষময় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে বিষয়ে কিছু কিছু বলতে চাই শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সকল পিতামাতাই যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সন্তানদের বিচার করেন। স্নেহ ও মৃদু শাসন দুইয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন পিতামাতার বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ আর সন্তানদের মনস্তত্ত্ব বুঝবার আন্তরিক চেষ্টা। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধও অনেকটা পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধেরই অনুরূপ। আমরা আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হয়ত নই, তবু একথাও বলি যে, যে সব ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের বৎসরের পর বৎসর কাটে, যেসব তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি প্রতি দিন, তাদের আমরা যথার্থই স্নেহ করি, তাই চাই তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ—এই আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি যে, তাদের পরিচয়ে হোক আমাদের পরিচয়—তাদের সুনামে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক। লেখাপড়ায় সবাই যে সমান উন্নতি করবে তা আশা করা যায় না, তবে এটাই একান্তভাবে কাম্য যে তারা চরিত্রবলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যেন আদর্শ সহধর্মিণী এবং জননী হতে পারে। সময় সময় মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন অভিভাবকদের নিকট আমাদের ডাক পড়ে। অনেক সময়ই আশঙ্কা হয়, পাছে তাঁরা কঠিন শাসন করে আরও সর্বনাশ করে না বসেন। তাই অভিভাবকদের কাছে এই অনুরোধ তাঁরা যেন ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করে বসেন। অনেকে বলতে পারেন, "এই উপদেশ দেবার প্রয়োজন কি, আপনারা কি পিতামাতার চেয়ে বেশী ভালবাসেন মেয়েদের?" তা হয়ত নয়, তবে ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব সম্ভবত: অনেক পিতামাতার চেয়ে বেশী বুঝি আর দীর্ঘকালের সাহচর্য্যে তরুণ মনের অলিগলির সঙ্গে পরিচয়ও আমাদের গভীর। পিতামাতার সম্পর্ক গুটিকয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আর আমরা হাজার হাজার মেয়ের সংস্পর্শে এলাম জীবনে।

অতিরিক্ত কঠোর শাসনের ফলে অনিষ্ট যে মেয়েদের কিরূপ হয় সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলছি—একটি ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে, সে পরীক্ষায় নকল করে। আমরা সাধারণত: এর প্রতিকার করি নিজেরাই মেয়েকে বকুনি দিয়ে আর ভালভাবে বুঝিয়ে—কিংবা তার নম্বর কেটে নিয়ে। প্রয়োজন বোধ করলে গুরুজনদের ডেকে জানিয়ে দিই। এক ক্ষেত্রে মেয়ের পিতাকে জানানো হ'ল। অবশ্য তিনি যে ধরণের শাস্তিবিধান করলেন তা ছিল সম্পূর্ণই আমাদের অপ্রত্যাশিত। মেয়ের বাবা করলেন কি, শাস্তিস্বরূপ মেয়েকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘর-সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলেন, আর বাড়ীর বাইরে তার কোথাও বেরুনো বন্ধ করে দিলেন। ফলে হ'ল কি—বাড়ীতে বসে থেকে ও দিনরাত শাসনের চাপে মেয়েটির মন বিগড়ে যেতে লাগল, সে হয়ে উঠল একান্ত অবাধ্য। লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল জন্মের মত। এক্ষেত্রে পিতা যে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করেছেন সে কথা বলা বাহুল্য।

এর ঠিক ভিন্ন ধরণের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মেয়ে দুয় বিষয়ে ফেল করে প্রোগ্রেস রিপোর্টে সব নম্বর পাল্টে বাড়ীতে বাবার হাতে রিপোর্টটি দিলে। পিতা এলেন পরদিন স্কুলে। "দেখুন এ কেন প্রমোশন পেলে না? সব বিষয়ে পাস-মার্ক রয়েছে ত?" অবাক হয়ে গেলাম এত বড় ভুল করেছি কি! মেরিট বুক এনে মিলিয়ে দেখি কোনটাই মিলছে না। তবে কি ভুল হ'ল ভুলতে? পর পর চেকিং চলতে লাগল—ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল—সবই কি ভুল হ'ল? পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সব নম্বরের উপর কালি দিয়ে লেখা—0 কে 8, 1 কে 4, 2 কে 5 ইত্যাদি। মেয়ের পিতাকে দেখানো হল। তিনিও স্বীকার করলেন over-writing (জাল করা হয়েছে)। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমোশনের জন্ত তিনি অনুরোধ করতে লাগলেন। বললাম, "আপনি এর প্রমোশনের জন্তে এ অন্যায় অনুরোধ করছেন কি করে!"

কিছু কথাকাটাকাটির পর সেদিনকার মত তিনি বিদায় হলেন। পরদিন আপিস কামাই করে এলেন আবার; অত্যন্ত কাজের চাপ, বহু অভিভাবক এসেছেন মেয়েদের প্রমোশনের জন্ত আবেদন জানাতে। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি পুনরায় এসে মেয়েকে প্রমোশন দেবার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্বেও তিনি অকৃতকার্য্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুন্ন মনে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যে পিতা জীবনে সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনিও আসেন চার বিষয়ে ফেল করা মেয়ের জন্ত অনুরোধ করতে। এতে যে প্রকারান্তরে মেয়েরই অনিষ্ট করা হয় সেকথা যে এঁরা ভুলে যান সেইটেই আশ্চর্য্য।

আমাদেরই কন্তাস্থানীয়া কতজন রয়েছে, কেহ কর্ম্মস্থলে, কেহ পরিবারে বধূ বা সহধর্ম্মিণীরূপে, সময় সময় যাদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, এ ত গেল এক দিক। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত শিক্ষার সুফলের দৃষ্টান্ত যখন দেখি তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে। এমন কত ছাত্রী রয়েছে যাদের কথা মনে করে আমরা গর্ব্ব বোধ করি।

যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী আজ ভ্রান্ত পথে চলেছে একান্তভাবে তাদের কল্যাণ কামনা করি বলেই তাদের সম্বন্ধে দু'একটি অপ্রিয় সত্য বলতে বসেছি। যে সকল মারাত্মক দোষত্রুটি আজ তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে, সেগুলো সংশোধন করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই হার মানতে বাধ্য হচ্ছি। বস্তুতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্য্যন্ত অন্তায় আচরণের অভ্যাস যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। শিক্ষকতা-কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হচ্ছে তা মর্ম্মান্তিক। ছোট ছেলেমেয়েরা মাহিনার টাকা চুরি করছে, একের কলম, ছাতা, বই, সেলাই অন্তে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। অপরাধীর অনুসন্ধান করতে ও অভিভাবকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা হয়রাণ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ সকলের প্রতিবিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে এ রকম এবং এর প্রতিকার কি—এ সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা প্রত্যেককেই আজ গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে—ছাত্রছাত্রীরা যাতে উন্মার্গগামী না হয় সেজন্ত সব সময় রাখতে হবে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। কত ছেলেমেয়ে যে স্কুলে যাবার নাম করে দশটা থেকে চারটা অন্ত জায়গায় আড্ডা মারে কিংবা সিনেমা দেখে, কয়জন পিতামাতা তার খোঁজ রাখেন। আমরাও অনেক সময় খোঁজ পাই না। বিলাসিতা এবং প্রসাধনের দিকেও আজকাল স্কুল-কলেজের মেয়েদের অসম্ভব রকম ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অনেকে সেজে-গুজে সারাদিন টো টো করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। মা বাবা নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার। কত মেয়ে যে দিনের পর দিন প্রক্সি দিয়ে এদিক সেদিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কত বিদ্যার্থিনীই না মোটা বই হাতে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, চ্যাপেল রোডে পায়চারি করছে। এ ধরণের বহির্মুখী বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে তো বিদ্যাভ্যাস হয় না, হয় পিতার বা অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ। সব রকম ছাত্র আন্দোলনে কিন্তু এদেরই দেখতে পাবেন অগ্রণী; বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের ছাপ্ কম বলে 'ছাত্রমেধ চলবে না', 'অভিভাবক বলি চলবে না', এই সমস্ত ধ্বনি করে ঝাণ্ডা উড়িয়ে প্রসেশন বের করছে নিঃসঙ্কোচে।

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সকল বিষবৃক্ষের বীজ আজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠছে আমরা চাই তা উৎপাটিত হোক, কিন্তু কিভাবে হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না। চাই ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতার সহযোগিতা, চাই প্রাণপণ চেষ্টা। হয়ত সফল হব না সকল ক্ষেত্রে তবু প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। তরুণ-তরুণীদের মানুষ করবার গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর ন্তস্ত। আমাদের কর্ত্তব্য তাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরা, অন্তায়ের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জন্মানো, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জাগানো। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া মেয়েদের চরিত্র এমনভাবে আমাদের গঠন করতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল ও জাতিকে গৌরবান্বিত করতে পারে। অবশ্য আজ যে আমরা আমাদের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি সেজন্ত অনেকটা দায়ী আধুনিক সমাজ-জীবন ও বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রাম। এ ছাড়া সময় এবং ইচ্ছার অভাবও কতকটা দায়ী। এ কথা জানি যে, পিতামাতার বিশেষ সতর্কতা সত্বেও কত ছেলেমেয়ে ভুল করে বিপথে যায়। এর মূলে থাকে অনেক কারণ, কিন্তু তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এদের যেমন স্নেহ করতে হবে তেমনি শাসনের রাশও শিথিল করে দিলে চলবে না। এদের আনন্দের খোরাক ও সঙ্গ দিতে হবে, ভাল সঙ্গী খুঁজে দিতে হবে এদের জন্ত। প্রতিবন্ধক যে কত, জীবন-সংগ্রাম যে কি প্রচণ্ড সবই জানি, কিন্তু কুসন্তানের জনক ও জননী হয়ে থাকা যে আরও বেশী মর্ম্মান্তিক।

অনেক দূর এগিয়ে চলে এসেছি জীবনপথ বেয়ে, আমাদের স্নেহের ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমরা অস্বস্তি বোধ করছি, তাই বার বার এই কথাই মনে জাগছে, সমস্যা কঠিন—পথ কোথায়? আমাদেরই চোখের সামনে কত তরুণের হচ্ছে সর্ব্বনাশ, কত তরুণী করছে মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত, কত পিতামাতা প্রতিদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন। আমরা কখনও দর্শক, কখনও বা ভুক্তভোগী—অক্ষমতার বোঝা বহন করছি শুধু। কখনও বা প্রায়শ্চিত্তও করছি আপন নির্বুদ্ধিতা ও সন্তানের ভুলের অপরাধের। তাই বলি সময় থাকতে প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কারের জন্ত মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আলোচনা

"রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন"

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধের (প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫৭) আলোচনা করিয়া (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

রামনারায়ণের "তর্কপঞ্চানন" উপাধি মোটেই ছিল কিনা এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য আমাদের দৃষ্ট রামনারায়ণের গ্রন্থত্রয়ে "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" উপাধিটিই আছে। শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্তের প্রবন্ধে ও "বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক" গ্রন্থে তর্কপঞ্চানন উপাধির উল্লেখ বিশ্বকোষ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। রামনারায়ণের বংশধরগণের মধ্যেও, তাঁহার যে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি ছিল পুরুষানুক্রমে সেই ধারণাই চলিয়া আসিতেছে। এত দিনের প্রচলিত সত্যরূপে গৃহীত তথ্য যে একেবারে অমূলক তাহা মনে হয় না। রামনারায়ণ যে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা ত সর্ব্ববাদীসম্মত এবং তাঁহার যে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি একেবারে ছিল না তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

রামনারায়ণের সমসাময়িক রূপে উল্লিখিত পাঁচ জন পণ্ডিতের মধ্যে রামেশ্বর ন্যায়বাগীশের জন্মপত্রিকা আমরা পাইয়াছি। তাহাতে তাঁহার জন্ম ১৬৪২ শকাব্দরূপে উল্লিখিত আছে। উহা রামনারায়ণের সমকালবর্ত্তী (১৬৩৫ শকাব্দ)। অন্যান্য পণ্ডিতের নাম পুরুষানুক্রম-হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

রামনারায়ণের 'স্থূল ভাগবত' রচনার আখ্যায়িকাটি আমাদের নিকট সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়, কারণ সারা দক্ষিণ অঞ্চলে প্রধান রূপে বৃত্ত হওয়ার একাধিপত্য তাঁহার বংশধরগণই ভোগ করিতেছেন। দক্ষিণ অঞ্চল কেশব রায় চৌধুরীরই জমিদারী। যদি কৃষ্ণরামের পূর্ব্বে কাহারও উক্ত মর্য্যাদা প্রাপ্তি সম্ভব হয় তবে তাঁহার ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে ইহার গ্রহণযোগ্যতা সম্ভবপর এবং রামনারায়ণের পুত্রদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন তবে অন্যান্য পুত্রদের বংশধরগণের মধ্যে তাহা বিদ্যমান থাকা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়। কিন্তু উহার কোন পক্ষই বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। রামনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং নিতান্ত লিপিবদ্ধ প্রমাণাভাববশতঃ উক্ত প্রচলিত ধারণার অসত্যতা প্রমাণিত হয় না। উহা সত্য হইলে জমিদার কেশব রায় চৌধুরীর সহিত রামনারায়ণের পিতার সম্পর্কের কথা একেবারে অমূলক নয়। পরন্তু উক্ত জমিদার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত 'মন্দির বাজার' নামক স্থানে একটি শিবমন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ খ্রীঃ অঃ) তিনি জীবিত ছিলেন। লিপিটি এইরূপ "আকাশ-বিয়দ কোণীমিতে শকে শিবালয়ং। ভূপঃ শ্রীকেশবো-কার্ষীদ্বাসুদেবেন শিল্পিনা" (Vareadra Reseerch Society's *Monographs* No. 4 ; "The Antiquities of N. W. Sundarban",—Kalidas Dutt. পৃঃ ৯)। কৃষ্ণরামের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত একটি পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৮৬ শকেও তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং বর্ষ হিসাবেও কৃষ্ণরাম জমিদার কেশব রায় চৌধুরীর সমসাময়িক। উক্ত সভাপণ্ডিত থাকাকালীন কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে আরও কয়েকটি আখ্যায়িকা তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কৃষ্ণরাম যে প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন এই উক্তি একেবারে অমূলক নয়। পুত্র রামনারায়ণ যখন ছাত্রাবস্থায় নবদ্বীপে শ্রুতাধ্যায় গ্রন্থ নকল করেন (১৬৩৫ শক) তখন কৃষ্ণরামের বার্দ্ধক্যাবস্থা। ১৬৮৬ শকেও তাঁহার জীবিত থাকার কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং কথিত বার্দ্ধক্যাবস্থার পর অন্ততঃ ৫১ বৎসর জীবিত ছিলেন।

ডাঃ বিদ্যাভূষণের উক্ত রামনারায়ণ যদি বুনো রমানাথ এবং কৃষ্ণকান্তের গুরু হন তবে আমাদের আলোচ্য রামনারায়ণ নিশ্চয়ই তিনি নন। এই রামনারায়ণ কখনও নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন নাই, মজিলপুরেই তাঁহার টোল ছিল। এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মজিলপুরের রামনারায়ণ যে তাঁহাদের সমসাময়িক তাহা নিঃসন্দেহ।

কারিকাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা যে প্রকৃতই মজিলপুর-নিবাসী রামনারায়ণ (কোদালিয়াবাসী নন) তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রামনারায়ণের পুত্র রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার বহু পুঁথিতে 'মজিলপুর' কথাটি লিখিয়াছেন এবং পৌত্র রামগোপাল তর্কালঙ্কার স্বরচিত 'ভেদজ্ঞান তিমির মিহিরোদয়' নামক দার্শনিক গ্রন্থের (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত) পুষ্পিকায় আপনাকে মজিলপুরবাসী রূপে উল্লেখ করিয়াছেন (সৌর মাঘস্য বিংশাংশে মঞ্জুলপুর দেশতঃ— পৃঃ ৬০)। রামগোপালের পুত্র রামরূপ তর্কবাগীশ বাংলা পয়ার ছন্দে গ্রথিত, স্বরচিত "জ্যোতীষতাযামুক্তাবলী" গ্রন্থে আপনাকে মজিলপুরবাসীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন— "মঞ্জুলপুর নিবাসী শ্রীরামরূপ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রমাণ-সূত্র গ্রথিতায়াং জ্যোতীষতাযা মুক্তাবল্যাং *** পঞ্চবিংশ-গ্রন্থিঃ।" উক্ত রামরূপ বিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামসেবক শিরোমণি (১২২৩ সন) কোদালিয়াবাসী রামনারায়ণের জামাতা মজিলপুর নিবাসী যাদবানন্দ বিদ্যারত্নের সমসাময়িক এবং যিনি (কোদালিয়াবাসী) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সমসাময়িক, তাঁহাকে কারিকাবলি রচয়িতা (১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ) রূপে কল্পনা করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। রামনারায়ণের ছয় পুরুষ অধস্তন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গঙ্গামাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদক, 'তিথিকৃত্যম্' শীর্ষক সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থের ও নৃপষ্টকম্ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কবিতার রচয়িতা বিখ্যাত স্মার্ত্ত বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যারত্ন কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মজিলপুরে জীবিত ছিলেন।

১। বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

২। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। ১৩৫৬, ১৩৫৭। পৃ. ৭৬, ৫৫।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ধারার সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী হইতে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ শীর্ষক যে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিষয়ের বৈচিত্র্যে, লেখক-নির্ব্বাচনে ও রচনার মনোগ্রাহিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা—এই সংগ্রহের দুইটি পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, স্বল্প পরিসরের মধ্যে ও ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম পুস্তিকায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জনশিক্ষার লুপ্তপ্রায় ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান ও শ্রীরামপুরের পাঠশালা হইতে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে জনশিক্ষার বিস্তার, এডাম সাহেবের এডুকেশন রিপোর্ট, হার্ডিঞ্জ স্কুলসমূহের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা ও নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত জনশিক্ষার বিস্তৃত ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত, কোন প্রয়োজনীয় কথা বাদ না দিয়া মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে, অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়া জনসাধারণের সুলভ ও অনায়াস জ্ঞানের পথ সুগম করিয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তিকায় বাগল মহাশয় বেথুন (বীটন) স্কুল প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগের যে প্রামাণিক বিবরণ দিয়াছেন তাহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবে। গত যুগের সমাজ ও শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী লেখক বিরল। যোগ্য ব্যক্তির উপরই এই দুইটি লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (সপ্তম খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত এই গ্রন্থমালার সপ্তম খণ্ড, পূর্ব্ব-খণ্ডগুলির মতই, তথ্য-নির্ব্বাচনে ও সমাহরণ-নৈপুণ্যে কেবল সুপাঠ্য নয়, সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ হিসাবে অপরিহার্য্য হইয়াছে বলিলেও চলে। বর্ত্তমান খণ্ডে ষোল জন গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লেখকদের বৃত্তান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা ও তথ্যনিষ্ঠার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বর্ত্তমান খণ্ডে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ভারতীয় সঙ্গীতের পশ্চাতে একটি বিরাট ইতিহাস রহিয়াছে। ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া শত শত সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীতসাধকের কঠোর সাধনা ও সঙ্গীতামোদী নৃপতিদিগের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নব নব রূপে রূপায়িত হইয়াছে। সঙ্গীতকলার এই ক্রমবিবর্ত্তন বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীতাচার্য্যগণ সঙ্গীত-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গীতকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেওয়াই প্রকৃত সঙ্গীতসাধকের লক্ষ্য থাকা উচিত।

সঙ্গীতের এই ক্রমবিবর্ত্তনকে গ্রন্থাকারে পরিবেশন করা বিপুল শ্রমসাপেক্ষ, কারণ এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার মত নির্ভরযোগ্য পুস্তক বিরল। সেই হেতু সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বাবুর এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গীতকলার সাধকসমাজ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন।

'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'-এর মধ্যে দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আহম্মদ শাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত যে সমুদয় সুরস্রষ্টার আবির্ভাব হয় তাঁহাদের নাম ও পরিচয় এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতকারগণের রচিত প্রায় একশত গীত ও সেগুলির স্বরলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্করানন্দ, নায়কগোপাল, বিবেকস্বামী, রামদাস, সুরদাস, তানসেন, জ্ঞানকীদাস, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, মিয়াঁ গুলামনবী, শোরী, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের মধ্যে ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সমাবেশ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কিরূপে কাহার দ্বারা ও কাহার রাজত্বকালে একটির পর আর একটির উৎপত্তি হইল তাহা, এবং একের সহিত অপরের প্রভেদ ও প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যে কেবল সঙ্গীত-পিপাসুকেই আনন্দের রসদ যোগাইবে তাহা নহে, ইহার ঐতিহাসিক দিক এবং সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া ভাব ও ভাষার বিবর্ত্তনের দিকটি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়

কালো আকাশ—শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ৩৮-এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

নগরোপকণ্ঠের শিল্পাঞ্চলের আকাশ যন্ত্র-দানবের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ধূমমলিন। এই আকাশের নীচে বাস করে যে সব মানুষ তাহাদের জীবন কারখানার নাগপাশে বাঁধা—যন্ত্রের সেবা করিয়া তাহারাও হইয়াছে সুখদুঃখে উদাসীন যন্ত্রের ন্যায়। এমনই এক শ্রমিক জয়দব—যৌবনের প্রারম্ভে শুরু হইয়াছে তাহার জীবনযুদ্ধ, পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছিয়াও সে যুদ্ধের বিরাম নাই। সংসারে রুগ্না স্ত্রী, বেকার ও উচ্ছৃঙ্খল ছেলে; মরণোন্মুখী ছোট একটি মেয়ে; অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, শান্তির আশাও মরীচিকা। এই সংসারেরই একটি ছেলের মনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৃহত্তর জগতের আলো ও বার্ত্তা। অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকে সে অদৃষ্টের প্রাপ্য বলিয়া মানিয়া লয় নাই—ধনসাম্যবাদের প্রশ্নটা তাহার মনে তীব্র হইয়াই জাগিয়াছে। নূতন সংসার আর বেগবান জীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। রুগ্না জননী এবং মরণোন্মুখী মেয়ের মনেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন। শৈশবকালের বারব্রত, খেলাঘর ও পুতুল-প্রীতির মধ্যে গৃহিনীপনা ও মাতৃত্বের বিকাশ। এই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত। এই একটি মাত্র পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লেখক শহরতলীর কালো আকাশের ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির পরিবেশ যেমন বিষাদম্লান, রেখা ও রঙ তেমনি ছলছলে—কাহিনীতে বেদনার সুর মাখানো। এই কাহিনীই ইনাইয়া বিনাইয়া করুণ রসে

ভরাইয়া দেওয়া নূতন লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিয়াও কথা ও ভাবকে আতিশয্য হইতে লেখক অত্যন্ত সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। কারখানা-জীবনের দারিদ্র্য ও দুষ্প্রবৃত্তি নীতিভ্রষ্টতা ও কুশিক্ষা, স্বার্থান্ধতা ও মূঢ়তা সবকিছুর উপরই তিনি আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে সমস্ত চরিত্র বিকশিত হইবার পূর্ণ সুযোগ পায় নাই; তথাপি লেখার টানে যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাতে চরিত্রগুলি সজীব হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে। প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈদিক দেবতা—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বেদ হিন্দুর পরম শ্রদ্ধার বস্তু—ইহা তাহার সমস্ত ধর্মকর্মের নিয়ামকরূপে স্বীকৃত। অথচ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বর্তমান হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদ যথেষ্ট। বৈদিক দেবতা ও আধুনিক হিন্দুর দেবতার মধ্যেও এই প্রভেদের নিদর্শনের অভাব নাই। বর্তমান হিন্দু সমাজে আমরা যে সমস্ত দেবদেবীর সহিত নিত্য-পরিচিত তাহাদের অনেকের কোন সন্ধান বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যাহাদের উল্লেখ বেদে পাই

১৯৫০ সর্ব্বদাই পুরোভাগে

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LTD.

ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে "হিন্দুস্থান" সর্ব্বদাই পুরোভাগে রহিয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সঙ্গতি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা	৬৩,১৬,৬০,৫৯৭৲ টাকা
মোট সংস্থান	১৭,৭০,৭০,৬২৪৲
বীমা তহবিল	১৫,৯৭,৪৭,৫৪৮৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৪০,৪৭,৩৩৮৲
দাবী শোধ (১৯৫০)	৭২,৯২,৮৫০৲

নূতন বীমা ১৩,৭৫,৩৯,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্ব্বাপর তাহার ক্রমোন্নতির পথে পাথেয় রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারই জন্য হিন্দুস্থানের প্রকৃত গৌরব। হিন্দুস্থানও তাহার ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে, নূতন বৎসরে ইহাই তাহার প্রতিশ্রুতি।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩

তাহাদেরও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহার সহিত বৈদিক বর্ণনার খুব বেশি মিল নাই—তাহাদের সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহাদের কোন কোনটির ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাও মিলে না। পক্ষান্তরে, বেদবর্ণিত বহু দেবতা আজ আমাদের নিকট অপরিচিত বা অল্প পরিচিত।

এ অবস্থায় বৈদিক দেবতার স্বরূপ বর্ণনা বা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কেবল কৌতুকজনকই নয়, হিন্দুধর্মের বিচিত্র পরিণতির ইতিহাস আলোচনায় ইহা প্রধান অবলম্বন। ইতিপূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাংলাভাষায় এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—তাঁহার 'যজ্ঞকথা'য় বৈদিক যাগযজ্ঞের অপূর্ব্ব বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে লেখক প্রাচীন বেদাচার্য যাস্কের শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়া ঋগবেদোক্ত প্রধান প্রধান দেবতার পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষেপে তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কোন কোন দেবতা বৈদিকপূর্ব্ব যুগ হইতে বিভিন্ন দেশে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন হিন্দু দেবতা বিভিন্ন নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতীক—প্রাচীন এবং আধুনিক অনেক পণ্ডিত কর্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত এই মতানুসারে লেখক অনেক স্থলে দেবতাদের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইংরেজীতে নামকরা প্রামাণিক গ্রন্থ আছে—বাংলায় এযাবৎ বিশেষ কিছুই ছিল না। বর্তমান পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালী পাঠক অনায়াসে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে সার কথাগুলি জানিতে পারিবেন এবং জানিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ—শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত। ৩৫, টাংরা রোড, কলিকাতা—১৫ হইতে শ্রীবিশ্বনাথ নাথ কর্তৃক প্রকাশিত। ১২২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

রাষ্ট্রিক কারণে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর প্রচারকল্পে বাংলা দেশে বাংলা ভাষার সাহায্যে প্রাথমিক ও উচ্চতর প্রবেশিকা ও পাঠ্যপুস্তক বহু বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার অনেকগুলির পিছনে জ্ঞান নিষ্ঠা ও সাধনা নাই, এগুলি শুধু ব্যবসায়বুদ্ধিপ্রণোদিত প্রকাশ তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয়, 'রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ' এই হুজুগ-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত নহে। গ্রন্থকার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সহিত যুক্ত থাকিয়া হাতে কলমে কাজ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ফলে এই পুস্তকে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। আঠারটি পাঠ এবং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শব্দকোষ আয়ত্ত করিলে হিন্দী ভাষার মোটামুটি জ্ঞান হইবে। বাংলা দেশে হিন্দী প্রচারে যাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সেই শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রভৃতি বইখানিকে সমাদর করিয়াছেন। আশা করি, শিক্ষার্থীরা এই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই জাতীয় ভাষা-প্রবেশিকায় মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকা অন্যায়। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এই কথাটি স্মরণ রাখিলে আনন্দিত হইব।

রাষ্ট্রভাষা-শিক্ষক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা। পৃ. ১১৮। মূল্য পাঁচ সিকা।

হিন্দী ও হিন্দুস্তানীর বিভেদ ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীর কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। শ্রীযুক্ত মজুমদার উভয়বিধ ভাষায় অভিজ্ঞ, অধিকন্তু ভাষাতত্ত্বের নিষ্ঠাবান্ সাধক। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্বল্প পরিসরের মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্তানীর বিভেদ ও সামঞ্জস্য বুঝাইয়া রাষ্ট্রভাষাকে সহজে আয়ত্তে আনার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশীলনগুলি বিশেষ কাজ দিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও নিবেদন করি যে, ১১৮ পৃষ্ঠার বইয়ে পুরা তিন পৃষ্ঠাব্যাপী "শুদ্ধি পত্র" লজ্জাকর। সুখের বিষয়, প্রকাশক আশ্বাস দিয়াছেন, বইখানিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করিয়া প্রচার করা হইবে, ইহা "ট্রায়াল প্রিণ্ট" মাত্র।

ব.

সন্ধানী—বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয়, হুগলী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২।

প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপক-ছাত্রগণের সুলিখিত প্রবন্ধ-সমষ্টি।

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন—শ্রীসন্তোষকুমার দে। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ২৲।

মোট পাঁচটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। যথা—'উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন', 'বিজ্ঞাপনের দাম দেয় কে?' 'ব্যাপক বিজ্ঞাপন', 'পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন' এবং 'খুচরা খবর'। আজকাল বিজ্ঞাপনের ব্যবসা একটা প্রধান আয়ের পথ। বহু লোক ইহাতে নিযুক্ত আছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে অচল দ্রব্য বেশী দিন চলে না। তবে বিজ্ঞাপন দিতে অবহেলা করিলে ভাল জিনিষও অচল হইয়া পড়ে। এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে অপর দুই একখানি গ্রন্থ থাকিলেও চাহিদার তুলনায় এই শ্রেণীর বাংলা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক জগতের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়া বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
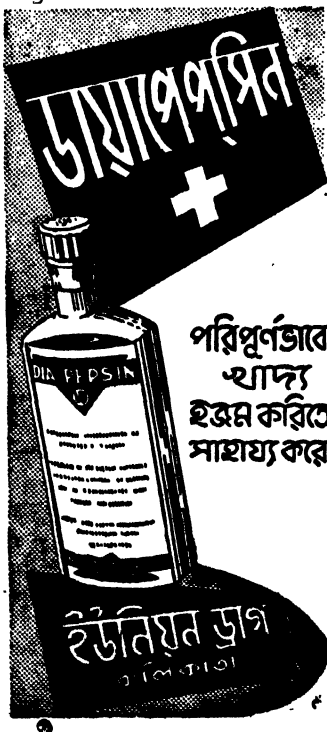
পরবাসী—শ্রীআদিত্যশঙ্কর। ৫৬, রিচি রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কাহিনী সুরু হইয়াছে সত্যেনের সংগ্রামময় জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। এম-এস্‌সি পাস করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্চাশায় মন যখন পরিপূর্ণ এমনি সময়ে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল বাইশ বছরের যুবক সত্যেনের স্কন্ধে। শহর হই. দূরে একটা ফ্যাক্টরিতে সহকারী কেমিষ্টের পদে সে বাহাল হইল। গল্পের নায়ক সত্যেন নয়, বিকাশ—যার পরিহাস-নৈপুণ্য, অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম সহনশীলতা, দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ [illegible] রহস্যময় চালচলন, প্রাণখোলা ব্যবহার ক হিনীকে আগাগোড়া প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বিকাশ ফ্যাক্টরির ফোরম্যান। ফলতঃ, ফ্যাক্টরীর বড় ছোট সকলেই তাহার অনুগত। সত্যেন এখানে নবাগত হইলেও তাহার উপর বিকাশের কি জানি কেন একটা বিস্ময়কর আকর্ষণ দেখা যাইত যাহার ফলে এই দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের লোকটির জীবনের অনেক তথ্যই তাহার কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

বিকাশের ভিতরকার সত্যিকারের মানুষটির পরিচয় যখন সত্যেন পাইল তখন সে নিজের কাছেই যেন ছোট হইয়া গেল। অথচ বিকাশ সব বুঝিয়া এবং সব জানিয়াও কত সহজে বলিতে পারিল—'ভুল ত মানুষই করে সত্যেন।'

বিকাশ ছাড়া 'আরও যে কয়টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে চাফ কেমিষ্ট ঘোষের স্ত্রী "বৌদি" মনে ছাপ রাখে। একটি খাঁটি বাঙালী মেয়ের ছবি নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তার মাতৃ, ভগ্নী ও স্ত্রী-প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের মধ্যে।

সুনীতির সম্বন্ধে সব সময়ই পাঠকের মনে একটা কৌতূহল জাগিয়া থাকে। পুস্তকের শেষে তাঁর সাক্ষাৎ মিলে ফ্যাক্টরির ম্যানেজারের স্ত্রী-রূপে যখন ম্যানেজার বিকাশকে ভুল বুঝিয়া আঘাত করিতে উদ্যত আর সেই আঘাত প্রতিহত করিতে বিকাশ যখন রুখিয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে। অত্যন্ত সাবধানী এবং স্বার্থপর একটি মেয়ে। কিন্তু এরই জন্য বিকাশ সর্ব্বস্বত্যাগী। সুনীতিকে না পাইয়া সে গোটা দুনিয়ার মানুষকে পাইয়াছে।

পুস্তকখানি সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় হইয়াছে। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ভাষা। কিন্তু বইখানিতে শরৎ চন্দ্রের একখানি উপন্যাসের প্রভাব বেশী করিয়াই পড়িয়াছে মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১। **শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথা, ২। শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মা পূজা ও কথা**—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য প্রত্যেকখানি দশ পয়সা।

পূজা-পার্ব্বণ, ব্রতউৎসব বাঙালী হিন্দুর ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। লেখকের প্রণীত পূজা ও ব্রতকথা বিষয়ক পুস্তকসমূহদ্বারা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। অল্পকাল মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে এই-খানি যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। শিল্পকর্ম্মের দেবতা বিশ্বকর্ম্মা। যন্ত্রশিল্পী ও কারু-শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর তাঁহার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে লেখক এই পূজার কথা বড়ই চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে শিল্পীদের স্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা মনোজ্ঞ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শরৎ চন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

কুড়ি-একুশ বৎসর পূর্ব্বে একটি সাহিত্য-সভায় যোগদানের সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেখানে সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত কয়েক-জন মনীষী শরৎ চন্দ্রের রচনা সম্পর্কে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন, তাহা শরৎ চন্দ্রের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। বর্ত্তমান 'রচনাবলী'তেও ইহার ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে বাংলাভাষায় খ্যাত-অখ্যাত, দীর্ঘস্থায়ী অল্পায়ু এমন পত্র-পত্রিকা খুব কমই ছিল যাহাতে কোন-না-কোন সময়ে শরৎ চন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় নাই। যিনিই আলোচ্য পুস্তকখানির পাতা উল্টাইবেন তাঁহারই চক্ষে প্রথমেই তাহা ধরা পড়িবে। ইহা হইতে আর একটি বিষয়ও আমাদের স্বতঃই মনে উদিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিচিত্র ধরণের পত্র-পত্রিকা হইতে রচনা সঙ্কলন কিরূপ শ্রম-সাধ্য ব্যাপার! কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক অনুসন্ধান দ্বারা এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল রচনা—যাহার অধিকাংশই হয়ত বর্ত্তমান পাঠক সমাজের অগোচরে থাকিয়া যাইত, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা-সাহিত্যের যেমন মর্য্যাদা বাড়িয়াছে, বাংলা-ভাষীরাও ততোধিক উপকৃত হইয়াছেন।

এই রচনাসমূহের প্রায় সমুদয়ই ১৩১১ সাল হইতে ১৩৪৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একখানি সমাপ্ত ও দুইখানি অসমাপ্ত উপন্যাস ও একটি রূপকথা বাদে অপর সকলই, এক কথায় বলিতে গেলে মনন-সাহিত্যমূলক রচনা ও ভাষণ। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ইহাতে নানা রূপে স্থান পাইয়াছে। 'ঔপন্যাসিক' শরৎ চন্দ্র কেন যে 'অপরাজেয়' হইয়াছেন তাহার মূল কারণ এই সকল রচনাপাঠে অনুভব করি। শরৎ চন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল যেমন বিচিত্র, তাঁহার আহরণও ছিল তেমনি প্রচুর। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, বৈদেশিক সাহিত্য তাঁহার বিশেষ পড়া ছিল। এই সকল আহরণকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া তিনি স্বীয় রচনাকে রসপুষ্ট করিয়াছেন। তবেই তো তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়াছে। 'কানকাটা' প্রবন্ধে উড়িষ্যার কানকাটা এবং বাইবেল-কথিত কানানাইট জাতির সাদৃশ্য [?] একটি চমৎকার উপমাদ্বারা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'দর্শনাভাব' এবং 'দশামা ভাব'টির মধ্যে যে মিল 'কানানাইট' ও 'কানকাটা'র মধ্যেও সেইরূপ মিল। শরৎ চন্দ্র মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগের ঐকান্তিক অনুরাগী ও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার কারাবরণের পর শরৎ চন্দ্র 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধ লেখেন ('নারায়ণ'—বৈশাখ ১৩২৯)। ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা' অপেক্ষাও সত্যাগ্রহ তথা 'অহিংসা'কে গান্ধীজী কেন উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা লেখক ইহাতে দিয়াছেন। 'সত্যাশ্রয়ী' ও 'বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা'য় তিনি অতি সহজ ভাষায় খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছেন। চরকার দ্বারা স্বরাজলাভ সম্ভব এ ধারণার প্রতিও তিনি কশাঘাত করিতে ত্রুটি করেন নাই। 'মুসলমান সাহিত্য' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই পুস্তক প্রত্যেক বাংলাভাষীর বার বার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১

সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতায় নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি

রামমোহন-গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)—সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৬। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর তিন খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি ধরিয়া এই চারি খণ্ড বাহির হইল। এই খণ্ডে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্ত সার এবং পঞ্চোপনিষৎ (তলবকার, ঈশ, কঠ, মাণ্ডুক্য ও মুণ্ডক) প্রদত্ত হইয়াছে। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইংরেজী অনুবাদ সহ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রকাশিত করেন। তাঁহার উত্তর রামমোহন দেন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে'। মৃত্যুঞ্জয়ের উক্ত বাংলা প্রতিবাদ এবং রামমোহনের জবাব দুই-ই এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এতদিন রামমোহনের উক্তির সঙ্গে মাত্র পাঠক সাধারণ পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণে উভয়-প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হওয়ায় এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের মতামত ও মনোভাব জানা যাইতেছে, অন্য দিকে রামমোহনের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে রামমোহনের জীবিতকালে প্রকাশিত মূল পুস্তকসমূহের সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন। রামমোহনের কোন কোন নবাবিষ্কৃত পুস্তক যাহা ইতিপূর্ব্বেকার সংস্করণগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, আবার কোন কোন রচনা অপরের সন্দেহে বর্জিতও হইয়াছে। এই শোভন ও পরিশুদ্ধ সংস্করণটি শুধু রামমোহন-অনুরাগীদেরই নহে, বাংলাভাষার মরমীদেরও বিশেষ কাজে আসিবে। বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির ধারা নির্ণয়কল্পেও এরূপ পুস্তক প্রকাশের বিশেষ সার্থকতা আছে।

বর্ষপঞ্জী, ১৩৫৮—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপাল ভৌমিকের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত। এস্ আর. সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। মূল্য চারি টাকা।

ইদানীং যে ধরণের বর্ষপঞ্জী বাহির হইতেছে, 'প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত' এই পঞ্জীখানিতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে সুখী হইতাম। কৃষি, শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বর্ত্তমান ভারত, বহির্ভারত, খেলাধুলা, খাদ্যসমস্যা, চলচ্চিত্র, ব্যক্তিপরিচয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণাই ইহাতে করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু তারতম্য হইলেও কোনটিরই বিশদ বা বিশেষ বিবরণ পাইতেছি না। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা মাত্র নয় পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় তারিখ"-এ দেখিতেছি, 'সতীদাহ প্রথা'র উচ্ছেদ হইয়াছে '১৮২৮ সনে'। ইহা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭শ বিধি-দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এতগুলি বিষয়ের পরিবর্ত্তে, দুই চারিটি অত্যাবশ্যক বিষয় লইয়া এক একখানি বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইলে ভাল হয় না কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেরিলিতে দুর্গোৎসব

এবার উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে বিপুল সমারোহে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ. কে. কর পূজা-কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। স্থানীয় লোক ও প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এবারকার পূজানুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বেরিলিতে সমাগত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কীর্তনও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

বেরিলিতে দুর্গোৎসব

হরিজন সেবক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় বোর্ড

(১৯৫০-৫১)

৩১-৩-৫১ তারিখান্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী

এই বৎসর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানকর্তৃক ৪০টি হরিজন বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩১টি পশ্চিমবঙ্গে এবং বাকি ৯টি পূর্ব্ব পাকিস্থানে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৬৮৪ জন হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সংখ্যা ছিল ১৪০০। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে চারটি বুনিয়াদী পদ্ধতিতে চলে। এগুলির শিক্ষকেরা ওয়ার্দ্ধা অথবা বলরামপুরে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যালয়গুলিতে বোর্ড যে সাহায্য দেন তাহা বৎসরান্ত। তাই পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারও শিক্ষকের বৃত্তির সহিত মাসিক ৫৲ হারে মাগ্‌গি ভাতা অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কারণে আটটি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে, দুইটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। নূতন বিদ্যালয়গুলির একটি হাওড়া জেলায়, অপরটি মেদিনীপুরে। বোর্ডের পক্ষ হইতে নবদ্বীপে দুটি বয়স্ক মহিলা-শিক্ষা কেন্দ্রও চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির সাহায্য বাবদ বোর্ড ৮,২৬৯৲ টাকা ও মাগ্‌গি ভাতা বাবদ ১,৩৬৬৸১০ সাহায্য দিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ২,৬১৫৲ টাকা। বিদ্যালয়ে সাহায্যের পরিমাণ মোট ১০,২৫০৸১০ টাকা। ৩টি হরিজন ছাত্রকে বৃত্তি বাবদ ৩২৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

দুই জন উৎসাহী কর্ম্মী পাওয়া গিয়াছে। একজন বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। অপর জন ভ্রাম্যমাণ চরকা-শিক্ষক।

শহরের মেথরদের কল্যাণ-চেষ্টায় এই বৎসর ৪৭১।০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। হাওড়ার একটি মেথরবস্তিতে সেবাকার্য্য চলিতেছে। হরিজনদের সামাজিক মর্য্যাদালাভ হইবে এই আশা লইয়া এ প্রচেষ্টা সুরু করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রের উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীলালবিহারী প্রধান ওয়ার্দ্ধায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য গিয়াছেন। পরে এই কেন্দ্রে শ্রীমধুসূদন শ্রীবাস্তব গত ৯ মাস যাবৎ ভগবতী বস্তিতে সাফাই ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। এই কর্ম্মে প্রতিবেশীদের সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ঐ স্থানে একটি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

প্রচারকার্য্যে ৩০১৮৶০ টাকা খরচ হইয়াছে। গান্ধী জয়ন্তী দিবস, গান্ধী প্রয়াণ দিবস, ঠক্কর বাপার জন্মদিন ও মৃত্যু দিবসে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জনসভার আয়োজন করা হয়। একটি সভায় ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু এবং আর একটিতে ভূতপূর্ব কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস টণ্ডন সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বোর্ড ৩,৫০০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ঠক্কর বাপার পরলোকগমনে সঙ্ঘের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ১৩৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় হরিজনদের দারুণ দুর্ব্বিপাকের দিনে এই বৃদ্ধ জনসেবক বাংলায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ঠক্কর বাপার দেহাবসানের পর শ্রীবিয়োগী হরি হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া সঙ্ঘের কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সঙ্ঘের সহযোগী হরিজন উত্থান বোর্ড এবং হরিজন পুনর্বসতি বোর্ডের পরিচালিত দুইটি পাঠশালা পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গীয় বোর্ডের সদস্যদের সহিত মিলিয়া হরিজন সেবা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

এই প্রতিষ্ঠানের বঙ্গীয় বোর্ডের সম্পাদক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

আলোচ্য বর্ষে মঠে ১৫২টি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্লাস এবং নিয়মিতভাবে শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন করা হইয়াছে। পুস্তকাগার এবং সাধারণ পাঠাগারও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১৭৪২।

মিশন বিভাগ : মিশনের তত্ত্বাবধানে বাঁকুড়া শহরে দুইটি এবং রামহরিপুর গ্রামে একটি মোট ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে এই তিনটি চিকিৎসালয়ে মোট ৬৬০৪৫ জন নূতন ও পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং মোট ১৫২ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া মিশন প্রাঙ্গণস্থ রোগিগণের অস্থায়ী আবাসে মোট ৩৩৮ জন রোগী অবস্থান করিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিভাগে মোট সাত জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২ জন ছাত্র হোমিওপ্যাথিক বিভাগের ডিগ্রীলাভ করিয়াছে।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে থাকিয়া দশ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই বৎসরে রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০। একটি বালিকাও এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

মিশন বিভাগ আলোচ্য বর্ষে মোট ৪০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১৬১৮/০ আনা সাহায্যদান করিয়াছে। মিশনের ১৯৫০ সালের মোট আয়, ৬৮৮১।০, তন্মধ্যে বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম্মে ব্যয় হইয়াছে ৬৭৪০৲১৫ পয়সা।

মূক-বধিরদের সমাবেশ

কলিকাতায় মূক-বধির বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে মূক-বধির শিক্ষা-প্রচেষ্টা সুরু হয় গত

মূক-বধিরদের সমাবেশ

শতাব্দীর শেষ দশকে। মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যামিনীমোহন মজুমদার দীর্ঘকাল ইহাদের সেবায় রত ছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ কেহ এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মজুমদার মূক-বধিরদের সাধারণ ও শিল্পশিক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে উদ্যোগী। তিনি সম্প্রতি স্বীয় ভবনে মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা ও সমাজগঠন মূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ আয়োজনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

ডক্টর শৈলেশচন্দ্র সেন

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন সম্প্রতি "Sugarcane Chemistry (ইক্ষু রসায়ন) সম্বন্ধে থিসিস লিখিয়া ডি-এস্‌সি ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন। ডক্টর সেন দ্বারভাঙ্গা জেলার পুষা ইক্ষু গবেষণা-কেন্দ্রে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। বিহারে 'ইক্ষু রসায়ন' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী আর কেহ নাই। তার জন রাসেল, ডি-এস্‌সি

এফ. আর. এস্., ডক্টর ডবল্যু. জি. ওগ, ডি-এস্‌সি. এফ. আর. এস্. ও অধ্যাপক রিচার্ড ফ্রেডরিক্স—এই তিন জন মনীষী ডক্টর সেনের থিসিস পরীক্ষা করেন।

ডক্টর সুনীলচন্দ্র রায়

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফেলো শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়, এম্-এ, "প্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি" সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অফ ফিলসফি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহার থিসিস অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক আলটেকার ও অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী কর্তৃক পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। ডক্টর রায় চুঁচুড়ার খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র।

পরিমল রায়

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে পরিমল রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। দিল্লী ছিল তাঁহার কর্মস্থল। অর্থনীতিতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করিতেন। বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা-সাহিত্যে রসরচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিতেন। তাঁর লেখায় যে সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইত তাহা প্রশংসনীয়।

মণীন্দ্রভূষণ সিংহ

গত ২২শে আশ্বিন বাঁকুড়ার জনপ্রিয় দেশসেবক মণীন্দ্রভূষণ সিংহ ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়ার তাড়ুল গ্রামের রাধিকাপ্রসাদ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। শৈশবে দেওঘরের উচ্চ ইংরেজী স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন এবং বিহার প্রদেশ হইতে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া ল কলেজে আইন অধ্যয়নকালীন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের 'ফরেন' আপিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। তৎকালে ফরেন আপিসে এদেশীয় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল অল্প। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে ইংরেজ সহকর্মীদের তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না, সেইজন্য তাঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁর বচসা হইত। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধের সময় তিনি সহসা চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সেই সময় হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করি-

বার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে জাগরূক হয়। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি তাঁর জন্মভূমি বাঁকুড়ার দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীঅনিলবরণ রায়ের সহিত যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৮ সালে তিন বৎসরের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত বার বার তাঁহাকে আটক রাখা হয়। তিনি পনর বৎসরকাল বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। বাঁকুড়া স্কুলবোর্ড, বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, বাঁকুড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, হিন্দুস্কুল কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবং আরও অনেক সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং ঐ সময় কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন।

গণেশচন্দ্র ভল্লা

কাঁথির প্রবীণতম সাংবাদিক গণেশচন্দ্র ভল্লা পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় যখন কোনও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল না সেই সময় কাঁথিতে জ্ঞানালোক বিস্তারের অগ্রদূত পরলোকগত মধুসূদন জানা মহাশয় 'নীহার প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং "নীহার" (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে কাঁথির ন্যায় একটি দূরবর্ত্তী, দুর্গম ক্ষুদ্র শহরে সংবাদপত্র পরিচালনা দুঃসাহসের কাজ ছিল। প্রথম হইতেই গণেশচন্দ্র এই পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনে "নীহার" গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে কারণে মধুবাবু বা গণেশচন্দ্র কেহই দেশসেবায় পশ্চাৎপদ হন নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ "নীহার" তাঁহার একনিষ্ঠ সেবা পাইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সত্যকিঙ্কর মিত্র

কলিকাতা ছোট আদালতের সুপরিচিত ব্যবহারজীবী শ্রীসত্যকিঙ্কর মিত্র গত ১৫ই কার্ত্তিক তাঁহার ২১এফ, জীক রোহিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

পাঁচমহলের সুপরিচিত মিত্র পরিবারের রায়বাহাদুর দ্বারকানাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যকিঙ্করবাবু কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। অমায়িক হিসাবে সত্যকিঙ্করের বিশেষ সুনাম ছিল এবং তিনি ভাল খেলোয়াড়রূপেই পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাবে ফুটবল খেলিয়াছেন। গত ১৯০৯ সালে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইবার পর তিনি আইন ব্যবসায় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

পাটনায় ১৯৩৭ সালে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পাটনাবাসী বাঙালীরা আবার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৫১ সালের অধিবেশন পাটনায় অনুষ্ঠিত করিতে স্থির করিয়াছেন। ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

মূল সম্মেলনটি আটটি শাখায় বিভক্ত। ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আটটি শাখা ও প্রত্যেকটির নির্ব্বাচিত সভাপতির নাম নীচে দেওয়া হইল :

সাহিত্য শাখা—আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন (শান্তিনিকেতন), ললিতকলা শাখা—শ্রীদিলীপকুমার রায় (পণ্ডিচেরী), বিজ্ঞান শাখা—অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বৃহত্তর-বঙ্গ শাখা—ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), ইতিহাস শাখা—অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), মহিলা শাখা—(সভানেত্রী নির্ব্বাচন এখনও হয় নাই), শিশু-সাহিত্য শাখা—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (কলিকাতা), নিখিল ভারতীয় সাহিত্য শাখা (আলোচনা)—পণ্ডিত শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হইবে।

ব্যারিষ্টার পি. আর. দাশ এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ এস. কে. দাশ এই অনুষ্ঠানের দুই জন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। শ্রীরমাপতি গুপ্ত ও অরুণচন্দ্র রায় ইহার যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মেলনের কার্য্যালয়ের ঠিকানা লালকুঠি, এগজিবিশন রোড, পাটনা।

প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

হাল্‌কা হাওয়া
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ই আগষ্ট, ১৮৭১ মৃত্যু : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৮

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের আর একজন কৃতী সন্তান দেহত্যাগ করিলেন, যিনি কেবল রক্তের সম্পর্কে নয়—ভাব-চিন্তা-আদর্শের সম্পর্কে কবিগুরুর সমধর্ম্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তিনি কতভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন "জোড়াসাঁকোর ধারে", "ঘরোয়া", "আপন কথা" প্রভৃতি বইয়ে। চিরকালের জন্য দেশের বালকবালিকাদের আনন্দবিধানের আয়োজন করিয়া গিয়াছেন তিনি "রাজকাহিনী", "ক্ষীরের পুতুল" প্রভৃতি পুস্তকে। ভারত-সংস্কৃতির ধারক এবং মরমী ব্যাখ্যাতা অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাগেশ্বরী" বক্তৃতামালার মধ্যে।

যাঁহারা বাংলার তথা ভারতের অন্তরাত্মাকে বিদেশীর ঘৃণা ও অবহেলার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের শিল্প ও ললিতকলাকে ধূলিস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন গৌরবে অভিষিক্ত করিয়া, রত্নকল্প উজ্জ্বল রূপে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব যদি কাহারও প্রাপ্য হয় তবে তাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের।

আচার্য্য শব্দের ব্যবহার আমরা জানি না, তাই যোগ্য অযোগ্য সকলকেই আমরা ঐ আখ্যা দান করিয়া থাকি। যিনি কোনও শাস্ত্রে কোনও নূতন বিধান বা সংজ্ঞা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি মনীষিগণের সম্মুখে নূতন জ্ঞানের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বা যিনি কোনও বিচার বা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নূতন আলোকের আধার স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আচার্য্য।

ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ললিতকলার স্থান নির্দ্দেশ ও তাহার উদ্ধারের পথ প্রদর্শন বাংলার এই সন্তানেরই পুরুষকারে সম্ভব হয়। তিনি যে শুধু পথ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার উপদেশে ও ব্যাখ্যায় এবং তাঁহার অমৃতময় তূলিকার সক্রিয় সঞ্চালনে ভারতের ললিতকলা নূতন জীবনলাভ করে। দেশে-বিদেশে তাঁহারই চেষ্টায়, তাঁহারই উদ্দীপনায় ভারতের চিত্রকলা খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হয়। সুতরাং আচার্য্য আখ্যায় তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তর্কের অতীত।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে কতিপয় বিদেশীর পদলেহী "লম্বশাটপটাবৃত" মূর্খ, বাচালতার দ্বারা তাঁহার গৌরবকে ম্লান করার চেষ্টা করায় দেশবাসীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে বিভ্রম ক্ষণিক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার তূলিকা ও তাঁহার লেখনী স্বর্ণাক্ষরে যাহা লিখিয়াছে এবং আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে তাহা অজেয় ও অক্ষয়।

বাংলার আকাশ আজ তমসাচ্ছন্ন। যে কয়টি তারকার আলোক আমাদের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতের আশাপথ নির্দ্দেশ করার জন্য অবশিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আজ অপসারিত হইল। আমাদের নিকট রহিল কেবল স্মৃতি। যাহা নশ্বর তাহা পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহা অক্ষয়, অমর, যাহা পুরুষকারে এবং অজেয় বিশ্বাস ও অদম্য প্রয়াসে অর্জ্জিত, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে বাংলা মায়ের মানসপটে। আত্মবিস্মৃত বাঙালী এখনও বুঝিতেছে না সে কি হারাইল, যেদিন বুঝিবে সেই দিনই দেখিবে যে, সেই অমরজ্যোতি যাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের যত্নে ও উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ম্লান হইতে পারে কিন্তু নির্ব্বাপিত হইতে পারে না।

এই মহামানব গত ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

বাংলায় নির্ব্বাচন

বাংলায় এবারকার নির্ব্বাচনে ভোটদাতাদের সম্মুখে এক বিষম সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রার্থীদল সকলেই নির্ব্বাচিত হইলে পরে বাংলাকে স্বর্গে পরিণত করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। নিজের বা নিজ দলের কৃতিত্বের পরিচয় দানে সকলেই শতমুখ। কংগ্রেস ত দলগত ও সমষ্টিগত ভাবে নির্ব্বাচনে দাবি করিতেছে যে, দেশকে স্বাধীন করা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে সমষ্টিগত করিয়া দেশবাসীর দখলে আনা, জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা, দুর্ভিক্ষ ঠেকাইয়া রাখা, বাস্তুহারা পুনর্ব্বসতি করা, সমস্ত পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার দান, দেশে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, মদ্যপান নিবারণ, প্রচুর খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন ও অস্পৃশ্য-উদ্ধার ইত্যাদি সব কিছুই ইহা করিয়াছে। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার অবকাশ কয়জন নির্ব্বাচকের হইয়াছে জানি না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশবাসীর পূর্ব্বপুরুষগণের দান অতি বিরাট্ এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অবদান অতি মহান্ একথা কে অস্বীকার করে? কিন্তু এ গৌরবের দাবি যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের কৃতিত্ব ইহাতে কতটুকু? দেশীয় রাজ্যের উদ্ধারে সর্দার প্যাটেলের অংশ গৌরবময় কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের বাহিরের বহু লোকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অশেষ কীর্ত্তির ইতিহাস কংগ্রেস প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহিতেছে। জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা ত আরম্ভ হয় ব্রিটিশ আমলে এবং ইহার ব্যবস্থায় বামপন্থীদের প্রয়াস ও নির্দ্দেশ কংগ্রেস অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। দুর্ভিক্ষ নিবারণে কংগ্রেস সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে তাহা করা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত দেশ সম্বিৎবিহীন এবং দুরারোগ্য কলুষ ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইমাত্র বলা যায় যে, দুর্ভিক্ষ সাময়িক ভাবে ঠেকানো হইয়াছে কিন্তু রোগ অপেক্ষা তাহার প্রতিকার ভীষণতর হইবার নিদর্শন দেখা দিয়াছে এবং যেভাবে কংগ্রেসের অধিকারীবর্গ ব্যবস্থা করিয়া চলিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসেরই দেহ জঘন্যভাবে কলুষিত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অন্ত সকল দাবি ত ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ব্যাপার। শিক্ষা, মাদক নিবারণ, বাস্তুহারা পুনর্ব্বাসন, প্রাইমারী শিক্ষা, সেচ ও খাদ্য উৎপাদন প্রায় প্রত্যেকটিই অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত। বানের জলের ন্যায় অর্থব্যয়ে সামান্য ফলই দেখা যাইতেছে। অস্পৃশ্য-উদ্ধার ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের কীর্ত্তি যাঁহার তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষার চেষ্টা মাত্রও যাহারা করে নাই তাহারাই সেই গৌরবের সবটাই দাবি করিতেছে, ইহা ভারতের অদৃষ্টের পরিহাস।

অন্য সকল দলও নানা কীর্ত্তির দাবি-দাওয়া করিতেছেন, তাহাও অনেকের ক্ষেত্রে অলীক ও অযৌক্তিক।

দাবি ছাড়িয়া প্রতিশ্রুতির প্রশ্নে আসিলে দেখা যায় অবস্থা আরও অদ্ভুত। "আমার দলকে রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের অধিকার দাও, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব"—এ প্রতিশ্রুতি সকলেই দিতেছেন, শুধু মাত্র সাধারণের রাজপদ লাভের পন্থার নির্দ্দেশ বিভিন্ন। তাহার পর স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি। ইহাও অশেষ ও বিচিত্র। যে যাহা খুসী অঙ্গীকার করিতেছে, "তৎপরে যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি"। ফলে নির্ব্বাচন একেবারে প্রহসনের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নির্ব্বাচকবর্গও, অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এই নির্ব্বাচনকে প্রহসন বা সামাজিক নিমন্ত্রণের মতই দেখিতেছেন। কয়জন বুঝিতেছেন যে, তাঁহারা যদি চক্ষুলজ্জার খাতিরে, বা ভাবের বশে, বা হেলাখেলায় অযোগ্য প্রার্থীকে নির্ব্বাচনে সমর্থন করেন তবে বাংলা ও বাঙালীর চিতায় আর একটি কাষ্ঠখণ্ড যোগানই হইবে, মৃতপ্রায় বাঙালীকে প্রাণদান করা হইবে না।

বাংলা ও বাঙালী আজ হৃতসর্ব্বস্ব, শোষিত, দলিত ও মরণোন্মুখ। আরও পাঁচ বৎসর যদি এইভাবে যায় তবে বাংলার সন্তানের মৃতদেহের উপর অশ্রুপাত করা ভিন্ন অন্ত কিছু করার থাকিবে না। এ সকল কথা দেশবাসী বুঝিয়া দেখুন ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

যে লোক বাংলার ও বাঙালীর দুঃখকষ্ট প্রতিনিয়ত অনুভব করে, যে লোক বাংলার দুর্দ্দশার প্রতিকার-চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ইহার প্রতিকারকল্পে যাহার বুদ্ধি, ক্ষমতা ও স্বার্থত্যাগ আছে সেই লোকই নির্ব্বাচনের যোগ্য। অক্ষম বা স্বার্থপর লোক অযোগ্য ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

যে লোক চরিত্রবান, দৃঢ়চেতা ও সাহসী, সে-ই নির্ব্বাচনের যোগ্য। অশক্ত ও সুবিধাবাদীর অযোগ্যতায় সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভোটদাতা বিচার করুন, এখনও সময় আছে যে বৃথা প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটা। যিনি বা যাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাঁহাদের সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষমতাই বা কতটুকু এবং তাঁহাদের অতীত ইতিহাসে তাহার নিদর্শনই বা কি আছে?

ভোটদাতার জানা প্রয়োজন যে, তাঁহার ভোটদানের অধিকার ক্ষণিকের মাত্র, কিন্তু তাহার ফলাফল তাঁহাকেই, সগোষ্ঠী ও সবান্ধবে, ভোগ করিতে হইবে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া। সুতরাং প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারের অধিকার তাঁহার আছে ভোটদানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। "কথা দিয়াছি" বা "একটা ভোট অযোগ্য লোক পাইলেই বা কি"—ইহা যদি তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, বা অন্ধবিশ্বাস তাঁহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ করে তবে আগামী পাঁচ বৎসর কোনও অভিযোগ করার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে না।

কংগ্রেসী সেকুলারত্ব (ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা)

"(১) আমিন নামে একটি লীগপন্থী মুসলমান ১৯৪৬ সালে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় এরূপ 'সুখ্যাতি' অর্জন করেছিল যে, সুরাবর্দ্দীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই সময় অসংখ্য অত্যাচার ও অনাচার সে নিজে ও তার সহকারীরা করিয়াছে। ঐ সকল অপরাধ অনুষ্ঠান করছে এরূপ বহু ছবি আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে। দেশ বিভাগের পর সে পাকিস্থানে পালিয়ে গিয়েছিল। গত বছর সে ফিরে আসে। আর যায় কোথা, Prodigal son ফিরে এলো। ঘরের মোটাসোটা বাছুরটি কাট এবং স্ফূর্তি ও ভোজের ব্যবস্থা কর। কংগ্রেসের সেকুলারী মহাপুরুষগণ তাকে লুফে নিলেন। আমিন হ'ল খড়্গপুর কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি। মাস ছয়েক হ'ল এহেন রত্নটিকে তথাকার অবৈতনিক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কারণ? আমিনের হাতে ৪,০০০ মুসলমান ভোট রয়েছে।

"(২) খুদাবক্স্‌ হচ্ছেন লীগপন্থী ব্যবস্থা-পরিষদ-সদস্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় তিনিও ছিলেন সুরাবর্দ্দীর অন্যতম হস্ত। সেকুলারী রাজত্বের পর লীগপন্থীদের স্বাভাবিক নিয়মে তিনি আসেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসপন্থীরাও তাকে লুফে নিলেন। গত বছর পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদের পুনর্ব্বসতির জন্য এই ভদ্রলোককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮৫,০০০৲ টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকার হিসাব চাওয়া হলে জানা গেল তার কোন পাত্তা নাই। পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দিলেন, আমি কোন রসিদ নিই নি। আরও চেপে ধরা হলে স্বয়ং ডাক্তার বিধান রায় এগিয়ে এলেন তাঁর পক্ষপুটে খুদাবক্স্‌কে বাঁচাবার জন্য। 'খুদাবক্স্‌ লোকটি ভালই—তবে যে লোকগুলিকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন, তারা যদি পাকিস্থানে পালায় তা হলে তিনি আর কি করবেন?'

"ভদ্রলোক আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট পেয়েছেন।"

শ্রীজবাহরলাল নেহেরু যে "জান-পাপী" তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোন রাষ্ট্রের নর-নারী যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস বশে চলে এবং ঐ বিশ্বাসের নির্দ্দেশে যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তৎসম্বন্ধে সেই রাষ্ট্র কি করিয়া নির্ব্বিকার নীতির অনুসরণ করিতে পারে। কোন যুগে তাহা সম্ভব হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন। তাহা যে মিথ্যা তার দুইটি প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ পর্য্যন্ত কোন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি মনোনীত হইতে পারেন নাই এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোন অ-কম্যুনিষ্ট কোন উচ্চপদে নিয়োজিত হন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিকল্পনা

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভারতরাষ্ট্রের নর-নারীর জীবনকে নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য অনেকের অনেক রকম পরিকল্পনা আছে, সুতরাং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরই থাকিবে না কেন! তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎসম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা করেন। তার চার-পাঁচ দিন পরে আর একটি সম্মেলনে তিনি নানা সংখ্যা-তথ্য-বহুল একটি বিবৃতি দান করেন, এবং তার প্রভাবে আগামী নির্ব্বাচনে জয়লাভের আশা করেন। যদি পরিকল্পনা পেশ ও পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকিত, তবে ডাঃ রায়ের মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য আমরা দেখিয়া যাইতে পারিতাম।

কিন্তু বিশ্ববিধানে সাধারণতঃ তাহা হয় না। ডাঃ রায় ভাগ্যবান লোক, তাঁহার বেলায় এই বিধান উল্টাইয়া গেলে আমরা সুখী হইব। তবুও সংশয়ী মন ইতিহাসের শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতে পারে না, এবং সেইজন্যই নিজের সংস্কার অনুসারে বলিতে বাধ্য হয় যে, সংখ্যা-তথ্যের সংগ্রহ ও সমাবেশে নয়, ভাবের পবিত্রতা, কর্ম্মের সফলতা ও ইচ্ছার একাগ্রতা পরিকল্পনাদিকে আশানুরূপ রূপদান করে। এই তিনটির সমবায় বা সম্মিলন আমরা দেখিয়া যাইতে পারিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মন খুলিয়া অভিনন্দন জানাইব।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাংলাদেশে শহর ও গ্রামগুলি নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে গ্রাম্য জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে বাঙালী জমির উপর একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে। ফলে চাষের উপর অধিকাংশ লোক নির্ভর করিয়াছে, কিন্তু পরিণামে কৃষিকে উন্নত না করিয়া ক্রমাগত অবনতির পথেই লইয়া গিয়াছে। কারণ শহরের সহিত অর্থাৎ বাজারের সহিত যোগাযোগ না থাকায় দালালের মারফত কাজ করিতে হয়, সুতরাং লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত কৃতী ও উত্যোগী তাহারা শহরে নূতন জীবিকার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। যাহারা অক্ষম তাহারাই এখন চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। অপর পক্ষে শহরগুলি এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে এই সকল গ্রাম-ত্যাগী মধ্যবিত্তকে বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। শহরের অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও বস্তী জীবন তাহাদের কৃত্রিম জীবনযাপনে বাধ্য করিতেছে। টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্যের ও মুক্ত আলোবাতাসের অভাবে শহরবাসিগণ স্বাস্থ্যহীন ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন গ্রাম ও শহরগুলির মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুযায়ী জনপদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা পঞ্চাশ-ষাটটি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামসমষ্টি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান জনসংখ্যার বিচার করিয়া বলা যায় যে, ঐরূপ এক-একটি গ্রামসমষ্টিতে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক থাকিবে এবং উহার পরিধি হইবে আনুমানিক ১৫ বর্গমাইল। এই নব-গঠিত শহরগুলির প্রত্যেকটিতে এক হইতে দুই হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল শহরে তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সেখানে শিক্ষা পাইয়া তাহারা নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে। এই সকল দ্রব্য ঐ পঞ্চাশ-ষাটটি গ্রামের লোকদের মধ্যে আবার বিলি-বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের লোকের চাহিদা মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা তখন কয়লা, কেরোসিন, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি দ্রব্যের বিনিময়ে রপ্তানী করা হইবে। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ব্ব-প্রকারেরই ব্যবস্থা থাকিবে এবং জনসাধারণকে সকল বিষয়েই সুযোগ দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অন্ততঃ বিশটি ক্ষুদ্র শহর স্থাপনে সক্ষম হইবেন। প্রত্যেকটি শহরের উন্নয়নের জন্য মোট চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনে আরও বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। আদর্শ নগর নির্ম্মাণের জন্য প্রধান প্রধান ব্যয় হইবে এইরূপ :

১। ৫ শত একর জমি দখল (একর প্রতি
২ শত টাকা)— ১ লক্ষ টাকা।
২। ১ সহস্র গৃহ নির্ম্মাণ (প্রত্যেকটি ১।০
হাজার টাকায়)—১৫ লক্ষ টাকা।
৩। পথ ঘাট, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ
এবং পয়ঃপ্রণালী—৫ লক্ষ টাকা।
৪। ১ হাজার লোককে বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষাদান
(প্রত্যেকের পিছনে ১৫০৲ ব্যয়) ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
৫। কলকারখানা নির্ম্মাণ— ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
৬। ৬ মাসের কলকারখানার সাজসরঞ্জামের ৮ লক্ষ টাঃ
৭। বিবিধ ব্যয় ... ২ লক্ষ টাঃ

মোট ৪০ লক্ষ টাকা

৬০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য এইরূপ ব্যয় হইবে :

১। রাস্তা ২০ মাইল পাকা, ১২০ মাইল কাঁচা ১২ লক্ষ টাঃ
২। স্কুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন ২ লক্ষ টাঃ
৩। গ্রামগুলির জন্য খাল খনন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
৪। মাথাপিছু ৭৫ টাকা হারে ৬ হাজার
গ্রামবাসীকে কৃষি সাহায্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ

মোট ২০ লক্ষ টাকা

অতএব প্রত্যেকটি নগর নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইবে ৬০ লক্ষ টাকা এবং এইরূপ ২০টি নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইবে অন্ততঃ ১২ কোটি টাকা। এই টাকার এক অংশ রাজ্য সরকার ঋণ বাবদ দিবেন। অবশিষ্টাংশ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের নিকট হইতে তোলা হইবে।

এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলার মধ্যবিত্ত সমস্যার সমাধান স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্তের সমস্যা এত বিরাট যে কয়েকটি 'স্যাটেলাইট' শহর ও কলোনী নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সমাধান হইবে না। দেশের যেখানে যত মধ্যবিত্ত আছে—সে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুই হউক বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাই হউক—তাহাদের সকলকে এক জায়গায় জড় করিয়া শহরে পুনর্ব্বাসন করিলে কোন সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় তাহাদের সকলকে একত্রে পাওয়াও যায় না এবং সে চেষ্টাও বাতুলতা। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-চাষী ও ধনী এই তিন শ্রেণীকে লইয়াই দেশ। ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক বাসস্থানে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রাখিলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল হইবে না। উহা সম্ভবও নহে। দেহের সহিত নাড়ীর সংযোগ না থাকিলে দেহ যেমন নশ্বর, গ্রাম হইতে ছিন্ন মধ্যবিত্তের জীবনও তেমনি মিথ্যা। শহরের কেরাণীর পশ্চাতে যে বৃহৎ মধ্যবিত্ত সমাজ আছে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্যাটেলাইট টাউন গঠন সমস্যার সমাধান নহে।

মধ্যবিত্তের সমস্যা আজ অর্থোপার্জ্জনের সমস্যা। মধ্যবিত্ত সমাজে যুবক শ্রেণীর চাকুরী নাই। সরকার তাহাদের চাকুরী দিতে পারিতেছে না। তাহারা শিল্প বা ব্যবসায়ে যোগ দিতে পারিতেছে না—কারণ তাহারা স্বত্বসর্ব্বস্ব, তাহাদের পুঁজি নাই। বড় বড় ব্যাঙ্ক হইতে তাহারা টাকা ধার পায় না, ছোট ব্যাঙ্ক তাহাদের টাকা ধার দিতে সাহস পায় না। ইহাই তাহাদের প্রধান সমস্যা। তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এত কাল কেহ তাহাদের করিয়া দেয় নাই। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় নিজেরাই করিয়াছে।

তাহাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের উপায়—তাহাদের উপার্জ্জনের পথ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া। এখানেই সরকারের

নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য করিতে পারে। তাহার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সকল পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলিকে সত্বর কার্য্যে পরিণত করা দরকার। তাহার দ্বারা গ্রামে সস্তাদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সহজ হইবে। ফলে নানা প্রকার কুটীরশিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে—যেখানে গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সমগ্র দেশের একটি অর্থনৈতিক সার্ভে করা—কোন্ স্থানে কি কি কাঁচামাল সহজলভ্য এবং কি ধরণের শিল্প সেখানে গড়িয়া উঠিতে পারে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা। অবশ্য এই ধরণের অনুসন্ধান একাধিক বার করা হইয়াছে এবং তাহা লিপিবদ্ধও আছে। তারপর বিভিন্ন আঞ্চলিক শিল্পের উপযোগী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা অন্তে তাহারা নিজ নিজ গ্রামে গিয়া যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে। সরকারী সাহায্যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অসংখ্য শাখা গ্রামের মধ্যে এই সকল শিল্প বা কৃষি অঞ্চলগুলিতে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। তাহারা বিনাসুদে মূলধন ধার দিয়া এই সকল শিক্ষার্থীকে শিল্পে যোগদানে সাহায্য করিবে। যত দিন টাকা পরিশোধ না হইবে তত দিন ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ ইহার উপর তদারক করিবেন এবং সৎ ও সুপরামর্শ দিয়া শিল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করিবেন। তত দিন নূতন শিল্পীও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

প্রাচ্যে জাপান একমাত্র কুটীরশিল্পের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সমস্যা মিটাইয়াছে। জার্ম্মানীতে গোয়েরিং-প্ল্যানও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সনে সুরু করিয়া মাত্র চার বৎসরের মধ্যে গোয়েরিং-প্ল্যানে জার্ম্মানীর মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক চেহারার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

একটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের কত উপকার সাধন করিতে পারে অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যাঙ্ক (Rural Bank of New South Wales) তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে, সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগ ও সরকারী এজেন্সী বিভাগ, শেষোক্ত বিভাগটি সরকারের অর্থে চলে। ইহার কাজ কৃষি, শিল্প, গরু-ভেড়া পালন প্রভৃতি প্রয়োজনে কিংবা গৃহনির্ম্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য কেহ ঋণ চাহিলে তাহাকে ঋণ দেওয়া হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় কাজের জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কের ৫০ জন অভিজ্ঞ ভ্যালুয়ার আছেন। কেহ ঋণ চাহিলে ইঁহারা তাহার সিকিউরিটির মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। কোন কৃষক ভাল উৎপাদন না করিতে পারিলে, তাঁহারা উন্নতির উপায় বিষয়ে পারিলে নিজেরা নতুবা অন্য বিভাগ হইতে পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ব্যাঙ্কের একটি পাবলিক রিলেশন অফিসার আছেন। তাঁহার কাজ উন্নত কৃষিকার্য্যে কৃষকদের শিক্ষাদান এবং কিসে প্রদেশের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহার সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার। এই ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা জনসাধারণকে সাহায্য করিতেছেন। দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী হইলে এ কাজ এমন কিছু দুরূহ নহে, আমাদের দেশেও ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। অর্থাভাবের ওজুহাত কোন কাজের নহে, সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য দফায় দফায় যে অর্থ খয়রাতী দিতেছেন তাহাতে না হইতেছে সরকারের লাভ, না দেশবাসীর, না উদ্বাস্তুদের নিজেদের। এই অর্থদ্বারা এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ইতিমধ্যে অনেক কাজ পাওয়া যাইত বলিয়া আমরা মনে করি, এখনও সরকার শিল্পে মূলধন সরবরাহের জন্য নিজে ঋণ করিয়া, বা শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রাদেশিক সরকার অক্ষম হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এরূপ ঋণ দেওয়ার জন্য বাধ্য করাইতে পারেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই ঋণ পরিশোধ করা যাইবে।

ডাঃ বিধান রায়ের পরিকল্পনাতে ২০টি স্যাটেলাইট শহরের জন্য ১২ কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু ঐ অর্থ যদি উপরোক্ত উপায়ে খরচ করা হয় তাহাতে অধিকতর অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে।

ভূমি-সংস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংবাদপত্রে বিবৃতি-প্রসঙ্গে গত ১৮ই নবেম্বর রবিবার জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, চাষ এবং চাষীদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ জমিদারী বা মধ্যবিত্ত স্বত্ব নয়। এই প্রথার উচ্ছেদ হইলেই যে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে ইহাও ভুল ধারণা, যদি তাহা হইত তবে যে সকল অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা আছে তথায় বা এই রাজ্যের খাসমহলের অন্তর্গত জমিতে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইত। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান মালিকানা ও ভূমিস্বত্ব উৎখাত করিতে হইলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইহাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার জমির উপর পড়িবে এবং জমি হইতেই তাহা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং নূতন ভূমিব্যবস্থায় চাষীর প্রকৃত উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও কৃষক যদি বেশী উৎপাদন করে তবে তাহা কৃষকেরই প্রাপ্য, যেহেতু জমিদারের আয় আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজন, ভূমির মালিকানা স্বত্ব চাষীর হস্তে অর্থাৎ শ্রমিক ও ভাগচাষী

এই উভয় প্রকার চাষীদের হস্তে অর্পিত হইলেই শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ প্রত্যেক চাষীকে বিলি করার জন্য পরিমিত চাষের জমি আমাদের নাই। পতিত জমি যাহা আছে তাহার অধিকাংশই বন্যাকলের বা জলস্রোতে ভাঙিয়া না যায় সেজন্য অথবা গো-মহিষাদির খাতের জন্য ঘাসের জমি হিসাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। অবশিষ্টাংশকে চাষের উপযুক্ত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানেই আমাদের জমি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং স্বল্প উৎপাদনের ইহাই প্রধান কারণ। ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া চাষীকে জমির মালিক করিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি আরও বহুধা বিভক্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে এবং এই পরিস্থিতিকে কোন আইন দ্বারা বন্ধ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদ্র জমি হওয়ার জন্য ইহা আরও দ্রুত মহাজনদের করতলগত হইবে, কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহাদের মহাজনদের কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার প্রতিকারের উপায় স্বরূপে তিনি বলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ জমির উপর হইতে অন্য দিকে চালনা করিতে হইবে। এজন্যই পল্লীবাসীদের কুটীর-শিল্পাদি লাভজনক কার্য্যের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন এবং চাষীদের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আয়তনের জমি চাষ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়টি এমনই জটিল ও ব্যাপক যে তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র বিষয়টি একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর দ্বারা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতি উদাসীন নহে। তাঁহারা কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যে সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতির সাহায্যে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা হইতেছে এবং কুটির-শিল্পের উন্নতিবিধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলও এখনই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি-সংস্কারের এ সকল সমস্তার কথা মনে রাখিয়াই সুন্দরবনের সরকারী জমিতে এই পরিকল্পনা প্রথম কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বর্তমানে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। জমিদারী প্রথা যে কৃষির দুর্দশার একমাত্র কারণ নহে তাহা সত্য। জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজন তাহা সরকারের নাই ইহাও সত্য। ভূমিস্বত্বের নূতন ব্যবস্থার ফলে নূতন সমস্তার উদ্ভব হইবে ইহাও জানা কথা। জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ সরাইয়া শিল্পের প্রসার করা প্রয়োজন তাহাও বহুশ্রুত বাক্য। কিন্তু কথা হইতেছে ইহার প্রতিকারের কি কোন ব্যবস্থা বাস্তবিকই নাই, না সরকারের বলিষ্ঠ মনোভাব ও ত্রুটিহীন কর্মসূচীর অভাবে প্রতিকার ব্যাহত হইতেছে? আমরা জানি এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যদি সরকারের মনোভাব সেরূপ হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, জমির মালিকানাস্বত্ব চাষীর হাতে অর্পিত হইলে তাহা আরও বিভক্ত হইবে এবং মহাজনদের হস্তগত হইবে। এ ক্ষেত্রে আমরা পঞ্জাবের Land Alienation Act-এর নিদর্শন দেখাইতেছি। সেখানে জমি কেবলমাত্র প্রকৃত চাষীই ক্রয় করিতে পারিবে। চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নহে এমন লোক জমি কিনিতে পারে না। আমাদের বাংলাদেশেও ফজলুল হক মহাশয়ের মন্ত্রিত্বের আমলে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর যখন দেখা গেল যে, অধিকাংশ জমি মহাজনের কবলে গিয়াছে তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীদের মধ্যে যাহারা জমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহাদিগকে জমি ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ইহা দ্বারা জমি চাষীর হাতেই থাকিবে—ইহার স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন হইবে। তাহাতে চাষের কোন ক্ষতি হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপ করিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারা মহাজনদের হাত হইতে জমি রক্ষা করিতে পারেন। অপর পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি বিভক্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা আছে তাহার প্রতিকারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইহার প্রতিকারে আমাদের উত্তরাধিকারের আইনের পরিবর্তন করা অসম্ভব হইলেও অন্য ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিকার করা যায়। বর্তমানে রাশিয়া প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দেশে বহুধা বিভক্ত মালিকানাস্বত্ব সম্মিলিত চাষের পক্ষে অন্তরায় হয় নাই। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন চাষীর জমিকে একত্রে চাষ করার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। ইহাতে চাষী তাহার নিজস্ব স্বত্ব রক্ষা করিয়াই ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে আইন দ্বারা জমি একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (land consolidation acts)। কিন্তু যদি জমিদারী প্রথা রহিত না হয় তাহা হইলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই অভীষ্ট ফল লাভ করা যাইতে পারে।

পতিত জমি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। পতিত জমির পরিমাণ আমাদের কম নহে। সে জমির উদ্ধারের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তাহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে চাষীর উপরই সে গুরু দায়িত্ব নিক্ষেপ করা হইয়াছে। জমির মালিকানাস্বত্ব জমিদারের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চাষীর

াতে ছাড়িয়া দিলেই সরকারের সকল কর্তব্য শেষ হইবে া।

তৃতীয়তঃ, জমির উপর নির্ভরতা হ্রাস করিবার জন্য য়োজন কুটিরশিল্পের প্রসার। ইহার জন্য প্রয়োজন রকারের বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণ। াহার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিস্তার করা সহজ হইবে। ম হইতে লোক সরাইয়া শিল্পে নিয়োগ করিয়া আপাততঃ াথিক সমস্যার সমাধান হইবে নিশ্চয়। কিন্তু কৃষি যদি র্তমান অবস্থায় থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও াচনীয় হইবে। আমাদের দেশে কৃষি একক ভাবে কোন নই সম্পূর্ণ ছিল না। চিরদিনই কুটিরশিল্প চাষীর অন্যতম ীবিকা ছিল এবং চাষের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা দ্বারা পার্জন করিত। বর্তমানেও একমাত্র কৃষি কৃষকের অভাব াচন করিতে পারিবে না। তাহাকে স্বাবলম্বী করিতে ইলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুটিরশিল্পের উন্নতি করিতে ইবে এবং এই দুইটি ব্যবস্থা একই সঙ্গে করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে জানা গেল যে সুন্দরবন অঞ্চলে রকারী খাসের জমিতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ ইয়াছে এবং তাহার ফলও পাওয়া যাইতেছে। এই ফলের রূপ জনসাধারণ আজও জানিতে পারিতেছে না। ইহার ারা বাংলার ক্ষুদ্রতম জেলারও খাদ্যাভাব দূর করা যাইবে লিয়া শুনিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। তাহা ছাড়া সমস্যাটা সমগ্র দেশের। তাহাকে একটি মাত্র সরকারী খাসের মধ্যে সীমা- ব রাখিলে বিশেষ লাভ হইবে কি? অবশ্য বলা হইবে— রীক্ষামূলক। কিন্তু স্বাধীনতার চারি বৎসর পরেও যদি রীক্ষণের কথা শুনিতে হয় তবে বড়ই বিপদের কথা। দেশের র্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ বড় নৈরাশ্যজনক। ার নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর কংগ্রেসের র্মসূচীর বিপরীত ধর্ম্মী ভাব ও নীতি প্রকাশ কংগ্রেসের পক্ষে তিকারক হইবে না কি? কংগ্রেস যে দিন হইতে নিজেকে নগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিয়াছে সেই দিন হইতে াবধি তাঁহারা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদকে তাঁহাদের কর্ম- চীর অন্যতম প্রধান নীতি হিসাবে রক্ষা করিয়াছেন। প্রধান ন্ত্রী ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের ক্ষে ইহা বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় কৃষি ঋণদান প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আট মাসব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালনা করা হইবে। এই সার্ভের ারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় সরকার তাহাদের স্ব স্ব কৃষি ঋণদান বিভাগ সুগঠিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় ইউনিয়নের ২০টি রাষ্ট্রে এই সার্ভে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ১৯৫২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রিপোর্টের খসড়া সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু দিন সময় লাগিবে বলা হইয়াছে।

এই কার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কৃষির অবস্থা অনুসারে ৩৩টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতকগুলি জেলাকে এবং প্রত্যেক জেলা হইতে আবার অনুরূপ উপায়ে আটটি করিয়া গ্রামকে বাছাই করা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৬০০ শত গ্রামকে এই সার্ভের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের চাষ বা ঐ সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করাই হইবে সার্ভের প্রথম কাজ। বিশেষতঃ বর্তমান অর্থ- নৈতিক পরিস্থিতিতে তাহাদের আয়, ব্যয়, ঋণ, সঞ্চয় ইত্যাদি সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই ইহা করা হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ১৫টি করিয়া পরিবারকে বাছাই করা হইয়াছে।

কৃষি ঋণদানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচী ও নিয়ম- কানুন পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে এই সার্ভের দ্বিতীয় কাজ। কৃষকের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি কতদূর সফল—কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের কি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়—কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অসুবিধার প্রতি- কার করা যায়—ইত্যাদি সকল বিষয়েরই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইবে।

ইহা ব্যতীত কৃষিঋণ সম্বন্ধীয় দেওয়ানী আইন ও লগ্নি কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রামের বিভিন্ন কৃষি ঋণদান ব্যবস্থার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে তাহারও অনুসন্ধান এই সার্ভেতে করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রতি চারটি গ্রামে একজন করিয়া 'ইনভেস্টিগেটর' নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা সকল তথ্য সংগ্রহ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি দুই জনের কার্য্য পরি- দর্শনের জন্য একজন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা আবার রিজিওনাল কণ্ট্রোলারদের অধীনে কাজ করিবেন। এরূপ পাঁচ জন রিজিওনাল কণ্ট্রো- লার ও চার জন ডেপুটী রিজিওনাল কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ভাবে সমগ্র কৃষিঋণের একটি সম্পূর্ণ সর্ব্বভারতীয় পরি- সংখ্যান সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং দেশের বহু দিনের একটি অভাব দূর হইবে

বলিয়া আশা করা যায়। ইহার দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ অবগত হইয়া দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন গঠিত হয় তখনই ভারতীয় কৃষিঋণের সুব্যবস্থা করার গুরু দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয়করণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিল। যাহা হউক, ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে। আর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তাহারা এই বিষয়ে সচেতন হইয়া সবেমাত্র তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগেই কর্ত্তব্যতৎপরতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতির বর্ত্তমান সঙ্কটে ইহা বড়ই দুঃখজনক।

জমির সার উৎপাদন

ধানবাদ হইতে ১৪ মাইল দূরে গণ্ড গ্রাম সিন্দ্‌রী। তাহা আজ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমির সার উৎপাদনের কেন্দ্ররূপে রূপান্তরিত হইতেছে। গত ১৪ই কার্ত্তিক এমোনিয়াম সালফেট সারের উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কারখানার ইতিবৃত্ত জানিয়া রাখা ভাল।

"প্রায় দশ মাইল জুড়ে এক শহরের পত্তন হয়েছে; সরকারী পরিচালনায় এবং সরকারী মালিকানায় এত বড় কারখানা ভারতবর্ষে আর নেই। একটি মাত্র কারখানা থেকে এই পরিমাণ অর্থাৎ দৈনিক হাজার টন, এমোনিয়াম সালফেট্ তৈরির ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির মধ্যেই সিন্দ্‌রির স্থান।

"সিন্দ্‌রির রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের ইতিহাসে দুইটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল, ব্রিগেডিয়ার এস. এইচ. কল। তিনি এই পরিকল্পনার প্রধান উপদেষ্টা রূপে কাজ করেছেন। অপর নাম মিঃ জে. এইচ. হল। তিনি কারখানাটির পরিকল্পনা করেছেন এবং তা গড়ে তুলেছেন। মিঃ হল এখন এই কারখানার রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার কল এটির জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হয়েছেন মিঃ বি. সি. মুখার্জ্জি। ইনি উড়িষ্যা সরকারের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন।

"ব্রিটিশ আমলে ভারত-সরকার ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনকল্পে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে নাইট্রোজেন-পুষ্ট জমির রাসায়নিক সার উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা হয়। তিন জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের উপরে এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। তাঁহারা একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের এবং সেখানে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের জন্য সুপারিশ করেন। যথাক্রমে একটি ব্রিটিশ ও একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারত-সরকার চুক্তি সম্পাদন করেন পরিকল্পনানুযায়ী কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি আনানো হ'ল ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে। ভারতবর্ষ সরবরাহ করল ঘর-বাড়ী তৈরির লোহা-লক্কড়, মাল-মশলা, লোকজন এবং প্রয়োজনীয় অর্থদান করলেন এই তিনটি রাষ্ট্র।

"স্থান নির্ব্বাচন, জমি খরিদ, বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, উঁচুনীচু মাটি কেটে সমান করা ইত্যাদি পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজগুলি আরম্ভ হয় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি; কারখানার ইমারত গড়া আরম্ভ হয় ১৯৪৬ সালের মধ্যবর্ত্তী কালে। পাঁচ বৎসরেই এই সুবৃহৎ পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষকে খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলবার উদ্দেশ্যের পক্ষে এই কারখানার গুরুত্ব খুব বেশী। সমগ্র পরিকল্পনাটির অর্থাৎ শহরসমেত কারখানাটি তৈরি করবার খরচ পড়েছে ২৩ কোটি টাকা।

"বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন করে এমোনিয়াম সালফেট বর্ত্তমানে ভারতে আমদানি হচ্ছে। যদি বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন করা যায় তা হলে প্রতি বৎসর ৯ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মত ভারত-সরকারের আমদানি খরচ বেচে যাবে।

"এখান থেকে যে সার তৈরি করা হবে তা খুব সস্তা দরে চাষীরা যাতে কিনতে পায় তার ব্যবস্থা হয়েছে।

"কেবল জমির সার তৈরি করার কাজের মধ্যেই কারখানাটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। মূলতঃ একটি ভারি রাসায়নিক উৎপাদনের কারখানা হয়ে দাঁড়াবে। কাঁচা কয়লা থেকে পোড়া কয়লা (কোক্) তৈরি করা যখন এই কারখানার সম্ভবপর হয়ে উঠবে তখন ন্যাপথা, আলকাতরা, বেনজিন এবং গ্যাস ইত্যাদি অন্যান্য সহজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদিও এখানে প্রচুর তৈরি করা যাবে। তা ছাড়া সিমেণ্ট তৈরির পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় একটি বস্তু—ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট স্লাজ (গাদ) এখানে তৈরি হবে ঠিক এমোনিয়াম সালফেটের সমপরিমাণেই, সহজাত উৎপন্নরূপে, প্রতিদিন ১০০০ টন। এমোনিয়াম সালফেট ছাড়া প্রায় ৩০০ টন এমোনিয়াও এই কারখানায় প্রতিদিন তৈরি হবে।"

কম্যুনিষ্ট ও বিড়লা শ্রেণী

শ্রীহেমন্তকুমার বসু নেতাজীর একজন একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী; তিনি পশ্চিমবঙ্গে "ফরওয়ার্ড ব্লকে"র অন্যতম নেতা। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই এই দল ত্রি-ধারায় বিভক্ত। তিনি উত্তর-কলিকাতায় কংগ্রেস কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে নির্ব্বাচিত হন। গত বৎসর কংগ্রেসী কু-শাসনের প্রতিবাদে দল ত্যাগ করেন; পরিষদের সদস্য পদেও ইস্তাফা দেন।

তিনি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার কর্ণধার ; তার নাম "কর্ম্মীদল"। সেই পত্রিকার ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে বামপন্থী দলের মিলন অসম্ভব হইল কেন, তৎসম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে কম্যুনিষ্ট দল ও বিড়লা শ্রেণীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভারতরাষ্ট্রের অগণিত জনমতের প্রতিধ্বনি ইহাতে শুনা যায় :

"আজ যাহারা ভুয়া বামপন্থী ঐক্যের নামে নেতাজী সুভাষের কলঙ্ক আরোপকারী বিদেশী দালালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া আমরা একথাই বলিব যে, কম্যুনিষ্টদের পাপচক্রে তাহারা যেন পা না দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই—বা আমরা সেই মহান রাষ্ট্রের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্নও নই। কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চির পুরাতন নষ্টামিকে আমরা কোনমতেই সমর্থন করিব না—করিতে পারি না। যদি কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ ভারতের জাতীয়তার প্রতি—ভারতের মহা মনীষীদের প্রতি—ভারতের জনগণের প্রতি দরদী মন লইয়া সংগঠনের পথে পরিক্রমা শুরু করিতেন, তাহা হইলে সারা ভারতের লাঞ্ছিত মানুষের স্নেহপুষ্ট সমর্থন তাঁহারা অবশ্যই পাইতেন—আমরাও তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতাম। কাজেই আজ যে-পথে তাঁহারা তাঁহাদের 'কর্ম্মচক্র' নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সে পথ অতি কর্দ্দমাক্ত—এদেশের প্রতি তাহা পদে পদে প্রতিকূল। কাজেই কংগ্রেসী ভণ্ডামি ও সকল সাম্যবাদীদের নষ্টামির বিরুদ্ধে আমাদের লেখনীধারা দুর্ব্বার গতিতে ছুটিয়া চলিবে।

"আমাদের সম্পর্কে যাঁহারা অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা একথাই বলিব যে, আমরা কোনরূপ অন্যায়ের পথ ধরিয়া চলি নাই। কাজেই অসত্যের প্রতিবাদে আমরা যে কোন বিপদকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। যে দেশের লোকের হাড় মাংস চিবাইয়া বিড়লা আজও রক্তচক্ষু করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে 'Purchasable Commodity' বলিতে সাহস পায়, যে দেশের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া বিড়লা ঔদ্ধত্য করিয়া বলিতে সাহসী হয় যে, "আগামী নির্ব্বাচন আমরাই চালাইব, মন্ত্রীমণ্ডলও আমরাই গঠন করিব", সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী কোন গোপন কারণে ইহার উপযুক্ত জবাব দিতে কার্পণ্য করিতে পারেন, কিন্তু যে বাঙালীর দেহমনে আজও সংগ্রামী জীবনের স্রোত স্তিমিত আকারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কাছে এইরূপ ধৃষ্টতা—এইরূপ অশিষ্ট উক্তি কি করিয়া সহ্য করা সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীকে এই কথাই আজ বেদনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, বিড়লা যেদিন দাম্ভিকতাবশে এই ঔদ্ধত্যসূচক উক্তি করিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি কি করিয়া উহা সহ্য করিয়াছিলেন? বাঙালীর বিদ্রোহী আত্মা—ক্ষাত্রধর্ম্মের তেজঃপ্রভা কি তাঁহার দেহমনে—তাঁহার ধমনীতে, শিরায় শিরায় সেদিন কম্পন জাগায় নাই?

"বিড়লার ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কার্পণ্য করিলেও—বাঙালী করিবে না। কারণ, বাঙালী আজও মরে নাই—তাই আমাদের কৈফিয়ৎ হিসাবে সকলের উদ্দেশ্যে বলিতে চাই যে,

রক্ত ঝরাতে পারিনে তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা
যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
এ লেখায় যেন লেখা হয় তাদের সর্ব্বনাশ।"

আমরা হেমন্তবাবুর সঙ্কিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, "Purchasable Commodity" কংগ্রেসের বাহিরেও আছে, নহিলে বাংলায় নির্ব্বাচন হয়ত অন্যরূপ ধারণ করিত।

মানভূমের অবস্থা

এই জেলার প্রসিদ্ধ জননেতা শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বিহার ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন "সংগঠন" পত্রিকার (সাপ্তাহিক) সম্পাদকরূপে দেশ ও দশের সেবা করিতেছেন। এই পত্রিকা পাঠ করিলে এ অঞ্চলের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার "মুক্তি" যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাই সংগঠন করিয়া যাইতেছে।

এই পত্রিকার ১১ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের নামে যে অপচেষ্টা চলিতেছে, অহিন্দী ভাষা-সমূহকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া আমাদের সহযোগী যাহা বলিয়াছেন তাহা বিহার রাজ্যের সীমানার বাহিরেও জানাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিতেছি :

"বিহার রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার একটা বিপর্য্যয় আসিল। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু ইংরেজী নয়, উড়িয়া বাংলাকেও সরাইয়া একমাত্র হিন্দীতেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উত্তর-পত্র লিখিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনে বিহার রাজ্যে কার্য্যতঃ অসুবিধার সৃষ্টি করা হইল। ইহা স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র-বিরোধী। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেমন করিয়া এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য।

"মানভূম জেলার সদর মহকুমা ছাড়া সর্ব্বত্র মাতৃভাষায়

আদালতের কাজ চলিবে বলিয়া সরকারী ইস্তাহার জারি হইয়াছে। এই সংবাদ দেখিয়া মানবাজার মহকুমার বহু দলিল লেখক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মানবাজার মহকুমার হিন্দী ভাষায় কম দলিলই লেখা হইয়া থাকে। মানুষের সরল সহজ নিজস্ব ভাষাকে বাদ দিয়া এই অত্যাচার সরকারী জুলুম ব্যতীত কিছুই নহে। ইংরেজ আমলে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল, পরন্তু বাংলা ভাষাতেই মানভূমের সর্ব্বত্র কোর্টের কার্য্য পরিচালিত হইত। অযথা গণবিক্ষোভের সৃষ্টি কোন সরকারেরই সুস্থ মস্তিকের লক্ষণ নহে।”

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্মভূমিতে আর কতকাল এই অনাচার চলিতে থাকিবে? এই প্রশ্ন আমরা প্রায় প্রতি মাসেই করিতেছি। তাহার সদুত্তর এখনও পাই নাই।

“মুক্তি” পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ পূর্ত্তিসংখ্যা

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পুরুলিয়ার “মুক্তি” দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। এই পত্রিকা রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা মজহর-অল প্রমুখ নেতৃবর্গের সহকর্ম্মী নিবারণচন্দ্র দাশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিচয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষর অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আজ নিবারণচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত “লোকসেবক সঙ্ঘ”-ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে নামিয়াছেন এবং “মুক্তি” তাহার সপক্ষে যুক্তি যোগাইতেছে। কি অবস্থায় পড়িলে সহকর্ম্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারা যায় তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। লোকসঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সঙ্ঘের মূল নির্ব্বাচনী কর্ম্মনীতিসমূহের মধ্যে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

“লোকসেবক সঙ্ঘ পঞ্চায়েৎ চেতনার ভিত্তিতে নির্ব্বাচন পরিচালনা করিবে।

সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ জেলার পঞ্চায়েৎগুলির কাছে দায়ী থাকিবে।

জাতীয় আর্থিক মানের দৃষ্টিতে সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের ব্যয় ত্যাগের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

ভোট আদায়ের নীতি পরিহার করিয়া জন-চেতনার ভিত্তিতে সঙ্ঘের নির্ব্বাচনী প্রচার চলিবে।

জনগণের জীবনক্ষেত্রে সঙ্ঘের সেবা ও সহায়তার যোগ যেখানে রহিয়াছে সঙ্ঘ সেখানেই প্রার্থী মনোনয়নের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাপক ক্ষেত্র প্রচারের সমগ্র অভিযানে সঙ্ঘ অর্থের সহায়তা বর্জ্জন করিয়াছে।

নির্ব্বাচনে কৃষক শ্রমিক প্রজা সাধারণের জন্য যোগ্য প্রতিনিধিদের উপযুক্ত অংশ প্রদান করিয়াছে।

নির্ব্বাচনী জীবনে ব্যাপক জনশক্তি ও বুদ্ধি-প্রধান শক্তির মধ্যে সঙ্ঘ সামঞ্জস্য বিধানের পথ অনুসরণ করিতেছে।

জেলায় শাসন-ব্যবস্থায় নির্ব্বাচন ও প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় অংশ লাভের লক্ষ্য সঙ্ঘের রহিয়াছে।

বিকেন্দ্রীকৃত আত্মশাসনের ভিত্তিতে গ্রামসমূহের জন্য পঞ্চায়েতী শাসনক্ষমতা অর্জ্জনের লক্ষ্য সঙ্ঘ রাখিয়াছে।

গান্ধীবাদের আদর্শ ও কর্ম্মনীতিই সঙ্ঘের মূল কর্ম্ম নির্দ্দেশ-রূপে থাকিবে।”

নির্ব্বাচনী নির্দ্দেশ-পত্রে ভাব ও কর্ম্ম পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে:

“মুক্তির নির্ব্বাচনী দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক কর্ম্মী গভীরভাবে ইহার বিষয়গুলি পাঠ করিয়া জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্য্য করিতে বিপুল উদ্যমে অগ্রসর হউন। মুক্তির নির্ব্বাচনী সংখ্যার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কর্ম্মিগণ জনচেতনা জাগৃতির জন্য ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করুন। লোকের যাহা কিছু প্রশ্ন বুঝাইতে চেষ্টা করুন। প্রচারের সময় এইগুলিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে:

(১) শাসনের অনাচার দেখিয়া লোকে ভোটের বিষয়ও বিরূপ হইয়াছে—ইহা দূর করিতে হইবে। লোকে উদাসীন হইলে স্বার্থান্বেষীদের ভোট পাইয়া অযোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইয়া ক্ষতি করিবে। ভোট রাষ্ট্রীয় অধিকার। ইহা প্রয়োগ করিয়া যোগ্য লোক বাছিয়া দেশের শাসন ভাল করিতে হইবে। সর্ব্বদা যোগ্য লোক বাছাই করিবার চেষ্টা না রাখিলে দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে কি করিয়া? (২) কিছু লোকে কংগ্রেসের শাসনে বিরক্ত হইয়া ব্রিটিশ সরকারের রাজত্ব ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে। এই মনোভাব ক্ষতিকর। জনগণকে বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভবও নয় এবং স্বাধীনতার মর্য্যাদার অনুযায়ীও নয়। কষ্ট হইলেও স্বাধীন জীবন শ্রেয়—স্বাধীন থাকিয়াই নিজেদের শক্তিতে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছে সরকারকে ভোট দিব অর্থাৎ ব্রিটিশকে ভোট দিব। বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভব নয়—ব্রিটিশ আর ভোটে দাঁড়াইতে পাইবে না। দেশের যে কোন লোককে ভোট দিতে হইবে। কংগ্রেসই এখন সরকার হইয়াছে; সরকারের পরিবর্ত্তন চাহিলে কংগ্রেসের পরিবর্ত্তন চাই। তাহা হইলে দেশে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। (৩) ভোটের আইন-কানুন ও অধিকার ভালভাবে বুঝাইতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের শাসনে বা চাপে কেহ ভোট দিবে না; এইভাবে কর্ম্মচারীরা কাজ করিলে দণ্ড হইবে—জনগণের বুঝা দরকার। (৪) ভোটের আশায় অপরে মিথ্যা প্রচার যাহা করিবে তাহা খণ্ডনের প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে। (৫) ভোটের তারিখ, স্থান প্রভৃতি বিষয়ে অন্যের মিথ্যা প্রচারে সাবধান থাকিতে হইবে। (৬) সত্য

আশ্রয় করিয়া, সঠিক সংবাদসমূহ লইয়া কর্ম্মীরা প্রচার করিবেন। (৭) অপরের প্রবল বিরোধিতা ও বাগ্‌জালে কর্ম্মীরা স্থির থাকিয়া নিজেদের যাহা যুক্তি তাহা দৃঢ়ভাবে ও বিচারপূর্ব্বক আত্মবিশ্বাসের সহিত জানাইতে থাকিবেন। (৮) জয়লাভের জন্ত কর্ম্মীরা ব্যাকুল হইবেন না। নিজের কাজ ঠিকমত করার মধ্যেই আমাদের জয়। স্থিরচিত্তে বিপুল উদ্যমে প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তিতে কর্ম্মীরা কর্ম্ম করিয়া চলুন—ইহাই কামনা।"

কাপড় লইবার ক্রেতা নাই

গত ৩১শে ভাদ্র সংখ্যায় মানভূম রামচন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত "সংগঠন" (সাপ্তাহিক) একটি অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই অবস্থা কাহার সৃষ্ট তাহা অজ্ঞাত নয়; ভারতের তথা জগতের শ্রেষ্ঠীবৃন্দ মানুষের খাওয়া-পরার দ্রব্যাদি লইয়া যে খেলা খেলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। সাধারণের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না—এই সামান্ত কথাটা তাঁহারা কবে বুঝিবেন?

সংগঠনের মন্তব্য উপলক্ষ করিয়া এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। গ্রামবাসী ও শহরবাসী কেহই কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইতেছে না, তাহাও মনে রাখা প্রয়োজন। "দোকানে দোকানে কাপড়ের স্তূপ—গ্রামবাসীদের ডাকা হইতেছে কাপড় লইয়া যাও—তাহারা আসে না।" মানুষের কাপড় নাই, ডাকা হইতেছে তবু তাহারা কাপড় কিনিতে আসে না—কারণ কি? মাত্র আট গজ কাপড় প্রতি পরিবার পাইবে তাহাও লইতে পারে না। কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ৎ সুন্দর; কাপড়ের প্রাচুর্য্য ক্রেতায় অপ্রাচুর্য্য—তবু দেশ "ন্যাংটা"।

"গ্রামের বিপণিতে যে কাপড় আসিতেছে তাহার মূল্য ও রকম যাহা, তাহা গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্রয় করা সাধ্যাতীত। গ্রামের লোকের প্রয়োজন মোটা কাপড়, টেকসই কাপড় এবং যাহার মূল্য সুলভ। তাহার পরিবর্ত্তে আসিতেছে চড়া দরের মিহি কাপড়। শুধু তাহাই নয় ৮ গজ কাপড়ের মধ্যে ৫ গজের একটি ধুতি বা শাড়ীর সঙ্গে ৩ গজ ছিট লইতেই হইবে। অনেকেরই ছিটের প্রয়োজন হয় না। যাহাদের ছিটের প্রয়োজন হয় না তাহারা ছিট লইয়া করিবে কি? তাহার বদলে যদি তাহাদের ৮ হাতি কাপড়ও দুইটি দেওয়া হয় তাহা কাজে লাগে। সরকারী কর্তৃপক্ষের এগুলি চিন্তা করা উচিত।"

রেলওয়ে উপার্জ্জন ও ভারতরাষ্ট্র

'যোগাযোগ' কলিকাতা রেলওয়ে-সমষ্টির প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। তার একটি সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের দাবি—'বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।' ইহা সত্য। কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, দেশের নদনদীর জলস্রোত সংযত ও সুপরিচালিত হইলে রেলওয়ের উপার্জ্জন অপেক্ষা বহু গুণ অর্থ রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে আসিত। জলাভাবে শস্যহানি ও বন্যার ধ্বংসলীলার অবসান হইত। এই কথা মনে রাখিয়া নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যের ও হিসাবের বিচার করিতে হইবে:

"বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার আয়ব্যয় প্রায় ভারত-সরকারের বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা চারিটি প্রধান রাজ্যের বাজেটের, অথবা ছোট আটটি রাজ্যের আয়-ব্যয়ের সমষ্টির সমান। এতদ্ব্যতীত জাতীয় অর্থনীতি, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা বিধান রেলওয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে

এই রেলওয়েতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কর্ম্মী কাজ করেন এবং নানাভাবে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে আমাদের ভারতীয় রেলওয়ে। ভারতীয় রেলওয়ে যেন ছোটখাট একটি পৃথিবী; এখানে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও জাতিবৈষম্য নাই, এখানে যেন সকলেই পারস্পরিক বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ।

১৯৪৭ সালের পরে রেলওয়েতে ভাড়া বাড়ান হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে শতকরা মাত্র ৪৬ এবং ৭৩ ভাগ ভাড়া বাড়ান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার তুলনায় রেল পরিচালনার খরচ বহু অংশে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্রব্যাদির দাম চারি শত ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতে দ্রব্যাদির দাম ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে যে পরিমাণে ভাড়া বাড়ান হইয়াছে তাহা যায়া প্রাক্-যুদ্ধ সময়ের ভাড়ায় মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ পাওয়া যায়।

১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতীয় রেলের ৭২৮৯৫, ৮০৪৯৮ এবং ৮২২৪৫ লক্ষ টাকার মূল পুঁজির মধ্যে ই. আই. রেলের অংশে যথাক্রমে ১৯৩১৪, ১৯,৬৯১ এবং ১৯,৮৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলের তৃতীয় শ্রেণীর এবং অন্যান্ত দেশের রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিম্নে প্রদত্ত হইল:

	ভাড়ার পর্য্যায় প্রতি মাইলে ভাড়া (পাই হিসাবে)
ভারত	৫
ইউ. কে.	২৬·০৪
ইউ. এস. এ.	২১·১৬
কানাডা	২০·০৪
সুইজারল্যাণ্ড	৩৩·১৬
ফ্রান্স	১৮·১২
ইটালী	১০·৪

গড়পড়তা যাত্রীর নিকট হইতে প্রতি মাইলে কত পাওয়া যায়	মাথা পিছু আয়
৪'৫৭	২৭০৲
১৩'৯	৩৬৭২৲
২২'৫	৬৯০২৲
২২·৩	৪১৩২৲
...	৪০৩২৲
...	২২৮৯৲
...	...

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ম্মী সংখ্যা

একটা হিসাবে দেখিলাম যে, ১১ বৎসরে এই রেলওয়ের কর্ম্মীসংখ্যা অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমানে ই. আই. রেলে কত রেলকর্ম্মী কাজ করেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :

১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ—	১৩০৫২৫
১৯৪২	১৩৩৩৮৭
১৯৪৩	১৪০২০৬
১৯৪৪	১৫৭৩৬২
১৯৪৫	১৬৪৭৫১
১৯৪৬	১৭১৪৪৩
১৯৪৭	১৮৯৭৮০
১৯৪৮	২২২১০৮
১৯৪৯	২২২৫২০
১৯৫০	২১০৪০৪

ভাগীরথীর দুর্দ্দশা

গত ৫ই কার্ত্তিক "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় কলিকাতা নগরীর আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অজানা নয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যেই সমস্ত অবস্থাটা বর্ণনা করা হইয়াছে। দামোদর বাঁধ সম্পূর্ণ হইলেও এই বিপদ দূর হইবে না। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারের মতে কলিকাতার বিপদ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই তর্কে যোগদান করিয়া লাভ হইবে না। কিন্তু তবুও আমাদের সহযোগীর আলোচনা সময়োপযোগী হইয়াছে, অধৈর্য্য হইলে চলিবে না।

"কয়েকদিন পূর্ব্বে সেচ-সচিব শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় কলিকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাগীরথী নদীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"ভাগীরথী নদীতে যে ভাবে পলি পড়িতেছে, তাহাতে আর কয়েক বছরের মধ্যেই নদী মরিয়া যাইবে এবং কলিকাতার বন্দর বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"সেচ-সচিব যথার্থই বলিয়াছেন যে ভাগীরথী নদীর মোহনার নিকটে এমন বিরাট চর পড়িয়াছে যে গঙ্গা নদীর সহিত বর্ষাকালের কয়েক সপ্তাহ ব্যতীত ভাগীরথীর কোন সংযোগ থাকে না। উত্তর ভাগে জল সরবরাহকারী উপনদীর সংখ্যাও অল্প, আকারও নগণ্য। দক্ষিণ দিকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলাঙ্গী বা চুর্ণী নদী দিয়া যে পরিমাণ জল ভাগীরথীতে পড়ে উত্তরের ছোট নদীগুলি দিয়া সেরূপ জল আসে না। ফলে ভাগীরথী শুকাইতেছে, চর পড়িয়া নদীর বুক ভরাট হইয়া যাইতেছে। এই বৎসর তাল বান হয় নাই। অন্যান্য বৎসরের মত ভাগীরথী এবারে কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, আশ্বিন মাসেই চর পড়িয়া নদীবক্ষ ভরিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী-বক্ষে জল থাকিবে কিনা বলা কঠিন। ফলে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ যে কয়টি শহর মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়ে, সেখানে গ্রীষ্মকালে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও বন্ধ না হইয়া যায়। সুতীর মোহনা হইতে শক্তিপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল ব্যাপী ভাগীরথী-বক্ষে যেভাবে বালুকা জমিয়াছে, তাহাতে নদী মরিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথচ গঙ্গার তীরে ধুলিয়ান শহর গঙ্গার ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সর্ব্বসময় প্রবহমানা রাখিবার যে প্ল্যান করিয়াছেন, গত তিন বৎসর হইতে সেই প্ল্যান মত কি ভাবে কার্য্যাদি চলিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। . ফরাক্কা-ব্যারেজ লইয়া তিন বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার কথাও শ্রীযুক্ত মজুমদার বলিয়াছেন। তিন বৎসর ধরিয়া Data সংগ্রহ করা হইতেছে বটে, অথচ নদী যে শুকাইতেছে তাহার কোন বিহিত এযাবৎ হয় নাই।... ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সুনাব্য ও প্রবহমাণা করিবার সত্যকারের চেষ্টা আজও হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কি বিশুষ্ক ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? নদী একেবারে শুকাইয়া গেলেই কি ফরাক্কা-ব্যারেজ বাঁধা হইবে?"

মূল কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নজর বাংলার উপর নাই। যে ব্যক্তি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ-বিভাগের অধিকারী তাঁহার বাঙালী-প্রীতি তো সকলেই জানে। সুতরাং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের "দৃষ্টি আকর্ষণ" করার চেষ্টা বৃথা। অন্য কোন্ পথে সে কাজ করিতে হইবে তাহাই বিচার করা প্রয়োজন।

তেলের প্রতিযোগিতা

রাজনীতি এক অদ্ভুত জিনিস। তাহা এক গোষ্ঠীর লোককে একেবারে ভিন্ন করিতে পারে না, আবার তাহাদের স্বার্থের মিলও কখনও হয় না। ইরাণের তেল লইয়া যে ঝগড়া বাধিয়াছে, তার মধ্যে দেখিতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে; সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে তাহারা একযোগে কাজ করিতেছে;

তাহারা নানা প্রস্তাবের সমর্থক। এদিকে আবার এই তেলের বাজার লইয়া বেশ একটা 'চাপা' বিরোধ চলিতেছে। অন্ততঃ ইহাই হইল ষ্টালিনের মত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিরোধের বার্ত্তা নানা ভাষায় অতি আনন্দের সঙ্গে আমাদের শুনাইতেছে এবং আমাদের মনে এই বিষয়ে যেন কোন সন্দেহ না থাকে তার জন্ত পরিসংখ্যানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মারণযন্ত্রগুলির টেকনিক্যাল উন্নতি তেলের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের অধ্যায়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মোট উৎপাদন যখন যৎসামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন তেলের উৎপাদন বাড়িয়াছিল অসম্ভব।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার তৈল উৎপাদন সম্পর্কে নীচের এই সংখ্যাগুলির (১০ লক্ষ টন হিসাবে) সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

১৯১৩	৫২
১৯২৫	১৪৮
১৯৫০	৪৮০

তেলের উৎসগুলি লইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্দ্ধমান সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের লড়াইটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিরোধের তীব্রতা ভালভাবে বুঝিতে হইলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তৈল কেন্দ্র ও তৈল উৎপাদনের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

দুইটি প্রধান তৈল অঞ্চল আছে। একটি আমেরিকা মহাদেশ, আর একটি নিকট-প্রাচ্য। আমেরিকার উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন; তন্মধ্যে ২৭ কোটি টনই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে। নিকট-প্রাচ্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯৫০ সালে নিকট-প্রাচ্য হইতে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তেল উত্তোলিত হইয়াছে। অবশ্য এই তথ্য হইতে নিকট প্রাচ্যের তৈল সম্পদের স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে না। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের হিসাব অনুসারে নিকট-প্রাচ্যে আছে সমস্ত পৃথিবীর তৈলসম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ। একমাত্র সৌদী আরবেই ৩০০ কোটি টন তৈল আকর আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট উৎপাদনের অর্দ্ধেকেরও বেশী। তবু সে নিকট-প্রাচ্যের তৈলসম্পদ করায়ত্ত করিতে চায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের গোড়ার দিকে মার্কিন তৈলপতিরা কুওয়েট ও ইরাকে ব্রিটেনকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিতে সক্ষম হন। তাঁহারা কুওয়েটের তৈল উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইরাকের তৈলের শতকরা ২৩.৫ ভাগ আদায় করিয়া লইলেন। ইহা ছাড়া এংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানীর উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তাঁহাদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্ত ব্রিটেনকে তাঁহারা রাজি করাইতে সক্ষম হইলেন। সৌদী আরব ও আবিসিনিয়ায় আমেরিকানরা তৈল উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার আদায় করিয়া লইলেন। সৌদী আরবে প্রচুর তৈল আছে। ১৯৪৪ সালের দশ লক্ষ টন হইতে এই অঞ্চলের তৈল উৎপাদন বাড়িয়া গিয়া বর্ত্তমান বৎসরে তাহা তিন কোটি টন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এই ভাবে নিকট প্রাচ্যের তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলে-কৌশলে ব্রিটেনের নাগাল ধরিয়া ফেলিয়াছে। নীচের সংখ্যাগুলি হইতে এই কথা পরিষ্কার হইবে :

নিকট-প্রাচ্যের তৈল-উৎপাদন (দশ লক্ষ টন হিসাবে)

	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গ্রেট ব্রিটেন
১৯৩৮	২	১২.৫
১৯৫০	৪০.৪	৪৪.২

এই হিসাব হইতে দেখা যায় তেলের প্রতিযোগিতা কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে তেলের উৎপাদন সম্বন্ধে কোন আভাস পাইলাম না। ষ্ট্যালিন ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই।

চীনের বর্ত্তমান উন্নতি

কম্যুনিষ্ট দুই জন বাঙালী অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি চীন দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিশ-পঁচিশ দিন ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সভা-সমিতিতে পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহাদের কথার বিচার করিতে চাই না। আমরা সকলেই নিজের নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তথ্যাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তাঁহারাও তাহা করিয়াছেন।

গান্ধীপন্থী অধ্যাপক জোসেফ কর্ণেলিয়াস কুমারাপ্পা "হরিজন" পত্রিকায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের বাংলা "হরিজন" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"খাদ্য সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বেশ পাওয়া যায়। দাম বেশ সস্তা। টাকার কাঁপতি হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিবার উপায় গবর্ণমেণ্ট লইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থা বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেছে। লোকের উহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা আছে। সকল কর্ম্মচারীরা লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া চলে। সকলে একই প্রকার কাপড়-চোপড় পরে, এক ভাবে বাস করে। উর্দ্ধতম ও নিম্নতমের প্রভেদ খুব বেশী নাই। চীন দেশের সভাপতি মাত্র ২,৮০০ কাটি জোয়ার (এক কাটি=১.৩ পাউণ্ড=৫১ তোলা), থাকিবার একটি বাড়ী ও ব্যবহারের

জন্য একটি মোটরকার পান। উহা একুনে মাসে ঊর্দ্ধপক্ষে ৬০০৲ টাকা ধরা যায়। দুই জন কেবিনেট মন্ত্রীর সহিত কথা বলি। তাঁহারা মাসিক প্রায় ৪৫০৲ টাকার সমান বেতন পান। যে স্বেচ্ছাসেবকেরা আমাদের দেখাশুনা করিতেছিল তাহারা উহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় চীন দেশ এমন নায়কদের পাইয়াছে যাঁহারা লোকের জীবনযাত্রার মিলিয়া মিশিয়া থাকে। যে মনোভাব এখানে চলিতেছে তাহা কতকটা আমাদের দেশে ১৯৩০ সালে যেমন ছিল সেই রকম। আমরা চীনের উপর রুশের অপ্রতিহত প্রভাব চলিয়াছে কল্পনা করিয়া থাকি। ঐরূপ প্রবল রুশপ্রভাব সেখানে নাই। বৃহৎ শিল্পে ভূমি উৎপাদন, আর সকল সম্পত্তির রাষ্ট্রভুক্তি—ইহাই সোভিয়েট কম্যুনিজমের মূল। কিন্তু চীন সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় এবং ক্ষুদ্রকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থাশীল। চীনের মূলমন্ত্র হইল ভূমি-ব্যবস্থার সংশোধন ও কৃষি উন্নয়ন। মূলগত এইরূপ পার্থক্য থাকায় হয়ত চীন রুশের অন্ধ অনুসরণ না করিতে পারে। সেলদোর শ্রমের মজুরী দিবার আমি যে পরিকল্পনা ও সূত্র ধরিয়াছি এখানকার পদ্ধতি অনেকটা সেইরূপ দেখিয়া আমার ভাল লাগিল। শ্রমিকরা বাসস্থান, পরিধেয় ও অন্ন পায় এবং হাতখরচ মাসিক প্রায় ১০ হইতে ১৫ টাকার সমান পায়। সেলদোর সুষম খাদ্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহা অধিক বিজ্ঞানসম্মত। তবে এখানকার ব্যবস্থার সহিত উহার সাদৃশ্য চমকপ্রদ।

"ভূমি-ব্যবস্থা সংশোধন বিষয়ে আপনারা খবর চাহিয়াছেন। ইঁহারা এই বিষয়ে বাস্তব পথে অগ্রসর হইয়াছেন মনে হয়। পরগাছা জমিদারবৃত্তি লোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পন্ন চাষী যাহারা চাষ-আবাদ করে তাহাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত প্রজারা উৎপন্ন ফসলের ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ জমিদারকে ভাগ দিত। ইহা বন্ধ হইয়াছে। চাষী এখন শ্রমের ফল নিজে ভোগ করিতে পায়। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের প্রায় ১৩ শতাংশ। ঐ রাজস্ব শস্যেই সংগৃহীত হয়। টাকার কাঁপতি কমাইবার ইহাই অন্যতম প্রধান পন্থারূপে গৃহীত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট বহু কর্মচারী ও শিক্ষকদিগকে পণ্যে বেতন দিয়া থাকেন। সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যাপার নাই। তবে যে সব জমিদার বল-প্রয়োগে বিদ্রোহ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদিগকে কঠোর-ভাবে দমন করা হয়। তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। যাহারা চাষ করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে অপর চাষীদের মতই পুনর্বাসনের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"সোবিয়েতে"র নদী : আজ ও কাল

"বিশাল সোবিয়েৎ ভূমি খণ্ডবিখণ্ড করে বয়ে যায় লক্ষাধিক নদনদী। সব কটি নদী এক সঙ্গে জুড়ে দিলে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি, অর্থাৎ সাড়ে ১২ লক্ষ মাইল। যাতায়াত ব্যবস্থায় নদনদীগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে যে সমস্ত নদী জাতীয় জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নীপার, ভল্গা, ওকা ও কামা (ভল্গার উপনদী), দন, উত্তর ডিনা এবং নেভা। বল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর হয়ে কন্‌স্তান্তিনোপল্ পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পথ ছিল নীপার। পরে ভল্গা, ওকা ও কামার জলপথ হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দন নদী নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে আজব সাগরে। উত্তর ডিনার জলরাশি গ্রহণ করছে শ্বেত সাগর। নেভার মোহানা বল্টিক সাগরে। এর সব কটিই সোবিয়েৎ ভূমির ইউরোপীয় অংশে প্রবাহিত।

উল্লিখিত নদীগুলির জলযান ব্যবস্থা উন্নত করায় কিছু কিছু কাজ জার-শাসিত রুশিয়ায় হয়েছিল। ভল্গাকে যুক্ত করা হয়েছিল নেভার সঙ্গে এবং উত্তর ডিনার শেষ ভাগে কতকগুলি খাল কাটা হয়েছিল এবং লকগেট নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের জলসম্পদকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার উদ্যোগ সোবিয়েৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আর হয় নি।

মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পূর্ব্বে জলবিদ্যুৎ ষ্টেশন নির্ম্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয় নি বললেই ঠিক হয় যদিও দেশে জলশক্তির বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। সোবিয়েৎ শাসন কায়েম হওয়ার পরেই দেশে জলবিদ্যুৎ ষ্টেশনের জাল বিস্তারের কাজ সুরু হ'ল। ইউরোপের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ ষ্টেশন নির্ম্মিত হ'ল নীপারের উপর। তার পর ভল্গার উপর তিনটি শক্তিশালী জলতড়িৎ কেন্দ্র এবং ককেসিয়া, মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেকগুলি নদীর উপর আরও কতকগুলি বিদ্যুৎ-ষ্টেশন মাথা তুলে দাঁড়াল। তার পরে খনন করা হ'ল কতকগুলি জলপ্রণালী যেমন শ্বেত সাগর, বাল্টিক সাগর খাল (ফিনিশ উপসাগরের সঙ্গে শ্বেত সাগরকে যুক্ত করছে) এবং মস্কো—ভল্গা খাল। নীপার, ভল্গা এবং অন্যান্য নদ-নদীর উপর বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ-ষ্টেশন নির্ম্মাণ করার ফলে জলযান চলাচলের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। আগেকার দিনে যে সব নদী ব্যবহার করা হ'ত না সেগুলি ব্যবহার যোগ্য হয়ে উঠল।

নদী, খাল ও জলাধারের কিনারায় নয়া নয়া বন্দর মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। অনেক নগর যেগুলির নিকটে জলের কোন অস্তিত্বই নেই ভবিষ্যতে সেগুলি জলসিক্ত হয়ে উঠবে। সোবিয়েৎ রাজধানী মস্কো দু'টি সমুদ্রের বন্দর হয়ে উঠবে। নয়া নয়া যাত্রীবাহী ও মালবাহী জাহাজপথ খোলার আয়োজন চলছে। আগামী বৎসরের গোড়ার দিকেই ভল্গা-দন খালে জাহাজ চলাচল সুরু হলে এই সমস্ত জাহাজপথের

গুলিতে কাজ আরম্ভ হবে। এজন্য নতুন ধরণের আধুনিক যাত্রীবাহী ও মালবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হচ্ছে।

আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোবিয়েতে নদীসমূহের যাতায়াত ব্যবস্থা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অনেকখানি সুবিধা হবে, কারণ রেলপথে যাতায়াতের চেয়ে জলপথে যাতায়াতের খরচ অনেক কম। জলপথ নির্ম্মিত হলে তদ্বারা যত মাল যাতায়াত করতে পারবে সমান দৈর্ঘ্যের রেলপথে তার ৪০ ভাগের এক ভাগের বেশী ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।"

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণের "সোবিয়েৎ দেশ" পত্রিকায় উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক জানিবার ও ভাবিবার আছে।

রামকৃষ্ণ নগর

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে কাছাড়ের প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ রামকৃষ্ণ নগর। তার আশেপাশে বহু জনপদ। স্থায়ী অধিবাসী যারা তারা ভাবিতেও পারে নাই এত সহজে স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া আগত উদ্বাস্তু ভাই-বোনই চেষ্টা করিয়া গড়িয়া তুলিবে জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমিতে এমন একটি সুন্দর উপনিবেশ। দিনের পর দিন স্থানীয় অধিবাসী ও উদ্বাস্তুদের সমবেত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে এই রামকৃষ্ণ নগরের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। সবাই বুঝিতে পারিয়াছে ঠাকুরের নামের সার্থকতা আছে আর বুঝিতে পারিয়াছে—চেষ্টায় অসাধ্য কিছুই নাই। এর পর ধীরে ধীরে এই উদ্বাস্তু উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে হাইস্কুল, পোষ্টাপিস, বাজার প্রভৃতি আরও কত কিছু। তার পর বিগত ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গাহাঙ্গামায় আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছাড় শাখার উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি ও সাহায্য বিভাগ এখানে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তুকে আনয়ন করিয়া আশ্রয়-শিবির পত্তন করেন এবং তাহাদের জন্য একটি স্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ইদানীং সরকার এই কর্ম্মকেন্দ্র তুলিয়া লইবার এক আদেশ দেওয়ায় এত বড় একটা গঠনমূলক কার্য্যে সহসা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম্মী, উদ্বাস্তু ও স্থানীয় অধিবাসীদের মনে কতটুকু আঘাত লাগিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরা বুঝিতে পারিয়াছেন।

"তার পর রামকৃষ্ণনগর বিভাপীঠ। আজ পরম সৌভাগ্য—গৌরবের কথা যে রামকৃষ্ণনগর আদর্শ বিভাপীঠ যুগপৎ আসাম-সরকার ও ভারত-সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। এই দিকে স্থানীয় অধিবাসী ও উদ্বাস্তুবৃন্দ সরকারের কাছে পরম কৃতজ্ঞ। কিন্তু এত যে আনন্দ, এত যে উৎসাহ তথাপি ইহার মধ্যে প্রাণ নাই। তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা বুঝিয়াছি জনসাধারণের আকুল আবেদন, তাহাদের প্রার্থনায় ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভের পরও, রামকৃষ্ণ মিশন উপেক্ষা না করিলেও সবিশেষ মনোযোগ দিতেছেন না। জনসাধারণ চায় যে রামকৃষ্ণ বিভাপীঠকে আদর্শ বিভালয়ে পরিণত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইহার পরিচালনার ভার নিজে গ্রহণ করুন। আর্থিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয় সব কিছু আজ বিভাপীঠের আছে বলা চলে। এমতাবস্থায় যাঁরা আজ এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের হাত থেকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের সদিচ্ছা ও ত্যাগকে অভিনন্দিত ও সাদরে বরণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের এই আদর্শ বিভাপীঠ পরিচালনভার গ্রহণের পক্ষে সঙ্কোচ ও দ্বিধার অবকাশ কোথায়?"

করিমগঞ্জের "নবারুণ" পত্রিকা কংগ্রেসের সমর্থক। তাতে এই উপনিবেশ ও বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হয়, তার চুম্বক আমরা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় জনগণের মনোগত ইচ্ছা প্রকাশের সাফল্য কামনা করি।

কাশী-লক্ষ্ণৌ-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই তিনটি বিশ্ববিভালয় সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়া থাকে। সম্প্রতি উত্তর-ভারতের নানা পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল মিঃ মোদি স্থির করিয়াছেন যে, এই দুই বিশ্ববিভালয়ে কোন উপাধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) থাকিবেন না। তিনি নিজেই তাদের অধ্যক্ষ। রাজ্যপালের ক্ষমতা ব্যবহার করিবার কারণ জানা যায় নাই। নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে একটি কথা শোনা যায়। লক্ষ্ণৌয়ের আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের শরীর সুস্থ নয়। তিনি কিন্তু আবার কাশী বিভালয়ের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যাপার কি? আচার্য্যজী একটা বিবৃতি দিলে সুবিধা হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইতেছে। বর্তমান উপাধ্যক্ষ ডক্টর কে. কে. ভট্টাচার্য্য নিজের পদে থাকিবেন। এই বিশ্ববিভালয়ের আর্থিক প্রয়োজন কিছুতেই মিটিতেছে না। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার পর তার একটা সুব্যবস্থা হইবে। সাময়িকভাবে একটা গোঁজামিল দেওয়া হইবে। টাকা প্রাপ্তির আশায় সব বিশ্ববিভালয়ই দেখিতেছি রাষ্ট্রের হাত-ধরা হইয়া পড়িতেছে। তার ফল কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে উপাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেতন গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ মাসিক প্রায় ৩ হাজার টাকা ব্যয় বাড়িবে। যে সব

আশা-আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে তাহার পরিণতি সময়সাপেক্ষ। সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে।

জামসেদপুর মজদুর আন্দোলনের নূতন রূপ

জামসেদপুরের "নব-জাগরণ" পত্রিকার ৩০শে ভাদ্র সংখ্যায় মজদুর ইউনিয়নের পুরাতন নেতৃবর্গের অপসারণ সম্বন্ধে যে আশা-আশঙ্কার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

আমরা আর্থিক শ্রেণী-বিভাগ বা শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক বুলির সত্যতা স্বীকার করি না। তবুও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরনারী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

"গত ৮ই সেপ্টেম্বর কেবেল ইউনিয়ন হইতে শ্রীজনের অপসারণ জামসেদপুর মজদুর আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এযাবৎ জামসেদপুরের মজদুর আন্দোলনের গতি অনেকবার রুদ্ধ হইয়াছে, আবার পরিবর্ত্তিতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের গতিভঙ্গী পৃথক ছিল। বিপরীত ভাবাপন্ন লোক অথবা দল দ্বারা জয়-পরাজয়ের লড়াই হইয়াছে, কিন্তু একই দলভুক্ত দুই উপদলের জয়-পরাজয়ের পালা ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। কংগ্রেসী শ্রীজন, গোপাল ও সিদ্ধেশ্বর চৌধুরীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন কংগ্রেসী শ্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। উভয় দলের লোকেরাই নিজেদের সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন।

কেবেল ইউনিয়নের গদীতে এই আরোহণ ও অবরোহণ জামসেদপুর মজদুর ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক আবদুল বারীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মজদুর সংগঠনের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহা চিরতরে ভাঙিয়া গেল। আবার শ্রীজনের মজদুর ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাবও খর্ব্ব হইয়া গেল এবং কিছুদিন হইতে তাহার নেতৃত্বে যে বিশ্বাসের অভাব দেখা যাইতেছিল তাহা এইবার প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করিল।"

সিরিয়ায় ও থাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রবিপ্লব

জলপথে ও স্থলপথে এই দুই রাষ্ট্রের ব্যবধান তিন-চার হাজার মাইলের কম হইবে না। আকাশযানে এই ব্যবধান ৩০।৩২ ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়। দুইটি দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্ন।

কিন্তু এই দূরত্ব ও পার্থক্য রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে কোন বাধা জন্মায় নাই। দুই রাষ্ট্রেই প্রধান সেনাপতি—আদিব এল শিশাকলি ও পিন চুন আহ্ওয়ান—রাষ্ট্রপতিকে আটক করিয়া পদত্যাগপত্র আদায় করিয়াছেন—গণতন্ত্রের নামে। পশ্চিম-এশিয়া ও পূর্ব্ব-এশিয়ার আরও উদাহরণ আছে। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি নিহত হন মসজিদে। ট্রান্স-জর্ডানের রাজা আব্দুল্লাও সেইভাবে নিহত হন। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিহত হন এক জন পাকিস্থানী আফগানের হাতে। যেমন গান্ধীজী একজন হিন্দুর হাতে নিহত হন। ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী আউঙ সান নিহত হইয়াছিলেন সমবেত মন্ত্রিমণ্ডলীর মন্ত্রণাগারে—নিজের দলের লোকের হাতে। ইন্দোচীনে গৃহযুদ্ধ চার বৎসর ব্যাপিয়া চলিতেছে। চীন-রাষ্ট্রে সম্প্রতি একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব অন্তর্বিরোধের শেষ কোথায় ভবিতব্যই জানেন।

সমস্ত বিশ্ব ভাবের রাজ্যে, বিশ্বাসের রাজ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধে অভিভূত। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, উহার বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিল। লোকে বলিত পৃথিবীতে সাধু-সন্ত ঘুমাইতেছেন। বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের সে সান্ত্বনাও নাই।

সংস্কৃত পুঁথির তালিকা

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এদেশের সকল সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রকাশের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

প্রাচ্য সম্পর্কিত বৃত্তি ও গবেষণার জন্য ঐরূপ তালিকার আবশ্যকতা বহু দিন যাবৎ অনুভূত হইতেছে। টি. এস. আফ্রেক্ট্স ১৮৯১-১৯০৩ সনের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন।

গত ১৯৩৫ সনে কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপ্রেরণায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় নূতনভাবে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। উহার সন্নিকটবর্ত্তী সরকারী প্রাচ্য হস্তলিপি গ্রন্থাগারে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথি আছে। ফলে ঐ কার্য্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সহজতর হয়। ১৯৪২ সনে তালিকা প্রণয়নকার্য্য বন্ধ রাখা হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উহা পুনরায় আরম্ভ করা হয়। তালিকাটির প্রথম খণ্ড গত ১৯৪৯ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

টি. এস. আফ্রেক্ট্সের ১১৯৫ পৃষ্ঠার তালিকাটি প্রণয়ন করিতে ১২ বৎসর সময় লাগে। নূতন তালিকা প্রণয়ন করিতেও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-পরিমাণ সময় লাগিবে। ইহা ১৬টি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা হইবে ৮,০০০। ইহা প্রণয়ন করিতে অতিরিক্তসংখ্যক কর্ম্মচারী, মুদ্রণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ আনুমানিক ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

কি নাম রাখা যায় ?

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

ছেলেমেয়ে হইলে তাহার কি নাম রাখা হইবে ইহা লইয়া কোন কোন বাপ-মায়ের চিন্তার অবধি থাকে না। তাঁহারা এই প্রশ্ন নিজেরা সমাধান করিতে না পারিলে হয়ত বা কোন সাহিত্যিকের নিকট উপস্থিত হন এবং নামটা পছন্দমত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যে নামের উপর পিতামাতা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন তাহা না বলিলেও চলে। 'নামেতে কি আসে যায়' একথা ইঁহারা স্বীকার করেন না। সাধারণ লোকে নামকরণে তত মনোযোগী না হইলেও এ বিষয়ে যে কতখানি সাবধানতা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ খুবই অবহিত ছিলেন। মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নামকরণের বিধিনিষেধের আলোচনা আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :

> ততশ্চ নাম কুর্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
> দেবপূর্বং নরাখ্যং হি শর্মবর্মাদি সংযুতম্।
> শর্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্।
> গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
> নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা।
> নামঙ্গল্যং জুগুপ্স্যং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্।
> নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতি গুর্বক্ষরান্বিতম্।
> সুখোচ্চার্যন্তু তন্নাম কুর্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্। ৩।১০।৮-১১।

অর্থাৎ, জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে পিতা নামকরণ করিবেন। নামের প্রথম পদ কোন দেবতার নামানুযায়ী হইবে। নামের শেষে শর্মা বর্মা ইত্যাদি যুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণের নামে শর্মা, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস যোগ করিতে হইবে। অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলবাচক এবং বীভৎস রূপ নামকরণ করিবে না। নামের অক্ষরগুলি যেন সম অর্থাৎ যুগ্ম হয়। নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, অধিক যুক্তাক্ষরবর্জিত, সুখোচ্চার্য এবং শ্রুতিমধুর নাম রাখা উচিত।

শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে শিশুর নামকরণের ব্যবস্থা আছে, কারণ প্রাচীনকালে দশ দিন পরে নবজাতকের অশৌচান্ত হয় বলিয়া ধরা হইত। কেহ কেহ বা বার দিনে অথবা এক মাস পূর্ণ হইলে অশৌচান্ত ধরিয়া নামকরণ করিতেন। এ সম্বন্ধে শ্লোক আছে, যথা :

> নামধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব।
> দ্বাদশ্যামথবা রাত্র্যাং মাসে পূর্ণে তথা পরে।

অপরে পুণ্য তিথি বা মুহূর্ত কিংবা নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া নামকরণ করিতেন। অন্নপ্রাশনের সময় অধুনা নাম রাখা হইয়া থাকে।

নামের আদ্যে পুরুষবাচক কোন দেবশব্দ রাখার উপদেশ আছে। অনেকে দেবতা বলিতে কুলদেবতাই বুঝিতেন। নামের আদিতে দেবতাবাচক শব্দ থাকায় তৎপূর্বে 'শ্রী' লেখার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়, যথা, শ্রীকালিদাস শর্মা। এখানে কালিদাস শব্দটি পুরুষবাচক এবং কালী কুলদেবতার নাম। বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন, শ্রীনারদমুনি রায়, শ্রীগৌতম দত্ত ইত্যাদি। আজকাল যে প্রকার তিন পদের নাম পাওয়া যায় পূর্বে তাহা অধিক প্রচলিত ছিল মনে হয় না। 'শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস' এখন এইরূপ নামের চলন হইয়াছে। পুরাকালে ইহা অপেক্ষা অল্প পদ যুক্ত নাম বেশী চলিত ছিল, যথা, শ্রীবিষ্ণু শর্মা। শ্রী কথাটার আর পূর্বের মর্যাদা নাই। রেডিওতে আজকাল 'শ্রীচার্চিল' ইত্যাদি নামও শোনা যায়। কেহ কেহ ত শ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিন শব্দের বড় নাম হইলে আর এক অসুবিধা দেখা যায়। লোকে অনেক সময় সমাসবদ্ধ পদ ভাঙিয়া ব্যবহার করেন। যেমন, 'সুমতিকুমার গুপ্ত' এবং 'দেবেন্দ্রমোহিনী দাসী' সংক্ষেপে শ্রীমান সুমতি ও শ্রীমতী দেবেন্দ্র হন। ছোট নামের যথা, দুর্গাদাস এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার ঐরূপ দুর্গতি হয় না।

অর্থহীন নাম রাখা অবিধেয় কিন্তু আজকাল এমন অনেক নাম দেখা যায় যার অর্থ হয় না, যথা, রিপেন্দ্রকুমার, বিবনামোহিনী ইত্যাদি। অপ্রশস্ত নাম, যথা, মাণিকলাল, দিগম্বর, ল্যাংটেশ্বর, প্রাণনাথ ইত্যাদি। দেশজ শব্দযুক্ত অথবা লজ্জাবহ নাম এই বর্গের অন্তর্গত। অপশব্দযুক্ত নামে অশ্লীল ভাবের উদয় হয়। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'অপশব্দং গুহ্যকেশাদি'। ইহার আধুনিক নমুনা, যথা, দিগম্বর, বিবসনা দেবী। অমঙ্গলবাচক নাম, যথা, শ্মশানপতি, রাহু ইত্যাদি। যে সকল নামের সহিত কোন বিপদ, দুর্ভোগ বা দুঃখজনক ইতিহাস জড়িত আছে তাহা ইহার অন্তর্গত। সীতা নামের বহু প্রচলন দেখা যাইলেও ইহা অমঙ্গল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জুগুপ্সিত নামে ঘৃণার উদয় হয়। হাতিমল নাম মারোয়াড়ীদের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ কিন্তু কেহ যদি বাঙালীর এই নাম রাখেন তবে তাহা জুগুপ্সিত বলিয়া

বিবেচিত হইবে। ভূরিধর্মসেন, জরৎকারু, অসিত ইত্যাদিকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

দুই অক্ষর বা চারি অক্ষরযুক্ত নাম অসম তিন অক্ষর বা পাঁচ অক্ষরের নাম অপেক্ষা প্রশস্ত। নামে অধিক যুক্ত অক্ষর বা অধিকসংখ্যক অক্ষর না থাকিলে তবেই তাহা সুখোচ্চার্য হয়। বেঙ্কটেশ্বর, ঝঞ্ঝানিল প্রভৃতি নাম মোটেই সুমধুর নহে। সরোবরে-হাস্যমুখী-নলিনীসুন্দরী নাম শ্রবণমধুর হইলেও অনেক অক্ষরযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য।

পূর্বে যে সকল কথা বলিলাম তাহা ডাকনাম সম্বন্ধে খাটে না। বাঙালীর প্রায়ই দুইটা নাম দেখা যায়, একটা পোশাকী ও অপরটি আটপৌরে। আটপৌরে বা ডাকনাম আত্মীয়স্বজন আদর করিয়া রাখিয়া থাকেন। ঘণ্টু, পচা, গলা, ধসা প্রভৃতি নাম বাপ-মায়ের যতই আদরের হউক তাহা অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত। অনেক সময় ডাকনাম চলিত হইয়া যায়, তখন সাধারণে ঐ নাম ব্যবহার করে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়কে খোকাবাবু বলিলে বিসদৃশ শোনায়। কিছুদিন আগে রেডিওতে হোনাবাবু এই নাম শুনিয়াছিলাম। বক্তা নামটি উচ্চারণ করিয়া নিজেই বলিলেন 'কি নাম রে বাবা!'

শাস্ত্রে বিপরীত বিধান থাকিলেও প্রাচীনকালেও অনেকেরই এখনকার ডাকনামের মত অর্থহীন অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত নাম ছিল। বহু উপনিষদোক্ত ব্যক্তির নাম এই প্রকারের। নচিকেতা, রৈক্ব প্রভৃতি নাম অর্থহীন। গর্গ (অর্থাৎ ষাঁড় বা কেঁচো), বক, মণ্ডূক, তিত্তির, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি নাম অপ্রশস্ত। হনুমান, জাম্বুবান্, কুক্কুর ইত্যাদি নামও এই শ্রেণীর। ঐতরেয় প্রভৃতি নাম জুগুপ্সিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজাদের নাম অনেক সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হইত, যথা, রজি, দিলীপ, রঘু, অজ, নৃগ, পাণ্ডু, মরু, কুরু ইত্যাদি। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সকল নামের পূর্বে শ্রী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না যদিও রাম এবং কৃষ্ণের পূর্বে শ্রীর উল্লেখ আছে। অন্ধ্ররাজগণের ও তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তশাসকগণের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, কেবল রাজারাই ও রাজবংশীয় শাসকেরা শ্রী ব্যবহারে অধিকারী ছিলেন। যতই প্রতিপত্তিশালী হউন না কেন সাধারণ শাসকগণের নামের পূর্বে শ্রী যোগ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে কেবল পুরুষদেরই নামকরণের বিধিনিষেধ আছে এবং পিতাকেই পুত্রের নাম রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মনুসংহিতায় পুরুষের নামকরণ বিধি বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। স্ত্রীলোকের নামকরণ সম্পর্কে মনু ২।৩৩ শ্লোকে বলিতেছেন:

> স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
> মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ।

অর্থাৎ, যে নাম সুখোচ্চার্য হয়, নিষ্ঠুরতাবাচক না হয়, যে নামের অনায়াসে অর্থ বুঝা যায়, যাহা মনোহর এবং মঙ্গলবাচক, যাহার অন্তে দীর্ঘ স্বর থাকে ও যাহা উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, স্ত্রীলোকের এই প্রকার নাম রাখা উচিত। যশোদা, সুখদা ইত্যাদি নাম এই হিসাবে প্রশস্ত। মনু পুনশ্চ ৩।৯,১০ শ্লোকে বলিতেছেন:

> নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাং।
> ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণ নামিকাং।
> অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণ গামিনীং।
> তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং।

অর্থাৎ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অন্ত্যপর্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসত্ববাচক অথবা ভয়াবহ নামধারিণীকে বিবাহ করিবে না। যে স্ত্রী অবিকলাঙ্গী, মনোহরনাম্নী, হংস বা গজগামিনী, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোককেই বিবাহ করিবে। এই নিয়ম অনুসারে রোহিণী, রেবতী, বিশাখা, কৃত্তিকা, গঙ্গা, যমুনা, সুপর্ণা ইত্যাদি নাম অবাঞ্ছনীয়। এরূপ নিষেধের কারণ বুঝা যায় না। অন্ত্যপর্বত অর্থে যে পশ্চিম দেশীয় পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যায়। কুল্লুকভট্ট স্বীয় টীকায় অন্ত্যপর্বত শব্দের অর্থ করিয়াছেন ম্লেচ্ছপর্বত।

ভীষণনাম্নী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে না বলা হইয়াছে। মনে হইতে পারে পিতামাতা যখন নামকরণের জন্য দায়ী তখন নিরপরাধা কন্যার উপর এ অবিচার কেন? অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে শাস্ত্রকার বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। যে বাপ-মা কন্যার অবাঞ্ছনীয় নাম রাখেন তাঁহাদের মানসিক অস্বাভাবিকতা সুস্পষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে যে কন্যার অথবা সেই কন্যাজাত সন্তানের বংশজ মানসিক রোগের সম্ভাবনা আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অদ্ভুত নাম রাখাও মনের বিকারের লক্ষণ। শ্রীমহম্মদ টমাস পূর্ণানন্দ পাল এই নাম পিতামাতার উৎকট ধর্মসমন্বয় আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক।

এক এক যুগে এক এক প্রকারের নামের সমধিক প্রচলন দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালে ষাঁড় অতিসম্মানিত প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বয়ং মহাদেব বৃষবাহন নামে খ্যাত ছিলেন। অনেকে বলবান বৃষে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। বৃষাকপি, ঋষভ, বৃষকেতু প্রভৃতি তখনকার দিনে অতি প্রিয় নাম ছিল। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অর্বাচীন কাল পর্যন্ত যে সকল রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন পুরাণে তাঁহাদের নাম ধৃত হই-

য়াছে। এই তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, নামকরণে রাজারাও যুগপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। যুদ্ধাদি কার্যে ও বাহন হিসাবে কালক্রমে অশ্ব বৃষের স্থান অধিকার করে। সেই সময়ে রাজগণের নামে অশ্ব শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যথা, বিশ্বগশ্ব, যুবনাশ্ব, বৃহদশ্ব, কুবলয়াশ্ব, দৃঢ়াশ্ব, বার্যশ্ব, সংহতাশ্ব, কৃশাশ্ব, পৃষদশ্ব, রোহিতাশ্ব ইত্যাদি। অশ্ব শব্দের প্রাধান্য কমিলে রথ শব্দের প্রচলন হয়। তখনকার রাজাদের নাম, যথা, সুরথ, দশরথ, মীনরথ, সত্যরথ, বৃহদ্রথ, ভানুরথ, চিত্ররথ, শুচিরথ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে যখন পৌরাণিক লৌকিক মানবকল্প শেষ হইয়া দ্বিতীয় কৃত বা সত্যযুগ আসিয়াছিল তখনকার রাজাদের নামে কৃত বা সত্যশব্দ যুক্ত দেখা যায়, যথা, কৃতঞ্জয়, সত্যজিত ইত্যাদি। পরে আরও কিছুকাল গত হইলে মিত্র শব্দযুক্ত নামের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছিল, যথা, পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, বজ্রমিত্র, ভূমিমিত্র ইত্যাদি। শেষ অন্ধ্ররাজগণের কালে বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। তখনকার নাম, যথা, শিবশ্রী, যজ্ঞশ্রী, চন্দ্রশ্রী, বেদশ্রী, শক্তিশ্রী ইত্যাদি। আজকাল রাজা ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নামের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই নারায়ণ শব্দটি যুক্ত দেখা যায়, যথা, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জগদিন্দ্রনারায়ণ, রামেশ্বরপ্রসাদনারায়ণ ইত্যাদি। সাধারণের মধ্যে এখন ইন্দ্র এবং নাথ অথবা চন্দ্র কিংবা কুমার সংযুক্ত নাম লোকপ্রিয় হইয়াছে, যথা, দেবেন্দ্রনাথ, কার্তিকচন্দ্র, নরেন্দ্রকুমার, ইত্যাদি। স্বদেশকুমার, চরখারাণী নামে স্বদেশীযুগের প্রভাব লক্ষণীয়। অনেক সময় একই বংশের সন্তানদের সমার্থবাচক নাম রাখা হয়, যথা, চারি ভ্রাতার নাম চন্দ্রনাথ, সোমনাথ, শশিনাথ এবং শশাঙ্কনাথ।

সংস্কৃত ভাষা বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার জননী। এ সমস্ত ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ দেখা যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, সংস্কৃত শব্দ অন্যান্য ভাষায় যত বিকৃত হইয়াছে বাংলায় তত নহে। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাংলা নামে প্রায়ই শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। বাঙালী নাম রাখে দেবেন্দ্র, বিহার বা উত্তর প্রদেশে তাহা দেবিন্দর হয়। কোন কোন প্রদেশে নামের সহিত পিতৃপরিচয় ও আদি বাসস্থানের নির্দেশ থাকে। কুশলচাঁদ চুনিলাল জয়পুরিয়া—এই নামে বুঝা যায় যে, কুশলচাঁদের পিতা চুনিলাল এবং তাঁহারা জয়পুরের অধিবাসী। মোগল আমলেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে; যথা, ভীমসেন বুর্হানপুরী, অর্থাৎ বুর্হানপুরের ভীমসেন। প্রাচীনকালে অনেকে বংশের বা প্রদেশের নামে পরিচিত হইতেন, যথা, রাঘব অর্থাৎ রঘুবংশজাত, কৌশল্যা অর্থাৎ কোশলদেশীয়া। মাতার নামানুযায়ীও নামকরণ হইত, যথা, কৌন্তেয়, গৌতমীপুত্র, ঐতরেয়। এখনও এইরূপ নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল যে অন্য প্রদেশের লোকের নামেই আদি বাসস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা নহে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙালী ব্রাহ্মণদের পদবী, যেমন গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি স্থাননির্দেশক। বৃত্তি অনুযায়ী পদবীও কোন কোন স্থলে দেখা যায়, যথা, কানুনগো, মহলানবিশ, আচার্য, দুধওয়ালা, ঝুনঝুনওয়ালা ইত্যাদি।

নাম দেহের প্রতীক। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, নাম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিন স্থায়ী। মানুষ গত হইলেও তাহার নাম রহিয়া যায়। কীর্তির্যস্য স জীবতি। কীর্তিমান পুরুষ মৃত হইলেও নামের মহিমায় বাঁচিয়া থাকেন। নামের স্থায়িত্ব কীর্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কাহারও নাম দুই-এক পুরুষ গত হইলে লোকে ভুলিয়া যায়, কাহারও বা নাম সহস্র বৎসরাধিক কালেও লোপ পায় না। পুরাণে গল্প আছে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুণ্যকাজ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। বহু যুগ পরে তাঁহার স্বর্গভোগ কাল শেষ হইয়া আসিলে দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ, এইবার আপনাকে মর্ত্যে যাইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু যদি পৃথিবীর এক প্রাণীরও আপনার নাম স্মরণে থাকে তবে আপনাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতে হইবে না।' অতঃপর দেবগণ মানুষী তনু ধারণ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে ধরাধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অনেক লোককে প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কেহই বলিল না যে ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম শুনিয়াছে। অবশেষে এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনারা ভূষণ্ডি কাককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি জানিলেও জানিতে পারেন ইন্দ্রদ্যুম্ন কে। আমরা চিরকাল দেখিতেছি তিনি ঐ বটবৃক্ষে বাস করেন, তাঁহার বয়সের ইয়ত্তা নাই।' দেবগণ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূষণ্ডি কাকের নিকট গেলেন। ভূষণ্ডি বলিলেন, 'আমি ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম শুনি নাই। নদীতীরে তিন্তিড়ী বৃক্ষে এক বক বাস করে। তাঁহার নাম তালজঙ্ঘা। তিনি আমার অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।' ভূষণ্ডি দেবগণ ও রাজাকে সঙ্গে লইয়া তালজঙ্ঘার নিকট গেলেন। তালজঙ্ঘা বলিলেন, তিনিও ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম শুনেন নাই। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, দূরবর্তী এক জলাশয়ে অকূপার নামক এক কূর্ম বাস করেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক প্রাণী ইহজগতে আর নাই, তিনি হয়ত ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনিতে পারেন। তালজঙ্ঘা পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকে লইয়া অকূপারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ

অকুপারকে প্রশ্ন করিতে তিনি আবেগভরে বলিলেন, 'মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম কে না জানে। তিনি পূর্বে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদের এত গাভী দান করেন যে, তাহাদের ক্ষুরাগ্রে মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক মহান্ সরোবরের সৃষ্টি করে। আমি সেই সরোবরে এখন পর্যন্ত সুখে বাস করিতেছি।' সকল কথা শুনিয়া দেবগণ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'মহারাজ আপনি ধন্য ; এখন পর্যন্ত জগতে আপনার নাম কীর্তিত হইতেছে। আপনার স্বর্গবাস অক্ষয় হউক।'

জননী জন্মভূমিশ্চ—

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

দক্ষিণে নাতিউচ্চ রাজমহল শৈলমালা, উত্তরে অতিবিস্তৃত বালুচর, ইহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত গঙ্গা। বর্ষায় আবর্ত্তময়ী গঙ্গা দুকূলব্যাপী জলোচ্ছ্বাসে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া গ্রাম, জনপদ গ্রাস করে আর শীতে ও গ্রীষ্মে ক্ষীণ জলধারাসমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ চর সৃষ্টি করিয়া আপন গতিপথকে সর্পিল করিয়া তোলে। ভাঙা-গড়ার, বিনাশ ও সৃষ্টির এই কাজ যুগ যুগ ধরিয়া চলে।

ওপারে সকৃরিগলি ঘাট, এপারে মণিহারি ঘাট। ওপারে বড় লাইনের বড় গাড়ী, এপারে ছোট লাইনের ছোট গাড়ী। নদী পারাপার ষ্টীমারে করিতে হয়। যাত্রীসাধারণ ভারত বিভাগ ভুলিয়া যান, কিন্তু একা নদী বিশ ক্রোশের ব্যবধান সহ্য করিতে চান না। সকৃরিগলি-মণিহারি পারাপারের কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা রেলকর্তৃপক্ষকে যে সব সুমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন তাহা গল্পে লিখিবার মত নয়।

রাত্রিতে দিনে, বর্ষায় শীতে, প্লাবনে শুষ্কতায়, ষ্টীমার ঘাটে লাগে। সম্মুখেই ট্রেন দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খড়ের ঘর, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ছোট ইঞ্জিনের তীব্র চীৎকার, মজদুরদের হুড়াহুড়ি ; মণিহারি ঘাট। কর্ম্মীরা জানে আজ যেখানে মণিহারি ঘাট কাল সেখানে প্রকাণ্ড চর। কাল যেখানে ঘাট আজ সে জায়গাটা গঙ্গার গভীর জলতলে। ছয়-সাত মাইল ব্যাপিয়া মণিহারি ঘাটের বিভিন্ন ঋতুতে এই স্থান পরিবর্ত্তন।

ফাল্গুন মাস। পলাশে শিমুলে, কোকিলে মলয়ে বসন্ত আসিয়াছে, কিন্তু সে কোথায়? ধূ ধূ করে বালুচর। দিনের প্রচণ্ড তাপে ভোর হইতেই বালি তাতিয়া উঠে। একটু বেলা হইলেই ধূলির ঝড় বহিতে থাকে। রৌদ্রতাপ, ফাল্গুনের লু উপেক্ষা করিয়া মজদুরের দল মাল উঠায়, নামায় আর রেল-কর্ম্মচারীরা পাট, চা, চিনি, চাল, আটার হিসাব রাখে। স্বাস্থ্যকর পশ্চিমের অধিবাসীরা এই সময়ে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন আর কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বৈদ্যুতিক পাখার নীচে ও খস্‌খস্-পর্দ্দার পশ্চাতে আপিসের কাজ করেন। রেলের কিন্তু দিন-রাত্রি নাই, শীত-গ্রীষ্ম নাই, মলয়-লু নাই। রেলের চাকা চলিতে থাকে, রেলের মজদুর কর্ম্মচারী খাটিতে থাকে।

এমন সময় আসিল উদ্বাস্তুর বন্যা। ফাল্গুনে জলের বন্যা নয়, এ মানুষের বন্যা। দলে দলে, দিনে-রাত্রিতে, উদ্বাস্তুর দল মণিহারি ঘাটে নামিতে লাগিল। কোথা হইতে আসিতেছে ইহারা? চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল। তারপরে শিয়ালদহ ষ্টেশন, তারপর এ ক্যাম্প সে ক্যাম্প। তার পরে? কে জানে কোথায়? জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, আসাম।

হঠাৎ সন্ধ্যায় খবর আসিল রাত্রি আটটায় উদ্বাস্তু-বোঝাই এক ষ্টীমার আসিবে, সারা রাত্রি মণিহারি থাকিয়া ভোরে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে যাইবে। একে ঘাটষ্টেশন তাহাতে রাত্রি, ইহারা থাকিবে কোথায়, খাইবে কি?

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ঝড় বহিয়াছে, চতুর্দ্দিক বালিতে বালিময়। কর্ম্মচারী, মজদুর, ঠিকাদার সকলে অবসন্ন। কিন্তু রেলের কর্ম্মচারীরাও মানুষ। মানুষ মানুষকে না দেখিলে কে দেখিবে? স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইল ; চাল ডাল জোগাড় হইল ; বালুচরে অজস্র চুল্লীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

যথাসময়ে জাহাজ ঘাটে ভিড়িল। দলে দলে নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নামিতে লাগিল। অনাহারে অনিদ্রায় কৃশ, রৌদ্র-জলে রুক্ষ, পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র ; হাতে, মাথায়, কাঁধে পোঁটলা-পুঁটলি, হাঁড়ি, বাসন, কাঁথা, পাটি, হুঁকা,

মুখে অতলান্ত নিরাশা; গায়ে বিষম গন্ধ। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সাদা বালু ঝিক্‌মিক করিতেছে। তাহার উপরে দলে দলে সারি সারি কাহারা চলিতেছে? মানুষ, না মানুষের জীবন্ত কঙ্কাল? হৈ চৈ ডাকাডাকি, ছুটাছুটি, চট্টগ্রাম হইতে বরিশালের ঐশ্বর্য্যময়ী বাংলা ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য!

খাওয়ার পালা আরম্ভ হইল। এমন কৃশকায় মানুষ এতগুলি খায় কি করিয়া! খিচুড়িতে যতটা চাল ডাল ততটা মণিহারির বালি। কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে? ফাল্গুনে এদিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। ইন্‌জেকশন, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ডাক্তার, মেথর ঘাটকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এত রাত্রিতে কে কাহার কথা শুনে, কে স্থান-অস্থান বিচার করে?

রাত্রি একটায় হঠাৎ একজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, শিগ্‌গীর আসুন। একটি স্ত্রীলোকের অবস্থা ভাল নয়।' ডাক্তার হাতে ব্যাগ লইয়া ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'ব্যাটাদের দুই মাসের খাওয়া এক দিনে খাওয়া চাই, চল্।'

চরের উপরে এক অতি কৃশকায় নারীদেহ পড়িয়া আছে। বয়স ১২ হইতে ৩২ যাহা কিছু হইতে পারে। পরিধেয় লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়···।

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল দেখিয়াই বলিলেন, 'আর দেরী নয়, একে কোথায়ও নিতে হবে; প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।'

স্বেচ্ছাসেবক দুইটি শিহরিয়া উঠিল। এই বিস্তীর্ণ বালুচর, অসংখ্য লোকের ভিড়। খড়ের তৈরি বিশ্রামাগারে তিলমাত্র ধারণের জায়গা নাই। একে কোথায় লইয়া যাইবে? কিন্তু উপায় নাই। অনতিদূরে ছিল টালি ক্লার্কদের খড়ের ব্যারাক। রোগীর চেয়ারে তুলিয়া মৃতপ্রায় স্ত্রীলোকটিকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। আত্মীয়স্বজন কেহ আছে কিনা জানা গেল না। থাকিলেও তাহারা বুদ্ধিমানের মত গা-ঢাকা দিলেন। কি ঝঞ্ঝাট এই অসময়ে, এই অস্থানে!

ব্যারাকে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার পরম যত্নে স্ত্রীলোকটিকে বাঁশের মাচার উপরে শোয়াইয়া দিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, 'গরম জল আর ঘরে মাত্র একজন স্বেচ্ছাসেবক। না ছিল যন্ত্রপাতি, না ছিল অন্য কোন ব্যবস্থা। বাহিরে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ঘণ্টা দুই পরে নবজাত শিশু তীব্র ক্রন্দন-ধ্বনিতে আপনার আবির্ভাব ঘোষণা করিল। চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তারী বালুচর, সম্মুখে ক্ষীণস্রোতা বহুধা-বিভক্ত গঙ্গা, ওপারে নীলাভ রাজমহল পর্ব্বতমালা, উপরে অনভ্র আকাশে খণ্ড চাঁদ—নবজাত শিশুর তীব্র চীৎকার-ধ্বনি বালুচর পার হইয়া, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজমহল গিরি-শ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া বুঝিবা সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। জগতে জগতে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মানবশিশুর জন্ম-বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিল, একটি সুন্দর শিশু জন্মিয়াছে কিন্তু মাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।

রাত্রি প্রভাত হইল। পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে মৃতদেহ সৎকার হইল। একটি উদ্বাস্তু-দম্পতি শিশুটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইল। সকলে মিলিয়া শিশুর নাম রাখিল মনোহর। ভোরের গাড়ীতে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, উদ্দেশ্যহীন দম্পতি আর একটি বোঝা ঘাড়ে লইয়া চলিয়া গেল।

মনোহর বাঁচিয়া থাকিবে কিনা জানি না। যদি এক দিন সে তাহার জন্মভূমি খুঁজিতে আসে, পাইবে না। হয় তাহা আবর্ত্তময়ী যোজনপ্রসারী রাক্ষসী নদীগর্ভে, নয় তাহা দূরবিস্তারী, আকারপ্রকারহীন অতিবিরল বনঝাউ-আচ্ছাদিত চরের যে কোন জায়গায়। আর তাহার জননী—?
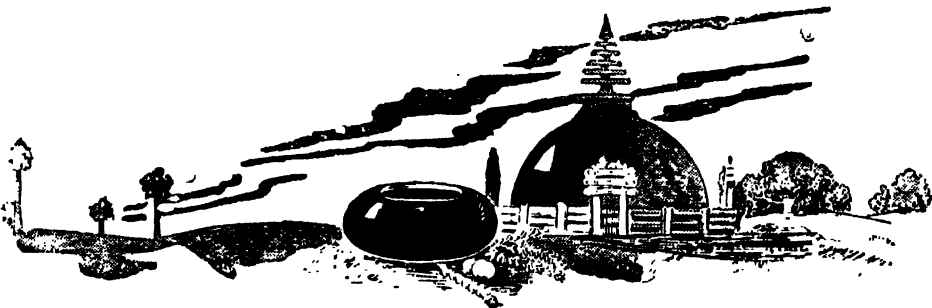
সূর্যরথ ও সূর্যসংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি'

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।

ঋগ্বেদ ১.১৬৪.২।

—(ভাষ্যানুবাদ) একচক্রযুক্ত সূর্যরথ সপ্ত অশ্ব বহন করে। এক অশ্ব অর্থাৎ এক বায়ু সপ্ত নাম বা সপ্ত রূপ ধরিয়া সূর্যের রথ বহন করে। অথবা একচক্র রথ অর্থাৎ একচারী বা অসহায়ভাবে সঞ্চারী আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে।

একচক্র রথ—ঋকের তৃতীয় চরণে "ত্রিনাভি চক্রম্"—এই ত্রিনাভির বর্ণনায় সায়ণ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যদ্যপি ত্রীণি চক্রাণি তথাপি তেষামেকরূপত্বাদেকচক্রমিত্যুচ্যতে," অর্থাৎ যদিও তিন চক্র, তথাপি তাহারা একরূপ বলিয়াই একচক্র বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্বেদ-লাভার্থ স্তবগান করিয়া সূর্যদেবের উপাসনা করিলে, আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া বাজিরূপ যোগিবরকে অযাতযাম, অর্থাৎ অন্যের অজ্ঞাত যজুঃসমূহ দান করিয়াছিলেন (ভাগবত ১২.৬.৭৯)। নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে মুদ্রিত শুক্লযজুর্বেদসংহিতায় এ বিষয়ে যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে সূর্যরথ একচক্র ও সপ্তাশ্ববাহন; সায়ণের ভাষ্যানুসারে একরূপ ত্রিচক্রযুক্ত নহে।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে একচক্র সূর্যরথের প্রয়োগ পাই নাই, আছে কিনা জানি না। সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারে সূর্যরথ বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে:

"একচক্রেম রথো যন্তা বিকলো বিষমা হয়াঃ।
আক্রামত্যেব তেজস্বী তথাপ্যর্কো নভস্তলম্॥"

অর্থাৎ, সূর্যের রথ একচক্রযুক্ত, সারথি অরুণ বিকলাঙ্গ, অর্থাৎ অনূরু-উরুবিহীন, অশ্বগণ বিষমসংখ্যক, অযুগ্ম সপ্তসংখ্যক, তথাপি, অর্থাৎ সেইপ্রকার রথাদি হইলেও তেজস্বী সূর্যনভস্তল আক্রমণ অর্থাৎ উদ্‌গমন করেন। তাৎপর্য,—তেজস্বীর তেজই মুখ্য সহায়, অন্য সহায়ক গৌণ।

বাংলায় কাব্যে ইহার অনেকগুলি প্রয়োগ পাওয়া যায়:

১। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সূর্যবন্দনায়,—

"একচক্র রথে, আকাশের পথে, উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি, একদিনে ফিরি, কে পারে শক্তি কহিতে।"

২। মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে—

(ক) "আগম অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্র রথ।"

(খ) "একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।—মেঘনাদবধ

(গ) উদয়-অচলে
দিবামুখে একচক্রে দিলা দরশন,
অংশুমালা গলে
বিতরি সুবর্ণরশ্মি চৌদিকে তপন।"
—'সূর্য ও মৈনাকগিরি—মাইকেল গ্রন্থাবলী।

৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কুহু ও কেকা"য়—

"সংহর ও মূর্তি, ওগো একচক্র রথের ঠাকুর।
গ্রীষ্মের সুর।

উদ্ধৃত কবিতাংশে সর্বত্র 'একচক্র' শব্দ 'একসংখ্যক চক্র' অর্থে গৃহীত হইয়াছে, 'একরূপ ত্রিচক্র' অর্থাৎ 'একাকৃতি তিন চক্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা একচক্র শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ।

সপ্ত অশ্ব—(ভাষ্যানুবাদ) (১) অন্তরিক্ষসঞ্চার বায়ুর অধীন বলিয়া সপ্তনামধারী বায়ু—এক অশ্ব বা সপ্তনামা অশ্ব; অথবা (২) সর্পণশাক বা সপ্তসংখ্যক রশ্মিসমূহ—সপ্তপ্রকার কার্যে অসাধারণ বা পরস্পরবিলক্ষণ ষড়ঋতুগণ, এক সাধারণ ঋতু—এই সপ্ত ঋতু সপ্ত অশ্ব; অথবা (৩) মাসদ্বয়াত্মক ষড়ঋতু, অপর অধিমাসাত্মক এক—এই সপ্ত ঋতু সপ্ত অশ্ব।

সায়ণ-ভাষ্যে "আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে"—এই অর্থ করিয়াছেন। সূর্যকিরণে ভায়লেট প্রভৃতি সপ্ত বর্ণ* আছে; ত্রিতল কাচফলকের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে সূর্য-রশ্মি ঐ সপ্ত বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্যরশ্মি বৃষ্টিকালে জলবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত মেঘখণ্ডে পতিত হইলে ঐ মেঘে নানা বর্ণে রঞ্জিত যে রামধনুর উৎপত্তি হয়, তাই সপ্ত বর্ণে চিত্রিত। ঐ সপ্ত বর্ণ সূর্যের সপ্তাশ্বরূপে কল্পনা করিলে, নিতান্ত অসঙ্গত হয় না বোধ হয়।

"আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ" (ঋগ্বেদ ৫.৪৫.৯)—এই ঋকের 'সপ্তাশ্ব' শব্দ বিশেষণ, বহুব্রীহিসাধিত শব্দ—'সপ্ত অশ্ব যাহার'। সূর্যের বিশেষণ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দ হইতে সূর্যের সংজ্ঞারূপে গৃহীত বিশেষ্য 'সপ্তাশ্ব' শব্দ অভিধানে ধৃত ও কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অশ্ব' ও 'সপ্তি' শব্দ সমার্থক—সূর্যের অন্য সংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি' শব্দ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দেরই প্রকৃতিগত রূপান্তর।

---

* সপ্তবর্ণ—violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red (সংক্ষেপে—vibgyor)।

প্রশ্ন

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আজ আশ্বিনের শেষে আগমনীর সুর সুরু হতে না হতে বর্ষা এসে দাঁড়াল আকাশ-প্রাঙ্গণে, তার মিশকালো ওড়না উড়িয়ে। বিদায়ের আগে তার যত কিছু সমারোহ নিয়ে নর্তন সুরু করে দিলে। সকাল থেকেই অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। শুনতে শুনতে আমার মানস-আকাশেও তার ছায়া এসে পড়ল—কি জানি সেখানেও কি কারণে সুরু হয়ে গেল বর্ষণ। কোথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে জমতে লাগল সেখানে, অজানা ব্যথায় অন্তরলোক করুণ হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত একখানি মুখ একবার চমকে উঠে মিলিয়ে গেল—বিচিত্র এই মানুষের মন।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা এক ক্লাসে পড়তুম, তখন আমাদের বয়স এগার-বার-তের। সে ছিল স্থূলকায়, শুধু স্থূলকায় বললে ভুল বলা হবে, সে ছিল বিপুলকায়। শুধু আমাদের ইস্কুল নয়, কাছাকাছি তিন-চারটে ইস্কুলের মধ্যে তার মত দশাসই চেহারার বালক আর একটিও ছিল না। সেইজন্য তাকে সে পট্টির ছেলেবুড়ো সবাই চিনত। নাম না জানলেও চেহারার বর্ণনা শুনলেই লোকে বুঝতে পারত কার কথা বলা হচ্ছে।

বিশ্বনাথরা ছিল ব্রাহ্মণ। বিশ্বনাথ মুখুজ্জে তার পুরো নাম। কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা, শুধু ক্লাসের ছেলেরা কেন—সারা ইস্কুলের ছেলেরা তাকে মোটা বিশু বলে ডাকত। বিশ্বনাথের চেহারাটাই শুধু অমন ছিল না, সেই শরীরে ঐ বয়সেই একেবারে হস্তীর মত না হোক, হস্তীশিশুর মত শক্তি ছিল। আমরা ক্লাসের ছেলেরা তো কেউ তার সঙ্গে পারতুমই না, তিন ক্লাস ওপরের ফার্ষ্ট ক্লাসের কেউ তার সঙ্গে পারত না। অত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার মেজাজটি ছিল শরীফ। কখনো তাকে রাগতে কিংবা মারামারি করতে দেখা যেত না, হাজার কারণ সত্ত্বেও। ক্লাসের ছেলেরা তো প্রায়ই বলত—ভাগ্যে বিশে শালা ছিল। কিংবা—বিশে বেটা আজ ছুরি আনে নি, পেন্সিল কাটি কি করে—ইত্যাদি।

কিন্তু বিশু নির্বিকার! সে ওসব সম্ভাষণকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না।

মেজাজের মত আহার সম্বন্ধেও তার ঔদার্য ছিল অপরিমিত। আমরা জিজ্ঞাসা করতুম—হ্যাঁরে বিশে, তুই নাকি একটা ছোটখাটো পাঁঠা একাই সাবাড় করতে পারিস?

কিন্তু হ্যাঁ না কিছু না বলে শুধু হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকত আর বলত—কেন রে এক দিন খাওয়াবি নাকি?

তার খাওয়ার কথা শুনেই আসছিলুম, একবার একটা উপলক্ষ্যে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হ'ল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ্যে সরকার থেকে এখানকার ইস্কুলের ছাত্রদের এক দিন ভূরিভোজনের আয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেক ইস্কুলের ছাত্রের সংখ্যার অনুযায়ী গবর্মেণ্ট টাকা দিয়েছিলেন, আর প্রত্যেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিলেন। বেলা দুটো কি আড়াইটার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বিশ্বনাথের খাবার মাত্রা দেখে আমরা তো অবাক, এমন কি মাষ্টারেরা পর্যন্ত ছুটে এলেন। ইস্কুল সুদ্ধ ছেলের খাওয়া হয়ে গেল, তখনও সে মাংস আর লুচি ওড়াচ্ছে। চার পাশে ছেলে ও মাষ্টারের দল দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিশু একা বসে ভোজন চালিয়েছে—সে এক দৃশ্য। শেষকালে অসুখ করবে বলে মাষ্টারেরা তাকে এক রকম জোর করে তুলে দিলেন।

মনে আছে ঐ ভূরিভোজনের পর সে চল্লিশটি পানতুয়া খেয়েছিল। যা হোক সেদিন আহারাদির পর আমরা বাড়ীতে না গিয়ে বিশুর বাড়ীতে গেলুম দাবা খেলতে।

বিকেল নাগাদ খেলা যখন খুব জমে উঠেছে, তর্কাতর্কি প্রায় মারামারিতে পৌঁছয় এমন সময় বিশ্বনাথের পাড়ার জনকয়েক ছেলে এসে তাকে ধরল। তাদের সঙ্গে যেতে হবে তাদের ইস্কুলে খেতে। বিশ্বনাথের এই বন্ধুরা পড়ত তখনকার জেনারেল এসেম্বলির ইন্‌স্টিটিউশনে। এখন যার নাম হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। তারা বিশুর সঙ্গে আমাদেরও টানাটানি করতে লাগল। আমরা কিছুতেই যাব না—শেষকালে বিশে বললে—ওরা যদি না যায় তো আমিও যাব না। ফলে হ'ল কি তারা এক রকম জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে চলল।

সেখানে গিয়ে পৌঁছনমাত্র ছেলেদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল মোটা বিশে এসেছে বলে। খাবার জায়গা তৈরিই ছিল, আমাদের ধরে তখুনি বসিয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে। অন্য ঘর থেকে ছেলেরা লাফিয়ে এসে আমাদের ঘরের পংক্তিতে ঠেসাঠেসি করে বসে যেতে লাগল। সকলের আগ্রহ মোটা বিশুর খাওয়া দেখবে। দু-তিন জন মাষ্টারও এসে উপস্থিত হলেন। ছেলেরা বলতে

লাগল—স্যার মোটা বিশুকে ধরে এনেছি, ও আসতে চাইছিল না। মাষ্টাররা বললেন—বেশ করেছ।

সকলে মিলে বিশ্বনাথকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, সবার উৎসাহ শুনে সেও উঠল ক্ষেপে। খাওয়ার সুরু থেকেই সে যেন মরিয়া হয়ে উঠল।

হৈ-হল্লোড়ের ব্যাপার! পরিবেশন ইত্যাদি তেমন কানুন মাফিক হচ্ছিল না, প্রথমে চারখানা করে গরম লুচি পাতে পড়ল—চারখানায় কি হবে, চারখানায় কি হবে করে ছেলেরা আরও চারখানা লুচি তার পাতে গছিয়ে দিলে। তরকারি আসতে মিনিট কয়েক দেরি হয়েছিল—ইতিমধ্যে বিশে নুন দিয়েই আটখানা লুচি আড়ে মেরে দিলে। ছেলেরা বিশুর কাণ্ড দেখে হৈ হৈ করে উঠল। তার পর প্রত্যেকটি পদ বেশ ভাল করে অর্থাৎ আর যারা বসেছিল তাদের সবায়ের চেয়ে বেশী তো খেলেই, উপরন্তু বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে আধ হাঁড়ি দৈ সাবাড় করে দিলে ভাল হজম হবার জন্যে।

ইস্‌কুলের কাছেই ছিল বিশুদের বাড়ী। টিফিনের সময় বাজে কচুরি জিলিপি না খেয়ে সে বাড়ীতে গিয়ে ভাত খেয়ে আসত। টিফিনের পরের ঘণ্টায় আমাদের ট্রান্‌সলেশ্যান হ'ত। বাংলা বইয়ের খানিকটা তর্জমা করতে দিয়ে মাষ্টারমশায় অন্য কাজ করতেন। সেটা ছিল বিশুর ঘুমোবার ঘণ্টা। সে ডবল বেঞ্চির ওপর দু'হাত দিয়ে তাতে মাথা রেখে ঘুমোত—আর আমরা চার-পাঁচ জন পালা করে তার পিঠ চুলকে আরাম করে দিতুম। তা না হলে বিশুবাবুর ঘুম হ'ত না। তার ঠাকুরমা ছেলেবেলা থেকে এখনো পর্য্যন্ত ঘুমোবার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে এমন অভ্যেস করে দিয়েছেন যে তা না করলে সে ঘুমোতে পারত না। দিনের বেলায় এই নিদ্রাটি না হলে তার বড় কষ্ট হ'ত এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় হ'ত না।

এক দিন কি কারণে জানি না, আমাদের ট্রান্‌সলেশ্যান-এর মাষ্টারমশায় এলেন না। মাষ্টার না এলে যা হয় অর্থাৎ ক্লাসে খুবই গোলমাল হতে লাগল। পাশের ক্লাসের মাষ্টার এসে দু-তিন বার বারণ করে গেলেন। ফলে মিনিট দুই চুপচাপ থেকে আবার গণ্ডগোল সুরু হ'ল। এক বার আর এক ক্লাসের মাষ্টার এসে খুব ধমকধামক করে গেলেন। তারই কিছুক্ষণ আগে কালীচরণ ও নিবারণের খুব তর্ক লেগেছিল। মাষ্টার চলে যেতেই আবার তর্ক সুরু হ'ল। ক্রমে কয়েকজন কালীচরণের ও কয়েকজন নিবারণের দলে জুটে গেল। প্রথমে তর্ক, তার পরে সুরু হ'ল গালা-গালি। আমরা তখন নতুন নতুন খারাপ কথা শিখেছি, কিন্তু সে সব প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র পাই না। একটা উপলক্ষ্য পেয়ে এইখানে খুব তোড়ে চলল সে সব। এক পক্ষ একটা বলে তো ও পক্ষ বলে চারটে। যারা নিরপেক্ষ ছিল তারাও বাহাদুরি দেখাবার জন্য মুখ ছোটাতে আরম্ভ করে দিলে। প্রতিযোগিতায় গালাগালি সুরু হয়ে গেল। ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। মাষ্টারমশাই একরকম ছুটতে ছুটতে ক্লাসে এসে বললেন—কি ব্যাপার কি?

মিনিটখানেক সব চুপচাপ, কেউ কোন কথা বলে না। কিন্তু মাষ্টারমশাই নাছোড়বান্দা, তিনি টেবিল চাপড়ে হুঙ্কার ছাড়লেন—কি হয়েছে! এত চেঁচামেচি কেন হচ্ছিল?

উভয় পক্ষ উঠে অন্য পক্ষের নামে দোষ দিতে আরম্ভ করলে। শেষকালে আবার এক হট্টগোল হবার উপক্রম দেখে মাষ্টারমশায় চেঁচিয়ে উঠলেন—সায়লেন্স।

আমাদের বিশ্বনাথ বাবাজী এতক্ষণ তাঁর সেই সনাতন 'পোজে' হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, মাষ্টার-মশায়ের হুঙ্কার শুনে ধড়মড় করে উঠে ঠিক হয়ে বসলেন। মাষ্টারমশায়ের কি দুর্মতি হ'ল, তিনি বিশুকে ডাকলেন—বিশ্বনাথ, কাম হিয়ার (এখানে এস)।

বিশ্বনাথ উঠে গুটিগুটি তাঁর কাছে গেল। মাষ্টারমশায় বললেন—আমি জানি এবং আশা করি তুমি মিথ্যে কথা অথবা কারুর পক্ষ টেনে বলবে না। এতক্ষণ কি হচ্ছিল বল ত?

বিশ্বনাথ কারুর দিকে না চেয়ে বলে যেতে লাগল—কি করে প্রথমে কথাকাটাকাটি হতে হতে ঝগড়া সুরু হ'ল। তার পরে কে কে কার দিকে যোগ দিলে ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে যেতে লাগল। অথচ আমরা সকলেই দেখেছি সে দু'হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা নিচু করে ঘুম মারছে। বেশ বুঝতে পারা গেল দিবানিদ্রার অসুবিধা হয়েছে বলে বিশুবাবু সবার ওপরেই চটে গিয়েছেন।

এতক্ষণ তো যা হোক চলছিল একরকম। কিন্তু মাষ্টার-মশাই যখন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কে কে গালাগালি করেছে, বিশ্বনাথ তখন সলজ্জ কিশোরীর মত ঘাড় নিচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিলে—বলব স্যার? কিন্তু আমার বড় লজ্জা করছে।

মাষ্টারমশায় বললেন—নির্ভয়ে বলে যা, লজ্জা কিসের?

বিশ্বনাথ বলতে আরম্ভ করল—স্যার প্রথমে কালীচরণ নিবারণকে বললে—।

একটা অত্যন্ত খারাপ কথা।

বিশ্বনাথের মুখ থেকে বাক্যটি বেরোনো মাত্র ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। মাষ্টারমশাই—এই চোপ্—চুপ কর—সায়লেন্স—বলে চীৎকার পাড়তে আরম্ভ

করলেন। পাশের ক্লাসের মাষ্টার কৌতূহল চাপতে না পেরে উঠে এলেন—পেছন পেছন সে ক্লাসের গুটিকয়েক ছাত্রও উঁকি দিতে লাগল।

একটু ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র বিশ্বনাথ বললে—তার পর স্যার, কালীচরণের ঐ কথা শুনে (কথাটি বিশ্বনাথ আবার উচ্চারণ করলে) নিবারণ বললে—।

ক্লাসশুদ্ধ ছেলেদের আবার হাসি।

শেষে প্রায় ইস্কুলসুদ্ধ মাষ্টার ও ছাত্র আমাদের ক্লাসে এসে হাজির হ'ল আর তার মাঝে বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে গম্ভীর-ভাবে একটার পর একটা খারাপ কথার মালা গেঁথে চলল। শেষকালে অন্য ক্লাসের একজন মাষ্টার বিশুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—খুব হয়েছে, যাও বাবা বিশ্বনাথ এখন নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বস গিয়ে।

বিশ্বনাথ গট গট করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সেটা ছিল ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। এই ঘণ্টায় আমাদের যিনি পড়াতেন তিনি ছিলেন অতি ভালমানুষ। বিশ্বনাথ গিয়ে নিজের জায়গায় বসতেই অন্য ক্লাসের ছাত্র ও মাষ্টাররা চলে গেল। ক্লাস একেবারে চুপচাপ—মাষ্টারমশাই চুপ করে নিজের জায়গায় বসে রইলেন। তিনি কারুকে তিরস্কার বা একটি কথাও বললেন না। পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞানবৃক্ষের যে সব শাখাপ্রশাখার বিবরণ দেওয়া আছে, ছাত্রদের মধ্যে তারও অতিরিক্ত জ্ঞানের এই প্রসার দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বসে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে—বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে।

সেদিনকার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা প্রায় দু'বছর পড়েছিলুম। সেবার বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পুজোর ছুটির কিছু-দিন আগে এক দিন বিশু এসে আমাদের জানালে যে তার এক কাকার সঙ্গে সে পাটনা চলে যাবে। পরের দিনই বিশু ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে একখানা পোষ্টকার্ড আমাদের লিখেছিল বটে, কিন্তু ওপরে ঠিকানা না দেওয়ায় তার আর জবাব দেওয়া হয় নি। অবিশ্যি তার বাড়ী থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে পারা যেত, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

প্রায় বছরতিনেক বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে সিনেট হলে বিশুর সঙ্গে দেখা। সেও পরীক্ষা দিতে এসেছে। বিশে বললে সে প্রায় বছরখানেক হ'ল কলকাতায় ফিরেছে। বাপরে বাপ—সে কি মোটাই হয়েছে—। যেমন মোটা তেমনি লম্বা। দেখা গেল পাটনার সস্তার খাবারের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। যা হোক, টিফিনের সময় বিশুর বাড়ী থেকে খাবার এল, সে প্রায় চার-পাঁচ জনের খাবার। আমরাও চার-পাঁচ জনে মিলে তার সবই মেরে দিলুম। বিশু দোকান থেকে গোটা দুয়েক ডাব আর দু-তিন বোতল লেমনেড কিনে খেলে। চার দিন বেড়ে কাটল। তার পর ছুটির প্রায় তিন মাস বিশুদের বৈঠকখানায় আমাদের ধুম আড্ডা চলল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল আমরা সদলবলে ফেল করেছি।

পরীক্ষার খবর বের হবার প্রায় মাসখানেকের মধ্যে বিশু চাকরিতে ঢুকে গেল। তার এক বড়লোক আত্মীয় কলকাতার কোন বড় ব্যাঙ্কে কেশিয়ারের কাজ করতেন। সে তাঁর অধীনে কাজে লেগে গেল। সে সময় বিশুর বয়স সতের, দেখলে মনে হ'ত পঁচিশ বছরের যুবা। মাইনে হ'ল মাসে তিরিশ টাকা। তখনকার বাজারে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নেহাৎ ফেল্‌নার ব্যাপার ছিল না। এর পরে বিশ্বনাথের সঙ্গে বছরদশেক আর দেখা হয় নি।

সে সময় কলকাতায় এমেচার থিয়েটার ক্লাবের খুব মরশুম পড়েছিল। আমরা জনকয়েক মিলে একটা ক্লাব করেছিলুম। আমাদের মধ্যে সেই পুরোনো দিনের ইস্কুলেরও কয়েকটি বন্ধু ছিল। এক দিন রাত্রে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মহলা দিচ্ছি, সপ্তাহখানেক বাদে পাব্লিক ষ্টেজে প্লে হবে। রিহার্স্যাল খুবই জমেছে—দুর্গাদাস বলছে—জাঁহাপনা দুর্গাদাস সে শ্রেণীর লোকের ওপরে—

—কতখানি ওপরে হে—বলেই বিশাল লম্বাচওড়া একটি লোক ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করলে।

আরে বিশে বিশে বিশে—বিশে আয়, বিশে আয়—আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলুম। বিশে বললে—তোরা যে ক্লাব করেছিস তা অনেক দিন থেকেই শুনছি, আজ মনে হ'ল দেখে আসি কি রকম রাজা উজির মারছিস!

অনেক দিন বাদে তাকে পেয়ে সত্যি বড় ভাল লাগল। বিশ্বনাথ বললে—কিন্তু বাবা! ক্লাব করবার সময় বিশেকে তো একবারও মনে পড়ে নি। ভাগ্যে আমি এলুম!

তার পর প্রায় পাঁচ বছর একাধারে বিশের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম চলল। বিশ্বনাথ একাই ক্লাবের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। যত পরিশ্রমের কাজ, আমরা সবই তার ঘাড়ে চাপাতুম এবং সে অম্লানবদনে করে যেত। তার পর এক দিন ক্লাবও উঠে গেল, তার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

প্রায় দশ বছর এমনি চলল—কখনো বা তার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়,—বিশে ভাই তুই আরও মোটা হয়েছিস।

—মোটা হয়েছি বলিস নি, বল দেহে সেরেছি।

কখনো বা একই ট্রামে চলেছি, মাঝখানে নিশ্ছিদ্র ভিড়। দু'জনে চোখে চোখে ইসারা হয়েছে। এরই মধ্যে দু'চার বছর অন্তর রবিবার বিকেলে সে আমার বাড়ী এসেছে, কখনও বা আমি তার বাড়ী গিয়েছি। এক দিন বিশুকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোর ছেলে কত বড় হ'ল রে?

বিশু বললে—এবার এম্-এস্‌সি পাস করেছে।

—বলিস কি? কোন ক্লাস পেলে?

—ফার্ষ্ট ক্লাস।

—বা বা বেশ ছেলে।

বিশে বললে—মাইরি তাই ভাবি, আমার ছেলে হয়ে বেটা এম্-এস্‌সি পাশ করলে কি করে!

বিশু আরও বললে, কোন একটা কোম্পানী তার ছেলেকে তিন শ' টাকা মাইনে দেবে বলেছে, বছর দুই বাদে তারাই বিলেতে পাঠাবে।

তার পরে আমি চলে গেলুম বিদেশে। পাঁচ-ছয় বছর আর তার কোন সংবাদই রাখি নি। ফিরে আসবার পর এক দিন ট্রামে দেখা। দেখলুম সে ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছে—বিশ্বনাথ মুখুজ্জে বলে তাকে আর চিনতে পারা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?

বিশু হাসতে হাসতে বললে—চিরদিনই কি একরকম থাকা ভাল? রোগা হয়ে বুঝতে পারছি মোটা হওয়ার কত অসুবিধা ছিল।

বললুম—কিন্তু হঠাৎ এ রকম রোগা হয়ে যাওয়া তো ভাল নয়! ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছিস?

—ওরাই তো না খেতে দিয়ে রোগা করে দিলে। বলে ডায়বিটিস হয়েছে, কিছু খেয়ো না—ধাঁ ধাঁ করে রোগা হয়ে গেলুম। এখন অবিশ্যি সবই খাচ্ছি, ওদের কথা শুনতে গেলে আর বাঁচা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এখনও ব্যাঙ্কে চাকরি করছিস তো।

বিশু হা হা করে হেসে বললে—ব্যাঙ্কে এখনও চাকরি করছি বটে, তবে সে ব্যাঙ্ক নয়। সে ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, শুনিস নি?

—না তো। তোর কিছু গেল নাকি?

বিশু বললে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিল ওখানে। শুনছি লিকুইডেটররা শতকরা পঞ্চাশ টাকা ফেরত দেবে, আপাতত। টাকা আজ না হয় কাল, না হয় পঞ্চাশ বছরে ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখ এই যে তিরিশ বছরের চাকরিটা গেল। সেই মনে আছে ষোলো-সতেরো বছর বয়সে ওখানে ঢুকেছিলুম—আর ছেচল্লিশ বছর বয়সে শেষ হ'ল। যখন ঢুকি তখন নোট গুনতুম, মাইনে হয়েছিল তিরিশ টাকা। ক্রমে এসিষ্ট্যাণ্ট কেশিয়ার হয়েছিলুম, পাঁচ শ' টাকা মাইনে হয়েছিল।

বিশু একবার হা হা করে হেসে বললে—ধম্মে সইবে কেন, আমাদের মত লোকের অত উন্নতি। কি বলিস?

বললুম—যেতে দাও বন্ধু, যা বরাতে ছিল তা হয়ে গেছে, তার জন্য আপশোষ করে কি হবে?

—ক্ষেপেছিস তুই! আমি করব আপশোষ? এক হপ্তার মধ্যে চাকরি ঠিক জুটিয়ে নিয়েছি। তবে মাইনেটা একটুক কম হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কত দিচ্ছে এখানে?

—এক শ' টাকা।

বলেই আবার সেই হা হা হাসি। তার পর বললে—ঢুকতেই তো তারা কিছু পাঁচ শ' টাকা আমায় দেবে না? কি বলিস?

সেদিন এইখানেই শেষ হ'ল। তিন-চার দিন পরে আবার ট্রামেই দেখা তার সঙ্গে। কথায় বার্তায় বুঝতে পারলুম, ওদের পৈতৃক সম্পত্তিও ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ জেরা করে এও জানা গেল যে সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা ও পায় নি। তার কাকা অন্যায়ভাবে তাকে ফাঁকি দিয়েছেন।

বললুম—কাকার নামে নালিশ করলি নি কেন?

বললে—তুই কি পাগল হয়েছিস? কাকার নামে নালিশ করব! আমার ছেলেবেলার যা-কিছু আবদার সব চলত কাকার কাছে। আমার খেলবার যা কিছু—গুলি, লাট্টু, ঘুড়ি-লাটাই, লজঞ্চুস, চানাচুর—এ সবেরই পয়সা জুটিয়েছে কাকা অম্লানবদনে, কখনও না বলে নি। আমাদের সেই সম্বন্ধ কাকা দশজনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলে গেল বলে আমিও ভুলব?

বড় রাগ হ'ল। বললুম—বেশ করেছ, দু'আনার গুলি ও চানাচুরের বদলে লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে খুব বাহাদুর করেছ।

আমার কথা শুনে এবার বিশে এমন হা হা করে হেসে উঠল যে ট্রামসুদ্ধ লোক চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল।

সেদিন সেইখানেই শেষ হ'ল। তার পরেই আমাকে কিছুদিনের জন্যে আবার বিদেশে যেতে হয়। বছর দুয়েক পরে নানান তাড়ায় দেশে ফিরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম, বন্ধুবান্ধব কারুরই খোঁজ নিতে পারি নি।

সে সময় শীতকাল। বিকেলে কবিরাজের বাড়ী থেকে ফিরছি—শরীর এত খারাপ যে একটু চললেই অবসন্ন বোধ

হয়। একটু ঘুরে যেতে হলেও মনে করলুম 'বিশেদের বাড়ীতে একটু বসে:সেখান থেকে একখানা রিক্সা ভাড়া করে ফেরা যাবে। বিশুর সঙ্গেও দেখা হবে।

দোরগোড়াতেই বিশুর খুড়তুত ভাই লোকনাথের সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ীর সবাই আমাকে চেনে, আমিও প্রায় সবাইকে চিনি। লোকনাথ আমাকে দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, আসুন দাদা আসুন। কেমন আছেন, কবে এলেন—ইত্যাদি সারা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বিশে এখনও ফেরে নি বুঝি ?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকনাথের মুখের ওপরে বিস্ময়ের একটা চমক খেলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা সামলে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে সে বললে—বড়দা আর আপিস থেকে ফিরবে না দাদু।

—তার মানে ?

—আপনি জানেন না বুঝি ? বড়দা ত নেই। তার গুষ্টির আর কেউই নেই। এক বছরের মধ্যে সব সাফ হয়ে গেছে—এই বছর দুই আগে।

লোকনাথ বলতে লাগল, ইদানীং বড়দা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রকম ? তাকে ত সারাজীবন একই রকম দেখেছি।

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, বাইরের লোকেরা বুঝতে পারত না, কিন্তু ইদানীং বড়দা একেবারে বদলে গিয়েছিল। অমন লোক যে কি করে এ রকম হতে পারে আমরা তাই বলাবলি করতুম।

—কি রকম হয়ে গিয়েছিল ?

লোকনাথ বললে—বড়দা ব্যাঙ্কে বড় কাজ করত জানেন ত—সেই ব্যাঙ্ক গেল ফেল হয়ে বড়দার চাকরিটাও গেল। বড়দা অন্য জায়গায় কম মাইনের একটা চাকরি জুটিয়ে নিলে। অবিশ্যি চাকরি না জুটলেও তার ভাবনা কিছু ছিল না, কারণ তার ছেলে সোমনাথ তখন পাঁচশ' টাকার ওপর মাইনে পায়। চাকরি যেতেই বড়দা বাড়ীর সব খরচ কমিয়ে দিলে। জানেন ত সে কি রকম খাইয়ে লোক ছিল। নিজে খেয়ে আর লোকজনকে খাইয়ে সে পাঁচশ' টাকা মাসে ফুঁকে দিত। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু দু'বেলা বাড়ীতে বিরিয়ানি কাবাব উড়ছে—এই ছিল তার ব্যবস্থা। বাপের নূতন ব্যবস্থা দেখে ছেলে বললে—বাবা এবার থেকে বাড়ীর খরচ সব আমার। বাপ বললে—খবরদার, ওসব নবাবি করতে চাও ত অন্যত্র যাও। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার আমদানি মতে বাড়ীর সবাইকে চলতে হবে।

হঠাৎ বড়দার এই হালচাল দেখে বৌদিও ভড়কে গেল—সেও কিছু বললে না। তারপরে একেবারে কালিয়া পোলাও থেকে দু'বেলা ভাত ডাঁটাচচ্চড়ি। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে কোনও জিনিষ আনবার জো নেই—কে এনেছে ? কেউ কোনও জিনিষ কিনতে পারবে না—কে কিনেছে ? সোমনাথের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছে, জামা নেই—কিন্তু কারও কেনবার হুকুম নেই। আগের দিনে যেমন যার যা খুশি করত বড়দা সবতাতেই খুশি, সবতাতেই তার হাসি—এ যেন একেবারে তার উল্টো, তার ইচ্ছা ছাড়া আর কারও কোনও ইচ্ছা খাটবে না। বড়দার শরীর ত ভেঙে পড়েইছিল, দেখতে দেখতে বৌদি আর সোমনাথও একেবারে কাঠির মত রোগা হয়ে গেল। ছেলেও বাপের এমন বাধ্য যে, বাড়ীতে যে শাকচচ্চড়ি ভাত হয় তা ছাড়া বাইরে আর কোথাও খায় না, বাপ বারণ করে দিয়েছে। আর বড়বৌদি, তিনি বড়দার চেয়েও ভালমানুষ ছিলেন। বড়দা যদি ঠাট্টা করে বলত—সরকারের হুকুম হয়েছে আজ থেকে লোকেদের মাথা দিয়ে হাঁটতে হবে, বড়বৌদি বল ত —এ রকম হুকুম কেন হ'ল বল দিকিন ?

এই রকম চলতে চলতে এক দিন সোমনাথ আপিস থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ী ফিরল। প্রথম কয়েকদিন তালে-গোলেই কেটে গেল, তারপর জ্বর এক দিন বেশি হতেই বড়দা একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনল। ডাক্তার রোগী দেখে বললেন—জ্বরটা বাঁকা বলে মনে হচ্ছে, কোনও বিশেষজ্ঞকে ডাকা দরকার।

বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হলেই টাকার দরকার। বড়দা কিছুতেই ডাকবে না। শেষকালে আমাদের জেদ ও বৌদির কান্নাকাটিতে ডাক্তার ডাকতে হ'ল, আর সেই সোমনাথের টাকায় হাত দিতেই হ'ল। ডাক্তার সব দেখে বললেন—রোগের সঙ্গে লড়বার শক্তি রোগীর নিজের নেই। ওষুধে যতদূর হয় আমরা তা করব।

কিন্তু কোনও ওষুধেই কিছু হ'ল না। দশ-বার দিন রোগভোগ করে এক দিন শেষরাত্রে সোমা মারা গেল।

ভোর হবার আগেই আমরা সোমার শবদেহ নিয়ে বেরিয়ে গেলুম, এদিকে বড়দা করলে কি সেই শয্যায় শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। এই ক'দিন দিনরাত সে ঠায় সোমনাথের শিয়রে বসে ছিল, নেহাত দরকারে এক-আধবার ওঠা ছাড়া সে কোথাও যায় নি, কোনও দিন খেয়েছে, কোনও দিন জল পর্যন্ত খায় নি। অনেক বলা-কওয়ার পর বড়দা তখনকার মত উঠল বটে, কিন্তু ঘর ধোয়া-পোঁছা হয়ে গেলেই সে আবার গিয়ে ঠিক সেই

জায়গাটিতেই শুয়ে পড়ল যেখানে সোমার বিছানা ছিল। বড়দা খায় না-দায় না দিন-রাত চোখ বুঁজে পড়ে রইল। ওষুধ কিংবা পথ্য দিলে থু করে ফেলে দেয়। একেই রোগে তার শরীর আগে থেকেই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল এখন এই অত্যাচারে মাসখানেক যেতে না যেতেই সে হয়ে গেল সারা। বড়দা মারা যাবার পর বৌদি বোধ হয় মাসতিনেক ছিল, কিন্তু সেও ঐ রকম অত্যাচার করেই মারা গেল। একটি বছরের মধ্যে সব ফরসা।—

এই অবধি বলে লোকনাথ চুপ করলে। মুখ তুলে দেখলুম তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে— আলাদা হয়ে গেলেও বড়দাকে তারা সবাই খুব ভালবাসত।

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম বিশ্বনাথের কথা। তাকে আমি যতটা জানতুম সেই বার-তের বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে আর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি— জীবনের কোনও খানটাই লোকনাথ-বর্ণিত তার শেষ-জীবনের সঙ্গে মেলে না। সে ছিল উদার অপার সাগরের মত। লোকের একটুখানি হাসিমুখ দেখবার জন্যে সে সব ত্যাগ করতে পারত। মনে পড়তে লাগল, আমাদের ছেলেবেলার দাবাবড়ে খেলবার কথা—আমরা তিন বার করে চাল ফেরত নিতুম, কিন্তু বিশ্বনাথ একবারও চাল ফেরত নিতে গেলে আমরা এমন গোলমাল লাগাতুম যে, সে হেসে বলত—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—আমি চাল ফেরত নেব না, এই রেখে দিচ্ছি—। বয়স বাড়ার সঙ্গে তার এই ঔদার্য বাড়তে বাড়তে একেবারে অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁচেছিল। এজন্য কতবার তাকে কত তিরস্কার করেছি, কিন্তু সবই সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে—আরে যেতে দে, কি বলিস। মনে পড়তে লাগল কি সমারোহের সঙ্গে এই সংসারে সে এগিয়ে চলেছিল আর কি বিশ্রী ভাবে সে বিদায় নিলে। সমস্ত জীবন ধরে সে নিজেকে বিলিয়েই দিয়ে এসেছিল। যে যা চায়, তার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সে কখনও কারুকে বঞ্চিত করে নি। এই বিরাট ত্যাগের মধ্যে কোথায় কেমন করে এক বিন্দু অভিমান লুকিয়েছিল একটি ঘটনার আঘাতে তা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে প্রিয়জনদের মৃত্যুর কারণ হ'ল এবং নিজেও এক রকম আত্মহত্যা করলে!

নানা চিন্তা ও প্রিয়-বিয়োগব্যথায় আত্মহারা হয়ে আছি এমন সময় লোকনাথ বললে—দাদা, অনেক দিন বাদে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, বুঝতে পারছি আর বোধ হয়, কখনও আসার সুবিধাও হবে না—বসুন একটু চা খেয়ে যাবেন।

লোকনাথ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। আমি বসে ভাবতে লাগলুম বিশুর কথা, আমাদের ছেলেবেলার কথা —মানুষের অদ্ভুত জটিল জীবনের কথা। ভাবছিলুম মানুষ কি ঘটনাপ্রবাহকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না? তা যদি না পারে তা হলে ঘটনার আঘাত থেকে আত্ম-রক্ষার উপায় তাকে আবিষ্কার করতেই হবে। একথা কখনই সত্য নয় যে, যে মহাশক্তি অতি নগণ্য কীটানু-কীটকে বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যে রূপান্তরিত করেছেন তিনিই আবার তাকে এই সুখ-দুঃখ শোক-তাপ লজ্জা-ভয় অভিমান-ঈর্ষার পুটপাকের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছেন?

লোকনাথের ওখান থেকে চা খেয়ে যখন বাইরে বেরোলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা ও ব্ল্যাক-আউটের সঙ্গে শীতের ধোঁয়া মিলে বাইরে যে অন্ধকার জমাট হয়েছিল তারই ভেতর দিয়ে এক রকম হাতড়ে হাতড়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। একেই রুগ্ন শরীর ঠেলে চলতে কষ্ট হয়, তার ওপরে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশুর মৃত্যুসংবাদ শুনে মনের ওপরেও একটা বিরাট ভার চেপে বসেছিল। কখনও দাঁড়িয়ে হাঁপাই, কখনও ধীরে ধীরে চলি। এরই মধ্যে একবার যেন মনে হ'ল সেই জমাট অন্ধকার ঠেলে বিশু আমার পাশে দাঁড়াল। আমি অভিভূতের মত তার দিকে হাত বাড়ালুম কিন্তু ঘনান্ধকারে সেই অশরীরী অনুভূতির কোনও শরীরী স্পর্শ মিল্‌ল না।
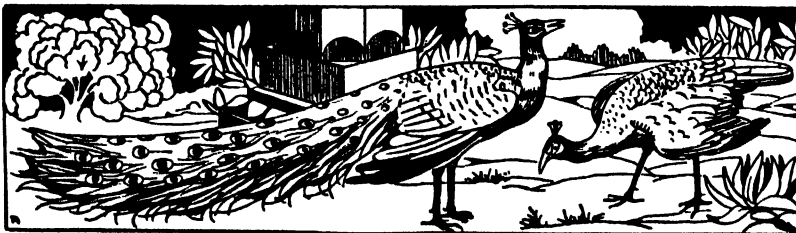
জনশিক্ষা

শ্রীহরিহর শেঠ

আমার এখানে আলোচনার বিষয় জনশিক্ষা। জনশিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার আবশ্যকতা, প্রসারের সহজ ও সম্ভবপর উপায় এবং তাহার কার্য্যকরী পন্থা নিরূপণ আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে দেশের অসন্তুষ্টি প্রতিরোধের অছিলায়ই হউক আর বৈদেশিক রাজশক্তির স্বার্থ-প্রণোদিতই হউক তাহার সংস্কার ও উৎকর্ষসাধনের অন্তঃসারশূন্য একটা প্রয়াস মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তাহা সরকার-নির্দ্ধারিত এক একটা কমিশনের আকারেই দেখা যায়। র‍্যালে কমিশন স্যাডলার কমিশন প্রভৃতি তাহারই উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পর শতাব্দীর একপাদ না যাইতেই তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের অসন্তুষ্টি হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের চাপে লর্ড রিপনের শাসনকালে স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের অধিনায়কত্বে সর্ব্বপ্রথম একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। তদবধি এতাবৎকাল মধ্যে মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কারের একটা বাহ্যিক চেষ্টা দেখা গেলেও আমাদের ঠিক উপযোগী শিক্ষা ও তাহার প্রসার হয় নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। যাঁহারা যখন দেশের মালিক থাকেন, তাঁহাদের প্রয়োজনে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই যাহা কিছু করিবার চেষ্টা হয়। তাহা তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির সহায়ক হইলেও, তাঁহারা যদি বিজাতীয় হন তবে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের উন্নতি, জাতীয়তার বিকাশ বা উদ্বোধন তদ্দ্বারা হয়ই না বরং অনেক সময় বিপরীতই হয়।

সংসার সমাজ ও রাষ্ট্র মধ্যে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা বা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহার মূলে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই। এতাবৎ আমাদের যে শিক্ষা চলিয়াছিল এবং যাহার ধারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তনের প্রথম কাল হইতে তাহার মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল? তাহা কি আমাদের জন্য কোন শুভ উদ্দেশ্য লইয়া আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? না তদ্দ্বারা শিশু-হৃদয়ের বা জনগণের সুপ্ত মানসিক শক্তির অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিবার কোন প্রয়াস ছিল? শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় সমুন্নত করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য পালন দ্বারা জনগণকে নিজ নিজ সমাজ ও দেশের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। শাসকবর্গ সে উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, তাঁহাদের রাজত্ব কি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে, নিজেদের পণ্য এদেশে চালাইয়া কি উপায়ে তাঁহাদের দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে, মাত্র এই সকল উদ্দেশ্যই তাঁহাদের ছিল।

লর্ড কার্জ্জনের সময় বঙ্গভঙ্গকে সূত্র করিয়া যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে রাজা-প্রজার স্বার্থের পার্থক্য স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। প্রকারান্তরে যদিও আমাদের মোহ ঘুচিয়া পথের সন্ধান আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও বৈদেশিক স্বার্থমূলক দীর্ঘ শাসনের ফলে আমাদের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। তাহা আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত যেন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ জয় করিয়া আমাদের যতটা না পদানত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনকে জয় করিয়া মানসিক সহজাতবৃত্তিসমূহকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই আজ দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমরা সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না।

আমাদের সুশিক্ষা দান করা, স্বাধীন মনোবৃত্তি উন্মেষের উদ্দেশ্য ত তাহাদের ছিলই না, শিক্ষার প্রসারও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং যাহা ছিল তাহা শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করা। ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে সরকারেরই প্রচেষ্টায় এডাম সাহেবের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার যে বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায়, তখন এক বাংলাদেশেই প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রায় তাহার শতভাগের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেযুগের পাঠ্যপুস্তকাদিতে জাতীয়তার উদ্বোধক বিশেষ কিছু যাহাতে স্থান না পায় সে বিষয়ে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা আমাদের জাতীয়তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নৈতিক বনিয়াদের উপর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা উপযোগী, সংস্কার দ্বারা তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যে সে বিষয়ে অবহিত আছেন, অধিকার হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাধাকৃষ্ণণ কমিশন গঠন তাহার একটি উদাহরণ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা এই কমিশনের

মতেই হইয়াছে। ইহা হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা বা ইহা কতটা কাজে আসিবে তাহা এক্ষণে বলা যায় না, অথবা কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে আলোচনার এখানে আবশ্যক নাই। তবে যদি এই ব্যয়-বাহুল্য করিয়া আশানুরূপ ফললাভ নাও হয়—ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যখন অবকাশ নাই, তখন দোষ-ত্রুটি যদিই থাকে পুনঃসংস্কারে কাম্যফল পাওয়া সম্ভব ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। কিন্তু ভাবিবার কথা, এই ব্যবস্থার মধ্যে বা উক্ত কমিশনে ব্যাপক জনশিক্ষার সম্বন্ধে যদি তেমন কিছু সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকে তবে তাহার জন্য কি করা যাইতে পারে?

শুনা যায়, ইউরোপ আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষর বলিতে প্রায় কেহ নাই, সেস্থলে দশ বৎসর পূর্ব্বেও সমগ্র ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৯০ আর বাংলায় ছিল প্রায় ৭৯। ভারতের প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের কথা বলিতেছি না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈদিক যুগের কথাও ছাড়িয়া দিই। বহু পরবর্ত্তী যুগে শ্যাম, কাম্বোজ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত বিশাল ভারতের বিরাট সংস্কৃতির কথা ক্রমে ভুলিতে বসিলেও আমাদের নালন্দা, ওদন্তপুরী, তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আজিও প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। এক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘারামসমূহে কম-বেশী দশ সহস্র ছাত্র ও তাহাদের অধ্যাপকগণ অবস্থান করিয়া বিদ্যাদান ও গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনের এই বিরাটত্বের কল্পনা কি স্বপ্নের মতই নহে? প্রাচীন ভারতে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হইত তাহা এখন আমাদের শুধু কল্পনারই বস্তু। সংস্কৃত একটি শ্লোক আছে—

যো দত্তাৎ জ্ঞানমজ্ঞানম্
কুর্য্যাৎ বা ধর্ম্মদর্শনম্,
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং দত্তাৎ,
তেন তুল্যং ন তদ্ভবেৎ।

পুরাকালে আমাদের দেশের এই জ্ঞানাহরণ-প্রবৃত্তি কতকটা সহজাতই ছিল। আহার নিদ্রার ন্যায় ইহা মানুষের অবশ্যকরণীয়ের মধ্যেই পরিগণিত হইত। সুতরাং সেজন্য তখন অন্তরের দরদ ছিল। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ অদম্য চেষ্টায় নিরক্ষরতা দূর করিয়া এক্ষণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষা প্রসার বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনই ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূল কার্য-হইলেও, রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বাস করেন, উচ্চশিক্ষার প্রভাবে শক্তি-স্ফুরিত হইয়া পরিণামে তাহা হইতে দেশের কল্যাণই সাধিত হয়। সেইজন্যই তাঁহারা শিক্ষার পথ সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকমুক্ত করিবার জন্য এত আগ্রহশীল।

সেখানকার রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে যে প্রয়াস তাহা আমাদের এই শিশু গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সুগঠিত করিয়া তোলার জন্য আবশ্যক। বলিতে গেলে ইহাই এখন এখানকার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্রকে গড়িবে সরকার, সেই সরকারকে গড়িবার ভার যখন জনসাধারণের উপর তখন সেই জন-সাধারণ যদি নিজেদের সত্যকার শুভাশুভ বোধ-বিবর্জ্জিত থাকিয়া স্বার্থজ্ঞান বিরহিত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের কাম্য সুখ-শান্তি উপভোগ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই প্রথম ও প্রধান কার্য্য, কারণ জনশিক্ষাই গণতন্ত্রের প্রাণ। বলা বাহুল্য, এ কার্য্য রাষ্ট্রের হইলেও এই রাষ্ট্রকে যাঁহার যেমন শক্তি সে বিষয় সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করা নাগরিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ব্যাপক শিক্ষার রূপ কি এবং তাহার প্রসার সহজে কি উপায়ে হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞগণই সে ভার লইতে পারেন। অনেকেই মনে করেন, এই উভয় বিষয়েই পাশ্চাত্যের অনুকরণ আমাদের ঠিক উপযোগী হইবে না। নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য যথাসম্ভব অভিযান আরম্ভ করা আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা বিনা ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হওয়া একান্ত দরকার। এজন্য আড়ম্বর-পূর্ণ অট্টালিকা অথবা ট্রেনিং-প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট না হইলে যে হইবে না এমন কোন কথা নাই। প্রশস্ত চালাঘর, অনেক সময় বৃক্ষতল এবং শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা সুশিক্ষক হইলেই হইতে পারে।

উচ্চ ইংরেজী স্কুল বা কলেজে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে এবং করিতে সক্ষম তাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া সমালোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জনগণের শিক্ষাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। সমাজবদ্ধ হইয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করিবার জন্য নৈতিক বনিয়াদকে ভিত্তি করিয়া যে সব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার দরকার স্থূলতঃ তাহা লাভ করার নামই শিক্ষা। আক্ষরিক বিদ্যার দ্বারা তাহা লাভ হওয়া অনেকাংশে সহজ হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও বহুপ্রকারে শিক্ষালাভ করা যায়। এদেশে সে উদাহরণের অভাব নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদিক যুগের স্থান ছিল বহু ঊর্দ্ধে, কিন্তু শুনা যায় তাহা

ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ। পুথিপত্র বা গ্রন্থাদির প্রচলন তখন কমই ছিল। তখনকার লোক যে শিক্ষিত ছিলেন না একথা বলা চলে না।

প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিই, বেশী দিন নয়, অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরাই যৌবনকালে দেখিয়াছি কবির গান, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সচরাচর অনুষ্ঠিত হইত এবং লোকে তাহাতে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইত। তদ্দ্বারা মনুষ্যত্বের চরম ধর্ম্ম যথা ত্যাগ, সত্যপালন, দান, সতীধর্ম্ম-পালন, কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণ রাজা হরিশ-চন্দ্র, বাজশ্রবা, কর্ণ, দধীচি, রামচন্দ্র, সীতা, শৈব্যা, শিবি, নচিকেতা প্রভৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া আনন্দ উপভোগের সহিত তাহা অতি সহজে অন্তরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত। আর অনেকেই অশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাহা আজীবন স্মরণ রাখিতেন। তাহা হইতে কত সহজে অলক্ষিতে নৈতিক চরিত্রকে সবল করিয়া মনুষ্যত্বলাভ দ্বারা সমগ্র জাতীয় চরিত্রের মান উন্নত করিত তাহা চিন্তার অবসরও এখনকার নগরসভ্যতাবিলাসী শিক্ষিতাভিমানীদের নাই। বাহিরের সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরের সহিত যদি ভিতরের সঙ্গতি না থাকে তবে তাহার পরিণাম কখনও শুভ হইতে পারে না।

যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির কথা যাহা উক্ত হইল সে সবের উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দদানের সহিত লোকশিক্ষা প্রচার। সাধারণের নৈতিক জীবনকে গড়িয়া তোলাই পালা-রচয়িতাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাকেই লোক-সাহিত্য বলিত। স্বল্প ব্যয়ে সহজে সে উদ্দেশ্য যেমন সত্বর সিদ্ধ হইত, অধুনা শিক্ষাকেন্দ্রে তদনুরূপ কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। আরও এক কথা, এখনকার স্কুল কলেজের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা শিক্ষা-মন্দিরের সংস্রবচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বিনা চর্চ্চায় যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে পারিত না। তাহা একেবারে হৃদয়-মনে বদ্ধমূল হইয়া উত্তর-জীবনে কার্য্যকরী হইত। এখন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলিতে যত যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহার চর্চ্চা না রাখিলে তাহা আর বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

যাহা জীবনে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারা যায় না, এমন শিক্ষার মোহ সকলের পক্ষে শোভন হইতে পারে না। মনুষ্য-জীবনে জ্ঞানলাভের সহিত যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অর্জ্জন করিয়া মানব-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারা যায়, তদপেক্ষা মানুষের কাম্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু নানা কারণে কলেজের শিক্ষালাভ উপস্থিত অবস্থায় কমসংখ্যক যুবক যুবতীর পক্ষেই সম্ভব। আমার বক্তব্য, মানবতার সাধনা ভুলিয়া শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া মোহে ভুলিয়া থাকিলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কখনও সমুজ্জ্বল হইতে পারে না। আমাদের যুবসম্প্রদায়কে মনুষ্যত্বের সহিত জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতির কথা ভাবিতে হইলে একথা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না যে, শুধু শহর লইয়াই জাতি নহে। পল্লীসমাজকে অবহেলা বহুপ্রকারে আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির মূল। শহরের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার অহমিকায় সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের সুখ-দুঃখে উদাসীন।

মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল চিন্তাশীল মনীষীর কথা—পল্লী-সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে, তথাকার অধিবাসীদের মানুষের মত বাঁচিবার জন্য সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার, সুযোগ করিয়া দিতে না পারিলে পাশ্চাত্ত্য সভ্য দেশসমূহের ন্যায় তথাকথিত গণ-তন্ত্রবাদ শুধু ধনিক ও কতিপয় শিক্ষিতের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে যখন নগরসভ্যতা এতটা বিস্তৃতিলাভ করে নাই, যখন দরিদ্র ও ধনিকের মধ্যে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য এত প্রকট হইয়া উঠে নাই, তখন সাধারণ পল্লীর অবস্থা এখনকার অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা যাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও সেই গ্রামমুখী হওয়া ভিন্ন আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। কিন্তু তাহা যদি কালপ্রভাবে হয় ত আবার কোন দিন হইতে পারে; নচেৎ নাগরিক সুখসুবিধা ছাড়িয়া কয়-জন যাইতে চাহিবেন জানি না। সুতরাং এখন পল্লীর সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। সেজন্য প্রথম আবশ্যক সরকারী প্রচেষ্টায় জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

জনশিক্ষা ব্যাপক করিতে হইলে দেশ কালকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে সেই প্রাচীন যুগে ফিরিয়া গিয়া শুধু সেই সেকালের গ্রামীণ শিক্ষার আশ্রয় লইলেই চলিবে না। এক্ষণে অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অবধি কিঞ্চিৎ আক্ষরিক বিদ্যালাভ করা সকল ছেলে-মেয়ের একান্ত দরকার। সেজন্য প্রথমে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আবশ্যক এবং তাহা অনুসরণ করিয়া আধুনিক প্রণালীতে পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে শিক্ষার সহিত আধুনিক রুচিসম্মত কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে অনেক উপকার হয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন রেডিও সাহায্যে রন্ধন,

সীবন, সঙ্গীত এমন কি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইতেছে তখন ম্যাজিক লণ্ঠন, বায়োস্কোপ বিশেষ করিয়া সিনেমার সহায়তায় যথেষ্ট কাজ পাওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক অনুরূপ ফিল্ম প্রস্তুত করাইয়া, শুধু পুরাণ উপপুরাণাদি হইতে আদর্শ বিষয়গুলি দেখান বা শুনানই নহে, তদ্দ্বারা বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানাদি বিষয়েরও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হইলেও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে গ্রামাঞ্চলে যথাসম্ভব সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও নৈশ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিয়া ও তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এ সবের জন্য চাই সরকার ও জনসাধারণের শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত আন্তরিক প্রচেষ্টা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ব্যয়সাধ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত রূপ কি জানি না। মনে হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে শিক্ষা বিষয়েও বহু গলদ নিরসন হইয়া প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিকাশের সহায়তা হওয়া দূরে থাক, শরীর ও মনের উৎকর্ষসাধনের জন্য যে সব শিক্ষার আবশ্যক তাহাও ঠিকমত লাভ করা সম্ভব হয় না, হয়ত সেসব বিষয় সহজসাধ্য হইতে পারিবে। ঊষর জমিকে উর্ব্বর করিবার সুযোগ দিবার জন্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে যেমন হীরাকুণ্ড, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনা রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হইয়া কাজে লাগিয়াছেন সেইরূপ দীর্ঘ অবসাদের ফলে যে জনসাধারণের হৃদয় আলোকহীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইবার জন্যও প্রথম বিরাট পরিকল্পনার আবশ্যক তাহার পর শিক্ষারূপ আবাদের জন্য কর্ষণ, বপন, সেচনের কথা।

সমগ্র ভারতের কথা এখানে না-ই ধরিলাম। বাংলার পল্লীসমূহে, যেখানে শতকরা ৭৮ জন বাস করে—তথাকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

শিক্ষা বিষয়ে যাঁহাদের চিন্তা ও প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের এদিকে অবহিত হওয়াই এখন আবশ্যক। অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত যেমন দেশব্যাপী আন্দোলন স্বতঃই সৃষ্ট হইয়াছে এজন্য সেইরূপ সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আদর্শ স্থির করিয়া কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক প্রয়োজন। তবে ইহাও স্বীকার্য্য, তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সঙ্কল্পের সহিত বেসরকারী উদ্যম এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আছে।*

* হুগলী ঘুটিয়াবাজার স্মৃতি-মন্দিরের (দি স্কুল অব্ ফিজিক্যাল কালচার) শারদোৎসব ও জনশিক্ষা বিভাগের উদ্বোধন সভায় সভাপতির অভিভাষণ। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৮।

পদ্মা

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

পদ্মার জল? মানুষের আঁখিজল।
পদ্মার বুকে করুণ ছলাৎছল।

এই পদ্মায় ছিল পদ্মের বন,
শঙ্খের সুরে ছিল কি অনুরণন!
আমরা সবাই উচ্ছল পদ্মায়
মায়েতে ভেসেছি সকালে ও সন্ধ্যায়।
পদ্মার বুকে ভাসায়েছি ধান খই,
সেই পদ্মার চিহ্ন তাহার কই?

হাল্কা হাওয়ায় কাঁপা পদ্মার ঢেউ
মাখেনি এমন আছে তো জানি না কেউ।
সেই ঢেউয়ে আজ অদ্ভুত অভিশাপ;
পদ্মার ঢেউ—পদ্মার ঢেউ সাপ
হৃদয়ে জড়ায় বুকেতে জড়ায় এসে,
আজো কাঁদি তবু পদ্মাকে ভালোবেসে।

পদ্মার জল? মানুষের আঁখিজল।
পদ্মাতে সুর করুণ ছলাৎছল।

কন্যাকুমারিকায় কয়েকদিন

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

ঠিক সন্ধ্যায় আমরা ত্রিবেন্দ্রম পৌঁছিলাম। সকালে মাদ্রাজ-ত্রিবেন্দ্রম এক্সপ্রেসে মাদুরা ছাড়িয়াছি; রাস্তায় গাড়ীতে সামান্য আহার হইলেও স্নান হয় নাই। তার উপর ভিড়ও ছিল যথেষ্ট।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ; তথাপি গাড়ীতে গরম অসহ্য বোধ হইল। একে সমুদ্রের তীরে শীত জমাট বাঁধিবার সময় পায় না; তার উপর আমরা ক্রমশ: বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী হইতেছি। পথের দৃশ্য মনোহর। পাহাড়ের থাকে থাকে সাজানো শস্যক্ষেত্র, শ্যামল বনানীর গগনচুম্বী বৃক্ষরাজি, স্থানে স্থানে আম্র, কদলী ও নারিকেলকুঞ্জ-বীথি—সমস্তই চক্ষু জুড়াইয়া দেয়। পথে কয়েকটি 'টানেল' পড়িল। ইহার মধ্যে দুই-একটি বেশ বড়। উজ্জ্বল দিবালোক হইতে সহসা নিবিড় অন্ধকারের কালগ্রাস মনকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে।

কন্যাকুমারিকায় বিচিত্র সূর্য্যোদয়

কুইলন হইতে সমুদ্রকে প্রায় সঙ্গী করিয়া চলিয়াছি। কখনও ঘন বৃক্ষপ্রাচীরের আড়ালে সমুদ্র হারাইয়া গিয়াছে, আবার কখনও নারিকেলকুঞ্জের ফাঁকে তাহার তটরেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিবেন্দ্রম্ ষ্টেশনটি ছোট। কিন্তু ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। তাই রাজধানীর সম্মানরক্ষার জন্ত ষ্টেশনটিকে টানিয়া টানিয়া বড় করা হইয়াছে। রাত্রিবাসের জন্ত রেল-কোম্পানীর যাত্রীনিবাস আছে। তাহার ভাড়া জনপ্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় চারি টাকা। ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে ধর্ম্মশালা, ভাড়া কম। বিনামূল্যে থাকিবার ব্যবস্থাও আছে, তবে 'দু:খেষ্বনুদ্বিগ্নমনা:' না হইয়া সেখানে বাস করা দুরূহ ব্যাপার।

সারাদিনের তাপদগ্ধ শরীর শীতল জলে স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জঠরাগ্নির জ্বালা বাড়িতে লাগিল। উত্তর-ভারতের মানুষ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন প্রদেশের আহার্য্য ভক্ষণে যাহারা অপারগ, তাহাদের পক্ষে বেশী দিন দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করা কষ্টকর। কাজেই ক্ষুধাকে আমরা বেশী প্রশ্রয় দিই নাই।

"মাতৃতীর্থ" স্নানের ঘাট ও চত্বর

সকালে খবর লইয়া জানা গেল, 'ষ্টেট এক্সপ্রেস' বাস বেলা পৌনে তিনটায় সময় ত্রিবেন্দ্রম ছাড়িয়া সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় কন্যাকুমারিকায় পৌঁছিবে। ত্রিবেন্দ্রম হইতে কন্যাকুমারিকার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল; সিমেণ্ট কংক্রিট বাঁধান রাস্তা প্রায় ধূলিহীন। পরিবেশও মনোরম।

ত্রিবেন্দ্রমে দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই। সমুদ্রতীরে সূর্য্যাস্তের অভাব। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল 'পদ্মনাভে'র মন্দির। দক্ষিণ-ভারতীয় ধাঁচে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি বৃহৎ মন্দির। মন্দিরের দেবতা বিষ্ণু অনন্ত শয়নে। মূর্ত্তি অতি বৃহৎ—কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তর যথারীতি অন্ধকারময়। তেলের বাতি সে অন্ধকার দূর করিতে পারে না। ঠাহর করিয়া মূর্ত্তির অবস্থান বুঝিতে হয়। তথাপি মূর্ত্তি ও পরিবেশ ভাল লাগিল।

মন্দিরটি সর্ব্বসাধারণের জন্ত নির্ম্মিত হইলেও ইহা রাজকীয় মন্দির। মন্দিরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা আসিয়া পূজা করেন; ইহা বহুদিনের রীতি। দ্বারদেশে 'বেয়নেট' হস্তে সিপাহী থাকে। ইহা রাজকীয় প্রতাপের নিদর্শন।

পুরুষযাত্রীকে কটিদেশের উপরিভাগ হইতে বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা বহু প্রাচীন রীতি; ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া হয় না। সন্ধ্যায় আরতির দৃশ্য সুন্দর। পুরোহিতের দল অপেক্ষাকৃত নির্লোভ;

অন্য দক্ষিণাই লক্ষ্য থাকে। এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার রীতি নাই; যুক্তহস্তে নমস্কার করিতে হয়।

সরকারী বাস-এর ব্যবস্থা ভাল। ইহা সময়মত ছাড়ে, অনিয়মিত ভাবে রাস্তায় দাঁড়ায় না, আর সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলে। বসিবার ব্যবস্থাও উত্তম, 'সিট' পূর্ব্বাহ্ণে রিজার্ভ করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের নামে উৎসর্গীকৃত মধ্যস্থান শৈলযুগল

ত্রিবেন্দ্রম রেল-ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতেই কন্যাকুমারিকার বাস ছাড়ে। আড়াই ঘণ্টার যাত্রা। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ সীমা দেখিবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হইয়া আছে। মনে মনে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই।

পথের চারিদিকে সবুজের শোভা-সম্ভার। সতেজ সবুজ ধানের ক্ষেত মাটির সহিত গলাগলি করিতেছে। পাশে কদলীবৃক্ষের সারি আর তার পাশে নারিকেলকুঞ্জের ঘন বিস্তার। এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে; কোনটি শৈবাল ও শস্পশ্যামল, আবার কোনটি রুক্ষ ও ধূসর। পথে কয়েকটি বাজার পড়িল; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান 'নাগের কয়েল'। এখান হইতে মাদ্রাজের 'টিনেভেলি' জেলার সদর টিনেভেলি শহরে যাইবার রাস্তা আছে।

ক্রমে বাস কন্যাকুমারিকার নিকটবর্ত্তী হইল। এদিকে-ওদিকে দুই-একটি বাড়ী। তার পর ছোট ছোট দোকান—চড়াই রাস্তা; প্রায় পোষ্ট আপিসের কাছাকাছি আসিয়া চড়াই শেষ হইয়াছে। সেই চড়াইয়ের সীমায় পৌঁছিয়া যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়। সম্মুখে ভারত-মহাসাগরের উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস, বামে বঙ্গোপসাগরের আবর্ত্ত। আর লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দক্ষিণে আরব সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। অবশ্য মহাসাগর, সাগর আর উপসাগরের সীমারেখা কোথাও নাই—এক দর্শকের মনে ছাড়া। সম্মুখে ঢালু রাস্তা সোজা গিয়া যেন সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পাশেই দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির; তারপর বিখ্যাত স্নানের ঘাট—মাতৃতীর্থ।

সরকারী বাস সরকারী হোটেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। আমাদের এখানেই থাকিবার কথা। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে ঘর ঠিক করা হয় নাই। হোটেলে সাধারণতঃ

কন্যাকুমারিকায় আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত

ভিড় বেশী হয় না। কিন্তু এখন ছুটির সময়। এখান-ওখান হইতে কয়েকটি পরিবার ছুটি কাটাইবার জন্য কন্যাকুমারিকায় আসিয়া জুটিয়াছে। তথাপি ভাগ্যক্রমে একখানা ঘর জুটিয়া গেল। হোটেলের ব্যবস্থা ভাল। বিজলীবাতি ও পাখা আছে—হোটেলের নিজের ডায়নামোতে চলে। তবে স্নানের জলের অভাব।

হোটেল ছাড়াও এখানে একটি সরকারী ডাকবাংলো আছে। আর আছে একটি বেসরকারী হোটেল ও ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালায় যাত্রীর ভিড় যথেষ্ট।

কন্যাকুমারিকা একটি ছোট গ্রামবিশেষ। গ্রামে বাজার নাই—অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি দোকান আছে। দশ মাইল দূরবর্ত্তী 'নাগের কয়েল'-এ সমস্ত দরকারী জিনিষ পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সুমিষ্ট আনারস। বহুপ্রকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য বড়টিকে অখাদ্য বলিয়া মনে হইল।

কন্যাকুমারিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্য সত্যই মুগ্ধ করে। তিন দিক ঘেরিয়া অগাধ জলরাশি। তীরে মাঝে মাঝে সমুন্নত নারিকেলকুঞ্জ। তীর হইতে একটু দূরে সমুদ্রের মধ্যে উন্নতশির উপলখণ্ড। সুদূর দিক্‌চক্রবালে মেঘের আড়াল হইতে প্রভাতে দিনমণির আত্মপ্রকাশ আর সন্ধ্যায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে তাহার আত্মবিলোপ; এই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যে একবার দেখিয়াছে সে আর তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম না হইতে পারিলে এই সৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে উপভোগ করা সম্ভব নহে। এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ভাবে সমাহিত হইয়াছিলেন। মাতৃতীর্থে অবগাহন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সাগরগর্জন উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে দুইটি সমান আকারের উপলখণ্ড উন্নতশিরে স্বামীজীর নাম এখনও বহন করিয়া রাখিয়াছে।

কন্যাকুমারিকা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম। সমুদ্রের তীরে দেবী কন্যাকুমারিকার মন্দির। দক্ষিণাপথের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এই মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মন্দির দ্রাবিড়-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বহন করিয়া রাখিয়াছে। দেবীর মূর্ত্তি কালো পাথরে নির্ম্মিত। অপূর্ব্ব তাহার সৌন্দর্য্য ; সর্ব্বদেহে লাবণ্য যেন মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে। দ্রাবিড়-সভ্যতার ভাস্কর্য্য-শিল্পের স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা এই মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায়। দেবী কন্যাকুমারীর কল্পনাটিও চমৎকার।

দেবী কন্যাকুমারী ছিলেন স্বর্গের অপ্সরা। দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে তাঁহার বাসনা হয়। তিনি মহাদেবকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন। কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। তিনি বলেন যে, মহা-দেবের পত্নী হইতে হইলে যে শারীরিক ও মানসিক ঐশ্বর্য্য থাকা উচিত তাহা তাঁহার নাই। সেজন্য তপস্যার দরকার।

দেবী কুমারীর মন্দিরে যাইবার রাস্তা

দবী কন্যাকুমারী তপস্যা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাদেব তাঁহাকে তাঁহার আবাস কৈলাস হইতে যতদূর সম্ভব রে গিয়া তপস্যা করিতে বলেন। ফলে, দেবী কুমারী ারতের শেষপ্রান্তে আসিয়া তপস্যায় মগ্ন হন। আকাঙ্ক্ষিত ত হইতে বহুদূরে থাকিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা ক দুরূহ সাধনা। সেই সাধনা, সেই তপস্যাই দেবী কুমারীর। বীর সে সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় নাই—মহাদেবের আশীর্ব্বাদ াভ এখনও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই।

আরতির সময় দেবী কুমারীকে সুন্দর বেশে সাজান হয়। ত পরিবেশটি অপূর্ব্ব একটি কাহিনীর মত মনে হয়। দর্শকের লে মন্দির ভরিয়া যায়। মনে মনে তাহারা দেবী কুমারীর ই কৃচ্ছ্র সাধনার উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করে। দেবীর মহাদেবী ইবার সাধনা যাহাতে সিদ্ধ হয় তাই তাহারা কামনা রে।

মন্দিরের মধ্যে অতীত ভারতবর্ষকে পুনর্বার যেন ফিরিয়া পাওয়া যায়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেবালয়ে ঠিক যে প্রকারে দেবীর পূজা হইত এখনও পূজা সেইরূপেই হয়। পূজার বিধি বা পদ্ধতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবশ্য একথা দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক দেবালয় সম্বন্ধেই খাটে।

দেবী কন্যাকুমারী

'মাতৃতীর্থে' পুণ্যস্নান হিন্দুর বহু আকাঙ্ক্ষিত। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিলেন। সেই পাপ [হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি এই তীর্থে স্নান করেন। সেই স্নানপুণ্যে তাঁহার মুক্তি হয়। মাতৃতীর্থে স্নান তাই "সর্ব্ব-পাপৈঃপ্রমুচ্যতে"—সকল পাপ হইতে মুক্ত করে।

মাতৃতীর্থে অবগাহনের স্থানটি বড়ই মনোরম। উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে হইলেও ঘাটের চারিপাশ উপলখণ্ডে ভরা। ঘাটে ঢেউয়ের আঘাত লাগে না, আর লাগিলেও তাহার প্রচণ্ডতা থাকে না। ঘাটের সিঁড়ি বাঁধানো ; মনে হয় পুকুরেই স্নান করিতেছি। ঘাটের উপরে বসিবার জন্য একটি গোলাকৃতি চত্বর আছে—তাহার ছাদ পাথরের। বহু দূর হইতে চত্বরটি দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কন্যাকুমারিকা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। লোকসংখ্যা অল্প ; বসতিও ঘন নহে। অধিবাসীরা দরিদ্র। তাহাদের উপজীবিকা—ছোটখাটো ব্যবসায় ও কৃষি। অল্প কিছু মৎস্যজীবীও আছে। ভাষা তামিল।

হিন্দুর মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই যেন এখানে একটি গীর্জ্জা তৈয়ারী করা হইয়াছে। গীর্জ্জাটি পুরাতন।

অশিক্ষিত ও তথাকথিত নির্যাতিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্মপ্রচার করাই নাকি ইহার উদ্দেশ্য।

মাতৃতীর্থে সমুদ্রস্নান, দেবীদর্শন, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমুদ্রবক্ষে দিনমণির উদয় ও অস্ত দেখিতে দেখিতে কয়েকটা দিন যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। হোটেলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই দাক্ষিণাত্যের লোক। একটি ইউরোপীয় দম্পতিও ছিলেন।

দেবী কুমারীকে প্রণাম করিয়া আবার ভ্রাম্যমাণ হইলাম। এবার টিনেভেলির পথে যাত্রার।

কেপ হোটেলের পাশ হইতে সমুদ্রের দৃশ্য

গোলআলু-সংরক্ষণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে গোলআলু অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে; বিশেষতঃ বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতিতে গোলআলুকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ইহার চাষের বিস্তৃতির পথে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা যথাসম্ভব দূর করাও সরকার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। আলুর চাষ ও সংরক্ষণের জন্য খুবই সাবধানতা অবলম্বন করাও উচিত। আলুর শত্রু অনেক; নানাবিধ পোকা ও রোগ আলুর খুবই ক্ষতি করে। কেবল যে এই সকল পোকা ও রোগ ক্ষেতে আলুর অনিষ্ট করে তাহা নহে, আলু ক্ষেত হইতে উঠাইবার পর যখন গুদামে রাখা হয় তখনও ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী। সময়মত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করিলে ক্ষেতে ও গুদামে আলুর ক্ষতি অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায়। ক্ষেতে যখন আলু জন্মায় তখন হইতেই এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কি শ্রেণীর আলু কিভাবে উৎপন্ন করিলে গুদামে উহার ক্ষতির পরিমাণ কম হইবে সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। এ সম্বন্ধে পুণা জেলার কৃষকেরা খুবই পারদর্শী।

যে সকল কৃষক আলু সংরক্ষণ করিতে চান, আলুর জমিতে জলসেচন সম্বন্ধে তাঁহাদের সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই দরকার। এই বিষয়ে পুণা জেলার কৃষকদের পদ্ধতি এইরূপ: আলু চাষের প্রথম দুই মাসের মধ্যে ৮।১০ দিন অন্তর একবার আলুর ক্ষেতে জলসেচন করা হয়; পরে ছয় দিন অন্তর একবার সেচ দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে সময়মত এবং পরিমাণমত জলসেচনের ফলে জমিতে 'ফাটল' ধরে না। জমিতে যাহাতে 'ফাটল' না ধরে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, কারণ 'ফাটল' ধরিলে মাটির নিয়ের নূতন উৎপন্ন আলু বাহির হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যকিরণ ও বায়ুর সংস্পর্শে উহাদের রং সবুজ হয় এই অবস্থায় এক রকম প্রজাপতি (tuber moth) উহাদের চোখের উপর ডিম পাড়িয়া যায়।

তথাকার কৃষকদের মধ্যে এই ধারণাও প্রচলিত আছে যে, পরিমাণমত ও উপযুক্ত সময়ে সেচের অভাবে মাটির নিয়ের আলু 'গরম' হইয়া যায়; এবং এইরূপ 'গরম' আলু বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। আলুর গোড়ায় মাটি দেওয়া ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া দরকার। একটিও আলু যেন মাটির বাহিরে না থাকে। সাধারণতঃ আলুর পাতা যখন হলুদে হইয়া যায় এবং শুকাইয়া যায় তখনই আলু উঠাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু আলু গাছের ডাঁটা (haulms) সম্পূর্ণরূপে 'মৃত' হইয়া গেলে আলু যদি উঠানো হয় তাহা হইলে ঐরূপ আলুও বেশী দিন গুদামে সংরক্ষণ করা যায় না; এই ধারণাও কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইরূপ আলুতে শীঘ্রই 'পচ' ধরে। মাটিতে যখন প্রচুর আর্দ্রতা থাকে তখনই আলু উঠানো উচিত।

আলু সংরক্ষণ খুবই কঠিন ও সাবধানতার কাজ। আলু উঠাইবার পর ক্ষেতে যখন আলু এক এক স্থানে জড় করিয়া রাখা হয় তখনও তাহাদের চোখের উপর প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থাতেও আলু অনাবৃত রাখা উচিত নয়। গুদামে রাখিবার পূর্ব্বে আলু রৌদ্রে রাখিলে উহা 'উত্তপ্ত' হইয়া যায়। ইহাও আলুর পক্ষে ক্ষতিকর।

পুণা জেলার কৃষকেরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ করেন। ক্ষেতের নিকটে ঘনঘন গাছের ছাওয়া-

যুক্ত এক শীতল স্থানই আলু সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত। প্রখর রৌদ্রের সময়ে যেন সোজাসুজি ভাবে ঐ স্থানে রৌদ্র না আসে। সহজে এইরূপ স্থান পাওয়া না গেলে গাছের নীচে চালাঘর নির্মিত করা হয়। এই ঘরের চারি ধারের বেড়া মাটি হইতে এক ফুট বা দুই ফুট উঁচে থাকে, যাহাতে ঘরের ভিতর অবাধে বায়ু চলাচল হইতে পারে। বৃক্ষের বা চালাঘরের তলদেশ কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক খণ্ডটি ৪।৫ ফুট প্রশস্ত। আলুর পরিমাণের উপর খণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। খণ্ডের প্রশস্ততা পাঁচ ফুটের বেশী করা উচিত নয়। ইহার বেশী হইলে খণ্ডের মধ্য-ভাগের আলু অতি শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক খণ্ডের চারি ধারে এক হইতে দেড় ফুট প্রশস্ত এবং ছয় হইতে আট ইঞ্চি গভীর একটি জলের নালা কাটিয়া দেওয়া হয়। নালা কাটিবার সময় যে মাটি পাওয়া যায় তাহা দ্বারা নালার পাড় প্রস্তুত হয়। ইহার পর প্রত্যেক খণ্ড জলে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। দুই-এক দিন খণ্ডটি এইরূপ ভাবে রাখিলে মাটি জল শুষিয়া লইবে। খণ্ডটি সম্পূর্ণ শুখাইয়া গেলে সদ্য-উত্থিত আলু কিংবা পূর্ব্বের উঠানো আলু খণ্ডের উপর গাদা করিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ গাদা চার ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। গাদাটি একটি পাতলা নিমপাতার আবরণে আবৃত করা হয়। ইহার পর গাদাটি সম্পূর্ণ ভাবে ভিজা ঘাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে, আচ্ছাদনটি ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পুরু হইবে। আচ্ছাদনটি জলের নালার পাড়ের বাহিরে আসিয়া পড়িবে। গাদাকে ঘাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা খুবই কৌশলের কাজ। ইহা উপযুক্তভাবে করিতে পারিলে গাদার মধ্যে প্রজাপতির প্রবেশ বহুলপরিমাণে নিবারণ করা যায় এবং সংরক্ষিত আলুও 'ঠাণ্ডা' থাকে। এইরূপ ভাবে বহু গাদা পাশাপাশি করা যাইতে পারে। কখনও কখনও গাদার উপর অল্প পরিমাণ চিনি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে পিপীলিকার আবির্ভাব হয় এবং উহারা প্রজাপতির ডিম, পুত্তলি প্রভৃতি খাইয়া ফেলে।

পুণায় এই ধরণের চালাঘরে গোলআলু সংরক্ষিত হয়

ঘাসের আচ্ছাদন দিবার পর কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে গাদার ভিতরকার তাপ খুব নিয়ে যেন থাকে। সাধারণতঃ নালায় জল ভর্ত্তি করিয়া এবং তিন-চার দিন অন্তর ঘাসের আচ্ছাদনের উপর জল ছিটাইয়া দিয়া তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং গাদার ভিতরের তাপ নিয়ে থাকে। নালার জল মাটি চোয়াইয়া নিয়ে চলিয়া যায় এবং গাদার তলদেশের মাটিকে আর্দ্র ও শীতল রাখে। গাদা যদি ভাল ভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং উহার ঠিকমত তত্ত্বাবধান হয় তাহা হইলে গাদার ভিতরের তাপ ৮৫° ফ. ডিগ্রীর উপরে উঠে না। এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষিত আলু 'ঘামিয়া' যায় না, শুষ্ক এবং শীতল থাকে। নালার জল যেন গাদায় প্রবেশ না করে, কারণ তাহা হইলে জলের সংস্পর্শে আসিয়া আলু অতি শীঘ্র পচিয়া যাইবে।

বিক্রয়ের সময় না আসা পর্য্যন্ত গাদা এইরূপ ভাবেই রাখা হয়। কিন্তু কোন কোন কৃষক মাঝে মাঝে গাদা খুলিয়া দেখেন এবং গাদার মধ্যে যদি কোন আলুতে পচ ধরে তবে তাহা বাছিয়া ফেলিয়া দেন। দেখা গিয়াছে, এই ভাবে আলু সংরক্ষণ করিলে তিন মাস, এমন কি ইহার বেশী সময় পর্য্যন্ত ইহা ভাল অবস্থাতেই থাকে।

বিগত যুদ্ধের সময় উপরোক্ত প্রণালীতে আলু সংরক্ষণ করিয়া "ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট"কে সরবরাহ করা হইত। ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম ছিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈরাগ্যের বাণী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তখন অধ্যাপনা করতাম শান্তিনিকেতনে। ইংরেজী ছাব্বিশ কি সাতাশ সাল হবে। গুরুপল্লীতে যাবার রাস্তায় আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে কবির শিলাইদহের জীবন সম্পর্কে যে কথা হয় তা স্মৃতির ভাণ্ডারে আজও জমা আছে। নন্দলালবাবু বলেছিলেন, কবির সঙ্গে একবার তিনি শিলাইদহে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়ে ভোরে উঠে এক দিনও তিনি দেখেন নি কবিকে বিছানায় শুয়ে থাকতে। কোন্ ভোরে উঠে কবি কাজ সুরু করে দিয়েছেন। বেশ মনে আছে নন্দলালবাবু এই প্রসঙ্গে পুষ্পিত পাদপের কথা এনেছিলেন। গাছ ফুলে ফুলে কত সুন্দর! এই ফুল ফোটানোর পিছনে রয়েছে ভিতরে ভিতরে গাছের সুকঠিন তপস্যা। এই তপস্যা চলেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কবির তপস্যার দিকটাও খুব অল্প লোকেই জানত। শিলাইদহের আর সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে তিনি ডুবে আছেন। কেবল বাইরে থেকে যারা তাঁকে দেখেছে তারা ভাবতেও পারত না কি বিরাট তপস্যার আগুন ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার পিছনে।

নন্দলাল কবির যে-তপস্যার কথা আমাকে বলেছিলেন সেই তপস্যায় কবি বিশ্বাস করতেন। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—নৈবেদ্যের এই পংক্তিটি আউড়ে অনেককে বলতে শুনেছি, আত্মপ্রকাশের জন্য কঠিন তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন আছে বলে কবি বিশ্বাস করতেন না। যে শুষ্ক বৈরাগ্যচর্চ্চা জীবনকে অস্বীকার করে, উড়িয়ে দেয় এই জগৎকে মায়া বলে তাকে তিনি নিশ্চয়ই সন্দেহের চোখে দেখতেন। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এ তো ছিল কবিরই কথা। তিনি ছিলেন জীবন-পূজারী—মুক্ত, শুদ্ধ পূর্ণ জীবনের পূজারী। এই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ জীবনের গৌরবে পৌছান সম্ভব শুধু ত্যাগের মধ্য দিয়ে—এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় ছিলেন। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তাদের পথকে কবি যেমন স্বীকার করতে পারেন নি, তেমনই স্বীকার করতে পারেন নি তাদের পথকে যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি হয়ে অরূপের রূপের লীলাকে কেমন করে তিনি অস্বীকার করতে পারতেন? সৌন্দর্য্যকে, ভোগকে, আনন্দকে কখনই তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন আনন্দলোকে উপনীত হবার জন্য নিরাসক্ত হওয়ার বিপুল প্রয়োজনকে। নিরাসক্ত হতে পেরেছে যারা, কবির ভাষায়, 'তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে।' আত্মপরিচয়ে কবি অনমুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন:

> "ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়।"

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এই কথা যে কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল তিনি কিন্তু আসক্তিকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। ভোগকে লোভ থেকে এবং সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে উদ্ধার করবার কথাই তাঁর সাহিত্য আমাদিগকে বারংবার শুনিয়েছে এবং সেইজন্যই তাঁর সাহিত্য অনায়াসে মহৎ সাহিত্যের স্তরে গিয়ে পৌছেছে।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি তাঁর *A Study of History*'র এক জায়গায় লিখেছেন:

> **We have now, perhaps, established the truth that ease is inimical to civilisation.**

মানুষের সভ্যতার আর প্রগতির পথে আরাম যে প্রচণ্ডতম বিঘ্ন—এই কথাটা টয়েন্‌বি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন এবং আপন উক্তিকে ইতিহাসের নানা নজির দিয়ে প্রমাণিতও করেছেন। রবীন্দ্রনাথেরও একই কথা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ জনৈকা শিষ্যাকে লিখেছিলেন: "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন?" বিবেকানন্দের অভিযান জড়তার এবং আরামপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁর কণ্ঠে দুঃখের, সংগ্রামের আর মহাবীর্য্যের জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মতই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন, দুঃখবরণের ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আসে নবজীবনের প্লাবন। তাই জাতিকে অমৃতের তীরে পৌছে দেবার জন্য তার কানে তিনি শোনালেন মরণের জয়গান।

> "কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ?
> ঐ উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
> অমর মরণ রক্ত চরণ
> নাচিছে সগৌরবে।"
>
> রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশ ও সংকল্প

মৃন্ময় ভুবনকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে ছিল আনন্দের মন্ত্র,জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল এবং প্রচুর। যে-দীপ্ত মুক্ত মহাজীবন তিনি কামনা করেছিলেন নিজের জন্য—জাতির জন্যও তাই কামনা করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি যখন জীবনের আহ্বানে দিক থেকে দিগন্তরে চলেছে তখন তাঁর স্বদেশ-কর্মকীর্তিহীন হয়ে পড়ে থাকবে পথের এক পাশে—এই চিন্তা কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু প্রগতি সম্ভব শুধু চলার মধ্য দিয়ে। কোথায় সেই বীরের দল যারা চলবার সাহস রাখে জানা থেকে অজানায়, কূল থেকে অকূলে, বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলরাশি থেকে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুল বক্ষে? সমাজের প্রবীণ 'পাকা'দের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না—একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। বিবেকানন্দের মতই তিনি নবীনদের কাছে পাঠালেন তাঁর দুর্জ্জয় আহ্বান। তাদের ভবিষ্যৎ খুব নিরাপদ—এমন মিথ্যা আশার কথা তাদের তিনি শোনালেন না। বাপ-পিতামহের প্রতিধ্বনি হবে না যারা, পুঁথির কথা না কপচে যারা বলবে উল্টো কথা তাদের নিন্দা দেশে দেশে রটবেই, তাদের বিপদ পদে পদে ঘটবেই। রবীন্দ্রনাথ তাই জাতির যৌবনকে শোনালেন শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদের কথা। 'ফাল্গুনী'তে সর্দ্দার বলেছে 'সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দ্দারি'। দেশের আসল 'সর্দ্দার' তো কবিরাই। কবি হুইটম্যানের ভাষায় কবি হচ্ছেন "The leader of leaders"। কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা পায় ভাব থেকে আর এই ভাবসম্পদ জাতিকে দান করে কবিদেরই রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈপ্লবিক ভাবের প্রেরণা দিয়ে স্বদেশের যুবসমাজকে পরিচালিত করেছেন সঙ্কট থেকে সঙ্কটে যেখানে নেই ঘরের আরাম, নেই নারীকণ্ঠের প্রেমগুঞ্জন, নেই বন্ধুজনের প্রশংসা, নেই লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ।

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এই কথা যাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তিনি কিন্তু কচকে দেবযানীর ভুজবন্ধনের মধ্যে কিছুতেই বাঁধা পড়তে দিলেন না। পুরুষকে তিনি নারীমায়া থেকে মুক্ত রাখলেন দেবতাদের সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করবার জন্য। কচের কথাগুলি কি চমৎকার, কি মর্ম্মস্পর্শী!—

> আমার যা আছে কাজ
> সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
> যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
> যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
> চির তৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম,
> সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
> সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
> এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
> নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
> সার্থক হইবে, তার পূর্ব্বে নাহি মানি
> আপনার সুখ।

'চতুরঙ্গের' শচীশকেও তিনি ঘর বাঁধতে দেন নি। দামিনীর যৌবন শচীশের বিবাগী মনকে টানতে পারে নি বাসরঘরের চতুঃসীমানার মধ্যে। দামিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধল শ্রীবিলাস, শচীশ নয়। বিবেকানন্দের বীরবাণীতে আছে: 'আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান, দূর কর নারীমায়া।' বিবেকানন্দ অবিবাহিত জীবনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। দেশে দেশে সত্যের জন্য লড়াই করবে যারা, স্বদেশকে যারা জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে তারা হবে সর্ব্বত্যাগী তপস্বী। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মত ডাক দিয়েছিলেন তাদের যারা ঘর বাঁধবে না, আরাম খুঁজবে না, নাম চাইবে না, তপস্যার মধ্যে যারা ডুবে থাকবে, যারা দেশবাসীর সম্মুখে আনবে নিষ্কাম পুরুষের সুদৃঢ় শক্তিরূপ। তাঁর 'তিন সঙ্গী' আসল রবীন্দ্রনাথকে চেনবার পক্ষে দীপশিখার কাজ করবে। এই গল্পের নায়ক নবীনবাবু নায়িকা অচিরাকে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদের সৃষ্টি কেন। উত্তরে অচিরা বলেছে:

> "বারো আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি, যারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেয়েছির মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়।...যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী; তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে দুটো-একটা করে।"

মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্যার মধ্য দিয়ে—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ শুনিয়ে গেছেন নূতন ভারতবর্ষের কর্ণ-কুহরে। স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে বর্ব্বর মানুষ হবে দেবতা—এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের বাণী। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। ভারতের উপনিষদ্ জীবনকে অস্বীকার করতে বলে নি, বরং বলেছে জোরের সঙ্গে বাঁচতে। এই বাঁচার আনন্দকে অনুভব করবার জন্যই মনকে নিরাসক্ত করবার দরকার আছে আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নিরাসক্ত যৌবনেরই জয়গান। নিজে যিনি তপস্বী ছিলেন তপস্যার প্রয়োজনকে তিনি বারংবার স্বীকার করে গেছেন ব্যষ্টির এবং সমষ্টির জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করবার জন্য।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৮-১৯০৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের কি বিচিত্র গতি! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালা বাঙালী গল্প-পিপাসু পাঠকসমাজকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছিল, বাংলার অন্তঃপুরের সহস্র সহস্র পাঠিকার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী হইয়াছিল, আজ মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে আমরা তাঁহার নামমাত্র আর শুনিতে পাই না। কালের নিকষে যোগেন্দ্রনাথের রচনা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একদা সাময়িকভাবে সেগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বাংলার সাহিত্য-সাধক সমাজে তাঁহাকে আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। সাময়িকপত্র-জগতে যোগেন্দ্রনাথের 'কল্পনা' স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও স্মরণীয়।

বংশ-পরিচয়: জন্ম

১২৬৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫৮) মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ যখন ছয় মাসের শিশু, সেই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়।

বিদ্যাশিক্ষা

যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পিতৃব্য প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া নয় বৎসর বয়সে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করিয়া এফ. এ. শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

পাঠদশা হইতেই যোগেন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সাময়িকপত্র পরিচালনে ব্রতী হন। তাঁহার পরিচালিত তিনখানি সাময়িকপত্রের কথা আমরা জানি; সেগুলি—

'সুধাকর': ইহা একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, ১২৮৪ সালের ভাদ্র (১৮৭৭, আগষ্ট) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সুধাকর' প্রকাশ করেন যোগেন্দ্রনাথ; সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

'কল্পনা': মাসিক পত্র; ইহাও যোগেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত; সম্পাদন করিতেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ বর্ষের (১২৯৬ সাল) পত্রিকায় সম্পাদকরূপে যোগেন্দ্রনাথেরই নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

'অবকাশ': ১২৮৮ সালের মাঘ (ইং ১৮৮২) মাসে কল্পনা-কার্য্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নামের একখানি "নবন্যাসপূর্ণ মাসিকপত্র" প্রকাশিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কথাশিল্পী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা কয়েকখানির উল্লেখ করিতেছি:—

১। প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা (ইং১৮৮৬), ২। প্রণয় পরিণাম (১৮৮৭), ৩। ভণ্ড দলপতি দণ্ড (প্রহসন, ১৮৮৮), ৪। ক'নে বউ (১৮৯০), ৫। বিমাতা (১৮৯৩), ৬। স্ত্রী ও স্বামী (১৮৯৪), ৭। বড় ভাই (১৮৯৪), ৮। কলঙ্কিনী (১৮৯৫), ৯। আমাদের ঝি (১৮৯৫), ১০। উন্মাদিনী (১৮৯৬), ১১। প্রসন্নকুমারের উইল (১৯০০), ১২। চা-কুলীর আত্মকাহিনী (১৯০১), ১৩। জঙ্গলী মেয়ে (১৯০২), ১৪। প্রতিশোধ (১৯০৪), ১৫। পাহাড়ী বাবা (১৯০৬), ১৬। খুড়ী-মা (১৯০৭), ১৭। শোভাসিংহ (১৯০৮)।

মৃত্যু

১৯০৯ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি (১৬ মাঘ ১৩১৫) যোগেন্দ্রনাথ, ৫১ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'জন্মভূমি' দীর্ঘ শোক-সংবাদ লিখিয়াছিলেন; উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের আর একটি নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।...তাদৃশ উদার প্রকৃতি সজ্জন বন্ধুবৎসল পরোপকারী নির্ম্মলস্বভাব সজ্জন বন্ধু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।...জাতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে তিনি ক্রমান্বয়ে ২৪ খানি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সকলগুলিই সুপাঠ্য, বিশেষতঃ 'ক'নে বউ' ও 'খুড়ী-মা' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গীয় সমাজকে তিনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন, তৎপ্রণীত সামাজিক উপন্যাসগুলি প্রকৃত প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, সমস্ত পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত।...তাঁহার বিয়োগে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-সংসার নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন, আমরাও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।" (পৌষ ১৩১৫)

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নবজাগরণ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, ভিয়েৎনাম (ইন্দোচীন) ইন্দোনেশিয়া (ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—এই সাতটি দেশ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গঠিত। কাহারও কাহারও মতে সিংহলকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যাধিকারী বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র শ্যামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাঁকিয়া বসিয়াছে। ১৭৯৬ সালের ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে হল্যাণ্ড ফরাসীপক্ষে যোগদান করে। ফলে হল্যাণ্ডের অধিকৃত সিংহল দ্বীপ ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৮৫ সালে সংঘটিত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লয়। ১৮৮৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে—প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯১০ সালের মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়। ১৮৮৪ সালে ফরাসীরা টংকিন এবং আনাম অধিকার করে। ১৮৯৩ সালে শ্যামরাজ তাহাদের হস্তে লাওস অর্পণ করেন। ইহার পর ১৯০৭ সালে ফরাসীরা কাম্বোডিয়া এবং কোচিন চীন অধিকার করিয়া লইল। এই ভাবে সমগ্র ভিয়েৎনাম ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হইল। ১৮৮৮ সালে বোর্ণিও দ্বীপে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। ঐ বৎসর স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের জাতীয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গ্রাস করে। ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে শ্যামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা তাহারও ছিল না।

বিশ্ব-অর্থনীতি ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপন্ন রবার এবং আহৃত টিনের যথাক্রমে নয়-দশমাংশ এবং সাত-দশমাংশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সরবরাহ করিত। খাদ্যশস্যের দিক হইতে এশিয়ার যে সমস্ত দেশ ঘাটতি অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া তাহাদিগকে চাল যোগাইত। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলে প্রচুর চা, চিনি এবং তামাক উৎপন্ন হইত। বিশ্বের কুইনাইন এবং মসলার মোট চাহিদার খুব বড় একটা অংশও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াই মিটাইত। এই অঞ্চলের আরণ্য এবং খনিজ সম্পদও উপেক্ষা করিবার মত নহে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কোথাও জাগরণের সাড়া তেমন ভাবে অনুভূত হইত না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইত যে, সাম্রাজ্যাধিকারী শ্বেতজাতিপুঞ্জ বহুকাল নির্ব্বিবাদে এই অঞ্চলে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সময় হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল।

এক দিন না এক দিন পরাধীন জনগণের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। শাসকগোষ্ঠী যদি অধীন জনগণকে বিশ্বাস না করেন, যদি তাহাদিগকে ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করিয়াই চলেন, যদি কোনদিনই তাহাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে না করেন, তবে শাসিত জাতি যত নিরীহ, নির্ব্বিরোধ এবং শান্তিপ্রিয় হউক না কেন, এক দিন না এক দিন তাহারা অবশ্যই স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট হইবে। কূটনীতি এবং বাহুবলের সহায়তায় কিছুকাল তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা যায় সত্য, কিন্তু বাহুবল এবং কূটনীতিদ্বারা প্রভুত্ব কায়েম করা চলে না। জাগ্রত জনগণের রোষ-বহ্নি শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, বিপ্লবের অগ্নিশিখায় আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। বিদেশী শাসনাধীন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সরকারী নীতি শ্বেতাঙ্গ শাসক জাতিসমূহ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়া তাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। নীতি নির্দ্ধারণে দেশবাসীর মতামত গ্রহণ করা দূরের কথা, মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতির মধ্যেই যে তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল, সে-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

নিজেদের প্রয়োজনে বিদেশী শাসকবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা কতকটা বিস্তারলাভও করিয়াছিল। এই শিক্ষাবিস্তারের পূর্ব্বে এশিয়াবাসী মনে করিত যে, যে শক্তিবলে শ্বেতজাতি সমগ্র জগতে প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কোন দিনই এশিয়াবাসীর আয়ত্তে আসিবে না। কিন্তু

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ এশিয়াবাসী পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে শ্বেতজাতির শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রবল জাতীয়তাবোধই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে দুর্জয় শক্তিতে শক্তিমান করিয়াছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এশিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিগত করিতে পারিলে সেও পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইবে এবং পাশ্চাত্য সমাজে তাহার সমকক্ষতার দাবি স্বীকৃত হইবার পথে কোন বাধাই থাকিবে না। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার ফলে এশিয়াবাসী আবিষ্কার করিল যে, জাতীয়তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত জাতি অসাধ্যসাধন করিতে সক্ষম। এই নবলব্ধ জ্ঞান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাগরণে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ন্যায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথম জাতীয়তার উন্মেষ হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেন। অতীতের পুনরুজ্জীবনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। অন্যেরা আবার স্ব-স্ব মাতৃভূমিকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জাতীয়তার নবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বহু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াবাসী প্রথম প্রথম শাসকজাতিকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষের গোখলে, ফিলিপাইনের ডাঃ রিজল এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাজনৈতিক সংস্থা 'বোদি উতোমো'র প্রতিষ্ঠাতারা এই পর্য্যায়ে পড়েন। ইহারা কেহই বিপ্লবের আদর্শে আস্থাবান ছিলেন না এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অনেককিছু শিক্ষা করিবার আছে। শাসক জাতির সদিচ্ছা এবং উদারতা সম্বন্ধে তাঁহারা কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না এবং বিশ্বাস করিতেন যে, সংস্কারের পথেই তাঁহারা এক দিন স্বাধীনতা লাভ করিবেন। কিন্তু এই ভুল ভাঙিতে বেশী দিন লাগে নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশী শাসক কোন দিনই স্বেচ্ছায় স্বীয় শাসনাধীন দেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মালিক বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে উদার মনোভাবসম্পন্ন দু'চার জন পরাধীন দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও একথা বুঝিতেন না যে, উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতাই ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জাতীয়তাবোধের বিকাশ ব্যতীত স্বাধীনতালাভ সম্ভব নহে। এই বিকাশের জন্য গণজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদিগণ কিছু দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন যে, গণ-সমর্থন এবং গণ-সংগঠন ব্যতীত তাঁহাদের স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। জন-সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় সংগঠনের ফলে সরকারের সহিত সংঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী একথা বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী রহিল না।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াবাসী যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। তদুপরি সমষ্টিগত ভাবে তাহাদিগকে শ্বেতজাতির তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করা হইত। এইজন্য তাহাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে সর্ব্বদাই ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইত। এই প্রতিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলম্বিত হইত। যে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর প্রতীকারের ভার ন্যস্ত ছিল, তাহার উপর জনসাধারণের কোন প্রভাবই ছিল না।

শাসক এবং শাসিত উভয়ের বাস্তববোধের অভাবে ঔপনিবেশিক সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইঁহারা সকলেই অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেন। ফলে বহু ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা তাহার জটিলতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইজন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই চরমপন্থী হইয়া উঠিল। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এশিয়াবাসী বুঝিল যে, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত প্রগতির পথ চিরদিনই বিঘ্নসঙ্কুল থাকিয়া যাইবে। বহু জাতীয়তাবাদী সহিংস আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন যে, একমাত্র সমাজবাদ বা সাম্যবাদই তাঁহাদের যাবতীয় দুর্গতির অবসান ঘটাইবে। অন্যেরা আবার অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্ম্মান্ধতা এবং বহির্জগতের প্রতি বিদ্বেষের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় এশিয়ার সর্ব্বত্র জাগরণের বেগ ও তীব্রতা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নিস্তরঙ্গ রাজনৈতিক জীবনেও ইহার ফলে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগিয়াছিল। ১৯০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর কতিপয় ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীর মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (বোদি উতোমো—মহান প্রচেষ্টা) সংগঠিত হয়। প্রথম দিকে ইহার কোন রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। বোদি উতোমোকে গণ-প্রতিষ্ঠান মনে করা ভুল হইবে। বহু বৎসর পর্য্যন্ত প্রধানতঃ শিক্ষিত যবদ্বীপবাসিগণই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে এবং

প্রধানতঃ ইহারই ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রগতিশীল জনমত এই সংস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠী পরাধীনের মুক্তি-কামনাকে উপেক্ষা করিয়া যুগধর্ম্মের বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন—অন্ততঃ মুখে বলিলেন এবং এখনও বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিলে উপনিবেশগুলির সর্ব্বনাশ হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতিরই যে ভুলের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া লইবার অধিকার আছে এই ঐতিহাসিক সত্য তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন। ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অতি দ্রুত দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই বিক্ষোভের বিশেষ কোন বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তরুণ সম্প্রদায় গতানুগতিকতার মোহমুক্ত হইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের স্বপ্নে মশগুল হইয়া পড়িয়াছিল।

শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা, কর্ম্মকুশলতা এবং সামরিক শক্তিতে আস্থা বিদেশী শাসনের প্রধান ভিত্তি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত্তিকে একেবারেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বিজয়দৃপ্ত জাপ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। স্ব-স্ব শাসনাধীন জনগণকে নিদারুণ সঙ্কট এবং দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়া বিদেশী শাসক 'যঃ পলায়তে সঃ জীবতি' নীতি অনুসরণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া-বাসীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহাদের শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাহারা বুঝিল, বিদেশী শাসনের ফলে আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারাইয়া তাহারা হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পূর্ব্বেই অভিযোগ করিয়াছিলেন—ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়া নির্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ সাফল্য এবং মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের চাঞ্চল্যকর সামরিক বিপর্য্যয় শ্বেত-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা যে একান্তই ভিত্তিহীন চোখে আঙুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিল।*

কেবল তাহাই নহে। এশিয়ার একমাত্র সাম্রাজ্যাধিকারী শক্তি জাপানের আক্রমণ হইতে মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদ নিজেদের আশ্রিত জাতিসমূহকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের এই অসামর্থ্যকে জনগণ বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করিল। শ্বেত এবং পীত শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা এই শিক্ষালাভ করিল যে, ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ এবং নিপীড়নেরই নামান্তর। সাম্রাজ্যাধিকারী জাতিগুলি এত কাল বলিত যে—এখনও সুযোগ পাইলেই বলিতে ছাড়ে না—তাহারা স্ব-স্ব উপনিবেশের অনুন্নত, দুর্ব্বল অধিবাসীদিগের ন্যাসরক্ষক মাত্র এবং বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট গুরুকর্ত্তব্য পালন করিবার জন্যই তাহারা উপনিবেশগুলির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে; ইহার পশ্চাতে কোন স্বার্থবুদ্ধি নাই। কিন্তু এই ধাপ্পা আর টিকিল না। আর এই ভুল ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খল খুলিয়া পড়িতেছে।

দূরদর্শী চিন্তানায়কগণ আগেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইবার কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর মিঃ সামনার ওয়েলস একটি ভাষণে বলেন যে, মানুষমাত্রই যে স্বাধীন এবং সে যে কাহারও তুলনায় হীন নহে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিবার দিন আসিয়াছে। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় মানবজাতির বন্ধন-মোচন করিবে। সাম্রাজ্যবাদের দিন চলিয়া গিয়াছে। জন-গণের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত উপনিবেশই স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু এখনও হাল ছাড়ে নাই। ইংরেজ ও ফরাসী আজও মালয় এবং ভিয়েৎ-নামে ভিন্ন রূপে এবং ভিন্ন নামে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। জাগ্রত জনসাধারণ এই শাসনের অবসান ঘটাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এই দুইটি দেশের বর্ত্তমান গোল-যোগকে যে নামই দেওয়া হউক না কেন, তাহা যে মুখ্যতঃ মুক্তি-সংগ্রাম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* ". . . the nature of defeats suffered by the Western nations in 1942 dealt a final blow to any concept of white superiority that still remained."—*Time for Decision* by Sumner Wells, p. 238.

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

দীপাদের বাড়ী থেকে বেরুতেই অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। ওর হাত ধরে অমলেন্দু গলির অন্ত প্রান্তে টেনে নিয়ে এল। বললে, সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। খবর আছে।

খবর? কিসের?

কালোবাজারীর। চুনোপুঁটি নয়—একেবারে রুই-কাতলা।

খবরটা শুনেও প্রভাত বিশেষ উৎসাহিত হ'ল না। বললে, রিপোর্ট যথাস্থানে পাঠিয়েছ?

তোমাকে না জানিয়ে—

আমি পরে জানলেও ক্ষতি হ'ত না।

অমলেন্দু বললে, ব্যাপারটা হাতে-নাতে ধরার মত নয়। ফাঁদ পাততে হবে। একটু থেমে বললে, তা ছাড়া তোমার মতামত না নিয়ে—

কেন অমল? ওর ইতস্ততঃ ভাব দেখে প্রভাত বিস্মিত হ'ল।

কারণ আরও ঘন হয়ে দাঁড়াল অমলেন্দু। গলা আরও নামিয়ে বললে, তুমিও ত যাতায়াত করছ এতদিন—কোন সন্দেহ হয় নি?

কোথায় যাতায়াত করছি? কিসের সন্দেহ? বিস্ময়ে প্রভাত বেশী কিছু বলতে পারলে না।

মানে—এই ইয়ে, একটা ঢোক গিলে অমলেন্দু এক নিঃশ্বাসে বললে, এই যে গলির মধ্যে উড়ে-বস্তি উড়িয়ে তিন-তলা প্রাসাদ খাড়া হ'ল—এর গোড়াকার কথা জানবার জন্ত কোন দিন কৌতূহল হয় নি তোমার? এই বাজারে যারা হঠাৎ লাখপতি কোটিপতি হয়ে ওঠে তাদের বনিয়াদের কোন কোন জায়গায় যে অলৌকিক কিছু আছে এ সন্দেহ হয় নি তোমার?

প্রভাতের পায়ের নীচেকার পৃথিবী সহসা দু'লে উঠল। ধন সঞ্চয়ের মূলে কোন ক্ষেত্রেই কি অধ্যবসায় আর সততার সঙ্গম থাকা অবিশ্বাস্ত এই যুগে? বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের ফলে মানুষের নীতি কি আমূল বদলে গেছে? নিজের দেশ বলে—জাতি বলে—জ্ঞাতিগোত্র বলেও একটু মমতা বা সমবেদনা জাগছে না মানুষের মনে? কোথায় গেল মানুষের হৃদয়—যা কালে কালে বেদনায় বিগলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে মহত্বকে, সুন্দরকে, অনির্ব্বচনীয়কে? হৃদয়ের ওপর চেপে বসেছে মস্তিষ্ক—কূটবুদ্ধির পণ্যে ভরা মস্তিষ্ক, যার বিচারে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য-সঞ্চয় ব্যতীত আর সব সঞ্চয় অকিঞ্চিৎকর। স্থূল ঐশ্বর্য্য—জাগতিক সুখসুবিধাগুলিকে যার দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব।

প্রভাত বললে, সন্দেহ হয়—সন্দেহ ভঞ্জন কয়। কিন্তু আমি ত জানি না—

বাধা দিয়ে অমলেন্দু বললে, আলোর নীচের সবচেয়ে বেশী অন্ধকার, প্রভাত।

ওরা পথ অতিবাহন করতে লাগল। পথের দু'ধারে কত নূতন অট্টালিকা বা প্রাসাদ। এই সব সম্পদের অন্তরালে অকীর্ত্তির কাহিনী নিশ্চয় আছে। বিশেষ করে নয়ন-লোভন সৌধগুলির জন্ম-রহস্ত সন্দেহাতীত নয়। চলতে চলতে মনে হচ্ছে ওদের সংখ্যাও ত কম নয়। তবে কি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাধি? কোন্‌টিকে বাদ দিয়ে কোন্‌টির কথা সে ভাববে? কার দুষ্কৃতির নালিশ—কোন্ তার বিচারকের আদালতে পেশ করবে! চালে কাঁকর, আটার তেঁতুলবীচি, চিনিতে মরম পাথর গুঁড়ো, সরিষার তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ—নারিকেল তেলে হোয়াইট অয়েল, গোয়ালার দুধে গুঁড়ো দুধের ভেজাল, গুঁড়ো দুধও অকৃত্রিম নয়। শিশুর খাত হরলিক্‌স, রোগীর পথ্য বার্লি সাগুদানা, ইন্‌জেকশনের সিরাম...না—না—গলিত দুষিত পৃথিবীতে মানুষ মরণোৎসবে মেতেছে—মানুষ ধন সঞ্চয়ের নেশায় মাতাল হয়েছে। এক দিকে পরমাণু বোমা, অন্ত দিকে ভেজাল আর কালোবাজার; পাইকারী ও খুচরা হারে মৃত্যুদেবতা বিতরণ করছেন ব্যাধি। জলপ্লাবনে একদা ধ্বংস হয়েছিল সৃষ্টি, এবারও ধ্বংসের আয়োজন চলছে সুচারুভাবে। একে সময় মত রুখতে না পারলে—

অমলেন্দুর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে প্রভাত বললে, এর প্রতিকার করতেই হবে।

নূতন করে ভাবতে বসল প্রভাত। ঠিকই বলেছে অমলেন্দু—আলোর নীচের বেশী অন্ধকার। সে অন্ধকারকে আমরা চিনি অথচ ঘৃণা করি না। সেই অন্ধকার সর্ব্বাঙ্গে হারাপাত করলে একটুও বিচলিত হই না; কেননা তার আসল চেহারা থাকে জ্ঞানের অগোচরে। কিন্তু সারা দুনিয়ার লোককে সন্দেহ করবে আবার দুনিয়াকে লোককে দেখাবে সেবার আগ্রহ—এর চেয়ে পরস্পর-বিরোধী কার্য্য আর কি আছে! কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় এই বোধ ত সকলের সমান নয়। মানুষের খাবারে ভাগ বসায় যে পশু তাকে নির্য্যাতন বা হত্যা করা অধর্ম্ম নয় এক প্রদেশে—অন্ত প্রদেশে সেই পশুর দেবোচিত পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন

হয়। ক্ষতি দু' জায়গাতেই ঘটে, কিন্তু পুরাকালের এক মহতী কীর্তিকলাপের কথা স্মরণ করে মানুষের কৃতজ্ঞতা তাতে দেবত্ব আরোপ করে কৃতকৃতার্থ হয়। এমনই বিচিত্র বিধান দেশে-বিদেশে।

আজ মনের প্রসন্নতা যেন নষ্ট হয়েছে। অকারণে রূঢ়তা প্রকাশ করে দীপাদের সে আহত করেছে। সত্যাই কি তার মনের গভীরে ওদের ঐশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব সঞ্চিত রয়েছে? অথচ ওদের সঙ্গ তার ভাল লাগে। ওদের সুখ্যাতির বার্ত্তায় মন তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল কেন।...যেন এই অসম্মান ওদের মানায় না। যে কলঙ্কসাগরে আজ লাখ-পতি কোটিপতিরা ভাসছেন—দীপারা আছে তার নাগালের বাইরে। সম্পদ সঞ্চয় মাত্রই যে নরঘাতনের দুরপনেয় কালিমা-লিপ্ত নয়—এই সত্য প্রচারের দিন এসেছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে পরিহাস নয়, শাসন নয়, উদ্ধত পরুষ বাক্য প্রয়োগও নয়। সহযোগিতা—সেবার আকাঙ্ক্ষা—প্রীতি এ সব উপচার না থাকলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না মনুষ্যত্বে, এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের আগে এক মহামানব মহৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন নি কি? সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে—একান্ত দীনবেশে তিনি অপমানিত লাঞ্ছিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুষ্কৃতকারীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন নি—তাঁর ক্ষমা-সুন্দর বাণী অহঙ্কারলেশহীন আচরণের দ্বারা বুঝিয়েছিলেন...বিদ্বেষে মানুষকে ঊর্দ্ধে তুলে মহিমা প্রচার করা যায় না—জাতিত্বের মমত্ব দ্বারা চালিত হয়ে যে গৌরব রচনা করা যায়, তা না জাতির না বা সমাজের মঙ্গল সাধন করে। ভুয়া দেশাত্মবোধে জন্মায় অহেতুক ঘৃণা—নিজেকে ঊর্দ্ধে উঠিয়ে অন্যকে পায়ের তলায় নামাবার দুর্ব্বার কামনা। এই মর্য্যাদাবোধে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে—বলদৃপ্ত জার্ম্মান জাতি হয়েছে পর্য্যুদস্ত। কিন্তু সমস্যা এই, সেবার শক্তি সঞ্চয় না করে সেবার আগ্রহ দেখালে বশম্বদ দাস ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সুনয়নী বাইরের ঘরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

কি মা?

ওমা—তুই একা অন্ধকারে শুয়ে আছিস? শরীর খারাপ হয় নি তো?

না—ভালই আছি।

তবে চট করে একবার ডাক্তার বাড়ী ঘুরে আয় বাবা। ওঁর কলিকের পেনটা বেড়েছে যেন।

অ্যাঁ—কখন হ'ল?

অপিস থেকে এসেই বললেন—আজ রাতে কিছু খাব না—পেটের মধ্যে ঝিম ঝিমে ব্যথা বোধ হচ্ছে। তার পর বলতে না বলতে—

প্রভাত ছুটল পরিচিত ডাক্তার বাড়ী। অবশ্য ডাক্তারকে সে আসবার অনুরোধ করলে না—জানে অনুরোধ করবার সঙ্গতি তার নাই। ডাক্তারও জানেন সে কথা। চাকুরীজীবী—দিন-আনা-দিন-খাওয়ার দল—পারতপক্ষে ডাকে না তাঁকে। আপদে বিপদে ছুটে আসে তাঁর কাছে—পরামর্শ চায়, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়ে নেয়—একবারে ফল না হলে বার বার আসে। একজন ডাক্তারকে ডাকার অর্থ—কম করে চারটি টাকার দণ্ড বহন করা। সে অর্থ ঔষধ পথ্যে ব্যয় করলে—

অনন্তর এ ব্যাধি নূতন নয়—ব্যবস্থাপত্রও মোটামুটি জানা। তবু ডাক্তারের সম্মতি নিয়ে প্রত্যেক বারে ঔষধ আনতে হয়। গরম জলের সেঁক—আর গোটা দুই বড়ী—লম্বা একটি ঘুমের সঙ্গে যন্ত্রণার অবসান হয়।

আজ কিন্তু জলের সেঁক ও বড়ীতে কোন ফল হ'ল না—প্রভাত আবার ছুটল ডাক্তার বাড়ী।

হু—একটা ভাল ওষুধ আছে—ইনজেকশন। কিন্তু সাদা বাজারে ওষুধটা পাওয়া যাবে কি!

চেষ্টা করব।

বেশ তো—। কিন্তু ওষুধ জোগাড় করতেই হবে। বেশী-ক্ষণ এ ভাবে যন্ত্রণা পেলে হার্ট ফেল করতে পারে।

কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটল প্রভাত। কেউ বললে—ঔষধ নাই, কেউ বললে—অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে দিতে পারি—দাম বেশী পড়বে। কেউ বা বললে, আমার মশাই সোজা কথা—ফিপটি পারসেণ্ট লাভ নেব—ক্যাশমেমো পাবেন না।

কয়েক দিন আগেকার একটা বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঔষধের ন্যায্য দামের বেশী দেবেন না—ক্যাশমেমো দাবি করুন। বেশী দাম আদায়কারীদের নাম ধাম ঠিকানা জানিয়ে দিন—

যত সহজে এগুলি বিজ্ঞাপিত হয়েছে—এত সহজে অনুজ্ঞা-গুলি পালন করা সম্ভব নয়। কালোবাজারীর হাতে পড়ব না বললেই—তাদের কবল থেকে অব্যাহতি লাভ সহজসাধ্য নয়। যন্ত্রণা আর মৃত্যুকে সামনে রেখে ন্যায় পথে চলবার দুঃসাহস ক'টি লোকের থাকে। কালোবাজারে হাত মেলাতেই হবে—না হলে যন্ত্রণা তো কমবে না, মৃত্যুও আসবে এগিয়ে।

বেশী দাম দিয়ে প্রভাত ঔষধ নিলে—কিন্তু দুর্নীতি দমনে সাহায্য করবার কোন প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারলে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেও—তা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার মনোবল তার থাকবে কি করে। বিপদে সামান্য মূল্য বেশী নিয়ে যে পরম উপকার করলে—তাকে অকৃতজ্ঞের মত ধরিয়ে দেওয়া...কৃতজ্ঞ মন স্বভাবতঃই নত হয়ে পড়ে—যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস তার থাকে না।

বড় কালোবাজারীকে ধরবার প্রতিজ্ঞা করেছে প্রভাত, কিন্তু জীবনের নিত্য প্রয়োজনের অংশে ছোট কালোবাজারীরা যে ভাবে জাঁকিয়ে বসে আছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ কি! এ যুগের জীবনটাই কি দুর্নীতির ভারে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে না? ঊষর মরুভূমিতে কয়েক কলসী জল ঢেলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির মত দুষ্কর চেষ্টা চালাচ্ছে না কি প্রভাতরা—এবং প্রভাতের সমগোত্রীয়েরা?

২২

তিন দিন ধরেও কলিকের ব্যথাটা কমছে না অমলার। ব্যথাটা অবশ্য একটানা থাকছে না—কিন্তু আসছে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় আর প্রত্যেক বারের স্থিতিকালও দীর্ঘ হচ্ছে।

অমলা বলছেন, আর পারি না—একটু আফিং বেশী করে দাও—জ্বালা জুড়োই।

ডাক্তারের আশ্রয় মর্ফিয়া—তাই বার তিনেক ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রণা উপশম হয়েছে সাময়িক ভাবে। যতক্ষণ আচ্ছন্ন ভাব থাকে যন্ত্রণাটা অনুভূত হয় না, কিন্তু তার পরেই—

ডাক্তার বলেছেন—কোন বড় হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার ব্যবস্থা করতে। কেসটা অস্ত্রোপচারের—পিত্তকোষে পাথর জমেই যন্ত্রণার উৎপত্তি। পাথর অপসারিত না হলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হবে না।

ভয়ের কোন কারণ নেই তো?

আজকাল আখছার হচ্ছে। কত লোকে ভালও হচ্ছে।

সবাই ভাল হচ্ছে কি?

সুনয়নীর অবোধ প্রশ্নে ডাক্তার হেসেছেন। ভাল হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলে—

সুনয়নী মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন—সবই যখন সেই নিয়ন্তার হাত তখন তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানালে কি হয়! দৈব ঔষধাদ্য—দেবনির্দ্দেশ কত পথই তো খোলা রয়েছে। কাছে-পিঠে তারকেশ্বর আছেন—হাজার রকমের বার-ব্রত—সাধু-সন্ন্যাসী রয়েছে—এর কোন একটা কি—

এক দিন তিনি গ্রহাচার্য্যের দুয়ারে ধরণা দিলেন। বাবা এর প্রতিকার কি?

পাঁজিপুঁথি খুলে গ্রহাচার্য্য বললেন, নবগ্রহের কবচ ধারণ করাও—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাও—

ব্যয় যা হবে তা ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত। তবু একবারই হবে।

কয়েকটা টাকা আঁচল থেকে বার করে দিয়ে তিনি কাকুতি করলেন, বেশী কিছু দিতে পারব না বাবা—এই নিয়ে যা হয় করুন।

আচ্ছা—আচ্ছা—অশক্ত পক্ষে যে বিধান আছে তাই করে দেব। মনে ভক্তি আনবে—বিশ্বাস করবে—

প্রভাত শুনে বললে, টাকা ক'টা থাকলে সংসারের কাজে লাগত—

কিন্তু উনি ভাল হয়ে উঠলে—টাকার ভাবনা কি?

হাসলে প্রভাত। টাকার ভাবনা নাই সত্য—কিন্তু যে টাকা আসে মাসকাবারে—তাতে ভাবনা ঘোচে কতটুকু সময়ের জন্ত! নাই নাই রব—ধার কর্জ্জ—এ সংসার থেকে ঘুচে গেল কি কোনদিন? উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পত্তি তাকেও বর্ত্তাবে। সে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নামবে—সংসার পাতবে—সংসারের সুখসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করে দুঃখের বোঝা ভারী করবে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়ে অসংখ্য দরিদ্র রিক্তের সংখ্যা বাড়াবে মাত্র! আজ সংসারের যা অবস্থা তাতে তার উপার্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। এ সংসার তার নয় মনে করতে পারে কি সে? মায়ের উপর, ছোট ভাই বোনদের উপর, রুগ্ন বাপের উপর তার কোন কর্ত্তব্য নাই কি? আজ যদি খবরের কাগজের হকারিটিও থাকত!

প্রভাত বুঝতে পারে, অহেতুক সম্ভ্রম-বোধের বাধা না জন্মালে—কিন্তু বুঝতে পারলেই কি মিথ্যা আত্ম-সম্মান-বোধকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়। সমাজের যে স্তরে প্রভাতরা আছে—ছেলেবেলা থেকে যে আচার-আচরণে ওরা অভ্যস্ত—তার মোহ সহজে ত্যাগ করা কি এতই সহজ?

দ্বিতীয় দিন কাগজ ফিরি করার সময় সামনে পড়লেন বাবার আপিসের এক ভদ্রলোক। ওঁদের সঙ্গে প্রভাতদের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। ওর হাতে কাগজের গোছা দেখে প্রশংসাসূচক হাসির সঙ্গে বললেন, বাঃ, চমৎকার! আমি যখন-তখন ভুতো আর নেণ্টুকে (ওঁর ছেলে) বলি—দেখগে যা প্রভাতকে—হীরের টুকরো ছেলে। ভাগ্য করেছিলেন বটে অমলদা! খালি লেখাপড়াতেই নয়—লোকের আপদে-বিপদে, ভালয়-মন্দে কোথায় না আছে। তা কোথাও লাইব্রেরি করেছ, না গরীবদের বিলোবার জন্ত এত কাগজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

তিনি অবশ্য উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। আপিসের সময়—মানুষকে জিজ্ঞাসা করা চলে কেমন আছ? কিন্তু তার কুশল অকুশল শুনে নিশ্চিন্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার অবসর কোথায়!

আর এক দিন সামনে পড়লেন এক আত্মীয়। বললেন, কাগজের আপিসে কাজ নিয়েছ বুঝি? তা বেশ।

তৃতীয় দিনের আত্মীয়টি কিন্তু প্রভাতের কর্ম্মধারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, তোমার এই কাজ! ভদ্রলোকের ছেলে, নেহাৎ মুখ্যু-সুখ্যু নও—বি-এ পাস করেছ, তোমার এমন দুর্ম্মতি হ'ল কেন! বাপ আপিসের চাকরো, একটা কেরাণী-গিরিও কি জুটিয়ে নিতে পারলে না? ছি!

তারপর দিন খালি হাতে বাড়ী আসতেই লক্ষ্মী বললে, ...াজ সব কাগজ বুঝি বিক্রি হয়ে গেল ?

না—আজ কাগজ নিই নি।

কেন ?

এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—আমি সত্যিই অপদার্থ।

লক্ষ্মী খুসী-উপচানো স্বরে বললে, ভালই হয়েছে—আমি ...ত দিন ঠাকুরকে বলেছি—দাদার সুমতি দাও।

প্রভাত অদ্ভুত দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চেয়ে বললে, তোর ...াকুর ভারি জাগ্রত।

কিন্তু বসে থাকলে ত চলে না—এর পর অনেক খোঁজ ...রে প্রভাত দুটো টিউশনি নিয়েছিল। একটা শ্যামবাজারে, ...ার একটা গোয়াবাগানে। দূরত্ব বেশী নয় বলে, সন্ধ্যার ...র ঘণ্টাতিনেক সময় ব্যয় হ'ত। মাইনে এক জায়গায় ভালই —ত্রিশ টাকা। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন পড়াতে হয়। আর ...ক জায়গায় প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়, মাইনেও কম— ...তি। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ছাত্র বলে অভিযোগের অবসর কম। ...ভিযোগ অবশ্য প্রভাত করে নি—কয়েকদিন পড়ানোর পর ...দের দিক থেকেই সুরু হ'ল সেটা।

এক দিন পড়ার ঘরে এসে বসলেন ছাত্রের বাবা—খানিক ...ভার ধরণ লক্ষ্য করে বললেন, দেখ—মাষ্টার, (বয়সে বড় ...লে উনি—এই ভাবেই সম্বোধন করেন, কিন্তু প্রভাতের স্পর্শ- ...াতর মনে—এই সম্বোধনে ঠিক স্নেহের সুর বাজে না, কেমন ...ন উঁচু-নীচু ভেদের সৃষ্টি করে), ঘণ্টা মিনিট ধরে পড়ালে ...লেকে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি ? মাষ্টারের উচিত ...র কি ছাত্রকে সব পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়া ?

প্রভাত নরম গলায় বললে, সব পড়া তৈরি হলেই ত—

না মাষ্টার, কাল তুমি চলে গেলে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ...তিহাসের পড়া, ও বললে, ওটা ক্লাসে ঠিক করে নেবে।

ছাত্রের পানে তাকালে প্রভাত। ছাত্র বললে, ইতিহাস ত ...তা মুখস্থ বলতে হয় না—

বলি গল্পটাও ত জেনে রাখা দরকার। আমি যখন জিজ্ঞাসা ...রলাম, ভারতে বিদেশীরা আসত কোন্ পথ দিয়ে আর কেন ...সত—তুই হাঁ করে রইলি কেন ?

বাঃ রে—ও ত ক্লাস নাইনের পড়া—

হুঁ—ক্লাস সিক্স'এ বেমালুম ভুলে বসে আছ! পড়াটা হচ্ছে শুধু পরীক্ষা পাস করা—মনে রাখা নয়—নয় ?

প্রভাত বললে, মোটামুটি পরীক্ষা পাস করতে পারে— ...টুকুই ত তৈরি করতে হবে ছেলেদের—

ও শিক্ষা আবার শিক্ষা! হুঁ! ছেলের বাবা অপ্রসন্ন ...র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন, যাই হোক—ঘণ্টা মিনিট ...র পড়িও না, একটু কেয়ার নিয়ে—যাতে ছেলেটা কিছু ...খতে পারে—

আমার অন্য জায়গায় টিউশানি আছে, এর বেশী সময় দেওয়া ত সম্ভব নয়। প্রভাত গম্ভীর স্বরে বললে।

ছাত্রের পিতা অবশ্য মুখে কিছু বললেন না—কিন্তু কপাটের থেকে ওঁর কটু মন্তব্য শোনা গেল, আজকাল যেমন হয়েছে ইস্কুল—তেমনি হয়েছে মাষ্টার! স্রেফ্ ব্যবসা—ব্যবসা।

ইচ্ছে হ'ল এই মুহূর্তে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করলে প্রভাত। সম্মানবোধ উগ্র হলে আর্থিক অসুবিধা ঘটবেই—এই বাস্তব সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে ও।

দ্বিতীয় বাড়ীর ব্যবহার আরও বিচিত্র। এখানে ছাত্রটি উঁচু ক্লাসের—কিন্তু মেধাবী নয়। বাপের পয়সা আছে—আছে কাজ-কারবার, বিদ্যাশিক্ষা শুধু দেশ-বিদেশের বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্য। একটু শিক্ষা না থাকলে জগৎটাকে ভাল করে চিনে নেওয়া ও তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্যার সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয় বলেই—বিত্তবান ব্যবসায়ীর ছেলেটি স্বভাবতঃই বিদ্যাবিমুখ।

প্রথম কয়েকদিন ছেলেটি পড়ায় মনোযোগ দিলে—অন্ততঃ মনোযোগ দেবার ভান করালে। ঝকঝকে বাঁধানো বই—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাতা—সুদৃশ্য দামী ফাউণ্টেন পেন—চমৎকার করে সাজানো ঘর—বিদ্যা গ্রহণের আবহাওয়াটা ভাল বলেই বোধ হ'ল।

এক দিন ছেলেটি বললে, মাষ্টার মশায়—আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না—আসুন একটু গল্প করি।

কিন্তু তোমার ক্লাস—

কাল ক্লাসে না গেলেও চলবে। আচ্ছা মাষ্টার মশায়, এবার কোন টিমের কম্বিনেশন ভাল বলুন তো? ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান ?—

—আমি জানি না।

—জানেন না? ছাত্র এ ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করলে—যেন খেলার কথাটি না জানা একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধ! ছেলেটি মন্তব্য করলে—স্পোর্টস শুধু শরীর গঠন করে না—মনকে তৈরি করে। সুস্থ দেহেই সুস্থ মন—

প্রভাত বললে, আজ তা হলে পড়বে না ?

বললাম তো ভাল লাগছে না। ছেলেটি আব্দারের ভঙ্গীতে বললে।

তা হলে উঠলাম।

প্রভাতকে উঠতে দেখে ছেলেটি বললে, চলুন না কেন—এক জায়গায় ঘুরে আসি। একটা বই এসেছে—চমৎকার—বোম্বের যত সেরা ষ্টার—নামে দুর্গা খোটে—নার্গিস, দিলীপকুমার—অশোককুমার—নলিনী জয়ন্ত—

প্রভাত বললে, আমি যাচ্ছি। ও সোজা বেরিয়ে গেল।

উপর হইতে নীচে : বাম দিকে— ১। প্যান্থিয়ন, ২। একটি রাজপথের দৃশ্য ; দক্ষিণে—৩। লুভার মিউজিয়ম, ৪। প্ল্যাস ভিলা কনকর্ড

দেবেশ বলে এক বন্ধুর কাছে কথা-প্রসঙ্গে এক দিন কথাটা পাড়লে।

দেবেশ সাগ্রহে বললে, আছে এই রকম পার্ট টাইমের কাজ। করবি?

কোথায়?

আমি যে ফার্মে কাজ করি তারা একটা নতুন বিজনেস ষ্টার্ট করেছে, এক জন করেস্‌পনডেন্স ক্লার্ক চায়। দেশ-বিদেশের সঙ্গে করেস্‌পনডেন্স—রেলের সঙ্গে ক্লেম সেট্‌ল আর কম্‌স্ পূরণ, খদ্দেরদের কোটেশন দেওয়া—এমনি সব কাজ। করবি?

অনেক সময় যাবে যে!

আরে—না না, শুনতে যেমন, কাজে তেমন নয়। হদ্দ-মুদ্দ দু' ঘণ্টা, সন্ধ্যের পর। পারবি না?

দেখা যাক, পারি কিংবা হারি। প্রভাত হাসলে।

দেবেশ বললে, পারবি না কি রে? আমাদের মত নন্-ম্যাট্রিক্ররা যদি দু'শো আড়াই শো কামাই করতে পারে—

আচ্ছা রাজী।

কাজটা হাতে নিয়ে দেখলে বিশেষ কিছু শক্ত নয়, বাঁধা-ধরা নিয়মও তেমন কিছু নাই। খানকয়েক চিঠির জবাব দিতে দু'ঘণ্টাও লাগে না। মনিব অবশ্য লেখাপড়া কিছুই জানেন না—কিন্তু কোথায় কি ভাবে জবাব দিতে হবে তার নির্দেশ দেন অদ্ভুত ভাবে। আশ্চর্য্য দক্ষতা ওঁর। ব্যবসা যেন ওঁদের জন্মগত জিনিস। বিদ্যা শিক্ষার এ যেন নূতন একটা দিক। তা ছাড়া লোকটিও ভাল। প্রভাতকে আগাম কিছু টাকা দিলেন।

এত দিনে সে সংসারের প্রয়োজনে এলো। নিজেকে মনে হ'ল—সুখ দায়মুক্ত। কিসের দায় তার কাঁধে চেপে ছিল—সে জানে না—হয় তো কর্ত্তব্যবোধ—হয় তো বা পরাশ্রয়ের গ্লানির ভার। নিজের উপার্জ্জন সংসারে দিয়ে নিজেকে বেশ হাল্‌কা মনে হচ্ছে। সংসারে দেওয়া জিনিসটা সত্যিই আনন্দ আনে—আত্মবিশ্বাস বাড়ায়—নেওয়ার হীনতা থেকে বাঁচায়।

একটু সামনে উঠে অনন্ত বললেন, এইবার দেখে শুনে একটা ভাল চাকরি নে।...পাকা মত একটা আশ্রয় হোক।

না—এতেই আপত্তি প্রভাতের। পাকা মত আশ্রয়ে এসে নিজেকে বন্দী করতে সে রাজী নয়। কাজ করার আনন্দ কাজের বন্ধনের মধ্যে নয়—কোনরূপ বাধ্যবাধকতা যেন তার মধ্যে না থাকে। তার মুখের কঠিন রেখার পানে তাকিয়ে অনন্ত প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন। কি জানি কেন, কোমল অথচ অনমনীয় প্রভাতকে তিনি মনে মনে ভয় করতে সুরু করেছেন। প্রভাত প্রতিবাদ করে বিনীত ভাবে—কঠিন স্নেহোক্তির সংক্ষিপ্ত উত্তাপহীন উত্তর দেয়। কিন্তু যুক্তি বা ক্রোধ কিংবা অভিশাপের ভয়—কোন কিছুতেই তার সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণের ব্যত্যয় ঘটে না। যে ছেলে বেশী বকে—অল্পতেই উষ্ণ হয়ে ওঠে—মেজাজে যার রুক্ষতা—তাকে বশে আনা সহজসাধ্য—এটা বহু জায়গায় তিনি দেখেছেন, কিন্তু পরিমিতবাক্—নম্র প্রকৃতির ছেলেরাই সবচেয়ে বেশী মারাত্মক, তাদের একগুঁয়েমির তুলনাই হয় না।

প্রভাত চলে যেতে সুনয়নী বললেন, ওকে শক্ত কথা না বলে বেশ নরম করে বুঝিয়ে বল না কেন।

অনন্ত মুখ বিকৃত করে হাসলেন, হাঁ, সেই ছেলেই বটে তোমার! কথায় বলে না—'তেল দাও সিঁদুর দাও ভবি ভোলবার নয়'—এও হয়েছে তাই। মরবে, নিজেই মরবে, আমার কি?

এমনি করে মাসের পর মাস কেটে গেল—প্রভাত পাকা চাকরীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ক্রমশঃ

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

সঙ্গীত হতে কোমল বাণীর দলগুলি—
ঝরে যায়,—তবু ফেলে যায় পিছে স্মৃতির ভার;
মনের মাঝারে ব্যাকুল ব্যথায় কেঁদে কেঁদে সুর-কাঁপন তার।
রজনীগন্ধা শুকাইয়া যায় ফুরালে আয়ু,
পরিমল তারি জেগে রয় ভরি নিশাসবায়ু।

গোলাপ ফুলের রক্তিম রাঙা দলগুলি,
ঝরে যায় যবে চিরঘুম নামে নয়নে তার।
ঝরা পাপড়িও রচি' দেয় শেষে প্রিয়ার কোমল শয়নাধার।
তুমি চলে গেলে তোমারি ভাবনা গোপন ভরু,
প্রেম হয়ে মোর মনের মাঝারে ঘুমায়ে রয়।

শেলির "Music when soft voices die" কবিতার ভাবানুবাদ

মানক দেবী

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে অবস্থানকালে বাপুজী এক দিন আমাকে বলিলেন কাথিওয়াড়ের নানা স্থানে যে সব নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ চলিয়াছে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিবার জন্য এবং তাহার বাস্তব রূপের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য। আশ্রমের সেক্রেটারী ছগনভাই আমার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আমাকে সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার পরিচয় জানাইয়া নানা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লিখিয়া দিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন সবরমতী রেল ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইলাম কাথিওয়াড়ের দিকে অর্থাৎ উত্তর গুজরাটের দিকে।

প্রথমে গেলাম কাথিওয়াড়ের অন্তর্গত ওয়ার্ধন রাজ্যের রাজধানী ওয়ার্ধন শহরের বাহিরে, কিন্তু অনতিদূরে পল্লী-অঞ্চলে অবস্থিত এক হরিজন আশ্রমে। ভগিভাই এই আশ্রমটির প্রধান কর্মকর্তা। ষ্টেশন হইতে সোজা আশ্রমে চলিয়া গেলাম। ভগিভাই তখন আশ্রমে ছিলেন। ছগনভাই ভগিভাইর নামে আমায় যে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন তাহা ভগিভাইর হাতে দিলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া আমার পরিচয় পাইলেন এবং আমাকে সমাদর করিয়া আশ্রমের ভিতর লইয়া গেলেন।

এই হরিজন আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি গঠনমূলক কাজ চলিতেছিল। এই সব কাজের মধ্যে প্রধান কাজই ছিল হরিজনদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা এবং তাহাদের ভিতরকার জড়তা দূর করিয়া নূতন প্রেরণার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলা। আশ্রমে গেলাম, সেখানে কয়েকজন হরিজন আশ্রমবাসীকে দেখিলাম। আশ্রমের ভিতর দিয়া তাহারা মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহারা আর হরিজন নাই। মানুষ হিসাবে মানুষের মাঝে তাহারা তাহাদের স্থান বুঝিয়া লইয়াছে। এই কেন্দ্রের সাহায্যে আরও কয়েকটি গঠনমূলক কাজ করা হয়; তাহা হইল—বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা, হরিজন বালক-বালিকাদের জন্য রাত্রির পাঠশালা পরিচালনা, বাস্তব কর্ম্ম ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া ছুৎমার্গ পরিহার এবং আশেপাশের গ্রামগুলির ভিতরে গ্রাম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

সকালবেলা রেলগাড়ী হইতে নামিয়াই এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। আশ্রমের হরিজন বন্ধুগণই রান্নাবান্না করিয়া থাকে, সেদিনও তাহারাই করিল। তাহাদের সহিত মেলামেশা আলাপ-আলোচনা করিলাম এবং তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহারও করা গেল। সারাদিন আশ্রমেই কাটিল। এই আশ্রমটির সুরুচিসম্পন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের তাপে অর্দ্ধ মরুভূমির মত এই অঞ্চল তাতিয়া উঠিল। অসহ্য সে গরম। আশ্রমের মাঝখানের ঘরটিতে বিশ্রাম করিবার অভিলাষে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। একজন হরিজন বালক পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তার এই সেবা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও কোন ফল পাইলাম না। এত গরম সহ্য করিতে আমি অনভ্যস্ত; তাই ভগিভাই বলিলেন যে, যদি আমি এই বালকটির সেবা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে অসুস্থ হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। ভগিভাইয়ের কথায় প্রতিবাদ করিলাম না। বালকটি বাতাস করিতে লাগিল। আমি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ দিকে বালকটি বাতাস করিতে করিতে মধুর স্বরে ছড়ার গানের মত কি যেন গাহিতে লাগিল। বড় মধুর লাগিল তার ছড়ার গান। জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি গাহিতেছে? সে জবাব দিল, "মানক দেবী"র গান।

গুজরাটি ভাষায় সে গান গাহিয়া গেল। গুজরাটি বলিতে পারি না; কিন্তু কিছু কিছু বুঝি। বুঝিলেও কবিতার ছন্দ বোঝা সহজ নয়; তবু যত দূর সম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শুনা হইল না। বিকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গেলাম। সেখানে গিয়াও রাখাল বালকদের মুখে শুনিতে পাইলাম মানক দেবীর গান। ভগিভাই সঙ্গে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, কাথিওয়াড়ের যেখানেই যাই না কেন, বিশেষ করিয়া ওয়ার্ধন রাজ্যের সর্ব্বত্রই বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখেই এই মানক দেবীর গান শুনিতে পাইব। পরে কাথিওয়াড়ের বহু স্থানে গিয়াছি, সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি মানক দেবীর গান আকাশবাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন পূর্ব্ব রাজপুতানা ও মধ্যভারতের সর্ব্বত্র ঝাঁসির রাণীর যশোগাথা শুনিতে পাওয়া যায় তেমনি কাথিওয়াড়ে শুনা যায় মানক দেবীর যশোগাথা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রাণী দেশকে স্বাধীন করার জন্য যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বীর রমণী এবং স্বাধীনতার উপাসিকা হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন। তাই রাজপুতানার মরুস্থল ও

মধ্য ভারতের বনজঙ্গল ও প্রান্তর কাঁপাইয়া বোল উঠে :

"চমক উঠী সব সাঁতরন মেঁ বহ তলোয়ার পুরাণী থী ;
বুন্দেলে হর বোলোঁকে মুহ হমনে শুনি কহানী থী,
খুব লড়ী মর্দানী বহ তো ঝাঁসিওয়ালী রাণী থী।" ইত্যাদি

ঠিক এমনি ভাবেই নায়ক দেবীর বীর্য্য সতীত্বের গৌরব-গাথায় কাথিওয়াড়ের আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠে।

কাথিওয়াড়ের এক ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজার রাণী হইলেন নায়ক দেবী। রাণী নায়ক দেবী ছিলেন রূপবতী, আর সাধারণ লোকের নিকট তিনি ছিলেন এক রহস্যময়ী অপ্সরী। গুণের দিক হইতেও তিনি এক মহান্ চরিত্রবলে বলবতী ছিলেন ; আর এই চরিত্রই তাঁহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল। এই চরিত্রবলের জন্যই তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আর রূপ, গুণ ও চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি নারী হইয়াও সকলের নিকট দেবী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাধবীর সুবাসের মত তাঁর গুণ-গরিমা ও রূপ-লাবণ্যের কথা সারা গুজরাটের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গুজরাটের মুসলমান নবাব। সারা গুজরাটের মালিক তিনি। গুজরাটের ছোট বড় হিন্দু রাজ্যগুলি তাঁর অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যে সব রাজ্য এখনও স্বাধীন রহিয়াছে, তাহারা স্বাধীন থাকিলেও প্রবল পরাক্রান্ত নবাবের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবার বা করিবার সাহস পায় না। নবাবের প্রতাপ ও পরাক্রম অপরিসীম। গুজরাটের এই পরাক্রান্ত নবাবের রাজ্যের নিকটেই নায়ক দেবীর স্বামীর রাজত্ব। রাজ্য ছোট হইলেও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। এই রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা কোন দিন কোন ব্যাঘাত ঘটান নাই বলিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রতি নবাবের দৃষ্টি পড়ে নাই।

রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছায় না হইলেও এক দিন নবাবের নজর পড়িল এই ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্যটির উপর। রাজ্যের রাণী নায়ক দেবীর রূপলাবণ্যের জনশ্রুতি নবাবকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। রাণীর অসাধারণ চরিত্রবলের কথা শুনিয়া নবাব হাসিয়া উঠিলেন। নারীর আবার চরিত্রবল কি ? শক্তিশালী পুরুষের নিকট সে নিশ্চয়ই মাথা নত করিবে, ইতিহাস তার বড় সাক্ষী। স্পর্দ্ধায় নবাবের বুক ফুলিয়া উঠিল। নবাব স্থির করিলেন, এই রূপবতী নারীকে তিনি তাঁহার বেগম করিবেন, তাঁহার শক্তিমত্তার কাছে চুরমার হইয়া যাইবে রাণীর চরিত্রবল ও গর্ব্ব, আর সারা গুজরাটের নরনারীকে দেখাইয়া দিবেন যে কেমন করিয়া সবাই শক্তির কাছে মাথা নত করে, কেমন করিয়া অপরূপ সুন্দরী নারী বিলাইয়া দেয় তার রূপ, যৌবন, মান, গর্ব্ব এবং গর্ব্বের ধন সতীত্ব এক শক্তিশালী পুরুষের কাছে—নায়ক দেবী তো সাধারণ একজন ছাড়ের রাজার রাণী বই অন্য কেহ নয়।

নবাবের মনে ঈর্ষা পূর্ণমাত্রায় জাগিল। সারা গুজরাট ব্যাপী যে নারীর এত রূপ, এত লাবণ্য, এত গুণ এবং এত মহিমা, সে অন্যের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে না—সে হইবে তাঁহারই। তার পর নায়ক দেবী অন্য দেশের রাণী হওয়া সত্বেও তাঁর রূপগুণের গরিমা তাঁহার রাজ্যের প্রজার মুখে মুখে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। দেশের শ্রেষ্ঠ নারী যদি তাঁর বেগম না হইল তাহা হইলে তাঁহার নবাবত্বের মূল্য কি ? নবাব নায়ক দেবীকে পাইবার আশায় প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। নায়ক দেবীকে তাঁর দরবারে পাঠাইবার জন্য নায়ক দেবীর স্বামীর কাছে দূত পাঠাইলেন।

রাজা দরবারে বসিয়াছিলেন ; এমন সময় নবাবের দূত আসিয়া তার আগমন বার্ত্তা ও সৌজন্য জানাইল। দূতমুখে বার্ত্তা শুনিয়া সভা নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সভাসদদের চোখে মুখে একটা বিজলীর ঝলক খেলিয়া গেল। রাজা কোন প্রকার অসৌজন্য প্রকাশ না করিয়া ধীর স্থির ও গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন যে, নবাব যেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা না করেন। দূত সেলাম জানাইয়া সভাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দূত সময়মত রাজার নিকট হইতে জবাব লইয়া নবাবের কাছে আসিল। নবাবকে সেলাম জানাইয়া দূত রাজার উত্তর ব্যক্ত করিল। উত্তর শুনিয়া নবাব জ্বলিয়া উঠিলেন, যেমন করিয়া ঘৃতাহুতির আগুন জ্বলিয়া উঠে। সামান্য একজন রাজা তিনি তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন—ইহা তাঁহার সহ্যের অতীত। নবাবের হুকুমে রাজধানীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। সহজে যাহা সম্ভব হয় নাই তাহা তিনি শক্তিপ্রয়োগে করিবেন। নবাব নিজে তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া নায়ক দেবীকে যুদ্ধ করিয়া লইয়া আসিতে চলিলেন। কেবল নায়ক দেবীকে বেগম করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইবেন না ; ঐ ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

নায়ক দেবীর স্বামী রাজা হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও, তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। দূতের নিকট নবাবকে যে জবাব তিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। যখনই তিনি এই কথা চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার দেহের ক্ষাত্ররক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া উঠে। সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। খবর পাইলেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য নবাব সৈন্য লইয়া আসিতেছেন। রাজা নিজে তাঁহার সৈন্য লইয়া অর্দ্ধপথে নবাবের গতিরোধ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজার সৈন্য নবাব-সৈন্যের তুলনায় সংখ্যায় অতি অল্প। তাহাতে ক্ষত্রিয় রাজা ভীত হইলেন না। অসির ঝনাৎকারে আকাশ-

বাতাস কাঁপাইয়া তিনি তাঁর ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ লইয়া নবাব-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। রণভূমির প্রান্তর রক্তের স্রোতে বহিয়া গেল। যুদ্ধের শেষ পরিণাম রাজার জানাই ছিল; কিন্তু ক্ষাত্ররক্ত তাহাতে ভীত হয় নাই। ক্ষত্রিয় বীরের তরবারি সঞ্চালনের কৌশলে বহু নবাব-সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীর-গণ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের কথা ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল নিজের জীবনের মায়া। তাহারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিল, হাজার হাজার নবাব-সৈন্যকে ধরাতলে শায়িত করিল, নিজেরাও শয়ন করিল অনন্তকালের জন্য।

রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিলেন। এ যুদ্ধ রাজ্য রক্ষা করার জন্য নয়, এ যুদ্ধ কেবল স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য নয়, এ যুদ্ধ পররাজ্য হরণ করার জন্যও নয়—এ যুদ্ধ ছিল হিন্দুর এক শাশ্বত মহিমময় আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্য। রাজা তাঁর দেহরক্ষী সৈন্যগণের সহযোগে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে বহু নবাব-সৈন্য হতাহত করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে সংখ্যায় বহু গুণ নবাব-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া রাজা যখন নবাবের সম্মুখে নবাবকে পর-নারীহরণের নির্মম শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন অতর্কিতে এক নবাব-সৈন্যের ভালার আঘাতে রাজা তাঁহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। নবাবের আদেশে রাজা নবাব-সৈন্যের হাতে বন্দী হইলেন। রাজার অবশিষ্ট সৈন্য আহত রাজাকে উদ্ধার করার জন্য শেষ চেষ্টা করিল, অসীম বিক্রমে নবাব-সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলেই রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এবং তাহাদের মহীয়সী রাণী নামক দেবীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানী ছিল অনেক দূর। রাজার পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছানোর বহু পূর্ব্বেই নবাবের অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে গিয়া পুরী আক্রমণ করিল। পুরী রক্ষার জন্য যে সামান্য ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ছিল, তাহারা অমিতবিক্রমে পুরীর প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে পুরীর প্রবেশদ্বার ভঙ্গ করিয়া নবাব-সৈন্য পুরীতে প্রবেশ করিল। যাহারা পুরী রক্ষার জন্য ছিল, তাহারাও যুদ্ধ করিল, নবাব-সৈন্যদিগকে মারিল এবং নিজেরা মরিল। রাজার বালক পুত্রদ্বয় স্থির থাকিতে পারিল না, মুক্ত তলোয়ার হস্তে পুরী-রক্ষকদের সহায়তায় অগণিত নবাব-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু কতক্ষণ! নবাব-সৈন্যের নিকট তাহারা আহত অবস্থায় বন্দী হইল।

রাণী নামক দেবীও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত বন্দী হইলেন। নামক দেবীর বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া নবাব গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং দাম্ভিকতার হাসি হাসিলেন। আজ তিনি দুনিয়াকে দেখাইয়া দিবেন যে, সতীত্বের তেজে গর্ব্বিতা নারী কেমন করিয়া সবলের কাছে তার দেহ, মন ও সতীত্বের অহঙ্কার লুটাইয়া দেয়।

যেখানে বসিয়া রাজা তাঁর দরবার করিতেন, সেই দরবার-কক্ষে নবাবের সম্মুখে বন্দী নামক দেবীকে ও তাঁহার আহত বন্দী পুত্রদ্বয়কে আনা হইল। নবাব দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে এক অপরূপ নারী দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি ত রূপবতী নারী নন, নারীরূপে জ্বলন্ত লৌহশলাকা। নবাব সে রূপের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। সূর্য্যের আলোক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া চোখে আসিয়া পড়িলে চোখ যেমন ঝলসিয়া যায় তেমনই সে রূপের তেজে নবাবের চোখও ঝলসিয়া গেল। আপনা আপনি নবাবের মাথা নত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নবাবের দাম্ভিকতা রাণীর রূপের জ্যোতির কাছে ম্লান হইয়া পড়িল। নবাব এক স্বর্গীয় দীপ্তির কাছে হার মানিলেন।

কিন্তু কতক্ষণ! আবার নবাবের মনে জাগিয়া উঠিল রূপের মোহ ও ভোগের স্পৃহা। নবাব শান্ত স্বরে নামক দেবীকে তাঁর বেগম হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। নবাবের কথা শুনিয়া নামক দেবীর আহত ও বন্দী পুত্রদ্বয় তাহাদের মস্তক নত করিল। পুত্রের সম্মুখে মাতার অপমানে বন্দী পুত্রদ্বয়ের মনে বিষম অন্তর্জ্বালা জাগিয়া উঠিল। আজ রাজপুত বালক বন্দী; তাই মাথা নত করিয়া সহ্য করিল নিজের মায়ের অপমান। কিন্তু ঘৃণায়, অপমানে ও ক্রোধে বন্দী নামক দেবী সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং বিজলী চমকের মত হঠাৎ অগ্রসর হইয়া নরাধম নবাবকে পদাঘাত করিলেন।

ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায় ও পরাজয়ের জ্বালায় নবাব উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। রুষ্ট কণ্ঠে নবাব নামক দেবীকে বলিলেন যে, হয় তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর বেগম হইবেন, না হয় তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হইবে। হয় বেগমত্ব স্বীকার, না হয় তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মস্তকদান ইহার একটা রাণীকে বাছিয়া লইতে হইবে। আহত সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন নামক দেবী এবং অট্টহাস্য হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নামক দেবীর পুত্রদ্বয়ও হাসিয়া উঠিল শ্মশানের ভূতপ্রেতের অট্টহাসি এবং সারা দরবার-গৃহে খেলিয়া গেল বিভীষিকার এক তড়িৎ-প্রবাহ। এই দৃশ্য নবাবের অসহ্য হইয়া উঠিল। রাণীর পুত্রদ্বয়কে হত্যা করার জন্য আদেশ করিলেন। আদেশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দুই জন পাঠানের দুইখানি শাণিত অসি কোষমুক্ত হইল; সঙ্গে সঙ্গে দুইখানি মুক্ত অসির ফলক বিজলী খেলিয়া যাওয়ার মত শূন্যে উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া আসিল আহত, বন্দী রাজপুত্রদ্বয়ের স্কন্ধে, আর দুইটি ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

রাণী চক্ষু বুজিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন বালকদ্বয়ের দেহ হইতে ফিন্‌কি দিয়া উঠা রক্তের স্রোত। ক্ষণিকের জন্যও রাণী একটু দুঃখ করিলেন না। নিজের সতীত্বের বিনিময়ে নরাধম নবাবের কাছে পুত্রদ্বয়ের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন না। দুই চোখ দিয়া তিনি দুই ফোঁটা চোখের জলও ফেলিলেন না। অচল অটল অবস্থায় বিস্ফারিত নয়নে পুত্রদ্বয়ের হত্যা দেখিলেন; চাহিয়া দেখিলেন ধূলায় লুটানো পুত্রদ্বয়ের ছিন্ন মস্তক। তারপর ধীর স্থির ভাবে লুটাইয়া পড়িয়া পুত্রদ্বয়ের তপ্ত রুধির তাঁহার সারা অঙ্গে মাখিলেন।

রুধির-রঞ্জিত রাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া নবাব ভীত হইলেন। তখন নবাব দেখিলেন রাণীর মধ্যে সতীত্বের তেজে দীপ্ত এক মহীয়সী নারী; আরও দেখিলেন তিনি নারীত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিত জলন্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এক হিন্দু নারী। অধিকক্ষণ সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি নবাব দেখিতে পারিলেন না; রাণীকে পাল্কীতে তুলিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম করিলেন। নবাবের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী-বাহকগণ পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল।

পাল্কীবাহকগণ রাণীকে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া নবাবের রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল। পাল্কীবাহকগণ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; ভিতরে রাণী বসিয়া আছেন, কোন সাড়া-শব্দ নাই। পাল্কী লইয়া বাহকগণ অনেক দূরে এক প্রান্তরে চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ রাণী পাল্কীর ভিতর হইতে অট্টহাস্য হাসিলেন—সে যেন মহা শ্মশানের শিবাকলরব। পাল্কী-বাহকগণ সে স্বর শুনিয়া ভীত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পাল্কীর ভিতর একটা ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ হইল; সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ আহত সিংহীর গর্জ্জন। পাল্কী-বাহকগণ পাল্কী নামাইয়া পিছনে পড়া নবাব-সৈন্যের ও নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভিতরের গর্জ্জন তীব্র হইতে তীব্রতর হইল, পদাঘাতে রাণী পাল্কীর দরজা ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া বাহির হইয়া রাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। বাহকগণ কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রাণীর অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল; সে মূর্ত্তি নারীমূর্ত্তি নয়, সে মূর্ত্তি দানবদলনী মূর্ত্তি। তাহারা রাণীকে বাধা দিল না, ধরিবার চেষ্টা করিল না—তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া গেল। রাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন—কোন্ দিকে, কোথায় তাহা তিনি জানেন না। জনহীন প্রান্তরে তিনি কেবল ছুটিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রান্তরের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া, কণ্টকিত বনের ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার পদযুগল প্রস্তরে, পাথরে ও কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইল; তথাপি তাঁহার ছুটিবার বিরাম নাই। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। অবসাদে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু অবসাদ কর্ত্তব্য ভুলাইতে পারিল না। মাঠ, প্রান্তর ও জঙ্গল হইতে শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিলেন এবং চিতা সাজাইলেন। চিতা সাজাইলেন; কিন্তু আগুন নাই। কোথায় আগুন পাইবেন! এই প্রান্তরে কে দিবে আজ তাঁহাকে একটু আগুন তাঁহার নারীত্ব ও সতীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য! কোথাও কোন আশা যখন মিলিল না, তখন তিনি খুঁজিয়া বাহির করিলেন একটুকরা পাথর। দ্বিতীয় পাথরের টুকরা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই পাথরের টুকরায় ঘষিয়া আগুন জ্বালাইলেন এবং চিতার শুষ্ক কাঠে লাগাইলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

এদিকে রাণীর পলায়ন দেখিয়া বাহকগণ কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যখন তাহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন তাহারা রাণীর পলায়ন-সংবাদ ঘোষণা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া নবাব-সৈন্য সেখানে আসিল, এবং নবাব নিজেও সেখানে আসিলেন। নবাব বাহকদের কথা শুনিয়া সব বুঝিলেন, এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট না করিয়া রাণীকে ধরিবার জন্য নবাব তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য চারিদিকে পাঠাইলেন এবং তিনি নিজেও কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে ছুটিয়া গেলেন। বন, জঙ্গল, মাঠ, পাহাড় প্রভৃতি সকলে খুঁজিল। নবাব নিজেও খুঁজিলেন। কিন্তু রাণীর কোন সন্ধান মিলিল না।

এই ভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে সকলে যখন নিরাশ হইয়া পড়িল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। সারা বিশ্বে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। নবাব এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দূরে দেখিলেন এক বিরাট অগ্নিশিখা। মনে করিলেন কোন চিতা জ্বলিতেছে। সেখানে গেলে হয়ত রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাই সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন।

নবাব সেই চিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সেই প্রজ্জ্বলিত চিতার এক পাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে কয়েকজন পাহাড়ী; যেন তাহারা কোন দেবীর উপাসনা করিতেছে। আর দেখিলেন জ্বলন্ত চিতার উপর চক্ষু মুদিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এক অপরূপ নারী। চিতার চারিদিকের আগুন লোল জিহ্বা বাহির করিয়া সেই রক্তবসনা নারীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। নবাব এই নারীকে চিনিলেন। এই নারীই রাণী মানক দেবী। নবাব স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাকে বাঁচাইতে কোন চেষ্টাই করিলেন না। পরাজয় ও অপমানের জ্বালায় তাঁহার অন্তর গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু হিন্দু নারীর তেজ, নারীত্ব বোধ, সতীত্বের আদর্শের মহিমা এবং ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া নবাবের মন প্রাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরিয়া

উঠিল। সবাই চিতায় উপবিষ্ট নারীর প্রতি চাহিয়া মাথা নত করিলেন।

যেখানে নানক দেবী চিতারোহণ করিয়াছিলেন সে স্থানের উপর একটি স্মৃতিমন্দির আছে। এই স্থান ওয়ার্ধন শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। সে এক তীর্থক্ষেত্র। পরদিন ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া এই স্মৃতিমন্দিরটি দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, বহু নারী পূজোপচার লইয়া আসিয়াছে, প্রণত করিতেছে, স্মৃতিমন্দিরে সিন্দুর মাখাইতেছে, ধূপ ধূনার আরতি করিতেছে আর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রাণের নিবেদন জানাইতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আদর্শ চরিত্র নানক দেবীর কথা ভাবিয়া প্রাণ মন তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। তারপর মাথা আপনি নত হইয়া আসিল। স্মৃতিমন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই অশরীরী নারী রাণী নানক দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাতজোড় করিলাম।

রূপের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চেনে না জানে না যে জন তাঁহাকে
সেও জানে নিরাকার।
পরিচয়ে আর আছে কিবা দরকার?
ধ্যানী, অনুরাগী, রসিক তাঁহারে জানে,
তাঁরি প্রীতিকামী, ফিরে তাঁর সন্ধানে,
সত্যদৃষ্টি তাহাদেরি বাণী
শুনিবার শোনাবার।

২

তন্ময় হয় যে রূপে তাদের
সিদ্ধ শিরোমন,
সেই রূপ তাঁতে করে যে নিরীক্ষণ।
কখনো বা তিনি বরাহ, কমঠ, মীন,
কুরূপের মাঝে মহারূপ সমাসীন,
ভক্ত মধুপ সব ফুলে করে
মধু যে আকর্ষণ!

৩

কখনো দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা
কখনো পঞ্চমুখ,
পদারবিন্দ পূজিয়া কাহারো সুখ।
কেহ তাঁরে দেখে রুদ্র ভয়ঙ্কর,
কেহ মনোহর চির-শ্যামসুন্দর,
বহুবল্লভ অনন্ত রূপ
যাতে যার ভরে বুক।

৪

কোন্‌টি তাঁহার খাঁটি রূপ বটে
কোন্‌টি তাঁহার নয়?
ভক্তই তাহা করে স্নেহ নির্ণয়।
যখন যে রূপে দেখেছে সত্য তাই,
অসত্যের যে প্রবেশ সেখানে নাই,
ধ্যানের সে রূপ-পরিমণ্ডলে
সব অমৃতময়।

৫

রূপ নাই তাঁর অন্ধও বলে,
দেখে সে অন্ধকার।
রূপ দেখে সেই বিপুল ভাগ্য যার।
যে রূপের লাগি তৃষিত নয়ন ঝুরে,
যে রূপ দেখিলে বচন নাহিক স্ফুরে।
সজ্জ যাহার, সাধনার ধন—
কৃচ্ছ্র তপস্যার।

৬

সেই তাঁরে চেনে, সেই দেয় নাম
ডাকে 'জয় জগদীশ'।
যোগ যার তাঁর সঙ্গে অহর্নিশ।
পটে ও পাষাণে যে রসমূর্তি আঁকে—
সত্য সে রূপ, ভক্ত দেখেছে তাঁকে।
রূপের পরিধি খুঁজিছে যাহার
নয়ন নির্নিমিষ।

৭

সে রাগের পথে এক সাথে হয়
রূপ ও কথার শেষ,
বংশীই তাঁর করে পথ নির্দেশ।
সকল চিন্তা চিন্তামণিরে যাচে,
সব দর্শন ফুরায় তাঁহার কাছে,
সব রস এক রসিকে ঘেরিয়া
রচে রূপ-পরিবেশ।

কিন্নর জাতি

শ্রীধর্ম্মদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

৩

গ—শিক্ষা, পার্ব্বণ, অভাব-অভিযোগ

শিক্ষা ও চিকিৎসা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি শিক্ষার দিকে কিন্নরদের আগ্রহ বাড়িয়াছে। যেখানেই গিয়াছি, লোকে স্কুল খুলিতে আমাদের অনুরোধ করিয়াছে। সারা কিন্নর-দেশে নয়টি স্কুল—সাতটি প্রাইমারী, একটি মিডল ও একটি লোয়ার মিডল। স্ত্রী-শিক্ষার দিকে কিন্নরদের নজর কম। এদিকে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত কিন্নর-দেশের উন্নতি হইবার নহে। চীনীতে একটি বেশ সুন্দর হাসপাতাল দেখিলাম। কিন্তু ডাক্তার নাই। কেন নাই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এত দূরে কোন ডাক্তার আসিতে চাহে না। চীনীতে জিনিষপত্র মহার্ঘ। সিমলার লবণের দর চার টাকা, চীনীতে চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা মণ দরেও চীনীতে গম দুষ্প্রাপ্য ছিল। আমার মনে হয়, এই দূর দেশে যে সব কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাতার ও রেশনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্নরদের নিজেদেরই সংবৎসরের খোরাক নাই।

চীনী কিন্নর-দেশের রাজধানী। এখানে একটি মিডল স্কুল আছে। রামপুর এখান হইতে সত্তর মাইল। সেখানে হাই স্কুল আছে। চীনী ও চীনীর আশপাশের লোকেরা ছেলেদের রামপুরে পাঠাইতে চায় না। তা ছাড়া ছাত্রদের তথায় মাথা-পিছু চল্লিশ টাকা খোরাকী খরচ পড়ে। তাই চীনীতে অবিলম্বে হাই-স্কুল খোলা আবশ্যক। রামপুর স্কুলকে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করার কথা চলিতেছে। শুনিলাম শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরও এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন।

রামপুরে মেয়েদের জন্য মিডল স্কুল

রামপুরে মেয়েদের প্রাইমারি স্কুল আছে। উহাকে মিডল স্কুলে উন্নীত করা দরকার। সুযোগ না থাকায়, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক মেয়ে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। মনে হয় অধিবাসীরা সহশিক্ষার পক্ষপাতী নহে। চীনীর স্কুলে মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। চীনীতে কোন মেয়েকে আমরা স্কুলে যাইতে দেখি নাই।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা

স্ত্রীরোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। অন্য স্থানে ধাই থাকে। এখানে (কিন্নর-দেশে) ধাই পর্য্যন্ত নাই। তাই প্রসবকালে অনেক স্ত্রীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে। স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য এখানে একটি হাসপাতাল একান্ত প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় কন্তুরবা ট্রাষ্ট হইতে সত্বরই একটি হাসপাতাল খোলা উচিত।

চারণ-ভূমির পথে

হিমাচল প্রদেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তাহা হইলে এখানকার প্রয়োজনমত ডাক্তার ও লেডি ডাক্তার পাওয়া যাইবে।

পর্ব্ব-পার্ব্বণ ও মেলা

কিন্নর-দেশে সৌর বর্ষ প্রচলিত। প্রায় সব তেহারই সংক্রান্তিতে হয়। প্রধান প্রধান পর্ব্ব হইতেছে :

১। বিশু বৈশাখ সংক্রান্তি দিন। ২। ফাল্গুনী হোলী। ৩। দেওয়ালি—অন্যত্র যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় তার এক মাস পরে। ৪। কু লৈচ—দশহরা। ৫। জাগড়া—২০শে ভাদ্র তারিখে। ৬। ডখরেন—শ্রাবণ-সংক্রান্তি।

পর্ব্ব উপলক্ষে লোকেরা নাচে, গায় ও শক্তি অনুসারে ভাল খায়দায়। জাগড়ার দিনে সারারাত জাগিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলাতে দেবতা আনা হয় এবং তাঁকে নাচান হয়। স্ত্রীলোকেরা গহনা পরে। বহু-পতি প্রথা প্রচলিত বলিয়া সব মেয়ের বিবাহ হয় না। এইরূপ অবিবাহিত মেয়েদের কেহ কেহ এই সময় স্বেচ্ছায় প্রেম-পরিণয় করিয়া থাকে।

রামপুরের প্রধান প্রধান মেলা

রামপুর কেবলমাত্র কিন্নর-দেশেরই বড় বাজার নহে; কুলু, স্পীতি, তিব্বত, কৌনসার-বাওর এবং হিমালয়ের অপর দূর দূর স্থানেরও তাহা প্রসিদ্ধ বাজার। এখানে তিনটি মেলা হয়:

১। ২৫শে কার্ত্তিক তথা মোটামুটি ১১-১২ই নবেম্বর একটা বড় মেলা বসে। এই মেলায় তিব্বত হইতেও পশম বিক্রয়ার্থ আসে। লাখ লাখ টাকার জিনিষের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এই মেলাকে লৌদ মেলা বলা হয়। বিক্রয়ের জন্য বহু ঘোড়াও আসে।

২। হোলী—এই মেলায় কিন্নর, বুশহর ও কুলু হইতে বহু লোক আসিয়া থাকে। এটা ঘরোয়া মেলা। দেবতা এই মেলায় আসেন।

৩। ২৪শে বৈশাখ—উপরি-উক্ত সব রকমের জিনিষ এই মেলায় বিক্রয় হয়। ভারত হইতে লোকে জিনিষপত্র লইয়া এখান হইতে তিব্বতে যায়।

গৃহ-নির্ম্মাণ

কিন্নর-দেশের ঘরের দেওয়াল পাথরে তৈরি, কিন্তু কাঠের ব্যবহারও কম নয়। এখানে কাঠে উই লাগে না। গম তথা ধানের গোলা পৃথক করিয়া বানানো হয়। সাধারণতঃ বাস-গৃহের নীচের তলায় পশুদের রাখা হয়। গৃহ দোতলা বা তেতলা। দরজা নেহাত ছোট। গৃহ নয় ত যেন দরজা-জানালা বন্ধ জেলের প্রকোষ্ঠ। ঘরের ছাদ তিন প্রকারের। চৌরার আশপাশে স্লেট-পাথরের ছাদ দেখিয়াছি। সেখানে পাথর পাওয়া যায়। ট্রঙা হইতে বাংগতু পর্য্যন্ত কাঠের ছাদ। পরে মাটির ছাদ, কারণ সেখানে বর্ষা নাই। এই সব ছাদ দেখিয়া পশ্চিম পঞ্জাবের কথা মনে পড়ে।

সরকারী ব্যবস্থা

সরকারী কর্ম্মব্যবস্থা তিন প্রকারের:

প্রত্যেক গ্রামে এক জন সর্দার থাকে। সে জাতিতে সবর্ণ। আর থাকে হরিজনশ্রেণী হইতে এক জন হয়রশী। ইহাদের বেতন নাই। সরকারী লোক আসিলে লোকজনকে খবর দেওয়া, লোক ডাকা ইত্যাদি তাহাদের কাজ। গ্রাম-বাসীদের পীড়ন করিয়া সরকারী লোকেদের জন্য তাহারা যে খাদ্য সংগ্রহ করে তার ভাগ তাহারা পায়। তাহাই তাহাদের বেতন।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি কোঠী। প্রত্যেক কোঠীতে একজন নম্বরদার থাকে। নম্বরদার অভিজাত-বংশের হওয়া চাই। রাজস্বের শতকরা পাঁচ টাকা তাহাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাতে কি তাদের চলে! জনগণকে, বিশেষ হরিজনদের উত্যক্ত করার তাহা লাইসেন্স। লাইসেন্স দিলে সরকারের লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে হয় ক্ষতি—এইটুকু ব্যবধান।

কতকগুলি কোঠীর সমষ্টিকে পরগণা কহে। পরগণার কর্তা হইতেছে জেলদার। জেলদার গরীব লোকের পক্ষে সাক্ষাৎ যমস্বরূপ। তাহার উৎপীড়নে লোকে শশব্যস্ত। জেলদারও অধিকাংশ স্থলে অভিজাত-বংশের লোক। এই ব্যক্তিও রাজস্বের একটা ভাগ পায়। প্রায় সব পরগণাতেই এক জন পাটোয়ারী থাকে। পাটোয়ারীদের এলাকা স্বতন্ত্র। কতকগুলি পরগণা লইয়া একটি তহশীল। তহশীল তহশীলদারের অধীন। কিন্নর-দেশে সর্ব্বসমেত পঁচাত্তরটি গ্রাম। কুড়িটি কোঠীতে তাহা বিভক্ত।

বরাত বলিতে হইবে, রামপুর ও চীনীর তহশীলদারেরা জনপ্রিয় যোগ্য লোক। তাহারা দুই জনেই বুশহরের লোক—ভাল মানুষ।

নাম বৈচিত্র্য। সিমলাতে এক কিন্নরের সহিত দেখা—শিক্ষা-বিভাগে এসিষ্টেণ্ট ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তাহার নাম বাংগ ডুপ ক্লিংগ। ভদ্রলোক বি-এ, বি-টি। চীনীতে একটি গ্রাম্য ছাত্রের সহিত দেখা, সে নিজ পরিবারের লোকের নাম এইরূপ বলিয়াছিল। ছাত্রের নাম—ফকফ ছেরিংগ। পিতার নাম দেশিম ছেরিংগ। মাতার নাম গবে জামী। বোনের নাম জমল জামী। রুকবংগ গ্রামের ছাত্র নিজ পরিবারের নাম যাহা বলিয়াছিল তাহা এই:

ছাত্রের নাম ঠাকুররাম। পিতার নাম (১) ইন্দ্রজিৎ, (২) তিলকরাম, (৩) রঘুদাস, (৪) পরস দাস। মাতাদের নাম (১) গঙ্গাদাসী, (২) বর্ম্মদাসী।

কিন্নর-দেশের যে সব পরিবারে লামাদের প্রভাব সে সব পরিবারে তিব্বতী ভাষায় নাম রাখা হয়। চীনীর মিডল স্কুলে দ্বিতীয় ভাষারূপে তিব্বতী পড়ান হয়। উহা পড়ান রামজীদাস। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। খুব সৎ লোক।

কিন্নর প্রদেশের কৈলাস

কিন্নর-দেশে ভয়ানক শীত। আমরা চীনী গিয়াছিলাম মে মাসে। পথে প্রায় সর্ব্বত্র উচ্চ শিখরগুলি বরফে ঢাকা দেখিতে পাই। হিমালয় যেন চাঁদির গহনা পরিয়াছিল। কিন্নর-দেশের সর্ব্বোচ্চ শিখর কৈলাস। তাহা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। কৈলাসের সর্ব্বোচ্চ ভাগের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২১২৫০ ফুট। উহার নাম বালডংগ। মানস সরোবরের নিকটস্থ কৈলাস আর এ কৈলাস এক নহে। তার উচ্চতা ২২০০০ ফুট। কিন্নর-দেশের কৈলাসের শোভার তুলনা নাই। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পরে কৈলাস যেন নব-বধূর সাজে সজ্জিত হয়। খানিক পরে পরে নূতন নূতন শাড়ী পরিয়া নব নব রূপ ধারণ করে।

কুমারসেন হইতে একটি হিমাচ্ছাদিত উচ্চ শিখর দেখা যায়। দেবকীনন্দন ভারদ্বাজ বলিলেন পাহাড়ীরা ঐ শিখরকে হুংসবেশক বলিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস জীব মরিয়া

ওখানে যায়। উপনিষদের ঋষিরা জীবকে হংস বলিয়াছেন। তারও আগে ঋগ্বেদে ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

বৃদ্ধ কিন্নরদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবে, পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণের নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে রওনা হইয়া হিমালয়ের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তাঁহারা কিন্নর দেশের কৈলাসে আরোহণ করেন ও তথায় দেহত্যাগ করেন। আর তাই এই শিখরকে কৈলাস বলা হয়। মৃত্যু শব্দের স্থলে স্বর্গবাস বা কৈলাসবাস কথাটি ভারতবাসীরা হামেশা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভ্রমণের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত

কিন্নরেরা অতি প্রাচীন জাতি। হিমাচলের এই সব অনুন্নত আদিম অধিবাসীরা সময়ের প্রগতির অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের এক কোণে অবস্থিত কিন্নরদের হৃদয়ে দুঃখানুভূতি আছে। তাহাদের মধ্যে জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আত্মবিকাশের জন্য তাহারা ব্যাকুল বলিলেই ঠিক বলা হইবে। কিন্তু জাগ্রত সমুন্নত অপর দেশবাসীর সহায়তা ব্যতিরেকে ইহাদের বিকাশ হইবার নহে।

অশিক্ষা কিন্নরদের মুখ্য সমস্যা। দুঃখের কথা, স্কুলের অভাবে কিন্নরেরা ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। ঘরের কোণে হইলেও ইউরোপ-আমেরিকা অপেক্ষা কিন্নরদেশ যাতায়াত কষ্টসাধ্য। ডাক্তার-বৈদ্য নাই, তাই ঠেকিয়া কিন্নরেরা ভূতপ্রেত ও দেবতার শরণাপন্ন, অসুখ-বিসুখে তাহারাই তাহাদের ভরসা। স্ত্রীলোকের অবস্থা শোচনীয়। হরিজনদের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও অধম। হিমাচল প্রদেশের আয় কম। অতএব কিন্নরদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পথ-ঘাটের সুব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই সবিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিকাশানুকূল অবস্থা সত্ত্বেও কিন্নরদেশ সব দিকে অনুন্নত। গান্ধী-স্মৃতি ভাণ্ডার, কস্তুরবা ট্রাষ্ট ও ভারতীয় আদিমজাতি সেবক-সঙ্ঘ ইত্যাদির কর্ত্তব্য— দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত এই সব উপেক্ষিত মূক দেশবাসীর উন্নয়নে অবহিত হওয়া।

কুমারসেনের দিকে এবার আমাদের যাত্রা সুরু হইল।

কুমারসেন একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। তাহা আজ নবগঠিত হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ১০ই মে কুমারসেনে পৌঁছিলাম। নারকুণ্ডা হইতে কুমারসেন ছয় মাইল। নারকুণ্ডা নয় হাজার ফুট উঁচু; কুমারসেন মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচ শত ফুট উঁচুতে।

এখানে সকলের মুখেই খাদ্যাভাবের অভিযোগ শুনিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছে গ্রামবাসীরা রেশনের জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। পরিণামে খবর দেখিয়া নারকুণ্ডার এক কাঠুরিয়া আমাদের বলে, 'পঞ্জাবে ত হাজারো বস্তা গম যাচ্ছে, এদিকে হিমাচলবাসী আমাদের কংগ্রেস-সরকার অনাহারে মারছে। যে দাম দিতেই আপনি প্রস্তুত থাকুন না কেন,

দত্তাত্রেয় মন্দির

নারকুণ্ডাতে গম বা ধান আপনি পাবেন না।' নারকুণ্ডা হইতে কুমারসেন যাইতে যাইতে মনে সংশয় জাগিল, অবস্থাটি কি এতই সঙ্গীন! কিছুদূর অগ্রসর হইতে সামনে দেখিলাম গম-ক্ষেত। দূর হইতে মনে হইল ফলন ভাল হইয়াছে। সব-কিছু নিজ চক্ষে দেখা অভ্যাস। রাস্তার ধারের একটা ক্ষেতে গেলাম। শস্য পাকিয়াছে বলিয়া মনে হইল। দুটি শীষ ছিঁড়িয়া লইলাম, হাতে ডলিলাম; গুঁড়া হইয়া গেল। একটি দানাও তাহাতে ছিল না। এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিতে পাইলাম, গম ফুলিবার সময় বৃষ্টি হয় নাই তাই ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীজ রাখার মত গম পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। দেখিলাম পশু দুর্ব্বল, আর মানুষ নির্জীব। একটি লোকের সহিত দেখা। সরকারী চিঠির বলে নারকুণ্ডা হইতে ছোলা লইয়া ফিরিতে-ছিল, মাত্র পাঁচ সের। খাইবে সাত জন। সাত জনের জন্য সাত দিনের ঐ বরাদ্দ। আর তার জন্য তাহাকে পুরা দুই দিন ব্যয় করিতে হইয়াছে। সে আমাকে বলিল, "পয়সা দিয়েও গম, যব, ধান, ছোলা কিছুই মিলে না। পাঁচ সেরে সাত জনের সাত দিন চলে? তহশিলদার এর বেশী দেয় না।"

কুমারসেন পৌঁছিতেই রেশনের অব্যবস্থায় সম্মুখীন হইতে হইল। কোন দোকানেই খাদ্যশস্য ছিল না। শ্রীদেবকীনন্দন

ভরদ্বাজ আমাদের ব্যবস্থা করিলেন, নয়ত আমাদেরও মুশকিলে পড়িতে হইত।

এই রাজ্যের রাণা শ্রীসোমেশ্বর সিং উদীয়মান যুবক। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে ইনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ত তিন হাজার টাকা দিয়াছেন। হিমাচল প্রদেশের সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন, তাই রাণা সাহেবের এই দান খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ। আমাদের পরামর্শে কুমারসেনের অধিবাসীরা কস্তুরবা বুনিয়াদী কন্যা বিদ্যালয় খুলিবেন স্থির করিয়াছেন। আশা করি, তাহাদের অভিপ্রায় শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। সিমলাতে হিমাচল প্রদেশের চীফ কমিশনার শ্রী. পী. মুনকে এ বিষয়ে বলিয়াছি।

অন্নক্লেশ

কুমারসেনে পৌঁছিলাম। এখানেও আমাদের দেখিতেই লোকের মুখে সেই 'হা অন্ন' ধ্বনি। ছাত্রাবাসের ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কৃষক, বালক, স্ত্রী-পুরুষ, সকলে ঘাস ও আম্লীর (ডুমুরজাতীয় ফল) খাইয়া দিন কাটাইতেছে। একান্ত বিস্ময় লাগিল। একজন হরিজনকে দেখিলাম। গত পনর দিন সে অনাহারে; নারকণ্ডায় শ্রীমুনের সহিত দিন-কয়েক পূর্ব্বে সে দেখা করিয়াছিল। সকাল-সন্ধ্যা নুন-চা খাইয়া সে দিন কাটাইতেছে অথবা ধীরে ধীরে মরিতেছে।

পরের দিন মন্তপুর হইয়া চাতাম গ্রামে গেলাম। সঙ্গে শ্রীপরীখজী ছিলেন। চাতাম কুমারসেন হইতে মাইল চারেক দূর। গ্রামের কাছে সরকারী সমিতির ইন্‌স্পেক্টরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীদেবকীনন্দনজীর অনুরোধেই সম্প্রতি তিনি গ্রামটি দেখিতে আসিয়াছেন। সেখানে সাক্ষা আকালের পরিচয় আমরা পাইলাম। গত তিন দিন সমস্ত গ্রামবাসীরা অনাহারে আছে। কিছু ঘাসের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। এক হরিজনের ঘরে গেলাম। ঘরে তাহাদের একটি দানা গমও ছিল না। উনান লেপা-পোঁছা, আগুন জ্বলে নাই।

গ্রামবাসীরা সকলে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ধারণা আমরা রেশন লইয়া গিয়াছি। এক বিধবা ব্রাহ্মণী আমাদের তাঁহার ঘর দেখিতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার পশ্চাতে তিনটি ছোট ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। স্ত্রীলোকটি তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন, 'সবুর কর, থাম, সরকার অন্নের একটা ব্যবস্থা করবেই, আমি কি করব?' একটু থামিয়া বেচারী বিধবা আরও বলিলেন, 'যাব কোথা? গয়না ছিল, তা ত খেয়ে শেষ করেছি। আছে সবল পরণের কাপড়। তা বেচেই তোদের খাওয়াব।' দারুণ লাগিল। ব্রাহ্মণীর ঘরে গেলাম। উনানে আগুন জ্বলে নাই। ঘরে কিছুই ছিল না, বাসন-কোসন আগেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। সকলেই আমাদের নিজ নিজ ঘর দেখিতে বলিতেছিল। সমাজকে চাষী অন্ন যোগায়। তার এই দুর্দশা! লজ্জায় মরিয়া গেলাম। শ্রীমঙ্গললাল তাই দোকানে গেলেন; কিছু তাজা ছোলা আনিয়া গ্রামবাসীদের দিলেন। প্রাণে তাহাদের জল আসিল। বুঝিতে পারিলাম, গ্রামবাসীদের সব সম্বল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কেনার শক্তি তাহাদের অত্যন্ত ক্ষীণ। চাতামে ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, মোহন সিং নামে এক বৃদ্ধ ক্ষুধার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ত শতদ্রুতে ঝাঁপ দিতে গিয়াছিল। টের পাইয়া গ্রামবাসীরা নদীর কিনারা হইতে ধরিয়া আনিয়াছে। সেই দিন দ্বিপ্রহরের আহারের পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবু, চিফ কমিশনার শ্রী. পী. মুন, জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীরামেশ্বরী নেহ্‌রু ও প্রেস ট্রাষ্ট-এর নামে এক লম্বা তার প্রেরণ করি। ভূপদেব নামে একটু উৎসাহী যুবক তাহা পাঠাইতে কোটগড়ে যায়। কোটগড় কুমারসেন হইতে চার মাইল।

খাইলাম, আনমনা ভাবে। যেখানে লোকে অনাহারে মরে, সেখানে অন্ন রুচে কি? মন্তপুর হইতে কুমারসেন ফিরিয়া আসিলাম; আবার সেই 'হা অন্ন' রব। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কাছে জানিলাম, তাহাদের কোন দিন দুইখানা, কোনদিন বা সওয়া দুইখানা রুটি জোটে, ক্ষুধা তাহাদের পাঁচ-খানার। ছাত্রের সংখ্যা ৫২।

এক বুড়ী আসিল। হাতে তার লবণ, মাটি-মিশ্রিত, আধ সের হইবে। দাম তিন আনা, বুড়ী বলিল, 'কিছু ঘাস বেটে জলে গুলে লবণ দিয়ে খাব। ঘাসও এখন দুখাপ্য।' কুমারসেনের লোকেদের আর একটা কষ্ট, তাহাদের হাই স্কুলকে মিডল স্কুলে অবনমিত করা হইয়াছে। তাই দ্বিবিধ ক্ষুধায় তাহারা ক্লিষ্ট—ভৌতিক ও মানসিক। হাই স্কুল বন্ধ হওয়াতে সাতাশ জন ছাত্রছাত্রী বসিয়া আছে। উহাদের দুই জন মেয়ে ও চার জন হরিজন। এই স্কুলকে প্রাইমারী হইতে হাই স্কুলে উন্নীত করিতে শ্রীদেবকীনন্দনজীকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছিল। তাই ইহার অবনতিতে তিনি অতিশয় বিমর্ষ। গ্রামবাসীদের অন্নকষ্ট আর হাই স্কুলের কষ্ট দুই-ই সমান তীব্র। কুমারসেনের শিক্ষার ক্ষুধা দৃষ্টে হিমাচল প্রদেশের শিক্ষার ক্ষুধার আঁচ করা যাইতে পারে। উর্ণীতেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রামের পনরটি ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে আসে। তাহারা পড়িতে চায়, কিন্তু স্কুল নাই বলিয়া পশু চরায়। উর্ণীর দশ মাইল দূরে কিলওয়াতে স্কুল আছে। ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে প্রতিদিন তত দূরে যাওয়া সম্ভব নহে। তাওয়াতে স্কুল আছে, ছাত্রসংখ্যা পঁয়ত্রিশ। ঘর নাই। গাছতলায় ক্লাস বসে। শিক্ষার ক্ষুধার ইহাও পরিচায়ক। লেখাপড়ার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দেশের বালক-বালিকারা নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে। যেখানে গিয়াছি, আর যাহার সঙ্গেই কথা হইয়াছে—সর্ব্বত্রই এক অনুরোধ—'আমাদের স্কুল দিন।'

চীনী হইতে ফিরিবার পথে রামপুরে আসিয়া (৩০শে মে) শুনিতে পাইলাম, কুমারসেন স্কুলকে দুই বছরের জন্ত পুনরায় হাই স্কুল করা হইবে। খুশী হইলাম। নারকণ্ডায় পৌঁছিয়া যখন খবর পাইলাম যে, কুমারসেনের জলকষ্ট দূর করার নিমিত্ত হিমাচল প্রদেশ-সরকার দ্বরায় ব্যবস্থা করিয়াছেন—লোকে রেশন পাইতেছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তিসম আনন্দ অনুভব করিলাম। চিফ কমিশনর শ্রীযুত ও তাঁহার অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের ধন্তবাদ জানাইলাম।

বসৌলী কুমারসেনের লাগোয়া গ্রাম। তথায় একটি আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার উৎসাহী যুবকেরা হিমাচল প্রদেশ সেবা-সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে। এ সম্পর্কে বৈদ্য শ্রীদায়রাম সিংজীর নাম উল্লেখযোগ্য। চীনীতেও এইরূপ একটি সেবা-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনগ্রসর প্রদেশের জাগৃতির পরিচয় মেলে।

মচার হইতে পৌড়া ফিরিতেছিলাম। পথে এক বৃদ্ধের সহিত দেখা। দেখিলাম লোকটি ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন।

পারীখজী ভগবানের নাম করিতে করিতে খানিকদূর আগাইয়া গিয়াছিলেন। অভিবাদন অন্তে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার নিবাস?' 'অপ্পু'। অপ্পু চীনী হইতেও খানিকটা দূরে—ও-পাশে। বৃদ্ধ আরও বলিলেন—'হিমাচল-প্রদেশ হয়েছে না, আমরা কিন্নরেরা মরেছি। আগে সিমলা হইতে যত ইচ্ছা লবণ, গুড়, চাল, কাপড় ইত্যাদি আনা যেত। কোন প্রতিবন্ধ ছিল না। গ্রীষ্মে বাড়ী ফেরবার সময় ভেড়া-ছাগলের পিঠে মাল চাপিয়ে দিলেই হ'ত। হিমাচল-প্রদেশ হওয়ার পরে আমাদের পক্ষে সিমলার বাজার বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্নরেরা ঠাঁয় মরেছে।' বৃদ্ধের নাম ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল বুশহরের মহারাজাকেও একহাত লইতে ছাড়িলেন না—"মহারাজা আপন বুঝ ত বুঝেছে; সরকারের সহিত আমার গণ্ডা মিলিয়ে তাড়া ঠিক করে নিয়েছে। দিন দিন ফুলছে। আমাদের দুঃখের কথা সে কি ভাবে! যখন রাজা ছিল তখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করে রাজা হয় নি, আর আজ হিমাচল প্রদেশেও আমাদের জিজ্ঞাসা করে আসে নি। এমন বিপদে আমরা কখনও পড়ি নি।"

ধর্ম্মপালকে বলিলাম—"রাজ্য এখন প্রজার, কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে। হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্র সিমলা, পূর্ব্ব-পঞ্জাব সরকারের অধীন, এ কথা ঠিক। সিমলার কতকটা ভাগ হিমাচল প্রদেশের হাতে থাকলে আপনাদের খুব সুবিধা হ'ত সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরাশ হবেন না। অল্প দিন হয় হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে। নতুন ঘর, গুছাতেও একটু সময় লাগবেই। আপনাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে যখন দেশ-সেবা করবে তখন আপনাদের অধিক লাভ হবে। হিমাচল প্রদেশ হওয়াতে ক্ষতি হয় নি লাভই হয়েছে।"

উৎকোচের অভিযোগ

দুইটি মেষ-শাবক পিঠে লইয়া একজন কিন্নর নায়ক যাইতেছিল। নায়ক চীনীর চৌদ্দ মাইল ওদিকে, তিব্বত-সীমান্তবর্তী গ্রাম। মেষের পালে খুরে-ঘা রোগের মড়ক দেখা গিয়াছিল। ভেড়া তখন কে কিনিবে! এক একটি ভেড়া বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্ত উমানুখ প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মেষগুলি দুই পা যায় আর বসিয়া পড়ে। একবার আদর করে, আবার রাগ করে; মেষগুলিকে লইয়া একটু যায়, আর থামে—এই ভাবে উমানুখ পথ চলিতেছে। উমানুখের অল্পবয়স্কা মেয়ে, মায়ের পিঠে তার সরহানের চড়াই পার হওয়ার কথা। মাতা-পিতার বোঝা না হইয়া, তাহাদের বোঝা হাল্কা করার জন্ত এক নবজাত মেষ-শাবক কোলে করিয়া সে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে। উমানুখের পত্নীর কথা আর কি বলিব! সে যেন তখন মেষ-হাসপাতালের অধ্যক্ষা। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলাম। আগ্রহ হইল উমানুখ ও তার ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলি। বলিলাম—"তোমাদের এ বিপদে তোমাদের জন্ত কিছু করতে পারি কি? কি কাজ করব বল?" এ কথার জবাবে উমানুখ যাহা বলিল তাহাতে আমার অস্বস্তি আরও বাড়িল। সে বলিল—"বাড়বাগ্নি ক্ষেত গ্রাস করতে সুরু করলে কি আর বাঁচার আশা থাকে! এখন সময় এমনই পড়েছে যে সরকারী চাক্‌রো মাত্রই ঘুষখোর হয়ে গেছে। পয়সা ছাড়া তারা গরীব আমাদের সঙ্গে কথা কয় না। যে যত বড় অফিসার তার ঘুষের বহর তত বেশী। কারও কাছ থেকেই আমাদের আশা নেই। এক রামই মাত্র এখন ভরসা।"

কহিলাম—"ঘুষ দাও বলে না ঘুষ নেয়। নইলে নেয় কার সাধ্য।"

"লোকে কি গায়ে পড়ে দেয়? সরকারী কর্মচারীরা আমাদের কিছু আত্মীয় নহে।"

এ কথা বলিয়া সে পাশ্বিত অসুস্থ ছাগের কাছে চলিয়া গেল।

বাজতুর ছয় মাইল দূরে শতদ্রুতীরে রাপরী নামক গ্রাম। তথাকার চটিতে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের সহিত দেখা। পাশের গ্রামে চুরির তদন্তে সে যাইতেছিল। দুই দিন আগে এক করেষ্ট-চৌকি হইতে খাট চুরি হইয়া গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর বলিল—"এখানে এসে মহা মুশকিলে পড়েছি। সবে এক মাস এখানে (চীনীতে) এসেছি। ত্রিশ টাকা দিয়ে সিমলা থেকে নূতন জুতো নিয়ে এসেছিলাম। এক মাসেই তা ছিঁড়ে শেষ। খাদ্যদ্রব্য ত কিছুই মেলে না। সঙ্গে কুড়ি সের গম নিয়ে এসে-

ছিলাম। ফুরিয়ে গেছে। এবার না খেয়ে থাকার পালা। অধিবাসীদের নিজেদেরই খাবার নেই ত আমার দেবে কোথা থেকে।"

সরহান, গৌরা, চৌরা ও চীনীর ডাকবাংলোর ভাণ্ডার ব্যবস্থাও আছে। কিন্নর দেশে এ কাজ করে স্নেচ্ছ জাতির হরিজনেরা। ঐ সব জায়গায় ভাণ্ডারীরা নালিশ করিল যে তাহারা রেশন পায় না। রোড ইন্‌স্পেক্টর শ্রীলক্ষ্মীচাঁদকে জমাদারদের অসুবিধা দূর করিতে বলিলে সে নিজের অসুবিধার কথা পাড়িল। রামপুরে রেশনের অস্থায়ী ব্যবস্থা আছে। তারপরে আর ওদিকে দোকানদারের কাছেও খাদ্যশস্য মিলে না। সরহানে যবের আটা টাকা টাকা সের, আর চাউল এক সেরের দাম দেড় টাকা। সরহানের ওপাশে কোন যাত্রী যায় ত তার পক্ষে উপবাসের পুণ্য অনায়াস-লভ্য। রোড ইন্‌স্পেক্টরকে যেখানে অনাহারে থাকিতে হয়, সেখানে মেথরদের আর কথা কি?

হিমাচল প্রদেশ-সরকার যদি সিমলা বা নারকুণ্ডায় গম-ধান ইত্যাদি মজুত করিয়া রাখে ত কিন্নরেরা মেষ ও ছাগের পিঠে তাহা চীনী, আর চীনীর ওদিককার সব স্থানে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। কিন্নর দেশে বর্ষা হয় না। এ স্থান ফলচাষের উপযুক্ত। গত দুই বৎসর হইতে এখানে ভয়ানক খাদ্যাভাব চলিতেছে। যেখানে এক মণ লবণের দাম পঞ্চাশ টাকা সেখানে আকাল নয় ত কি?

'পাগলের' পাল্লায়

রোগী একটি গ্রাম। চীনীর নিকটে। পরীখকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর বাড়ী যাই। সেখানে বিদ্যার্থী শেরসিং থাকে। দুই বছর আগে অলোক আশ্রমের বিদ্যালয়ে সে আমার কাছে পড়িত। সন্তোষদাসজী ওখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্নর দেশের উন্নয়ন কি ভাবে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি একটি লোক আমার পাশে আসিয়া বসিল। পরিচয় নাই, কথা নাই, বার্ত্তা নাই সে বলিল—"চার ছেলে ও চার বিঘা জমি আমি সরকারকে দিচ্ছি। আপনি নিন। ছেলেদের ফৌজে ভর্ত্তি করে দিন। আমার জমি হচ্ছে চীনীর পাশে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডের সংলগ্ন।" জিজ্ঞাসা করিয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর কাছে জানিলাম লোকটি এক লামা। নাম তার সমমপায়া জঙ্গ। চিকিৎসা-ব্যবসায়ও সে করে। দুই মিনিট পরে লামা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয় বারে গোঁফে তা দিয়া বলিল—"আমার মত দাতা কে? চার চার ছেলে আর চার চার বিঘা জমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার যদি পনরটি ছেলে থাকত তাদের সকলকেই আমি দিয়ে দিতাম।" লামা আমাদের কথা শুইতে দিল না। একই কথা সে বার বার বলিতেছিল। ভুক ভুক করিয়া তার মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছিল।

বলিলাম—"লামাজী, মহাত্মা বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধী মদের অশেষ নিন্দা করেছেন। মদ আর খাবেন না।"

"হাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু আমার কথা টুকে নাও—চার ছেলে, আর চার-ছ বিঘা জমি।"

নোটবুকে তার নাম লিখিয়া লইলাম তবে না অব্যাহতি।

জলও বরাদ্দ

থিয়োগ রমণীয় স্থান, শিমলা-নারকুণ্ডা রাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে হাই স্কুল, হাসপাতাল ও আদালত আছে। থিয়োগে টাউন-এরিয়া কমিটি আছে। লোকসংখ্যা দেড় হাজারেরও অধিক। পনর শত লোকসংখ্যাকে পাহাড়ে খুব বেশী বলিতে হইবে। জলের এখানে ভয়ানক অভাব। শীতকালে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলিয়া পড়িতে থাকে তখন চারিটি চৌবাচ্চায় তাহা ধরিয়া রাখা হয়। এপ্রিল, মে, জুন তিন মাস জলের এখানে নিদারুণ কষ্ট। নির্দ্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চার তালা খোলা হয়, তখন রেশনের মত বরাদ্দমাফিক জল মিলে। মে'র শেষ সপ্তাহে আমরা যখন চীনী হইতে ফিরিলাম তখন শুনিলাম যে এক টাকায় এক কলসী জল বিক্রী হইতেছে।

আমাদের মনে হয়, হিমাচল প্রদেশ থিয়োগ কমিটিকে একটি মোটর কিনিয়া দিলে এই জলাভাব দূর হইতে পারে। নারকুণ্ডাগামী মোটর-রাস্তার উপরে আট মাইল দূরে জল আছে মোটরে তাহা লইয়া যাওয়া সম্ভব। অন্য একটি ব্যবস্থাও হইতে পারে। থিয়োগের দুই মাইল নীচে খাঁড আছে। নল বসাইয়া ইঞ্জিন সাহায্যে সেখান হইতে জল তোলা যাইতে পারে। মোটর দ্বারা জল-বহনের প্রশ্ন ব্যবহারিক ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাপেক্ষ। প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ জল পয়সা লইয়াও বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক কলসীর দাম এক টাকা পড়িবে না। অনেক কম হইবে। এখানকার আবহাওয়া শান্ত ও স্বাস্থ্যপ্রদ, জমি খুবই উত্তম। আর ইহা সিমলারও নিকটবর্ত্তী। পরীখজী ও আমি যখন থিয়োগে যাই তখন কোন লোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম —"অন্য সব দিক হইতে থিয়োগ স্বর্গ, জলের কথা বলেন ত নরক।"

নরমেধের বলি হরিজন

মহাপুরুষ দত্তাত্রেয়ের নামে শতদ্রুতীরে দত্তনগর নামক গ্রাম। এখানে ২৮ ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে কুড়ি ঘর কোলী (হরিজন) আর চার ঘর ব্রাহ্মণ। দুইটি দোকান। দোকানদার অনন্তরাম হালবাঁই আদর করিয়া আমাদের

দত্তাত্রেয় স্বামীর ও দেবীর মন্দির দেখাইল। কথিত আছে, পরশুরামজী সত্যযুগে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দত্তনগর হইতে ১৮ মাইল দূরে শতদ্রু তীরে নরমন্ত (কুলুর রবং পরশুরামজীর মন্দির বর্ত্তমান। শুনিলাম বার বছর পর অন্তর্গত) পর দত্তনগরে নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরের ছাদ হইতে একটি মোটা দড়ি ঝুলিতেছে। লোকে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যে লোক দড়ি চড়িবে, যজ্ঞের ছয় মাস আগে নিজ হাতে সে ৫৬০ গজ লম্বা একটি দড়ি পাকাইয়া বলির জন্য প্রস্তুত হয়। বলির দিনে লাখো লাখো লোক তাহা দেখিতে আসে। দড়ির এক দিক উচ্চ শিখরের একটি খুঁটায় বাঁধা হয়, অপর প্রান্ত মন্দিরের পাশে ময়দানের অপর একটি খুঁটায়। যে বলি হইতে চায় সে ঐ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দড়িতে উপবিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে উপর হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মিনিটকয়েক মধ্যে ৫৬০ গজ ব্যবধান দড়ির উপর দিয়া সে অতিক্রম করে। কাজটি নেহাতই ভয়াবহ। মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অনেক সময় ঘর্ষণের দরুন দড়িতে আগুনও ধরিয়া যায়। তাই দড়ি যে চড়ে তাহার পিঠে একটি জলাধার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িতে থাকে। যে লোক এতটা দূর নিরাপদে পৌঁছিয়া যায়, জনসাধারণ, এমন কি মহারাজ স্বয়ং তাহাকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। বারিপাতের জন্যই নাকি এই নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অধিকাংশ স্থলে হরিজন শ্রেণীর লোকেরাই নরমেধ যজ্ঞের বলি হয়।

আমাদের ভ্রমণ-কথা এখানেই শেষ হইতেছে। এই অনগ্রসর সীমান্ত প্রদেশে কত কাজ যে করার আছে, এই লেখা পড়িয়া, আশা করি, লোকহিতব্রতী সংস্থাসমূহ তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন, আর পারস্পরিক সহযোগিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

বৃহত্তর ভারত

শ্রীকরুণাময় বসু

শ্যামল বনশ্রী দ্বীপ
যেন কাঁচপোকা টিপ
সমুদ্র-মেখলা রূপসীর,—
যৌবন হেথায় নতশির
শস্যে ফলে প্রাচুর্য্য সম্ভারে,
বসন্তের পুষ্প উপহারে।

প্রশান্তির ধ্রুব বাণী
উৎকীর্ণ রয়েছে জানি
পর্ব্বতের খোদাই অক্ষরে,
মন্দিরের কারুশিল্পে, শরতের স্বচ্ছ নীলাম্বরে
ছায়াঙ্কিত বনের পাতায়,
চাঁদ উঠা জ্যোৎস্নারাতে ফুলের লতায়।
বহুদিন
এই দ্বীপ রয়েছে নবীন
গভীর প্রাণের রসে,
লসিত শ্যামল রঙে, প্রেমের পরশে।

অকস্মাৎ উঠিয়াছে ঝড়,
সেই কল্লোলিত স্বর,—
তীর হ'তে তীরে
ধ্বনিত করিয়া ফিরে
জীবনের মুক্তির বারতা ;
বিদ্রোহের সেই কথা
অকস্মাৎ
করেছে আঘাত
ভারতের মর্ম্ম-উপকূলে ;
আত্মীয়তা লভিলাম আঙুলে আঙুলে।
প্রাণ যারা দিতে জানে,
প্রাণের নিবিড় যোগ তাহাদের টানে,--
এই সত্য করিনু স্বীকার।
আজ তাই করি অঙ্গীকার
তোমাদের কাছাকাছি
আমরাও আছি,
জয় হউক ইন্দোনেশিয়ার।

দুরাশা

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রব

এল্‌বে নদীর মোহনা। বিপুলবক্ষ আটলান্টিক মহাসাগরে এসে মিশেছে প্রশস্ত জলধারা। এপারে একটা নৌ-আস্তানা, সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে সুরক্ষিত তার পোতাশ্রয়গুলো। সমুদ্রচারী সাবমেরিনগুলো সেখানে এসে আশ্রয় পায়। দু-চার দিন বিশ্রাম করে, তেল-রসদ গুলি-বারুদ বোঝাই করে নেয়, আবার বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে মাঝ দরিয়ায়। জলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে হিংস্র হুঁশিয়ার জলজন্তুর মত। আস্তানার কাছাকাছি এসে যখন হঠাৎ জলগর্ভের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠে উপরে তখন তাদের কালো কালো ইস্পাত-কঠোর চেহারা দেখলে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয় অতিকায় হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী বুঝি! ধীরে ধীরে ইউ-বোটগুলো এসে আশ্রয় নেয় তাদের নির্দিষ্ট খোলের মধ্যে।

ডাঙায় আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে ছোট ছোট দালান-কোঠা ঘরবাড়ী; তাদের ছাদের উপরিভাগ নানাবর্ণে বিচিত্রিত আকাশ থেকে শত্রু-বৈমানিকেরা যাতে সহজে চিনতে না পারে জায়গাটার আসল চেহারা, সেইজন্যেই ঐ কৌশল। এ আস্তানাটা আগে ছিল না, লড়াইয়ের প্রয়োজনেই গজিয়ে উঠেছে হালে। শহর এবং লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূর, ভারি নির্জন জায়গাটি। কেবল তারাই এখানে থাকে যারা সংশ্লিষ্ট এই নৌ-আস্তানার কাজকর্মের সঙ্গে, তাদেরই জন্যে তৈরি হয়েছে ঐ সব ছোটখাটো ঘরবাড়ী। এই ক্ষুদ্র একটু জনপদের ওপাশ থেকে সুরু হয়েছে বনভূমি।

একটা লাইট রেলওয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে শহরে প্রায় বিশ মাইল দূরে, একঘেয়ে নির্জনবাসে যে সব কর্মী ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করে, সপ্তাহে দু'দিন এক দিন চলে যায় শহরে, নাচগান, আমোদ-আহ্লাদ করে, প্রচুর মদ খায়, তারপর ফিরে আসে যে-যার কাজে। এমনই করে চলে এখানকার প্রাণহীন জীবনযাত্রা, কঠোর নিয়মের শৃঙ্খল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মানুষগুলো যেন একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের ছোট ছোট চাকা। মনে নেই কল্পনার প্রসার, কর্মে নেই স্বকীয়তা, আচরণের মধ্যে নেই নূতনত্ব, সকলেই যেন এক ছাঁচে ঢালা, একই কারখানার তৈরি।

ওপারে সারাদিন বাঁধা থাকে দুখানা ড্রেজার (মাটি-কাটা জাহাজ), আর কয়েকটা টহলদারী জাহাজ। টহলদারী জাহাজগুলো একটার পর একটা পালা করে ডিউটি দেয়—উপকূলের ধার ঘেঁষে তারা চব্বিশ ঘণ্টা দেয় পাহারা। শত্রু অথবা সন্দেহজনক জাহাজ যাতে কাছে ভিড়তে না পারে সেইজন্যে তাদের এই সতর্কতা।

উজানের দিকে নদীর ভাঙন সুরু হয়েছে, তাকে ঠেকাবার জন্যে দিনরাত্রি খাটছে এক দল শ্রমিক আর তাদের ইঞ্জিনীয়ার। রেলওয়ে ট্রাকের উপর এসেছে একটা ভার্টিকাল বয়লার, তার সঙ্গে খাটছে একখানা ষ্টীম-হ্যামার। দুম্‌-দুম্‌ করে পিটে পিটে বড় বড় নরওয়েজিয়ান ওক্‌ কাঠের খুঁটিগুলো দেখতে দেখতে বসিয়ে দিচ্ছে মাটির মধ্যে, তার পেছনে এসে পড়ছে বড় বড় ব্যালাষ্ট ট্রেন বোঝাই পাথরের বোল্‌ডার। ঠোকর খেয়ে জলের স্রোত ঘুরে বেঁকে যাচ্ছে; দিনের বেলায় তেমন প্রকট হয় না যান্ত্রিক হাতুড়ির শব্দ, কিন্তু রাত্রিবেলায় বহু দূর পর্য্যন্ত ভেসে যায় তার তীক্ষ্ণ কর্কশ প্রতিধ্বনি।

আস্তানার অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন জোয়াকিম্‌ শীয়ার বিপত্নীক বুড়ো মানুষ; নির্ঝঞ্ঝাট স্বভাব; নির্জনতায় ক্লান্ত অথবা কাবু হবার পাত্র তিনি নন। মদের অভ্যাস আছে, ঘরে বসেই পান করেন; শহরেও যান না, অথবা মাতলামিও করেন না। যৌবনসুলভ মত্ততার অতীত তিনি এখন। গম্ভীর মন্থর স্বভাবের লোক, কঠোর নিষ্ঠাবান কর্মী। জুঙ্কার-প্রুশিয়ান ভূস্বামীদের মত আছে একজোড়া বিপুল গোঁফ; যেন দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্পের প্রতীক।

পোতাশ্রয় থেকে খানিকটা তফাতে ক্যাপ্টেন শীয়ারের বাংলো। লড়াইয়ের বাসা যেমন হয়ে থাকে আর কি। আড়ম্বরহীন সাদাসিধে ধরণের কুটি। তারই সংলগ্ন তাঁর আপিস। তার পেছনে আছে প্রকাণ্ড দুটো বেতার-সঙ্কেতের মাস্তল। আপিসের মধ্যেও আছে নানা রকম কলকব্জা, হরেকরকম সামুদ্রিক মানচিত্র। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই ক্যাপ্টেনের কাটে আপিস ঘরের মধ্যে। সমুদ্রের উপর বিভিন্ন জাহাজ থেকে বিভিন্ন রকম সাঙ্কেতিক খবর এসে পৌঁছাচ্ছে সেখানে, সেগুলো চালান যাচ্ছে হেড কোয়ার্টারে, আবার হেড কোয়ার্টার থেকে যে সব খবর আসছে তা বিলি হচ্ছে সমুদ্রে। ক্যাপ্টেন রিসিভার কানে দিয়ে ঘন ঘন সংবাদ সংগ্রহ করছেন আর ম্যাপের উপর আঁকজোক করছেন। এই ওঁর কাজ, এই কাজেই উনি দিনরাত মশগুল। পাশের আলমারিতেই থাকে মদের বোতল আর গেলাস, কলিং-বেল বাজালেই বেয়ারা এসে ঢেলে দিয়ে যায়।

ক্যাপ্টেনের কন্যা ম্যারিয়া, থাকে তার বাপের সঙ্গেই এই পোতাশ্রয়ের বাংলোতে। দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, তন্বী তরুণী। বছর বাইশেক হবে বোধ হয় বয়স, মাথায় এক গুচ্ছ রেশম-চিক্কণ মসৃণ কেশ, তাতে সোনালী আভা, রক্তিম

গৌরবর্ণ, নীলাভ দুটি চক্ষু, যেন আকাশ আর সমুদ্রের নীলিমার প্রতিবিম্ব। ম্যারিয়ার কোন প্রয়োজন নেই এই নৌ-আস্তানার নির্জন নির্বাসনের মধ্যে পড়ে থাকবার, কোন কাজ করে না এখানে সে, তবু থাকে বাপের কাছে। শহরে বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে অনায়াসেই থাকতে পারে। ওর বয়সে এমন একঘেয়ে নির্জনতা হয়ত মানায় না ঠিকমত; হয়ত আমোদ-আহ্লাদ আর নাচগানের মজলিশেই ওকে মানায়। কিন্তু ম্যারিয়া ঘেঁসে না সেদিকে, এই জনহীন সমুদ্রতট তাকে যেন মায়ামুগ্ধ করে রেখেছে। একা একা ঘুরে বেড়ায় নদীর পাড় দিয়ে বনের কিনারে কিনারে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে জলের ধারে, উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কত নূতন নূতন জাহাজ প্রবেশ করছে নদীর মোহনায়, আবার কত কত যাচ্ছে বেরিয়ে। মনে হয় কোন একটি বিশেষ জাহাজকে সে খোঁজে।

সত্যই তাই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ম্যারিয়া এই নির্জন নৌ-আস্তানায় প্রতীক্ষা করে বসে থাকে বিশেষ একখানি ইউ-বোটের জন্য, একটি উজ্জ্বল কালো রঙের সাবমেরিন, তার নম্বর U-59, কমাণ্ডারের নাম জোদ্‌লে। বলিষ্ঠ তরুণ, নির্ভীক, দুঃসাহসী যোদ্ধা। কমাণ্ডার জোদ্‌লে মাঝে মাঝে ফিরে আসে পোতাশ্রয়ে, বোঝাই করে নেয় তেল-রসদ গুলি-বারুদ, আবার তার ইউবোট নিয়ে উধাও হয়ে যায় দূর নীল সমুদ্রে। জলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে, শত্রু-জাহাজের সন্ধান পেলে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়। রসদ ফুরালে ফিরে আসে আস্তানায়। যেবার সমুদ্রের উপরেই কোন জাহাজ থেকে রসদ পায় সেবার পোতাশ্রয়ে ফিরে আসতে দেরি লাগে দুই-তিন সপ্তাহ। তা নইলে পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে এক কি দেড় সপ্তাহের মধ্যেই। প্রায় পনের দিন আগে কমাণ্ডার জোদ্‌লে বেরিয়ে গেছে তার জাহাজ নিয়ে আজও ফিরে আসে নি। মনের মধ্যে একটা রুদ্ধ উদ্বেগ নিয়ে ম্যারিয়া একা একা ঘুরে বেড়ায় সাগর-মোহনার বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে। মাঝে মাঝে সাগ্রহ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূর সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে। হয়ত কোন কালো বিন্দু জেগে উঠেছে সেখানে, হয়ত বা কোন জাহাজ। সাঁ সাঁ করে আসে বাতাসের শব্দ, তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের গর্জন, দেখতে দেখতে সেই ক্ষুদ্র কালো বিন্দু হারিয়ে যায় কোথায়!

বাপ জানেন মেয়ের মনের কথা; কিন্তু কঠোর নিয়মনিষ্ঠ 'মিলিটারিয়্যান' তিনি। স্নেহ-মমতার চেয়ে 'ডিউটি' তাঁর কাছে বড়। তাঁর আচরণের মধ্যে আভাস নেই কোন আবেগ অথবা দুর্বলতার। ইউবোট (U-59) সমুদ্রের কোন্ অবস্থায় কোথায় কখন থাকে সে খবর তিনি প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকেন বেতার-সংবাদে। কিন্তু সচরাচর মেয়েকে জানান না কিছু। তবে মাঝে মাঝে যে দু'একটি খবর না জানান তেমন নয়। যেমন ম্যারিয়া শুনেছে তার বাপের কাছ থেকে পাঁচ দিন আগে U-59 ছিল হেলিগোল্যাণ্ড্ বাইটের কাছাকাছি; দুই-এক দিনের মধ্যেই যে জাহাজখানা পোতাশ্রয়ে ঢুকবে এ ধারণা খুবই সঙ্গত। প্রতিদিন প্রত্যূষে উদ্‌গ্রীব আশা নিয়ে ম্যারিয়ার ঘুম ভাঙে। সে ভাবে কমাণ্ডার জোদ্‌লের প্রত্যাবর্তনের শুভসংবাদ আজকে নিশ্চয় পাবে।

অবশেষে এক দিন সত্যিই ফিরে এল কমাণ্ডার জোদ্‌লে। হাসিহাসি মিষ্টি মুখে অভিনন্দন জানায় ম্যারিয়াকে—ক্লবলিন ম্যারিয়া সুপ্রভাত।

—হেইল জোদ্‌লে! আহ্লাদে আবেগে ম্যারিয়া জড়িয়ে ধরে তট-প্রত্যাগত নৌ-সৈনিককে; এক নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করে—এবার এত দেরি হ'ল যে!

তেমনি হাসিমুখে জবাব দেয় জোদ্‌লে—এবারকার চক্করটা ছিল খুব লম্বা। প্রথমে গেলাম অর্কনিজ, সেখান থেকে সেট্‌ল্যাণ্ড্‌স, স্কাপাফ্লো হয়ে নরওয়ের দরিয়া ঘুরে তবে এলাম, পথে একটা জোগানদার জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়ায় রসদ নিয়ে নিয়েছিলাম তাই আর অসুবিধের পড়তে হয় নি।

এবার যে প্রশ্ন করতে গেল ম্যারিয়া তাতে তার নিজেরই বুকখানা একটু কেঁপে উঠল। একটু যেন ইতস্ততঃ করছিল, তবু শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললে—ক'খানা জাহাজ ডোবালে এবার?

—সঠিক হিসেব দেওয়া শক্ত, তবে সবসুদ্ধ আট-দশখানা হবে বোধ হয়। সব সময়ে তো নিশ্চিত প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করা যায় না, শত্রুর আক্রমণের ভয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে আসতে হয় টর্পেডো ছুঁড়েই। দু'-একখানা জাহাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বৈ কি!

ম্যারিয়ার মুখের উপর একটা করুণ বেদনার ছায়া নামে, নম্র মিনতির সুরে বলে—আচ্ছা, সত্যিই কি, একটুও অনুকম্পা, একটুও দয়া হয় না তোমাদের মনে! নিরীহ নিরপরাধ যাত্রীদের অকূল সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও।

—দয়া দেখাবার কোন আইন নেই আমাদের ম্যারিয়া, আমরা শুধু জানি হুকুম। আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে শত্রুর মাল অথবা রসদ আছে এমন কোন জাহাজ দেখলেই ডুবিয়ে দিতে। কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ সে বিচারের ভার নেই আমাদের হাতে। আর তেমন বিচার করতে গেলে লড়াই করা চলে না। শত্রুর বিমান এসে যখন আমাদের বড় বড় নগর অথবা কারখানার উপর বোমা ফেলে, তারা তো নির্বিচারেই ফেলে, রেহাই দেয় না নারী, শিশু অথবা নিরপরাধকে। সবার উপরে জন্মভূমি, দেশ, দেশের জন্য হত্যায় পাপ নেই, মৃত্যুও গৌরবজনক।

ম্যারিয়া বলে—দেশের উপরেও মহত্ত্ব।

হোঃ হোঃ করে অট্টহাস্য করে ওঠে জোদ্‌লে—তোমার মুখে মানায় না অমন কথা. তুমি হচ্ছ সৈন্যাধ্যক্ষের মেয়ে। তোমার বাপ ক্যাপ্টেন শীরার সেনাবিভাগের এক জন প্রধান বীর। মেয়ের মুখে অমন কথা শুনলে নিশ্চয় তিনি হেসে খুন হবেন। যাক্‌ ও সব, যাবে তো আমার সঙ্গে আজকে বিকেলে শহরে বেড়াতে?

ঠোঁট উল্টে ম্যারিয়া বলে—শহরে গিয়ে সেই মদ খাওয়া আর নাচানাচি করা তো! ভাল লাগে না ও সব আমায়, আমি যাব না।

—আরে না, না, আজকে মদ খাব না তোমায় কথা দিচ্ছি। যাব এক বার হাসপাতালে, "পল"কে দেখতে। সেই যে এর আগের চালানে একজন আহত সৈনিককে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, মনে নেই বুঝি তোমার? ঐ যে ছেলেটা টর্পেডো ছুঁড়তে গিয়ে আগুনের হল্কায় পুড়ে গিয়েছিল!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ম্যারিয়া। জোদ্‌লের সঙ্গে তার খুব ভাব। U-59 সামুদ্রিক সফর শেষ করে পোতাশ্রয়ে ফিরে এলে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ হয়। অনেক কথা হয় দু'জনাতে। আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় ক্ষণিকের মিলনটুকু ভরে উঠে বেদনায় ও নিবিড়তায়। ম্যারিয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জোদ্‌লেকে তার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, বিপদ-আপদের সবিস্তার বিবরণ। ওরা একসঙ্গে যায় শহরে বেড়াতে। কিন্তু জোদ্‌লে একবার মদের আড্ডায় ঢুকে পড়লে তলিয়ে যায় সেখানে। কার সাধ্য তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে! ম্যারিয়া তখন একা একাই ফিরে আসে নৌ-আস্তানায়। তীরে এসে যে ক'দিন ছুটি পায় জোদ্‌লে, সে চায় মদ খেয়ে আর স্ফূর্তি করে উড়িয়ে দিতে। ম্যারিয়া চায় তাকে শান্ত এবং ভদ্র জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে; যথেচ্ছাচার ও মাতলামির পথ বন্ধ করতে। কিন্তু সহজ নয় সে কাজ।

ম্যারিয়া জিজ্ঞেস করে—কেন মদ খাও অত বল তো! উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচারে নিজেকে যে একেবারে উজাড় করে ফেললে!

—মদ না খেলে লড়াই করা যায় না ম্যারিয়া। কোন একটা নেশা এবং উত্তেজনা সৈনিক-জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। প্রতি মুহূর্তে যারা মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে বাস করে, জীবনের প্রতি মমতা এবং আশা তাদের কম। তাদের রুচি এবং আকাঙ্ক্ষা সহজেই নেমে আসে পাশবিকতার স্তরে। সহজেই তারা হয়ে ওঠে উদ্দাম, মাদকতা এবং উন্মাদনার বলেই তারা উপেক্ষা করে মৃত্যুভয়। নচেৎ সহজে কি কেউ মরতে চায়!

খানিকটা নিজের মনে কি যেন ভেবে নিয়ে ম্যারিয়া বলে—ছেড়ে দাও এই সৈনিকবৃত্তি, কি হবে এমন ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে গিয়ে, তার চেয়ে বরং সংযত শান্ত জীবনের মধ্যে ফিরে এসো।

আবার হেসে জবাব দেয় জোদ্‌লে—আমি ছাড়লেও দেশের আইন আমায় ছাড়বে কেন? যত দিন দেহে শক্তি-সামর্থ্য থাকবে তত দিন আমি লড়াই করতে বাধ্য। হঠাৎ মৃত্যু অথবা সাংঘাতিক জখম না হলে যুদ্ধের কবল থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আর ছাড়বই বা কি করে এ পথ লোকে বলবে ভীরু কাপুরুষ, সে অপবাদ সইব কেমন করে?

ক্রমলিন ম্যারিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে ক্যাল্‌ ক্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে জোদ্‌লের দিকে; কোন জবাব দেয় না। সেদিন বিকেলে ওরা দু'জনে গিয়েছিল শহরে মিলিটারি হাসপাতাল দেখতে। ম্যারিয়ার মাথা ঘুরে যায়, অস্বস্তি বোধ করে। উঃ, কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! সারি সারি খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে শত শত আহত যোদ্ধা। কারও মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারও পা উড়ে গেছে, কেউ বধির, কেউ পঙ্গু, কারও বা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, কেউ কাতরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, ছটফট করছে। কারও জীবনদীপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অচিরেই নির্ব্বাপিত হবে, তাকে আলাদা করে সরিয়ে ফেলবার জন্য ষ্ট্রেচার-বাহকেরা এসে হাজির হয়েছে। ম্যারিয়ার বুক কাঁপে, অস্বস্তি বোধ করে, বলে—চল, আর ভাল লাগছে না।

বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় ও যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। আইডোফরম্‌ আর ওষুধের গন্ধে হাসপাতালের আবহাওয়াটা যেন কেমন জমাট আর ভারী, তার সঙ্গে বিকলাঙ্গ আহতদের আর্ত্তনাদ মিশ্রিত হয়ে কেমন যেন একটা দুঃসহ বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

তার পর দিন আবার ওরা গিয়েছিল শহরে। প্রথমে কথা ছিল, জোদ্‌লে মদ খাবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারে নি সঙ্কল্প রক্ষা করতে। একটা নাচ-ঘরের সামনে এসে মিশে গেল মদের আড্ডায়। তরুণী নর্ত্তকীদের দেহসজ্জা ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে যৌবন-মাদকতা ফেনিল হয়ে উঠেছে। তাদের ঘিরে ঘিরে ভিড় জমেছে স্বদেশ-প্রত্যাগত পল্টনগুলির, যেন গেঁজে-ওঠা মদের উপর একদল তৃষ্ণার্ত্ত মাছি। জোদ্‌লের মনের তলায় যে তৃষিত এবং বুভুক্ষু লোলুপতা অসাড় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে দিনের বেলায় সভ্যতা ও ভদ্রতার চাপে, সে যেন হঠাৎ মাতাল হয়ে ক্ষেপে ওঠে—সুলভ নারী ও সুরার গন্ধ পেয়ে। সমুদ্র-পর্য্যটক ঘরছাড়া নাবিক, দীর্ঘ উপবাসক্লিষ্ট জানোয়ারের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভোজ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে। জোদ্‌লে মিশে যায় মাতালদের ভিড়ে, ম্যারিয়া নিজেকে সরিয়ে রাখে মজ-লিসের এক পাশে।

পোতাশ্রয়ে ফেরবার শেষ গাড়ী রাত্রি এগারোটায়। একবার মজলিসে ঢুকলে হুঁশিয়ারহুঁশ ভুলে যায় জোদ্‌লে। খেয়ালই ছিল না যে কালকে সকালেই আবার বেরুতে হবে

জাহাজ নিয়ে সমুদ্র-যাত্রায়। যে দু'দিনের ছুটি পেয়েছিল তার মেয়াদ আজই রাত তিনটের পর থেকে ফুরিয়ে যাবে। কাজেই আজ রাত্রেই তার পোতাশ্রয়ে ফিরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কথাটা ম্যারিয়া নিজেই আগ্রহ করে জানায় জোদ্‌লেকে। হাজার হলেও সৈনিক সে, ডিউটির সময় আসন্ন হয়ে আসছে এ খেয়াল হতেই হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে, তখুনি বেরিয়ে পড়ল নাচঘর থেকে, মদের শেষ গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে। যে করেই হউক রাত্রি এগারোটার ট্রেন ধরতেই হবে। কাল প্রভাতেই আবার সুরু হবে সমুদ্র-যাত্রা, আবার সেই সীমাহীন নীল জল আর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের নৃত্য। তারই মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দিবারাত্র টহল দিতে হবে শত্রু-শিকারের সন্ধানে।

নাচ-ঘর থেকে বেরিয়ে কমাণ্ডার জোদ্‌লে সোজা চলে এল ষ্টেশনে, সঙ্গে তার ম্যারিয়া। গাড়ী ছাড়তে আর বড় দেরি নেই। দুপুর-রাতের গাড়ী, যাত্রীর ভিড় নেই বললেই চলে। পোতাশ্রয়ের টার্মিনাসে ওরা যখন এসে পৌঁছল, তখন নির্জ্জন নিস্তব্ধ অন্ধকার জমাট বেঁধে নেমেছে। দূরে ডক্ আর নৌ-আস্তানার ঠুলি-লাগান বিজলী বাতিগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। রাইফেলধারী ষ্টীল-হেল্‌মেট-পরা নৈশ প্রহরী মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'এক জন। মাত্র দু'জন যাত্রী, জোদ্‌লে আর ম্যারিয়া নামল ষ্টেশনে। খানিক দূর যেতে হবে দু'জনকে একসঙ্গে, তারপর হবে ছাড়াছাড়ি।

সত্যি কথা বলতে গেলে ম্যারিয়ার মনে মনে যে ভয় একটু না করছিল এমন নয়। বলিষ্ঠ পুরুষ জোদ্‌লে, তার ওপর মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে। জনহীন রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ ওর সংযম ও শিষ্টাচারের বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে কতক্ষণ।

ম্যারিয়ার ভয় মিথ্যা নয়। মদের নেশার সঙ্গে নিঃসঙ্গ তরুণীর নিভৃত সান্নিধ্য হঠাৎ যেন ওর মগজে আগুন ধরিয়ে দিল। নিজেকে সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। দৃঢ় মুষ্টিতে খপ করে ম্যারিয়ার হাত চেপে ধরে বলে, ম্যারিয়া, তুমি তরুণী, রূপসী, এই নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে আমার পাশে একাকিনী, আর আমি হচ্ছি একজন তৃষাতুর যুবক। তুমি কি মনে কর আমার পক্ষে সংযত থাকা এতই সহজ!

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে প্রথমটা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ম্যারিয়া। জোদ্‌লে ওকে স্পর্শ করতেই তার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ দৃঢ় এবং কঠিন কণ্ঠেই জবাব দিলে, জোদ্‌লে তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি কে! আমি তোমার প্রভু জোয়াকিম পীয়ারের কন্যা। আমাকে অপমান করবার জন্ত তোমাকে যথাযোগ্য শাস্তি পেতে হবে। তুমি তোমার মিলিটারী ডিসিপ্লিন (সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা) ভঙ্গ করছ।

বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন হঠাৎ চমকে ওঠে, ক্যাপ্টেন পীয়ারের নাম শুনে তেমনি চমকে উঠল জোদ্‌লে। তার শিথিল মুষ্টি খলিত হয়ে পড়ল, ম্যারিয়ার হাতের কব্জি থেকে। ওরা নিঃশব্দে চলল, বাকী পথটুকু কেউ একটা কথা বললে না। চৌরাস্তার কাছে এসে জোদ্‌লে চলে গেল নেভী-ক্যাম্পের দিকে আর ম্যারিয়া ফিরে এল বাংলোতে।

পরদিন সকালেই ঘুম ভেঙ্গেছে ম্যারিয়ার। মনের মধ্যে কেমন যেন অশান্তি জমে উঠেছিল। গত রাত্রির অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ওর মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল, এমন সময়ে ভৃত্য এসে খবর দিলে, কমাণ্ডার জোদ্‌লে এসেছে—দেখা করতে চায়। ম্যারিয়া তাকে সোজা ভেতরে আসবার জন্তেই খবর পাঠাল। সামনে এসে দাঁড়াল কমাণ্ডার, যেন ঝড়ের শেষে নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র। কোন আলোড়ন, কোন চঞ্চলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। স্থির মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার চোখে; মুখের ওপরে নেমেছে সৌম্য সুশ্রীতার আভা। ও যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ, গত রাত্রির প্রমত্ত মত্তপায়ী জোদ্‌লের সঙ্গে এর যেন কোন সম্বন্ধ নেই। বিনীত নম্র কণ্ঠে জোদ্‌লে বলে, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি ম্যারিয়া, গত রাত্রির আচরণের জন্ত সত্যই আমি অনুতপ্ত। আমি তখন ছিলাম মাতাল এবং অন্ধ। চলে যাবার আগে ক্ষমা চেয়ে যাই আমার আচরণের জন্ত, মনে কোন গ্লানি রেখো না তুমি—এই আমার অনুরোধ।

জোদ্‌লের কথা শুনে চোখে জল ভরে উঠল ম্যারিয়ার। কমাণ্ডারের হাত ধরে যত্ন করে সে তাকে নিয়ে বসাল একটা চেয়ারে, বললে, তুমি বলবার আগেই আমি ক্ষমা করেছি জোদ্‌লে। বিশ্বাস কর, আমি তোমায় সত্যিই ভালবাসি।

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে ম্যারিয়া, আবার বলে—অনেকটা স্বগত উক্তির মত, ভেবে কি জান, আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি, তুমি শান্ত ও সুন্দর হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এস। তুমি ত্যাগ কর তোমার ঐ প্রমত্ততা, লোলুপতা ও বর্ব্বরতা। আমার জীবনের স্বপ্ন; একখানি অনাড়ম্বর গৃহ, তার প্রভু হবে তুমি আর আমি হব গৃহিণী। আসবাব উপকরণ নাই-বা থাকল প্রচুর, সেখানে থাকবে অফুরন্ত ভালবাসা, অপরিসীম ত্যাগ ও ধৈর্য্য। আমরা হব ঈর্ষা বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার অতীত; আমাদের জীবনের ব্রত হবে পরসেবা। তেমন একটি শান্তির নীড় আমাদের পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব জোদ্‌লে?

অবিশ্বাস আর করুণার হাসি ফুটে ওঠে জোদ্‌লের মুখে। সে বলে, তোমার স্বপ্ন সুন্দর ম্যারিয়া, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তা সফল হওয়া এ যুগে হয়তো একেবারেই অসম্ভব। শুনতে ভাল লাগে তোমার কথা, মনে একটা ক্ষণিকের আবেগও সৃষ্টি করে, কিন্তু তবু তা আমাদের যুগের নাগালের বাইরে। আধিপত্য আর কাড়াকাড়িই এ যুগের মূলকথা।

পরসেবা নয়, আত্মসেবাই আমাদের লক্ষ্য।—একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, ঘড়ি দেখে ফোদ্‌লে বলে, থাক ওসব ব্যর্থ আলোচনা। এবার তা হলে উঠি, আটটায় সময় আমার জাহাজ ছাড়বে।

ফোদ্‌লে উঠে চলে গেল। দুয়ারের চৌকাঠ ধরে উদাসীন দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে কয়েক মিনিট নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যারিয়া।

এপ্রিল মাসের শেষাশেষি এক দিন বিকেল বেলায়, নর-ওয়ের উপকূলের অদূরে বার্গেন বন্দরের দক্ষিণে U-59 টহল দিয়ে ফিরছিল। সমুদ্রের জলে কেমন যেন কালো থমথমে ছায়া, আকাশের রং ঘোলাটে, তরঙ্গগুলো ক্রমেই অধিকতর স্ফীতকায় ও গর্জনশীল হয়ে উঠছিল। নাবিকেরা বুঝল ঝড়ের পূর্ব্বাভাস, ব্যারোমিটারের চাপ কমে গেছে। হয়তো সন্ধ্যার আগেই সাইক্লোন উঠবে, এমন সময়ে হাইড্রোফোনে ধরা পড়ল একটা জাহাজের শব্দ। একখানা ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার ছুটে চলেছে ক্ষিপ্র বেগে, হয়তো ঝড় আসবার আগেই কোন বন্দরে আশ্রয় চায়। জাহাজের শব্দ শুনেই ইউবোটের নাবিকেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা তাদের করতে হ'ল না। পেরি-স্কোপের দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ল পতাকার। তিন-চার জন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ", ব্যস আর কিছু বল-বার দরকার নেই। নাবিকদের জানা আছে যথাকর্ত্তব্য। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের নিজের কাজে, আক্রমণের জন্য সকলেই প্রস্তুত। টর্পেডো টিউব ভর্ত্তি হয়ে গেছে ইতি-মধ্যেই। সাবমেরিনখানা ঘুরে ফিরে সন্তর্পণে গিয়ে ওৎ পেতে বসল ডেষ্ট্রয়ারের পথের উপর। টর্পেডোর রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়বার অপেক্ষামাত্র, তারপর নিক্ষিপ্ত হবে সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুবাণ।

ঐ যে এসে পড়েছে—দেরি নেই, সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টেপা হ'ল টর্পেডো টিউবের, একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিদীর্ণ হয়ে গেছে ডেষ্ট্রয়ারখানা। ডুবছে ধীরে ধীরে, ইউবোটের নাবিকদের মুখে উল্লাসের হাসি। কিন্তু সহসা এ কি! সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেন বিপুল এক জলস্তম্ভের প্রচণ্ড শক্তি সাবমেরিনটাকে হু হু করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে। সর্ব্বনাশ, শত্রু ডেপ্‌থ্‌ চার্জ্জ (জলবোমা) মেরেছে! সত্যিই তাই, ইউবোটখানারও অন্তিম দশা। বাম পার্শ্বভাগ ফেটে গিয়ে হু হু করে জল ঢুকছে। বাঁচবার আশা নেই। সমুদ্রের উপর তখন ঝড় ঘনিয়ে এসেছে, বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন মুহুর্মুহু হেঁকে চলেছে, তার সঙ্গে মাতাল হয়ে ক্ষেপে উঠেছে উদ্দাম তরঙ্গদল। ডুবন্ত ইউবোটের ডেকের উপর থেকে ওয়ারলেস্‌ অপারেটার ক্রমাগত বেতার-সঙ্কেত পাঠাতে লাগল S.O.S......S.O.S... S.O.S......(আমাদের জীবন রক্ষা কর)।

সেই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ এল্‌ব নদীর মোহনায় নৌ-আস্তানায় ক্যাপ্টেন শীয়ারের উঁচু বেতার মাস্তলেও ধরা পড়েছিল। তখন সেখানেও চলছে প্রচণ্ড সাইক্লোন। সাগর-সৈকত আর অরণ্যময় প্রান্তরের উপর দিয়ে মাতাল হাওয়া দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশ পেয়ে তখখুনি ছুটল এক দল রেস্‌কু শিপ (উদ্ধারকারী জাহাজ) ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে।

ম্যারিয়া শুনেছিল তার বাপের কাছে, কমাণ্ডার ফোদ্‌লের জাহাজ ডুবছে স্কাগাররাাক প্রণালীর কাছাকাছি। ম্যারিয়ার বুকের মধ্যেও ঝড় ঘনিয়ে এল, আকাশ ও দিগন্তজোড়া ঝড়ের সঙ্গে আজ তার অন্তর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে তার প্রতিটি মুহূর্ত্ত হয়ে উঠল দুর্ব্বিষহ।

পরদিন ঝড় থেমে গেছে। আকাশ হয়েছে উজ্জ্বল সুনীল-সোনালী রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে। বিপদের আশঙ্কা আর নেই। সামুদ্রিক পক্ষী 'সী-গাল' সার বেঁধে আকাশের গায়ে ডানা ছড়িয়ে অলস মেঘের মত মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে সুদূর সমুদ্রের পারে। হাওয়ার দাপট সইতে না পেরে কয়েকটা স্লুপ আর ফিসিংট্রলার আশ্রয় নিয়েছিল নদীর মোহনায়, তারাও ক্রমে ক্রমে নোঙর তুলে ছেড়ে যাচ্ছে। একে একে ফিরে এল রেস্কু-শিপের বহর। U-59-এর কয়েক-জন নাবিক রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু কমাণ্ডার ফোদ্‌লের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। সে তলিয়ে গেছে আটলাণ্টিক মহা-সমুদ্রের অতল গর্ভে।

সেদিন ম্যারিয়া সারা সকাল ধরে সমুদ্রতট আর অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পাগলের মত একা একা টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। বারংবার তার চক্ষু দুটি অশ্রু-প্লাবিত হ'ল, আর বারে বারে সে মুছে ফেলল।

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১২ এবং '১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের সুদক্ষ কিন্তু গোপন পরিচালনায় বাংলার বিপ্লববাদ পুরাদমে চলিয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ পত্রই "কোডে" (সাঙ্কেতিক অক্ষরে) আসিত। আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতাম। তিনি অর্থ সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিপন্ন মনে করিলেও, আমাকে পত্রযোগে তাহা জানাইতেন।

আমি তাঁহার অর্থাভাবের কথা পণ্ডিচারী হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। শুধু অর্থাভাব নহে—বস্ত্রাভাবের অত্যন্ত দুঃখও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি অতি দ্রুত তাঁহাকে কিছু টাকা এবং বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন, "তারযোগে তোমার টাকা এবং পত্র ও বস্ত্রাদি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি।"

"Your money by wire and letter and clothes reached safely."

এই সময়ে তাঁহার যে দারুণ অর্থকষ্ট, দূরে থাকিয়া তাহা সম্যক্ বুঝি নাই। তিনি এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় পণ্ডিচারী পৌঁছিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি চিরদিন ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয়-প্রবৃত্তি তাঁহার কোনদিন ছিল না। গীতার মন্ত্রভাব—ভগবানের উপরেই যোগ-ক্ষেমবহনের ভার দিয়া চলার সাধন-নীতিটা যেন তাঁর তখনকার জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমার নিকট তাঁহার যেটুকু অর্থ চাওয়া, তাহার মধ্যেও ঈশ্বর-প্রসাদই ছিল—নতুবা তাঁহার সেই দাবিটুকু-পূরণ করার প্রাণ লইয়াই আমার পক্ষে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না।

পণ্ডিচারী গিয়াই তিনি কোন এক বন্ধুর কিছু সহায়তা পাইয়াছিলেন—সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে কতখানি দিতে পারিব, সে বিষয়ে সবিশেষ ধারণা করার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চিন্তা বাধ্য হইয়াই করিতে হইত; কিন্তু কোথা হইতে অর্থ তাঁহার নিকট আসিবে; তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ এক দিন আসিবেই—এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় তিনি পোষণ করিতেন না। এক মান্দ্রাজী বন্ধু ১০০০ টাকা তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং যাহাতে পণ্ডিচারী বাসকালে অর্থাভাবে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে না হয়, তাহারও চেষ্টা করিবেন, আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুটির প্রতিশ্রুতি ও আশা কোনটিই সফল হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে পত্রযোগে আমায় জানাইয়াছিলেন:

"The last time he came, he brought a promise of Rs. 1000 in a month and some permanent provision afterwards, but the promise like certain predecessors may not yet be fulfilled and we sent him for cash. But though he should have been here three days ago, he has not returned and even when he returns, I am not quite sure about the cash and still less sure about the sufficiency of the amount."

শ্রীঅরবিন্দ শিশুকাল হইতেই ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন; সেকথা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। এই পত্রেও তিনি আমায় লিখিয়া জানাইলেন সকৌতুকে তাঁহার নিজের মনেরই কথা—"ভগবান যে ব্যবস্থা করিবেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু তাঁর এই দুষ্ট স্বভাবটুকু দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তিনি শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ছাড়েন না।"

"No doubt, God will provide, but He has contracted a bad habit of waiting till the last moment."

আমি তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কোন প্রকারে তাঁহাকে কিরূপে অধিক অর্থ পাঠাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার যৎকিঞ্চিৎ টাকা ও কিছু বস্ত্রাদি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। শুনিয়া আসিয়াছিলাম—তাঁহাদের পাঁচ জনের জন্য প্রতি মাসে অন্ততঃ ৭৫৲ টাকা খরচ হয়, আর শ্রীঅরবিন্দের নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য অন্ততঃ ১০৲ টাকা হাতে থাকা উচিত। আমি এই ৮৫৲ টাকা প্রতি মাসে পাঠাইবার জন্য অনুপ্রাণিত হইলাম। আমার আশা পূর্ণ হইল এবং প্রথম দফা টাকা যথারীতি প্রেরিত হইলে তিনি লিখিলেন:

"তুমি এবারকার ৮০৲ টাকা এবং মার্চ্চ মাসের জন্য ৮৫৲ পাঠাইয়াছ দেখিয়া আমরা খুবই আশ্বস্ত হইলাম।"

"It is a great relief to us that you are able to send Rs. 80/- this time and Rs. 85/- for March."

শ্রীঅরবিন্দের এই আকৃতি আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সেবার অবদান যোগাইবার প্রেরণা জাগাইয়াই তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ করিলেন—আমার মধ্য দিয়া কত অর্থসংগ্রহ ও অর্থাগমের উপায় সৃষ্টির প্রয়াস—তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হই। সে যুগে

তাঁহার অর্থসংগ্রহের সকল প্রচেষ্টাই আমাকে কেন্দ্র করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিল। বাংলায় রাষ্ট্র-সাধনায়ও যেটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছি তাহাও শ্রীঅরবিন্দের করুণায় সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি তাঁর কত আপনার জন মনে করিয়া তিনি আমার উপর একরূপ ক্ষুদ্র দাবি রাখিতেন, সেকথা ক্রমে বলিতেছি। তিনি চাহিতেন প্রচুর অর্থ। আমি তাঁহার কতটুকু দাবিই-বা পূরণ করিয়াছি—তাঁহার চাওয়ার মূল্য সেদিন তেমন করিয়া বুঝি নাই। আজ ভাবিয়া সে চাওয়ার কূলকিনারা পাই না। সেদিন কিন্তু বুঝি আমায় সান্ত্বনা দিবার ছলেই তাঁহার দাবি পূর্ণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকুই তাঁহার নিকট যেন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি আমার নিকট মাসিক ৮৫৲ টাকা পাইবেন—এই সামর্থ্যসৃষ্টির পর, তিনি আমায় তাঁর এক পত্র লইয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী ম্যাকা খাব্‌সারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখিলেন :

"'এম' অর্থাৎ মারাঠা বন্ধুকে একখানি পত্র দিলাম—আমার জন্য যদি তিনি কিছু দেন, অবিলম্বে তাহা আমার নিকট পাঠাইও।"

"I send enclosed a letter to our M. friend. If he can give you anything for me, please send this without the least delay."

শ্রীযুক্ত ম্যাকা খাব্‌সার একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। কলিকাতার বড়বাজারে তাঁহার কাপড়ের গুদাম ছিল। তিনি বাস করিতেন বালিগঞ্জে। আমি খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে আমায় পুলিসের চর বলিয়া বিদায় দিলেন, শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি কিন্তু সঙ্গে রাখিলেন। তাহার পরদিন আমি আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এবার বুঝিলাম তিনি সংবাদ লইয়া আমার কথা বিশেষ ভাবেই অবগত হইয়াছেন। তার পর শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন চন্দননগরে কি ভাবে ছিলেন এবং কিরূপেই বা পণ্ডিচারী গমন করিলেন, বিশেষ ভাবেই তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু টাকা তিনি আমার হস্তে দিলেন না, সহাস্যে বলিলেন—"আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেছি না, ইহা আপনি মনে করিবেন না। শ্রীঅরবিন্দের নামে অনেক টাকাই মধ্যবর্ত্তী লোকের হাতে পড়িয়া শেষ হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি, সোজাসুজি ভাবেই তাঁহার হাতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিব, অন্য প্রকারে নহে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। তাঁহাকে লিখিয়া জানাইতে পারেন—আমি ১০০০৲ টাকা তাঁহাকে 'গ্রীণ্ডলে কোম্পানী'র মারফতে প্রেরণ করিব।" আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চন্দননগরে ফিরিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলাম। তিনি যথাসময়ে 'গ্রীণ্ডলে কোম্পানী'র নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত ম্যাকা খাব্‌সারের টাকা পাইয়া তিনি এইবার পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ৪১ নং রু দে ফ্রাঁসোয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বাড়ীওয়ালার ১২০৲ টাকা ভাড়া বাকি ছিল। এই সময়ে বাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে কোন এক পাওনাদার নালিশ রুজু করায় এই টাকা শ্রীঅরবিন্দ নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন—এই কথাও তাঁহার পত্রেই জানিয়াছিলাম।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি চন্দননগর ফিরিয়াই শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় বিপ্লবের কাজে প্রবল ভাবে লাগিয়া যাই। শ্রীঅরবিন্দকেও এই কাজে কতকটা জড়াইয়া ফেলি। তখন অনন্যোপায় হইয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সেই সময়ে পণ্ডিচারী "ফ্রী পোর্ট" বলিয়া বিদেশ হইতে বহু দ্রব্য আমদানী হইত। আমার বিপ্লবী সহযোগিগণ স্থির করিলেন—পণ্ডিচারী হইতে রিভলভার আনা হইবে। ইহার ব্যবস্থার ভার বন্ধুরা আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমায় বাধ্য হইয়াই এই বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দকে জানাইতে হইল। তাঁহাকে ছয়টি রিভলভার ক্রয় করিবার জন্য নিবেদন করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমার দাবি অপূর্ণ রাখিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিক সতর্কতার বশে, রিভলভারগুলি হস্তগত হইলে তাহা তিনি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এইগুলি আমাদের নিকট পাঠাইবার সুযোগ বহুদিন মিলিল না। পণ্ডিচারীতে অনেক বন্ধু তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট তিনি যে তথায় যোগসাধনের নিমিত্তই আসিয়াছেন, এই কথাই বলিতেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত তাঁহার যে সংযোগ থাকিতে পারে, এই কথা তিনি একেবারেই গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালকে দিয়া ঐ রিভলভারগুলি অতি সন্তর্পণে ও সুকৌশলে লইয়া আসা হয়। কিন্তু মাটিতে এক বৎসরকাল প্রোথিত থাকায় যন্ত্রগুলি একপ্রকার অকেজো হইয়াই যায়। শ্রীঅরবিন্দ অতি সতর্কতার সহিত বাংলার বিপ্লব-সংহতির সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেন, তাঁহার পত্রই এই কথার সাক্ষ্য দিবে :

"I do not write to you this time about the despatch of the books, because that is a long matter and would delay the proofs, which have already been too long delayed. But I shall write a separate letter on that subject. I have also to write about your Tantric Yoga. But I think I shall have to await what else you have to tell me on that subject before doing so."

ইহার অর্থ অন্য কেহ বুঝিবেন না। আমি বুঝিলাম

তিনি 'গ্রন্থ' অর্থাৎ রিভলভারগুলি পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন এবং আমাকেও তিনি তান্ত্রিক যোগ অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন শুধু সাঙ্কেতিক ভাষায় নয় বিপ্লবের রাষ্ট্রসাধনাকে যথার্থই বীরাচারী শক্তিসাধনা বলিয়াই গণ্য করিতেন আর তাহার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির নয়, জাতির সমষ্টিগত মুক্তি ও ভুক্তি। তাঁহার সম্মুখে সেদিন কত বৃহৎ কর্ম্ম প্রতীক্ষারত, তাহা বুঝি নাই এবং সেইজন্যই তাঁহার চিন্তা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। তিনি যেরূপ আদেশ করিতেন, তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই আমার স্বভাব ছিল। আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ কিন্তু আমায় পণ্ডিচারী হইতে রিভলভারগুলি আনাইবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিলেন। আমি পরিশেষে তাহা কিরূপে আনাইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর. এস. শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। আমি সেদিন বুঝি নাই এই শর্ম্মা পুলিস বিভাগেরই একজন গুপ্তচর। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। এই শর্ম্মা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পর পত্রে জানাইলেন :

"Your R. S. Sarma I hold to be a police-spy. I have refused to see him, because originally when he tried to force his way into my house and win my confidence by his extravagances, I received a warning against him from within which has always been expected. This was confirmed afterwards by two facts: first, that the Madras police betrayed a very benevolent interest in the success of his mission; secondly, that he came to Pondichery afterwards as sub-editor of a new Pondichery paper, "The Independent" subsequently defunct and replaced by another, the "Aryan," belonging to the same proprietor, who has been acting in concern with the British police agents in Pondichery. In the paper he wrote a very enervating and deprecatory paragraph about me (not by name but by allusion), in which he vented his spite at his failure."

অর্থাৎ,

'তোমার প্রেরিত আর. এস. শর্ম্মাকে আমি একজন পুলিসের গুপ্তচর বলিয়াই মনে করি। আমি তাহার সহিত দেখা করি নাই ; কারণ প্রথম যখন সে আমার বাটীতে জোর করিয়া ঢুকিতে চায় ও অতিশয়োক্তি দ্বারা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি অন্তর হইতেই সতর্ক হইবার সঙ্কেত পাই। এই রকম সঙ্কেত আমি প্রায়ই পাইয়া থাকি। এই সঙ্কেতেরই সমর্থন মিলে পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনায়। প্রথমতঃ, মাদ্রাজী পুলিস যে শর্ম্মার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাপারে বেশ উৎসাহশীল, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার পরে সে যখন আবার পণ্ডিচারীতে আসে, তখন অধুনা-বিলুপ্ত "দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। পরে সে ইহার স্থলাভিষিক্ত "এরিয়ান" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এইরূপ বলে। এই শেষোক্ত পত্রিকাখানিও একই স্বত্বাধিকারীর কাগজ, যিনি পণ্ডিচারীর ব্রিটিশ পুলিস-প্রতিভূগণের সহিত প্রকাশ্যে সংযুক্ত হইয়া কাজ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় ঐ ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ না করিয়াও আমার উদ্দেশে একটি খুব হীনতাজনক নিন্দোক্তি প্রচার করে, যাহাতে তাহার ব্যর্থতারই জ্বালা প্রকাশিত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ এই সকল কথা জানাইয়া, ভবিষ্যতে এই প্রকার অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে আমায় নিষেধ করেন। এই সময়ে পণ্ডিচারীতে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক পলাতক বাস করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ পুলিসের অনুযোগে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তদানীন্তন ফরাসী পণ্ডিত সাহেব ও জজসাহেবের সহায়তায় এই প্রয়াস ব্যর্থ করেন। এই বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার এক পত্রে আমায় লিখেন :

"Other difficulties are disappearing. The case brought against the Swadesics (No one in this household was included in it, altho' we had a very charmingly polite visit from the Parquet and Judge d'Instruction) has collapsed into the nether region and the complainant and his son have fled from P.T. (Pondichery territory) and become like ourselves 'political refugees' in C'lore (Cuddalore)"

ভি. ভি. এস. আয়েঙ্গার নামে একজন তরুণ বিপ্লবী পণ্ডিচারী আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইংরেজ পুলিস ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাকে ধৃত করার জন্য অনুরোধ জানায়। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী বলিয়া যাঁহারা পণ্ডিচারীতে ছিলেন, তাঁহাদের সকলের উপর ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তদন্ত সুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁহার অতুল প্রতিভায় স্বদেশীরা সে যাত্রায় রক্ষা পান এবং দীর্ঘ দিনের জন্য পণ্ডিচারী স্বদেশীদের নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়।

আমি বিপ্লবের কর্ম্মে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকিতাম, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ চাহিত সাধনার নির্দ্দেশ। শ্রীঅরবিন্দকে শুধু আত্মসমর্পণ যোগের গুরুস্থানীয় ভাবিয়াই পরিতুষ্ট হই নাই, তাঁহার কার্য্যে আত্মনিবেদন করার জন্য আন্তরিক যত্ন করিতাম। তাঁহার কর্ম্ম শরীর, প্রাণ, মন দিয়া সিদ্ধ করিতে পারিলে, আপনাকে তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছি বলিয়া মনে হইত। আমি পত্রেই তাঁহার সাধন-নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতাম। এক

পত্রে তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার অন্তরে চির-গ্রথিত হইয়া আছে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তিনি যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না, ভগবৎপ্রেরণাই তাঁহার জীবনকে পূর্ণ শৃঙ্খলিত করিয়া লইতেছে—পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, তাহা পাঠক-পাঠিকারা অনুভব করিতে পারিবেন। তিনি লিখিলেন :

"There is no reason for not writing to you. I never now-a-days act on reasons, but only as an automaton in the hands of another. Sometimes He lets me know the reasons of my actions, sometimes He does not, but I have to act or refrain from action all the same, according as He wills.

I shall write nothing about sadhan, etc., until I am out of my present struggle to make the Spirit prevail over matter and circumstances."

তাঁহার বাস্তব অভাব কতখানি তাহার ইয়ত্তা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তিনি মাণিকতলা বাগান বিক্রয়ের টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিব। তাঁহার বস্ত্রাভাবের পরিচয় তাঁহার পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"There is the pressing cry for clothes in this quarter, as these articles seem to be with us to remind us constantly the paucity of matter."

এই বস্ত্রাভাব দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আমি কাপড়ও পাঠাইয়া দিতাম। তিনি ম্যাকা ঘাবসারের ১০০০৲ টাকা পাইয়াও আর্থিক ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। আমিও যাহা পাঠাইতাম, তাহা তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। আজ বিস্ময় বোধ হয়—জাতির নিকট হইতে কতটুকু দান গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত তথা বিশ্বের মানব-জাতির জন্য কি অসাধারণ প্রতিভার অবদানই না রাখিয়া গেলেন!

এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের *Soul of India* নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হাতে পাইয়াই আমায় জানাইলেন—ভগিনী নিবেদিতার *My Master as I saw him* পুস্তকখানিও তাঁহার নিকট যেন প্রেরণ করা হয়। আরও তিনি চাহিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ। তিনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মের জন্য, বিপ্লববাদের অন্তরালে নিজেকে কি ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার পত্রের ছত্রে ছত্রে তাহা প্রকাশ পাইত। আমি ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্কেতগুলিই বড় করিয়া ধরিতাম—আর তাঁর বৈপ্লবিক নির্দ্দেশগুলি বিপ্লবীদের জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

এই সময়ে রাসবিহারী বসু আমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিদিত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্র হইতেই "automaton" তত্ত্বটি আহরণ করিয়া তিনি আমার নিকট বিশেষভাবে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লন। ইহার পর এই 'automaton' বা যন্ত্রসাধনা তাঁহার জীবনে কি ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

রাসবিহারী যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই তিনি বসন্তকুমারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে নগর-প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি আহত হইলে উৎসব বন্ধ, দিল্লীর দরবার পণ্ড হইয়া যায়। আজ বলিতে বাধা নাই যে, এই বোমা নিক্ষেপ করেন নারীবেশে তরুণ বসন্তকুমার আর রাসবিহারীই ছিলেন পার্থসারথির মত তাহার পরিচালক ও পৃষ্ঠরক্ষক। এই ঘটনার জন্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ গ্রহণ করি নাই; কিন্তু ঘটনান্তে তিনি খুশী হইয়াই যে কথা লেখেন, তাঁর পত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"I welcome it as a sign of some preliminary effectiveness thro' you. In this direction in which hitherto everything has gone against us, also as we have proof of several; . . . . . that the quantity of your power and your work is greatly improving in effectiveness and success."

অর্থাৎ,

"তোমার ভিতর দিয়া কিছু প্রাথমিক কার্য্যকারিতার লক্ষণরূপে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। এই দিকে যেখানে এতাবৎ সবই আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ইহা তোমার শক্তি ও কর্ম্মের উৎকর্ষ প্রমাণ করে—তোমার কর্ম্ম কার্য্যকারিতার সাফল্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে।"

রাসবিহারী বসু ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সাহায্যে ধীরপদে আমরা বিপ্লবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এদিকে রমেশবাবুর ঋগ্বেদের অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে পাঠানো হইল। তিনি পুনরায় আমায় পত্রযোগে জানাইলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তাঁহার জন্য কিছু অর্থ ভিক্ষা করিতে। আমি শ্রীঅরবিন্দের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেশবন্ধু অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর আর এক দিন আমায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বলিলেন। আমি যথাকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সাগর-সঙ্গীত" গ্রন্থখানি বাহির করিয়া বলিলেন —"শ্রীঅরবিন্দ যদি ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দেন, তবে আমি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে এই কর্ম্মের জন্য দিব।" শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলে, তিনি "সাগর-সঙ্গীত"

গ্রন্থখানি চাহিয়া পাঠাইলেন। মিত্রাক্ষরে ও অমিত্রাক্ষরে "সাগর সঙ্গীতে"র দুই প্রস্থ ইংরেজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দই করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু এই বাবদ উপরোক্ত অর্থসাহায্যও যথাকালে করিয়াছিলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট বাংলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি—বর্ষণের বিরাম নাই। কূপ তড়াগ পুষ্করিণী ভাঙিল। দামোদর নদে প্রবল বন্যা দেখা দিল। পূর্ব্বকূলের অধিবাসিবৃন্দ গৃহহীন হইল। বাংলার বিপ্লবী তরুণগণ সেবাব্রতে তৎপর হইলেন। শ্রীযুক্ত বি. কে. লাহিড়ীর উদ্যোগে উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকার শ্রীমাখনলাল সেন মহাশয় সেবাকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই বাঘা যতীনের কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম। তিনিও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বীর। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্বন্ধে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্দ্ধমানের কাজে আত্মনিয়োগ করার কালে আমি দারুণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হই। বেহুঁশ জ্বরাবস্থায় আমি শ্রীঅমৃতলাল হাজরা ওরফে শ্রীশশাঙ্কের উদ্যোগে বর্দ্ধমান হইতে চন্দননগরে নীত হই। আরোগ্যলাভ করিলে, পূজার পর বিপ্লবিগণের এক সভায় স্থির হয় যে, পণ্ডিচারী হইতে আমায় ইন্দোচীনে যাইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরিত রিভলভারগুলি নষ্ট হওয়ায় এবং পণ্ডিচারী হইতে অস্ত্র-সংগ্রহের কাজ বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায় ইন্দোচীন হইতে প্রচুর অস্ত্রাদি যাহাতে চন্দননগরে আসিয়া পৌছায়, তাহার আয়োজন আমাকে করিতেই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগ সেদিন আমায় পাইয়া বসিয়াছে। তাঁহার আত্মসমর্পণ-যোগে জীবনের মমতা রাখিতে নাই। আমি ভাবিয়া স্থির করিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদন পাইলে, আমি ইন্দোচীনে গমন করিব। বন্ধুদের এই কথা স্পষ্ট জানাইলাম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা শেষ হইলে, আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। আমায় পুরা-দস্তুর সাহেব সাজান হইল। সুচিক্কণ গুম্ফরাজি বিসর্জ্জন দিয়া মুখমণ্ডলের শ্রী পরিবর্ত্তিত করা হইল। সুদর্শন চট্টোপাধ্যায় আমার আর্দ্দালী সাজিয়া মাদ্রাজ মেলে আমায় তুলিয়া দিল। মাদ্রাজ ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু পার্থ-সারথির বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্ল্যাটফরমে আত্মকৃত অপরাধে যে বিপদ ঘনাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহাতে এই ক্ষেত্রে নিরাপদ বিশ্রাম সম্ভবপর হইল না। মাদ্রাজের প্ল্যাটফরমে গাড়ী পৌছিলে এক ব্যক্তি আমায় যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আমার নাম M. Ray (এম্‌. রে), কলিকাতার চুণাগলি অথবা চৌরঙ্গীতে আমি বাস করি না, চন্দননগর আমার বাসস্থান ও আমি একজন হিন্দু—এই সংবাদ-বিদ্যুৎ-গতিতে পুলিসের নিকট গিয়া পৌছায়। অল্পকাল-মধ্যে পার্থসারথির বাড়ীটি পুলিস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। আমায় খিড়কীর দ্বার দিয়া পার্থসারথি বাহির করিয়া ষ্টেশনে এক গাড়ীতে তুলিয়া দেন। তারপর অতি প্রত্যূষে পণ্ডিচারী যখন পৌছাই, তখন প্রবল বৃষ্টিধারা নামিয়াছে। আমি সাহেবী পোশাকে সরাসরি শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। পার্থসারথির জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই সময়ে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে পণ্ডিচারীতে বাস করিতেছিলেন—তাঁহারই নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও আমায় এক বিন্দু কালহরণ করিতে না দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের বাস-ভবনে পৌছাইয়া দিলেন। গুপ্তচরবৃন্দ আমায় দেখিল, কিন্তু একজন সাহেব আসিয়াছে, এই সংবাদই ব্রিটিশ পুলিস আপিসে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীঅরবিন্দের আবাসস্থলে প্রবেশ করিয়াই আমি সম্মুখে এক তরুণকে দেখিলাম। তাহার নাম শুনিলাম অমৃত। সে আমাকে বিজয় নাগের সহিত দেখা করাইয়া দিল। তারপর আসিল নলিনী, মণি ও সৌরীন—ইহারা সকলেই আমার পরিচিত বন্ধু। আমার সাহেবী বেশ দেখিয়া সকলেই সকৌতুকে তারিফ করিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইলেন। আমি নতজানু হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইতে পারিলাম না, সাহেবী পোশাকে তাহা বাধিল। তিনি আমায় দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিরাপদে আসিয়াছ ত ?"

আমি তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব সাজিয়া গোপনে আসিতেছ, নামটাও তো ভাঁড়াইতে হয়। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্বটুকু যদি রহিল, তো সাহেব সাজার প্রয়োজন কি ?" আমি অপ্রস্তুত হইলাম। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। তারপর দেড় মাস কাল শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে তাঁহার সান্নিধ্যে পণ্ডিচারীতেই থাকিতে হইল। ইন্দোচীনে যাওয়ার জন্য তাঁহার আদেশ মিলিল না।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৩

পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত কুটীরশিল্প আছে, নানা কারণে সেগুলির অবস্থা একরূপ মৃতপ্রায় বলা চলে। উপস্থিত যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে ক্রেতার অভাবে এবং অত্যধিক দামের জন্য তাহাও কাটতি হইতেছে না। পূর্ব্বে যে সমস্ত কুটীরশিল্প ছিল তাহাদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এবং এখনও যেগুলি আছে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে হইলে পল্লী-অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা দরকার, নচেৎ উৎপাদন-ব্যয় কমিবে না। তাহা ছাড়া এই সমস্ত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি যাহাতে উপযুক্ত দামে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থাও প্রদেশ-সরকারের করা আবশ্যক। শ্রমশিল্প ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় এ বিষয় পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রধান ও সুস্পষ্ট কারণ নিয়ে দিতেছি। আর এই কারণেই এই প্রদেশকে একটি সমস্যা প্রধান প্রদেশ বলা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পাট ও কয়লা ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু পণ্যদ্রব্য অপর প্রদেশে রপ্তানি করে না, পাট ও পাটজাত দ্রব্য যাহা অপর প্রদেশে এবং বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার মূল্যের সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পায়। কয়লা যাহা উৎপন্ন হয় তাহার বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রেলপথে ব্যবহৃত হয়, কতকটা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং সামান্য পরিমাণ অপর প্রদেশে চালান যায়।

নিয়ে প্রদত্ত হিসাব হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসরে উপস্থিত বাজার ও কণ্ট্রোল দর অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্যই অপর প্রদেশে চলিয়া যায়। উক্ত হিসাবের মধ্যে পাকিস্থান হইতে রেল ও ষ্টীমারযোগে এবং বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানী করা হয় যথা—চাউল, গম, ময়দা ইত্যাদি, এবং যাহা এই প্রদেশে ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য ধরা হয় নাই। তাহা ছাড়া অপর প্রদেশ হইতে সূতীবস্ত্র, লবণ, ঘৃত, মাখন, মৎস্য, ফল, আলু ও নানারূপ তরিতরকারী যাহা যাহা আমদানী করা হয় তাহার মূল্যও ধরা হয় নাই; কারণ কোনও সরকারী পুস্তিকায় উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এই সকল দ্রব্যের মূল্যও বহু কোটি টাকা হইবে। এই বাৎসরিক অর্থক্ষয় কোন সময়ই রোধ করিতে পারা যাইবে না কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচুর দুগ্ধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহা অর্থের সদ্ব্যয় মোটেই বলা যাইতে পারে না। যেখানে খাদ্যোৎপাদনের আবশ্যকমত জমির অভাব সেখানে গো-চারণ-ভূমি ও গবাদি পশুর খাদ্য কোথা হইতে আসিবে? "অধিক খাদ্য ফলাও", "বনমহোৎসব" কর এবং প্রধানমন্ত্রীর

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রেল ও নদীপথে পশ্চিমবঙ্গে আমদানীকৃত কয়েকটি খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের হিসাব

দ্রব্যের নাম	আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ	প্রকাশিত ন্যূনতম বাজার ও কণ্ট্রোল দর	মোট টাকা
ছোলা	১,৪৩০,৫০৬ মণ	২০৲ টাকা প্রতি মণ	২৮,৬১০,১২০৲
ধান্য	১১৪,৩৯৫ ”	৮৲ ”	৯১৫,১৬০৲
চাউল	৪৫৩,৬৮৯ ”	১৭৲ ”	৭,৭১২,৭১৩৲
গম	১৯,০৪৭ ”	১৬৲ ”	৩০৪,৭৫২৲
আটা	৪৫,৯৬৭ ”	১৬৲ ”	৭৩৫,৪৭২৲
বাদাম তৈল	৩৪৭,৫২৫ ”	৭৪৲ ” (পাইপ সমেত)	২৫,৭১৬,৮৫০৲
অন্যান্য তৈল	৪৬৯,৩৭৯ ”	৭০৲ ”	৩২,৮৫৬,৫৩০৲
বাদাম	২৩৩,২৯৭ ”	৩৪৲ ”	৭,৯৩২,০৯৮৲
সরিষা	৫,০০৪,৪৫৭ ”	৩৩৲ ”	১৬৫,১৪৭,০৮১৲
চিনি	৩,৬৩২,৭১৯ ”	৩৫৲ ”	১২৭,১৪৫,১৬৫৲
গুড়	১,৯৬৩,৪৮৪ ”	২৪৲ ”	৪৭,১২৩,৬১৬৲
নারিকেল তৈল	২৫,৩৭৭ ”	১০২৲ ”	২,৫৮৮,৪৫৪৲
		মোট	৪৪৬,৭৮৮,০১১৲

নূতন অভিযান "ধনসম্পদ বাড়াও" পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিকট একটা নিদারুণ পরিহাস মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "মৎস্য ফলাও" অভিযানের একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মৎস্যচাষের সরকারী মহকুমা কর্ম্মচারীকে তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া পুষ্করিণীগুলি দেখিয়া তাহাতে মৎস্যচাষের বিষয় উপদেশ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কর্ম্মচারীটি সেই প্রতিষ্ঠানের লোকদের তাঁহার আফিসে দেখা করিয়া উপদেশ লইতে বলিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারা যায়, টাকার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যচাষের কর্ম্মচারীদের যাতায়াতের ভাতা কমাইয়া দিয়াছেন এবং সেইজন্যই মৎস্যচাষের সরকারী কর্ম্মচারীরা পুষ্করিণী না দেখিয়াই আপিসের চেয়ারে বসিয়া উপদেশ দেন। এই প্রদেশে "খাদ্য ফলাও", "মৎস্য ফলাও", "দুগ্ধ ফলাও" এবং "বনমহোৎসব কর" এই সব অভিযান ও পরিকল্পনার জন্য বেশীর ভাগ বরাদ্দ টাকা ছোট বড় কর্ম্মচারীদের বেতন দিতেই ফুরাইয়া যায়।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই প্রদেশে ধানের জমিতে পাটচাষ করান হইতেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি পাটকল আছে সেই পরিমাণ পাটচাষের জমি নাই। কিন্তু পাট-করের বেশীর ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অপর প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। আশা করি, প্রদেশ-সরকার এই বিষয় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে বসতির চাপের হার বৃদ্ধির জন্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর স্থায়ী ক্ষতি এবং অসুবিধার বিশদ বিবরণ নব-গঠিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিশনের কাছে তাঁহাদের দাবিসহ পেশ করিতে ভুলিবেন না।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পররাষ্ট্র বিষয়ে যেরূপ মনোযোগী, নিজরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাংলাদেশে তিনি যে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাহার সেরূপ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও নানা অশান্তি দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের এশিয়ার একটি বৃহত্তর "বলকান" হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক প্রদেশের আয়তন তাহার প্রতি বর্গমাইলের বসতি চাপের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া ঠিক করা দরকার। কেবল বক্তৃতা, নূতন নূতন পরিকল্পনা, অগণিত "বাণী" ও মুখরোচক ধ্বনির দ্বারা ইহার কোনরূপ সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পণ্ডিত নেহরুর বাসভূমি উত্তর প্রদেশের আয়তন ১,০৬,২৪৭ বর্গমাইল, বোম্বাই প্রদেশের আয়তন ৭৬,৪৩৩ বর্গমাইল এবং বিহার প্রদেশের আয়তন ৬৯,৭৪৫ বর্গমাইল দাঁড়াইয়াছে। আর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩০,৬৮৯ বর্গমাইল। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা উত্থাপন করিলেই কেন যে ইহা প্রাদেশিকতার দোষে দূষিত হয় তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হারের বিষয় আলোচনা করিবার সময় লিখিয়াছিলাম যে, ভারত বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কুচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে। ত্রিপুরা রাজ্য এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং উহা পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মোট বর্গমাইল যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিকই আছে।

পূর্ব্বে বাঙালী জাতি সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্ববিষয়ে সমগ্র ভারতের অগ্রণী ছিল। একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ভারত আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার ভিত্তি প্রধানতঃ দেশপ্রেমিক বাঙালী যুবকদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের উপর স্থাপিত। সে সময় বাঙালী জাতিকে অপর প্রদেশবাসীরা যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এখন তাহা প্রায় ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্দোলনের সময় বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় আইন সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লর্ড কার্জ্জনের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাংলা আজ যাহা ভাবিতেছে—সমগ্র ভারত কাল তাহাই ভাবিবে।" আজ বাঙালীর অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান একরূপ ভারত-সরকারের উপরই নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারত-সরকারের প্রভাব অনুভূত হয়। ভারত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর এই কারণেই ঋষিবাক্য "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" পর্য্যন্ত তাঁহার নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে *Engineering News of India*'র সম্পাদক ডি. সি. ড্রাইভার "A Tiger looks at India" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বাঙালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"In Inda the Symbol of the State shonld be strength or Shakti. If there is strength, truth will prevail; otherwise it will take refuge in subterfuge. Look at poor Bengal. Once like a tiger it led. What Bengal roared at new moon other Provinces would bleat at full moon. The tiger spirit of Bengal is gone. Now ferocious tigers only appear in West Bengal, painted on its buses."

নিয়ে ইহার বঙ্গানুবাদ দিলাম :

"ভারতরাষ্ট্রের প্রতীক হওয়া উচিত শক্তি। শক্তি থাকিলে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী ; অন্যথায় ইহা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাংলার দিকে তাকাও। এক সময়ে উহা ব্যাঘ্রের ন্যায় নায়কত্ব করিয়াছিল। অমা-নিশার অন্ধকারের মধ্যে বাংলা যাহা সদর্পে গর্জ্জন করিয়া যাহা প্রকাশ করিত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাত রাত্রে অন্যান্য প্রদেশ তাহা মৃদুস্বরে মাত্র ব্যক্ত করিত। কিন্তু আজ বাংলা তাহার ব্যাঘ্রদর্প হারাইয়াছে। এখন সেই বীর্য্যবান ব্যাঘ্র-সমূহের মূর্ত্তি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালিত মোটর-বাসেই শুধু অঙ্কিত রহিয়াছে।"

ড্রাইভারের উক্তি যে নিদারুণ সত্য তাহা বলাই বাহুল্য। ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতি তাহার এই জীবনমরণ সমস্যার সমাধান না করিয়া কত দিন যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে তাহা অনুমান করা শক্ত। যদি আমাদের দেশের নেতারা বাংলার সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান না করেন তাহা হইলে মনে হয়, হয়ত এক দিন সমগ্র বাঙালী জাতি আবার "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিবে এবং নিজেরাই প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

আজ আমরা যে লোক-শিক্ষকের ৮ম বার্ষিক তিরোধান-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতে সমবেত হয়েছি তাঁর জীবনের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া দুষ্কর। কারণ তিনি নিজেকে নিজের কর্ম্মের পশ্চাতে এমন করে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সে গোপনীয়তা দুর্ভেদ্য বললে অসঙ্গত হবে না। অথচ এই লোকটি নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ছিলেন হাসি-খুশীর আধার। গম্ভীর মুখে হাসির উৎস-মুখ খুলে দেবার কৌশল তিনি জানতেন। শান্তিনিকেতনের অনেক বন্ধুর নিকট তা শুনেছি। গাম্ভীর্য্য ও পরিহাস-নৈপুণ্যের এই সমবায় বিধাতৃদত্ত একটি গুণ।

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকা দুখানির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রামানন্দ—নিজের কাজের মধ্যে নিজের নাম দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান রাখবার ব্যবস্থা করে গেছেন। একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের "রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ" পত্রিকায় রামানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এই একজন সাংবাদিক যিনি রাজনীতিবিদ্ বলে অভিহিত হতে পারেন, Journalist as a statesman"। সেই সাংবাদিক এখনও বেঁচে আছেন; তাঁর নাম সন্ত নিহাল সিংহ।

আমার নিকট রামানন্দের প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন লোক-শিক্ষক। আজীবন এই কর্ত্তব্য পালন করেছেন—কলেজের অধ্যাপকরূপে বা সম্পাদকরূপে এবং এই কর্ত্তব্য পালনে এমন একটা নিষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন যা বর্ত্তমানযুগে বিরল। পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। পণ্ডিতের রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন ; ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে তিনি কৌলিক সনাতন আচার-আচরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজে পণ্ডিতের যে স্থান ছিল, লোকের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তাঁরা যেমন করে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করতেন, রামানন্দের জীবনে সেই নিষ্ঠা ও নির্লোভতার পরিচয় পেয়েছি প্রচুর, তাঁর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, এই স্বল্পবাক্ লোকটির মধ্যে জ্ঞানের কি অমূল্য ভাণ্ডার লুক্কায়িত ছিল। এই ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে দেশ-বিদেশের গুণী ও পণ্ডিত লোকেরা তাঁর চারপাশে সমবেত হতেন এই পাড়ার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গোষ্ঠীর সেবায় নিবেদিত-প্রাণ এই আইরিশ-তনয়া সিষ্টার নিবেদিতা নামে পরিচিতা ছিলেন লোক-সমাজে। "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকার প্রতিষ্ঠালাভের মূলে এই বিদেশী নারীর দান ভুলবার নয়। সেইরূপ কত খ্যাত অখ্যাত লোক তাঁকে সাহায্য করতেন।

রামানন্দ যখন "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিয়ু" বের করেন, তখন ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ বিপ্লবী আন্দোলনের বন্যায় পরিপ্লাবিত। এর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা এখনও জানা যায় নি। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতি বিপ্লবীপ্রধানদের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই কথা তখনও লোকে জানত; ইংরেজের পুলিসেরও জানা ছিল। এই

আত্মবিলোপকারী লোকটি কি করে এই আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে চালাতেন, লোকে এই সব বিপজ্জনক সম্পর্কের কথা জানত না; শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি নিজের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যাদি করে যেতেন। তা তাঁর শক্তির পরিচায়ক ছিল, এবং এ সব সম্ভব হ'ত না যদি তাঁর সহধর্ম্মিণী তাঁকে সাহায্য না করতেন। রামানন্দের জীবনে ও কর্ম্মে মনোরমা দেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্ব্বে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা (শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়) তাঁর অভিভাষণে বর্ত্তমান ভারতের সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন মনে করি। হতে পারে, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তা হলেও যে সর্ব্বক্ষণ তাদের কানে এই কথা শুনানো হবে যে তারা অযোগ্য, তারা হেয় এটা সমীচীন নয়। এরূপ কথা শুনতে শুনতে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, সত্যই তারা অযোগ্য, তারা হেয়। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কথা বলে এরূপ উক্তির নিন্দা করে গেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের ছেলেদের বিদেশী শাসকবর্গ প্রায়ই নাকি শুনাতেন, "Pat, you are no good" "প্যাট, তোমরা কোন কাজের নও।" শুনে শুনে প্যাটেদের মনে এই ধারণা দৃঢ় হইতে লাগল যে তারা সত্য সত্যই অকেজো, অপদার্থ। কিন্তু সেই প্যাটেরাই যখন মার্কিন মুলুকে পদার্পণ করলে, তখন এই ধিক্কারের কথা তাদের কানে বাজত না, এবং এই প্যাটেদের মধ্য থেকেই দেখা দিলেন অনেক শিক্ষক-অধ্যাপক, পণ্ডিত গবেষক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের নেতা যাঁদের নাম ইতিহাসে জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমাদের দেশের ছেলেরাও সেরূপ উৎসাহ পেলে তাঁদের মত কীর্ত্তি রেখে যাবেন।

---

* গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রামানন্দ স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বেনারসী দাস চতুর্ব্বেদী কর্ত্তৃক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-গ্রন্থ "রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" উপহার প্রদান। রাষ্ট্রপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

প্যারিস

শ্রীশেফালী নন্দী, এম-এ

লণ্ডন—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে গাড়ী করে প্রথম গেলাম হারেন পোর্ট-এ। সেখান থেকে ছোট একখানি ষ্টীমার আমাদের নিয়ে গেল দিয়েপ বন্দরে, আমরা পৌঁছলাম ফ্রান্সে। ছোট ষ্টীমার, দুলুনি অত্যন্ত বেশী, তার উপর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বেশী হওয়ায় ভিড়ের কষ্টটা অনুভব করলাম বেশ ভালই। আবার ডাঙায় নেমে উঠলাম গাড়ীতে। বেশ বোঝা গেল ফ্রান্সে এসে পড়েছি, দু'দিকে অপূর্ব্ব সবুজের সমারোহ—তারই মাঝে মাঝে ফুলের রাশি। হাস্যমুখর নরনারীর কোলাহল, সব মিলে মনটা প্রসন্ন করে তুলল। সন্ধ্যা ছটায় পৌঁছলাম প্যারিসে; ষ্টেশনটির নাম সেণ্ট লাজারা। হোটেলের সন্ধানে বের হলাম। ঠাঁই নাই কোথাও। সর্ব্বত্র বিদেশী-বিদেশিনীদের ভিড়। যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে প্রবেশ করা সাধারণ ভারতীয়দের পক্ষে দুঃসাধ্য—বর্ণবিদ্বেষ নয়, অর্থ-সঙ্কট। লণ্ডন মহানগরীতে এক রাত্রি বাস করতে হলে সাধারণ হোটেলের দক্ষিণা আনুমানিক এক পাউণ্ড, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩।৵০। প্রথম যখন এক পাউণ্ড ভাঙিয়ে ফরাসী কাগজে ৯৮০ ফ্রাঁ পেলাম, আমার আনন্দ দেখে কে? মনে হ'ল খুব কম খরচায় প্যারিস দেখা সেরে ফিরে আসব। কিন্তু "বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।" কে জানত যে প্যারিস মহানগরীতে এক রাত্রির বিছানা-ভাড়া ১০০০ ফ্রাঁ। বহু কষ্টে একটি সাধারণ হোটেল পাওয়া গেল যেখানে মাত্র কয়েকটা ঘর খালি ছিল। প্রতিটি ঘরের দর্শনী ৪৭০ ফ্রাঁ। যাক তবু মন্দের ভাল। মাল বলতে ত ছোট দুটি ব্যাগ, সেগুলো হোটেলওয়ালার জিম্মায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম কিছু খাবারের সন্ধানে, তার সঙ্গে কিছু উপরিলাভ হবে—কয়েকটি রাস্তায় ও দুই-একটি দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

দুই জন বিদেশিনী সহ লেখিকা

হোটেলের নীচেই একটি রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। এত বড় এবং এমন ঝকঝকে চায়ের হল ত কই কোন দিন দেখি নি। চার দিক দিয়েই লোক প্রবেশ করছে, আর চার দিকেই খাবারের সারি। ব্যাপারটা খানিক পরেই বোধগম্য হ'ল যখন দেখলাম আমিও প্রবেশ করছি আমার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে। দোকানটি নিতান্তই ছোট—আর তার দেয়াল বলতে কিছুই নেই। রাস্তার দিকটা বাদ দিয়ে তিন দিকেই ছাদ থেকে মেঝে পর্য্যন্ত কেবল ঝকঝকে আয়নায় ঢাকা। ফলে যেদিকে তাকাই মনে হয় এর সীমা নেই। কেউ বা দাঁড়িয়েই তরল পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছে, কেউ বা বসেছে, কেউ বা প্রতীক্ষা করছে কারুর জন্য। আমি একটা টেবিল দখল করে বসলাম. এবার সুরু হ'ল ভাষা-সমস্যা, কি করে বোঝাই আমি কি চাই। একটি 'ওয়েটার' এগিয়ে এল, তাকে বোঝাতে চাইলাম 'চা ও কিছু খাবার', সে কেবল তাকিয়ে রইল সহাস্য মুখে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, উঠে গিয়ে চায়ের পাত্রটি দেখিয়ে দিলাম আর রুটি ডিম। সে খুশী হয়ে খানিক পরে এনে হাজির করলে।

ভোজনপর্ব্ব কোনরকমে সমাপ্ত করার পর দাম দেবার বেলায় সে নিজেই আর একটি ওয়েটারকে নিয়ে এল সঙ্গে করে। সে বুঝিয়ে দিলে কাগজে লিখে যে আমি খেয়েছি চা ৪৫ ফ্রাঁ, রুটি ৩৫ ফ্রাঁ, ডিম ৩০ মোট ১১০ ফ্রাঁ। আমার ত চক্ষুস্থির। ব্যাপার দেখে ওয়েটার ত হেসেই বাঁচে না। সে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, প্রত্যেকটি জিনিষের নীচে দাম লেখা আছে। দেখলাম একটি সাধারণ কলার দাম ৪০ ফ্রাঁ অর্থাৎ আমাদের দেশীয় মুদ্রায় দশ আনা। কোন জিনিষ ২০ ফ্রাঁর নীচে বিক্রী হয় না। স্তূপাকার কাগজের টাকা দিয়ে কোন জিনিষ কিনতে হয়। শুধুই কাগজের ছড়াছড়ি। সোনা বা রূপার ধার ধারে না, এর হাত হতে ওর হাতে ক্রমশঃ কাগজ উড়ে যাচ্ছে আর জীবনধারণের খরচা ক্রমশঃই চড়ে যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার জন্য কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে ত মনে হ'ল না। অবশ্য আমি ছিলাম রাজধানীতে, তাই হয়ত নিতান্ত গরীব ও সাধারণ জীবনযাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু রাজধানীতে কৈ চিন্তাকুল মুখ ত দেখলাম না। সকলেই সহাস্য মুখে আপন

কাজ করে যাচ্ছে, খাবার সময় হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেয়ে নিচ্ছে, ঝকঝকে তকতকে পোশাক-পরা, জীবনটাকে যেন নিতান্ত খেলার ছলে ভোগ করে দুনিয়ার সবটুকু সুখ নিংড়ে নিতে চাইছে। এরাই সত্যিকার সুখী। এ যেন "নগদ

ভের্সাই প্রাসাদ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী

যা পাও, ভোগ করে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।" এমনি আর একটা জাত দেখেছিলাম—স্পেনিশ সেন্টার। আফ্রিকার উত্তর কোণে ক্ষুদ্র বন্দর। ওখানকার অধিবাসীরা যেন শুধু হাসতেই পৃথিবীতে এসেছে। কোন চিন্তা, দুঃখ, ভাবনা যেন ওদের স্পর্শ করেনি। জীবন ওদের দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে ভারাক্রান্ত হয় নি। স্পেনিশরা সবচেয়ে প্রাণ-চঞ্চল জাত বলে বিখ্যাত, তার পরেই ফরাসীরা। জীবনকে ওরা নিয়েছে নিতান্ত সহজভাবে। তাই অনর্থক দুশ্চিন্তার বোঝায় এরা ভারাক্রান্ত নয়।

টিউব ষ্টেশনে এসে মনস্থ করলাম কনকর্ড দেখতে যাওয়া যাক্। দিয়েপ থেকে প্যারিস আসার পথে এক ফরাসী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থানের নাম বলেছিলেন, তার মধ্যে কনকর্ড একটা। ভাষা বিভ্রাট এড়িয়ে যখন এখানে এসে পৌঁছলাম রাত তখন ন'টা। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম প্যারিসের প্রশস্ত রাজপথের দিকে। এত বড় এবং এত জনাকীর্ণ রাস্তা যে কোথাও থাকতে পারে তা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। ছয়টি রাস্তা এসে মিশেছে যেখানে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ—প্লা কনকর্ড। এখানে মেরী এন্টিওনেট, চতুর্দশ লুই, ষোড়শ লুই এবং আরও কয়েকজনকে 'গিলোটিন' করা হয়। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি ফ্রান্স ভুলতে পারে নি, যা তাকে এনে দিয়েছিল স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ। প্রতিটি রাস্তার দুই পার্শ্বে অপূর্ব্ব আলোকমালার সারি আর প্রতিটি রাস্তা দিয়ে সেকেণ্ডে অন্ততঃ কুড়িটি মোটর চলেছে গন্তব্যস্থল অভিমুখে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম রাস্তা পার হবার জন্য। কিন্তু কার সাধ্য এই বিংশ শতাব্দীর গতির সামনে এগিয়ে যায়। অনেক ইতস্ততঃ করে বারকয়েক

হোঁচট খেয়ে যখন রাস্তা পেরিয়ে গেলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল না। যেদিকে দু' চোখ যায় সবুজ ঘাসের মেলা, যত্ন করে তৈরি করা ফুলের রাশি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট চেয়ার শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য

ভের্সাই প্রাসাদ

সাজান-গোছান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পার্ক দেখে মনে হ'ল এরা জানে কি করে মানুষের চোখকে তৃপ্তি দিতে হয়। বিধাতার দান এরা দু'হাত ভরে নিতে পেরেছে, পেরেছে সে আশীর্ব্বাদের ধারাকে নিজেদের তৃপ্তির ছোঁয়ায় সার্থক করতে।

পর দিন ভোরবেলা—অবশ্য আমাদের ভোর নয়, পশ্চিমের সকাল বেলা দশটায় আবার বের হলাম লুভার মিউজিয়মের উদ্দেশে। পথ জানি না, ভাষা জানি না, শুধু জানি গন্তব্য স্থানের নাম, তাও ভাল করে উচ্চারণ করতে পারি না। কারণ আমি বিদেশী, বিদেশীর ভাষা শুধু পড়তেই জানি, তার স্বদেশীর উচ্চাচরণ লোকের মুখে মুখে কতটা পরিবর্ত্তিত হয়েছে তার খবর রাখি না। তাই যখন নির্ব্বান্ধব প্যারিসের রাজপথের পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম লুভার কোথায়, কেউ বা তাকিয়ে হাসল, কেউ বা বললে, ঐ দিকে। যাকে দেখলে মনে হয় এ হয়ত ইংরেজী বুঝবে তাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেউবা জবাব দেয়, কেউবা বিদেশী দেখে কৃপা করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে, কারণ সে আমাদের ভাষা জানে না। অশেষ দুর্গতি ভোগ করার পর খুঁজে পেলাম আমার গন্তব্যস্থল প্যারিসের অতীত স্মৃতি-ভাণ্ডার—লুভার মিউজিয়ম।

পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা এই লুভার। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এটা ছিল ফ্রান্সের রাজপুরী। ৪৮ একর জমির উপর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এই অট্টালিকা ফরাসী স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফরাসী বিপ্লবের পর এই অট্টালিকা ব্যবহৃত হয় ফরাসী সাম্রাজ্যের শিল্পাগার হিসাবে। নানা বিভাগে বিভক্ত করে এক-একটি অংশে করা হয়েছে এক এক

জাতীয় শিল্পের সমাবেশ। ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন ভেনাস-ডি-মেলো—গ্রীক ভাস্করের পাথর কেটে গড়া মূর্ত্তি ভেনাস দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ মহিমায়, শিল্পী রয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে, কিন্তু ভেনাস সগৌরবে ঘোষণা করছে শিল্পের জয়গান। কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারে নি, মূর্ত্তিটির হাত দুটি ভেঙে গেছে, পিঠের স্থানে স্থানে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য্য বা অপরূপ লাবণ্যের হানি হয় নি। স্মিত হাস্যে অশেষ লাবণ্যময়ী ভেনাস জগতের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বলছে, "আমি মানুষের সেরা সৃষ্টি।" লোকচক্ষুর

লুভার মিউজিয়ম

অন্তরালে নির্জ্জনে বসে যে শিল্পী এমন অপরূপ প্রতিমা গড়ে তুলতে পারে তার শক্তির কথা ভাবলে মানুষের শিল্প-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাই জাগে। তিল তিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমা—জগতের যত লাবণ্য যত কোমলতা সবই কি একত্রিত হয়েছে ঐ ভেনাসের মুখে, বক্ষে, দেহ-সুষমায়। বিধাতার সৃষ্টি এ নয়, এ মানুষের প্রেমে মানুষের শক্তিতে মানুষের আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে।

লুভার মিউজিয়মের আর এক অংশে গ্রীক ভাস্কর্য্যের আরও দু'একটি মূর্ত্তি পাওয়া যায়। একটি বিশ্ববিখ্যাত এপোলোর মূর্ত্তি আর একটি দেবী মিনার্ভার। একটি পাথরের মূর্ত্তির গায়ে আর একটি রঙীন পাথর—দেবীর গায়ে চাদরের মত করে বসান হয়েছে। অধিকাংশ মর্ম্মরমূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে, তাদের দেহের প্রতিটি রেখা বস্ত্র বা দেহাবরণের প্রতিটি ভাঁজ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ হস্তে।

মিউজিয়মের অন্য একটি অংশে আছে সেরা রঙীন চিত্র। তাদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন শিল্প-রীতি অনুসারে। বিভিন্ন দেশের চিত্রাবলী তাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে দা ভিঞ্চির ছবি, র‍্যাফায়েলের মাতৃমূর্ত্তি প্রভৃতি জগতের যত সেরা চিত্র। এই সুদীর্ঘ গ্যালারী দেখা যখন শেষ করে বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্যারিসের বুকে। লুভারের অন্য অংশে কি আছে দেখার আর সময় হ'ল না। এই শিল্প-মন্দির কালের হস্তাবলেপ উপেক্ষা করে আহ্বান করেছে জগতের সকল শিল্পানুরাগীকে তার অপরূপ সংগ্রহ দেখবার জন্য।

পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি আপিস বার করা গেল যেখান থেকে বিদেশীদের প্যারিসের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের সঙ্গে থাকে ইংরেজী ভাষা জানা গাইড। ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম, একবেলা দেখাবে ঐতিহাসিক প্যারিস, একবেলা আধুনিক প্যারিস আর দেখাবে

নেপোলিয়ানের সমাধি

বিশ্ববিখ্যাত ভেলের্সাই নিকেতন। সকাল ১১টায় রওনা হওয়া গেল প্যারিসের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলের উদ্দেশে। প্রথমেই গেলাম সেণ্ট ম্যাগডেলিন গির্জ্জা—সপ্তদশ শতাব্দীর এই গির্জ্জাটি বহন করছে গ্রীক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। গির্জ্জার মধ্যে কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তি সত্যিই সুন্দর। এর পর আমরা দেখতে গেলাম নেপোলিয়ানের সমাধি-মন্দির। সমাধিস্থানটি মেঝে থেকে প্রায় দু' ফুট নীচে। খ্রীষ্টের দশ জন শিষ্যের প্রস্তরমূর্ত্তি সমাধি-স্থানটির চার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে যেখানে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে সেই বেদীর উপরিভাগ (অনেকটা আমাদের দেবতার চতুর্দ্দোলার মত) হতে আলো ঠিকরে পড়ছে সোনালী চিত্রের ভিতর থেকে। কোন রকম আলো বা সূর্য্যালোক ছাড়াই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকের একটি কক্ষে রক্ষিত আছে বিভিন্ন জাতির পতাকা যা ফরাসীরা জয় করেছিল নেপোলিয়নের নেতৃত্বে। মন্দিরের আর এক কোণে নেপোলিয়নের প্রথমা স্ত্রী যোসেফাইনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

এর পর দেখতে গেলাম যুদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে গত দুই মহাযুদ্ধে নিহত ফরাসী সৈন্যদের নাম খোদাই করা আছে। এক পাশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধবিরতির তারিখ আর

অপর পার্শ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। মাঝখানে গ্যাস বার্ণারের সাহায্যে অনবরত ঊর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই শহীদদের কথা—মাঝে মাঝে কেউ এসে ফুলের মালা দিয়েও এদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ

'প্যান্থিয়ন' ফরাসী জাতির বরেণ্যদের সমাধিস্থান। এখানে আছে ভিক্টর হিউগো, এমিল জোলা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি। প্রবেশপথের উপরিভাগে লেখা আছে, "ফ্রান্স তার জাতির বরেণ্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

বিশ্ববিখ্যাত নোতর্ দাম গির্জা গথিক শিল্পের নিদর্শন। নোতর্ দাম এবং সেন্ট ম্যাগডেলিন উভয় গির্জাতেই কয়েকটি 'গোলাপ-জানালা' অর্থাৎ গোলাপের পাপড়ির আকারে আঁকা কাঁচের জানালা আছে। যুদ্ধের সময় এগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

'এফেল টাওয়ার' পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। আমাদের গাইড বললে, "Eiffel Tower represents Paris more than anything else"। রাস্তার এক পার্শ্বে এফেল টাওয়ার আর এক পার্শ্বে নয়নলোভন উদ্যান। প্যারিসের আশেপাশে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে সেখানেই অপূর্ব্ব সবুজ ও লোভনীয় ফুলের মেলা। এমন পুষ্পপ্রিয় জাত বোধ হয় আর নেই।

সিন নদীর উপরিস্থিত সেতু পার হয়ে রওনা হলাম ভের্সাইয়ের দিকে। চতুর্দ্দশ লুই লুভার প্রাসাদে থাকা পছন্দ না করায় গড়ে উঠেছিল এই ভের্সাই প্রাসাদ। এমন রমণীয় প্রাসাদ গোটা ইউরোপে বিরল, প্রতিটি কক্ষে অপরূপ সজ্জা, ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত নানা চিত্রে সুশোভিত প্রাচীরগাত্র, এমন কি কক্ষের সুশোভন সীলিং পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব চিত্রমণ্ডিত—নেপোলিয়ানের করোনেশন, 'লুই'দের ও তাঁদের প্রেয়সীদের প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি নানা চিত্র। একটি কক্ষে রক্ষিত আছে সেই টেবিলটি যাতে ভের্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ইফেল টাওয়ার

সবচেয়ে আশ্চর্য্য ভের্সাই প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান। চার পাশের নানারকম ফুল ও ঘাসের মিনা-করা গালিচার নীচে দিয়ে নেমে গেছে পথ—সেই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুই পাশে নানা জাতীয় বৃক্ষের সারি—কোনটি উঠেছে সমভূমি থেকে, কোনটি-বা নেমে গেছে অনেক নীচে। তারই নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটি স্রোতস্বিনী, ধাপে ধাপে নিম্নাবতরণ করেছে তার প্রবাহ। পঞ্চদশ লুই-এর কীর্ত্তি এটি। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতে গণ্ডোলায় চড়ে রাজা বেরুতেন জল-বিহারে, তাই প্রয়োজন হয়েছিল এই স্বচ্ছসলিলা প্রবাহের। উদ্যানের প্রতিটি বৃক্ষ মাটি টবের উপর স্থাপিত। কারণ সম্রাট দিনের দুই বেলায় বাগানের একরকম রং পছন্দ করতেন না—তাই যাতে তার ইচ্ছানুযায়ী বাগানের রং বদলানো যায় এই ব্যবস্থা।

রাজ-প্রাসাদের অনতিদূরে রাজান্তঃপুরিকাদের থাকবার জন্য ছোট একটি অট্টালিকা—চার পাশে উদ্যানের মনোরম পরিবেশে স্থানটি লোভনীয়, ছোট দোতলা বাড়ী, কিন্তু গৃহ-সজ্জায় ভের্সাই প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রাসাদের সর্ব্বশেষ অধিকারী ছিল মেরী এন্টিওনেটের—তাঁরই পরিবার ও বন্ধুবর্গের ছবি ও সম্রাট ষোড়শ লুই-এর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তিতে সুশোভিত। বিশেষ করে মেরী এন্টিওনেটের শয্যা, টেবিল, প্রসাধন-কক্ষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পেতি-ট্রিয়ানন থেকে ফেরার পথে দেখতে গেলাম 'ক্যারেজ মিউজিয়ম' অর্থাৎ সম্রাটদের শকটশালা। লুইদের কয়েকটি যানের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে নেপোলিয়ানের ব্যবহৃত দুইটি কারুকার্য্য খচিত অশ্বযান। একটি ব্যবহৃত হয়েছিল নেপোলিয়ানের প্রথমা পত্নী যোসেফাইনের বিবাহে, আর একটি দ্বিতীয় পত্নীর জন্য।

ভের্সাই প্রাসাদ থেকে ফেরবার পথে মনে হ'ল, ফরাসী সম্রাটেরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছেন; নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনের যে অর্থ তাঁরা করেছিলেন তার মূল্য দিতে হয়েছিল শেষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে। ফরাসী রাজ্যের জনগণ যখন দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছিল তখনও মেরী এন্টিওনেট তাঁর প্রাসাদে বিভোর হয়ে চর্চ্চা করেছেন শিল্পকলার। প্রজার হিতে বা স্বার্থে তাঁরা কি করেছেন সে বিচার না করে একথা বলা যায়—তাদের প্রচেষ্টায় যা গড়ে উঠেছে তা আজ পৃথিবীর দর্শনীয় হয়ে আছে।

কবির ব্যথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দেহে পড়ন্ত বেলা পেকে আসে সব চুল
মুখে দুগ্ধধবল দাঁতগুলি মোর দুটি,
তবু জীবন-তরুতে গাহে মোর বুলবুল
মোর মনের কুঞ্জে ফুল করে লুটোপুটি।
দেহ পীড়াজর্জর দারিদ্র্যজালাভরা
তবু সুন্দরে দেখে প্রাণ করে আনচান,
যত দুঃখেরি বিষে হইয়া দুঃখহরা
মন গেয়ে ওঠে কেন জানি না টুংরি গান।

ওরে সজল নয়নে ধরণীর পানে চাহি
দেখি সুন্দর এবং সুন্দরীদের মেলা,
আমি মরি গৌরবে আমার দৈন্ত নাহি
মোর সৌরভে ভরে ওঠে বিদায়ের বেলা।
হঠাৎ বিদায়-বেলাতে আগমনীগান গেয়ে
বাঁধি গোলাপের সাথে জীবনের হিন্দোল,
সারা সৃষ্টিলীলায় জীবনোৎসবে চেয়ে
আমি ভুলে যাই সখা মরণের কলরোল।

সারা চিত্ত আমার সুন্দরে মিশে যায়
দেখি ভগবান যেন মোর পাশে কাছাকাছি,
এই নিখিল জুড়িয়া সকলেরি চিন্তায়
আমি সবারি মনের যৌবনে বেঁচে আছি।
এই ভুবনপদ্ম ফুটেছে যেদিন থেকে
ওরে তারো আগে থেকে তার মাঝে ছিনু আমি,
সেই লীলাশয্যাতে এই মনোদেহ রেখে
মোহে ছিনু এক সাথে আমি ও জগৎস্বামী।

কবে হঠাৎ একদা খেয়ালী সে ভগবান
তার দেয়ালী জ্বালিতে সাধ হ'ল মনে মনে,
সারা জগৎ জুড়িয়া করিল সে দীপদান,
আমি কবি হয়ে সাথে রহিনু সঙ্গোপনে,
সেই জগৎশিল্পী খেয়ালে দেয়ালী জ্বালি
সারা জগৎ জুড়িয়া রচিল সৃষ্টিমেলা,
তার সেই থেকে চলে সৃজন খামখেয়ালী
আমি কথা গেঁথে করি ভালবাসাবাসি খেলা।

সে যে লীলায় মগ্ন সবারি আড়ালে রহি'
হেথা ধরা-ছোঁয়া সে যে দেয় না কাহারে কভু,
আমি আঁখির সমুখে মানুষের ব্যথা বহি'
লিখি তাদেরি বেদনা—চিনিল না তারা তবু।
আমি তাদেরি লাগিয়া জ্বালিনু আমার আলো
যত মরে ভালোবেসে লিখিনু তাদেরি লেখা,
তবু তারা চিনিল না, বাসিল না ভালো মোরে
তাই সকলের মাঝে মনে মনে ফিরি একা।

তাই বাস করি আমি নির্জ্জনে এক কোণে
মোর সঙ্গী পাখীরা দূর্ব্বা তুলসীবন,
মোরে যারা হেলা করে তাহাদেরি বন্দনে
একা বসে বসে বাঁশী বাজাই অনুক্ষণ।
এই সন্ধ্যাকালেতে জ্বালায়ে রেখেছি দীপ
হায় অন্ধকারেতে যদি কেউ আসে কাছে,
আমি তাহার ললাটে পরাইয়া দিব টীপ্
যদি জানিগো সত্যি কেউ ভালোবাসিয়াছে।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইন্দ্রদের জেলার সদর টাউনের আলবার্ট পার্কে বক্তৃতা হইতেছিল। কয়েকজন স্বদেশী প্রচারক আসিয়াছেন বাহির হইতে, তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন। পার্কের বাহিরে রেগুলেশন লাঠিধারী কয়েকজন পুলিস দাঁড়াইয়াছিল। ইন্দ্র কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল।

বানরীপাড়ায় পিটুনি পুলিসের অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা হইতেছিল। বক্তার পরে বক্তা উঠিয়া সে অত্যাচারের কাহিনী শ্রোতাদের বলিলেন। একজন বলিলেন—বরিশালে মগের আমল কায়েম হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা ফুলারের আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সংবাদ বেঙ্গলী কাগজে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা সেন্ট্রাল আপিসে সে টেলিগ্রাম আটক করা হয়েছে। ফুলারের তাঁবেদার বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের আদেশে গুর্খারা এক ভদ্রলোকের ঘর ভেঙে দিয়েছে। তাঁর অপরাধ—সেই ঘরে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেওয়া হয়েছিল। রান্নাঘরের মধ্যে এগার বছরের একটি ছেলে বন্দে মাতরম্ বলেছিল। সেই অপরাধে কালেক্টরের আদালতের সামনে হুইপিং ট্র্যাঙ্গেলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে তাকে বেত মারা হয়েছে।

আর এক বক্তা বলিলেন—ফুলার ঘোষণা করেছে সে নাকি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের দেখে নেবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ দিয়েছে তাঁদের পরিবার অন্যত্র পাঠাতে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হুকুমে গুর্খারা নাকি রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতরে পর্য্যন্ত ঢুকে অত্যাচার করে। গুর্খা সৈন্যদের কাপ্তেনের কাছে নালিশ করলে সে জবাব দেয়—তার কথা গুর্খারা শোনে না, সে কি করবে? ডেপুটিরা মেঠাইওয়ালাদের আদেশ দিয়েছে গুর্খারা যা চাইবে দেবে, দাম চাইতে পারবে না। দুই জন দোকানদারের দোকানঘরের বেড়ায় স্বদেশী বিজ্ঞাপন ছিল। তারা সেই বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলতে অস্বীকার করায় তাদের বেত মেরে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

তৃতীয় বক্তা উঠিয়া বলিলেন—মৈমনসিংহে ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বন্দে মাতরম্ বলে চীৎকার করছিল। শুনতে পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট 'ক্লার্ক' তার চাপরাসীকে আদেশ করলে ছেলেদের ধরে আনতে। ছেলেরা চাপরাসীকে আসতে দেখে ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন নিজে তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগল। ছেলেদের ধরবার জন্য সে লোকের বাড়ীর অন্দরমহলে ঢুকতেও ইতস্ততঃ করলে না। খুলনায় পুলিস সাহেব দোকানদারদের শাসিয়েছে, তারা দোকানে বিলেতী জিনিস না রাখলে বরিশালের মত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। সিরাজগঞ্জে ছাত্রদের এক সভা ভাঙতে গিয়ে পুলিস শহরের পথে বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে, স্ত্রীলোক, শিশু পর্য্যন্ত বাদ যায় নি। রংপুরে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ফুলারের অভ্যর্থনার জন্য ভোট দেন নি তাঁদের স্পেশাল কনেষ্টবল করা হয়েছে।

চতুর্থ বক্তা বলিলেন—বর্ব্বরোচিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ফুলারকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মসনদে বসানো হয়েছে। অত্যাচারী ফুলার হয়েছেন সম্রাটের প্রতিনিধি। ফুলার জন বলেছে, আমি রক্তপাতের জন্যও প্রস্তুত। অতি সুসংবাদ! দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সকল দেশেই রক্তপাতের ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে ফুলারের কুশাসন তার জন্য দায়ী। কোন সভ্য দেশে এই কুশাসনের তুলনা নেই।

শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া বক্তা বলিলেন—আপনাদের একখানা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছেন এক জন মৌলবী। তিনি লিখেছেন, কসাই যখন একটা ভেড়াকে জবাই করবার পরে সেই রক্তমাখা হাত আর একটা ভেড়ার গায়ে আদর করে বুলায় তখন বেচারার প্রাণে ভয় ছাড়া আর কি ভাব হতে পারে? সরকার যখন আদর করে মুসলমানদের পিঠে হাত বুলান সে আদর কি তাদের ভাল লাগবার কথা? সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্য ভাবে দেশের লোকের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইউরোপের কোন জাতি, এমন কি আমেরিকার লোকেরা পর্য্যন্ত কখনও কি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছে কোন দিন? মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভেদনীতি—

সভায় এই সময় বিষম হট্টগোল আরম্ভ হইল। লাঠিধারী পুলিসের দল ইহার আগেই পার্কের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ধাক্কাধাক্কি করিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিয়া তাহারা লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। বেপরোয়া লাঠি চালনার ফলে সভা ভাঙিয়া গেল। গোলমাল বাধিল স্কুল ও কলেজের ছেলেদের লইয়া। ইন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গোলমালের সৃষ্টি হইল।

ইন্দ্র রাজনগর হইতে সবে বাহিরে আসিয়াছে। শান্তিপূর্ণ সভার উপর এই ধরণের পুলিসী আক্রমণ ও নির্ব্বিচারে লাঠি চালানো এই সে প্রথম দেখিল। হয়ত সময় পাইলে সেও নিজের সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সে সময়টুকু পুলিস তাহাকে দিল না। পিছন হইতে লাঠির গুঁতা পিঠে লাগিতে

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র অসীম বলশালী যুবক, রাজনগরের প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, লাঠিয়াল আজাহার সর্দারের প্রিয় শাগরেদ। গুঁতা খাইয়া সে আহত ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া উঠিল। চোখের নিমিষে পুলিসের হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া সে এক লাফিতে তাহাকে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গী-দিগকে পার্কের রেলিং টপকাইয়া চলিয়া যাইতে বলিয়া সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্ক প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল। জনপাঁচেক ছেলে ছাড়া বাকী ছেলেরা ইন্দ্রের কাণ্ড দেখিয়া যত শীঘ্র পারে সরিয়া পড়িল। আট-দশ জন পুলিস লাঠি উঁচাইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। কাছে আসিয়া ইন্দ্রের চেহারা ও লাঠিহাতে তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বুঝিতে দেরী হইল না, ইহাকে ঘাঁটানো সুবুদ্ধির কাজ হইবে না।

ইতিমধ্যে পুলিস-দলের ভারপ্রাপ্ত দারোগাটি সেখানে উপস্থিত হইল। ক্ষতযষ্টি পুলিসটি তাহার অভিযোগ জানাইল। দারোগা আদেশ দিল—উহার লাঠি কাড়িয়া লইয়া গ্রেপ্তার কর। বয়োবৃদ্ধ এক জন কনেষ্টবল বলিল—হেই বাবুজী, লাঠিঠো হাতসে ফেলিয়ে দিন।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—লাঠিটা ফেলে দিই আর তোমরা লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ভাঙো, কেমন? এস, লাঠি কেড়ে নাও।

দারোগা অবস্থাটা বুঝিয়া লইল। ইন্দ্রের চেহারা ও হাসি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। সে বলিল—লাঠি ছেড়ে দিন মশাই। কেউ আপনাকে ছোঁবে না। তবে দয়া করে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

ইন্দ্রের সঙ্গী কয়েক জনের দিকে চাহিয়া সে বলিল—আপনারাও আসুন। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়াটা ঠিক নয়।

ইন্দ্র লাঠি ফেলিয়া দিয়া দলবল সহ থানায় চলিল। দারোগা কাজের বেলায় খুব হুঁশিয়ার। ইন্দ্র ও বাকী পাঁচ জন ছেলের মধ্যে কেহ থানা হইতে বাড়ী ফিরিতে পারিল না।

পরের দিন পুলিসকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া ও পুলিসকে প্রহার করিবার অভিযোগে ইন্দ্রের ও সেই ব্যাপারে সাহায্য করিবার অভিযোগে বাকী পাঁচ জনের বিচার হইল। সরাসরি বিচার। ইন্দ্রের ছয় মাস ও আর সকলের দুই মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইন্দ্রদের এষ্টেটের উকিল সংবাদ পাইয়া যখন ছুটিয়া আসিলেন তখন বিচার শেষ হইয়াছে। তিনি আপিলের অনুমতি ও আপিল সাপেক্ষে জামিনের প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দিলেন, কিন্তু প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। ইন্দ্র দলবল সহ জেলে ঢুকিল।

উকিলবাবু আপীলের দরখাস্ত করিলেন। তার পর বিস্তারিত ঘটনা জানাইয়া হরিনারায়ণকে টেলিগ্রাম করিলেন।

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আদালতের কাজ সারিয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন ইন্দ্রের এক জন ভৃত্য একখানি খোলা টেলিগ্রাম হাতে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পড়িয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হরিনারায়ণ টেলিগ্রাম করিয়াছেন—ইন্দ্রকে অবিলম্বে রাজনগরে আসিবার জন্য, তাহার মাতার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শহরের বড় ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সে যেন কালবিলম্ব না করিয়া রওনা হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আদালতের পোশাকেই তিনি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিলেন। সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তখনই ডাক্তারের রওনা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—হরিনারায়ণবাবুকে বলবেন আমি যেমন করে পারি ইন্দ্রকে জামিনে খালাস করে রাজনগরে পাঠাবার চেষ্টা করব।

পর দিন ডাক্তার যখন রাজনগরে পৌছিলেন তখন জগদ্ধাত্রীর দীর্ঘ রোগভোগের শান্তি হইয়াছে—বড় ছেলের জন্য কয়েক বৎসর ব্যাপী বিলাপ থামিয়াছে, স্বামীকে ছাড়িয়া পাছে এক দিনের জন্যও বাঁচিয়া থাকিতে হয় এই উৎকণ্ঠা শান্ত হইয়াছে। শেষ নিঃশ্বাস লইবার আগে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া জগদ্ধাত্রী যখন চোখের ইঙ্গিতে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইলেন, হরিনারায়ণ তখন মনে মনে বলিলেন—তুমি আমার আগে যাবে এ প্রতিজ্ঞা রাখলে, কিন্তু তোমার অভাব কি আমি সহ্য করতে পারব? কবে আমার সময় আসবে?

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে জগদ্ধাত্রীর বাকরোধ হইয়াছিল। তাঁহার দুই চোখের তারা এদিক ওদিক ঘুরিয়া নীরবে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছিল। তাঁহার দুইটি ছেলে, কিন্তু এমনি বরাত যে, মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উভয়েই অনুপস্থিত। এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হইয়া গেল যে ছোট মেয়েটিকেও লোক পাঠাইয়া আনিবার সময় হইল না।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রীর চিকিৎসা করিতে, হরিনারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইল। ধীরভাবে ডাক্তারের মুখে তিনি ইন্দ্রের খবর শুনিলেন। তার পর স্ত্রীর শেষকৃত্য সারিয়া আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।

ডাক্তারবাবু যখন ইন্দ্রের গ্রেপ্তার ও বিচার সম্বন্ধে উকিল-বাবুর মুখে শোনা কথাগুলি হরিনারায়ণকে বলিতেছিলেন, তখন জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শরীর তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। জগদ্ধাত্রীর অসুখের সংবাদ পাইয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেই যে এ বাড়ীতে আসিয়া-

ছিলেন এ পর্য্যন্ত আর স্বগৃহে ফিরিতে পারেন নাই।

হরিনারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্ত লক্ষীকে আনাইলেন। হরিনারায়ণের বড় মেয়ে মৃন্ময়ী শোকে এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে দেখিবার জন্তই লোকের দরকার, পিতার সেবা সে আর কি করিবে? চিন্ময়ীকে শ্বশুরবাড়ী হইতে আনিবার জন্য জীবানন্দ লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই সব ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভাবিতে বসিলেন ইন্দ্রের সম্বন্ধে কি করা যায়। উকিলবাবু আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে ইন্দ্রকে জামিনে খালাস করিয়া রাজনগরে পাঠাইবেন, কিন্তু জীবানন্দ জানিতেন এ কাজ তেমন সহজে হইবে না। স্বদেশী-ওয়ালা স্কুল কলেজের ছাত্রদের উপর শাসকসম্প্রদায়ের যে প্রকার বিদ্বেষ ভাব তাহাতে পুলিস কাহাকেও একবার কোন উপলক্ষে ধরিতে পারিলে তাহার নিষ্কৃতি পাওয়া দুর্ঘট। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, ইন্দ্রের আপীলের বিচার যে জেলা জজের কাছে হইবে তিনি পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগে বদলি হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে ইঁহার অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। কিছু হৃদ্যতাও হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে। ভদ্রলোক জাতিতে আইরিশ, ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে একটা বিরূপ ভাব আছে জীবানন্দ তাহা সেই সময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

জীবানন্দ স্থির করিলেন, তিনি নিজে সদরে যাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলাজজ উভয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইন্দ্রের জামিন সম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন। স্ত্রীকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। ত্রিনয়নী সাগ্রহে বলিলেন, তুমি আজই যাও। দিদি অকালে চলে গেলেন। কর্ত্তার যা অবস্থা দেখছি তাঁর ভালমন্দ কিছু হলে এত বড় সংসারটা ভেসে যাবে। ইন্দ্রকে এখন কাছে পেলে হয়ত ওঁর অবস্থা ভালোর দিকে যাবে। এমন বিপাকে একটা সংসার পড়তে পারে ভাবাও যায় না। একটু থামিয়া বলিলেন, চিরকাল আমরা এঁদের কাছ থেকে উপকার নিয়েছি, এখন এঁদের এই বিপদে যেটুকু সাধ্য করতে হবে। জেলের মধ্যে ইন্দ্র যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাবে—

কথা শেষ না করিয়া ত্রিনয়নী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিলেন। ইন্দ্রের অবস্থা মনে আসিতে তাঁহার চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতেছিল।

তিনি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ডাক্তারকে রাজনগরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া জীবানন্দ সেই দিন বিকালে সদরে রওনা হইয়া গেলেন।

উকিলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে তিনি জেলা জজের সঙ্গে দেখা করিলেন। পুরাতন আলাপ-পরিচয় ঝালাইয়া লইয়া ও পারিবারিক কুশল-প্রশ্নাদির পর জেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আই সি রায় বাহাদুর, অসুখের নাম করে আপনি বাবু অশ্বিনী দত্তের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন। ইট ইজ বিকমিং র‍্যাদার ওয়ার্ম দেয়ার। (সেখানকার হাওয়াটা কিন্তু বেশ গরম হয়ে উঠেছে।)

জীবানন্দ একটু হাসিলেন। বলিলেন, আমি একটা ব্যক্তিগত কাজের জন্ত এসেছি। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সঙ্কোচ বোধ করছি।

জেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আপনি পুলিসের লোক, নিশ্চয় কোন স্বদেশীওয়ালার জন্য কিছু বলতে আসেন নি। তবে আর সঙ্কোচ কিসের? নির্ভয়ে বলুন।

জীবানন্দ বলিলেন, স্যার, আমি একজন স্বদেশীওয়ালার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

জেলা জজ—'কি বললেন? আপনি না একজন ডি. এস. পি. এবং রায় বাহাদুর।'

জীবানন্দ ম্লান হাসিলেন। বলিলেন, আমার কথাটা দয়া করে শুনুন স্যার।

জীবানন্দ ইন্দ্রের গ্রেপ্তার, তাহার বিচার ও শাস্তি, তাহার মাতার মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন।

ধীর ভাবে সব শুনিয়া জেলা জজ বলিলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি রায় বাহাদুর?

জীবানন্দ—সেটা আপনি বিবেচনা করে বলবেন স্যার। আমার কথাটা আগে বলে নিই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদের নাইনে-করা উকিল আছে এখানে। তবু 'ডিফেন্সের' (আত্মপক্ষ সমর্থনের) কোন সুযোগ না দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সরাসরি তার বিচার করা হয়েছে। আমরা আপীলের দরখাস্ত করেছি। আপীল মঞ্জুর হলে তার মাতার আকস্মিক মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে এবং তার সামাজিক মর্য্যাদার কথা বিবেচনা করে জামিন দিতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি হবার কথা নয়। তবুও পুলিস আপত্তি তুলতে পারে। এবার আমার ব্যক্তিগত নিবেদনটা জানাচ্ছি। ইন্দ্রকে মুক্ত করা আমার কর্ত্তব্য। আমাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আজ দু'দিন হ'ল ইন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তার পিতা গুরুতর অসুস্থ। ইন্দ্র তাঁর একমাত্র পুত্র। ইন্দ্রের পিতা আমার বাল্যবন্ধু, আমার একান্ত হিতৈষী তিনি। আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, আমাকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আমার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার ইন্দ্রের পিতা বহন করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমার পরম বন্ধুর পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর পুত্রকে কাছে পাওয়া। এই সান্ত্বনাটুকু যাতে তিনি পান সেই ব্যবস্থা করে দেবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

জেলা জজ সহানুভূতির সঙ্গে জীবানন্দের কথা শুনিলেন। বলিলেন—আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি বলুন।

জীবানন্দ—ইন্দ্রের অপরাধ প্রমাণ করবার মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না আপীলের বিচারের সময় দেখা যাবে। আপীলের শুনানি হতে দেরি হবে। কিন্তু আপনি জানেন প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা। কাজেই এই সময় ছাড়া পাওয়া ইন্দ্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমি আপনার কাছে এই অনুগ্রহটুকু চাইছি।

জেলা জজ বলিলেন, রায় বাহাদুর, কাগজপত্র না দেখে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি নে। তবে জামিনের—আচ্ছা আপনারা কি জামিনের দরখাস্ত করেছেন?

জীবানন্দ—আজ করা হবে।

জেলা জজ—তাই করুন। কি করা যায় দেখব। আই ফিল র‍্যাদার সরি ফর ইওর ফ্রেণ্ড (আমি আপনার বন্ধুর জন্ত রীতিমত দুঃখবোধ করছি।)

জীবানন্দ ভাবিতেছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে কিনা সেকথা জজকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু তাঁর শেষের কথা শুনিয়া স্থির করিলেন উহা অনাবশ্যক, বরং ফল খারাপ হইতে পারে। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া জীবানন্দ উঠিতেছিলেন, জেলা জজ বলিলেন—বসুন, এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটু উপদেশ দিতে চাই।

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—জানেন, রায় বাহাদুর, আমার চৌদ্দ বছরের ছেলে এক জন হবু 'সিন ফিনা'র। কে জানে এক দিন আমার অবস্থা আপনার বন্ধুর মত হবে কি না। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর ছেলেটির বয়স কত হবে?

জীবানন্দ—বছর সতের-আঠারো হতে পারে।

—আপনার বন্ধুর আর্থিক অবস্থা কেমন?

জীবানন্দ—বনেদী জমিদার ঘর। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

জজ—আমি একটা কথা বলছি। থিঙ্ক এবাউট ইট (এ বিষয়ে ভেবে দেখুন)। আপনাদের দেশে ষোল থেকে কুড়ি-বাইশ বছর পর্য্যন্ত ছেলেদের পক্ষে সঙ্কট-সময়। আপনাদের সমাজে ছেলেদের বিবাহ করানোর পক্ষে আঠারো বছর উপযুক্ত বয়স মনে করা হয়, নয় কি? ছেলেটিকে চটপট বিয়ে করিয়ে ফেলুন। ইট উইল বি এ গ্যারান্টি অব সেফ্‌টি ফর ফিউচার (এটা হবে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার একটা অব্যর্থ উপায়)। ওকে যখন আপনার আমার মত চাকরি করে খেতে হবে না তখন ভাবনার কথা কি? আপনার পছন্দ হ'ল কথাটা?

জীবানন্দের কথাটা খুব মনে লাগিল। তিনি বুঝিলেন জজ বিচক্ষণ লোক। হরিনারায়ণের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে ইন্দ্রের বিবাহ করা প্রয়োজনও বটে। চট করিয়া একটা পুরাতন কথা তাঁহার মনে পড়িল। হরিনারায়ণের বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহার পিতা, হরিনারায়ণের পুত্রের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা কি তাঁহাকেই করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্ত ধন্যবাদ। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমি এই উপদেশ পালন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

জেলা জজ—ইয়েস, ইউ মুস্ত ডু ইট (হাঁ, তাই আপনার করা উচিত।)

জীবানন্দ উঠিলেন। সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি আজ অপেক্ষা করব তার।

সাহেব একটু হাসিয়া জীবানন্দের করমর্দন করিলেন, তাঁহার কথার স্পষ্ট উত্তর দিলেন না।

১০

চিন্ময়ী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। বাড়ীতে পা দিয়াই সে মায়ের ঘরে গিয়া মেঝের পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। লক্ষ্মী তাহার আসিবার খবর পাইয়াছিল। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া অবশেষে তাহাকে জগদ্ধাত্রীর ঘরে পাইল। চিন্ময়ীর পাশে বসিয়া সে তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে উঠিয়া বসিয়া চিন্ময়ী লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না ভাই, এ দুঃখ যে আমার মরলেও যাবে না!—লক্ষ্মীর চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল।

চিনি একটু শান্ত হইলে লক্ষ্মী বলিল—চিনু চল, জ্যেঠা-মশায়ের কাছে গিয়ে একটু বসবি। তোরা কাঁদছিস, ওঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কেমন যেন হয়ে গেছেন—ওঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে।

চিনিকে লইয়া লক্ষ্মী হরিনারায়ণের ঘরে চলিল। লক্ষ্মী এই কয় দিন এ বাড়ীতেই আছে। হরিনারায়ণের সেবার ভার তাহার উপরে। জ্রিনয়নী সকালে বিকালে আসেন, ডাক্তারের মতামত শুনিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী-শূন্য সংসারের ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। ইন্দ্রের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন সর্ব্বদা হায় হায় করে। ভাবেন, বড় ভাই নিরুদ্দেশ, অকালে মা চলিয়া গেলেন, চোখের দেখাটুকু পর্য্যন্ত হইল না, এদিকে বাপের অবস্থাও এখন তখন। সংসারের এই হাল আর ছেলেটা নিজে রইল জেলে আটক।

চিনিকে লইয়া লক্ষ্মী হরিনারায়ণের কাছে বসিল। মেয়েকে দেখিয়া হরিনারায়ণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চিনি তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। একটু পরে লক্ষ্মী চাহিয়া দেখিল হরিনারায়ণের চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। হরিনারায়ণের চোখে জল দেখিয়া তাহার মন যেন একটু হাল্কা হইল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের চারদিকে চাহিয়া দেখিল। হরি-

নারায়ণের প্রিয় সেতারটি একধারে অযত্নে পড়িয়া আছে, ধুলি জমিয়াছে সেতারের গায়ে। ছোট টেবিলের উপরে ফুলদানিতে ফুল কবে শুকাইয়া গিয়াছে। বড় টেবিলটার উপরে অনেকগুলি বই ছড়ানো রহিয়াছে। রূপার গড়গড়ার গায়ে ধুলি সঞ্চিত হইয়াছে। মাথার বালিশের তোয়ালেখানা ময়লা হইয়াছে। লক্ষ্মী আঁচল দিয়া সাবধানে সেতারের ধুলি মুছিয়া তাহার ঢাকা পরাইয়া সেটিকে যথাস্থানে রাখিল। ফুলদানি বারান্দায় লইয়া গিয়া বাসি, শুকনো ফুলগুলি ফেলিয়া দিল। হরিনারায়ণের খাস খানসামা বারান্দায় ঢুকিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া বাগান হইতে ফুল আনিতে বলিল। গড়গড়ার ধুলি মুছিয়া, নল খুলিয়া সেটি ধুইয়া মুছিয়া আবার নল পরাইয়া রাখিল।

কাজ শেষ করিয়া সে চাহিয়া দেখিল চিনি তখনও মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মনে পড়িল, চিনি শ্বশুরবাড়ী হইতে কাল রওনা হইয়াছে, পথে কিছু খাওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহাকে কিছু খাওয়ানো দরকার। সে চিনির পিঠে হাত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল—চিনু আয়, হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসবি।

হরিনারায়ণের খানসামাকে সে ঘরের মধ্যে বসিতে বলিল। তার পর চিনিকে জড়াইয়া ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে হরিনারায়ণের কাছে গিয়া বলিল—জ্যেঠামশাই, চিনুকে কিছু খাইয়ে আসি, ওর বোধ হয় সারাদিন খাওয়া হয় নি। হরিনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা হরিনারায়ণকে পথ্য দিয়া, লক্ষ্মী কাপড় ছাড়িয়া মণ্ডপ দালানে প্রণাম করিয়া অন্দরের আঙিনায় তুলসীতলায় আসিল। দেখিল বেদীমূলে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রদীপের সলিতাটি উস্‌কাইয়া দিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া সে প্রণাম করিল। প্রণাম সারিয়া উঠিতে দেখিল তাহার পাশ দিয়া কে এক জন চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী একটু চমকিয়া বলিল—কে ?

যে যাইতেছিল সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কে, লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী দেখিল ইন্দ্র। অন্ধকারে ইন্দ্রের মুখের চেহারা ভাল দেখা গেল না। তাহার গলার স্বর লক্ষ্মীর মনের মধ্যে আঘাত করিল।

ইন্দ্র আগাইয়া আসিয়া বলিল, বাবা কেমন আছেন ? চিনি এসেছে ?

লক্ষ্মী বলিল, আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে ? জ্যেঠামশাই আজ একটু ভাল আছেন। চিনি কাল এসেছে। চিনি বড় কান্নাকাটি করছে।

একটু থামিয়া সে বলিল, আপনি জ্যেঠামশায়ের কাছে যান। আমি চিনিকে নিয়ে তাঁর ঘরে যাচ্ছি।

ইন্দ্র চলিয়া গেল। সে চোখের আড়ালে গেলে লক্ষ্মী গলায় আঁচল জড়াইয়া আবার তুলসী-বেদীতে প্রণাম করিল। একবারে তাহার তৃপ্তি হইল না, তিন চার বার সে বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া জীবানন্দ ইন্দ্রকে বলিলেন, তুমি দাদার ঘরে যাও, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

ডাক্তার বৈঠকখানার একটি ঘরে ছিলেন। জীবানন্দ ঘরে ঢুকিতে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিনারায়ণবাবুর ছেলে এসেছে ?

জীবানন্দ বলিলেন, সে জামিনে ছাড়া পেয়েছে। আপীলে শুনানির সময় উপস্থিত হতে হবে। ডাক্তার বলিলেন, সে সব পরের কথা। উপস্থিত তাকে যে ছেড়ে দিয়েছে সেইটেই ঢের অনুগ্রহ করেছে বলতে হবে। ছেলেকে কাছে পেলে হরিনারায়ণবাবুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই হবে। তাঁর ছোট মেয়ে আসবার পরে থেকে কিছু উন্নতি দেখছি। আপনার মেয়ের প্রশংসা কিভাবে করব জানিনে রায়বাহাদুর। এটুকু বয়সে অমন বুদ্ধিমতী, শান্ত স্বভাবের কাজের মেয়ে আমার আর চোখে পড়ে নি।

জীবানন্দ মৃদু হাসিলেন মেয়ের প্রশংসা শুনিয়া। বলিলেন, এ যাত্রা দাদা সামলে নিতে পারবেন মনে হচ্ছে কি ?

ডাক্তার—ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে ধীরে ধীরে সেরে উঠবেন ভরসা করছি। তবে রীতিমত সুস্থ হয়ে ওঠা—মানে আগেকার স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন কিনা সন্দেহ। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলে ওঁর স্থানপরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। সে যা হোক, এখনকার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে গেলেম। আপনি এসেছেন এইবার আমাকে ছুটি দিন।

জীবানন্দ—আজ রাতটা থাকুন। কাল ওঁকে ভাল করে দেখে ব্যবস্থার কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার শরীরটাও সুস্থ নয়। আমার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আপনার ব্যবস্থা এখনই করছি। সারা জীবন খেটেছেন, এখন একটু বিশ্রাম নিন। আপনার প্রয়োজন পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ডাক্তারের ঘর হইতে বাহির হইয়া জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে গেলেন।

রাত্রে আহারের পর জীবানন্দ স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওপরে এস। অনেক পরামর্শ আছে।

নিচে যাইয়া ছেলেমেয়েদের শুইতে পাঠাইয়া ত্রিনয়নী যখন ঘরে আসিলেন জীবানন্দ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ত্রিনয়নীর পায়ের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি

উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, এক গ্লাস জল দাও ত, তেষ্টা পেয়েছে।

জল খাইয়া তিনি বলিলেন, ঠিক হয়ে বস বিছানায়। অনেক কথা আছে।

চিন্ময়ী বিছানায় বসিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, কি কথা বল।

জীবানন্দ—হাতে আরও দু'মাস ছুটি আছে। ভেবেছিলাম একটু সুস্থ হলে কোন ভাল জায়গায় গিয়ে মাসখানেক থেকে আসব। কিন্তু সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। হরিনারায়ণদার এই বিপদের সময় তাঁকে ফেলে যেতে পারি নে। এখন হাতে দুটো কাজ রয়েছে। একটা ইন্দ্রের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টা—

চিন্ময়ী—মেয়ের বিয়ে।

জীবানন্দ—ঠিক ধরেছ। ও বাড়ীর চিনি আর লক্ষ্মী এক বয়সের নয় ?

চিন্ময়ী—লক্ষ্মী দু'মাসের বড়। আর তাকে রাখা যায় না।

জীবানন্দ—তাই বলে না দেখে শুনে বিয়ে দেব ? তা হবে না। আমার ইচ্ছে কি ছিল জানো ? একসঙ্গে বেবু আর লক্ষ্মীর বিয়ে দেব। কিন্তু বেবুর যা ভাবগতিক, চট করে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি নে। তাই ঠিক করেছি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেলা ভাল। এবার চেষ্টা আরম্ভ করব। এখন ইন্দ্রের কথা বলছি—শোন। জজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় সে ছাড়া পেলেও পেতে পারে, নচেৎ নামমাত্র শাস্তি হবে। কিন্তু তার পরেও ইন্দ্রের বিপদ কাটবে না। পুলিসের নজর পড়েছে ওর ওপর। লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘের চেয়ে পুলিস সাংঘাতিক জীব। পুলিসে ছুঁলে হয় বত্রিশ ঘা। সবাই একথা জানে। জজসাহেবও জানেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, 'ছেলেটাকে যদি নিরাপদে রাখতে চাও তা হলে ওর বিয়ে দিয়ে ফেল।' এই পরামর্শমত কাজ করতে হলে প্রথমত ইন্দ্রের বাপের মত হওয়া চাই, তার পর ইন্দ্রের নিজের রাজী হওয়া চাই। ওর বাপকে হয়ত বর্তমান অবস্থায় রাজী করানো যেতে পারে, কিন্তু ইন্দ্র নিজে যদি বেঁকে বসে ? ছেলেদের কার পেটে কি আছে বোঝা দুষ্কর।

চিন্ময়ী—ইন্দ্রকে আগে থেকে বলবার দরকার কি ? সে ছাড়া পেলে ওবাড়ীর বট্‌ঠাকুর বলবেন। তাঁর কথা সে ফেলতে পারবে না।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—তুমি ঠিক বলেছ। আজ রাতটুকু কাটুক, কাল হরিনারায়ণদাকে সব কথা বলব।

চিন্ময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। জীবানন্দ বলিলেন, আর কি ভাবছ ? যেটুকু গোলমালের আশঙ্কা ছিল তার মীমাংসা ত তুমি নিজেই করে দিলে।

চিন্ময়ী—ভাবছি ইন্দ্রের বিয়ে দেবার ভার ত নিচ্ছ, কিন্তু ওর বাপের পছন্দমত মেয়ে দেখে বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে পারবে কি ? বট্‌ঠাকুরের শরীরের অবস্থা ভাল নয়।

এবার জীবানন্দ ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা সত্য। ইন্দ্রের পিতা অসুস্থ। যাহা করিবার অর্থাৎ পছন্দমত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ স্থির করিবার কাজ তাঁহাকেই হয়ত করিতে হইবে।

চিন্ময়ী—একটা কথা বলছি, তুমি কি ভাববে জানি নে, তবে আমি মা, অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয়। সে স'ব কথা তুমি বুঝবে না।

জীবানন্দ একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। বলিলেন—কি বলবে বল না, আমার কাছে বলতে যদি অত ভাবতে হয়—

চিন্ময়ী—ভাবছি এজন্য যে কথাটা শুনে তোমার কেমন লাগবে জানি না। তুমি এখানে থাক না, নিজের চোখে কিছু দেখবার সুযোগ হয় নি। অত কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি বলি কি—

জীবানন্দ বুঝিলেন চিন্ময়ীর বক্তব্য বাধিয়া যাইতেছে তিনি কি ভাবে কথাটা লইবেন তাহা ভাবিয়া। তিনি স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তোমার মনের কথা বল। সেকথা যাই হোক না কেন, আমি কিছু মনে করব না।

চিন্ময়ী স্বামীর কথা শুনিয়া মৃদু ম্লান হাসি হাসিলেন। বলিলেন—বলছি। আমি বলি কি আমাদের মেয়েকে কি ইন্দ্রের হাতে দেওয়া যায় না ? অন্য কোন দিক ভেবে আমি একথা বলছি না জেনো, আমি মা বলে অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয় কিনা ?

চিন্ময়ীর কথা শুনিয়া জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, স্ত্রীর কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিন্ময়ী বলিলেন—ইন্দ্রের জেলে কয়েদ হবার সংবাদ যখন শুনল তখন মেয়ের এমনি অবস্থা হ'ল যে তার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি নি, শুধু ভগবানকে ডাকলাম মনে মনে। বললাম, ঠাকুর, মেয়ে আমার বড় হয়েছে, এ কি খেলা খেলছ তুমি ? ছোটটি থেকে দু'জনে মেলা-মেশা করছে, হাসিখুশী, গল্প, ঠাট্টা-মস্করা, ঝগড়া-ঝাঁটি কতই হয়েছে। দোষ আমাদেরই, কেন আরও আগে মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করি নি। এত দিনে সব ভুলে যেত। বরং মেয়ের মনে এমন দাগ বসেছে, ভাবতে আমার বুক কেঁপে ওঠে। মেয়ের মুখ যেন আয়না, নিজেও হয়ত ভাল করে বোঝে না ছেলেবেলার চাঁদ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

জীবানন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার কথা এবার বুঝলাম। আমাদের ত্রুটি হয়েছে মেয়ের এত দিন বিয়ে না দেওয়া। এবার আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করব, যত শীঘ্র পারি। কিন্তু তুমি যে প্রস্তাব করলে তা হতে পারে না। অত কথা ছেড়ে দিলেও একটা কথা থেকে

যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, ওরা আমাদের উপকারী যজমান বংশ, আমরা ওদের বৃত্তিভোগী পুরোহিতবংশ। । ওদের দেওয়া ব্রহ্মোত্তর আমরা এখনও ভোগ করছি। ওরা নিজে থেকে দিতে না চাইলে আমি এ প্রস্তাব করতে পারি নে।

এবার জ্ঞানদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—তুমি বাপ, তুমি যা ভাল মনে কর তাই হবে।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—তুমি শোও, আমি বাতাস করি একটু।

জীবানন্দ শয়ন করিলেন।

পরের দিন জীবানন্দ হরিনারায়ণের নিকট ইন্দ্রের বিয়ের কথা তুলিলেন। তিনি সহজেই মত দিলেন। বলিলেন, ছেলের বিয়ে দিতে পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারি ভাই। তবে খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল মেয়ে খুঁজে বের করতে পারবে কি এত শীঘ্র? আমি অশক্ত হয়ে পড়েছি, সব ভার তোমার ওপর।

ভাল মেয়ের কথা উঠিতে জীবানন্দ একটু বিমনা হইলেন। তখনই সে ভাব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, আগে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনি। মেয়ের ভাবনা কি?

যথাসময়ে জগদ্ধাত্রীর শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেল। হরিনারায়ণের শরীর আর খারাপের দিকে যায় নাই।

জীবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হরিনারায়ণ স্থির করিলেন আপীলের ফলাফল দেখিয়া ইন্দ্রের বিবাহের কথা পাকাপাকি স্থির করা হইবে। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় কোন পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথা স্থির করা ঠিক হইবে না। ইন্দ্রের কারাদণ্ড হইলে কেহ কেহ হয়ত মেয়ে দিতে ইতস্ততঃ করিবেন।

হরিনারায়ণ পুত্রকে বিবাহ করাইবেন একথা প্রচার হওয়াতে দুই একটি করিয়া সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। হরিনারায়ণ বৃদ্ধ নায়েবের উপর প্রাথমিক কথাবার্ত্তা চালাইবার ও মেয়ে দেখিবার ভার দিলেন। তিনি ভাবিলেন, উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান পাইলে জীবানন্দকে মেয়ে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতে অনুরোধ করিবেন।

রাজনগরে ফিরিয়া মাতার আকস্মিক মৃত্যুর শোকে ও পিতার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্র কয়েক দিন মুহ্যমান হইয়া রহিল। গ্রেপ্তার, সরাসরি বিচার ও কারাদণ্ডের আদেশ তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আজ এক বৎসরের উপর স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য পুলিসী জুলুম, সরকার-তোষণকারী এক শ্রেণীর লোকের বিরোধিতা, সাধারণ লোকের ঔদাসীন্য—এই সব ধীরে ধীরে তাহার মনে নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করিতেছিল। তাহার মনে কেমন একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল যে, স্বদেশী আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে। প্রথমে এই আন্দোলন লোকের মনে যেভাবে দোলা দিয়াছিল সেই হুজুগ থামিয়া গিয়াছে। লোকের মন আবার পূর্ব্বেকার ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পারিবারিক শোকের আঘাতে মনের এই ভাবটা আরও ঘনীভূত হইল।

ইন্দ্র স্বভাবতঃ আবেগপ্রবণ, উদ্যমশীল ও বিশেষ বুদ্ধিমান। শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল, পারিবারিক শোকের আঘাতে যে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়াছে সেই দুর্ব্বলতা, ও পিতার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ায় তাঁহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে সেই অনিশ্চয়তা তাহার দৃষ্টিকে ও বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে ভাবিল, হয়ত তাহার জেল হইবে। জেল হইতে বাহির হইয়া সে কি করিবে? কোন্ পথে সে চলিবে? এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কবলে পড়িয়া সে ভাবিল, যদি মন খুলিয়া কথা বলিবার ও পরামর্শ করিবার মত কাহাকেও পাওয়া যাইত! সতীশের কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহার ঠিকানা ত সে জানে না। অনেক চিন্তা করিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিতে বসিল। ভাবিল দেবুদা তাহার আবাল্য পরামর্শদাতা গুরু, তাহার সর্ব্বোত্তম সুহৃদ, দেখা যাক সে কি পরামর্শ দেয়।

অনেক রাত জাগিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিল। বর্ত্তমান পারিবারিক যে সমস্যা তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিল। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশসেবার কার্য্যকরী পন্থা কি এই প্রশ্নটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল। পরদিন চিঠিখানি ডাকে দিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল।

বিকালের দিকে পিতাকে ঔষধ খাওয়াইয়া সে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। চিন্ময়ী ও ইন্দ্র উভয়ে মিলিয়া পিতার শুশ্রূষার ভার লইয়া লক্ষ্মীকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়াছে। লক্ষ্মী এখন বাড়ী হইতে প্রতিদিন বিকালে আসিয়া হরিনারায়ণকে দেখিয়া যায়।

ইন্দ্র রায়বাগানের পাশ দিয়া বনদুর্গাতলা হইয়া মুরলী বিলের ধারে মাঠে যাইবার পথ ধরিল। বনদুর্গাতলায় আসিয়া কি ভাবিয়া সে একটু দাঁড়াইল, তারপর বাঁ-দিকে বিলের পথে অগ্রসর হইল। সেই সময়ে চৌধপাড়া হইতে ইন্দ্রদের বাড়ীর ঝি বুকীর মা লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল। চিন্ময়ী লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছিল। বুকীর মা আগে আগে আসিতেছিল। বনদুর্গাতলায় ইন্দ্রকে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার পিছনে লক্ষ্মীকে দেখিতে পায় নাই। কয়েক পা গিয়া বুকীর মার গলার শব্দে ফিরিয়া চাহিতে ইন্দ্র দেখিল বনদুর্গাতলায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতে লক্ষ্মী ঘাড় হেঁট করিল, এবং বুকীর মার পিছনে অগ্রসর হইল।

নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্র চলিতে

লাগিল, ভাবিল, লক্ষ্মী বাবাকে দেখিতে যাইতেছে। এবার এত দিন ধরিয়া লক্ষ্মী বাবার যে সেবা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। লক্ষ্মীর যে এত গুণ সে কখনও ভাবে নাই। তাহার মনে হইল লক্ষ্মী যেন আরও বড় হইয়াছে, আরও সুন্দর হইয়াছে। চিনি ওর একবয়সী, কিন্তু তাকে কত ছেলেমানুষটি দেখায়। হঠাৎ তাহার মনে হইল লক্ষ্মী ওখানে দাঁড়াইয়াছিল কেন? তার কি তাহাকে কিছু বলিবার ছিল? সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দুই এক পা আগাইয়া থামিল। ভাবিল লক্ষ্মী আজকাল তাহার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, সে গিয়া কি করিবে? কিছু বলিবার থাকিলে চিনুকে বলিবে। সে আবার বিলের পথে চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আজ সকালে হরিনারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিল। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হওয়ায় বিকালে আর যাইবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু মুক্তীর মা আসিয়া বলিল, ছোট দিদিমণি তাহাকে পাঠাইয়াছে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্মী দিদিমণিকে লইয়া যাইবার জন্য। লক্ষ্মী মনে করিল হরিনারায়ণের সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে বোধ হয় চিনি কোন পরামর্শ করিতে চাহে তাহার সঙ্গে। সে জানিত না চিন্ময়ী তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল বটে, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে কোন পরামর্শের অভিপ্রায়ে নহে। সেদিন সে জীবানন্দ কাকাকে তাহার বাবার কাছে বলিতে শুনিয়াছিল যে, পঞ্চক্রোশীতে একটি ভাল ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তিনি পঞ্চক্রোশী যাইতেছেন। বর বর পছন্দ হইলে তিনি মেয়ে দেখিবার জন্য পাত্রপক্ষকে নিমন্ত্রণ করিবেন ও ছুটি শেষ হইবার আগে লক্ষ্মীর বিবাহ দিবেন। হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন—মেয়ে বড় হয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব দায়মুক্ত হওয়া ভাল। তুমি পঞ্চক্রোশী থেকে ফিরে এস, ইন্দ্রের জন্য একটি ভাল সম্বন্ধ এসেছে, মেয়েটি তোমাকে এক বার কষ্ট করে দেখতে যেতে হবে। বড় বয়, মায়েবকে ওখানে পাঠাতে পারি না।—এই কথাবার্তা শুনিবার পর চিন্ময়ী অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না ইঁহারা এমন অন্ধ কেন, কেন নিকটের বস্তু চোখ তুলিয়া না দেখিয়া দূরে হাতড়াইতে যাইতেছেন। লক্ষ্মীর মনের কথা সে কিছু কিছু জানে। সুতরাং অন্য কোথাও যাহাতে লক্ষ্মীর বিয়ের কথা চলিতে না পারে সে চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। কুল-গৌরবে অন্ধ হইয়া তিনি তাহার প্রস্তাব কানে তোলেন নাই, নিজের সংসারের কিসে হিত হয় বুঝিতে চাহেন নাই। আজ তিনি স্বর্গে, তাঁহার দোষ ধরিতে নাই। তাহার বাবার মনোভাবও কি ঐ রকম? বোধ হয় তাই। নচেৎ লক্ষ্মীকে এত দিন ধরিয়া দেখিয়া, তাহার সুন্দর স্বভাবের এত পরিচয় পাইয়াও দাদার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহের কথা বলেন না কেন? সব পুরুষ মানুষ অন্ধ। তাহার দাদাও কি অন্ধ?

চিন্ময়ী সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়া হউক সে জীবানন্দ কাকার পঞ্চক্রোশী যাওয়া বন্ধ করিবে, তাহার বাবার কাছে কথাটা পাড়িবে। সে বুঝিতে পারে জীবানন্দ কাকা নিজে হইতে বাবার কাছে প্রস্তাব করিবেন না। ভাবিতে ভাবিতে এক বার তাহার মনে হইল, আচ্ছা, দাদার নিজের মনেও যদি মায়ের মত, দিদির মত কুলের বড়াই থাকে, যদি লক্ষ্মীর উপর সত্যই টান না থাকে তাহা হইলে সে কি করিবে? আগে দাদার মনের ভাবটা বুঝিয়া লইয়া বাবার কাছে কথা উত্থাপন করা উচিত। এখন দাদার মনের ভাব বুঝিবার কি উপায় করা যায়? দাদাকে দেখিয়া মনে হয় তাহার মাথায় কি সব চিন্তা ঘুরিতেছে। ইহার আগে মায়ের অসুখের সময় যখন সে আসিয়াছিল তখনও দাদাকে এই রকম চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়াছিল। সে সব সময়ে উন্মনা থাকে। সেদিন কাকীমাও তাহাকে বলিয়াছিলেন—চিনু, ইন্দ্র এত উন্মনা হ'ল কেন? তোমার বড় ভাই সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছে। ইন্দ্রের এই ভাবটা আমার ভাল লাগছে না। তোমরা যত শীঘ্র পার বিয়ে দিয়ে ওকে বাঁধবার চেষ্টা কর। ও যদি পালায় তোমার বাবা সেই দণ্ডে মারা যাবেন।—কাকীমা যথার্থ হিতৈষিণীর মত কথা বলিয়াছেন। আর দেরি করা ভাল হইবে না।

অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পরে তাহার মনে হইল লক্ষ্মী আজ বিকালে বোধ হয় আসিবে না, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাই। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখি। ক্রমশঃ
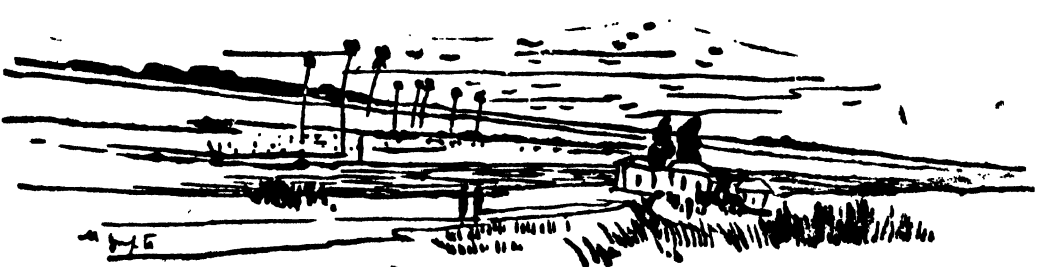
শিশিরকুমার ঘোষ ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

জাতীয়তার উদ্বোধক প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই "অমৃত বাজার পত্রিকা"র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। হিন্দুমেলার সহিতও তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।*

হিন্দুমেলার ন্যায় রঙ্গমঞ্চকেও শিশিরকুমার জাতীয়তার উন্মেষ তথা স্বদেশ-সেবার অন্যতম প্রধান বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার একখানা আধুনিক ধরণের যাত্রার বই লিখিয়াছিলেন এবং নিজ গ্রাম অমৃত বাজারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ আমোদ এবং সত্যকার শিক্ষা—এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা ইহা আরম্ভ করেন।

দৃশ্যনাট্যের মধ্য দিয়া জাতির মর্ম্মবেদনা ও মর্ম্ম-কথা যেরূপ প্রচার করা যায় এরূপ আর কিছু দ্বারাই সম্ভব নহে। এতদিন কলিকাতা এবং মফস্বলের ধনী ও বিত্ত-শালী লোকেরা সখের থিয়েটার বা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া সাময়িক ভাবে সে যুগের সামাজিক ও অন্যবিধ বহু সমস্যামূলক নাটক-প্রহসন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে উঁহাদের বন্ধু-বান্ধব এবং নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে, প্রথমে ঢাকায় এবং তাহার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় এই সাধারণ-অধিগম্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নামে অভিহিত হয়। শিশিরকুমার কলিকাতায় আগমনের পর এইরূপ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ উৎফুল্ল হন এবং যে সব যুবক ইহার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় শিশিরকুমার ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র যে-সব অভিনয় হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সুবিখ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় লইয়াই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল। যখন এই নাটকাভিনয়ের মহলা চলিতেছিল তখনই শিশিরকুমার উদ্যোক্তাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচিত হন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু উদ্যোক্তা ও অভিনেতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

"খুব উৎসাহের সহিত আমাদের ['নীলদর্পণে'র] রিহা-র্সাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটারে গা ঢালিয়া দিয়াছি। একদিন রসিক নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন আমার ঠিক মনে নাই।...আমি একাকী তামাকু সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভুবন নিয়োগীর এই বাড়ীতে থিয়েটারের রিহার্সাল হয়?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'তুমি কি সেই দলের একজন প্লেয়ার?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

'আজ তোমরা এখনও রিহার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন?'

'আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।'

'তাই ত; আমরা এলুম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে'—

'আসুন ভিতরে বসুন, তামাক খান।'

'থাক্, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পারছ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারীমোহন রায়।'

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদধূলি লইলাম, অক্ষয় বাবুকে ও প্যারীমোহন বাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি?'

'অমৃতলাল বসু।'

'তুমি কি সাজবে?'

'সৈরিন্ধ্রী।'

'আচ্ছা, সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হ'ল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পাঠটা আমাদের একটু শোনাবে?'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম।...আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—'আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপ-নার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশী, আপনি যখন বলছেন তখন আমি আমার পাঠ একটু আপনাকে শোনাতে পারি।'

আমি নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যায় পার্শ্বে সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।"*

---

* পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। ১৩৩০। পৃ. ১০০-১

* দীপায়ন—মাঘ, ১৩৫৩।

২

শিশিরকুমার জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অতঃপর অমৃতলাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"সেদিন ফিরিয়া যাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—'এখন আমি বৌবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে থাকি; তুমি আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—'তিনি একজন আস্ত বাঙ্গালী ছিলেন। একথাটা যে কত সত্য তা' আপনারা বোধ হয় অ.জকাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তিনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নূতন থিয়েটার খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ন্যাশনাল থিয়েটার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic ষ্টেজ, ইহা ত আর ধনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্ম্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্ত লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে।...কিছু দিন পরে শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।"*

প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা-চিৎপুরস্থ মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হইল 'নীলদর্পণ'। শিশিরকুমার অভিনয় দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী ১২ই ডিসেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিজ মন্তব্যসহ দীর্ঘ বিবরণ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একারণ এখানে এই বিবরণটি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

"নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবার নীলদর্পণের 'নবযৌবন' হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার্য্যের অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইয়াগো চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীনমাধব বলিলেন যে, 'আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ' বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি?"

শিশিরকুমারের দৃষ্টি শুধু কলিকাতাবাসীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি মনে করিতেন বাঙালী জাতির হিত করিতে হইলে কলিকাতার ন্যায় মফস্বলের জনসাধারণকেও জাতীয় ভাবে ভাবিত করিতে হইবে। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠাতৃবর্গকেও এইজন্য তিনি মফস্বলে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বেলাতেও তিনি নীলদর্পণের এই প্রথম অভিনয়ের পরেই মফস্বলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে কর্ম্মকর্ত্তাদের উপদেশ দিলেন। তবে এবারে ইহার কারণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ছিল। শিশিরকুমার লিখিলেন,

"আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্তধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিপীড়ন আর নাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব?"

জাতীয় রঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণ' কয়েকবার অভিনয়ের পর অন্যান্য নাটকও অভিনীত হইতে লাগিল। বড় বড় নাটকের সঙ্গে প্রহসনও অভিনীত হইতে থাকে। তখন প্রহসন-সাহিত্য সবে গড়িয়া উঠিতেছিল। মধুসূদনের কয়েকখানি প্রহসনই ছিল তখন একমাত্র সম্বল। অভি-

* ঐ। পৃ. ১০১-২।

নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রহসন-রচনায় তৎপর হইলেন। এই প্রহসন-সাহিত্য রচনায়ও শিশিরকুমার পত্রিকা মারফত যুবকদিগকে কিরূপ প্রেরণা দিতেছিলেন, অমৃতলাল বসু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,

"এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে।...ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সব্ ডেপুটী তৈয়ার করিবার জন্য স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপকরা, সন্তরণ, জিম্‌ন্যাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সব্ ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গবর্ণমেণ্টের সার্কুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃত বাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার Cartoon বাহির হইল ; কয়েকজন জিম্‌ন্যাষ্টিকের পোষাকপরা বাঙালী যুবক সার গাঁথিয়া দণ্ডায়মান—তাহাদের কানে চিমটে, কোমরে শিকল। সব্ ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্ত্তমান। আমাদের থিয়েটারের জন্য প্রহসনের সুন্দর মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার ফার্স রচিত হইয়া গেল।"*

৩

যুবকদের এই সাধু প্রচেষ্টায় শীঘ্রই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটিতে লাগিল। এই সময় শিশিরকুমার পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেন। ১৮৭৩ সনের ১৯শে জানুয়ারী তাঁহার সভাপতিত্বে বিবদমান যুবকদের লইয়া এক সভা হইল। সভায় উপস্থিতমত বিবাদ-মীমাংসা অসম্ভব বিধায় তিনি একটি সালিশী কমিটির উপর ইহার ভার অর্পণ করিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল পাল এবং রাজেন্দ্রলাল পাল। যাহা হউক, কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাদ মিটিয়া গেল। ইহাতে শিশিরকুমারের কতখানি হাত ছিল, পরবর্ত্তী ৩১শে ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান মিররে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে তাহা সম্যক্ জানা যাইতেছে,

Sir,—Now the rupture among the members of the National Theatrical Society has, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave rise to it. This collision would have proved distructive of national entertainments, had not the well-known Editor of the *Amrita Bazar Patrika* intervened between the contesting parties. His good advices and solicitations gradually conquered the obstinacy and party-feeling of each party and at last brought the matter to a happy end. Such is his desire to give the National Theatre a firm stand that he, in addition to his hard labor as an Editor, willingly embraced all the privations to write a Natuk for them and at last produced the pleasing *Noisho nupeca* on the stage the week before last. The three directors of the Theatre now are the Editor of the *Amrita Bazar Patrika*, Babu G. C. Ghose, and another Native gentleman.

We wish prosperous career to the National Theatre. The members of the N. T. Society must feel grateful; that the Editor of the *Amrita Bazar* has meddled in its affairs and when he is there we doubt not the matters will be managed smoothly.

Yours etc.,
A friend to the National Theatre.*

এই পত্রখানি হইতে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিবাদ ভঞ্জনে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার জানা যাইতেছে। উদ্যোক্তারা যুবক, তাঁহাদের উপরে চালক থাকা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ উদ্যোক্তাদের আগ্রহাতিশয্যে এবং শিশিরকুমারের পরামর্শে তিন জন ডিরেক্টরের উপর সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। এই তিন জন ডিরেক্টর হইলেন শিশিরকুমার স্বয়ং, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত পত্রে শিশিরকুমারের 'নয়শো রূপেয়া' নামক নাটক রচনা ও অভিনয়ের কথাও জানিতে পারিতেছি। এই নাটকখানি জাতীয় রঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হয়। বঙ্গে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ কন্যার পণপ্রথা হেতু দিন দিন কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছিল এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। শিশিরকুমার কঠিন সমস্যার বিষয়ও হাস্যকৌতুকের সমাবেশে সরস করিয়া তুলিতেন। 'নয়শো রূপেয়া' শুধু নাটক নহে, একটি সার্থক রস-রচনাও। শিশিরকুমার 'বাজারের লড়াই' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে আরও দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে আবার বিবাদ আরম্ভ হইল। ৮ই মার্চ্চ তারিখে শেষ বারের মত অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে ইহা বিদায় লইল। কর্ম্মকর্ত্তারা কিছুকাল পরে দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নাম বজায় রাখিলেন, অন্য দল 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হইলেন। শিশিরকুমার অতঃপর ইহাদের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংস্রব রাখেন নাই। তবে উভয় দলেরই অভিনয়-কাহিনী তিনি যথারীতি পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন।

---

* ঐ, ১২৬-৭

* বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় সং। পৃ. ১১৩-৪। এই পুস্তকে এবিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪

শিশিরকুমার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরই মফস্বলেও অভিনয়াদির আয়োজন করিতে উহাদের পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়াছি। ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া মফস্বলে—ঢাকায় ও অন্যত্র গিয়া অভিনয়াদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার অল্প দিন পরেই গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইতে লাগিল, এই সময়ে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার এবং বেঙ্গল থিয়েটার নামে আরও দুইটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল থিয়েটারেই সামাজিক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন নাটক অভিনীত হইতেছিল। 'ভারতমাতা', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'শরৎ সরোজিনী', 'বীরনারী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মোহন্তের এই কি কাজ', 'হীরকচূর্ণ নাটক', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রভৃতি সময়োপযোগী বিষয়াদি সম্পর্কেও নাটক প্রহসন রচিত হইয়া অভিনীত হইতে লাগিল। এ সকল নাটকে উল্লিখিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর শিশিরকুমারও পত্রিকায় লেখনী চালাইতেছিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অভিনয়াদির সমালোচনা করিয়া রচয়িতা ও অভিনেতাদের উৎসাহিত করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পথে শীঘ্রই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। 'গজদানন্দ ও যুবরাজে'র (পরে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'হনুমান-চরিত') অভিনয়ে সরকার হইতে ঘোরতর আপত্তি হইল। ১৮৭৬ সালে যুবরাজ (পরে, সপ্তম এডোয়ার্ড) কলিকাতায় আসিলে হাইকোর্টের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের ভবনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পুরনারীদের দ্বারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহকারে বরণ করান। এই ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ করিয়া উক্ত প্রহসন লিখিত। পুলিস ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক তিন মাসের জন্য বাংলা-সরকারকে যাবতীয় অশ্লীল, মানহানিকর ও রাজদ্রোহাত্মক অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা দিয়া ১৮৭৬ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী এক অর্ডিনান্স জারি করিলেন। পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসেই Dramatic Performances Control Bill নামে একটি আইনের খসড়া আইন-সভায় পেশ করা হয় এবং বৎসরের শেষের দিকে সাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহা আইনে পরিণত হয়। শিশিরকুমার বরাবরই এরূপ স্বাধীনতা-হস্তারক আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ১৮৭৬ সনে ১৪ই ডিসেম্বর পত্রিকায় লেখেন,

"নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এইজন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সূর্য্য গেল স্বর্ণরথে। অস্ত রবি দিয়ে গেল ডাক,
অবনীর যাত্রা সুরু অজ্ঞাত সে অনন্তের পথে।
উদ্ভাসিত মূর্ত্তি যাঁর মহিমার অম্লান আলোতে
সম্ভ্রমে আনত মৃত্যু সে জ্যোতির সম্মুখে নির্ব্বাক।
ভিন্ন রুচি, স্তুতি, দ্বন্দ্ব, শোক, দুঃখ— সকলি মিলাক।
রচনার মাঝে শুধু নহ ত জীবন্ত কোন মতে,
গুরুর গৌরব তব চিত্রময় এ মহা-ভারতে,
অমর তুমি যে, ওঠে জয়ধ্বনি, বেজে ওঠে শাঁখ।

প্লাবন আনিয়া দিলে, হে বিপ্লবী, ভেঙে দিলে বাঁধ,
রুদ্ধ স্রোত মুক্ত হ'ল, মুক্তধারা বহে চারি ভিতে।
কলা-সরস্বতী তাঁর দিল ঢেলে সব আশীর্ব্বাদ,
দিল প্রাণে বহ্নিশিখা এ জীবন সফল করিতে।
জাগে চিত্ত, জাগে দেশ, নীলাকাশে জাগে পূর্ণ চাঁদ,
বসন্তের আবির্ভাব নবশ্রী-প্রসন্ন অবনীতে।

দিনাজপুর জেলায় পল্লীর আর্থিক জীবনের রূপান্তর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

পরিবর্ত্তনশীল জগতে বাঙালীর আর্থিক জীবনও নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নদীমাতৃক বাংলার সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে রেল-পথকে কেন্দ্র করিয়া উহা নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই নূতন গতির আওতায় আসিয়া বাঙালীর আর্থিক জীবনেরও বহুপ্রকার ভাঙাগড়া সুরু হইয়াছে। বাংলার যে-কোন জেলায় সমাজগড়নের রূপান্তর লক্ষ্য করিলে এই পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিবে।

দিনাজপুর বাংলারই একটি জেলা। ধানই দিনাজ-পুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট ধান এই জেলায় উৎপন্ন হয়।

এই জেলায় পূর্ব্বে ধানভানা হইত ঢেঁকিতে। ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলই চালান হইত পল্লী হইতে গঞ্জে এবং গঞ্জ হইতে নৌকায় দূর দূরান্তরে। জেলাময় হাজার হাজার ঢেঁকি ছিল। ঢেঁকিতে ধানভানা ছিল পল্লীবাসীর অর্থ উপার্জ্জনের একটি বড় উপায়। একজনের এক মণ ধান ঢেঁকিতে ভানিতে প্রায় দেড় দিন লাগিত, এবং খরচ পড়িত প্রায় দশ হইতে এগার আনা। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের আবাদ ও ঢেঁকির কাজ বহু পূর্ব্বে সাঁওতালদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছিল।

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাত-আট লক্ষ মণ ধান-চাউল কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গা বন্দর দিয়া কলিকাতার দিকে রপ্তানি হইত। তখনকার দিনে পুনর্ভবা, কুলীক, নাগর, আত্রাই, যমুনা ও করতোয়া নদীপথে ধান চাউল বাংলার অন্যান্য জেলায় ও বিহারে চালান হইয়া যাইত। এখনও জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমে রেল-ষ্টেশন হইতে দূরে ধান-চাউল নৌকায় রপ্তানি হয়। পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীর তীরে ঝাঁটাবাড়ী, নাজিপুর, নীথপুর, গোপালগঞ্জ, আমগুলি, শিহোল ও কালিকামোরার ঘাটে ঘাটে নৌকায় ধান বোঝাই হয়। আত্রাই নদী বাহিয়া ধানের নৌকা যাইত প্রায়ই পূর্ব্ববঙ্গে। পুনর্ভবা নদীতে ধানের নৌকা চলিত মুর্শিদাবাদ, বিহার ও বালিয়ার দিকে। ইটাহার ও বংশীহারি থানা এলাকায় ধান চালান হইত মালদহের দিকে গরুর গাড়ীতে।

ধানের পরই প্রধান ফসল পাট, আখ, সরিষা, লঙ্কা, ও পেঁয়াজ ইত্যাদি। আত্রাই নদীর তীরে ভূষির বন্দর হইতে এককালে পাটও রপ্তানী হইত নৌকায়। ডালিম-গাঁও ও কালীয়াগঞ্জের সরিষা ও পেঁয়াজ, এবং সেতাবগঞ্জ ও কাহারুলের গুড়ও নৌকায় রপ্তানি হইত। নাজিপুর ছিল গুড়ের বড় বন্দর। বৎসরে প্রায় ৭০।৭৫ হাজার মণ গুড় নৌকায় চালান হইত।

নৌকাগুলি নারিকেল, কড়াই, এনামেলের বাসন, লবণ, ময়দা, কাপড়, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি লইয়া দিনাজপুরের বন্দরগুলিতে ভিড়িত, এবং যাইবার সময় ধান চাউল, গুড়, পাট, লঙ্কা ও অন্যান্য বেসাতি লইয়া নদী পাড়ি দিত।

সেকালে পুনর্ভবা নদীর কূলে বড় গঞ্জ ছিল নীথপুর। কুলীকের তীরে রায়গঞ্জ, টাঙ্গননদীর উপরে কালিকামোরা এবং আত্রাইয়ের তীরে তীরে ছিল মর্ম্মঝিয়া, চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, পতিরাম, রাঙ্গামাটি ; যমুনার কূলে হিলি, এবং করতোয়ার তীরে ঘোড়াঘাট।

এই জেলার নদীগুলি যে কেবলমাত্র কৃষি ও বাণিজ্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নহে, দেশবাসীর ধর্ম্ম, সমাজ-জীবন, এমন কি সভ্যতার মূলেও ছিল নদীর গভীর প্রভাব। পূর্ব্বে নদীগুলিও বর্ত্তমানের মত মৃতপ্রায় শীর্ণকায় ছিল না। মোগল-পাঠান যুদ্ধের সমকালেও করতোয়া নদী এরূপ বিস্তৃত ছিল যে এক তীর হইতে অপর কূল পরিষ্কার দেখা যাইত না।

নদীগুলি ক্রমশঃ হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় আগের মত নৌকায় ধান চাউল ইত্যাদি চালান দেওয়া ব্যাহত হইতে-ছিল। কাজেই এই জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাঙা-গড়া সুরু হইয়াছিল, এবং রেল চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-কেন্দ্রেরও পরিবর্ত্তন হইতেছিল। হিলি হইতে পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত ছোট রেলপথ হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। পার্ব্বতীপুরের পূর্ব্বাংশে রেল চলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং পশ্চিম দিকে রেল চলিতে আরম্ভ করে ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দিনাজপুর-রুহিয়া রেল লাইন খোলা হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। জেলার ভিতর দিয়া রেল চলিবার পর হইতেই নদীর তীর ছাড়িয়া রেলের ধারে ধারে গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যাপারীদের বস্তি।

রেল-লাইনকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর, হিলি, চরকাই, ফুলবাড়ী, বিরল, বাজালবাড়ী ইত্যাদি রেল ষ্টেশনের কাছে কাছে এবং উত্তরে শিবগঞ্জ ও সেতাবগঞ্জে প্রায় ৩৮টি চালের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিলির নিকটেই ১৪টি কল। এই জেলায় প্রথম চা'ল-কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় উহা প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ ও আক্কেলপুর

রেলষ্টেশনও ধান-চাউল রপ্তানির বড় কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারকেন্দ্র নদীর তীর হইতে সরিয়া আসিল রেলের ধারে। সমাজ জীবনেও নদীর প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া রেলের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল। যত দিন নদীর ধারে কর্ম্মকেন্দ্র ছিল তত দিন সবই ছিল প্রায় ষোল আনা বাঙালীর তাঁবে, আর রেলের ধারে নূতন কর্ম্মকেন্দ্রে দেখিতেছি অবাঙালীর প্রসার বৃদ্ধি। শ্রমিকের ভিতর বিহার ও উত্তর-ভারতের লোকই বেশী। চরকাই, ফুলবাড়ী ও হিলিতে বুনো, সাঁওতাল ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য আদিবাসী। কেবল রুহিয়াতে বাঙালী শ্রমিক নজরে পড়ে। ধান শুকাইবার ও তুলিবার কাজ মেয়েরা করে।

১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও শুধু রেলের সাহায্যে দিনাজপুর জেলা হইতে ধান রপ্তানি হইয়াছে ২৪২,৮০৯ মণ এবং চাউল চালান হইয়াছে ১,৯৬৩,৮৬৯ মণ। শুধু ধান চাউল নহে, পাটও বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ মণ রপ্তানি হয় রেলে। রেল হইবার পর হইতেই পাটের বন্দরের কাজও চলিতেছে দিনাজপুর, রুহিয়া, শিবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, গড়েয়া, রায়গঞ্জ ও হিলি রেল-ষ্টেশন হইতে। এই জেলার কিছু ধান-চাউল ও পাট রপ্তানি হয় রংপুর জেলার দারওয়ানী ও সৈয়দপুর রেল ষ্টেশন হইতে। গুড়, সরিষা, লঙ্কা প্রভৃতি নৌকার পরিবর্ত্তে রেলে চালান সুরু হইয়াছে।

চা'ল-কলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বাহিরে পল্লীতে রেল-ষ্টেশনের নিকট কতকগুলি পাটকল (জুট প্রেস্), ইটের ভাঁটা, তেলকল এবং একটা চিনির কলও গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যের আমলে ঢেঁকি, ঘানি, গুড় ও তাঁত ছাড়া অপর শিল্পের বড় একটা স্থান ছিল না। এখনও লাহিড়ীহাটের কাছে ও রাণীবন্দরে কয়েক ঘর তাঁতী ও জোলা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আছে। তাহারা মরিয়াও মরে নাই। সেতাবগঞ্জের চিনির কলের চাপে গুড়ের উৎপাদন কমিয়াছে। তেলের কল পল্লীর ঘানির গলা টিপিয়া মারিবার জন্য হাত উঁচাইয়াছে। চাউলের কল ঢেঁকিকে স্বর্গে পাঠাইয়াছে।

পল্লীর অতিবৃদ্ধ বলিতেছেন, "যে স্থলে ১০০ খানা ঢেঁকি সারাদিন চলিত আজ সেই স্থলে দুইখানাও দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে ঢেঁকির শব্দে ছিল প্রতি পল্লী মুখরিত। তজ্জন্য পল্লী-গৃহস্থের ট্যাঁকেও দুইটা পয়সা আসিত; কিন্তু আজ সবই গিয়াছে। বেশী সময় লাগে নাই। এক পুরুষের মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন। এখন কলছাটা চাউল চালান হয়। কলে ছাটিবার খরচও কম, লোকের রুচিও বদলাইয়াছে। নদীর তীরে কত গঞ্জ, কত বন্দর গজাইয়া উঠিয়াছিল; আজ দেখিতে পাইবেন গ্রামের নামের শেষেই 'গঞ্জ' ও 'বন্দর' আছে, কাজের বেলা প্রায় সবই নীরব। কারণ নদী যাইতেছে হাজিয়া মজিয়া, আর রেল উঠিয়াছে গজাইয়া।

এক দিকে বৃদ্ধের মুখে ভাঙনের সুর, অপর দিকে রেললাইনের ধারে ধারে গড়নের নব রূপ। কৃষিপ্রধান দিনাজপুর কলকারখানাপ্রধান হয় নাই বটে, কিন্তু যন্ত্রপল্লীর আওতায় আসিয়া পড়িতেছে বলা চলে। সমাজ-জীবনে যন্ত্রের প্রভাব সুরু হইয়াছে।

এই জেলায় রেল খুলিবার পর হইতেই ফসলের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। মাল চালান দিবার সুবিধার জন্যই গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে দাম চড়িয়াছে। প্রধান ফসল চাউল। শুধু সাধারণ চাউলের মূল্যবৃদ্ধির গতি দেখিলেই দর কি হারে চড়িতেছে তাহা কতকটা আঁচ করিতে পারা যাইবে:

১৮০৮ খ্রীঃ	এক টাকায় সাধারণ চাউল পাওয়া যাইত	৪৮ সের
১৮৬১	" " "	৩২ সের
১৮৭১	" " "	৩১ সের
১৮৭৪ খ্রীঃ	ছিল দুর্ভিক্ষের বৎসর। তার পরই এক টাকায় পাওয়া যাইত ২২ সের চাউল।	
১৮৮১ খ্রীঃ	এক টাকায় সাধারণ চাউল পাওয়া যাইত	৩২ সের
১৮৮৪	" " "	১৫ সের
১৯০১	" " "	১৩½ সের
১৯০৬	" " "	৮½ সের
১৯০৭	" " "	৭¾ সের
১৯০৮	" " "	৭½ সের
১৯১০	" " "	১৩½ সের
১৯২৬	" " "	১০ সের
১৯৫১	" " "	২½ সের

(দিনাজপুর জেলায় ওজন বেশী)

এককালে টাকায় ৭.৮ সের চাউল হইলেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে টাকায় আড়াই সের চাউল পাওয়া গেলেও উহা দুর্ভিক্ষ বলিয়া গণ্য হয় না। তাহা হইলে লোকের উপার্জ্জন কি এই অনুপাতে এতটা বাড়িয়া গিয়াছে?

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিনাজপুর জেলার সকল থানার এলাকায় প্রধান প্রধান গ্রামগুলি ঘুরিয়া নিম্নলিখিত কয় প্রকার মজুরির হার দেখিতে পাইয়াছিলাম। এইগুলি জনপ্রতি দৈনিক হার:

(১) ।/৫ আনা ও দুই বার খোরাক।
(২) ।৵০ " " "
(৩) ॥০ আনা খোরাকি নাই।
(৪) ।৶১০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
॥/১০ " " (পুরুষদিগের)
(৫) ॥/০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
৸০ " " (পুরুষদিগের)

(১) (২) (৩) নং মজুরির হারই কতকটা স্থায়ী, এবং জেলার প্রায় ৩ ভাগ স্থানে ইহার চলন আছে। (৪) নং হারের চলন প্রায় ২০।২৫টি গ্রামে পাইয়াছি। চালের কলেই (৫) নং মজুরির হার চলে। ইহা ছাড়া ধান ও পাট কাটিবার সময় মজুরির হার জেলার সর্ব্বত্রই বাড়িয়া ১৲ হইতে ১।০ পর্য্যন্ত উঠিত। তখন সাধারণতঃ উহা ৸০ আনার নীচে নামিত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান—যাহার নিজের গাড়ী বলদ আছে—সেও দৈনিক প্রায় ১॥০ টাকা উপার্জ্জন করিত।

ধান ও পাট কাটিবার সময় বিহার ও বাংলার অন্যান্য জেলার মজুর আসিত। ফসল কাটিবার সময় অঞ্চলের কৃষক বিদেশী মজুরের সাহায্য লইয়া থাকে। যখন ধান পাকিতে আরম্ভ করে তখন তাড়াতাড়ি অনেক বিঘা জমির ধান কাটিতে হয় বলিয়া বিদেশী মজুরের সাহায্য লইতে হয়! 'গাতা' প্রথা, অর্থাৎ পল্লীর সকলে বা বহুলোকে মিলিয়া একজনের শস্য কাটিয়া দিবার রীতিও প্রচলিত আছে। এই জেলার শ্রমিক দেখিতে খুব শক্ত ও জোয়ান হইলেও সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ। মেয়েরাও বাহিরের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। পর্দাপ্রথা নাই।

বর্ত্তমান সময়ে খোরাকি ছাড়া মজুরির হার ৸০ আনার নীচে নাই, এবং ১॥০ টাকার উপরে সাধারণতঃ উঠে না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ চাউলের দাম বাড়িয়াছে প্রায় পাঁচ গুণ। অথচ মজুরির হার ১৯২৬-২৭-এর তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে বাড়িয়াছে প্রায় তিন গুণ। মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি সমান তালে হয় নাই। অথচ ঠাটও কিছু বাড়িয়াছে। ফলে আর্থিক কষ্ট ঘরে ঘরে।

নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত হইয়া রেল-প্রভাবের আওতায় আসিয়া এবং যন্ত্রপন্থায় পা বাড়াইয়া এই জেলার নর-নারী আর্থিক সচ্ছলতা প্রায় হারাইতে বসিয়াছে।

পল্লীশিল্প যাহা ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপার্জ্জনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও প্রায় সবই মৃত। অথচ রেলকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই জেলার পল্লীবাসীগণ নানাকারণে যোগ দিতে পারিতেছে না। কৃষিক্ষেত্র ও পূর্ব্ব আবাস ছাড়িয়া দূরে গিয়া নূতন বসতি স্থাপন করিবার সুযোগ কয়জনের আছে? ভিটার মায়ায় ক্ষেতখামার আঁকড়াইয়া ধরিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াই রহিয়াছে বেশীর ভাগ নরনারী।

এই জেলার—এই জেলার কেন, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই পল্লীবাসীর আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন পল্লীতেই উপার্জ্জন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি। উহা সম্ভবপর হয় যদি পল্লীতেই কৃষির ভিত্তিতে পল্লীশিল্প ও কারখানা গড়িয়া উঠে। আমরা এমন একটা যুগে আসিয়া পড়িয়াছি যে এখন আর কল ছাড়িয়া ঢেঁকি অন্য কিছু আশ্রয় করা সম্ভবপর নহে। কাজেই যে অঞ্চলে যে কাঁচা মালের যোগান বেশী সেই সব পল্লীর নিকটেই তৎসংলগ্ন কারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। অতীতে এই নীতি অনুসরণ করিয়াই পল্লীশিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছিল। যে অঞ্চলে পাটের আবাদ ভাল সেই সব পল্লীতেই দিনাজপুরের বিখ্যাত চটশিল্পীদের আবাস ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পল্লী-সমাজের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত নাই। বর্ত্তমানে কুটীর-শিল্পেরও জন্য হয় ধনী বা গবর্ণমেণ্টের খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া। কাঁচামালের যোগান ও স্থানীয় লোকের প্রতিভা এবং দক্ষতার কথা বিবেচিত হয় না। পল্লী-সমাজের গড়ন ও আদর্শ বজায় রাখিয়া যদি পল্লীর বিভিন্ন স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা হইলেই পল্লীবাসী কৃষি ছাড়াও নূতন উপার্জ্জনক্ষেত্র পাইতে পারে।

পল্লীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে সরকারী আপিস শিল্প-কারখানা প্রভৃতিও কিছু কিছু পল্লীতে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। পল্লীবাসী কৃষকের জন্য যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র তাহাও রহিয়াছে জেলা শহরে, পল্লীতে নহে। এই সব আপিসকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীতে উপার্জ্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। কলিকাতার ছাত্রের ভিড় কমাইবার জন্য সরকারী সাহায্যে পল্লী-অঞ্চলে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকার ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছেন শহর ছাড়িয়া পল্লীতে যাইতে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় যাবতীয় আপিস ও উপার্জ্জন-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত করিয়া ঐসব ছাত্রের অভিভাবকদিগকে এবং ছাত্রদিগকেও আকৃষ্ট করিতেছেন শহরের অভিমুখে। এইরূপ অবাস্তব নীতি অনুসরণ করিয়া পল্লীর এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। উপার্জ্জনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশময় পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া না দিতে পারিলে, এবং স্বদেশীয় সংস্কৃতির অনুসরণে সহজ জীবনের আদর্শ প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শুধু শহরবাসীর মুখনিঃসৃত "পল্লীতে ফিরিয়া যাও" উপদেশে পল্লীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না।

মুক্তার জন্মকথা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একখানা ঘর, সব সময় এমন একটা অস্পষ্টতা জড়িয়ে থাকে যে অনভ্যস্ত লোকের বুঝে ওঠা মুশকিল দিন ও রাত ঠিক কোন সময় আসে বা যায়। ঘড়িতে সময় প্রায় ন'টা। শেফালী তাড়াতাড়ি কোন রকমে জলসিক্ত দেহটা কাপড়ে জড়িয়ে পাশের ছোট্ট বাথ-রুমটা হতে বেরিয়ে এল এবং ওই অন্ধকার ঘরেই একটা বিবর্ণ আরসার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে গেল তেলের শিশিটা একেবারেই ফাঁকা। সুতরাং চিরুণীটা একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই রুক্ষ চুলগুলো'র মধ্যে চালাতে চালাতে বলল—আমার ভাতটা তাড়াতাড়ি দাও মা, আজকে আবার দেরি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

মা অপর্ণা কিছুটা সঙ্কুচিত সুরে জবাব দিলেন—তাই তো দেখি, আজ আমার রান্নারও এমন দেরি হ'ল। সকালে উঠে রেশন আনবার টাকা ত তুই দিয়ে গেলি না, আমার হাতের সব ফুরিয়ে গেছে। অনেক খুঁজে পেতে দুটো চাল জোগাড় করে আনলাম।

অনভ্যস্ত লোক অবাক হয়ে যাবে, অপর্ণার কথায় নয়, তার উপস্থিতিতে। এই ঘরেই তিনি এতক্ষণ বসে আছেন এবং সেখানে একটা জলন্ত উনুনও আছে।

শেফালীর মনটা এ খবরে বড় মুষড়ে পড়ল এবং তার চোখ দুটো আবার ঘড়ির পানে গেল। খিদেও পেয়েছে তার খুব, কিন্তু আর আক্ষেপ বা অপেক্ষা করা চলে না। রেশনে যা চাল পাওয়া যায় তাতে সপ্তাহটা পুরো চলে না, আবার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং অপর্ণা যা খবর দিলেন সেটা নতুন কিছু নয়, শুধু আর একটু সময় মত দিলেই হ'ত। একেবারে বেরিয়ে যাবার পোশাকে তৈরি হতে হতে শেফালীর মুখে একটা ম্লান কৌতুকের ভাব জাগে—আর যেদিন চাল ফুরোয় সেই দিনই বুঝি রেশনের দিন।

অপর্ণা অন্ধকারের মধ্যেই একটা সঠিক দৃষ্টিপাত করে সব বুঝে নিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন—দাঁড়া, যাসনি বেবি, আর মিনিট পনেরোর ভাত হয়ে আসছে।

সময়ের হিসেব এই সব ঘরেই নিখুঁত। সময় এত কম যে মান-অভিমানের প্রশ্নও ওঠে না। শেফালী হিসেব করতে লাগে মিনিট পনের হতে, অন্ততঃ মিনিট দশেক জুড়োতে ও খেতে—এই নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টার ব্যাপার, অতখানি সময় পাওয়া অসম্ভব। বুড়ী হেড মিস্ট্রেসটি অল্পবয়সী শিক্ষয়িত্রীদের ওপর কি রকম যেন সব সময় চটা। প্রথম দিকে দু-এক মিনিট দেরি হলে এমন কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু খোঁটা দেওয়ার সুযোগ ওতেই হয়। শেফালী এই খোঁটা হজম করার ব্যাপারে এখনও অভ্যস্ত হতে পারে নি, সুতরাং এবেলার মত ভাত খাওয়াটাই তার মুলতুবী রইল। মুশকিল এই যে, মা একথা কোনদিনই বোঝেন না, তাঁর বিশ্বাস হ'ল, যে না খেয়ে মানুষ কাজ করতে পারে! আর তা হলে কাজ করাটাই বা কিসের জন্য?

ছোট ব্যাগটায় জিনিষগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে শেফালী বলল—তুমি ভেবো না মা, আমি কোথাও কিছু খেয়ে নেব, ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখ, ওবেলায় এসে খাওয়া যাবে।

এক গ্লাস জল পেলে হ'ত। সকালে শুধু সেই এক কাপ চা, তার পরে টিউশনির সেই এক রাশ বকুনি, গলাটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। অথচ জলের কুঁজোটা যায় দিকের কোণটায় এবং জলের সঙ্গে খাবার মত কোন কিছুই ঘরে যে নেই তা শেফালী জানে, কারণ তা হলে মা নিজেই এক্ষেত্রে তা আগে ভাগে তার সুমুখে হাজির করতেন। অথচ সব জেনেশুনেও যদি শেফালী এখন এক গ্লাস জল খাবার উদ্যোগ করে তা হলে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠে এমন খোঁজা-খুঁজি লাগিয়ে দেবেন যেটা ঐ হেডমিস্ট্রেসের খোঁটার মতই শেফালী সইতে পারবে না।

অপর্ণা তখনও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তারই পানে চেয়ে, আড় চোখে চাইতে গিয়েও শেফালীর চোখ পড়ে যায়। যাবার মুখে এই রকম থমকে দাঁড়ানোর কৈফিয়ত স্বরূপই সে যেন বলে—হ্যাঁ দীলু নীলু সময়মত স্কুল যায় তেন। গলির মোড়ে খেলছে দেখে এসেছি, সকালে পড়তে বসেছিল ত?

অপর্ণা পূর্ব্ববৎ আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করেন—হ্যাঁ, কিন্তু তুই···আচ্ছা আয়। দুর্গা দুর্গা···

শেফালী ততক্ষণ অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে।

প্রথমে আপিসে ঢুকেই সে শুনতে পেল হেডমিস্ট্রেস তাঁর সহকারিণীর সঙ্গে অদূরে দাঁড়িয়ে তরিতরকারীর রন্ধনতত্ত্ব নিয়ে গল্প করছেন। বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কি! কেন, আপিসটা তোমার রান্নাঘর না কি! সে নিঃশব্দে খাতায় নাম সই করতে করতে একবার আড়চোখে দেখে, হেডমিস্ট্রেস ততোধিক আড়চোখে ঘড়ি দেখা শেষ করেই তার পানে তাকাবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তাদের এই গোপন কটাক্ষের মিলন হতেই তিনি বললেন—কি শেফালী, আজ বড় সকাল সকাল যে, ব্যাপারখানা কি!

শেফালী বোঝে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্যই আপিসের কোণে এই রান্নার মসলা-তত্ত্ব বিশ্লেষণ। সে এর উত্তরে একটা

অস্পষ্ট হুঁ বলে ক্লাসের খাতাখানা নিয়ে চলে এল নিজেদের ঘরে। তা ছাড়া আর বলবারই বা কি আছে? এক হয় তাকে এই মসলার আলোচনায় যোগ দিতে হয়! তার চেয়ে শেফালী নিজেদের ঘরে বসে প্রাণভরে জল খাবে, তার অনেক সময় আছে।

ক্লাসেও সেই রকমের এক বকমারি। একটা ছোট্ট মেয়ে অনেকটা দেরি করে ক্লাসে এল, শেফালী বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল—এত দেরি কেন? উত্তরে মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করে বেশ সহজভাবেই জবাব দিল—মা রান্নার দেরি করে দিল, আমি কি করব?

হতভাগা মেয়েটা! কেন সংসারে আর কি কোন কথা ছিল না? একেবারে সবল পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে সে যদি বলত রাস্তার মাঝখানে পড়ে পা ভেঙে গেল তাই দেরি, তা হলেও শেফালী বুঝি এতখানি বিরক্ত হ'ত না।

ক্লাসগুলো রোজই এই রকম লাগে, আজকে যেন একটু অতিরিক্ত একঘেয়ে আর লম্বা মনে হয়। শেফালী অভ্যাস-মত বকে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং যতই সময় যাচ্ছে শেফালী ততই সচেতন হয়ে উঠছে, তার ক্লান্তি যেন বাইরে না ফুটে বেরোয়।

শেষের একটা পিরিয়ডে এসে সে কিন্তু একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। পড়া ছিল উটের কথা, সে নাকি একেবারে বহু দিনের জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে, এমনি আরও কত কি। শেফালী বরাবরই ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। একটি ছাত্রী জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দিদিমণি, আর কোন প্রাণী আছে যে এমন না খেয়ে থাকতে পারে। শেফালী বলে—শোনা যায় সাপ নাকি সারা শীতকালটা না খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ ও কোণ থেকে বলে উঠল—আমি বলব দিদিমণি? সবচেয়ে বেশী সময় না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ। আগেকার মুনি-ঋষিরা নাকি বছরের পর বছর…

শেফালী মাঝপথেই কেটে পড়ল—কথা হচ্ছিল সাপ আর উট নিয়ে, তুমি কোত্থেকে নিয়ে এলে মানুষ, মুনি-ঋষি কত কি…

এমন উপহাসের ভঙ্গীতে সে কথাগুলো উচ্চারণ করল যে, এর পরেও একটা মেয়ে সসঙ্কোচে প্রশ্ন না করে পারল না—তা হলে ওগুলো কি সব মিছে কথা?

শেফালী বিদ্রোহিণীর ভঙ্গীতে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল—সব মিছে কথা, সব…।

আর একটি জিনিষ নিয়েও শেফালীর মনটা টিফিনের পর হতেই খারাপ যাচ্ছিল। হেডমিস্ট্রেস তাকে টিফিনের সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন—ঠিক যে সময়ে শেফালী চায়ের সন্ধানে সঙ্গিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। এটা ওটা সেটা পাঁচটা কথা মিলিয়ে তিনি শেফালীকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন ক্লাসে পাঠ্যের বাইরে অত বাজে জিনিষ আলোচনায় লাভ নাই, কারণ পাস করাটাই সবচেয়ে আগের কথা। এমন ভাবে কথাটা বলা হ'ল যে শেফালী চমকে উঠল, যেন কাউকে পাস করতে না দেওয়ার জন্যই তার এই ষড়যন্ত্র-মূলক শিক্ষাদান বিধি! বেশ তাই হবে। সঙ্গে সঙ্গে টিফিন-শেষের ঘণ্টা বেজে উঠল এবং শেফালী আজ সম্পূর্ণ স্বার্থপরের মত অনুভব করল—পরের মানসিক উন্নতিবিধানের নিষ্ফল তর্কবিতর্ক করে তার নিজের খাদ্য সন্ধানের সময়টাই নষ্ট হয়ে গেল।

তার এই স্বার্থপরতাই বুঝি শেষের পিরিয়ডে অসহ্য হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে একেবারে উচ্চে মুনি-ঋষি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল! কলির আর কোন তেজ না থাকুক ক্ষুধার তেজ ত্রিকালবিস্তৃত!

ছুটি হতেই শেফালী সঙ্গিনীদের একটু আড়াল দিয়েই বাড়ীর পানে হাঁটল। খিদে তার এখন তেমন মনে হয় না কিন্তু আলো কিছুতেই আর সইছে না। কিছুতেই না। মাঝপথে একটা ছোট মেয়ে এসে বাধা দিল, বললে—মা আপনাকে আজ আবার ডেকেছে দিদিমণি, সময় হবে, যাবেন কি? সোজা না বলতে ইচ্ছে হয় শেফালীর কিন্তু ভয়ও হয়। টিউশনি এমন সস্তা নয়। শেফালী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের বাড়ীতে ঢোকে।

গৃহস্বামিনী অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে বসান এবং সময়মত কাজের কথা পাড়েন। মেয়েটিকে পড়াতে হবে এবং পড়ানোর চাইতে তার মনটিকে সেইভাবে গড়তে হবে, শেফালীর এ বিষয়ে তিনি সুনাম শুনেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেফালী বোঝে ধনীগৃহের সেই এক অনুযোগ, সব আছে শুধু মনটা ঠিক করে দাও এবং মনে মনে একটু হাসে, মন ঠিক করে দেওয়ার লোক ধরা হয়েছে বটে!

চা খাওয়ার এক ফাঁকে গৃহস্বামিনী আবার বলেন—আর মেয়েটি এত জেদী হয়েছে, দেখুন না ও বেলায় মিছিমিছি একটা ছবির বই নিয়ে মেতে রইল, যত বলি ইস্কুলে যা তত গোঁ ধরে ছবি দেখা তার চাই-ই। ওকে নিয়ে আপনাকে একটু দুর্ভোগ পোয়াতে হবে মনে হয়।

মেয়েটি অদূরে ঘরের কোণে বসে একটা ছবির বই ওল্টাচ্ছিল, এ কথায় দু'জনের চোখাচোখি হয়ে গেল। শেফালী চিনতে পারল ফার্ষ্ট পিরিয়ডের সেই মেয়েটিই বটে এবং মেয়েটি দেখল সে ধরা পড়েছে, তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল। শেফালীর মনটা এ কথায় আর একটি যেন চাবুক খেল।

কি মুশকিল! মিথ্যা সাজাতে বললেও ধনী-গৃহের কাজ-কর্ম্মে পোষায় না, গরীবের ঘরের বিপর্যয়গুলোকে ধরে টান

মারতে হয়। ছবি দেখতে দেরি হ'ল বলা চলে না, বলতে হয় ভাত পেতে দেরি হয়ে গেল।

হবেই না বা কেন? ওসব ঘরে সবই ত মিথ্যা সেজে বসে আছে, মিথ্যে খুঁজে বার করা ওখানেই ত সবচেয়ে সোজা। শেফালী ভাবে মেয়েটি বোকা, ওতে ওর লজ্জার কি আছে? যদি কারও লজ্জা পেতে হয় ত সে শেফালী নিজে।

আজকে এমন অসময় করলি যে। যে তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে বোস আর, ভাত ত একেবারে জল হয়ে পড়ে আছে, খেয়ে নে। অপর্ণা দরজা খুলে দিয়েই বলতে থাকেন।

শেফালীর মাথাটা এমন ধরে আছে যে কিছুক্ষণ শুধু হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু উপায় নাই, না খাওয়া পর্য্যন্ত মা তাকে শান্তি দেবেন না। তার ওপর দীলু নীলু মেঝের বসে পড়ছে, অনর্থক কথা কাটাকাটিতে ওদের ব্যাঘাত হবে। সে নিঃশব্দে বেশভূষা বদলে নিয়ে খাবার জায়গাটায় গিয়ে বসল। অপর্ণা কাছে বসে ভাত বেড়ে দিতে থাকেন।

টিউশনির সুসংবাদটা মাকে শোনাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু অপর্ণাই থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে আগেভাগে আরম্ভ করেন চাপা ফিস্‌ফিসানির সুরে—আজ ত এ বেলায় মোটে রান্না হ'ল না।

শেফালী চমকে উঠল, চোখ দুটো তার সোজা পড়ল ঠাণ্ডা উনুনটার উপর ও তারপরে পাঠরত ভাই দুটির উপর। সেও তেমনি চাপা সুরে প্রশ্ন করল—তা হলে তোমরা খাবে কি?

এমন হতাশভাবে শেফালী কথাগুলো উচ্চারণ করল যেন তার নিজের খাওয়াই সংশয়গ্রস্ত। অপর্ণা তাড়াতাড়ি চকিত স্বরে বললেন—সে তোকে ভাবতে হবে না তুই খা দিকি। তারপরে একটু থেমে আবার বললেন—ও বেলাই বেশী রান্না করেছিলাম, ওই বাসি দিয়েই হয়ে গেল। দীলু নীলু খেয়েদেয়েই পড়তে বসেছে, আর আমি রাত্রে খাব না, খিদে নেই।

শেফালী সবই বুঝল, সুতরাং খেতে আরম্ভ করে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল—এবং থাকলেও কোন উপায় নেই না মা? তা এস না, দু'জনে একসঙ্গে কিছুটা খেয়ে নিই।

অপর্ণা বলেন—না রে বেবি সত্যিই খিদে নেই। ও বেলায় তুই না খেয়ে যাবার পর থেকে মনটা ভাল লাগছিল না, তাই অনেকগুলো এদিক ওদিক কাজ করার পর খেতে সেই দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। আর পেটটা সত্যিই কেমনধারা ভার করে আছে।

আজ সারাদিনের মধ্যে এই একটি কথায় শেফালীর মাথার ভার অনেকটা কমে যায়। সে এবার পরিতৃপ্তির ছেলেমানুষি ঢঙে মাথাটা একটু বাঁকিয়ে বলল—বেশ তাই হ'ল, কিন্তু এই বেশী রান্নার কথাটা, সেটাও কি সত্যি?

অপর্ণা এবার হয়ত সত্যিই রাগ করেন—তোর আজ হয়েছে কি বল ত বেবি, ইস্কুল হতে এসেই এই ভয় সন্ধ্যের আমার পেছনে লেগেছিস, ভাল করে দুটো খা দিকি আগে।

শেফালী ভাত খাওয়া ভুলে মায়ের এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখে। শেফালী জানে তিনি নিশ্চয়ই সারাদিন কিছুই খান নি অথচ অত বড় মিথ্যা কথাটা বলেও তাঁর চোখে মুখে সৌন্দর্য্যের কি ছড়াছড়ি! তার নিজের সমস্ত অভিযোগগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর ওই ক্লান্ত মধুর চাহনিতে। ঠোঁটে তার একটা অদ্ভুত আবিষ্কারের পরিতৃপ্ত হাসি ফুটে ওঠে, যেটা পরক্ষণেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের খিল খিল শব্দস্রোতে ঝরঝর ছড়িয়ে পড়ে।

অপর্ণা আবার ভ্রূকুটি করেন, দীলু নীলু ফিরে তাকায় কিন্তু এবারে শেফালী মায়ের ভ্রূকুটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাঁক পাড়ে—দীলু নীলু দৌড়ে আয় দেখি, এই ভাত দুটো খেয়ে আমায় উদ্ধার করে দিয়ে যা ভাই।

অপর্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়েন—সে কি, তুই যে একেবারেই খেলি না, দে দে আর দুটো মুখে দে দিকি, ততক্ষণে ছোট ভাই নীলু এসে দিদির আসনের এক পাশ অধিকার করে বসেছিল, শেফালী তার ব্যগ্র ঘাড়টা বাঁ হাতে সোজা করে জড়িয়ে ধরে খাইয়ে দিতে থাকে এবং মায়ের অনুযোগের উত্তরে এবারে সে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তায় সঙ্গে মৃদু হেসে বলে—বললাম ত বড্ড মাথা ধরেছে, খিদে একেবারে নেই। দীলু তার বয়সোচিত সঙ্কোচ নিয়ে অন্য পাশে বসে পড়ে, অপর্ণা হাঁড়ির অবশিষ্ট ভাত দুটো তার সামনে এগিয়ে দেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন শেফালী তার একটি কথাও বিশ্বাস করে নি। শেফালীর খাইয়ে দেওয়ার নিবিড় ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর মনে একটা অপূর্ব্ব নির্ভরতার রোমাঞ্চ জাগে।

ওদিকে শেফালী সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে নীলুর ভাত খাওয়ায় প্রচণ্ড আগ্রহ, ও ব স্কীর ওই ছোট ছবি-দেখা মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায়, সেই তার ছবির মধ্যে মগ্ন তন্ময় আগ্রহভরা ভঙ্গিটি। কাল হতে এদেরকে আর সন্ধ্যেবেলায় পড়া বলে দেওয়ার সময় হবে না। এটা কি সুসংবাদ!

ছেলের আর তর সয় না, একটু দাঁড়া বাপু, রয়ে সয়ে খা—অত্যধিক আগ্রহসহকারে মুখ চালনার ফলে এবং শেফালীর ক্ষণিক অন্যমনস্কতার দরুন তার একটা আঙুলে নীলুর কামড় পড়ে যায়, শেফালীর সমস্ত শরীরে একটা মমতার শিহরণ জাগে।

নীলু একটু অপ্রতিভ হয়ে বাঁ হাতে মাথা চুলকে গিলতে গিলতে বলে—তোমার লাগল দিদি?

শেফালী তার ছোট্ট মাথায় রুক্ষ চুলের গোড়ায় হাত বুলোতে থাকে, গলাটা তার মায়ের মতই ধরে আসে, একটু পরে বলে—খা দণ্ডি হয়েছে। হ্যাঁ রে নীলু, আজ ঠিক সময়ে ক্লাসে যেতে পেরেছিলি ত? সে, হাঁ কয়।

নীলু এতক্ষণে বুঝি দিদিকে শোনাবার মত একটা কথা পায়। অত কাড়াকাড়ির মধ্যেও যতটুকু অঙ্গভঙ্গি সম্ভব, সবটা করে নিয়ে নীলু ভাতটা গিলে নিয়েই যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—পারব না তবে? এমন ছুট দিয়েছিলাম, দাদাকে জিজ্ঞেস কর না কেন। তবে ক্লাসে বসে প্রথমটা পেটে কিছুক্ষণ লাগছিল আর হাতের লেখার খাতাখানাই নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম—বলতে বলতে তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, বলে—আচ্ছা দিদি, তুমি খেয়ে যাও নি কেন, অসুখ বুঝি? আচ্ছা, তোমাদের ভারি মজা না দিদি, দেরি কর আর যাই কর কেউ বকবার নাই, না?

শেফালী বোঝে হাতের লেখার জন্ত নীলু বকুনি বা আরও কিছু খেয়েছে। মাষ্টারেরই বা কি দোষ, তিনি কেমন করে জানবেন যে, নীলু কতখানি প্রাণপণ করেও কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছে। সে এক হাতে শেষ গ্রাস ক'টি মাখতে মাখতে ও বাঁ হাতটা তেমনি তার মাথায় বুলোতে বুলোতে আশ্বাসদানের ভঙ্গিতে বলল—সে হবে, তোরাও লেখাপড়া শিখে বড় হোস।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—এ মজার হাত হতে ওদের রক্ষে ক'রো প্রভু, তুমি উপায় ক'রো।

নীলু শেফালীর হাতের পানে চেয়ে ছিল, ভাত মাখা হতেই সে যেমন মুখ বাড়াতে যাবে অমনি তার গালের উপর এক ফোঁটা গরম জলের স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠে উপর পানে চাইবার চেষ্টা করল, আন্দাজের সুরে বলল—দিদি তুমি···

শেফালী তার মাথার উপর একটু চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল—ও কিছু নয় তুই খা দিকি।

অনুরোধ

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

যুগে যুগে প্রেয়সি আমার।
তুমি আসিয়াছ আজি   বসন্ত কুসুম রাজি
মোর করে দিতে উপহার।
আজিকে পূর্ণিমা রাতে   কোন দিন তব সাথে
ছিল কিনা মোর পরিচয়
আমি যে গিয়াছি ভুলে,   তুমি তাহা কুতুহলে
দেখিতেছ মানিয়া বিস্ময়।
অঞ্জলিতে ভরা ফুল,   পদ্ম আঁখি সমতুল,
ব্যথা কম্প, দুরু দুরু হিয়া,
চঞ্চল দখিনা বায়ে   অঞ্চল লুটায় পায়ে
বকুলের সুরভি মাখিয়া।
আজিকে ব্যাকুল মন   থেকে থেকে অনুখন
খুঁজে কারে আকাশে বাতাসে,
কার আঁখি মোর তরে   চির অনুরাগ ভরে
অপলক চায় মোর আশে।
নবীন ফাল্গুন মোরে   বিস্মৃতির ঘুম ঘোরে
দিলে আজ স্বপনের দোলা,
ক্ষমা কি করিবে মোরে?   যদি তুমি বুঝে থাকো
কেন জেগে আছি আধ-ভোলা?
উতলা মাধবী নিশি,   উছলিত দশ দিশি,
উতরোল হিয়া ব্যথাতুর।
হে প্রিয়া! নয়ন মেল—   পাপিয়া ডাকিয়া গেল—
হৃদি আজি বিরহ-বিধুর।
আজি মধু আনন্দের   বসন্তের অন্তরের,
মুকুলের আধ-জাগা আঁখি
যদি এ ব্যথিত প্রাণে   ভরে' দেয় গানে গানে—
উচাটন হিয়া থাকি থাকি—
তুমি কি গো অভিমানে   চাহিবে না মোর পানে—
রোধি' দ্বার নাহি দিবে সাড়া?
যামিনী বিফলে যাবে   পিক যবে কুহরিবে
উচ্ছ্বসিত পাগলের পারা?
শুধু নিমেষের ভুলে   তোমার চরণ মূলে
যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
আমার বেদনা দিয়া   তোমার ব্যথিত হিয়া
ঘুচাইবে না কি পরমাদ?
উছল যামিনী, হায়,   ঝরে' পড়ে বেদনায়
কার তরে বিহ্বল, ব্যাকুল;
ব্যথিত অন্তর মম   ফেটে পড়ে আকাসম—
প্রিয়া লাগি কাঁদিয়া আকুল।
নবীন ফাল্গুন বায়   ডাকিয়া ফিরিয়া যায়—
প্রিয়া! আঁখি তোল একবার!
যদি সোহাগের ডাকে   ও বুকে সরম জাগে—
খুলো শুধু হৃদয়ের দ্বার।

সখি মুখ চন্দ্র ছবি

স্বরলিপি—শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(রাগ খাম্বাবতী)

(আস্থায়ী) সখি মুখ চন্দ্র ছবি যব আই বিহারী
মান ধরম সবকো গুমাই ॥

(অন্তরা) প্যারে প্যারে নৈনা ওটে ওটে ধারলে
চিতবন মে বশ গেই চিতবতকি আই ॥*

[খাম্বাবতী খাম্বাজ অঙ্গের রাগ, ইহাতে দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী মা, সংবাদী সা। আরোহণে গান্ধার ধৈবত বর্জ্জিত। অন্তরা উঠাইবার সময় ধৈবত বর্জ্জিত রাখিয়া শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করা হয় যথাঃ—মা পা না না র্সা। অবরোহণের গতি বক্র ও সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয় বলিয়া খাম্বাবতীকে বক্র সম্পূর্ণ রাগ বলা হয়। খাম্বাবতীর আরোহণে, মাড়, দেশ, সিন্ধুড়া ও অবরোহণে বাগেশ্রীর রূপের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ধা মা ও মা সা সঙ্গতি খাম্বাবতীকে উক্ত রাগসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

খাম্বাবতীর মুখ্য অঙ্গ—রা মা পা ধা র্সা—ণা ধা পা ধা, মা গা মা সা

নিষিদ্ধ বিন্যাস { মা গা রা সা, গা মা রা সা, রা গা মা পা,
র্সা না ধা পা, পা ধা না র্সা, ণা ধা না র্সা, ধা না র্সা র্রা }

আরোহণ—সা রা মা পা ধা র্সা। অবরোহণ—র্সা ণা ধা পা, ধা মা গা মা, সা

রাগবাচক তান—সা রা মা পা ধা র্সা র্রা র্সা, ণা ধা পা ধা মা গা মা সা।

খাম্বাবতী—তেতালা

১				+				৩				0			
পা	গমা	পা	ধা	র্সা	।	।	।	ণা	।	ধর্সা	ণা	ধা	।	পা	।
স	খি	মু	খ	চৌ	০		০	ন্দ্র	০	০	০	ছ	০	বি	০

১				+				৩				0			
পধা	পা	।	মা	মা	গা	।	রা	ঋগা	।	সা	।	ঋগা	সরা	।	।
যব্	আ	০	ই	বি	হা	০	০	আ	০	রী	০	আ	রে	০	০

১				+				৩				0			
মা	।	মা,	পা	মপা	পা,	ধা	ধা	মা	পা	।	।	পধা	র্সর্রা	।	।
মা	০	ন,	ধ	অর্	ম,	স	ব	কো	০	.০	০	ও০	০০	০	০

১				+				৩				0			
র্রা	র্গা	।	র্রা	র্সা	।	নর্সা	ণা	ধা	র্সা	ণা	।	ধা	ণা,	ধা	ণা
ও	ও	০	গু	মা	০	০০	০	আ	০	ই	০	ই	ই	ই	ই

১				+				
ধা	মা	পা	ধা	র্সা	।	।	।	॥
স	খি	মু	খ	চৌ	০	০	০	

---

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য পরলোকগত রামকৃষ্ণ বেজবোয়ার গায়কী অবলম্বনে

(অন্তরা)

0 ১ + ৩
। । । পমা | পা, না । না | না র্সা । । | র্সনা র্সা । ।
০ ০ ০ প্যা রে, প্যা ০ রে নৈ ০ ০ ০ না ০ ০ ০

0 ১ + ৩
না র্সা । । | ধর্সা র্রগা র্সা । | র্সনর্সা র্রর্সা নর্সণা । | পধা । পা ।
ও টে ০ ০ ও ০ ০ ০ টে ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ০ লে ০

0 ১ + ৩
ধা পা মা গা | গা । । । | গা । গা রা | গরা গা সা । |
চি ত ব ন মে ০ ০ ০ ব ০ শ ০ গেঁ ০ ই ০

0 ১ + ৩
সা রা ।, মা | পা ।, ধা । | পধা র্সর্রা । । | র্রা র্গা । র্সা |
চি ত ০, ব ত ০, কি ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০

0 ১ + ৩
ণা । ণসা ণা | ধা মা পা ধা | র্সা । । । | র্সা । । ।
ই ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌঁ ০ ০ ০ ম্‌ ০ ০ ০

0 ১ + ৩
। । । । | র্সা ।, ণা ধা | র্সা । । । | নসা রসা, ণা ।
০ ০ ০ ০ উঁ ০, ০ ০ খ ০ ০ ০ এ ০ ০ ০, মু ০

0 ১ + ৩
ণা ণা ণা ণা | নর্সা র্রর্সা, ণা । | ণা ণা ণা ণা | পধা পমা গমা ধা
উঁ ০ ০ ০ এ ০ ০ ০, মু ০ উঁ ০ ০ ০ মু ০ ০ ০ ০ ০ ০

0 ১ + ৩
ধা ধা ধা ধা | ধা পা মা । | গা । গা মা | মা সা । ।
উঁ ০ ০ ০ খ ০ ০ ০ চৌঁ ০ ০ ০ দ্রে ০ ০ ০

0 ১ +
মা রা পা মা | ধা পা পা ধা | র্রা । ণা, সা । | । ধা, ণা ।
স খি মু খ ছ বি মু খ চৌঁ ০ ০, দ্রে ০ ০, ছ ০

0 ১ + ৩
পা, ধা । মা | ধা মা পা ধা | র্সা । । । | নর্সা রর্সা ণা, ধণা
০, বি ০ ০ স খি মু খ চৌঁ ০ ০ ০ মু ০ ০ ০ খ, চৌঁ০

0 ১ + ৩
র্সণা ধা, ধা পা | ধা মা পা ধা | র্সা া া, া | ধণা র্সণা ধপা মগা | (তান সমূহ)
০০ ন্দ্রে, ছ বি স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ আ০ ০০ ০০ ০০

0 ১ + ৩
রমা পধা র্সা া | ণধা র্সণা ধর্সা ণধা | র্সণা র্সণা ধপা মগা | রমা পধা পমা গমা |
আ০ ০০ ০ ০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০

0 ১ + ৩
ধমা পধা র্সা া | ধা মা পা ধা | র্সা া া া | ধর্সা র্রর্গা র্সর্রা র্গর্সা
আ০ ০০ ০ ০ স খি মু খ চৌঁ ০ ০ ০ আ০ ০০ ০০ ০০

0 ১ + ৩
র্সণা ধর্সা ণধা পমা | র্সণা র্সণা ধপা মগা | রমা পধা পমা গমা | সা, সমা রমা পধা
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ, আ০ ০০ ০০

0 ১ +
ধমা পধা র্সা া | ধা মা পা ধা | র্সা া া া |
আ০ ০০ ০ ০ স খি মু খ চৌঁ ০ ০ ০

৩ 0 ১ +
পণা ধপা, ধমা গমা | রমা পধা পমা গমা | ধমা পধা র্সর্রা র্সণা | ধপা মগা মমা সসা
আ০ ০০, ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০

৩ 0 ১ +
র্সর্সা ধধা, ণণা পপা | ধধা মমা, পপা গগা | ধা মা পা ধা | র্সা া া া
আ০ ০০, ০০ ০০ আ০ ০০, ০০ ০০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০

৩ 0 ১ +
ধর্সা র্রর্গা, র্মর্মা র্সর্সা | র্রর্রা ননা, র্সর্সা ধধা | ণণা পপা, ধধা মমা | পপা গগা মমা সসা
আ০ ০০, ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০, ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০

৩ 0 ১ +
সরা মপা ধর্সা র্রর্সা | ণধা পমা গমা সসা | ধা মা পা ধা | র্সা া া া
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০

বাংলায় কার্পাস-চাষ

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

বস্ত্র-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার
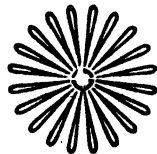
বর্ত্তমান বস্ত্র-সমস্যার দিনে ঘরে ঘরে সামান্য পরিমাণ জমিতে কার্পাস জন্মাইয়া চরখার প্রচলন দ্বারা সহজে বস্ত্রাভাব দূর হইতে পারে। বাংলায় কার্পাস সহজলভ্য নয় বলিয়াই দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়ও এখানে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল প্রদেশে কার্পাস উৎপন্ন হয় তথায় শিশুরাও ক্রীড়াচ্ছলে চরখা কাটিয়া আনন্দ পায়। বস্ত্র-শিল্পে বস্ত্র-মূল্যের দশ আনা তুলা খরিদ করিতে ব্যয়িত হয়। নিজে কার্পাস জন্মাইলে নিখরচায় সহজে ইহার সমাধান হয়। প্রত্যহ কতক সময় পাড়ার কয়েক জনে মিলিয়া চরখায় সূতা কাটিলে এবং এক জনে তথায় রামায়ণ মহাভারতাদি কিংবা কোন পত্রিকা হইতে আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করিলে সময়টা বেশ আনন্দে কাটিয়া যায়।

বাংলায় কার্পাস-চাষ লোপ পাইবার কারণ

যে বাংলায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস জন্মিত সেখানে দীর্ঘদিন ইহার চাষের প্রচলন না থাকায় ক্রমশঃ ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে আছে :

"The district of Dacca produces the best cotton in the world. The fibres are fine, silky and strong."

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সূতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইলে এখানে সে সকল আমদানী হইতে থাকে। বিলাত হইতে আমদানী সূতা অনেক সস্তা বলিয়া ক্রমশঃ চরখা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। চরখা কাটা বন্ধ হইলে তুলার চাষও উঠিয়া যায়। দীর্ঘদিন ইহার চাষ না থাকায়, বাংলা যেন কার্পাস-চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। পাঠ্য পুস্তকাদিতেও এ প্রকার অনুপযোগিতা বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় বহু পাটকল আছে। ইহার অধিকাংশের মালিকই ইংরেজ। বাংলায় কার্পাস-চাষ ব্যাপক ভাবে হইলে পাটের চাষ কমিয়া যাইবে এই আশঙ্কা হেতু ইংরেজ বণিকগণ, তথা গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে অবহিত হন নাই। বাংলায় এখন চল্লিশ-পঞ্চাশটি কাপড় ও সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুলার আঁশ অন্ততঃ এক ইঞ্চির সাত-অষ্টমাংশ লম্বা না হইলে কলে ব্যবহার চলে না। বাংলায় এ প্রকার তুলার চাষ নাই বলিয়া এ সকল মিলের আবশ্যক তুলা অন্যান্য প্রদেশ— পাকিস্থান, আমেরিকা, আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

কার্পাস-চাষ-প্রচেষ্টা

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স নানা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুলার বীজ আমদানী করিয়া তাহাদের এগ্রিকালচারাল অফিসার হিসাবে আমাকে দিয়া তাহার চাষ করাইয়া ভাল ফল পান। সরকারী কৃষিবিভাগও এ বিষয়ে অনুরূপ সাফল্য লাভ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি ও গবর্ণমেণ্টের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং অর্থ সাহায্যে ১৩৩৮-৩৯ সন হইতে বিভিন্ন পরিকল্পনানুযায়ী সরকারী কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন জেলায় দশ বৎসর ইহার চাষ হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় কটন কমিটি অর্থসাহায্য ও উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বর্ষায় জল দাঁড়ায় না এপ্রকার দোআঁশলা মাটি কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার চাষে বিঘাপ্রতি পঞ্চাশ-ষাট টাকার মত খরচ করিয়া কার্পাসমূল্য বাবদ এক শত পঁচিশ হইতে এক শত পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শিশুরা ক্রীড়াচ্ছলে চরখায় সূতা কাটিতেছে

ফলন বিঘাপ্রতি তিন মণ হইতে পাঁচ মণ কার্পাস বা এক মণ হইতে দুই মণ তুলা ও দুই মণ হইতে তিন মণ বীজ পাওয়া যায়। মিশরীয় কার্পাসের মূল্য অন্যান্য কার্পাসের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক এবং ইহা বাংলায় বিশেষ উপযোগী

ক্ষেতে উৎপন্ন একটি মিশরীয় কার্পাস গাছ

ফসল। উপরোক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনানুযায়ী উৎপন্ন কার্পাসের বীজ বিনামূল্যে ছাড়াইয়া তুলা ও বীজ বিক্রয় করতঃ উৎপাদকদিগকে মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ভিন্ন বিনা মূল্যে সার, বীজ দেওয়া হইত। পারিতোষিক প্রদান ও ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার জন্য একটিমাত্র কল থাকাতে উৎপাদকদিগকে বহুস্থলে মূল্য দিতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিত। এজন্য অনেকেরই পর বৎসর আর ইহার চাষে উৎসাহ থাকিত না। এ সকল অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল এমন সময় বঙ্গ-বিভাগ হইল। ইহার পর কি গবর্ণমেণ্ট, কি মিল-মালিক সমিতি কিংবা ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স কেহই বাংলার কার্পাস-চাষের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। আমি পশ্চিম বাংলার ইহার চাষের কথা বহুরকমে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন পত্রিকাদির মারফতে প্রচার করিয়া আসিতেছি। এ সম্বন্ধে আমার বহু দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—নদীয়া জেলার ফুলিয়াবয়রা গ্রামে নানারকম কার্পাস চাষের কাজে লাগাইয়া উৎপাদকদিগকে আবশ্যকমত বীজ সরবরাহ করিতে প্রবৃত্ত হই। মিশরীয় কার্পাসের চাষে এতদিন কেবল আমিই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। ঢাকায় কয়েক রকম উৎকৃষ্ট তুলার বীজের মত, ইহাও যাহাতে বাংলা হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহাই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৪৯ সনের ১৬ই এপ্রিল বাংলার রাজ্যপাল আমার চাষ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন স্থায়ী ফলের আশা না থাকায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

বর্ত্তমান বস্ত্র-সমস্যা ও কার্পাস-চাষ আন্দোলন

দেশ-বিভাগ ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার মিলগুলি আবশ্যকমত কার্পাস না পাওয়ায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ১৯৪৯-৫০ সালের বিভিন্ন সময়ে দিল্লী ও বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কার্পাস-চাষের প্রসারকল্পে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। চাষের প্রসার দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষকে কার্পাস বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে না হয় এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটিকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। এ সময়ে বাংলায় মিশরীয় কার্পাস-চাষ প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া প্রচার করি। ইহা কৃষিবিভাগের নিকট প্রদত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট সুপারিশ করিয়া ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কটন কমিটিকে পাঠাইয়া দেন এবং ১৯৫০-৫১ সনে আমি যাহাতে ইহার চাষ চালাইয়া যাইতে পারি এজন্য ১০২০৲ টাকা সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে কৃষিবিভাগ হইতেও বাংলায় লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ প্রসারের উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের জন্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া আর একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কটন কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। পশ্চিম বাংলার সরবরাহ-সচিব বাংলার কার্পাস-চাষোপযোগী কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু পতিত জমি দশ-পনর হাজার টাকা খরচ করিয়া সেচব্যবস্থার সাহায্যে কিভাবে চাষোপযোগী করা যায় তিনি তাহার একটি বিবরণ দেন। যে সকল উঁচু দোআঁশলা মাটিতে পাট ও আউশ ধানের চাষ হয় সে সব স্থলেও কার্পাস জন্মানো যাইতে পারে। এই ধরনের বিস্তর জমি বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পতিত আছে। এই প্রকার ৫০০০ একর পতিত জমিতে কার্পাস-চাষ প্রচলন করিবার ব্যবস্থা হয়।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি—বোম্বাই

এই কমিটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মিল এবং সেগুলির প্রয়োজনীয় ভারত-জাত কার্পাসের উন্নতি ও চাষের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিবিভাগ কার্পাস-চাষ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে কমিটি উপদেশ ও অর্থানুকূল্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করে। সেখানে কার্পাস-চাষ সম্পর্কে গবেষণা ও অন্যান্য কার্য্য পরিচালনার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মিল-মালিকদের প্রতিনিধি, কৃষি-বিভাগের প্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত এক কমিটি ইহার কার্য্য পরিচালনা করেন। ভারত হইতে রপ্তানি তুলা এবং মিলে খরিদ তুলার উপর যে কর আদায় হয় তাহা এই কমিটির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

পশ্চিম বাংলার দুইটি কার্পাস-চাষ পরিকল্পনা ও তাহাদের কার্য্য (১৯৫১-৫২)

পশ্চিম বাংলা হইতে আমার প্রদত্ত মিশরীয় কার্পাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং কৃষি-বিভাগ প্রদত্ত লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ-প্রচলন পরিকল্পনা ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির সভ্যদের দ্বারা বিবেচিত হয়। তাঁহারা কমিটির সেক্রেটারীকে নবেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে পশ্চিম বাংলায় গিয়া কতকগুলি কার্পাস-কেন্দ্র পরিদর্শনান্তে এ বিষয়ে তথাকার কার্পাস সাব-কমিটির সদস্য ও স্থানীয় অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করেন। পরে তাঁহাদের সম্পাদককে ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে এখানে পাঠাইয়া দেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ৯।১২।৫০ তারিখের কাগজে এ বিষয়ে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এই প্রদেশে তিন-চার দিন অবস্থান-কালের মধ্যে এখানকার কয়েকটি কার্পাস-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি কুলিয়ারবরায় আমার উৎপাদিত মিশরীয় কার্পাসও কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এবং সরকারী ক্রপ-রিসার্চ অফিসারকে লইয়া দেখিয়া আসেন। ইহার পর প্রাদেশিক কার্পাস কমিটির কতিপয় সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়া কৃষিবিভাগ প্রদত্ত কার্পাস-চাষ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। আমার প্রদত্ত মিশরীয় কার্পাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনাটি তাঁহাদের দ্বারা সাময়িক ভাবে বর্জ্জিত হয়। আমি প্রাদেশিক কটন সাব-কমিটির একজন সভ্য থাকা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য বিষয় জানাইবার কোন সুযোগ যে আমাকে দেওয়া হয় নাই—ইহা পরিতাপের বিষয়। সে যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আমার পরিকল্পনা-

কার্পাসগাছের কাছে দণ্ডায়মান লেখক

নুযায়ী তিন বৎসরের স্থলে এক বৎসরের জন্য (১৯৫১-৫২) ইহার চাষের খরচ ১৪৮০৲ মঞ্জুর করেন। আমার পারিশ্রমিক বাবদ তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে মাসিক বৃত্তির জন্য সুপারিশ করিলেও তাঁহাদের মঞ্জুরী টাকার মধ্যে ইহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাংলার মিশরীয় কার্পাস-চাষের অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি কুলিয়ারবরায় (নদীয়া) প্রায় তিন বিঘা জমিতে মিশরীয় কার্পাসের চাষ করিতেছি।

কৃষিবিভাগ প্রদত্ত তিন বৎসরের কার্পাস-চাষ পরিকল্পনাতে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন। এই পরি-

কল্পনানুযায়ী এ বৎসরের কার্য্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ১৯৫১-৫২ সালে প্রায় ৩,৫০০ একর জমিতে পার্ব্বণী নামক লম্বা আঁশের কার্পাসের চাষ হইতেছে। যে সকল জমিতে আশু ধান কিংবা পাট চাষের সম্ভাবনা ছিল না, সম্ভবমত সে সকল জমিতেই কার্পাস-চাষ হইতেছে। এতদ্ব বহু জমি কৃষিবিভাগের ট্রাক্টরের সাহায্যে সাধ্যমত চাষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাষের জন্ত যে খরচ হইয়াছে উৎপাদকগণ কার্পাস জন্মাইয়া তাহার মূল্য হইতে তাহা শোধ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অল্প মূল্য লইয়া সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। এবার কার্পাসের মূল্য যাহাতে অবিলম্বে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্তে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কার্পাস-বীজ-ছাড়ান কল (ginning machine) প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন উৎপাদকদিগকে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলাদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও এত ব্যাপক ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা লইয়া কার্পাস চাষের ব্যবস্থা হয় নাই। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের উত্তোগে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে কর্ম্মে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারী কৃষি-কর্ম্মচারীরা প্রায় প্রত্যেকেই ইহার সাফল্যের জন্ত সাধ্য-মত চেষ্টা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে পরিকল্পনানুযায়ী যে হয় জন ডিমনষ্ট্রেটর ও কটন সুপারভাইজিং অফিসার নিযুক্ত ছিলেন, তদ্ব্যতীত কৃষি-বিভাগের অন্তান্ত কর্ম্মচারীদের এই কার্য্যে আশানুরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। আগামী বৎসর চাষের জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

একটি মিশরীয় কার্পাসগাছ

এ সকল গাছে গড়ে ১০০টি করিয়া গুটী হয়। লাগাই-বার পর পরবর্ত্তী চাষের সুবিধার জন্ত চার হাত অন্তর পংক্তি করিয়া পংক্তিতে দুই হাত অন্তর বীজ পুঁতিলে প্রতি গাছে এক পোয়া কার্পাস হয়। এই একই ব্যবধানে এক বিঘায় ৮০০ গাছ হইতে ৫ মণ কার্পাস বা ১।০ মণ তুলা পাওয়া যায়। মণপ্রতি ৩০০৲ দর হইলেও ইহাতে ৪৫০৲ পাওয়া যায়। চাষের খরচ ১০০৲ টাকার বেশী হয় না।

বাংলায় মিশরীয় কার্পাস-চাষ

মিশর দেশে জাত কার্পাস পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্পাস বলিয়া গণ্য। ইহার মূল্যও অন্তান্ত কার্পাসের দ্বিগুণেরও অধিক। বাংলাদেশের আবহাওয়ার সহিত মিশরের আব-হাওয়ার কোন মিল নাই। পাকিস্থানের সিন্ধুপ্রদেশের সহিত মিশরের আবহাওয়ার কতকটা মিল থাকায় তথাকার সরকার ইহা উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। কাজেই বাংলায় ইহার চাষের সাফল্যলাভের পথে বহু বিঘ্ন থাকা স্বাভাবিক। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের এগ্রিকাল্‌চারাল অফিসার হিসাবে আমি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ করি। প্রথম চার-পাঁচ বৎসর খুবই ভাল ফল পাইয়াছিলাম। ইহার সূক্ষ্ম শক্ত আঁশ দৈর্ঘ্যে হইয়াছিল প্রায় দেড় ইঞ্চি এবং এই তুলা ৮০-১০০ নং সুতা প্রস্তুতের উপযোগী ছিল। বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির সম্পাদক "ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। কমবেশ বিঘাপ্রতি পাঁচ-ছয় মণ কার্পাস বা প্রায় দুই মণ তুলা পাইয়াছি। এ সকল বীজ ব্যবহার করিয়া বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ সুফলই লাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির সম্পাদক ঢাকেশ্বরী কটন মিল কম্পাউণ্ডে উৎপন্ন কার্পাস পরীক্ষা করিয়া ইহার উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাংলায় যে এরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বিদেশীয় এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ ব্যবহারের পূর্ব্বে যেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশোধন করিয়া লওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তখন প্রতি বৎসর বীজ বিশোধন না করিয়াই বপন করিতাম। ইহার পর বৎসর (১৯৪১ সালে) ইহাতে এক রকম ছত্রক রোগ (fungus disease) দেখা দিয়া যাবতীয় ফসলই নষ্ট হয়। ইহাতে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বাংলার মাটি সুষ্ঠুভাবে এই কার্পাস উৎপাদনের অনুপযোগী মনে করিয়া ইহার চাষ হইতে বিরত হন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ও বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি এ প্রকার একটি অর্থকরী উৎকৃষ্ট কার্পাসশিল্প রক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিকারের জন্ত যত্নবান হইবেন এই ভরসা প্রদান করেন এবং ১২০০০৲ ব্যয়ে ৫ বৎসরের জন্ত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির অর্থানুকূল্যে কাজ আরম্ভ হয় ও দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই উত্তোক্তারা কার্পাসের এই রোগ দূর করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের গবেষণালব্ধ প্রণালীদ্বারা বিশোধিত বীজ প্রতি বৎসরই মাঠে আমি বপন এবং চাষের ব্যবস্থা করিতাম। তাঁহারা এ কাজ পরিত্যাগ করিবার পরেও গত পাঁচ বৎসর যাবৎ যথাসম্ভব তাঁহাদের প্রণালীতে বীজ বিশোধন করিয়া উক্ত বীজ রক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর ইহার চাষ করিয়া বিশেষ সুফললাভ করিয়া আসিতেছি। বীজগুলি আট-দশ মিনিট সালফিউরিক এসিডে ডুবাইয়া পরিষ্কার জলে ধোওয়া হয়। তার পর সেগুলির মধ্যে জলে ডুবিয়া থাকে এ প্রকার বীজ বপনের জন্ত রাখা হয়। এই বীজগুলি ৪ ঘণ্টা ৬০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া পরে

সুযোগমত বুনিতে হয়। এভাবে উত্তাপে রাখিবার জন্য, ইনকিউবেটরের অভাবে আমি সাধারণতঃ বীজগুলি চার ঘণ্টা রৌদ্রে রাখি। ইহার চাষ-প্রণালী এইরূপ : জমি বার বার চাষ করিয়া ও মই দিয়া বপনোপযোগী করিয়া এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে বৃষ্টি হইবার পরে, আর জল না হইলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। তার পরে মাটির জো হইলে বীজ পুঁতিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জমি কোপাইয়া কার্পাসগাছের গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। জুন, জুলাই মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পরে বীজ বুনিলে যে সকল গাছ উৎপন্ন হয় সেগুলি প্রায়ই সুস্থ থাকে না। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারা রীতিমত অনুসন্ধানের পর এ বিষয়ে নীতি নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী মহাশয়ের চেষ্টায় টালিগঞ্জে সম্প্রতি কৃষিবিষয়ক একটি বড় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েক জন কৃতী যুবকের তত্ত্বাবধানে এখানে কৃষি-সম্পর্কিত বিবিধ কার্য্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-এক জন খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রথমে ডক্টর আগারকারের অধীনে কার্পাস-বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে লণ্ডন হইতে বিশেষজ্ঞ হইয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ইঁহারা সম্প্রতি এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। কার্পাস-চাষ-প্রসার পরিকল্পনানুযায়ী ইহার কার্য্যভার ডক্টর পি. কে. গ্রেগরী পিএইচ. ডি. মহাশয়ের উপর ন্যস্ত আছে। উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি দীর্ঘকাল বাংলায় কার্পাস-চাষ প্রসারকল্পে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। মিশরীয় কার্পাসের মত একটি অর্থকরী ফসলের বীজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশুদ্ধ রাখিয়া দেশে উক্ত শ্রেণীর কার্পাসের প্রসারকল্পে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা ইঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।
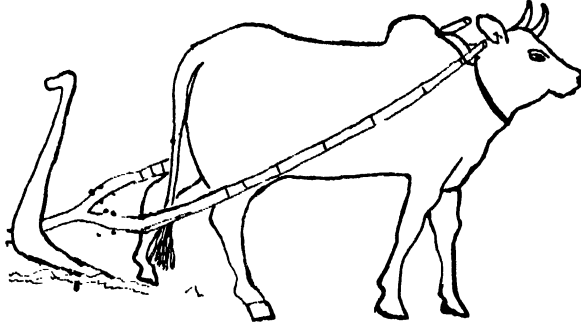
এক-গরুচালিত লাঙ্গল

দক্ষিণে—এক প্রকার কৃষিযন্ত্র

গত বৎসরে নদীয়া জেলায় ফুলিয়াবয়রাতে (১৯৫০-৫১) যে মিশরীয় কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আঁশের দৈর্ঘ্য ১$\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি। প্রসিদ্ধ মিলকর্ম্মী এম্. এল. সাহার মতে মোহিনী মিল্‌স-এ ঐ কার্পাস হইতে ৮০ নং তাহার সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৫১-৫২) উৎপন্ন কার্পাস সম্বন্ধে কেশোরাম কটন মিল্‌স তাঁহাদের ২৪।১১।৫১ তারিখের পত্রে ইহার দৈর্ঘ্য ১$\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি এবং কার্পাস খুবই ভাল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অন্যান্য কার্পাসের মতই ইহাও উৎপাদন করিতে প্রায় সমান যত্ন ও চেষ্টা এবং প্রায় একই রকমের খরচ পড়ে, কিন্তু ফসল হইতে দ্বিগুণের অধিক আয় করা সম্ভব হয়।

এখন মিশরীয় কার্পাস-চাষের প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা বলিতেছি :

১। বাংলায় সাধারণতঃ যে সকল ফসল জন্মে তাহাদের তুলনায় কার্পাস উৎপন্ন করিতে অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু কার্পাস-উৎপাদন-সম্পর্কিত কতকগুলি অল্প পরিশ্রমের কাজ যেমন নিড়ান, পোকা বাছা, কার্পাসসংগ্রহ প্রভৃতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাও করিতে পারে। ইহাদ্বারা জমিও অধিকতর সময় আবদ্ধ থাকে। যাহাদের সব কাজ মজুর রাখিয়া করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ইহার লাভজনক চাষ হওয়া কঠিন।

২। ইহা মিশ্রিত ফসল হিসাবে আশু ধান, চীনাবাদাম, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে জন্মান উচিত। আশু-ধানের সহিত উৎপন্ন করিতে হইলে প্রথমে আশু ধান বুনিবার বিশ-পঁচিশ দিন মধ্যে জমিতে কয়েকবার মই ও বিদে দেওয়ার পর তিন-চার হাত অন্তর অন্তর সারি করিতে হইবে। তার পর সেই সকল লাইনে দুই হাত আড়াই হাত ব্যবধানে মাটি কোপাইয়া নিড়াইয়া এবং থালাতে সার মিশাইয়া পাঁচ-ছয়টি করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ধান, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে কার্পাস জন্মাইয়া আমি সুফল পাইতেছি।

৩। পূর্ব্ব হইতে তৈরি জমিতে মে-জুন মাসে বৃষ্টি হওয়ামাত্র কার্পাস বুনিতে হইবে। কার্পাস বীজ বুনিবার পর প্রায় তিন মাস ইহাতে জলের প্রয়োজন। ফুলফল ধরিলে পর মাটি শুষ্ক থাকা আবশ্যক। এজন্য বাংলায় শুধু ইহার চাষের পক্ষে
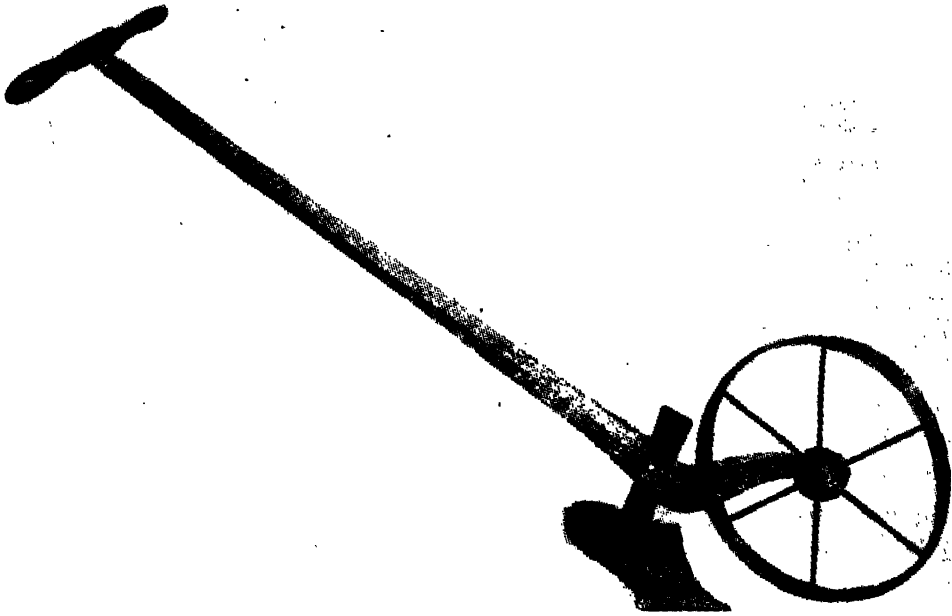
সাধারণ হাত লাঙল—মূল্য ৩৫৲

বিশেষ অনুকূল। বর্ষার জল সহজে সরিয়া যায় এই প্রকার দোআঁশলা মাটিই কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী।

৪। বাংলাদেশে বর্ষার সময় বাড়তি ঘাস ও আগাছা দূরীকরণের জন্য অল্প খরচে যাহাতে কাজ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বুনিবার পর দেড় মাস প্রায়ই হাত-লাঙল ও বিদে এবং পরে গরুদ্বারা চালিত লাঙল ও বিদে ব্যবহার করিয়া জমি পরিষ্কার রাখিতে হয়। হাতে কোপাইলে ও নিড়াইলে ইহার চার-পাঁচ গুণ খরচ করিয়াও দ্রুত কাজ সমাধা হয় না বলিয়া জমি আগাছায় পূর্ণ থাকে। বর্ষার সময় ক্রমাগত বেশী দিন বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে না বলিয়া, জমির 'যো' অনুযায়ী নিড়ান এবং খোঁড়ার জন্য সময় কম পাওয়া যায়। এ সময়ে আউশ ধান ও পাট নিড়াইতে প্রচুর লোক আবশ্যক বলিয়া এই কাজের জন্য লোক পাওয়া কঠিন এবং লোক যদি বা সংগ্রহ হয় তাহা হইলেও অনেক সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই বন্ধ করিতে হয়। আমেরিকার সাধারণ চাষীরা একটি খচ্চর-চালিত লাঙল ও বিদে সাহায্যে কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমিতে কার্পাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেখানকার আদর্শে আমাদের দেশেও কার্পাস-চাষে এইপ্রকার কৃষি-যন্ত্রাদির প্রচলন না করিলে ইহাতে অতিরিক্ত খরচ হয় বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে ইহাতে তত উৎসাহিত হইবে না।

৫। এই প্রদেশে কার্পাস-চাষের ব্যাপক প্রচলন নূতনভাবে হইতেছে বলিয়া ফসল-মূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কার্পাস-সংগ্রহে ব্যয়িত হইবে। যে সকল প্রদেশে কার্পাস হয় তথায় নগদ টাকা না দিয়া মণকরা চার-পাঁচ সের কার্পাস মজুরীতে দেওয়া হয়। এখানে লোকে একাজে অনভ্যস্ত বলিয়া দৈনিক /৫ পাঁচ সের আন্দাজ কার্পাস সংগ্রহ করিবে। এ কার্য্যে ঠিকা মজুরীতে যথাসম্ভব স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্কদের নিযুক্ত করিয়া খরচ কমান যায় কিনা চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। এদেশে আশানুরূপভাবে কার্পাস-চাষের প্রসার এখনও হয় নাই। বর্ত্তমানে বিনা খরচায় বীজ ছাড়াইয়া তুলা বিক্রী করিয়া উৎপাদকগণকে যথাসম্ভব সত্বর মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা থাকা পর্য্যন্ত যাহাতে বৃত্তি হিসাবে এক শ্রেণীর লোক এই কার্য্য অবলম্বন করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে পাট-ধানের মত এদেশে অল্প পরিমাণে ইহার বিক্রির মত বাজার নাই। সহজে বিক্রির ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কার্পাস-চাষ এখানে স্থায়ী হইবে কিনা বলা কঠিন। এবারকার ৩৫০০ একর জমিতে উৎপাদিত

অন্তত: ১৪০০০ মণ কার্পাসে ৪৫৲ মণ হিসাবে (তুলার মণ প্রায় ১১০৲) ৬,৩০,০০০৲ মূল্যের মধ্যে মণকরা ন্যূনকল্পে ৫৲ হিসাবে কার্পাস সংগ্রহ ও বিক্রির ব্যবস্থার জন্য মজুরী ধরিলে এই উদ্দেশ্যে ৭০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। কাজেই এখন হইতে নিয়মিত প্রচার করিলে এ প্রকার কাজে বহু লোক যে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। কার্পাস-চাষের আয়ব্যয় বিষয়ে একটা হিসাব সংগ্রহ করা আবশ্যক। জমি প্রস্তুত, বীজ বপন ও পরবর্তী কাজ—ফসলসংগ্রহ প্রভৃতি বাবদ বিভিন্ন সময়ে কত খরচ হয় বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া এবং কার্পাস-চাষের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মন্তব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। কার্পাস-উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে কি ভাবে চাষের খরচ কমাইয়া ইহার আয় বাড়ান যায় তাহার পন্থা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আমেরিকার কার্পাস উৎপাদনকারী সমিতির লোকেদের (Cotton Growers' Assn.) মধ্যে এভাবে আলোচনার ফলে তথায় কার্পাস-চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

৮। কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর এই মূল্যবান মিশরীয় কার্পাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশ: ইহার উৎকৃষ্ট বীজের পরিমাণ বাড়াইয়া চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা আবশ্যক। এভাবে দেশে পার্ব্বণী প্রভৃতি লম্বা আঁশের কার্পাস চাষের পরিবর্ত্তে এই অর্থকরী ফসলের প্রবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে পারিলে প্রচুর লাভ দেখিয়া সাধারণে স্থায়ী ভাবে ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইবে। এখন মিহি কাপড় প্রস্তুতের উপযোগী কার্পাস এদেশে জন্মে না। মিহি কাপড়ের চাহিদা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই কার্পাস বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া দেশে উৎপন্ন করিতে পারিলে চাষীদের ও দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

ছোট ঘর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় তোমারে নিয়ে হারিয়ে গেলাম ;
অচেনা পথের মাঝে কুড়ায়ে পেলাম
হবেও বা আর কারো হারান মাণিক,
চেনা চেনা মনে হল অচেনা খানিক।

তবুও দু'জনে তাই কুড়ায়ে নিলাম,
ধুলায় হারাই পাছে তোমারে দিলাম।
আমাদের ছোট ঘর ; ছোট এ উঠান,
এক ফালি আকাশের ছোট ব্যবধান
ঘুচাতে পারি না তাই সরমে মরি,
তুমি যে রয়েছ মোর হৃদয় ভরি।
আকাশের এত আলো, এত অবকাশ ;
তার মাঝে তবু যেন পড়েনাক' শ্বাস।

তুমি আছ কাছে কাছে, বাহিরে জনতা,
সেথায় কলহ বাড়ে, ভিতরে মমতা।
একখানি ছোট ঘর, মোরা দুটি প্রাণী,
বাতাসে শুনিতে পাই চলে কানাকানি।

হারান মাণিক কা'র পেয়ে হারালাম,
কিবা তাতে আসে যায় ? আজ দাঁড়ালাম
মুখোমুখি দুইজনে আঙিনায় এসে
মাথার উপরে চাঁদ গলে পড়ে হেসে।

ছোট ঘর তাই বুঝি বাহিরে এলাম,
পরিসর ছোট তবু ঠাঁই ত পেলাম !
সীমানা হারায়ে যায় হাড়ায়ে দেয়াল
দেখি দূরে পড়ে আছি, হয় নি খেয়াল !

সমুখে অশেষ পথ, মাথায় আকাশ
সীমা নাই, শেষ নাই, আলোর আভাস
কোনোখানে কিছু নাই, ধূ ধূ মরীচিকা;
তবু যেন মনে হয় কোনো অনামিকা
আমারে ভুলাতে চায়, কাঁদাতে তোমারে ;
এ খেলা লাগে না ভাল, আলোকে-আঁধারে।
তবে চল ফিরে যাই সেই ছোট ঘরে
দু'জনে সাজায়ে তুলি প্রেম থরে থরে।

সে প্রেমে বাসর-শয্যা সে প্রেমে ধূপতি
সুগন্ধে ভরিয়া দিবে মিলন-আরতি ;
দু'জনে ফিরিব চল, থেকো না একেলা,
চল যাই ফিরে যাই শেষ ক'রে খেলা।

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

ব্রহ্মচারী রমেশ

'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় "বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের চারি জন সন্ন্যাসী-সদস্য বহির্ভারতে ভারতের মহান্ বাণী প্রচারের জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে মরিশাস দ্বীপে অবতরণ করেন। তাঁহাদের প্রেরিত পত্রাদিতে প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পরিবেশ, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের সাফল্য এবং আর্থিক উন্নয়নে তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ পাইয়াছি তৎসম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মরিশাস ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব তেত্রিশ শত মাইল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের আয়তন ৭১২ বর্গমাইল লোকসংখ্যা সাড়ে চারি লক্ষ; তন্মধ্যে হিন্দু আড়াই লক্ষেরও অধিক। দ্বীপটি পার্বত্যময়; অধিকাংশ স্থানই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ শত থেকে ৩ হাজার ফুট উঁচু। এই স্থানের আদিম অধিবাসিগণকে ক্রিয়ল বলে এবং তাহাদের ভাষা ক্রিয়ল নামে পরিচিত।

মরিশাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকগণ ঐ দ্বীপটি আবিষ্কার করে। তখন এই স্থানে লোকবসতি ছিল না। জনৈক নাবিকের নামানুসারে এই দ্বীপটির নামকরণ করা হয়—ম্যাসকারেন। ভৌগোলিকগণ ইহাকে কায়নি আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইহার কতকাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া হল্যাণ্ডের যুবরাজের নামে এই দ্বীপের নাম রাখা হয় "মোরিস"। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এই উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আনাইয়া দ্বীপটিকে বসবাস ও কৃষির উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়। অবশেষে এই স্থানের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না মনে করিয়া তাহারা তাহাদের গড়িয়া তোলা গৃহাদি ও উপনিবেশের অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া যায়। ওলন্দাজগণ এই দ্বীপ ত্যাগ করিলে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফরাসী অধিকারে আসে এবং ইহার নূতন নামকরণ করা হয়—'লেডি ফাঁস'। ফরাসীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ ক্রমশঃ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। এই সময় ইংরেজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র পাড়ি দিতে সুরু করিয়াছিল। তাহাদের লুব্ধ দৃষ্টি ইহার উপর পড়িল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতগামী একটি ব্রিটিশ নৌবহরের অভিযাত্রিগণ কর্তৃক এই দ্বীপটির কিয়দংশ অধিকৃত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তির ফলে দ্বীপটির শাসনভার সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশের অধিকারে আসে এবং এখানে ফরাসী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশের অধিকারের পর দ্বীপটির নাম দেওয়া হয় মরিশাস।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে এখানকার ক্রীতদাসপ্রথা রহিত হয়। তখন আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাসরূপে শ্রমিক আনয়ন বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করিতে সুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই মরিশাস, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়গণের আগমন আরম্ভ হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মরিশাসে সর্ব্বপ্রথম বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে শ্রমিক আনয়ন করা হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ হাজার। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্যান-ডার্স ন কমিটি মরিশাসে জনসংখ্যার বহুলতা, কৃষির উপযোগী ভূমির স্বল্পতা, কলোনীর আর্থিক বিপর্য্যয়, শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের শ্রমবিমুখতার ওজুহাতে ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে শ্রমিক আনয়ন বন্ধ করিবার সুপারিশ করেন। ইহার ফলে কিছুদিনের জন্য শ্রমিক আমদানি বন্ধ থাকে।

মরিশাসের মোট লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৮০ হাজার; তন্মধ্যে ভারতীয় হিন্দু—২ লক্ষ ৩০ হাজার, মুসলমান ৬৭ হাজার, ভারতীয় খ্রীষ্টান ১০ হাজার, চীনা ২৫ হাজার, ফরাসী ১০ হাজার এবং আফ্রিকান ও শ্বেতাঙ্গ প্রায় দেড় লক্ষ।

এই স্থানে অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা ইক্ষুচাষ। এই ইক্ষুচাষের জন্যই ভারতীয় শ্রমিকগণকে এই দেশে আনয়ন করা হয়। এই দ্বীপে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন অপেক্ষা কিছু বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইক্ষু হইতে শর্করা উৎপাদনের কলগুলি ফরাসীদের একচেটিয়া এবং ইক্ষুচাষের জমির অধিকাংশও তাহাদেরই। কাজেই ফরাসীগণ এদেশের শ্রেষ্ঠ ধনী এবং এখানকার আর্থিক উন্নতি তাহাদের উপর প্রায় ষোল আনা নির্ভরশীল। মুসলমান ও চীনারা এদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রণী। অন্যান্য অনেকে মসীজীবী, আবার অনেকে কুটীর-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বর্তমানে স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় হিন্দু ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছে। তবে অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দু কৃষিক্ষেত্রের অথবা শর্করা উৎপাদনের কলের শ্রমিক। হিন্দুগণের মধ্যে বণিকশ্রেণী নাই বলিলেও চলে। তাহারা বেশীর ভাগই দরিদ্র। তাহাদের কুটীর-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে কিছু কিছু কৃষির উপযোগী জমি আছে মাত্র। বৎসরে আট-দশ মাস স্ত্রীপুরুষ সকলেই কোন-না-কোন কার্য্যে

নিযুক্ত থাকে। প্রতিদিন এক একটি পরিবারে স্ত্রী-পুরুষে পাঁচ-ছয় টাকা উপার্জন করে। বৎসরে তিন মাস কাল শ্রমিকগণের প্রায়ই কাজ থাকে না। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও অবনতির দিকে। তাহাদের ভাগ্যে পুষ্টিকর খাদ্য খুব কমই জোটে। ইহার উপর প্রায় অধিকাংশ লোক মদ্যপানাসক্ত। মদ খুবই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ওদিকে কিন্তু উৎপন্ন গমের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়। ফল ও শাকসব্জী প্রচুর জন্মে। গো-দুগ্ধ এখানে প্রতি সের ।৵০ মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। প্রায় সকলেই চা পান করে।

ফরাসী ভাষা এখানকার রাষ্ট্রভাষা ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রায় সকলেই ফরাসী ভাষায় কথা বলে। সংবাদ-পত্রগুলি ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হয়। বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দী ভাষার অনুরাগীদের বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠের শেষে পৃথক ভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হয়। আফ্রিকান প্রভৃতি অন্যান্য অনেক অধিবাসী ফরাসী ভাষার অপভ্রংশকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। বর্তমানে হিন্দীর বহুল প্রচারের জন্য ভারতীয় প্রচারকগণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় হিন্দী অবশ্যপাঠ্য ও পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এখানে হিন্দী-ভাষায় কয়েকজন কবি ও লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। দুই-একটি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্র প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশিক্ষার্থীদের ভারত অথবা ইংলণ্ড যাইতে হয়। সেইজন্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখানে বিরল।

আমাদের দেশে যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হয়, এখানেও তেমনি কোন কোন স্থানে ধর্মশাস্ত্র পাঠ-ব্যাখ্যানাদি হইয়া থাকে। এখানকার শ্রদ্ধাবান হিন্দুগণও ইহাকে পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করেন। ধর্মান্তরিত-করণ এদেশের একটি লক্ষণীয় বিষয়। বহু হিন্দু আর্থিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য প্রলোভনে পড়িয়া ধর্মান্তরিত হয়। জনগণের মধ্যে হিন্দুদের মহান্ ভাবধারাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইলে হিন্দুগণকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বনের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে গগনচুম্বী বিশাল গীর্জা রহিয়াছে। এই স্থানের অধিকাংশ খ্রীষ্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের। খ্রীষ্টানগণ গীর্জায় আসুক বা নাই আসুক, মিশ্রিত সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে গীর্জায় যায় ও প্রার্থনাদি করে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুদের সাধারণ উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান এখানে নাই। অথচ ভারতের বাহিরে সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক হিন্দু এখানে বাস করে। গীতাভবন নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে; বাহিরের আগন্তুকগণ এখানে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করে।

শাসনতন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতীয় হিন্দুদের অধিকার নগণ্য নয়। এখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিক

হইতেছে। গত ১৯৪৮ সনে এখানকার শাসনতন্ত্রানুযায়ী নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক নরনারী স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে। ফলে ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ১১টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত হয়। অবশিষ্ট ৭ জন স্থানীয় ক্রীয়ল এবং ১ জন ইউরোপীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হইয়াছেন। এই স্থানে ক্রমশঃ রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইতেছে এবং শ্রমিকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

মরিশাসের ইতিহাসে ভারতীয়গণের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রাণপণ চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আজ সুসমৃদ্ধ। চাষের জমি বাড়িয়াছে, গ্রামের সংখ্যা বাড়িয়াছে এই ভারতীয়গণেরই অধ্যবসায়ের ফলে। আবার রেলপথ এবং পর্বতের ভিতর দিয়া রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে শহরের পত্তন—সবই ভারতীয়দের চেষ্টার ফল।

মরিশাসের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও মনোরম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের সভ্যগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শহর হইতে ২৫ মাইল দূরে মিউগ্রোভ নামক স্থানে একটি সভার আয়োজন হয়। এই ২৫ মাইল পথ অতিক্রমের সময় মিশনের অন্যতম সদস্য ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ এই স্থানের দৃশ্যাবলীতে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—"চিরহরিৎ পর্বতময় দ্বীপের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমরা মিউগ্রোভ অভিমুখে চলিয়াছি; কোথাও রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ আখের ক্ষেত, আবার কোথাও সবুজ বনরাজির অভ্যন্তরে সুরম্য শহর। প্রত্যেক শহরের সৌন্দর্য্য যেন কোন চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকা-স্পর্শে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে 'বাংলো' প্যাটার্ণের

ছোট ছোট বাড়ী; প্রশস্ত অঙ্গনে নানা প্রকার নাম-না-জানা রং-বেরঙের ফুল ও শাকসবজির গাছ। এক প্রকার ছোট সারিবদ্ধ বাঁশের ঝাড় দিয়া প্রাঙ্গণ তথা বাংলোটি ঘেরা। এখানে বর্ণবৈষম্য না থাকায় যে-কোনও স্থানে ভারতীয়গণ বাস করিতে পারে। শহরের বহু স্থানে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়গণকে পাশাপাশি বাস করিতে দেখিলাম। তবে শ্বেতাঙ্গদের অনুরূপ ভারতীয়গণকেও বাংলো করিতে হয়।"

ভারতীয়গণ দীর্ঘকাল যাবৎ মাতৃভূমি হইতে বহু দূরবর্তী এই দেশে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের মহান্ ঐতিহ্যের কথা তাহারা ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু এই সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও তাহাদের দেশপ্রেমে ভাটা পড়ে নাই। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের আগমনে তাহাদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা গিয়াছিল। স্বাধীন ভারতের সবকিছু জানিবার জন্য তাহারা উৎসুক; সন্ন্যাসী-প্রচারকদের নিকট তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার পণ্ডিত জবাহরলাল, এবং সর্দ্দার প্যাটেল* সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে চায়; দেশাত্মীয় সংবাদ জানিবার জন্য তাহাদের কতই না আগ্রহ!

মিশনের সদস্যগণ মাত্র দুই দিন এই দ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভারতের মহান্ আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পান। স্বাধীন ভারতের সর্ব্ববাণী ত্যাগ ও সেবা, মৈত্রী ও শান্তির আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই প্রচারকবাহিনী বহির্ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

---

* সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণ গত ১৯৫০ সালের ১২ই ডিসেম্বর মরিশাস দ্বীপে অবতরণ করেন। ঐ সময় সর্দ্দার প্যাটেল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

উদ্ভাস

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি আকাশে উঠেছে চিল
মেঘ কেটে গেছে।
অন্ধকার স'রে গিয়ে জ্যোৎস্না নেমেছে।
পুরনো বিষণ্ণ দিন : শোণিতসিক্ত দিন
অপগত আজ;
জ্যোতির আভাস জাগে, ক্লান্ত চোখে ফিরে আসে
আলোর স্বরাজ।
মেঘ কেটে গেছে আজ মেঘ স'রে গেছে,
মলিন নগর ছেড়ে রজনীগন্ধা-বনে
জ্যোৎস্না নেমেছে।

এমন চাঁদের দিন দেখিনি কি আর বার
বুদ্ধ-পূর্ণিমার!
এমন জ্যোৎস্না সে কি হাসে নি কো প্রেয়সীর
হাসির আভার!

ছিল তো ঐতিহ্য নীল
আলো-হাসি অনাবিল
আমাদের অস্তিত্বের প্রাণ-পঞ্জরে,
তারপর কোথা কবে
নখের আঁচড়ে সে কে
মুছে দিল সব তার শোণিতাক্ষরে!
ইতিহাস তোলে নি তো, যত করি ক্ষমা,
বহু ব্যথা বহু অশ্রু
পাতা ভ'রে আজও তার হ'য়ে আছে জমা।

এসেছে আলোক,
অকস্মাৎ উদ্ভাসিয়া ওঠে মনোলোক;
অভ্রভেদী দুর্গম শিলা পেরিয়ে আবার
স্পর্শ পাই স্নিগ্ধ এক নব পূর্ণিমার।
মেঘ কেটে গেছে আজ মেঘ স'রে গেছে,
মলিন নগর ছেড়ে রজনীগন্ধা-বনে
জ্যোৎস্না নেমেছে।

প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসের (সান্যাল) "বিবর্তনে কামতা রাজ্য" প্রবন্ধটির শিরোনামা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধেই তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া জানা গেল—বর্তমান কোচবিহার রাজ্যের ইতিবৃত্ত সকলনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিতেছি।

কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে যে, নরক বিদেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুর জয় করিয়া কিরাতরাজ ঘোটককে নিহত করেন। ম: ম: পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল। হিউয়েন্ সাং এখানে শত শত দেবমন্দির এবং মিথিলায় কথিত ভাষার সহিত কামরূপীয় ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। নিধানপুর তাম্রশাসনে ভাস্কর বর্মাকে "প্রকৃষ্ট আর্য্য ধর্মের রক্ষক ও শশিশেখর প্রিয় পিনাকিনের ভক্ত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্মপাল বর্মদেবের প্রথম তাম্রশাসনেও প্রথমে প্রণাম করা হইয়াছে তাঁকে যিনি আদিদেব অর্দ্ধ যুবতীশ্বর, যাঁর গলার এক দিকে দোলে নীলাপদ্ম, অন্য দিকে উদ্যতফণা সর্প; যাঁর বরবপুর এক দিক যুবতীসুলভ স্তনভারনম্র, আর এক দিক ভস্মাচ্ছাদিত —যিনি শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসের প্রতীক্। বাণ এবং অনিরুদ্ধ-উষার কাহিনী, উলুপী বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার কথাও আমরা পড়িয়াছি। বর্মণ রাজবংশের পর ম্লেচ্ছবংশীয় শালস্তম্ভ রাজারা কামরূপে রাজত্ব করেন, তাহার পরে আসেন পালেরা। বঙ্গদেশের পালেদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানা নাই—ইঁহাদের বলা হইত ভৌম পাল ও বারাহীপাল। শালস্তম্ভ বংশের রাজারা "কামেশ্বর মহাগৌরী"র উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বরের মন্দির তাঁহারাই নির্ম্মাণ করেন।

কামরূপে এই সময়ে লুইপা, সরহপা, মীনপা, গোরক্ষপা কানপা, তিল্লোপা, তান্ত্রিপা, কত্তুরী, ভুসুর্ক, ডোম্বী প্রভৃতি চৌরাশী সিদ্ধাচার্য্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত মাণিকচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান কামরূপেও প্রচলিত ছিল। ডা: শহীদুল্লাহের মতে হিন্দী, মরাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতেও নামগীতিকা পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় "তেঞ্জুরে" ত আছেই। কালিকাপুরাণ ও যোগিনী-তন্ত্রে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-প্রাবনে বিকৃত তন্ত্রবাদ, সহজিয়াবাদ ও নাথবাদ কামরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিতদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অষ্ট্রিকভাষী জাতিদের সময়ে। মাতৃতন্ত্রপ্রধান কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সভ্যতাই অষ্ট্রিক সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। বহু যুগ পরে এই মাতৃতন্ত্রবাদ সহজিয়া ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার শক্তিবাদের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়া কামরূপী সভ্যতাকে এক নূতন রূপ দিয়াছিল। দেবী কামাখ্যা তাহারই প্রতীক। তাঁহাকে অষ্ট্রিক ভূমাতাই বলি, (কা-মেই-খা-ই) বলি বা শক্তির যোনি-পীঠস্থানই বলি মূলে তিনি এক আর্য্য-অনার্য্য অষ্ট্রিক বড-সংস্কৃতির মিলিত প্রকাশ। কোচবিহারের আই পূজা তৎকালীন শক্তিপূজারই চিহ্ন।

অহমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে পতিত কায়স্থের দেশ বা কলিতা কিংবা কুললুপ্তের দেশ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পরশুরাম যখন তাঁর ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তখন জামদগ্ন্যের রোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক ক্ষত্রিয় নিজেদের কলিত বা কুললুপ্ত বলিত। গুপ্তদের সময় "প্রাগ্-জ্যোতিষভুক্তি" গুপ্ত সম্রাটদের শাসনাধীন একটি প্রদেশ ছিল। ধর্মপালের সময়ও কামরূপ পালসম্রাটদের প্রভাবাধীন ছিল। কবিশরণের কবিতায় লক্ষ্মণসেনদেবের কীর্ত্তি-বর্ণনায় কামরূপের উল্লেখ আছে—

"ভ্রূক্ষেপাদ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি
কেলিমাক্রং কলিঙ্গান্
বিনয়তে কামরূপাভিমানং।

কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গেও কামরূপের উল্লেখ আছে।

মান্দাসর অনুশাসনে বর্ণিত রাজা যশোধর্ম্মের সাম্রাজ্যও কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যমতীর পিতা হর্ষদেব ভগদত্তবংশ-জাত বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার স্বামী লিচ্ছবীরাজ দ্বিতীয় জয়দেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলাধিপতি ছিলেন।

গৌড়াধিপ রামপালের সময় কামরূপ বিজিত হয়। বাঙালী সেনাপতি-প্রতিষ্ঠিত ময়নাগড় আজও কামরূপ বিজয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। নৃপতি তিঙ্গ্যদেব সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া বর্তমান তেজপুরে (বাণরাজার শোণিতপুর) রাজধানী পরিবর্তিত করেন। তিঙ্গ্যদেব গৌড়সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে গৌড়রাজমন্ত্রী-পুত্র বৈদ্যদেব পুনরায় কামরূপ বিজয় করেন। বৈদ্যদেব প্রথমে রাজপ্রতিনিধি ও তাহার পরে স্বাধীন ভাবে কামরূপরাজ্যের পশ্চিম দিকে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজ্যই কামতা রাজ্য। বৈদ্যদেবের পর রায়রিদেব, ভাস্করদেব, বল্লভদেব, পৃথুদেব প্রভৃতি কয়েকজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। এই সময়

বাংলাদেশে সেনরাজদের প্রতিপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখমোহন নাথের মতে গোয়ালপাড়া জেলার অভয়াপুরীর সন্নিকটবর্তী লালমাটির ধ্বংসাবশেষ এই যুগের। হলেশ্বরের নৃত্যপরায়ণ গণেশ ও ব্রহ্মা এবং তেজপুরের সূর্য্যমূর্ত্তি বাংলার ও কামরূপের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয়। ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষ কামতারাজ্যের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। পৃথুদেবের রাজত্ব গৌমঃপুনিক মুসলমান অভিযানের জন্ত বিখ্যাত। প্রথমে মুসলমানরা পরাভূত হইয়া পলাইয়া যায় এবং তাহার স্মারক-স্বরূপ গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বরশীবোয়া স্থানে পাষাণ-গাত্রে খোদিত একটি শিলালিপি আছে :

"শাকে তুরগে যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে
কামরূপং সমাগত্য তুরষ্কাঃ ক্ষয়মায়য়ুঃ।"

পৃথুদেবের মৃত্যুর পর কামতারাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কায়স্থ মন্ত্রীবংশ পশ্চিম দিক অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করেন। পূর্ব্ব অংশে অর্থাৎ দরং ও কামরূপ জেলার পূর্ব্বভাগে প্রাচীন পালবংশের বারাহীশাখার রাজারা পুনরায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণকার মাধব কন্দলী এক মহামাণিক্য বারাহী রাজার সভাকবি ছিলেন। এই বারাহী রাজা ত্রিপুরাধিপতি, জয়ন্তীয়াধিপতি বা কামপুররাজ তাহার সঠিক নির্ণয় এখনও হয় নাই।

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
মাধব কন্দলী আরো নাম
সপোনে বাচিতে মঞি ভাষে তার বাক্যে মনে
অহর্নিশি চিন্তো রাম নাম।

শ্রীমহামাণিক্য বারাহী রাজার অনুরোধে তিনি রামায়ণ রচনা করিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামতাপুরাধিপতি দুর্লভনারায়ণের নামও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে জল জল করে। "কামতা-মণ্ডল, দুর্লভনারায়ণ, নৃপবর অনুপম"—তাঁহার রাজসভায় হেম-সরস্বতী ও হরিহর বিপ্র নামে দুই জন কবি ছিলেন। হেম-সরস্বতীর প্রহ্লাদ-চরিত্র বিখ্যাত :

নৃপশিরোমণি দেব মহামানী
দুর্লভনারাণ রাজা।
তাহান্ তনয় ইন্দ্রনারায়ণ দেব
মহাবীর ধীর স্বভাব গম্ভীর
নিতে কৃত্য হরিদেব।

দুর্লভনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ "শাক গৌরেশ্বর" ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ছোটশিলা নামে এক গ্রামে কায়স্থপ্রবর চক্রপাণি শিকদারের পুত্র কবিরত্ন সরস্বতী নামে আর এক কবি ছিলেন। তিনি মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব অনুবাদ করেন।

দ্রোণপর্ব্ব জয়দ্রথ বধ
কৌতূহলে নির্ণদতি

এই সময়ে রচিত পদ্মপুরাণ নামে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায় যাহাতে হাসেন হুসেনের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের ঘোর যুদ্ধ হয়। হাসেন হুসেন বাংলার হুসেন শাহ।

আই পূজার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমস্ত কামরূপ জুড়িয়া, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে (যেমন ফুলবাড়ী) আই পূজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কাছাড়ীদের বুঢ়াবুঢ়ী (হরপার্ব্বতী) কেচাইখাতীর তাম্রেশ্বরী, কামাখ্যাপূজার প্রচলন, জল্পেশ্বরের কাহিনী, বারভূঞার আইগোসানী পূজা প্রাচীন অষ্ট্রিক মাতৃবাদের সহিত তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজা মিশিয়া এক মাতৃতন্ত্রবাদে পরিণত হইয়াছে। তখন কামরূপের সীমানা ছিল :

ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনং
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্
নেপালস্তকাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্ত সঙ্গমম্
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।

বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযোগিনী সাধনার অর্ঘ্যদানের পদ্ধতিতে লিখিত আছে :

"পশ্চাৎ পুনরপি ওড্ডিয়াম পূর্ণগিরি কামাখ্যা সিরিহট্ট
ইত্যাদেন পূজয়েৎ ওঁ ওঁ ওঁ সর্ব্ববুদ্ধ ডাকিনীয়ে
বজ্রবর্ণনীয়ে বজ্র বৈরোচনীয়ে হুং হুং হুং ফট্ ফট্ ফট্ স্বাহা। (সাধনমালা গাইকোয়াড় সিরিজ দ্বিতীয় ভাগ ৪৫৩ পৃ, সাধনসংখ্যা ২৩২।)

ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা
ওঁ শ্রীহট্ট বজ্রপুষ্পে স্বাহা
ওঁ নম সর্ব্বগুরু বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্রপুষ্পে স্বাহা।

তন্ত্রসারেও মূলাধারে কামরূপের উল্লেখ আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মগধ গৌড় প্রভৃতি দেশ হইতে বিতাড়িত অনেক বৌদ্ধসন্ন্যাসী পূর্ব্বাকলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কামাখ্যা শক্তিপূজার পাদপীঠ—প্রাচীন অষ্ট্রিক মাতৃতন্ত্রবাদের যোনিপূজার সঙ্গে মিশিয়া বিকৃত তন্ত্রবাদ এক ধরণের মাতৃপূজার আয়োজন করিয়াছিল। কিছু অনার্য্য-প্রভাব, কিছু লিঙ্গপূজা এবং শৈববাদও মিশিয়া গিয়াছিল। বৈদিক রুদ্রকে অনেকে Syncratic দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন। রুদ্রকে বলা হইত বভ্রুবর্ণ। কীথের মতে, তামিল ভাষায় শিব বলিতে বুঝাইত রক্তবর্ণ মানুষ। রুদ্র ছিলেন অনার্য্যদের দেবতা, পশুপালন তাঁর পেশা। রুদ্রের পশুপতি নাম কি ভাবে আসিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার কাহিনী আছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে পশুপ বলা হইয়াছে। গোভিল গৃহসূত্রে রুদ্রের স্থান পশ্চাতে। যজুর্ব্বেদীর শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে দস্যু বঞ্চক তস্কর প্রভৃতির প্রিয় দেবতা বলা

হইয়াছে। আবার উপনিষদে রুদ্রকে পরম তত্ত্বরূপেও দেখি।

অসমীয়া সাহিত্যে "আইর নাম" বলিয়া কতকগুলি প্রাচীন কবিতা আছে। এই আই "দুখীয়ার পুত্‌লা" তাঁর অপর নাম শীতলা "দি যোৱা বুক জুরাই"—তাঁকে পেলে বুক জুড়িয়ে যায়। ভক্ত গোসানী জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি দিয়া তোমার পূজা করিব—ফল, দুধ, ধন, জল, অন্ন, বস্ত্র, মন, চিত্ত—আই উত্তর দিতেছেন,

যেই বস্তু দিও মাতৃ সেই বস্তু চুবা
আপোনর নামে মাতৃ সন্তুষ্ট হোবা।

আইকে বলা হইতেছে :

আই ভগবতী আই, তোমার নাম সুন্দরী নাই।
অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এইরূপে ফুরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, "আইদেবী" অম্বিকা, চণ্ডিকা, ভবানী কালিকারই অন্ত রূপ। দিনের শেষে গোধূলিতে মহামায়া রূপে আই আসিতেছেন। সোনার বাঁশী বাজিতেছে, তাঁর হাতে কমলের ফুল "দুখীয়ালৈ পেলাই দিছে সুখিল ফুলর মালা"।

এক দিকে মুসলমানদের আক্রমণ, অন্ত দিকে তাইশাখার অহমদের আগমন, অন্তর্বিবাদ, ভূঁঞাদের গৃহবিবাদ সমস্ত কামতা এবং কামপুররাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময়েই চিকনা নামক স্থানে গোয়ালপাড়া জেলার বড়জাতীর কোচ-নৃপতি বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হয়। গীতি-রামায়ণ ও বেহুলা আখ্যান রচয়িতা কবি দুর্গাবর কোচবিহারাধিপতিকে 'কমতা-ঈশ্বর' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন :

কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর
আটচল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠর কোঙর

নিজের বিবরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "শ্রীকায়স্থ চন্দ্রধর তানপুত্র দুর্গাবর, বিরচিল গীত বিতোপন"। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। তিনি নব্য আসামের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শুধু ভক্ত, সাধক, যুগ-প্রবর্তক বিরাট পুরুষ ছিলেন না, কবি, সুরকার, গায়ক ও নাট্যকারও ছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন কোচ-নৃপতিদের আশ্রয়েই কাটান ও সমগ্র কোচবিহারে তাঁহার প্রভাব সক্রিয় ছিল। কথিত আছে যে, বীর চিলারায় (শুক্লধ্বজ) তাঁহার ভার্য্যা কমলপ্রিয়া দেবীর মুখে শঙ্করদেবের "পামর মন রামচরণে চিত্ত দেহ" এই গানটি শুনিয়া শঙ্করদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লন। কামতা রাজ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফরমোসা

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

সম্প্রতি ভারতবর্ষ জাপ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে ও সানফ্রান্সিসকো শান্তি-সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই অসম্মতির অন্যতম কারণ হইতেছে ফরমোসাকে চীনের হাতে প্রত্যর্পণ না করা। ভারত-সরকার মনে করেন যে, শান্তি-চুক্তিতে ফরমোসাকে চীনের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতের ধারণা যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা কোন দেশের শান্তি আসিতে পারে না। ফরমোসাকে নিজেদের অধীনে রাখা এই সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর; সুতরাং ইহাতে ভারতের সমর্থন থাকিতে পারে না।

ফরমোসাকে চীনের হাতে ফিরাইয়া দিবার যুক্তির মূলে যে ধারণা রহিয়াছে তাহা হইতেছে—ইহা চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুত: ইহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই ফরমোসা চীনের অধিকারে ছিল। এই বিষয়টি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব।

ইতিহাস : স্থানীয় ভাষায় ফরমোসার নাম "তাইওয়ান"। ফরমোসা নাম ইউরোপীয়দের দেওয়া, ইহার অর্থ সুন্দর। পর্তুগীজ নাবিকেরা এই স্থান দিয়া যাইবার সময় সমুদ্র হইতে এই সুন্দর দ্বীপটিকে দেখিয়া 'ফরমোসা' অর্থাৎ 'সুন্দর' এই নাম রাখিয়াছিল।

এই দ্বীপটি চীন দেশের সন্নিকটে; সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতে চীনারা ইহার খবর রাখিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রয়োজন না হওয়ায় তখন তাহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা প্রথম এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৬২৪ সনে ওলন্দাজরা ইহার পূর্ব্ব-উপকূলে জেলাণ্ডিয়া নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে ৩৭ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতে থাকে। এই সময় চীন দেশে 'মাঞ্চু'-রা মিংবংশীয়দের পরাজিত করে। এই পরাজিত মিং বংশের অনুগত কতিপয় লোক কোক্সিঙ্গা নামে পরিচিত এক দলপতির

নায়কত্বে ফরমোসার ওলন্দাজদিগকে বিতাড়িত করে এবং ইহার একটি বৃহত্তর অংশ দখল করিয়া বসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার 'মাঞ্চুরা' ফরমোসার এই অংশকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করে। সেই হইতে ইহা চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনারা এখানে দ্রুত চলিয়া আসিতে থাকে। ফলে তাহাদের সহিত ফরমোসার আদিম অধি-বাসীদের বিবাদ সুরু হয়।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টিয়েন্‌সিনের চুক্তির ফলে তাইওয়াম ও তামসিন নামক ফরমোসার দুইটি বন্দর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মযাজকেরা তথায় ধর্মপ্রচারের জন্য আসিয়া জুটিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরমোসার উপকূলে একটি জাপানী জাহাজ ডুবিয়া যায়। এই জাহাজের কোন নাবিককে এখানকার আদিম অধিবাসীরা নাকি হত্যা করে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জাপানীরা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করে। ফলে চীনের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, কিন্তু কোনক্রমে এই যুদ্ধ এড়ান হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও চীনের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ফরাসীরা ফরমোসাকে আংশিক ভাবে অবরোধ করিয়া কয়েক মাসের জন্য কীলাং অধিকার করে। ইহার পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরমোসা সিমোনোসেকি চুক্তির বলে জাপানের হাতে সমর্পিত হয়। কিন্তু সেখানকার চীনা অধি-বাসীরা ইহাতে প্রতিবাদ করিল এবং সেখানে গণতন্ত্র ঘোষিত হইল। অতঃপর জাপানীরা ইহা বলপ্রয়োগ দ্বারা দখল করে—এই বিদ্রোহী ফরমোসাকে বশে আনিতে তাহাদের কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

ভৌগোলিক বিবরণ : ফরমোসা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের নিকটস্থ একটি দ্বীপ। চীন ও ইহার মধ্যে যে প্রণালী বিদ্যমান তাহার নাম ফরমোসা প্রণালী। ইহা ৯০ মাইল চওড়া এবং জায়গায় জায়গায় আরও অধিক বিস্তৃত। ফরমোসার উত্তর ও দক্ষিণে যথাক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্র অবস্থিত। ফর-মোসার আকৃতি ডিম্বের মত। ইহা লম্বায় ২২৫ মাইল ও চওড়ায় ৬০-৮০ মাইল এবং ইহার ক্ষেত্রফল ১৩,৪২৯ বর্গ-মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ৬৪,০০,০০০ জন (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী)। ইহার রাজধানী তাই হোকু ও অন্যান্য শহরের লোকসংখ্যা নিম্ন-লিখিত রূপ :

তাই হোকু	··· ৩,২৬,৪০৭	জন
তাকাও	··· ১,৫২,২৬৫	,,
তাইনান	··· ১,৪২,১৩৩	,,
কীলাং (কীয়াম)	··· ১,০০,৫১১	,,
কাগি	··· ৯২,৪২৮	,,

ফরমোসার উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত-মালা মেরুদণ্ডাকারে অবস্থিত এবং এই পর্ব্বতরাজি ইহার মধ্য ও পূর্ব্বাংশে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার প্রধান জলবিভাজিকা পূর্ব্ব প্রান্তে। এই দিকে পর্ব্বত খাড়া ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক স্থানে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সমান্তরালভাবে ১৫০০ হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রাচীর সৃষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি সমতল ভূমি বিশেষতঃ গিরন এই দিকে অবস্থিত এবং ইহার মধ্যভাগে সমুদ্রোপকূলের সহিত সমান্তরাল ভাবে একটি উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ফরমোসার অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যে নিসন (নীটাকায়ামা) ১৪,৭২০ ফুট ও সিলভিয়া (সেটজু জান—১২,৪৮০ ফুট) উল্লেখযোগ্য। ফরমোসার পশ্চিম দিক সমতল ভূমিতে পরিপূর্ণ এবং ইহা ২০ মাইল চওড়া।

কর্কট ক্রান্তি (Tropic of Cancer) ইহার মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কিউরোসিও নামক উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া এখানকার জল-বায়ু উষ্ণমণ্ডলের অনুরূপ।

ফরমোসায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই দ্বীপটি সারা বৎসর সমান বৃষ্টি পায়। অবশ্য ইহার দক্ষিণ ভাগ শীত-কালে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে অর্থাৎ কম বৃষ্টি পায়। জলবায়ুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত হেতু আর্দ্রতা এই দুইটি কারণে এখানে মূল্যবান উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। ইহার বেশীর ভাগ ভূমি শস্য ও তৃণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলের বৃহত্তর ভাগ ব্যাপিয়া সতেজ বনরাজি প্রসারিত। এই বন তাল বট কর্ক (ছিপি), কর্পূর ও ফার্ণ বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

চাউল, ইক্ষু, চা, পাট, মিষ্টি আলু, সিম, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফরমোসার প্রধান ফসল। এখানে চাউল বছরে দুই বার করিয়া জন্মে। ১৯৪৩ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানকার উৎপন্ন-দ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

চাউল	১,৪৫,৪০,০০০ টন (৪,৪৮,০০,০০০ বু)
মিষ্টি আলু	১৪,০০,০০০ ,,
চিনি	১২,৭০,০০০ ,,
চা	১৫,৪০০ ,,

এখানে কলা এবং কমলাও প্রচুর উৎপন্ন হয়। পশুপালনেও ফরমোসাবাসীরা খুবই তৎপর।

কীলাঙে কয়লার খনি আছে এবং সিনজোর নিকটে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখান হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হয়। রৌপ্য, তাম্র, গন্ধক, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ফরমোসায় পাওয়া যায়।

১৯৪৩ সালে ফরমোসা ৪০,০০,০০,০০০ ইয়েন মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করে এবং ৩৪,০০,০০,০০০ ইয়েন দামের মাল আমদানী করে। ইয়েন জাপানী মুদ্রা। এই ইয়েন এখানেও

মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। পরে চীনা জাতীয় মুদ্রা ব্যবহৃত হইতে থাকে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফরমোসার যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

রেলপথ (সরকারী)	৮৭৯	মাইল
„ (বেসরকারী)	১,৬২৪	„
ট্রাম রাস্তা	৫০০	„
অন্যান্য রাস্তা	১০,০০০	„

ফরমোসার পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত লান বিমানঘাঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর উপকূলে চিলাং ও তাইপী হইয়া পশ্চিম উপকূল ধরিয়া তাওয়ুয়াম সিন্চু, তাইচুং, চিয়াই, তাইনাম ও কাওসিয়াং হইয়া পিংটাং পর্য্যন্ত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর একটি রেলপথ পূর্ব্ব উপকূলের মধ্যভাগে হুয়ালিনচিয়াং হইতে তাইতুং পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ফরমোসার তাইপী, তাওয়ুয়ান, তাইচুং, পিংটাং প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাঁটি এবং সুংশাং, তাইপী, তাইয়ুয়াম, সিন্চু, তাইচুং, কাওসিয়াং, পিংটাং, হেংচুন, তাইতুং, হুয়ালিনচিয়াং ও লান্-এ বিমানঘাঁটি করা হইয়াছে। এখানে চিলাং, কেংশান প্রভৃতি বন্দর আছে।

আদিম অধিবাসী : ফরমোসায় জাপানী ও চীনা ব্যতীত দুই শ্রেণীর আদিম মানুষ বাস করে। একটিকে বলে হাক্কা। ইহারা চীনের অভ্যন্তরভাগস্থ কোয়াংটাঙ প্রদেশের উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। পেপাহুয়ন বা বশীভূত বুনো এবং চীম হুয়ন বা বন্য বর্ব্বর এই দুই শ্রেণীর আদিবাসীর মধ্যে প্রথমোক্তেরা চীনা রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছে, শেষোক্তেরা পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের সহিত মালয়-বাসীদের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই আদিম অধিবাসীরা ফিলিপাইন ও ওলন্দাজ অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেসিয়ট অর্থাৎ বৈপিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের গায়ের চামড়া বাদামী রঙের ও মাথা লম্বা। তাহাদের সহিত ইন্দোনেশীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে নরমুণ্ডশিকার প্রচলিত আছে এবং ইহা তাহাদের সামাজিক মান নির্ণায়ক। বিবাহের সময় এই নৃশংস কার্য্যকে পাত্রের গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখানকার লোকেরা উল্কি পরে। কপালের মাঝখান দিয়া একটি নীল রেখা নাকের মত অঙ্কিত করে ও নীচের ঠোঁটের মাঝখান হইতে অনুরূপ একটি রেখা থুতনির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাটে। মেয়েরা উপর ও নীচ উভয় ঠোঁটে ও গালে নানারকম উল্কি কাটে এবং তাহাদের কান পর্য্যন্ত একটি নীল রেখা ক্রমসূক্ষ্মায়মান করিয়া আঁকা হয়। তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিলে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ছেলে মেয়ে উভয়েরই উপরের দুই কষের দুইটি কুত্তম দন্ত বা রাজদন্ত তুলিয়া ফেলা হয়। এখানে অবিবাহিত পুরুষরা আলাদা বাড়ীতে থাকে। এই বাড়ী সাধারণতঃ কাঠের খুঁটির উপর নির্ম্মিত হয় এবং তাহাকে 'অবিবাহিতের বাড়ী' বলে। ইহাদের কেহ কেহ লবণকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করে এবং ইহাদের মধ্যে 'পূর্ব্বপুরুষ পূজা'র প্রচলন আছে।

ইহারা যে ক্রমে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। উক্ত বৎসরে এখানে ১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২,০৭৬ জন শিক্ষক ও ৭,৪০,৬৯৩ জন ছাত্র ছিল এবং দুইটি নর্ম্যাল স্কুলে ২২৫ জন শিক্ষক ও ২,৫০৭ জন ছাত্র ছিল। এখানে চারটি কলেজে ২৩৬ জন অধ্যাপক ও ১,৩৮৫ জন ছাত্র এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৪৫ জন ছাত্র ছিল।

বর্ত্তমান অবস্থা : ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর হইতে ফরমোসা জাপানের উপনিবেশ হিসাবে রহিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ফরমোসাকে জাপানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া চীনের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে চীনা জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক জেনারেল চেন য়ী এখানকার গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

ফরমোসায় কুয়োমিনটাং দলই প্রবল। বর্ত্তমানে চিয়াং কাইশেক সদল বলে এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট চীনারা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে, অপর পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার জন্য আমেরিকা চিয়াঙের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছে।

মহিলা-সংবাদ

গত ১৯৫০ সালের কাব্য উপাধি পরীক্ষায় শ্রীমতী আশালতা দত্তচৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "গোপীনাথ মাইতি পদক" লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বাগবাজার চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত কালিপদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্রী।

উদ্বাস্তু-সমস্যা

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু-সমস্যা আবার নূতন করিয়া ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়াছে। এক দিক দিয়া নহে, ইহার বহুগুলি দিক ভাবিতে পারা যায়, এই সমস্যা ক্রমশ: জট পাকাইয়া যাইতেছে। বঙ্গবিভাগের পুরাতন কাসুন্দি না ঘাঁটিয়া আমরা ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের অনিবার্য সমস্যা রূপে ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিব।

প্রাথমিক ভাবে উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রধান দিক আছে। একটি অস্থায়ী সাহায্য, দ্বিতীয় পুনর্বাসন। অর্থাৎ পুনর্বাসনের পূর্বে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী সাহায্যের স্বাভাবিক ভাবেই একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিবির সংস্থাপন করিয়া সাময়িক ভাবে সাহায্যদানের পর তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করানোতেই এই বিরাট সমস্যার সুরাহা করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এই কার্যক্রমই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তাহাদের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করাইতেছেন। বর্তমানে খাদ্য ও উদ্বাস্তু সমস্যার ধাক্কায় এই প্রদেশ খুব বেশী বিব্রত। এই দুই দিকেই সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য দিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে অতি সামান্যই বলিবার আছে। যেটুকু বলিবার তাহা বিভাগীয় কোন-কোন কর্মচারী সম্পর্কে। সরকারী নীতি ও কার্যক্রম ভড়িৎ-গতিতে সম্পন্ন করিতে না পারিলে সমস্ত পরিকল্পনা ও কার্যধারা বিপর্যস্ত হইতে বাধ্য। তাহার ফলে কোথাও কোথাও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সরকারকে দোষের ভাগী হইতে হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার সহিত এই কার্য সমাধা করিতে না পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। শহরে যে সব পুনর্বসতি হইবে, তাহাদের শহরের উপযোগী জীবিকার সংস্থান হওয়া প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পে, সওদাগরী আপিসে, দোকান প্রভৃতি স্থানে যাহারা নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত, তাহাদের শহর কিংবা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস থাকা দরকার। নতুবা অসুবিধার সৃষ্টি ঘটিবে এবং তাহাতে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। অপর দিকে, যে সকল পরিবারের গ্রাম্য পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ করা চলিতে পারে, তাহাদিগকে অনর্থক শহরে ভিড় না করাইয়া গ্রামে বসবাস এবং কৃষি বা কুটীরশিল্পে নিযুক্ত করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। সরকার প্রভৃতি ইউনিয়ন বোর্ড মারফত যেখানে যেখানে সম্ভব—কৃষক, মজুর, বৃত্তিধারী ও কুটীরশিল্পীদের বসবাসের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব ও চাপ এত বেশী যে, শুধু এই প্রদেশের মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বসতি সম্ভব নহে। তাই সরকার পার্শ্ববর্তী রাজ্য-সরকারগুলির সহিত যোগাযোগ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যায় বহু উদ্বাস্তু প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি হয়ত আছে, তাহার উপর উদ্বাস্তুদের বাঙালী-প্রবণতা বিহার ও উড়িষ্যার মাটিতে গিয়া খা খাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিরুদ্ধ প্রচার ত আছেই। এই সব মিলিয়া অঘটন ঘটাইয়াছে অর্থাৎ বহু উদ্বাস্তু পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমানে হাওড়া ষ্টেশনে যে-সব শরণার্থী ভিড় করিয়া আছে, তাহারা সকলেই বাংলার বাহিরের প্রদেশ-প্রত্যাগত। ভারত-সরকার ইহাদের সম্বন্ধে খুব কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেছেন; দায় পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তাঁহারা তাহাদিগকে শহরের বাহিরে কোন স্থানে লইয়া যাইতে চাহিলেও তাহা কেহ শুনিতেছে না, ফলে কিছু অর্থ খয়রাতি বাবদ খরচ হইতেছে। আমরা এই অবস্থার আশু নিরসন কামনা করি। প্রদেশ-কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় এই অবস্থার অবসানকল্পে পশ্চিম বাংলার সহিত সংলগ্ন অন্য রাজ্যের বাঙালী-প্রধান স্থানগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাইয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ও এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবত: আগামী নির্বাচনের তোড়-জোড়ের জন্য সে সব দাবি আপাতত: চাপা পড়িয়া আছে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে যেমন দুর্নীতি ও অনাচার প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, উদ্বাস্তু-ব্যাপারেও তেমনি। প্রথম দুর্নীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে উদ্বাস্তুদের প্রকারভেদে। এমন বহু ব্যক্তি উদ্বাস্তু বলিয়া সরকারী খাতায় নাম লিখাইয়াছে, যাহারা তাহার সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী অংশত: বা মোটেই নহে। এক দল পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে বহুকাল যাবৎ চাকরি বা ব্যবসায়সূত্রে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। বৎসরে এক বার বা দুই বার দেশের বাড়ীতে গিয়াই গ্রামের প্রতি নিজেদের কর্তব্য শেষ করিত। তাহারা প্রায় পশ্চিমবঙ্গবাসী—সরকারী অলিগলির খোঁজখবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকায় সুযোগ লইয়া উদ্বাস্তুদের জন্য

নির্দ্ধারিত যাবতীয় সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অপ্রয়োজনে সুবিধা লাভ করিলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ এই ধরণের বহু ব্যক্তি সুবিধালাভের অপব্যবহার করিয়াছে। সকলেই জানেন যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্ত প্রচুর পরিমাণে ঢেউ-তোলা টিনের প্রয়োজন হইতেছে। উদ্বাস্তু হিসাবে পাওয়া টিন ও অন্তান্ত দ্রব্যাদিও চোরাবাজারে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারটি আরও দুর্নীতিপূর্ণ। পূর্বপাকিস্তান হইতে বহু 'ভদ্রলোক' নারী ও বালকবালিকাদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যে বাস করেন, সমস্তপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন ; অপর দিকে দেশের জমিজমা ও বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার জন্ত বাড়ীতে দুই-এক জন লোক থাকে। অর্থাৎ যাহাকে বলে 'গাছেরও খাওয়া, তলারও কুড়ানো'— তাহাই ঘটিতেছে। এই পর্যায়ে পড়ে সরকারী কর্মচারী, চাকুরিয়া, ব্যবসাদার, ছোটখাটো জমিদার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকে।

অথচ আসলে যাহারা শরণার্থী, সত্যকারের ছিন্নমূল নিঃসম্বল উদ্বাস্তু, তাহারাই আজ সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। অতি সাধারণ স্তরের ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তি ইহারা— সহায় নাই, আশ্রয় নাই, একমাত্র সম্বল সরকারের দয়া ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সহানুভূতি। কিন্তু তাহাও বুঝি 'শিক্ষিত' উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রার কয়েকটি ভুল নীতি ও কিছু মতলববাজ লোকের ধ্বংসাত্মক তথাকথিত রাজনীতির প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ ইহারা হারাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু ইহা তো হইবার কথা নহে। প্রথম যখন ১৯৪৬ সালের হাঙ্গামার ফলে এবং পরেও দলে দলে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র হিন্দু-সমাজ তাহাদের জন্ত অকাতরে হৃদয় ঢালিয়া দান করিয়াছে—জমি দিয়াছে, ঘর দিয়াছে, সেবা করিয়াছে, নিজেদের ভাগ হইতে খাদ্য সরবরাহ করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়াইয়াছে। সেদিনকার সেকথা কখনই ভুলিবার নহে। কিন্তু আজ কেন এত তীব্র ভাবে পূর্ব্ব-পশ্চিম মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে ? মুসলিম লীগ আমলে যে-কোন সরকারী চাকুরিতে মুসলমান অফিসারগণ মুসলিম যুবকদের অধিক সুযোগ দিবার ফলে যেমন শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং মুস-লিম সমাজে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও তেমনি বহু অফিসার দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গীয় হওয়ায় তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবকদের বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন বলিয়া পূর্ব-পশ্চিম মনোভাব উভয় বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, অন্ত কোন কাজে, সরকারী কর্মচারিগণ কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্ত ব্যস্ত হন। ইহার ফলে এই মনোভাব দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সরকারী কার্যে অবস্থানকারী কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় কর্মচারীকে বলিতে শোনা যায়—'সব হারাইয়া আসিয়াছি, আমাদের ক্ষতি কিছু উপায় না করিলে চলিবে কেন ?' বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী পূর্ব-বঙ্গাগত এবং জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্তের মনোভাব অতীব দুঃখজনক।

কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মনের এত পার্থক্য ঘটিল কেন ? সেখানে ত স্বার্থের কোন বিরোধ বাধে নাই। বরং বহু গ্রামে সাদরে বহু উদ্বাস্তুকে বসবাসের জন্ত আহ্বান করিয়া লওয়া হইয়াছে। রোগ অন্তত্র, সাধারণতঃ উদ্বাস্তুদের 'কলোনী' করিয়া বিদেশীর মত বসবাসের ধারা অনেকাংশে দায়ী। বিস্তীর্ণ পতিত জমিতে কলোনী গড়িয়া তোলা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যেখানে গ্রামের মধ্যে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতই একই মাটির সন্তান হইয়া বসবাস সম্ভব, সেখানেও এই মনোবৃত্তি থাকিয়া গিয়াছে। বাংলার বাহিরে অন্তান্ত প্রদেশের 'বাঙালী-টোলা'র স্বাতন্ত্র্যের মত এই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যও বিচ্ছেদ সৃষ্টির সহায়ক। ভুয়া সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক অসাম্য প্রভৃতির ধুয়া তুলিয়া এই যে বিচ্ছেদের প্রাকার গড়িয়া তোলা হইতেছে, ইহা নূতন করিয়া সমস্তাকে মনস্তত্বের দিক দিয়া জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। ইহা ব্যতীত প্রতিবেশীদের সহিত, বাড়ীওয়ালার সহিত, জমি-দারের সহিত তুচ্ছ কারণে বা অকারণে ঝগড়া-বিবাদ এত বেশী বাধিতেছে যে, তাহা সত্যই শোচনীয়। কোথায় সমাধান, না নূতন সঙ্কটসৃষ্টি।

ইহার উপর তথাকথিত বৈপ্লবিক ও বামপন্থী রাজনৈতিক-দের দাপটে উদ্বাস্তু-সমস্তা আরও ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্তা এত বেশী ব্যাপক ও গভীর যে, যে-কোন সরকারকে ইহা লইয়া হিমসিম খাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত সর্ব দিক দিয়া ঘাটতি প্রদেশে ইহার ভার গুরুতর রূপেই পড়িয়াছে। এই সঙ্কটের সুযোগ লইয়া স্বার্থসিদ্ধি-রত রাজনৈতিক নেতারা যে-কোন প্রকারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাইয়া সরকারী ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে সর্বদা সচেষ্ট। বাস্তুহারাদের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্য যে ইহার মধ্যে নিহিত আছে, ইহা একটুকুও সত্য বলিয়া মনে হয় না। আসল উদ্দেশ্য—আগামী নির্বাচনে ভোটের তাস হিসাবে ইহাদের কাজে লাগাইয়া ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। রাণাঘাটে উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক পর পর তিন দিন ট্রেন চলাচল বন্ধ করার মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে বানচাল করিয়া দেওয়া ও এই সুযোগে রেল বন্ধ করিয়া চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া তথাকথিত 'বিপ্লব' ঘটানই ঐ শ্রেণীর নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের সুদৃঢ় ও সুসংহত প্রতিরোধের ফলে উহাদের

এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে, তাহাতে কি বাস্তহারাদের কোন কল্যাণ সাধনের আশা করা সম্ভব? যাহারা নিঃস্ব হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী, মানবতার নামে তাহাদের সমস্ত অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার অগ্রণী, জনসাধারণও সহানুভূতিশীল। পশ্চিমবঙ্গবাসীর একান্ত কামনা—শরণাগত ভাই-বোনেরা তাহাদের দায় ও ভারস্বরূপ না হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহায় ও সম্পদ হইয়া উঠুক। তাহা না হইলে, কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না। তাই এই দুরূহ সমস্যার সমাধানে উদ্বাস্তগণকেও আগাইয়া আসিতে হইবে দুরা নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া। সরকারী ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার পথে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাভাবিক সহানুভূতিকে কাজে লাগাইয়া এই মাটির সন্তান হইয়া যাইতে হইবে। ভিটার মায়া ভোলা যায় না সত্য ; কিন্তু যাহা আর পাইবার নহে, তাহার আশা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও মানুষকে আপন করিয়া লইয়া বাস করিতে হইবে। এই পথেই পূর্ব-পশ্চিমের বিভেদ দূর হইয়া যাইবে।

ষাটের পরে

শ্রীকালিদাস রায়

ষাটের উপরে ক্রমে বয়স বাড়িছে মোর যত
নানা দুঃখ আধি ব্যাধি আর্তি ক্লেশ জুটিতেছে তত।
ইহাদেরো আছে প্রয়োজন,
ইহারাই একে একে ছিঁড়িতেছে মর্ত্যের বাঁধন।
বিধাতার করুণার পাণি
সবের আড়ালে আছে মানি আর নাই আমি মানি।
বুঝিয়াছি ইহাদের সার্থকতা। বিতৃষ্ণা জীবনে
জাগাইতে চলিতেছে ইহাদের চক্রান্ত গোপনে।
ইহারা হরিছে মোর অবাঞ্ছিত আয়ু,
তুলিছে অসহ্য করি এই ধরণীর জলবায়ু।
মৃত্যু-বিভীষিকা মোর হরিতেছে এরা মোরে ঘিরে,
করিতেছে মরণেরে বরণীয় স্পৃহণীয় ধীরে।
বিস্মৃতির অতলে নামিতে
ইহারা সোপান হ'য়ে মধ্যপথে দেয় না থামিতে।
ছিন্ন করে সব পিছুটান,
মরণ আগারে আসে পরিত্রাতা বন্ধুর সমান।

নব আশ্বাস

শ্রীআর্য চক্রবর্তী

কুহেলীমলিন হলুদ চাঁদের হাসি
স্তব্ধ রাত্রি শীতের মন্ত্র জপে
নির্জন পথে সহসা পদধ্বনি
দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃস্বনি।

দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃস্বনি
আধো তন্দ্রার নরম আবেশ ভাঙে
জাগ্রত চোখে শত স্বপ্নের ভিড়
মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়।

মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়
তবু তারি মাঝে নব আশ্বাস জাগে
সোনার সুতায় গাঁথা মুক্তার মালা
কার কথা ভেবে ঘুমে হাসে রাজবালা।

"রামেন্দ্র-রচনাবলী"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

তখন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'প্রজ্ঞার জয়' পড়িলাম। পড়িয়াছি এই পর্য্যন্ত মনে ছিল, ইহার বিষয়বস্তু কি পরবর্ত্তীকালে তাহা চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি নাই। এবারে পুনরায় পাতা উল্টাইতে গিয়া বুঝিলাম, কেন ইহা সেই কিশোর মনেও দাগ কাটিয়াছিল। কঠিন বিষয়, কিন্তু এমন সরল ভাষা, বাচনভঙ্গী এত চমৎকার। কৈশোরের কথক ঠাকুরের কথকতা যেন শুনিতেছি। এ তো প্রবন্ধ নয়, এ যে কথকতা। লেখক পাঠককে যেন সম্মুখে রাখিয়া সকল খুঁটিনাটি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া বলিয়া যাইতেছেন। রামেন্দ্র-রচনা যতই পাঠ করিবেন, এইটি ততই উপলব্ধি হইবে।

রামেন্দ্রবাবু বিদ্যার সাধক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রসুন্দর "একটা মিশন লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়াছেন। 'নবজীবনে'র প্রথম সন্দর্ভ লেখার সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই 'মিশন' বা এই সাধনা তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারার স্বরূপ ছিল, কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে এই জীবনব্যাপী সাধনার কথা বেশ ফুটিয়া উঠে।" রামেন্দ্রসুন্দর অসম্ভবরকম পরিশ্রম করিতে পারিতেন। পাঁচকড়িবাবু বলিয়াছেন, "রামেন্দ্র বিনিদ্র রজনী আগাগোড়াই বেদ ও তন্ত্রের আলোচনায় কাটাইয়া দিতেন। এই উৎকট পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার যকৃৎ রোগ হয় এবং সেই রোগেই তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা পরিষৎ-প্রকাশিত এই রামেন্দ্র-রচনাবলী পাঠে সম্যক্ বুঝা যায়। এযাবৎ পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে; সম্পাদকদ্বয় বলিতেছেন, এখনও যে সব রচনা গ্রথিত হয় নাই তাহা একত্র করিয়া ছাপাইলে আরও এক খণ্ড হইবে। এই পাঁচ খণ্ডেই রয়েল আট পেজী আকারের প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠায় রামেন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রৌঢ়কালে - মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে তিনি যে কত বিষয় চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে তিনি স্বদেশবাসীকে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং লিখিয়াও গিয়াছেন যে, এমন দিন কল্পনা করা মোটেই অসাধ্য নয় যখন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষায় উচ্চতম শিক্ষাও প্রদত্ত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষাকে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ করার অদম্য প্রয়াস তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, কিন্তু বিজ্ঞানের এমন শাখা নাই যে সম্বন্ধে তিনি পরিপক্ক জ্ঞানলাভ করেন নাই, এবং সেই জ্ঞান মাতৃভাষায় পরিবেশন করিয়া তাহা গৌড়জনকে উপহার দেন নাই। আবার সাহিত্য, দর্শনেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বাংলা-সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শন তাঁহার লেখনীর অগ্রে যেন একান্ত নমনীয় হইয়া যাইত। ভাষার রূপ লইয়া তাহা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত তখন মনে হইত, যে বিষয়টিকে এত দিন খুবই কঠিন মনে হইয়াছে, এখন যে তাহা একেবারে জল হইয়া গেল!

রামেন্দ্রসুন্দরকে বাঙালী জাতি এত দিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের কাছে এত 'সুন্দর', তাঁহার সেই সাহিত্য ও রচনা দুষ্প্রাপ্য থাকিয়া সাধারণের নিকট নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছিল। এই সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা পুস্তকাকারে গ্রথিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া 'পিতৃঋণ' পরিশোধে অগ্রসর হন। স্বল্প সময়ে তাঁহারা পাঁচ খণ্ডে রচনাবলী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহার যাঁহার চেষ্টায় ও অর্থে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহারা সকলেই বাঙালী মাত্রের ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে সম্পাদকদ্বয়ের উৎসাহ ও পরিশ্রম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পুস্তকের পাঠ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। যে সব গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, তাহাও যে-যে পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া সংশোধনান্তর মুদ্রিত হইয়াছে। আবার কোন কোন লেখা যেমন 'ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট?'—অনুসন্ধানান্তর সম্পাদকদ্বয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রামেন্দ্রসুন্দরের দুইখানি সুদৃশ্য চিত্রও সন্নিবিষ্ট আছে।

এত কথা বলিয়াও রচনাবলীর সামান্য পরিচয় দেওয়াই এখানে সম্ভব। প্রথম খণ্ডে আছে—প্রকৃতি জিজ্ঞাসা ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। পুস্তকাকারে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ পত্রিকায় এগুলি বাহির হইয়াছিল, ভূমিকায়, সূচীপত্রে বা প্রবন্ধশেষে তাহার নির্দ্দেশ আছে। এইরূপ নির্দ্দেশ পরবর্ত্তী খণ্ডত্রয়েও দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-কথা, চরিত-কথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে—শব্দ-কথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ-কথা। শেষোক্ত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অনুরোধে লিখিত ও বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে পঠিত হয়। চতুর্থ খণ্ডে রহিয়াছে—নানা কথা, জগৎ-কথা, পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি-পঞ্জিকা। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি লইয়া পঞ্চম খণ্ড। পাঠক পুস্তক-গুলির নাম হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানের পরিধি কিরূপ প্রসারিত ছিল তাহার আঁচ করিতে পারিবেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর যে সরল মনোহারী ভাষায় তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কয়জনের রচনার মধ্যে পাই? দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষা-সাহিত্যের আলোচনায় সারল্য এবং প্রাঞ্জলতা একান্ত কাম্য, কেননা লোক-শিক্ষার পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। 'লোক-শিক্ষক' রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী এহেতু শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও পুস্তক-প্রণেতাদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। নূতন অবস্থায় যে সকল সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা-বলী, বিশেষতঃ 'নানা কথা'র প্রবন্ধসমষ্টির মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিবে। রাষ্ট্রপরিচালক ও শিক্ষানায়কদেরও এগুলি পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

রামেন্দ্র-রচনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থাগার, শিক্ষালয় ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রে নিশ্চয়ই স্থান পাইবে। ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে যাহাতে এই সকল গ্রন্থ যথাযথ ভাবে প্রচারিত হয় সে বিষয়েও উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রামেন্দ্র-সাহিত্যের অনুশীলন জাতির জীবনে নব-বলের সঞ্চার করিবে।*

---

* রামেন্দ্র-রচনাবলী (১ম-৫ম খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য যথাক্রমে—৮৲ ৮৲, ১০।০, ১০৲ ও ১০।০।

রাজগৃহ ও নালন্দা—ডক্টর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন। ভারত বিদ্যাবিহার। ২১, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

জৈনধর্ম্ম—ডক্টর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার। ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

রাজগৃহ ও নালন্দার নাম শুনিলেই শিক্ষিতগণের চিত্তে কৌতুক জাগিয়া উঠে। এক দিন এই দুইটি স্থানের গৌরব নানারূপে এই প্রকারেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি ঐ দৃষ্টিতেই ঐ দুই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং বহু দিন সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ দুই স্থান ভ্রমণ করিতে চান তাঁহারাও ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

গুরুদেবের বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থাবলী প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ইউরোপের ন্যায় আমাদের দেশেও সহজ ভাষায় ও অল্পের মধ্যে বিবিধ বিদ্যাকে বাঙালী পাঠকদের নিকটে উপস্থিত করা। বর্ত্তমান পুস্তিকাখানির দ্বারা জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। জৈনধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই। লেখক জর্ম্মানির সুপ্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্ববিদ্ শুব্রিং সাহেবের ছাত্র। ইনি তাঁহার সর্ব্বত্র সুবিদিত "জৈনমত" নামক পুস্তকখানি পাঠ করার সুবিধাও এই পুস্তিকা-রচনায় লাভ করিয়াছেন। পাঠকেরা ইহাতে উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ—শ্রীজবাহরলাল নেহরু। *Glimpses of World History* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। জে. এফ. হোরাবিন অঙ্কিত ৫০ খানি মানচিত্র সম্বলিত। ৯৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২৷০।

এই বিশ্বখ্যাত ইতিহাস-পুস্তকখানির বিষয়বস্তু ও রচনাশিল্প নূতন করিয়া বিচারের অপেক্ষা রাখে না; ভারতের প্রধান মন্ত্রীর লেখা বলিয়া নহে, এক জন ভারতীয়ের লেখা বলিয়া ইহা ভারতেরই গৌরবের বস্তু। মূল পুস্তকের চিঠির আকারে লেখা ভঙ্গী এবং সাহিত্যগুণযুক্ত ইংরেজী এই ইতিহাসগ্রন্থখানিকেও সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এইরূপ একটি বিরাট্ ও বিখ্যাত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। যাহার-তাহার পক্ষে এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। প্রকাশনী ইহাতে হস্তক্ষেপ করাতে শুধু অনুবাদের দিক্ দিয়া নহে, মুদ্রণ ও গঠনের দিক দিয়াও ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অক্টোবর ১৯৩০ হইতে আগষ্ট ১৯৩৩-এর মধ্যে কারাগারে বসিয়া জবাহরলাল কন্যা ইন্দিরাকে পত্রগুলি লেখেন। উপকরণের অভাবে স্বতঃই তাঁহাকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, ফলে ইতিহাসখানি সর্ব্বত্র সমান সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে তিনি সংস্কারের দ্বারা অনেক অপূর্ণতা দূর করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান বাংলা সংস্করণে আমরা লেখকের শেষ সংশোধিত পাঠই পাইতেছি।

বইখানি বাঙালীর স্থায়ী উপকারে আসিবে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এরূপ দুরূহ একাধিক কাজে হাত দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। শুধু একটি বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলি। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে স্বভাবতঃই অনেক হাতের সহযোগিতা আছে, কিন্তু সামঞ্জস্যবিধায়ক দৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে। ফলে "সাথে" ও "সঙ্গে"র ক্লেশদায়ক সংমিশ্রণ লক্ষিত হইল। ভাল কাজে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মগের মুলুক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য তিন টাকা।

ছোট গল্পের বই নাকি বাজারে তেমন কাটে না—অথচ ছোট গল্প নহিলেও মাসিক পত্রিকার অঙ্গহানি হয়। কথাসাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখে ছোট গল্প। জাতির প্রাণশক্তি সভ্যতা সংস্কৃতি সবকিছুকেই প্রকাশ করার মূলে ইহার কৃতিত্ব অনেকখানি। বাংলা-সাহিত্যের এই দিকটই সবচেয়ে উজ্জ্বল—অন্ততঃ বিশ্বসাহিত্যের পাশে অকুণ্ঠ সাহসে সে দাঁড়াইতে

ঢোল এণ্ড

পারে। এই ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের দানও উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের আসরে তিনি যে সব চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করেন সেগুলির মধ্যে অপরিচয়ের দুরত্ব নাই, তাহারা অসাধারণও নহে। নিত্য চোখে দেখা মানুষ, প্রতিমুহূর্ত্তে সংঘটিত সব ঘটনা অথচ তাহাদের বিশেষ করিয়া জানিবার বা কার্য্যকারণের সম্পর্ক লইয়া ভাবিবার অবসর অল্প লোকেরই আছে। শিল্পীর তুলিকায় তাহাদের অকপট অভিব্যক্তি বিস্ময়কেই শুধু বাড়াইয়া তোলে না, অতি আপনার জনকে হাটের ভিড় হইতে তুলিয়া ঘরের মাঝখানে বসাইয়া আনন্দ উপভোগ করায়।

কিন্তু শুধু পরিচিত মানুষই নহে, অপরিচিতেরাও মাঝে মাঝে গল্পের মাঝে উঁকি মারে—তাহাদের আচার প্রথা নিয়ম নীতি আমাদের বিস্ময়-বর্দ্ধন করে। যদিও ঐ আচার-নিয়মগুলিও একান্ত বাহিরের বস্তু। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ যে মন এবং সব চেয়ে বড় রহস্য সেই মনের লীলা-প্রবাহ তাহা জাতিধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিখিলের মানব-সত্তাকে প্রকাশ করে অপরূপ মহিমায়। এই মহিমাই 'মগের মুলুক' গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। পঙ্কমার পরিবর্তন, আগুনে পুড়িয়া সোনা খাঁটি হওয়ার উপমাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটি অপূর্ব্ব চিত্র পাই 'গঙ্গাযাত্রা' গল্পে। বাংলা-বিভাগের অভিশাপ উদ্বাস্তু-জীবনে এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহার তুলনা অন্যত্র প্রায় মেলে না। মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় এবং যুদ্ধোত্তর জগতে সদবৃত্তির বিনাশ কি দ্রুত ও মর্ম্মান্তিক ভাবেই ঘটিতেছে 'গঙ্গাযাত্রা' গল্পে তাহা সুচিত্রিত হইয়াছে। 'গার্ড সাহেব' গল্পটিতেও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ-চিত্ত এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দের মাঝে সহসা নিজেকে আবিষ্কার করিয়া—ক্ষুদ্রকালে নহে অনন্তকালের নবজীবনে যেন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গল্পের পরিবেশটিও চমৎকার। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যেও পল্লীর সুর ও ছন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, পল্লীর আচার রীতি, কথোপকথনের ভঙ্গি, প্রবাদবাক্য বা উপমার ঘটা সুপ্রযুক্ত হইয়া পল্লী-পরিবেশ ও মানুষগুলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

ইঙ্গিত—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি-৫৮, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

বর্ত্তমানকালের রাজনীতির পটভূমিকায় রাষ্ট্রনায়কদের চিত্র উপন্যাসখানিতে পাওয়া যায়।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী অর্থশালী ব্যক্তি—সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করার কলাকৌশল তিনি ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি-কৌশলে পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকেরা তাঁহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরূপে কিনিয়া লওয়াও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হয় না।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত বুঝিতে পারে সমাজ বা অর্থনীতির মূল গলদটি কোথায় বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের সুর এবং সে দ্বন্দ্বে শ্রীমন্তের ভাগ্যের গতি কোন্ পথ ধরিয়াছে তাহা অবশ্য লেখক বলিয়াছেন—কিন্তু 'ইঙ্গিতে'র প্রতিপাদ্য তাহা নহে। নেতায় নেতায় আত্মঘাতী কলহ, ক্ষমতালাভের মত্ততা, দ্বৈতনীতির প্রয়োগ জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও পঙ্কিল করিয়া তোলে—ইঙ্গিতের মূল উপজীব্য এইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাঁহার

বক্তব্য ভালভাবেই গুছাইয়া বলিয়াছেন। উপন্যাসখানি পড়িয়া মনে হয় না শুধু কল্পনার জগতেই বিচরণ করিতেছি।

আজিকার দিনে যে তিক্ত সত্য মানুষকে প্রায় নৈরাশ্যবাদী করিয়া তুলিয়াছে—'ইঙ্গিত' তাহারই মর্ম্মার্থ বহন করিয়া পাঠকমনে কৌতূহল সঞ্চার করে। গল্পের মধ্যে কিছু রোমাণ্টিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইহার সব কয়টি চরিত্রই বাস্তবানুগ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নিশান নাও—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "কুটীরের গান" লিখিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন। তাঁহার কবিতায় বৈশিষ্ট্য আছে। "নিশান নাও" তেইশটি কবিতার সমষ্টি। অতিকায় না হইলেও এই অবৃহৎ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সকল কবিতাই কবিত্বে উজ্জ্বল এবং দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল। যে যুগ এক দিন তরুণের মনে উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল ইহার অধিকাংশ কবিতা সেই যুগে রচিত। যুগ হয়ত বিগত, তাহার আবেগ কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। সেই উদ্দীপনাময় অপূর্ব্ব দিনের সুরের রেশ রচনার মধ্যে পাওয়া যায়:

> "মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!
> মৃত্যু পণ! জীবন পণ!
> হয় বিজয়! নয় মরণ!
> জয় গাহ আজি দেশমাতার!
> জয় গাহ আজি স্বাধীনতার!"

অত্যাচারক্লিষ্ট জনগণের ব্যথিত আহ্বান বাজিয়াছে:

> "তাই আজি নিপীড়িত মানবাত্মা ডাকিছে তোমায়,
> হে সারথি, আনো রথ, আনো শঙ্খ, আনো সুদর্শন!"

প্রশ্ন জাগিয়াছে:

> "কে এসেছ তরুণ পথিক, দুঃখসাগর কূলে?"

উত্তর আসিয়াছে:

> "প্রলয় রাত্রি এসেছে আজ।
> মৃত্যু-শ্মশানে প্রাণসাধনার প্রাণের পূজারী এস হে বীর,
> শৌর্য্যে-বীর্য্যে মুছে দাও গ্লানি, কালি কলঙ্ক শতাব্দীর!"

সকলকে ডাক দিয়া ধ্বনি উঠিয়াছে:

> "আজি বন্যায় সব ভেসে যায় পুঞ্জিত জঞ্জাল,
> চূর্ণিত হ'ল মিথ্যা শিকল—প্রাণহীন কঙ্কাল।"

ভুবন ভরিয়া সাড়া পড়িয়াছে:

> "বেজেছে পাঞ্চজন্য!
> বুকে বুকে জাগে পঞ্জরভাঙা মহা-উন্মাদ দোল,
> শুধুই অস্থি, শুধু কঙ্কাল, শুধু গর্জ্জন-রোল!"

সেই শৌর্য্য কোথায়, সেই হিন্দু কই, কোথা গেল সেই বীর জাতি, বলিয়া কবি দুঃখ করিয়াছেন:

> "বিদেশের বীরনারী চলে একা হিমানীর দেশে।
> আমাদের পুরুষেরা শাস্ত্র-হাতে অন্ধকার ঘেঁসে
> দাঁড়ায়েছে সন্তর্পণে।"

অতএব:

> "এস ধূর্জ্জটি মেঘজটাজুট উড়ায়ে
> উন্মাদ বেগে ক্ষুদ্র বিশ্ব গুঁড়ায়ে,
> বহ্নি-নয়নে এস এস শঙ্কর,
> উচ্ছৃঙ্খল কেশজাল মেলি এস প্রলয়ঙ্কর!"

মহাপুরুষের "শেষ যাত্রা"র কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন:

> "তাঁহার ললাটে জ্বলে আত্মার অম্লান জয়টীকা
> সংশয় তিমিরচ্ছেদী নিশান্তের বহ্নিবর্ণে লিখা
> বিশ্বাসের ধ্রুবজ্যোতি শিখা।

'হের দিগন্তে উষার আভাস, রাত্রি শেষ'—এ কথা বলিয়াও সংশয় জাগিয়াছে:

> "অধীনতা-পাশ ছিন্ন হয়েছে, কই স্বরাজ?
> কই নবযুগ, নূতন প্রাণ,
> কণ্ঠে কণ্ঠে প্রভাতী গান?"

যাত্রা শেষ হয় নাই

> "খেয়োনা এখন, ধর আরবার চলার সুর।"

ছন্দের সাবলীলতায়, শব্দের ঝঙ্কারে, প্রাণের আবেগে এবং আন্তরিকতায় কবিতাগুলি কাব্যপ্রিয় পাঠকের চিত্তকে উদ্দীপিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আফগানিস্থানের শিনওয়ারী বিদ্রোহ—শ্রীঅসিতনাথ রায়চৌধুরী। রায়চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫১। মূল্য তিন টাকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষ হইবার কিছু পরেই, ১৯১৯ সনের

সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১

যে মাসে আফগানিস্থানের সহিত ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই আফগানিস্থান প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার পূর্ব্বে এই দেশ নামে মাত্র স্বাধীন এবং ব্রিটিশের অর্থভোগী রাষ্ট্রমাত্র ছিল। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী আমীর 'আফগানিস্থানের রাজা' আখ্যা পাইলেন, দেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল, ডুরাণ্ড রেখা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে নূতন সীমারেখা নির্দ্ধারিত হইল। করাচী বন্দর আফগানিস্থানের শুল্কবিধান বন্দররূপে স্বীকৃত হইল, ডুরাণ্ড রেখার উত্তর পার্শ্বের জাতিসমূহকে (ট্রাইব) স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হইল। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রদূত নিয়োগ বিষয়ে আফগানিস্থান নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইল। কিন্তু ইংরেজ এই সন্ধিসর্ত্তে সুখী হয় নাই। রাজা আমানুল্লা খাঁ তাঁহার দেশে যে নবজাগরণ আনিতে চাহিলেন তাহাতেও ইংরেজ আনন্দিত হইল না। এদিকে আফগানিস্থানের গোঁড়া মুসলমানেরাও আমানুল্লার বিপ্লবী সংস্কার প্রচেষ্টাসমূহকে সুনজরে দেখিল না। সুতরাং তুরস্কে কামাল পাশা যাহা করিতে পারিয়াছিলেন আফগানিস্থানে আমানুল্লা তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না—তাঁহার পতন, রাজ্যত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। গ্রন্থকার সমসাময়িক ঘটনা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিনওয়ারী বিদ্রোহের নেতা বাচ্চা ই সাকোর অভ্যুদয়ের সফলতার বিবরণকে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। লেখকের মতে দস্যু-সর্দ্দার বাচ্চা-ই সাকোকে পরাজিত করিবার শক্তি আমানুল্লার ছিল। কিন্তু দেশবাসীর রক্তপাত এড়াইবার জন্যই তিনি ইহা হইতে বিরত হন। নাদির খাঁ (পরে শাহ) দেশকে দস্যু-সর্দ্দারের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ও ধীরে ধীরে জাতিকে আমানুল্লা-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পথে চালিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আফগানিস্থান ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে এশিয়ার অন্যতম শান্তিরক্ষক। আমানুল্লা, নাদির শাহ ও জাহির শাহ প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে আফগানিস্থান চলিয়াছে বলিয়াই এরূপ সম্ভব হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র বইখানি একাধারে তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ব্রহ্মসূত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বাংলা ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শঙ্কর ও রামানুজ কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ক্রমশঃ মূলসূত্র, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্যানুসারী বাংলা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে উভয় মতের মর্ম্মার্থ বিবৃত হওয়ায় বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশার্থীদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের শাস্ত্রনিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্য পরিস্ফুট। বাংলা ভাষায় পরিমিত স্বল্পসংখ্যক দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

মন তোর—শ্রীরাখালদাস সোম। ডি. এম্. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকারের 'বুদ্বুদ' এবং 'ব্যালান্স শীট' ইতিপূর্ব্বে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাঁহার কল্পনা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বইখানি ট্রাইক, কষ্টিপাথর, বজ্র শ্রীকল, রাবণ ও মন্ত্র —এই ছয়টি গল্পের সমষ্টি। গল্পই বলি, কেননা সাধারণ গল্পের মত
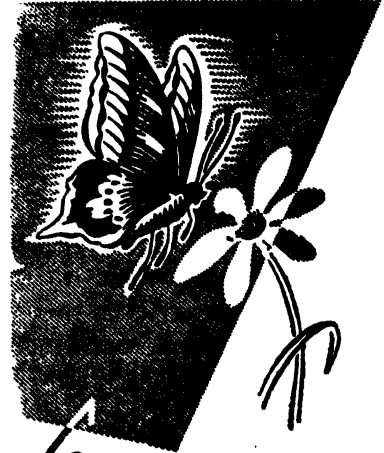
উপার্জ্জনের ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের সুযোগ আজ আছে, কাল নাও থাকিতে পারে। তখন আপনার অনুতাপ হইবে যে, সময় থাকিতে আপনার নিজের ও প্রিয়জনের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল। হিন্দুস্থানের বীমা-পত্র এই সঞ্চয়ের সহায়ক। আজই ভাবিয়া দেখুন।

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

না হইলেও এগুলিতে গল্পের রস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অথবা, বলিতে পারি, জীবনের কয়েকটি খণ্ড চিত্র। ঘটনাংশ সামান্য, কিন্তু কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া জীবনের রূপ ও মনের রহস্য চিত্তাকর্ষক হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পরিচয়ে' লেখক বলিয়াছেন: "তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, শর্মিষ্ঠা, শকুন্তলা—এদের সবাইকে নিয়েই আমার মন। সেই মানসসরোবরে স্নানার্থী—তুমি, আমি, সবাই।" বিভিন্ন লোকের মনের কথাকে লেখক বাহিরে টানিয়া আনিতে পারিয়াছেন, ইহা কম কথা নয়। প্রথম গল্প 'ষ্ট্রাইকে' ছাত্রধর্মঘট উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি কচিমন এবং শিক্ষক-হৃদয়ের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা যেমন উপভোগ্য, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। স্থানে স্থানে রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে তিনি ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গরসিকতা কাহাকেও আঘাত করিবার জন্য নহে, জাতিকে সচেতন করিবার নিমিত্ত। প্রসঙ্গক্রমে দেশবিদেশের সমাজ এবং রাজনীতি বিষয়ে তিনি একটু আধটু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অযৌক্তিক নয়।

বিধুর বিভব কাব্য—শ্রীপঞ্চানন কবিরত্ন। শৈলশ্রী—১১, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। ২য় সংস্করণ। দাম তিন টাকা।

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্য। রচনারীতি প্রাচীন। এ যুগে পৌরাণিক কাব্য বিরল। যাঁহারা স্বাদ বদলাইতে চাহেন, তাঁহারা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাশুপত (নাটক)—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৭, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

মহাভারতের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'পাশুপত' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাটক যদি লোক-শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে 'পাশুপত' নাটকখানি নিঃসন্দেহে তাহার সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছে। বর্ত্তমানের সজ্যাত-ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, 'পাশুপত' পৌরাণিক নাটকে অনুরূপ ছায়াপাত লোকমনকে সচেতন করিয়া তুলিবে। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, "নাটকখানিতে নাট্য-মুহূর্ত্ত সৃষ্টির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ভাষা শুধু সহজ ও সাবলীলই নয়—গতিবেগেরও অধিকারী।"

রিফিউজী (নাটক)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভৌমিক। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের ছিন্নমূল নরনারীর দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সামাজিক নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যে অবস্থার মধ্যে বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে যে জীবনাবেগের প্রেরণায় নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী নূতনভাবে বসতিস্থাপন ও আত্ম-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছেন তাহারই একটি খণ্ড-চিত্র এই নাটকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লেখকের আন্তরিকতা আছে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে শুধু আন্তরিকতাই একমাত্র মূলধন নয়।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

বাংলা-সাহিত্যে গবেষণার জন্য পুরস্কার

১। পরলোকগত অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-কার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি সঞ্চিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই তহবিলের আয় হইতে প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, গত শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের সম্বন্ধে লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধারে উৎসাহ দিবার জন্য পরিষৎ এক শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ টাকা পরিষদ্‌কেই দান করিয়াছেন।

২। মনোবিদ্যা ও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য "জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি তহবিল" হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, সাইকো-অ্যানালিটিকাল সোসাইটির সভাপতি প্রখ্যাত মনোবিৎ ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুকে ছয় শত টাকার একটি বৃত্তি দিয়াছেন। পরিভাষাগুলি অচিরে মুদ্রিত হইবে।

৩। দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকস-এর শ্রীযুক্ত বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ" সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 'লীলা বাংলা রচনা পুরস্কার' (১৯৫১) লাভ করিয়াছেন।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও যক্ষ্মা হাসপাতাল

স্বনামধন্য কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি মহাশয় কর্তৃক ১৩২৩ সালে উপরোক্ত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী ইহার নিজস্ব গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৪ সালে কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। ইহার পর ডাঃ জে. এন. মৈত্র প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত যক্ষ্মা হাসপাতালের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ২৫,০০০৲ সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র ও বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাতিপুকুরে যক্ষ্মা হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ৪৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহার গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ইহা কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বার্ষিক ২৫০০০৲ সাহায্য পায়। যক্ষ্মা হাসপাতালে বর্ত্তমানে ৫০টি 'বেড' বা রোগী-শয্যা আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্ত্য উভয় পদ্ধতিতে এখানে রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে যক্ষ্মারোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ রোগী ভর্ত্তি করা সম্ভব হইতেছে না। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মজুমদারের বদান্যতায় উক্ত হাসপাতালের সংলগ্ন একটি ত্রিতল গৃহনির্ম্মাণ সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানে ত্রিশটি বেড-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বাড়্‌তি রোগীদের রাখিবার ব্যয়-সঙ্কুলানের কোনরূপ উপায় এখনও হয় নাই। যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এজন্য জাতীয় সরকার, রাজ্য-সরকার এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্যদান করিলে তাহা যে প্রকৃত স্বদেশসেবা হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রত্যেকেরই ইহাতে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা

কর্ত্তব্য। অরবাবুর পুত্রের নামে ত্রিতল গৃহের নাম দেওয়া হইয়াছে 'দেবব্রত হাসপাতাল ভবন'। পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই নবেম্বর ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বাঁকুড়া জেলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আইন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছাড়াও তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বগ্রামের বহু যুবককে নিজ গৃহে স্থান দিয়া বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরমহংসদেবের পরম ভক্ত, দার্শনিক মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে অগ্রহায়ণ ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মনোহরপুকুর রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মপ্রবণতা তাঁহাকে বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং তৎকালে তিনি "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কবি কায়কোবাদ

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের সমসাময়িক কবি কায়কোবাদ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালী মুসলমান কবি কায়কোবাদ রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন।

"মহাশ্মশান", "অশ্রুমালা", "শিবমন্দির" তাঁহার কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বইগুলির নামকরণ হইতে তাঁহার ভাবধারা ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতায় একজন মুসলমান ব্যাখ্যাকার বলেন, "তিনি মুসলমান হয়েও সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি আলাওলের মত এদেশের মাটির সহিত নিবিড় ভাবে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, এদের আদর্শ গ্রহণ করে এদের ভাবে ভরে, এদেশের উপমা দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন।"

"মহাশ্মশান" কাব্য কারবালার হাসান হোসেনের হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত। একদা "বিষাদ-সিন্ধু" দুঃখের বন্যা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কায়কোবাদের "মহাশ্মশান" কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কায়কোবাদের অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা এই কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকযাত্রার একাংশ
(বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বানপ্রস্থ

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
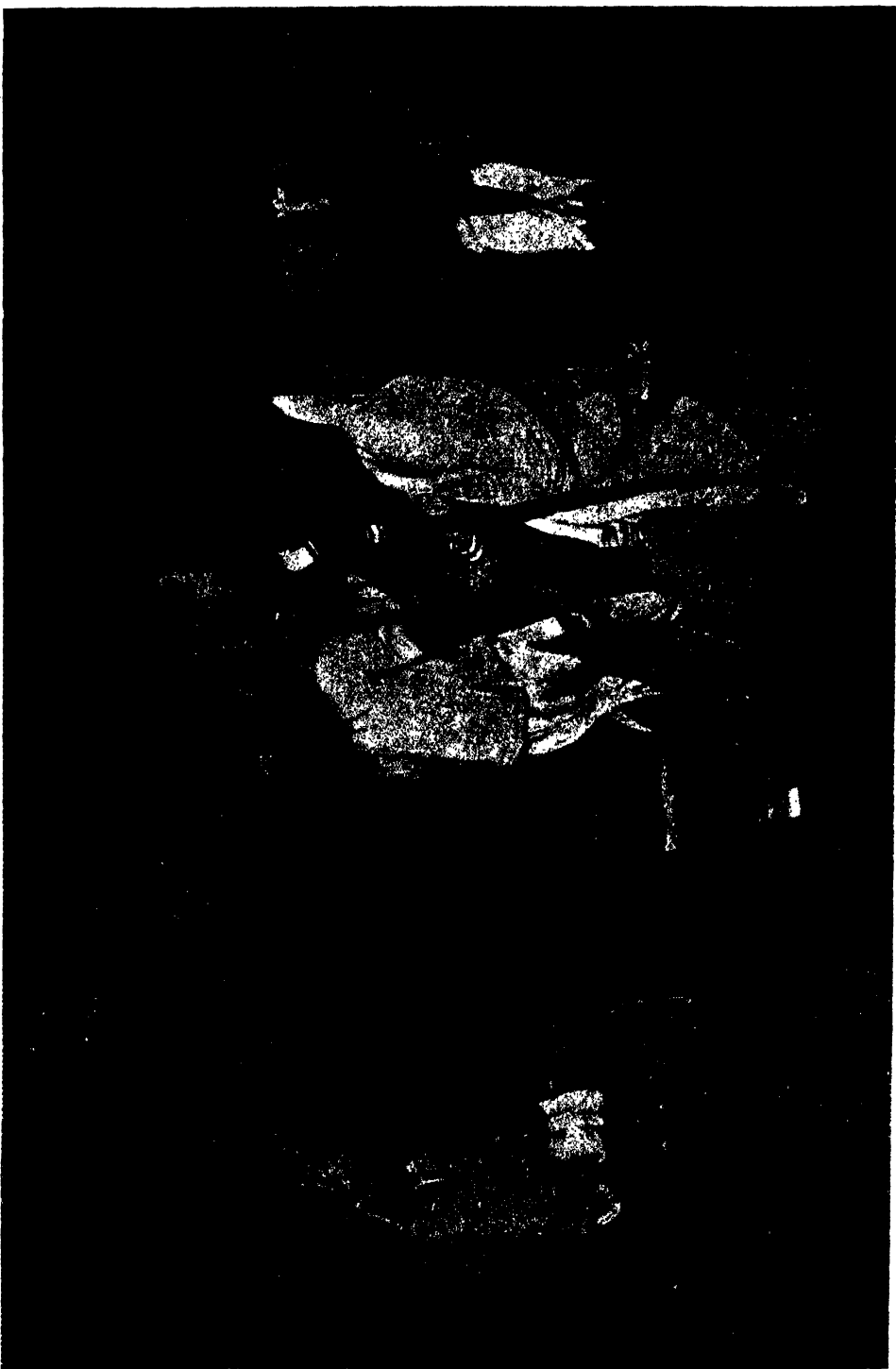
প্রসাধন [শ্রীবিপ্র মহান্তি

রাজপুতানী [শ্রীহৈমন্তী সেন

শরশয্যা [শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় নির্ব্বাচনী অভিযান

বাংলায় এখন নির্ব্বাচনের ধুম পড়িয়াছে। বিভিন্ন দল সকল ক্ষেত্রে ও সকল জেলায় ভোট-সমরাঙ্গনে নামিয়াছেন। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-কোলাহলে ব্যস্ত। কংগ্রেসের ভাগ্যবিপর্য্যয় যাহা হইতে পারিত তাহা অনেকটা ঐ কারণে কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি লোকমত কোন্ দিকে যাইবে তাহার কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। গুজব নানাপ্রকার শোনা যায়, তাহার সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের উপায় নাই, নির্ব্বাচনের ফলাফল বাহির হইলে তাহা বুঝা যাইবে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে অন্য প্রদেশে তথাকথিত বামপন্থী এবং প্রকৃত বামপন্থী দলের ঝগড়া-বিবাদের ফলে কংগ্রেসের আশা যেরূপে বাড়িয়াছে, বাংলায়ও তাহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে।

ফলাফল যাহাই হউক, নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মতবাদ প্রচার যেভাবে চলিতেছে এবং যে দৃষ্টিকোণ দিয়া নির্ব্বাচনের বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় এই নির্ব্বাচনে বাংলার ভবিষ্যতের অন্ধকার কিছুমাত্র কাটিবে না, বরঞ্চ গাঢ়তর হইতে পারে। যেখানে প্রশ্ন কেবলমাত্র দলগত স্বার্থের বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সেখানে দেশবাসীর মঙ্গলের কথা স্থান পাইতে পারে না, ইহা বিগত পাঁচ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল এক দিকে যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতা এবং অন্য দিকে সাহস ও সততার পরিমাপে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা। যোগ্যতার বিচারে অতীতের ত্যাগ ও নির্য্যাতন ভোগ বা আন্দোলন-পরিচালন-ক্ষমতা একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা সর্ব্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। কেননা এই নির্ব্বাচন পেন্সন ভোগের জন্য বা পুরস্কার বিতরণের জন্য নহে, ইহা দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা নির্দ্ধারণেরই ব্যাপার। অতীতে যিনি ভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও ক্রিয়াশীল ছিলেন, তিনি যে সকল ক্ষেত্রেই বর্ত্তমানের ভার গ্রহণে সক্ষম একথা কি করিয়া বলা যায়?

কংগ্রেস এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কেননা দলের আনুগত্য বা অর্থ-সামর্থ্য ভিন্ন অন্য কোনও যোগ্যতার পরিমাপ কংগ্রেসের অধিকারী-বর্গ গ্রহণ করেন নাই। যোগ্যতা ও সততার কষ্টি-পাথরে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থিগণের অধিকাংশই মেকি বা বিষম খাদ-যুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবেন।

দুঃখের বিষয়, বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ স্থলে ঐ একই পরিমাপ স্বীকৃত হইয়াছে। কয়েকজন যোগ্য লোক এবং তাঁহাদের দল গঠনে বহুসংখ্যক অযোগ্য বা সামান্য যোগ্যতাযুক্ত লোক লইয়াই বিভিন্ন দল নামিয়াছেন। এইরূপ পন্থার ফলাফল শুধু যে অনিশ্চিত তাহা নহে, ইহা জন-কল্যাণের পরিপন্থী। যোগ্যতার বিচারেও টিকিটের মূল্যই জোর করিয়া তুলিয়া ধরা হইতেছে, ব্যক্তিগত গুণাগুণের কোনও প্রশ্নই আসিতেছে না।

কংগ্রেসের ভাগ্যে যদি ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটে তবে পূর্ব্বভাবে রাষ্ট্র-চালনায় তাঁহাদের মনোনীত ধুরন্ধরবর্গ প্রতি পদে, স্বার্থের তাড়নায়, প্রতিবন্ধকের সৃষ্টিই করিবেন। কেননা যেখানে যোগ্যতার অভাব সেখানে স্বার্থই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়—ইহা আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি। বাংলার বিগত পাঁচ বৎসরের রাষ্ট্র-চালনায়ও ঐ একই অভিজ্ঞতা আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অযোগ্য দল অযোগ্য মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবে এবং অযোগ্য মন্ত্রী প্রতিদিন দেশের অমঙ্গল সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলও ত সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন মনে হয় না যাহাতে দেশের ও দশের স্বার্থ বজায় থাকে। ভাঙন দিয়া গঠনের কাজ হয় না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাচনেই প্রত্যেক দলসমষ্টিতে গঠন অপেক্ষা ভাঙনের কাজই অধিক চলিতেছে।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অভিভাষণ

বর্ত্তমান জগতে সমাজ তথা জাতির কল্যাণের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পেষিত করিবার যে এক দুর্ব্বার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, ভারতের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ও মণিরাহ ভারতের রাষ্ট্রদূত ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে তাহার সমালোচনা করেন। জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিয়া তিনি বলেন যে, ব্যক্তিই সকল সৃষ্টির মূল উৎস। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে, দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, কারিগর ও পূর্ত্তবিদের প্রয়োজন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ইহাদের সহযোগিতা ভিন্ন জাতি অগ্রসর হইতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেশেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাফল্য ও কর্ম্মকুশলতার পরীক্ষা হইবে দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পগত উৎকর্ষের দ্বারা। অসংখ্য নিরাশ্রিত ক্ষুধিত জনতার কত জনের অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান সরকার করিয়াছেন, খাদ্যোৎপাদন, কর্ম্মাভাব, জনসংখ্যাধিক্য এবং দরিদ্রতার তাঁহারা কতটা প্রতিকার করিয়াছেন—ইহাই আজ জিজ্ঞাস্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারের সার্থকতা নির্ণীত হইবে। ইহাই বিচারের চরম তুলাদণ্ড। কারণ বুভুক্ষু-জনসাধারণকে লইয়া কোন মহান্ জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দেশের নানারূপ অভাব অনটনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা অবিরাম খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কথা, ভূমি সংস্কারের কথা শুনিয়া আসিতেছি তথাপি প্রতি বৎসরই আমাদের সত্তর লক্ষ টন খাদ্য-শস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। প্রশ্ন এই, ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা-বজ্রপাতের ঘনঘটা কি কেবলমাত্র সত্যযুক্ত দেশের আকাশকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে? যুদ্ধের দাবানলে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি কি ভাবে তাহাদের পূর্ব্বেকার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগৎ এক বিপ্লবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। কেবল অসন্তোষ নহে, সর্ব্বত্র আক্রোশ ও বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র ইহা পরিব্যাপ্ত। দেশের নেতৃবৃন্দকে দেশের ও বিশ্বের এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং ইহা সমাধানের জন্য তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এই কলেজ প্রতি বৎসর বহু সংখ্যায় পূর্ত্তবিদ ও কারিগর সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল কর্ম্মী দ্বারাই দেশের নানাবিধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে। ইহাদের শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি সফল হওয়া অসম্ভব।

তিনি বলেন, এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠার সময় ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইহাকে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত মানবত্বকে বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানবধর্ম্মী কোন বিশেষ ধরণের মানুষ নহে, প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বীয় ক্ষেত্রে মানবধর্ম্মী। মানুষের শিক্ষা বা তাহার ব্যবহারিক বৃত্তি এই মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। মানুষ যে কোন কাজে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মানবধর্ম্ম কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মানুষ হইতে, মানুষের বৃত্তি হইতে মানুষের মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করা, অর্থাৎ মানবতার সৃষ্টি করাই বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষার আদর্শ। এই মনুষ্যত্বকে বিকাশ করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। কারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সম্ভব নহে। ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়া সমষ্টির কোন উন্নতি কল্পনা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে শিক্ষা, যে পরিকল্পনা মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করিয়া সমাজের প্রগতি কামনা করে, সেই পরিকল্পনাকে সন্তোষজনক বলা চলে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, প্রগতিশীল দেশগুলিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই তবে তাঁহাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রমাণিত হইবে। অন্য দেশ আমাদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু সে দেশ ত এদেশের জাতীয় আদর্শের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আমাদের সংস্কার, আমাদের কৃষ্টি হইতেই আমাদের জাতীয় আদর্শকে উদ্ভূত করিতে হইবে।

এই আদর্শ কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকাই ভারতীয় জীবনাদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক। পতাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত চক্র জীবনের অগ্রগতির প্রতীক। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং এই পরিবর্ত্তনই প্রগতির নিদর্শন। মানুষকে এই গতিবেগের সহিত সম পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। পতাকার চক্রটি শ্বেত-পটভূমিকার উপর অবস্থিত। শ্বেত অনন্ত কালের প্রতীক। অনন্তের পটভূমিকায় সংসার চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাকে ভুলিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে জীবনের এখানেই সমাপ্তি নয়, জীবন অনন্ত কালের। পতাকার গৈরিক অংশ ত্যাগ ও সংযমের

নির্দ্দেশ। ত্যাগ ও সংযম দ্বারা লোভকে জয় করিয়া জীবনকে সুশৃঙ্খল করিতে হইবে। হরিদ্রাংশ সমৃদ্ধির প্রতীক। এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধিতে, প্রাচুর্য্যে আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় পতাকার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ।

খাদ্য

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার অভিভাষণে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরা বহুবার বহুভাবে ফসল বৃদ্ধি ও ভূমি-সংস্কারের কথা শুনিতেছি, তথাপি প্রতি বৎসরই সত্তর লক্ষ টন খাদ্য-শস্য আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।"

এই প্রশ্নটি এমন একটি স্থান হইতে করা হইয়াছে যাহা রাজনৈতিক দলাদলির বহু উর্দ্ধে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে।

গত চারি বৎসরে বাংলার খাদ্যাবস্থা এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সমস্ত বিষয়টির আনুপূর্ব্বিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতিকে এক মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। কেবলমাত্র মৌখিক আক্ষেপ করিয়া বা সরকারের ত্রুটিবহুল খাদ্য-ব্যবস্থাকে দোষারোপ করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিলে আজ আর চলিবে না। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আজ দেশের কেন এ অবস্থা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় স্থির করিতে হইবে। কারণ এ সমস্যা কোন শ্রেণী বা দল বিশেষের নহে, ইহা আজ সমগ্র দেশবাসী প্রত্যেকের। নানা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার কথা শুনিয়াও কেন যে আমাদের খাদ্য আমদানী করিতে হয় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এবং যাহারা ইহার জন্য দায়ী তাহাদের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যুদ্ধের মধ্য হইতেই আমাদের খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং ভারত বিভাগের পর হইতে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরের দয়া ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। সরকারী মহলের অভিমত এই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করিতে পারি না এবং যতটুকুও আমরা উৎপন্ন করিতে পারি তাহাও প্রকৃতির বিমুখতায় ব্যাহত হইতেছে, ফলে আমাদের খাদ্যের জন্য বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। আর এই খাদ্য ঘাটতির জন্যই আমাদের কাপড়ের অভাবও ঘুচিতেছে না। খাদ্য ডলার অঞ্চল হইতেই বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ডলারের সঞ্চয় কম, সুতরাং ডলার উপার্জ্জন করিতে আমাদের কাপড় রপ্তানী করিতে হয়।

দেখা যাইতেছে, খাদ্য সমস্যা আমাদের অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদই এই খাদ্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া আছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা।

আমাদের দেশে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইবার উপায় কম আছে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ জমি বর্ত্তমানে চাষ হইতেছে তাহাকেই আরও ভাল ভাবে চাষ করা দরকার। অর্থাৎ, এই জমিতে ভাল সার, বীজ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া যদি উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দ্বারা চাষ করা হয় তবে ফসল বাড়ানো যাইতে পারে। এজন্য যে সকল জমিতে জলাভাব নাই সেখানেই প্রথমে কাজ সুরু করা আবশ্যক। কারণ এসব জমিতে জলের জন্য বড় বড় প্ল্যানের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

এখানে দরকার কিছু ছোট ছোট খাল, পুকুর অথবা কয়েক শত টিউবওয়েল, আর ভাল জাতীয় বীজ ও সার। ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ রহিয়াছে এবং সার ও বীজ বণ্টনের ভার আছে কৃষি বিভাগের উপর। কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর হইতে ক্যানিংয়ের মধ্যে এক লক্ষ বিঘা জমি জলে ডুবিয়া অনাবাদী হইয়া রহিয়াছে। চার বৎসরের মধ্যে একটা খাল কাটিয়া এই জল নিকাশ করা গেল না। এই জমি পরিষ্কার করিয়া সার দিয়া চাষ করিলে এখানে ৩০ লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাইত। বর্দ্ধমান শহরের আদালতের সংলগ্ন খাজুইবিলের মাঠে বিঘা প্রতি ১৮ মণ ধান ফলিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বাকারপুর ডাঙ্গার পর এস্থান হইতে মাটি লওয়ায় উহা জলাকীর্ণ হয় এবং এখানে ৮।৯ বৎসর যাবৎ ফসল ফলে নাই। ইহার ব্যবস্থা সেচ বিভাগ করিতে পারিত। ইহাতে বিশেষ অর্থ বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে।

সার ও বীজের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস। ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের নামে প্রতিটি বৎসর কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে কিন্তু ফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে কোন প্রকার নিয়ম বা পরিকল্পনা আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। পর পর দুই তিন বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচের বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। কখনও গমের বীজেই বেশী ব্যয় হইল, কখনও ডালের বীজ দেওয়া হইল, কখনও বা ট্যাপিওকা চারাই বিলি করা হইল হাজার হাজার টাকার। কখনও পারশিয়ান চাকার গুণগান আরম্ভ হইল, কখনও আবার পাম্পের শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার সুরু হইল। প্রয়োজন অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিতে হয়, যে মাটিতে যে শস্য ভাল উৎপন্ন হয় সেখানে সেই বীজ না দিয়া অন্য বীজ দিলে তাহাতে ফসল উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে? তার পর কখনও বা বীজ আছে, সার নাই। সারের পারমিট মিলিল কিন্তু মাল নাই—বা মাল পাইতে চাষের সময় উত্তীর্ণ হইয়া

গিয়াছে, ভাগ্যক্রমে যদি সারও পাওয়া যায় ত জল নাই—তখন আবার ক্যানেল কর্তৃপক্ষ জল ছাড়িতে নারাজ। এসব কারণে অর্থ বানের জলের মত খরচ হইতেছে, কিন্তু খাতরূপ পরমার্থের সঞ্চয় হইতেছে না।

চাষের জমি বাড়ানো যায় কি না সে সম্বন্ধেও ভাবিবার কথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৪,২৬,০০০ একর। ইহার বেশীর ভাগ জমি অনাবাদী থাকার কারণ জলাভাব ও আগাছা জাতীয় জঙ্গল। জলাভাব উপরোক্ত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে। আগাছা নির্মূল করিবার যন্ত্র ট্রাক্টর। এ সকল জমি যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে চাষের উপযোগী করা যায়। রাণাঘাট অঞ্চলে বহু জমি এই ভাবে পতিত আছে। এই সকল জমিতে কিছু উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন হইয়াছে। তাহারা সেখানে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না ঐ দুই কারণে। নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাক্টর দ্বারা চাষের উপযুক্ত এক চাপে ৩।৪ শত বিঘা জমি অনেক আছে। ই-আই-আর, বি-এন-আর প্রভৃতি রেল লাইনের দুই দিকে গবর্মেণ্টের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। চাষের ব্যবস্থা করিলে উহার ফসলেই দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র খাদ্য উৎপাদন বাড়িলেই আমাদের কুলাইয়া যাইত। লাখখানেক একর এখনই কাজে লাগানো যায় এরূপ জমি পশ্চিমবঙ্গে আছে কিন্তু সরকারের হাতে ট্রাক্টর আছে মাত্র ৩১টি। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত ছিল মাত্র ১০টি, তারও ৫টির লাঙ্গল ছিল না। এই জমিতে উন্নত ধরণের চাষ করিলে ২০ লক্ষ মণ ধান বাড়িত।

ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যয়ের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, কর্ম্মচারী, দারোয়ান, চাপরাশি, তাহাদের ভাতা, যাতায়াত খরচ, আপিসের বাড়ী ইত্যাদিতেই প্রায় বেশীর ভাগ বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে এটা হয়ত ওটা হয় না। খাদ্য বিভাগের এবং কৃষি বিভাগের বাজেটে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কর্ম্মচারীদের বেতন ও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা থাকিলে খরচ বুঝিতে সুবিধা হইত। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচ ঢালা হিসাবে দেখানো হয়। তাহাতে খরচের বিশদ হিসাব পাওয়া যায় না। ফল হইতেছে কি না তাহাও বুঝা যায় না।

বাংলাদেশে প্রতি একরে চাউল সাধারণ জমিতে ১৮ মণ জন্মে। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলিতেছেন, প্রতি একর জমিতে ১৫ মণ উৎপন্ন হয়।

জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পরে ধানচাষ বহু গুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। চীনের উৎপাদন আমাদের আড়াই কি তিন গুণ। ইহারা এত অল্প সময়ে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বন্যার মধ্যে যাহা করিতে পারিতেছে আমরা কেন তাহা পারিতেছি না। দীর্ঘ মেয়াদী জটিল পরিকল্পনার পিছনে যে সময় ও অর্থ অপচয় করিতেছি তাহার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা আন্তরিকতার সহিত আরম্ভ করিয়া দিলে এত দিনে অন্ততঃ বাংলার অন্ন-সমস্যা দূর হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বৃহৎ কোন প্ল্যান সম্পূর্ণ ভাবে করিতে গেলে যথেষ্ট সময় ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের যখন অপেক্ষা করার মত সময় ও ব্যয় করার মত বেশী অর্থ নাই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প খরচের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা উচিত ছিল। গবর্মেণ্ট যদি এতদিন বছরে একটি করিয়া জেলারও উন্নতিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে পাঁচটি জেলাকে অভাব মুক্ত করিতে পারিতেন। আজ নির্ব্বাচনের মুহূর্ত্তে দেশবাসীর কাছে বলিবার কিছু কথা তাঁহাদের থাকিত। চার বৎসরে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা দুঃসাধ্য কথা মানি, কিন্তু প্রতি বৎসর ফসল বৃদ্ধির নামে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা দ্বারা বছরে দুইটি জেলার উন্নতি করাও ত অসাধ্য ছিল না। তাহা হইলে এই চার-পাঁচ বৎসরে বাংলার চেহারা ফিরিয়া যাইত।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

সম্প্রতি ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের একটি পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে পৃথিবীর খাদ্য ব্যবস্থার একটি তথ্যপূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ইহার এক অংশে বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আমরা কয়েকটি বিশেষ দেশের হিসাব এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিনের বরাদ্দ :

দেশ	ক্যালোরি ১৯৪৯-৫০ দৈনিক বরাদ্দ	ক্যালোরি ১৯৪৯-৫০-এর তুলনায় ১৯৫০-৫১ শতকরা পরিবর্ত্তন	প্রোটিন ১৯৪৯-৫০ দৈনিক বরাদ্দ	প্রোটিন ১৯৪৯-৫০-এর তুলনায় ১৯৫০-৫১ শতকরা পরিবর্ত্তন
কানাডা	৩,১৩০	+১.৫	৯৩	+১
আমেরিকা	৩,১৭০	+১.৫	৯১	+১
আরজেণ্টাইনা	৩,১৬৯	—১	১০২'৬	—১
বেলজিয়াম	২,৮৯৫	+১	৮৫	—
ডেনমার্ক	৩,১৬০	+৪	১০২	—২
সুইজারল্যাণ্ড	৩,১৯৫	+৩	৯৮	+৩
চীন	২,০২০	+১০	৬২	+১০
ইন্দোনেশিয়া	১,৮৮০	+৩	৪২	+২
জাপান	২,১০০	+২	৫৩	+২
তুরস্ক	২,৩৪০	+৭	৭৩.৫	+৮
ভারতবর্ষ	১.৭০০	—৬	৪৩	—৫

কেবলমাত্র আরজেন্টাইনা ব্যতীত ইউরো-আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশেই ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যের উন্নতি হইয়াছে। আরজেন্টাইনার অধিবাসীরা মেদ-বহুল হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া তাহাদের কিছু কমানো হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া সকল দেশেই খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে। চীন সমস্ত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভারতের অপেক্ষা শান্ত বলিয়া শোনা যায় না। সেখানেও তাহারা জাতির স্বাস্থ্যকে বিস্মৃত হয় নাই। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের অর্থ যে জাতির মৃত্যু, বিপন্ন হইলেও ইন্দোনেশিয়া তাহা ভাল ভাবেই জানে। ভারতবর্ষে ক্যালোরি কমিয়াছে শতকরা ছয় ভাগ আর প্রোটিন শতকরা পাঁচ ভাগ। আমাদের প্রত্যেকের সপ্তাহে ৩'৫৬ সের খাদ্য দরকার হয়। রেশনের বর্ত্তমান বরাদ্দ সপ্তাহে ২'৬২ সের এবং ইহাতেও খাদ্যপ্রাণ কতটুকু থাকিতেছে তাহাও উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে। ইহাতে জাতির স্বাস্থ্য যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। রেশন-ব্যবস্থার পূর্ব্বেই আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য ও সুচিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে মৃত্যুহার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। রেশন চালু হওয়ার পর তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভোর কমিটির তদন্তে আমাদের স্বাস্থ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানা দরকার।

জীবন-মৃত্যুর তুলনামূলক খতিয়ান

দেশ	মৃত্যুহার	শিশুমৃত্যু	জীবনের আশা	
			পুরুষ	স্ত্রী
নিউজীলাণ্ড	৯'১	৩১	৬৫'০৪	৬৭'৮৮
অষ্ট্রেলিয়া	৯'৪	৩৮	৬৩'৪৮	৬৭'১৪
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১০'১	৩৭	৫৭'৭৮	৬১'৪৮
কানাডা	১০'২	৭৬	৫৯'৩২	৬১'৫৯
আমেরিকা	১১'২	৫৪	৫৯'১২	৬২'৬৭
ব্রিটেন	১২'৪	৫৮	৫৮'৭৫	৬২'৮৮
জাপান	১৭	১০৬	৪৪'৮২	৪৬'৫৪
ভারতবর্ষ	২২'৪	১৬২	২৬'৯১	২৬'৫৬

ভারতে মৃত্যুহার ও বিশেষ করিয়া শিশু ও মেয়েদের মৃত্যু-হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক। প্রসূতিদের অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও শিক্ষিত ধাইয়ের অভাব ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

শিশু (জাতির ভবিষ্যৎ) মৃত্যুর হার

	এক বৎসরের কম বয়স	১-৫ বৎসর	৫-১০ বৎসর
ভারতবর্ষ	২৪'৩	১৮'৬	৫'৫
ব্রিটেন	৬'৮	২'১	১'১

দুধের অভাব ও মাতার স্বাস্থ্যহীনতাই ইহার জন্য দায়ী। আমাদের দেশে শিশুর জন্য দুধ পাওয়া দুষ্কর, যাহাও পাওয়া যায় তাহা দুর্মূল্য ও ভেজালমিশ্রিত।

প্রসূতি-মৃত্যুর সঠিক হিসাব আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ভোর কমিটির মতে মোট প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যা বার্ষিক দুই লক্ষ ও প্রসবজনিত রোগগ্রস্তা জননীর সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ।

সাধারণভাবে রোগের প্রকোপের নমুনা এইরূপ :
(১৯৩২-৪১ এই কয় বৎসরের গড়পড়তা বার্ষিক হিসাব)

রোগ	সংখ্যা
কলেরা—	১,৪৪,৯২৪
বসন্ত—	৬৯,৪৭৪
প্লেগ—	৩০,৯৩২
জ্বর (প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া)—	৩৬,২২,৮৬৯
আমাশয় ও পেটের অসুখ—	২,৬১,৯২৪
যক্ষ্মা—	৪,৭১,৮০২
অন্যান্য—	১৫,৯৯,৪৯০
মোট—	৬২,০৯,৪৩৪

অবশ্য এই মৃত্যুহার সম্পূর্ণ নহে। আমাদের গ্রামবাসীরা মরিলে পরে সংবাদ লিখাইবে এতদূর শিক্ষিত এখনও হয় নাই। প্রকৃত মৃত্যুর হার সঠিক সংগ্রহ করা কঠিন। ভোর কমিটিও করিতে পারেন নাই।

রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু লজ্জাজনক ব্যাপার। ইহার একমাত্র চিকিৎসা কুইনাইন। একজন রোগীর জন্য ৭৫ গ্রেণ কুইনাইন প্রয়োজন ধরিলে মোট কুইনাইন দরকার বৎসরে ষোল লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে বড়জোর দুই লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আমরা পাই। ভারতবর্ষে কালিম্পং এবং নীলগিরিতে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইনাইন প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু কিনাবুরো নামক একটি ডাচ কোম্পানীর স্বার্থে ইংরেজ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে এদেশে কুইনাইনের পর্য্যাপ্ত চাষ হইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হয় তাহা যৎসামান্য এবং কংগ্রেস-সরকার উহার মূল্যও বাড়াইয়াছেন এবং শক্তিও হ্রাস করিয়াছেন। কিনাবুরো কোম্পানী যথেচ্ছ দামে তাহার কুইনাইন বিক্রয় করিতেছে। গ্রীস কেবলমাত্র ডি ডি টি ছড়াইয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইয়াছে। আমাদের দেশে সরকার সেভাবে যদি অন্ততঃ বৎসরে একটি জেলার ম্যালেরিয়াও দূর করিতেন তাহা হইলেও এত দিনে অনেক কাজ হইত। ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত ১০ কোটি লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ মরে বটে, কিন্তু ঐ ব্যাধি বাকী ৯ কোটি ৯০ লক্ষ লোককে জীবন্মৃত করিয়া রাখে। যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি যে কোন রোগের সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা আক্রান্ত হয় এবং মরিয়া যায়। কিন্তু দেশের লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া থাকিলেই তাহাদের শোষণ সহজ ও সম্ভব হয়।

অন্যান্য রোগের অবস্থাও কম ভয়াবহ নহে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে যক্ষা-রোগে মৃত্যুর নিম্নোক্ত হিসাব বাহির হইয়াছিল :

প্রতি এক লক্ষ লোকে মৃত্যুহার

প্যারিস	১৭৭	কানপুর	৪৩২
মেক্সিকো	১৭০	লক্ষ্ণৌ	৪১৯
নিউইয়র্ক	১২৮	মাদ্রাজ	২৯০
বার্লিন	১২০	কলিকাতা	২৩০
লণ্ডন	৯৬	বোম্বাই	১৪০

ডাঃ বেণ্ট্রালিনের মতে বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে যক্ষারোগে মারা যায়। কিন্তু তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা এইরূপ :

যক্ষা হাসপাতাল ও স্যানিটোরিয়াম

	স্যানিটেরিয়াম		যক্ষাহাসপাতাল		অন্ত হাসপাতাল	
	সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড
আসাম	১	২৮	—	—	১০	১৮
বাংলা	২	৫১	৩	৩১৮	২৭	২৪৭
বিহার	১	১৩০	—	—	১০	৯৭
বোম্বাই	৮	৫৯৩	৫	২৩৯	১৫	২০২
মধ্যপ্রদেশ	১	১৫১	—	—	৭	৯১
মাদ্রাজ	৫	৫১৩	১	৬২	১৭	৪০০
উড়িষ্যা	—	—	—	—	৩	১৩
পঞ্জাব	৯	৬৫৪	৩	১৬৩	১৪	৩৪৮
উত্তর প্রদেশ	৫	২৯৫	—	—	৮	১৮৪

স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্যহীনতার কারণ সম্বন্ধে ভোর কমিটি বলিতেছেন, "দেশের অধিকাংশ স্থানেই পরিচ্ছন্নতা খুব কম, জনসাধারণের একটি বড় অংশ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বীর্য্যহীন, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম, শিক্ষার অভাবে দেশের লোকে অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক এবং রোগ সম্বন্ধে উদাসীন।" যে সকল গ্রামে বীজাণুমুক্ত পানীয় জল, ময়লা জল অপসারণের জন্ত পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে তাহাকেই আমরা স্বাস্থ্যকর গ্রাম বলিতে পারি। শতকরা একটি গ্রামেও এই ব্যবস্থা নাই। ডাঃ বিধান রায় পশ্চিম-বাংলার ৭০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৮১টিতে ৮১ সেট ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার নার্স বসাইয়াছেন। কিন্তু এখানে অভাব আছে কেবল ঔষধ এবং পথ্যের।

মফস্বলের মেডিক্যাল স্কুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে। ঔষধ আরও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে। টাইফয়েডের অব্যর্থ ঔষধ ক্লোরোমাইসিন পাকিস্থানে আট টাকায় পাওয়া যায় (শুল্ক শতকরা ৫—৭½ ভাগ), কলিকাতায় উহারই দাম ৩২ টাকা (শুল্ক শতকরা ৪০ ভাগ)। গরীবের পক্ষে এই রোগের চিকিৎসা অসম্ভব। বাংলাদেশে মফস্বলে মেডিক্যাল স্কুল থাকায় গ্রামের লোকের যেটুকু সুবিধা ছিল, সেগুলি তুলিয়া দেওয়ায় আরও অসুবিধা হইয়াছে। একটু কঠিন রোগ হইলেই মফস্বলে চিকিৎসার আর কোন উপায় আজকাল না থাকায় বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। এখানে হাসপাতালে স্থানাভাব, বাহিরে জায়গা পাওয়া কঠিন, ডাক্তারের ফী, মলমূত্র পরীক্ষা, এক্সরে ইত্যাদির ফী অধিক। অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অধিকাংশ চিকিৎসা-যোগ্য রোগে লোক মরিতেছে। সরকারী হাসপাতালের ফ্রি বেডের সংখ্যা শতকরা ৬৬ ভাগ কমানো হইয়াছে। যে যে হাসপাতালে 'এণ্ডাউমেণ্ট' হইতে ফ্রি বেডের ব্যবস্থা—(School of Tropical Medicine, Lake Hospital প্রভৃতি) ছিল তাহা অর্থকরী করা হইয়াছে।

ডিসপেন্সারিতে আউট-ডোর রোগীদের কি ভাবে দেখা হয় তৎসম্বন্ধে ভোর কমিটি বলিতেছেন যে, এক ঘণ্টায় গড়ে ৭৫ জনকে দেখা হয়, অর্থাৎ এক জন রোগী দেখিতে ডাক্তার ৪৮ সেকেণ্ড মাত্র সময় দিতে পারেন। এই তো রোগী দেখার নমুনা। ঔষধের অবস্থাও তদ্রূপ। দুই-তিনটা টক মিকশ্চার ছাড়া বিশেষ কোন ঔষধ ডিসপেন্সারিতে থাকে না।

মাঝে মাঝে বেতার বক্তৃতায় বা ব্যবস্থা পরিষদে পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা দিয়া উহা খাওয়ার পরামর্শ অনেকে দিয়া থাকেন। কিন্তু একথা বুঝেন না যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ভাগ্যবান ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এই বাজারে এক সঙ্গে দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, মাখন সর্ব্ববিধ খাদ্য গ্রহণ করা কত অসম্ভব। খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীন খাদ্যের বহুদিন যাবৎ ব্যবহারই দেশের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ।

দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে সরকারের দরদ কত তাহা যে-কোন বৎসরের "চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বরাদ্দ" বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়ে।

নিম্নে ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে এই বাবদে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :

	১৯৪৯-৫০ বাজেট টাকা		১৯৪৯-৫০ সংশোধিত টাকা		১৯৪৯-৫০ অডিটকরা খরচ টাকা
	লক্ষ	হাজার	লক্ষ	হাজার	
গ্রাম্য ডিসপেন্সারি ও হেলথ ইউনিট	৮০	—	৭১	৪৫	২৩,৫২,৮৬৪
চালু হাসপাতালের উন্নতি	১৫	—	৭	৮২	৫,৫৮,১৬২
কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার হাসপাতাল	৩	—	২	৫০	১৬,১০০
নূতন এম্বুলেন্স সার্ভিস	৬	—	১৩	৬৮	৪৫,৪৫৯

যক্ষা হাসপাতাল	১৩ লক্ষ	—	১১	২১	১,৫১,৪৯৫
নীলরতন সরকার মেডিকেল					
স্কুল	১০	—	৪	৪০	২,৪২,৭২৫
কার্মেল শিক্ষা	২॥	—		৫০	১,১০০
হেল্‌থ এডুকেশন	১				
ন্যাশনাল ইনফারমেরির যক্ষা-রোগীদের					
অন্যত্র সরানো (২০০)	৪	৫০			
আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ	১॥			৫০	৫০,০০০
দাঁতের মেডিকেল কলেজ	৩	১			[illegible]
প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ	২	১			৫৯,২০১
কুষ্ঠ চিকিৎসা	২	২৪	১	৮১	৩০,৯৫০
ম্যালেরিয়া নিবারণ	২				

বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয় কার্য্যক্ষেত্রে তাহার অনেক কম খরচা হয়। যতটুকু খরচ হয় তাহারও বেশীর ভাগ 'এষ্টাব্লিশমেণ্ট' বাবদই যায়, ঔষধ ও পথ্যের অবস্থা তো দেখাই গেল।

দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে যদি এই ভাবে কাজ চলিতে থাকে তাহা হইলে জাতির ধ্বংসের আর বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

গত ২১শে পৌষ দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :

"ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরী চুক্তির পূর্ণ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল :—১৯৫০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন মতবাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্রুত ভারতের সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও ঐ চুক্তিতে সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং স্বীকৃত হইয়াছে যে, উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যন্ত্রবিদ্যা, যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী প্রণালী সম্পর্কে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে উভয় দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর। ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা বৃদ্ধির জন্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার্থ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রেষারেষির ভাব দূর করার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বনকল্পে একযোগে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে—ইহা বিবেচনা করিয়া কারিগরী পরিকল্পনার সহযোগিতা এবং ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন কর্ম্মসূচী নিম্নোক্ত উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিতে সম্মত হইয়াছে :—

১নং অনুচ্ছেদ—এতদ্দ্বারা ভারত-সরকার যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন ঐগুলি যথাবিধি নির্দ্দিষ্ট একজন মন্ত্রীর সাহায্যে পালিত হইবে। এতদ্দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ হইলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান) মারফত তাহা কার্য্যকর হইবে।

(১) ভারতে কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য উক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের ভারতস্থ প্রতিনিধিই কারিগরী সহযোগিতা বিভাগের ডিরেক্টররূপে কাজ করিবেন। তিনি এবং তাঁহার বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ ভারতে মার্কিন কূটনৈতিক কর্ম্মচারীদেরই অন্যতম। কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কূটনৈতিক কর্ম্মচারীবৃন্দ যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন উক্ত অধিকারিক এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণই তদনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ-বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া গঠিত একটি প্রত্যক্ষ সহযোগী ও সাহায্যকারী দল প্রেরণ করিবেন। এই সাহায্যকারী দল উক্ত (ডিরেক্টরের) পরিচালনাধীনে কাজ করিবেন। মার্কিণ সরকারই ডিরেক্টর এবং বিশেষজ্ঞগণকে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু ভারত-সরকারের নিকট এই সকল ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। যে সমস্ত পরিকল্পনা সাহায্য পাইবে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে সহযোগিতা এবং ইহা পরিদর্শনের জন্য ভারত-সরকার উক্ত কারিগরী পরিকল্পনা সহযোগিতা সম্পর্কিত ডিরেক্টর এবং সরেজমিন সাহায্যকারী বিশেষজ্ঞ দলকে যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা দিবেন।

(৩) ভারত-সরকার স্বীকার করিতেছেন যে, যেহেতু অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের আদালতে অভিযুক্ত না হইবার সুবিধা প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিগণ ভোগ করিয়া থাকেন এই পরিষদের লোকজনও তাহা ভোগ করিবেন।

২নং অনুচ্ছেদ—উভয় গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা তহবিল নামে একটি অর্থভাণ্ডার সৃষ্ট হইবে। এই তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫ কোটি ডলার জমা দিবেন। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক যথাবিধি নিযুক্ত অফিসার এবং (মার্কিন) কারিগরী সহযোগিতা পরিচালন সম্পর্কিত ডিরেক্টর কর্ত্তৃক যৌথভাবে এই তহবিলের অর্থ কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কিত অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ

কার্য্যে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হইবে। উক্ত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় নিবন্ধে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী এই তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ হইবে। উক্ত অনুচ্ছেদের এই ভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, (ক) অর্থভাণ্ডার হইতে সম্মিলিত অর্থভাণ্ডারে অর্থ হস্তান্তর অথবা অন্যভাবে ব্যয় অনুমোদন করা চলিবে। উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে কয়েকটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঐগুলির জন্য ভারত-সরকারের অনুমোদিত হারে ঋণ বাবদ এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার জন্য পঞ্চম অনুচ্ছেদে বর্ণিত চুক্তির সর্ত্তাবলী অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। এই চুক্তি অনুযায়ী যে অর্থ বরাদ্দ হইবে তৎসম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার (ক) অর্থ-ভাণ্ডারে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে ভারত-সরকারকে মাঝে মাঝে জানাইবেন।

ভারত-সরকারের একটি বিশেষ উন্নয়ন তহবিল রহিয়াছে। ইহার পরিমাণ পঁচিশ কোটি টাকারও বেশী। ভারত-সরকার সম্মত হইতেছেন যে, ভারত-সরকার এককভাবে অথবা ভারতের রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় প্রত্যেকটি যথা-বিধি অনুমোদিত পরিকল্পনার জন্ত স্থিরীকৃত হারে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্ত 'খ' তহবিল হইতে অর্থব্যয় অনুমোদন করিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত উভয় সরকারের অর্থানুকূল্যে যদিও উক্ত তহবিল গঠিত হইবে, কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ ও তাহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারটি ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী ব্যবস্থার মার্কিন পরিচালক যিনি হইবেন, তিনি ভারতস্থ মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীভুক্ত হিসাবে থাকিবেন এবং পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ ও তাহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবেন।

৩নং অনুচ্ছেদ—(১) উভয় গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইতেছেন যে, ভারতের বাহির হইতে উভয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত মাল, উপকরণ ও ঠিকাদার সংগ্রহের জন্ত 'ক' তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের দেয় অর্থের একাংশ ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে; এইভাবে যে অর্থ রাখিয়া দেওয়া হইবে তাহা 'ক' তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) পরিকল্পনাগুলির কাজ চালাইবার জন্য যে অর্থ বিতরিত হইবে, তাহা সাহায্য অথবা ঋণ অথবা একসঙ্গে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। যদি ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, তবে তাহা টাকায় ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণের সর্ত্তে দিতে হইবে; এইভাবে ঋণ শোধ হইতে ভারত-সরকার যে অর্থ পাইবেন এবং এই কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে আমদানীকৃত বিক্রয়যোগ্য মাল বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা 'খ' তহবিলে জমা দিতে হইবে। এই চুক্তি যতকাল বলবৎ থাকিবে, ততকাল একমাত্র উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে স্বীকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৩) উভয় গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইতেছেন যে, পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট যে সকল অভিজ্ঞ কারিগর নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদের সকলের বেতন ও ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভারতীয়কে ভারতের বাহিরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দিবেন তাহাদের বাহিরে ভ্রমণের ব্যয়, ছাত্র বেতন, ও অন্যান্য খরচ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত যে কারিগরী সাহায্য দিবেন তাহার ব্যয় 'ক' তহবিলে প্রদেয় অর্থ হইতে না দিয়া অন্য তহবিল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বহন করিবেন। অপরপক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ক্ষেত্রে আবশ্যক মত ও চুক্তি অনুসারে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা দিবেন এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত চুক্তি অনুসারে যে সকল কারিগর ভারতে আসিবেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতিকে কাষ্টম শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন।

৪নং অনুচ্ছেদ—(১) একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটি একটি সাধারণ পরিস্থিতি স্থির করিবেন এবং কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি অনুযায়ী যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে, সেগুলি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা সাত জনের বেশী হইবে না।

১। এই কমিটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্ত দায়ী থাকিবেন। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে কাজ করিবেন।

জনকল্যাণ পরিকল্পনা

উভয় সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সাময়িকভাবে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত তহবিলের অর্থসাহায্যে যে সকল পরিকল্পনার কাজ হইবে, তন্মধ্যে একটি হইবে জনকল্যাণ পরিকল্পনা।

জনকল্যাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০টি শহর-পল্লী উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চল ২ লক্ষ লোকের বসতিযুক্ত প্রায় ৩ শত গ্রাম লইয়া গঠিত হইবে। এইরূপ অনেকগুলি অঞ্চল নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকায় এবং নলকূপ খনন পরিকল্পনা এলাকার সন্নিকটে গঠিত হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন যে, এইরূপ ভাবে মার্কিন ঋণ গ্রহণ করিলে আমাদের মার্কিনের প্রভাবে পড়িয়া তাহাদের নানাবিধ রাজনৈতিক কৌশলের

মধ্যে জড়াইয়া পড়িব; আমাদের "নিরপেক্ষ" নীতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। যদি ইহাই আমাদের ধারণা হয়, তবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া কোন শক্তি অর্জন করি নাই, এবং শীঘ্র তাহা বৃদ্ধি করিয়া নির্ভীক হইবার সম্ভাবনা খুব কম। নিজের জাতি সম্বন্ধে এইরূপ হীন ধারণা আমাদের নাই এবং বুদ্ধির অভাবও আমাদের জাতিগত নহে। রাজনীতির নানা কৌশল আমরা বুঝি ও শিখিতেছি।

যুদ্ধের অপরাধী

কোন ব্যক্তি নরহত্যা করিলে তার ফাঁসী হয় বা যাবজ্জীবন তাহাকে কারাগারে কাটাইতে হয়। বিজয়ীরা ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ হইতে এক নূতন নিয়ম করিলেন যে, রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার পরামর্শদাতারা যখন বিরাট নরহত্যার অপরাধে দোষী তখন তাঁহাদেরও ফাঁসী দিতে হইবে। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ। তিনি ধুয়া তুলিলেন—"সম্রাট উইলিয়মকে ফাঁসী দিব" এবং এই প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রসার করিয়া যুদ্ধান্তে একটি ভোট-যুদ্ধেও জয়লাভ করিলেন।

সেইরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের "হিটলারকে ফাঁসী দিব"—"মুসোলিনিকে ফাঁসি দিব"—এইরূপ ধারণা লোকের মনে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইল, বিশেষ করিয়া রুশিয়ায়। কিন্তু মিঃ চার্চিল এই বর্বরতার ব্যর্থতা দেখিয়াছেন এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করিয়া যে লাভ হয় না তাহা দেখিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জেতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় বিজিতকে টাকা ধার দিয়া। ষ্টালিন কিন্তু এসব যুক্তি মানিতে চাহিলেন না। তিনি তেহরাণ (ইরাণের রাজধানী) নগরীতে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্টালিনের যা যুক্তি পরামর্শ হয় ১৯৪৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে, তাহাতে প্রস্তাব করেন যে নাৎসি দলের নেতা ও সামরিক নেতৃবর্গকে ফাঁসী দিতে হইবে। এই মারাত্মক প্রস্তাবের বিবরণ চার্চিলের "বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে" বাহির হইতেছে।

"নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকায় তার সার মর্ম অবলম্বন করিয়া কোন মার্কিন সাংবাদিক এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। চার্চিলের কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য তার অনুবাদ করিয়া দিলাম। "কথায় কথায় ষ্টালিন বলিলেন: 'জার্মানীর সামরিক নেতৃবর্গকে ধ্বংস করিতে হইবে; হিটলারের সমস্ত শক্তি নির্ভর করে এই ৫০,০০০ বিশেষজ্ঞের উপর। যদি তাঁহাদের খুঁজিয়া পাতিয়া ধরা যায়, তবে যুদ্ধের পরে তাঁহাদের গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে; এই ভাবে জার্মানির সামরিক শক্তি ধ্বংস করিয়া বিশ্বশান্তির পথ মুক্ত করিতে পারা যাইবে'।"

চার্চিল এই কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন রুজভেল্ট ব্যাপারটি লঘু করিবার জন্য বলিলেন যে, ৫০,০০০ হাজার নয়, ৪৯,০০০ হাজারকে গুলি করিয়া মারিলেই চলিবে যদিও এলিয়ট রুজভেল্ট ষ্টালিনের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ষ্টালিন ও মলোটভ চার্চিলকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—'আমরা ঠাট্টা করিতেছিলাম মাত্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

চার্চিল এখন বলিতেছেন: "আমি ঠিকই ভাবিয়াছিলাম; ব্যাপার ঠাট্টা বিদ্রূপের নয়।" এই সম্পর্কে লেখক পোলিশ সামরিক কর্মচারীদের কথা তুলিয়াছেন। প্রায় ১৫।২০ হাজার লোককে কাটীন জঙ্গলে হত্যা করা হয়—নাৎসি হত্যাকাণ্ডের পর যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্বে বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে "কুলাকদের ধ্বংস" করিবার নামেও প্রায় ৩০ লক্ষ নরনারীকে না খাইতে দিয়া মরণের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ষ্টালিনের যুক্তি ছিল একটা, "কুলাকদের (সম্পন্ন চাষীদের) প্ররোচনায় এই লোকসমষ্টি নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য তাহাদের গরু মহিষ ভেড়া ছাগল বিনা প্রয়োজনে মারিয়া ফেলে। কোন রাষ্ট্র তাহা সহ্য করিতে পারে না। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে চলিবার সাহস থাকিলে তাহা হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দেয়। আমাদের কম্যুনিষ্টদের সেই সাহস আছে কি?

জাতিসঙ্ঘে কৃষিপ্রসঙ্গ

রাষ্ট্রসঙ্ঘে সম্মিলিত প্রতিনিধিবৃন্দ ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বর্তমান অধিবেশনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলিয়া মনে করেন। বর্তমান সপ্তাহে এই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটিতে উত্থাপিত হইতেছে। প্রতিনিধিদলের এক জন সদস্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, ভূমি-সংস্কার সমস্যার আশু সমাধান না হইলে ইহা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং বিশ্বের নর-নারীর দৈনিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত করিবে।

ভূমি-সংস্কারপ্রসঙ্গে ব্রাজিল, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান কর্তৃক উত্থাপিত যুক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটির বর্তমান অধিবেশনে বিবেচিত হইবে। ভূমি-সংস্কার সমস্যার সমাধানে সরকারের দায়িত্ব সমধিক। সরকারের নিকট হইতে যান্ত্রিক সাহায্য এ বিষয়ে প্রভূত কার্য্যকরী হইবে। সরকারের সহযোগিতায় প্রায়োজন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ভূমি-সংস্কার সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

গত ২২শে পৌষ তারিখে প্যারিস হইতে যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, উপরোক্ত সংবাদটি তাহার মধ্যে আছে। পরিকল্পনা বিরাট হউক, সাধারণই হউক, তাহার সাফল্য নির্ভর করে ব্যক্তির উপর। কোন রাষ্ট্র কেবল তার অর্থবলের সাহায্যে তাহা আনিতে পারে না। ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের নিকট ইহাই প্রধান সমস্যা। "বৃহৎ যন্ত্রের" সাহায্য না পাইয়াও প্রাচীন মিশর, প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন রোম-

পটেমিয়া ও প্রাচীন চীনের লোক তাহাদের দেশের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছিল। তাহার ইতিহাস হইতে বর্তমান যুবযুগের নর-নারীর অনেক শিখিবার আছে।

একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। প্রাচীন জগতের এই সব নদী-নালা দাস-শ্রমিক দ্বারা করানো হইত। আজকাল তাহা করানো হয় না। কিন্তু যাঁহারা এই সব পরিকল্পনার খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান ইহার মধ্যে বেশী নাই; পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গেলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কম-বেশী সঙ্কুচিত হইবে। প্রাচীনকালে দাস-শ্রমিক হয়ত পলাইয়া যাইত। আজ শ্রমিক হয় "ধর্মঘট" করে, না হয় কাজে ইস্তফা দেয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই।

ভারতরাষ্ট্রের নৌবহর

গত ৬ই পৌষ ভারতব্যাপী "নৌবহর দিবস" প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারত-সরকার একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান (ইংরেজ আমলের) কথা তাহার মধ্যে ছিল। আর ছিল এই যুদ্ধাস্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহার করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে স্বাধীন ভারত কি করিয়াছে তাহার কথা। আমরা তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

ভারতীয় নৌবহরের সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। কিন্তু আধুনিক কালের যে ইতিহাস আমরা জানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতীয় পোত সমুদ্রে বিচরণ করিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস এবং শিল্পকলার নিদর্শনগুলিতে তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে। যদিও ইহাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই ছিল, তবু দ্বীপগুলি জয় করিবার সময় জাহাজের সাহায্যে সৈন্যবাহিনী পার করা হইত ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। ভারতে জাহাজ-নির্ম্মাণ শিল্পও উন্নতিলাভ করিতেছিল। নদীতে চালাইবার উপযুক্ত শুধু নৌকাই যে তৈরি হইত তাহা নহে। সমুদ্রগামী পোত নির্ম্মাণও অপ্রচলিত ছিল না।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও এই নৌশিল্পের চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়। মোগল আমলে, বিশেষতঃ আকবর নৌশিল্পের উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বাংলার ঢাকা শহরে তাঁহার নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর ছিল। আকবরের উত্তরাধিকারীরাও নৌশিল্পকে অবহেলা করেন নাই। মালাবার উপকূলের চেতাগণও (মারাঠীরা) তাহাদের নৌশক্তির জন্য উপকূলে দীর্ঘকাল যাবৎ আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। উৎকল ও অন্ধ্র রাজ্যে লোক ভারতসমুদ্রে যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাঙালীর নৌবহর রাজা বলকে পর্য্যন্ত চমকিত করিয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল: ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতীয় নৌবাণিজ্যের প্রবর্তন করিলেন এবং এই সব পোতে কাজ করিবার জন্য ভারতীয় কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করিলেন তখন হইতেই ভারতীয় নৌ-বহরের প্রকৃত উৎপত্তি হইল বলা চলে। এই সব পোতে উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে কোম্পানীর বাণিজ্যপোতের লোকদের নিয়োগ করা হইলেও নিম্নতন কর্ম্মচারী এবং তক শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়।

ভারতীয় নৌবহরের নাম পরিবর্তন করিয়া পরে বোম্বাই নৌবহর রাখা হইয়াছিল এবং বোম্বাইতেই ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে কোম্পানীর যে সব যুদ্ধ হয়, তাহাতে এই নৌবহর বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু শুধু সামরিক ও অসামরিক কাজেই কোম্পানী তাহাদের জাহাজগুলিকে নিয়োগ করেন নাই। বোম্বাইতে একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাও তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন। বোম্বাইয়ের বর্তমান ডকটি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অধিকৃত এবং ক্রমে ইহা জাহাজ নির্ম্মাণের একটি কারখানা হইয়া উঠে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কারখানাটি এত উন্নতিলাভ করে যে, পৃথিবীর তৎকালীন যে-কোন শ্রেষ্ঠ কারখানার সঙ্গে তুলনা করা চলিত। ওক কাষ্ঠনির্ম্মিত এই জাহাজগুলি ইউরোপের যে-কোন কারখানার জাহাজের অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর বলিয়া তখন সর্ব্বত্র স্বীকৃতিলাভ করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় নৌবহর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হস্তান্তরিত হয়। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে বহুবার ইহার নামের পরিবর্তন হইয়াছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে অবশেষে ইহাকে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় নৌবহরের একটি শাখা হিসাবে কাজ করিতে থাকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের বহু নৌযুদ্ধে সহ-যোগিতা করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীরূপে আখ্যাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবহরকে বহুলাংশে প্রসারিত করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহার উচ্চ ও নিম্নতন কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ২ হাজার মাত্র ছিল। যুদ্ধের সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ হাজারে উঠে বহু আধুনিক জাহাজও ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পরে: ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় নৌবহরের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ৪খানি জাহাজ, ২খানি ফ্রিগেট, ১খানি করভেট, ১খানি সার্ভে-ভেসেল, থানকয়েক ট্রলার মাইন সুইপার (বোমা তুলিবার জাহাজ) এবং ১খানি ক্রাক-টাইং মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ৩ হাজার

মাইন উপকূল রক্ষার কাজে ইহাকে মোটেই পর্য্যাপ্ত বলা চলে না।

সুতরাং নৌবহর প্রসারের পরিকল্পনায় ভারতকে যথেষ্ট কাজ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রথম হইতে কাজ সুরু করিতে হইয়াছে। ঐ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে এ সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল তাহার ফলে সে ৭০৩০ টনের 'একিলিস" নামে একখানি ক্রুজার পায় এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার 'দিল্লী' নাম দেওয়া হয়।

এইভাবে ভারতীয় নৌবহর বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারত ক্রমে "রাজপুত" "রণজিৎ" ও "রাণা" নামে তিনখানি ক্রুজার লাভ করিয়া একটি ফ্লোটিলা গঠন করে। এই সঙ্গে দেশ বিভাগের ফলে যে ফ্রিগেটগুলি ভারতের অংশে পড়ে সেগুলি লইয়াও ভারত একটি ফ্রিগেট ফ্লোটিলা গড়িয়া তোলে। প্রত্যেক বহরে ২ শত কর্ম্মচারী আছে। সম্প্রতি মাইন সুইপার ফ্লোটিলাও গঠন করা হইয়াছে।

শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : ভারতে নৌবহরের প্রসার পরিকল্পনায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় নৌবহরের যোগ্যতা ও স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ বিভাগের পর ভারত তিনটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞকে হারাইয়াছিল। অবশ্য এডমিরাল দপ্তরের সাহায্যে প্রাথমিক অসুবিধাগুলি কাটাইয়া উঠা গিয়াছিল। ভারতীয় নৌ-কর্ম্মচারিগণকে দলে দলে শিক্ষা দেওয়ার ভার উঁহারা গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডগামী ভারতীয় শিক্ষানবীশদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিভিন্নপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্য্য : ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে নৌবহরের নামের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সেই দিন হইতে দীর্ঘকালের 'রাজকীয়' শব্দটি ত্যাগ করিয়া ইহাকে শুধু ভারতীয় নৌবহর নামে অভিহিত করা হয়।

জামনগর ও বোম্বাইয়ের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং কোচিন ও বিশাখাপত্তনমে নূতন শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের নৌবিভাগীয় ডোয়াড্রম ও জাহাজ ভিড়াইবার স্থান সম্প্রসারণও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে তাহা করা যাইতেছে না। ১৯৪৯ সনে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ হইতে ৪৬-এ উঠে। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি 'দিল্লী' জাহাজে সমস্তই শিক্ষিত কর্ম্মচারী পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু এডমিরালদের সাহায্যে নৌবহর বিভাগের সমস্ত প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। তাই নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়িয়া তুলিতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন।

সম্প্রতি নৌবিভাগের বিমানবহরের জন্য সমুদ্রের উপকূলে ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

নৌবিভাগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক জন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার অধীনে গবেষণাকার্য্য চালান হইতেছে।

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা-সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৩ই পৌষ পাটনা নগরীতে নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল, সাহিত্যরসিক ও ব্যাখ্যাকাররূপে তিনি বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

তাঁহার বক্তৃতা ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্যের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে :

"পূর্ব্বে পশ্চিমে খণ্ডাংশ ছিন্ন হলেও মহাদেশের মত প্রকাণ্ড দেশে আমরা এক মহারাষ্ট্র গড়ে তুলেছি—বাইরের চাপে নয়, নিজেদের প্রয়োজনে ও ইচ্ছায়। এ মহাদেশের ঐক্য কি কেবল হবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, শাসন সৌকর্য্যের ঐক্য—যা ইংরেজের আমলে ছিল। যদি তাই ঘটে তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড সম্ভাবনাকে আমরা ব্যর্থ করব। সে সম্ভাবনা হচ্ছে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র এই মহাদেশে জাতিতে জাতিতে যে মিল তা রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডী ছাপিয়ে অন্তরের ঐক্যে পরিণত হবে।...

সাহিত্য ও সমাজ : দুইটি চরম মতবাদ

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। সেদিক থেকে দুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতানুসারে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য্য কারণ বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের স্থূল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্য্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কারবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবারগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তি-গত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, অতি স্থূল স্থূল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকতে হয়। কিছু পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন না দিলে পরিবারের গঠন সম্ভব নয়। একইভাবে বিভিন্ন পরিবারমণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীও হয়ে যায় পুনরায় বিস্তৃততর এবং সার্ব্বজনীন স্তরের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। তা সত্ত্বেও যে কোন স্থির-প্রতিষ্ঠ সমাজেই পরিবারের তথা ব্যক্তির দাবি উপেক্ষিত হবার নয়—কারণ পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাদের বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের—কাব্য দর্শন বর্গের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ অত

পৃথিবীতেই চিরকাল প্রোথিত—প্রাত্যহিক জীবনের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, দাবি-অধিকার-আইন প্রভৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপৃত। কিন্তু সাহিত্যের চির-অম্লান শতদল প্রস্ফুটিত হয় সেই অপার্থিব মানসলোকেরই চির-শোভন মানস-সরোবরে। নিদাঘদাহে যেমন শতদলের শতদলই শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে, বাস্তবতার প্রখর তাপে তেমনি সাহিত্যের প্রাণবস্তুও হয়ে যায় বিনষ্ট। সেজন্য সাহিত্যের কমলাসন থাকবে পাতা সেই অবাস্তব সৌন্দর্য্যলোকেই মাত্র যেখানে পৌঁছাতেই পারে না কোনও পার্থিব শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না ধরণীর ধূলার মলিন ছায়া, যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায় জাগতিক বিবাদ-বিসংবাদের কর্কশ কোলাহল।

উভয় চরম মতবাদের সমন্বয় সাধন

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য রক্তকণা, স্নায়ু, মাংসপেশী, ইন্দ্রিয়াদি সম্বলিত মনুষ্যদেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও কি এক অপূর্ব্ব দৈবিক নিয়মানুসারে একটি সমগ্র অখণ্ড বস্তু। অন্যথা জীবনধারণ হয়ে উঠত অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রমুখ বিভিন্ন—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ মানসিক ভাব-সম্বলিত মানব-মনও কি এক আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন সমগ্র সত্তা। নতুবা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ত কথার কথা। এরূপে শুধু মানবের কেন, সমগ্র জগতেরই ইতিহাস অল্পমাত্রও আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যেও একের, বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মধ্যেও সমগ্রের আবিষ্কার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও সমুন্নতির কারণ। সে জন্য আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি সংযোগ সংস্থাপনের প্রচেষ্টাও মানুষের শাশ্বত প্রচেষ্টা। বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ঋষি এবং চরম বস্তুবাদী ভোগীর সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থীদের সংখ্যাই অধিক। মনুষ্যজীবনের এই সমন্বয়ের চিত্রও মনুষ্যসৃষ্ট দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলায় পরিস্ফুট হয়েছে। তারই ফলে উপরি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মধ্যেও আমরা পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার, আকাশ ও পৃথিবীর, আত্মা ও দেহমনের সংঘটিত হয়েছে এক অপূর্ব্ব মিলন। প্রথম চরম মতানুসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক তীক্ষ্ণধী দার্শনিকের এবং উদগ্র কল্পনাবিলাসী রসিকজনের আদরের বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব ও স্বকপোলকল্পিত, যার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য মণ্ডলে, তা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেও কতকাল কত পরিমাণে প্রকৃত তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয়, সেইটাই চিন্তনীয়। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে একাকী, উদগ্র খেলায় মনই বরং অচিরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানব-বিদ্বেষী দার্শনিকপ্রবরের ও lotus-eater বা দিবাস্বপ্নবিলাসী অলস, অকর্মণ্য ভবঘুরের।

সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা অত্যাধুনিক কালে ভারতবর্ষের মনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন পৃথিবীর অন্য সব দেশে তেমনি ভারতবর্ষে আজ আমরা কর্ম-ব্যস্ত। অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও চিন্তায় জাতি প্রপীড়িত। যেমন অন্য দেশে তেমনি ভারতবর্ষেও আমরা অনেকে বলছি সুখের দিনের শেষে আমাদের দুঃখের দিন এসেছে। এ দুঃখের দিনের একটা প্রধান কারণ যাদের মুখে অন্ন কি পরনে কাপড় আছে কিনা সে খোঁজ নেওয়ার সুখী লোকের প্রয়োজন হ'ত না, সেই অন্নবস্ত্রহীনের দল আজ আর কাকেও নিশ্চিন্ত থাকতে দিচ্ছে না। তাদের দাবি মেটাবার চেষ্টা না করে উপায় নেই। এই চেষ্টায় পূর্ব্বতন সুখের পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙে পড়ছে। চারদিকে নূতন সৃষ্টির বেদনা। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের দাবিই কি এদের চরম দাবি? সে দাবি যখন মিটবে তাদের অন্তরাত্মা তখন জিজ্ঞাসা করবে না ততঃ কিম্? যেমন আজকের সভ্যসজ্জনেরা শুধু শরীরের দাবি মেটানকে পূর্ণ সুখের অবস্থা মনে করেন না, সভ্যতার যে সব অশরীরী সৃষ্টির আনন্দ না হলে তাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন ও অপূর্ণ মনে হয়, তার দাবিও আজকের অন্নবস্ত্রের কাঙালেরা পরশু করবে। সভ্যতার যে সব সৃষ্টি সাংসারিক কাজে লাগে না, কিন্তু মানুষের যা অমূল্য সম্পদ, তার দাবি যদি তারা না করতে শেখে তবে এই চিরবঞ্চিতেরা আবার বঞ্চিত হবে। ইতি-মধ্যে তাদের অন্নবস্ত্র জোগাবার ব্যস্ততায় সভ্যতার অমৃতভাণ্ড-গুলি যেন আমরা না ভাঙি। মানুষের সাহিত্য সেই অমৃত-ভাণ্ডের একটি।"

এই ব্যাখ্যান যুগোপযোগী হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীসুধাংশুকুমার দাশ এই সভ্যই অন্য ভাষায় বলিয়া-ছেন। ভারতবর্ষের সত্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য বাংলা সাহিত্য যাহা করিয়াছে এবং যাহা করিতে পারে সেই আদর্শের কথাই তিনি বলিয়াছেন। শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীসুধীর-চন্দ্র সরকার। তিনি এতৎসম্পর্কে লোক-সাহিত্য, গাথা, গল্প, রূপকথা ও কবিতার উল্লেখ করেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথের অবদান স্মরণীয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও সুকুমার রায় আধুনিক যুগের শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা। আজ যাঁহারা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছেন পৌত্র-পৌত্রীর সৌভাগ্যে তাঁহাদের হিংসা হয়।

সুধীরবাবু একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান করিয়াছেন:

"দিন দিন সাহিত্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। আজকের দিনে কেবলমাত্র বইয়ের পাতার মধ্যেই শিশু-

সাহিত্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। বেতার ও সিনেমার ভিতর দিয়ে নানা দেশে এক অভিনব শিশু-সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি হচ্ছে। এই নতুন ধরণের সাহিত্য—যদি তাদের সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে—খুবই অদ্ভুতভাবে সরল শিশুচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করছে। এই প্রভাবের ভিতর শিশুদিগের চিত্তকে বিভ্রান্ত করবার যেমন অনেক পথ আছে—তেমনি ভালো দিকে নিয়ে যাবারও বহু উপায় আছে।"

সম্মেলনের এই অধিবেশন সার্থক হইয়াছে যখন দেখি যে নিখিল-ভারত সাহিত্য শাখার সভাপতি বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীহাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী বলিতেছেন :

"যত দিন আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত না হচ্ছি তত দিন প্রদেশে প্রদেশে সত্যিকার প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হতে পারে না।"

মধ্যযুগে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ যাতায়াতের এত সুবিধা সত্ত্বেও তাহা হইতেছে না কেন তাহাই প্রশ্ন। অতীতের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

"বাংলা ভাষা, মৈথিলী, ব্রজবুলি সাহিত্যের একসঙ্গে আলোচনা করলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। আসামের অঙ্কিয়ানাটের পরম্পরায় এবং নেপালে প্রাপ্ত নাট্যসাহিত্য পরম্পরায় মৈথিলী ভাষার প্রভাব দেখান হয়েছে। মণিপুর, বাংলা এবং উড়িষ্যাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রভাব বিস্তার হয়েছিল এবং বৃন্দাবন থেকে তার প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে কিছু কিছু এসে পড়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদের সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি পরে অযোধ্যার অনেক রামাওত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণের বৈষ্ণব সাহিত্য যে আমাদের উত্তর-ভারতের সাহিত্যগুলিকে নব-প্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয় সকলেরই জানা আছে।"

পশ্চিম বাংলার রেশনের দোকান

এই বিষয়ে, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সরবরাহের ব্যাপারে কচকচির শেষ হইল না। কেন এক দোকানে, বিশেষতঃ, গবর্মেণ্টের দোকানে, আতপ চাল পাওয়া যায়, অন্য দোকানে পাওয়া যায় না, তার রহস্য বুঝা শক্ত। সেই কথাই "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র ২৬শে পৌষ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। এই বিরক্তিকর ব্যাপারের অবসান কবে হইবে ?

"কলিকাতার খাদ্য রেশন সরবরাহে কিরূপ অব্যবস্থা হয় সম্প্রতি তাহার একটি ঘটনা আমাদের গোচরে আসিয়াছে। উত্তর কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট এলাকার রেশনগ্রহীতাদের অনেককে কেবল আতপ-চাউলই দেওয়া হইতেছে ; আর বড়তলা এলাকার রেশনগ্রহীতাদের মধ্যে যাহাদের আতপ-চাউল একান্ত প্রয়োজন তাহারা তাহা চাহিয়াও পাইতেছে না। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুই এলাকায় যে এইরূপ সরবরাহ-বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাহা উপরওয়ালাদিগের অবহেলা ও মনোযোগের অভাব প্রমাণ করে। উভয় এলাকার লোককে এইরূপ ভাবে বিব্রত ও বিরক্ত না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট এলাকার আতপ চাউলের কিছু অংশ বড়তলা এলাকায় এবং বড়তলা এলাকার সিদ্ধ চাউলের কিছু অংশ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট এলাকায় পাঠাইতেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইত। কোন্ রেশন দোকানে মাসিক কি পরিমাণ আতপ চাউলের প্রয়োজন হয় তাহার একটা হিসাব আছে। রেশন দোকানের ম্যানেজারেরা যখন প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য ফর্দ পাঠান তখন তাহাতে নিশ্চয়ই 'ইহার' উল্লেখ থাকে। উপরওয়ালারা তদনুযায়ী কার্য্য করেন না কেন—এই প্রশ্নের জবাবদিহির প্রয়োজন। আতপ চাউলই যাহাদের একমাত্র ব্যবহার্য্য তাহাদের আতপ চাউল সরবরাহ না করার অর্থ আহার হইতে বঞ্চিত করা।"

এই বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের দায়িত্ব সুস্পষ্ট। ভোটযুদ্ধে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁর ত একটা আপিস আছে ; তাঁরা কি করিতেছেন ? এতৎসম্পর্কে সহযোগী "যুগবাণী" গত ২৭শে পৌষ সংখ্যায় অপব্যয়ের সংবাদের উপর যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁর প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

"রেশন কার্ড বদলাইবার নিয়ম

ষ্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে রেশন কার্ডের স্লিপ আঁটিবার বিজ্ঞাপন খুব বড় করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা খবরের কাগজওলার পকেটে ঢালা হইয়াছে। রেশন কার্ডের মেয়াদ যথাসময়ে ফুরায় এবং যথারীতি মামুলী কায়দায় রেশন স্লিপ আঁটিয়া দেয়। তবে কখন কোথায় কি ভাবে তাহারা স্লিপ আঁটিবে তাহা ২৫ টাকা ইঞ্চি দরে দৈনিক ২০০ টাকা এক একটি কাগজে খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। রেশন দোকানে একটা নোটিশ টাঙাইয়া দিলেই যথেষ্ট, না দিলেও কথা নাই। আসল, জাল, নকল সব রকম রেশন কার্ডের মালিকরা নিজেদের গরজেই স্লিপ আঁটাইয়া লইবে। যে টাকাটা এই ভাবে খবরের কাগজওলাকে দেওয়া হয় সেটা কার টাকা ? কেন দেওয়া হয় ? ইলেকশন অফিসার এবং আর পাঁচটা সরকারী মুখপাত্রের পাটোয়ারী বুদ্ধির হাস্যকর বিবৃতি ছাপিবার জন্যই কি এই ঘুষের ব্যবস্থা ?"

ত্রিপুরা রাজ্যে গমনাগমনের সুবিধা

আগরতলা-পাথরকান্দি পথে জিপযোগে (অন্য কোন যানে নয়) অন্যতর পথ হিসাবে ডাক চলাচল সুরু হইয়াছে ১লা জানুয়ারী হইতে। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহা বাহির হইয়াছে। পথটি এখনও শুধু Zeepable ; পরের দুই বাণ অর্থাৎ

formation cutting ও metalling এখনও বেরি আছে। ভারত ব্যবচ্ছেদের পর ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আগরতলা হইতে পাথরকান্দির দূরত্ব ১৪৬ মাইল। পাথরকান্দি হইতে করিমগঞ্জ, বদরপুর দিয়া আসাম শিবের সঙ্গে যোগাযোগ অতঃপর সহজসাধ্য হইবে।

সাবরুম ত্রিপুরার অন্যতম বিভাগ—প্রধান নগর (গ্রাম ?) সাবরুম হইতেই বিভাগের নাম। কিন্তু এইটি যেন পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা ইহাকে দক্ষিণ-প্রান্তে বেষ্টন করিয়া আছে। আগরতলা হইতে সাবরুম যাইবার দুইটি পথ। (১) আগরতলা হইতে বাসযোগে বিশাল-গড় (পথ একপ্রকার); তথা হইতে বাসযোগে উদয়পুর; উদয়পুর হইতে সাবরুম (হাঁটা পথ, অতি কষ্টে জিপ চলে)। (২) ভিতর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ই-বি-রেলওয়ের আখাউরা জংসন হইতে চট্টগ্রামের পথে ধূম ষ্টেশন; তথা হইতে নৌকা যোগে ২২ মাইল সাবরুম।

কলকলিয়াঘাট হইতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে লাইনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করা হইয়াছে। এই সব সুখবর। আশা করি, ত্রিপুরা রাজ্যের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ভাণ্ডার এখন মুক্ত হইবে।

বাংলা ভাষা ও পাকিস্থানের শিক্ষানীতি

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে একটা দুর্ব্বোধ্য নীতি আছে তাহা পাকিস্থানের নাগরিকবর্গের পর্য্যন্ত বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ঢাকার "আজাদ" পত্রিকার গত ২৪শে কার্ত্তিক সংখ্যায় নুরুল আব্বাছ নামে একজন লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধের শিরোনামা "শিক্ষা বিভাগের কীর্ত্তি।" আমরা লেখককে জানি না। কিন্তু "আজাদ" যখন দু'কলম শিরোনামা দিয়া প্রায় তিন কলমব্যাপী প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন, তখন মনে করি তার একটা মূল্য আছে।

লেখক পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা ডক্টর কুদরৎ-ই খোদার প্রতি দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে যেভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"ওপরের দিকে তাকালে দেখতে পাই—ডাক্তার (?) কুদরতে খুদার মত লোক যিনি একাধারে ডি-এস্‌সি, পি-আর-এস্‌, কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম বিভাগে প্রথম, বহু গ্রন্থ-প্রণেতা...তাঁর মত লোকের স্থান পূর্ব্ব পাকিস্থানে হ'ল না। নানা বিপাকে পড়ে তাঁকে একেবারে ছিটকে পড়তে হ'ল করাচীতে। দেশে ফিরে আসবার চেষ্টাও যে তিনি করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁর অপরাধ অনেক।

সব চাইতে বড় অপরাধ বুঝি এই যে, শিক্ষা বিভাগের জনৈক সিলেটবাসী কর্ম্মচারীকে তিনি তাঁর বিভাগে পূর্ব্ববঙ্গের অসংখ্য সুদক্ষ ও বেশীকাল চাকরী করেছেন এমন সব কর্ম্মচারীকে ডিঙ্গিয়ে সিনিয়র সার্ভিস দিতে রাজী হন নি।"

এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী আবদুল হামিদ একজন শ্রীহট্টবাসী। এবং পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইলে শ্রীহট্টবাসী মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চ পদ ও সরকারী চাকুরীতে অনেক সুবিধা পাইবেন এই প্রলোভনেই অনেকে গণভোটের সময় পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দেন। শ্রীহট্টের মুসলমানসমাজ শিক্ষায় বেশ অগ্রসর এবং বংশমর্য্যাদায় তাঁদের স্থান প্রায় সুউচ্চে। তাঁদের অনেকেই ভারতরাষ্ট্রে উচ্চপদ অধিকার করে আছেন। এখন তার জন্য তাঁরা অন্য জেলাবাসীর হিংসার পাত্র।

নুরুল আব্বাস সাহেব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত আলোচনা করিয়া ব্যাপারটি লঘু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারও প্রয়োজন আছে; অনেকের গুণাগুণের কথা জানা যায়। মূলনীতি সম্বন্ধে অগ্রহায়ণ মাসের "ইমরোজ" যাহা বলিয়াছেন তাহা জানিয়া রাখা ভাল :

"বৎসর চারেক আগে পূর্ব্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কার কমিটি বলে যে কমিটি গঠিত হয়, তাঁরা এতদিনে তাঁদের বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌দের কমিটি যে বিষয় ছেলেদের ঘাড়ে চাপাতে সাহস করেন নি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে একেবারে বাধ্যতামূলক করে তুলেছেন। প্রাইমারী শিক্ষার মধ্যে আমরা আরবী তথা উর্দু হরফের প্রচলনের চেষ্টা ও তার সাফাই গাওয়ার কথাই বলছি।

মন্ত্রিত্বের গদী বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের মত সমস্ত জ্ঞানের আধার কিনা জানি না, তবে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে উপেক্ষা করার মত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাই নি। শিশুর মস্তিষ্কও শিশুই, তার ঘাড়ে চাপালেই সে দুনিয়ার সব জ্ঞান বহন করতে পারবে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। মন্ত্রী সাহেব বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে ভাবী নাগরিকদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছেন বলে মনে করতে পারছি না।

শুধু পূর্ব্ব পাকিস্থানেই নয় কেন্দ্রীয় পাকিস্থানের মন্ত্রীর গদীতেও যে আলকেমি নেই এতদিনে আমরা তা একটু একটু বুঝতে পারছি। বাংলায় বা পূর্ব্ব বাংলায় কোন কালে নাকি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী হয়েছিল। এবার লবণ ১৬ টাকা সের দরে বিক্রী হয়েছে। তখনকার শাসনকর্ত্তাকে কোন জবাবদিহি করতে হয়েছিল কিনা জানি না, তবে তিনি খুশীতে গদগদ হয়েছিলেন। এবারকার ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী খুশী হয়েছেন কিনা জানি না, তবে জবাবদিহি করেছেন। এ জবাবদিহিতে কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। পাক ভারতের বাক্‌-যুদ্ধেই যাঁরা জাহাজ ঘাটতির দোহাই দিতে পারেন, মারণ যুদ্ধে তাঁরা কি করবেন সে শুধু অনুমানই করা যেতে পারে—লেখা যায় না।

পাকিস্থান ইসলামী রাষ্ট্র হবে এ কথায় যদি ইসলামের অনুবর্ত্তীরা অতি বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইসলামী কায়দা কানুন প্রবর্ত্তন করতে চান তাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কথা হ'ল কোন্‌টা ইসলামিক আর কোন্‌টা ইসলামিক নয় এর একটা বিধিব্যবস্থা হওয়া উচিত। ফটো বড়দের জন্ত বিগ্রিসজ্জত অন্তের পক্ষে নয়, ঘোড় দৌড় করাচীতে বিধিসঙ্গত ঢাকাতে নয়, বলডান্স বড়দের জন্য ইসলামিক রাজ্যের রাজধানী ঢাকা, করাচী, লাহোরে বিধিসঙ্গত অন্য স্থানে নয়, এমনি নিয়ম হতে পারে না। •

তবে মধ্যযুগীয় প্রভু-মনস্তুষ্টিকর ধর্ম্মব্যাখ্যাই যাঁরা সত্যিকার ব্যাখ্যা বলে চালাতে চান তাঁদের বিশ্বাসকে এতটুকুও অমর্য্যাদা না করেও বলা চলে যে সেটা সঠিকও নয় সত্যও নয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সে একেবারেই অচল ও মর্য্যাদাহীন।

সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব বাংলার সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার যত কর্ম্মচারীকে স্বাক্ষরিত ফটোসহ এখন এতে ঢুকতে হচ্ছে। সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান ঘোষণা করার কি যৌক্তিকতা আছে জানি না। তবে এতে গবর্মেণ্টের Red-tapism-এর ১৮ মাসের বৎসর যদি স্বাভাবিক বৎসরে অর্থাৎ ১২ মাসের বৎসরে পরিণত হয় তা হলেই আমরা খুশী হব। সে যাই হোক, এর মধ্যে যে ইসলামিক কায়দা কানুনের কথা উঠে পড়েছে, সেটাতেই আমরা বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। প্রকাশ, কতিপয় কর্ম্মচারী ফটো তোলা অন-ইসলামিক বলে এতে আপত্তি জানিয়েছেন।

মধ্যে দুটো নূতন ইউনিভার্সিটি (রাজসাহীতে ও চট্টগ্রামে) খোলার কথা শোনা যাচ্ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে নানা কারণে সে প্রস্তাব যামা চাপা পড়ে গেছে। শিক্ষার এমনি অবস্থাতে আমাদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট।"

বাংলার খাদি গুরুকুল

নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। বাংলা "হরিজন" পত্রিকার ১৩ই পৌষ সংখ্যায় তাহা বাহির হইয়াছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যাবলী নানা পরীক্ষার ফল ; মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাহা করিয়া গিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বিদেশী ব্যাখ্যাকারগণও তাহার যুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিন সাংবাদিক ভিক্টর সিহান তাঁহার "Lead kindly light"—"দিব্য জ্যোতি আমাদের পরিচালনা করুক"—এই নামের পুস্তকে তাহাই করিয়াছেন। রিচার্ড গ্রেগের প্রসিদ্ধ বইয়ের নামের উল্লেখ নাই-বা করিলাম।

ধীরেনবাবু বলিতেছেন যে, "বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যর্থতা বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়।" আমরা বলিতে চাই যে সারা ভারতবর্ষের, তথা সারা দুনিয়ার জনসাধারণ তাহা বুঝিয়াছে।

"এই রকম সমাজ গঠনের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কারণ রাষ্ট্র গঠনের মূলই শিক্ষা। বর্ত্তমানের ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত কেতাবী শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌলিক বুদ্ধি ও শক্তি বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ইংরেজের শাসন চালাইবার পক্ষে এই পদ্ধতি ঠিক ছিল। তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক ইংরেজের শাসন ও শোষণ যন্ত্র চালানই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পক্ষে এই শিক্ষার মোটেই আবশ্যকতা নাই। আজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য এমন বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক মজুর দরকার যাহারা শারীরশ্রমের দ্বারা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বৈভব বাড়াইতে পারিবে।

এই কারণেই গান্ধীজী শিক্ষার সহিত শারীরশ্রমের গুরুত্ব দিতেন যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক কর্ম্মঠ, স্বাবলম্বী ও কুশলী নাগরিক হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘ প্রায় দুই বৎসর হইল মেদিনীপুর জেলার বরিদা গ্রামে খাদি গুরুকুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গত দুই বৎসরের কাজ খুবই সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ। দেখা যায় ছেলেরা আকস্মিক জ্ঞানে প্রত্যেক বিষয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শারীরশ্রমের দ্বারা নিজেদের যাবতীয় খরচের শতকরা ৪৮ ভাগ স্বাবলম্বী হইয়াছে।"

বাংলা "হরিজন" পত্রিকার পরিচালকবৃন্দের নিকট একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। বাংলা কাগজে ইংরেজী তারিখ কেন থাকিবে তাহা বুঝি না। আর যদিই তাহা রাখিতে হয় তবে বাংলা তারিখও তার সঙ্গে দিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক প্রেস ইনষ্টিটিউট

২৪টি দেশে নবগঠিত আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্‌ষ্টিটিউটের (সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের) কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া উহার এক্‌জিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান লেষ্টার মারকেল ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ২৪টি দেশের প্রতি দেশে একটি করিয়া জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে—ঐ কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে এই দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্বের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিবার কার্য্য এই প্রতিষ্ঠান করিবে। সংবাদের আদান-প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করাও ইহার অন্যতম লক্ষ্য। রকফেলার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নামক মার্কিন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অর্থ-

সাহায্যে ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে। তিন বৎসরের জন্ত উক্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ প্রতি দেশে বিপন্ন। কোন দেশের রাষ্ট্র সোজাসুজি তাহা নিয়ন্ত্রিত করে, কেহ করে নানা কৌশলে। বেশীর ভাগ দেশে ব্যক্তিগত অর্থ বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত ভাণ্ডার নানা উপায়ে তাহা করিয়া থাকে। ভারতরাষ্ট্রেও তাহাই চলিতেছে।

দার্শনিক সম্মেলন

দিল্লী নগরীতে সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এরূপ সম্মেলনের যে ইতিহাস দেখিলাম তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস। লেখক নৈমিষারণ্যের কথা শুনেন নাই; বৌদ্ধসঙ্ঘের কথা শুনেন নাই বা বলেন নাই। ইসলামের দার্শনিক সম্মেলনও অনুক্ত। চীন দেশ ত "বহু দূর"।

তবুও এই ইতিহাসের মূল্য আছে।

"দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের এইভাবে সম্মিলিত হয়ে আলোচনার প্রথম আয়োজন করেছিলেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের আহূত এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দার্শনিক প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতীয় দার্শনিক সম্মেলনের আয়োজন প্লেটোর পরবর্ত্তীকালে আর হয় নি। বর্ত্তমানকালে আন্তর্জাতিক ভাবধারার আদান-প্রদানের একটি যোগসূত্র হ'ল রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রতিষ্ঠানটি।"

বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর "অংশীদার"

পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের আদর্শ লইয়া ইউনাইটেড নেশন্স জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইউ এন চার্টারের মুখবন্ধে লেখা আছে যে, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করা উহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই আদর্শ পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল করিতে হইলে তরুণ-তরুণীদের ইউ-এন-ওর কার্য্যকলাপ এবং উহার সাফল্যের পরিচয় জানানো দরকার। মিলিয়া-মিশিয়া মানুষের প্রাথমিক সমস্তাসমূহ সমাধানের চেষ্টা যতই সকলের মধ্যে দৃঢ়মূল হইবে, যুদ্ধ ততই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইজন্ত তরুণ বয়স হইতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পত্নী শ্রীমতী এলিয়ানর রুজভেল্ট এই বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং হেলেন ফেরিসের সহযোগিতায় "পার্টনার্স: ইউনাইটেড নেশন্স এণ্ড ইউথ" নামে একটি চমৎকার বই লিখিয়াছেন। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ইউ-এন-ওর বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিচয় গল্পের মত করিয়া বইটিতে দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বে নূতন আদর্শ, বিশেষতঃ পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করিতে হইলে তরুণ বয়স হইতেই তাহা করিতে হইবে ইহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। এই বইখানি তরুণদের উপযোগী হওয়ার দিক দিয়া বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। বুক কোম্পানী বইখানি প্রচারের ভার লইয়াছেন। দুই টাকা দাম খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নাকি আগামী দু' তিন মাসের মধ্যে তাঁর উচ্চপদ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীর তাঁর ভাল যাইতেছে না। চির-রুগ্ন রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে ভাবে এতদিন লোকসেবা করিয়াছেন। তাহা কেবল মনের জোরে। আজ এই বয়সে যদি তিনি বিশ্রাম করিতে চান, তবে আমরা তাহাতে দুঃখিত হইব না।

স্বভাবতই তাঁহার স্থলে কাহাকে মনোনীত করা হইবে তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দার্শনিক ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে আমাদের মন নিঃসন্দেহ নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে ভাব ও কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ভাসা ভাসা; তাহা তাঁহার বুদ্ধিগ্রাহ্য, হৃদয়গ্রাহ্য বলিয়া কোন পরিচয় পাই নাই।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যিনি ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইবেন রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে তাঁহার মত হইবে অগ্রগণ্য। এক জনের নাম স্বভাবতই মনে হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের ডক্টর মুকুন্দরাম জয়াকর। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন মনে করি না। আর এক কথা। "সেকুলারত্ব"—ধর্ম্মনিরপেক্ষত্ব—প্রমাণ করিতে হইলে কেবল হিন্দুবংশোদ্ভব নর-নারীর মধ্যে এই পদ একচেটিয়া করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, নিরীশ্বরবাদী যে কেহ এই পদের উপযুক্ত মনে হওয়া উচিত। ডক্টর আম্বেদকরের নাম করা যাইতে পারে। আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব। অবশ্ত তাঁর মনোনয়নে "পণ্ডিত" নেহেরুর এই পদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে যে খিদ্‌খুটে ভাব আছে তাহা প্রধান বাধা হইবে।

পতৌদীর নবাব

গত ২০শে পৌষ ক্রিকেট-বীর পতৌদীর নবাব ইফ্‌তিকার আলি পোলো খেলিবার সময় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। বিশ্বের ক্রিকেট-ইতিহাসে তিনি সুপরিচিত। উইলিংডন হাসপাতালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯১০ সালের ১৭ই মার্চ্চ তাঁহার জন্ম হয় এবং লাহোর এচিসন কলেজে তিনি বাল্যকালে অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে খেলিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। প্রিন্স দলীপ সিংজীর ন্যায় টেষ্ট খেলায় যোগদান করিয়াই তিনি শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য অসময়েই ক্রিকেট খেলা

পৌরাণিক গাথা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম, কীর্তিকলাপ এবং বংশ-বৃত্তান্ত কালনির্দেশ সহ পুরাণে ধৃত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীনকালের 'হিষ্টরি' বা ইতবৃত্ত। পুরাণকার তাঁহার ইতবৃত্তীয় বিবরণে পৃথিবী কবে ও কিরূপে সৃষ্ট হইল এবং মানবের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন; এ সকল তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী লিখিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতের সহিত তাঁহার কথা অনেকাংশে মেলে। পুরাণকার কি করিয়া জগতের লয় হইবে ও সেই সঙ্গে কিরূপে সকল ইতবৃত্তের অবসান হইবে তাহারও বিবরণ দিয়াছেন। পুরাণমতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তন ঘটে। পুরাণে অতিরঞ্জন থাকিলেও পৌরাণিক কাহিনী অবিশ্বাস্য নহে। পুরাণের প্রামাণ্য অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে যে সকল রাজার নাম আছে ও যাঁহাদের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা বাস্তবিকই এক দিন জীবিত ছিলেন। বিশিষ্ট রাজগণের চরিত্র-কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক ও সর্বথা স্মরণযোগ্য।

পুরাণ আদিতে পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত ছিল। সৃষ্টি, লয়, বংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশবিবরণ, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ এবং মন্বন্তর বা কালনির্দেশ এই পাঁচটি বিষয় পুরাণের পঞ্চ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। কালক্রমে পুরাণে অন্যান্য প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। পুরাণ একাধিক। পুরাণার্থবিশারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস পুরাণগুলির সারসংকলন করিয়া পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন এবং নানা আখ্যান, উপাখ্যান, শ্রাদ্ধ-কল্পাদির বিবরণ ও গাথা তাহার সহিত যোগ করিয়া দেন। ইহাতে পুরাণ অধিক লোকপ্রিয় হয় এবং তাহার ইতবৃত্তীয় মূল্যও বৃদ্ধি পায়। নিজে দেখিয়া যে সকল বিবরণ দেওয়া যায় তাহা আখ্যান, পরের মুখে শোনা কাহিনী উপাখ্যান। শ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিবরণের আর এক নাম কল্পশুদ্ধি। মৃত মহাত্মাগণের রচিত শ্লোক বা গীত গাথা। গাথাগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কতক গাথা উপদেশমূলক; কতক গাথায় বিখ্যাত রাজাদের গুণাবলী এবং কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে; কোনও রাজার কোন বিশেষ দোষ থাকিলে তাহাও কখন কখন গাথায় ঘোষিত হইয়াছে। দুই-একটি ব্যতীত গাথাগুলির রচয়িতার কোন সন্ধান মিলে না। ছড়া ও লোকসঙ্গীত রচকের মত গাথাকার আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী কোন অর্বাচীন পুরাণকারের রচিত এক বিখ্যাত গাথা আছে। গাথার ভাব ও রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। মনুষ্য-জীবন ও রাজ্য ঐশ্বর্যাদির নশ্বরতা এই শ্লোকগুলিতে গীত হইয়াছে। গাথাটি উদ্ধৃত করিলাম:

তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈরুদ্বাহুভির্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্যাঃ কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥
পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকানব্যাহতো যোঽরিবিদারিচক্রঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ॥
যঃ কার্তবীর্যো বুভুজে সমস্তান্ দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ স এব সংকল্পবিকল্পহেতুঃ॥
দশাননাবিক্ষিতরাঘবানামৈশ্বর্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি যাতং ন কথং ক্ষণেন ভ্রূভঙ্গপাতেন ধিগন্তকস্য॥
কথাশরীরত্বমবাপ যদ্বৈ মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্তী।
শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধুর্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ॥
ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে সত্যং ন মিথ্যা ক্ব নু তে ন বিদ্মঃ॥

বিষ্ণু ।৪।২৪।৭০-৭৫ ।

শ্লোকগুলির ভাবার্থ, যথা 'পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনেক বর্ষ তপস্যা করিয়াছেন এবং যে সকল শক্তিমান ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছেন কাল তাঁহাদের কথা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সব শেষ করিয়াছে। যে পৃথু অরি দলন করিয়া অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন তিনি কালবায়ুদ্বারা আহত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিমুল তুলার মত বিনষ্ট হইয়াছেন। কার্তবীর্য রিপুদল নিহত করিয়া দুই নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ আয়ত্তে আনিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু এখন কথা-প্রসঙ্গে তাঁর নাম উঠিলে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বাস্তবিক ছিলেন কিনা। দশানন, অবিক্ষিত ও রাঘবদের ঐশ্বর্যে দিকসকল উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত কিন্তু ধিক্, কালের ভ্রূকুটিপাতে তাহা ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হইয়াছে। মান্ধাতা-নামা পৃথিবীর চক্রবর্তীরাজ আজ কথাশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা শুনিয়া কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন যিনি অল্প বুদ্ধিবশে নিজের উপর মমত্ব করিবেন। ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির আদি সকলেই ছিলেন একথা সত্য, মিথ্যা নহে, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় আমরা জানি না।'

দেখা যাইতেছে আমরা এখন কেহ কেহ যেমন পুরাণোক্ত রাজাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না পুরাকালেও সেরূপ লোকের অভাব ছিল না। মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ বহুকাল হইতেই কথাশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক যুগেও এই প্রকার অবিশ্বাস দেখা যায়। অনেকে মনে করেন শেক্‌স্‌পীয়র নামা কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

কার্ত্তিকেয় যখন তারকাসুর বধের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সিদ্ধবন্দিকিন্নরগণ এক গীত গাহিয়াছিলেন। পুরাণকার ইহাকে গাথা বলিয়াছেন যদিও গাথার বিশিষ্ট রূপ ইহাতে নাই। ইহা পুরাণকার-রচিত। পুরাণ বলিতেছেন, তারকাসুর চিন্তাকুল ও বিস্মিত চিত্তে অদূরে ঈদৃশ হৃদয়বিদারক, কর্কশাক্ষরময় গীত শ্রবণ করিতে লাগিল :

জয় অতুলশক্তিদীধিতিপিঞ্জর-
ভুজদণ্ডচণ্ডরণরভস।
সুখদ কুমুদকাননবিকাসনেন্দো
কুমার জয় দিতিজকুলমহোদধিবড়বানল।
ষণ্মুখ মধুররব ময়ূররথ
সুরমুকুটকোটিঘট্টিতচরণ নখাঙ্কুরমহাসন।
জয় ললিতচূড়াকলাপনববিমলদল
কমলকান্ত দৈত্যবংশদুঃসহদাবানল।
জয় বিশাখ বিভো জয় সকললোকতারক
স্কন্দ জয় গৌরীনন্দন ঘণ্টাপ্রিয়।
প্রিয় বিশাখ বিভো ধৃতপতাকপ্রকীর্ণ
পটল কনকভূষণভাস্বরদিনকরচ্ছায়।
জয় জনিতসম্ভ্রমলীলালূনাখিলারাতে জয়
সকললোকতারক দিতিজাসুরবরতারকান্তক।
স্কন্দ জয় বাল সপ্তবাসর জয়
ভুবনাবলিশোকবিনাশন। মৎস্য।১৫৯।৪০-৪৩।

এই গাথায় কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আজকাল যেমন যুদ্ধ-যাত্রাকালে জাতীয় সংগীত গীত হইয়া থাকে পূর্বে সেইরূপ হইত না। তখনকার দিনে সেনা-পতিরই প্রশস্তি গাওয়া হইত। যুদ্ধে নানারূপ বাদ্যের সহিত ঘণ্টাও বাজান হইত। কার্ত্তিকেয়কে ঘণ্টাপ্রিয় বলা হইয়াছে। ঘণ্টার প্রচলন ক্রমে উঠিয়া যায়। ভারত-যুদ্ধে শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ ইত্যাদি নিনাদিত হইয়াছিল কিন্তু ঘণ্টার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কার্ত্তিকেয় অতি তরুণবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাত্র সাত বৎসরের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ছিল এজন্য তাঁহাকে গাথায় 'বাল সপ্তবাসর' বলা হইয়াছে। তাঁহাকে তারকাসুর বলিয়াছিলেন 'তুমি কি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি বালক মাত্র। তোমার এখনও কন্দুক লইয়া খেলা করিবার বয়স যায় নাই। তুমি সমর-ভীষণ যুদ্ধোন্মত্ত অসুরদিগকে দেখ নাই তাই এ বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে।'

যযাতি-গাথা পুরাণে প্রসিদ্ধ। এই গাথা রাজা যযাতির নিজের রচিত। বিষয়বস্তুভোগ দ্বারা কামনার বিনাশ হয় না ইহাই গাথায় গীত হইয়াছে। গাথাটি খুবই লোকপ্রিয় ছিল মনে হয়। একাধিক পুরাণে ইহা ধৃত হইয়াছে। গাথার প্রথম শ্লোকটি এখনও অনেক লোকের মুখে শোনা যায়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ বিষ্ণু।৪।১০।৯।

গাথার সাতটি শ্লোক আছে। বায়ু ও বিষ্ণুর যযাতি-গাথায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যে শ্লোকগুলি উভয় পুরাণে অনুরূপ তাহার ভাবার্থ দিলাম। 'বিষয়বস্তুর ভোগে কামনার উপশম হয় না, অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন তাহা না কমিয়া অধিকতর প্রজ্জলিত হয় সেইরূপ ভোগের ফলে বিষয়-বাসনা বাড়িতেই থাকে। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশু, এবং স্ত্রীলোক আছে তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ মিটে না, সেজন্য অতিতৃষ্ণা ত্যাগ করিবে। দুর্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিলে সুখের দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয় কিন্তু তাহার জীবনের আশা ও ধনের আশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না।'

আগুনে ঘি ঢালার উপমা এই গাথায় যযাতি কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়; এখন তাহা সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণবর্ত্ম অগ্নির আর এক নাম, কারণ জঙ্গলে আগুন দিলে আগুন নিজ পথে কৃষ্ণচিহ্ন রাখিয়া যায়। পুরাকালে বন সাফ করিবার জন্য এই উপায়ের বহুল প্রচলন ছিল। গাথায় কৃষ্ণবর্ত্ম কথা ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। বেদেও অনেক স্থলে কৃষ্ণবর্ত্ম কথা আছে। এখন একথাটার চলন নাই।

পুরাণে আর এক অতি প্রাচীন গাথার উল্লেখ আছে। ইহার রচয়িতা ভগবদ্‌গীতোক্ত উশনা। ইনি আদি কবি বলিয়া কথিত। ধ্রুব ও তাহার মাতা সুনীতির মহিমা এই গাথায় কীর্তিত হইয়াছে। গাথার ভাবার্থ যথা, 'অহো, ইহাঁর তপস্যার বল, অহো ইহাঁর তপের ফল যাহার প্রভাবে ইহাঁকে সম্মুখে রাখিয়া সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত আছেন। আর এই ধ্রুবের সুনীতি বা সুনৃতা নাম্নী মাতা, ইহাঁর মহিমাই বা পৃথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সক্ষম, যিনি ধ্রুবকে গর্ভে

ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ ত্রিলোকের পরম স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অচঞ্চলরূপে অবস্থান করিতেছেন।'

মান্ধাতার নামে এক গাথা প্রচলিত আছে। মান্ধাতা চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। এখন যেমন বলা হয় যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না, সেইরূপ মান্ধাতার সম্বন্ধে বলা হইত :

যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।

সর্বং তদযৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥ বিষ্ণু।৪।২।১৮।

অর্থাৎ, 'সূর্য যেখান হইতে উঠেন ও যেখানে অস্ত যান তাহার অন্তর্গত সমুদয় প্রদেশ যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়।' এই শ্লোকের রচয়িতা কে তাহা জানা নাই।

ভগীরথ সম্বন্ধে গাথা আছে, 'ভগীরথ কর্মবলে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এইজন্য বংশবিদ্ ব্যক্তিগণ গঙ্গাকে ভাগীরথী বলিয়া থাকেন।' নাভাগ বংশে মরুত্ত নামে এক অতি ধনশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে গাথা আছে, 'মরুত্ত রাজার যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্বপ্রকার যজ্ঞসামগ্রী স্বর্ণনির্মিত ছিল; স্বর্ণপাত্রে সোমরস পান করিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হন, ব্রাহ্মণগণও দক্ষিণায় সন্তোষলাভ করেন। এই যজ্ঞে দেবতারা সদস্য হইয়া পরিবেশকের কার্য করিয়াছিলেন।' রাম সম্বন্ধে যে গাথা কীর্তিত হইয়াছে তাহা প্রধানত প্রশস্তি-বাচক। ইহাতে রামকে লোহিতচক্ষু, সুমুখ, সিংহস্কন্ধ এবং মহাভুজ বলা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে বেদপাঠের শব্দ এবং ধনুকের টংকার অবিচ্ছিন্ন শোনা যাইত এবং নিয়ত দীয়তাং ভুজ্যতাম্ রব উত্থিত হইত, ইত্যাদি। কাশিরাজ-গোত্রে ধন্বন্তরির বংশে অলর্ক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে গাথা আছে, 'অলর্ক ব্যতীত অপর কেহই যুবার ন্যায় উৎসাহ সহকারে ষাট হাজার ষাট শত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজ্যভোগ করেন নাই।' ষাট হাজার ষাট শত বৎসর উপলক্ষণ প্রয়োগ, ইহার প্রকৃত অর্থ ছেষট্টি বৎসর। এত দীর্ঘ রাজ্যকাল কদাচিৎ দেখা যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া চৌষট্টি বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার নামে গাথা না থাকিলেও তাঁহার রাজ্য-ভোগের ষাট বৎসরে হীরক 'জুবিলি' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মরণীয় কালের মধ্যে অপর কোন নৃপতির এ সৌভাগ্য দেখা যায় নাই। ভীষ্মের পিতা শন্তনু বা শান্তনুর আসল নাম জানা নাই। তাঁহার নামের নিরুক্তি তাঁহার সম্বন্ধে রচিত গাথায় পাওয়া যায়। 'রাজা সময়পূর্বক যে যে জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতেন সেই সেই পুরুষই পুনরায় যৌবন-লাভ করিত এবং পরম শান্তি পাইত এইজন্যই ইঁহার নাম শান্তনু।' তিনি মহাভিষ অর্থাৎ মহাচিকিৎসক নামে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে লোকে এখনও বিশ্বাস করে যে, king's evil অর্থাৎ গণ্ডমালা রোগ রাজার হস্ত-স্পর্শে সারিয়া যায়। শান্তনু যেমন 'মহাভিষ' উপনাম পাইয়াছিলেন সেইরূপ মূলক নামে রামের এক পূর্ব-পুরুষ 'নারীকবচ' নামে সাধারণে খ্যাত হইয়াছিলেন। পরশুরামের আক্রমণকালে ইনি নারীবেশ ধারণ করিয়া বিবস্ত্রা নারীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে রক্ষা করেন। তৃণবিন্দু প্রভৃতি আরও কতিপয় রাজার নামে গাথা প্রচলিত আছে কিন্তু তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। রাজা জ্যামঘ একজন যদুবংশীয় নৃপতি। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বড়ই মজার গাথা প্রচলিত আছে। জ্যামঘের কাহিনী এইরূপ :

রাজা জ্যামঘ অল্পবয়স্ক এবং অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা; কোন কোন পুরাণে তিনি চিত্রা বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। শৈব্যা জ্যামঘ অপেক্ষা অধিক-বয়স্কা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এখনও রাজপুতানায় রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ অসম বিবাহ প্রচলিত আছে। এক বংশের পুত্র জন্মিলে অপর বংশে যে কন্যা হইবে তাহার সহিত বিবাহ দিবার কথা পূর্ব হইতেই ঠিক থাকে। হয়ত কন্যার আগে জন্ম হইল এবং তাহার অনেক বৎসর পরে অপর বংশে পুত্র জন্মিল। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি অনুসারে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ হয়। অনেক সময় কন্যার বয়স বর অপেক্ষা কুড়ি বৎসরেরও বেশী হইতে দেখা যায়। জ্যামঘের বোধ হয় এই প্রকার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বয়স্থা পত্নীর খুবই অনুগত ছিলেন। পুত্র না হওয়ায় জ্যামঘের মনে খেদ ছিল কিন্তু তিনি শৈব্যার ভয়ে অন্য বিবাহ করেন নাই। একবার জ্যামঘকে যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। তিনি অশ্ব-গজ ইত্যাদির সম্মর্দনজনিত ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সমস্ত শত্রু-সৈন্য পরাজিত করিলেন। চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। এমন সময় জ্যামঘ শুনিতে পাইলেন কোন নারী 'আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। জ্যামঘ নিকটে যাইয়া সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, ঐ কন্যা রাজকন্যা; তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছেন। অত্যন্ত ভয় পাওয়ায় কন্যার আয়ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও চঞ্চল হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন 'আমার পুত্র-সন্তান নাই, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, আমি যদি এই কন্যাকে বিবাহ করি তবে সন্তানলাভ করিতে পারি। বিধাতা স্বয়ং বুঝি আমাকে এই কন্যারত্ন দিলেন। ইহাকে এখন নিজ রাজধানীতে লইয়া যাই ও পরে শৈব্যার অনুমতি-ক্রমে ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।' তখন রাজা কন্যাকে

রথে তুলিয়া লইয়া নিজ নগরের দিকে যাত্রা করিলেন। অনন্তর দেবী শৈব্যা অনেক আত্মীয়স্বজন, অমাত্য পরিজন ও ভৃত্যগণসহ বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার বাম পার্শ্বে কন্যাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে অধরপল্লব স্ফুরিত করিয়া বলিলেন, 'হে অতিচপলচিত্ত, এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?' রাজা অতিশয় ভয়ে আমতা আমতা করিয়া কি উত্তর দিতেছেন তাহা না বুঝিয়াই বলিলেন, 'এই কন্যাটি আমার পুত্রবধূ।' শৈব্যা বলিলেন, 'আমার পুত্র হয় নাই তোমারও অন্য পত্নী নাই তবে কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?' রাজা নিজেকে সামলাইবার জন্য বলিলেন, 'তোমার যে পুত্র জন্মিবে ভবিষ্যৎকালে ইনিই তার ভার্যা হইবেন।' এই কথা শুনিয়া শৈব্যা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' কথিত আছে, রাজা ও রাণীর মধ্যে পুত্রজন্ম সম্বন্ধে যে আলাপ হইয়াছিল তাহা দৈবক্রমে অতি 'শুদ্ধ লগ্ন হোরাংশকাবয়বাদিতে' নিষ্পন্ন হয়। ফলে শৈব্যা সন্তান-প্রসবোচিত বয়স অতিক্রম করিলেও অল্প দিনের মধ্যে গর্ভবতী হইলেন। এই গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম বিদর্ভ। কালে বিদর্ভের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। জ্যামঘ সম্বন্ধে গাথা আছে,

ভার্য্যাবশ্যাস্তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ।
তেষাস্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূন্নৃপঃ॥

অর্থাৎ, জগতে যত স্ত্রৈণ পুরুষ জন্মিয়াছিলেন এবং গত হইয়াছেন অথবা যাঁহারা জন্মিবেন তাঁহাদের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ।

কবির সুখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা লিখিয়া পাই নি অর্থ,
পাই নাই কোনো খ্যাতি।
হয়েছি স্বপ্ন-বিলাসী, অলস,
অনুযোগ কর সাথী।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ,
ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন মান লাগি কবিতা লিখি না,
আমি মরি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হলে চাষ করিতাম,
ব্যবসা—চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল ফেলা চাই,
আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ।

অনটন দেয় আঘাত নিত্য
মচ্‌কাই তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাহি মোর,
ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধার যখন কাটিতে চায় না,
একা বসে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমার এসে উঁকি মারে,
আকাশ ভরে যে আবীরে।
বিদ্রূপ পাই, নিন্দাও পাই,
নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে
আমি থাকি সেই আশাতে।

কি অর্থ খ্যাতি পাইবার লাগি
ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে
কঠোর জীবন যাপিয়া?
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা
তারা কি মুক্তা মণি চায়?
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে
নিতি প্রতি অণু-কণিকায়।
আমি সেই সুখ সেই সে তৃপ্তি—
আমি সেই প্রেম-ভিখারী,
আলোক মাগি যে, আতপ চাহি যে,
সেই হোমানল শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতময়,
শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর
আমার অবনী বালকের।
সোনার নূপুর গুঞ্জরে যেথা,
বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয়
সব ব্যথা যাই পাসরি।
লিখি হিজিবিজি কি পাই তাহাতে?
বন্ধু কহিব কিবা আর—
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি
উপজে যে সুখ বিধাতার।

মনস্তত্ত্বে এডলারের দান

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে এডলারের দানের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই ফ্রয়েডের কথা কিছু বলা আবশ্যক; কারণ এডলার প্রথমতঃ ফ্রয়েডের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের নির্জ্ঞান মন এবং অবদমন সম্বন্ধে মতবাদগুলি খানিকটা গ্রহণও করিয়াছিলেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে ফ্রয়েডের মতানৈক্য আছে। ফ্রয়েডের বিশ্বাস আদিম যৌন কামনাই বিভিন্ন রূপে নির্জ্ঞান মন বা সংজ্ঞান মনের ভিতর দিয়া আমাদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এডলার কিন্তু যৌন কামনাকে অতটা গুরুত্ব দিতে চাহেন না; তাঁহার মতে শক্তির আকাঙ্ক্ষাই (will to power) আমাদের ক্রিয়াকপলাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এডলার বলেন, জাতককে জীবনের পথে চলিতে হইলে তিনটি ব্যাপারে জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে সমাজের সহিত, দ্বিতীয়টি পেশা ও কর্ম্মজীবনের সহিত এবং তৃতীয়টি প্রেম ও প্রেমাস্পদের সহিত। এই তিনটি ব্যাপারে সে শৈশবে ও বাল্যে যেমনভাবে সাহায্য বা বাধা পায়, সেই অনুসারে তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

এডলার বলেন, মানুষ শৈশবে অত্যন্ত অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই অসহায় ভাবটি আমাদের নিকট দুই ভাবে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে; প্রথমতঃ অনুপযুক্ত ব্যবহার বা অনুপযুক্ত পরিবেশের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ দেহযন্ত্রগত দুর্ব্বলতা, হীনতা বা অসম্পূর্ণতার জন্য।

মাত্রাতিরিক্ত ভাবে তিরস্কার করা, "আতু আতু" করা, "নাই" দেওয়া, একচোখোমি করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া, অহেতুক শাসন তাড়না করা ইত্যাদি অনুপযুক্ত ব্যবহারের পর্য্যায়ে পড়ে। অনুপযুক্ত পরিবেশ নানা ভাবে হইতে পারে; কেহ হয়ত পরিবারের মধ্যে বংশের প্রদীপ, আদুরে দুলাল একমাত্র পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিল, কেহ হয়ত পিতার বৃদ্ধ বয়সের শেষ-কুড়ান ছেলে হইল, বাড়ীর আদুরে চতুর্থ বা পঞ্চম কন্যাটি হয়ত হঠাৎ একটি ভাই লাভ করিয়া তাহার আদর-মর্য্যাদা হারাইল। কেহ হয়ত পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিল, কেহ বা বিমাতা-প্রতিপালিত বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া 'মানুষ' হইল। ইহাদের সকলেরই গৃহ-পরিবেশ সুস্থ সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল নহে।

ইহা ছাড়া দেহযন্ত্রগত অসম্পূর্ণতা বা হীনতাবোধও মানুষের সামাজিক আচরণের অসঙ্গতি ও প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে একটা প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দেহগত অসম্পূর্ণতা জাতকের মনে একটা ভয়, অসহায়তাবোধ এবং লজ্জাতুরতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অনেক সময় অস্বভাবী করিয়া তুলে।

এডলার বলেন, এই সমস্ত প্রাথমিক অন্তরায়ের জন্য তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে;—প্রথমটি হইতেছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (successful compensation) দ্বিতীয়টি—পরাজয় বা পলায়নের প্রচেষ্টা (defeat or retreat) এবং তৃতীয়টি—ক্ষতিপূরণের আতিশয্য (over-compensation) জনিত অস্বভাবী আচরণ।

ক্ষতিপূরণের উদাহরণ—বিথোভেন ডিমস্থেনিস প্রভৃতি। বিথোভেন বধিরতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের এই অসম্পূর্ণতার সফল ভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া উত্তর জীবনে তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিমস্থেনিসও তাঁহার বাল্যের তোতলামিকে জয় করিয়া সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়তই পথে ঘাটে দেখিতে পাই। ইহা যাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়, তাহারা নিজেদের অক্ষমতা বা অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জীবন-সংগ্রামের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং কল্পনার জগতে অথবা গৃহ-পরিবারের অভিভাবকত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চায়।

তৃতীয় প্রকার প্রতিক্রিয়ার উদাহরণও বিরল নহে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই "হাবা কালা কাণা খোঁড়ার এক কাঠি বাড়া।" তাই দেখা যায়, ছোট্ট হাল্কা ব্যক্তিত্বহীন মানুষটি প্রায়ই আত্মপ্রচারের জন্য আকুল ভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কুৎসিত মেয়েটি হয়ত সাজপোশাকের চাকচিক্যে ও রূপের বাহাদুরিতে লোকের চোখ ঝলসাইয়া দিতে চায়, জীর্ণ দুর্ব্বল ছেলেটি পুরুষোচিত বীরত্বের অভিনয়ে সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিতে চায়।

এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় একটা সামঞ্জস্যবিধান বা খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা। এডলারের মতে আমাদের জন্ম ও পরিবেশগত ত্রুটির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ করিয়া সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যেই আছে সুস্থ মনুষ্যত্ব। এই সামঞ্জস্যবিধানে একটু এদিক-

ওদিক হইলেই মাত্রাহীনতা বা মাত্রাতিরিক্ততা আসিয়া মানুষকে একটা অস্বাভাবিকত্ব দান করে। সুতরাং আমাদের যাহা কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে, তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের বাল্য-জীবনে পরিবেশ বা প্রতিপালনের দোষে নিজেদের সম্বন্ধে হীনমন্যতা (inferiority complex) এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেই হীনমন্যতার অনুভূতি হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। এইখানেই ফ্রয়েডের সঙ্গে এডলারের পার্থক্য। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের অস্বাভাবিকত্বের মূলে আছে অধিশাস্তা (Super ego) মন বা নীতিবোধের সহিত আদিম যৌন কামনার (id) সংঘাতজনিত অবদমন প্রভৃতি, আর এডলার বলেন ইহার মূলে আছে হীনমন্যতা, সমাজ-পরিবারের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাব। সেই ব্যক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক চরিত্রবিশিষ্ট, যাহার ব্যক্তিগত "আমি"টীর (ego) সহিত সমাজগত "আমি"র (community feeling) একটি সামঞ্জস্য হইয়াছে।

এই সামঞ্জস্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে জাতকের নিজের গৃহ ও পরিবারের সহিত সামঞ্জস্যবিধান। সুতরাং যে গৃহে জাতকের আত্মসম্মান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সেখানে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। আবার গৃহের মধ্যে বালকটিকে মহামানী মন্যুময় দুর্য্যোধন করিয়া মানুষ করিলেও তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। কারণ গৃহের ছোট্ট গণ্ডীটি ছাড়িয়া যখন সে বাহিরের বৃহত্তর সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিবে, তখন সে দেখিবে বাহিরের জগৎ তাহাকে তেমন ভাবে মাথায় করিয়া নাচিতেছে না, তাহার অভীষ্ট মূল্য দিতেছে না। তখনই আসিবে তাহার ব্যর্থতা এবং সমাজ হইতে পলায়নস্পৃহা, গৃহ-মুখিতা, ভীরুতা ও লজ্জাশীলতা। আবার যে ছেলেকে বহু দিন ধরিয়া "খোকা" করিয়া রাখিয়া "ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" বাঁধিয়া প্রতিনিয়ত আতু আতু করিয়া মাতাপিতার সতর্ক দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যেই রাখা হয়, সেও জগতের সঙ্গে সুস্থভাবে কারবার করিতে পারে না এবং ভীরু আত্মকেন্দ্রিক ও পলায়নপর হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার জীবনে তিনটি জিনিষের আহ্বানে (challenge) সাড়া দিতে হয়,—সমাজ, পেশা ও প্রেম। ইহাদের কোনটিকেই অন্য-নিরপেক্ষ এককভাবে বিচার করা চলে না। বস্তুতঃ মানুষ প্রেমের ব্যাপারেও কি ভাবে আচরণ করিবে তাহা নির্ভর করে আমাদের সমাজ ও পেশাগত জীবনে সার্থকতা এবং ব্যর্থতার উপর।

এডলার বলেন, আমাদের অহম্‌টির (ego) সহিত বাহিরের জগতের প্রথম সম্পর্ক হয় গৃহের পরিজনকে লইয়া। কাজেই এই পরিজনের নিকট আমরা যেরূপ আচরণ বা অভিজ্ঞতালাভ করিব, তাহারই উপর নির্ভর করে আমরা বড় হইয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিব। যে বালক দেখে গৃহে তাহার মাতাপিতার মধ্যে সম্পর্কের মধুরতা ঠিক নাই, সে উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে না। যে বালক অত্যন্ত শাসন তাড়নের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, সে বড় হইয়া দুর্দ্দান্ত অথবা জেদী স্বামী হইয়া কিংবা বদমেজাজী পিতা বা গৃহ-কর্ত্তা হইয়া তাহার ক্ষমতার অভিলাষকে চরিতার্থ করিবে। এই ভাবে ক্ষমতার অভিলাষকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আমাদের যে প্রতিক্রিয়া আছে, এডলার তাহার নাম দিয়াছেন "Masculine protest."

এই প্রতিক্রিয়াটির অভিব্যক্তি নানাজাতীয় হইতে পারে। ইহার ফলে হয়ত ক্ষমতালুব্ধা দুর্ব্বলা বালিকাটি নারীসুলভ কর্ত্তব্যকে ঘৃণা করিয়া পুরুষোচিত আচরণ করিয়া তাহার দীনতাবোধকে দাবাইয়া রাখে। আবার ইহারই ফলে হয়ত দুর্ব্বল এঁচড়ে পাকা ছেলেটি সারা জীবনই নারীত্বের অভিনয় করিয়া পুরুষত্বের তেজ শক্তি ও ক্ষমতার পূজা করিয়া থাকে।

হীনমন্যতার প্রতিকার হিসাবে এই "Masculine protest" ছাড়া আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়া আছে। ইহার মূলেও ব্যর্থতার ইতিহাস এবং ক্ষমতার জন্য আঁকুপাঁকু আছে। যে কর্ত্তৃত্ব শক্তির দ্বারা অর্জ্জিত হয় না, তাহা হয়ত অনেক সময় চাতুরী বিশ্বাসঘাতকতা ছলনা কপটতা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। এইগুলিকে এডলার স্ত্রীসুলভ অস্ত্র (feminine weapons) নাম দিয়াছেন। অবশ্য এই জিনিষগুলি স্ত্রীসুলভ অস্ত্র হইলেও ইহা একান্তভাবে স্ত্রীলোকেরই সম্পত্তি নহে। যে পুরুষ প্রতিনিয়ত পরাধীনতা ও বশ্যতার দীনতার ভিতর দিয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যেও এই অস্ত্রগুলি ব্যবহারের প্রয়াস দেখা যায়।

এডলারের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার বাল্য-শৈশবের অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। সুতরাং মানুষকে বিচার করিতে হইলে তাহার গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বিশেষত্বগুলি জানিলেই চলিবে না; প্রত্যেক মানুষটিকে এক একটি পৃথক এবং (সমাজ-প্রতিক্রিয়াজাত) সম্পূর্ণ একক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সমস্যা, স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে; সমাজের সঙ্গে কারবারের জন্য তাহার ঘাতপ্রতিঘাত আছে বটে, এবং সেই ঘাত-

প্রতিঘাত তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের ইতিহাস এককভাবে তাহার নিজেরই জিনিষ; সেই ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বটুকু না জানিলে তাহার পরিচয় ঠিকমত জানা হইবে না। এইজন্য এডলারের মনস্তত্ত্বকে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব (individual psychology) বলা হয়।

এই ব্যক্তিটিকে বুঝিতে হইলে তাহার বাল্য-শৈশবের ইতিহাসকে বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে তাহার পরিবারগত জীবনধারা (family style) এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা (life style)।

বাল্যের অভিজ্ঞতার প্রভাবের উপর অনেকখানি জোর দিয়াছেন বলিয়াই এডলার আমাদের নীতিগর্হিত ও পাপের কাজগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, বেশ্যাবৃত্তি নারীর বুভুক্ষা বা উদগ্র কাম-ক্ষুধাজনিত ফল ততটা নহে, যতটা বাল্য-জীবনে বঞ্চনা ও ভোগরিক্ততার মধ্যে 'মানুষ' হওয়াতে অতৃপ্ত কামনাকে সুদে আসলে বেপরোয়াভাবে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা অথবা পুরুষকে প্রতারণা করিয়া নারীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রয়াস। প্রায় সমস্ত ব্যভিচারের মূলেই আছে শৈশবের বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার ইতিহাস, সমস্ত অস্বভাবী মানসতার মূলেই আছে শৈশবের ভ্রান্ত লালনপালন, সমস্ত পাপের মধ্যেই আছে শৈশবের অহেতুক হীনমন্যতাবোধ এবং বিকৃত উপায়ে তাহার প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা।

এইজন্য রোগের প্রতিকারের দিক দিয়াও ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সহিত এডলারের মনোবিজ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। মনোবিকলন করিয়া যৌনক্ষুধার অবদমন-জনিত জটের (complex) গ্রন্থি খুলিয়া নির্জ্ঞান মনের স্তর হইতে অসঙ্গত এবং অসামাজিক কামনার গোপন ইতিহাস সংগ্রহ না করিয়া এডলার সোজাসুজি ভাবে রোগীকে উৎসাহ দেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের ভয়ে সে হীনতর কলাকৌশলের বা কাল্পনিক জগতের আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই তাহার রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিকারের উপায় হইতেছে কল্পনার অবাস্তব জগৎ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহসের সহিত বাস্তব জগতের সম্মুখীন হওয়া এবং জয়ী হইবার চেষ্টা করা। এই জয়ী হইবার জন্য সুস্থ দেহ-যন্ত্রের প্রয়োজনও কম নহে। আমরা সকলেই জানি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপানি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনেক সময়ই আমাদের 'মেজাজ' ও আচরণকে প্রভাবান্বিত করে এবং আমাদের অহম্ ও সমাজের সহিত সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটায়। এইজন্যই এডলার মানসরোগের প্রতি-কারের জন্য ঔষধপত্রের ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। ফ্রয়েডপন্থীগণ কিন্তু এই ব্যাপারে ঔষধপত্রের চেয়ে মনোবিকলনকে অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া মনে করেন।

যাহাকে পাপ বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা শৈশবের হীনমন্যতা হইতে কি ভাবে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাহা এডলার নানা ভাবে দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের পাপমতি বালিকার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। সেই বালিকাটি তাহার চেয়ে ছোট ছোট বালিকাদের খেলায় আহ্বান করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে নদীর জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। এই ভাবে পর পর তিনটি বালিকাকে হত্যা করিবার পর সে ধরা পড়ে। পরে দেখা যায়, এই বালিকাটি তাহার জীবনের প্রথম চারিটি বৎসর মাতাপিতার কনিষ্ঠা কন্যা হিসাবে আদরের দুলালী হইয়া 'মানুষ' হইয়াছিল; তাহার পর তাহার দুর্দ্দিন আসিল যখন তাহার আর একটি নবজাত ভগিনীর আবির্ভাব হইল। সে দেখিল সে ক্রমশঃই কোণ-ঠাসা হইয়া যাইতেছে, আদর-যত্ন সমস্তই তাহার নবজাত ভগিনীটিই পাইতেছে। ক্রমে সে তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ছোট মেয়েকেই সে নিজের হন্তব্য শত্রু বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই হইল বালিকাটির পাপের ইতিহাস।

অধিকাংশ পাপের ব্যাপারেই এই জাতীয় একটা-না-একটা ইতিহাস আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিধূসরিত হওয়া, অভিমান আহত হওয়া, অবস্থার বিড়ম্বনায় নিজেকে ছোট বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হওয়া, আদর-যত্নে বঞ্চিত হওয়া, বাহবা এবং হাততালি পাওয়ার সুযোগ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, এই সমস্ত জিনিষই জাতককে সমাজবিরোধী আচরণে প্ররোচিত করে। এইজন্যই দেখা যায়, সাধারণতঃ যে ছেলে পড়াশুনায় বাহবা পায় না, সেই ছেলেটিই স্কুলের ধর্মঘটের সময় দলপতিত্ব করিয়া ছাত্রনেতা হইবার চেষ্টা করে, স্কুলের আইনশৃঙ্খলা ভাঙিয়া, আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া শিক্ষককে অপমান করিয়া বন্ধুমহলে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে।

যাহাকে আত্মাবমাননাজনিত জট বা হীনমন্যতা বলে, তাহা কি ভাবে ছাত্রদের পাপের পথে লইয়া যায়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়। একজন বালক হয়ত ক্লাসে অঙ্ক কষিতে পারে না, সহানুভূতিহীন শিক্ষক হয়ত তাহাকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করেন, তাহার বন্ধুবান্ধবদের সম্মুখে অপমান করেন। ফলে বালকের আত্মাবমাননা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বিদ্যালয়টিকেই সে হীনমন্যতার কেন্দ্র বলিয়া

মনে করিয়া স্কুল পালাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পরেই আরম্ভ হইল অভিভাবকের স্বাক্ষর জাল করিয়া চিঠি লেখা। তাহার পরে সুরু হইল স্কুল-পলাতক অবস্থায় সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে সিনেমা অভিযান, বিড়ি ফুঁকিতে শেখা, অসময়ে যৌনচেতনা লাভ করা এবং দলের বন্ধুদের অন্যান্য পাপাচরণগুলি শেখা। স্কুলের বাহিরের জগতে সে দেখে অঙ্কের ভুলের জন্য তিরস্কার নাই, ব্যাকরণের ভুলের জন্য বিদ্রূপ নাই, পদে পদে আত্মাবমাননা ও লাঞ্ছনার ভয় নাই। এখানে নেতাগিরি করিবার সুবিধা আছে, চাল মারিবার সুযোগ আছে। স্কুলের পরিবেশ তাহার আমিত্বকে ছোট করিয়া দেখায়, আর স্কুলের বাহিরের জগৎ তাহার আমিত্বকে বড় করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত সে স্কুল ছাড়িয়া দেয় এবং হয়ত "বয়াটে" হইয়া পড়ে। এই বয়াটে হইবার পরিণাম যাহাই হউক, ইহার প্রারম্ভ যে ছিল হীনমন্যতার মধ্যেই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এডলারের এই তত্ত্বটি শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাভাবেই ব্যবহারিক নির্দ্দেশ দিতে পারে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়াও অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত না করেন, বিদ্যার তাক লাগাইয়া ছাত্রদের স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা না করেন, "তোর কিচ্ছু হবে না" বলিয়া প্রথম হইতেই যদি তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া না দেন, তাহা হইলে অনেক বালকই বিপথে যায় না। যোগ্য শিক্ষক অন্যভাবেও তাহাদের বাঁচাইতে পারেন। যে বালক এক বিষয়ে পথের সন্ধান পাইল না, তাহাকে অন্য বিষয়ে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। ফলে যে বালক অঙ্ক করিতে পারিল না, সে হয়ত ভাল গায়ক হইল; যে তাহাও হইতে পারিল না, সে হয়ত ভাল চিত্র-শিল্পী হইল। এইভাবে তাহাকে আত্মাবমাননার হাত হইতে, ব্যর্থতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। আত্মাবমাননার অনুভূতি কিভাবে ছেলেদের খারাপ করিয়া দেয়, তাহা এডলার-বর্ণিত আর একটি উদাহরণ হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এই উদাহৃত গল্পটির নায়ক হইতেছে একটি পাঁচ বৎসরের বালক। বালকটির মাতাপিতা বাহিরে যাইবার সময় বাক্স সিন্দুকে তালাচাবি দিয়া যাইতেন। ইহাতে বালকটি অপমানিত বোধ করিতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত মাতাপিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে চুরি অভ্যাস আরম্ভ করিল। আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার এই চুরি-রোগ সারিল না; সে ধরাও পড়ে তবুও চুরি করিয়া যায়। পিতা বলেন, "দেখো এতে লাভ কি? তুমি যত বার চুরি কর আমি তত বারই ত ধরে ফেলি, এতে আর বাহাদুরি কি?" বালকটি তখন মনে মনে হাসে আর বলে, "কুড়ি বার চুরির মধ্যে অন্ততঃ এক বারও ত আমি ফাঁকি দিতে পারি,—ঐখানেই আমার বাহাদুরি প্রতিপন্ন হ'ল।"

এডলারীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের এইটুকুই বুঝাইয়া দেয় যে, শিক্ষার ব্যাপারে এই বাহাদুরির পথটিকে নানা দিক দিয়াই খুলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে বিপদ আছে। সোজা পথে বালকবালিকারা যদি এই বাহাদুরির পথের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে অলিগলির বাঁকা পথে, পাপের অন্ধকারে এই পথের সন্ধান করিবে। তাহাতে তাহাদের এবং জাতির কাহারও কল্যাণ হইবে না। এই অকল্যাণ হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ভাবীকালের নাগরিক প্রত্যেক ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষাকে বহুমুখী করিতে হইবে এবং তাহাদের যোগ্যতা ও শক্তিকে চিনিয়া লইয়া যথাযোগ্য পথের সন্ধান দিতে হইবে।

এডলারীয় মনোবিজ্ঞানকে অনেকে হয়ত অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিবেন। ইহার মধ্যে জটিলতা কিছু নাই, নূতন কথা কিছু নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু জটিলতা নাই বলিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটি হেলা করিবার জিনিষ নহে। ইহার মধ্যে যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, যে একটা আশার বাণী আছে, তাহা হইতে শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকেই উপকৃত হইতে পারেন। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে, দৃষ্টিকে উদার করে। ইহার ফলে আমরা পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারি; আমরা বুঝিতে পারি আজ আমরা যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে নিজের দোষে পাপী ততটা নহে, যতটা সমাজের পাপে, লালনপালনের দোষে, দুর্ব্বল দেহযন্ত্রের ত্রুটিতে। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুটির পর্য্যন্ত আত্মসম্মানের যথাযথ ব্যবস্থা না করিলে সে ভবিষ্যতে 'পাপী' হইয়া উঠিতে পারে। অত্যন্ত অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যার নিকটও আমাদের আচরণকে ভদ্র ও সংযত রাখিতে হইবে, নতুবা আমাদের আচরণের অভিজ্ঞতা তাহাদের ক্রিয়াকলাপকেও প্রভাবান্বিত করিবে এবং ভবিষ্যতে অভদ্র বা অ-নৈতিপরায়ণ নাগরিক সৃষ্টি করিবে।

কথা-সাহিত্যের প্রথম যুগ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১২৬৪ সাল বা ১৭৭৯ শকাব্দা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর কথা-সাহিত্যের এমন তিনখানি সুলিখিত পুস্তক জন্মলাভ করে যাহা বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্তক তিনখানি—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস; বিষয়-বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী—সকল দিক দিয়াই ইহা তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয়খানি এডভেঞ্চারের কাহিনী, কতকটা আরব্য-উপন্যাসের ধরণে লিখিত; তৃতীয়খানি রেঃ কণ্টার (Caunter)-কৃত *Romance of Indian History—India* অবলম্বনে লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তিনখানি পুস্তকেরই আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল-হিসাবে কেবল সালেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় তারিখ-অনুযায়ী কোন্‌টি কাহার পরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বাংলা ১২৬৪ সাল বা ১৭৭৯ শকাব্দা ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্য্যন্ত। অনেকে এই পুস্তক তিনখানির প্রকাশকাল ইংরেজী হিসাবে "১৮৫৭" ধরিয়াছেন, ১৮৫৮ সনের হিসাবটা ধরেন নাই।

সাল বা শকাব্দার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইংরেজী হিসাবে পুস্তকগুলির সঠিক প্রকাশকাল নির্দ্ধারণ করা দুরূহ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। সমসাময়িক সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে প্রকাশিত সমালোচনার তারিখ দেখিয়াও প্রায় নিঃসন্দেহে ইহা নিরূপণ করা যায়।

প্রথমেই 'আলালের ঘরের দুলালে'র কথা ধরা যাক। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১২৬৪ সাল। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ইহার প্রকাশকাল "১৮৫৭" লিখিয়াছেন। কোথা হইতে তাঁহারা এই ইংরেজী সাল সংগ্রহ করিলেন জানি না, অন্ততঃ পুস্তকে ইহা নাই; সম্ভবতঃ পুস্তকে মুদ্রিত প্রকাশকাল "১২৬৪" সাল হইতেই তাঁহারা এই ইংরেজী সাল অনুমান করিয়া লইয়াছেন। যাহাই হউক, উহা যে ঠিক নহে, ১৮৫৮ সনে যে 'আলাল' প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা প্রমাণ করা যায়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ (২৭ চৈত্র ১২৬৪) তারিখের *Hindoo Patriot* পত্রে সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন:—

"Those of our readers who have not blessed themselves with this parting gift of the Bengali Year 1264, may obtain that blessing on an application to Messrs D'Rozario & Co. and the earlier the better, for such blessings are apt to be exhausted."

উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'আলালের ঘরের দুলাল' ১২৬৪ সালের চৈত্র, অর্থাৎ ১৮৫৮ সনের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ—১৭৭৯ শকে প্রকাশিত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাসও নহে. অক্ষয়চন্দ্র সরকার-উল্লিখিত *Romance of Indian History* হইতে সঙ্কলিতও নহে; ইহা প্রকৃত পক্ষে একজন বাঙালী সৈনিকের এডভেঞ্চারের কাহিনী। আজকালকার বাঙালী পাঠক যে এই পুস্তকখানির সহিত পরিচিত নহেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত সাহিত্যরথী পর্য্যন্ত শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিন বার পাঠ করিলাম।...

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।...উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। (বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ, ৫২৫-২৭)

আশ্চর্য্যের বিষয়, অধ্যাপক শ্রীকুমার বাবু বা ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একখানি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার সুবিখ্যাত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিকপত্রের আষাঢ় ১৭৮০ (জুন ১৮৫৮) সংখ্যায় ইহার সপ্রশংস সমালোচনা করেন। সমালোচনার কালটি স্মরণ রাখিলে মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা

ভ্রমণ' মাসিকে সমালোচিত হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে—১৭৭৯ শকাব্দার শেষ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ১৭৭৯ শকের চৈত্র মাস (মার্চ ১৮৫৮) হওয়াই সম্ভব, কারণ পরবর্ত্তী ৫ই বৈশাখ হইতে কৃষ্ণকমল কিছু কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।

আলোচ্য তৃতীয় গ্রন্থ—'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১৭৭৯ শকাব্দা। ডঃ সুকুমার সেন ইহার প্রকাশকাল "১৮৫৭" বলিয়াছেন। শ্রীকুমার বাবু 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ১ম সংস্করণের সন্ধান না পাইয়া লিখিয়া বসিয়াছেন যে, ইহার "প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।" তবে তিনি শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের ('ভারতবর্ষ,' বৈশাখ ১৩৪৯) নজীরে উহা যে "১৮৫৭" তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ইংরেজী সাল যে ভুল, সম্প্রতি আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পুরাতন উল্টাইতে গিয়া ১৮৫৮, ১৮ই নবেম্বরের সংখ্যায় ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র এক দীর্ঘ সমালোচনা পাইতেছি। উপন্যাসখানি ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, একখানি স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে উহা যে দীর্ঘ এক বৎসর পরে সমালোচিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে মন সায় দেয় না। একে ত তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় বাংলা বই প্রকাশিত হইত, তাহার উপর বইখানি বন্ধুর লেখা; হরিশ্চন্দ্র যে স্বীয় পত্রিকায় উহার সমালোচনা প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব করিবেন, এইরূপ চিন্তা করা অসমীচীন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ১৭৭৯ শকে মুদ্রিত হইলেও কোন কারণে প্রকাশিত হইতে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু উহা যে ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

এই সকল কারণে, আলোচ্য পুস্তকগুলির প্রকাশের কালক্রম আমার মতে এইরূপ :—

১। আলালের ঘরের দুলাল : ১২৬৪ সাল (মার্চ, ১৮৫৮)
২। দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ : ১৭৭৯ শকাব্দা (মার্চ, ১৮৫৮)
৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস : ১৭৭৯ শকাব্দা (ইং ১৮৫৮)

গোপনচারিণী

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

প্রলয়ের মাঝে স্থিতি হে মূর্ত্তিমতী,
কাজ করে চলো গোপনে গোপনে অতি,
কে গো মায়াবিনী—রূপ নয়নাভিরাম,
গোপনচারিণী, জানি না তোমার নাম।

নয়নের কোণে মধুর জ্যোতির শোভা,
অধরের বাণী মুনিজন-মনোলোভা,
নিরলঙ্কারা, তোমার অলবাস—
সমারোহহীন, নাহি বিলাসোচ্ছ্বাস।

অসুন্দরেরে সুন্দর করো তুমি,
চরণ-পরশে পুলকিত বনভূমি;
তোমার হাসিতে গাছে গাছে ফোটে ফুল,
বনে বনে পাখী কাকলি-কূজনাকুল।

মহামিলনের রাঙা রাখী ল'য়ে করে,
আনন্দ-ভরা চোরা কটাক্ষ ভরে
সুরে ও বে-সুরে বেঁধে দাও সেই রাখী
আপনি গোপনে চোখের আড়ালে থাকি।

এ নর মহীতে তুমি চির অমৃতা,
বিধাতা তোমার রচিতে পারে নি চিতা;
পিনাকপাণির প্রলয়-ডমরুধ্বনি
স্থির সুরে তব বীণে ওঠে রণি'।

যুগে যুগে তুমি আছিলে, আছ ও রবে
মহীয়সী হ'য়ে সত্যের গৌরবে;
মিথ্যারে তুমি বরণ করো নি, তাই
এ নর মরতে তোমার মরণ নাই।

কামনা জাগায়ে গোপনে কামীর বুকে
কাম্যের রূপে দেখা দাও সম্মুখে,
কে গো মায়াবিনী, রূপ-নয়নাভিরাম
কহ পরিচয়—'প্রেম' কি তোমার নাম?

শ্রীধর স্বামীর কুল-পরিচয় ও কালনির্ণয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বনামধন্য শ্রীধর স্বামি-রচিত ভাগবতটীকা ও গীতাটীকা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত এবং উভয় গ্রন্থই বহু স্থানে বহুবার মুদ্রিত হইয়া সকলের নিকট সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। এই শ্রীধর স্বামি-রচিত অপর গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণের টীকাও বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথমোক্ত টীকাদ্বয়ের ন্যায় জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। তদ্রচিত "বালবোধিনী" নামক সনৎসুজাতীয় ব্যাখ্যা বোধ হয় অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে। ভারত-বিখ্যাত এই মহা-পণ্ডিত ও যতিবরের নাম না শুনিয়াছেন, এরূপ লোক শিক্ষিত-সমাজে অতীব বিরল। অথচ এই মহাত্মার কোন প্রামাণিক বিবরণ কেহই এযাবৎ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের পরিচয়াদি ব্যাপারে এই পরাঙ্মুখতা ও উপেক্ষাভাব বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির যে সকল উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে শ্রীধর স্বামী তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান্। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয়াদি বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শ্রীধর স্বামীর পুত্রই বিখ্যাত ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ছিলেন। এই প্রবাদ "ভক্তমাল" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীলশ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা কৈল বিস্তারিত।

* * *

শাঙ্করী বিরুদ্ধ গৌণ-লক্ষণ-ব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ।

* * *

গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণ গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে মন হইল দৃঢ়মতি।
হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া।
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তিত বালক এই কে-বা রক্ষা করে।
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যেষ্ঠী-ডিম্ব।
চাল হতে পড়ে গেল বিনা অবলম্ব।
ভাঙ্গিয়া ভিতর হতে বাচ্চা নিকলিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল।
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল।
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইল।
ভট্টিনামে রামলীলা সাহিত্য রচিল।

ভট্টিকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী নামক নগরে ধরসেন রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল। চারি জন ধরসেন রাজার অস্তিত্ব শাসনলিপি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—শেষ ধরসেনের রাজত্বকাল প্রায় ৬৫০ খ্রীঃ। সুতরাং ভট্টি কবির পিতা ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী কিছুতেই হইতে পারেন না। ভট্টিকাব্যের পুষ্পিকায় কবির পিতার নাম লিখিত আছে "শ্রীস্বামী"—তাহার পাঠান্তর "শ্রীধর স্বামী" দুই-এক স্থলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। এই ভ্রমাত্মক কল্পনা নির্ব্বিচারে অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী গুজরাট নিবাসী ছিলেন, ইহাই প্রচলিত মত।

শ্রীধর স্বামী স্বয়ং তাঁহার টীকাত্রয়ে যেটুকু আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইরূপ। (১) তাঁহার গুরুর নাম ছিল "পরমানন্দ"; গীতাটীকার প্রারম্ভ শ্লোকে তাঁহার ব্যাখ্যা-চাতুর্য্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

শেষাশেষ-মুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে "পরমানন্দ"-মাধবম্॥

ভাগবতটীকার বহু স্থলে এই গুরুনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা সর্ব্বশেষে,

ভাবার্থ-দীপিকামেতাং ভগবদ্ভক্তবৎসলাৎ।
"পরমানন্দ"-পাদাব্জ-ভৃঙ্গঃ শ্রীশ্রীধরোঽকরোৎ॥

"পরানন্দ"রূপে নামটির পাঠান্তরও স্থলে স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণ-টীকায়,

সংশ্রিতশ্রীপরানন্দ-মৃহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ।
(প্রথমাংশের শেষে ও দ্বিতীয়াংশের আরম্ভে)
পরানন্দপদাম্ভোজ-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ।
(তৃতীয়াংশের আরম্ভে)

(২) টীকাত্রয় ৺কাশীধামে রচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সহজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাশীতে রচিত হওয়াতেই কুল্লুকভট্টের মনুটীকাও তদ্রূপ সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইতে পারিয়াছিল।

গীতাটীকার আরম্ভে গুরুবন্দনার পরবর্ত্তী মঙ্গলশ্লোক হইল :

শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকার মঙ্গলশ্লোক যথা,

শ্রীবিন্দুমাধবং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহং।
বাচং বিশ্বেশ্বরং গঙ্গাং পরাশরমুখান্ মুনীন্ ॥

বৈষ্ণবের পক্ষে বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গার বন্দনা নিঃসন্দেহ কাশীবাস সূচিত করে। (৩) শ্রীধর স্বামী "নৃসিংহ"-দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাই প্রচলিত প্রবাদ এবং তদনুযায়ী পৌরাণিক সম্প্রদায়ে শ্লোকার্দ্ধ প্রচারিত আছে :

শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে স্বগুরুকে 'নৃহরি'র সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে 'বিন্দুমাধবে'র বন্দনা করিয়া তিনি স্বকীয় গুরুপাটেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের টীকায় ইহা স্পষ্টতরভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :

অথাতঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদয়ঃ।
বিন্দুমাধবতোষায় যথামতি বিতন্যতে ॥

কাশীর বিখ্যাত 'বিন্দু-মাধব' তীর্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অধুনা বেণীমাধবের ধ্বজায় পরিণত হইয়াছে। এই পবিত্রক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াই শ্রীধর স্বামী গ্রন্থরচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিন্দুমাধব-ক্ষেত্রের দেবতা ছিল বোধ হয় 'নৃহরি' অথবা নৃসিংহ।

শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় তাঁহার গ্রন্থোক্ত প্রমাণাবলী ও পারিবারিক ইতিহাস হইতে সহজসাধ্য। ভাগবতের টীকায় (৩।২৩।৩২) তিনি "বিশ্বপ্রকাশে"র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ('রুচকং মঙ্গলদ্রব্যে গ্রীবাভরণদন্তয়োঃ')—বিশ্বপ্রকাশের রচনাকাল ১০৩৩ শকাব্দ (১১১১ খ্রীঃ)। বিষ্ণুপুরাণের টীকারম্ভে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :

শ্রীমৎচিৎসুখযোগিমুখ্যরচিত-ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং,
তন্মার্গেণ ইত্যাদি।

নানা গ্রন্থকার চিৎসুখাচার্য্যের অভ্যুদয়কাল প্রায় ১২৫০ খ্রীঃ; তদ্রচিত টীকা ও তৎসম্প্রদায়ের উল্লেখ করায় শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কালের ঊর্দ্ধতন সীমা ১৩০০ খ্রীঃ অবধারিত হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধারা নানা স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই 'শ্রীধর স্বামী বংশ' নামে পরিচিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রামাণিক বিবরণ কুলপঞ্জী প্রভৃতি নানা উপকরণ হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহার সারাংশ লিখিত হইল। (১) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করেন (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬ শকাব্দ)—"আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু পূজা হইতে পারে কিনা?" তৎকালে ইহা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বহু বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী এ বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থাপত্র সঙ্কলন করিয়াছিল। "বিষ্ণু-নৈবেদ্যবিচার" নামে 'সভাবাজারীয় রাজসভাসদ-প্রণীত' একটি পুস্তিকা প্রত্যুত্তরস্বরূপ ঐ সময়ে পৃথক্ মুদ্রিত হইয়াছিল (পৃ. ৪৪+১)। তাহার শেষে (পৃ. ৪৪) ভরত শিরোমণিপ্রমুখ ১৪ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। পঞ্চম স্বাক্ষরকারীর পরিচয়লিপি অবিকল এই :—"শ্রীধরস্বামিবংশাবতংস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি।" এই ঠাকুরদাস কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। ১২৯৪ সনের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার ৯৩ বৎসর বয়সে কাশীপ্রাপ্তি হয় (নববিভাকর-সাধারণী, ২৯ কার্ত্তিক ১২৯৪, পৃ. ৬৪০)। তাঁহার হাতীবাগানের টোলে 'সর্ব্ব-শাস্ত্র' পড়ান হইত এবং ছাত্রসংখ্যা এক সময়ে প্রায় ৫০ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ ঘোষণা করিয়া "হিন্দুরঞ্জিকা"র লিখিত হয়, "ইহার তুল্য পণ্ডিত বাংলায় আর নাই" (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সংখ্যা)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২৪২-১৩১২ সন) ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র ছিলেন এবং মহেশচন্দ্র ঠাকুরদাসের টোলেই প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(২) আমরা বহু কুলপঞ্জীতে এই সুবিখ্যাত বংশের নামমালা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি। 'কুলকল্পদ্রুম' নামক ঘটকগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (বন্দ্যবংশ) কিয়দংশ মুদ্রিতও হইয়াছে (পৃ. ৩২৭-৮)। এই বংশের বিভিন্ন শাখার বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সাঁকাডাঙ্গার ঘটকবংশীয় ব্যবহারাজীব জনমেজয় ঘটক সেকালের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কুলপঞ্জীতে শ্রীধর স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত "কুলতত্ত্বদর্শন" গ্রন্থে (যশোহর হইতে ১২৯৫ সনে প্রকাশিত) লিখিয়াছিলেন :—"সুরেশ্বর নাম্দার বাড়ুরি নামে খ্যাত, এই বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে ১২ পুরুষ অন্তর শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবত ও ভগবদ্‌গীতার টীপ্পনিকর্ত্তা তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ নায়্যাচিগ্রামে বাস, পুস্তকে লেখা আছে কোন জেলায় জানি না।" (পৃ. ৪৮, পাদটীকা।) নগেন্দ্রনাথ বসু (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমাংশ, ২য় সং, পৃ. ২৫৭) একটি নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন; দুঃখের বিষয়, তিনি শ্রীধরের উপাধি ও গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ বাদ

দিয়াছেন। আমরা হস্তলিখিত মূল গ্রন্থ হইতে শ্রীধর স্বামীর ঊর্দ্ধতন নামমালা যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া লিখিতেছি।

আদিশূরানীত শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশের অধস্তন ৭ম পুরুষ "গাউ"। যথা, ক্ষিতীশ—ভট্টনারায়ণ—বরাহ—বৈনতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গাউ প্রভৃতি। তাঁহার ছয় পুত্র—"হাঁকুচশ্চ নিধো জহ্নুর্গঙ্গাধরভগীরথৌ। ষষ্ঠঃ সুরেশ্বরশ্চাপি গাউকস্য সুতা ইমে॥" এই সুরেশ্বর 'নান্দা' গ্রাম-নিবাসী ছিলেন (পাঠান্তর নান্ধা, নাঁদা, নাঁধা)। কোন কোন কুলগ্রন্থে 'নপাড়ী' বংশীয় অপর এক বহু পরবর্ত্তী সুরেশ্বর হইতে এই বংশের নামমালা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সুরেশ্বরের ধারায় কৌলীন্য ছিল না—কুলগ্রন্থে তজ্জন্য এই আদিবংশজ গোষ্ঠীর উপাধি 'বাড়ুরি' লিখিত আছে। কুলপঞ্জীতে আদিবংশজের নামমালা লিপিবদ্ধ থাকে না। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দুই কারণে—ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিতের প্রতি অসাধারণ মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং মেলবন্ধনের পূর্ব্বে এই বংশের একটি সর্ব্বজনবিদিত কুলক্রিয়া। সুরেশ্বরের অধস্তন ৮ম পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষিতীশ হইতে ১৫শ পুরুষ, শ্রীধর স্বামী। যথা, সুরেশ্বর—প্রদ্যুম্ন—গুণাকর—পীতাম্বর—গুণার্ণব—যাদবাচার্য্য ('কণ্ঠাভরণ' অথবা 'কণ্ঠহার' উপাধি)—মঙ্গলানন্দ মিশ্র—শ্রীধর স্বামী। সাঙ্কাভাঙ্গার গ্রন্থানুসারে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ১১৭।১ পত্র) যাদবের পুত্রই শ্রীধর। আমাদের হস্তগত অপর এক পুঁথিতে যাদব কণ্ঠাভরণের পুত্রের নাম লিখিত আছে "মকরন্দ মিশ্র"। এই অকুলীন গোষ্ঠীর নামমালা সব কুলপঞ্জীতে নাই। কিন্তু, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক, যে কয়টি গ্রন্থে আছে, সর্ব্বত্র স্পষ্টাক্ষরে শ্রীধর স্বামীকে ভাগবতের টীকাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথচ বিশাল রাঢ়ীয় কুল-গ্রন্থে মুখবংশীয় কৃত্তিবাস এবং বন্দ্যবংশীয় এই শ্রীধর স্বামী ব্যতীত কুত্রাপি গ্রন্থরচনার নির্দ্দেশ নাই। বেণীসংহার-নাটক, নৈষধকাব্য প্রভৃতি রচনার কথা পরে কল্পিত হইয়াছে—মূলগ্রন্থে নাই। কয়েকটি কুলপঞ্জীর বচন অবিকল উদ্ধৃত হইল। জনমজেয় ঘটকের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি কুল-পঞ্জী হইতে সংগৃহীত।—

"শ্রীধর স্বামী ভা(গ)বতের টীকাকার"
(আমাদের নিকট রক্ষিত ২ পত্র)।

"শ্রীধর স্বামী ভাগবতস্য টীকাকারক"
(পরিষদের পুথি, ১১৭।১ পত্র)।

"শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকাকার"
(ঢাকায় একটি পুথি, ১৬২।২ পত্র)।

উদ্ধৃত নামমালা হইতে শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় সহজ-সাধ্য। বন্দ্যবংশে ৬ জন বল্লালসেনের রাজত্বকালে "কুলীন" হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে ঈশান ছিলেন সুরেশ্বরের ভ্রাতা হাকুচের অধস্তন ৫ম পুরুষ এবং জাহ্লন ও মহেশ্বর অপর ভ্রাতা গঙ্গাধরের চতুর্থ পুরুষ, অর্থাৎ প্রপৌত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরেশ্বরের পৌত্রকে প্রথম কুলীনদের সমকালীন ধরা যায়। এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিলেও শ্রীধর স্বামীর জন্ম কোন প্রকারেই ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যায় না। শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কাল সুতরাং নিঃসন্দেহে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা যায়।

শ্রীধর স্বামীর কন্যাকে মুখবংশীয় ফুলিয়ামেলের বিখ্যাত কুলীন মনোহর পণ্ডিতের পুত্র বল্লভ বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত মূল কুলপঞ্জী কয়টিতে ইহা লিখিত আছে। পরন্তু বিদ্যাসাগরের 'বহু-বিবাহ' গ্রন্থানুসারে (পৃ. ২৬) স্বয়ং মনোহরই এই হানিকর বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে একটি কারিকা নানাগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে:

মনোহর বিয়ে করে নাঁধার বাঁড়ুরী।
পরে কুল ভেঙ্গে পায় শোধার আকুরী॥

এই বিবাহ হইতে ফুলিয়া মেলোৎপত্তির বীজভূত প্রথম 'নাঁধা' দোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীধরের অভ্যুদয় কাল বিবেচনা করিলে মনোহরের পক্ষেই এই বিবাহ করা সম্ভব হয়, মনোহরের পুত্র বল্লভের পক্ষে নহে। মনোহরের পিতৃব্য ছিলেন কৃত্তিবাস কবি—শ্রীধর স্বামী ও কৃত্তিবাস সুতরাং প্রায় সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। কৃত্তিবাসের জন্ম আমরা ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছি (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩০৯) এবং সম্ভবতঃ শ্রীধর স্বামী তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রীধর স্বামীর অধস্তন বংশধারা অতীব বিস্তৃত—সেহাখলা, নারীট, ঝিকড়া, হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের ভট্টাচার্য্য-গণ এই বংশীয় বটেন। ইঁহারা প্রধানতঃ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং উক্ত গ্রামসমূহে প্রাচীনকাল হইতে এই বংশে যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সমষ্টিসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে। আমরা বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান উদ্ধার কর্ত্তা নারীটের ভট্টাচার্য্য বংশীয় স্বনামধন্য মহেশ ন্যায়রত্নের ধারাটি মাত্র নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীধর স্বামীর একটি মাত্র পুত্র ছিল "শ্রীকর বিদ্যার্ণব"—সম্ভবতঃ ইঁহার শৈশবকালেই শ্রীধর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যার্ণবের পুত্র (হরিহর) বিদ্যাবল্লভ ও তৎপুত্র রমানাথ বিদ্যানিবাস। কোন কোন পুথিতে বিদ্যার্ণব ও বিদ্যানিবাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। বিদ্যানিবাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন ও তৎপুত্র

জানকীনাথ চূড়ামণি। জানকীনাথের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন মহেশচন্দ্র। যথা, জানকীনাথ—রাজেন্দ্র সার্ব্বভৌম (২য় পুত্র)—গোবিন্দ তর্কালঙ্কার (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—শ্রীপতি ন্যায়বাচস্পতি (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—রাধাবল্লভ তর্কবাগীশ—হীরালাল তর্কশিরোমণি—হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মহেশচন্দ্র শ্রীধর স্বামীর অধস্তন ১৪ পুরুষ এবং আদিশূরানীত ক্ষিতীশ হইতে অধস্তন ২৮ পুরুষ ছিলেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১৬ পুরুষ (কণ্ঠাভরণ হইতে ন্যায়রত্ন পর্য্যন্ত) অবিশ্রান্ত ধারায় উপাধিধারী শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেশচন্দ্রের ধারাটি প্রায় জ্যেষ্ঠানুক্রমিক—শ্রীধরের জন্ম ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে ধরিলেও এই ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ-ধারায় এক পুরুষের গড়পড়তা হয় "৩৭ বৎসর"। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, চারি পুরুষে এক শতাব্দী বাংলাদেশে কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে কোন কালে লক্ষিত হয় না। মহেশচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষদের বহু পারিবারিক তথ্য কুলগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। আমরা দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি। হুগলীর ১২১০৪ নং তায়দাদে দৃষ্ট হয়, ১২০৯ সনে হীরালাল তর্কশিরোমণি এক খণ্ড বৃহৎ নিষ্কর ভূমির দখলকার ছিলেন। ছোটফুলিয়ার মুখবংশে হরি মিশ্র একজন কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দ, পৃ. ১১৪)। তাঁহার এক অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র পুরুষোত্তম সম্বন্ধে লিখিত আছে—"নান্দাবন্দ্য গোবিন্দ তর্কালঙ্কারস্য কন্যাবিবাহাৎ নৈকস্যভঙ্গঃ" (ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ফুলিয়া প্রকরণ, ৩৩।১ পত্র)। এতদনুসারে গোবিন্দের অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমাংশ। পশপুরনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত কৃপারাম তর্কবাগীশ (১১০০-১২১০ সন) প্রথম বিবাহ করেন "নারিটী"-নিবাসী গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশের কন্যাকে—গৌরীকান্তের দৌহিত্রের নাম ছিল রামসুন্দর তর্কপঞ্চানন (হুগলীর ২৯৮৭১ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গৌরীকান্তের জন্ম ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

পুণার ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানে শ্রীধরাচার্য্য রচিত "গীতাসারটীকা"র পুথি রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীধর স্বামীর গীতাটীকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে। ভগবদ্গীতার পরিশিষ্টস্বরূপ 'গীতাসার' নামক এক ক্ষুদ্র অতি দুর্লভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সম্বাদে তন্ত্রসম্মত গূঢ় যোগরহস্য-ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে। টীকার পুষ্পিকাটি অতীব মূল্যবান্ এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

> "ইতি শ্রীগীতাসারটীকা ব্রহ্মলবোধিনী সমাপ্তা।
> কৃতিঃ শ্রীনরসিংহ-পাদপদ্ম-পরাগপুঞ্জপবিত্রিতানাং
> শ্রীশ্রীধরাচার্য্যাণাম্। * * *
>
> কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জলনিধৌ তত্ত্বযোগগূঢ়ে
> কুত্রকৃফাছিপত্তিবিবলংপার্থরত্নাদ্রি-কূটে।
> শ্রীকৃষ্ণেনাবিরলবিবৃতাবর্ত্ত্যতার্থং বিগাঢ়ে
> স্বচ্ছং গীতামৃতমুদতবৎ সপ্তসাপ্তাবিত্তং যৎ।

সংসারেস্মিন্ তত্ত্বতাৎপর্য্যভূত্যৈ, টীকাখ্যাতা ব্রহ্মলবোধিনীয়ম্।
"আচার্য্যেণ শ্রীধরেণ ত্রিবেণী-সঙ্গ-স্নানকালিতান্তর্মলেন।
"রাগাবিষ্টে" বিক্রমাদিত্যশাকে, মাঘে ক্লিষ্টে সোমবারেণ দর্শে।
সিদ্ধে যোগে বিন্দুমন্তল্লকূটে, সিদ্ধক্ষেত্রে "মাধবাখ্য"বিশিষ্টে।

(১৮৭৫-৬ সনের ৪২৫ সংখ্যক পুথি)

নরসিংহের উপাসক এই শ্রীধরাচার্য্য ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া মাধব-মন্দির-সমন্বিত যে সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিন্দু-মাধবতীর্থ-সমন্বিত কাশীধামই বটে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে যোগাভ্যাসরত শ্রীধর স্বামীই এই টীকাকার বলিয়া মনে হয়। টীকাটির রচনাকাল হইতেছে 'কটপয়াদি'ক্রমে লিখিত "১৪৩২ বিক্রমাব্দ"—ঐ সনে বস্তুতই মাঘের অমাবস্যা সোমবারে পড়িয়াছিল (=২১ জানুয়ারী ১৩৭৬ খ্রীঃ)। আমাদের নির্ণীত শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কাল এস্থলে আশ্চর্য্যরূপে সমর্থিত হইতেছে। তাঁহার প্রধান গ্রন্থসমূহ সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রায় ১৪০০ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৩

এমনি করেই কাটল কয়েকটা মাস।

বাপের অসুখে তাল দিতে দিতে প্রভাতের উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ হতে লাগল। যে সাধনায় ও মনোনিবেশ করবে ভেবেছিল তা রইল বহুদূরে। একটা বছর বৃথাই গেল—ক্লাস নেওয়ার সঙ্গতি ওর হ'ল না।

জানুয়ারীর প্রথমে অমিয়েষের সঙ্গে দেখা। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, এতদিনে সুযোগ হ'ল ভাই—শীগ্‌গিরই ইউরোপ যাচ্ছি।

তোমাদেরও সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।

কি করব ভাই—বাবা বললেন, যখন পড়তেই যাচ্ছ না—তখন বিজনেসের আদি অন্ত কিছু জেনে নাও। আজকাল ব্যবসা বলতে ঘর নিয়ে থাকলে তো হবে না—পৃথিবীটা যে এগিয়ে এসেছে। তাই তালিম দিচ্ছিলাম এতদিন।

কন্‌গ্র্যাচুলেসনস্‌।

কিন্তু আমার ইচ্ছা শুধু শিল্প-কারখানা দেখা বা ইউরোপের মার্কেট ষ্টাডি করা নয়—ওই সঙ্গে ও দেশের সাহিত্য ও মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা।

প্রভাত বললে, এ দেশে বসে ওদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য বুঝি?

অমিয়েষ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, মানুষের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখলে যেমন জ্ঞানলাভ হয়—

তা ঠিক—যাদের সে সুযোগ আছে—তারা কেনই বা তা না জানবে!

অমিয়েষ বললে, গিয়ে চিঠি দেব—উত্তর দিতে ভুলবি না তো?

প্রভাত বললে হেসে, আকাশের এক ফোঁটা জল পুকুরে পড়লে কি হয় জান তো?

অমিয়েষ হেসে উত্তর দিলে, তাই তো পুকুর ভরে ফোটে পদ্মফুল।...

তোমার জীবনের এই আশা সার্থক হোক।

সত্যই কি আনন্দ লাভ করতে পারলে প্রভাত? ওর মনে কি ক্ষোভ জাগছে না যে বৃহৎ পৃথিবী আজ অমিয়েষের বিচরণ-ক্ষেত্র হতে চলেছে! কল্পনায় আঁকা সমুদ্র নানা বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র বেশধারী নরনারী তাদের রীতিনীতি শিক্ষা সভ্যতা নিয়ে ওর জগতে এসে দাঁড়াবে। ও সার্থক হবে—বড় হবে। আজ প্রভাত যদি অমিয়েষ হতো! না—না—ওর সৌভাগ্য প্রভাতের মনে ঈর্ষ্যার ছায়াপাত করছে—এ ঈর্ষ্যাই। এই ঈর্ষ্যাকে জয় করতে না পারলে...বড় দুর্ব্বল—বড় একলা, অত্যন্ত নিঃস্ব প্রভাত। প্রবাদ বলে—সকলকারই জীবনে একদিন-না-একদিন সৌভাগ্য স্মিতহাস্যে কটাক্ষপাত করে। কিন্তু যারা মাথায় বোঝা নিয়ে জন্মেছে অভাবের সংসারে, পেটের ক্ষুধা ও দেহের লজ্জা মিটলেই তো তারা সৌভাগ্যবান! দূর দূরান্তর ভ্রমণ, জ্ঞান-তৃষ্ণার শান্তি বা বিচিত্র আনন্দ স্বাদে পরিতৃপ্ত হওয়ার দুঃস্বপ্ন তারা কেন দেখে! তারা জন্মায় কোন্ প্রয়োজনে এবং মৃত্যুর পরে রেখে যায় কি সম্পত্তি? অথচ সাধারণ ঘরের ছেলেই অধ্যবসায়ে হয়েছে জ্ঞানতপস্বী—মহাসাধক—দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক—জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। সে দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এরা।

ভাবতে ভাবতে ও বড় বাড়ীটার সামনে এসে পড়েছে। বৈঠকখানা থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে।

মুহূর্ত্তে প্রভাতের মন বিরূপ হয়ে উঠল। কিছুদিন আগেকার অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি ভেসে উঠল মনে। সেই দিন থেকে এ বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্কই তো রাখেন নি প্রভাত। মাঝে মাঝে মেজ-জ্যেঠাইমার কথা মনে হয়—অতীত দিনের কাহিনীর পাতায় শক্তিময়ী এক নারীর কথা—কিন্তু সেই কাহিনীর পিছনে মানুষের স্বার্থের কুশ্রী প্রকাশে স্বতঃই বিমুখ হয়ে ওঠে চিত্ত। মাঝে কি মাঝে না এই ইতস্ততঃ-ভাব ওর মনকে দোলা দিতে লাগল। অবশ্য সময় সব কিছুর তীব্রতা হরণ করে—বহুদূরের অপ্রীতি এই মুহূর্ত্তে সেদিনকার মত তীব্র বোধ হচ্ছে না। ওর চিন্তার রাজ্যে আর একটি দুয়ার গেল খুলে। এককালের ধন-জন-সমৃদ্ধ অট্টালিকার গর্ব্বোদ্ধত মূর্ত্তি আজ নাই। ক্ষমতার রশ্মি সংহরণ করে সূর্য্য যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েছেন। তবু অস্তাচলগামী সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্মণ্ডল রচনার সাধ্য এঁদের নাই—এঁদের সামনে রাত্রির আসন্ন বিভীষিকা। সমস্ত গলিটার মালিকানা স্বত্ব নিঃশেষিত হয়ে এই ভগ্নসৌধে আশ্রয় নিয়েছে—এই সৌধও তাকে পরিপোষণ করতে পারবে কি? ওঁদের মনে যদিই লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার কামনা উগ্র হয়ে ওঠে—সেজন্য শুধু কি ওঁরাই দায়ী? মানুষের মনে বাসনার জালা যা থেকে সৃষ্ট হয়েছে—দায়ী সেই বৃত্তি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন এমনি করেই পুড়িয়ে মারে—সুন্দর আবরণে সীমারেখা না হলে। আজ প্রভাতও কি জ্বলছে না? কোথায় গেল ওর প্রতিজ্ঞা—উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে—এ দেশের ধরাছে যতটুকু পাওয়া যায়? অমিয়েষ চলেছে সমুদ্র-

পারে—ওর মনে ব্যর্থতার বেদনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ও হিংসা করছে অনিমেষের। চারিদিকের ঘটনা ওকে পিছনে ঠেলছে প্রবল বেগে—প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে প্রভাত। বহুদূরে ওর তীরভূমি—প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—সেখানে পৌঁছবার আশা বুঝি দুরাশা হ'ল। চিন্তা-রাজ্যের দুয়ার খুলে একটি রশ্মি ওর জ্ঞান-বর্তিকায় সংলগ্ন হ'ল। হাঁ—অকূল দরিয়ায় ভাসছে ও—দিক্‌হারা পৃথিবী ওকে ভয় দেখাচ্ছে—কিন্তু এই অকূলেও একখণ্ড কাঠ যেন ভেসে আসছে। ত্রিলোচন সেনের ডাক সরাসরি উপেক্ষা করতে পারলে না ও—ভাবতে লাগল যাবে কি যাবে না।

ইতিমধ্যে ত্রিলোচন সেন নেমে এসেছেন। ওর কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ? আমি ডাকলাম—শুনতে পাও নি? আর আস না কেন? একটি সাহিত্য সভাতে তোমাদের সাহিত্য শাখার কাজ শেষ হয়ে গেল?

এস ভেতরে এস।

প্রভাতকে নিয়ে উনি সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটিতে এসে বসলেন। বললেন, ভয় নেই, প্রবন্ধ শোনাব না।

প্রভাত অপ্রতিভ স্বরে বললে, কিছু মনে করবেন না।

আরে—না—না, তা হলে তোমাকে ডাকতুমই না। তুমি ত জান না—আমাদের দেহে যে রক্ত বয় তার রঙই আলাদা। এই ঘরে বসে তুমি ভাবতেও পারবে না—একযুগ আগে আমারই কোন পূর্ব্ব পুরুষ কথা-না শোনার শাস্তি-স্বরূপ অবাধ্য প্রজাকে এই ঘরের দেওয়ালেই জীবন্ত গেঁথে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন—আর সে হুকুম তামিলও হয়েছে।

প্রভাত ভীষণ ভাবে চমকে উঠতেই ত্রিলোচন যেন হেসে উঠলেন উচ্চৈঃস্বরে।

ছেলেমানুষ তোমরা—ফাঁকা তেজ আছে মনে—কিন্তু যে শক্তির ওপর দাঁড় করালে তেজকে মনে হবে পৌরুষ—তা নেই তোমাদের। দোষ তোমার নয়—এ কালটাই এই রকম। যাক।—যে কথার জন্ত ডেকেছি—প্রভাতের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, চাকরি করবে? দশটা পাঁচটার দাসখত নয়—ঠিক গোলামি যাকে মনে কর—তা নয়। কলকাতা থেকে দূরে আমার একটা মহাল আছে। ছোট মহাল, আয় কম—তবু জমিদারির ভগ্নাবশেষ। সেখানকার প্রজারা নেহাৎ চাষী মজুর নয়—তাদের সত্ত্ব আছে—শক্তি আছে—জমিদারকে তারা প্রজারক্ষক বা রক্ত শোষক কোনটাই মনে করে না। তবু তাদের চালিয়ে নেওয়াটা সহজ নয়। আমাদের পুরনো নায়েব পারেন নি—তাঁকে বিদায় করতে হয়েছে।

আশ্চর্য্য, ইনি প্রভাতকে নায়েবি দিতে চান। নায়েবি? প্রভাত সঙ্কুচিত হয়ে বললে, নায়েবি করবার মত শিক্ষালাভ করিনি ত।

তা করনি বটে—তবু সেকালের শিক্ষার এ কালে নায়েবি চলল না—চলবে না। ভয় নেই—খাতার জমা খরচ তোমায় করতে হবে না—চেক দাখিলাও লিখতে হবে না—একটা সই দিও শুধু—মামলা-মোকদ্দমা—আরে ঘাবড়ো না—এ কালটাই আলাদা রকমের। ও সব বিভীষিকা মোটেই নেই ও মহলে।

তবে—

কথা কি জান—শিক্ষা এ কালের—আর মানুষ সেকালের মিল হয় কখনও! হয় ত জমিদারিও থাকবে না—আর নায়েবরা তার আগেই সরবে—কিন্তু কথাটা কি সত্যি নয় যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করবার জন্ত আইন তৈরি হবে সংসদে?

হয় ত হবে। কিন্তু তাতেও জমিদাররা মোটা রকমের ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পাবেন? আচ্ছা তাই হোক—হোক এমন আইন। আইন না হ'লে স্বেচ্ছায় ত কোন জিনিস ছাড়তে চাইব না আমরা।

কিন্তু জমিদারি প্রথাটা নষ্ট হলে—আপনার ক্ষতি হবে না?

হবে। কিন্তু দায়িত্ব থেকে রেহাই পাব।

সে কি? আশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলে প্রভাত।

পাব না? হো-হো করে হেসে উঠলেন ত্রিলোচন সেন। এ কালটাই যে বেয়াড়া—যা আছে তা নিয়ে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষের মন চায় যুদ্ধ করতে—শান্তি তার চক্ষুশূল।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে পৃথিবীর চারিদিকে যে অশান্তি ছড়ান রয়েছে তা দূর করবার জন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন।

যুদ্ধের দ্বারা শান্তি! তোমাদের গান্ধীজী কি বলেছেন? হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায়?

কিন্তু যুদ্ধ মাত্রকেই হিংসা বলছেন কেন?

বলছি এইজন্ত যে হিংসা-অহিংসার প্রভেদটা বড় সূক্ষ্ম। তোমাকে আমাকে আরও অনেককে নিয়ে ত পৃথিবী—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার—কিংবা আমাদের সঙ্গে আর সকলের মতের মিল নাই। তুমি যুদ্ধ করছ আদর্শ সৃষ্টি করতে—আমি চাইছি সেই আদর্শকে ভাঙতে। আর এক জন চাইছে আদর্শের সংস্কার করতে। এমনি বিভিন্ন মতবাদে আজকের পৃথিবী ভারি হয়ে ওঠে নি কি?

কিন্তু—

তর্ক নয়—যে ক'দিন জমিদারি প্রথা টি'কে থাকে—তুমি রাজী কি কাজটা নিতে?

প্রভাতের মন বললে, না। কিন্তু কণ্ঠে সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল না। সংসারে একেবারে কিছু না করা চলে না।

ঢেউ যখন এগিয়ে আসে চোখ বুজে তার স্পর্শ বাঁচান সম্ভব নয়। সংসারে চলাটা যেমন ধর্ম—তেমনি কর্মের আশ্রয়ে জীবন রক্ষার বৃত্তিও আর একটি ধর্ম। এই সব ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্তব্য-রশি দিয়ে অনেক বস্তুকে বেঁধে রাখা হয়েছে—যা থেকে পরিত্রাণ লাভ সহজ নয়।

সে বললে, আমাকে দিন দুই সময় দিন।

বেশ ত—জানুয়ারির শেষ তারিখে তোমার মত জানিও—অপেক্ষা করব আমি।

ও চলে আসছে—ত্রিলোচন সেন আবার ডাকলেন।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে থাকা ভাল। তোমাকে ডেকে যে কাজটা দিতে চাইছি—আশা করি এর ভুল অর্থ করবে না। হয় ত শুনে থাকবে তোমাকে নিকটে টানবার মূলে আমার একটু উদ্দেশ্য আছে; সে আর এমন বিচিত্র কি! কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা স্বভাবতঃই সৎ পাত্রের সন্ধান পেলে খুশী হন—তাকে আপন করে নেবার চেষ্টা করেন—

প্রভাত মাথা নীচু করলে।

লক্ষ্য করে ত্রিলোচন সেন বললেন, এটা কোন পক্ষেরই লজ্জার কথা নয়—সংসারে এ ঘটেই। কিন্তু একমাত্র সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যদি উপকারকের ভূমিকা অভিনয় করতে হয় ত তার চেয়ে লজ্জা কি থাকতে পারে! তোমাকে ভাল লাগে—অস্বীকার করি না—কিন্তু তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে আমার স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে টানব না এটা নিশ্চিত জেন। এ বিষয় তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আচ্ছা—যাও।

পথে এসে প্রভাত ভাবলে, হয় ত ত্রিলোচন সেন সরল মনে প্রস্তাবটি করেছেন—কিন্তু তাঁর মনে যে বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে প্রতিকূল প্রতিবেশে নিয়ে যাওয়া প্রভাতের পক্ষে সম্ভব হবে কি! মনের একটা নরম অংশ আছে—সময়-বিশেষে যা কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে হাত মেলায় কর্তব্যবোধ। তখন অকারণে রূঢ় হওয়া চলে না। না—আজ আর এ নিয়ে ভাববে না সে। হাতে সময় আছে—অনেক ভাববে সে। গভীর ভাবে ভাববে।

২৪

পরের দিন—দীপার একখানা ছোট চিঠি পেলে সে।

দীপা লিখেছে: আজ দুপুরে একবার আসবেন এ-বাড়ীতে। বিশেষ দরকার। বোধ হয় শুনেছেন—দাদা কন্টিনেন্টে যাচ্ছেন—ওঁকে একটা অভিনন্দন দেওয়া দরকার নয় কি? আপনার কি মত? আসবেন অবিশ্যি—অনেক—অনেক কথা আছে। দীপা।

সে অনেক কথা প্রভাত জানে। অতঃপর এই উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের আসর বসবে—নিমন্ত্রিত হবেন এ যুগের সমাজ-শিরোমণিরা। একজনকে সভাপতি সাজিয়ে—গান-বক্তৃতা-কবিতাপাঠ-হাসি-গল্প-বচসা—সব কিছু নিয়মিত চলবে। যেমন সাধারণ সভায় হয়ে থাকে—প্রচারের পর্ব্বগুলি যান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সাধারণ সভাকে—শোক বা উৎসব যে সভাই হোক, মানুষ যেমন অত্যন্ত সহজে ও শীঘ্র ভুলে যায়—যেমন একটা সভার পর অন্য সভাটি অমর হয়ে ওঠে না—যেমন প্রারম্ভ সঙ্গীতে কেউ মনোনিবেশ করে না—বক্তৃতাকে ভাল লাগলেও মনে হয় গুছিয়ে বলার, শ্রুতিমধুর করে বলার কৌশল মাত্র—কবিতা পাঠে নিষ্প্রাণ কণ্ঠের ধ্বনি সভাস্থলে অর্থহীন হয়েই থাকে—তেমনি ধরণের অনুষ্ঠান হবে এটি। এসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা কি? কাকে প্রচারের জন্য এর অবতারণা?—শোককে, আনন্দকে না আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছাকে? আশ্চর্য্য—সুখে বা দুঃখে—সম্পদে বা বিপদে মানুষ সর্ব্বদাই চায় প্রসারিত হতে!

ওকে চিন্তাযুক্ত দেখে দীপা বললে, কি ভাবছেন এত? শরীর কি সুস্থ নেই?

না কিছু নয়। ওরা তখন বড় বারান্দাটা অতিক্রম করছে। হঠাৎ বারান্দার এক প্রান্তে প্রভাতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। মনে হ'ল একজন লোক বারান্দার মেঝে ভেদ করে ভূগর্ভে অদৃশ্য হ'ল। ও বিস্ময়ে শব্দ করে উঠতেই দীপার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল সেদিকে। বললে, আপনি জানেন না বুঝি ওই বারান্দার নীচের একটি বড় চোরা কুঠুরি আছে।

কেন?

মানে বিয়াল্লিশের জাপানী বোমার কথা মনে আছে তো? তাই থেকে পরিত্রাণ পাবার একটি আশ্রয় আর কি।

কিন্তু এখন এ আশ্রয়ের মূল্য কি!

দীপা বললে, ভবিষ্যতের জন্য—যদি কখনও যুদ্ধ বাধে—

প্রভাত বললে, আরও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

কি উদ্দেশ্য?

ধর, কোন মানুষকে লুকিয়ে রাখার দরকার—কোন জিনিষও হতে পারে—

দীপা বললে, আপনি আজগুবি ডিটেকটিভ উপন্যাস বানাচ্ছেন প্রভাতদা।

ঠিক নয়—কেন না—মানুষের বদলে জিনিস রাখতে পারলে আজকালকার দিনে লাভ বেশী। কালো বাজারে যে সব জিনিস পাওয়া যায়—সাদা বাজার থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে তারা মাটির তলাকেই আশ্রয় করে তো।

দীপা সজোরে হেসে বললে, দেখবেন—আমাদের যেন ও দলে টানবেন না।

এই কথায় প্রভাত চমকে উঠল। একথা পরিহাস মাত্র হতে পারে। এই প্রাসাদের অন্দরহস্য কে বলতে পারে ভূগর্ভ-নির্ম্মিত ওই ঘরেতে নাই!

চলতে চলতে তার বার বার মনে হ'ল—কি আছে পায়ের নীচের এই গর্ভ-গৃহে? এ কি শুধু অনাগত দিনের বিপদ-পাতকে নিবারণ করবার জন্যই তৈরি হয়েছে—না চলতি কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক সুনিবিড়!

আচ্ছা, তোমাদের একটা প্রেস চলছে না? হঠাৎ প্রশ্ন করলে প্রভাত।

হুঁ—কেন? বই ছাপাবেন? সত্যি যদি ছাপেন কোন বই—কর্মা পিছু কিছু কনসেসন পাবেন।

কাগজ? সে তো আজকালকার বাজারে দুষ্প্রাপ্য।

না—তাও দেব। আমাদের ষ্টক আছে—নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই—

ওরা সিঁড়ির কাছে এসে পড়ল। সিঁড়ির মুখে অমিয়েশের সঙ্গে দেখা। বললে হাসিমুখে—এঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না, একটা বিদায়-অভিনন্দন দেবেনই। আমার ইচ্ছা ছিল কিরে আসি কিছু সঞ্চয় করে—

প্রভাতও হাসলে, সঞ্চয় না থাকলে কি কেউ বেশী পাবার অধিকারী হয়? ভাবছো না—যেতে আসতে দু'দিকেই তোমার লাভ হবে।

হো-হো করে হেসে উঠল অমিয়েশ। আচ্ছা—আচ্ছা ওপরে যাও। শীস্ দিতে দিতে সে বেরিয়ে গেল।

আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ে উপরের ঘরে বসেছিল। এরা দীপা আর অমিয়েশের বন্ধু। এদেরই উৎসাহে অভিনন্দনের পরিকল্পনা কার্য্য লাভ করবে। কাগজে কলমে বক্তব্য লিপিবদ্ধ হ'ল। নাচের জন্য কাকে বলা হবে—সঙ্গীতে কে কে অংশ গ্রহণ করবেন—কার কোন কোন নামী কবিতার আবৃত্তি হবে—আর সভাপতি নির্ব্বাচন—এ নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হ'ল।

হঠাৎ দীপা বললে, আপনি তো কিছু বলছেন না প্রভাতদা?

আমি! আমি এসবের কিছু জানি না তো। তোমরা প্রায়ই যাও সম্বর্দ্ধনা-সভায়—জলসায়—

তা হোক—সভাপতির নাম আপনাকে বলতেই হবে।

প্রভাত বিব্রত হয়ে বললে, যাকে হোক একজনকে—

সে তো নিশ্চয়—খালি চেয়ারে ফুলের মালা দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান সুরু করব না।

প্রভাত হঠাৎ যা বলতে গিয়ে থেমে গেল—তার ভাবার্থ হ'ল এই যে—তাতেই বা ক্ষতি কি? এক জনকে উপলক্ষ্য করে নিজেদের জাহির করার কাজে যে কেউ হলেই তো যথেষ্ট।

একটি ছেলে বললে, সংবাদপত্রের কোন সম্পাদককে বললে ভাল হয়।

একটি মেয়ে সোৎসাহে বললে, ঠিক—ঠিক তাতে রিপোর্টটা পুরো এক কলমে পৌঁছবে।

প্রভাত আর একবার হাসলে মনে মনে। আসল উদ্দেশ্যই ত ব্যক্ত হয়েছে। সভাটি নিছক বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন নয়—

এর পর আলোচনা হ'ল—কোন্ কাগজের প্রচার সংখ্যা সর্ব্বাধিক এবং কোন কাগজের সম্পাদক পর-কীর্ত্তন-কুণ্ঠ—বা পর-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে আত্ম-প্রশংসায় শতমুখ। যাঁরা স্তুতি-তোষে পরিতৃপ্ত হয়ে দশ লাইনের বিষয় বস্তুকে দু'কলমে বিস্তারিত করতে পারেন—এই ভাবের ঘরোয়া অভিনন্দন ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতাই নিঃসংশয়ে সর্ব্বাধিক। এর পর তাঁদের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে কার পরিচয় কত নিবিড় এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হ'ল।

প্রভাতের কানে কোলাহলটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও তখন অন্য রাজ্যে। ও ভাবছে পায়ের তলায় যে গর্ভগৃহ তাতেই কি সঞ্চিত হয়ে আছে নিয়ন্ত্রণের কাগজ? রাতের অন্ধকারে যা পৃথিবীতে উঠে আসে—নিঃশব্দে চলে যায় স্থানান্তরে—বিনিময়ে এই প্রাসাদের দেহবৃদ্ধি ঘটে! অমলেন্দুর কথাতে কি এরই ইঙ্গিত ছিল?

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে নিলে সে। বিদায় নেবার সময় দীপাকে বললে, তা হলে কথা রইল দীপা—আমার বই ছাপানোর কাজে সাহায্য করবে তুমি। নামে ছাপার খরচ—কাগজ—

নিশ্চয়। কিন্তু এক সর্ত্তে।

সর্ত্ত! সে আবার কি? প্রভাত বিস্মিত হ'ল।

সর্ত্ত এই যে বইখানা আমার নামে উৎসর্গ করতে হবে।

দীপার পানে চাইলে প্রভাত। ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। অত্যন্ত কোমল—নির্ভরপ্রার্থী দৃষ্টি। এ দৃষ্টির সঙ্গে কোন কালে পরিচিত ছিল না প্রভাত। এ দৃষ্টির আঘাতে ওর নূতন সত্তা জেগে উঠল যেন। সবল—সুস্থ পৌরুষময় সত্তা—যা যুগে যুগে দুর্ব্বলকে বল দিয়েছে—আশ্রয়প্রার্থীকে দিয়েছে আশ্বাস—এবং নারীকে দিয়েছে প্রেমের সন্ধান। দীপার মধ্যে সেই শাশ্বতী নারী প্রতিভাসিত হয়েছে—ওর দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ-রতা শাশ্বতীর ক্ষণদীপ্তি সর্ত্ত আরোপের মুহূর্ত্তে উদ্‌ভাসিত হ'ল। প্রভাতের সারা অন্তর কেঁপে উঠল।

দীপা বললে, মনে থাকে যেন।

প্রভাতের দৃষ্টিতেও কি স্বীকৃতি ফুটে ছিল? নতুবা দীপা কি করে অসংশয়ে মেনে নিলে তার দাবি গ্রাহ্য হয়েছে!

২৫

অভাবনীয় সুকুমার মুহূর্ত্তগুলি ক্ষণজীবী। পৃথিবীর বায়ুস্তরে তারা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ক্ষণদীপ্তিময়—নীচের বিরাট অন্ধকার মুহূর্ত্তে সে জ্যোতি গ্রাস করে নেয়।

ভূপতি ম্লান মুখে এসে দাঁড়াল সামনে। প্রভাতদা—একবার আসবে—আমাদের বাড়ীতে? বাবার বড্ড অসুখ।

কি অসুখ?

তা জানি না···কোন কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না—অথচ যতবার ডাক্তার ডাকবার কথা হয়েছে—হাত নেড়ে বারণ করেছেন।

রোগীর কথা শুনলে—রোগ আরাম করা যাবে না—চল যাচ্ছি।

গিয়ে দেখলে রোগটি শক্ত। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন নয় —আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন—কিন্তু ডাক্তারের নাম শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কিছুক্ষণের জন্ত নষ্ট হচ্ছে—হাত নেড়ে কি ইঙ্গিত করছেন। ইঙ্গিতটি নিষেধেরই নামান্তর।

প্রভাত বললে, ডাক্তার না ডাকলে যন্ত্রণা কমবে না।

রোগী ইঙ্গিতে জানালেন—যন্ত্রণা নেই।

না হলে জীবন সংশয় হতে পারে।

মাথা নাড়লেন ভূপতির বাবা। ওঁর ক্যাকাসে মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। জীবনের প্রতি উপেক্ষায় কিংবা জীবন ধারণের ব্যঙ্গে সে হাসি রহস্তময়।

না হলে আপনার সংসার দেখবে কে? মমতার শক্ত দড়ি ধরে নাড়া দিলে প্রভাত।

শীর্ণ হাত উপরে তুলে ভূপতির বাবা আবার হাসলেন। অর্থাৎ দেখবেন ওই ওপরে যিনি আছেন—যিনি তোমার আমার—এই বিশ্বজনের সকলকারই প্রভু।

প্রভাত আপত্তি শুনলে না—বাইরে এসে বললে, ডাক্তার ডাকতে চললাম।

ভূপতি শুকনো মুখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, ঘরে কিন্তু টাকা নেই—আজ মাসের বাইশে।

তাই ত—এ কথাটা ত প্রভাতের মনেই হয় নি। ভূপতির বাবা যন্ত্রণা ভোগ করেও কেন ডাক্তার ডাকার নামে আঁৎকে উঠছেন—এতক্ষণে স্পষ্ট হ'ল রহস্তটা। কিন্তু অর্থাভাবে মানুষ ডাক্তার ডাকতে পারবে না, রোগযন্ত্রণায় ওষুধ পাবে না এ কেমন কথা? স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কলঙ্কের কথা নয় কি?

অবশ্য ডাক্তার এলেন—প্রভাতই নিজের খরচে আনালে, তার মাসোয়ারাটী প্রচুর দেওয়া কয়েকটি টাকা তখনও পকেটে ছিল। আর টাকা থাকলে মানুষের কষ্ট দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাক্তার বাইরে এসে প্রভাতকে আশ্বাস দিলেন না। বললেন, ভাইটালিটি নেই—চিকিৎসা করব কি?

তবু একটু চেষ্টা করুন স্তার।

চেষ্টা অবশ্যই করব—আমাদের শিক্ষাই হচ্ছে যে কোন অবস্থাতে হাল না ছেড়ে দেওয়া—কিন্তু যা ক্যাক্ট তা আপনাকে জানালাম, কেননা আপনি তো ওঁর নিকট-আত্মীয় নন।

এমনটা কেন হ'ল?

ম্যাল-নিউট্রিশন। এ কি আজ নতুন জানলেন? আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে শতকরা নব্বই জনের এই দশা। বিশেষ করে যারা চাকরি করে।

ডাক্তারের কথা সমস্ত মন দিয়ে মেনে নিলে প্রভাত—কিন্তু এ ছাড়া দরিদ্র ঘরের ছেলেদের অবলম্বনীয় সহজ বৃত্তি আর কি আছে! বিনা পুঁজিতে আংশিক নিশ্চিন্ত হওয়ার অন্ত কৌশল তো তাদের জানা নাই! দেবতার দুয়ারে এই পরম পদ লাভের জন্ত কত বুকভরা প্রার্থনা আর সামর্থ্য ছাড়া ঘুষ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জমে—সে আর না জানে কে?

ভূপতির বাবা দুই-এক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন—ভূপতির ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন পোয়্যভার। দুটি নাবালক ভাই—দুটি অবিবাহিত বোন—বিধবা মা। অতঃপর চাকরি করব না—এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারবে না ও। পারলেও না। পরের দিনই কাচা গলায় দিয়ে বাপের আপিসে উমেদারি করতে ছুটল। সদাগরী আপিস—অত আইন-কানুনের ঝঞ্ঝাট নাই—ইউরোপীয় মনিবের মনে লাগলেই সুরাহা হয়ে যায়। ভূপতি চাকরি পেলে—বাপের দরুন কিছু বোনাসও পেলে—আসন্ন পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় হ'ল।

ফিরে এসে প্রভাতকে বললে, তোমাদের সমিতি থেকে নামটা কাটিয়ে দিও—আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো চলবে না।

কেন রসদ যোগাড় করে নিলে কি দেশের কাজ করা যায় না?

না যায় না। 'আমি' জিনিসটা সব দিকেই পথ আগলে দাঁড়ায় প্রভাতদা। নিজে বাঁচার কথাই যদি ভাবব দিনরাত—

কিন্তু আমাদের কাজ তো পরকে বাঁচানো নয়, নিজেকেই বাঁচানো।

সেটা একলা একলাই জমে ভাল। আর কিছুদিন গেলে তোমাদের সমিতি—কি তোমার নাম পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারব না। সত্যি বলছি—যে চোরাবালিতে ডুবছে সে কখনও ঢেউয়ের উৎপত্তি-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না।

প্রভাত অত্যন্ত বিমর্ষ হল। ভূপতির মত উৎসাহী কর্মী ছেলে তাকে ছেড়ে গেল—এই ক্ষতির জন্ত নয়। এ যেন অভিশাপ—দু'শো বছর ধরে যা তিলে তিলে আহরিত হয়ে এমনি অকস্মাৎ নেমে আসে। ভারতবর্ষ অন্তঃসারশূন্ত হয়েছে—এ কথাটা স্বদেশী যুগ থেকে শোনানো হচ্ছে—কিন্তু সেই অন্তঃসারশূন্ততা কোথায় আর কি ভাবে আরম্ভ হয়ে মর্শ্মের কতদূরে পৌছেছে তা সঠিক বলতে পারে কেউ? ঐশ্বর্য্যশালিনী ভারতকে সর্বরিক্তা করেছে শোষকগোষ্ঠী—কিন্তু সে ধন তার সঞ্চিত মণি মুক্তা হীরা মাণিক্য নয়—তার শিল্প-বাণিজ্য সামরিক শক্তিও নয়। কেননা এ সব অপহৃত হলে

কালে পূরণ হবার আশা থাকে। ভূমির শস্ত কেটে নিয়ে লুঠেরা তো ভূমিকে চিরবঞ্চিতা করে রাখতে পারে না, সে নিঃস্বতা তার সাময়িক। কিন্তু চোর সিঁধকাটি চালিয়েছে গোপন সুড়ঙ্গে—ভারতের প্রাণবস্তু অপহরণের চেষ্টা চলছে বহুকাল ধরে। তার শিক্ষা সংস্কৃতির রূপকে আমূল বদলে দেবার চেষ্টা, তার বণিককে করণিকে রূপান্তরিত করার সাধনা, তার গৃহের তুলসী ও শালগ্রাম শিলা সরিয়ে মরসুমি ফুলগাছ ও নিরীশ্বর বাদের প্রতিষ্ঠা—সুস্থ স্বচ্ছ সবল ও সরল প্রতিবেশ থেকে তাকে সংঘাত-সঙ্কুল আবর্তের মধ্যে টেনে এনে পরাশ্রয়ের কলঙ্কচিহ্ন ললাটে এঁকে পৃথিবীতে অত্যন্ত অসহায় আর ভীরু আর অসহিষ্ণু জাতির পংক্তিতে নামিয়ে আনা না হলে সর্ববৃত্তিহারা মানুষ সামান্য একটা চাকরির জন্ত এমন আকুলি-বিকুলি করবে কেন? মনের দুরন্ত আশা আর কল্পনাকে সমাধিস্থ করে এই ভাবে কোনমতে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে যাবে কেন? অন্ন হরণ করে—অন্ন ভিক্ষার এই নিষ্ঠুর অভিনয়ের মধ্যে কে তাদের ঠেলে দিয়েছে?—অসহায়—পঙ্গু—পরনির্ভরশীল—দাসত্ব-লোলুপ জীবনযুদ্ধপরাঙ্মুখ···

প্রভাতের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে ও বললে, পৃথিবীতে দুর্ব্বলের স্থান নাই। শক্তিমান হলেন তিনি যাঁর পদমর্য্যাদা আছে—আর সে পদমর্য্যাদার সৃষ্টি করে বিত্ত। সুতরাং শক্তির মূলতত্ত্বে বিত্ত ছাড়া আর কিছুকে কল্পনা করা যায় না। এই বিত্তকে মুখে নিন্দা করেও মন থেকে সরিয়ে দেওয়া কি শক্ত! তাই কি সাম্যবাদীরা এরই মূলে আঘাত হানছে নিষ্ঠুর ভাবে! কিন্তু সে তো বাহিরের আঘাত। তারা ধনীদের চাইছে গরীবদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড় করাতে কিন্তু ধনকে পরিহার করার মন্ত্র তারা জানে না। সুতরাং ধন বণ্টন করে সবাই চাচ্ছে সুখী হতে আর এরই মধ্যে জ্বলছে অকল্যাণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ধনসাম্যই যদি এলো তো শান্তি আসছে না কেন? কেন কাদার বদলে লোহার দেহ গড়ে বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা!

···মনের গভীরে দৃষ্টি ফেলে সংশোধনের কাজ করবেন—এই সমাজ-ক্ষতকে স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে আরোগ্য করে তুলবেন তেমন ভিষক কোথায়?

প্রভাতের মুখমণ্ডল সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আছেন—তেমন মানুষ তো আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। তিনি রাজধানীতে বসে দিনের পর দিন ধরে আত্মশুদ্ধির মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তাঁর প্রার্থনা-সভা শুধু রাম-ভজন-গান-সর্ব্বস্ব—ইহলৌকিক পরিত্রাণ ক্ষেত্র নয়। ইহলোকে যে সব প্রলোভন মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে নামিয়ে দেয়—আত্মদর্শনের প্রখর আলোয় সেইগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করার মন্ত্র। ক্ষমতায় অহঙ্কার কোন্ ছিদ্রপথে প্রবেশ করে অত্যন্ত সৎ মানুষের অন্তরকেও আবিল করে তোলে—তারই ইঙ্গিত যেন প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলিতে পাওয়া যায়। সেই মহাত্মা বলছেন, কংগ্রেস ভেঙে দাও। ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে ওই পবিত্র প্রতিষ্ঠান আর পূর্ব্ব মর্য্যাদা বহন করতে পারছে না। ওর সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে স্থিতিশীলতার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। সাংঘাতিক লক্ষণ। শুধু সংগ্রহ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে. মাৎস্যন্যায় নীতিতে সে আস্থাবান হয়ে ওঠে। আজকার জগৎ বস্তুতান্ত্রিকতার মন্ত্র জপ করছে—নীতিজ্ঞান সেকালের কুসংস্কার বলে সমাজতন্ত্রে বাসা বাঁধছে। তাই কি মুক্তদৃষ্টি ত্যাগী পুরুষ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে দূর দিগন্তের নিঃশেষিত নীলিমায় অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বার বার উচ্চারণ করছেন—সাবধান বাণী। হুঁসিয়ার পথ ভুল করো না। আপনাকে জান—আপনাকে জান।

তাই আজ দিল্লীতে বসে মহামানব আর্ত্তস্বরে বলছেন, ফের—ফের—অসত্যের পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা জমে উঠছে তোমাদের দু'পাশে। ও বোঝার তলায় একদিন সমাধি রচিত হবে তোমাদের—সময় থাকতে যদি সাবধান না হও। সৎ হও—সাহসী হও। অযথা ধনসঞ্চয়ে কালোবাজারকে বলিষ্ঠ করো না। এই অতি স্ফীতি—কেটে যাওয়ার পূর্ব্ব-সূচনা।

রঘু পতি রাঘব রাজা রাম
সব কো সন্মতি দে ভগবান।

শুধু প্রার্থনা ক্ষেত্রে গলা সাধা নয়—সারা মন প্রাণ ঢেলে দাও এই কর্ম্মের সাধনায়।

ফিরিয়ে দাও পঞ্চান্ন কোটি মুদ্রা—পাকিস্থানের প্রাপ্য বলে যা দাবি উঠেছে। ফিরিয়ে নিয়ে এস উৎসাদিত ইসলামী জনকে—তাদের ধর্ম্ম স্থানকে সংস্কৃত করে—বাসস্থানকে বাধা মুক্ত করে—তারা যেমন নিরুদ্বিগ্নে ছিল—তেমনি নির্ভাবনার মধ্যে পুনঃ স্থাপিত কর তাদের। সত্যকে প্রতিষ্ঠা না দিলে আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যাব। দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা তাঁর। হয় জীবন—নয় মরণ।

মৃত্যু পরাজিত হয়েছে—সত্যাশ্রয়ী শেষ সংগ্রামে হয়েছেন জয়ী। তবু তিনি জানেন···এ মূল্য তাঁর জীবনরক্ষার মমতা-বশে মিলেছে। এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির মহিমা নিহিত কিনা এ সংশয় তাঁর মনে জেগেছে।

সব কো সন্মতি দে ভগবান।

এই প্রার্থনা প্রতিদিন চলছে—এই প্রার্থনা আজীবন চলবে। এই প্রার্থনার শক্তিতে উজ্জীবিত হবে ভারত—স্বচ্ছ—সুস্থ—ভারত আর তার পদমূলে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য দেবে সত্য-সন্ধানী অগণিত সন্তান।

২৬

প্রভাত বসে বসে সমিতির কার্য্যসূচীর একটা খসড়া তৈরি করছিল—শশী হাজরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঘরের বাইরে, আসতে পারি কি ভায়া ?

অমলেন্দু প্রভাতের পানে চেয়ে হেসে বললে, আসুন।

ঘরে ঢুকেই হাজরা জিভ কেটে দু' পা পিছিয়ে অত্যন্ত অপরাধীর মত বললেন, তোমরা কাজে ব্যস্ত রয়েছ জানলে কি মিসীমানায় আসি ! তোমাদের মূল্যবান সময়—

না—না—আপনি বসুন। এক মিনিট।

শশী বসলে না—ঘরের চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—একটু ইতস্তত: করে বললে, একটি কথা বলব—রাগ করবে না ত ভায়া ?

প্রভাত কাগজটা এক পাশে ঠেলে রেখে বললে, কি কথা ?

এই—বার দুই ঢোক গিলে হাজরা বললে, গান্ধীর ছবিটা না রাখলে কি চলে না ? মানে আমাদের বাংলা দেশে—

সবিস্ময়ে চাইলে প্রভাত। বললে, গান্ধীজী বাংলাকে দেখতে পারেন না—এমন অভিযোগ অনেক বার শুনেছি বটে —কিন্তু প্রমাণটা পাই ঠিক উল্টো।

বোধ হয় নোয়াখালির কথা বলবে। কিন্তু পেছনে সমস্ত রাজ্যের শান্ত্রী সেপাই নিয়ে ও রকম খালি হাতে চলার বাহাদুরি—

সে কি—শান্ত্রী সেপাই—

মিট মিট করে চেয়ে মুচকে হাসলে হাজরা। বললে, ও কথা বিশ্বাস করুক কাগজওয়ালারা যারা রিপোর্ট বানায়—বিশ্বাস করুক বোকারা—যারা ছাপার হরপে যা পড়ে তাই সত্যি মনে করে—কিন্তু—

হাজরা মশায়—আপনার বিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে গান্ধীজীর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই—হয়ত জানেন ভাল করেই। আকাশে থুথু ফেললে সে থুথু নিজের গায়েই লাগে। যাক—দ্বিতীয় ব্যাপারটাই ত দেখলেন !

দেখলাম—মোছলমানদের সঙ্গে চিরকাল উনি আঁতাত করে আসছেন। এ ওঁর একচোখোমি। গান্ধীকে ভালোমানুষ পেয়ে ওরা যে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে এটা বুঝছেন ত ?

কে বুঝছে ?

সবাই—যার সঙ্গে দেখা সে-ই বলে—কাজটা কি ভাল হচ্ছে ? ভালমানুষী করে অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দেওয়া —ওদের বাড়ী ঘর দোর সারিয়ে দিচ্ছে করা—এর ফল কি হবে জান ? আর একবার ভাগবাঁটোয়ারা। কথায় বলে না—

ছিল শাল—হ'ল শূল
কাটতে কাটতে নির্মূল !

যাকগে—আপনার কোন দরকার আছে কি ?

আছে বলেই ত ছুটে এলাম। তোমরা ত ভায়া দেখ যত দোষ নন্দ ঘোষের। কিন্তু এ দিকে যে নেপোয় দই মারছে সেটা দেখেও দেখছ না !

খুলে বলুন ত।

বলব আর কি—সামান্য মুদিখানার ব্ল্যাকমার্কেট দেখ কিন্তু টন টন লোহা—আর রিম রিম কাগজ যে অন্ধকারে পাচার হচ্ছে নাকের উপর দিয়ে সে খোঁজ রাখ ?

প্রভাতের মুখ গম্ভীর হ'ল—বললে, আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ?

বেশ ত—বুড়োর কথায় বিশ্বাস না হয়—এক দিন রাত্তিরে পাহারা দাও না। বেশি দূর যেতে হবে না—নিজের বাড়ীতে বসেই—

আপনাকে থাকতে হবে। ওর হাত চেপে ধরলে প্রভাত।

শশী হাজরা আঁতকে উঠল, আরে—ছাড়—ছাড়—আমার কি গায়ে শক্তি আছে যে লাঠির ঘা সহ্য করব। ও রাজা-রাজড়ার যুদ্ধের মধ্যে উলু খড়কে টেনো না ভাই। সন্ধান সুলুক চাও—বাতলে দিতে পারি। কিন্তু—

না, থাক্তে হবে আপনাকে। একটু ভেবে বললে, কাজটা আপনাকে দিয়েই হাসিল করব।

শশী হাজরা সত্রাসে চীৎকার করে উঠল, ওরে বাবা, ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে আমি নেই। খাই দাই কাঁসি বাজাই—ও সবের ধার ধারি না।

না হলে কিছুই হবে না। আপনার মহাজন খ্যাতি আছে —আপনাকে না হলে হবে না। বেশ ত—এই কাজটি করে আমাদের কর্ম্মী-তালিকা ভুক্ত হন।

তা কি করতে হবে আমায় ?

অমলেন্দু বললে, আপনি যেন ব্ল্যাকে কাগজ কিনছেন—এমনি ভাব করে ওদের মনে বিশ্বাস জন্মাবেন। তার পর যা করবার আমরা করব।

হাজরা মুখে যথেষ্ট আপত্তি জানালে—মনে মনে সন্তুষ্ট হ'ল। অর্দ্ধেন্দু বাবুর উপর ও মোটেই খুশী ছিল না। লোহা আর কাগজের বিরাট সঞ্চয় আছে ওদের—অত কালো-বাজারের চেয়ে শস্তায় জিনিস ছাড়তেও পিছপা নয় ওরা। বলতে গেলে ওদের তেজী কারবারের ঘা লেগে হাজরার ব্ল্যাকের লাভ প্রায়—আসলের কোঠায় নেমেছে। হাজরার উপর শুধু সরকারের কড়া নজর নাই—পাড়ার বেকার ছেলেরাও যেন উঠে পড়ে লেগেছে। না হলে এ বাজারে রাঘব বোয়াল হওয়া তার পক্ষে আশ্চর্য্যের ছিল না। এখন বাঘের শত্রু যদি বাঘে মারে—ক্ষতি কি ! শশী ত আর সত্যের বেসাতি করতে বসে নি—কারও মুখে সত্যের কথা শুনলে ওর মনে হয় বড়াই করছে লোকটা। শশী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে,

যেখানে পাল পার্ব্বণ বার ব্রত কুটুম্ব-অভ্যাগত দায়-অদায় ঠেকিয়ে মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রতিদিন সেখানে সত্য বলে কিছু থাকতে পারে? তেরশো পঞ্চাশে যারা সত্যবাদী ছিল—তারা না খেতে পেয়ে স্বর্গে গেছে—আর তাদের মুখের অন্ন কালোয় বেচে যারা রইল পৃথিবীতে—তারাই আজ ফুলে কেঁপে হয়ে উঠেছে রাজা আমীর। তারাই তো সত্যিকারের বড় মানুষ!

অবশ্য মনের এ উষ্মা প্রকাশ সে করলে না। তাকে উত্তেজিত দেখে প্রভাত বললে, যাক, পরে এ বিষয়ে পরামর্শ করব।

যাই কর বাবা—এই বুড়োকে আর ক্যাসাদের মধ্যে জড়িও না। গোবিন্দ হে—সবই তোমার ইচ্ছা।

হাজরা চলে গেলে অমলেন্দু বললে, হাজরাকে বিশ্বাস কর প্রভাত?

সম্পূর্ণ নয়।

তবে ওঁকে দিয়ে এ কাজ করাবে কেন?

না হলে আর পথ কি?

একটু ভেবে দেখলে হতো না। হাজরা যে ব্ল্যাক-মার্কেটের কথা বলছে—ওর স্বার্থ না থাকলে—

প্রভাত অধীর হয়ে বললে, কিন্তু কবে আর কাজ করব আমরা! দিনকের দিন কি অবস্থা হচ্ছে দেশের দেখছ! কালো বাজারী কাঁপছে—নীচু স্তরের যারা তারাও টিকে থাকবে—কিন্তু আমরা মধ্যবিত্তরা এ ভাবে কতদিন বাঁচব বলতে পার? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে যাদের দান ছিল সবচেয়ে দামী তারাই এ ভাবে মুছে যাবে স্বাধীন ভারতবর্ষ থেকে!

অমলেন্দু বললে, দেশময় দুর্নীতি তোমার আমার চেষ্টায় কতটুকু দূর হবে। যাঁরা রাজ্যভার নিয়েছেন হাতে তাঁরাই পারছেন না!

প্রভাত বললে, বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পৃথিবীতে যে সময়ে সবচেয়ে সঙ্কটের কাল তাই স্বাধীনতা পেয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে। আজ যদি আমাদের ঘরে অন্নটাও থাকত!

অমলেন্দু বললে, এই অন্নবকলা সৃষ্টি করে তেরশো পঞ্চাশে দেশের যুবশক্তিকে নিজের প্রয়োজনে নিতে পেরেছিল ইংরেজ। কংগ্রেস মিত্রশক্তির সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করলে—দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দলে দলে মানুষ এসে ঢুকল সেনাবাহিনীতে। এবারও যে সেই ব্যাপার আবার ঘটবে না কে বলতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধ আর শীঘ্র বাধছে না। প্রভাত আশ্বাস দিলে।

কে বললে—যুদ্ধের সাধ আমাদের মিটেছে? যারা যুদ্ধ করে তাদের ইচ্ছা কতটুকু—যারা যুদ্ধ বাধায় তারা ত কোন দিন সামনে আসে না।

কিন্তু তাদের চিনি আমরা।

চিনি কিন্তু ধরতে পারি না—শাস্তি দিতে পারি না। আমরা যারা মৃত্যুর হাত ধরে পথ চলছি তারাও নির্ব্বাচনী পালায় বর্ণচোরাদের পক্ষ সমর্থন করছি!

এবার আর ভুল করব না।

কেন করব না—একমুঠো চালের বদলে—আমাদের পাল্লায় যদি অলক্ষ্যে আসতে পারি—

কেন আসব?

তাই তো জানি তাই—অথচ বারে বারে এ ভুল আমাদের হবেই। ভুল হয়—কেননা ভুল ঠেকাবার সহজ পথ আমরা বেছে নিই না।

কেন নিই না?

কাউকে যে বিশ্বাস করতে পারি না!

কেন পারি না?

যাঁকে আপন জেনে মাথায় তুললাম—কিছু দিন পরে দেখি মাথায় উঠে সেই আমাকে দুর্দ্দশার মধ্যে টানে। বলবে কেন এমনটা হয়? হয় এইজন্য আমাদের শিক্ষায় গোড়ায় গলদ রয়েছে—গলদ রয়েছে চারদিকের আবহাওয়ায়। আমাদের মনে ধনের মোহ যে পরিমাণে রয়েছে—জনকল্যাণের আস্থা তার শতাংশের এক অংশও নাই। তুমি আমি আজ ধনকে বলছি—পৃথিবীর অকল্যাণ—কিন্তু তুমি আমি যদি দৈবক্রমে লক্ষপতি হই অমনি মনে মনে স্বীকার করব ধনের চেয়ে কল্যাণকর কিছু জগতে নেই। জীবন ধারণের যত কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব অর্থে মেলে—আর ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়াটাই তো আমাদের সব কামনার সেরা কামনা। আমরা বঞ্চিত বলেই হয়তো ধনের নিন্দা করি।

প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, জানি না তোমার মনের এটা সত্যমূর্ত্তি কি না—

অমলেন্দু হাসলে, তোমার আমার এবং আমাদের মত মত বিত্ত-বঞ্চিত সাধারণ লোক প্রায় সকলকারই মনের এই মূর্ত্তি। আমরা যা পাই না তারই দোষ কীর্ত্তন করি—পেলে চুপ করে থাকি। বাইরের দুর্নীতিটা এত ব্যাপক এইজন্য—মনের দুর্নীতি আমাদের দুরপনেয়।

প্রভাত বললে, তোমার কথা শুনে মনে হয়—আমাদের উদ্ধারের আশা বুঝি নেই!

অমলেন্দু হেসে বললে, মাভৈঃ একেবারেই অন্ধকারে নেই আমরা—মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে বৈকি। তাই তো আমরা বেঁচে রয়েছি এবং ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টাও করছি। তবে এটুকু আমার মনে হয়—যে আঘাত আমরা পাচ্ছি তা যথেষ্ট নয়। আরও কঠিন আঘাত না এলে নীতির মানদণ্ডটা ঠিক পথে ফিরবে না। ভিতর থেকে যাতে বদলাতে পারি—সেই শিক্ষা, সেই পথ নির্দেশ আজ আমাদের

অত্যন্ত প্রয়োজন। চল না এক দিন অর্দ্ধেন্দুবাবুর কাছে গিয়ে সমিতির উদ্দেশ্য জানাই।

সর্ব্বনাশ—বল কি ? প্রভাত চমকাবার ভান করে হেসে উঠল, অর্থাৎ বাঘের সামনে গিয়ে বলব···বাঘ মশাই, আপনি আর নিরীহ মেষ শাবককে মেরে উদর পূর্ত্তি করবেন না—তৃণ ভোজনে অভ্যস্ত হোন।

অমলেন্দু হেসে বললে, উপমা তোমার দুষ্ট হ'ল। মানুষ কিছু হিংস্র বাঘ নয় আর তাকে তৃণ ভোজনে অনুরোধ জানানোও বিদ্রূপ ছাড়া কিছু নয়।

তা হলে—

আমরা বলব—মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটুকু সঞ্চয় আবশ্যক তা আপনার আছে—এইবার আপনি—

কালোবাজারী পরিত্যাগ করুন। না অমলেন্দু, এভাবে নাটক জমে—দর্শকের হাততালি মেলে—কিন্তু যে মানুষ দর্শক এবং নায়ক তাকে ভোলানো যায় না। ধন তৃষ্ণা আর জলতৃষ্ণা সমান জিনিস নয়।

তা হলে হাজরার শরণাপন্ন হবেই ?

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে প্রভাত কি ভাবলে। বললে, আচ্ছা ভেবে দেখি—কি পথ নিলে সুবিধা হয়। ভাল কথা শশাঙ্ককে দেখছি না কয়েক দিন ধরে ?

আর দেখবেও না ! অমলেন্দু হাসল।

মানে ?

জানুয়ারির প্রথমেই সে দিল্লী গেছে—একটা ইণ্টারভিউ দিতে।

চাকরির জন্য ?

তুমি ভাব কি—আমরা সবাই দেশের সেবা করব—চাকরি করব না ?

কিন্তু—

প্রভাত—চাকরি নিলে যে দেশের সেবা করা চলে না এ ধারণা তোমার ভুল।

হবে। আমার একটা উপমা মনে পড়ল। আমার দূর সম্পর্কের এক পিসিমা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কোন সিদ্ধবাবার কাছে তিনি নাকি মন্ত্র নিয়েছিলেন। দিনে লক্ষ নাম জপ ছিল সে মন্ত্রের বিধি। পিসিমা তাই করতেন—কিন্তু সংসারের যাবতীয় কাজ—রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা, গল্প বসকা, হাসি, ঠাট্টা সবই তাঁর চলত সেই সঙ্গে। ত্রিশ বছর ধরে পিসিমা মন্ত্র নিয়েছিলেন আর ত্রিশ বছর একটানা তিনি এই সব করেছেন—তুমি হিসাব করে বল তো আমায়, সিদ্ধির পথে কতখানি এগিয়েছিলেন তিনি ?

অমলেন্দু বললে, সংসারে থেকে ঈশ্বরকে পাওয়ার দৃষ্টান্ত যে নাই—

সে সব অসাধারণদের কথা। আমরা কাদায় তৈরি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—আমাদের ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিশেলে তেলের সঙ্গে জলের মতই অবস্থা দাঁড়ায়। তেল ভেসে বেড়ায় ওপরে—

অমলেন্দু বললে, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারি।

আজ থাক। চলতে চলতে ও মুখ ফিরিয়ে বললে, কি জানি অমল—আমার কেবলই ভয় হচ্ছে—শেষ পর্য্যন্ত এই সব নিয়ে তোমার সঙ্গেও আর তর্ক করতে হবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই পথ আলাদা।

কিন্তু সব পথেই কি দিল্লী পৌঁছান যায় না ? উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলে অমলেন্দু।

২৭

মা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। বললেন, কখন থেকে তোর আশায় দাঁড়িয়ে আছি বাবা—শীগ্‌গির ডাক্তার-বাড়ী যা। ওঁর কলিকের ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

সারা রাতই ছুটাছুটি চলল। ইন্‌জেক্‌শন—সেঁক—গরম জল। এ সবের সঙ্গে অর্থও ব্যয় হ'ল যথেষ্ট। মা তাঁর হাতের চুড়ী খুলে দিলেন। বললেন, যে খুঁটিতে ভর করে আছি—তা আগে রক্ষে হোক—সুদিন আসে আবার সব হবে।

ভোর বেলায় রোগী একটু সুস্থ হয়ে চোখ বুজলে। প্রভাতও বিছানায় শুয়ে পড়ল। অসীম ক্লান্তি দেহে—তবু ঘুম আসছে না। ক্লান্তির চেয়ে তীব্রতর কত চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মা যা বলেছেন—সেই তথাকথিত সুদিন আসবে কি ? মধ্যবিত্ত ঘরে কবে আসে সুদিন—এলেও তার আয়ু কতই বা দীর্ঘ ! একটি মানুষের উপার্জ্জনের ছায়ায় অনেকগুলি প্রাণী আশ্রিত। সে প্রাণীগুলিকে সংসারে আনলে কে ?···সারহীন জমিতে রিক্ত বাদ্য গাছও ক্ষীণ শাখা-প্রশাখা ছড়ায়—তার রুগ্ন শাখায় ফোটে স্বভাব-ক্ষুদ্র ফুল—আর তাতে ফলে অপরিপুষ্ট ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য সেই অপুষ্ট ফলেও থাকে অসংখ্য বীজ আর সে বীজের গর্ভে থাকে অঙ্কুর। সব ক'টি তার অঙ্কুরিত না হলেও গাছের মৃত্তিকা-রসে ভাগ বসায় তারা। তার পর তাদের মধ্যে চলে আলো ও রস আহরণের প্রতিযোগিতা। বাঃ রে—সংসার। সৃষ্টি-লীলায় এই ধারা না চললে কি সৃষ্টি লোপের আশঙ্কা দেখে ওঠে ! এই দুঃখ-দৈন্য—রোগ-মৃত্যু—এরা জীবনের পাশে পাশে চলে কোন্ মহাজীবনের বার্ত্তা বিঘোষিত করে ! এদের যারা জয় করতে পারে না—তাদের জীবনের মহিমাই বা কি ! মৃত্যুর মহিমা ! এমনি লক্ষ কোটি সংসার নিয়ে দেশ—আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ ! দুঃখ-দৈন্য—অভাব—মৃত্যু—জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটানা অবিচ্ছিন্ন ক্লেশবহনের ইতিহাস,

এই রচনা কোন যুগ হতে আরম্ভ করেছি—শেষ করব কোন কোন যুগে—কেউ জানে না। হাঁ আশাবাদী বলেন এরই নাম যুদ্ধ—জীবনযুদ্ধ। দুঃখ-উত্তরণের চেষ্টা—ও নাকি জন্মগত বৃত্তি। এতেই জীবনের স্বাদ, শোভা, হয়তো বৈচিত্র্যও।

বাবার ভালমন্দ কিছু হলে—এত সব চিন্তাও আর থাকবে না। যখন ঘূর্ণি ঝড় উঠে—কুটিরে বসে কুটিরবাসী বলে—ঝড় থামাও ভগবান—বাঁচাও। ঝড় থেমে যখন মুষল ধারে বৃষ্টি নামে তখনও তার প্রার্থনা চলে—বৃষ্টি বন্ধ কর প্রভু—বাঁচাও। বৃষ্টির পর যদি প্রবল শীত আসে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রার্থনা ঐ একই সুরে চলে—আর প্রখর রৌদ্রের তাপে জর্জ্জরিত হয়েও সে সুর থাকে অব্যাহত। একটা-না-একটা অভাব আর তা থেকে পরিত্রাণের জন্ত পরিত্রাহি রব—এই চলছে সংসারে। তবু সংসারের মত সুন্দর নাকি কিছু নাই—সংসার ছেড়ে যাবার কল্পনায় মানুষ কাঁদে। মানুষ বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। ভুবন সুন্দরই বটে!

দাদা।

কি রে? লক্ষ্মীর ডাকে প্রভাত বাস্তবে নেমে এল। সত্যি লক্ষ্মীও কি অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে! ওর সদাপ্রফুল্ল মুখে দুশ্চিন্তার ঘন ছায়া, বেশবাসও কেমন মলিন। যে বিপৎপাতের ভয়ে মানুষ সর্ব্বক্ষণ সচকিত হয়ে থাকে—তাই বুঝি ওর চিন্তায় চেপে বসেছে।

লক্ষ্মী দু'হাতের আঙুল দিয়ে আঁচলের প্রান্তে গিঁট বাঁধতে লাগল। বললে, একটা কথা যদি রাখ—

কি কথা রে—অত ভয়ই বা তোর কেন! প্রভাত ঈষৎ হেসে ওর দুশ্চিন্তা দূর করতে চাইলে।

ভয় করি সাধে—তোমাদের জেদের তো অন্ত নেই। একটু চুপ করে থেকে বললে, নন্দীরা বলছিল—ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারে এমন একজন অল্প লেখাপড়া জানা মেয়ে যদি সন্ধানে থাকে—

ও: এই কথা! তা মেয়ের অভাব কি? বলিস তো কালই ব্যবস্থা করে দিই।

না—তোমাকে আর অত উপকার করতে হবে না। একটা ঢোঁক গিলে বললে, আচ্ছা আমিও তো ছোটদের পড়াতে পারি—দুপুর বেলা খালি ঘুমিয়ে তো কাটাই।

কথাটা বলে আড়চোখে সে প্রভাতের মুখভাব দেখতে লাগল। কিন্তু তার সন্দেহ সত্য হ'ল না। তার প্রস্তাবে প্রভাতের মুখ গম্ভীর হ'ল না—খানিকটা বিস্ময় আর প্রশংসার আভাসে তা অদ্ভুত দেখাতে লাগল। প্রভাত বললে, তুইও তা হলে সংসারের কথা ভাবিস লক্ষ্মী! একটি ছোট নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললে, কেবল আমিই ভাবি না।

না দাদা, তুমিও তো যথেষ্ট ভাব—না হলে পাঁচটার পর মারোয়াড়ীর কার্য্যে—

ওরে, সে হ'ল মান-বাঁচানো চাকরি। কিন্তু তা করে চলবে না। পাকা চাকরি আমায় নিতেই হবে—

কাজ কি—আর কিছু পড় না।

প্রভাত হাসলে, অর্থাৎ চিরকাল খোকাই থাকব—ব হব না। বাবার অসুখে মা গহনা খুলে দিলেন—ঘ আসবাবপত্র নাই—পোষ্টাপিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের খ পর্য্যন্ত নেই যার অঙ্ক অন্তত: পাঁচটা টাকা।

তুমি চাকরি করলেই—আমাদের টাকা জমবে।

সেই স্বপ্ন দেখিস বুঝি লক্ষ্মী?

কেন দেখব না—সবাই দেখে আর আমি দেখলেই দোষ

ঠিক কথা! স্বপ্ন দেখে না কোন্ মানুষ? কল্পনাই তাকে প্রাণের রসে উচ্ছল করে তোলে। পৃথিবী পুরাতন হয়ে চির নূতন আর তিক্ত হয়েও বর্ণময়ী এ শুধু কল্পনারই প্রসাদে আমার কিছু নেই—জটপাকানো বর্ত্তমান আর ধূ ধূ বালুরাশি বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ—এটা ক্ষণ-প্রতীতি না হলে জীবনকে বয়ে বেড়ানো দুঃসাধ্য হতো না কি? এই কল্পনার জের—এ জগৎ ছাড়িয়েও টেনে চলতে হয়—এক জন্ম থেকে বহু জন্মে অনুস্মৃতি একটি সীমাহীন সমুদ্রের মত জীবনের কল্পনা জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম—এই তো চলেছে যুগে যুগে।

প্রভাত বললে, ইচ্ছে হলে কাজটা নিতে পারিস—আমিও বসে থাকব না। একটা কিছু করতেই হবে আমাকে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে সে বললে, আচ্ছা লক্ষ্মী—ধর আমি যদি কোন কাজ নিয়ে দূরে চলে যাই তোদের অসুবিধে হবে না?

বা: রে, কত লোকই তো চাকরি নিয়ে কত দূরে যায়—

ঠিক বলেছিস। আচ্ছা লক্ষ্মী, আর একটা কথা ধর কেউ আমাকে অনেক অনেক টাকা দিয়ে বললে, তুমি আজ থেকে আমাদের হলে—তা হলে কেমন হয়?

সে তো কিনে নেওয়া। মানুষকে অমনি করে কেউ কেনে নাকি? আজও কি পৃথিবীতে মানুষ কেনা-বেচা চলে!

চলে বৈকি। প্রভাত মুখ টিপে হাসলে। তবে সেই দাসত্ব প্রথার মত ভয়ঙ্কর কিছু নয়। সে প্রথাটি বর্ব্বর সামিল—কেমন জানিস? যেমন ধর একটা লোহার গেটের মাথায় যুঁই ফুলের ঝাড়। বাইরে থেকে যে কেউ দেখবে—বলবে—চমৎকার! লোকে ফুল গাছের সবুজ শ্রী বা ফুলের সাদা রঙ দেখে—তার তলায় লোহার কথা ভাবে না।

লক্ষ্মী হেসে বললে, এই নিয়ে একটি গল্প লিখবে বুঝি?

ভাবছি লিখব। ভাল হবে গল্পটা, নয়?

প্রভাতের মুখে মৃদু হাসি দেখে লক্ষ্মীর সন্দেহ হ'ল—এই পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তার বুদ্ধি নিয়ে—ছেলে মানুষি নিয়ে প্রভাত প্রায়ই পরিহাস করে। ওই ধরণের হাসি

কিন্তু লক্ষ্মীর ভাল লাগে—যদিও কৃত্রিম ক্রোধে ও প্রাণপণে প্রতিবাদ করে যায়। আজ কিন্তু ও রাগলে না—হাসিমুখে বললে, গল্পটা কিন্তু আমাকে শোনালে হবে না—সাহিত্য-সভায় পড়তে হবে!

সাহিত্যরসিকরা কিন্তু মুখ খোলে না—লক্ষ্মী!

ইস—তাইতে বুঝি তোমার দুঃখ? তা ভয় নেই, এবার সে দুঃখ মোচন হবে। বলে ও দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হ'ল ঘর থেকে। অনতিবিলম্বে ফিরে এল হাতে একটি নীল লেফাপা নিয়ে। সেটা প্রভাতের কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললে, পড়।

আশ্চর্য্য—সিপ্রাই লিখেছে চিঠি। অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ওই মেয়েটিকে না দেখে ওর মনে যে ছবিটা উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেটা আলস্যপরায়ণা সজ্জাসর্ব্বস্ব ধনী দুলালীর ছবি। সেই জড় ছবি যে কথা বলতে পারে···

প্রভাত তাড়াতাড়ি পড়লে:

ভাই লক্ষ্মী—আমার একটি অনুরোধ। তোমার দাদাকে বলবে—খবরদার যেন বাবার কথা না শোনেন। আজকাল রক্তহীন রোগীকে রক্ত দিয়ে বাঁচান হচ্ছে—কিন্তু যে রোগী সত্যিই বাঁচবে না—তাকে রক্ত দান করাটা নির্ব্বুদ্ধিতা নয় কি? এ যুগে জমিদারী রক্ষা করা যাবে না—তোমার দাদার উৎসাহ বুদ্ধি পরিশ্রম কোন কিছু দিয়েও নয়। সুতরাং এ চেষ্টা যেন তিনি না করেন। যদি করেন—নিজেই ডুববেন।

ইতি
তোমার সিপ্রাদি

আশ্চর্য্য—সজ্জাসর্ব্বস্ব জড়বৎ মেয়েটিও কথা কইতে জানে। চিঠির সামান্য কটি ছত্রের মধ্য দিয়ে সে যেন অসামান্য হয়ে উঠল। সঞ্চিত সম্পদকে যারা মনে করে ভাগ্য পাওনা—কিংবা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে বর্ত্তমান জন্মের ভোগপ্রাপ্তি—এই মেয়েটি অন্ততঃ তাদের গোত্রের নয়। এ মেয়ে পৃথিবীর বুকে কালের পদধ্বনি শুনেছে—আর স্রোতের গতি কোন দিকে তাও ওর অজানা নয়। প্রাসাদের রুদ্ধ বাতায়ন খুলে এ শুধু নীল আকাশের সৌন্দর্য্য দেখেই মুগ্ধ হয় নি—রুক্ষ মাটির অসমতল উদ্ধত ভঙ্গিতে যে ইঙ্গিত নিহিত তার যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে। সিপ্রা আর যাই হোক—দুলালী নয়—প্রাণময়ী একটি মেয়ে। সাধারণ মেয়েরা যে সুরে কথা বলে—যে চিন্তাজাল আপন মনে বোনে—এবং যে সব সমস্যা আপন বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা করে—সিপ্রা তেমনই মেয়ে। ওকে জীবনের পথে সঙ্গী পেলে—জীবন হয়ত ভারগ্রস্ত হবে না!

আপন মনে হেসে উঠল প্রভাত। যেন এই মুহূর্ত্তে সিপ্রাকে লাভ করবার সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেল! যেন চাকরি নেওয়ার সঙ্গে সিপ্রাকে নেওয়াও অত্যন্ত সহজ!

হাসলে যে? লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে।

এমনি। আচ্ছা লক্ষ্মী, তুই বিশ্বাস করিস্ জমিদারী-প্রথা থাকবে না?

বাঃ রে—আমি জানব কি করে?

তবে তোকেই বা ওকথা জানালে কেন?

লক্ষ্মী হেসে বললে, আমার জবানিতে জানিয়েছেন তোমাকে।

তুই কিছুই জানিস না তা হলে? প্রভাত ওর পানে আড় চোখে চেয়ে হাসলে। আচ্ছা—আর একটা কথার উত্তর দে ত। এই গণতন্ত্র মানে—পাঁচ জনকে মেরে একজনের বড় হওয়ার দিন অনেক জায়গাতেই শেষ হয়ে আসছে নাকি!

কেন? বিস্মিত কণ্ঠে লক্ষ্মী বললে, তোমার হাতের পাঁচটা আঙুল সমান? না, তোমার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির তুলনা চলে? পৃথিবীতে যার যেমন বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি সে সেই মত ফলই ত পায়—গায়ের জোরে এক করে দিলেই সব কিছু এক হয় না।

কিন্তু হচ্ছেও ত। পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—

লক্ষ্মী হেসে বললে, না গো মশাই না। ওই গায়ের জোরে বলছি এক—কিন্তু এক কখনও হতে পারে! একই যদি হ'ল ত আলাদা আলাদা জিনিস তৈরী হওয়ার মানেটা কি!

এর উত্তরে অনেক কথা বলা যায়। যুক্তি তর্ক প্রমাণ দিয়ে বোঝান যায়—প্রকৃতিতে যেটুকু প্রভেদ তা মানুষের চেষ্টায় অনায়াসে দূর করা সম্ভব। এই প্রভেদে শক্তিকে মানুষ এমন পর্য্যায়ে এনেছে—যাতে কল্যাণ অংশ নাই বললেই চলে। বুদ্ধির বলে মানুষ উপার্জ্জন করছে—আবার সঞ্চয়ও করছে—আবার প্রভুত্ব করছে। প্রভুত্বে অহঙ্কার বাড়ায়। সে-ও তত মারাত্মক নয়—যত সর্ব্বনাশ মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাকে ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ রৌপ্যের কঠিন বস্তু মনের কোমল বৃত্তির উপর যতই চেপে বসে মন ততই বেদরদী হয়—নিষ্ঠুর হয়। সর্ব্বনাশের বীজ এই সকলকে মেরে নিজে ওপরে ওঠার নেশার মধ্যেই থাকে। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা এই সর্ব্বনাশকে ঠেকাবার জন্যই কি নয়? কিন্তু লক্ষ্মী তর্কের পাত্রী নয়। ওর সহজাত যুক্তিরও একটা দিক আছে যা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলগত তত্ত্বের ব্যাপার। এক বিরাট মহান পুরুষের ইচ্ছায় বিধৃত রয়েছে এই জগৎ—তাঁর ইচ্ছাতেই লীলার বিকাশ—আর লীলার বৈচিত্র্য সম্পাদনে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন বৃত্তিনিচয় অসংখ্য কুশীলব অসামঞ্জস্যময় জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এসব না থাকলে জগৎ থাকার সার্থকতাই বা কি থাকত। সমুদ্রে যদি ঢেউ না ওঠে—কিসের শোভা।

না···কর্ম্মহীন জীবনের সবই বিস্বাদ লাগে। বিস্বাদ শহরের এই একঘেয়ে জীবন। উদয় হতে অস্ত এবং অস্তের পর নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত চারিদিকে একই সুর—সর্ব্বক্ষণ

একই চিন্তা আনন্দ বা দুঃখ নিয়ে কালযাপন। একটি দিনের পর আর একটি দিন আসে সামান্যই প্রভেদ নিয়ে—কিন্তু পর পর কয়েকটি দিনকে পাশাপাশি রাখলেই বৈচিত্র্যের বর্ণ বা স্বাদ কোথায়। এ থেকে অন্ততঃ মুক্তি চাই। এই গলি থেকে, বাড়ী থেকে, নিত্য প্রয়োজনের সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে সে অপরিচিত পরিমণ্ডলে—যেখানে নূতন মানুষের ভিড়ে নূতন জীবন স্পন্দিত হবে···নূতন মূর্ত্তিতে ঘন হয়ে উঠবে আকাশের নীল—আর সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ—নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দর্পণে প্রতিফলিত করাবে···জন্ম মৃত্যুর স্রোতবাহিত এক অপূর্ব্ব-দর্শন বস্তুকে যা অগ্নির মত নিত্যদৃষ্ট হয়েও নিত্য ক্লিষ্ট নয়।

প্রশান্ত ত্রিলোচন সেনের প্রস্তাবটা আর একবার ভাল করে ভেবে দেখবে স্থির করলে।

ক্রমশঃ

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিচার

অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য্য

জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপনীত হয় নাই, বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতি দুর্যোগময়ী। দুর্যোগে বিপন্ন মানুষ অপরের সাহায্যপ্রার্থনা করে। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন মানুষের সাহায্য অতি নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন কোন অনন্ত শক্তিশালী পুরুষের সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ—ভূকম্পন, ঝঞ্ঝাবাত্যা, বন্যা প্রভৃতি—মানুষের মনে মানুষের শক্তির ক্ষুদ্রতা উপলব্ধ করাইয়া অনন্তশক্তিশালী কোন বিরাট পুরুষের কল্পনা জাগাইয়া দেয়। মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন প্রথমে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের পশ্চাতে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে। ক্রমে চিন্তাধারার বিকাশের ফলে মানুষ বুঝিতে পারে প্রকৃতির বিভিন্নতার পশ্চাতে ঐক্য, একরূপতা বর্ত্তমান। এই উপলব্ধির পর বহু ঈশ্বরবাদ ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়—প্রকৃতির পরিচালক ও নিয়ন্তা রূপে মানুষ একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের কথা ভাবে এবং বিপদে তাঁহার ধ্যান করিয়া শক্তি প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এই ভাবে সৃষ্ট হইলেও যুক্তিতর্ক দ্বারা মানুষ সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করে। এই বিশ্বাস যে অর্থহীন মিথ্যা বিশ্বাস নহে, ইহা যে যথার্থ বিশ্বাস, প্রকৃতই যে ঈশ্বর বিদ্যমান ইহা প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় আমরা তন্মধ্যে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি :—এন্‌সেল্‌ম নামক জনৈক মধ্যযুগীয় ধর্ম্মযাজক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে যুক্তি উপস্থিত করেন তাহা ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি (Ontological argument) নামে পরিচিত। ইনি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এই কথা একমাত্র মূর্খেরাই বলিতে পারে এবং এই কথা দ্বারা মূর্খেরা শুধু নিজেদের 'মূর্খামির'ই পরিচয় দেয়। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি 'মহত্তম সত্তা' যাহা হইতে আর কিছু মহত্তর আছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। এই মহত্তম সত্তার অস্তিত্ব যদি বাস্তব না হইয়া শুধু কাল্পনিক হয় তবে সেই সত্তাকে মহত্তম বলা অর্থহীন। যে সত্তা কাল্পনিক ও বাস্তব এই উভয় জগতে বিদ্যমান সেই সত্তাই প্রকৃত মহত্তম। সুতরাং ঈশ্বরের ভাব বা ধারণা হইতেই তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এন্‌সেল্‌ম-এর এই ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিটি আধুনিক যুগের ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট একটু পরিমার্জ্জিত রূপে উপস্থিত করেন। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেদের অপূর্ণ সত্তারূপে অনুভব করি, কারণ আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা যাহা ইচ্ছা করি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারি না। আমাদের মনে 'পূর্ণ সত্তা'র ধারণা বিদ্যমান না থাকিলে 'অপূর্ণসত্তা' এই ধারণাটি জাগরূক হইতে পারিত না। আমরা যে অপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারি যেহেতু আমাদের মনে পূর্ণত্বের ধারণা বিদ্যমান। এই পূর্ণ সত্তার ধারণা হইতেই প্রমাণ হয় সেই সত্তা অস্তিত্ববান, কারণ অস্তিত্বহীন সত্তা পূর্ণ সত্তা হইতে পারে না। যে সকল গুণ দ্বারা পূর্ণ সত্তার পূর্ণত্ব, অস্তিত্ব তাহার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং পূর্ণ সত্তাকে অস্তিত্বহীন কল্পনা করা স্ববিরোধী। ডেকার্ট-এর মতে এই পূর্ণ সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্ববান্।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে জার্ম্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট যে আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাণ্ট বলেন, ভাবলোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবলোকে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান ন্যায়সম্মত নহে। আমি ঈশ্বর নামক একটি পূর্ণ সত্তার ভাবনা করিতে পারি বটে এবং যখন সেই পূর্ণ সত্তার ভাবনা করি তখন তাহাকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়াই ভাবনা করি, কারণ অস্তিত্বকে পূর্ণত্বের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। যখন আমি একটি ত্রিভুজের ভাবনা করি তখন ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান

বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। কিন্তু এই ভাবনা হইতে ভাবনা-বহির্ভূত বাস্তব জগতে ত্রিভুজ নামক কোন সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, কারণ জ্যামিতি-পরিকল্পিত ত্রিভুজের অস্তিত্ব শুধু ভাবনার জগতেই, বাস্তব জগতে নহে। কাণ্ট-এর মতে ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ভাবজগতের বহির্ভূত বাস্তব জগতে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব আছে। অবশ্য আমি যখন ঈশ্বরকে পূর্ণ সত্তারূপে ভাবি তখন তাঁহাকে অস্তিত্ব-সম্পন্নরূপেই ভাবিয়া থাকি; কিন্তু আমি যখন ঈশ্বরের কথা না ভাবি তখন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। ভাবজগৎ হইতে বাস্তবলোকে অনুমান সত্য হইলে আমার জামার পকেটে এক শত মুদ্রা আছে এই ভাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা পকেটে প্রবেশ করিত। যেহেতু এক শত মুদ্রার ভাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা উপস্থিত হয় না, সেইজন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভাবনা হইতে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

কাণ্ট-এর পরবর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেল ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিটিকে এত সহজে খণ্ডনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। হেগেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তুজগৎ এবং ভাবজগতের মধ্যে মূলত: কোন অলঙ্ঘনীয় পার্থক্য নাই, কারণ উভয় জগৎ মূলে একই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। সুতরাং যাহা ভাবজগতে অবশ্যস্বীকার্য্য তাহা বস্তুজগতেও অবশ্য অস্তিত্ববান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বের পরমসত্তা ঈশ্বর ভাবজগতে অবশ্যস্বীকার্য্য হওয়ায় বস্তুজগতে তাঁহার অস্তিত্বের অনুমান অসঙ্গত নহে। হেগেলের যুক্তির যাথার্থ্য ভাববাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা স্বীকার করেন না। বস্তুবাদীরা ভাবজগৎ ও বস্তুজগতের মূলে কোন বিশ্বচেতনার স্বীকৃতি দ্বারা এই উভয় জগতের পার্থক্য অতিক্রম করিতে রাজী নহেন। সুতরাং ভাবতাত্ত্বিক যুক্তির যাথার্থ্য সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কিন্তু যুক্তিটির গুরুত্ব প্রত্যেক দার্শনিকই স্বীকার করেন। পূর্ণত্বের যে আদর্শকে আমাদের মন উপলব্ধি করে তাহা শুধু আমাদের মানসিক কল্পনা নহে, প্রকৃতই সেই আদর্শানুরূপ পূর্ণ সত্তা ঈশ্বর অস্তিত্ববান—আমাদের মনের অন্তস্তলের এই দাবিটি ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিতে প্রকাশিত। পূর্ণত্বের আদর্শ আমাদের অপূর্ণ স্বভাব হইতে সঞ্জাত হইতে পারে না, এই আদর্শ একমাত্র পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের মনে সঞ্জাত করিতে পারেন। আমরা অপূর্ণ-স্বভাব হইয়াও পূর্ণত্বের আদর্শ বা ধারণা সৃষ্টি করিতে পারি—এইরূপ যদি কেহ দাবি করে তবে উত্তরে বলিতে হয়, অপূর্ণ স্বভাব যদি পূর্ণত্বের আদর্শের স্রষ্টা হয় তবে অপূর্ণ কারণকে পূর্ণ কার্য্যের স্রষ্টারূপে গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু ইহা অসম্ভব। সুতরাং ডেকার্ট মনে করেন যে, পূর্ণত্বের ধারণার অস্তিত্ব হইতেই সেই ধারণার স্রষ্টারূপে ঈশ্বর স্বীকার্য্য। যাহা হউক, সন্দেহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই যুক্তিটি এই সত্যকে সমর্থন করে যে, আমাদের মনের অন্তস্তলে বিদ্যমান ঈশ্বরের ধারণাটি অর্থহীন নহে, ইহা যথার্থ।

কারণিক যুক্তি:—এই বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে তাহারই একটি কারণ বর্ত্তমান, এমন কিছু এই বিশ্বে ঘটিতে পারে না যাহার কোন কারণ নাই। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা কার্য্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ। ইহাই জগতের নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারেই আমাদের ভাবিতে হয়, এই জগতেরও একটি কারণ বিদ্যমান এবং সেই কারণই ঈশ্বর। তাহা স্বীকার না করিলে জগতকে কারণহীন ভাবিতে হয়, কিন্তু কারণহীন কিছুই থাকিতে বা ঘটিতে পারে না। কারণিক যুক্তিটিকে (causal argument) নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা হয়:—

প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট;
এই জগৎ একটি ঘটনা;
সুতরাং এই জগৎ একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট।

এই যুক্তির প্রধান প্রতিজ্ঞাটি স্বত:সিদ্ধ। প্রত্যেকটি ঘটনাই একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট ইহা স্বীকার না করিলে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'এই জগৎ একটি ঘটনা' এই অপ্রধান প্রতিজ্ঞাটির যাথার্থ্য স্বীকৃতি লইয়া তর্ক উঠে। ঘটনা বলিলে এমন একটি ব্যাপার বুঝায় যাহার আদি ও অন্ত বিদ্যমান। কিন্তু জগৎকে আদি-ও-অন্তযুক্ত একটি ব্যাপার বলিতে কেহ কেহ রাজী নহেন। এই জগৎ একটি আদিহীন অন্তহীন ব্যাপারও হইতে পারে—কে জানে! জড়বাদীরা জড়কে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করায় জড়জগৎ তাহাদের নিকট অনাদি ও অনন্ত। কারণিক যুক্তিটির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি উঠে কারণ শব্দের অর্থ লইয়া। যুক্তিটির প্রধান প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রধান প্রতিজ্ঞাতে যখন বলা হইয়াছে প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট, কারণ শব্দটিকে তখন সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে—অর্থাৎ কারণ শব্দটি দ্বারা এমন একটি ব্যাপার বুঝান হইতেছে যাহা অপর একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটি মূল কারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যে কারণ অপর কোন কারণ দ্বারা সৃষ্ট নহে। সুতরাং কারণিক যুক্তিটি দ্ব্যর্থকতাদোষে দুষ্ট। আরও একটি আপত্তি উঠে। সেটি এই যে, এই জগতের একটি মূল কারণ আছে স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। জগতের একটি মূল কারণ আছে সত্য, কিন্তু সেই কারণ জড় ভিন্ন অন্ত কিছু তাহা অনুমান করিবার কি হেতু থাকিতে পারে! জড়বাদীরা জগতের মূল কারণকে ঈশ্বররূপে স্বীকার না করিয়া জড়রূপে চিন্তা করেন। সুতরাং কারণিক যুক্তিদ্বারা জগতের মূল কারণ যে ঈশ্বর তাহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই যুক্তিটির কোন গুরুত্ব নাই একথা বলা যায় না। ইংরেজ দার্শনিক জন লক, জার্মান দার্শনিক

ইম্যানুয়েল কাণ্ট প্রমুখ মনীষীরা এই যুক্তিটির প্রশংসা করিয়াছেন। কাণ্ট বলেন, এই যুক্তিটি সাধারণ-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি এই উভয় স্তরের লোকের নিকট সমভাবে শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত। জন লক বলেন, জগতের মূল কারণরূপে এমন একটা কিছুকে স্বীকার করিতেই হইবে যাহা অনাদিকাল হইতেই বর্তমান। কিন্তু অনাদি কাল হইতে বর্তমান 'একটা কিছু'কে স্বীকার করিলেও সেই বস্তুই যে ঈশ্বর তাহার কি প্রমাণ আছে? সেই বস্তুকে জড় রূপে না ভাবিয়া ঈশ্বররূপে গ্রহণ করা নিছক কল্পনাও ত হইতে পারে!

সম্প্রতি ডঃ র‍্যাশডাল নামক জনৈক দার্শনিক কারণিক যুক্তিটিকে ভাববাদের সঙ্গে সমন্বিত করিয়া ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান এবং যেহেতু ভাববাদ প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন কিছুকে বিদ্যমান থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপে বিদ্যমান থাকিতে হইবে, সেই হেতু আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের চেতনার অতিরিক্ত একটি বিরাট চেতনা বিদ্যমান যাহার বিষয়রূপে এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই অস্তিত্বসম্পন্ন ছিল। সেই বিরাট চেতনাই ঈশ্বর। সুতরাং নিত্য অনাদি চেতনারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলে মানুষের চেতনার বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ডঃ র‍্যাশড্যাল-এর যুক্তির যাথার্থ্য ভাববাদীরা স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা এই যুক্তিকে মর্য্যাদা দিতে রাজী নহেন। কারণ তাঁহারা একথা স্বীকার করেন না যে, কোন কিছুকে বিদ্যমান থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপেই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। সুতরাং এই যুক্তিটির যাথার্থ্যও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

কারণিক যুক্তিটির আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রূপে বিচার করিতে গেলে যুক্তিটি ব্যর্থ, কারণ ইহা দ্বারা শুধু একটি অনাদি কারণেরই সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কারণটিই ঈশ্বর কিনা এই প্রশ্নের কোন সমাধান ইহাতে নাই। তথাপি কারণিক যুক্তিটিকে একেবারে অর্থহীন বলা চলে না। উক্ত যুক্তির দ্বারা এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, জগতের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের পশ্চাতে একটি নিত্য বিরাট সত্তা বিদ্যমান যাহাকে জাগতিক ঘটনার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য মূল কারণ জড় কি চৈতন্যময় সত্তা তাহা কারণিক যুক্তি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয় না।

উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি :—জাগতিক বস্তুগুলির গঠনমৈপুণ্য হইতে উদ্ভাবিত ঈশ্বরের অনুমানটি উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি (Telcolegical argument) নামে পরিচিত। জাগতিক বস্তুগুলির গঠনকৌশল লক্ষ্য করিলে মনে হয় এইগুলি কোন বিশ্বশিল্পীর শিল্প। আকস্মিক ঘটকারণ হইতে এই নিপুণতার প্রকাশ কল্পনা করা যায় না। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু—প্রত্যেকেই আপন আপন প্রয়োজনমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমন্বিত। প্রকৃতির বক্ষে যাহাতে নিরাপদে আমাদের সঙ্গে জীবনধারণ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহ গঠন করা হইয়াছে। স্থলচরেরা যাহাতে বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের ফুসফুস গঠিত হইয়াছে। জলচর জীবদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য তাহাদের উপযোগী ভিন্নজাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্তমান। পশুপক্ষীদের বর্ণ-বিভিন্নতার পশ্চাতেও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যে সকল পশুপক্ষী শত্রুর হাতে বিপন্ন বোধ করে, শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণের উপযোগী করিয়া তাহাদের বর্ণসৃষ্টি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। পক্ষীর অস্থিগুলি লঘু নতুবা তাহারা আকাশে উড়িতে পারিত না; দুর্ব্বল পশুগুলি অত্যন্ত সতর্ক ও ক্ষিপ্র, তাহা না হইলে ইহারা শত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন বিশ্ব-শিল্পী যেন প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই বিরাট বিশ্বে প্রচ্ছন্ন রূপে মহান্ শিল্পী যেন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধির সহায়তায় বস্তুজগৎ ও প্রাণিজগৎকে নিপুণতার সহিত গঠন করিতেছেন। সুতরাং জাগতিক বস্তুগুলির গঠননৈপুণ্য হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়। ইহাই উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির মর্ম্মার্থ। এই যুক্তিটির যাথার্থ্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন। এনেক্‌জেগোরাস প্রাণি-অঙ্গের গঠনবিন্যাস দেখিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশস্তি গাহিয়াছেন। পিথাগোরাস বস্তুনিচয়ের সুসমঞ্জস সুশৃঙ্খল গঠন-বিন্যাস দেখিয়া ঈশ্বরকে বিরাট গণিতবিদ্ আখ্যা দিয়াছেন। প্লেটো *Timæus* গ্রন্থে উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এরিষ্টটল জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার আলোচনা হইতে বিশ্বপরিচালনায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটি ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইম্যানুয়েল কাণ্ট এই যুক্তিটিকে 'the clearest, the oldest and best suited to human reason' বলিয়া প্রশংসা করেন। দার্শনিকপ্রবর পেলে (Paley) এই যুক্তিটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় উৎসাহী ধর্মবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণি-অঙ্গের বিভিন্ন উপযোগিতা কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশস্তি আরম্ভ করেন। এই সময়ে ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ প্রচারিত হইয়া ধর্মবিজ্ঞানীদের উৎসাহ অনেকাংশে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। ডারউইন প্রমাণ করেন যে, একমাত্র আকস্মিক পরিবর্তন (chance variations) হইতেই প্রাণিজগতে দেহগঠনের বিভিন্নতা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণিদেহে স্বভাব হইতেই কতকগুলি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি যদি জীবন-সংগ্রামে প্রাণীর

অস্তিত্ব রক্ষার অনুকূল হয় তবেই সেই প্রাণী বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু যদি এই পরিবর্তনগুলি আত্মরক্ষার প্রতিকূল হয় তবে সেই প্রাণী প্রকৃতির বক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পূর্ব-পুরুষের পরিবর্তনগুলি পরবর্তী পুরুষে আসিয়া থাকে। পরবর্তী পুরুষে আবার নূতন নূতন আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সঞ্চিত হইয়া নূতন-জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিদেহের পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণই আকস্মিক। ইহার পশ্চাতে কোন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুমান করার হেতু নাই। প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না, কারণ প্রাণিদেহে শুধু উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয় না, অনেক অনুপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সৃষ্ট হয়। কিন্তু একমাত্র উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সমৃদ্ধ প্রাণীই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়, অনুপযোগী অঙ্গ-সম্পন্ন প্রাণী সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রকৃতির বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য ডারউইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু প্রাণিদেহের গঠন-উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ইহাই তাঁহার মত। শুধু আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা প্রাণীদের গঠনবৈচিত্র্যকে উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহা ডারউইন স্বীকার করিতেন। কিন্তু অন্য কোন কারণ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আকস্মিকতাকেই আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ইহাই তাঁহার অভিমত। ডারউইন নাস্তিক ছিলেন না। "I deserve to be called a theist", 'আমি একজন আস্তিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য'—এক সময় তিনি এই উক্তি করেন। কিন্তু প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপ-যোগিতা হইতে ঈশ্বরের অনুমান তথ্যসমর্থিত নহে বলিয়া ইনি উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির যাথার্থ্যে আস্থাবান নহেন।

সম্প্রতি নর্ম্যান কেম্প স্মিথ নামক একজন ইংরেজ দার্শনিক উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, এই যুক্তিতে প্রাকৃত বস্তু ও কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। কোন একটি কৃত্রিম বস্তুর গঠননৈপুণ্য হইতে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কোন নির্মাতাকে অনুমান করা যায়, কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর গঠন-কৌশল হইতে এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত কি-না তাহা প্রশ্নের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে রচয়িতা শিল্পী রূপে চিন্তা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে শিল্পীরূপে ভাবিলে তাঁহাকে মনুষ্য-সুলভ-গুণ দ্বারা ভূষিত করিয়া বিরাট মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ পরম পুরুষকে এরূপ কল্পনা করা কি স্ববিরোধী নহে? উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি দার্শনিক মহলে আলোচিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে শুধু যে উদ্দেশ্যদ্যোতক নিপুণতাই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, নৈপুণ্যের পাশাপাশি অনৈপুণ্যও দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি একদিকে যেরূপ সুন্দর, অপর-দিকে সেরূপ কুৎসিত। প্রাণিজগতের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যে জীবনরক্ষার উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা নহে, অনুপযোগী, অপ্রয়োজনীয়, আত্মরক্ষার পরিপন্থী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া অনেক প্রাণী প্রকৃতির রাজ্য হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক অতিকায় জীবজন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটি একদর্শিতাদোষে দুষ্ট।

সম্প্রতি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উত্থাপিত করিয়া-ছেন। বিশ্বপ্রকৃতিকে যদি আমরা ইচ্ছাহীন, উদ্দেশ্যহীন জড় বলিয়া গ্রহণ করি তবে প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ-জ্ঞান সঞ্জাত হইতে পারে না এবং যথার্থ-জ্ঞান সঞ্জাত না হইলে প্রকৃতিকে ইচ্ছাহীন উদ্দেশ্যহীন জড় বলারও কোন সার্থকতা থাকে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ বা সত্য জ্ঞান সঞ্জাত হয় স্বীকার করিলে প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথার্থ ইহা আমরা তখনই স্বীকার করিতে পারি যখন আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতি স্বেচ্ছায় আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়া যথাযথভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃতি যদি আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়া যথাযথভাবে আত্ম-প্রকাশ না করে, অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির ঐক্য বা সামঞ্জস্য না থাকে তবে প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যহীন জড়স্বরূপ বলিবারও কোন অর্থ থাকে না, এই বর্ণনাও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যহীন কল্পনা করিবার পূর্বে যথার্থজ্ঞান বা সত্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্যপূর্ণ আত্ম-প্রকাশ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সত্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্যপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে তবে শিব ও সুন্দরের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য বা ঐক্য থাকিবে না কেন? সত্যকে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিলে শিব-সুন্দরকেও প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিতে হইবে। সত্যশিবসুন্দরকে বাস্তবে রূপায়িত করা যে প্রকৃতি দ্বারা সম্ভব হইতেছে তাহাকে উদ্দেশ্যহীন জড়-সত্তা বর্ণনা করা অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ চেতন সত্তারূপে ভাবিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য সত্যশিবসুন্দরের বাস্তব রূপায়ণে পরিস্ফুট। বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির যাথার্থ্য এই ভাবেই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে স্থির নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যরূপে কল্পনা করা চলে না। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ মনে করেন যে, স্থির ও নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের মাপকাঠি দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যকে কল্পনা করিলে প্রাণীদের প্রত্যক্ষ অনুভূত স্বাধীন ইচ্ছায় স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যকে ক্রম-

স্বল্যমান ক্রমবিকাশমান উদ্দেশ্যরূপে ভাবিতে হইবে। প্রকৃতি ক্রমবিকাশের মধ্যে ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জাগ্রত হইতেছে, ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইতেছে।

নৈতিক যুক্তি :—ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি, কারণিক যুক্তি ও উদ্দেশ্যাত্মক যুক্তি এই তিনটি যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে ইম্যানুয়েল কাণ্ট যে যুক্তি উপস্থাপিত করেন তাহা নৈতিক যুক্তি নামে অভিহিত। ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিতে ভাবজগৎ হইতে বস্তুজগতে অনুমান, কারণিক যুক্তিতে পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত জগতের কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল হইতে অপ্রাকৃত মূল কারণের অনুমান এবং উদ্দেশ্যাত্মক যুক্তিতে কতকগুলি কৃত্রিম বস্তুকে উদ্দেশ্যদ্যোতক লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বিশ্বে উদ্দেশ্যপূর্ণ ঈশ্বরের অনুমান ন্যায়সম্মত বলিয়া কাণ্ট স্বীকার করেন না। এই যুক্তিগুলির ব্যর্থতার কারণ এই যে, শুদ্ধ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কাণ্ট মনে করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একমাত্র নৈতিক চেতনার ভিত্তিতেই সম্ভব। আমাদের নৈতিক চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবি করে, ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনা যথার্থ হয় না :

"Admitting that the pure moral law inexorably binds everyman as command, the righteous man may say: "I *will* that there be a Gog. I firmly abide by this and will not let this faith be taken away from me." (Kant's *Metaphysics of Morals.*)

আমাদের নৈতিক চেতনা নৈতিক আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবী করে। নৈতিক আদর্শের প্রতি নির্ব্বিরোধ অকুণ্ঠ আনুগত্য হইতেই পূর্ণস্বরূপী আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়। পূর্ণত্বের আদর্শের দিকে অগ্রগতি হইতে পুণ্য এবং সেই আদর্শ হইতে অপসরণের ফলে পাপ সঞ্জাত হয়। পুণ্যবান যদিও সুখের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না তবু পূর্ণত্বের আদর্শকে বিশ্লেষণ করিলে পুণ্য ও সুখ এই দুইটিকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পাওয়া যায়। যদিও পূর্ণস্বরূপ পরম আদর্শে পুণ্য ও সুখ একত্রই সমন্বিত তবু ইহজগতে পুণ্যবানকে সর্ব্বদা সুখভোগী এবং পাপাচারীকে সর্ব্বদা দুঃখভোগী হইতে দেখা যায় না। প্রকৃতির রাজ্য যদি নীতির রাজ্যের অনুগ হয় তবেই পুণ্যবান সুখী এবং পাপাচারী দুঃখী হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রাজ্য পরস্পরনিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বলিয়া ইহজগতে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অনুসারে প্রকৃতিকে নীতির অনুগ হইতে হইবে, পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা যথাক্রমে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী সুখ ও দুঃখের অধিকারী হইবে। কিন্তু পরস্পরনিরপেক্ষ প্রকৃতি-রাজ্য ও নীতির রাজ্য একে অপরের অনুগ হইতে হইলে একত্বভয়ের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে অনুমান করিতে হয় যাঁহার ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতি নীতির অনুগ হইয়া পুণ্যাত্মাকে পরলোকে সুখী ও পাপাত্মাকে দুঃখী করিবে। সুতরাং আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অনুসারে পুণ্যবানকে সুখী ও পাপাচারীকে দুঃখী হইতে হইলে সুখ-দুঃখের বণ্টনকারী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান অপরিহার্য্য। ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনার দাবির সার্থকতা থাকে না, নৈতিক আদর্শ অর্থহীন হইয়া পড়ে। কাণ্ট মনে করেন, নৈতিক চেতনা প্রাকৃত জগতের চেতনার ন্যায়ই যথার্থ ও বাস্তব, নৈতিক চেতনাকে মায়ামরীচিকা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং নৈতিক আদর্শের সার্থকতার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

জেম্‌স্ মার্টিনো নৈতিক যুক্তিটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ চেতনাতে আমরা যেরূপ একটি স্বতন্ত্র বাহ্যসত্তার সম্মুখীন হইয়া সেই সত্তাকে অনুভব করি, সেইরূপ নৈতিক চেতনাতেও আমরা একটি মহত্তম সত্তার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুভব করি। সেই মহত্তম সত্তাই ঈশ্বর। নৈতিক চেতনাতে আমরা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই এবং কর্ত্তব্যানুসরণের ভিতর দিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করি। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, নৈতিক চেতনাতে আমরা যে মহত্তম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করি সেই সত্তা সমাজ কি ঈশ্বর তাহা কে বলিতে পারে? ডার্কহিম মনে করেন সমাজই সেই মহত্তম সত্তা যাহাকে আমরা নৈতিক চেতনাতে প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

সম্প্রতি ডঃ র‍্যাশড্যাল নৈতিক যুক্তিটিকে নূতন রূপ দিয়াছেন। নৈতিক চেতনাতে আমরা যে কর্ত্তব্যনির্দ্দেশের সন্ধান পাই সেই নির্দ্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নির্দ্দেশগুলি সার্ব্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ। আমরা যদি বিশ্বাস করি প্রাণীহত্যা হইতে প্রাণীরক্ষাই শ্রেয়ঃ, কৃতঘ্নতা হইতে কৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা হইতে নিঃস্বার্থতাই শ্রেয়ঃ, যদি প্রত্যেকে না হউক, অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় কার্য্যটিকে প্রথমটি হইতে শ্রেয়ঃ মনে করে, তবেই আমাদের বুঝিতে হইবে নৈতিক নির্দ্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নৈতিক নির্দ্দেশ বস্তুনিষ্ঠ, নৈতিক চেতনার বাস্তব ভিত্তি বর্ত্তমান। নৈতিক নির্দ্দেশগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপে গ্রহণ করিলে কোন এক বিশ্বচেতনার স্বীকৃতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে চেতনার ভিত্তিতে নির্দ্দেশগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হইতে পারে। অর্থাৎ, নৈতিক আদর্শের সার্ব্বজনীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতা স্বীকার করিলে সেই আদর্শের ভিত্তিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন।

অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও নৈতিক যুক্তি আদর্শ জগতের গুরুত্বকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবি আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে। নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার জড়জগতের বিষয় ও ব্যাপারাদি দ্বারা আদর্শ জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না— আদর্শ জগতের প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে, আদর্শ জগৎকে

যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহা নৈতিক চেতনার দাবি। কিন্তু নৈতিক দাবিকে বিশ্বপ্রকৃতি মানিয়া লইবে, এবং নৈতিক দাবির অনুযায়ী ঈশ্বর প্রকৃতই যে অস্তিত্ববান তাহার কি প্রমাণ আছে! সুতরাং নৈতিক যুক্তিটিকেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না। অবশ্য কান্টের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ নীতিসর্বস্ব ব্যক্তির নিকট নৈতিক যুক্তিটি ঈশ্বরাস্তিত্বের যথার্থ প্রমাণরূপে প্রতিভাত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা আদর্শজগৎকে বস্তুজগতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না তাঁহারা নৈতিক যুক্তিকে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। নৈতিক আদর্শ ভাবজগতের ব্যাপার। ভাবজগৎ হইতে বস্তুজগতে অনুমান ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া কান্ট ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নৈতিক যুক্তিতে কান্ট নিজেই ভাবজগতের দাবি অনুসারে বস্তুজগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণে তৎপর হইয়াছেন।

ঈশ্বরাস্তিত্বের উপরি-উক্ত চারিটি যুক্তির আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তন্মধ্যে কোন একটি যুক্তিও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ নহে। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাহারা উল্লিখিত যুক্তিগুলি হইতে নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রচুর সমর্থন পাইবেন। কিন্তু যাহারা নাস্তিক, ঈশ্বরাস্তিত্বে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যুক্তিগুলি ব্যর্থ। চারিটি যুক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সঙ্গত নহে। ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিতে পূর্ণত্বের ধারণা হইতে পূর্ণস্বরূপ যে ঈশ্বরের অনুমান করা হইয়াছে, কারণিক যুক্তিতে তাঁহাকেই জগতের মূল কারণরূপে, উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিতে তাঁহাকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ চেতন সত্তারূপে এবং নৈতিক যুক্তিতে নৈতিক রাজ্যের বিধাতা পাপপুণ্যের বিচারকরূপে চিন্তা করা হইয়াছে। যদিও অভ্রান্ত ও সন্দেহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে যুক্তিগুলির যাথার্থ্য প্রশ্নের বিষয়, তবু যুক্তিগুলি এক সঙ্গে ঈশ্বররূপী একটি পরমসত্তার অস্তিত্বের আভাস দেয়।

শিক্ষার বিবর্ত্তন

অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি বিচিত্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। হয়ত তাহাই অনুসরণ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের বাস্তব নাট্য অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আজিকার যুগসন্ধিক্ষণেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তর হইতে দেখিলে অভিনয়ের জীবন্ত রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া সমগ্রের অনুভূতি হ্রাস করিয়া দেয়। সেইরূপ আজিকার শিক্ষা-বিপর্য্যয় আমাদের মনে হয়ত তত স্পষ্ট করিয়া রেখাপাত করে না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটি প্রভূত ইঙ্গিতপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরিবর্ত্তন মাত্রেই দূষণীয় নহে; বস্তুতঃ পরিবর্ত্তনই উন্নতির সোপান। নব নব পরিস্থিতিতে নূতন নূতন প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। তাহা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতি ও প্রেরণা সুপথে চালিত করিলে যেমন জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, সেইরূপ বিপথে চালিত হইলে তাহাই জাতির অবনতির কারণ হইয়া উঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্রতিগণকে অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রশক্তিই অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠে; নির্ব্বিকল্পভাবে শিক্ষার কথা না ভাবিয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কখনও কখনও শিক্ষার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতির মোড় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তাহা মঙ্গলজনক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এমন সুবর্ণযুগ আসে যখন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষাব্রতিগণের নিকট উপস্থিত হয় এবং জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকে। তখনই জাতির উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

আমাদের দেশে একবার এইরূপ এক সুবর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজত্বে শিক্ষা ও শিক্ষককে যে সমাদরের সহিত পোষণ করা হইত তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নানা ভাবে ব্যক্ত আছে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা প্রতীয়মান হয়। হিন্দু জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদের অনেক তথ্য এরূপ যে দীর্ঘকালের—হয়ত বংশপরম্পরার—অনুসন্ধান ও নিরীক্ষা (observation) ব্যতীত তাহা স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজশক্তির পোষকতা ভিন্ন এরূপ তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিত না। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শিক্ষার কোন্ ক্রটির জন্য হিন্দু-প্রতিভা বহিরাক্রমণের নিকট অবনত

হইতে বাধ্য হইল সে ইতিহাস অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কালক্রমে শিক্ষার ভারকেন্দ্র কি অসমতাপ্রাপ্তি হইয়াছিল? শিক্ষা কি বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল? শিক্ষা কি উপর হইতে নিঃসৃত হইয়া সমাজদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিত না?

মুসলমান রাজত্বের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির পোষকতা-বর্জ্জিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষের মত নিরীক্ষামূলক বিষয়গুলির অগ্রগতি পূর্ব্বেই ব্যাহত হইল। পরাধীন জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চ্চাও অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র স্মৃতি কাব্য, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদির চর্চ্চা চলিতে লাগিল। সৌভাগ্য-বশতঃ তখনকার দিনে শাসনযন্ত্র দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই। মুসলমান রাজপুরুষগণ রাজস্বগ্রহণ ব্যতীত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। তাই হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে আপন ধর্ম্মসম্মত জীবনযাপন করিবার বিশেষ কোন বাধা হইত না। সমাজপতিগণ কঠোর অনুশাসন দ্বারা সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করিলেন; হিন্দু-সংস্কারগুলি যাহাতে শিথিল না হয় তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে কেবলমাত্র জ্ঞানান্বেষণের প্রয়াসরূপে গ্রহণ না করিয়া জীবনব্রতের অঙ্গ ও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করার সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান প্রেরণা হইল ধর্ম্মসম্মত জীবন যাপন করিয়া, হিন্দু আদর্শ পরিপোষণপূর্ব্বক হিন্দু সমাজকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা। এই পরিস্থিতিতে ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃত শিক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের শ্রদ্ধাবারিসিঞ্চনে অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় রক্ষিত হইল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, হিন্দুদিগের রক্ষণ-শীলতা নব্য শিক্ষিত সমাজের নিকট বিদ্রূপের বিষয় ছিল। আজ আমাদের রক্ষণশীলতা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু রক্ষণশীলতা ব্যতীত হিন্দু সংস্কৃতির ভগ্নাংশও মুসলমান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত কি না সন্দেহের বিষয়।

মুসলমান রাজত্বের শেষ অঙ্কে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এক অন্ধকার যুগ সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষা ত জীবন্মৃত অবস্থাতেই ছিল; মুসলমান রাজশক্তি যে আরবী, ফারসীর মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাও মনে করিবার কারণ নাই। রাজকার্য্য ফারসী ভাষায় পরিচালিত হইত এবং এইজন্য ফারসী ভাষার চর্চ্চা কথঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা—যাহা তৎকালীন ইউরোপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা বাংলাদেশে একেবারেই ছিল না।

অতঃপর ইংরেজ-রাজত্ব অনুসরণ করিয়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইল। ভারতীয়দের শিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমে হইবে কি সংস্কৃত অথবা আরবী, ফারসীর মাধ্যমে হইবে তাহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছিল, মেকলের সুপরিচিত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার অবসান হইল; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইংরেজীর মারফতে পরিচালনা করা স্থির হইল। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানসম্পদ মেকলের নিকট অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং তিনি ইহার প্রতি যথোচিত সুবিচার করেন নাই। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তার পর সংস্কৃত ভাষার পক্ষে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে কার্য্যকরী হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 'প্রাচ্য ভাষায় সকল গ্রন্থ অপেক্ষা নির্ব্বাচিত কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে'—মেকলের এই উদ্ধত উক্তির মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত ছিল। ইতিপূর্ব্বেই অনেকে ব্যক্তি-গতভাবে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে এই ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজই মেকলের প্রধান সমর্থক ছিল। অন্যথায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন কখনই সহজসাধ্য হইত না। রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট কেবলমাত্র প্রাচ্য শিক্ষার পোষকতা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এরূপ শিক্ষা দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিবে'।*

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পশ্চাতে মেকলের একটি আশা ব্যক্ত হইয়াছিল যে, সমস্ত ভারতবর্ষ ইহার ফলে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। সে আশা নিষ্ফল হইয়াছে যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে মেকলের সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নবযুগ সূচিত হইল। আমরা নূতন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলাম ইউরোপীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া গেল। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের প্লাবন আরম্ভ হইল। বাংলা ভাষাও ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে বিবিধ ভাব-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। একটি প্রতিক্রিয়া হইল এই যে, হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল। নব্য ছাত্রসমাজ হিন্দু রীতি-নীতির উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বিদেশীর আচার-ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এ

* 'Calculated to keep the country in darkne
—*Selections from Educational Records, Part I* by H. Sha
Calcutta, 1920—page 101.
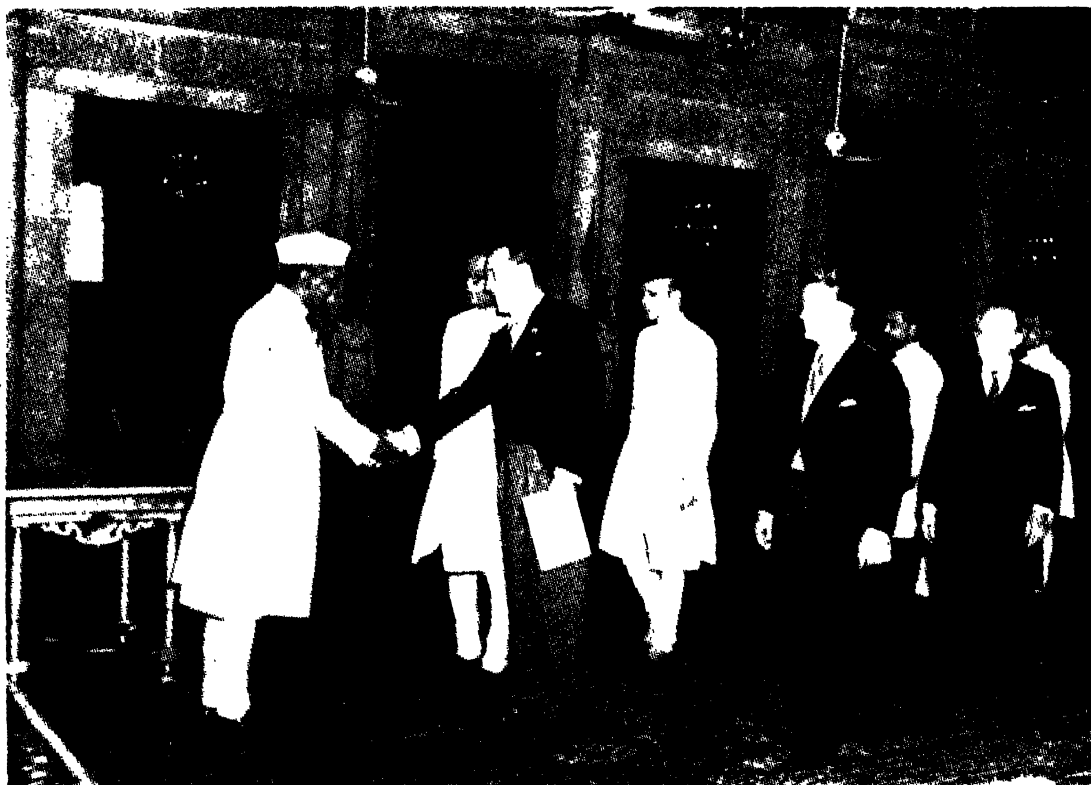
রাষ্ট্রপতি-ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূতের সহিত করমর্দনরত ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত ও এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা 'সিন্ধ্রি কারবনাইজার ফ্যাক্টরির' একটি দৃশ্য

গেজিরার 'হোয়াইট নাইল' নদীর উপর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গেবেল আউলিয়া বাঁধ

সেচ-পরিকল্পনা অনুসারে কাটানো গেজিরার প্রধান খাল

উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যই লঘুচিত্ততা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার মধ্যেও তাহাদের সাধনার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তখনকার ছাত্রগণ আন্তরিকভাবেই কায়মনোবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আজিকার ছাত্রসমাজে শিক্ষার প্রতি যেরূপ নিষ্ক্রিয়তা ও নিরুদ্যমের লক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় তখনকার ছাত্রদিগের এই পরানুকরণমূলক মনোভাব নিন্দনীয় হইলেও এক দিক দিয়া প্রশংসারও যোগ্য। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কার। নব্য-ছাত্রসমাজ সাধারণ ভাবে হিন্দুসংস্কারের প্রতি স্বতই অবজ্ঞাপরায়ণ হউক না কেন, এই সংস্কারটির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। ইংরেজী রাজভাষা; সুতরাং অবশ্যই অর্থকরী ছিল। কিন্তু শুধু অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়াই নহে, আদর্শবাদ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও ছাত্রগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিত।

আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এই যুগ যতটা অনুকরণের যুগ, জ্ঞান-সংগ্রহের যুগ, ততটা জ্ঞান-সৃষ্টির নহে। এই সময়ে ইউরোপে নব নব উদ্ভাবনের যে ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহার তুলনায় আমরা নিষ্ক্রিয় ছিলাম। নূতন ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা মনে করিতাম জ্ঞান-সংগ্রহ করিবার জন্য ত পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখেই রহিয়াছে—জ্ঞান সৃষ্টি করিবার কথা তখন একেবারেই মনে উঠে নাই। ইহা সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ও ভারতীয়দিগকে গবেষণার সুযোগ দিবার ইচ্ছা ততটা পোষণ করিতেন কিনা সন্দেহ। কালের গতির সহিত সকল রাষ্ট্রই দেশের নানা প্রকার মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেছে। তদানীন্তন কালে সেরূপ প্রেরণা ছিল না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিদেশীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সে প্রেরণা স্বভাবতঃই আরও ক্ষীণ ছিল। নব্য শিক্ষিতকে রাজকার্য্যের সহায়করূপে পাইবার উপস্থিত প্রয়োজন ছিল; সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই ভাবেই গঠিত হইল। ইংরেজ শাসকগণ সংশয়হীনরূপে আপন আপন প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যকরীরূপে প্রবর্ত্তন করিতে জানিতেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালনা করিতেন। শিক্ষা সীমাবদ্ধ হইলেও যাহাতে খাঁটি হয়, তাহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল; নির্ভুলভাবে ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিষয় বুঝিতে এবং নির্ভুলভাবে এই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে ছাত্রগণ অভ্যস্ত হইত।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম উদ্দীপনা কাটিয়া গিয়া ইহার অর্থকরী রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল; শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সরকারী চাকুরী লাভ। লোকে অধিকতর সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। বাংলাদেশই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিল। রাজকার্য্যের জন্য বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আহূত হইতে লাগিল। ছাত্রজীবনে পুথির মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং কর্ম্মজীবনে দূরদূরান্তরে কেবলমাত্র ইংরেজ প্রভুর মেজাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে দেশের জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি মুসলমান রাজত্বেও আমরা নিভৃতে যে গ্রামীণ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, পল্লীর পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের সংযোগ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এই বহিঃকেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষা কল্যাণকর হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। হয়ত ইংরেজী শিক্ষার এই সমাজধ্বংসী রূপের কথা মনে করিয়াই রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা কমিশন 'গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়' (Rural Universities) গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

অতঃপর স্বদেশীযুগ আরম্ভ হইল। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেই আন্দোলন প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে। এই শুভক্ষণেই শিক্ষিত-সমাজ প্রথম জনসাধারণের সহিত যোগস্থাপন করিতে উৎসুক হয়। অপর পক্ষে ইংরেজ শাসকগণও ক্রমে ক্রমে উচ্চতর পদগুলি দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিয়া শিক্ষিত-সমাজের মতি গতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিতেন তাঁহাদের প্রতি, এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের কর্ম্মীদের মধ্য হইতেও যাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব তাঁহাদের প্রতিও এই অনুগ্রহ বর্ষিত হইতে লাগিল। শিক্ষাবিভাগেই অধিকতর ভারতীয়করণ নীতি প্রযুক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই আমরা শিক্ষানৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আমরা এই স্বাধীনতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় নাই।

দেশবাসীর করায়ত্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সংস্কার আশানুরূপ কল্যাণপ্রসূ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া, নিরীক্ষামূলক ও বহির্মুখী করিয়া, সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা—শিক্ষাকে পোশাকী রূপ হইতে

প্রয়োজনীয় শিক্ষার রূপে পরিবর্ত্তিত করা; সরকারী দপ্তরে কেরাণী তৈয়ার করিবার সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের উপর শিক্ষাকে স্থাপিত না করিয়া, সমাজ-কল্যাণের প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু কার্য্যতঃ সংস্কার হইল এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার যে কঠোরতা ছিল তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইল; অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও কঠোরতা হ্রাস করিয়া ছাত্রদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শক করা হইল। ঈপ্সিত ফল অবশ্যই লাভ হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-ভাণ্ডারেরও অনুরূপ স্ফীতি হইতে লাগিল। এই সময় শিক্ষাবিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ক্রমবর্দ্ধমান 'পাসের' অনুপাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। "The Senate views with alarm"—(সিনেট আশঙ্কার সহিত এই মত প্রকাশ করিতেছেন) তাঁহার প্রস্তাবের এই মুখবন্ধ তখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বিদ্রূপের সহিত উচ্চারিত হইত; সকলেই ইংরেজকে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী বলিয়া মনে করিত। শিক্ষার ও শিক্ষালয়ের সুষ্ঠুতর ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইবার প্রস্তাব না আনিয়া, কেবল পরীক্ষায় 'পাসের' সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ভীত হইলে, ইহা অপেক্ষা উদারতর সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আজ স্বদেশীয়েরাই সেই নিন্দিত নীতি কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তখন সিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন ছিল; এখন ছাত্রদিগের মূঢ় অভিভাবকগণ অর্থের বিনিময়ে ইহা অনুভব করিতেছেন। তখন শিক্ষার যে গ্লানির সূচনামাত্র হইয়াছিল-তৎকালে এই নীতি গৃহীত হইলে যে অনিষ্ট রুদ্ধ হইত, আজ তাহা সমাজদেহে পরিপূর্ণ বিষক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাদৃশ্যও আছে; তখন শিক্ষার যে সকল সংস্কার করণীয় ছিল, আজও তাহা করণীয়ই রহিয়াছে।

নূতন শিক্ষা সংস্কারের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্নাতকোত্তর (post-graduate) স্তরের শিক্ষা স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করা হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহার কুফল হইয়াছে এই যে, নিম্নস্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পর যে দুইটি বৎসর ব্যয়িত হয় তাহা প্রায় ব্যর্থতায় পরিণত হইতেছে। অপর পক্ষে উচ্চতর স্তরে একাধিপত্যের কুলক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ফীতি মাত্রা ছাড়া[ইয়া] যাইতেছে; শিক্ষার সৌকর্য্যের জন্য একাধিক বি[শ্ব]বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহা শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই অনু[ভব] করিতেছেন; নানা শিক্ষা কমিশন অনেক দিন হইতে অনুরূপ মন্তব্য করিয়া আসিতেছেন। তথাপি ঠিক [এ] সংস্কারটির কথা উচ্চারিত হইবে না। বরঞ্চ কলিকা[তা] বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে থাকিয়া যে সকল বি[শেষ] বিশেষের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানা স্থানে শিক্ষা-পরিবেশন ক[রি]তেছে, সেগুলির কর্ত্তৃত্বও কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করি[বার] প্রস্তাব উঠিতেছে। কেহ বা এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দিতে চাহিতেছে[ন] কেহ বা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা[ন]গুলিকে সম্বদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। পর পর একা[ধিক] শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ প্রস্তাব উত্থা[পন] করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য কি? ভারতীয়গণ যতই বৃহৎ প্রতি[ষ্ঠান] পরিচালনায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছে না, ত[তই] বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইতে[ছে] কেন? বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার [উৎ]কর্ষের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষার অধুনাতন গতিপ্রকৃতি শিক্ষানুরাগীর হৃ[দয়ে] অধিকতর হতাশার সৃষ্টি করিবে। মহাত্মা গান্ধী 'আ[বশ্যিক] শিক্ষা (Basic education) সম্বন্ধেই শিক্ষাসংক্রান্ত স[কল] চিন্তা নিঃশেষিত করিয়াছেন; কদাচিৎ তিনি উচ্চ শি[ক্ষা] সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা ওয়ার্ধা [কন]ফারেন্সে তিনি কার্য্যত: উচ্চশিক্ষার বিরোধিতাই কর[িয়া]ছিলেন। সার ফিলিপ হার্টগ লিখিয়াছেন:

> "A suggestion by Mr. Gandhi that no Govern[ment] Funds should in future be provided for Universities, ex[cept] to meet state needs was, I think, fortunately not end[orsed] by the Wardha Conference. Its adoption would go [far] to kill higher education in India." (*Some Aspect[s of] Indian Education, Past and Present*, by Sir P[hilip] Hartog. Oxford Univ. Press, 1939. Preface, page X

মহাত্মা গান্ধী সত্যসন্ধ ছিলেন; নিজ মনে[র কথা] অবিকৃতভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অনুগামীদিগের বাক্যে ও কার্য্যে মিল স্বত[ঃসিদ্ধ] নহে। আজ দেখিতে পাই শিক্ষার বাহ্যিক আড়[ম্বরের] নিম্নে শিক্ষার প্রতি অনাস্থা ও অবহেলার প্রবল স্রোত বহিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নানাস্থ[ানে] জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) স্থা[পিত] হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সর্ব্বভারতীয় বি[শেষ] বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর অর্থসাহায্য [...]

হইতেছে। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার আদর্শ অপেক্ষা ক্ষমতালোলুপতার ক্রিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র শিক্ষিত-সমাজের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া, আপন গোষ্ঠীর পোষকতা করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণভাবে শিক্ষা পরিচালন ও শিক্ষিতের জীবনযাপন বিড়ম্বিত হইতেছে।

শিল্পপতিগণ এবং বণিকসম্প্রদায় কারিগরি ও কেরাণীগিরি শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনওপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন দেখেন না। এ সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য জগতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে বিচলিত করে না। তাঁহারা দুইটি নীতির উপর তাঁহাদের মুনাফার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে শিল্প পরিচালিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ভারতের চতুর্দ্দিকে শুল্ক-প্রাচীর উত্তোলন করিয়া তাঁহারা অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিবার অভিলাষী। এমন অবস্থায় শিল্পের উন্নতির জন্য কারখানার অভ্যন্তরে গবেষণার ও সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইবে কিরূপে? যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের জীবিকার এবং কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নহে তাহা দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিল্পপতি এবং বিদেশীয় পুঁজিপতির হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্য তুলিয়া দিয়া এবং দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী বিশেষজ্ঞের মুষ্টিগত করিয়া দেশের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে?

স্বদেশীয়দের শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত কোন্ দেশের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে? হয়ত প্রত্যুত্তর মিলিবে, রাষ্ট্র শিক্ষার বিরাট ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষিতের মর্য্যাদা রক্ষা, শিক্ষিতের জীবনধারণের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। শিক্ষিতের জীবন বিড়ম্বিত করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। শিক্ষিতের জীবনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া, কারিগরি ও কেরাণীগিরির দিকে শিক্ষার স্রোত বহিতেছে; শিক্ষার স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষা ও সমগ্র দেশ কোন্ পরিণামের দিকে চলিতে থাকিবে তাহা স্বদেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীকেই চিন্তিত করিয়া তুলিবে।

ভ্রষ্টনীড়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

একটি হৃদয় খোঁজে
সতত এ মন
কত পথ করে পর্য্যটন।
ধু ধু বালুচরে—
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
অবিরাম চরে,
হেঁটে যেতে 'ওয়েসিস'
অন্বেষণ করে—
একটি হৃদয়
যে মরুবালুতে ঢাকা রয়।
তবু ঝড়ো-হাওয়া
শত স্বর্ণকণা
প্রদাহের শুধুই লাঞ্ছনা
তিক্ত স্বাদ আনে।
মেলে না হৃদয় কোনোখানে।

তবু এক দিন
এই মরু-আবরণ ছিঁড়ে
একটি হৃদয়
হবে স্রোতোময়,
ধু ধু বালু ভিড়ে
দেবে পরিচয়—
রৌদ্রে গেলে সে প্রান্তর ভেঙে'
এই কথা মনে হয়
হেঁটে যেতে যেতে।
মনে হয় একদিন
এ মরু-প্রান্তর
ছিল যে সাগর
ছিল না শুধুই বালুস্তূপ—
পিঙ্গল ধূসর।
তখন হৃদয় ছিল
সৌরভে উর্মিল,
পাওয়া যেত জীবনের
অনিবার্য মিল।

সে সমুদ্র আজ নেই—
প্রকৃষ্ট হৃদয়,
কঠিন সময়
বালুতে-কঙ্করে চড়া
পরিণত হয়।

সে সমুদ্র নেই জানি
তবু যে হৃদয়
—'ওয়েসিস' খুঁজে ফিরি
ধু ধু মরুময়।

সুদান

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সুয়েজ খাল অঞ্চল ও সুদান লইয়া ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে বিরোধ মনকষাকষি ইত্যাদির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল সম্প্রতি তাহা এক নূতন পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে। মিশরের পররাষ্ট্র-সচিব সালে-এল দিন পাশা সম্প্রতি জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে আপোষ-রফার প্রথম সর্ত্ত হইবে মিশর হইতে ব্রিটিশের অপসারণ।
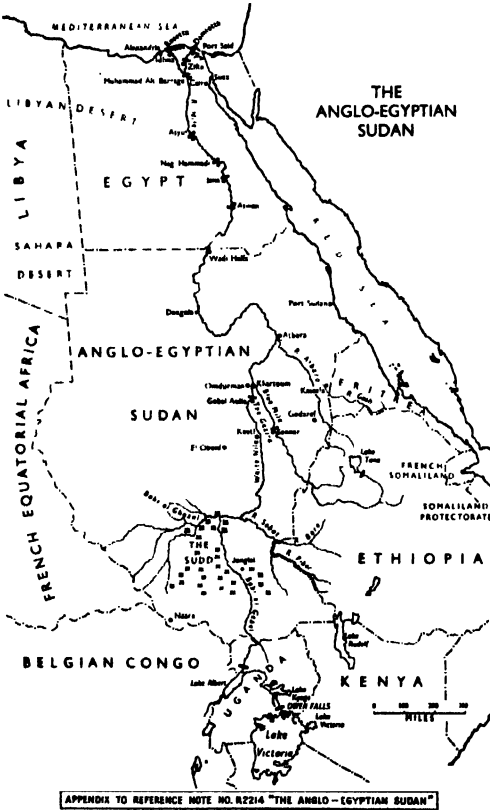
সুদানের মানচিত্র

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সুদানীদের পরাজয়স্বরূপ মাহ্‌দীর পরাজয়ের পর সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় দ্বৈত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নীলনদকে মিশরের ধমনী বলা চলে। এই নীলনদের বারি-বিধৌত অঞ্চলের ঐক্যবিধানের উদ্দেশ্যে মিশর আজ সুদানকে নিজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়। ব্রিটিশের ইহাতে আপত্তি।

সুদানে 'ওয়াদ এল নীল', 'আশিগ গা', 'ইত্তিহাদিয়ান' প্রভৃতি অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে—তন্মধ্যে কোন কোনটি সুদানের মিশরের অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী, কিন্তু এক দল জাতীয়তাবাদী সুদানী মিশর এবং সুদানের পরিপূর্ণ ঐক্যের প্রস্তাব মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক। বিভিন্ন দলের এই মতানৈক্যের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ সুদানেও নিজের চিরাচরিত কূট-নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সুদানে ব্রিটিশ কূটনীতি বানচাল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সুদানের সমুদয় রাজনৈতিক দল—তন্মধ্যে সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী আল উম্মা দলও আছে—সুদান হইতে ব্রিটিশ এবং মিশরীয় সমুদয় সৈন্য-বাহিনীর অপসারণের পর গণভোট গ্রহণ করা হোক্ এই মর্ম্মে মহম্মদ সালে-এল দীন পাশা যে প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহাতে একমত হইয়াছে।

মিশরের দক্ষিণ দিকে সুদান অবস্থিত। সুবিখ্যাত নীল নদ ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মিশরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 'ব্লু নাইল' এবং 'হোয়াইট নাইল' এই দুইটি নদী খারটুমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল অঞ্চলকে আরবীয়েরা বলে এল গেজিরা—সমগ্র সুদানের মধ্যে এই অঞ্চলটিই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। মধ্যভাগে ইহা প্রায় নব্বই মাইল প্রশস্ত।

সুদানের উত্তর প্রান্তসীমাস্থ লিবিয়া এবং সাহারা মরুভূমি হইতে দক্ষিণের সুদ এলাকার জলাভূমি পর্য্যন্ত সহস্র মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য আছে এবং এই ভূভাগের জনসংখ্যা এবং তাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী মুখ্যতঃ এই বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত। উত্তর হইতে যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই বৃষ্টিপাতের ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মরু-অঞ্চলের সীমারেখা হইতে পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী গেজিরাতেই বৃষ্টিপাত হয় সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন চারণভূমিতে বিস্তর ঘাস এবং শস্যক্ষেত্রাদিতে বিবিধ মরসুমী ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে এরিত্রিয়া এবং লোহিত সাগর পর্ব্বতমালা হইতে পশ্চিমে নয় শত মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত 'ফ্রেঞ্চ ইকুয়ে-টরিয়াল আফ্রিকা'র মধ্যবর্ত্তী—গেজিরা সম্বলিত, অঞ্চলটি প্রায় ২০০ শত হইতে ৪০০ শত মাইল প্রশস্ত—ইহার অধিকাংশই উন্মুক্ত সমতলভূমি এবং গো-মহিষাদি প্রতিপালন করিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

সমগ্র সুদানের মধ্যে গেজিরার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে মিশর হইতে নীল নদের তীরবর্তী যে রাস্তা দ্বারা মধ্য-আফ্রিকার সহিত উহার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহার অবস্থিতি, আবার পূর্ব্বদিকে লোহিত সাগর এবং আরব হইতে পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া একটি রাস্তা ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতীতে এই সমস্ত রাস্তা দিয়াই বিদেশীরা বিজয়-অভিযান পরিচালনা করিয়া এই দেশ জয় করিয়াছে, এই পথ দিয়াই বহিরাগতেরা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

মাহ্‌দীর স্বহস্তনির্ম্মিত শেখ খোয়াণীর সমাধি
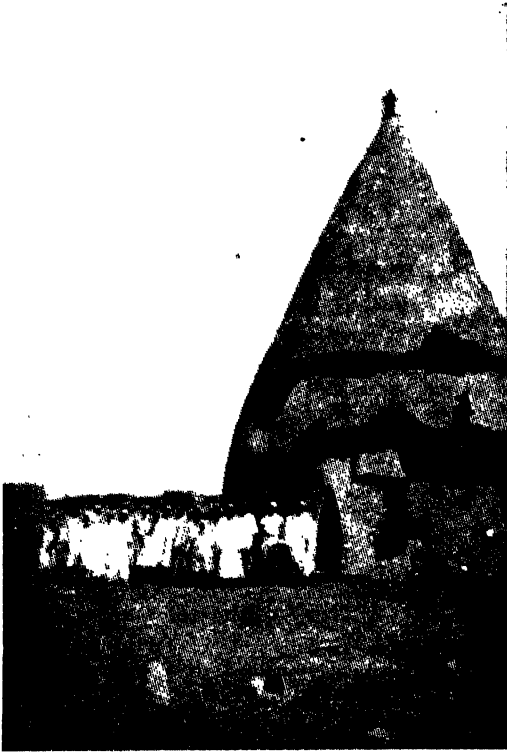
ব্রিটিশ শাসনাধীনে সুদানের আর্থিক সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আসল হেতু নূতন নূতন রেলপথ খুলিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারসাধন। এই ব্যবস্থার দরুন সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইয়াছে গেজিরা—রেল-পথের দ্বারা সমুদ্রের সহিত সংযোগ স্থাপিত না হইলে গেজিরার বর্ত্তমান সেচব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। উক্ত রেলপথ লোহিত সাগর পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়া পোর্ট সুদান পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং মিশরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। লর্ড কিচেনার কর্ত্তৃক সুদান-বিজয়ের উদ্দেশ্যে এই রেলপথ নির্ম্মিত হয়। সেন্নার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার একটি শাখা গমের প্রধান বাজার এল ওবিদ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং আর একটি শাখা পূর্ব্বদিকে সেন্নার বাঁধ অতিক্রম করিয়া কার্পাস-উৎপাদন-অঞ্চল কাসালার ভিতর দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পোর্ট সুদানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গেজিরার ভিতরে এমন কয়েকটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে যেগুলি অতিক্রম করিয়া নাইজিরিয়া এবং পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থযাত্রীরা পুরাতন সুয়াকিন বন্দরের ভিতর দিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। আগেকার দিনে বিভিন্ন পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা দলবদ্ধ ভাবে পদব্রজে আফ্রিকার ভিতর দিয়া এই তীর্থযাত্রায় বাহির হইত—মায়েরা শিশুদের পিঠে বাঁধিয়া লইত। সাম্প্রতিক কালে গেজিরার কার্পাস-ক্ষেত্র হইতে এবং তীর্থযাত্রাপথে বিভিন্ন বিরাম-স্থলে নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ অর্জ্জিত হয় তীর্থযাত্রীরা তাহার সাহায্যে সমুদ্রোপকূলে এই ভ্রমণের শেষ পর্ব্বটুকু ট্রেনযোগে সম্পন্ন করে।

সুদানের দুই জন অভিজাত-ব্যবসায়ী সহ মাহ্‌দীর পুত্র
সার সৈয়দ আবদ এল রহমান (মধ্যস্থলে)

রেলপথের ন্যায় মোটরকারের বহুল প্রচলনেও গেজিরার মাল চালান ও লোক-চলাচল-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আজকাল গেজিরার সেচ-অঞ্চলের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলির ভিতর দিয়া বিস্তর মাল এবং লোকজনসহ ক্রমাগত মোটর বাস যাতায়াত করে। ট্রেন এবং মোটর বাস কিন্তু মাল বহনের প্রতিযোগিতা এই মরু-অঞ্চলের সনাতন বাহন উটকে হটাইয়া দিতে পারে নাই। বরং কৃষির প্রসারের দরুন বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে গেজিরা এবং অন্যত্র মালবহনকারী উটের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

গেজিরা লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট সুদানের অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল হইলেও এই দেশের ইতিহাসে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খ্রীষ্টীয় এক সহস্রাব্দ হইতে পাঁচ 'শত বৎসর কাল গেজিরাতে আলোয়া নামে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

খার্টুমের ৩০০ মাইল দক্ষিণে সোবা নামক স্থানে ছিল ইহার রাজধানী। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক সোবা বিধ্বস্ত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পর তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত গেজিরার উপর ফুং রাজ্যের সুলতানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সহিত শাসন-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত উপজাতীয় নেতাদের সাক্ষাৎ

ছিল—তাদের রাজধানী ছিল সেন্নার। অতীতে গেজিরার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বার বার পটপরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফুং বংশের রাজত্বকালে বহিরাগত আরব এবং বর্ব্বরেরা এদেশে অভিযানে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে বন্দীকৃত এবং বহু লোককে হত্যা করে। অবশেষে তাহারা দেশটি দখল করিয়া বসে। ক্রমে ক্রমে গেজিরা এই নবাগত জাতিরই বাসভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

কালক্রমে গেজিরা বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সুদানের সঙ্গে ইসলাম-জগতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। ক্রমে ক্রমে সেন্নার একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইল। ইউরোপীয়গণ এই শহর পরিদর্শনে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে এখানে লাভজনক কার্পাস-শিল্প গড়িয়া উঠিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীগণ কর্ত্তৃক সেন্নার অধিকৃত হইলে ফুং-প্রভুত্ব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়।

মিশরের অধীনে থাকাকালে বিজেতাদের কুশাসন এবং দুর্নীতি ভাবী মাহ্‌দী বিদ্রোহের পথ পরিষ্কার করিল—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে খার্টুমের পতনে এই বিদ্রোহের অবসান হইল।

এই সময় গেজিরার বর্ত্তমান গঞ্জশহর মেসিলিমিয়া ছিল দক্ষিণ অঞ্চল হইতে বন্দীকৃত দাসবিক্রয়ের একটি প্রধান বাজার। সুদান হইতে বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস—সময় সময় তাহাদের সংখ্যা বৎসরে ৫০,০০০ হাজারে দাঁড়াইত—সুদান হইতে চালান হইত।

মাহ্‌দি বিদ্রোহের নায়ক মাহ্‌দী স্বয়ং গেজিরায় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-মণ্ডলীর (টারিগা) অন্তর্ভুক্ত—এখনও গেজিরায় উক্ত ধর্ম্মমণ্ডলীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। কথিত আছে, তাঁহার শ্বশুর শেখ খোরাশীর মৃত্যুর পর তিনি নিজের হাতে তাঁর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সুদানের বর্ত্তমান অধিবাসী

বর্ত্তমানকালে সুদানের একই অঞ্চলে এমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপজাতীয় লোকেরা বাস করে। তন্মধ্যে মাহ্‌দী সৈন্যদের বংশধরেরাও আছে। গেজিরার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মূরদের অধ্যুষিত একটি জেলা আছে এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের বহু গ্রামে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির বাস। গ্রামাঞ্চলের আরবদের মুখাকৃতি এবং দৈহিক গঠন লক্ষ্য করিলে একথা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের দেহে প্রচুর দাস (নিগ্রোয়েড) রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে।

গেজিরার নীল নদের বুকে ভাসমান বজরা

আগেকার দিনে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রায়ই কলহ-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটি হইত। ইহাদের সমাজে নানা কুসংস্কারও ছিল। ইদানীং এ সকল বহুলাংশে কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। জাতির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি ইহাদের অনুরাগ অপরিসীম। ইহারা গোষ্ঠী-কথা, পূর্ব্ব-পুরুষদের যুদ্ধবিগ্রহ এবং কৃতিসমূহের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসে।

এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অতিথিসৎকার-পরায়ণ। কোনো গ্রামে বেড়াইতে গিয়া গৃহস্থবাটী হইতে খাদ্য গ্রহণ না করিলে তাহা শিষ্টাচারবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সুদান বহু মিশ্র জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে এক দিকে যেমন জড়বুদ্ধি দাস-শ্রেণীর লোকের বাস, অন্য দিকে তেমনি দৈহিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিরল নহে। সাধারণতঃ শেখ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যেমন আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা তেমনি মর্য্যাদাদ্যোতক তাঁহাদের আচরণ—তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিও প্রখর।

গেজিরার আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা

গেজিরার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ইহার সেচ-ব্যবস্থা। ইহার দরুন এই দেশের এক অংশের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সেচ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-যাপন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, অবশ্য সমগ্র গেজিরার সামান্য অংশমাত্রই সেচ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। নীল নদের পশ্চিম দিকে প্রাচীন গেজিরা। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আজও আগেকার আমলের জীবনধারারই অনুবর্ত্তন করিতেছে।

উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া উক্ত অঞ্চলে গাছপালা বিরল। দক্ষিণদিকে—যেখানে পাহাড়শ্রেণী সীমা-রেখা রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গাছপালার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া একপ্রকার কাঁটা গাছের ঝোপ ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

গেজিরার অনন্ত-প্রসারিত, উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইলে নজরে পড়ে গ্রামগুলি সুদূর দিগন্তে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারিবাঁধা তৃণে ছাওয়া সূক্ষ্মাগ্র চালাবিশিষ্ট কুটীরসমূহ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তর অঞ্চলে চাল ছাইবার তৃণ জন্মায় না বলিয়া রৌদ্রদগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা সমতল আকারের চালা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক কূয়া আছে—পশ্চিম অঞ্চলে মাটি খুঁড়িয়া জল পাওয়া কষ্টকর বলিয়া বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বিরাট আকারের দীঘি (হাফির) কাটানো হয়।

নবেম্বর মাসে বৃষ্টিপাতের অভাবে জমি থাকে শুষ্ক এবং অনুর্ব্বর। সেচ-অঞ্চলে কার্পাসগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জানুয়ারী মাসে কার্পাস-গুটি যখন ফাটিতে থাকে তখন পাকা তুলার শুভ্রতা সুদূরপ্রসারিত কার্পাসক্ষেত্রগুলিকে এক অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়া তোলে। তুলা-সংগ্রহকারীরা দলে দলে মাঠে গিয়া কার্য্যে রত হয়। গৃহস্থদের কুটীরে কুটীরে রাশি রাশি তুলা বস্তাবন্দী করিবার ধুম পড়িয়া

সেচ অঞ্চলের বাহিরের একটি গ্রামের কূয়া হইতে স্ত্রী-পুরুষ চামড়ার থলিয়ায় জল তুলিতেছে

যায়—তারপর উটের পিঠে চাপাইয়া সেগুলিকে বীজ ছাড়াইবার কেন্দ্রগুলিতে লইয়া যাওয়া হয়।

যে বৎসর সুবৃষ্টি হয় সেই বৎসরে বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভূ-ভাগ বিবিধ তৃণলতা এবং গুল্মবৃক্ষের প্রাচুর্য্যে সবুজ শোভায় মণ্ডিত হয়। পল্লীগ্রামের মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া খালগুলির ওপারে তাকাইলে নজরে পড়ে ঘন সবুজ জনারের ক্ষেত মাইলের পর মাইল অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে সুদূরপ্রসারিত তৃণক্ষেত্রের উপর সাদা রঙের এক প্রকার ফুল অজস্র ফুটিয়া রহিয়াছে—যেন সবুজের উপর সাদা ফুলতোলা বিরাট কার্পেট ভূপৃষ্ঠে বিছানো।

জনারই এখানে উৎপন্ন প্রধান খাদ্যশস্য। নবেম্বর মাসে ফসল কাটা হইলে পর লোকেদের বাৎসরিক খাটুনির অবসান হয়। ভাল বৃষ্টি হইলে তাদের খাদ্যাভাব হয় না। তখন তাহারা তীর্থযাত্রায় বাহির হয়। মাঝে মাঝে ভোজের আয়োজনও করে। প্রাচীনকালে এই সময় তাহারা যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইত।

সেচ-ব্যবস্থার ফলে কেবল সেচ-অঞ্চলের নহে তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের অধিবাসীদেরও দুর্গতি এবং দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইয়াছে। ইহার দরুন অনাবৃষ্টি হইলেও ক্ষেতগুলি প্রচুর জল পায় বলিয়া ফসল নষ্ট হয় না, উপরন্তু

কার্পাসগাছ হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়াও লোকেরা বেশ দু' পয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

সুদানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

তুলাই সুদানের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। গত বৎসর তুলা রপ্তানি করিয়া এদেশের প্রায় ২,২০,০০,০০০ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। একা ব্রিটেনই সুদানের নিকট হইতে ১,৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের তুলা কিনিয়াছিল। আর ভারতবর্ষ

একজন সুদানী সিপাহী

ক্রয় করিয়াছিল ২০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। তুলার দর যে ভাবে চড়িতেছে এবং উৎপাদনও যেরূপ বাড়তির পথে তাহাতে আশা করা যায় যে, আগামী মরসুমে তুলা রপ্তানি দ্বারা সুদানের আয় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

সুদানের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে তুলার পরেই আরব্য জমায়ের স্থান—দুনিয়ার বাজারে তাহার এই জিনিসটির এক-চেটিয়া কারবার। এই খাদ্যশস্য রপ্তানি দ্বারা গত বৎসর সুদানের লাভ হইয়াছিল ২,০০,০০০ পাউণ্ড।

এই দেশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমি, চারণভূমি এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ—এখানকার উপজাতীয় লোকেরাও অনুন্নত। সেইজন্য এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পণ্যদ্রব্য এতদুভয়েরই একান্ত অভাব। কার্পাস-তুলা এবং জমায় ছাড়া সামান্ত পরিমাণ চামড়া, বিদেশের চিড়িয়াখানার জন্য দুষ্প্রাপ্য পশুপক্ষী এখানকার রপ্তানিদ্রব্য।

মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সুদান জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনাসমূহকে কার্য্যকরী করিবার যন্ত্রপাতি, তৈরি মাল এবং অন্যান্য বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। গত বৎসর সুদান বিদেশ হইতে মোট ২,৫০,০০,০০০ পাউণ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রিটেন হইতে আসে ৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের আর ভারতবর্ষ হইতে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ডের—অধিকাংশই বয়ন-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি।

জাতিগঠনমূলক সরকারী পরিকল্পনা

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুদান গবর্ণমেণ্ট একটি দশ বৎসরের পরিকল্পনা লইয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই পরিকল্পনার চারিটি অঙ্গ—সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি এবং জনহিতকর কার্য্য।

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে খার্টুমে সাতটি ফ্যাকাল্‌টি সম্বলিত একটি উন্নত ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১২০০ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট এক লক্ষ। সরকার খার্টুম, ওমডারমান এবং অন্যান্য শহরে কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যনীতিবিষয়ক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রসারও এই দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত। পরিকল্পনার এই অংশটি কার্য্যকরী করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষকে দুইটি প্রবল প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হয়—প্রথমতঃ, এই কার্য্যের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তাহার অপ্রাচুর্য্য আর দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীদের চিরাচরিত অভ্যাস এবং কুসংস্কার। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবন্ধসমূহ বহুলাংশে অপসারিত হইয়াছে। আজ সুদানের প্রত্যেক নগরী এবং মফস্বল শহরে আধুনিক ব্যবস্থা-সম্বলিত হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাস-পাতালের নৌকাগুলি ঔষধপত্র এবং চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্য উপকরণাদি সহ নীল নদ এবং তাহার উপনদীসমূহের বুকের উপর দিয়া বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করে।

সেচ-ব্যবস্থার ফলে গেজিরার যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে আমরা পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

গেজিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা

সরকারী কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় গেজিরা উন্নয়ন-পরি-কল্পনা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। গেজিরা কথাটার মানে দ্বীপ, কিন্তু এই সুদান গেজিরা আসলে একটি উপদ্বীপ। এখানকার প্রায় পাঁচ লক্ষ একর উর্ব্বর জমিতে যৌথ কৃষির

ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই এই যৌথ কৃষির অংশীদার। এই অংশীদারী ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্পাসের মরসুমে ক্ষেত চাষ হইতে সুরু করিয়া চারাগাছ রোপণ—তুলা সংগ্রহ, বীজ ছাড়ানো পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টই চাষীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন। সরকার চাষীর জন্য জমির বন্দোবস্ত করিয়া দেন—ক্ষেতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, চাষীকে বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন সম্বন্ধে যথোচিত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। বাজারে তুলা বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সরকারী তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। চাষীকে প্রয়োজনবোধে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক চাষী প্রায় চল্লিশ একর জমি পায়, তন্মধ্যে অন্ততঃ দশ একর জমিতে তুলা উৎপাদন করিতে সে বাধ্য—বাকী জমিতে সে নিজের খুশিমত জনার, তরিতরকারী এবং অন্যান্য ফসল জন্মাইতে পারে।

এমনিভাবে সরকারী ব্যবস্থাধীনে যৌথ কৃষির দ্বারা যে আয় হয় তন্মধ্যে সরকার লন শতকরা ষাট ভাগ—মূলধন বিনিয়োগ এবং চাষবাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সহায়তা ইত্যাদির দরুন, আর চাষীকে তার শ্রমের বিনিময়ে দেওয়া হইয়া থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

গেজিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক অবস্থায়ই আছে বলা চলে। পরিকল্পিত পাঁচ লক্ষ একরের মধ্যে মাত্র দুই লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং উন্নত ধরণের কৃষির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু সমগ্র সুদানে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৃষি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে যতগুলি যৌথ কৃষি-বিষয়ক, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কিন্তু ইদানীং ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক বিরোধের দরুন গেজিরা-পরিকল্পনা এবং সুদানের অনুরূপ অন্যান্য উন্নয়ন-পরিকল্পনা ব্যাহত হইতেছে। কেননা ১৯২৯-এর নীল নদের জলরাশি সম্পর্কিত চুক্তি (Nile waters agreement) অনুসারে সুদান নীলনদের জলের কেবলমাত্র শতকরা কিঞ্চিদধিক দুই ভাগ ব্যবহারের অধিকারী—বাকী সমুদয় অংশ মিশরের এলাকাভুক্ত। দীর্ঘকাল যাবৎ এই চুক্তির অদল-বদল একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলেও কায়রো-খারটুম-লণ্ডনের রাজনৈতিক বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

সুদান এবং মিশরের প্রধান সমস্যা হইতেছে নীল নদের জলের সমস্যা। অনেকগুলি সেচ-পরিকল্পনাই সুদান-সরকার করিয়াছেন, কিন্তু যে বারিরাশি সুদানকে বিধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহার শতকরা দুই ভাগের বেশী কাজে লাগাইবার অধিকার সুদানবাসীর নাই। সরকারী অনুমতিপত্র ছাড়া কোনো সুদানী চাষী এই মুক্তগতি নদীর অনন্ত বারিরাশি হইতে দুই গ্যালন মাত্র জল পর্য্যন্তও নিজের

সুদানী সিপাহীর স্ত্রী

ক্ষেতে পাম্প করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। 'নাইল ওয়াটার এগ্রিমেণ্ট' এমনিভাবে তাহাদিগকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে মিশরও যে খুব লাভবান হইতেছে তাহা নয়। মিশর নীল জলের বাকী ৯৮ অংশের অল্পমাত্রই ব্যবহার করিতে পারে—শতকরা ষাট ভাগই সরাসরি চলিয়া যায় ভূমধ্যসাগরে। কাজেই নীলনদের বারিরাশির অংশীদারিত্ব সম্বন্ধে একটা যথাযথ সুষ্ঠু চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কি সুদান, কি মিশর কাহারো কল্যাণ হইতে পারে না—এটা উভয়েরই মরণ-বাঁচনের সমস্যা।

বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দরুন সুদানের শুধু অর্থনৈতিক নহে, শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা-সমূহও বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। খারটুম ইউনিভার্সিটি কলেজ সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, ফলে গত দুই মাস যাবৎ ইহা বন্ধ। ওমডারম্যান নগরেরও অনেকগুলি বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খারটুম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। সুদানের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা অব্যাহত থাকিয়া যাহাতে দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে সেই জন্য সুদানকে লইয়া সৃষ্ট ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক বিরোধের আশু অবসান একান্ত আবশ্যক।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইন্দ্র মুরলী বিলের ধারে মাঠে বেড়াইতেছিল। মাথায় তাহার নানা রকমের চিন্তা। সে এত অন্যমনস্ক যে, মুরলী বিলের ওপারে অস্তগামী সূর্য্যের শোভা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইল দূরে সেটগীদের ইটের পাঁজার নীচে একজন লোক বসিয়া আছে। সেটগীদের ইটের পাঁজা দেখিয়া তাহার মনে পড়িল কয়েক বৎসর আগেকার কথা যখন সে ও দেবানন্দ প্রায়ই ঐ পাঁজার আড়ালে মুরলী বিলের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া নানা রকম আলোচনা করিত, কবিতা আবৃত্তি করিত, লুকাইয়া আনন্দ-মঠ প্রভৃতি বই পড়িত। তাহাদের সেই প্রিয় জায়গাটি কে অধিকার করিল ভাবিয়া ইন্দ্রের কৌতূহল হইল। সে ইটের পাঁজার দিকে অগ্রসর হইল।

খানিকটা দূর হইতে সে বিস্মিত হইয়া দেখিল স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার যতীনবাবু একখানি ইটের উপর বসিয়া এক মনে কি যেন পড়িতেছেন। সে কাছে যাইতে যতীন-বাবু তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা পকেটে রাখিয়া তিনি বলিলেন—তুমি একা একা এত দূর বেড়াতে এসেছ? তোমার বাবা কেমন আছেন?

ইন্দ্র বলিল—বাবা একটু ভাল আছেন। আপনি মাঠের মধ্যে বসে কি পড়ছিলেন মাষ্টার মশাই?

যতীন বাবু তাঁহার ইষ্টকাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—একখানা নূতন কাগজ বেরিয়েছে তাই দেখছিলাম। তোমার মোকদ্দমার তারিখ কবে?

ইন্দ্র—তা জানি না। সময়মত খবর আসবে বাবার জন্ত। কি নূতন কাগজ মাষ্টার মশাই।

যতীনবাবু—কাগজখানার নাম যুগান্তর। কিছুদিন থেকে বেরুচ্ছে। কলকাতা থেকে একজন একটি মাত্র সংখ্যা পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্র—কাগজখানার নাম শুনেছি মনে হচ্ছে। দেখি কি রকম কাগজ।

যতীনবাবু পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ইন্দ্রের হাতে দিলেন। কাগজখানা খুলিতেই ইন্দ্রের চোখে পড়িল একটা জায়গায় লাল কালিতে মোটা করিয়া দাগ দেওয়া। তাহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল :

"যে দেশে ৩০ কোটি লোক বিনা আপত্তিতে দাসত্বের শৃঙ্খল পরে রয়েছে সে দেশে বীর জন্মাবে কি করে? যে দেশে মুখের গ্রাস হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেও, জোর করে অন্তঃপুরে ঢুকে মেয়েদের মর্য্যাদাহানি করলেও লোকে অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে, এ দৃশ্য চোখে দেখেও প্রতিকার করতে এগোয় না সে দেশ বীরের পক্ষে বন্ধ্যা। হাজার বার পদাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েও যে জাতির আত্মসম্মানবোধ জাগে না সে দেশ মনুষ্যত্বহীন। বিলাতের এক সভায় একজন ভারতীয় বাগ্মী ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা বল-ছিলেন। একজন সাধারণ শ্রমিক বক্তৃতার শেষে তাঁর কাছে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করল—তোমাদের দেশের লোক সংখ্যা কত? তিনি বললেন—ত্রিশ কোটি। শুনে শ্রমিক বলল—তা হলে তোমরা পচে মর গিয়ে। একজন সাধারণ শ্রমিক পর্য্যন্ত ভেবে বিস্মিত হ'ল কি করে এই বিপুলসংখ্যক লোক এক জোটে দাসত্বের ভার বইতে রাজী হয়েছে। আর আমাদের দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা একে বলছেন ডিভাইন ডিস-পেন্সেসন—বিধাতার বিধান। আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফল হয়েছে এই শ্রেণীর বিধাতার বিধান। ভগবান এই সংস্কৃতির হাত থেকে দেশকে বাঁচান।"

ইন্দ্র যতীনবাবুকে বাররম ও শেলীর ভক্ত রাজনগর স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার বলিয়া জানিত। গোড়ার স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানে তাঁর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। সেবার যতীনদা রাজনগরে আসিবার পর হইতে তাঁহার মধ্যে যেন খানিকটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মে নাই। আজ তাঁহার হাতে যুগান্তর দেখিয়া হঠাৎ যেন সে নূতন করিয়া তাহার পরিচয় লাভ করিল।

ইন্দ্র যতীনবাবুকে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার পাশে বসিল। তার পর দুই জনের মধ্যে নানা রকম আলাপ আরম্ভ হইল। অবশেষে ইন্দ্র তাঁহাকে নিজের সমস্যার কথা বলিল। ধীর ভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—সন্ধ্যা হয়ে এল। চল এবার ওঠা যাক। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা জিনিস পড়তে দিতে চাই। আমার একখানা সংগ্রহ-খাতা আছে। দেশের নানা সমস্যা, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জাতীয়তা-বাদী কাগজে যে সকল মত বেরোয় আমি সেগুলো সংগ্রহ করে রাখি সেই খাতায়। তুমি যেকথা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর খানিকটা কয়েকখানা কাগজের সাজেশন থেকে

পাবে। আগে তুমি সেগুলো পড়ে নাও, তার পর আলোচনা করা যাবে।

ইন্দ্র বলিল—চলুন আপনার বাড়ী গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসি।

যতীনবাবু বলিলেন—আজ রাত হয়ে যাবে। তুমি বাড়ী যাও। কাল সকালে আমি খাতাখানা তোমাকে দিয়ে আসব, তোমার বাবাকেও দেখে আসব।

ইন্দ্রদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যতীনবাবুকে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিতে হইবে। বিদায় লইবার সময় ইন্দ্র বলিল—মাষ্টার মশাই, খাতাখানা আনতে ভুলবেন না।

ইন্দ্র কাছারি-বাড়ীর পাশ দিয়া বৈঠকখানা দালানের দিকে যাইতেছে এমন সময় বৃদ্ধ নায়েব তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিল—ছোটবাবু একটা কথা আছে।

ইন্দ্র সেখানে দাঁড়াইল। নায়েব কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ছোটবাবু, তার এসেছে কাল আপনাকে সদরে যেতে হবে। ও-বাড়ীর রায় বাহাদুর বললেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, আর কথাটা যেন কর্তাবাবুকে না জানানো হয়। যা বলতে হয় তিনি নিজে বলবেন।

ইন্দ্র সব শুনিয়া বলিল—আচ্ছা।

সে বৈঠকখানা-দালানের মধ্য দিয়া পিতার ঘরের কাছে গিয়া চিন্ময়ীর গলা শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। চিন্ময়ী বলিতেছিল—আমার কথা রাখুন বাবা। যদি এ ভাঙা সংসারে আবার শ্রী ফিরিয়ে আনতে চান··· ইন্দ্রের মনে হইল কান্নার চিনির কথা বন্ধ হইয়া গেল। পিতাকে চিনি কি বলিতেছিল তাহা সে অনুমান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চিনি আর কিছু না বলাতে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিল না।

পাশের ঘরের ভিতর দিয়া সে অন্দরে গেল। উঠানে একটা লণ্ঠন হাতে মুকীর মা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—বাহার বাড়ী থেকে পাঁড়েজি কি একজন সদারকে ডাকি, তুমি একটু খাড়াও লক্ষ্মী দিদিমণি। একা ফিরতি মোর ভয় করবি।

ইন্দ্র বুঝিল মুকীর মা লণ্ঠন লইয়া লক্ষ্মীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে যাইতেছে। সে বলিল—মুকীর মা লণ্ঠন আমাকে দাও। বাইরে থেকে কাউকে ডাকতে হবে না, আমি যাচ্ছি। লক্ষ্মীকে ডেকে দাও।

মুকীর মা মাথার কাপড় দিয়া লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রীর ঘরে বসিয়া মৃন্ময়ীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। মুকীর মা তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, ছোটবাবু নিজে যেতেছেন দিদিমণি, আমার যাওয়ার কাম কি?

ইন্দ্র আগে আগে লণ্ঠন হাতে চলিল, পিছনে লক্ষ্মী। দু' জনে নির্ব্বাক ভাবে পথ চলিতে লাগিল, অবশেষে জীবানন্দের বাড়ীর ফটকের সামনে আসিয়া ইন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল লক্ষ্মীকে পথ দিবার জন্য। বলিল—আমি এবার যাই।

লক্ষ্মী এক পা ভিতরে গিয়াছে, ইন্দ্র বলিল—লক্ষ্মী, একটা কথা বলব।

লক্ষ্মী ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র বলিল—কাল আমাকে সদরে যেতে হবে। যদি আমার জেল হয়, আমি ফিরতে না পারি বাবাকে তুমি আগের মত দেখো। চিনুর ওপর বেশী ভরসা করি নে, তারপর হঠাৎ হয়ত তার শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসে পড়বে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি না দেখলে ফিরে এসে হয়ত বাবাকে আর দেখতে পাব না। দেখবে তুমি?

লক্ষ্মী মাথা নোয়াইল। ইন্দ্র ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, লক্ষ্মী আগাইয়া আসিয়া হেঁট হইল প্রণাম করিবার জন্য। ইন্দ্রের পায়ের উপর সে মাথা রাখিল, মাথা আর উঠে না। ইন্দ্র লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া লক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য ডান হাত বাড়াইল। মৃদু, কোমল স্বরে বলিল—লক্ষ্মী ওঠ।

ইন্দ্রের নিজের চোখ কেমন যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইল। লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রের প্রসারিত হাত তাহার মাথায় না লাগিয়া চিবুক স্পর্শ করিল।

ত্রিনয়নী দোতলার জানালা দিয়া আলো দেখিতে পাইয়া বলিলেন—কে?

ইন্দ্র বলিল—কাকীমা, লক্ষ্মীকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

ত্রিনয়নী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ওপরে এসো বাবা, একটু বসে যাও।

ইন্দ্র—আজ যাই কাকীমা, বাবার ওষুধ দেবার সময় হ'ল, দেরী হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া সে বলিল—তুমি ভেতরে যাও লক্ষ্মী, আমি যাই।

ইন্দ্র চলিয়া গেল।

পরের দিন ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ সদরে রওনা হইয়া গেলেন। তার পরের দিন বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে স্থির হওয়ার পরে বরিশালের জেলা-কর্তৃপক্ষ বরিশাল "ইন এ ষ্টেট অব সিডিসন" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। নবাব সলিমুল্লাহের কাছারি-বাড়ী রেগুলেশন লাঠিধারী রিজার্ভ পুলিস ও বন্দুকধারী কনেষ্টবলে ভরিয়া গেল। শহরে বন্দে মাতরম্ বলা আগেই বন্ধ হইয়াছিল—সভা, সমিতি, শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ হইল।

কনফারেন্সের দিন সকাল আটটায় কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিদের লইয়া ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল। প্রতিনিধিরা সমবেত কণ্ঠে

চিৎকার করিলেন—বন্দে মাতরম্! ঘাটে বরিশালের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য। প্রত্যুত্তরে ঘাট হইতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠিল না। রুলারী সারকুলারে বরিশালে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ। এন্টি-সারকুলার সোসাইটির সভ্যেরা ঘাটে নামিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগিল, সরকারী নিষেধ অমান্য করিয়া সমস্ত রাস্তা তাহারা ধ্বনি দিতে দিতে চলিল।

রাজা বাহাদুরের হাভেলী হইতে প্রতিনিধিরা সভামণ্ডপে যাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। আগে চলিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতারা, তাঁহাদের পশ্চাতে এন্টি-সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ। সহসা পুলিস-সাহেব ক্যাম্প ও লাঠিধারী কনেষ্টবলরা আসিয়া সভ্যদের ঘিরিয়া ফেলিল। ক্যাম্প সভ্যদের হুকুম করিল—ব্যাজ খুলিয়া ফেল। তাহারা অস্বীকার করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ আরম্ভ হইল। রেগুলেশন লাঠিধারী পুলিস চারদিক হইতে সভ্যদের মাথায়, পিঠে, বাহুতে আঘাত করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহারা ধ্বনি দিতে লাগিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্! অনেকের মাথা কাটিয়া রক্তে মুখ, জামা, কাপড় লাল হইল, কেহ কেহ মাটিতে পড়িয়া গেল তবু বন্দে মাতরম্ ধ্বনির বিরাম নাই। বালক চিত্তরঞ্জন চিৎকার করিতেছিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্! তিন জন কনেষ্টবল তাহাকে মারিতে মারিতে এক ডোবার মধ্যে ফেলিয়া দিল। ডোবার জলে বালক যখন নিমজ্জমান তখনও তাহাদের লাঠি চলিতে লাগিল অবিরাম। অবশেষে একজন হিন্দু কনেষ্টবলের লাঠি থামিয়া গেল। ছেলেটা ডুবিয়া মরিতেছে দেখিয়া সে তাহাকে জল হইতে উঠাইল। বালক তখন অচৈতন্য।

ইতিমধ্যে পুলিস সাহেব ক্যাম্প সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তারের পরেই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করা হইল। সরাসরি বিচারে তাঁহার জরিমানা হইল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি পুলিসকে বলিলেন—'ওঁদের মারছ কেন? আমাকে মার'। একজন কনেষ্টবল বলিল—এই ব্যাটাদের মারবার হুকুম নাই।

লাঞ্ছিত, প্রহারে জর্জ্জরিত প্রতিনিধিরা অবশেষে সভামণ্ডপে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের সকলের মনে এই লাঞ্ছনার আগুন জ্বলিতেছিল। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন পূর্ব্ববঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হইয়া অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এন্টি-সারকুলার সোসাইটি ও ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের সভ্যেরা সভাপতির মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন—লাল পাগড়ি ও কাল কোর্ত্তা জুজুর ভয় দেখাও কারে? সভার উত্তেজনা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, গান বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

সভাপতি এ. রসুলের অভিভাষণ শেষ হইলে কয়েকজন ভদ্রলোক সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি বালক ও একটি যুবককে ধরাধরি করিয়া সভামণ্ডপে আনিলেন, তাহাদের সঙ্গে আসিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বালকটি তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জন ও যুবকটি মৈমনসিংহ সুহৃদ সমিতির ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলি। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা শ্রোতাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা নিজের চোখে দেখুন পুলিস এদের কি রকম নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করেছে। মারের চোটে আমার ছেলের প্রবল জ্বর এসেছে, জ্বরের তাড়সে সে কাঁপছে। আমার ছেলে যদি মারা যায় তা হলে আমি গর্ব্ববোধ করব।"

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বাগেরহাটের এক উকিলের চিঠি সভায় পড়া হইল। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী কয়েকটি টাকা ও সোনার বালা পাঠাইয়াছেন পুলিস যে জায়গায় ছেলেদের রক্তপাত করিয়াছে সেখানে একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য। চিঠিখানি পড়া হইলে সভায় প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চট্টগ্রামের এক জমিদার সভাপতির টেবিলের উপর পাঁচ শত টাকার এক থলিয়া রাখিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। মৈমনসিংহের বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী এক মহিলা এক লক্ষ টাকা এবং আরও কয়েকজন মিলিত ভাবে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিবেন জানাইলেন।

এই সময়ে প্রকাণ্ড একটি পুলিস বাহিনী লইয়া পুলিস সাহেব ক্যাম্প সভামণ্ডপের প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়া জানাইল, সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আদেশ হইয়াছে, সে আরও জানাইল প্রয়োজন হইলে গুলি চালাইবে। এই কথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত অনেকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, পুলিস গুলী চালাইয়া তাঁহাদের হত্যা করুক, তাঁহারা নড়িবেন না। সভায় পাঁচ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নেতারা মহিলাদের দেখাইয়া বলিলেন পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিলে বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হইবে, মহিলারাও বাদ যাইবেন না। প্রতিনিধিরা তখন শান্ত ভাবে সভামণ্ডপ ত্যাগ করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে একটি গৃহে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় লোকেরা বিরাট এক সভা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বরিশাল কন্ফারেন্সের প্রতিনিধিদের উপর পুলিসের বর্ব্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ দেশময় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। গোলদীঘিতে দুইটি সভায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুরেশ সমাজপতি, আশুতোষ চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তীব্র ভাষায় পুলিস ও পূর্ব্ববঙ্গ-সরকারের আচরণের নিন্দা করিলেন। "আগুন জ্বলিল, পূর্ব্ববঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান" এই শিরোনামায় সংবাদপত্রে পুলিসী আক্রমণের বিস্তারিত

বিবরণ প্রকাশিত হইল। কোন কোন কাগজ লিখিল—"দেশের উপর দিয়া প্রলয়ঙ্কর ঝড় বহিতেছে, লোকের মনে বেপরোয়া ভাব", "উঠ, জাগো ভাই সব, শব-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার সুযোগ আসিয়াছে।" কেহ কেহ বরিশালের পুলিসী তাণ্ডবের নাম দিল—ফুলার লু বা ইষ্টার হার্ট, কেহ লিখিল পূর্ব্ববঙ্গের নাদির শাহ ফুলার, কেহ লিখিল পূর্ব্ববঙ্গের মহম্মদ তোগলক ফুলার। লাহোর, মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক তার আসিতে লাগিল। দেশের বহু স্থানে সভা করিয়া ফুলারী কুশাসনের তীব্র নিন্দা করা হইল। বেঙ্গলী "দি হিদার ইজ অন ফায়ার" ("The heather is on fire") হেডিং দিয়া লিখিল—বরিশালের ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্ত ভারতবাসী আজ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার লোকের মুখে মুখে ও সংবাদপত্র মারফত দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল কাব্যবিশারদের গান—

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'ল লাঠির ঘায়ে।
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় বন্দেমাতরম্ বলে।
রক্ত বইছে শত ধার, নাই কো শক্তি চলিবার
এরা মার খেয়ে কেউ না তোলে না, সহে অত্যাচার।
আছে দিব্য চক্ষু যার, খোল ভবিষ্যতের দ্বার
সময় হলে পশুবলের দেখবে প্রতিকার।

১১

আপিলের বিচারে ইন্দ্রের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে দুই মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইন্দ্রের এষ্টেটের উকিল জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আদালত হইতে বাড়ীতে ফিরিলেন। জীবানন্দ আপিলের ফল শুনিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া তিনি ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া রাজনগরে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলেন। হরিনারায়ণের কাছে ইন্দ্রকে ফিরাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার একটা গুরুভার দায়িত্বের অবসান হয়।

পরদিন রাজনগরে পৌঁছিয়া ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী ও লক্ষ্মী তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া আছে, হরিনারায়ণ কি বলিতেছেন। আগে চিন্ময়ীর দৃষ্টি পড়িল ইন্দ্রের উপর। সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, বাবা, ছোড়দা খালাস পেয়েছেন।

ইন্দ্র পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিল। হরিনারায়ণ তাঁহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জীবানন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভায়া, তুমি আমাকে নূতন জীবন দিলে। একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া তিনি আবার বলিলেন, কিন্তু তোমার ঋণ আমি বাকী রাখব না, সুদে-আসলে শোধ দেবার চেষ্টা করব।

পিতার কথা শুনিয়া চিন্ময়ী লক্ষ্মীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, চল, আমরা কাকাবাবু ও দাদার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

জীবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, কাকাবাবু, আপনি জল খেয়ে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি লোক পাঠিয়ে কাকীমাকে খবর দিচ্ছি যে দাদাকে নিয়ে আপনি ফিরেছেন।

জীবানন্দ বলিলেন, আমি স্নান না করে কিছু খাব না মা। আমি এখন বাড়ী যাই, ওবেলা এসে তোমার হাতের সরভাজা খাব।

লক্ষ্মীকে লইয়া চিন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ সংক্ষেপে হরিনারায়ণের নিকট ইন্দ্রের মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সমুদয় কথা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, দাদা, এবার জজসাহেবের উপদেশমত কাজ করবার আয়োজন করুন, আর দেরি করবেন না।

হরিনারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমি সেকথা ভেবে মনস্থির করেছি। ওবেলা তোমাকে সব বলব। রাত জেগে এসেছ, এবার বাড়ী গিয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে নাও গে।

লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ বাড়ী ফিরিলেন। পথে লক্ষ্মী বলিল, আপনার নামে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে কাল। মার কাছে রয়েছে, এখনও খোলা হয় নি।

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া জীবানন্দ একটু ব্যস্ত হইলেন। বলিলেন, তুমি ত ইংরেজী কিছু কিছু বুঝতে পার, খুলে দেখ নি কেন?

লক্ষ্মী বলিল, মা বললেন, তুই কি বুঝতে কি বুঝবি, এখন থাক, তোর বাবা এসে খুলবেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া জীবানন্দ স্নিগ্ধমনীর কাছে মোকদ্দমার ফিরিস্তি দিলেন। বলিলেন, আমার কাঁধ থেকে মস্ত বড় এক বোঝা নেমে গেল। কত উপকার ওদের কাছ থেকে নিয়েছি, এবার সামান্য কিছু ঋণ শোধ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। সে কথা যাক। লক্ষ্মী বললে, কাল একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। খুলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে পারতে।

স্নিগ্ধমনী বলিলেন, আজ তুমি না ফিরলে তাই করতাম। টেলিগ্রামখানা হাতে করে কেন জানিনে আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। বরিশাল থেকে এসেছে। কম্পাউণ্ডারটা সেজন্ত কাউকে দিয়ে খোলাই নি।

স্নিগ্ধমনী দোতলার নিজের ঘর হইতে টেলিগ্রামখানা আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। জীবানন্দ খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের চেহারার পরিবর্তন দেখিয়া স্নিগ্ধমনী উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, কি খবর আছে ওতে? কে পাঠিয়েছে?

জীবানন্দ ম্লান হাসিয়া বলিলেন, এখানে বসো, বলছি।

এরকমটা যে হবে আমার বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু বুঝলেই বা কি করতে পারতাম ?

হিমবনী অস্থির হইয়া বলিলেন, কি খবর আছে ওতে আগে বল না।

জীবানন্দ—খবর খুবই চমৎকার। তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে।

হিমবনী মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে ? কেন ? কি অপরাধ করেছে সে ?

জীবানন্দ হাসিলেন। বলিলেন, ইন্দ্রই বা এমন কি অপরাধ করেছিল ? ইন্‌স্পেক্টর তার পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে লিখেছে পত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছে। টেলিগ্রাম থেকে শুধু এই সংবাদটুকু জানা গেল যে, দেবু বরিশাল কন্‌ফারেন্স সম্পর্কে গেপ্তার হয়েছে। তোমরা বরিশাল কন্‌ফারেন্স সম্পর্কে কোন খবর পাও নি ?

হিমবনী বলিলেন, লোকে বলাবলি করছিল কাগজে নাকি খবর বেরিয়েছে পুলিস জোর করে কন্‌ফারেন্স ভেঙে দিয়েছে, লোককে মারধোর করেছে, সুরেন ব'ন্‌ডুয্যেকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিস যখন মারধোর করছিল ছোটলাট ফুলারের ইষ্টলক্ষ ব্রহ্মকুণ্ড তখন নাকি মাঝ নদীতে দাঁড়িয়েছিল। লোকে ফুলারের মুণ্ডপাত করছে।

জীবানন্দ—মুণ্ডপাত হবে এবার আমার চাকুরির। সে যা হোক, ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। এমার্সন ও ক্যাম্পের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি পালিয়েছিলাম। ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি নি। একবার মনে হয়েছিল ওকে কলকাতা পাঠাই। তাও বলি, অবস্থা এখন সর্ব্বত্র সমান। চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ক্যাম্প যখন একবার ওকে ধরেছে কিছুদিন জেল না খাটিয়ে ছাড়বে সে সম্ভাবনা নেই।

স্বামীর কথা শুনিয়া হিমবনী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, দেবুকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে না ? তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল।

জীবানন্দ বলিলেন, দেবুর বাপ পুলিসের চাকুরে না হলে চেষ্টা করা চলত। তুমি কি ভেবেছ দেবুর অপরাধের শাস্তি শুধু তার ওপর দিয়ে যাবে ? সে শাস্তির ভাগ আমাকে নিতে হবে না ? মন খারাপ করো না। ওঠ, আমার স্নানের যোগাড় করে দাও।

হিমবনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আমি মিশ্রী ভিজিয়ে স্নানের যোগাড় করে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

মায়ের কাছে লক্ষ্মী তাহার দাদার খবর শুনিল। ইন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাহার মুখে কেমন একটু মিষ্ট হাসির আমেজ লাগিয়াছিল। খবর শুনিয়া সে হাসি অন্তর্হিত হইল।

সন্ধ্যার আগে জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে গিয়া বসিলেন। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। হরিনারায়ণ অনেক দিন পরে বেশ ভাল বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জীবানন্দ বলিলেন, দাদা, আপনাকে আজ অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। আমার আশা হচ্ছে এ যাত্রাটা সামলে উঠবেন।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, আজ মনটা ভাল আছে তাই বাইরে থেকে দেখে তোমার ঐ রকম মনে হচ্ছে। একটু হাঁটবার চেষ্টা করলে নিজেই বুঝতে পারি কতখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি।

একটু থামিয়া বলিলেন, এ সব কথা যাক। একটা কাজের কথা বলছি শোন।

জীবানন্দ—কি কাজের কথা বলুন।

হরিনারায়ণ—ইন্দ্রের বিয়ের কথা স্থির করেছি একরকম। এখন তোমার মত পেলে কথাটা পাকা হয়ে যায়।

জীবানন্দ একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—দু'দিনের মধ্যে স্থির হয়ে গেল ? মেয়ে কোথাকার ?

হরিনারায়ণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, দু'দিনের কথা কি বলছ ? এক দণ্ডের মধ্যে স্থির হয়েছে। তবে জানো কি মেয়ের বাপ এখনও এ বিষয়ে কিছু জানেন না।

জীবানন্দের বিস্ময় বাড়িল। তিনি বলিলেন—আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে, দাদা।

হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর জীবানন্দের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে লক্ষ্মী মাকে আমি নিতে চাই। বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে মত জানিও।

জীবানন্দ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখে মুখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ। তিনি বলিলেন—দাদা, লক্ষ্মী অনেক তপস্যা করে এসেছিল, তাই আপনার ঘরে তার ডাক পড়েছে।

হরিনারায়ণ মৃদুস্বরে বলিলেন—তোমার একথা ঠিক নয় জীব। লক্ষ্মী আমার সংসারের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তার কথা আমি ভুলেই ছিলাম। নিজের মন স্থির করবার পরে বুঝিতে পারছি সে আমার অন্তরে কতখানি স্থান অধিকার করে রেখেছে।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে কিছু জানাবার আগে আমাদের দু'জনের মধ্যে কথা স্থির হয়ে গিয়েছে। অবশ্য চিনু মধ্যস্থ ছিল। ঘটকালির পাওনা তার প্রাপ্য। বৌমাকে জানিয়ে রেখো।

জীবানন্দ বলিলেন—আমি মনে একটা ভার নিয়ে এসেছিলাম। এখন সে ভার হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

হরিনারায়ণ বলিলেন—কিসের ভার বল ত।

জীবানন্দ টেলিগ্রামের কথা জানাইলেন। শুনিয়া হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—ঠিক হয়েছে। দেবু ও ইন্দ্র দুই বন্ধু। ইন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছিল দেবু কি করে বাইরে থাকবে? এ নিয়ে বেশী মন খারাপ করো না। আমার পরামর্শ শোন। বাড়ী যাও। বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ের দিন স্থির কর। বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর তুমি বরিশাল গিয়ে দেবুকে ছাড়ানো যায় কি না চেষ্টা করে দেখ। বিয়েটা হয়ে গেলে আমরা দু'জনে একটা বড় দায় থেকে মুক্ত হই।

জীবানন্দ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। আমি বাড়ী যাই।

তিন দিন পরে হরিনারায়ণের গৃহে একজন অপ্রত্যাশিত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সতীন।

সতীনের বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। তাহাকে পাইয়া ইন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সতীনকে বলিল—সতীনদা, কিছুদিন আগে সারাক্ষণ কেবল আপনার কথা ভাবছিলাম। ঠিকানা জানা ছিল না নইলে চিঠি লিখতাম।

সতীনের আসিবার খবর পাইয়া জীবানন্দ আসিলেন, এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার যতীনবাবুও হাজির হইলেন। বরিশালের খবর সে কিছু জানে কি না জীবানন্দ সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

সতীন বলিল—কনফারেন্স ভেঙে যাবার পরদিন আমি বরিশালে গিয়েছিলেম। খবর সংগ্রহ করবার জন্য স্বদেশ-বান্ধব সমিতিতে গিয়ে শুনলাম পুলিস কনফারেন্সের প্রথম দিন দেবু, তার বন্ধু মহেন্দ্র বলে একটি ছেলে এবং আরও কয়েকটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিস তাদের স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ কেড়ে নেয় ও তাদের ধরে নিয়ে যায়, কিছু মারধর করেছিল। একটা নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল বরিশালে থাকতে থাকতে। আমরা কথা বলছি এমন সময় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সেখানে এল। শুনলাম ছেলেটির নাম অতুল, সে দেবুর বন্ধু। আমার পরিচয় পেয়ে অতুল বললে, এটি আমার মামাতো বোন, নাম সুরমা। কনফারেন্সের দুই দিনের অধিবেশনেই ও যোগ দিয়েছিল। ওদের বাড়ী ভুকৈলাসের রাজবাড়ী থেকে প্যাণ্ডেলে যাবার রাস্তার ওপরে। নিজের চোখে চিত্তরঞ্জন ও ব্রজেনকে অসহায় ভাবে পুলিশের মার খেতে দেখেছে। বললে ব্রজেনের মাথায় লাঠি মারবার সময় সে চেঁচিয়ে গান ধরল—আমার দেহ দেহে কি মা ভুলাবে, আমি কি মায়ের সেই ছেলে—চিত্তরঞ্জনকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে মারছে, মুখ থুবড়ে সে পড়ে গেল, কাদায় ও রক্তে সারা গা, মুখ ভেসে যাচ্ছে তবুও থেকে থেকে সে চিৎকার করছে—বন্দে মাতরম্! এই দৃশ্য দেখে সুরমা সারাদিন না খেয়ে কেঁদেছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীন আবার সুরু করিল—সুরমার মুখে শুনলাম, সভায় চিত্তরঞ্জনের বাবা যখন সারা গায়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, ছেলে মরে গেলেও তিনি কাঁদবেন না উপস্থিত মেয়েরা তখন মুখ নামিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান, তুমি কি নেই? এতটুকু ছেলের ওপর এই অত্যাচার তুমি কি চোখে দেখছ না?

অতুলের কথা শুনে আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে কেমন একটা হতাশার ছাপ। অতুল বললে, আমার বাবা মৃত্যু-শয্যায়, ডাক্তার দেখাবার জন্য তাঁকে নিয়ে শহরে এসেছি। ডাক্তারেরা বলেন, যে-কোন সময়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। তাঁকে ফেলে আমি কন্‌ফারেন্সে আসতে পারি নি। সুরমা গিয়ে ধরল, চল তোমার স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করে আসি। ওর মুখ চোখের ভাব দেখে বাবার কাছে থেকে উঠে আসতে হ'ল।

সুরমার দিকে ফিরে অতুল বললে, কি রে, কিছু বলবি? সুরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমার কিছু বলবার আছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বুঝলাম, সুরমা কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না। তারপর হঠাৎ সে জোরে জোরে বললে, চোখের ওপর এই অত্যাচার দেখেও কি আপনারা সবাই চুপ করে থাকবেন? এত লোক, এত বড় বড় নেতা, সবাই কি পড়ে পড়ে মার খাবার জন্য এসেছিলেন? এরই জন্যে কি হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল সভায়। কত পুলিস কত ওর্ধা ছিল এমার্সনের তাঁবে?

এতটুকু মেয়ের মুখে এই কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। এমন কথা সে ভাবতে পারল কি করে? ভাবতে শিখল কার কাছে?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীন বলিল, এই মেয়েটির কথা কয়েক দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল। স্কুলে পড়বার সময় একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলেম, A stormy petral। কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছিল আমি যেন ষ্টর্মি পেট্রেলের পাখার ঝাপটানি শুনছি মাথার ওপর।

সকলে চুপ করিয়া সতীনের কথা শুনিতেছিল। যতীনবাবু বলিলেন, সুরমা যা বলেছিল সেই ধরণের চিন্তা অন্য লোকের মনেও জেগেছে। আমি কয়েকখানা কাগজ দেখেছি। সন্ধ্যা লিখেছে, "আমাদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে আজ গরু ও ভেড়ার পালের মত চুপ করে মার খাওয়া ভাল না আত্মরক্ষার জন্য লাঠির বদলে লাঠি চালানো ভাল।" অন্য একখানা দেখলাম লিখেছে, "মা রক্ত চান। রক্ত বিনা মা

সন্তোষলাভ করেন না। যে নির্লজ্জের দল নির্ব্বিবাদে মার খায়, প্রহৃত হইয়া যাহারা করজোড়ে প্রহারকারীর কাছে সুবিচার ভিক্ষা করে না তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না।" একখানা কাগজ আবার লিখেছে, "বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতি হইলে মি: এমার্সনের ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে দেখিতে পাইতাম। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে এবং নিরীহ বালকদের রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে ইংরেজের রক্তপাত করিয়া। এই রক্তপাতের পাপের দায়িত্ব আমাদের অত্যাচারীদের।"

জীবানন্দ কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়াছিল। সজোরে তিনি মন হইতে দুশ্চিন্তা বাড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, লক্ষণ ভাল নয়—সতীন, কি বলো? ইণ্ডিয়ান মিররের মত ঠাণ্ডা মেজাজের কাগজ পর্য্যন্ত এই মর্ম্মে লিখেছে দেখলাম—ক্ষমতামদমত্ত সরকারের পক্ষে জনসভার দমননীতি চালানো খুবই সহজ, কিন্তু তার ফল কি?- ফল হচ্ছে গুপ্ত সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পঞ্জাবেও নাকি বরিশালের ব্যাপার নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কালকার হিতবাদীতে দেখলাম খুব গরম গরম কথা লিখেছে, আর ইণ্ডিয়ান মিরর যা বলেছে সেই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

হরিনারায়ণের ঘরের চৌকাঠের বাহিরে একটি বালক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। সকলে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে ইন্দ্রের চোখ পড়িল। ইন্দ্রকে চাহিতে দেখিয়া বালক হাত নাড়িয়া তাহাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ইন্দ্র বাহিরে যাইতে সে বলিল, ইন্দ্রদাদা, মা ডাকছেন সন্ন্যাসী-বাবুকে।

সে সতীনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল। তাহার মুখে "সন্ন্যাসীবাবু" কথা শুনিয়া ইন্দ্রের মুখে হাসি দেখা দিল। বালকটি দেবানন্দের ছয় বছরের ভ্রাতা উমানন্দ, সকলে আনন্দ বলিয়া ডাকে। ইন্দ্র ঘরের মধ্যে ফিরিয়া সতীনকে বলিল, দাদা, ও-বাড়ীতে আপনার ডাক পড়েছে।

সতীন উঠিল। মাষ্টার যতীনবাবুও উঠিলেন। ইন্দ্র আনন্দকে বলিল, তুমি বাড়ী গিয়ে বল উনি যাচ্ছেন। সে চলিয়া গেল।

তিন জন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। যতীনবাবু পকেট হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া ইন্দ্রকে দিয়া বলিলেন, এই খাতার কথা তোমাকে বলেছিলাম। কয়েকখানা কাগজ থেকে সকলন আছে এতে। এগুলোতে জাতীয় আন্দোলনের এক দিককার ত্রুটি নির্দ্দেশ করা হয়েছে। পড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিও।

যতীনবাবু তখনকার মত বিদায় চাহিলেন। সতীন বলিল, আমি আজ রাত্রে চলে যাব। একটা কথা আপনাকে বলছি। আপনার ঢাকায় যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। বরিশাল, ফরিদপুর, মাদারীপুরে দল গড়ে উঠছে। জিতুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। এর পর কুমিল্লা, মৈমনসিং প্রভৃতি জায়গায় যাবেন। সবকিছুর ভার এখন জিতুদার হাতে, আমি নূতন পথের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ইন্দ্র যতীনবাবুর খাতাখানি খুলিয়াছিল দেখিবার জন্ত কিন্তু তাহার দুই কান একাগ্র হইয়া শুনিতেছিল সতীনের কথাগুলি। মাতার মৃত্যু ও পিতার অসুখের জন্ত তাহার মনের পুরাতন যে সব চিন্তা চাপা পড়িয়াছিল আবার তাহারা মাথা বাড়া দিয়া উঠিল। নিজের মনকে সে প্রশ্ন করিল, আমিও কি সব ছেড়ে দিয়ে, দেশসেবার ব্রত নিয়ে সতীনদার অনুসরণ করতে পারি নে?

জীবানন্দের বাড়ী যাইবার পথে ইন্দ্র নিজের মনের কথা সতীনকে বলিতে লাগিল। সতীন চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিল। ইন্দ্র জানিত না যে, তাহার অনুপস্থিতিতে হরিনারায়ণ সতীনের কাছে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরুদ্দেশ হইবার ফলে তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু, ইন্দ্রের এখনকার মনোভাব, তাঁহার নিজের শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ইন্দ্র অতি বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ছেলে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সক্রিয়ভাবে দেশের জন্ত কিছু করতে পারছে না ভেবে তার মনে একটা অস্থিরতা এসেছে। আমি যে ওর প্রতি এতখানি লক্ষ্য রেখেছি তা সে জানে না। জীবানন্দের মেয়ের সঙ্গে আমি ওর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। ইন্দ্র এতে অমত করবে না মনে হয়। তোমাকে সে খুব ভক্তি করে। আমার বিশেষ অনুরোধ, সকল অবস্থা বিবেচনা করে এমন কোন পথ ওকে দেখিয়ে দাও যে, ওর মনে কোন ক্ষোভ না থাকে, আর আমার কাছে থেকে সরে যাবার কথা না ভাবে।

সতীন হরিনারায়ণকে বলিয়াছিল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইন্দ্রের কথা শেষ হইবার আগে তাহারা জীবানন্দের বাড়ী পৌঁছিল। আনন্দ বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। ইন্দ্র বলিল, সতীনদাকে কাকীমার কাছে নিয়ে যাও, আমি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছি।

সে পকেট হইতে যতীনবাবুর খাতাখানা বাহির করিয়া বাহিরের ঘরে বসিল।

সতীন ভিতরে গিয়া হিমরমণীকে প্রণাম করিয়া বসিল। বলিল, লক্ষ্মীদিদিকে দেখছি না কাকীমা, সে কোথায়?

ত্রিনয়নী—সে পাশের বাড়ীতে গিয়েছে একটু কাজে, এখুনি আসবে।

ত্রিনয়নী প্রথমেই দেবানন্দের খবর জানিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত দিন জেলে থাকিতে হইবে, তাহার হাত পা বা মাথা ভাঙিয়াছে কিনা। দেবানন্দের প্রসঙ্গ তুলিতে গিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। তার পর ইন্দ্রের বিচার ও জরিমানার কথা হইল। শেষে হরিনারায়ণ কর্তৃক উত্থাপিত লক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, ওঁদের ঘরের বৌ হওয়া লক্ষ্মীর বহু জন্মের তপস্যার ফল। অমনি মত ছেলেকে জামাই রূপে পাওয়াও আমার কম ভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও মনের ভয় কেন যেন ঘুচছে না বাবা। দেবু আর ইন্দ্র একসঙ্গে স্বদেশীর কাজে নেমেছিল। ইন্দ্র জেল থেকে ঘুরে এল। দেবুরও জেল হবে জানা কথা। ভয়ের কথা এই যে, অনেক দিন ধরে ইন্দ্র বড় উন্মনা। দেখছি—জেল থেকে ফিরে ওর ঐ ভাব আরও বেড়েছে। লক্ষ্মীর ওপর ছেলেবেলা থেকে ওর টান আছে, লক্ষ্মী ওদের ঘরে যাচ্ছে, আমরা বিয়ের বন্দোবস্ত করছি, কিন্তু ছেলের মুখে হাসি নেই। কর্তার কাছে শুনেছি দেশে নানা রকম সমিতি গড়ে উঠছে। এর পর বাড়ী ঘর ছেড়ে কোন দলে গিয়ে ইন্দ্র যদি নাম লেখায় মেয়েটা আমার ভেসে যাবে। তুমি ওকে একটু ভাল করে বোঝাও বাবা, যাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।…

ওদিকে ইন্দ্র বসিয়া খাতা খুলিয়া পড়িতেছিল। প্রথমে কয়েক লাইন মন্তব্য :—"স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে প্রথমে যে প্রাণের স্পর্শ ছিল তাহা যেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিসের জন্য এমন হইল তাহা চিন্তা করিতে গিয়া কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী কাগজের উক্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই উক্তিগুলি হইতে আন্দোলনের একটা বড় ত্রুটি চোখে পড়িল। এই ত্রুটি কি সংশোধন করা যায় না ?"

এই মন্তব্যের পরে বিভিন্ন কাগজ হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইন্দ্র পড়িতে লাগিল—

১। "আমাদের সাধনার গতি পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে এবার। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণীর যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে কি উপায়ে সেই সংযোগ আবার স্থাপন করা যায় তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আবার আমাদিগকে গ্রামে গ্রামে পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে দেশের অন্তরের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে। একদিন আমরা ভদ্রলোকেরা শৈবাল ও ঘাসে আচ্ছন্ন পুষ্করিণীর ধারে পর্ণকুটীর আশ্রয়ী দেশের অন্তরকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম। আজ পিছনে ফিরিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের তরুণের দল গ্রামে গ্রামে আখড়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তির চর্চা করিতেছে। গ্রামের ইতর সাধারণের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে।

এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য পর্ণকুটীরে গিয়া তাহাদিগকে বক্তৃতা করিতে হইবে না। স্নেহ ও সহৃদয়তার দ্বারা এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি যুবককে পাঁচ-ছয়টি করিয়া নিম্নশ্রেণীর পরিবারের সেবার ভার লইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। বৎসরাধিক কাল এই সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিলে শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীগুলির সংযোগ আবার স্থাপিত হইবে।" (নবশক্তি)

২। বাংলায় আজ সমাজ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের পদদলিত, উপেক্ষিত শ্রেণীরা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাদিগকে পদদলিত করিয়াছি। যে বিদেশী শক্তি অত্যাচারে অত্যাচারে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছে, আজ তাহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছি সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়। আমরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক প্রবল শক্তিশালী বিদেশী বণিক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেখিতে পাইতেছি আমাদের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন নাই। আমাদের যুদ্ধ চালাইবার রসদ নাই, প্রয়োজনীয় শক্তি নাই।" (সঞ্জীবনী)

একবার পড়া শেষ করিয়া ইন্দ্র দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল এগুলির মধ্যে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে। হয়ত তাহার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে উক্তিগুলি হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে নিবিষ্ট মনে পড়িতেছে হঠাৎ লক্ষ্মী ভিতর-বাড়ীতে যাইবার উদ্দেশ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং ইন্দ্রকে দেখিয়া যেন একটু বিব্রতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র যে ঘরে আছে সে জানিত না।

ইন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীকে দেখিল, তাহার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার মুখে বোধ হয় তাহার অজ্ঞাতসারে মৃদু কৌতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—যতীন দা ভেতরে কাকীমার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র।

লক্ষ্মী ভিতরে গিয়া দেখিল যতীন তাহার মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সে কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। যতীন বলিল, তুমি এসেছ দিদি, তোমাদের কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। একটা কথা বলি তোমাকে শুনে রাখ। দেবুর জন্য মন খারাপ করো না তোমরা। তোমরা যে যুগে জন্মেছ সে যুগে বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম ব্যাপার ঘটবে। মনকে শক্ত করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। আমি বড় সুখী হয়েছি দিদি যে ইন্দ্রদের ভাঙা সংসার জোড়া দেবার

অত তোমার ডাক পড়েছে। ইন্দ্রের মত ছেলে হয় না। ওকে আমি দেবুর মতই ভালবাসি। তোমরা দু'জন দু'জনকে পেয়ে সুখী হও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

চিন্ময়ী আঁচলে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, বাবা, একটু বস। একটু কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

লক্ষ্মীকে বলিলেন, দুখানা আসন পেতে জল গড়িয়ে দে লক্ষ্মী। ইন্দ্র বাইরে বসে আছে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

চিন্ময়ী উঠিয়া দুইখানি পাথরের রেকাবীতে নানা রকম মিষ্টি সাজাইয়া আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিলেন। লক্ষ্মী জল গড়াইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, যা ইন্দ্রকে ডেকে আন। ওর মা নেই, নিজে থেকে যত্ন-আত্তি করতে হবে, লজ্জা করবার অবসর নেই রে।

লক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ইন্দ্র ও আনন্দের মধ্যে দিদির বিবাহের নিমন্ত্রণ-রক্ষা-সম্পর্কিত আলাপ হইতেছে। তাহার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের উপদেশ স্মরণ করিয়া লজ্জা দমন করিয়া সে বলিল, মা ডাকছেন ভেতরে।

ইন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া আনন্দকে বলিল, এস আনন্দ, এখন থেকে নিমন্ত্রণ খাওয়া সুরু করা যাক। (ক্রমশঃ)

লোকারাধনা না লোকবঞ্চনা?

দাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময়ে ডায়োজিনিস নামে এক বিবাগী ছিলেন। এই বিবাগীর মন মনুষ্যজাতির উপর কথঞ্চিৎ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে তিক্তবিরক্ত বৈরাগী মনে করিত। তাঁহার সম্বন্ধে এমন তিনটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহা দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইবে।

একদা দিন-দুপুরে লোকে দেখিল ডায়োজিনিস লণ্ঠন হাতে পথ চলিতেছেন। লোকে ত তাঁহাকে পাগল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পাগলামি যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা কেহ ভাবে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই দিন-দুপুরে লণ্ঠন নিয়ে কেন? দিনের বেলা লণ্ঠন নিয়ে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি?" ডায়োজিনিস খুব শান্ত ভাবে কহিলেন, "আমি ইমানদার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ডায়োজিনিস সহজে ইমানদার লোক খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। দিনের আলো যেখানে পৌঁছায় সেখানে যদি ইমানদার লোকের দেখা মিলিত তবে তাঁহাকে লণ্ঠন হাতে লইতে হইত না। অপ্রসিদ্ধ স্থানে ইমানদার লোকের খোঁজ করিবেন বলিয়া নিজ হাতে তিনি লণ্ঠন লইয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা ছিল, কে বলিতে পারে বেচারা ইমানদার লোক কোথায় লুকাইয়া আছে? কোন্ কোণে? কোন্ গুহার অভ্যন্তরে? কোন্ অন্ধকার ঘরে? তাই ত লণ্ঠন লইয়া তিনি বাহির হইয়াছেন।

ইমানদারীর ইস্তাহার

আমাদের প্রধান মন্ত্রী জবাহরলালজীও কংগ্রেসে ইমানদার লোকের খোঁজ সুরু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এবার টিকেট তাহাদেরই দেওয়া হইবে যাহারা ইমানদার।" ফল হইয়াছে এই যে, নিজ নিজ ইমানদারী সপ্রমাণ করার পালা লাগিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের মাথায় একটি চিন্তা, নিজেকে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক ইমানদার প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কেবল ইমানদার হওয়াই যথেষ্ট নয়। আরও দুইটি জিনিষের আবশ্যকতা ছিল। একটি এই যে, লোকে উহাকে ইমানদার বলিয়া জানে, অর্থাৎ সে মান্যগণ্য ইমানদার লোক। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, ইমানদারী সপ্রমাণ করার সময় আসিলে সে যেন নিজকে অযোগ্য প্রমাণিত না করে।

এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে এমন ইমানদার লোক দুনিয়ায় কত জন মিলিবে যাহারা একথা বলিয়া ও প্রতিপন্ন করিয়া বেড়াইবে যে, আমার চেয়ে অধিক ইমানদার লোক আর কেহ নাই। যে নিজেকে নিজেই ইমানদার বলে, লোকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইমানদার সে নিজ ইমানদারীর ঢোল পিটায় না। সে ইমানদার হয়, আর লোকেও তাহাকে ইমানদার বলিয়া মানে। কেহ যদি তাহাকে ইমানদার না-ই বলে তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। যুক্তিতর্ক ও দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে আপন ইমানদারী প্রমাণ করিতে সে চায় না।

অপরকে বেইমান সাব্যস্ত করায় ইমানদারী

কিন্তু এবার ত ইমানদারীকে টিকেটের সর্ত করা হইয়াছে। অতএব টিকেট যাহাদের চাই নিজ নিজ উর্দিতে তাহাদের ইমানদারীর নিদর্শন লাগাইতে হইয়াছে। ইমানদারীর মূল্য তাহাদের কাছে যতটা থাকুক না থাকুক, টিকেটের মূল্য ছিল ততোধিক। তাহারা ছাড়া পৃথিবীতে অপর কোন ইমানদার লোক নাই, ইহা ত সরাসরি বলিবার উপায় ছিল না। আর তাহাদেরই সমান বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন

লোক নিজ নিদর্শন লাগাইয়া সামনে আসিয়া না দাঁড়ায় সে ব্যবস্থা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অন্ত কলা-কৌশলের আশ্রয় তাহাদের লইতে হইল। নিজ নিজ ইমানদারী সপ্রমাণ করা অপেক্ষা অন্তের বেইমানি প্রমাণ করার পরোক্ষ উপায় তাহারা অবলম্বন করিল। নিজের তিল-পরিমাণ গুণকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ ও অপরের তৃণখণ্ডবৎ সামান্ত দোষকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া মুষলাকার করার কলায় পারদর্শিতা লাভে তাহারা লাগিয়া গেল। সজ্জনের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা নিজেদের তিলপ্রমাণ ত্রুটিকে পর্বতপ্রমাণ মনে করেন, আর অন্তের সর্ষপপরিমাণ গুণকে পর্বতাকার করিয়া দেখেন। কিন্তু ইমানদারীর বর্ত্তমান প্রতিযোগিতায় আত্মশ্লাঘা আর পরনিন্দাই শালীনতার ও নৈতিকতার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বের রীতি

স্বামী বিবেকানন্দের একটি আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে তিনি এক সময়ে কোন স্কুলে যাইয়া খড়ি দিয়া বোর্ডে একটি রেখা টানেন ও ছাত্রদের বলেন, দেখ, এই রেখাটি না মুছিয়া, নিশ্চিহ্ন না করিয়া, না কাটিয়া, ছোট করিয়া দেখাও। বালক-দের কাছ হইতে উত্তর আসিল—সাবধানতার সহিত প্রদত্ত উত্তর। বেশ খানিক পরে একটি ছেলে নীরবে আসিয়া ঐ রেখার নীচে উহা অপেক্ষা বড় একটি রেখা টানিয়া দিল। ব্যস্, প্রথম রেখাটি ছোট হইয়া গেল। উমেদারদের প্রতিযোগিতায় যদি এই দৃষ্ট দেখা যাইত তবে জবাহরলালজীর পক্ষে ভারতকে নন্দনকাননে পরিণত করা অসম্ভব হইত না।

কিন্তু হইয়াছে একেবারেই উহার বিপরীত। টিকেটের উমেদারগণ লণ্ঠন লইয়া ইমানদারীর সন্ধানে নহে, বেইমানির খোঁজে লাগিয়া গেল আর দেখিতে পাইল যে, তাহারা ছাড়া দেশের আর সকলেই বেইমান। যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে তাহারাও সকলে আপন আপন সন্ধানী আলো লইয়া অপর সব দলের বিশ্বাসঘাতকতার উপর রশ্মিপাত করিতে আরম্ভ করিল। জনগণের কাছে সকলে আজ একে অন্তের বেইমানি ও দোষোদ্ঘাটনে মশগুল। যে দৃষ্ট তাহারা আমা-দের দেখাইতে চাহে তাহা কি নরক হইতে অভিন্ন ? দুর্যো-ধনকে বলা হইল, 'একজন সজ্জন লোক খুঁজে আন।' এখানে ওখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কোন সজ্জন মিললো ?' দুর্যোধন বলি-লেন, 'থাকলে তো পাব।' ধর্মরাজকে বলিলেন, 'তবে তুমিই খুঁজে আন ?' ধর্মরাজ দুর্যোধন হইতেই সজ্জন খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, 'লোকে খামকা একে দুর্যোধন বলে, এ সুযোধন।' ইহাই সজ্জনের দৃষ্টির মূল কথা। কিন্তু শুনতে পাই রাজনীতিতে উহা অচল। না, ঠিক। অ-রাজনৈতিকতাই আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ হউক।

গণতন্ত্রের বিপদ

না এক দিন বলিলেন, যে মোয়া চাহিবে না সে মোয়া পাইবে। আর কি ? না-চাওয়ার 'মেনিফেষ্টো' বাহির হইতে লাগিল। প্রত্যেকে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, 'দেখ, আমি কিন্তু মোয়া চাচ্ছি না।' ইহার অনুক্ত যে অংশ প্রত্যেকেরই মনে ছিল তাহা এই—'এ কারণেই ত মোয়া আমার প্রাপ্য।' কেহ বা অনুচ্চ স্বরে মনের কথাটা ব্যক্তই করিয়া ফেলিল। কথা হইতেছে গণতন্ত্রের ও সজ্জনতার মিলন কি আদৌ সম্ভব নহে ? তাহা যদি সম্ভব না হয় ত গণতন্ত্রের মঙ্গল নাই।

সর্বোদয়-নিষ্ঠার সাধনা

আমাদের দেশে কতকগুলি মঠাধীশ ও পীঠাধীশ দিনে মশাল জ্বালাইয়া চলে। ইহা পঞ্চাগ্নি সাধন নহে। তাহারা ধুনি জ্বালায় না, মশাল লইয়া চলে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করেন ত খুব সম্ভব তাহারা বলিবে যে, এই সব মশাল সূর্যকে আলো দেওয়ার জন্ত। অঞ্জলিতে জল লইয়া আমরা কি সমুদ্রকে স্নান করাই না ? ছোট্ট একটি বাতি জ্বালাইয়া সূর্যকে দীপ দর্শন করাই না নাকি ? করাইয়া থাকি, তাহাতে আর সংশয় কোথায় ? কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে আরতিতে থাকে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা, আর ইহাতে রহিয়াছে প্রদর্শনের ভাবনা। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা আপন আপন মশাল লইয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু গণদেবতাকে দীপদানের নিমিত্ত নহে, পরন্তু আপন আপন আলোতে চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া তাহাদের ধাঁধাঁ লাগাইবার গরজে। ইহা লোকারাধনা নহে, লোক-বঞ্চনা। লোকসেবার ইহা প্রশস্ত পন্থা নহে। গণতন্ত্রকে যদি লোক-বিপ্লবের বাহনে পরিণত করিতে চাহি ত আমাদের অন্ত সব প্রক্রিয়া খুঁজিতে হইবে। সর্বোদয়ে নিষ্ঠাপরায়ণদের এই সাধনা হওয়া চাই।

শ্রেষ্ঠদের প্রতি নিবেদন

রাষ্ট্রনেতা শ্রীজবাহরলালজী ও বিভিন্ন পক্ষের প্রধান প্রধান নেতাদের পুন: পুন: বলি যে, নির্বাচনের নেশায় আমরা যেন সভ্যতাকে বিদায় না দিই। কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিন যাবৎ কমপক্ষে তিন জন নেতৃপ্রধান একে অন্তের উপর মাথা খারাপ হওয়ার অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার কোন ভাল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া দরকার। ইহা যদি পরিহাস মাত্র হয় ত আপত্তির বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুগামীরাও তাঁহাদের এরূপ রসিকতার অনুকরণ আরম্ভ করিতে পারে। তাহা হইলে ভব্যতার লেশমাত্র থাকিবে না। ক্ষুদে এক নেতা অপরকে বলিবে, "তোমার বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিয়াছে।" উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিবে, "তোমার মগজ পচিয়া গোবর হইয়াছে, দুর্গন্ধে টেকা দায়।" এরূপ ব্যাপারের পর আবার যে তাহারা

পরস্পরের উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি করিবে, ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

গান্ধীজী আমাদের সার্বজনিক বাদ-বিসংবাদকে এক অতি উচ্চ স্তরে উঠাইয়াছিলেন। জনসভাতেও অনুশাসন ও ভব্যতা যত্নপূর্বক রক্ষিত হইত। এখন কোন নেতা যদি অপর কোন নেতার প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ত জনসাধারণের দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতিষ্ঠার হানি ঘটিবে। তাই শ্রেষ্ঠদের কাছে নিবেদন নির্বাচনের জন্যও যেন তাঁহারা নিজ নিজ বাণী কলুষিত না করেন।

প্রভুত্ব-বাসনা

ডায়োজিনিস সম্বন্ধে দ্বিতীয় গল্প এই যে, নিলামের জন্য যখন তাঁহাকে দাসের বাজারে রাখা হয় তখন খরিদ্দারেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি কাজ জান?" তিনি বলেন, "আমি একটি মাত্রই কাজ জানি, আর তাহা হইতেছে মানুষের উপর প্রভুত্ব করা। ইহাই আমার পেশা। যাহার মালিকের প্রয়োজন সে আমাকে কিনিতে পারে।" বিভিন্ন দল হইতে যাহারা নির্বাচনপ্রার্থী, তাঁহারা সাধারণ লোক একথা যেন কেহ মনে না করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি ডায়োজিনিস। প্রভুত্বের বাসনা তাঁহাদের মজ্জাগত, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে।

নোকরিগিরির উমেদার

তবে ডায়োজিনিস ও উহাদের মধ্যে ব্যবধান এইটুকু যে, ডায়োজিনিস শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেন উহাদের রূঢ় অর্থে, ইঁহারা করেন অন্যরূপে। দরবারী ভাষায় কোন শব্দ কখনও উহার ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তদনুসারে কোন সরকারী চাকুরেকেই সরকারী চাকুরে বলা হয় না—তাঁহাদের বলা হয় সাধারণের ভৃত্য। উঁহাদের নাম—পাব্লিক্ সার্ভেণ্টস্। হিন্দীতে নৌকরী, খিদমৎ ও সেবা, এই তিন শব্দের প্রয়োগ তিন অর্থে হইয়া থাকে, কিন্তু এ সবের জন্য ইংরেজীতে একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়—সার্ভিস্। সংস্কৃতে সার্ভিস্ পর্যায়বাচী শব্দ হইতেছে সেবা। অর্থাৎ যত সব সরকারী চাকুরে সকলেই লোক-সেবক। যখন তাঁহারা সরকারী চাকুরির জন্য দরখাস্ত করে তখন তাঁহারা সেবার উমেদার হন। আর তাহাদের মধ্যে কেহ সেবার অধিকার পাইলে, সাধারণতঃ বিনা ঘুষে, বিনা মুখঝামটার কাজ করেন না। আমাদের প্রতিনিধিও আমাদের 'নোকর'। যখন নির্বাচনপ্রার্থী হন তখন তাঁহারা নোকরি-গিরির উমেদার হন। কিন্তু নোকর হওয়ার পরে জন-সাধারণকে ইঁহারা অধিকাংশই নাবালক বা বিধবা স্ত্রীলোকের মত অসহায় মনে করেন। তাই অতি উগ্রভাবে তাঁহারা প্রভুত্ব করিতে থাকেন। আজ তাঁহারা আমাদের সম্মুখে খাড়া হইয়াছেন। তাঁহাদের মাথার উপরে লেবেল আঁটা—যাহাদের সেবক দরকার, তাহারা আমাদের কিনিয়া লউন। কিন্তু এখানে সেবকের অর্থ মালিক। নিরক্ষর জড়ভাবাপন্ন মূঢ় জনগণ জিজ্ঞাসা করে, "ইহা কিরূপ বিপরীত গণতন্ত্র?"

প্রার্থীদের প্রতি

ডায়োজিনিস সম্বন্ধে তৃতীয় জনশ্রুতি এই যে, এক দিন তিনি এমনি বসিয়া আছেন, এমন সময় আলেকজাণ্ডার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ডায়োজিনিস উল্টা প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?" জবাব আসিল, "আমি পৃথিবীজয়ী আলেকজাণ্ডার।" ডায়োজিনিস কহিলেন, "তুমি আলেকজাণ্ডার ত আমি ডায়োজিনিস।" আলেকজাণ্ডার অতিশয় গর্বভরে কহিলেন, "আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি?" ডায়োজিনিস কহিলেন, "সূর্যকে আবৃত করিয়া ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছ, সরিয়া গেলে মহা উপকৃত হইব।" "আলেকজাণ্ডার না হইলে আমি ডায়োজিনিস হইতাম"—এই বলিয়া আলেকজাণ্ডার চলিয়া গেলেন।

ভাল, কোন উমেদারের এ ধরণের কথা কখনও কি মনে হইয়াছে? গঠন-কর্মরত সেবকদের নিকট ইহাই মাত্র অনুরোধ যে, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতা অধিকারী লোকেরা কৃপা করিয়া যেন তাঁহাদের ও সূর্যের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

হুসেন সাগর, হায়দরাবাদ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালো জল আর কালো আকাশ
আকাশে চাঁদ,
তারার দল,
ঘুরে ঘুরে জলে প্রদীপমালা।
সেতুর উপরে আমরা দু'জন,
আমাদের মনে আলোক জ্বালা।

মোর মন আর তোমার মন,
উছলে জল,
কে বাঁধে সেতু?
হাসিছে স্বপন চাঁদতারার।
শোন অশান্ত ঢেউয়ের বাতাসে
ওপারের ঢেউ ডাকে এপার।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

(সত্যমূলক নাটিকা)

গল্পাংশ

আনারকলি (পূর্ব্বে আয়েষা) নাম্নী কাবুলের মুন্সী মহিউদ্দিনের পরমা সুন্দরী কন্যা যুবরাজ সেলিমের চিত্রমাত্র দর্শনে মোহিত হইয়া, গোপন প্রেমে আত্মহারা হয়. এবং পিতামাতার বহু অনুনয় সত্ত্বেও অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। তাহার এই ভাবের বৈলক্ষণ্যের কথা শুনিয়া কাবুলের হিন্দু শাসনকর্ত্তা দেওয়ান মাধব রাও তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার উদ্দেশে দিল্লী পাঠাইবার পরামর্শ ও সাহায্যদান করেন। সেখানে যাইয়া সে যুবরাজের বাঞ্ছিত প্রণয়লাভে সক্ষম হয়, কিন্তু সেই কারণেই আকবর শাহের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ; এবং বীরবলের মন্ত্রণার ফলে বিচারান্তে তাহাকে জীয়ন্তে কবর দিবার ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। লাহোরে এখনও আনারকলির সুন্দর সমাধি দৃষ্ট হয়, তবে এই নাটিকার বাদবাকী ঘটনা অনেকাংশে কল্পনাপ্রসূত।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রিগণ

পুরুষ

আকবর শাহ—	দিল্লীর বাদশা
বীরবল—	ঐ মন্ত্রী
ফৈজী—	ঐ রাজকবি
সেলিম—	ঐ যুবরাজ
কাজী সাহেব—	ঐ বিচারপতি
দেওয়ান মাধব রাও—	কাবুলের শাসনকর্ত্তা
ইলাহী বক্স—	ঐ নগরপাল
মুন্সী মহিউদ্দিন—	ঐ সেরেস্তাদার, আয়েষার পিতা

ওমরাহগণ, আদালতের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও প্রতিহারিগণ।

স্ত্রী

আমিনা—	মহিউদ্দিনের স্ত্রী
আয়েষা—	ঐ কন্যা
মতিজান দর্জ্জিনী—	আয়েষার সখী
রোবেনাম—	কাবুলের কাজীর কন্যা
মেহের-উন্নিসা—	দিল্লীর অন্দরমহল রক্ষী
সাকিনা—	ঐ বেগমবিশেষ

অন্তঃপুরিকাগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মাধব রাওয়ের সভাগৃহে মুন্সী, মহিউদ্দিন ও দেওয়ান মাধব রাও আসীন। উভয়পার্শ্বে দুই চোপদার কেরামত ও নেয়ামত দণ্ডায়মান।)

মাধব। মুন্সীজী, সেই ফারসী বয়েতটা আর একবার বল ত, যাতে আছে যে "বিদ্যুৎ পড়ুক", "বিদ্যুৎ পড়ুক" বলতে বলতে বিদ্যুৎ পড়ল। সেটা মনে আছে ?

মুন্সী। আছে বই কি, হুজুর। সেই অভিলাষে বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক— যদি বিদ্যুৎ পড়ে ধনধান্য জ্বলে যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নয়।

মাধব। আমিও তাই বলতে চাই যে, আমরা যেমন বলাবলি করছিলুম সব বড় চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে, একটা লড়াই নেই, একটু লুঠতরাজ নেই, আমাদের বীরপুরুষেরা তবে বীরত্ব দেখাবে কিসে ? তেমনি ভগবান যেন আমাদের মনের আর্জ্জি শুনেই লাণ্ডিকোটাল থেকে খামকা এক দল ডাকাত পাঠিয়ে দিলেন।

মুন্সী। খোদাবন্দ্ ! তাতে ছেলেদের তাকত দেখাবার সুবিধে হতে পারে বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে একটু মুশকিলের কথা হয়ে পড়ে।

মাধব। কেঁউজী, তোমার ঘরে কিছু মুশকিলের কারণ ঘটেছে নাকি ?

মুন্সী। মুশকিলও হয়েছে, মুশকিল-আসানও হয়েছে। সেই কথাটা বলতেই ত হুজুরের দরবারে আজ সকালে ছুটে এসেছি, আর আমার মেয়েকেও আনতে পাঠিয়েছি।

মাধব। তোমার মেয়ে ? আয়েষা ? কেন তার আবার কি হয়েছে ? তার মত সুন্দরী কাবুল শহরে আর একটি নেই।

মুন্সী। সেই ত হয়েছে বিপদ, হুজুর। কালো কুৎসিত হলে ত কোন ভাবনাই ছিল না। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় তার একটু জানলার ধারেও দাঁড়াবার জো নেই। আবার যদি বোরখা পরে মেয়েদের সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে বেরল ত পড়ল ডাকাতের সুনজরে।

মাধব। (উত্তেজিত) বল কি মুন্সীজী ? তাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে ? রাধামাধব !

মুন্সী। আজ্ঞে, যদি ধরে নিয়ে যেত তা হলে কি আর হুজুরের কাছে মুখ দেখাতে আসতুম ? এই, কেরামত !

কেরামত। জী হুজুর !

মুন্সী। এক বার দেখ ত আয়েষাবিবি অন্দরমহলে এসেছেন কিনা ? বল, মুন্সীসাহেব তাঁকে বাইরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কেরামত। যো হুকুম মুন্সীজী। (প্রস্থান)

মুন্সী। যে বীরপুরুষের কথা এখনি হচ্ছিল, তাদের মধ্যে দু'তিন জন যদি সেদিন প্রাণ হাতে করে আয়েষাদের উদ্ধার না করত, তা হলে এই বুড়ো বয়সে আমার মান-ইজ্জৎ সমস্তই খোয়া যেত, আর আমিও দেশত্যাগী হতুম।

মাধব। (উৎকণ্ঠিত) বল, বল কি হয়েছে মুন্সীজী; আমাকে আর সংশয়ের দোলায় দুলিও না।

(প্রথমে কেরামত, পরে বোরখাপরা আয়েষা,
পরে ইলাহী বক্সের প্রবেশ)

মুন্সী। এই যে হুজুর, যাদের গল্প তাদের কাছেই এবার ভাল করে সব শুনুন।

মাধব। আয়েষাদিদি, তুমি বোরখা খুলে ফেলে ভাল হয়ে বসো। ভয় নেই, তোমাকে লুঠ করে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে কোন ডাকাত ওৎ পেতে বসে নেই!

আয়েষা। (বোরখা খুলিতে খুলিতে) বাবা, তুমি কেন ও-সব কথা হুজুরকে বলে দিলে! আমার বুঝি লজ্জা করে না?

মুন্সী। তোমার লজ্জা করবার বয়স হয়েছে, সেকথা তুমি নিজেই ভুলিয়ে দাও যে মা! তা ছাড়া আমি এখনও হুজুরকে কিছুই বলি নি, তোমাদের নিজের মুখেই সব শুনবেন বলে তিনি বসে আছেন।

আয়েষা। তুমিই তাঁকে গল্পটা বল না বাবা, তুমি ত সবই জান।

মুন্সী। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সাতটা বেজে যেতেই তোমার মা মরিয়মকে পাঠালেন মোতীবিবির ওখানে, আর মজিদকে পাঠালেন ইলাহী বক্সকে ডাকতে। আর আমাকে কোথায় পাঠাতে চান তা যদিও—পষ্ট করে বললেন না, কিন্তু দিনরাত কেবল লেখাপড়া নিয়ে থাকি আর ছেলেমেয়ের কোন খোঁজখবর রাখি নে বলে বকতে বকতে এমন তুলকালাম্ বাধিয়ে দিলেন যে, আমি মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্য আস্তে আস্তে পাগড়ী আর লাঠি নিয়ে রাস্তায় যেমনি বেরিয়ে পড়েছি, অমনি দূর থেকে দেখলুম আমাদের ইলাহী সাহেবের সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসছেন; দেখে প্রাণটা সুদ্ধ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদিও তার ধীর গম্ভীর চাল দেখে কারও হঠাৎ বোঝবার সাধ্য ছিল না যে, সে আমাদের এই নাচুনে আয়েষারাণী!

আয়েষা। আমি কিন্তু একবারও কাঁদি নি বাবা, তুমি বরং মোতীদিদিকে জিজ্ঞেস কর।

মাধব। না দিদি, আফগান মেয়েরা বিপদে পড়লে কখনও কাঁদে না, আর আফগান ছেলেরা ত হাসে। কি ইলাহী বক্স, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনবার জন্য যে আমরা উৎসুক হয়ে বসে আছি।

ইলাহী। হুজুর, বেশি ত কিছু বলবার নেই। আমিনা বিবির অনুরোধে তাঁর মেয়েদের খুঁজতে বেরিয়ে, দেওদার বনের বাইরে আবদুল আর আহমেদকে রেখে আমি ভেতরে ঢুকলুম। ঘুরতে ঘুরতে ফুলের মালা, ভাঙ্গা পেয়ালা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে যখন সন্দেহ হ'ল যে, একটু আগেই সেখানে আয়েষাবিবিরা ও ডাকাতের দলবল এসে চলে গেছে তখন তাড়াতাড়ি আবদুলদের ডেকে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ছুটলুম। একটু পরেই দূরে দুটো আলো দেখতে পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দেখি দুই বেটা ডাকাত আয়েষাবিবিদের সঙ্গে নিয়ে গভীর বনের দিকে চলেছে। বেওকুফরা আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়াল, আর মশাল ফেলে ছোরা উঁচিয়ে আমাদের মারতে এল। আবদুল আর আহমেদ তখন চট্ করে তাদের ডান হাতে এমন জোরসে দুই লাঠির ঘা কসিয়ে দিলে যে, ছোরাগুলি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তার পর আমরা তিন জনে তিন জবর লাথি মেরে তাদের মাটিতে পেড়ে ফেললুম, আর তাদেরই ছোরা তাদের বুকে বসিয়ে মেয়েদের নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, আগে তাদেরই পাগড়ী দিয়ে তাদের গাছের সঙ্গে কসে বেঁধে ফেলেছিলুম; বোধ হয় এখনও তারা সেই অবস্থায় সেখানেই পড়ে রয়েছে।

মাধব। আর বোধ হয় মামদো ভূতের ভয়ে ও-পথ দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। ভালই হ'ল—আমার দেবদারু গাছগুলো তা হলে একটু বাঁচবে!

আয়েষা। (জনান্তিকে বাপকে কিছু বলিল)

মাধব। কি, আয়েষা-দিদি! যা বলবার আছে খুলে বল না, লজ্জা কিসের?

মুন্সী। হুজুর, ও বলছে, যিনি এতক্ষণ গল্প বললেন, তিনি আর সব কথা ঠিকই বলেছেন, কেবল নিজের বীরত্বের কথাটা চেপে গিয়েছেন। ডাকাতরা মাটিতে পড়ে যাবার পরেও অত চট করে গাছের সঙ্গে বাঁধা পড়ে নি; শেষ পর্য্যন্ত লাথি ঘুষি কামড়, কোনটাই বসাতে ছাড়ে নি। শেষে একজন কোথা থেকে এক চাকুছুরি বের করে ইলাহীর হাতের কবজায় বার বার খোঁচা মারায় ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল; তবু ইলাহী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে, তবে রুমাল দিয়ে নিজের হাত বাঁধলে। ঐ যে সেই রক্তমাখা রুমাল এখনও হাতে জড়ানো রয়েছে, দেখুন না।

মাধব। দেখি ইলাহী? তাই ত। আবার রুমালের উপর একটা শুকনো ফুলের মালা কেন? এ-কি ব্যথা কমাবার ওষুধ নাকি? কোথায় পেলে? কে দিলে?

ইলাহী। আজ্ঞে, কেউ দেয় নি, আমি আপনিই বন থেকে কুড়িয়ে এনেছি। কিন্তু ব্যথা ত কমে না।

মাধব। সাবাস ইলাহী, তোমার হিম্মতের কথা শুনে আমার বড় মেজাজ খোশ হ'ল।

ইলাহী। আমি কেবল নিজের কর্ত্তব্য কাজ করেছি হুজুর, তার বেশি কিছু নয়।

মাধব। প্রজার যেমন কর্ত্তব্য আছে, রাজারও তেমনি কর্ত্তব্য আছে। এই, নেয়ামত!

নেয়ামত। জী, হুজুর!

মাধব। খাজাঞ্চীকে বল কোতোয়াল সাহেবকে এক হাজার আসরফী এখনি বকশিশ করতে।

নেয়ামত। যো হুকুম, হুজুর!

ইলাহী। হুজুরের অনুগ্রহ অসীম, কিন্তু (আয়েষার দিকে আড়চোখে চাহিয়া) আমার বকশিশ আগেই মিলে গেছে।

মাধব। নেয়ামতের সঙ্গে যাও, ইলাহী। আর সর্ব্বদা মনে রেখো যে, দেশ তোমার মত সুপুত্রই চায়। কিন্তু শুধু দু জনকে নয়, দলশুদ্ধ ডাকাতকেই দেশছাড়া করা চাই, বুঝলে?

ইলাহী। (সেলাম করে)—আল্লার দোয়ায় তাই হবে হুজুর। (প্রস্থান)

মুন্সী। এবার তুমি অন্দরে যেতে পারো মা। আমি হুজুরের সঙ্গে দুটো কথা বলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য খবর পাঠাব।

মাধব। মুন্সীজী, তোমার মেয়েকে একটা গান শুনিয়ে যেতে বল না। সকলের মুখেই ত শুনতে পাই ওর যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

মুন্সী। হুজুর, আমাদের দেশে মেয়েদের রূপ থাকলেই বা কি, গুণ থাকলেই বা কি? জ্ঞান হতে না হতে তারা হীরে জহরতের মত লোহার সিন্দুকে বন্ধ হয়ে যায়; ফুটতে না ফুটতে তারা পোকা-কাটা ফুলের মত মাটিতে ঝরে পড়ে। আয়েষার গলাটি মিষ্টি, কিন্তু কোনরকম শিক্ষা ত পায় নি। এই আমি নিজে যেটুকু জানি তাই শিখিয়েছি, আর আপনার বাড়ীর নাচগানের মজলিস দেখেশুনে এক আধটু যা শিখতে পেরেছে! তবে আপনি যে ওর গান শুনতে ইচ্ছে করেন, সে আপনার মেহেরবানী।

—কেরামত! হোসেন খাঁর কাছ থেকে এক জোড়া বাঁয়া-তবলা আর ঘুঙুর শীঘ্র এনে দাও ত, আর ঐ দিলরুবাটা এগিয়ে দাও। (কেরামতের তথাকরণ)

সেই যে ফারসী গানটা আমি ভালবাসি, সেটা হুজুরকে শুনিয়ে দাও ত মা!

আয়েষা। (দিলরুবা বাজিয়ে গান)—

> হাল মে রবে রবা।
> তু আপনে কজল করি, দমমে রবসাঁই।
> সুপ্রদম তোর, মাহি খেসরা
> তুদানি, হিসাবে কমো বেসরা।

মাধব। বাঃ বাঃ, বড় সুন্দর। কিন্তু গানটা কিছু গম্ভীর, সুরটিও বড় করুণ। ওর বয়সের উপযুক্ত আর একটু হাল্‌কাভাবের একটা কিছু গাইতে বল না মুন্সী।

মুন্সী। আচ্ছা আয়েষা, তোমার ছেলেবেলায় আয়াজী যে নাচগান করে তোমাকে ভোলাত, সেইটে হুজুরকে দেখিয়ে দাও না?

আয়েষা। সে ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে হুজুর হাসবেন নিশ্চয়। (কেরামতের বাঁয়াতবলা ও ঘুঙুর আনয়ন। মুন্সীর সঙ্গত করণ ও আয়েষার ঘুঙুর পরা)।

মাধব। তাই ত চাই বিবিজী। আমাদের দেখিয়ে দাও যে ডাকাতরা তোমার হাসিটি চুরি করে নিয়ে যায় নি। তা ছাড়া আমারও ভিতরের ছেলেমানুষটি ত এখনও একেবারে মরে নি, দাড়িগোঁফে ঢাকা চাপা আছে মাত্র। তাকেও মাঝে মাঝে খোরাক দিয়ে জীইয়ে রাখা চাই ত?

আয়েষা। (নাচ ও গান)

> কোন এয়সি সখি চতুর না মিলে
> মোয়ে পিকে দুয়ারমে পৌছা দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।
> মেরে মনমেত আয়া কি যোগন বনু,
> আওর মলকে বতুত মহিনে চলুঁ।
> সখি হিন্দী কি নগরীমে কাহে রহু,
> নেহি প্রীতকি চৈন জরা দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।
> সখি সাত সমুন্দর পার ভয়া,
> মেরে জজমেত চলনে ন জোর হাওয়া,
> কোই আতি মহিনে সে ঐসি হাওয়া,
> নব মুলকে আমার কো উড়া দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।

মাধব। (হাততালি দিয়া)—সাবাস্ সাবাস্। এই ছেলেমানুষির ভিতর আস্‌লী মাল লুকনো রয়েছে, তা কিন্তু বলে রাখলুম। পরে দেখে নিও। আমাদের চোখ এই দেখতে দেখতে বুড়ো হতে গেল, কিসে কি হয় তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। নাও, আয়েষাবিবি, আমার গলার এই হারটি তোমাকে বকশিশ করলুম। যার গলায় তুমি মালা দেবে, সে ভাগ্যবান পুরুষ না জানি কোথায় ব'সে দিন গুনছে!

মুন্সী। মা আয়েষা, এবার তুমি বাড়ী যাবার উদ্যোগ কর গে; জানই ত দেরি হলে তোমার আমার কপালে কি আছে!

আয়েষা। তুমি যে চুপ করে থাক বাবা, কাজেই মা যত খুসি বকে যায়!

মুন্সী। তাই ত মাঝে মাঝে হুজুরের কাছে পালিয়ে আসি, নিজের গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে! আর একটু বড় হও মা, তখন বুঝবে সে বাধা না দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। (হাসিতে হাসিতে আয়েষার প্রস্থান)

মাধব। এমন মেয়েকে তুমি কার হাতে তুলে দেবে মনে করছ মুন্সীজী?

মুন্সী। হুজুর, সেই বিষয়েই ত আপনার উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনার মত বন্ধু এই শহরে আমার আর কেউ নেই। আয়েষাকে আমি এত বড় করে ঘরে রেখেছি, পাঁচরকম বই পড়িয়েছি আর গান-বাজনাও কিছু কিছু শিখিয়েছি, এই সব অপরাধে সমাজের মোড়লরা আমার উপর খড়্গহস্ত। তবে কি কুক্ষণে যে মেয়েটা রূপ নিয়ে জন্মেছিল, তাই বুড়োরা যাই বলুক, ছেলেরা ওর জন্যে সব খোয়াতে রাজী।

মাধব। তবে ভাল দেখে একটি পাত্রের সঙ্গে এই বেলা ওর সম্বন্ধ পাকা করে ফেল না? যত দেরি করবে, তত বেশি মুশকিলে পড়বে। আমি ভুক্তভোগী কিনা, তাই জানি। আমার ত মনে হয় ওর উপর ইলাহীর নেকনজর আছে। তোমার কি বোধ হয়?

মুন্সী। আজ্ঞে, আমার বোধ করবার কোন আবশ্যক নেই। বহু দিন যাবৎ প্রমাণ পেয়েছি যে ইলাহী ওর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমার মেয়েকে যে মোটে বাগ মানাতে পারছি নে হুজুর, কি করি বলুন? ওর মা আর আমি ওকে বলে বুঝিয়ে, বকে ধমকে, খোশামোদ করে, হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। এক বাঁকি আছে জোরজবরদস্তি।

মাধব। না না, তাও কি করতে আছে? হয়ত ওর মনে মনে অন্য কাউকে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু বলতে লজ্জা করে।

মুন্সী। আজ্ঞে না, হুজুর, সে খোঁজও নেওয়া হয়েছে। সেরকম কেউ নেই। অথচ আজকাল ওর ঘরের কাজ করতে মনে থাকে না, লেখাপড়ায় ভুল হয়ে যায়। আনমনে জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, সাত বার ডাকলে তবে এক বার সাড়া পাওয়া যায়।

মাধব। এ সব ত বড় ভাল লক্ষণ নয়! এ যে আমাদের শ্রীরাধিকার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। দেশে দেশে মানুষের মন সবই এক, কেবল আমরাই ভুল বুঝে "রাম রহিমকে জুদা" করি। যা হোক, চুপ করে বসে থাকলে ত চলবে না, এর একটা কিছু বিহিত করা ত চাই।

মুন্সী। আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলচ্ছে না হুজুর। জানেন ত মেয়েজাতটাকে চিরকালই আমি একটু ডরাই; ছোটই হোক্ বড়ই হোক্, ওদের বেশি ঘাঁটাতে সাহস করি নে। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, তাই করব। তার উপর আবার এই এক ডাকাতের উপদ্রব হয়ে দিন রাতে স্বস্তি নেই।

মাধব। (একটু ভাবিয়া) এক কাজ করলে হয় না?

মুন্সী। আজ্ঞা করুন হুজুর।

মাধব। ওকে দিনকতক অন্য কোথায়ও পাঠিয়ে দিলে হয় না? হয় ত একটু জায়গা বদলালে মনের এই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে পারে।

মুন্সী। হুজুর আমরা গরীব মানুষ, তবু ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি। ওকে ছেড়ে থাকা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হলেও, ওর ভালোর জন্যে তাও করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই অল্প বয়সে অমন সুন্দরী মেয়েকে একলা দূরদেশে পাঠানো কি বুদ্ধির কাজ হবে? কে ওর সঙ্গে যাবে, কে ওর খবরদারি করবে—শেষে হিত করতে বিপরীত হবে না ত?

মাধব। আমি কি সব দিক না ভেবে-চিন্তে একটা মোৎফরক্কা কথা বলে বসবার লোক, মুন্সীজী? তা হলে আর এত বড় একটা রাজ্যশাসনের ভার আমার হাতে এতদিন থাকৃত না।

মুন্সী। আমাকে মাপ করুন, হুজুর। স্নেহে মানুষকে অন্ধ করে ফেলে।

মাধব। আমি ভাবছিলুম ওকে দিল্লী পাঠালে কেমন হয়? সেখানে এক দিকে যেমন ধুমধাম, জাঁকজমক, আমোদপ্রমোদে ছেলেমানুষের মন ভুলবে; অপর দিকে তেমনি আমি চিঠি দিলে প্রাসাদেও ওকে হেপাজত করবার লোকের অভাব হবে না। কি বল, এতে তোমার মত আছে?

মুন্সী। হুজুর যা বলছেন সবই ওর ভালোর জন্যে, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার একলার মতে ত কাজ হবে না; দেখি ওর মা কি বলেন।

মাধব। যদি তোমাদের দু'জনের মত হয়, আর অবশ্য আয়েষা যেতে চায়, তা হলে খাজনা নিয়ে আমাদের যে ডাক শীঘ্রই দিল্লী রওনা হবে, সেই সঙ্গে ওকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। ইলাহীকে বলব ওর রক্ষক হয়ে সঙ্গে

যেতে ও থাকতে ; আর তোমরাও হয়ত কোন মেয়েকে ওর সঙ্গিনী করে দিতে পারবে।

মুন্সী। হুজুরের দয়ার শেষ নেই। কি ঠিক হয় কালই আপনাকে জানাব। (সেলাম করিয়া প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(মুন্সী মহিউদ্দিনের বাড়ীর অন্দরমহল। আমিনা বিবি সেলাইকার্য্যে রত। দূরে জানালার ধারে আয়েষা বই হস্তে আসীন)।

মুন্সী। (ব্যস্ত হইয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ)—আমিনা! আমিনা! কোথায় তুমি?

আমিনা। এই যে, এইখানেই বসে আছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে সকাল ত হুজুরেই হাজির থাকি, আর যাব কোন্ চুলোয়?

মুন্সী। (বসিয়া পড়িয়া) তোমাকে ত আমি আর কোথায়ও যেতে বলছি নে। কিন্তু আয়েষার এক জায়গায় যাবার কথা হচ্ছে, তাই তোমাকে বলতে এলুম।

আমিনা। আয়েষা? সে আবার কোথায় যাবে? মেয়েমানুষে ত এক বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যায় জানি; তা ও-মেয়ের ত সেরকম কোন গতিক দেখছি নে। আর তার পর তারা যায় যমের বাড়ী। তা আমার সেইটেই বাকি রয়েছে; এখন যেতে পারলেই আমি বাঁচি, তুমিও বাঁচ। (চোখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন)।

(আয়েষা নিজের নাম শুনিয়া কান খাড়া করিল)

মুন্সী। (উঠিয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়া)—আমিনা, তুমি হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ঝগড়া কর কেন? আমি কি কখনও তোমাকে কোন কটু কথা বলেছি যে, তুমি কথায় কথায় মান-অভিমান কান্নাকাটি কর?

আমিনা। সেইটেই ত আমার এত অসহ্য বোধ হয়। তুমি যদি আমার কথার পিঠে কথা বলতে, যদি আমার রাগের উত্তরে রাগ করতে, যদি আমার গলার উপরে গলা চড়াতে, তা হলে ত তবু বুঝতুম যে আমার স্বামী একটা মানুষ, আর আমাকেও সে মানুষ জ্ঞান করে।

মুন্সী। (হাসিয়া) তোমার স্বামী মানুষ নয় ত কি?

আমিনা। (রাগতঃ) জানি নে। দেবতা হতে পারে কিংবা কলের পুতুল কিংবা বইয়ের পোকা। শুধু এইটুকু জানি যে তার বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না।

মুন্সী। (শান্তভাবে) এত দিনে সেও বোধ হয় সেকথা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমিনা, শুধু একদিন আধ ঘণ্টার জন্যে যদি নিজেকে ভুলে পরের কথা,—তাও পর নয়, নিজের মেয়ের কথা শুনতে পার তা হলে—

আমিনা। কথা বলবার লোক পেলে ত শুনব? বাপ থাকেন বই নিয়ে, আর মেয়ে থাকেন নিজের ভাবে ভোর। আমাকে কি কেউ পোঁছে? আমি চুপ করে মুখ বুজে হয় সেলাই করি, নয় রাঁধি, নয় ছাতে একলা পড়ে পড়ে তারা গুনি—আর কি করব? না আছে একটা কাপড়, না আছে একটা গয়না, না আছে পাঁচ জন ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া আসা, না আছে—

মুন্সী। যা নেই তার জন্যে মিছে হা-হুতাশ না করে যা আছে তাই রক্ষা করবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না?

আমিনা। আমার আবার কি ছাই আছে? থাকবার মধ্যে আছে—

মুন্সী। একটা হতভাগা স্বামী, এই ত?

আমিনা। ছিঃ ছিঃ, অমন কথা মুখেও এনো না। আমার স্বামীর মত এমন ভাল লোক এই সারা কাবুলে আর একটি নেই। কেবল যদি—

মুন্সী। তা সে বিষয় তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আর একটা জরুরী বিষয়ে যে তোমার মত জানতে চাই। তোমার একটি মেয়েও আছে।

আমিনা। সে পোড়ারমুখীর জন্যে ভেবে ভেবে আমার ত রাত্রে ঘুমই হয় না। ওদিকে তুমি ত বেশ নিশ্চিন্তমনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও।

মুন্সী। সে দোষ আমার আছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার মেয়ে বাপের শান্তশিষ্ট স্বভাবটি পায় নি। বোধ হয় মাতৃকুলের দিকে—

আমিনা। (রাগতঃ) আর যাই কর, আমার মা-বাপ তুলো না, ভাল হবে না বলছি। এখনও আমার বাপের কবরে হিন্দু-মুসলমানে সিন্নি দেয়, তা জান?

মুন্সী। জানি। কিন্তু এমন অপদার্থ লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে কি তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন বলতে চাও?

আমিনা। ফের আমার স্বামীর নিন্দে করছ? তবে আমি চললুম (উঠিতে উদ্যত)—

মুন্সী। (ধরিয়া বসাইয়া) না না, বসো বসো। আর ও লোকটার নাম করব না, ভয় নেই। তা যে কারণেই হোক, আয়েষার মন যে আজকাল বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়?

আমিনা। তা আর করি নি? তোমাদের মত কেতাবী বুদ্ধি নাই থাক, আমরা মানুষের মন বুঝি। তার উপর আয়েষা ত আমার পেটের মেয়ে।

মুন্সী। তুমি ওকে পেটে ধরেছ বটে, কিন্তু আমি ওকে হাতে গড়েছি। দুধেদাঁত পড়বার পর থেকেই ও আমার পড়ার সঙ্গী, আমার খেলার সাথী, আমার গানের

সাগরেদ। কিন্তু এই মাসখানেক থেকে যে ওর কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে।

আমিনা। এ তো অতি সহজ কথা। মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক। তোমাদের পণ্ডিতী মন কি না, তাই সোজা জিনিসটাকে প্যাঁচালো করে তোল। আমরা মূর্খ মেয়ে-মানুষ হতে পারি, কিন্তু সংসার-জ্ঞানে তোমাদের চেয়ে ঢের পাকা।

মুন্সী। তাই ত তোমাকে না জিজ্ঞেস করে আমি সংসারের কোন কাজেই হাত দিই নে। কিন্তু আয়েষা যে বিয়ের কথা মোটে কানেই তোলে না, তা তুমি বেশ জান।

(আয়েষা ক্রমে অগ্রসর হইল)

আমিনা। মেয়ের মত কেউ কখনো নিয়ে থাকে? আমার বাবা আমার কত মত নিয়েছিলেন? একটি ভাল পাত্র ঠিক করে মোল্লা সাহেবকে ডাক, কল্‌মা পড়ে দিব—ব্যস, চিরজীবনের মত কাজ ফতে। আবার কি?

মুন্সী। তা ত ঠিক। কিন্তু তুমি মেয়েটাকে কাঁদিয়ে জোর করে বিদায় দিতে পারবে?

আমিনা। কেন পারব না? মেয়েমানুষ ত সারা জীবন কাঁদতেই আছে। জন্মাবার সময় কাঁদে, বিয়ের সময় কাঁদে, মরবার সময় কাঁদে। উপায় কি বল?

মুন্সী। হুজুর একটা উপায় করে দিতে চেয়েছেন।

আমিনা। তোমার রাতদিন কেবল হুজুর হুজুর। নিজের ঘটে একটা বুদ্ধি যোগায় না, স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলতেও সাহসে কুলোয় না, শুধু হুজুরের কাছে হাতযোড় হয়ে আছ।

মুন্সী। তুমি ত জান কত সময় কত বিপদ থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সাধে কি তাঁকে মেনে চলি? কিন্তু আগে উপায়টা বলি শোন। হুজুর বলছেন কোন নতুন জায়গায় ঘুরে এলে হয়ত মেয়েটার মনের একটা বদল হতে পারে। ওঁদের লোকলস্কর খাজনা নিয়ে শীঘ্র দিল্লী যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ওকে উপযুক্ত সঙ্গী দিয়ে পাঠাতে পারেন, বললেন—অবশ্য যদি আমাদের মত হয়। কালই তাঁকে এ বিষয় জবাব দেব বলেছি। এখন কি বলতে চাও বল। (মাথায় হাত দিয়া) আমার ত মাথার ঠিক নেই।

আমিনা। কি বললে? দিল্লী? সেই জাহান্নামে ঐ দুধের মেয়েকে একলা পাঠাব? তুমি ঠিকই বলেছ মুন্সীজী, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি হুজুরকে আমার হাজার হাজার সেলাম দিয়ে বলো তাঁর বহুৎ মেহেরবানী, কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে কাছছাড়া করলে পাছে একেবারে হাতছাড়া হয়ে যায় এই আমার ভয়।

মুন্সী। তবে কি এমনি দিনের পর দিন সে কাটা ফুলের মত নেতিয়ে পড়বে, আর আমরা বসে বসে তাই দেখব?

আমিনা। বলছি ত ধরে বেঁধে একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, সব সেরে যাবে।

মুন্সী। তার আগে একটু ঘুরে ফিরে এলে ক্ষতি কি? জেলখানা ত সামনে খোলাই রয়েছে, যাবজ্জীবন কারাবাসে ঢোকবার আগে পৃথিবীটা একটু দেখে শুনে নিক, তার রূপরস ভোগ করে নিক। অন্ততঃ তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যাক না, সে কি বলে।

আমিনা। (উঠিয়া) আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত কখনো দিল্লী যেতে চাইবে না।

মুন্সী। (উঠিয়া) আর আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত—

আয়েষা। (বই ফেলিয়া সামনে ছুটিয়া আসিয়া, দুই জনের দুই হাত ধরিয়া) আমি বলছি আমি মায়েরও মেয়ে, বাবারও মেয়ে, আর আমি দিল্লী যাব নিশ্চয়ই।

মুন্সী ও আমিনা। (একসঙ্গে ফিরিয়া) তবে তুমি সব শুনেছ।

আয়েষা। তোমরা যে চেঁচামেচি করছিলে, আর না শুনে করি কি? এইটুকু ত ঘর।

মুন্সী। (কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া) মা, আমরা তোমার উপযুক্ত ঘর-বর কিছুই দিতে পারলুম না, এই দুঃখ।

আয়েষা। (তাঁহাকে আদর করিয়া) না বাবা, তোমরা আমার জন্য সবই করেছ, আমার কোন অভাব নেই। (থামিয়া) কিন্তু কি জানি আমার আজকাল কি হয়েছে। এই ছোট ঘর, ছোট শহর, ছোট কথার মধ্যে দিনরাত থেকে থেকে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তোমরা দিনকতক আমাকে ছেড়ে দিয়ে দেখ, আমি নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে ফিরে আসব।

মুন্সী। পাখীর ডানা গজালে তাকে বাসা ছেড়ে উড়তে দিতেই হবে, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু তোমার মা যে সেকথা মোটেই বুঝছেন না, কি করি বল।

আয়েষা। (বাপকে ছাড়িয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া) কেন মা, তুমি আমার জন্য এত উতলা হচ্ছ? আমি কি এখনও তোমার সেই কচি খুকিটি, যার বাড়ী ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে তুমি দশ বার ঘরবা'র করতে?

আমিনা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) তুমি আমাদের একলা

ফেলে কোথায় যাবে মা? সে সোনার পিঁজরায় যে একবার ঢুকেছে, সে কখনও প্রাণ নিয়ে বেরোয় নি।

আয়েষা। (হাসিয়া) কেন বেরবে না? এই ত কাবুল থেকে নওরোজের জন্তে সুন্দরী মেয়ে পাঠাতে বলেছিল বলে কাজী সাহেবদের রোশেনারা ক'বছর আগে দিল্লী বেড়িয়ে এল। শুনেছি উৎসব হয়ে গেলে বেগম সাহিবারা তাকে কত জমকালো পেশোয়াজ, ওড়না, গয়না, খেলনা সব দিয়ে দেশে ফিরে পাঠালেন। আর আমি গেলেই তারা আমাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলবে?

আমিনা। ছিঃ আয়েষা, তুমি কি কোন কালেই বড় হবে না?

(মোতীবিবির প্রবেশ)

মোতী। এ কি কথা শুনছি চাচিজী? আয়েষা নাকি কাল দিল্লী যাবে? আমার ত কথাটা একেবারেই বিশ্বাস হ'ল না, তাই ছুটে খবর নিতে এলুম।

আমিনা। ওমা, এর মধ্যেই পাড়ার লোকের কানে কথাটা উঠেছে? ধন্যি বাপু!

মোতী। না, মরিয়ম তার একটা কুর্তা সেলাই করাতে নিয়ে গেল কি না, তাই বললে যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে শুনে এলুম।

আমিনা। তার মত পাড়া-বেড়ানী আর কে আছে বল? এদিকে তাকে দিয়ে ঘরের একটা কাজ পাবার জো নেই। তা তোমার কাছে বলতে কি বাছা, তুমি আয়েষাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভালোবাস, ওর যাবার কথা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক হয় নি।

আয়েষা। হ্যাঁ ভাই মোতীদিদি, ঠিক হয়েছে। বল মা, সব ঠিক হয়ে গেছে, না? আয় মোতী, আমরা কাপড়চোপড় বন্ধ করে ফেলি গে। (প্রস্থানোদ্যত)

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। চাচিজী, আয়েষার নাকি দিল্লী যাওয়া ঠিক হয়েছে?

আমিনা। (গালে হাত দিয়া) মাগো, আমি কোথা যাব! আমরা নিজেই যেকথা জানি নে, সেকথা শহরসুদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে গেল? কাজীসাহেবের বাড়ী কি এখানে? মরিয়ম কি এর ভেতর সেখানেও ঘুরে এল?

রোশেনারা। মরিয়ম কেন যাবে? এই ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের ফতেমা আয়া আমার নতুন চোলিটা খলিফা সাহেবের কাছ থেকে আনতে গিয়েছিল, সেখানে বসে থাকতে থাকতে শুনলে যে মরিয়ম এই কথা বলছে। আমি ত শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম। তাই ভাবলুম যাই একবার ছুটে দেখে আসি গে কি ব্যাপার!

আমিনা। এ কথা ত চিরদিন লুকানো থাকবে না মা, তবে আমরা নিজেরাই এখনও মন স্থির করতে পারি নি। হুজুর এইমাত্র বলে পাঠিয়েছেন বটে, তাই ভাবছি—

আয়েষা। ভাবতে ভাবতে যে এদিকে গোছগাছের সময় বয়ে গেল মা।—আচ্ছা রোশেনারা, তুই ত একবার দিল্লী গিয়েছিলি। সেটা কি মগের মুল্লুক? সেখানে যে যায়, সে নাকি ফেরে না? তবে কি তুই মরে ভূত হয়ে এসেছিস্?

রোশেনারা। সে দেশে একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না বটে, সে কথা সত্যি। কি রূপ, কি রং, কি রোশনাই, কি তামাশা! কেবল মা-বাপের জন্য মাঝে মাঝে যা মনটা কেমন করত, না হলে কি আমি আর ফিরতুম? চল, তোর সঙ্গে আমিও আবার যাই ভাই, যদিও তোকে দেখলে আমার দিকে কেউ আর ফিরেও তাকাবে না! কোন্ নবাবজাদা হয় ত তাঁর হাজার বেগমের উপর আর একটি বাড়াবার জন্য শাহেন শা'র কাছে দিনরাত আরজি পেশ করতে থাকবেন। আর তুইও সে সব বাদশাহী চেহারা দেখে আমাদের জঙ্গলী দেশের মূর্খ রুক্ষ লোকদের ভুলে যাবি।

আয়েষা। যাঃ, তোর অত বাজে বকতে হবে না। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে, চল্।

রোশেনারা। আচ্ছা, দাঁড়া, আমাকে বেগমরা যেসব কিংখাবের পেশোয়াজ দিয়েছিল, তা ত বাক্সে তোলা থেকে থেকে পোকায় কাটছে। তারই দু'একটা ভাল দেখে নিয়ে আসি, তোর সেখানে কাজে লাগবে। আর আমার চেয়ে তোকে মানাবেও ভাল। (প্রস্থান)

মুন্সী। মা, তুমি ত নতুন দেশ, নতুন লোক দেখতে চললে, কিন্তু আমাদের সব যে নিয়ে গেলে, আমরা কি নিয়ে থাকব?

আয়েষা। খুরশেদ্ রইল যে বাবা। আর আমি ত চিরদিনের জন্যে তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি নে—দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে। বরং তোমাদের জন্যে কি নিয়ে আসব, তাই জিজ্ঞেস কর। মা, আমি এমন সব চমৎকার মোগ্লাই খানা আর সাঁচ্চা কলাবতুর কাজ শিখে এসে তোমাকে শেখাব যে, তোমার কাবাবের আর সুনামের খোশ্বয় পাড়াসুদ্ধ ভুর্ভুর্ করবে। আর তোমার জন্যে কি আনব বাবা? মোগ্লাই ছবি না ফারসী পুঁথি?

মুন্সী। তুমি নিজে ভালোয় ভালোয় ফিরে এস মা, আমি আর কিছু চাই নে। আমিও ত বুড়ো হয়েছি, হয়ত আর দেখা নাও হতে পারে। (কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ)

(পেশোয়াজ হাতে করিয়া রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) চাচাজী, আমি বাবাকে বলেছি, তিনি বললেন তোমার যদি মত হয়, তবে আমি আয়েষার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারি। কি বল, তোমার এতে কোন আপত্তি নেই ত?

মুন্সী। সে কি কথা মা, আমরা ত ওর সঙ্গে কাকে দেব তাই ভাবছিলুম; তুমি যেতে রাজী আছ শুনে মন থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। আর তুমি আগে সেখানে গেছ, সব জান, এর চেয়ে ভাল সঙ্গী আমরা কোথায় পাব?

আয়েষা। তবে আর কি, সব গোল মিটে গেল। এখন আয়, আমরা সবাই মিলে আমোদ করে একটা গান করি, তা হলে মনের এই অন্ধকার ভাবটা কেটে যাবে। বাবা, তুমি বাজাও, মা তুমি শোন।

(তিন সখীর গান)

চলো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠরিয়া,
যহদুর যানে হোবেগা।
আজ ভি যানা, কাল ভি যানা,
আখের যানা হোবেগা।
রুপিয়া দৌলত যিৎনা হ্যায়—
সভি গিরে রহেগা।
মেহ্‌রারু লড়কা যো কোই হ্যায়
কোই নেই সাথ্‌মে যাবেগা।
যিৎনা দের ছুনিয়ামে রহেনা
উৎনাই মোহব্বৎ হোবেগা
করো মোহব্বৎ উসীকোনে
যো নে সাথ্‌মে যাবেগা।

ক্রমশঃ

গ্রামবাসী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

গুণী মানী ওরা কেউ নয় ভাই,
আমাদের গ্রামবাসী,
ওরা যে সরল সহজ মানুষ,
তাই এত ভালবাসি!
দেশ ছারখার—গেল কে কোথায়—
কোন্ ঘাটে মাঠে লোকরখানায়,
আজি পরবাসে ভাবি ব'সে তাই
আর আঁখিজলে ভাসি।

আহা, তবু ওরা আত্মীয় মোর
নয় নয় কভু পর,
প্রিয়-পরিজন ওরাই আমার—
জীবনের সহচর!
আমার দুঃখে ছিল ওরা দুখী,
মোর উল্লাসে হ'ত কত সুখী,
ওদের লাগিয়া চিরদিন খোলা
ছিল যে আমার ঘর!

জানি, উহাদের ছিল না খেতাব,
ছিল নাকো গাড়ী-ঘুড়ি,
হুকুম করিতে জানিত না ওরা
দুলায়ে বিপুল ভুঁড়ি!
ছিল নাকো কেউ হাকিম ডেপুটি,
রোহিত কাত্‌লা নয়—চুনোপুঁটি,
ধরাখানা ওরা সরা ভেবে কভু
হেলায় দিত না ছুড়ি।

হয়তো জীবনে উহাদের সনে
হবে নাকো আর দেখা,
হায় স্বাধীনতা, হায় রাক্ষসী,
ছিল এ ভাগ্যে লেখা!
স্মৃতির পসরা খুলি' বার বার—
করিবে হৃদয় শুধু হাহাকার,
এ জীবনে হায়, শুকাবে না কভু
একটি কথের রেখা!

ভাস্কর্য্যের একটি নিদর্শন [শ্রীআশুতোষ সামন্ত

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

শ্রীবিমল রায়

গত ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। উদ্বোধন করেছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এই প্রদর্শনীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে চিত্র-প্রদর্শনীর উল্লেখই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। প্রদর্শিত চিত্রাদির সমালোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না।

কাব্য, সাহিত্য, নাটক, গান ইত্যাদি ভাল বলে পরিচিত হলে বহু বার সমালোচনা করে সেগুলির প্রশস্তি গাওয়া হয়। ভাষা অথবা সুরে যতটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব, তার চেয়ে চিত্রে অনায়াসে অনেক বেশী প্রকাশ করা যায়। সাধারণতঃ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলতে শুনি 'ছবি-টবি বিশেষ বুঝি না'। একথা শুনে মনে কৌতূহল জেগেছে, সহজেই যা বোঝা যায় সেটা তাঁদের কাছে দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয় কেন? শিল্পী-মাত্রেরই এ প্রশ্নের একটা সমাধানের পথ খুঁজে দেখা উচিত। কারণ সহজ বিষয়কে বোঝা-ই কি দর্শকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন? তা হলে ছবিও দিন দিন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠবে। দর্শক ছাড়া ছবির মর্য্যাদা হয় না। শিল্পানুরাগীর শিল্পরসের অনুগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে শিল্প ক্রমে ক্রমে মরে যাবে। সেই কারণে তাঁদের মনকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চিত্র-সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যদি একথা সত্য হয় যে, ছবির অর্থ বোঝা দুরূহ, তা হলে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, ছবির মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন আমাদের দেশে নেই। সেই কারণে ভাষার সাহায্যে যথোচিত সমালোচনা না হলে ছবি অনুধাবন করা খুবই শক্ত। আমরা আগে দেখি, পরে ভাষায় প্রকাশ করি। এ ক্ষেত্রে আগে কানে শুনব কি দেখতে যাচ্ছি, তারপর দেখে বুঝতে পারব—ঠিক যা শুনলাম তা দেখা হ'ল কিনা।

সুদূর অতীতে মানুষ যখন গিরি-গুহায় বাস করত, কাঁচা মাংস খেত, রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, উত্তররামচরিত রচনার কল্পনাও যখন তার মনে উদিত হয় নি তখনও সে গুহার ভিতরে ছবি আঁকত। কোনও জাতির সভ্যতার বয়স নিরূপণে সেই জাতির ছবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, সভ্যতার শীর্ষভাগে শিল্পের স্থান।

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে [শ্রীরামচন্দ্র দাস

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ছবি কাকে বলব? ভাষার সাহায্যে যখন বাংলাদেশের একটা পল্লীর বর্ণনা করি, তখন সেই বর্ণনার ভেতর দিয়ে সেই পল্লীর ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যখন সেই বর্ণিত পল্লীকে দেখতে যাই তখন মনের চোখে দেখা পল্লীর সঙ্গে সাদৃশ্যের অভাব ঘটে; মনে হয়, না দেখলেই ছিল ভাল। প্রকৃতির এক একটি দৃশ্যপটে সৌন্দর্য্য লুকানো

আছে—সেটা তার মাধুর্য্য। কাউকে দেখে তার দেহলাবণ্য, ভঙ্গিমা, আদল, রং ইত্যাদি ঠিক ঠিক বর্ণনা করা হ'ল, কিন্তু তখনও বাকী রইল আসল জিনিষ—সে তার স্বাভাবিক সত্তার রূপ বর্ণনা করা। এই সত্তা তার মাধুর্য্য—যাকে ভাল লাগা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ তাকেই দেখতে ও দেখাতে ভালবাসে।

কুটীর-শিল্প [শ্রীচুণীলাল দত্তগুপ্ত

মনের উপর বর্ণে বর্ণে বর্ণনার ছবি এঁকে দেওয়া—এ হ'ল কথাশিল্পীর কাজ। চিত্রশিল্পীর কাজ হচ্ছে রেখায় রূপায়িত করে ছবিটাকে একেবারে জীবন্ত করে এঁকে দেখানো। কোনও লেখা ভাষা না জানলেও এ ছবি অন্তরস্থ হয়। ভাষা কণ্ঠস্থই করা যায়—কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে যে ছবির সৃষ্টি, তার স্থান অন্তরে।

প্রদর্শনীতে অনেক রকমের ছবি ছিল, দর্শকও এসেছিলেন অনেক, মতামতও শোনা গেল বিভিন্ন রকমের। প্রশংসা করে গেছেন প্রায় সকলে। কিন্তু তাঁরা ছবি নিয়ে গেছেন খুব অল্পই। শিল্পীকে সুখ্যাতি করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার শিল্পকে সমাদরে গ্রহণ করে তৃপ্তি পাওয়াও শান্তির কথা, গৌরবের কথা।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, দেশের শিল্প-সম্পদের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়সাধন করা, শিল্প-সম্পদের ভাণ্ডারটি তাদের হাতের কাছে তুলে দেওয়া। প্রদর্শনী নূতন নূতন শিল্পীর প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করায় সহায়তা করতে পারে। শিল্প যে শিক্ষার মস্ত বড় অঙ্গ, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, তা স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। দেশবাসীর সঙ্গে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠতা এবং শিল্প-পরিচয়-সাধন এই প্রদর্শনীর মারফতেই সম্ভব।

প্রদর্শনী দেখে খুব আনন্দ লাভ করা গেল। শিল্পীরা সবাই ছাত্রছাত্রী—আড়ম্বর নাই, জাঁকজমক নাই, স্বকীয় প্রেরণায় নিজেদের খেয়ালমত যা এঁকেছেন, তাই তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন। ছবিগুলি সুন্দর, কিন্তু দাম অল্প। প্রদর্শনীতে প্রথম

কর্ম্মরতা [শ্রীশচীন রায়

শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং শিক্ষণ-শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ছিল, যেমন ইণ্ডিয়ান পেন্টিং, ফাইন আর্টস, কমার্শিয়াল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট, ভাস্কর্য্য এবং কারুশিল্প এগুলো বিভাগের কাজের প্রকারভেদ থাকায় একঘেয়েমি ছিল না। তবে সংখ্যায় কিছু কম হলে ভাল হ'ত।

বর্ত্তমান বাংলায় ছাত্র-শিল্পীদের বহুবিধ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অভাব-অনটন, বাসস্থানের সমস্যা, রং, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস্ ইত্যাদি শিল্পোপকরণের উচ্চ মূল্য শিল্পচর্চ্চার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলে শিল্পীরা শিল্পকলার চর্চ্চা ছেড়ে দিতে পারেন না। শিল্পানুরাগীরা দু'একখানা করে ছবি ক্রয় করলেই এদের উৎসাহ বাড়বে। বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী মিঃ রুশিন এদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি প্রদর্শনী দেখে অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন এবং এই আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরণের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বিলাতে সম্ভবপর হতে পারে।

এই প্রবন্ধে যেসব ছবি ছাপান হ'ল, তা ছাড়া এমন আরও ছবি ছিল, যেগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাদেরও নামের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পেণ্টিংয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র—এর কাজগুলো খুব চমৎকার লাগল। 'শরশয্যা' ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটির রেখাবিন্যাস, বর্ণপ্রয়োগ, রচনা এবং প্রকাশ অতি সুন্দর। ছবিটিতে ভারতীয় শিল্পকলা-পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এতে সংযম এবং মাত্রাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীচিত্ত দাস, শিক্ষণ-শ্রেণীর ছাত্র—'প্রতিকৃতি' প্যাষ্টেলে আঁকা, তুলি ব্যবহার করা হয় নি। ছবিটি সুন্দর হয়েছে। ছবিটি অনাড়ম্বর, কিন্তু এর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত।

শ্রীশচীন রায়, ফাইন আর্টস্ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র—'ট্রেনের কামরা' রঙে আঁকা স্কেচ, খুব ভাল হয়েছে। গাড়ী চলছে, যাত্রীরা আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব, রাজনীতিচর্চ্চায় মশগুল। ছবিতে এই ভাবটি ফুটে উঠেছে। যেন সবটাই চলছে—থেমে নেই। এর আর একখানা ছবি 'কুটীর-শিল্প' (কাঠ খোদাই)—কাজে ব্যস্ত দুটি স্ত্রীলোক, কাজে তারা তন্ময় এই ভাবটা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে।

ট্রেনের কামরা [শ্রীশচীন রায়

শ্রীমতী হৈমন্তী সেন, ফাইন আর্টস্ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী—'রাজপুতানী' তৈলচিত্র—এর কাজগুলো অধিকাংশই সুন্দর হয়েছে। এর কোন কোন ছবি বিশেষ প্রশংসালাভ করেছিল। ছবিতে রাজপুতানীকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে। ড্রইং, রং এবং তুলিটানার পদ্ধতি প্রশংসনীয়। এর ছবিতে নৈপুণ্য, মাধুর্য্য রুচি এবং সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিপ্রদাস মহান্তী, শিক্ষণ শ্রেণীর ছাত্র—'প্রসাধন' মূর্ত্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রসাধনরতা স্ত্রীলোকটির দেহভঙ্গিমা অনবদ্য ভাবে পাথরে রূপায়িত হয়েছে। ভাস্কর শ্রীআশুতোষ সামন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র—কারিগরী শিল্প চার ভাগে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে—কোন প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে স্থাপনোপযোগী ভাস্কর্য্যশিল্প। সহজ সরল ভঙ্গীতে সাধারণ মানুষ কে কেমন করে কি তৈরি করছে তা দেখান হয়েছে। শিল্প-পরিবেশন-নৈপুণ্য চমৎকার।

শ্রীঅসিত সেন, কমার্শিয়াল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—'বাজার' রেখায় আঁকা একটি স্কেচ, প্রশংসনীয়। শ্রীরামচন্দ্র দাস কমার্শিয়াল বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—'ভিজিট পুরী' একটি নূতন ধরণের পোষ্টার (প্রাচীরচিত্র)—পুরীর পটচিত্র অবলম্বনে আঁকা, জগন্নাথদেবের মন্দিরদর্শনের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছবিটিতে আছে। শ্রীচুণীলাল দত্তগুপ্ত—কমার্শিয়াল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—'কুটীর-শিল্প' ক্যালেণ্ডারের উপযুক্ত ছবি। ক্যালেণ্ডার সাধারণতঃ

প্রতিকৃতি [শ্রীশচীন রায়

বাজার [শ্রীঅসিত সেন

বিজ্ঞাপনের জন্য ছাপা হয়। একটা সুন্দর ছবির মধ্যে বিজ্ঞাপনের মূল কথা নিহিত আছে। একটু একটু করে একটা ধাঁধা বোঝা হচ্ছে। অনেক রকম অর্থেই ছবিটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ ছাড়া আর যে সমস্ত শিল্পীর ছবি উল্লেখযোগ্য তাদের নাম নীচে দেওয়া হ'ল—

শ্রীঅরুণ বসু, মীরা সেন, অজিত বক্সী, সুভাষ সিংহ রায়, কমল চৌধুরী, সলিলকুমার ভট্টাচার্য্য; তারাদাস সেনগুপ্ত, শিউলি রায়, সেবিকা নাগ, পরীক্ষিৎ বসু, সন্তোষ কুণ্ডারী, সুমঙ্গল সেন, লক্ষ্মীধর দাস, রমল সেন, রণজিৎ দে, কানাই কর্ম্মকার, গোষ্ঠ কুমার, জ্যোতির্ম্ময় মজুমদার, সুধীন্দ্র দাসবর্ম্মা, অমূল্য চৌধুরী, সুনির্ম্মল বসু, রবি মুখোপাধ্যায়, মদন রায়, মনোরঞ্জন ঠাকুর, রণেন মুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্ত্তী, সমরেশ চৌধুরী, শর্ব্বরী রায় চৌধুরী।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩১৯ সালের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমার কৃষি-সম্পর্কীয় প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তখন আমি সাবোর (বিহার) কৃষি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। 'প্রবাসী'র কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কাহাকেও তখনও জানিতাম না। যখন প্রবন্ধ পাঠাই তখন আমাদের জনৈক অধ্যাপক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় এবং কয়েক জন সহপাঠী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রবাসী অতি উচ্চ স্তরের মাসিক পত্রিকা, ইহাতে নামজাদা ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ব্যতীত আর কাহারও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না; আমার প্রবন্ধ অমনোনীত হইয়া ফেরত আসিবে। সুতরাং আমিও প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে এবং ইহার ফলে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছিলাম তাহার বলেই আজ পর্য্যন্ত কৃষি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিয়া যাইতেছি।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে 'প্রবাসী'র সহিত আমার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহার বহুকাল পরে। সন ও তারিখ মনে নাই; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন; তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহের পার্শ্বে প্রবাসী আপিস অবস্থিত ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কাহারও সঙ্গে বিনা কারণে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না, সকল সময়েই লেখা কিংবা পড়ায় ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা তাঁহার প্রথম কথাতেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমার পরিচয় করাইয়া দিবার পরেই তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কৃষি-বিষয়ে প্রবন্ধ খুব সহজ ভাষায় লিখতে পার; তোমার প্রবন্ধে এমন কোন বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ থাকে না, যা আমার মত লোক বুঝতে পারে না।" তাঁহার এই প্রথম কথাতেই আমার আশঙ্কা ও সঙ্কোচ একেবারে দূর হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথম কারণ আমাকে তাঁর "তুমি" সম্বোধন, দ্বিতীয় কারণ আমার প্রবন্ধের প্রশংসা। আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক ও সহপাঠিগণ যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা তাঁহাকে বলিলাম; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কৃষিই যে আমাদের দেশের আসল বস্তু; কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ যত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল হবে—আমার কাছে কৃষি-বিষয়ক

প্রবন্ধ অতি মূল্যবান ; তুমি লিখে যাও।" তখন বুঝিলাম তাঁহার নিকট কৃষির মূল্য ও মর্য্যাদা কত বেশী।

আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। উন্নত কৃষি-প্রণালীর প্রচারের জন্য ইংরেজী ১৯২২ সালে আমি একটি গল্পের বই লিখিয়াছিলাম ; পুস্তকখানির নাম "ভুলের ফসল।" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে পুস্তকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচনার প্রথমেই ছিল—"লেখক চাষা, লিখিয়াছেন গল্প।" তখন আমি ফরিদপুরে, জেলা-কৃষি-কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম ; সমালোচনাতে আমাকে 'চাষা' আখ্যা দেওয়াতে আমি খুবই মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলাম। ইহার পরেই সরকারী কার্য্য উপলক্ষে যখন দুই-এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসি—তখন রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে 'চাষা' আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদ করি। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি প্রকৃতই কৃষিকাজকে ভালবাস, তা হলে 'চাষা' উপাধিতে তোমার গৌরব অনুভব করা উচিত।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'চাষাই দেশের খাঁটি মানুষ। তুমি সেই রকম খাঁটি মানুষ হবার চেষ্টা কর।' তাঁহার সেই হাসি আমার এখনও মনে আছে। তখন হইতেই আমি বহু সভায় নিজেকে 'চাষা' বলিয়া পরিচয় দিয়াছি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা সকল সভায় বলিয়াছি।

রামানন্দবাবু আমাকে কয়েকখানি চিঠিও লিখিয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ শস্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রয়োজনেই চিঠিগুলি লিখিত হইয়াছিল। সেই সকল চিঠিতেও কৃষির উন্নতির জন্য তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম।

অতি সামান্য দরকারেও রামানন্দবাবুর নিকটে গিয়াছি—কিন্তু তাঁহার নিকট যাইতে কখনও কোন দ্বিধা অনুভব করি নাই। ১৯২৫ সালে 'ওয়েম্বলী এগজিবিশনে'র পূর্ব্বে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সময়ে কতকগুলি ছবি, চার্ট প্রভৃতির জন্য কয়েকটি ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি দরকার হয়। একটি ইংরেজী শব্দ ছিল "pedigree bull", আমি ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলাম "বংশ-জানা ষাঁড়"। রামানন্দবাবু কয়েকটি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ করিয়া দিলেন ; আমার pedigree শব্দের বাংলা অনুবাদ দেখিয়া বলিলেন, "খুব সহজ হয়েছে, আমি এত সহজ লিখতে পারতাম না।" যে কয়েক বার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, এইরূপ স্নেহ, প্রীতি এবং উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে অদ্যাবধি 'প্রবাসী'র সহিত আমার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন আছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রবাসীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার পিতার ন্যায় উন্নত কৃষির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সচেতন এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের একজন প্রকৃত দরদী। ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কৃষিসম্পর্কীয় প্রবন্ধসমূহের সংখ্যাধিক্য হইতে। প্রবাসীর "বিবিধ প্রসঙ্গে"র আলোচনাসমূহ হইতেও ইহার পরিচয় মেলে।

ইতিহাসে নাম

শ্রীকালিদাস রায়

জগতের ইতিহাসে দেখি যুগে যুগে আসে
এমন মানুষ দেশে দেশে,
এই সৃষ্টি বিধাতার করে তোলে তোলপাড়
তাতে ছাপ যায় রেখে শেষে।
এ মানুষ শুধু চায় চিরদিন এ ধরায়
ইতিহাসে থাকে যেন নাম
যে দেশে সে জন্মে হায় আশা দিয়ে জিনে তায়
সে দেশ কত না দেয় দাম।
লক্ষ লক্ষ নারী-নরে প্রাণ দেয় তারি তরে
লক্ষ লক্ষ হারায় সম্বল,
লক্ষ লক্ষ গৃহহারা হারায় অপত্য দারা
সারা দেশ হয় হীনবল।

ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য নয় মিত্র, দারাপত্য নয়
নয় পরাধীনতা মোচন,
আত্ম-সুখ বৃদ্ধি নয় স্বদেশের ঋদ্ধি নয়
নয় বিশ্বে কল্যাণসাধন,
শুধু বিশ্ব-ইতিহাসে নাম রাখিবার আশে
দেশে দেশে জ্বালায় অনল।
একের খেয়াল বশে সহস্র অনলে পশে
স্বর্ণভূমি হয় রসাতল।
তবু লোক নাহি বুঝে কোটি কোটি তারে পূজে
যুগে যত করে হাহাকার।
মোহাবেশে মনে করে তাদেরি কল্যাণ-তরে
বুঝি সে দেবের অবতার।

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

পণ্ডিচারী-বাসকালে আমরা শ্রীঅরবিন্দ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাকে "অরো" বলিয়া অভিহিত করিতাম। এই সম্বোধন আমরা অতিশয় আদরের সহিত করিতাম। এই "অরো" আমার নিকট ক্ষুদ্র ছিলেন না, তাঁহার সমুন্নত মহিমা আজিও অনুভব করি, বিস্মিত হই। অরোর সঙ্গে এই সময়ে আমরা দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়াছি। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে তিনি বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেন। যোগসাধনার মধ্য দিয়া আমাদের জীবনকে নূতন ভঙ্গীতে ঢালিয়া লইবারই যেন তিনি আলো ধরিতেন। আলোচনা দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া চলিত—সারা রাত কোথা দিয়া যেন কাটিয়া যাইত, আমাদের হুঁস থাকিত না। প্রভাতের পাখীর ডাকে নিজ নিজ শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইতাম। সে কি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ, সে কি গভীর স্নেহ-ডোরে আমাকে বাঁধিবার অনুপ্রেরণা!

আমি বাল্যকাল হইতে নিরামিষাশী। পণ্ডিচারী আসিয়া দেখিলাম—মৎস্য ও মাংস ভিন্ন দুই বেলা আহারের অন্য ব্যবস্থা নাই। আমি কয়েক দিন অন্নের সঙ্গে আলুসিদ্ধ খাইয়া উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিলাম। অরো নিরপেক্ষ ভাবেই হাসিতেন। মণি, বিজয়, নলিনী প্রভৃতি পরিহাস করিয়া বলিতেন, "এমন করিয়া কতদিন চলিবে? মৎস্য, মাংস খাইলে আপনি কি জাতিচ্যুত হইবেন?" অরোর মুখে কিন্তু কথা ছিল না—তিনি ভোজনকালে নানা রঙ্গ-রহস্যে সময় কাটাইয়া দিতেন; আমি কিন্তু তাঁহার অন্তরের বাণী বুঝিয়া লইলাম। অতীতের সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি দিতেই তাঁর অনুপ্রেরণা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। বিজয় প্রভৃতির বাক্য উপলক্ষ্য বলিয়া মনে হইল। আমি সেই দিনই ভোজনকালে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিলাম, "আজ হইতে নিরামিষাশী আমি আর নহি। অরোর যাহাতে রুচি, তাহাই আমার গ্রহণীয় হইবে।" সহতীর্থেরা উল্লসিত হইয়া বলিল, "সাবাস আপনাকে—আপনার সংস্কার, আচার ও নীতি অরোই ভাঙ্গিয়া দিলেন। সন্ধ্যা হইতেই আপনার খাদ্যপাত্রে সমুদ্র-মৎস্য দেওয়া হইবে।"

তাহাই হইল। রাত্রে ভোজন-পাত্রের সম্মুখে বসিয়া দেখিলাম—ভাতের সঙ্গে এক বাটি মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছে। আবাল্যের সংস্কার জ্ঞানতঃ ভঙ্গ করিলাম বটে, কিন্তু অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অরো এক বার আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। বেদনাভরা আঁখি দুটি আমার দুঃখে যেন দ্রব হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন আমায় নূতন করিয়া গড়িতে, অতীতের সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আমি আজ হইতে মৎস্য-মাংসভোজী হইয়াছি।" তিনি হাসিলেন। সেই হাসির মধ্যেই আমার সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইলাম। সেদিন অন্নগ্রাস মুখে উঠিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না। ভোজনান্তে বারান্দায় বসিয়া তিনি আত্মসমর্পণের সাধনার কথা বিশদ ভাবে বলিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াই একের শরণ লইতে হয়। আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এবার পণ্ডিচারী আসিয়াছিলাম।

এক দিন প্রাতঃকালে ফরাসী পুলিস কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মান্দ্রাজে মোটঘাট লইয়া শ্রীযুক্ত পার্থসারথির সকাশে গিয়াছিলাম। আমি কিন্তু গোপন পথ দিয়া পলাইয়াছি; তার পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সহিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনে প্রবেশ করায় ও ইংরেজ পুলিস সম্ভবতঃ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে তদন্ত করিতে বলায়, পুলিস কমিশনারের আবির্ভাব। বন্ধুরা সকলেই আমায় গোপন দ্বার দিয়া কিছুক্ষণ দূরে থাকিতে বলিলেন—কমিশনার সাহেব বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া প্রস্থান করিলে, পুনরায় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই চলিবে। এইরূপ পরামর্শকালে অরো আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহারই অর্দ্ধভাগ গায়ে জড়াইতেন। পায়ে এক জোড়া চটিজুতা থাকিত। সেই সৌম্যস্নিগ্ধ মূর্ত্তি ভুলিবার নয়। তখন তিনি শীর্ণকায় ছিলেন—কিন্তু তাঁহার চক্ষে ছিল অপরূপ দীপ্তি, ভাস্বর মুখমণ্ডল। মৃদু হাসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিব পুলিস কমিশনারকে?" কিন্তু আমায় আর কিছু বলিতে হইল না; তিনি আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তার পর অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুলিস কমিশনারকে তিনি আমার কথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন। সব কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দননগর হইতে যে ভদ্রলোক আপনার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আপনার সম্পর্ক কি?" তিনি স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "He is my disciple" (তিনি আমার শিষ্য)। কমিশনার

সাহেব করমর্দ্দন করিয়া হাস্যমুখে প্রস্থান করিলেন। অরো আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সব চুকিয়া গেল, তুমি এখন আমার নিকট নিরাপদেই বাস করিতে পার।"

এই সময়ে দেড় মাস তাঁহার নিকটে বাস করি। মধ্যে একখানি প্রশস্ত গৃহে নলিনী, মণি ও সৌরীন বাস করিত। শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখস্থ কক্ষে বিজয়ের সহিত বীরেন বলিয়া এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিতে হইবে।

অরোর মুখে ভারতের পুরাণেতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা শুনিলাম। বেদের মন্ত্র তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইত। উপনিষৎ ও গীতার সত্য-মর্ম্ম অন্তর দিয়া বুঝিয়া লইলাম। ভারতের রাষ্ট্রজীবনের বহু পরিচয় মিলিল—নেতৃপুরুষগণের পরিচয় পাইলাম। অরো এই সময়েই নিজের বাল্যজীবনের কথা কিছু বলিয়াছিলেন। আমি তাহা খাতায় টুকিয়া লইয়াছিলাম। সে কাহিনীটুকু আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।

আমার ইন্দোচীনে যাওয়া বন্ধ হইল। বিপ্লবী বন্ধুদের অনুরোধ অনুযায়ী রিভলভার আনিবার প্রশ্ন উত্থাপন করা-মাত্র তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষ রাজসিকতার মধ্য দিয়া জাগিবে না; ভারতের এক দল মানুষকে গীতার পার্থ-সারথির কথা শুনিতে হইবে। ভারতের নেতৃপুরুষগণ হইবেন গীতার মানুষ। তাঁহাদের গুণাতীত হইতে হইবে। তবেই আসিবে ভারতের মুক্তি।" এই সময়ে তিনি স্পষ্ট করিয়াই আমায় জানাইলেন—অতঃপর রাজসিক কর্ম্মে আমি যেন প্রবৃত্ত না হই। তিনি ভারতকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আমিও তাঁর নির্দ্দেশ প্রাণপণে পালন করিব বলিলাম। তিনি আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "আমার কাজ তোমার কাজ; তোমার কাজও আমার বলিয়াই গ্রহণ করিও।"

এই সময়ে তিনি রাত্রে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন। আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গী হইতাম। আমরা "পীয়ারে"র শেষ সীমানায় আসিয়া বসিতাম। জেটিকে পণ্ডিচারীর লোকে "পীয়ার" বলে। জ্যোৎস্নাবিধৌত সমুদ্রতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি অতিশয় পুলকিত হইতেন। আমি গান গাহিতাম, সুরেশ ওরফে মণি সেও গাহিত, "অরো" তাল দিতেন। সে রঙ্গ-রহস্যের কথাগুলি স্মরণ করিলে আজও তৃপ্তি পাই। মনে আছে, এক দিন অলিন্দে বসিয়া তিনি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন—আমায় ইচ্ছাশক্তির কথা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা সর্ব্বব্যাপী, এই দেখ—আমি will করিব, চিলগুলি তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে উড়িয়া যাইবে।" সত্যই তাঁহার ইচ্ছামাত্র চিলগুলি ভিন্নমুখী হইল।

যেদিন বিদায়ের পালা আসিল, সেদিন কি ভাবে আমি বাংলায় ফিরিয়া যাইব—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, "যেভাবে তুমি ইংরেজ পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তোমায় পাইলে তাহারা সহজে তোমায় ছাড়িবে না। তোমাকে গোপনেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী ফরাসী কোম্পানীর বাংলায় যে ষ্টীমার আসে, তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। তারপর নীলাম্বুরাশি বিদীর্ণ করিয়া কলিকাতার বন্দরে যেদিন ষ্টীমার ভিড়িল, সেই দিনই রাজাবাজার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কমোহন প্রমুখ প্রায় ২০ জন বিপ্লবী ধরা পড়ে। আমি ঐ রাত্রে রাজাবাজার যাইতে গিয়া অন্তরের সতর্কেষণায় সহসা গতির মোড় ফিরাইয়া চন্দননগরেই উপনীত হই। অরোর আশীর্ব্বাদেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া মনে করিলাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের নূতন বাণী লইয়া "আর্য্য" পত্র প্রকাশিত হইল। "বন্দে মাতরম্"-এর ঋষি "কর্ম্মযোগিন" ও "ধর্ম্মে"র পর "আর্য্যে" অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "আর্য্য" বাহির করার পূর্ব্বে চন্দননগরে ডেপুটি নির্ব্বাচনের আন্দোলনে আমাদের যোগদান শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশক্রমেই হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে আমরা জয়লাভ করি—তাহার মূল এইখানেই নিহিত ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী ভারতীয় ডেপুটি নির্ব্বাচনে মঃ লে-ম্যার, মঃ পল ব্লুজে ও মঃ পল রিশার, এই তিন জন প্রতিনিধি পদ প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এই সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মঃ পল রিশারকে ভোটযুদ্ধে জয়ী করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু মঃ লে-ম্যারই বিজয়ী হইয়া ডেপুটি রূপে নির্ব্বাচিত হন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

"The election is over, or what they call an election with the result that the man who had the fewer real votes, has got the majority."

অর্থাৎ,

"নির্ব্বাচন অথবা ইহারা যাহাকে নির্ব্বাচন বলে, তাহার শেষ হইয়াছে। ফলে যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাইয়াছিলেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী দাঁড়াইয়াছিলেন।"

তাঁহারই পত্র হইতে আরও জানা গিয়াছিল যে, যেখানে মঃ লে-ম্যার মাত্র তিন শত ভোট পাইয়াছিলেন, সেখানে ৩৩০০ শত লিখিত হইয়াছিল। ফরাসী ভারতের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তিনি সেই পত্রেই আমাদের চেষ্টাকেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি অর্থের কথা পুনরায় জানাইলেন। তিনি লিখিলেন—

"My present position is that, I have exhausted all my money along with your Rs. 60|- and I am still in debt for the Rs. 130|- due for the old rent. I do not like to take more money from Mons. Richard. He has sold one-fourth of his wife's fortune (a very small one) in order to be able to come and work for India."

"তোমার ৬০৲ টাকা সহ আমার সব টাকাই আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। পুরাতন বাড়ীভাড়ার দরুন আমি এখনও ১৩০৲ টাকা ঋণগ্রস্ত। মঃ রিশারের নিকট আর টাকা লইতে আমি রাজী নহি। তিনি তাঁর স্ত্রী-ধন হইতে (যাহার পরিমাণ খুবই অল্প) এক-চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহা দিয়া ভারতে আসিয়া ভারতের কার্য্য করিবার জন্য।"

এই সময়ে বাগান বিক্রয়ের তাঁহার অংশস্বরূপ ৫০০৲ টাকার তাগিদ দিবার জন্য তিনি আমায় পত্রে লেখেন। কোন বিশিষ্ট নেতার নিকট হইতে দেশের গচ্ছিত টাকা আদায়ের দুঃসাধ্যতা উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা লিখিলেন—

"This habit of defalcation of money for noble and philanthrophic purposes in which usually the ego is largely the beneficiary, is one of the curses of our movement and so long as it is continued Lukshmi will not return to this country. I have sharply dicontinued all looseness of the kind myself and it must be discouraged henceforth wherever we meet it. It is much better and honest to be a thief for our own personal benefit than under these holy marks."

"উচ্চ ও পরহিতের উদ্দেশ্য দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করার এই অভ্যাস—যাহাতে প্রধানতঃ মানুষের স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইয়া থাকে—তাহা আমাদের আন্দোলনের অভিশাপ-স্বরূপ ; আর ইহা যতদিন না দূর হয়, ততদিন ভারতে লক্ষ্মী-দেবীর পুনরাবির্ভাব হইবে না। আমি নিজে আমার এই শ্রেণীর সকল ঢিলেমি তীব্রভাবে বন্ধ করিয়াছি এবং যেখানেই ইহা দেখি না কেন, তাহার উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের সোজাসুজি ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চোর হওয়াও বরং ঢের ভাল আর এইরূপ পুণ্যচিহ্নের আবরণে তাহা হওয়ার চেয়ে ঢের সাধু আচরণ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘদিন অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন ছিলেন, কিন্তু সঙ্কটে কোন দিনই তিনি প্রতিহত হন নাই। ভাগবত কর্ম্মের জন্য অর্থাগমের পথ চিরদিন মুক্ত বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। এই সময়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমায় স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন—

"What you have to do is to make some real arrangement not a theoretical arrangement by which my burden of my expenses may be shifted off your shoulders, until I am able to make my own provision. Meanwhile get me Rs. 150 and the Rs. 500 due to me (garden money). If afterwards we can make no other arrangements, we shall then have to consider the question again."

"তোমার যাহা করিতে হইবে, তাহা হইতেছে একটি বস্তুতন্ত্র ব্যবস্থা করা—কোন কল্পনামূলক ব্যবস্থা নয়—যাহাতে আমার ব্যয়ভার তোমার স্কন্ধ হইতে সরিয়া যায়—আমার নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৫০৲ ও বাগান বিক্রয়ের ৫০০৲ টাকা আমায় পাঠাইও। পরে আর কোন ব্যবস্থা যদি আমরা না করিতে পারি, তাহা হইলে এই প্রশ্নটি আবার বিবেচনা করিতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া আমি নিরতিশয় চিন্তান্বিত হইলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দাবি পূরণ করিতে পারিয়াছিলাম। এই জন্য আমার কৃতিত্ব অপেক্ষা তাঁহার প্রেরণার মূল্যই অধিক বলিয়া আমি মনে করি।

আমি যখন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ছিলাম, সেই সময়ে বীরেন নামক এক যুবক ৺বিজয় নাগের সঙ্গে থাকিত—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৌরীন্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই আমায় বলিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি যে পুলিসের এক জন গুপ্তচর, এইরূপ উক্তিও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এইজন্য আমি সতর্ক থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—

"Then for important subjects. You write about Biren being here. I do not hold the same opinion as Sowrin etc. do, who are inclined towards a very black interpretation of his character and action. . . . I fail to find in him, looking at him spiritually, those ineffable blacknesses, which were supposed to dwell in him, only flightiness, weakness, indiscretion, childishness, swattvic impulsiveness and self-will and certain undesirable possibilities presnet in many young Bengalees, in a certain type, indeed, which has done much harm in the past. All these have recently much diminished and I hope even to eradicate them by the Yoga. In fact, the view of his presence here forced in me by that which guides us, is that he was sent here as the representative of this type and that I have to change and purify it. If I can do this in the representative, it is possible in the future to do so in the class and unless I can do it, the task I have set for myself for India will remain almost difficult for solution. For as long as that element remains strong, Bengal can never become what it is intended to be."

"বীরেন সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ এবং সৌরীন প্রমুখ

যাহা বলিয়াছে, তাহা সবটুকু সত্য নহে। বীরেনের ঐ সকল চরিত্রগত দোষ আমার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পড়ে নাই। তাহার চাপল্য, দুর্ব্বলতা, অবিবেচনা, ছেলেমানুষি, একটা সাত্ত্বিক ভাবপ্রবণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এরূপ কয়েকটি অবাঞ্ছনীয় সম্ভাবনা দেখা যায় বটে, যাহা এক শ্রেণীর বাঙালী তরুণদের মধ্যে বিদ্যমান এবং অতীতে যাহা যথেষ্ট অনিষ্টই করিয়াছে—এই সকল দোষ এখন অনেকটা কমিয়াছে এবং আমি আশা করি যোগের দ্বারা ঐগুলি একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।......যিনি আমাদের নিয়ন্তা, তিনি তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন—সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে। আর তাহাকে আমার পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। একটি প্রতীকের মধ্যে যদি ইহা আজ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র শ্রেণীটির মধ্যেই তাহা করা সম্ভবপর হইবে। আর তাহা যদি আমি না করিতে পারি, তো যে কাজ আমি ভারতের জন্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা সমাধান করা দুঃসাধ্য হইবে। বাংলাও তাহা হইলে যাহা হইবার জন্য চিহ্নিত, তাহা হইতে পারিবে না।"

বীরেন সম্বন্ধে তাঁহার এই আকুলতার মূল্য নিশ্চয়ই অনুধাবনীয়। মানুষকে বড় করিয়া দেখার প্রবৃত্তি যে তাঁহার মধ্যে কতখানি ছিল, ইহা হইতেই তাহার পরিচয় মিলিবে। যদিও বীরেন্দ্রনাথের সংবাদ আর আমরা রাখিতে পারি নাই তথাপি শ্রীঅরবিন্দের বাঙালীজাতির তথা ভারতের অভ্যুত্থান ও জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তনকল্পে যে আন্তরিকতা, তাহা চিরদিন আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই বাংলার বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বাংলার বিপ্লবিগণ তাঁহাকে রাষ্ট্রনেতার আসন দিতে অতঃপর অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি তখন যে অবস্থায় তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তিনি সর্ব্বদাই জানাইতেন বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে যেন আমি বিরত থাকি। তিনি এই সময়ে স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

"You must realise that my work is a vast one and that I must in doing it come in close contact with all sorts of people, including Europeans, perhaps even spies and officials."

"তোমার উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমার কার্য্য অতি বৃহৎ। এই কার্য্যের জন্য বহুবিধ লোকের সংস্পর্শে আমার আসিতে হইবে—তন্মধ্যে ইউরোপীয়, এমন কি গুপ্তচর ও রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি এক জন ফরাসী কর্ম্মচারীরও নাম করিয়াছিলেন—চন্দননগরে তিনি কর্ম্মোপলক্ষে এই সময়ে থাকিতেন। আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম সে ব্যক্তি একেবারেই বুদ্ধিহীন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি তাঁহার অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দও এক দিন ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "He is a queer sort of fool."—সে এক বিচিত্র ধরণের বোকা লোক।

স্পষ্টই বুঝিলাম—মঁসিয়ে রিশারের আগমনের পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে দূরেই থাকিতে চাহিতেছেন—আমাকেও তাঁহার সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রতি পত্রে নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। তিনি অতঃপর যে নীতি ধরিয়া চলিতে চাহিতেছিলেন, তাহার আভাস পরবর্ত্তী কয়েক ছত্রে পরিস্ফুট হইবে:

(1) It mgiht be known among our friends that my whole action is about to be such as I have described, so that they may not again repeat that kind of mistake.

(2) Those immediately concerned with me must be aloof physically from Tantrickism: because of the discredit it brings.

(3) Biren and others of that kind must be made to understand that Tantra for us is discontinued until farther notices, which can be only in the future.

(4) The written basis of Vedantic Yoga has now become impossible and must be entirely changed and as far as possible. withdrawn from circulation."

"১। আমার বন্ধুদের জানা উচিত যে, অতঃপর আমার সমগ্র কর্ম্ম যেমন বলিয়াছি, সেইরূপ হইবে, যাহাতে যে ভুল তাহারা করিয়াছে তাহা আর পুনরায় না ঘটে।

২। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে আমার সহিত জড়িত, তাহাদের তান্ত্রিক কর্ম্ম হইতে স্থূলতঃ বিরত থাকিতে হইবে—কারণ তাহাতে অপবাদ ঘটায়।

৩। বীরেনের মত লোকেদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা তন্ত্রসাধনা পুনরায় না নির্দ্দেশ পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছি; আর সে পুনরারম্ভ সুদূর ভবিষ্যৎ ছাড়া হইতে পারে না।

৪। বেদান্তযোগের সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থখানি এখন অচল হইয়াছে। উহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া বাংলার বিপ্লবীরা কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময়ে পণ্ডিচারীতে ধর্ম্মসাধনার ভিত্তির উপর একটা নূতন সাধকমণ্ডলী গড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের ইচ্ছানুযায়ী এই সমিতির ফরাসী নামকরণ হইয়াছিল "L'ide Nouvell" (The New Idea)। এই সমিতি কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

রবীন্দ্র-সংলাপ কণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরবিজয়

ঠিক মনে নাই, আশ্রমে পূজাবকাশ বা গ্রীষ্মাবকাশ উপস্থিত। ছাত্র আর অধ্যাপকেরা কয়েক দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। আমি সন্ধ্যার পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি বলিলেন—

'আপনি কোথায় যাইতেছেন?'

'প্রথমে তো মেদিনীপুর, সেখানে আমার ছোটভাই ইন্দুশেখর জেলা-ইঞ্জিনিয়ার। সেখানে এক বার যাইতে হইবে।'

'তার পর?'

'তার পর জামশেদপুর, সেখানে আমার পুত্র ব্রহ্মব্রত থাকে, সেখানে না গিয়া পারি না।'

'তার পর?'

'তার পর হরিশ্চন্দ্রপুর। সেখানে আমাদের বাড়ী, যাইতেই হইবে।'

'তাহা হইলে বলুন আপনি একবারে ত্রিপুরবিজয়ে বাহির হইতেছেন!'

বাইওকেমিক চিকিৎসা

৩১শে আশ্বিন, ১৩৪৪ সাল। গুরুদেব বরাহনগর-কামারহাটির পথে বালি রেলপুলের নীচেই গুপ্ত নিবাস নামে এক বাগান বাড়ীতে আছেন। তাঁহার শরীর খুবই ক্লান্ত। সাঙ্ঘাতিক বিসর্প ব্যাধি হইতে উঠিয়াছেন। লম্বাচুল অনেকটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দাড়িও দুই পাশে উপরের দিকে কতক ছাঁটিয়া দিতে হইয়াছে। অনেক কথা হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'শরীর যখন আর চলে না তখন অন্যের উপর ভর করিয়া থাকা ঠিক নহে।' তিনি বলিলেন সেই গুরুতর ব্যারামের মধ্যে কোন কষ্ট অনুভব করেন নি। বাইও-কেমিক ঔষধ তিনি নিজের ইচ্ছায় খাইতে চাহিয়াছিলেন—যদি নীলরতন বাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণের অমত না হয়। তাঁহাদের অমত হয় নি, কেননা তাঁহাদের মতে ওটা ওষুধই নয়। কিন্তু ফলটা যে ঐ ওষুধেরই হইয়াছিল তাহা বলা চলে না। ডাক্তারেরা যথেষ্ট দেখাশুনা করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি-বেদক (reporter) বন্ধুত্বের সুবিধা লইয়া ডাক্তারদের পরামর্শের স্থানে গিয়া ভাল করেন নি। ঐ ওষুধের বিবরণ পত্রিকায় বাহির হওয়ায় ডাক্তারদের কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

বাক্‌সিদ্ধি

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন। সকলে তাঁহাকে এখন সংযত হইয়া কথা-বার্তা করিতে বলেন, কেননা তিনি এখন যাঁহা বলেন তাহাই ফলিয়া যায়। প্রথম প্রমাণ এই যে, তাঁহার উল্লিখিত সাঙ্ঘাতিক বিসর্প। যেদিন রাত্রে এই ব্যারামটা দেখা দিল তাহারই একটু আগে সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে তিনি বলিতেছিলেন যে, তাঁহার তো তেমন কোন ব্যারাম হয়ই না। এমন রোগ হয় যে, চারিদিকে সকলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, রাত জাগিতেছে, ডাক্তার-কবিরাজ মাথার কাছে বসিয়া আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে তো বুঝি হাঁ ব্যারাম, নতুবা কিছুই না! ইহা সঙ্গে সঙ্গেই ফলিয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রমাণ। এই কিছু দিন হইল, একটা খুব বড় রকম ঝড় হইয়া গেল। ইহার দিন দুই আগে গুরুদেব বলিতেছিলেন 'এখন আর আগের মত ঝড় হয় না। সে-সব ঝড় গেল কোথায়? মনে আছে, কলিকাতায় আছি। এক ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। সকলে ছিলাম তেতালায়। নামিয়া দোতালায় আসিলাম। মাঝের ঘরের একখানা কবাট ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে ভীষণ কাণ্ড। সেই সব ছিল ঝড়। এখন আর তেমন হয় না।' এই কথার দুই দিন পরে ঐ ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রমাণ। গুরুদেব সেদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাসায় বাগানবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গল্পগুজব হইতেছিল। গুরুদেব বলিতে-ছিলেন, 'আজকাল ডাকাতি হয় না। যদি হয় তো খুব মজা করিয়া দেখা যায়।' ঠিক ঐ দিনই রাত্রে ঐ বাসাতেই ডাকাতি হইয়াছিল। গুরুদেবের পাশেরই ঘরে প্রশান্তবাবু ছিলেন। তাঁহাকে বেশ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

নিজের মৃত্যুর পূর্বেই লোকসমূহের গুজবজনিত শোক জানা

গুরুদেবের সহিত কথা চলিতেছে। তাঁহার ঐ অসুখেরই বিষয়ে বলিতেছিলাম। ঐ সময়ে তাঁহার ব্যারামে দেশ-বিদেশে এত উদ্বেগ হইয়াছিল যে, কয়েক হাজার চিঠি ও তার শান্তিনিকেতন ডাকঘরে সহসা বাড়িয়া উঠে।

এজন্ত কর্তৃপক্ষকে জন দুই অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাই অবলম্বন করিয়া গুরুদেবকে বলিলাম, 'আপনার বস্তুত অভাব হইলে লোকের মনের ভাব কেমন হইবে তাহা আপনি জানিয়া লইলেন!' গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, 'মরিলে অনেকের জন্ত এরূপ হয়, কিন্তু ইহা মনে করিবার সুযোগ অনেকের হয় না, আমার সে সুযোগটা হইয়াছে।'

যমের ঝুঁটিধরা

ঐ গুরুতর ব্যারামে গুরুদেবকে নিজের লম্বাচুলকে অনেকটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন 'যম আসিয়া ঝুঁটিটা ধরিয়াছিল, অন্তদিকে ডাক্তারেরা আসিয়া দেহটা ধরিয়া বিপরীত দিকে টানিতেছিলেন। ফলে যমের হাতে ঝুঁটিটা থাকিয়া গেল, ডাক্তারেরা দেহটা টানিয়া রাখিলেন।'

কাঁটা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

সুলতার সহিত বিকাশের আলাপের আরম্ভটা এইরূপ: দ্বিপ্রহরের গুরুভোজনের পর বিকাশ রাত্রির জাগরণটা দিবা-নিদ্রায় দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু নূতন জামাতাকে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। মাত্র এই কয়েক দিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। শ্যালক, শ্যালিকা প্রভৃতি মধুর সম্পর্কীয়দিগের নিকট এখনও সে পুরাতন হইয়া যায় নাই। আহারান্তে সে তাহার জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষে আসিবার পূর্ব্বেই বালক-বালিকা ও কিশোরীর দল আসিয়া সেখানে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বিকাশ মনের বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কক্ষ ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বাঙালীর গৃহে জামাতা নামক জীবটির উপর যাহাদের একটা বিশেষ অধিকার বহুকাল ধরিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে তাহারা এত সহজে ভুলিবার পাত্রপাত্রী নয়। বিকাশকে ভালরূপে জ্বালাতন না করিয়া কেহ চলিয়া যাইতে সম্মত হইল না।

ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় বাহিরে তাসের আড্ডায় গিয়া বসিবে কিনা, ইহাই যখন বিকাশ ভাবিতেছে তখন সৌভাগ্যক্রমে শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া সকলকে কক্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া চলিয়া গেলেন। বিকাশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় দেহ এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল। ঘুম কিন্তু আসিল না। একটা পরিচিত পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইবার প্রত্যাশায় কান দুটি খাড়া হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে মৃদু পদধ্বনি কানে আসিতেই বিকাশ চোখ দুটিকে ভালরূপে বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। কিন্তু প্রত্যাশিত স্পর্শ না পাইয়া বাধ্য হইয়াই যখন চোখ খুলিল তখন দেখিল, কে একটি বালিকা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া তাহার শয্যার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে।

বিকাশ ভাবিল, কেহ বোধ হয় কোন শ্যালিকাকে বধূ সাজাইয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া মজা দেখিতেছে। মৃদু হাসিয়া তাই সে কহিল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এসো আমার কাছে বসবে।

বালিকা সে আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। বিকাশ কহিল, না আসবে ত ঘোমটাটা খোল। দেখি কেমন সুন্দর মুখখানি তোমার।

বালিকা তথাপি কোন কথা বলিল না দেখিয়া বিকাশ উঠিয়া বসিল, শয্যার কিনারে সরিয়া আসিয়া বালিকার ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুব সুন্দর একখানি মুখ, ফুটফুটে গায়ের রং, মাথায় এক রাশি কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, সুশ্রী ভ্রূর নীচে টানা টানা দুটি চোখ। প্রথম দর্শনেই বিকাশ মুগ্ধ হইয়া গেল। এত দিনের মধ্যে এই সুশ্রী বালিকাটি কেন যে চোখে পড়ে নাই, তাহা ভাবিয়া সে বিস্মিত হইল।

ঘোমটা খুলিয়া দিতেই বালিকার মুখে হাসি ফুটিল। বিকাশ কহিল, এস খুকী, বসবে। কি নাম তোমার?

বালিকা কহিল, আমি সুলতা। তোমার শাশুড়ী।

বিকাশ কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, ও, তুমি আমার শাশুড়ী! তাই বুঝি ঘোমটা দিয়েছিলে? কিন্তু জামাইয়ের কাছে কি এতটা ঘোমটা দিতে হয়?

সুলতা কহিল, তুমি ভাল জামাই। তোমার সামনে একটু ঘোমটা দিব।

নেপথ্যে থাকিয়া যাহারা আলাপ শুনিতেছিল, তাহারা এইবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুলতা লজ্জিত হইয়া দৌড়াইয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

বিকাশের স্ত্রী প্রমীলা আসিয়া বলিল, সুলতা সম্পর্কে আমার পিসী হয়। বাবার দূরসম্পর্কের এক মামার মেয়ে।

ইহার পরের বার সুলতা যখন আসিল তখন তাহার ঘোমটার মাত্রাটা অনেকখানি কমিয়াছে। পাতলা ঠোঁট দুটি

পান খাইয়া লাল টুকটুকে করিয়া বিকাশের পাশে বসিয়া কহিল, জামাই, তুমি রূপকথা জান ?

বিকাশ হাসিয়া কহিল, না, আমি জানি না। তুমি জান ?

সুলতা কহিল, জানি। কিন্তু দিনে ত বলতে নেই। রাতে বলব। দিনে বললে রাতকাণা হয়।

তাই নাকি ? বেশ রাতেই এসো তা হলে—

সুলতা বিকাশকে কি চোখে দেখিল, সে-ই জানে। বিকাশ যখনই একা থাকে তখনই সে তাহার নিকট আসিয়া হাজির হয়। বিকাশের টেবিলে নানা ধরণের মাসিক পত্রিকা থাকে। সুলতার প্রত্যহ সব পত্রিকার ছবিগুলি দেখা চাই। বিকাশের ভস্মাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরা ও সিগারেটের খালি বাক্সগুলির উপর তাহার অপরিসীম লোভ। সিগারেটের বাক্সের মধ্যে সিগারেটের টুকরাগুলি পুরিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেয়, বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

প্রবীলা হাসিয়া বলে, কি ভাগ্যি তুই আছিস্, তাই আর ঘর নোংরা হতে পায় না।

সুলতা ধমক দিয়া বলে, পিসীমার সামনে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে নেই। তুই এখন যা এখান থেকে—

প্রবীলা মুচ্‌কি হাসিয়া বিকাশের দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সুখে পিসীমার আদেশ পালন করে।

সুলতা নিশ্চিন্ত মনে ছবি দেখে, বিকাশকে নানা শিশু-সুলভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। বিকাশ কোনটার উত্তর দেয়, কোনটার উত্তর উহার নিকট হইতেই জানিয়া লয়।

সুলতা গম্ভীরভাবে বলে, জানো জামাই, মানুষ মরবার পর কোথায় যায় ? তাহার পর নিজেই তাহার উত্তর দেয়, "জানো না বুঝি ? আকাশে তারা দেখেছ ত ? মানুষ মরলে তারা হয়। আমার বাবা তারা হয়ে আছেন। আমি রোজ দেখি ঐ তারাকে। আমি যখন মরব তখন আমিও তারা হব, বাবার কাছটিতে গিয়ে উঠব—"

মানুষের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধেও তাহার নিজস্ব মত আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিকাশ সুলতার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তাহার জানা এমন কোনও বিষয় নাই যাহা সে বিকাশকে না জানাইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিকের সমস্ত খুঁটি-নাটি বিবরণ বিকাশের জানা হইয়া গিয়াছে।

প্রবীলা বলে, সুলতা তোমার কাছেই এমন শান্তশিষ্টটি থাকে। বাইরে ওর দুরন্তপনার অন্ত নাই। ওর জ্বালায় পুকুর-ঘাটে কারও তেলের বাটি রাখবার জো নাই। যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছ অমনি সে বাটিসুদ্ধ তেল জলের দিকে ছুঁড়ে দেবে। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে কোলে নিতে যাবে, আদর করবে, চুমো খাবে ; কিন্তু একটু পরেই দেখবে ছেলের গাল কামড়ে। ছেলে যদি কেঁদে উঠেছে ত অম্‌নি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ছুটে পালাবে।

সুলতার এই সব দুষ্টামির কথা শুনিতে বিকাশের খুবই ভাল লাগে। বলে, "দুষ্টুমি আর চাঞ্চল্য ছেলেমেয়েদের অলঙ্কার। তোমার যদি মেয়ে হয় তা হলে যেন—" প্রবীলা বিকাশকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

সেবার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় বিকাশ সুলতার জন্য কয়েকটি খেলনা ও কয়েকখানা ছবির বই লইয়া গেল। সুলতা বই ও খেলনা পাইয়া মহা খুশী। বলিল, জামাই, তুমি রোজ এখানে আস না কেন ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, রোজ আসতে চাইলে যে এরা থাকতে দেবে না।

সুলতা গম্ভীরভাবে বলিল, জামাই তুমি রোজ এসো। এরা থাকতে না দেয় আমাদের ঘরে গিয়ে থেকো।

যত দিন যায়, তত বয়স বাড়ে ; বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সংসাররূপ জালে জড়াইয়া পড়িতে হয়। বিকাশের কলেজ-জীবন শেষ হইল, কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল এবং তাহাও ধীরে ধীরে নূতনত্বকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া চলিল। প্রবীলা এখন নববধূত্ব হইতে জননীর মহিমময় পদে উন্নীত হইয়াছে ; দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং সাংসারিক নানা কাজ লইয়া এখন সে সব সময় বিব্রত থাকে। বিকাশের পৃথিবী এখন আপিসের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দশটা পাঁচটা আপিস করিয়াও নিস্তার নাই ; গৃহে ফিরিয়াও আপিসের অসম্পূর্ণ কাজ সারিয়া রাখিতে হয়। ছেলেমেয়েরা পিতার একটু আদরের প্রত্যাশায় পাশে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের আদর করিবার মত অবসর বিকাশের থাকে না। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিলে, নিকটে দাপা-দাপি করিলে তাহার কাজের ব্যাঘাত হয়, সে বিরক্তি বোধ করে ; প্রবীলা বলে, ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি মাতামাতি না করে কি তোমার মত মুখ গম্ভীর করে আপিসের হিসেব দেখবে ? সুলতার মত মেয়ে চেয়েছিলে, এখন মেয়ে দুষ্টুমি করলে এত চটলে চলবে কেন ?

সুলতার কথা কিন্তু বিকাশ ভোলে নাই। যদিও এখন শ্বশুরবাড়ী কদাচিৎ যাওয়া ঘটিয়া উঠে, তা সত্ত্বেও যখনই যায় তখনই সুলতা তাহার হাস্যমুখ লইয়া বিকাশের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এখন সে আর বালিকা নাই, যৌবনের আভাস তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। বিকাশের নিকট কিন্তু তাহার লজ্জা নাই। মাথার সামান্য একটু ঘোমটা টানিয়া সে বিকাশের নিকট আসিয়া পূর্ব্বের মত নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। তবে এখন পত্রিকার ছবি অপেক্ষা গল্প-কবিতার প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, ভস্মাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরার প্রতি তাহার আর আকর্ষণ নাই।

সেদিন আপিস হইতে ফিরিয়া বিকাশ বৈকালিক জলযোগে মনোনিবেশ করিয়াছে এমন সময় প্রবীণা কহিল, বাবা চিঠি দিয়েছেন। খোকার বিয়ে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত কর।

বিকাশ কহিল, "একঘেয়ে কাজ করতে করতে আমারও বিরক্তি ধরে গেছে। ছুটিও অনেক পাওনা আছে। দেখি কি হয়।"

ছুটি মিলিল এবং এক দিন বিকাশ সপরিবারে শ্বশুরালয়ে আসিয়া হাজির হইল। বহু দিন আসা-যাওয়া না থাকায় সবই যেন কেমন একটু অপরিচিত অপরিচিত মনে হইতে লাগিল। যাহারা ছোট ছিল তাহারা বড় হইয়াছে, যাহারা বড় ছিল তাহারা আরও বড় হইয়াছে। অবিবাহিতদের বিবাহ হইয়াছে, মেয়েদের অনেকেই সন্তানের জননী হইয়াছে। সুলতাকে বিকাশ যে আর আগের মতটি দেখিবে না তাহা বুঝিতে পারিল। হয়ত তাহার বিবাহ হইয়াছে, হয়ত সে এখন শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্রই তাহার অনুমান মিথ্যা হইল। শুনিতে পাইল, সুলতা বিকাশের শাশুড়ীকে কহিতেছে, কৈ গো বৌদি, জামাই কি এসেছে দাও।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেছেন, জামাই কি এসেছে, না এসেছে, তা জামাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্—

"তাই যাই।" বলিয়া সে বিকাশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাল আছ তো জামাই?"

বিকাশ চোখ তুলিয়া সুলতার দিকে তাকাইয়াই চোখ নামাইয়া লইল। এই যুবতীর সহিত নিঃসংকোচে কথা বলিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

সুলতা কহিল, তোমাকে এবার খুব রোগা দেখাচ্ছে। শরীরের যত্ন নিচ্ছ না বুঝি?

বিকাশ চাহিয়া দেখিল সুলতার সীমন্তে সিন্দুর নাই। বুঝিল, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। কহিল, শরীর খারাপ হয়েছে বলেই একেবারে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। ভাল করে শরীর সারাব, তবে যাব।

সুলতা আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল, এক মাস থাকবে। খুব আমোদে দিনগুলো কাটানো যাবে তা হলে।

সুলতার নিঃসংকোচ ব্যবহারে বিকাশেরও মনের সংকোচ কাটিয়া গেল। ইহার পর পূর্ব্বের মতই উভয়ের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। সুলতা গ্রামের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ তাহার হয় নাই। কিন্তু বিকাশ তাহার সহিত কথা বলিয়া বুঝিল, পড়াশুনার চর্চা এখনও সে ছাড়ে নাই এবং সে চর্চাও নেহাত নিয়মের নয়।

দিনগুলি সত্যই আনন্দে কাটিতেছিল। নিত্য কর্মটার সময় আপিস যাইবার তাড়া নাই, যখন ইচ্ছা শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারা যায়, স্নান-আহারের সময় কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না মানিলেও চলে। বিশেষ করিয়া সুলতার আনন্দোজ্জ্বল সাহচর্য্য বিকাশের অবসর-দিনগুলি অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিতেছিল।

এক দিন সুলতা হঠাৎ বিকাশকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা জামাই, মেয়েমানুষের বিয়ে না করলে কি চলতেই পারে না?

বিকাশ এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুলতাদের সাংসারিক অবস্থার কথা তাহার অজানা নাই। গৃহে বিধবা মা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও অভিভাবক নাই। আর্থিক অবস্থাও এমন সচ্ছল নহে যে, বিবাহযোগ্যা এই তরুণীকে সংপাত্রে সমর্পণ করা যাইতে পারে। রূপ এবং রূপার পরিপূর্ণ সমন্বয় না হইলে আজিও আমাদের দেশে কন্যা সংপাত্রস্থ করা সহজ ব্যাপার নয়। সুলতার রূপ আছে, গুণও আছে, কিন্তু গৃহে রূপার অভাব। কাজেই আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার সহিত বিকাশের সামাজিক সম্পর্কটা এমনি ধরণের যে, এইরূপ বিষয় লইয়া তাহার সহিত আলোচনা করিতেও তাহার বাধ-বাধ ঠেকে। তবু সে বলিল, মেয়েদের বিয়ে না করলে যে চলে না, তা নয়। তবে আজীবন কুমারী হয়ে থাকতে গেলেও তার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের, আত্মনির্ভরশীল হবার মত বিশেষ শিক্ষার দরকার।

সুলতা ম্লান মুখে বলিল, কিন্তু সে পারিপার্শ্বিক আমি পাই কোথায়, আর সে শিক্ষাই বা আমায় দেয় কে?

বিকাশ সে কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। নীরবে সুলতার চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে এতদিন ধরিয়া যে আনন্দ-লোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল আজ সর্ব্বপ্রথম তাহার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বেদনার আবির্ভাব হইল। সুলতা অল্পক্ষণ পরে আবার কহিল, জামাই, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমায় কোনও কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারো? দেশের কাজে কিংবা রোগীর সেবায়?

এরকম কোনও কাজের সন্ধানও বিকাশের জানা ছিল না। তাই সে এবারও চুপ করিয়া রহিল।...

রাত্রে প্রবীণা কহিল, "দেখ, তোমাকে বলি বলি করেও বলতে পারি নি। কিন্তু আর না বলেও থাকতে পারছি না। সুলতা সম্পর্কে আমাদের গুরুজন হলেও সম্পর্কটা খুব নিকট নয়। ওর সঙ্গে এত মাখামাখি করলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে।"

বিকাশ কথাটা অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে লইয়া মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু নিকট-সম্পর্কীয়া না হইলেও শেষকালে সুলতার সমস্ত ভার প্রবীণার পিতাকেই গ্রহণ করিতে হইল। সুলতার মা সামান্য কিছু জমিজমা যাহা ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া এক

বিপত্নীক বৃদ্ধের হাতে সুলতাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বামীভাগ্য ভাল ছিল না। তাই বৎসরখানেকই বিধবা হইয়া সে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং পর বৎসরই মাকে হারাইয়া প্রমীলার পিতৃ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সুলতার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিকাশ চিঠিপত্রের মারফত অবগত হইতেছিল। তাহার এই পরের গৃহে আশ্রয় লওয়া রূপ দুর্ভাগ্যটার জন্যই বিকাশ সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হইল।

ইতিমধ্যে বিকাশের ক্ষুদ্র সংসারে আরও দুটি নূতন অভ্যাগতের শুভাগমন হইয়াছে এবং সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়া প্রমীলা নিজের শরীরের উপর লক্ষ্য রাখিবার মত সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কন্যার অসুস্থতার সংবাদে উৎকণ্ঠিত পিতা কন্যা-জামাতাকে তাঁহার গৃহে যাইয়া কিছুকাল কাটাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পাহাড়-ঘেরা পল্লীগ্রামটির স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাতি আছে। বিকাশ আর একবার দীর্ঘদিনের ছুটি লইয়া সপরিবারে শ্বশুরালয়ে গিয়া হাজির হইল।

এবারের মত এমন অন্তরঙ্গভাবে বিকাশ আর কখনও সুলতাকে পায় নাই। সুলতা এখন আর পরের ঘরের মেয়ে নয়, প্রমীলাদের সংসারেরই একজন। তাহার কর্মদক্ষতায়, সেবানিপুণতায় বিকাশ মুগ্ধ হইয়া গেল। সুলতার সেবার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই প্রমীলার পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তিমআভা দেখা দিল, অস্থি-চর্মসার দেহে পুনরায় লাবণ্যের সঞ্চার হইতে লাগিল।

সুলতা না থাকিলে ছোট ছেলে দুটিকে সামলানো দায় হইয়া উঠিত। ছেলের সঙ্গে ছেলেমানুষ সাজিতে, রোগীর সঙ্গে রোগী সাজিতে, অপরের জন্য সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে সে কোথায় শিখিল, তাহা ভাবিয়া বিকাশ বিস্মিত হইল। বলিল, "এত খাটুনি খেটেও তোমার মুখে যে কি করে হাসি লেগে থাকে তা ভেবে আমি অবাক হই। তোমার এত খাটবারই কি দরকার? ঘরে ত লোকজনের অভাব নেই।"

সুলতা হাসিয়া কহিল, "মেয়েছেলে হয়ে যখন জন্মেছি তখন সুযোগ পেয়েও মেয়েদের করণীয় কাজগুলো করতে না পারাটাই দুঃখের বিষয়। নিজের লোকের জন্য মেয়েছেলের খেটে যে কত আনন্দ, তা তোমরা পুরুষেরা বুঝে উঠতে পারবে না।"

বিকাশও হাসিল। কহিল, "তা না বুঝি; কিন্তু এটুকু বুঝি যে তুমি তোমার শরীরের উপর আদৌ লক্ষ্য রাখছ না। আরশীতে নিজের মুখখানি একবার দেখো, তা হলেই আমার কথা বুঝতে পারবে।"

অকস্মাৎ সুলতার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল। সে বিকাশের টেবিলে কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল। হৃদয়ের কোন এক উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে হাতের কাজ সমাপ্ত না করিয়াই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আমি থাকব কি করে? প্রমীলার শরীরও তো এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে কেমন হয়?

বিকাশ উৎসাহিত হইয়া কহিল, খুব ভাল হয়। শ্বশুর মশায়ের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।

বিকাশকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইল না। শ্বশুর মহাশয়ই বলিলেন যে, সুলতা তাহাদের সঙ্গে যাক। আরও কিছুদিন সাবধানে না থাকিলে প্রমীলার স্বাস্থ্য পুনরায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সুলতার হৃদয় আনন্দ-উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। যাত্রার আয়োজন করিতে করিতে তাহার মন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের স্বল্পশিক্ষিতা বিধবা সে। সাংসারিক অভিজ্ঞতাও যে তাহার খুব বেশী হইয়াছে, তাহা নহে। নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সচেতনতাও তাহার আসে নাই। তাহার এই আনন্দ যে কোনও অসামাজিক বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই।...

কিন্তু যাহার দৈহিক দুর্বলতা আসিয়াছে, নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, নিজের উপর আস্থা হারাইতে তাহার বেশী দেরি হয় না এবং অসংযত মুহূর্তে যাহা সে বলিয়া ফেলে তাহাই তাহার অবচেতন মনের যথার্থ পরিচয়। একদিন হঠাৎ প্রমীলার অবচেতন মনের গহ্বরে সঞ্চিত অমূলক সন্দেহের পরিচয় পাইয়া বিকাশের সমস্ত আনন্দ অবলুপ্ত হইয়া গেল।

প্রমীলা বিকাশকে বলিতেছিল, তুমি যে কত দূর অধঃপাতে গেছ, তা বুঝবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তোমার লোপ পেয়ে গেছে। এত দিন দূরে ছিল, এবার কাছে পাবে। আমারও এই শরীর, কবে মরি তার ঠিক নেই। নিজের জন্য ভাবছি না। যত আমার দুশ্চিন্তা ছেলেমেয়েদের জন্য।

জিনিসপত্র গুছান সম্বন্ধে কি একটা পরামর্শের জন্য সুলতা প্রমীলার কাছে আসিতেছিল। স্বামী-স্ত্রীর আলাপ যখন তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কি সম্বন্ধে আলাপ চলিতেছে, তাহা যখন সে উপলব্ধি করিতে পারিল, তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহার আর ফিরিয়া যাইবার পথ ছিল না।

প্রমীলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল। সে সুলতার

প্রবেশ লক্ষ্য করে নাই। বিকাশ লক্ষ্য করিলেও প্রমীলাকে সতর্ক করিয়া দিবার সুযোগ পাইল না।

স্বামীর নীরবতায় প্রমীলার কেমন যেন সন্দেহ হইল। সে পিছন ফিরিয়া সুলতাকে দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া মুখ নত করিল। নিজের অসংযত উক্তির অন্তর্দুঃখে ক্ষোভে, লজ্জায়, অনুশোচনায় তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। সুলতার হাত দুটি ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

সুলতা প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির মত একই স্থানে একই রকম ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। অসাধারণ মনের জোরে সে নিজেকে সামলাইয়া রাখিতেছিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। বিকাশ একটা মাসিকের পাতা উল্টাইতে লাগিল, প্রমীলা মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল, সুলতা তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে সুলতাই প্রথম কথা বলিল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া সে ধীর কণ্ঠে বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল— জামাই, এর জন্য তুমি দুঃখ করো না, বা পমীর উপর রাগ করো না। সে যা বলে ফেলেছে হয়তো তা বলবার তার ইচ্ছা ছিল না। হয়ত এক বলতে আর বলে ফেলেছে। জিনিসপত্র আমি সব গুছিয়ে ফেলেছি। পমী, বাকিগুলো তুই দেখে শুনে নে। আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে··· বলিয়া সে ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া টলিতে টলিতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহার মূর্চ্ছিত দেহ শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

যাত্রার সময় যখন প্রমীলার মা শুনিলেন যে, সুলতা যাইবে না তখন তিনি গর্জ্জাইতে লাগিলেন, কহিলেন, পর কি কখনও আপন হয়, না পরের সুখ দুঃখ বুঝে? ক'দিন ধরে কি লোক দেখানো দরদটাই না দেখালে। জামাই বলতে অজ্ঞান, ছেলে-মেয়েগুলো কাছে না থাকলে মুখে ভাত রোচে না, পমীর সেবা করতে না পেলে রাতে ঘুম হয় না। আর যেই সত্যিকারের দরকার হ'ল অমনি বলে বসল, আমি যাব না। অমন মেয়েকে মুখে ঝাঁটা মেরে ঘর থেকে বার করতে হয়—

প্রমীলার বাবা মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু সুলতার এই অবাধ্যতায় তিনিও যে খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৪

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা বণ্টনের একটা মূলনীতি স্থির করিয়া না দেন ততদিন পর্য্যন্ত দেশমুখ-বণ্টননীতি প্রচলিত থাকিবে। দেশমুখ-বণ্টননীতি অন্যান্য মূল ভিত্তির মধ্যে প্রদেশগুলির জনসংখ্যার অনুপাতের উপর স্থির করা হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইহার মূল ভিত্তি প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলের বসতির হারের অনুপাতের উপর ধার্য্য করিলে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হইত। কারণ খাদ্যোৎপাদনের, শিল্প-প্রসারণের এবং প্রদেশবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘনবসতি খুবই প্রতিকূল। এই কারণে ঐ সব প্রদেশ-সরকারকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য অপর প্রদেশের তুলনায় বাৎসরিক অনেক বেশী পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা ভিন্ন বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও নানাবিধ কারণে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ফলে প্রদেশ-সরকারকে ইহার জন্য বহু অর্থব্যয়ের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন কিরূপ সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহা ইহার মানচিত্র দেখিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে। কংগ্রেস-নেতারা বহুকাল পূর্ব্বে ভাষার ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পরি-বর্ত্তনের ন্যায়সঙ্গত দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন; ইদানীং পণ্ডিত নেহরু ও অপরাপর কংগ্রেস-নেতারা ঐ সকল প্রতি-শ্রুতি কার্য্যতঃ ভঙ্গ না করিলেও ক্রমে ক্রমে ইহার সঙ্গে এমন সব সর্ত্ত আরোপ করিতেছেন যাহার দরুন কখনও সে প্রতি-শ্রুতি পালন করা সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙালী জাতি যে কেবল স্বাস্থ্যের দিক হইতে ক্ষয়িষ্ণু তাহা নহে। এই প্রদেশকে সকল দিক দিয়াই ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইদানীং প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল বৃহত্তর বঙ্গের আশা-ভরসা একরূপ কল্পনা-লোকে পাঠাইয়াছেন বলিলেও চলে। তাঁহার মতে কোন প্রদেশের

সীমানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতিবেশী উভয় প্রদেশেরই মোটামুটি সম্মতি থাকা দরকার। বাস্তব ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থা কখনও সম্ভব হইতে পারে কি? অনেকে মনে করেন যে, এইরূপ ধারণা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যদি কেহ প্রস্তাব করেন, হিন্দু কোড বিলের বিবাহ-বিচ্ছেদ ধারাতে এমন একটি নূতন সংজ্ঞা যোগ করা উচিত যে উভয় পক্ষ মোটামুটি সম্মতি না দিলে কোন আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবে না, তাহা হইলে এইরূপ প্রস্তাবকে সকলে নিশ্চয়ই প্রলাপোক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন এবং নেহরুজীও যে তাহাই বলিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রদেশের আয়তন ও সীমানা, ভৌগোলিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, বসতির হার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যত দূর সম্ভব সমতা রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন না করা হইবে তত দিন পর্য্যন্ত কোন অর্থ কমিশনই এই উপ-মহাদেশকে স্থায়ী ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ ইহা ব্যতিরেকে প্রত্যেক প্রদেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত অবস্থার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার আছে কি না তাহা আমার সঠিক জানা নাই, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শুনিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনের বিষয় যে সমস্ত স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন তাহাতে একমাত্র ঘনবসতির জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের খরচ বেশী হয় এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঘনবসতির জন্য শিল্প-সম্প্রসারণ, খাদ্যোৎপাদন ও নানা বিষয়ের অসুবিধার কারণে প্রদেশবাসীর এবং প্রাদেশিক তহবিলের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করেন নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও বিশদভাবে তাঁহাদের দাবি অর্থ কমিশনের নিকট দাখিল করা কর্ত্তব্য।

নিম্নে ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট অনুসারে কয়েকটি প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দুরবস্থা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এই প্রদেশ-সরকার যদি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে না পায় তাহা হইলে কোন বিভাগেরই উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না এবং প্রদেশ ও প্রদেশবাসীরা দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চলিতে থাকিবে।

বাজেট ১৯৫১-৫২

(হাজার অনুপাতে)

প্রদেশের নাম	বাৎসরিক আয়	বাৎসরিক ব্যয়	বাড়্‌তি	ঘাট্‌তি
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪,০৪,৫৪	৩৮,৮০,৭৪	—	৪,৭৬,২০
বোম্বাই	৬০,৬৪,২৫*	৬০,৫৯,৭৩	৪,৫২	—
মাদ্রাজ	৫৯,৬২,৫০	৬০,২৯,৭৮	—	৬৭,২৮
উত্তর প্রদেশ	৬১,২৬,০০	৬১,৫১,০০	—	২৫,০০
পূর্ব্ব-পঞ্জাব	১৬,৬৩,৪১	১৬,৮৪,৩৮	—	২০,৯৭
বিহার	৩৫,৯৬,৭৩†	৩১,১২,৯২	৪,৮৩,৮১	—
উড়িষ্যা	১০,৫৬,৩২	১১,৫০,৮১	—	৯৪,৪৯
মধ্যপ্রদেশ	২০,৪৪,৫০‡	২০,৩০,৬০	১৩,৯০	—
আসাম	৯,৬২,৪০	১০,৬০,২৪	—	৯৭,৮৪

সম্প্রতি প্রদেশ-বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী কিরূপ অসহায় অবস্থায় উপনীত তাহা খুবই পরিস্ফুট হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এত অধিকসংখ্যায় অপর প্রদেশবাসী আসিয়া শ্রমশিল্পে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে যে, বাংলায় রাজ্য-বিধান ও লোকসভায় যাঁহারা মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেক ক্ষেত্রে অপর প্রদেশবাসীর ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে ও হইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই প্রদেশের রাজ্য-বিধানসভায় বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ অপর প্রদেশবাসীর স্বনামী ও বেনামী সভ্যদের ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমস্ত শহরে ও শিল্পাঞ্চলে অপর প্রদেশবাসীর সংখ্যাধিক্য কেবলমাত্র সেই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দা নিজ প্রদেশের লোকেদের প্রভাবান্বিত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর, উত্তর প্রদেশের পণ্ডিত পন্থের, উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মহতাবের, বিহারের শ্রীযুক্ত জগজীবনরামের পরিভ্রমণ-সূচী স্থির হইয়াছিল। যে সমস্ত জেলায় এবং যে সমস্ত মহকুমায় ভিন্ন প্রদেশবাসীর সংখ্যা কম সেই সমস্ত অঞ্চলে এই সকল নেতা কেন ভ্রমণ-সূচীভুক্ত করেন নাই ইহা ভাবিবার কথা। এই সমস্ত দেশনেতাই আবার প্রাদেশিকতার গন্ধে বিচলিত হইয়া উঠেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তাঁহারা নিজেরাই কতদূর প্রাদেশিকতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

* মজুত আমানত টাকা হইতে ২,০০,০০ লইয়াছে।
† মজুত আমানত টাকা হইতে ১১,০০,০০ লইয়াছে।
‡ মজুত আমানত টাকা হইতে ১৬,০০ লইয়াছে।

সাধারণতঃ কোন প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে সেই প্রদেশে নানারূপ বৃহত্তর শিল্পের সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিল্প-সম্প্রসারণ বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙালীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে কিনা তাহা বিশেষ ভাবিবার কথা, কেননা নানা কারণে ইহা বহু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। আমার মনে হয় সর্ব্বাগ্রে কুটিরশিল্পের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান করিতে পারিলে বাঙালীকে তাহার আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। যতই নূতন নূতন বৃহৎ বৃহৎ শিল্প পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই অধিকতর সংখ্যায় অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা এই প্রদেশে আসিয়া বসতির চাপ ও সেই পরিমাণে খাদ্যাভাব আরও বাড়াইয়া তুলিবে। যখন কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের জন্যই এই প্রদেশে সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও রাঁচি হইতে বহু শ্রমিক আনিতে হয় তখন উপযুক্ত বাঙালী শ্রমিকের অভাবে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার জন্য অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিক লইয়া আসা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত বাঙালী যৌথ কোম্পানিতে অংশ (share) কিনিয়া বহু কোটি টাকা হারাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা আর অর্থ বিনিয়োগ করিবেন কিনা সন্দেহ। বিত্তশালী বাঙালীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ডাইরেক্টর হইবার মত অংশ কিনিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে কতিপয় বাঙালী কেরাণী ও কয়েকটি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে মাত্র। ভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকগণ তাহাদের উপার্জ্জিত টাকা স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইয়া দিবে এবং অপর প্রদেশবাসী যাঁহারা ঐ সমস্ত কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ করিবেন তাঁহারা লভ্যাংশ ভোগ করিবেন। ইহাতে বাংলা ও বাঙালীর লাভ কোথায়? সরকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬·৪০ কোটি টাকা আয়কর আদায় হইয়াছিল। কিন্তু এই আয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দেয় অংশ কতটুকু তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাদের অংশ বেশী নহে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন কোন প্রদেশের কত শ্রমিক কার্য্যে লিপ্ত আছে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যখন এই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে তখন সঠিক বুঝা যাইবে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসী শ্রমিক ও কার্য্যরত ব্যক্তিদের স্থান কতটুকু।

গত ৮ই ডিসেম্বর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্যামনগর ষ্টেশনের নিকট উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মফস্বলবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং যাহাতে শহর ছাড়িয়া লোকে মফস্বলে বাস করিতে আগ্রহান্বিত হয় তাহার জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মফস্বলে বাস করিয়া লোকে কি ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখি, উপস্থিত কয়েকটি ছোট ছোট শহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। যদি কেবলমাত্র ঐ শহরগুলিতেই বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত শহরের আশপাশের কৃষিক্ষেত্রসমূহ কি করিয়া উহার সুবিধা পাইবে এবং কুটীরশিল্পই বা কিরূপে গড়িয়া উঠিবে? যদি ছোট শহরগুলির ভিতরেই কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠে তাহা হইলে অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া উঠা দূরের কথা বরং কমিতেই থাকিবে। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রাদেশিক ও জেলার রাস্তাগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা দরকার যাহাতে শহরের বাহিরে ঐ সমস্ত রাস্তার ধারে কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হয়। আমি জানি উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার অন্তর্ব্বর্ত্তী কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগের উপদেশানুসারে পরিচালিত একটি সুপরিচিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য দরখাস্ত করিয়া এখনও তাহা পায় নাই, যদিও সেই কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ কোন একটি বাগানবাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি নিকটবর্ত্তী একটি বাস্তুহারা কলোনীর অধিবাসীদের দরখাস্ত—যতদূর জানা যায়, এখনও মঞ্জুর হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে কুটিরশিল্প—পূর্ব্বে যাহা ছিল এবং এখনও আছে সেগুলির পুনরুদ্ধার ও সুপরিচালনার ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙালী যুবক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের উপযোগী আরও অনেক প্রকার কুটিরশিল্প এই প্রদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং সেগুলির জন্য অপর প্রদেশের শ্রমিকের আমদানী আবশ্যক হইবে না। তাঁতশিল্পের ন্যায় গৃহস্থঘরের ছেলেমেয়েরাও এই সমস্ত কুটীরশিল্প প্রসারে সাহায্য করিতে পারে।

যেরূপ নানা প্রকার ঘড়ি তৈরি করিবার ছোট ছোট কারখানা দেখিয়াছি, মনে হয় তদনুরূপ ছোট কারখানা পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের বিশেষ উপযোগী হইবে। এই সব কুটীরশিল্প শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইলে বিশেষ ফল হইবে কি না সন্দেহ, কারণ ইহা বহু সময় ও ব্যয়সাধ্য। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চীন, জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি এবং অন্যান্য কুটীরশিল্পপ্রধান দেশগুলি হইতে কুটীরশিল্পে সুদক্ষ ব্যক্তিদের আনাইয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট গ্রামে ও শহরে পাঠাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এই প্রদেশবাসীর প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে আশা করা যায়। যাহাতে কুটীরশিল্পগুলি সমবায় পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে এবং সেইগুলি অর্থাভাবে এবং মহাজনের ঋণের চাপে ধ্বংস না হইয়া যায় তাহার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় প্রদেশ-সরকারের দ্বারা পরিচালিত একটি করিয়া সমবায় লগ্নী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থাভাবে ও মহাজনের ঋণের চাপে বহু কুটীরশিল্প হয় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে নতুবা মহাজনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ফলে লভ্যাংশ মহাজনেরাই ষোল আনা ভোগ করিতেছে। বহির্বাণিজ্যে, বৃহত্তর শিল্পে ও অপরাপর ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় তাহা পরে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

জন্ম—১৮৫২ খ্রীঃ, ডিসেম্বর মৃত্যু—১৯৩৬ খ্রীঃ, ৫ই ডিসেম্বর

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

রামমোহনের আবির্ভাবের কল্যাণপ্রদ ফল জাতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল ঊনবিংশতি শতকের শেষ দিক্ হইতে। তৎকালে বাংলাদেশের যে স্বল্প-সংখ্যক তরুণ সেই জ্যোতির্ময় অভ্যুদয়কে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। ভারতীয় জাতিগঠনে, বাংলার সামাজিক প্রগতিবিধানে এবং নির্ভীকতা ও সততার সহিত সাংবাদিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনে মিত্র মহাশয়ের দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার কর্ম্মজীবনের গতি ছিল বহুমুখী। দেশ, জাতি ও সমাজের হিতকর কার্য্য মাত্রই তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। এই সমুদয় কার্য্যকে তিনি ভগবানের প্রিয় কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন আধ্যাত্মিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি বলিতেন যে, কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা, সে ত মৃত্যু। অন্তিম শয্যায় শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যশখ্যাতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া, নিগ্রহ-নির্য্যাতনকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া এবং ভগবানে অবিচলিত ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া মিত্র মহাশয় আমৃত্যু দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাঘিল গ্রামে সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারে কৃষ্ণকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বাখরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার পিতা গুরুচরণ ছিলেন ধার্ম্মিক, পরোপকারী, আশ্রিতবৎসল ও সাহসী পুরুষ। এই সমুদয় সদ্গুণ কৃষ্ণকুমার তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইয়াছিলেন। গুরুচরণ ছিলেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী। দৈহিক বলের সঙ্গে তিনি মানসিক বলেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উপদ্রবে বাংলার চাষী-মজুর অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। টাঙ্গাইল অঞ্চলেও নদীর ধারে-ধারে অনেক 'নীলকুঠী' ছিল। তাঁহার নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী রামদেবপুরে মিঃ বেরি নামক একজন ইংরেজের 'নীলকুঠী' ছিল। সে বহু অসহায় লোকের ধানের ক্ষেতে জোর করিয়া নীলের চাষ করাইত এবং অনেক দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক-শ্রমজীবীকে বলপূর্ব্বক নীল-চাষের জন্য বেগার খাটাইত। বিপন্ন নিপীড়িত গ্রামবাসীরা গুরুচরণের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া বেরি সাহেবের কুঠী আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নীলকুঠীর শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গব ইহা জানিতে পারিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

গুরুচরণ নির্য্যাতিত চাষী-মজুরদিগকে লাঠি, বল্লম, রাম-দা, কোঁচ, সড়কি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বেরি সাহেবকে দিবালোকেই আক্রমণ করিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বারোহণে তাঁহার দলের লোককে পরিচালিত করেন। বেরী সাহেবও অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সদল-বলে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হইল। সাহেব মস্তকে লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেল। তাহার দলের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন

করিল। গুরুচরণের আদেশে উত্তেজিত জনতা সাহেবের ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া দিল। সেই দিন সন্ধ্যায় তাহাকে নৌকায় করিয়া যমুনার অপর পারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। একজন গ্রাম্য 'নেটিভ' তালুকদারের হস্তে এই ভাবে প্রহৃত হইয়া সাহেব আদালতে অভিযোগ আনিতে লজ্জা বোধ করিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে সেই অঞ্চল হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়। নিপীড়িত অসহায় দুর্ব্বল মানুষের জন্য বেদনা-বোধ এবং তাহাদের উদ্ধারার্থ বিপদের সম্মুখীন হইবার মত মহদ্‌গুণ ছিল গুরুচরণের বংশগত। কৃষ্ণকুমারের জীবনে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমারের বিদ্যার্থী-জীবন আরম্ভ হয় ময়মনসিংহ শহরের বঙ্গ বিদ্যালয়ে। এই শিক্ষায়তনে তৎকালে কোরানের বঙ্গানুবাদক, 'তাপসমালা' ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের স্বনামখ্যাত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন অন্যতম শিক্ষক। অপর একজন শিক্ষকও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া অপর স্থানীয় জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। সেই স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্ম। এই সকল আদর্শ শিক্ষাব্রতী তাঁহার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে ময়মনসিংহ শহরে একটি শাখা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সমাজের সভাদের সঙ্কল্প ছিল—"যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, কাজেও তাহাই করিব।" এই সঙ্কল্পবাণী কৃষ্ণকুমারের কিশোর-চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। তিনি পরম আগ্রহের সহিত উক্ত সমাজে যোগদান করিয়া সভাশ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের কর্ম্মধারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প-বাণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সেই সঙ্কল্প তিনি জীবনে কখনও ভঙ্গ করেন নাই।

কৃষ্ণকুমার ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া নিয়মিত ভাবে উপাসনায় যোগদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তখন এত অল্প বয়সে হিন্দু-পরিবারের কোন ছেলেকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার পিতার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করিবার জন্য তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দিলেন। দৃঢ়চিত্ত স্নেহশীল পিতা তাঁহাদের পরামর্শমত কাজ করিতে অসম্মতি জানাইলে তাঁহাকে একঘরে করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করা হয়। গুরুচরণ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি বরং পুত্রের সঙ্গে একঘরে হইয়াই থাকিবেন, এইরূপ তথাপি পুত্রকে বর্জ্জন করিবেন না।

ময়মনসিংহ শহরে বাসকালে কৃষ্ণকুমার এমন অনেক সঙ্গী পাইলেন—যাঁহাদের সহিত এক দিকে যেমন সদালোচনা হইত, তেমনই খেলাধূলা এবং ব্যায়াম-চর্চ্চাও চলিত। সন্তরণ, নৌকাচালনা, অশ্বারোহণ, ৫০ ৬০ মাইল দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করা ইত্যাদিতে তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিবার সময় সঙ্গীদের লইয়া সাঁতার কাটিতেন। তৎকালে ঐ নদের প্রশস্ততা অনেক বেশী ছিল। কৃষ্ণকুমার ও তাঁহার সঙ্গিগণ সাঁতার কাটিয়া ব্রহ্মপুত্রের পরপারে যাইতেন এবং পুনরায় এ-পারে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার বাল্যকালে ময়মনসিংহ শহর হইতে বাঘিল গ্রামে যাইতে হইলে বর্ষাকালে নৌকায় নদীপথে যাতায়াত করিতে হইত এবং গ্রীষ্মে পদব্রজে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। তাঁহাদের গ্রামে হাঁটিয়া যাইতে তিন দিন সময় লাগিত। বালক কৃষ্ণকুমার গ্রীষ্মাবকাশে সঙ্গীর সহিত দীর্ঘ পথ ক্রমাগত তিন দিন হাঁটিয়া, হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল ও দস্যু-উপদ্রুত মধুপুরের অরণ্যের মধ্য দিয়া স্বগ্রামে যাইতেন এবং অবকাশ-অন্তে শহরে ফিরিয়া আসিতেন। একবার পূজার ছুটিতে নৌকায় গ্রামে যাইবার কালে ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়িয়া নৌকাডুবি হয়। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এক জ্যাঠতুতো ভাই; উভয়ে এক চরে ঝাউ গাছ ধরিয়া সারারাত্রি কাটাইলেন। পর দিন প্রভাতে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ভরা নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া অপর তীরে এক জোলা গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উঠিলেন। নদী-পথে যাতায়াতকালে কৃষ্ণকুমার মাঝিদের সঙ্গে নিজে নৌকা চালাইতেন। এমনই ভাবে তিনি বাল্যকালেই সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা গুরুচরণ মিত্র যৌবনকাল হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণকুমারও বাল্যকালেই উত্তম ঘোড়-সওয়ার হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। বিরাশি বৎসর বয়সেও তিনি অশ্বারোহণে টাঙ্গাইল মহকুমার কয়েক স্থানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিয়াছেন। ঘোড়া যতই দুরন্ত হইত তাঁহার সাহস ও উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পাইত। বাল্যকালে তিনি একবার একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়িতে চেষ্টা করিয়া প্রথমে বিফল মনোরথ হন। ঘোড়াটি এমন দুরন্ত ছিল যে, কেহ চড়িতে গেলে লাফাইয়া উঠিয়া বাধা দিত। তাঁহার জেদ হইল, এই ঘোড়ায় উঠিবেনই এবং উহাকে শায়েস্তা করিয়া তবে ছাড়িবেন। তিনি সেই ঘোড়ার লাগাম একটি গাছে বাঁধিলেন এবং গাছে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া পড়িলেন; তার পর প্রচণ্ড বেগে উহাকে অনেক দূর অবধি ছুটাইয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে ঘোড়াটি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমনি ভাবে ঘোড়াটিকে তিনি সায়েস্তা করিয়া ছাড়িলেন।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে কৃষ্ণকুমার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পান। মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার

প্রবল ছিল ; কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। অবশেষে তাঁহাকে এফ-এ পড়িবার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে হইল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ ছাত্রাবাসে স্থান পাইলেন। বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তও তখন এই ছাত্রাবাসে থাকিতেন। তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ভারতবিশ্রুত আনন্দমোহন বসু তথায় আসিয়া ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে ধর্মভাবে ও দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময় অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের, কালীশঙ্কর সুকুল, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকুমারকে স্বগ্রামে যাইতে হইল। ইহাতে পাঠে ব্যাঘাত জন্মে, ফলে সেইবার তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পিতা সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারীং ক্লাসে ভর্তি হইলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠ সমাপ্তির পরে নানা কারণে তাঁহার এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

ইহার পর কৃষ্ণকুমার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। মাত্র ছয় মাস অধ্যয়নের পর তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন ক্লাসে ভর্তি হইয়া 'প্লীডারশিপ' (ওকালতি) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষাও শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে দুই বৎসর বি-এ পড়িয়া তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

ছাত্রজীবনে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থানকালে কৃষ্ণকুমার ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় পরোপকার, সেবাপরায়ণতা দুর্গতদের উদ্ধার করিবার মনোবৃত্তি বিপন্নের উদ্ধার, দুর্বলকে রক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশসাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতাদৃশ মহৎ গুণগ্রাম উত্তরকালে তাঁহাকে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় ত্যাগস্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের বিদগ্ধমণ্ডলে থাকিয়া তিনি জীবনাদর্শকে রূপ দান করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইলেন। সেই মণ্ডলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির ন্যায় বরেণ্য নেতা এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীশঙ্কর সুকুল প্রভৃতির মত সুযোগ্য সহকর্মীর অভাব ছিলনা। স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাসঞ্চার ও পৌর অধিকারবোধ জাগাইবার জন্য কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার সতীর্থ-বন্ধু কালীশঙ্কর সুকুল উত্তরবঙ্গে প্রচারকার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত সে অঞ্চলে রেলগাড়ীতে চলাচল-ব্যবস্থা হয় নাই ; সেই কারণে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা ছিল। তাঁহারা দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নানা স্থানে গিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ—এই এগার বৎসর ভারতের জাতীয় জীবনে একটা সার্থক যুগ বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং সিটি স্কুল ও সিটি কলেজ ইত্যাদি এই যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ইহার পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি) প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা অবধি কৃষ্ণকুমার একজন একনিষ্ঠ কর্মীরূপে ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আনন্দমোহন বসু বাংলার ছাত্রগণকে স্বদেশ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার মহান্ উদ্দেশ্যে ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলে কৃষ্ণকুমার তাহাতে যোগদান করেন। এই সমিতির তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী কর্মী। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় রাজনীতিক প্রগতি সাধনকল্পে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (ভারত-সভা) স্থাপিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন আনন্দমোহন বসু। কৃষ্ণকুমার এই সভার বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট দেশে—যেখানে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস, নানা ভাষার প্রচলন, বিবিধ ধর্মমতের বিদ্যমানতা ও শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে দেশবাসীর মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও সেখানে জাতির চেতনা সঞ্চার করা কেবল যে রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নহে তাহা বাংলার তদানীন্তন দেশসেবকেরা বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ঊনবিংশতি শতকের শেষভাগে তাঁহাদের কর্মধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমার ১৮৮১ সনে সিটি স্কুলে মাসিক মাত্র ৪০৲ বেতনে শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার বন্ধু কালীশঙ্কর সুকুল গণিত পড়াইতেন। ছাত্রদের চরিত্রগঠন, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষাদান ইত্যাদি কার্য্যে কৃষ্ণকুমার এরূপ যত্ন লইতেন যে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকগণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। আদর্শ শিক্ষাব্রতী বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাহাই। কত কলুষিতচরিত্র ছাত্রকে উদ্ধার করিয়া তিনি 'মানুষ' করিয়াছেন, কত অমনোযোগী বিপথগামী ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষায় আকৃষ্ট করিয়া সৎপথে আনিয়াছেন সেই সকল বিবরণ তাঁহার 'আত্মচরিত' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মস্তক আপনা হইতেই নত হয়।

প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সিটি স্কুলটি কলেজে পরিণত হইল, পরবর্তীকালে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পদোন্নতি হইলেও তিনি মাসিক ৭০ টাকার অধিক বেতন গ্রহণ করেন নাই। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আনন্দমোহন বসু ও তাঁহার সুযোগ্য সতীর্থগণ এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই ইহা দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণসাধনের একটি সময়োপযোগী সংস্থায় পরিণত হইল। কৃষ্ণকুমার এই বিভাবতনে সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করিয়াই শুধু নিজের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে এবং উড়িষ্যায় যাইয়া প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তৎকালে রেল-ষ্টীমারে যাতায়াতের ব্যাপক ব্যবস্থা না হওয়ায় দূরদূরান্তরে গমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। একবার তিনি অর্থ-সংগ্রহের জন্য আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজার নিকট গিয়াছিলেন। সিটি কলেজের জন্য মহারাজা তিন হাজার টাকা দান করেন। তখন ত্রিপুরায় যাতায়াতের জন্য রেলপথ ও ষ্টীমার ছিল না। নদীপথে আগরতলা হইতে কলিকাতায় নৌকাযোগে প্রত্যা-বর্তনকালে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাঁহার নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকাডুবি আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি মহারাজার প্রদত্ত তিন হাজার টাকার রৌপ্য মুদ্রা ও নোট বাক্স হইতে বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলেন; নৌকাডুবির সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল-তরঙ্গপূর্ণ মেঘনা নদী সাঁতরাইয়া একবস্ত্রে অপর তীরে উঠিলেন, এবং সেই স্থান হইতে খালি পায়ে কয়েক ক্রোশ হাঁটিয়া গোয়ালন্দে যাইয়া ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমার সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার এই প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে স্বদেশীগ্রহণ ও বিলাতী বর্জন আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করেন। গবর্ণমেণ্ট সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ললিতমোহন দাসকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখিলে সিটি কলেজের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। তৎকালীন বিদেশী শাসকগণের ধারণা ছিল যে, চাকুরি হারাইবার ভয়ে তাঁহারা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী ললিত-মোহন চাকুরি ছাড়িলেন, কিন্তু দেশসেবার ব্রত ত্যাগ করিলেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মগণের চেষ্টায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য যুবক কৃষ্ণকুমার একজন উৎসাহী কর্মীরূপে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদের আদি উদ্গাতা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর সহিত কৃষ্ণকুমার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ উপলক্ষে সামান্য গোল-যোগের সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সেই সমাজের বিধানমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে রাজনারায়ণ কৃষ্ণকুমারের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন।

লীলাবতী ছিলেন কৃষ্ণকুমারের যোগ্যা জীবন-সঙ্গিনী। পতিব্রতা সহধর্মিণী বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। ইহাই মন্দিরে প্রথম বিবাহ বলিয়া বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দুইটি হৃদয়ের নদী', 'জগতের পুরোহিত তুমি', 'শুভ দিনে এসেছে দোঁহে' ইত্যাদি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহ-সভায় গানগুলি গাহিয়াছিলেন—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধগায়ক চুনিলাল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য ও সুকণ্ঠ গায়কগণ।

কৃষ্ণকুমারের দাম্পত্য জীবন সুখ-শান্তিতে কাটিয়াছে। সাধ্বী লীলাবতী যাবতীয় সৎকার্য্যে স্বামীর সহযোগিতা করিয়া-ছিলেন। দেশসেবায় স্বামীর লাঞ্ছনা নির্যাতন ভোগের অংশ-ভাগিনী হইতে তিনি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি একজন সুলেখিকাও ছিলেন। 'বঙ্গনারী'—এই ছদ্মনামে বিভিন্ন বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় কৃষ্ণকুমারের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। তাঁহার সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় এই সাপ্তাহিকখানি এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৩রা বৈশাখ) কৃষ্ণকুমার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পরেশনাথ সেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন বড়লাট লর্ড রিপণের শাসনকাল—ইলবার্ট বিলের আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা লইয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সঞ্জীবনী' অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সঞ্জীবনী হইতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহা তিনি ধর্ম, দেশ ও জাতির সেবায়ই ব্যয় করিয়া

গিয়াছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সঞ্জীবনীর প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :

(১) ভারতস্থ ইংরেজদিগের পরিচালিত ইলবার্ট বিল-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিরোধ করিতে এবং দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করিতে সঞ্জীবনী-সম্পাদক নির্ভীকতার সহিত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর কল্যাণে বহু বাঙালীর মনে জাতীয় মর্য্যাদাবোধ জাগিয়াছিল।

(২) বিদেশী সরকার যখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে খোলা-ভাটি স্থাপন করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাসের প্রশ্রয় দিতেছিলেন, তখন সঞ্জীবনী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু ভারত-সভার পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে গবর্ণমেণ্ট খোলাভাটি প্রথা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

(৩) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি সঞ্জীবনী ইহার সমর্থক ছিল। দেশের অনেক সংবাদপত্র নূতন হুজুগ সুরু হইল বলিয়া কংগ্রেসকে উপহাস করিতে থাকে। কোন কোন সংবাদপত্র কংগ্রেসকে 'কদমস' এবং 'X'mas pantomime" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সঞ্জীবনীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণ চিত্তাকর্ষক শিরোনামায় প্রকাশিত হইত এবং কংগ্রেসকে 'জাতীয় যজ্ঞ' ও কংগ্রেসের নায়কগণকে 'হোতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

(৪) বাংলাদেশের বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে অসংখ্য আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা বসানো হইয়াছিল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা পর্য্যন্ত এই সকল আড্ডায় যাইয়া আফিং ও চণ্ডু সেবন করিত। সঞ্জীবনীর প্রবল আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্ত এক আফিং কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের তদন্তে সাহায্য করিয়া সঞ্জীবনী দেশ হইতে আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল। আসামে সঞ্জীবনীর মত শক্তিশালী নির্ভীক সংবাদপত্র না থাকায় সেখানকার বহু অধিবাসী আফিং-খোর ('কানিয়া') হইয়া গিয়াছিল। তদন্তকালে পুলিসের সতর্কতার দরুন অনেক সময়ে কমিশনের সদস্যগণ আফিংখোর ও চণ্ডুখোরের আড্ডাগুলি বাহির হইতে বুঝিতে পারিতেন না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক স্বয়ং কমিশনের সদস্যগণকে লইয়া গিয়া লুক্কায়িত আড্ডাগুলি দেখাইয়া দিতেন। তাহার ফলে কঠোর আইন পাস হয় এবং দেশ হইতে এই সমুদয় সর্ব্বনাশা আড্ডা উঠিয়া যায়।

(৫) আসামে চা-বাগানে কুলীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইত, তৎসম্বন্ধে দেশবাসী কিছুই জানিত না। সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম সেই অত্যাচারের কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশ করিতে থাকে। সম্পাদকের সতীর্থ বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কত বিপদের মধ্য দিয়া আসামের চা-বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিতেন এবং সঞ্জীবনীতে প্রকাশের জন্ত পাঠাইয়া দিতেন। কৃষ্ণকুমারের অগ্নিময়ী লেখনী তৎসমুদয় দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিত। তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় লাঞ্ছিত অসহায় নিরীহ দেশবাসীর উদ্ধারের জন্ত দেশবাসীকে সচেষ্ট হইতে আহ্বান করিতেন। 'চা না কুলীর রক্ত', 'আসামে লিগ্রীর বংশ' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী সঞ্জীবনীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লিগ্রী "Uncle Tom's Cabin" নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত দাসদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারকারী শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী। আসামের কুলী চালান (Indentured labour) প্রায় দাস-ব্যবসায়ের অনুরূপ ছিল। সঞ্জীবনীর একান্ত চেষ্টায় তাহা দূরীভূত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে লইয়া আড়কাঠির কেন্দ্রে যাইয়া আসামে গমনোদ্যত কুলী নরনারীকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতেন এবং সঞ্জীবনী পত্রিকার দ্বারা লব্ধ অর্থব্যয়ে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতেন।

মিত্র মহাশয়ের সাংবাদিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে সঞ্জীবনী পত্রিকার মারফতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব এবং সুচিন্তিত কার্য্যক্রম দেশবাসীর সম্মুখে উত্থাপন। এই ঐতিহাসিক সত্য বর্ত্তমান যুগের অনেকেই জানেন না যে, বয়কট আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ়) তারিখের সঞ্জীবনীতে "কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ" শিরোনামায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রস্তাবিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম প্রদত্ত হইয়াছিল :

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে।... জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

"জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্ত আর অর্থদান করা হইবে না।

"যত দিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, তত দিন রাজপুরুষদের আবির্ভাবে ও তিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

"লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙালী আর রাজপুরুষদের সংস্রবে যাইতে পারিবেন না।"

সঞ্জীবনীর উপরোক্ত কার্য্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পায়। ইহার ফলে প্রায় চার সপ্তাহ পরে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত ৭ই আগষ্টের বিরাট প্রতিবাদ-সভায় বিলাতী বর্জ্জন বা বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর হইতে সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিলাতী পণ্যের কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত না। ইহাতে সঞ্জীবনীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, মিত্র মহাশয় ছিলেন উহার পুরোভাগে। তৎকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরূপ লোকপ্রিয়তা ছিল যে, তিনি 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' ('uncrowned king of Bengal') বলিয়া অভিহিত হইতেন। মিত্র মহাশয় ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বাংলাদেশের যে সমুদয় দেশভক্ত নেতার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে স্বদেশী বা বয়কট আন্দোলন সফল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

মিত্র মহাশয় একাদিক্রমে চুয়ান্ন বৎসর কাল নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিয়া কৃতিত্বের সহিত সঞ্জীবনীর মত সুপ্রচারিত ও সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই অর্থাভাবে সঞ্জীবনীর প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

মাতৃভাষায় সংবাদপত্রের সম্পাদনা ব্যতীত মিত্র মহাশয় 'মহম্মদ চরিত', 'বুদ্ধদেব চরিত' এবং 'আত্মচরিত' নামক তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ কয়খানি সাহিত্যক্ষেত্রে সমাদর লাভ করিয়াছে। 'নানক চরিত' নামে তিনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পুলিস তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী কালে পাণ্ডুলিপি লইয়া যায়। সে পাণ্ডুলিপি অনেক চেষ্টা করিয়াও ফেরত পাওয়া যায় নাই।

'কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত' গ্রন্থে বাংলার সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের অনেক তথ্যপূর্ণ উপাদান নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্ময়কর কাহিনীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা পাঠে সংশয়বাদী বা নাস্তিকের মনেও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। স্বদেশী যুগের ত্যাগী কর্মী আদর্শ শিক্ষাব্রতী পরলোকগত অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় মিত্র মহাশয়ের এক মৃত্যুবার্ষিকী সভায় ভাষণ দানকালে বলিয়াছিলেন যে, মিত্র মহাশয়ের আত্মচরিত গ্রন্থখানিকে তিনি বাইবেল বা গীতার ন্যায় পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার আরম্ভেই আছে :

"গল্পের বহি যেরূপ আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আমি সেইরূপ আগ্রহের সহিত ইহা আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। গ্রন্থকার মহাশয়ের স্বাভাবিক সরলতা এবং পুস্তকখানির সহজ ভাষা আমাকে ইহা অতি অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে সমর্থ করিয়াছে।

"কৃষ্ণকুমার মিত্র যৌবনে ও পরিণত বয়সে যেমন মানুষটি ছিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই পাওয়া যায়।

"এই পুস্তকে বর্ণিত অনেক ঘটনা উপন্যাসবর্ণিত অনেক ঘটনার মত আশ্চর্য্য।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন :

"সেকালে মিত্র মহাশয়ের মত শিক্ষকেরা ছাত্রদের কল্যাণার্থ যাহা করিতেন, তাহা সকল শিক্ষকেরই জ্ঞাতব্য ও অনুসরণীয়।

"মিত্র মহাশয় ও তাঁহার কোন কোন বন্ধু যৌবনকালেই ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠন এবং রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কর্ম্মিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব ও আস্ফালনসার ছিলেন না।

"স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অনতিক্রান্ত হইয়া আছে।"

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্ব্বে যখন বিদেশী সরকারের দমননীতি প্রবল বেগে চলিতেছিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গে ফুলারী শাসনকালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন বলপূর্ব্বক ভাঙিয়া দেওয়া হয়। প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিবার জন্য পুলিস দলবদ্ধ হইয়া নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর লাঠির দ্বারা আক্রমণ চালাইয়া অনেককে আহত করে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে—১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মিত্র মহাশয় পুলিসের নিষ্ঠুর অত্যাচার নিবারণার্থ এবং আক্রান্ত প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্য বীরের ন্যায় সশস্ত্র পুলিসের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে কন্‌ফারেন্স যখন ভাঙিয়া দেওয়া হইল, তখন নেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বিদেশী সরকারের ঐ অন্যায় আদেশ অমান্য করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বসিয়া রহিলেন। বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা তাঁহাকে সভামণ্ডপ হইতে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে মিত্র মহাশয় কেন যে

সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন, তৎসম্পর্কে 'আত্মচরিত' হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"সকলেই সভা পরিত্যাগ করিলেন, এ অপমান সহ্য অপেক্ষা মৃত্যু ভাল ইহা মনে করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমাকে সভা ত্যাগ করিতে বলিলেন, আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

"আমি বলিলাম, 'আজ এই স্থানে প্রাণ দিব, কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিব না, আপনারা সকলে প্রস্থান করুন।' অনাথবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল আমি যেন একমাত্র সাহসী পুরুষ। এই ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র আপনাকে অবনত করিয়া অনাথবাবুর সহিত বাহিরে চলিয়া গেলাম।"

মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত আচরণ ও উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সত্ত্বগুণাশ্রিত স্বভাবের একটা বিশেষ দিক প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছিলেন একজন সত্ত্বগুণধর্মী ক্ষত্রিয় বীর—যিনি ক্ষাত্রধর্ম পালন করিতে যাইয়াও রজোগুণের প্রভাব হইতে মনকে বিমুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মিত্র মহাশয়ের জীবনের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে তাঁহার নির্ব্বাসন। এই সময় আলিপুরের আদালতে মাণিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বিচার চলিতেছিল। অরবিন্দ-বারীন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র; কৃষ্ণকুমার তাঁহাদের মেসো-মহাশয়। অরবিন্দ নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষসমর্থনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রধানতঃ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় দেশবাসীর নিকট হইতে অরবিন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সতেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মামলা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত মামলার শুনানিকালে উপস্থিত হন নাই। তিনি টাকাও ফেরত পাইলেন না। তৎপর মিঃ সি. আর. দাশ (পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) মামলা চালাইতে রাজী হইলেন। যেদিন সি. আর. দাশকে মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হইল, তাহার পরদিনই মিত্র মহাশয় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। সেই সময় বাংলাদেশের আরও আট জন নেতাকে নির্ব্বাসিত করা হইল।

মিত্র মহাশয়কে আগ্রা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কারাগারে নির্জ্জন কক্ষে বৃদ্ধ বয়সে বন্দী থাকিয়া তাঁহাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। চৌদ্দ মাসকাল এ ভাবে বন্দী থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে, তাঁহার দেহের শক্তি নষ্ট হইলেও মনের বল অক্ষুণ্ণ ছিল। বন্দীজীবনে তিনি ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তিনি পরমেশ্বরের করুণার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় তাঁহার যে সত্যোপলব্ধি হইয়াছিল, সেই পুণ্য কাহিনী আত্মচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মিত্র মহাশয় নির্ব্বাসনে থাকাকালে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিলাতের শ্রমিক দলের নেতা মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহারা উভয়ে কলিকাতায় ৬নং কলেজ স্কোয়ারে (বর্ত্তমানে বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট) মিত্র মহাশয়ের গৃহে আসিয়া তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৃহের দেওয়ালে ঝুলানো, ফ্রেমে বাঁধানো একটি ইংরেজী 'মটো'র (মূলমন্ত্র) প্রতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দৃষ্টি পড়ে। মটোতে লেখা ছিল—"I shall go in the strength of Lord God" নির্ব্বাসিত জননায়কের গৃহের প্রাচীরগাত্রে ঐ মটো দেখিয়া শ্রমিক-নেতার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি তৎপ্রণীত *Awakening of India* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ মটোকে মিত্র মহাশয়ের জীবন-বাণী বলা যাইতে পারে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পাইলেন। কিন্তু পূর্ব্বস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না। বন্দী-জীবন হইতে মুক্ত হইয়া বৃদ্ধবয়সেও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া মিত্র মহাশয় দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় পূর্ব্বের ন্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জীবনে কোন দিনই তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে চাহেন নাই। পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান ছিল এই কর্ম্ম-পরায়ণ কর্ম্মবীরের প্রাণধর্ম্ম। জীবনের সায়াহ্ন বেলায়ও তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিগৃহীতা নারীর উদ্ধার ও আশ্রয়ের জন্য "নারীরক্ষা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলার নারীকল্যাণ কর্ম্মের ইতিহাসে "নারীরক্ষা সমিতির" কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতার বাসভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কৃষ্ণকুমারের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়। জীবনদীপ নির্ব্বাণের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—"হে ঈশ্বর, ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ কবিমানস ও সৃষ্টিলোক

শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি

প্রথম স্তবক : কবিমানস

বাংলার তথা ভারতের মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া যেসব মহাপুরুষ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবম্প্রকার বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টির কারণ হইতে পারিয়াছিল। দেশ ও জাতির কল্যাণ-চিন্তায় এইরূপ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মনীষী অতিশয় বিরল। তাঁহার যাহা কিছু সাধনা ও কামনার বস্তু ছিল তাহা তাঁহার দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহার এই দুর্লভ দেশপ্রেম সম্পর্কে শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে, সাহিত্য-সৃষ্টির অপূর্ব্ব উন্মাদনায়—যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়, বার্দ্ধক্যের স্মৃতি-কল্পনায়—এই দেশপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল; দেশের নামে তিনি আত্মহারা হইতেন।"

দেশ বলিতে তিনি ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড-টুকুকেই বুঝেন নাই। দেশ তাঁহার নিকট ছিল প্রাণময়ী দেবী। তিনি তাঁহার যে রূপ ধ্যান করিয়াছিলেন তাহা এক দিকে যেমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, অন্য দিকে তাহাই আবার তাঁহার নিকট দশ প্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদল-বিহারিণী কমলা ও বিদ্যাদায়িনী বাণী রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। মৃন্ময়ী বঙ্গভূমি চিন্ময়ী রূপে তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছিল। এই যে দেবীস্বরূপিণী দেশমাতৃকা ইঁহারই আরাধনায় বঙ্কিম তাঁহার মন প্রাণ আত্মা, পার্থিব দেহ ত বটেই—সবকিছু আহুতি দিয়াছেন। দেশ যে তাঁহার নিকট কি বস্তু ছিল তাঁহার এই পংক্তিগুলিই তাহার চরম নিদর্শন।

"আয় বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের যে দিকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় তাহা হইতেছে এক এক অতি-দুর্লভ কবি-প্রতিভার সহিত অনন্যসুলভ অর্জ্জিত জ্ঞানের সমাবেশ—যাহা লাভ করিবার জন্য তপশ্চর্য্যা করিতে হয়, সেই তপশ্চর্য্যাই প্রতিভা; যাহাকে মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন, "Genius is the capacity to take infinite pains"। বাংলা সাহিত্যে সহজাত প্রতিভার অভাব নাই। কিন্তু সহজাত প্রতিভার সহিত ঐ তপশ্চর্য্যার মিলন বঙ্কিম-সাহিত্যে যেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বিরল। এ সম্পর্কে নিম্নে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইল উহা তাঁহারই যেন আত্মকথা: "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপ-কথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।" (রজনী)

বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন তাঁহার বঙ্গভূমির রূপের অভাব নাই। তিনি দেখিলেন বঙ্গভূমির শ্যামল বক্ষে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজিও শুভ্র জ্যোৎস্নার অমৃত ধারায় স্নাত হইয়া পুলকিত যামিনী নামিয়া আসে। ফুল্লকুসুমিত দ্রুম-দলে শোভিতা হইয়া আজিও তাঁহার শ্যামাঞ্চল অপরূপ শোভায় ঝলকিয়া উঠে। কিন্তু মাতার অঙ্গে অলঙ্কার কোথায়? ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী হইয়াও মাতা যে তাঁহার দীনায় ভায় দিনাতিপাত করিতেছেন তাঁহার সন্তানগণ যে আত্মপরিচয়হারা, ধূল্যবলুণ্ঠিত, দীনতার পঙ্কে নিমগ্ন। জাতির এই দুরবস্থা দর্শনে বঙ্কিমের হৃদয় বিগলিত হইল। জাতির এই হীনাবস্থা দর্শনে তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি এ সকলের স্মৃতি আছে কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবন-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন-চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে। বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?"

এই যে দেশপ্রেম ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি জাতির জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। নৈরাজ্যের [illegible]

আকাঙ্ক্ষার আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়াছেন। সাহিত্যিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যাহা সেই সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও তাহার নিবৃত্তির জন্যই শুধু বঙ্কিম লেখনী ধারণ করেন নাই। আর্টের গজদন্ত প্রাসাদে নিজেকে অবরুদ্ধ রাখিয়া তিনি জগৎ ও জীবন হইতে দূরে থাকিতে চাহেন নাই। বরং জগৎ ও জীবনের জন্যই তিনি নিছক আর্টের কল্পনাবিলাসকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, "সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী, বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন।"

কিন্তু আসলে বঙ্কিম কবি, দেশপ্রেমের দ্বারা একান্তভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কবি হইয়া কাব্য-সৃষ্টির আহ্বানকে উপেক্ষা করাও ছিল বঙ্কিমের পক্ষে অসম্ভব। বঙ্কিমের জীবনে গভীর সমস্যা দেখা দিল। এক দিকে কবি-প্রতিভার আত্ম-প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্বেদনা, অন্য দিকে দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের আহ্বান। কবি-প্রতিভা চায় নির্ঝরিণীর মত নৃত্য করিয়া সঙ্গীতের সুরধুনী সৃষ্টি করিতে, দেশ ও জাতি দাবি করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গের কঠিন সঙ্কল্প। এক দিকে শিল্পসৌন্দর্য্যের ছায়া-কানন, অন্য দিকে দেশপ্রেমের কণ্টকাকীর্ণ পথ। আর্টের লীলাভূমি কল্পনার কল্পলোক, দেশ-প্রেমের ক্ষেত্র রূঢ় বাস্তব জগৎ। এই দুই বিপরীতধর্মী বৃত্তির সংঘাত বঙ্কিমের হৃদয়কে গভীর ভাবে আলোড়িত করিল। সাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে এই দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করা কঠিন হইত, কিন্তু অসাধারণ শক্তিমান বঙ্কিম আপনার অজেয় পৌরুষের দ্বারা এই দুই বৃত্তির সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাহা এই মৃতপ্রায় জাতির পক্ষে কেবলমাত্র মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় ক্রিয়াই করিল না একই কালে তাহা শাশ্বত সাহিত্যের আসন লাভ করিল। স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি সবকিছুর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মহাকালের বিচারে তাহা সর্বদেশ ও সর্বকালের বলিয়া প্রমাণিত হইল। তাঁহার রচিত সাহিত্য এক দিকে যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, অন্য দিকে তাহাই আবার মৃতপ্রায় জাতির নব জাগরণের প্রাণদ মন্ত্রস্বরূপ।

উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমের সৃষ্টি দুইটি বিভিন্ন উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া গঙ্গা-যমুনার মত প্রবাহিত হইতেছে। এই দুইটি উৎসের একটি কবি-প্রতিভা অপরটি দেশপ্রেম। বর্তমান প্রবন্ধে আমি প্রথম উৎসকে কবি-মানস ও সৃষ্টিলোক আখ্যা দিয়া উহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বঙ্কিমের কবি-মানসে এই জগৎ ও মানব অদৃষ্টের যে প্রতি-লিপি বিম্বিত হইয়াছিল তাহাই তাঁহার সাহিত্যের মূলতত্ত্ব। তিনি যেন প্রত্যাহরে দণ্ডায়মান হইয়া এই পৃথিবী ও তথায় অনুষ্ঠিত মানব-ভাগ্যের বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, মহাকালের হিমশীতল করস্পর্শে অহরহ জীবলোকের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। এই নিষ্ঠুর নিয়তির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষের কি আকুল অথচ ব্যর্থ প্রয়াস! প্রেম ও ঘৃণা, মিলন ও বিরহ, সফলতা ও বিফলতা, সত্য ও মিথ্যা, হাসি ও অশ্রুর ঘাত-প্রতি-ঘাতে এবং বর্ণ-বিন্যাসে মানুষের জীবননাটক যেমন রঙীন তেমনি বেদনার্ত। সাধারণ মানুষ বুঝিতেছে না যে, তাহার প্রেম ও মিলন, বিরহ ও বিচ্ছেদ, মায়া ও মমতা—তাহার যাহা কিছু শ্রেয় ও প্রেয়: এই মহাশক্তির চরণোপান্তে অতি তুচ্ছ খেলনার মত। তাই তাহার পাদক্ষেপে মানুষের সেই সব সাধনার বস্তু মুহুর্মুহু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। জগৎ ও জীবনকে শাসন করিয়া যে দুর্বার শক্তি আপনার কাজ আপনার মনেই করিয়া যাইতেছে তাহার কাছে মানুষের সাধনার কোন আবেদনই নাই। বধির নয়, অন্ধ নয়, সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু অতি নিষ্ঠুর এই মহাশক্তি। এক হাতে সে যেমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে, অপর হাতে সে-ই আবার সেই সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করিতেছে। এই শক্তির হাতে বসন্ত আসিতে না আসিতে "ভ্রমরের" গুঞ্জরণ স্তব্ধ হইয়া গেল; ফুটিতে না ফুটিতে "কুন্দ" কুসুম অকালে ঝরিয়া গেল: "রোহিণী" ক্ষণিকের জন্য গগনপ্রান্ত আলোকিত করিয়া বিস্মৃতির তমসাপারে অদৃশ্য হইল। "হীরা" অলঙ্কারের শোভাবৃদ্ধি না করিয়া পথের ধূলায় হারাইয়া গেল। "সূর্য্য-মুখী"র প্রফুল্ল আনন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে শুষ্ক হইয়া গেল। শৈবলিনী মরিল, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রবক্ষেই শান্তির নীড় খুঁজিয়া পাইল। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর—কেহই রক্ষা পাইল না। কেহ মরিল, কেহ বাঁচিয়াও মরিয়া রহিল—এই যে ব্যর্থতা, এই যে ধ্বংস-লীলা ও অপচয় ইহাকে বঙ্কিম দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, এই যে জগৎ-দর্শন বা জীবন-জিজ্ঞাসা ইহাই বঙ্কিমের কাব্যের মূলতত্ত্ব।

ট্রাজেডির এই যে আদর্শ ইহা বঙ্কিম সেক্সপীয়রের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমের পরিচয় ছিল অতিশয় নিবিড়। তিনি যেমন ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যরসধারা আকণ্ঠ পান করিয়া স্বীয় কাব্য-তৃষার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন তেমনই নবতর কাব্য-সৃষ্টিতে আদর্শ হিসাবে ঐ কাব্যরস-প্রেরণাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের ট্রাজেডিতে নায়ক-নায়িকার যে পরিণাম সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির নায়ক ও নায়িকারও সেই পরিণাম। ডেসডিমোনা, অফিলিয়া, লেডি ম্যাকবেথ, জুলিয়েট, ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতির ভাগ্য লইয়া ঐ নিয়তির অন্ধশক্তি যে ক্রীড়া করিয়াছে বঙ্কিমের নায়ক ও নায়িকাগণের ভাগ্য লইয়াও সেই একই খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই মৃত্যু, সেই ধ্বংস, সেই বিনাশ, সেই অপচয়। সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির

তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমালোচক ব্র্যাডলি যে উক্তি করিয়াছেন এখানে তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"The central feeling is the impression of waste. With Shakespeare at any rate the pity and fear which are stirred by tragic story seem to unite with and even to merge in a profound sense of sadness and mystery which is due to this impression of waste. . . . Everywhere from the crushed rocks beneath our feet to the soul of man we see power, intelligence, life, glory, which astound us and seem to call for our worship. And everywhere we see them perishing, devouring one another often with dreadful pain as though they came into being for no other end. All this makes us feel the blindness and helplessness of man. . . . There is no tragedy in its expulsion of evil. The tragedy is that it involves the waste of good."

বঙ্কিমের ট্র্যাজেডিগুলি সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির এই আদর্শ বঙ্কিম তাঁহার কাব্য-সাধনার পরিণত অবস্থায় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার ভারতীয় সংস্কার বাধা দিয়াছে। তাঁহার কবি-জীবনের প্রথম ভাগে, স্বভাবতঃই যাহা হইয়া থাকে, সৃষ্টি-প্রেরণা ছিল উদ্দাম ও উচ্ছল; কতকটা অন্ধ। তখন তিনি সবেমাত্র শেক্সপীয়রের কাব্যরসে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার রক্তে যে সংস্কার মিশিয়া আছে তাহা অপেক্ষা ঐ কাব্যরসাদর্শ তখন অতিশয় প্রবল। কাজেই ঐ কাব্যাদর্শকেই তিনি তাঁহার সংস্কারের উপরে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু কবি-জীবনের পরিণত অধ্যায়ে যখন সৃষ্টি-প্রেরণা বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে তখন তাঁহার সেই সুপ্ত সংস্কার সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি শেক্সপীয়রের কাব্যাদর্শে মানব-জীবনের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিলেন তাহাতে শান্তি পাইলেন না। দুঃখ ও মৃত্যুকে—তাহা যত সত্যই হউক, শেষ কথা বলিয়া মানিতে কিছুতেই তাঁহার প্রাণ চাহিল না। মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনের আর কি থাকে! এক মহাশূন্যতাই কি তাহা হইলে জীব-জগতের শেষ পরিণাম! দুঃখই কি তাহা হইলে সংসারে একমাত্র সত্য বস্তু? এত দুঃখ সহিবার পরে মহত্তর জীবনের বা পরিণতির কোন আশ্বাসই তাহা হইলে নাই? ইউরোপীয় আদর্শে এই দুঃখই পরম সত্য, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কার তাহা মানে না। সেই সংস্কার আমাদিগকে দুঃখ নিশার পারে এক মহত্তর ও উজ্জ্বলতর জীবনের ইঙ্গিত দেয়; বলে দুঃখটা পরিণতি নয়—পন্থা। যে দিন হইতে বঙ্কিমের ভারতীয় সংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠিল সেই দিন হইতে তিনি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর লীলাকে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই নিয়তিকে স্বীকার করিয়া তাহাকেই জয় করিবার পন্থার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সম্পর্কে মোহিতলালের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"জীবন ও জগৎ, আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার আছে যে আমরা কোন দুঃখকেই চূড়ান্ত মনে করি না, সব ঠিক আছে, কোনখানে অনিয়ম বা অবিচার নাই; কোন দুঃখই অমূলক বা অসঙ্গত নয়; এমন কি জ্ঞান কিংবা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিলে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আমরা কাঁদি বটে সেটা জীব-ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ক্রন্দনেও সান্ত্বনা আছে। এই সান্ত্বনার প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতিতে সজ্ঞান ও অজ্ঞানে অতিশয় দৃঢ়মূল হইয়া আছে,...ভারতবর্ষ জীবনের বাস্তবকেই চূড়ান্ত বলিয়াই গ্রহণ করে নাই। সেই বাস্তবকে ভেদ করিয়া প্রকৃতি ও নিয়তির অন্তরালে একটা বৃহত্তর কিছুর দর্শনলাভ না করিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই... ইউরোপীয় সংস্কার ইহার বিপরীত, তাহাতে দুঃখটা অতিশয় সত্য। উহার শক্তি অপরিসীম; ভগবানও সেই শরভাগের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না।...বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইউরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও মধ্যপথে ভারতীয় বা হিন্দুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই বা চাহেন নাই।"

যে নিয়তি-লীলার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা মানুষের ভুল-ভ্রান্তিকেই আশ্রয় করিয়া আপনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির উহাও একটি উপাদান। নায়ক-নায়িকার স্বকৃতকার্য্যেই তাহাদের সর্ব্বনাশ অথবা বিনষ্টির বীজ উপ্ত থাকিবে। মানুষ যে ভুল ভ্রান্তি করে তাহা রিপুর তাড়নাতেই করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি রিপুর মধ্যে কামই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এইজন্য ষড়্‌রিপুর উল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কামেরই উল্লেখ করা হয়। এই কাম সৃষ্টির মূলে। ইহা যেমন সৃষ্টির কারণ তেমনই ইহাই আবার ধ্বংসের হেতু—ইহা একাধারে মহৎ ও ভয়ঙ্কর। এই কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যে ভুল করে তাহাই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডির কারণ হইয়া থাকে। নরনারীর পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ আকর্ষণ ও প্রণয় তাহাই বঙ্কিমের ট্রাজেডির উপজীব্য, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তাহাই তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার জীবনে ট্র্যাজেডির কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব কি? প্রকৃতি একটা অন্ধ শক্তি। সৃষ্টিই তাহার একমাত্র কাজ, তাহার পবিত্র বা অপবিত্র কোন সংস্কারই নাই। সে কখন যে কাহার উপর প্রসন্ন হয় তাহারও স্থিরতা নাই। পুরুষ কখনও তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার দয়া-ভিক্ষা করে—কিন্তু পায় না, আবার কখনও বা

…র করিতে গিয়া নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতন করে, তাহাতে নারী পুড়িয়া মরে সত্য, কিন্তু সেই আগুনের হল্‌কা হইতে পুরুষও অব্যাহতি পায় না ; তাহারও সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রকৃতি যে পুরুষ অপেক্ষা শক্তিময়ী ইহাই বঙ্কিম দেখাইয়াছেন। নারীর মধ্যে তিনি মহামায়া জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—সেই ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, প্রেম, সবেরই অনন্ত আকর ঐ নারী-হৃদয়। সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি নারী, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা নীরবে সহিয়া নারীই পুরুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ঋষি-দার্শনিক সোপেনহাওয়ার তাই বলিয়াছেন, "The woman pays the debt of life not by what she does but by what she suffers." নারীর এই বিরাট মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্কিম নারীদের বন্দনা গান গীতারতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।" নারীরূপের বর্ণনা করিবার সময় বঙ্কিমের ভাষা বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চপলতার বাষ্পমাত্র সেখানে নাই। তিনি যেন নারীর পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, "গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। নীল জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্রতারা-রূপিণী কলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।" এরূপ পংক্তি বহু আছে।

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর যে আলোচনা করিয়াছি তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার এত প্রয়াস তিনি পাইলেন কেন ? সবই যদি মিথ্যা, মায়া, মৃত্যু বা বিনাশই যখন জীব ও জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম অথবা ইহলোক অপেক্ষা পরলোকই যখন মহত্তর সত্য তখন ঐহিক শুভা-শুভের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া চলে কি ? জগৎ ও জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই যখন এক বিরাট মহাশূন্যতা তখন তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির মধ্যে আর কি সত্য থাকিতে পারে ? আপাতদৃষ্টিতে ইহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বঙ্কিম এক দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ইহাদের সামঞ্জস্য আবিষ্কার ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সমন্বয়-সাধন বঙ্কিম-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন জগৎ ও জীবনের পরিণাম যাহাই হউক না কেন মানুষের ঐহিক অস্তিত্ব কয়েকটি দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন—যেমন সে ইচ্ছা করিলেই আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান বা সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জাগতিক নিয়মের বশেই তাহাকে বাঁচিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এই বাঁচার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সমস্যাগুলির, যথা—ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ শোক প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হইবে। বাঁচিতে হইবে অথচ সেই বাঁচার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ যে দুঃখ-কষ্ট দেখা দিবে তাহার প্রতিকার সে করিতে পারিবে না—ইহা এক দুঃসহ অবস্থা। বাঁচাই যখন নিয়তি তখন তাহা যত অল্পক্ষণের জন্যই হউক না কেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া বাঁচিতে হইবে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অতএব ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা অবশ্য করণীয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী ইহাই বঙ্কিমের জীবনবাদ। বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনবাদ উভয়ই সত্য, কোনটির মধ্যে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, দিব্য-জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিতে ইহারা লব্ধ। এই দুই সত্য পরস্পর-বিরোধীও নয়। আদর্শবাদী বঙ্কিমের দৃষ্টি এখানে পরম নিষ্ঠার সহিত বাস্তবকে অনুসরণ করিয়াছে। তিনি জীবনকে খণ্ডরূপে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-বাদের মধ্যে যে-কোন একটিই সত্য হইত। পক্ষান্তরে তিনি জীবনের একটি সমগ্র ও অখণ্ড রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মানবজীবনকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু মানব-অদৃষ্ট দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা অব্যক্ত বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই তাড়নায় সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে তৃপ্তি না পাইয়া তিনি হিন্দু সংস্কারের বশে জীবনের পরপারে মহত্তর জীবনের সন্ধান করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি, বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডিগুলিই তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে তিনি মুক্ত বিহঙ্গের মত কল্পনার অনন্ত নীলাকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। মানুষ যে কত অসহায়, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানের নিকট সে যে কত দুর্ব্বল বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাহা দেখাইয়াছেন। সবই ঠিক আছে, কোথাও কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নাই হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার জন্য সুখের সংসার দুঃখের প্লাবনে ভাসিয়া গেল। বঙ্কিমের ভাষায় বলি, "যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে।" তারপর ঝড়-ঝঞ্ঝা, ধ্বংস-বিলয়ের অবসানে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া নীড়হারা নরনারী দিগন্তপানে চাহিয়া প্রশ্ন করে, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনই হয়।" কিন্তু হায় উত্তর আসে না। তাহাদের ঐ প্রশ্ন বায়ু-স্তরে ক্ষীণ তরঙ্গের কম্পনমাত্র সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া যায়। একটি ভুলের জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ভুল যে করে সে তাহার ভ্রান্তি ও অনিবার্য্য পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সংশোধনের চেষ্টাও সে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। এক দিকে বিবেকের অনুশাসন অন্য দিকে প্রাণের আকুল আকুতি এই দোটানার স্রোতে পড়িয়া মানুষ তৃণখণ্ডের মত অকূলে ভাসিয়া যায়। সহজাত জ্ঞানের দীপশিখায় যাহাকে অন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারই দুর্ব্বার আহ্বানে সাড়া দিয়া

মানুষ অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করিতেছে। বঙ্কিমের নিজের ভাষায় বলি, "......কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।" একজন একজনের জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। অথচ যাহার জন্য সে এই আত্মত্যাগে প্রস্তুত সে চেষ্টা করিয়াও তাহার এই অঞ্জলি গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ; হয়ত তাহার হৃদয় তখন আর একজনের দুয়ারে প্রণয়ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে যেখান হইতে প্রতিদানের কোন আশাই নাই। এই যে মানব-অদৃষ্ট ইহাই বঙ্কিমের উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।

গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, রোহিণী, কুন্দ, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, হীরা প্রভৃতি সকলেই একই পথের পথিক। কল্যাণময় অন্তরালোকে তাহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল, যে-পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে সে পথে কোন দিনই তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু মিলিবে না ; বরং স্পষ্টই দেখিয়াছিল ঐ পথের শেষ যেখানে সেখানে তীর্থ-দেবতার দেউল নাই, আছে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বর। সেখানে আলো নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। আছে অনন্ত আঁধার, অসীম দুঃখ, সীমাহীন অশান্তি আর অপরিসীম অতৃপ্তি। সেই চরম-পরিণতি দর্শনে তাহারা শিহরিয়া উঠিয়াছিল ; প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল ফিরিতে। কিন্তু পারে নাই, কোন এক কুহকিনীর ইন্দ্রজালে আচ্ছন্নের মত তাহারা সেই বিনাশের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদেই ধাবিত হইয়াছিল। আত্মসংযমের জন্য রোহিণী কি প্রাণপণ প্রয়াস না পাইয়াছিল। বিধাতার কাছে তাহার শক্তি-ভিক্ষার কথা পড়িলে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমার রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ্য যন্ত্রণা, অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু? হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।" কিন্তু হায়, বিধাতার অসীম কৃপা-পারাবার হইতে এক বিন্দু পরিমিত কৃপাবারিও রোহিণীর অদৃষ্টে মিলে নাই। রোহিণী আত্ম-সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার "স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না।" গোবিন্দলালও ঠিক একই ভাবে একই প্রার্থনা বিধাতার কাছে জানাইয়াছিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" কিন্তু গোবিন্দলাল ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনিও 'মরিয়াছিলেন', ভ্রমরও মরিয়াছিল। নগেন্দ্রর অবস্থা তাহাই। কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে জানি না, কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু যেই ক্ষণে তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখন হইতেই কঠোর হস্তে কুন্দকে সেই আসনচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই। আত্মজয়ের চেষ্টা এখানেও ব্যর্থ হইয়াছিল। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে বলিতেছেন, "সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব ; আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই ; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্তবশ হইল না।" সূর্য্যমুখীও কমলমণিকে লিখিত পত্রে ইহা স্বীকার করিয়াছে—"আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।......" আর কুন্দ? আত্মজয়ের জন্যই ত সে নিশীথিনীর নীরব প্রহরে নগেন্দ্রর নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অজানা পথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু হায় পারিল না। আবার তাহাকে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রেমের পবিত্র কুসুমে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের ভ্রমর গোবিন্দলালের অর্চ্চনা করিতে চাহিয়াছিল। অদেয় বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না। কিন্তু সে আশা কি তাহাদের পূর্ণ হইয়াছিল? হীরা অসঙ্কোচে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পদ দেবেন্দ্রের চরণতলে অর্ঘ্য দিয়াছিল। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পাইয়াছিল? অপমান আর লাঞ্ছনা। কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অদেয় কিছুই ছিল না। তথাপি এই বনবালা নবকুমারের প্রণয়ের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারিল না। সমুদ্রের শীতল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তাহার সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। মানব-জীবনের এই ভয়াবহ পরিণতি এই চরম সর্ব্বনাশ দর্শনে জনৈক ইংরেজ মনীষী যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন,

"The purest reality, the purest beauty, the purest love cannot by its own nature, manifest itself here on earth without disaster but in disaster it can."

সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত হইবেই। কিন্তু এমন দিন হয়ত কোন কালেই আসিবে না যেদিন সে বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহে বর্ণিত সমস্যাগুলির হাত হইতে মুক্ত হইবে। এ সব প্রশ্ন সাময়িকও নয়, আর বিশেষ সমাজেরও নয়। সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বমানবীয়। ইহাদিগকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহার আবেদন সকল যুগের সকল মানুষের কাছে পৌঁছিতে বাধ্য। যদি কোন সাময়িক সমস্যা বঙ্কিমের সাহিত্যের উপজীব্য হইত তাহা হইলে তাহার

আবেদন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনীন হইত না—স্থান ও কালের সীমারেখায় তাহার পরিধি চিহ্নিত হইয়া যাইত।

বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় 'art for art's sake' নীতিকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহার কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ বিরোধী। বার্ণার্ড শ জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বঙ্কিমের সম্বন্ধেও সেই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য, যথা :

"I am of opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live, it is my privilege to do for it whatsoever I can. I want to be thoroughly used up when I die for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch which I have got hold of for the moment and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations."

যাঁহারা 'আর্ট'-বিলাসী তাঁহাদের সহিত জীবনের সম্বন্ধ ততটুকু যতটুকু না হইলে উপাদানের অভাবে আর্টের চর্চ্চা সম্ভব হয় না। জীবনটা তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ গৌণ। পক্ষান্তরে বঙ্কিমের নিকট জীবনই ছিল মুখ্য। তিনি জীবনকে ভালবাসিয়াছিলেন। শত কদর্য্যতা, ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও জীবন তাঁহার নিকট অবহেলিত হয় নাই, শুধু তাই নয় আদর্শবাদীর যাহা ধর্ম্ম—জীবনের একটা মহৎ ও উজ্জ্বল রূপ—তিনি ধ্যান করিতেন। যেখানে তিনি কদর্য্যতা বা কালিমা লক্ষ্য করিয়াছেন, পাপের কলুষস্পর্শে যেখানে বিষ সঞ্চারিত হইতে দেখিয়াছেন সেখানে তিনি অসহ্য বেদনাবোধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাণ, মন ও আত্মা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ, শুধু বেদনা বোধ করিয়া তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, নীতিজ্ঞানের দ্বারা সেই কদর্য্যতা ও পাপকে দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। নীতিজ্ঞানকে তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। কায়ার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় ইহা তাঁহার কবিপ্রতিভার সগোত্র হিসাবে তাঁহার সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ "জীবন যাহার বিষয় সেই সাহিত্য আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহাতে জীবনের রূপসমগ্রতা প্রকাশ পাইত না। তাঁহার রচনায় যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে তাহাতে যদিও আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কাব্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। কারণ সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তির প্রতিভা; এবং জীবনকে যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সে-ই তত বড় ব্যক্তি, তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট টাইল—তাহাই Great Art." (শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)।

উপরের কথাগুলির মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিভার মূল সূত্রটি বিধৃত রহিয়াছে।

আলোচনা

"নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা"

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

প্রবাসী আষাঢ় ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ ও প্রবাসী ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনা পড়িয়া বুঝিলাম ঐ প্রবন্ধদ্বয়ের প্রতিপাদ্য দেবতাগণ সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান হয় নাই। নিম্নবঙ্গে যিনি বাবা ঠাকুর নামে কথিত, তিনিই হয়ত মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের বনাঞ্চলে বৃক্ষতলে কিংবা শহরের চতুষ্পথে মকর সংক্রান্তির রাত্রিতে বড়াম ঠাকুর রূপে পূজিত হন। স্থানভেদে ইনিই বড়াম চণ্ডী ও বোড়াই চণ্ডী।

দক্ষিণরায় পৃথক দেবতা বলিয়াই মনে হয়। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতির মত তিনিও হয়ত মনুষ্যদেহধারী ছিলেন। মহাকবি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের মাতা "রায়বাঘিনী" রূপে পূজিতা। মেদিনীপুর ক্ষীরপাইয়ে ঐ নামের দেবতা আছেন। ঐ বংশের প্রথম রাজা কৃষ্ণরায়ের দক্ষিণরায় নামে যে পুত্র ছিলেন, কুলগ্রন্থে তাঁহার ধারা দেখি নাই। তিনিই কি দক্ষিণরায় নামে পূজিত হইতেছেন?

অক্ষয়বাবুর আলোচনায় "মেদিনীপুরে ঘাটাল মহ-[illegible]" ইতি [illegible]।

চেতুয়া বাসুদেবপুর, বৈকুণ্ঠপুর, নির্ভয়পুর, চাঁদপুর প্রভৃতি ঐ মহকুমার বহু গ্রামের মন্দিরেই শীতলা ও মনসা দেবীর সহিত নিম্নোক্ত ধ্যানের অনুরূপ পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের মূর্ত্তি বিদ্যমান, উঁহার দুই পাশে উপদেবতা মূর্ত্তিদ্বয়।

ধ্যান :—বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং নক্তহস্ত সমন্বিতম্।
লোচনত্রয় সংযুক্তং তক্তাভীষ্ট ফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহংভজে॥

মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের দেবতাটির সহিত ইঁহার মিল আছে। মেদিনীপুরের কেপুত গ্রামে ও হাওড়ার আমতা প্রভৃতি অঞ্চলে বটবৃক্ষতলে ঘটরূপে পঞ্চানন্দ পূজিত হন। শনিবারই উঁহার পূজার প্রশস্ত দিন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইনি বটুক ভৈরব। প্রবাদ যে, শিবই শত বলি গ্রহণের জন্য পঞ্চানন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নিমতলা ও মেদিনীপুরস্থ দাসপুরের নির্ভয়পুর প্রভৃতি স্থানে পঞ্চানন্দ শ্মশানের দেবতা রূপেও পূজিত। নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইনি পাঁচু ঠাকুর। এই সকল দেবতা সম্পর্কে সত্য নির্ণয়ের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বুড়ো শিব

শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

"হে বাবা বুড়ো শিব, তুমি কেপ্পা কর নাথ। ওই বোয়েদীর পুতের সব্বনাশ হোক, সব্বনাশ হোক, সব্বনাশ হোক। ওকে সগ্গে বংশাক দেব—ও-রাত্তির যেন না কাটে ভাবতা। তুমি দেখো, তুমি দেখো, তুমি দেখো।" বগলা বুড়ী মাথা ঠোকে আর বিড়বিড় করে আওড়ায়।

বুড়ো শিবের 'থানে' তখন শেষ-চৈত্রের খরা রোদ। রোদ তো নয় আগুন। বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও রৌদ্রের উত্তাপ এত। বুড়ীর ভ্রূক্ষেপ নাই। পাথরের চাতাল রৌদ্রে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর বগলা বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে। রতন বুড়ী আমগাছটার ছাওয়ায় দাঁড়াইয়া ঢাকে কাঠি মারে আর বুড়ীর দিকে চাহিয়া দেখে। বুড়ীর মাথা ঠোকা আর শেষ হয় না। বৈকাল হইয়া আসিলেও এ থানটায় এখনও প্রচণ্ড রোদ। গাছপালাও বেশী নাই—চাতালের বাঁ পাশে শুধু একটা আমগাছ—কাঁচামিঠে আম। সামনে পালেদের বৈঠকখানার বাঁধান বারান্দা। তাহারই উপর বাটি হাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড়—অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর। প্রসাদপ্রার্থী। ওধারে একটা ছোট চালাঘর। তাহাতেই একটা উনানে পূজারী ব্রাহ্মণ ভোগ চাপাইয়াছে। পাশে দাঁড়াইয়া মুখুজ্জে-গিন্নী।

বগলা বুড়ীর মাথা ঠোকা শেষ হইয়াছে। সে উঠিয়া আসিয়া আমগাছের ছাওয়ায় দাঁড়াইয়াছে।

রতন মুচ্কি হাসিয়া বলে, কি পিসী, অত মাথা ঠুকছ্যালে ক্যানে গো?

—মরণ তো হয় না, মরণ মাগছিনু রে মুখপোড়া। বুড়ী জবাব দেয়।

রতনের হাসি এবার স্পষ্ট হয়—তা বেশ, তা বেশ। বুড়ী রাগিয়া ওপাশটায় সরিয়া দাঁড়ায়।

মুখুজ্জে গিন্নীর বয়স হইয়াছে—চোখে ভাল দেখিতে পান না। পূজারীকে ডাকিয়া বলেন—ভাখো তো তারক, ওই আমগাছের ছাওয়ায় বগল দাঁড়িয়ে না। তারক উনানে ফুঁ দিতেছিল—মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। হ্যাঁ গো বগলই। বলিয়াই আবার ভিজা কাঠে ফুঁ দিতে আরম্ভ করে। বুড়ী ঐদিকেই যাইতেছিল। বোধ হয় পুকুরে যাইবে। ভোগের চালার কাছে আসিয়া বুড়ী নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। সাবধানে ছায়া বাঁচাইয়া অগ্রসর হয়। মুখুজ্জে-গিন্নী হাঁকেন, বগল—অ বগল। বুড়ীর কানে সে স্বর পৌঁছায় না।—বলি ও বগল কাদের মাথা খেয়েছিস্? মুখুজ্জে-গিন্নী এবার জোরে জোরে হাঁকেন। বুড়ী দাঁড়াইয়া পড়ে, বলে, আমি কাদের মাথা খেতে যাব কেনে, সে খেয়েছ তোমরা।

কথাটা ব্রাহ্মণ-পূজারী তারককেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছিল। কারণ আছে। সেদিন বুড়ী ছেলেদের সহিত ভোগের প্রসাদ লইতে আসিলে ব্রাহ্মণ এক কৌটা পায়েস ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সে সামে মাত্র। ব্রাহ্মণের দোষ নাই, নইলে কুলায় কৈ। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও বুড়ী আর এক কৌটা পায় নাই। রাগটা সেইজন্যই। কিন্তু চোখ তুলিতেই নজরে পড়িল, প্রশ্নকর্ত্তা পূজারী ব্রাহ্মণ তো নয়ই—আর কেহ হইলেও বোধহয় রক্ষা থাকিত, কিন্তু সে স্বয়ং মুখুজ্জে-গিন্নী। বুড়ী পূর্ব্ব সম্বন্ধের দোহাই পাড়িয়া চট্ করিয়া কথা ঘোরায়। বহু দিন আগে তাহারা 'মনের কথা' পাতাইয়াছিল।

—ওমা 'মনের কথা' তুমি। আমি বলি কে না কে। তা তুমি কিছু মনে কোরো না দিদি—চোখেও পাই নে দেখতে, কানেও পাইনে শুনতে। তা—কি বল্ছিলে?" বুড়ী জিজ্ঞাসা করে। স্রেফ ভুলিয়া যায় এই মাত্র সে বলিয়াছে কাদের মাথা খাইয়াছে অপরে—সে নয়।

মুখুজ্জে-গিন্নী আর কথা বাড়াইলেন না। গলার স্বর একটু উচ্চে চড়াইয়া বলিলেন—না বগল, এসব ভাল নয়। এই তোর মেয়ের কথাই বলছি। কম্লা রে কম্লা। মুখুজ্জে-গিন্নীর স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠে, সে হারাম-জাদীর কাণ্ডটা আজ শোন্। সকালবেলা সবে চান সেরে আলোচাল ক'টা নিয়ে এসেছি—ঘাটে ধোব বলে। কাল থেকেই মনে করে রেখেছি বাবার ভোগটা আজ আমিই দোব। চাল ক'টা ধুয়ে সবে সিঁড়িতে জল ঝরতে দিয়ে হাতটা মুছছি আর তোর ঐ আহ্লাদী মেয়ে ছলাৎ করে দিলে গায়ে জল। তুই-ই বল্ না হাতে চাল ক'টা থাকলে আজ কি ভোগই দিতুম করে? ও হারামজাদীকে বারণ করে দিস্। আর বলতে, বললে কি জানিস্—হ্যাঁ গো হ্যাঁ একটু সরে গিয়ে ধুলেই তো পার। বলে কোমর বেঁকিয়ে—মুখুজ্জে-গিন্নীর তোবড়ানো মুখ কিয়ৎকাল বিকৃত হইয়া থাকে।

বুড়ী এবার নিজের মাথায় একটা চড় মারিয়া বলে, 'সবই আমার অদেষ্ট গো। কাকে বারণ করব? আমার বারণটা শুনছে কে? সে হারামজাদীকে বলতে গেলে আমাকেই উল্টে দা-কতক বসিয়ে দেবে। পিথিবীতে কত লোক মরে, আমার মরণ হয় না।' বুড়ী পুকুরঘাটের পথ ধরে। পুকুরপাড়ে আম-কাঁঠালের গাছের ঘন সারি। পৈঁঠায় ছায়া পড়িয়াছে। বুড়ী সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদে। নিজেকে অভিসম্পাত

দের—কত্তার মৃত্যু কামনা করে—'বোরেগীর পুতে'র 'তে-রাত্তিরে'র মধ্যে সর্প-দংশন চাহে। ওধারে তখন ঢাকের বাজনা থামিয়াছে—ভোগ-রন্ধন বোধ হয় শেষ হইয়াছে। এবার ভোগ নিবেদনের পালা। তাহার পরের কাজটুকু অর্থাৎ প্রসাদবিতরণের অপেক্ষায় বুড়ী বসিয়া থাকে।

প্রসাদ খাইয়া, পুকুরে হাত ধুইয়া, বোরেগীর পুতের আর একবার মৃত্যু-কামনা করিয়া বুড়ী বাড়ীর পথ ধরে। এ পথটুকু বুড়ী মেয়েকে গাল পাড়িতে পাড়িতে চলে। মেয়ের উপর বুড়ীর অভিযোগের আর অন্ত নাই। বুড়ী তো নিজেই বলে সময়ে অসময়ে—কি করব মা, নইলে নিজের প্যাটের মেয়ে। কিন্তু ব্যাভারটা দেখো—যেন সতীনের মেয়ে গো।

২

পণপ্রথা লইয়া অনেক হৈ-হল্লোড়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হৈ-হল্লোড় যতটা হইয়াছে ফল হইয়াছে তার তুলনায় খুবই কম। কিন্তু এই যে আন্দোলন ইহাতে যাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা—তাহারা বরপক্ষ। কিন্তু কন্তাপক্ষও যে পণ লয় এবং পণপ্রথাবিরোধী আন্দোলন যে অতি উৎসাহীরা তাহাদের বিরুদ্ধেও চালাইতে পারে এ দিকটা বোধ হয় তেমন নজরে পড়ে নাই। কিন্তু আন্দোলন যদি বা চালান যায়, ফল বোধ হয় কিছুই ফলিবে না; কেমনা নিম্নশ্রেণীর এই সব হিন্দুর মধ্যে বিবাহবন্ধনটা উচ্চ শ্রেণীর মত অত সযত্নে রক্ষিত তো হয়ই না বরং ঐ প্রকার রক্ষণটাই যেন ব্যতিক্রম। সেজন্য বিবাহ হয়—পত্নী বর্তমান থাকিতে অপর বিবাহ হয় ত সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরই আবার নূতন বিবাহের আয়োজন চলে। তাহাকে ইহারা বিবাহ বলে না—বলে, 'নিকে'।

বগলা-বুড়ীর মেয়ের নাম কমলা। এদের সমাজের নিয়মমত তাহার বিবাহও হইয়াছিল নবম বর্ষে। কিন্তু স্বামীর ঘরের পাট চিরকালের মত সারিয়া যখন সে আবার পিতৃগৃহে আসিল তখন তাহার বয়স ষোল। ষোড়শী যুবতী—এমন মেয়েকে মা সর্ব্বদাই আগলাইয়া ফেরে। সযত্নে নূতন আশার স্বপ্নও দেখে বগলা-বুড়ী। মেয়ে তাহার দেখিতে খারাপ একথা কম লোকই বলিতে পারিবে—তাহার উপর এই বয়স। বুড়ী রঙীন সুতোর জাল বোনে। 'নিকে' হইবে কমলার বড় এক চাষীর ছেলে—একটি 'মাতব্বর' ছেলের সঙ্গে। টাকা ত কিছু পাইবেই আর অমন জামাই পাইলে এত দুঃখ-ধান্দার আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কিন্তু বুড়ীর এই যে এত যত্নে বর্দ্ধিত আশা, একেবারে ইহার মূলে যে কুঠারাঘাত করিল সে আর কেহ নহে, সে তাহার মেয়ে কমলা নিজেই। বুড়ী তাই রোজ সন্ধ্যাবেলায় আকাশের তারাগুলার দিকে চাহিয়া অদৃষ্টকে গালি পাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও—ঠাকুর কি 'মেকন' লিকেছিলে আমার কপালে গো—আর ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়েকে বশে এনে দাও হে ঠাকুর।

এবার আরম্ভ হইল বোরেগীপর্ব্ব। বগলা-বুড়ীর এত বড় আশায় বাদ সাধিয়াছিল তাহার মেয়েই সন্দেহ নাই, কিন্তু আনুষঙ্গিক হিসাবে যাহার নাম করিতে হইবে, সে ঐ বোরেগীদের নিতাই বৈরাগী। শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে। চাষবাসে মন নাই। বুড়ী তাহাকে অনেক বিশেষণেই আপ্যায়িত করে। কখনও বলে 'উড়নচণ্ডী', কখনও 'বাঁশ-ঘুকো', কখনও 'ড্যাকরা'—এমনি আরও কত কি। ওকে জমি দিতে চাহিয়াছিল হরেন পাল। লাঙল গরু সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু নিতাই সম্মত হয় নাই। ওর রক্তে কেমন এক ধরণের উগ্র উল্লাস আছে, তাই চাষবাস করিয়া অমন শান্ত জীবন যাপন করিতে সে চাহে না। কাছের শহরে পাটের কলে সে কাজ করে—থাকে সেখানেই। মাঝে মাঝে আসে গ্রামে। পিছুটান কিছুই নাই, যেটুকু আছে তাহাকে এক কথায় বলা যায়—তাহা ঐ কমলা।

সেদিনকারই কথা। সকালবেলা কমলা গরু বাহির করিয়া মাঠে বাঁধিয়া দিতে গিয়াছিল। মাঠের পথে না ফিরিয়া সে একেবারে পাড়ার মধ্য দিয়া আসিল—উদ্দেশ্যটা একেবারে চৌধুরীদের বাসন কয়টা মাজিয়া দিয়া বাড়ী ফেরে। ঘাটে বাসন মাজিতেছিল—মুখুজ্জে-গিন্নীর গায়ে জল লাগিয়াছিল তখনই। বাসন মাজিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতেছিল। পথ সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশীদের উঠান বাগান ডিঙাইয়া আসিতে আসিতে বোরেগীর খড়ের ঘরটার দিকে নজর পড়িল।—পায়ে এক রাশ ধূলা, পাশে একজোড়া নূতন জুতা—লোকটিকে চিনিতে কমলার এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। সে নিতাই। কমলা এক মুহূর্ত ভাবিল, লোকটা এত সকালে আসিল কোথা হইতে? থাকে ত বিশ মাইল দূরে—শহরে, রতনগঞ্জে। হয়ত রাত্রিশেষে বাহির হইয়া পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছে—বিশ্বাস নাই। এ লোকটা পারে না এমন কাজই নাই। তাই কমলার আশ্চর্য্য ঠেকিল না বরং ঐ যে লোকটি একহাঁটু ধূলা লইয়া জুতাজোড়াটি খুলিয়া রাখিয়া বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তাহার জন্য কমলার মনে জাগিল উৎকণ্ঠা।

কমলা দাঁড়াইয়া পড়ে। উঠানের একপাশে একটা শিউলি ফুলের গাছ। এক গাছা ঝাঁটা গাছটির গায়ে ঠেস দেওয়ানো ছিল। কমলা ঝাঁটাগাছটি টানিয়া লইল। উঠানে একরাশ পাতা জমা হইয়া আছে—কত দিন ঝাঁট পড়ে নাই। কমলার মনে পড়ে—সেবার নিতাই আসিয়াছিল, তখন দুরন্ত শীত। সেটা মাঘ মাস—আজ দু'মাসের কথা

হইতে চলিল। দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতিতে ঘাসগুলি পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, অতাত ছোট চারাগাছও আছে। কমলা পাতাগুলি ঝাঁট দিয়া এক পার্শ্বে জড়ো করিয়া রাখিল। দাওয়ার এক পার্শ্বে একটা উনান তাহাতে কত দিন রন্ধন হয় নাই। উনান পরিষ্কার করিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া দেখিল নিতাই বসিয়া হাই তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নিতাই বলিল—ইস্, এর মধ্যে উঠোন ঝাঁট, উনোন-পাড়া হয়ে ত গেল সব। বড্ড খিদে লেগেছে যে—কি খাব বল তো ?···মুহূর্তে রাগে কমলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় সাত-সকালে সে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করিয়া রান্নার উত্তোগ করিয়া দিল তাহার জন্ত দুটো মিষ্টি কথা দূরে থাক—উঠিয়াই খাই খাই আরম্ভ করিয়াছে। রাগে মুখ ঘুরাইয়া সে বলিল—কি খাব ? ঐ যে খাও না, উনানের পাশগুলো জড়ো করে রেখেছি।—নিতাই শুইয়া পড়িয়া আর একটা বিরাট হাই তুলিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিল কমলা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বলিল—তোকে কে ডেকেছে রে ? পায়ে পড়ে কাজ করতে কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে। যা-যা আমার খাবার ব্যবস্থা আমি করে নেব'খন।

ইহার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। অভিমানে কমলার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। হাতের ঝাঁটাগাছটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে অদৃশ্ত হইয়া গেল। নিতাই হাসিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল।

বাড়ী ফিরিতে বাস্তবিকই দেরি হইয়াছে। বগলা-বুড়ী দাওয়ায় বসিয়াছিল। মেয়েকে দেখিয়া আরম্ভ করিল—এই যে গরু বাঁধা হ'ল ? সকালবেলা ত বেরিয়েছিলে। কোথায় মস্করা করা হচ্ছিল শুনি ? কমলা কোন কথা বলিল না। বুড়ী বলিল—হারামজাদী, বিশ দিন বলেছি গরু বেঁধে এসেই আমার ভাত বেড়ে দিবি। বুড়োমানুষ সকালে কিদে লাগে।

এই এখনি এক জায়গায় ক্ষুধার জবাবদিহি করিয়া আসিয়া কমলার মন মেজাজ ভাল ছিল না। আবার ক্ষুধার কথা শুনিয়া সুর চড়াইয়া বলিল—খেগে না বেড়ে। রাক্কোস —সব রাক্কোস।

বুড়ী সমান চড়া গলায় উত্তর দেয়—কে রাক্কোস রে হারামজাদী ? সে তুই। পিথিবীতে পড়তে তর সইল না অমনি বাপকে খেলে। বাপ্‌খাগী আবার আমায় বলে রাক্কোস। খাবই ত—নিজেই বেড়ে খাব।—বুড়ী উঠিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া কমলা ফিরিল। বুড়ী বন্ধ ঘরে চেঁচাইতেছে—ওরে সব্বনাশী, ও হারামজাদী—শেকল খোল্, শেকল খোল্। কিন্তু শিকল যে খুলিবে সে তখন আমবাগানের পথ ধরিয়া সোজা রায়বাড়ী চলিয়াছে।

বুড়ী ভাত বাড়িয়া খাইয়া বন্ধ ঘরে বসিয়া বসিয়া মেয়েকে গালি দিতেছিল। হঠাৎ শিকল খুলিয়া গেল—সামনে দাঁড়াইয়া অভয়ার মা। 'শেকল তুল্ল কে দিদি ?'

আমার প্যাটের মেয়ে 'যম্'। মেয়েকে ভাত বাড়তে বলেছি ত গোসা করে দিল শেকল তুলে। আমার মরণ হয় না গো—বুড়ী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

কেঁদে কি করবি বোন্। অদেষ্ট গো। সব অদেষ্ট। নইলে তোমার অমন মেয়ে—অভয়ার মা সান্ত্বনা দেয়।

অদেষ্ট, অদেষ্ট, হা অদেষ্ট। বুড়ী কপাল চাপড়ায়।

আসি, দিদি আর একটা কথা বলছিনু গো।

কি কথা লো ?

আমার অভয়ার বিয়ে এ মাসের মধ্যেই দেব বোন্। ছেলের বাপের কুড়ি বিঘে জমি চাষ। সব ধান-জমি। দু'এক বিঘে আলুর জমিও আছে। টালির ছাউনি বড় বড় দুখানা ঘর। একটাতে বাপ—একটাতে ব্যাটা। মিন্‌সের পরিবার অনেক দিন হ'ল গ্যাছে। ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল ওই হরগঞ্জে। তা—বৌটা বাঁচল না। বুড়ো এসেছিল। দিন ঠিক করে ফেলেছি—এখন কেবল ভালয় ভালয় মিটে গেলেই বাঁচি।

বুড়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর আমার মেয়ে। মেয়ে ত মর খাওয়ারী। নইলে আমারই আবার দুঃখ কি গা ?

অভয়ার মা ফোঁস্ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সহানুভূতি দেখাইল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তবে, কথা যখন তুললে দিদি বলি শোন। গাল-মন্দ ক'র না, ভালর লেগেই বলছি। এই সকালে ওধারে কি জন্তে গেছি—দেখি মেয়ে তোমার ঐ বোরেগীর উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। ভাবনু—একটু দেখিই না ব্যাপারটা। তা দিদি দু'জনে কত হাসি মস্করা—আমি গুটি গুটি চলে এনু। এমনি যদি দিনদুপুরে যখন-তখন এমনটি চলে তবে দশ জনের মুখে হাতই চাপা দেবে কি করে ? এপাড়ায় যা সব মিন্‌সেগুলো—তখনই বেফাঁস করে দেবে। এই বেলা সোজা কর দিদি। পাঁচ জনকে নিয়েই ত সব কাজকম্ম। আর এমন ব্যাপারে পাঁচ জনে ত পাঁচ কথা বলবেই। আমি সময় থাকতে তাই বলছিনু দিদি, আর কেন এবার রাশ টেনে ধর। আসি তা' হলে—রাগ করিস্‌নি দিদি।

বুড়ী গুম হইয়া থাকে।

সকালবেলা এই কাণ্ডের পর বুড়ী এবার বোরেগীর পোকে গালি দিল। তাহাকে খানিকটা গাল পাড়িয়া এবার অভয়ার মাকে লইয়া পড়িল।

ছিরি দ্যাখ না মাগীর। যেমন মেয়ে তেমনি মা। আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে এসেছে। তোর মেয়ের দিকে তুই দিবি ত আমার কি লা ? মর্, মর্, মাগী।

এমন কাণ্ডের পরে রাগ সকলেরই হয়। তাই বগলা-বুড়ীর রাগ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ঐ বোষ্টমীর জন্যই ত তাহার এই সর্ব্বনাশ। বোষ্টমী অবশ্য গাঁয়ে-ঘরে থাকে না। তবে যখনই আসে তাহাকে জ্বালাইয়া খাইতে ছাড়ে না। এ পর্য্যন্ত বোধ হয় চার-পাঁচ বার বোষ্টমী বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছে —এবারে শহর হইতে ফিরিয়া একেবারে ছুটি লইয়া আসিয়া বিয়ের কাজকর্ম সব সে মিটাইয়া ফেলিবে, তাহার মেয়েকে সে শহরে লইয়া যাইবে। আর বুড়ী যদি একান্ত না যায় তবে মাস মাস তাহার নামে পোষ্টাপিসে টাকা পাঠাইবে। বুড়ীর অবশ্য আশা আরও একটু উঁচুদরের ছিল। বোষ্টমীর না আছে চাল না আছে চুলো। তবে হ্যাঁ নগদ পয়সা কামায় শহরের কলে ঐটুকুই যা। তাহার উপর মেয়ের তাহার এমনি গোঁ যে আর কাহাকেও আমলই দিতে চাহে না। বুড়ী তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাকে মত দিয়াছিল। কিন্তু মত যাহাকে দিয়াছিল তাহার বোধ হয়, মত ঘুরিয়া গিয়াছিল, কেননা ইহার পর আসিয়া সে আর ওকথা মুখে আনে নাই। অবশ্য ছোঁড়াটা যে খুবই 'মন্দ' তাহা নহে। কমলাকে তো আরশি, চিরুনি, চুলবাঁধা ফিতে, কাঁটা সবই দিয়াছে। কাপড়ও দিতে চাহিয়াছিল, মেয়ে তাহা লয় নাই—আ মর্-মর্-মর্। তাহাকেও দু-এক ঠোঙা মণ্ডামিঠাইও খাওয়াইয়াছে, কিন্তু বিয়ের বাবে আবার যে-কে সে। ওকথা আর মনেই নাই। তাই বুড়ী এই টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া এটুকু স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, সব অনর্থের মূল ঐ বোষ্টমীর পো। এই ভাবে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে তাই বুড়ো শিবের 'থানে' রাত্রির মধ্যে বোষ্টমীর পোর সর্পদংশনে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। বুড়ীর বড় ছেলে কেষ্ট খাতা সবে কাজ সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়াছে। বুড়ী পুকুরঘাট হইতে ছেলের হাত ধুইবার জন্য গাড়ুতে জল আনিতে গিয়াছিল। আসিয়া দেখিল রীতিমত আসর জমাইয়া নিতাই বসিয়া গিয়াছে। কেষ্ট ও নিতাই মিলিয়া কি একটা পরামর্শ করিতেছিল। বুড়ীকে দেখিয়া আবার সব চুপচাপ। বুড়ী নিজ মনে গস্ গস্ করিতে করিতে দাওয়ার উপর গাড়ু নামাইয়া রাখিয়া উঠানে গিয়া বসিল। কমলা উঠানে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজের পোষা বিড়ালটিকে আদর করিতেছিল। বুড়ী বসিয়া পড়িয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল—নিতাইকে দেখিতেই পায় নাই, ভাবটা এমনি।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কেষ্ট হাত ধুইয়া দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া আছে—বুড়ী আকাশের তারা গুনিতেছে, কমলা বিড়ালটিকে লইয়া যেন আলাদা জগতের মানুষ। কিন্তু নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

—মাসী, অ-মাসী। নিতাই দাওয়া হইতে হাঁকিল।

—কে রে ?

—আমি নিতাই গো মাসী।

—এবার কি মনে করে ভালমানুষের ছেলে—

—অই ভাখ, মাসী যেন কি ? কোথায় এসেই তোমাদের খোঁজখবর করতে এনু—

—থাক্, থাক্ বাবা, খোঁজখপর আমাদের আমরাই করব। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও বাছা।

নিতাই আড়চোখে একবার কমলার দিকে চাহিল। সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নায় কমলাকে বড় রহস্যময়ী লাগিতেছে—তাহার পানের রসে রাঙা ওষ্ঠাধরে এক ঝলক হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কে জানিত ইহার মধ্যেই দু'জনের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।—সত্যই তো সকালের পর দীর্ঘ দুপুর ছিল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতে কত সময়ই বা লাগে!

নিতাই এবার দাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—কি মাসী, অত চুপচাপ কেনে ? আমার উপুর গোসা করে আর কি করবে বল ? টাকার জোগাড় করতে হবে তো। তোমার কাছে তো বারো গণ্ডা টাকার কম কথাই চলবে না। এবার কিছু জোগাড়-যাত করেছি—তা' হলে এই বোশেখেই হয়ে যাক্ কি বল। আমি কলের সাহেবকে বলে দিন দুই ছুটি নিয়ে আসব। সাহেব খুব ভাল লোক মাসী—অই তো টাকাগুলো দিলে।

টাকার কথায় বুড়ীর এবার সন্দেহ গেল।—তা বাছা, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝি না বাপ্। তোমার কথা তুমিই দিয়েছ—তুমিই ভেঙেছ। এবার টাকা হাতে পেয়ে—তবে কথা।

—তবে মাসী তাই হোক। টাকা হাতে দিয়েই কথা-বার্তা হোক। কিছু টাকা আমার কাছে যা আছে এখন দিচ্ছি। পরে কাজের সময় সব মিটিয়ে দোব।

নিতাই অর্দ্ধেক টাকা বুড়ীর হাতে দিল। বুড়ী নিতাইয়ের মাথায় হাত দিয়া বলিল, থাক্ বাবা, তোমার মতি স্থির হোক —এ তো ভাল কথা। তবে তাই হবে, আর দেরিই কেন। এবার সাহেবকে বলে কয়ে ছুটি নিয়ে এস। আর আমাকে একটা নক্সাপাড় কাপড় কিনে দিতে হবে বলে রাখছি বাবা।

পুরা আধ ঘণ্টা ধরিয়া ভাবী জামাইয়ের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুড়ী উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে বুড়ী বলিল, হ্যাঁ বাবা বলি কি—এ বেলা আমার কাছেই খাওয়া-দাওয়া সেরে যাও না কেনে। ওবেলা চারটে কইমাছ ধরেছিনু—ঝোল রাঁধব'খন।

নিতাই আপত্তি করে নাই—বিশেষ করিয়া তাহার রাঁধেই বা কে ?

খাওয়াদাওয়া সারিতে রাত্রি হইল। শুক্লা জ্যোৎস্নায় ওধারে সজনে গাছটার সাদা ফুলগুলা যেন একত্র হইয়া

গিয়াছে। অবগুণ্ঠিতা তরুণী নববধূর মতই গাছটিকে দেখাইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া কমলার ভারি ভাল লাগিল। ভাবী জীবনের রোমাঞ্চময় স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে উঠান হইতে উঠিয়া ঘাটের খেজুরগাছের গুঁড়ির উপর আসিয়া বসিল।

নিতাই মাসীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া নিজের ঘরে চলিল। কমলাকে পুকুরঘাটে দেখিয়া নিতাই কমলার দুই চোখে আঙুল চাপা দিল। শক্ত কড়া-পড়া হাত, কিন্তু কমলা বাধা দিল না। খানিক পরে নিতাই নিজেই হাত ছাড়িয়া দিয়া কমলার ডান হাত ধরিয়া টান মারিল।

—উঃ, লাগে না বুঝি।

—লাগে তো লাগে চোখ বোজ্। কমলা চোখ বুজিল। নিতাই কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া তাহার হাতে একটা কি ফেলিয়া দিয়া ঈষৎ চাপ দিল। কমলা চোখ খুলিল। জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে—সুগন্ধি একটা ফুলের মালা।

* * *

পর দিন বৈকাল। তারক বামুন ভোগ রাঁধিতেছে—রতন মুচী ঢাক পিটাইতেছে—পালেদের বাঁধান বারান্দায় আজও এক পাল ছেলেমেয়ের ভিড়। বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে—বাবা কালরুদ্দুর তুমি তো সবই বোঝ ভাবতা। বোয়েরীর পোকে শাপ দিছিলাম—সে শাপ ফিরিয়ে দাও দেব। একশো বছর পরমায়ু হোক হ্যালেটার।—হে বাবা কালরুদ্দুর।

—কোথাও কোন পরিবর্ত্তন নাই। পরিবর্ত্তন কেবল বুড়ীর প্রার্থনায়। আমগাছটার একটা ডাল বোধ হয় ছেলেদের দাপাদাপিতে ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের এক টুকরা বাবার বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। চকচকে সিমেণ্টের মেঝের উপর রৌদ্রের সেই প্রতিফলনটুকু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে কালো শিবলিঙ্গটির অনতিদূরে। শিবলিঙ্গ তাই চক্ চক্ করিতেছে।

বুড়ী মাথা তুলিয়া মূর্ত্তির দিকে চাহিল। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধার নিকট কিন্তু মূর্ত্তির এই ঔজ্জ্বল্যটুকু এড়াইল না। বুড়ী বিড় বিড় করিয়া নিজেই বলিল—বাবা হাসছে।—তাহার পর বুড়ী বাড়ীর পথ ধরিল। অন্যদিনের মত আজ তো তাহার মনে নাই যে, ভোগ-নিবেদনের পরেই প্রসাদ বিতরণের পালা। কেন—কে জানে!

৪

বাবার থানের সামনে পাল-বাড়ী। পাশে পালেদের নাটমন্দির। নাটমন্দিরের দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দাঁড়াইয়া পাল-গিন্নী ও তাহার বড় মেয়ে সুষি।

কথা হইতেছে পাল-গিন্নী ও সুষির মধ্যে। পাল-গিন্নী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মেয়েকে বলিলেন—হ্যাঁরে ও তো কেষ্ট খাড়ার বোন্ কম্‌লি না। ও-মা ও ছুঁড়ীও আবার পেন্নাম ঠোকে গো।

সত্যই বাবার 'থানে'র এক পার্শ্বে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেছে কমলা। আশ্চর্য্যই বটে। উহাকে কোন দিন দেবালয়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতে কেহ দেখে নাই। আজ কেন সে নিবিষ্টচিত্তে প্রণাম করে—কি তাহার প্রার্থনা?

ফিরে দাও

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফিরে দাও আমার সে সবুজ আমিরে—
ফেলিয়া এসেছি যারে কৈশোরের তীরে
অশ্রুধৌত, অনাবিল, সৌন্দর্য্য-পাগল।
সেদিন বিশ্বাস ছিল অচল-অটল
সুমেরু-পর্ব্বতসম। মনে হ'ত মোর—
তোমার অদৃশ্য দুটি স্নিগ্ধ বাহুডোর
আমার সত্তারে ঘিরে আছে সর্ব্বক্ষণ।
মনে হ'ত যাহা-কিছু করি নিবেদন
সব তুমি শোনো কানে। দিনে দিনে, হায়,
সে কৈশোর লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কোথায়!
প্রার্থনায় সে-দিনের নাই ব্যাকুলতা!
কোথা গেল বিশ্বাসের সেই সুদৃঢ়তা?
ফিরে দাও সে বিশ্বাস, সেই নিষ্ঠা মোর,
ফিরে দাও আমায় সে সোনার কৈশোর।

কেন ছেড়ে গেলে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এক দল সেনা লুট-পাট করে শুনি যে দেশে,
বজ্রের মতো অশ্বেরা ডাকে—হাঁটুতে ফেনা:
উদ্ধত আর কালো বেশ পরা, নির্নিমেষে—
হানিয়া চাবুক এলো নির্দ্দয় সারথি-সেনা!

তারা চীৎকারে যুদ্ধের নাম রাত্রিভাগে,
আমি ঘুমে কাঁদি শুনিয়া তাদের অট্টহাসি,
স্বপ্নের মেঘ তারা চিরে দেয়—আগুন জাগে;
লোহা পেটে যেন বুকের উপর—বিষের কাঁসি!

বিজয়-গর্ব্বে সবুজ কেশর নাড়িয়া আসে,
সাগর হইতে তারা এসে নাকি তীরেতে কোঁসে!
হে মোর চিত্ত! কতো হতাশাই চিত্তাকাশে,
প্রিয়া! প্রিয়তমা! কেন ছেড়ে গেলে—কি মোর দোষে?

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবরেণ্য শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বিগত ৮ই ডিসেম্বর গবর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্রাফট-এর প্রাঙ্গণে উক্ত শিল্পায়তনের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য কলেজের ছাত্রী মণ্ডপ ফুলে এবং আলপনায় সুশোভিত করিয়া, ইহার উপর কলেজেই রক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ধূপ ধুনা সহযোগে এই প্রতিমূর্ত্তিটিতে মাল্যদান করেন। তাহার পর সমবেত ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী এই স্বর্গত মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিবেদন করেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া এই দিনটি তাঁহারা শোকদিবস-স্বরূপ পালন করেন।

অবনীন্দ্রনাথ একদা এই বিদ্যায়তনটিতেই ভারতীয় শিল্পের লুপ্ত গৌরবময় ইতিহাসের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। যখন সমগ্র ভারতের শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা বিদেশীয় শিল্পের অন্ধ অনুরক্ত ছিল, যখন ভারতীয় শিল্প দেশবাসীর নিকট অপরিণত এবং অনুন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হইত তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার কাজে, লেখায় এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য আমাদের শুধু বহুমূল্য সম্পত্তিই নয়, ইহা হইতে ভবিষ্যতের বহুমুখী অনুপ্রেরণার সুযোগও বর্ত্তমান। তখনকার দিনে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অথবা তাঁহার চিত্রাবলী এক নবযুগের প্রবর্ত্তন আনয়ন করিলেও বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পরে আমরা "স্বাধীন ভারতে" বুঝিতেছি কি অপমান হইতে তিনি আমাদের দেশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান কথাগুলি আবার দেশবাসীকে স্মরণ করিতে বলি :

"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে. চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয় তবে এই যুগের চরম কর্ত্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করি।"

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা

[বাংলা "অমৃত বাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব আর নাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এক দিনের বা এক ব্যক্তির চেষ্টায় লব্ধ হয় নাই। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর আত্মদানে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর দীর্ঘ-কালব্যাপী বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে বাংলা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র নির্ভীক উক্তিসমূহ আজিও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শুধু রাজনীতি নহে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও যে আমরা তখন পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে-ছিলাম, এ কথাও বার বার আমাদের কর্ণকুহরে প্রতি-ধ্বনিত করান হয়। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে সত্যকার জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা, জাতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। 'পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এ সকল বিষয়েও বিভিন্ন প্রবন্ধে আমাদের মনোযোগী হইতে বলিয়া-ছেন। এখানে প্রাচীন বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা, গ্রন্থাগার, টোল চতুষ্পাঠী, কারুশিল্প-বিদ্যালয়, চিকিৎসাবিষয়ক বাংলা পুস্তক রচনা, বিজ্ঞানসভাদি প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ প্রদত্ত হইল। ইদানীন্তন কালেও প্রবন্ধোক্ত বিষয়সমূহের সারবত্তা আমাদের উপলব্ধি হইবে। এ সকল অনুসরণের প্রয়োজনীতাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে অবশ্য-শিক্ষণীয় কতিপয় বিষয়

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রথা অনেক দিন যাবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সাধারণ্যে ইহা সমাদৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যেক বিষয়েরই একটি প্রত্যক্ষ এবং গৌণ ফল আছে; প্রথমবিধ ফলেই মানব-মন অধিক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীতে প্রত্যক্ষ ফল দূরে থাকুক, পরোক্ষ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। যে দুইটি ফলের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তবেই পাঠক-বর্গ বুঝিতে পারিবেন।

বিদ্যার অর্থকরী ও জ্ঞানকরী দুইটি শক্তি আছে। অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষম হইয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, এবং বিদ্যাতে জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া মনুষ্যগণ বিমল মানসিক সুখ উপভোগ করেন। যদিও স্ত্রীলোকদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে না হউক, তথাচ তাঁহারদিগের এমন অনেক বিষয় জানা নিতান্ত প্রয়োজন যাহাতে কথঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এবম্বিধ শিক্ষাদান অভাবে স্ত্রী-শিক্ষায় উন্নতি প্রত্যাশা নিষ্ফল। প্রায় বালিকা-বিদ্যালয় মাত্রেই দেখা যায়, দুই চারিখানি সাহিত্য, গণিতের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম, একখানি ইতিহাস, এবং কয়েকটি স্থানের নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কি প্রণালীতে এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আগামীতে বলিতে ইচ্ছা রহিল, সংপ্রতি স্ত্রীলোকের অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।...

রন্ধন স্ত্রীলোকদিগের একটি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। সংপ্রতি কিরূপে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়িত্রীর উচিত যে তাঁহারা প্রত্যহ অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সহিত রন্ধন বিষয়ে একটি২ উপদেশ প্রদান করেন। পরন্তু তাঁহারদিগকে প্রথম২ এদেশ প্রচলিত সাধারণ অন্ন, ব্যঞ্জন, দেশীয় পিষ্টক ও লুচি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পলান্ন প্রভৃতি প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষা না দিলেও ক্ষতি নাই। কেননা আমরা সেসব সামগ্রী সচরাচর ব্যবহার করি না।...ক্রমাগত ছয়টি বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক, সপ্তম অর্থাৎ অবকাশ দিবসে তাহা পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা আমাদের বিবেচনায় বড় ফলোপধায়ক হইবে না। স্কুল গৃহের একপ্রান্তে, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে রন্ধন সামগ্রী লইয়া বালিকাদিগের দ্বারা পৃথক কয়েকদিন রন্ধন বিষয়ে যে কয়েকটি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যঞ্জন পাক করাইবেন। বালিকাদিগের ভ্রম লক্ষিত হইলে, শিক্ষক তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিবেন। সপ্তাহে না হয় পক্ষান্তে অবশ্যই এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ পরীক্ষাতে তিনটি উপকার লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বালিকারা শিক্ষিত বিষয় উত্তমরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়তঃ একত্র পানাহার দ্বারা তাহারদিগের পরস্পর বন্ধুতা ও আমোদ জন্মিবে। তৃতীয়তঃ এরূপ উপকারী শিক্ষা সন্দর্শনে লোকে আগ্রহের সহিত স্বীয় সন্ততিদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে। এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-সমাজ আছে, তাহা হইতে এই ব্যয় প্রদত্ত হইবে, যে স্থলে তাহা নাই ছাত্রীদিগের অভিভাবকেরা অর্থ বা দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন।

রন্ধনের পর জলপানি প্রস্তুত করা স্ত্রীলোকদিগের একটি প্রধান কর্ম্ম।...এই শিক্ষা কি প্রণালীতে দিতে হইবে সংপ্রতি তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। সন্দেশ ইত্যাদি প্রস্তুত

করা ছানা অভাবে পল্লীগ্রামে ঘটিয়া উঠে না। অতএব ছানা দ্বারা যে সকল সন্দেশ প্রস্তুত হয় তাহা প্রথমতঃ শিক্ষা না দিয়া, নারিকেল ও ক্ষীর দ্বারা যে সকল মিষ্টান্ন হয়, তাহাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর মিঠাই এবং পরিশেষে ছানার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখাইবেন। এ সকল বিষয় শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা উত্তম হইতে পারিবে। অতএব স্থানীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ বেতন প্রদান পূর্ব্বক, এতদ্বিষয়ে পটু গ্রাম্য কোন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিবেন। তিনি দিনের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বালিকাদিগকে এক স্থানে লইয়া শিক্ষা দিবেন। প্রস্তুত সামগ্রীতে যাঁহাদিগের অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পাইবে, তাঁহারদিগকে পুরস্কার দেওয়া বিধেয়।

আহার্য্য বস্তুর ন্যায় পরিধেয় বিষয়েও বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময় ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে, কিংবা জীর্ণ বস্ত্র সংস্কার করিতে সূচিকগণকে অনেক পয়সা দিতে হয়। পয়সা দিয়াও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, প্রাপ্ত হইলেও মনোমত হয় না। অতএব এইক্ষণ যদ্রূপ বালিকা বিদ্যালয়ে কারপেটের কায শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে পিরিহান, চাপকান, সুজনী ইত্যাদি প্রস্তুত করা, এবং ছিন্ন বস্ত্র "রিপু" করিতে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। এ সকল শিক্ষা লইলে, কারপেট শিখাইলে কোন ক্ষতি নাই।

এতদ্ব্যতীত বালিকাদিগকে 'শিকা', 'ভাগা' ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করান এবং চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। চিত্র বলিতে কেহ যেন কটগ্রাফ, কি লিথোগ্রাফ প্রভৃতির কথা আমরা বলিতেছি এরূপ বিবেচনা না করেন। কেননা সেগুলি সাধারণের পক্ষে সুদূরপরাহত, ও আকাশ কুসুমবৎ। যাহারা নগরবাসী তাহারা যে চিত্রের কথা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু লেখক যখন একজন পল্লীবাসী, তখন তিনি পল্লীগ্রামের অভাব বিশেষরূপে জানেন। পল্লীগ্রামস্থ অনেকগুলি ব্রতে এবং বিবাহে সর্ব্বত্রই নানা প্রকার চিত্রের প্রয়োজন হয়। হিন্দু বালিকারা তৎসমুদয় না জানিলে সমাজে অনেক অপদস্থ হন। অতএব এটিও বালিকা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নাই। ইহাও কোন স্ত্রীলোক দ্বারা অধ্যাপনা কর্ত্তব্য।

এ সকল শিক্ষাতে বালিকারা যদ্রূপ গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পরিবারে ব্যবহার্য্যা হইবে, তদ্রূপ তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রাখর্য্য জন্মিবে।...উপসংহারের পূর্ব্বে দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, প্রদর্শিত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবেই হইবে। যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়, সাধারণের মত। অতএব নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ে যেন বিশেষরূপে আন্দোলন করেন।
(১৬ ফাল্গুন ১২৭৪। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮)

কৃষকদিগকে বিদ্যাদান

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এদেশস্থ হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ভারি উৎসাহ দেখাইতেছেন। সব ঠিক হইয়াছে, কেবল টাকার অপ্রতুলতা।

কৃষকেরা এদেশের ছোট লোক। তাহাদের অবস্থাটি কিরূপ, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের বাস পল্লী-গ্রামে, আমাদের তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাহাদের দৈন্য সকলে জানেন কিন্তু কতদূর দৈন্য সকলে জানুন না জানুন, গবর্ণমেণ্ট জানেন না।...

কৃষকেরা ভোর হইতে দুই প্রহর ১টা পর্য্যন্ত এবং ৩টা হইতে রাত্র ১ প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। এ তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রত্যহ ১২।১৩ ঘণ্টা ঘোরতর পরিশ্রম, এ সামান্য কাণ্ড নয়। কিন্তু পাঠক! কৃষকের সম্পত্তি কখন দেখিয়াছ? আমরা এখানে একটি তালিকা দিতেছি, এ আনুমানিক নয়, আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

ঘর দুইখানা	মূল্য ৬ টাকা
থালা ২	৸০
বদনা কি ঘটী ১	১৲
ছোট ঘটী	।০
মেটে হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি মৃত্তমের মূল্য	৴১০
ঢেঁকি ১টা	।০
নিড়ানি	৴১০
কাস্তে	৵০
দা	৵০
লাঙ্গল	১।০
মই	।০
বিদে	।০
চরকা	।০
গরু ২টা	২০৲
চৌকা	৶১০
পাটি ৪টা	।০
কাঁথা ২খানা	।০
বস্ত্র ৪খানা (স্ত্রী পুরুষে)	৩৲
গামছা ১খানা	।০
হুকা কল্কে	৶১৫
বীজ	৫৲
গহনা	৸০
নগদ	০

সাধারণতঃ একজন কৃষকের যথাসর্ব্বস্বের তালিকা উপরে

দেওয়া গেল। আরও কিছু দ্রব্যাদি তাহাদের বাটীতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য নাই। আর একটি কথা বলি। যে মূল্য ধরা গিয়াছে সে সমুদায় ঐ দ্রব্যাদির নূতন অবস্থার সময়ের। অতএব তালিকায় কৃষকের যে সম্পত্তি দেখান যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের তত সম্পত্তি নাই।

ইহারা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারে না বলেই ইহাদের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ আমোদ-আহ্লাদ বলে কারে তাহা জানে না, করিবার সময়ও নাই। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাঁঠাল সিদ্ধ, চিনা ভুরা, আম সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, অন্ন প্রায় জুটে না। পরিবের একখানি বস্ত্র, আর গামছাখানি সম্বল। স্নানাতে গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্র শুখান হয়। ভাদ্র মাসে একটি তাল আনিয়া তাহাতে পোয়াটেক দুধ ও গুড় মিশাইয়া উত্তম আহার করা হয়, আর পৌষ মাসে, চালির গুঁড়া সিদ্ধ করিয়া উৎসব করা হয়। এটা যেন কেহ স্বপ্নেও না ভাবেন যে আমরা বাছিয়া বাছিয়া কৃষকদিগের মধ্যে অতি দৈন্ত লোকদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। কৃষকদিগের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কাহার কাহার অবস্থা ভাল, কাহার অবস্থা মন্দ। একশত জন কৃষকের মধ্যে এক জনের বাটী গোলা আছে, আবার তেমনি একশত জনের মধ্যে পঁচিশ জনের আদৌ লাঙ্গল নাই তাহাদের চিরকাল খাটিয়া খাইতে হয়।

ইহা ব্যতীত তাহাদের অনেক ক্ষতি দিতে হয়। মহাজনের টাকায় সুদ শতকরা ৩৮৲ টাকা। ধান্ত প্রভৃতি শস্তের সুদ শতকরা ৫০৲ টাকা। তাহাদের বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, কি কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকে যদি তাহাদের বলদের মৃত্যু হয়, কি তাহারা স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে কাজেই মহাজনের শরণাগত হইতে হয়। আর, একবার মহাজনের কবলে পড়িলে তাহার আর অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। যে কৃষকেরা নিজে মহাজনি করে, তাহারা ব্যতীত প্রায় সমুদায়ই মহাজনের নিকট দায়ী।

উপরে যেরূপ বর্ণনা করা গেল, নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক মাত্রেরই অবস্থা প্রায় সেই রূপ। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমাদের দেশীয় কৃষকেরা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারে না। এরূপ লোকদিগকে বিদ্যাদান করিবার পূর্ব্বে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ভূদেব বাবু* ও তাঁহার সহচরগণের যত্নে একণে অনেক গ্রামে পাঠশালা বসিয়াছে। এই পাঠশালাগুলি অতিশয় যত্ন-সহকারে ও নানাবিধ উপায়ে সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ পাঠশালায় ভদ্রলোকের ছেলেরা অনেকে পড়ে, তথু এ যত্ন প্রায় ভূদেব বাবুর পক্ষ হইতে, গ্রামস্থ লোকদিগের যত্ন মাত্র নাই, যদিও প্রথম প্রথম কিছু যত্ন দেখায় বটে কিন্তু সে অল্প দিনের নিমিত্ত। "পেটে নাই ভাত, তা আবার লেখাপড়া শিখাইব" ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টরেরা গ্রামে পাঠশালা বসাইতে গেলেই কৃষকেরা এই কথা বলিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় স্থির করিয়াছেন। কেন টাকাগুলি জলে ফেলাইবেন? এই টাকা দিয়া যদি একটা পিপলস্ ব্যাঙ্ক করা হয়, যদি তাহাদিগকে মহাজনের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তবে তাহাদের ধন বৃদ্ধি হইবে, ও ধন বৃদ্ধি হইলে তখন বিদ্যা চর্চ্চা করিবার অবসরও পাইবে ইচ্ছাও হইবে। তখন কোন ট্যাক্স বসাইতে হইবে না, গ্রামে গ্রামে ডেপুটিদিগকে উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না, কৃষকেরা আপনারাই যত্ন করিয়া ব্যয়ের নিমিত্ত কুণ্ঠিত না হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ একটা কাজ করেন তবেই প্রজালোকের মা বাপের মত কাজ করিবেন। কেন নাম কেনার জন্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনর্থক টাকাগুলি মাটি করিবেন। (৫ ভাদ্র ১২৭৫। ২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

ভূদেববাবুর পাঠশালা প্রণালী

...ভূদেববাবুর প্রণালীতে পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের সমুদায় লাভ ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কম। হঠাৎ দেখিতে গেলে এ প্রণালীর দোষ পাওয়া যায় না, হঠাৎ কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এ প্রণালীটি প্রায় সর্ব্বাঙ্গ শুভ বলিয়া বোধ হয়। ভূদেববাবুর অধীন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকে কর্ম্মদক্ষ, ঘোর পরিশ্রমী ও প্রভুভক্ত। এ সমুদায় সত্বেও পাঠশালার পরিবর্দ্ধন কেন নাই, কেন ডেপুটীদিগের বিভাগের ছাপার ভার, পাঠশালা মুখে করিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে হয়? কেন পাঠশালা সংক্রান্ত সমুদায়ই নীরস ও উৎসাহ-বিহীন হইয়াছে? পাঠশালা পরিদর্শনে আর সুখ নাই, পাঠশালায় পড়ান আর সুখ নাই, পাঠশালায় পড়িতেও আর সুখ নাই।

গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই পাঠশালা শুধু দরিদ্র লোকের নিমিত্ত থাকুক, কিন্তু ডেপুটি, গুরু ও ছাত্রদিগের ইচ্ছা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সহিত টক্কর দেওয়া।...এরূপ উচ্চাভিলাষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু না কিছু বড় হওয়া যায়, কিন্তু তা বলিয়া হাত কি। টাকা দিবার কর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট, তাহার ইচ্ছা ইহার ঠিক বিপরীত। যদি ডেপুটিদিগের পদোন্নতির প্রত্যাশা থাকিত, যদি পাঠশালার নিমিত্ত পৃথক ছাত্রবৃত্তি থাকিত, তবে এরূপ বড় হইবার চেষ্টার কাজ দিত, কিন্তু তাহা না হওয়াতে পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি পাঠশালা সংক্রান্ত সমুদায়ই মৃত্যুবৎ হইয়া উঠিয়াছে।...

পাঠশালায় পড়িয়া কি ফল হইবে, পল্লীগ্রামস্থ লোকে ইহাই ভাবে, ও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। যাহারা ভদ্রলোক তাহাদিগের পাঠশালায় পড়িয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়

* ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

না।...নিতান্ত দরিদ্র লোকও পাঠশালায় যাইয়া কি করিবে? ভূগোল পড়িলে, ভারতবর্ষে কয়েকটি নদী আছে জানিতে পারিলে, কি সেরাজোদ্দৌলা কোন্ সালে কলিকাতা আক্রমণ করেন জানিলে, পেটের ভাতও হয় না, এক বিঘা জমিতে ৭ মণের অধিক ধানও জন্মান যায় না। দরিদ্রলোকের সন্তানেরা পাঁচ বৎসর হইতে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, পাঠশালায় পড়িলে এ উপার্জ্জনের ক্ষতি, ইহা ব্যতীত গুরুর বেতন, পুস্তকের মূল্য, এমত স্থলে দরিদ্রলোকের সন্তানগণকে পাঠশালায় না পাঠানই লাভ, আর দরিদ্র লোকে ধনীর ন্যায় তাহাদের নিজের লাভ বুঝে। তবে পাঠশালায় মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা পড়িতে পারে, ও এইরূপ লোকেই এক্ষণে পাঠশালা রাখিতেছে...।

পাঠশালা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকারী নয়, বরং ইষ্টকারী। এই পাঠশালা স্থাপনের নিমিত্ত অনেক ছাত্রের মনে বিদ্যাভ্যাসের ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে ও তাহারা পরিণামে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমত স্থলে গবর্ণমেণ্টের এই দুই প্রণালীতে সখ্যভাব করিয়া দেওয়া উচিত। অন্য একটি শৃঙ্খল দিয়া গাঁথিয়া দিলে এই দুই প্রণালী উভয়ে উভয়কে পরিবর্দ্ধন করিবে। আর নতুবা অনর্থক বৎসর বৎসর এতটি টাকা কেন জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়? ভূদেববাবু এই পাঠশালার নিমিত্ত গত বৎসর ১ লক্ষ, ৩১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কাশীকান্ত বাবু ৫১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ও ব্যয় ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। হয় গবর্ণমেণ্ট আরও কিছু টাকা ব্যয় করুন, নতুবা পাঠশালা যে পরিমাণে বাড়াইতেছেন, তাহা না করিয়া সেই অর্থের দ্বারা ভদ্র পাঠশালার নিমিত্ত কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি করুন। গবর্ণমেণ্টের ভয়, এরূপ করিলে পাঠশালা যাহাদের নিমিত্ত স্থাপিত, তাহারা ইহার ফলভোগী হইবেক না, এটা গবর্ণমেণ্টের বিষম ভুল হয়। যদি দরিদ্র লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক বিদ্যা অন্তঃকরণ করাইতে চাহেন, সে স্বতন্ত্র কথা নতুবা যখন দরিদ্র লোকে বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বোধ করিবে (যখন তাহাদের প্রকৃত অভাব বোধ হইবে, তখনি প্রয়োজন বোধ করিবে) তখন ডেপুটিদিগকে আর গ্রামে গ্রামে উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। এক্ষণে আমাদের বারো আনা লোকে উপবাস করে, গবর্ণমেণ্ট তাহারই চিকিৎসা করুন, তখন কৃষকেরা আপনারা আপনারা পাঠশালা বসাইবে। (২৭শে চৈত্র ১২৭৫। ৮ এপ্রিল ১৮৬৯)

স্কুল ও পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টর

পাঠকগণ অবগত আছেন, ভূদেববাবু, উড্রো, মার্টিন, ক্লার্ক সাহেবদিগের ন্যায় ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। উঁহার উত্তর-মধ্য বিভাগ তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা ভূদেববাবুর অধীন থাকিবেন, ও ইংরেজী ও বাঙ্গালার স্কুলের ডেপুটিগণ ডিভিসনাল ইনস্পেক্টরদের অধীন থাকিবেন। নূতন বন্দোবস্তে এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণ অবধি এই নিয়ম হইয়াছে, যে জেলা যে ইনস্পেক্টরের অধীন থাকিবে, সেই জেলার উভয়বিধ ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা এক ইনস্পেক্টরের অধীন থাকিবেন। আর একটি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডেপুটিদিগের মধ্যে বেতন ও শ্রেণীর তারতম্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার প্রভেদ থাকিল না। যাঁহারা পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাঁহারা ইংরেজী স্কুল ও পাঠশালা উভয় পরিদর্শন করিতে পারিবেন, আবার যাঁহারা ডিভিসনাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাঁহাদিগকেও পাঠশালা ও স্কুল নির্ব্বিশেষে দেখিতে হইবে। পাঠশালার ডেপুটিরা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এবং আপাততঃ পূর্ব্ব বেতন ৭৫ টাকা পাইবেন। ক্রমে ইঁহাদের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নীত হইবার আশা থাকিল। এই প্রণালী দ্বারা পরিদর্শন কার্য্য ও স্কুলসমূহের উন্নতিসাধন যে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে হইবে তাহাতে আর দুই মত হইবার সম্ভাবনা নাই।...

উপসংহারকালে আমাদের ইন্সপেক্টর ভূদেববাবু সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ভূদেব বাবু যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ তাহা আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহা দ্বারাই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে যে, সম্পূর্ণ বিনা সহায়ে তিনি এত বড় উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটি বিষয়ের জন্য ভূদেববাবু আমাদের বিশেষ ভক্তির পাত্র। যখন তিনি অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ছিলেন, তখন পাঠশালাগুলি অতি যত্নের সামগ্রী স্বরূপ গণ্য করিতেন। অন্যান্য ইন্সপেক্টরেরাও যেরূপ স্কুলের উন্নতির নিমিত্ত উদাসীন, ভূদেববাবু সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। স্কুল কোন কারণ বশতঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য ইন্সপেক্টরদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় উহা উঠাইয়া দিতে পারিলে আর ছাড়েন না, ভূদেববাবু এরূপ অবস্থায় যাহাতে পাঠশালাটি পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহাই করিতেন। ভূদেববাবুর অধীনে ঢাকার যুবতী বিদ্যালয়ও কখন উঠিয়া যাইত না, শালিখার স্কুলের গবর্ণমেণ্ট চান্দাও কখনও বন্ধ হইত না। ভূদেববাবু অল্পদিন সম্পূর্ণ ইন্সপেক্টর হইয়াছেন। অদ্যাবধি পরিদর্শন কার্য্যে বহির্গত হন নাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এতৎ প্রদেশের ইংরেজী স্কুলগুলি তাঁহার তত্ত্বাবধানে শ্রীসম্পন্ন হইবে। আপাততই একটি বিষয়ের জন্য সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকেরা তাঁহার অধীনে সুখে আছে। পূর্ব্বে এক মাস দুই মাসের কমে ইন্সপেক্টরের আপিস হইতে সাহায্যের বিল ফেরত আসিত না। এক্ষণ সাত দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষকদের এই নিমিত্ত কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিলে তাহার উত্তর পাওয়া

দুরূহ ব্যাপার ছিল, ভূদেববাবুর নিকট পত্র লিখিবামাত্র উত্তর পাওয়া যায়। ভূদেববাবু সত্বর যে সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। (২৫ আষাঢ় ১২৭৬। ৮ জুলাই ১৮৬৯)

পুস্তকালয়

কোন কোন মহোদয় সাহেবের কৃপায় এক্ষণে জেলায় জেলায় এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। রেক্‌স্‌ সাহেব, যিনি প্রথমে এই সমুদায় পুস্তকালয় করিবার যত্ন করেন, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে এ সমুদায় ক্ষুদ্র লাইব্রারিতে বিশেষ দৃষ্টি আছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র, ব্লুবুক, সাম্বৎসরিক রিপোর্ট প্রভৃতি সমুদায়ই এই সমুদায় লাইব্রারিতে পাঠান হইয়া থাকে। কিন্তু তবু ইহাদের প্রায় তাবতেরই ভগ্ন দশা। যশোহরের পুস্তকালয় মর মর অবস্থা হইয়া এক্ষণে হেড-মাষ্টার উমাচরণ বাবুর হস্তে গিয়াছে। ইনি বিস্তার মর্য্যাদা বুঝেন, দেখি ইঁহা দ্বারা কি হয়। কৃষ্ণনগর লাইব্রারির মৃত্যু হইয়াছে। বরিশালের প্রায় ঐ দশা। কেবল চুচড়ার লাইব্রারিটি ভূদেব বাবুর যত্নে একটু ভাল আছে।...

আমাদের বাঙ্গলাদেশে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রারি, আদি ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রারি, জয়কৃষ্ণবাবুর উত্তরপাড়ার লাইব্রারি, এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রারি ও পবলিক লাইব্রারি এই কয়েকটি প্রধান পুস্তকালয় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, সকলের শেষটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমরা নিয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া ভূমণ্ডলে যত বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয় আছে, তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা দিতেছি, পাঠক দেখিবেন যে পুস্তকালয় সম্বন্ধে আমরা কত পাছে পড়িয়াছি।

স্থানের নাম	পুস্তকের সংখ্যা	
	লক্ষ	হাজার
ব্রিটেন :		
ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন	৭	
বদলিয়ান লাইব্রারি, (অক্সফোর্ড)	২	৮২
আড্‌ বোকেটস্‌ ঐ, (এডিনবরা)	১	৮০
ট্রিনিটি কলেজ, ঐ, (ডবলিন)	১	৩০
উনিবার্সিটি, (এডিনবরা)	১	
ঐ (গ্লাসগো)	—	৭০
ঐ (সেণ্ট আণ্ড্রুস)	—	৬৫
ঐ (আবারডিন)	—	৪৮
সিয়ন কলেজ (লণ্ডন)	—	৫০
কুইন্স ইন (ডবলিন)	—	৩৫
ব্রিটেনের অন্যান্য স্থানে	১	২২
ফ্রান্স :		
ইম্পিরিয়াল লাইব্রারি (পেরিস)	১১	৮০
আরসেনাল ঐ (ঐ)	২	৬
জেনিবেভ্যু ঐ (ঐ)	১	৫৭
ম্যাজারিন ঐ (ঐ)	১	৫৯
সবরন ঐ (ঐ)	১	৮১
হোটেলবিলি ঐ (ঐ)	১	৬৫
ফ্রান্সের অন্যান্য স্থানে	৪০	৩০
ইটালী :		
ক্যাসাণ্ট লাইব্রারি (রোম)	২	—
আম্ব্রসিয়ান ঐ (মিলান)	১	—
ব্রিরা ঐ (ঐ)	১	৩০
মারিলিবেচী ঐ (ফ্লোরেন্স)	১	৬০
বোর্‌বান ঐ (নেপল্‌স)	২	—
সেণ্টমার্ক ঐ (বেনিস)	১	২০
ইটালীর অন্যান্য স্থানে	৩	৫০
স্পেন :		
মাদ্রিদ লাইব্রারি	২	—
জারমেনি :		
রোয়াল লাইব্রারি (মিউনিক)	৬	—
ঐ ঐ (ড্রেসডেন)	৩	২৫
উনিবার্সিটি (গটিনজেন)	৩	৫০
ঐ (ওলফেন বুটেন)	২	—
প্রাসিয়া :		
রোয়াল লাইব্রারি (বারলিন)	৫	৫০
অন্যান্য স্থানে	১৫	—
অষ্ট্রিয়া :		
ইম্পিরিয়াল লাইব্রারি (বিয়ানা)	৪	—
অন্যান্য স্থানে	২১	—
এতদ্ভিন্ন : রুশিয়ায়	৮	২৫
বেলজিয়ামে	৫	২৫
রোয়াল লাইব্রারি (হেগ)	১	—
ঐ ঐ (কপেনহেগেন)	৪	৫০
উনিবারসিটি আপসাল (সুইডেন)	১	২৫
ঐ ক্রিষ্টিনিয়া	১১	৫০
হার্ব্বার্ড কলেজ, ম্যাচাচুসেট্‌স্‌	১	—
কলিকাতা	১	—

এই সমুদায় পুস্তকের সমষ্টি প্রায় দুই কোটি কুড়ি লক্ষ এবং ইহার প্রত্যেকখানা আতপাত্ত পড়িতে যদি গড়ে দুই ঘণ্টা করিয়া লাগে, তবে এই সমুদায় পুস্তকগুলি পড়িতে খৃষ্টানদিগের মত যতদিন পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন ও আরো হাজার বৎসর বেশী লাগিবে। (৮ ফাল্গুন ১২৭৫। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

[ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল]

সচরাচর প্রস্তাব করা যত কঠিন, উহা কার্য্যে পরিণত করা তাহা অপেক্ষা সহজ, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত। শত সহস্র প্রস্তাব হইতেছে কিন্তু তাহা জীবিত থাকে কয়টী।

আমাদের দেশে একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল হয়, ইহা অনেক কাল হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে কিন্তু এত দিন পরে ভগবানবাবুর* যত্নে উহা কার্য্যে পরিণত হইল।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন, যে বর্দ্ধমানের রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ভগবানবাবু বিস্তর যত্ন করিয়াছেন, এমন কি ভগবানবাবু যত্ন না করিলে বর্দ্ধমানের যে সর্ব্বনাশ হইতেছিল, ইহা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের কর্ণগোচর হইত না। ভগবানবাবু বর্দ্ধমানে যে বিস্তালয় করিয়াছেন, তাহা ঐ রুগ্ন দরিদ্রদের সাহায্যার্থে। ভগবানবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য একেবারে বিভা ও অন্ন দান।

তাঁহার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত হইতে ছুতারের ব্যবসায় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা শুনিলাম যে এই নিমিত্ত একটি হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইয়াছে, গোরা মিস্ত্রী এখানে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভগবানবাবু যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃত-কার্য্য হওয়া না হওয়া অর্থসাপেক্ষ। আপাততঃ এই স্কুলের ব্যয়ের ভার আর কাহারও লইতে হইবে না, ছাত্র ও শিক্ষক-দিগের প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় করিলেই হইবে। আমরা ভরসা করি যে সদাশয় ব্যক্তিগণ ও গবর্ণমেণ্ট ভগবানবাবুকে সাহায্য করিবেন। (২৮ ফাল্গুন ১২৭৬। ১০ মার্চ্চ ১৮৭০)

[নবদ্বীপের টোল]

নবদ্বীপে এখন ৩১টি টোল আছে এবং ৯০ জন ছাত্র মাত্র অধ্যয়ন করে। টোলের অনেকগুলি নামমাত্র। তাহাতে মোটে ছাত্র নাই, অধ্যাপকেরা নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তি আশায় একটি টোল খুলিয়া রাখিয়াছেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, হরমোহন তর্কচূড়ামণি, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্ন-কুমার তর্করত্ন প্রধান। (১০ আষাঢ় ১২৭৭। ১৩ জুন ১৮৭০)

[নেটিভ ডাক্তার]

এ বৎসর মেডিকেল কালেজ খুলিবার উপলক্ষে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী† একটি বক্তৃতা দেন। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী অতিশয় পণ্ডিত এবং তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে লোকের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব নিবন্ধন নেটিভ ডাক্তারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রে যথোচিত জ্ঞান পায় না। এ পর্য্যন্ত কয়েকজন ডাক্তার খানকয়েক পুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, এ বিষয়ে আরো মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুত এদেশীয় নেটিভ ডাক্তারগণের হাতে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করেন, তাহার মত তাঁহারা কিছুই শিক্ষা পান না। কালেজে তাঁহারা যে তিন বৎসর থাকেন, তাহাতে সুবিধা পাইলে তাঁহারা বিস্তর অভ্যাস করিতে পারেন। মেটিরিয়া মেডিকা, প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ না করিয়া যদি এদেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা নিজ পরীক্ষার ফলসহ রচনা করেন, তবে বিশেষ উপকার হইতে পারে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী হয়ত এত দিন বাঙ্গলা ভুলে যান নাই, তদ্ভিন্ন ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে, জগবন্ধু ভদ্র, সূর্য্যকুমার অধিকারী, তিন কড়ি কর প্রভৃতি পুরাতন চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারেন। (৩১ ভাদ্র ১২৭৭। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭০)

বিজ্ঞান সভা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় একটি বিজ্ঞান উৎকর্ষিণী সভা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি যেরূপ বিদ্বান বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষ তাহাতে তাঁহা কর্ত্তৃক ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যুবকগণের উচিত যে তাঁহার এরূপ মহদোপকারী সংকল্পের সহযোগী হন। (১ মাঘ ১২৭৬। ১৩ জানুয়ারি ১৮৭০)

ইংরেজী সাহিত্য ও অঙ্কশাস্ত্রে এদেশীয়গণ যেরূপ ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন, তাহাতে আমাদের মনেং অনেক সময় গৌরব উদয় হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভারতবর্ষীয়রা অদ্যাপি তাদৃশ পারদর্শিতা দেখান নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধিবৃত্তির অভাব কি যথাশায় এদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না বলিয়া বাঙ্গালির মধ্যে অদ্যাপি আমরা বিজ্ঞানবিৎ কোন ব্যক্তিকে দেখিতেই পাই নাই তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। বাঙ্গালায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কিয়ৎপরিমাণ বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় এবং পরীক্ষাতে এঁরা যেরূপ পারগতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাঙ্গালি যুবকগণকে এবিষয়ে নির্ব্বোধ বলা যায় না, দোষ হয় যে কলেজ ছাড়িলে আর বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না, তাহাদের এবিষয়ে সুযোগও থাকে না, স্পৃহারও অভাব হয়।

ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা আসীয় জাতির মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত কম। ভারতবর্ষীয়গণ আধ্যাত্ম বিদ্যায় কিছু অধিক তৎপর। ভারতবর্ষের জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতিতে দেশীয়-গণের মন বিজ্ঞান অপেক্ষা মনস্তত্ত্বে অধিক নিবেশিত করে, ফল বাঙ্গলা যুবকগণের এ বৃত্তিটি নিহিত বই ইহার অভাব নাই।

কার্য্যানুরোধে যখন যিনি বিজ্ঞান চর্চ্চায় বাধ্য হইয়াছেন তখনই তাহাতে কিছু না কিছু সুখ্যাতি লইয়াছেন। কানাই বাবু বিদেশীয়গণের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ যশস্বী। আজকাল রাধাকৃষ্ণ বাবুও বিজ্ঞান চর্চ্চায় আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিবার সুযোগ পান না, সুতরাং এদেশে যতদূর সম্ভব তাঁহার ততদূর এবিষয়ে শিক্ষা হয় নাই এবং কানাই বাবু কালেজের তত বিখ্যাত নন সুতরাং

* ভগবানচন্দ্র বসু, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা। এই সময়ে তিনি বর্দ্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন।

† ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক।

এরা উভয় যখন এবিষয়ে স্বদেশীয় মধ্যে হউক আর বিদেশীয়-গণের মধ্যে হউক কিছু কিছু প্রতিষ্ঠার ভাজন হইয়াছেন তখন বিদ্যালয়ের অনেক যুবকেরই এই প্রতিষ্ঠার ভাজন হওয়া

মহেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে যদি এখানে সায়েন্স এসোসিয়েসনটির সংস্থাপন ও উন্নতি হয়, তাহা হইলে দেশীয় যুবকগণের আশা তৃপ্তির আর একটি নূতন উপায় হইবে। শুদ্ধ আশা তৃপ্তির নয়, অনেক যুবকের ইচ্ছা কোন উপায়ে দেশের কিছু মঙ্গল সম্পাদন করেন, কিন্তু সুযোগ পান না। এ সভাটিতে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার সুবিধা হইবে।

মহেন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠিত সভার আকৃতি এক্ষণ তিনি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত করেন নাই, সুতরাং ইহা কর্ত্তৃক আর আমাদের কোন্ কোন্ আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভব তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রটি এদেশের সম্পূর্ণ পতিত ভূমি। ইহার উৎকর্ষ নিবন্ধন আমরা অনেক লাভের প্রত্যাশা করি। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় মহেন্দ্র বাবু ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তবে জগতে জানিবে ভারতবর্ষে বিধাতা কত রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন। এদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা চাকুরি অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া পড়িয়াছে, এবং বৎসর বৎসর বাড়িতেছে। ইহার ফল হইতেছে লোকের বিদ্যা চর্চ্চার উপর তাচ্ছিল্য ও হতাশা। এক্ষণ যাহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। সাএন্স এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক এটি কতক পরিমাণে নিরাকরণের সম্ভব।

এদেশীয় যুবা পুরুষগণকে অনেকে অর্থ গৃধ্ন, বলিয়া কলঙ্ক করেন। ইহাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা প্রণালী দেখিলে এটি বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। তাঁহারা প্রকৃত কালেজ ছাড়িলে পুস্তকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক লোপ করেন এবং কোথায় দুটি পয়সা পাইবেন তাহাই লইয়া বিব্রত থাকেন। কিন্তু তাহাদের অপরাধ কি? তাহারা কি করে? সাএন্স এসোসিয়েশন কি অন্য কোন বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হইলে যুবকগণ বোধ হয়—বোধ হয় কি—নিশ্চয় এরূপ অর্থলালসায় জ্ঞানশূন্য হইয়া বেড়াইবেন না। (২৮ ফাল্গুন ১২৭৬। ১০ মার্চ ১৮৭০)

ঢাকা ইনষ্টিটিউট

...ঢাকায় নূতন একটি সভা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ পাঠে আমাদের যেরূপ বোধ হইল উহাতে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক হইবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চাই যেন সভার প্রধান উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এরূপ ভাবিতে পারেন যে যাহারা পরাধীন, যাহাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নাই তাহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চায় সুখই বা কি, ফলই বা কি? কিন্তু আমরা তত দূর যাই না। তবে উহা যদি স্কুলবয়ের ডিবেটিং ক্লবের মত হয় তবে সংবাদপত্রে উহার বিষয় আলোচনা করা না সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে লজ্জা দেওয়া। কিন্তু ঢাকা অতি প্রধান স্থান, এমন কি কলিকাতার নিচেই ঢাকা। সেখানকার প্রধান প্রধান লোকে যদি সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকেন, তবে ভালই বা কেন না হইবে? তবে বাঙ্গালির সভার নাম শুনিলেই আমাদের ডিবেটিং ক্লবের কথা মনে পড়ে। সিজরের জীবন চরিত্র, আডিসনের রচনা প্রণালী প্রভৃতি প্রস্তাবের নাম শুনিলে এখন আমাদের বমন হয়। যদি ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা প্রকৃত দেশের মঙ্গল ও আপনার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সভায় দুরূহ গণিত, প্রাকৃতিক শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করুন। এক দেশের কৃষি অন্য দেশে প্রয়োগ করা যায় না। কলিকাতায় কৃষিসভা কেবল বিদেশীয় বৃক্ষ এতদ্দেশে প্রস্তুত করিবার যত্ন করিতেছেন। কিন্তু কি উপায়ে এদেশের ভূমি আরও ফলবতী হয় তাহার যত্ন তাঁহারা তত করিয়া উঠিতে পারেন না। ভূতত্ত্ববিদ্যা বাঙ্গালিরা চর্চ্চা করেন না। বাঙ্গালায় ভূতত্ত্ব অদ্যাপি কেহ ভাল করিয়া অনুসন্ধানও করেন নাই। তাহার কিছু কারণ আছে বাঙ্গালায় যে চর পড়িয়াছে উহার মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে অনেক খনন করিতে হয় কিন্তু ঢাকায় এই শাস্ত্র চর্চ্চায় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা। সেখানে নিম্নভূমিও আছে পর্ব্বতও আছে।...(৯ বৈশাখ ১২৭৭। ২১ এপ্রিল ১৮৭০)

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর **উদ্বৃত্তের** পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে **১ কোটি ২৫ লক্ষ** টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজার করা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

মেয়াদী বীমায়—
আজীবন বীমায়— } ৮৲ টাকা

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং সুদের হার অজ্জিত হার অপেক্ষা ½% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে। লগ্নীতে কমহারে সুদ অর্জ্জন, দুর্মূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

- চলতি বীমা .... ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
- বীমা তহবিল ..... ১৫ " ৯৭ " " "
- প্রিমিয়ামের আয়.. ৩ " ৪০ " " "
- দাবী শোধ .... ৭ " ২০ " " "

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ

"পুথি পরিচয়"

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রায় দোয়া শ' বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচনার সূচনা হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের পুথি লইয়া প্রথমে কাজ আরম্ভ হয়। অনেক পরে প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলির দিকে পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় —সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষায় পুথিও সংগৃহীত হইতে থাকে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাংলা পুথির সংগ্রহ ও আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রাচীন বাংলা পুথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং পরিষৎ পত্রিকার মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকে। পরিষৎ পত্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য কোন কোন পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে নানা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। পরিষদ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত বিবরণের মধ্য হইতে দরকারমত কোন পুথির বৃত্তান্ত খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম নামক সংস্কৃত পুস্তককোষের অনুকরণে একখানি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকোষ প্রণয়নের কল্পনা পরিষদের আছে। এই গ্রন্থ সংকলিত হইলে নবলব্ধ পুথির আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে—প্রাপ্ত পুথির মূল্য নির্দ্ধারণ সুকর হইবে।

পুথির প্রকাশিত বিবরণ পূর্ণাঙ্গ বা প্রয়োজনানুরূপ হওয়ার উপরই এই কোষগ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ প্রকাশিত বিবরণগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। এ বিষয়ে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমি ইতঃপূর্ব্বে উপস্থাপিত করিয়াছি (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃঃ ৫৩৯)। অতি জরুর এই প্রাচীন পুথি ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। তাই এদিকে ইতিহাসরসিক ব্যক্তিমাত্রের অবহিত হওয়া উচিত।

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 'পুথি-পরিচয়' নামকগ্রন্থে* নূতন ভাবে পুথি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বিশ্বভারতীর পুথি-শালায় সংগৃহীত সাড়ে পাঁচ হাজার বাংলা পুথির প্রথম পাঁচ শত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া ১৮১ খানির বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তবে কি সূত্র অবলম্বন করিয়া বাছাই করা হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লেখা যোগাতার বন্দনার পুথির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (২২,৪৫ সংখ্যা), কিন্তু যাহারাদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থের একটি পরিশিষ্টে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপহৃত ২১৮ খানি পুথির মধ্যে ২১খানি পুথির বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সমস্ত পুথির কোন বিবরণ গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হয় নাই তাহাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আর একটি পরিশিষ্টে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। যে পাঁচ শত পুথি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন তাহাদের বর্ণানুক্রমিক নামসূচী ও গ্রন্থকার-সূচী দুইটি নির্ঘণ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে লিপিকর, লিপিস্থান, গ্রন্থের মালিক প্রভৃতির তালিকা সংযোজিত হইলে আরও ভাল হইত। গ্রন্থের নামসূচীর মধ্যে পুথির পত্রসংখ্যা ও লিপিকাল উল্লিখিত হওয়ায় ইহা সংক্ষিপ্ত বিবরণের কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত পুথির বিবরণগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা একটি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকাটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকায় প্রদত্ত পুথিবিবরণ-পঞ্জীর সংক্ষিপ্তসার। উল্লিখিত সূচী দুইটিও তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত সূচীর আদর্শে রচিত বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থের ভূমিকায় পুথিসংগ্রহের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং বাংলা পুথির—বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের মতে—পুথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান পেশা। হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পেশা অবলম্বন করিতেন। তেরেটপাতা, তোজপাত, গাছের বাকল এবং চামড়ার লেখা বাংলা পুথির কথাও তিনি বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল উক্তির সমর্থক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিয়া যায়—উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় হয়। পুথির শেষের দিকে মালিক, লিপিকর, লিপিকাল, লিপিস্থান, পুথির মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান্ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা

* পুথিপরিচয়। প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম-এ সঙ্কলিত। বিশ্বভারতি গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭। মূল্য দশ টাকা।

অন্যত্র উপস্থাপিত করিয়াছি। বিশেষ আনন্দের কথা, বর্ত্তমান গ্রন্থকার এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ঐতিহাসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুথির বিবরণ সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা মামুলি ধরণে পুথির প্রারম্ভ ও শেষ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াই কাজ শেষ করেন নাই—গ্রন্থের ও পুথির বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচিত গ্রন্থের অন্ত পুথি অন্যত্র বর্ণিত হইয়া থাকিলে মাঝে মাঝে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র এইরূপ না করায় কারণ বুঝা যায় না। বিবরণের মধ্যে গ্রন্থের বিষয়-পরিচয় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থে সেরূপ পরিচয়ের অভাব অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ২৮, ৩৫, ও ৬১ সংখ্যক বিবরণ দ্রষ্টব্য। ১৩ সংখ্যক বিবরণে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'দ্বিজ আত্মারাম সম্ভবতঃ লিপিকর, লেখক সুরুল নিবাসী দ্বিজ মহানন্দ।' এই অনুমানের হেতু নির্দ্দেশ করিলে ভাল হইত।

আলোচ্য পুথিগুলির বেশীর ভাগই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যাঁহাদের লিপিকাল পুথির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের ভিতর সবচেয়ে পুরাতন যেখানি সেখানি ১০১৩ সালে নকল করা। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে নকল করা আর একখানি পুথি আছে। আধুনিক পুথির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলি ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সত্য-নারায়ণের পাঁচালি উল্লেখযোগ্য। ছাপা প্রচলনের পরেও কেহ কেহ ছাপা বই নকল করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। উল্লিখিত পুথি দুইখানির মধ্যে প্রথমখানি যদিবা সেইরূপের হয়, দ্বিতীয়খানি কখনই সেইরূপ নয়। এ জাতীয় পুথিকে পুথিশালার অন্তর্ভুক্ত করা কতটা যুক্তিযুক্ত বিচার করিতে হইবে।

যে সকল পুথির নকলের তারিখ দেওয়া নাই তাহাদের লিপিকাল গ্রন্থকার মোটামুটিভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন পুথি আনুমানিক ২২৫ বৎসরের পুরাতন। কোনখানি ২০০ বৎসরের, কোনখানি ১৭৫ বৎসরের, কোনখানি বা ১৫০ বৎসরের। কিন্তু লেখা দেখিয়া পঁচিশ বৎসরের কম বেশী পুরাতন বা নূতন ধরা যায় কি ?

পুথিগুলির অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি—অনেকগুলির কেবল একটি করিয়া পাতা। এগুলি সাধারণতঃ 'পাতড়া' নামে পরিচিত। কতকগুলি পত্র, দরখাস্ত, ছাড়পত্র প্রভৃতিকেও পুথির মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পুথির নাম অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের নিজের দেওয়া মনে হয়। একই বিষয়ের গ্রন্থের দুই রকম নামও দেখা যায় (২২,৪৫)। পদাবলীর পাতাগুলি স্বতন্ত্র পুথিরূপে (১৪ প্রভৃতি) প্রদর্শিত হইলেও কিছু কিছু পাতা একই পুথির বিচ্ছিন্ন অংশ কিনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। পাতার মাপের ঐক্য আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ একই পুথির বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র পুথিরূপে রক্ষিত হওয়ার ব্যাপার কোন কোন ক্ষেত্রে ধরা পড়িয়াছে।

শতাধিক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত পুথি লইয়া আলোচনার পরেও সংস্কৃত পুথির বিবরণ এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। বাংলা পুথির অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালব্যাপী আলোচনায় ত্রুটিবিচ্যুতি আশ্চর্য্যকর নহে। এ বিষয়ে কর্ম্মীর অত্যন্ত অভাব—কাজ করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ খুবই কম। তাই এই নবীন উদ্যম বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

সন্ধান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বাধু-পারাবার পাড়ি দিতে চায় পাখী,
পাখা-দ্বীপ তায় আঁকিতে লাগায় ঘোর ;
চলায়—থামায় পথ প'ড়ে থাকে বাকী ;
কেটেও কাটে না ভাবনের মায়া-ডোর ;—
অতনু সুরেরে অসীমে উড়ায়ে তাই,
অধরারে যেন পাখী বলে—'যাই যাই'।
কোমল কুসুম-পল্লব পাখা মেলি'
মাটির পাখীটি রবিরে ধরিতে চায় ;
মাটি হতে শুধু বেড়ে ওঠে মাটি ঠেলি',
শাখার শিখরে বাঁধা শেষে পড়ে যায় ;
গন্ধ তাহার তাই বুঝি বারে বারে
পৌঁছাতে চায় চিরন্তনের পারে।
ধূলার ধূসর উষর ধরার মাঝে
মাটির মানুষও অমৃত লভিতে চায় ;
বাঁধন এড়াতে কিছুতেই পারে না যে,
তবুও জগতে ফিরে ফিরে আসে যায়।
ছন্দে-গন্ধে তবু অনুহারা প্রাণ,
সীমায় করিছে অসীমেরই সন্ধান।

ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র—শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী। এবা পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯০ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। প্রাপ্তিস্থান—এস্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

ভারত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রের স্বরূপ কি তাহা জানা প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। অথচ কনষ্টিটুশন অফ ইণ্ডিয়া অধিগত করা ব্যবহারবিশারদের পক্ষেই সম্ভব, আড়াই শত পৃষ্ঠাব্যাপী রাষ্ট্রসূত্রসমন্বিত ইংরেজী পুস্তকখানির জটিলতা উদ্ধার করা সাধারণজনের সাধ্য নহে। "ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রে"র সারমর্ম্ম সরল ভাষায় পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গ্রন্থকার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। কেবল রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুবাদে সে অভাব দূর করা যায় না। যে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে পারা যায় শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরীর সে জ্ঞান আছে। তিনি খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী এবং বিলাত আমেরিকা ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই তিনি সহজ ভাষায় ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিচয়প্রদানের জন্য তাঁহাকে পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইংরেজী পরিভাষার হিন্দী ও বাংলা প্রতিশব্দের যে সরকারী তালিকা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নয়, কেননা অনেকগুলি প্রতিশব্দই সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাষ্ট্রসংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্র, দ্বিতীয় ভাগে শাসনতন্ত্র এবং তৃতীয় ভাগে বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলও নহে, যুক্তরাষ্ট্রও নহে, ইহা ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রসংহতি। প্রথম খণ্ডে রাষ্ট্রের স্বরূপ, সংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ, রাষ্ট্রিকতা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির; দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্রীয় এবং আঙ্গিক শাসনতন্ত্র, লোকসভা, রাষ্ট্রপরিষৎ, আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষৎ প্রভৃতির, তৃতীয় খণ্ডে আপদ্ধর্ম্ম, সরকারী চাকুরি, সদস্য নির্ব্বাচন, রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তন প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত এবং সমস্ত খণ্ডেই অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তিন খণ্ড ছাড়াও পরিশিষ্টে বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা শব্দার্থপঞ্জী এবং অনুক্রমণী দেওয়া হইয়াছে। এই সুখপাঠ্য এবং জ্ঞানগর্ভ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কৌতূহলী পাঠক ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেশের কথা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। ৫৯, বারাকপুর ট্রাঙ্ক-রোড কলিকাতা-২ হইতে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭৪। মূল্য তিন টাকা।

দোসরা অক্টোবর, ছাব্বিশে জানুয়ারী, কংগ্রেস, বাংলা ও বাঙালী, আমাদের কর্ম্মসূচীর খসড়া এবং গান্ধীবাদ ও হিন্দুমুসলমান সমস্যা মোট এই ছয়টি অধ্যায়ে পুস্তকখানি বিভক্ত। বঙ্গের তথা ভারতের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি এতই জটিল যে, সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া খুবই শক্ত। চিন্তাশীল গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকে স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কংগ্রেসপন্থী হইলেও তিনি কংগ্রেসের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই তিনি আজিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির ধারাকে যাচাই করিয়াছেন। কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনেককিছুই ঠিক আদর্শ অনুযায়ী হয় না; কাজেই এ সব ক্ষেত্রে নির্ভুলতা আশা করা বৃথা। কিন্তু তাই বলিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশংসা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অল্পকাল হইল আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। এক দিকে ভুল-ভ্রান্তি অন্য দিকে অসাধুতা ও অযোগ্যতা আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। সুতরাং পদে পদে এই বাধা ঠেলিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এক্ষেত্রে অধৈর্য্য হইলে বা কেবলমাত্র সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে চলে না—লেখক এই সত্যটি পাঠক ও দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বহু দিন রোগশয্যায় কাটাইয়া দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে যে সব চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরের দরদ দিয়া মর্ম্মস্পর্শীভাবে সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কাজল রেখা—শ্রীমণি বাগচি। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গল্প জিনিসটি সর্ব্বকালে সকল বয়সের মানুষের অত্যন্ত প্রিয়—বিশেষতঃ শিশুচিত্তে ইহার প্রভাব অপরিসীম। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে এক দিকে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়—অন্য দিকে কল্পনার রাজ্যে তাহার অপ্রতিহত অভিযান এই দুই বিপরীত ধারায় তাহার চরিত্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইতে থাকে। আমাদের শিশুরা আজ রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন এবং আমরাও

বাস্তবকে অত্যন্ত কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছি, এবং সেই কারণেই হয়তো কল্পনার প্রদীপে তৈল-নিষেক করিবার উৎসাহ স্বভাবতঃই আমাদের হ্রাস পাইয়াছে। সেকালের মা, ঠাকুরমা, দিদিমা যাঁহারা শিশুচিত্তে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারাও আজ কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরসবৃত্তির চর্চ্চা করিবার অবসর বড় একটা পান না, কিংবা যুগের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের রুচিও বদলাইয়াছে। কিন্তু একালের ছেলেরা কি সত্যই গল্প শুনিতে ভালবাসে না? কঠিন বাস্তবের তিক্তস্বাদমাখা প্রহরগুলি হইতে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিষ্কৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষা কি তাহাদের নাই? গল্প শুনিবার আগ্রহ শিশুদের নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই আগ্রহকে কল্পনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার আয়োজনটুকুই যে আজ নাই। লেখক ছেলেদের জন্য এই আয়োজন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সেকালের রূপকথার ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া চমৎকার চারিটি গল্প তিনি এই সঙ্কলনে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পগুলির নাম—কাজল রেখা, কাঞ্চনমালা, মাণিকতারা, সোনামতি। এগুলি অখণ্ড বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুকাল ধরিয়া কত লক্ষ মা-ঠাকুরমার মুখনিঃসৃত হইয়া কত কোটি শিশুর মনোহরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজিকার মায়েদের কাহারও কাহারও বা স্মৃতিপটে এই সব গল্পের ভাঙা ভাঙা টুকরা এখনও হয়তো চূর্ণ হীরকের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে। গল্পগুলি শুধু সুনির্ব্বাচিতই নহে, এগুলিকে গুছাইয়া বলিবার প্রশংসাও লেখকের প্রাপ্য। তা ছাড়া সুমুদ্রণ ও সুন্দর প্রচ্ছদপটে বইখানি লোভনীয়। পড়িয়া ছেলেরা তো আনন্দ পাইবেই—মায়েরাও হারানো গল্পের সূত্র ধরিয়া কল্পনালুব্ধ শিশুদের লইয়া দ্বিপ্রাহরিক বা সান্ধ্য আসর জমাইয়া তুলিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ডায়াপেপসিন
DIA PEPSIN
পরিপূর্ণভাবে খাদ্য হজম করিতে সাহায্য করে
ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা
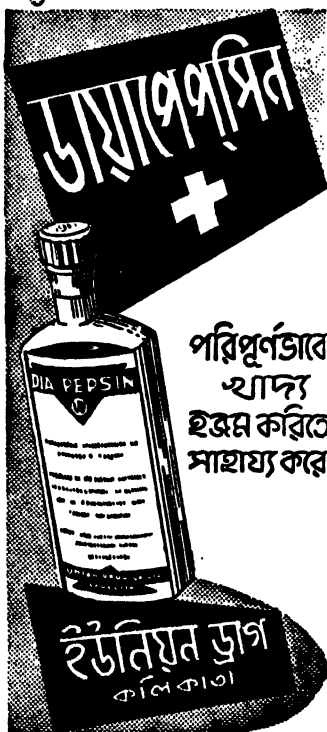
মাটির কান্না—জসিমউদ্দীন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; বাংলাবাজার, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

ক্ষেতখামারের কথা, বঙ্গপল্লীর বুকের কথা জসিমউদ্দীনের কাব্যে মধুর করুণ সুরে বাজিয়াছে। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর সরল লাবণ্য, সাবলীল গতি এবং প্রাণের দীপ্তি সহজেই পাঠকের মন কাড়িয়া লয়।

"রাতের বেলায় আঁধারের কোলে ঘুমায় নদীর চর,
জোনাকী মেয়েরা স্বপনের দীপ দোলায় বুকের 'পর।
শেষ রাত্রের জোছনার রথে পরীরা নামিয়া আসি
শঙ্খ শামুক কুড়ায়ে কুড়ায়ে খেলায় হেথায় হাসি'।"

প্রকৃতির এই সব লীলারহস্যে কবি মুগ্ধ। সংসারের দুঃখদৈন্য অবিচারে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে কোন কোন কবিতায়। সেগুলিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কথায় মাত্রায় সুরের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। যেমন, 'সোনার মেয়ে'-তে—

"কতটুকু আমি পারিব করিতে, সাধ্য কতবা আছে,
মিথ্যানীতি কুসংস্কার তোর চলিতেছে পাছে পাছে।"

'নির্ব্বাসিতা'য়—

"সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া পান সে করিত রূপোর গেলাসে জল,
সেই জলে আজি নানান্ রোগের বীজাণু আসিয়া করিতেছে কলবল।"

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত নারীদের জন্য তাঁহার মর্ম্মবেদনা পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগাইবে, কিন্তু তাঁহার 'পাকিস্থান'-প্রশস্তি অনেকেই হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গ্রহণ করিবেন। দেশবিভাগে অখণ্ড বাংলার ও বাঙালীর কবি উল্লসিত হইবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল।

মহাকবি—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ, সাহিত্যবিশারদ, তত্ত্বরত্ন। ডি. এম্. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি মধুসূদনের জীবনকথা লইয়া বাংলাভাষায় ইতিপূর্ব্বে একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে। তথাপি এ গ্রন্থ পাঠককে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নাট্যরচনায় লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে।

নক্সী কাঁথার মাঠ—জসিমউদ্দীন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, বাংলাবাজার, ঢাকা। ৭ম সংস্করণ। মূল্য ১৸০।

কবিতার প্রতি বাঙালী পাঠকসাধারণের বিরাগসত্ত্বেও যে কবিতার বইয়ের সপ্তম সংস্করণ হইয়াছে, তাহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। জসিমউদ্দীন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁহার 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়া বিদেশে সমাদরলাভ করিয়াছে। বাংলার

জেনে রাখো—
যে কোন ১৭ বৎসরের কম ছাত্রছাত্রীকে বিনা চাঁদায় মাত্র ডাক খরচ দিলেই গ্রাহক করা হয়। প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লওয়া হবে। সুতরাং সত্বর যোগাযোগ কর, কারণ আগে এলে আগে পাবে।
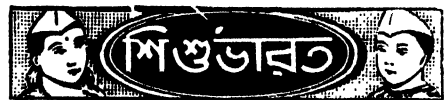
ছোটদের সাপ্তাহিক] [বার্ষিক সডাক ৬৸০
পরিচালক—পোষ্ট বক্স নং ২৫৫২ জি. পি. ও. কলিকাতা।

পল্লীজীবনের, বিশেষতঃ কৃষকজীবনের চিত্র আধুনিক সাহিত্যে আর কেহ এমন করিয়া আঁকেন নাই। এ কবিতা কেবল কথার কৌশল নয়, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতায় সমৃদ্ধ, তাই ইহা সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

উতঙ্গ নির্জ্জন—শ্রীআলোক সরকার। ৪৫-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৩। মূল্য এক টাকা।

কাব্যিক রচনা আর কবিতা—সম্ভবতঃ দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আজকাল কাব্যিক রচনা অনেক দেখি, কিন্তু কবিতা একান্ত বিরল। কৃত্রিম কলাকৌশল এই সব রচনার প্রাণকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ছন্দ নিখুঁত, শব্দবিন্যাসে চাতুর্য্য আছে, কিন্তু নেই সেই জিনিষ যা সোজাসুজি মনকে গিয়ে নাড়া দেয়। এ বইখানি পড়েও সেই কথাই মনে হ'ল। "নির্নিমেষ অন্বেষণ", "আশ্চর্য্য হাওয়ার হাত", "তরঙ্গিত হেসে ওঠা", "একমুঠি বসন্তের গান—কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে কি হ'ল, সহজে বোঝা যায় না। তরুণ কবিদল নূতন পথ-সন্ধানে উৎসুক, বাঁকা পথ ছেড়ে কি তাঁরা সোজা পথ ধরবেন না?

আবাহন—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার রায়। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

শব্দ ও ছন্দের উপর কবির অধিকার আছে।

রহিতে নারিনু ঘরে—শ্রীকালীপদ ঘটক। মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কীর্ত্তনের সুর শ্রীবিলাসের মর্ম্মে প্রবেশ করে, তাকে করেছিল প্রেমস্বপ্নে বিভোর। কূটবুদ্ধি রাজু চক্রবর্ত্তীর দল হ'ল তার শত্রু। তাদের শয়তানী চক্রান্তে বিপন্ন হলেও শ্রীবিলাস অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াল না; অন্তরে যাকে সত্য বলে জেনেছিল, তারই অনুসরণে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। শত্রুদের চৈতন্য উদয় হ'ল ঘটনাবিপর্য্যয়ে। কবিত্বগন্ধি উপন্যাস, কিন্তু সুখপাঠ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অগ্নিসম্ভব—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪।০ আনা।

লেখক অনুবাদ-সাহিত্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার মৌলিক উপন্যাস। উপন্যাসের গোড়ায়ই আমাদের পরিচয় হয় যশোমধন্যা চিত্রাভিনেত্রী রমিতা মজুমদারের সঙ্গে। ক্রমে এই চিত্রাভিনেত্রীর বিগত জীবনের একটি অতি করুণ অধ্যায় পাঠকের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়। আজিকার রমিতা তখন ছিল সান্ত্বনা নামে পরিচিতা। বৈদ্যের মেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে মিহিরকে বিবাহ করিল বাপের অমতে এবং ঘটনাচক্রে এমন একটা সময় আসিল যখন এই মিহিরই নিজের স্ত্রীকে বিপথগামিনী হইতে বাধ্য করিল। এখানে সান্ত্বনার অতীত জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল। লোকে জানিল সে মরিয়াছে, কিন্তু সে নমিতা মজুমদার নামে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। পৃথিবীর সমগ্র পুরুষজাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল—সুরু হইল তার নূতন জীবন। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে রমিতা—শিক্ষিতা রমিতা উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে বাছিয়া লইলেও অন্তরের সহিত ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার দেহে মনে দেখা দিল

বিপর্য্যয়। এই সময় ডাঃ প্রভঞ্জন সরকারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। প্রভঞ্জনকে আশ্রয় করিয়া সে নূতনভাবে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু প্রভঞ্জন শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিদেশে পাড়ি জমাইল। রমিতা বিস্মিত হইল, ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু আশা ছাড়িল না। স্থির করিল, প্রভঞ্জনের কর্ম্মের মধ্যেই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা রমিতার জানা—ফিরিয়া আসিয়া একটি বিরাট হাসপাতাল খুলিতে সে কৃতসঙ্কল্প। রমিতা পর পর পাঁচখানা ছবি তুলিবার কনট্র্যাক্ট করিয়া বসিল। প্রভঞ্জনের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেখিতে হইলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন! রমিতার সঙ্কল্প এই টাকাটা সে তারই হাতে তুলিয়া দিবে, আর নিজে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমৃত্যু তাঁহার পাশে থাকিয়া কাজ করিবে।

কাহিনীটি মোটামুটি এই। রমিতার চলার পথে আরও বহু নর ও নারী ভিড় করিয়াছে। তাহারা সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের লিপি-সংযম সহজ সাবলীল ভাষা এবং শাণিত সংলাপ পুস্তকখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্তুতিমালিকা—শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীশিবকিঙ্কর কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত এবং মুর্শিদাবাদ, পোঃ খাগড়া, 'বহরমপুর জুবিলী' টোল হইতে প্রকাশিত। ৬২+৩ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে প্রাতঃকালে স্মরণীয় স্তবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তেইশটি বিভিন্ন দেবীর স্তব, দুইটি জাতীয় সঙ্গীত, বহু দেবদেবীর ধ্যান-প্রণাম এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবপূজাবিধি স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশই প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্তবের সংগ্রহ, মাত্র কয়েকটি প্রথম সঙ্কলকের এবং একটি দ্বিতীয় সঙ্কলকের বিরচিত। জাতীয় সঙ্গীতের প্রথমটি ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরম্' ও দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক'। প্রাচীন স্তব-গুলি সুনির্ব্বাচিত এবং সঙ্কলয়িতাদের রচিত স্তবগুলিও ছন্দের মাধুর্য্যে, শব্দের ঝঙ্কারে এবং ভাবের সরসতায় সমুজ্জ্বল। এই সুগ্রথিত মালিকা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই কণ্ঠে পরিশোভিত হইবার যোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্তোত্ররত্নম্—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

শ্রীযমুনাচার্য্য বিরচিত 'স্তোত্ররত্নম্' পঁয়ষট্টিটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। সম্পাদক চপলাবাবু লিখিয়াছেন—"১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মীরূপে 'আশ্রম' আখ্যাযুক্ত একটি কর্ম্মিনিবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলাম। তথাকার উষাকালীন প্রার্থনায় যমুনাচার্য্যের 'স্তোত্ররত্নম্' হইতে কয়েকটি শ্লোক পঠিত হইত।…শ্লোক কয়টির ভাবমহিমা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে যমুনাচার্য্যের স্তোত্র হইতে যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ অনুভব করি এবং সম্পূর্ণ স্তোত্রটির সন্ধান করিতে থাকি।" এই অনুসন্ধানের ফল আলোচ্য পুস্তকখানি। প্রতিটি শ্লোকের সঙ্গে সরল বাংলা ব্যাখ্যা থাকায় সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে

বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকায় যমুনাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কোন্ কোন্ স্থলে ইহা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ভূমিকায় পাদটীকায় তাহারও উল্লেখ আছে। পুস্তকখানি সুসম্পাদিত। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি: "বাক্য ও মনের অতীত অথচ বাক্য ও মনের আশ্রয় যে মহৎ সত্তার অপূর্ব্ব উপলব্ধি এই স্তোত্রের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণতি।"

গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (প্রথম ভাগ)—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর, কে, পাবলিশিং কোং। ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য আড়াই টাকা। সচিত্র।

সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্য্যয় সত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।৵ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, লেখক গোকুল মিত্রের বংশধর, সুতরাং এই বংশের অনেক পুরাতন দলিলপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সব দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত, এরূপও ভূমিকায় বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে গোকুলচন্দ্র মিত্র-প্রসঙ্গে কলিকাতার বহু পুরাতন খবর আমরা জানিতে পারি। কিন্তু বিষয়-বিন্যাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ইহা অধিকতর সুখপাঠ্য হইত। কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাকালে এ বইখানির প্রয়োজন হইবে নিশ্চয়।

যে গল্পের শেষ নাই (প্রথম খণ্ড)-শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ। ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পৃথিবীর জন্মরহস্য জানিবার কৌতূহল মানুষের মনে চিরজাগরূক রহিয়াছে। হিন্দু, ইহুদী প্রমুখ প্রাচীন জাতিসমূহের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে নানা আলোচনা আছে। বিজ্ঞানও বসিয়া নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি, প্রাণের জন্ম, মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। আবার 'পাহাড়ের বই' হইতে জীবজগতের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধেও আমরা নানা নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। মানুষ তথা মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পূর্ব্বপুরুষ 'মাছ'—শুনিতে কেমন লাগে। অথচ এই সকল জটিল বিষয় গল্পচ্ছলে অতি সহজ ভাষায় লেখক বলিয়াছেন। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে চিত্রাদি সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। পুস্তকখানি অল্পবয়স্কদের জন্য লিখিত। এইরূপ সহজ ভাষায় বিজ্ঞান-পুস্তক রচনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

নারীর মূল্য—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"শ্রীমতী অনিলা দেবী"—এই ছদ্মনামে ১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিক-পত্রে লেখকের 'নারীর মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বাহির হয়। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকৃতপক্ষে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ। শরৎচন্দ্র নারী-জাতির প্রতি কিরূপ দরদী ছিলেন তাহা তাঁহার উপন্যাসরাজি পাঠে আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে মোটেই আকস্মিক নহে। তিনি নারী-জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; আবার ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সমাজতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি পাঠে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের সমাজে নারী-জাতির স্থান সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন। নারীর দুঃখ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও আহৃত জ্ঞান তাঁহার মনকে একেবারে দরদে ভরপুর করিয়া তোলে। বিভিন্ন উপন্যাসে তাহা যেন উপচাইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের জ্ঞানের পরিধি যে কত বিচিত্র ও গভীর, স্বল্প পরিসরের এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহাও পাঠকের সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে, আশ্রমবৈতালিকগণের প্রভাতী কীর্তনের পর আশ্রমাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ গিরি আশ্রম-পতাকা উত্তোলন করেন। অপরাহ্নে সেবায়তন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কুচকাওয়াজ সহকারে জাতীয় পতাকা অভিবাদন করেন। তৎপরে শ্রীমৎ-স্বামী সর্বানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই আশ্রমের ভক্ত-মণ্ডলী ও বিভিন্ন স্থানের বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় দিন বালকগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় প্রায় দুই শত যোগপন্থাবলম্বী সাধকের সমাবেশে ক্রিয়াযোগ সাধন ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা হয়। জেলা প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

অনিলচন্দ্র রায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক, বাংলা দেশের অগ্নিযুগের কর্ম্মী, এবং পরবর্তী জীবনে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা অনিল রায় গত ২১শে পৌষ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্গত প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। দুরন্ত আন্ত্রিক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য বিশিষ্ট সার্জ্জেন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জির চিকিৎসাধীনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু অস্ত্রোপচারে আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া ডাঃ চ্যাটার্জ্জি অস্ত্রোপচারে বিরত হন। সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লীলা রায়, ছোট ভাই শ্রীঅমল রায় এবং দুই জন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্ম্মীর উপস্থিতিতে অনিলবাবু ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনিলচন্দ্র ১৯০২ সনে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বিরাম্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অরুণ রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। অনিল রায় ১৯২২ সালে ঢাকা হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ. ডিগ্রী লাভ করেন। স্কুলে ছাত্রজীবন হইতেই তিনি বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে 'শ্রীসঙ্ঘ' নামে তিনি এক সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন নেতাজীর নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হইয়া ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৪০ সালে নেতাজীর সহিত ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনে তিনি বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৯৪১ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাবাসে কাটাইতে হয়। ১৯৪৭ সালে 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং পরে ফরোয়ার্ড ব্লক দুইটি ভাগে বিভক্ত হইলে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক জীবন ছাড়া অনিলচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং মৌলিক রচনার খ্যাতিও ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ ও কলা-রসিক সমাজে তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি অগ্রগামী সঙ্ঘ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং "নেতাজীর ডাক" নামে নৃত্য-নাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। "পার্টি এণ্ড লীডারশিপ", "সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ", "নেতাজীর জীবন-বাদ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সুবক্তা ছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পর তিনি উদ্বাস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলা রায় এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রমথেশ বড়ুয়া

চিত্র-নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া অকালে মর্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য গত ২রা পৌষ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পিগণ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে এক স্মৃতি-সভার আয়োজন করেন। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রমথেশ আসামের ধুবড়ীর অন্তর্গত গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রভাতচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পরিপোষক। রংপুর সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ছায়াচিত্রের ক্ষেত্রে প্রমথেশের মত অভিজাতপরিবারের ব্যক্তির আবির্ভাব অনেককে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে প্রচুর সুনাম এবং সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া বাংলা-দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রমথেশবাবুর পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।
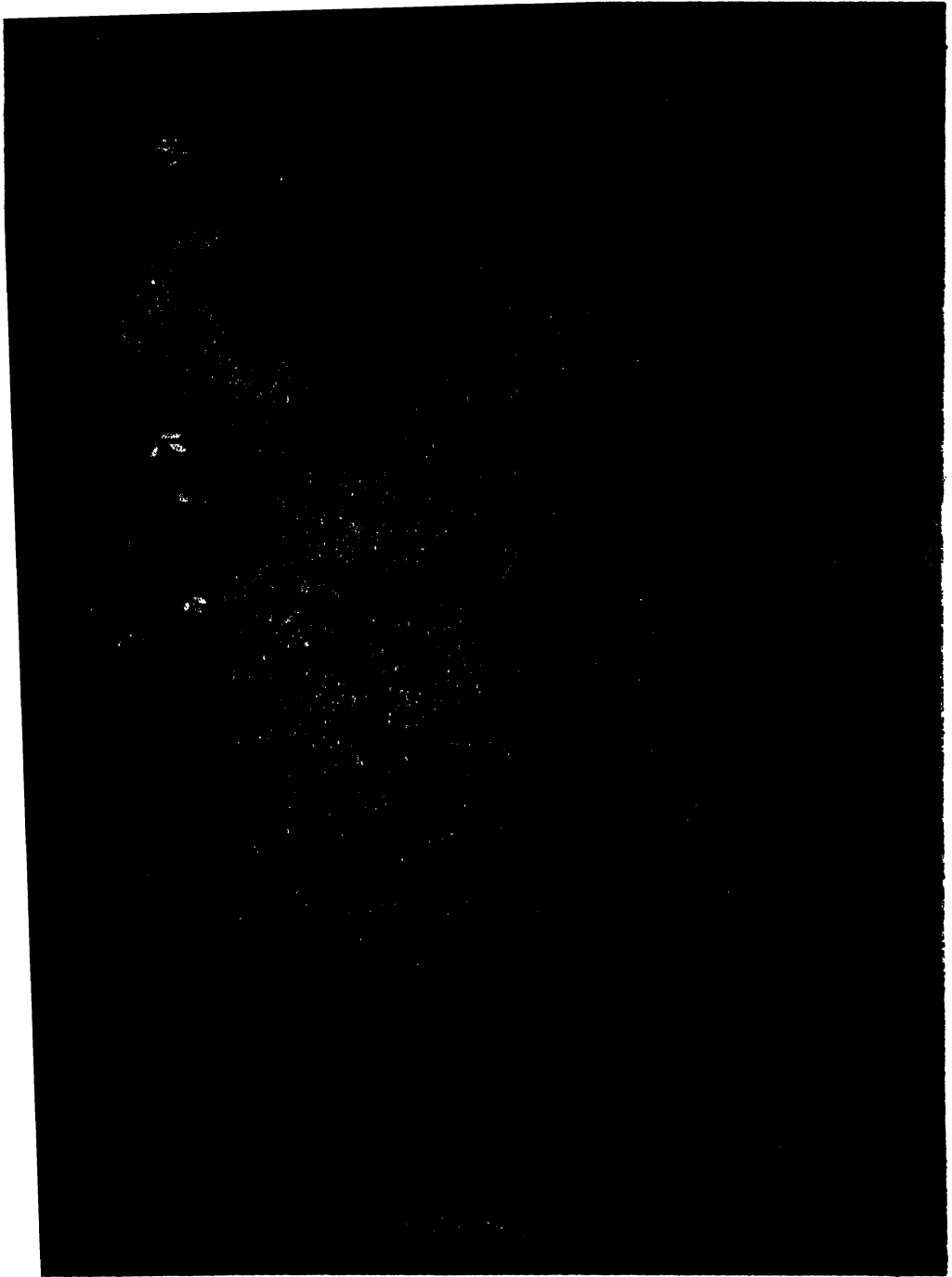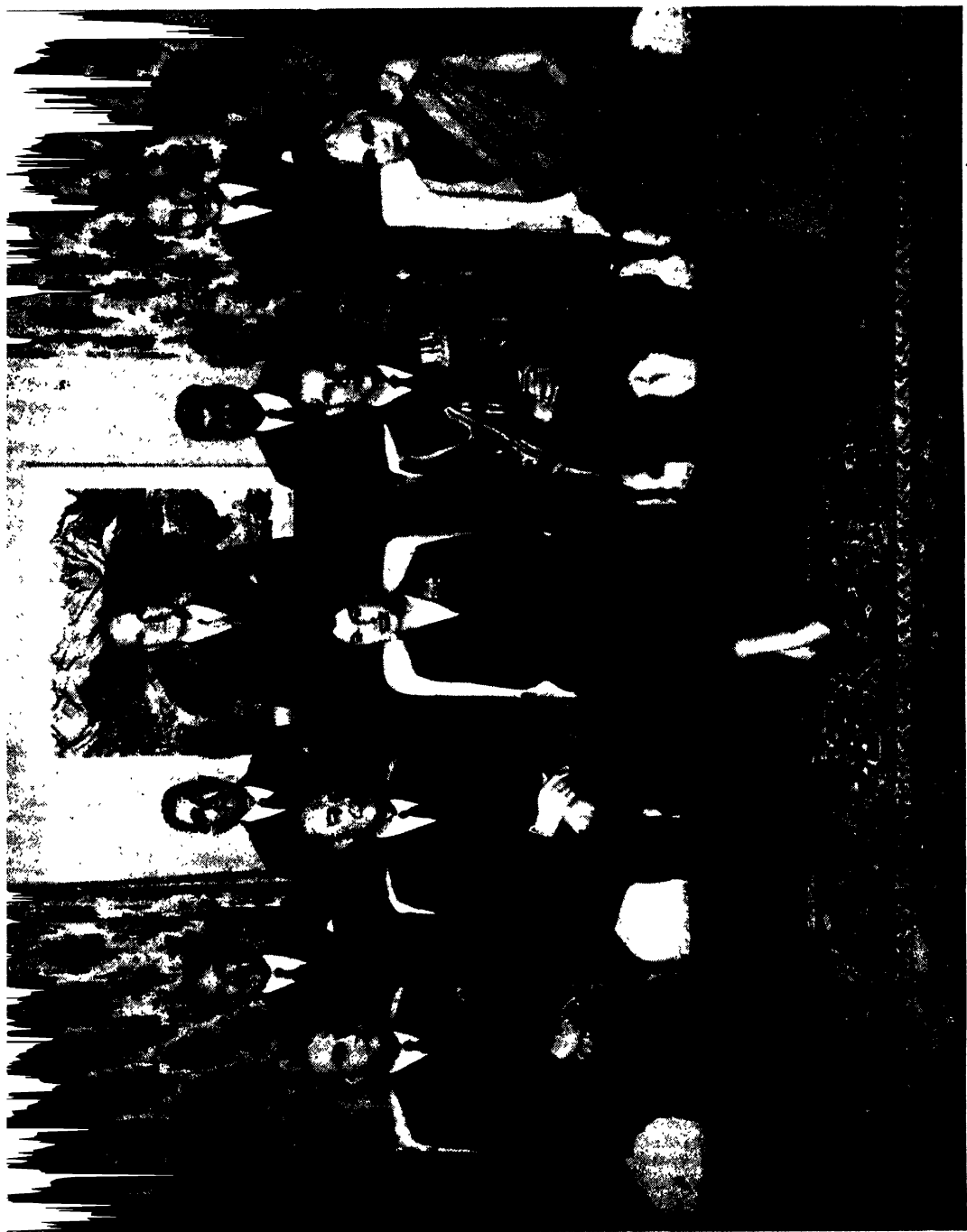
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বুদ্ধের বৈরাগ্য
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ওয়াশিংটনস্থ কানাডার দূতাবাসে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দূতগণ সহ রাজকুমারী এলিজাবেথ। সম্প্রতি রাজা ষষ্ঠ জর্জের পরলোকগমন হেতু তিনি ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন। চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৮

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন

বাংলার ভোটযুদ্ধ ত শেষ হইল, এখন ভবিষ্যতে কি লেখা আছে? অবশ্য এ কথা বলা চলে যে, "নীচের তলার" ব্যাপার শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু "উপরের তলা" এখনও খালি এবং সেখানকার নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ কথা বলা বা লেখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। উপরের তলার কথা মনে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, বাংলার ভবিষ্যতে কোনও বিশেষ আলোর রেখা আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই।

নির্ব্বাচন যে ভাবে হইয়াছে তাহাতে একথা সুস্পষ্ট যে, দেশের শিক্ষিত সাধারণের অধিকাংশ হয় অবসাদগ্রস্ত হইয়া এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন নয় সাময়িক উত্তেজনার বশে দায়িত্বহীন কার্য্যকলাপ করিয়াছেন। যেভাবে নির্ব্বাচন চলিয়াছিল তাহাতে মনে হয় অনেক স্থলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা দশ জনও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ ঔদাসীন্য শিক্ষিত বাঙালীর একটা প্রকৃতিগত বিষয়ে দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। কেননা উহার প্রতিকার না হইলে জাতির দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভব হইবে না। এবারের নির্ব্বাচনে বাংলায় কোনরূপ প্রকাণ্ড উপদ্রব হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহা দেশবাসীর নিয়মশৃঙ্খলার ভক্তির পরিচায়ক নহে, বরঞ্চ নিদারুণ অবসাদ ও অবহেলারই পরিচায়ক। বাংলার শিক্ষিত সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই পড়ে। এই নির্ব্বাচনে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণ এবং চিন্তাশক্তি দারুণ জরাগ্রস্ত।

এ বিষয়ের বিশেষ পরিচায়ক বাংলার সেই সকল সংবাদপত্র যাহা এখনও শিক্ষিত বাঙালীর মুখপত্র রূপে পরিচিত। এই নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের মুখপত্র দুই একটি ছাড়া আর সকলেই অতি সন্তর্পণে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া "কূল বাঁচাইবার" চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বিভিন্ন নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতায় বাংলার সংবাদপত্রের এইরূপ নির্জীব জড়ভাব কখনও দেখি নাই। ইহাও বাঙালীর জীবনীশক্তির হ্রাসেরই পরিচায়ক। সংবাদপত্রের কথা আমরা বুঝিতে পারি, কেননা হয়ত সেগুলির পরিচালকবর্গ নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা আগে করিয়া কাহাকেও চটাইতে চাহেন নাই; এই ভয় ছিল যে, যদি-বা যাহাদের সমর্থন করি তাহারা হারিয়া বিপক্ষ দল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পাঠকবর্গ কি ততোধিক জরাগ্রস্ত ছিলেন, না হইলে ঐরূপ স্বাদহীন, সারহীন বস্তু তাঁহারা দিনের পর দিন কিরূপে গলাধঃকরণ করিলেন? বস্তুতঃপক্ষে বাংলার ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে বাংলার সাংবাদিক গোষ্ঠীর এরূপ কর্ত্তব্যে ত্রুটি অতিশয় দুঃখজনক।

এবারের নির্ব্বাচনে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অর্ব্বাচীনের জয় প্রায় সকল নগর কেন্দ্রে এবং অনেক গ্রাম্য অঞ্চলেও হইয়াছে। তবে সুখের বিষয়, গ্রামের লোক বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে দল অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহারা টিকিট না দেখিয়া লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং নির্ব্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছে। ভুল-ভ্রান্তি তাহাদের যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু নগরের লোকের মত বিপরীত বুদ্ধির ব্যবহারে নিজেদের মনের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা তাহারা এতটা করে নাই। বোধ হয় শহরে লোকের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি সেরূপ না থাকায় তাহাদের বুদ্ধিভ্রম এতটা হয় নাই।

বাংলার নির্ব্বাচনে কোন দলই জয়যুক্ত হয় নাই, কেননা নির্ব্বাচনের ফলে যদি বাংলার ভবিষ্যতের অন্ধকার কিছু লাঘব না হয় তবে সে জয়-পরাজয়ের মূল্য কি? কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই নির্ব্বাচনের ফলে পশ্চিম-বাংলার বিধানসভা অধিকতর কার্য্যক্ষম বা সবল হইল বা এই নির্ব্বাচনের ফলে বাংলার সমস্যাপূর্ণ ভাগ্যপথ কিছুমাত্র সুগম হইল?

আমরা দেখিতেছি সকল দলেরই মধ্যে যে কয়জন চিন্তাশীল বা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত গুণের কথা বলিতেছি, দলগত মতামতের নহে—তাঁহারা প্রায় সকলেই পরাজিত হইয়াছেন। ইহার কারণ প্রত্যেক দলেরই প্রধান চেষ্টা ছিল বিপক্ষের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে পরাজিত করা। এইরূপ হওয়ার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে যোগ্য লোকের নিদারুণ অভাব তো হইয়াছেই, বিরোধীদলের মধ্যেও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকও অতি অল্প। সুতরাং রাষ্ট্র চালনার ব্যাপারে অধিকারীবর্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার কারণে দেশের প্রগতি যেরূপে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিল, অন্য দিকে বিপক্ষের বিচারশূন্য বাধাদানেও দশের স্বার্থও সেইরূপে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিল। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য দলাদলির ফল যাহা হয় তাহাই দেশবাসীকে ততদিন ভোগ করিতে হইবে যতদিন তাঁহাদের এ বিষয়ে চৈতন্যের উদ্রেক না হয়।

নির্ব্বাচন পরিচালনা সম্বন্ধে এখন লিখিবার সময় আসে নাই, কেননা কতকগুলি "অলৌকিক" ব্যাপারের কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ আমরা এখনও খুঁজিয়া পাই নাই, যদিও সে বিষয়ে অনুসন্ধান আমরা করিতেছি। যথাসময়ে সে সকলের এবং এবারের নির্ব্বাচনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ এইমাত্র বলা চলে যে, দেশের লোক এখনও নির্ব্বাচনরূপ বস্তুর ব্যবহারে অভিজ্ঞতার অভাব সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখাইয়াছে।

ফলাফল যাহাই হউক, এখন কিছুকালের মত দেশের লোক নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিল। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই—যিনি যে কোনও দলের হউন না কেন—যদি বিধান সভায় ও লোকসভায় পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন তবে বাংলার ভবিষ্যৎ এখনও প্রসন্ন হইতে পারে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা

কি পরিবেশের মধ্যে বাংলার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ আগামী কয় বৎসর চলিবে তাহার সামান্য আভাস আমরা দিয়াছি। এখন সে বিষয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা কিরূপ তাহাও জানা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সেই জ্ঞাতব্য তথ্যের পূর্ণ পরিচয় পাইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমরা তাঁহার আগামী চার বৎসরের কার্য্যক্রমের একটি নক্সা পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার ধারণা সম্পর্কে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের কয়েকটি প্রধান সমস্যা সমাধানে পরবর্ত্তী চার বৎসর সরকার কি পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন, তাহার এক চিত্র সাংবাদিকগণের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে রবিবার ২৪শে মাঘ অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথমতঃ উদ্বাস্তু সমস্যা ও তৎসম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার কথা অবতারণা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত অনুমান সাড়ে একুশ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে দেড় লক্ষের মত উদ্বাস্তুর জীবিকা সংস্থান করিয়া দিতে হইবে এবং গড়ে সকলের বর্ত্তমান আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উদ্বাস্তু সম্পর্কে ডঃ রায়ের বিবৃতিতে সমস্যাপূরণ বিষয়ে আমরা নূতন কিছুই পাই নাই। আমরা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি যে, ঐ সমস্যাপূরণ তখনই সম্ভব হইবে যখন ভারত-সরকার পাকিস্থানের হিন্দু সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিবেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে উদ্বাস্তুদিগের নিজেদেরও এ বিষয়ে মনোভাবের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, কেবলমাত্র পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের অধোগতি দ্রুত হইতে দ্রুততরই হইবে, এবং বর্ত্তমানে যে বিষাক্ত হাওয়া অনবরত বহিতেছে তাহারও বৃদ্ধি অচিরেই হইবে। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে যেভাবে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, তথা তাহার উচ্চতম অধিকারীবর্গের, আয়ত্তের ও ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ রায়ের এ বিষয়ে যথেষ্ট ভুল ধারণা আছে, এবং এ বিষয়ে সুযোগ্য মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী নিয়োগেও শৈথিল্য ইতিপূর্ব্বে হওয়ার ব্যাপার ক্রমেই বিপরীত দিকে গড়াইয়াছে। সুতরাং সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন ডাঃ রায়ের দৃষ্টিকোণের পরিবর্ত্তন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি ছোট ছোট শহর নির্ম্মাণের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং গ্রামের সহিত শহরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করাই ইহার মূল লক্ষ্য।

এই ছোট ছোট শহর নির্ম্মাণের ব্যাপারে যতটা কাজ হইয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি সুচতুর রাজকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের আত্মীয়-বন্ধু গোষ্ঠীরই উপকার অধিক হইতেছে। যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই সকল পরিকল্পনা রচিত তাহাদের অবস্থা "যে তিমিরে সেই তিমিরে।" বস্তুতঃপক্ষে বাস্তুঘুঘুর উৎপাতে যেমন প্রকৃত উদ্বাস্তুর নৈরাশ্য গাঢ়তর হইতেছে, সরকারী পরিকল্পনার অসাধু রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর চৌর মনোবৃত্তিসম্পন্ন পার্শ্বচর ও চাটুকারের দৌরাত্ম্যে দেশের মধ্যবিত্ত লোকের ব্যর্থতা ও মনের জ্বালা সেইরূপই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সুচিন্তিত মন্ত্রীর পূর্ণ সহায়তা এবং বিধান সভার পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য এখানে ব্যাহত হইতে বাধ্য।

পরিকল্পনার পরিসর ও সময় নিরূপণ ত এইরূপে মুখ্যমন্ত্রী সহজেই করিলেন, কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এইটুকু যে, ঐ কার্য্যধারা কাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। বিদেশী টাকা দিতে পারে, উপদেশ দিতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাকৃতিক ও টেকনিক্যাল সমস্তার সমাধানের পথও দেখাইতে পারে। কিন্তু ভারত-সরকারের উচ্চ অধিকারীবর্গের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন তাহারা করিতে পারে না, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ম্মচারী ও অধিকারীবর্গের মধ্যে সাধু-অসাধু বা যোগ্য-অযোগ্যের বাছাইও করিতে পারে না। সুতরাং যত দিন তাহার ব্যবস্থার আভাস আমরা না পাই তত দিন এই সকল পরিকল্পনাই অরবিন্তর আকাশ কুসুমের পর্য্যায়েই থাকিবে। ডাঃ রায় আগে দেখান যোগ্য লোক কোথায় যাহারা এইরূপ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে পরিণত করিতে পারে এবং ইহাও দেখান যে কাহার উপর তিনি এই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিচার ও ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহার পর আমরা বাহবা দিব।

মুখ্যমন্ত্রী লবণশিল্প ও গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার সম্বন্ধেও সরকারের পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য তাঁহারা যে কর্ম্মের অবকাশ করিয়া দিতেছেন, তাঁহার আশা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অথচ কর্ম্মাভাবে হতাশ যুবকগণ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

মুখ্যমন্ত্রী ভারত-সরকারের পরিকল্পনায় যে সমাজ উন্নয়নের সুপারিশ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, সম্প্রতি ভারত-মার্কিন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই যে পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন, তাহার সহিত ভারত-সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গতি আছে। কথা হইয়াছে যে, তিন-চার শত বর্গমাইল অথবা গড়ে তিন-চার শত গ্রাম জুড়িয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। এরূপ পরিকল্পনাভুক্ত প্রত্যেকটি এলাকাকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক ৫০ বর্গ মাইল ব্যাপী এক একটি বিভাগে ৫০ হইতে ৭৫টি গ্রাম থাকিবে, ২০,০০০ একর আবাদী জমি ও ৩৫,০০০ অধিবাসী থাকিবে। পরিকল্পনায় নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা নাই, কথা আছে গ্রামীণ-শহর প্রতিষ্ঠার কথা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের ইচ্ছা এইসব শহর ময়ূরাক্ষী ও দামোদর উপত্যকার সন্নিকটে স্থাপন করেন। ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে তিনটি এবং দামোদর উপত্যকায় দুইটি শহর প্রতিষ্ঠার কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব জলাভূমিতে আবাদ সম্ভব নহে সেই সব স্থানে নালার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং জল নিকাশন হইয়া গেলেই সেখানে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কোন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা নাই ; এখানে জমি বন্ধুর, এই সব জায়গায় বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। তৃতীয়তঃ নলকূপ বসাইয়া সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ মোট আটটি পরিকল্পনায় আটটি করিয়া বিভাগ ধরিলে ৬৪টি বিভাগের কাজ চার বৎসরে শেষ করিবার ইচ্ছা সরকারের আছে। শেষ হইলে দুই লক্ষ গ্রামবাসী এবং ১৬ হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। অনেকে গৃহ নির্ম্মাণের কাজ পাইবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে এক হাজার এবং বে-সরকারী তত্ত্বাবধানে এক হাজার গৃহ নির্ম্মিত হইবে। সংযোগ-রক্ষার জন্য সড়ক নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও আছে ; কেননা শহরাঞ্চল হইতে যাহাতে চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-সেবার কার্য্যধারা সহজেই গ্রামাঞ্চলে প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্য এই সড়ক-সংযোগ অপরিহার্য্য।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে ডাঃ রায় আরও বলেন যে, সমগ্র পরিকল্পনা ১৯৫৬ সালে শেষ হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে আটটি পরিকল্পনার এক একটি বিভাগের কাজ সুরু হইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ঐ আটটির কাজ সমাপ্ত হইলে ২৯টি নূতন বিভাগের কাজ গ্রহণ করা হইবে। তৃতীয় বৎসর ১৯৫৪-৫৫ সালে ঐ ২৯টি শেষ হইলে আরও ২৭টি বিভাগের কাজ লওয়া হইবে। এই ভাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষাশেষি ৮টি পরিকল্পনাই শেষ হইয়া যাইবে।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সমাজ উন্নয়ন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিভাগ এই সব শহরে স্থানান্তর করা হইবে। পরিকল্পনার বিশদ ব্যবস্থার জন্য সরকার একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; কেননা সরকার যথাশীঘ্র এই পরিকল্পনা কার্যাকরী করিতে উৎকণ্ঠিত। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা হইয়াছে। যাহাতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাজে হাত দেওয়া যায়, তদুদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ম্মচারিগণ প্রভাবিত এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ফোর্ড-ফাউণ্ডেশান’ কর্ম্মসূচী অনুসারে শহর এলাকায় যুবকগণকে কৃষি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে ; এই যুবকগণ স্থানীয় এলাকায় গ্রামবাসীকে সেই শিক্ষা দিবে। শহর এলাকায় কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার লোক পাওয়া যাইবে ; কেননা গত তিন বৎসর যাবৎ আসানসোল, শিবপুর, যাদবপুর ও অন্যান্য স্থানে বহু উদ্বাস্তু তেমন শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষাদানের যোগ্যতা ইহাদের আছে।

ইহার ব্যয় সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন, ইহার খানিকটা ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করিবেন এবং অবশিষ্টটুকু কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। ডাঃ রায় বলেন, সরকার জনসাধারণকে সুযোগ দিবেন, সেই সুযোগ গ্রহণের কাজ জনসাধারণের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বৎসর বহু যুবক-যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে বাহির হইয়া আসে ও কর্মাভাবে হতাশ হইয়া পড়ে। সরকারের কর্তব্য এই সব যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া। তাঁহারা তাহাই করিতেছেন এবং তিনি আশা করেন, যুবক-যুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

ডাঃ রায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল যুবক-যুবতী বাহির হইয়া আসে তাহাদের কর্মসংস্থান করা সরকারের কর্তব্য। অন্যথায় তাহারা ব্যর্থতায় আক্রোশ ব্যক্ত করিবার জন্য তাহাদের অপরিপক্ব বুদ্ধি ও শক্তি কি ভাবে অকাজে ও কুকাজে লাগায় তাহার পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে —নূতন নির্ব্বাচনের বিষময় ফলরূপে—আরও অধিকতরভাবে পাইবার আশঙ্কাও আছে।

ডাঃ রায়ের এই উক্তির পরের অংশের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহারা তাহাই করিতেছেন", এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, "তিনি আশা করেন যুবক-যুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।"

আমরা বলিতে বাধ্য যে, বিগত কয়েক বৎসরের যে চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে তাহাতে যোগ্যতার বিচারে সকল কর্মপ্রার্থীর সমান সুযোগের কথা ভাবিতেই পারি না। অসংখ্য চাকুরী, অসংখ্য সুযোগ অতি অযোগ্য, অতি অকর্মণ্য লোকে পাইয়াছে। পার্শ্বচর-চাটুকারের গোষ্ঠীবর্গ, অধিকারীবর্গের অকেজো বেকার আত্মীয় এবং উপরন্ত ত্যাগী মহাপুরুষগণের উমেদারবৃন্দ—ইহারাই তো অধিকাংশ কাজ পাইয়াছে। তাহার পর পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগের পথে চতুর্দ্দিকে কাঁটা দিয়াছেন কতিপয় পূর্ব্ববঙ্গজাত উচ্চ অধিকারী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীদিগের নিকট ডাঃ রায়ের বিবৃতি আরব্য উপন্যাসের অংশবিশেষ বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

সর্ব্বশেষে বলিব যে, ডাঃ রায়ের দৃষ্টিকোণের বিশেষ পরিবর্তন না হইলে তাঁহার বিবৃতিতে আশ্বস্ত হওয়ার কোনও কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইব না।

দুর্নীতি দমন

ভারতীয় পার্লামেণ্টে আইনসচিব ডাঃ কাটজু ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের একটি ধারার মেয়াদ আরও বাড়াইবার জন্য আইন পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই আইন পাঁচ বৎসর বলবৎ আছে, উহার সাহায্যে কতকগুলি দণ্ড হইয়াছে, কিন্তু দুর্নীতির উচ্ছেদ ত বহু দূরের কথা, দুর্নীতি দমনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিও হয় নাই। মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এক শ্রেণীর অসাধু ধনী ব্যবসায়ীর স্বার্থে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন এইরূপ একটি ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোড়ওয়ালা তাঁহার রিপোর্টে গবর্ণমেণ্টকে সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাও করা হইতেছে না। বরং এইরূপ একটি ধারণা জন্মিতেছে যে, প্রভাবশালী মন্ত্রীদের অনুগৃহীত বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হাত দিতে গেলে সৎ কর্মচারীদেরই বিপদে পড়িতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সেল-ট্যাক্সের ঘটনাটি এ বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদে দাবি করা হইল যে, যাহারা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের কার্য্যের তদন্ত একটি ট্রাইবুনাল বসাইয়া করা হউক। প্রথমে একজন স্পেশাল জজ নিযুক্ত করিয়া যে এসিষ্টাণ্ট কমিশনার টাকা আদায় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে তথ্য ফাঁসের অভিযোগ আনা হইল। স্পেশাল জজ রায়ে বলিলেন যে, আইনানুসারে অভিযোগ যেরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবার কথা তাহা করা হয় নাই। তথাপি পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি রায় দিলেন যে, উক্ত অফিসারকে ডিসমিস করা উচিত নয়। ডিসমিস না করিবার কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, একই ট্যাক্স অফিসারকে অভিযোক্তা এবং বিচারক করিবার ফলে কিছু আতিশয্য ঘটিবেই, ইহা পদ্ধতির দোষ। তাহা ছাড়া এই অফিসার ট্যাক্স আদায়ের জন্য যেটুকু জোর করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য, কোন অসাধু মতলবে এরূপ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিলে সমগ্র সরকারী বিভাগের মনোবল নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও ফাইনান্স সেক্রেটারী এসিষ্টাণ্ট কমিশনারকে নোটিশ দেন যে, তাঁহাকে কেন পদচ্যুত করা হইবে না তিনি যেন তার কারণ প্রদর্শন করেন। ট্রাইবুনাল সে সকল ট্যাক্সের পরিমাণ গ্রাহ্য করেন নাই।

ইহার পর ট্রাইবুনাল বসে এবং ট্রাইবুনাল উক্ত কোম্পানীর উপর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসান। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ঐ ম্যানেজিং এজেণ্টের অধীনস্থ পেপার মিলকে ২৬ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন, কটন মিলকে ৪০ লক্ষ এবং মোটর কোম্পানীকে ২৫ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইতে চাহিয়াছিলেন। কেলোয়ারের উপর তাঁহারা ৪,৩৬,০০০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া দিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেণ্টরা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল ট্রাইবুনালেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, টাকার পরিমাণের প্রশ্নটাই কেবল মীমাংসা হইল না। সুতরাং মূলতঃ এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ঠিকই ধরিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহার পর পদচ্যুতির কারণ দর্শাইবার নোটিশ আসে কিরূপে? এসিষ্টাণ্ট কমিশনার হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্ট রায়ে ফাইনান্স সেক্রেটারী এবং সেল-ট্যাক্স কমিশনারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে, ফাইনান্স সেক্রেটারী কমিশনারকে চিঠি লিখিয়া এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে হয়রানির ও বিলম্বের অভিযোগ আনেন এবং অসাধুতার অভিযোগও করেন। ইহার

উপর হাইকোর্ট মন্তব্য করিতেছেন, "এই মারাত্মক অভিযোগের মূলে কোন ভিত্তি নাই। দরখাস্তকারী সেল-ট্যাক্স বিভাগের অতি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ তথ্য না থাকা সত্ত্বেও এরূপ গুরুতর অভিযোগ আনা অন্যায় হইয়াছে।"

এই রায়ের পর ফাইনান্স সেক্রেটারী এবং সেল-ট্যাক্স কমিশনার যদি স্বপদে বহাল থাকিতে পারেন তবে এসিষ্টান্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত রায় কি করিয়া পদচ্যুত হন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী এবং লোকসেবক কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রধান কারণ দুর্নীতি। এইভাবে সৎ কর্ম্মচারীরা অসাধুদের হাতে যদি লাঞ্ছিত হন এবং গবর্ণমেণ্ট শেষোক্তদের প্রশ্রয় দেন তবে দুর্নীতি কখনও দূর হইতে পারে না। ভারত-সরকারের ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত রায় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থায় পড়িয়া যদি কিছু ভুলও করিয়া থাকেন তবে তাহার জন্য তাঁহাকে এরূপে লাঞ্ছিত করা বাংলা-সরকারের পক্ষে অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য।

কাশ্মীর সমস্যা ও ডেভার্স পরিকল্পনা

গত ৩রা মাঘ প্যারিস হইতে সংবাদ পাঠান হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদে ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিতীয় দফা বিবরণ পেশ করিবেন। তৎসম্পর্কে তিনি বলেন, কাশ্মীর রাজ্য লইয়া এবং বিশেষতঃ কাশ্মীরকে অসামরিকীকরণের প্রশ্ন লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা একাধারে ব্যাপক ও মৌলিক। তিনি সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত নীতির উল্লেখ করেন:—(১) অসামরিকীকরণের সময় অন্তে উভয় পক্ষের সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম করিতে হইবে ; (২) ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী যুদ্ধ-বিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে উপরি-উক্ত সৈন্য হ্রাস করিতে হইবে।

গত ৯ই মাঘ নূতন দিল্লী হইতে সরকারী ভাবে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয় :

"এখানে অদ্য সরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গতকল্য প্যারিসে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অসামরিকীকরণের জন্য যে ডেভার্স পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারত-সরকার কিংবা ভারতের প্রতিনিধি শ্রীবি. এন. রাও ও তাঁহার সামরিক উপদেষ্টাদিগকে প্যারিসে আলোচনাকালে একেবারেই জানান হয় নাই। গত ১৩ই অগ্রহায়ণ ডাঃ গ্রাহাম যে পরিকল্পনাটি ইহাদের হস্তে দিয়াছিলেন তাহার সহিত ইহার কোনও রকম সাদৃশ্য নাই।

যুদ্ধবিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে শুধু সৈন্য অবস্থানের বিষয় নহে, অন্যান্য বিষয়েও 'ডেভার্স পরিকল্পনা'র গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। গিলগিট স্কাউট সংক্রান্ত বিধান প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বিষয়ও এই পরিকল্পনায় সংযোজিত হইয়াছে।"

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ব পরিকল্পনায় পাক্-অধিকৃত এলাকায় ৭,৬০০ সৈন্য (এই সংখ্যার মধ্যে নিয়মিত পাক্-সৈন্য ও অসামরিক কার্য্যে ব্যবহৃত সশস্ত্র সৈন্যকেও ধরা হইয়াছে) এবং ভারতীয় এলাকায় ২৮ হাজার সৈন্য অবস্থানের প্রস্তাব ছিল। নূতন পরিকল্পনায় পাকিস্থান-অধিকৃত এলাকায় প্রায় দশ হাজার সৈন্য ও ভারতীয় এলাকায় ১৪ হাজার সৈন্য রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসনোট

ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, 'ডেভার্স পরিকল্পনা' প্রকাশের পূর্ব্বে ভারত-সরকারকে কোন কথা জানানো হয় নাই। এরূপভাবে পরিকল্পনা প্রকাশে ভারত-সরকার বিস্মিত হইয়াছেন। গ্রাহামের দ্বিতীয় রিপোর্টের ষষ্ঠ পরিশিষ্ট হিসাবে 'ডেভার্স পরিকল্পনা' প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে পরিকল্পনাটির অংশবিশেষের বিবরণ প্রদত্ত হইল :

"(১) ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে চুক্তির পর ত্রিশ দিন চরম সীমা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(২ক) যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ত্ত যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তাহা দেখিবার জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে স্থানীয় সরকারসমূহকে সাহায্যের জন্য এবং সৈন্য-বাহিনী সমাবেশের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জীপ, হেলিকোপ্টার ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হইবে।

(খ) পশ্চিম দিক হইতে বিনা অনুমতিতে যাহাতে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য পাকিস্থানকে আজাদ কাশ্মীর এলাকায় পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবেশ বন্ধ রাখিতে হইবে। বাছাই-করা নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা এই কাজ করিতে হইবে।

(গ) তিন ব্যাটেলিয়াম ছাড়া সমস্ত নিয়মিত পাকিস্থানী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে।

(ঘ) আজাদ কাশ্মীর সশস্ত্র বাহিনীকে কমাইয়া চার ব্যাটেলিয়াম করিতে হইবে এবং ভারতের নিয়মিত সৈন্যদলের সংখ্যা হ্রাস করিয়া এক ডিভিসন করিতে হইবে।

(ঙ) নিম্নলিখিতভাবে আজাদ এলাকায় চার হাজার অসামরিক ব্যক্তিকে লইয়া একটি পুলিসবাহিনী গঠন করিতে হইবে :

(১) ভাঙিয়া দেওয়া আজাদ বাহিনীর পূর্ব্বতন

লোকজনের মধ্য হইতে ১,২০০ জনকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(২) কখনও আজাদ বাহিনীতে কাজ করে নাই, এমন ১,২০০ ব্যক্তিকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্থানী বা পাক্-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব সৈন্যকে ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) ভাঙিয়া দেওয়া আজাদ বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব লোকজনের মধ্য হইতে ৮০০ নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(৪) কখনই আজাদ বাহিনীতে যোগদান করে নাই, এরূপ ৮শত নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্থানীকে অথবা পাক্-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব সৈন্যকে উহাতে গ্রহণ করা হইবে না।"

এই "পরিকল্পনা" লইয়া নাকি বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? অসত্যভাষণ, সত্যের বিলোপ ও রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ। চাণক্য পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া ট্রুম্যান, চার্চ্চিল, ষ্ট্যালিন, নেহরু, মাও-সে তুঙের যুগ পর্য্যন্ত এই নীতি অটুট আছে। ডিক্সন যেমন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধির নিকট এক কথা আর পাকিস্থানকে আর এক রকম কথা বলিয়াছিলেন, সেইরূপ গ্রাহাম-ডেভার্ণ'ও দুই পক্ষকে দু'কথা বলিয়া একটু খেলিয়া লইতেছেন মাত্র।

কাশ্মীর সমস্যার আলোচনার মধ্যে নূতন ঘটনা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মঃ জ্যাকব মালিকের বক্তৃতা। তাহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। মার্কিন ও ব্রিটেনের নষ্টামির বিরুদ্ধে অসংলগ্ন বাক্য বর্ষণ এই বক্তৃতাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী ডিক্সন ও মার্কিনী গ্রাহাম এই দুই জনেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেহ যে তাহা পারিবেন সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কি ভাবে ও কোন্ সময়ে তাহা হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হয়ত তাহা কাশ্মীরের ভাগ্যবিধাতা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিয়া এই রাজ্যের নরনারীর শক্তি ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিতেছেন এবং আমাদের ভরসা এই যে, কাশ্মীরবাসী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

নেপালে আবার বিদ্রোহ

প্রতি ভারতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজ দেড় বৎসর হইতে নেপালে একটা না একটা গণ্ডগোল লাগিয়া আছে। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের 'রাণাতন্ত্রে'র অনধিকার অসহ্য বোধ করিয়া মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন শাহদেব ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজা চন্দ্র সমসেরজঙ্গ প্রধান মন্ত্রীরূপে মহারাজাধিরাজের সঙ্গে জনমতের শক্তির সমর্থন লক্ষ্য করিয়া একটা আপোষ করিয়া লইলেন। তার পর এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার গণমতের প্রতিনিধি নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিধান পরিষদ গঠিত হইল, দু'তিনটি দলের সমবায়ে মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনভার গ্রহণ করিলেন; রাজবংশ, রাণাবংশ, উদারনৈতিক দল ও বামপন্থীরা একত্র হইয়া শাসনকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু আরও উগ্রপন্থী দল গণ্ডগোল করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাঃ কে. আই. সিংহের পরিচয় আমরা পাই নাই। সংবাদপত্রে যাহা দেখিতে পাই, নেপালী সরকারের নানা ঘোষণায় যাহা পাঠ করি তাহাতে মনে হয় এই ভদ্রলোক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। বার বার জেল হইতে পলায়ন করার কৌশল আয়ত্ত করিবার শক্তি তাঁহার আছে। পুলিস বিভাগের ও কারাবিভাগের কর্ম্মচারীবর্গের সমর্থন না থাকিলে তিনি কখনও এরূপ ভেল্‌কিবাজী খেলিতে পারিতেন না। শত শত লোক তাঁহার দলভুক্ত। নেপালী সমাজের একাংশের হৃদয় জয় করিতে না পারিলে ইহা সম্ভব হইত না।

গত ১০ই মাঘ কাঠমুণ্ড নগরীতে "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করা হয়। ১৯৪২ সাল হইতে এই অবস্থার সঙ্গে বাঙালীর বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং ইহার সুবিধা-অসুবিধার বর্ণনা অনাবশ্যক। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে "সর্ব্বময়" ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ২৩শে মাঘের বিবরণীতে বলা হইয়াছে:

"বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে. আই. সিং পলায়নের চেষ্টা করিতে পারেন পূর্ব্ব হইতেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নেপাল-সরকার তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য আদেশ জারী করেন, কিন্তু রক্ষী দলের, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সেই আদেশ পালন করেন নাই।"

ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ কে. আই. সিং বর্ত্তমানে এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে রসুয়া গিরিবর্ত্ম দিয়া তিব্বতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রসুয়া হইতে কুড়ি মাইল দূরে তিব্বতের মধ্যে অবস্থিত কারেরং তিব্বতী কর্তৃপক্ষ নেপাল-সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ডাঃ কে. আই. সিং যদি তিব্বতে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে নেপাল-সরকারের হস্তে দেওয়া হইবে।

তার পর হইতে সব নীরব। আমরা এই বিদ্রোহের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই নীরব মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদজনিত—একথা অবিদিত।

"ভোট দাও নাই চিনি ও কাপড় পাইবে না"

"রঘুনাথপুর থানার যে সমস্ত গ্রামবাসী কংগ্রেসকে অর্থাৎ কংগ্রেস-প্রার্থিনী শ্রীযুক্তা বিজলীপ্রভা দত্তকে ভোট দেন নাই, তাঁহার স্বামী-দেবতা উচ্চকণ্ঠে উক্ত গ্রামবাসীদিগকে চিনি ও কাপড় পাইবে না বলিয়া হাঁকাইয়া দিতেছেন। চিনি ও কাপড় জনসাধারণের প্রয়োজনে কো-অপারেটিভ ষ্টোরে রহিয়াছে তাহা জনসাধারণের প্রাপ্য। তাহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। আমরা স্থানীয় সরকারের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি ও জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সমস্ত জিনিষ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিনা বাধায় পায়, তাহার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। রঘুনাথপুর থানায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবার নামে জনসাধারণের উপর জবরদস্তি, জুলুমবাজী এবং স্বেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে। জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যেক গ্রামবাসী তাহাদের প্রাপ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায়সঙ্গত মূল্যে যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা হউক।"

মানভূম রামচন্দ্রপুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত "সংগঠন" পত্রিকা উপরোক্ত অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা স্থানীয় একটি কর্ম্মচারীর খামখেয়ালি বলিয়া মনে করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। ২৪ পরগণার আলীপুর মহকুমার পোলিং কর্ম্মচারী আমাদের বলিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সকল লোকে অতি সতর্কতা ও সততার সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহা একটা ভরসার কথা। সরকারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ যদি এইভাবে আপন কর্ত্তব্যে অটুট থাকিতে পারে তবে দেশে নিরাশার বন্যা আটকানো সম্ভব। তাঁহার কথা সত্য হউক।

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ

সম্প্রতি নেতাজীর জয়ন্তী উৎসব ভারত ও বহির্ভারতের নানা স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়িতে ভারতীয় চা-বাগান সমিতি ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডক্টর রাধা-বিনোদ পাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন এবং ঠিক সময়েই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি আরও বলেন যে, নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ কেবলমাত্র স্বার্থান্বেষী দলের অপপ্রচার মাত্র।

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ডেপুটি চেয়ারম্যান পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী নেতাজীর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে বক্তিয়ারপুরে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এশিয়ার কোন স্থানে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আরও বলেন, নেতাজী ভারতে ফিরিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এই দুইটি বক্তৃতা সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, এক দিকে দুই জন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ অস্বীকার করিতেছেন অন্য দিকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার-সচিব আয়ার মহাশয় ততোধিক দৃঢ়তার সহিত কেন বলিতেছেন যে ১৯৪৪ সনে আগষ্ট মাসে বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় একখানি বই লিখিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আয়ার মহাশয় বর্ত্তমানে বোম্বাই-সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্ত্তা; তিনি জাপানে গিয়াছিলেন এবং নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছেন। এইরূপ দুইটি পরস্পরবিরোধী ঘোষণা দ্বারা কার কি স্বার্থোদ্ধার হইতেছে, তাহা আমরা বুঝি না। যদি নেতাজী জীবিত থাকেন তবে তিনি কেন এই বিভ্রান্তিজনক অবস্থা হইতে তাঁহার দেশবাসীকে উদ্ধার করিতেছেন না, তাহাও বুঝিতেছি না।

কম্যুনিষ্ট দলের জয়

বাঁকুড়ার "হিন্দু-বাণী" (সাপ্তাহিক) ২২শে মাঘ সংখ্যায় ঐ জেলার নানা রাজনৈতিক দলের শক্তিসামর্থ্যের আলোচনা করার পর বলিয়াছেন:

"সর্ব্বশেষ আসে কম্যুনিষ্ট দলের কথা। এই দলও তাহাদের একটি পকেট সংগঠন তৈরি করেছিল সংযুক্ত প্রগতিশীল দল নাম দিয়ে কতকগুলি বেনামী কম্যুনিষ্টের সহায়তায়। এই দলের একটি প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারেন নি। সবচেয়ে মজা লাগে এই দলের প্রচার-কৌশলে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও নিজেদের কর্ম্মী ও স্বল্পসংখ্যক ভোটারদের মনোবল বজায় রাখার জন্য জয়লাভ সুনিশ্চিত বলে প্রচার করে এসেছেন। বাগ্না দিতে এই দল কংগ্রেসকেও হার মানায়। এদের গত আট-দশ বৎসরের কার্য্যকলাপ লোকে ভুলে নি। '৪১-'৪২ সালে এই দল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" ঘোষণা করে ইংরেজ-আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল (এরাই আবার আজকাল অন্য দলকে আমেরিকার দালাল বলে গালি পাড়েন!), ইঙ্গ-আমেরিকার 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস'রূপে সেদিন এই দল নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে জাপানের দালাল বলে চীৎকার করেছিল এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিয়েছিল। মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবী পাকিস্থান প্রস্তাবকে সবচেয়ে আগে সমর্থন করেছিল এই কম্যুনিষ্টরা—তাও আবার মুসলমানদের 'জাতীয় দাবি' বলে! রাজা-গোপাল-ফরমুলার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল কম্যুনিষ্টরা।

দিনের পর দিন তারা গান্ধীজীকে বিনায় দরজায় ধর্না দেবার জন্য চীৎকার করেছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির পরবর্তী ইতিহাস আরও কলঙ্কময়। যেদিন পাকিস্থান-দাবিতে মুসলীম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে কলিকাতার রাজপথে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল, সেই ১৬ই আগষ্টে মুসলীম লীগের শোভা-যাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লীগ ও কম্যুনিষ্ট পতাকার গাঁট-ছড়া বেঁধে অংশ গ্রহণ করেছিল এই কম্যুনিষ্ট পার্টি। তার পর নরহত্যা ও লুণ্ঠনে কলঙ্কিত সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হলে কম্যুনিষ্ট সদস্যেরা নিরপেক্ষ থেকে পরোক্ষে লীগ-মন্ত্রিসভা তথা হত্যা-কাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন।"

কম্যুনিজমের প্রতিরোধ—কম্যুনিজমের প্রসার

গত ২১শে পৌষ ভারতের সংবাদপত্রে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের জগদ্ব্যাপী অশান্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কোন মন্তব্য করিয়া আমরা এই সংবাদের উপর রং ফলাইতে চাই না :

নিউইয়র্ক, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোল্‌স্ গতকাল বিমানযোগে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পৌঁছান এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও রাজদপ্তরের সহিত আলোচনার জন্য তখনই ওয়াশিংটনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মিঃ বোল্‌স্ বলেন যে, তিনি আগামী সপ্তাহে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভারতে কম্যুনিজম্ প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বোল্‌স্ তিনটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন :—(১) যুক্ত-রাষ্ট্র এবং তাহার আদর্শ সম্পর্কে ভারতকে আরও ভালভাবে ওয়াকিবহাল করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য তাহার অমূল্য সম্পদ। (২) ভারতকে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য দান একান্ত প্রয়োজন। চীনে আমেরিকা যে পরিমাণ সাহায্য দিয়াছে ভারতকে সেই পরিমাণ সাহায্য দিলে সার্থকতা লাভের খুব সম্ভাবনা আছে। (৩) ভারতবাসীর সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে দৃঢ়তার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়া এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে ভারতবাসীরই। মিঃ বোল্‌স্ বলেন যে, ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে মন্থরগতিতে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না।

বোম্বাই, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতস্থ রুশরাষ্ট্রদূত মিঃ এন. ভি. নোভিকভ আজ এখানে বলেন যে, তাঁহার দেশ ভারতকে যে-কোনও শিল্প-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে এবং টাকায় অথবা আর অন্য যে-কোনও সুলভ মুদ্রায় তাহার মূল্য গ্রহণ করিতে রাজী আছে।

তিনি বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে। আপনারা যাহা কিছুই কিনিতে চাহিবেন, তাহাই আমাদের নিকট পাইবেন, আর আমরাও আমাদের দরকারী জিনিসপত্র আপনাদের নিকট হইতে কিনিতে রাজী আছি।"

তাঁহার দেশ শিল্পোন্নয়নে দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে এবং এই সম্পর্কে অন্য যে-কোনও দেশকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর কোন দেশই কারিগরী বিদ্যায় তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে আমরা পুনরায় গড়িয়া তুলিতেছি, অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, আমরা যুদ্ধ চাহি না। আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের দরকার। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা নাই।

সোভিয়েট সরকার জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন, রুশ-রাষ্ট্রদূত তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন, "রাশিয়ার সম্মুখে জনশক্তি হ্রাসের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে। রাশিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুবিধ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করিতেছে এবং শীঘ্রই যে শত শত "এক্সক্যাভেটর" এবং তদনুরূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইবে যাহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাজ নিষ্পন্ন হইবে। গত ২৪ বৎসর যাবৎ রাশিয়াতে কোনও বেকার-সমস্যা নাই। সেখানে বেকার-সমস্যার সমাধান ১৯২৭ সালেই হইয়া গিয়াছে, তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

একটি প্রশ্নের উত্তরে রুশ-রাষ্ট্রদূত বলেন, রাশিয়াতে ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই, একথা বলা ভুল। প্রথমে একজন শ্রমিক, পরে একজন ইঞ্জিনীয়ার এবং এখন একজন কূটনীতিবিদ রূপে তাঁহার সুদীর্ঘ চাকুরী কালে তাঁহার ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই আছে। এইরূপ ধারণা যে কেন পোষণ করা হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না।

মিঃ নোভিকভ বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দিত এবং তিনি আশা করেন যে, এই সম্পর্ক আরও আন্তরিক হইবে।

"রয়েল রিপাব্লিক"

এই শিরোনামায় "যুগান্তর" (২৫শে মাঘ) দেড় কলম ব্যাপী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, আমাদের "আজাদী ঝুঁটা হায়"। দুই একজন ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার সদ্যপ্রাপ্ত আবিষ্কারকে নাড়াচাড়া করিতেছেন। অথচ আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের সহযোগী ১৫ই আগষ্টের উৎসব উপলক্ষে বিপুলকায় "বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশিত করিতেছেন।

এর মধ্যে কোন্‌টা সত্য দেশবাসী তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

"যুগান্তরে"র এই প্রবন্ধের ভাষা ইংরেজী ভাষার অনুবাদ। নিয়ে তার একটু নমুনা দিলাম। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকেই বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

"...জাতীয় কংগ্রেসের সেই পবিত্র ও মহান্ প্রতিশ্রুতিকে অনায়াসে অগ্রাহ্য এবং পদদলিত করিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ণধারগণ মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের রাজকীয় বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটা জাতির আত্মমর্য্যাদাবোধ কতখানি অধঃপাতে নামিয়া গেলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাঝে রাজকীয় বন্দনার এই কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণা সম্ভব হইতে পারে, তাহা ভাবিবার মত। এই রয়েল রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রী রূপে আমরা যাঁহাকে পাইয়াছি, তিনি মাঝে মাঝে মহান্ গণতন্ত্রের আদর্শ, এমন কি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বুলি পর্য্যন্ত আওড়াইয়া থাকেন। আসলে ইঁহারা পরাধীন ভারতবর্ষের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নীল রক্তের উপাসক এবং ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী অভিজাত শ্রেণী ব্রিটিশরাজ ও রাজত্বের প্রতি দাস মনোভাবের বাহক। অন্যথা হীন আত্ম অবমাননার এই গ্লানিকর দৃশ্য দেখিবার আগে কংগ্রেসের কর্ণধার এবং তাঁহার ভাবকবৃন্দের উচিত ছিল আরব সমুদ্রের জলে আত্মবিসর্জন করা।..."

"যুগান্তর" ও "অমৃত বাজার পত্রিকা" একই সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ। কিন্তু দুইটির পরিচালনায় এরূপ পার্থক্য দেখা যায় কেন?

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নূতন অভিযান

"বিহার সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন—বিহার সরকারী ভাষা আইন (১৯৫০ সাল) বিহারে অবিলম্বে চালু হইবে। অর্থাৎ, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা বিহারে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রে এখন হইতেই ব্যবহৃত হইবে। তদনুসারে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করাইবার দলিলপত্র দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে লেখাইতে হইবে। থানায় থানায় অভিযোগের প্রথম এত্তালা (ডাইরী) হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে। ইন্‌স্পেক্টার, সাব-ইন্‌স্পেক্টররা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পরীক্ষার মন্তব্য, তাহাদের ও এই সকল স্কুলের হেডমাষ্টারদের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান, এসেম্‌ব্লী ও কাউন্সিলে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কীয় পত্রালাপ ও বিহার গেজেটের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম ভাগ এখন হইতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় হইবে। বিচারের আদালতসমূহে হিন্দী ভাষা চলিবে, অর্থাৎ মোকদ্দমার আবেদনপত্র, জবাব দরখাস্ত ইত্যাদি হিন্দী ভাষায় লিখিতে হইবে। সমন, নোটিশ প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে ও জারী হইবে। বাদী বিবাদী আসামীর এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে; এবং হয়ত হিন্দী ভাষাতে দিতে হইবে। উকীল মোক্তারদিগকেও হয়ত হিন্দী ভাষাতেই সওয়াল-জবাব করিতে হইবে। এই সময়ে আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এইরূপ একটা অদ্ভুত বিপর্য্যয়ের ব্যবস্থা কেন করা হইল, তাহা হয়ত অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু গভীরভাবে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই নির্ব্বাচনের কাজ হইতে জনগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করা হইয়াছে। যে সকল হিন্দীভাষী জনগণ এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা সরকারের দৌলতে তাঁহাদের হিন্দী গোঁড়ামির অনুকূল আবহাওয়া পাইয়াছেন ভাবিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন, এবং যে সকল বঙ্গভাষাভাষী এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষার উপর এই নূতন আক্রমণের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ ও শক্তি-সামর্থ্য আকৃষ্ট হইলে নির্ব্বাচনের কাজে তাঁহাদের শৈথিল্য ঘটিতে পারে—এই অভিপ্রায় ইহার পশ্চাতে থাকা খুবই সম্ভব। তাহা ছাড়া ইহাতে বাংলাভাষীকে বিহার হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টাও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে এইরূপ একটা অনর্থের সৃষ্টি করায় শত্রু-মিত্র সকলেই সরকারের ও কংগ্রেসের প্রতি আরও বিরূপ হইবে।"

উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষার এই বিভীষিকা গান্ধীজী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দূর করিতে পারেন নাই। ফলে মহাভারতের সৃষ্টি সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্থান সৃষ্টি এই পাপের এক মূর্ত্তি; হিন্দী ভাষা বা অন্য কোন ভাষার অহমিকা তার অন্য রূপ। মূলতঃ দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

বিহার গবর্ন্মেণ্টের অনুদারতা

টাটা কোম্পানী উদার শিল্পপতিগণের অন্যতম, কিন্তু বিহার গবর্ণমেণ্টের চাপে পড়িয়া তাঁহাদেরও কতদূর অনুদার হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে 'যুগান্তর' (দৈনিক) পত্রিকায় ২রা পৌষ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অজানিত না হইলেও, নূতন করিয়া বিহারী অ-বিহারী সমস্যাটার গুরুত্ব আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে:

"গত কয়েক বৎসরে টাটা কোম্পানীর দৌলতে জামসেদপুর শহরের অতি দ্রুত বিস্তৃতি ও উন্নতি ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় শহরের জনসংখ্যা যেমন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, জামসেদপুরেও তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক শহরের দ্রুত বিস্তৃতি সত্ত্বেও শহরবাসীদের বসবাসের

সমস্যা মিটে নাই। ফলে জমির সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রকাশ যে, এই অবস্থায় টাটা কোম্পানী তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জমির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থির করিয়াছেন যে, একমাত্র বিহারীদের মধ্যেই তাঁহারা জমি বণ্টন করিবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে জামসেদপুরবাসী অ-বিহারী নাগরিকদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। জামসেদপুরের অন্ধ্র-সমিতি, উৎকল-সমিতি এবং পঞ্জাবী ও বাঙালী সম্প্রদায় সম্প্রতি কতকগুলি সভা-সমিতি করিয়া টাটা কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা বিহারী ও অ-বিহারীদের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কেবল উগ্র প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পাইবে না, অধিকন্তু ইহা জামসেদপুরবাসী অ-বিহারীদের মৌলিক অধিকারকে হরণ করিবে। আমরা জামসেদপুরবাসীদের এই প্রতিবাদকে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ জামসেদপুর কোন "প্রাদেশিক" শহর নহে, ইহা সর্ব্ব-ভারতীয় জনগণের শহর। টাটা কোম্পানীর উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে সর্ব্বভারতীয় শ্রমিক, কর্ম্মচারী, কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারদের দান রহিয়াছে, এই অবস্থায় টাটা কোম্পানী তাঁহাদের জমিগুলি কেবলমাত্র বিহারীদের জন্ত সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। এই দৃষ্টান্ত হইতে কলিকাতা, বোম্বাই কিংবা অন্ত যে-কোন শহরের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ভিন্ন প্রদেশবাসীর নিকট জমি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? ইহা কি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্দা ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিরই প্রতিধ্বনি নহে এবং যে নীতির বিরুদ্ধে আজ দীর্ঘকাল যাবৎ আন্তর্জাতিক আন্দোলন চলিতেছে? টাটা কোম্পানীর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নীতির একান্ত বিরোধী। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানী এই পর্য্যন্ত বহু জনহিতকর এবং সামাজিক কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা জমি সংক্রান্ত এই অন্তায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবেন।"

এই মন্তব্যের উপর আমরা আর কোন মন্তব্য করিতে চাই না। একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিহার রাজ্যের অধিবাসী প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মৌলিক বাঙালীকে তাহা প্রমাণ করিতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে "ডোমিসাইল্‌ড" সার্টিফিকেট-রূপী বেড়া ডিঙাইবার বেগ পাইতে হইতেছে। গান্ধীজী পর্য্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাদ্য ঘাট্‌তি কি প্রকৃত?

ভারত-সরকারের "ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এগ্রিকালচারাল কমিশনার" শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া সময়োপযোগী কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আজ সাত-আট বৎসর হইতে—১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ হইতে—দেশের চিন্তাশীল নর-নারী এই সমস্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছেন; নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রী কে. সিধ্বা ১৯৪৭ সাল হইতে বলিতেছেন যে, ভারতরাষ্ট্রে খাদ্যে ঘাট্‌তি নয়। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বাণিজ্য-সম্পাদক সংখ্যাতথ্যের নানা অঙ্ক কষিয়া এই কথার সমর্থন করিয়াছিলেন ১৯৪৯ সালের মে মাসে। আমরা সেই সময় তাহা সমর্থন করিয়াছিলাম। ইন্দুবাবুর ৩৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা সেই মত পরিবর্ত্তনের যুক্তি দেখাইতেছে।

তবুও বলিতেছি যে, ১ কোটি টন (২৭ কোটি মণ) খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তি দেশবাসীর বুকের উপর যে অটল হইয়া বসিয়া আছে তাহার কারণ কি? সংখ্যাতথ্যের খেলা তাহা প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিতে পারিতেছে না এবং প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিলেও দেশের নর-নারীর সান্ত্বনা কোথায়!

সিধ্বা মহাশয় গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সুযোগে তাঁহার যুক্তির সপক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিলে দেশের মহৎ উপকারসাধন করিবেন।

ইন্দুবাবু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবিভাগীয় মতের সমর্থন করিতেছেন। উডহেড সাহেবের দুর্ভিক্ষ কমিশনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত দৃঢ় করিতেছেন, এবং খাদ্য-বিভাগীয় নানা তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনের মন্তব্যাদি শ্রীকালীচরণ ঘোষ কৃত 'বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ' পুস্তকে সংখ্যাতথ্যের সাহায্যে আলোচিত হইয়াছিল। তখনকার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার যুক্তি অ-প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আজও এই তর্ক-যুদ্ধে কোন পক্ষ দাবি করিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করিয়া তর্কের অবসান হউক।

ইন্দুবাবু তাঁহার পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় "সমতাপূর্ণ প্রণালী" (integrated plan) কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কথা ও কাজের মধ্যে দূরত্ব বিস্তর। তাহা কে কমাইবেন ইহাই গোড়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের চাষ

নবদ্বীপ হইতে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতির প্রচার-সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষের নানা অসুবিধা সম্বন্ধে যে-সব কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তৎপ্রতি মৎস্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ ভক্তিভূষণ যাহা বলিয়াছেন তাহা অভিজ্ঞজন মাত্রেই সমর্থন করিবেন। তিনি সমুদ্রে মৎস্য-শিকার সম্বন্ধে বলেন:

বাংলার নদনদীতে যে জেলে ব্যবসায় চালায়, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়াছেন। "প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইলে আমাদিগকে কিভাবে ও কি পরিমাণে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাই মূল কথা। মৎস্যচাষে যে মৎস্যচাষী লাভবান হইবেন এবং দেশেরও খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু মৎস্যচাষের অসুবিধা যদি থাকিয়াই যায়, আর আমরা মৎস্যচাষ কর বলিতেই থাকি—তাহাতে ক্ষতি বই বৃদ্ধি মোটেই হইবে না, প্রাচুর্য্য লাভ ত দূরের কথা। আমাদের অভাবই ভয়ঙ্কর। তাই এবিষয়ের মূল সমস্যাগুলির উপর কিছু আলোকপাত করিতেছি মাত্র। সমস্যাগুলি এই—(ক) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পুকুর, বাঁধ, জলনীতে ও বিলে মৎস্যের জীবনধারণোপযোগী জল থাকে না। (খ) যে সমস্ত দীঘিপুকুর পূর্ব্বপুরুষের খনিত, তাহার তলদেশে বহু জলজ তৃণাদি জন্মিয়াছে—উহাতে মৎস্য চাষ অসম্ভব। (গ) যে-সব বিলে প্রচুর জল থাকে, এমন কি চৈত্র বৈশাখ মাসেও দুই হাত জল থাকে, তাহাতে কচুরীপানা জন্মে ও ঐ পানার গাছ পাতা শিকড় জলের তলে পচিয়া (ড্যাবড) মৎস্য চাষের অসুবিধা জন্মায়। (ঘ) প্রচুর গভীর জলবিশিষ্ট জলাতে বহু মৎস্যাশী মৎস্যও বর্ত্তমান আছে। (ঙ) যে কতিপয় জলা (সংখ্যায় নগণ্য) সর্ব্ব পরিবেশে মৎস্যচাষের যোগ্য তাহাদের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত মৎস্য-ডিম বা পোনা সংগ্রহের ব্যবস্থার প্রাচুর্য্য নাই। (চ) মৎস্যবৃদ্ধির (মৎস্য-পোষণ) দিকে ঝোঁক দিলেই ডিম ও পোনা সংগ্রহকে প্রাথমিক অধিকার দিতে হইবে। মৎস্য বিভাগের এ বিষয়ে অগ্রগতি অনেক কারণেই আজও বন্ধ। (ছ) বহু পুকুর, দীঘি প্রভৃতি মৎস্যচাষোপযোগী জলার উপর বহু মালিকানা স্বত্ব মৎস্যচাষের বিঘ্নগুলির মধ্যে অন্যতম। (জ) যে জলায় যে প্রকারের মৎস্যের বৃদ্ধির ও পুষ্টির সম্ভাবনা অধিক, সে জলায় সেই প্রকার মৎস্যচাষে অজ্ঞতা। (ঝ) জলায় মৎস্যখাদ্য পরিমাণের অনুসন্ধিৎসার অভাব ও মৎস্যজীবিগণকে অনেক ক্ষেত্রে পরিহার করার উদ্যম। উল্লিখিত কারণগুলির আশু সমাধান না হইলে মৎস্যচাষে পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণের অসম্ভব।"

পাকিস্থানে হিন্দু

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকিস্থান পার্লামেন্টে কংগ্রেসী দলের নেতা। সম্প্রতি তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সঙ্ঘের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কলম্বো যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান সরকারের দুইটি কার্য্যের উপর সেখানকার হিন্দুদের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ, 'টু-নেশন থিওরী' বা দুই-জাতি নীতি পরিত্যাগ, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন। তিনি বলেন, পাকিস্থানে বর্ত্তমানে যে সকল হিন্দু এখনও বাস করিতেছে, তাহারা স্থায়ী ভাবেই সেখানে বসবাসের ইচ্ছা রাখে। সুতরাং এই দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেই সেখানে তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারে, এই অধিকার অর্জ্জনের জন্যই হিন্দু জনসাধারণের সংগ্রাম করিতে হইবে।

'আজাদ' এই সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় লিখিয়াছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় তাহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইল :

"পাকিস্থান পার্লামেন্টের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সঙ্ঘের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলম্বো যাত্রার পথে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দল পাকিস্থানে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তন এবং টু-নেশন থিয়োরি বা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রত্যাহার চায়; তবেই পাকিস্থানের সংখ্যালঘুগণ নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও সেখানে আছে এবং যেহেতু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেখানে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিবে, সেই কারণে নিজেদের অধিকার অর্জ্জনের জন্য তাহাদের সংগ্রাম করা উচিত।

"মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের বোম্বাই-বিবৃতি তাঁহার দলের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকেই সচেতন করিবে। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যে কোন দলের প্রকৃত রাষ্ট্রানুগত নাগরিকের নিজ অধিকার অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিবার অধিকার কেহই অস্বীকার করিবেন না—অন্ততঃ এছলামের অনুসারীরা অস্বীকার করে না। যদি পাকিস্থানী সংখ্যালঘুদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অর্জ্জনের জন্য তাঁহারা সংগ্রাম করুন, তাহাতে পাকিস্থানের সংখ্যাগুরুদের কোন আপত্তি নাই; বরং যদি সত্যই কোন অধিকার সংখ্যাগুরুরা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে মুছলমানেরা উহা সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে পাকিস্থানের মৌলিক নীতি-বিরোধী অধিকারের দাবী করা হয় বা পাকিস্থানের ভিত্তিধ্বংসমূলক কোন কর্ম্মপন্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহার আপোষহীন বিরোধিতা করাই পাকিস্থানের প্রতিটি রাষ্ট্রানুগত নাগরিকের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে।

"পাকিস্থানে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথা কিংবা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্থানের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা উহার প্রত্যাহার কামনা বা দাবী করা বা তজ্জন্য কোন ব্যক্তি বা দল পাকিস্থানে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে চাহিলে কোন পাকিস্থানী নাগরিক উহা সমর্থন করিবে না, করিতে পারে না। সোজা কথায়, এই নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্থান অর্জ্জিত হইয়াছে। দায়ে পড়িয়া বা চাপে পড়িয়া

যা যে কারণেই হউক, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেসকে উক্ত নীতির ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভাগ ও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পাকিস্থানে দ্বিজাতিতত্ত্ব-বিরোধী প্রচারণাকে রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করার সামিল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পাকিস্থান পার্লামেণ্টে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আদর্শ প্রস্তাব আলোচনার বা অন্ত কোন সময় মিঃ চট্টোপাধ্যায় টু-নেশন থিয়োরির বিরুদ্ধে কোন উক্তি করেন নাই। আজ বোম্বাইতে হঠাৎ এরূপ মন্তব্য করিবার কারণ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না।

"দ্বিজাতিতত্ত্বের অবসান হইলেই তবে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুগণ নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কেবল এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জাগিয়া ঘুমাইলে কেহই তাহারও ঘুম ভাঙাইতে পারিবে না, ইচ্ছাকৃত আতঙ্ক ও আশঙ্কা কোন কালে কেহ দূর করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র একবার পূর্ব্ব পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে—তাও আবার দীর্ঘকালব্যাপী বহু ভারতীয় দাঙ্গার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। তার পরও গত এক বৎসরের মধ্যে সত্তর বারের উপর ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে। পাকিস্থানে পঞ্চাশ সালের সাময়িক উত্তেজনা ও হাঙ্গামার জন্ত প্রতিটি পাকিস্থানী লজ্জা অনুভব করেন; তাঁহারা নিজেদের ইতিহাস অমলিন রাখিবার জন্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু যথেষ্ট যে, দ্বিজাতিতত্ত্ববাদী পাকিস্থানী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, ভারতের তথাকথিত সেকুলারী সংখ্যাগুরুরা তাহাতে অক্ষম হইয়াছেন।

"পাকিস্থানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও এখানে বাস করিতেছেন। আমরা জানি, যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশ স্থায়ীভাবেই আছেন; দেশত্যাগের কল্পনা তাঁহারা করেন নাই। আবার এ কথাও জানি যে, বহু সংখ্যালঘু পরিবার-পরিজন ভারতে রাখিয়া এখানে জীবিকা অর্জ্জনের জন্তই রহিয়াছেন। এঁরা পাকিস্থানী নহেন, যদিও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেদের পাকিস্থানী বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টাও এঁরা কম করেন না। এ কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা নাই বলিয়া আমরা মনে করি না। তবুও পাকিস্থানীরা ইহাতে আপত্তি করে না বা তাঁহাদের কোন প্রকার অসুবিধা ঘটাইবার মত কাজও করে না; বরং তাঁহাদের অতিথি বলিয়াই গণ্য করে।

"পুনরুক্তি সত্ত্বেও আবার আমরা বলিতেছি যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকার করার অর্থই পাকিস্থানের মূলে কুঠারাঘাত করা। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর এ সম্পর্কে আর কোন বিতর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে না। যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রশ্নের সহিত ইহাকে জড়িত করিয়া মিঃ চট্টোপাধ্যায় অহেতুক আতঙ্কজনক সমস্যার অবতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে কিনা, তাহা কেবল মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের কংগ্রেসী বর্ণহিন্দুদলের মতের বা দাবির উপর নির্ভর করে না—দেশের অন্তান্ত শ্রেণীর, এমন কি সংখ্যাগুরুদেরও এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। অধিকাংশের মতের অস্বীকৃতির অর্থ গণতন্ত্র নহে—ফ্যাসিজম; মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না।

"দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশ্নটা না তুলিলেই মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। মোছলেম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বকে বাস্তব সত্য বলিয়া গণ্য করে। আজ যাঁহারা মোছলেম লীগের বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত ইহা অস্বীকার করেন নাই। দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্থানের বনিয়াদ—এ সম্পর্কে বিতর্ক অন্ততঃ পাকিস্থানে নিষ্প্রয়োজন, অকারণ, অহেতুক, উপরন্ত রাষ্ট্রানুকূল নহে। দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকলের পক্ষে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও পাশাপাশি বাস করা ও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, ইহাই পাকিস্থানের নীতি এবং শান্তি সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। প্রতিটি পাকিস্থানীকে যে-কোন জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মাবলম্বী হউক না, তাকে ইহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী সৃজনের উপরই পাকিস্থানের রাষ্ট্রানুগত্যের প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে।"

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা কোন্ নেশন ?

পাকিস্থান বলিতেছে তাহারা দুই-জাতি—'টু-নেশন থিওরী'র উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাতে মুসলমানেরা নেশন বা জাতি বা নাগরিক, হিন্দুরা নহে। আইন-পরিষদে ও শাসন-ব্যবস্থায় পাকিস্থান হিন্দুদিগকে মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার দেয় নাই। 'টু-নেশন থিওরী' অনুসারে হিন্দুরা সেখানে নেশন নহে বলিয়া তাহা দিতেও পারে না। তবে হিন্দুরা কোন্ নেশন, তাহাদের রাষ্ট্র কোন্‌টি ?

কলিকাতায় জবাহরলাল নেহ্‌রু বলিয়াছেন পূর্ব্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দুর সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কথা বলিবার অধিকার নাই, তাহাদের অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের সহিত তুলনীয়। পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন হইলে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, ইউ. এন. ও. তাহা করিবে। কিন্তু ইউ. এন. ও.-তে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ছাড়া কেহ কথা বলিতে পারে না এবং সে গবর্ণমেণ্ট সকলের স্বীকৃত গবর্ণমেণ্ট হওয়া চাই। পাকিস্থান যদি তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার না করে, ভারতবর্ষও যদি তাহাদের ন্যাশনাল বা নাগরিক

বলিয়া স্বীকার না করে তবে ইউ. এন. ও-তে তাহাদের কথা তুলিবে কে ?

সুতরাং পাকিস্থানের হিন্দুদের সম্বন্ধে মূল প্রশ্নই অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে এবং এইজন্যই পাকিস্থানের হিন্দু সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইতে পারিতেছে না। পাকিস্থানের হিন্দুরা কোন্ রাষ্ট্রের ন্যাশনাল—তাহাদের দেশ কোথায়, তাহাদের নাগরিক অধিকার কোন্ রাষ্ট্রের উপর রহিয়াছে—ইহাই মৌলিক প্রশ্ন এবং ইহার মীমাংসা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অতি বিপদাপন্ন লোকও সাময়িকভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আশ্রিত থাকাকালেও তার একটা দেশ থাকে, কোন-না-কোন দেশে তার নাগরিক অধিকার থাকে। পাকিস্থানের হিন্দুরা পাকিস্থানের আশ্রিত একথা মানিয়া লইলে তখন প্রশ্ন উঠে তাহারা তবে কোন্ নেশন, তাহাদের রাষ্ট্র কোন্‌টি ?

হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, এই 'টু-নেশন থিওরী' মতে পাকিস্থান যদি হিন্দুদের তার ন্যাশনাল বলিয়া না মানে, তবে তারা ভারতবর্ষের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে কিনা ? পাকিস্থান বলিতেছে যে, তাহারা মুসলমানের জন্য "হোমল্যাণ্ড" চাহিয়াছিল। হিন্দুদের তাহারা চায় নাই। নেহরু বলিতেছেন, ভারতবর্ষ আকস্মিক ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছে, টু-নেশন থিওরী তিনি মানেন না। জিন্নার টু-নেশন থিওরী অনুসারে ইংরেজ ভারতবর্ষ ভাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে তবে কোন্‌টি সত্য ? যাঁহারা ভারত বিভাগ দাবি করিয়াছেন এবং যাঁহারা যাওয়ার আগে সেই দাবি পূরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যে ভিত্তিতে উহা করিয়াছেন তাহা মানিতে হইবে, অথবা মসনদের লোভে যিনি খণ্ডিত ভারত মানিয়া লইয়াছেন তাঁহার কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে ? টু-নেশন থিওরী কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া মুখে অস্বীকার করিলেই কি উহা বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইবে ?

দিল্লী-চুক্তির সময় কথাটি উঠিয়াছিল। পাকিস্থান তার রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করে নাই, কেবলমাত্র উহা ইসলামিক রাষ্ট্র হইবে—এই মুখবন্ধটি পাস করাইয়াছে। দিল্লী চুক্তির সময় লিয়াকৎ আলি উহা এড়াইয়া যান। সেকুলার ও থিওক্রেটিক রাষ্ট্রে কিরূপে চুক্তি হইতে পারে এই মূলগত প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ঝামেলা এড়াইবার জন্য নেহরু সমস্যাটিকে চাপাচাপা দিয়াছিলেন, কিন্তু ঝামেলা তাঁহাকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সেকুলার ও থিওক্রেটিক রাষ্ট্রে, অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতার যে কিরূপ মিলন ও চুক্তি হয় নেহরু তাহার পরীক্ষা যতই করিয়া চলিয়াছেন ততই ব্যর্থ হইতেছেন।

পাকিস্থানে যৌথ নির্ব্বাচন দাবী

যৌথ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পাকিস্থানী মুখপত্র বলিতেছে, কেবল বর্ণহিন্দুদের দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে না। অন্যান্য শ্রেণী অর্থাৎ অবর্ণ হিন্দুদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণেরও এ বিষয়ে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত মতামতের দ্বারা বিষয়টির মীমাংসা হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগের পর পাকিস্থান মন্ত্রী-সভায় একজন হিন্দু মন্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে ধারিক বারুরীকে উক্ত পদে বহাল করা হয়। আগামী গণভোটের পূর্ব্বাভাসেই বর্ণহিন্দুগণ পাকিস্থানে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যৌথ নির্ব্বাচন দাবি করিয়াছে। পাকিস্থান সরকার দৃশ্যতঃ এই দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন যে, যদি সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাবি করে তবে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ধারিক বারুরীর প্ররোচনায় এক শ্রেণীর তপশীলী স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবি তুলিয়াছে। তাহারা সংখ্যায় যত সামান্যই হউক না কেন, তাহাদের যুক্তি যতই অসার হউক না কেন, তাহাদের মতকে পাকিস্থান সরকার প্রাধান্য দিবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ইংরেজের ভেদনীতিকে পাকিস্থান অসাধারণ দক্ষতার সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করিতেছে। ধারিক বারুরীকে মুখপাত্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন জিন্নাকে সৃষ্টি করিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ভারতকে ছিন্নভিন্ন করিয়া শক্তিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পাকিস্থান সরকারও বিপন্ন নিরাশ্রিত সহায়-সম্বলহীন হিন্দু জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে এবং সেদিন যেমন জিন্নার অভাব হয় নাই আজও সে শ্রেণীর লোকের অভাব হইবে না। তাহারা পাকিস্থানে হিন্দু-সংহতিকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সম্মুখে এক ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত করিয়াছে—ইহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধন মান সম্মান সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

বাঙালী

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে—মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরের "গণরাজ" পত্রিকায় উদ্ধৃত কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব তাহা সময়োপযোগী। ছদ্মনামে লেখক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী একটা কৃপার পাত্র নয়; তাঁহারা কেবল "চ্যাঁচামি" খায় না; গঠন করে নূতন জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টাও করে।

কাঙাল বাঙালী! করিও না গোল, মুখটি বুজিয়া থাক,
খণ্ডিত তব হোয়েছে অঙ্গ, তাহাতে কি আসে যায় ?
হিয়ার তোমার যে ব্যথা জমেছে হিয়ায় বাধারে রাখ,

প্রাদেশিকতার গন্ধটি যেন না লাগে তাহারো গা'র।
বিহারে আসামে ঠ্যাঙানী খেয়েও কোরো না অশ্রুপাত,
উৎকল যদি করে উৎপাত, মনে করিও না কিছু।
নেতা সেজে কর নিজেদের মাঝে নিয়ত নিন্দাবাদ,
নিজেদের দোষে সকলের কাছে মাথা ক'রে থাক নীচু।
প্রদেশে প্রদেশে বাইছে মিশিয়া দেশীয় রাজ্য যত
যোগ্য সময় হয়নি বলিয়া কথা ত উঠে না কভু।
ত্রিপুরা কিম্বা কুচবিহারের বেলায় প্রশ্ন শত
স্মরিয়া স্মরিয়া কাঁদিয়া আকুল বড় বড় যত প্রভু।
তোমাদের লাগি ভাবিছেন তাঁরা, তোমরা কোরো না কথা।
ব্যস্ত করুক তোমাদের ঘিরি বাস্তহারার দল,
আসামে তবুও বাঁধিও না বাসা, দিও না তাদের ব্যথা;
বাঙালী যেখানে বাঞ্ছিত নয়, বেছে থাক্ জঙ্গল।
ক্যাল ক্যাল ক'রে দেখ এই সব, মারামারি কর ঘরে,
দলবল নিয়ে যাও বারে বারে দিল্লীর দরজায়,
সাম্যবাদীর পাশব-খড়্গ ঝুলুক মাথার 'পরে
ভুলিয়াও তবু ছাড়িও না কভু উপদল মহিমায়।

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী।

সাদা চামড়ার দাপট

ডঃ ডেনিয়েল মালান দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ত্রিশ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। সেই সময়েই আর একজন শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বর্ণ-বিদ্বেষমূলক নীতির ফলে এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছেন। অশ্বেতকায় অধিবাসীগণ মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের আইন ভাগবৎ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছে এবং অশ্বেতকায় জাতিসমূহ এই স্পর্দ্ধা স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লইবে না, সঙ্ঘবদ্ধ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। এই শ্বেতাঙ্গটি হইলেন মালান সরকার কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নির্ব্বাসিত ইংরেজ ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট। ইনি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই বার রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষদর্শী রূপে মালান সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম যাহা বলে বলুক, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব যে মন্তব্য করিতে হয় করুক—তাহার প্রতি কর্ণপাত করিবার অবকাশ ডঃ মালানের নাই; শ্বেতাঙ্গপ্রাধান্য তাহার শাসন ও শোষণের কল্যাণে একটা বিরাট জনসঙ্ঘকে নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, আইন প্রণয়ন দ্বারা মানুষের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে গৃহপালিত পশুপালে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশ্ববিধান রচিত অজ্ঞাত একটি দণ্ড মানব ইতিহাসে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়। সেই বিধান যে লঙ্ঘন করে, সেই বিধানের রোষ তাহাকে তৃণ সম দহন করে। কিন্তু মালান-জাতীয় জীব তাহা জানিয়াও জানিতে চায় না; বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। ফলে নিজেকে ও কোটি কোটি নরনারীকে দুঃখের সাগরে ঠেলিয়া দেয়।

মিশর-সুদান-টিউনিসিয়া

আজ প্রায় আটষট্টি বৎসর মিশরদেশ ব্রিটেনের অধীনে আছে; সেই সঙ্গে সুদানের উপরও কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। মাহদির পরাজয় ঘটে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে; তখন মিশরকে বাধ্য করা হয় "সম-অধিকার" (condominion) স্বীকার করিয়া লইবার জন্য, যদিও মিশরই এই অভিযানের ব্যয় বহন করিয়াছিল। প্রায় সেই সময়েই ফরাসী সেনাপতি মার্চেণ্ট ইংরেজ সেনাপতি কিচেনারের দাপটে ফেসডা (Fashoda) হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইংরেজ ফ্রান্সকেও চটাইতে চাহিল না। উত্তর আফ্রিকায় ফরাসীর অধিকার বিস্তারে প্রশ্রয় দিল।

এই ভাবে একটি জটিলতার সৃষ্টি হইল। ইহার ফল আজ আমরা সকলে ভোগ করিতেছি। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন মিশরকে স্বাধীনতা দিল। কিন্তু "সম-অধিকারটি" (condominion) বজায় রাখিল। আবার ওদিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে নিজেকে দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন মার্কিন ও ব্রিটেনের সাহায্য ছাড়া তাহার চলে না।

সুতরাং মিশর-সুদান-টিউনিসিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। টিউনিসিয়ার রাজনীতিকেরা আরব-রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাহিরে নিজেদের দাবিদাওয়ার সমর্থনলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, স্বধর্ম্মী বলিয়া পাকিস্থান ত তাঁহাদের পক্ষে আছেই, ভারতরাষ্ট্রের সাহায্যও প্রয়োজন। সেই জন্য টিউনিসিয়ার অবিসম্বাদিত নেতা এল হবিব বোর্জিবা এই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার একখানি পত্র "স্পট-লাইটস্" (Spot-Lights) পত্রিকার সম্পাদকের হাতে পৌঁছিয়াছে। তিনি এখন ফরাসী কারাগারে বন্দী। তাঁহার পত্রে ভারতরাষ্ট্রের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে যেন তাঁহারা ভারতের জনমতকে তাঁহাদের সপক্ষে আনয়ন করেন। পণ্ডিত নেহরুর বিষয়েও বলা হইয়াছে।

আমরা এল হবিবের এই অনুরোধ সমর্থন করি। বিদেশী শাসনের জ্বালা যে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে, তাহার পক্ষে পরাধীনতার বিলুপ্তি একান্তভাবে কাম্য। তাহার উপর ভারতের রাষ্ট্রনীতি আজ এক শত বৎসর হইতে এই অনুপ্রেরণায় চলিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। ভারত সকল দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির অকুণ্ঠ সমর্থক।

বাংলার পুস্তক প্রকাশক সঙ্ঘ

এই সঙ্ঘের কার্য্যক্রমে বাংলার পুস্তক ব্যবসায়ে একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে এখন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের হাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সকল দায়িত্ব আসিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে; তার পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষারও পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই দুই কাজ একসঙ্গে না করিলে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়া বালক-বালিকার শিক্ষার গোড়া দৃঢ় না করিতে পারিলে পুস্তকের বোঝা তাহাদের ঘাড় হইতে অল্পবিস্তর না কমাইলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব এবং মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়া দৃঢ় না করিলে দেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে; পুরাতন ব্যর্থতার অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। এই ভাবে মানবজীবন এক সূত্রে গ্রথিত।

এই সব কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, কিন্তু মানবজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। টোল-মক্তব ইত্যাদির শিক্ষা বর্ত্তমান জগতের নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। যান্ত্রিক সভ্যতার আমলে মানুষ অনেকটা যন্ত্র-চালিত হইয়া যাইতেছে এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্যক্তির আত্ম-কর্ত্তৃত্ব আরও সঙ্কুচিত হইবে।

এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া মানবজীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব হইতে রাষ্ট্র নিজেকে মুক্ত করেন।

ছাপাখানার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশ এক বিরাট ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে এই ব্যবসায়ে কত কোটি টাকা মূলধন রূপে খাটিতেছে তাহার হিসাব দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; তার বাৎসরিক আয় কত ও কত লক্ষ পরিবার এই ব্যবসায়ের কল্যাণে জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তাহার একটু বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই অবস্থার ফলে "বিশ্বভারতী" প্রকাশক সঙ্ঘ, এম. সি. সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক সঙ্ঘ একঘরে করিতেছেন। আচার্য্য যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপালদের পুস্তক বিক্রয়ে বাধা দিতে যাঁহারা চেষ্টা করিবেন, মনে হয় তাঁহারাই "একঘরে" হইবেন।

এই সমস্যার সমাধান কঠিন নয়। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। সেইরূপ কোন ব্যবসায়ী সঙ্ঘের হাতে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। এই দুই পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ করিতে কে অগ্রসর হইবেন, তাহাই বিবেচ্য। জল যথেষ্ট ঘোলা করা হইয়াছে, এখন স্থির-বুদ্ধিতে সমস্যাপূরণ করা কর্ত্তব্য।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ

গত ২৩শে মাঘ ব্রিটেনের রাজা, "কমনওয়েলথে"র প্রধান, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ৫৭ বৎসর বয়সে মরজগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই মৃত্যু আকস্মিক নয়। গত ভাদ্র মাসে যখন তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়, তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, ষষ্ঠ জর্জ্জের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইল; শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী গিয়া রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিমণ্ডলী মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে গঠিত হইল। রাষ্ট্রের পরিচালনে কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। বিলাতের লোকের মাংসের অভাব মিটিল না। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রচুর, এবং বিলাতের নর-নারী মাংসের ব্যবহার কমাইতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন অবনতি হয় নাই; বরং উন্নতি হইয়াছে।

অপুত্রক রাজার প্রথম কন্যা রাজকুমারী লিলিবেথ ব্রিটেনের রাণী হইয়াছেন; কমনওয়েলথের প্রধানা হইলেন। তাঁহার পিতার সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লবকারী ঘটনা হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৪), যেমন তাঁহার পিতামহের সময়ে ঘটিয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। এই দুই ঘটনায় প্রায় সারা ইউরোপ খণ্ড হইতে রাজতন্ত্র (monarchy) লুপ্ত হইল। রাশিয়ার জার, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার কাইজার, তুরস্কের সুলতান ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলেন। কেবল রহিলেন ব্রিটেনের রাজবংশ বাতি দিবার জন্য। এই বিষয়টি একটা আলোচনার বিষয় হইয়াছে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রবিদ্‌দের মধ্যে। তাহার রহস্য ভেদ করিবার নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়। তার মধ্যে প্রধান হইল ইংরেজের রক্ষণশীলতা। ইংরেজী ভাবাভাবী মার্কিনীরা পর্য্যন্ত লণ্ডনে আসিলে রাজা বা রাণীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করে।

এই সম্ভ্রম আর কতদিন টিকিবে তাহা ইতিহাস বলিতে পারে। ইংরেজের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, তাঁহাদের দেশে যখন রাণীর আবির্ভাব হয় তখন দেশের সমৃদ্ধি কাঁপিয়া উঠে যেমন উঠিয়াছিল রাণী এলিজাবেথের সময়, রাণী ভিক্টোরিয়ার সময়। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের কন্যা দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

তাঁহার পিতৃবিয়োগে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি, এবং গণতন্ত্র বিধানের নাগরিক হইয়াও তাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। আমাদের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাহা করা হইতেছে তার মধ্যে একটু আতিশয্য থাকিতে পারে, অন্যায় কিছু নাই।

সংশোধন

খুলনা দৌলৎপুর কলেজের শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ নিম্নলিখিত সংশোধন পত্রটি পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি :

"আপনি লিখিয়াছেন যে "মহাশ্মশান কাব্য কারবালায় হাসান হোসেনের হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত। একদা 'বিষাদসিন্ধু' দুঃখের বন্যা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্তমান যুগের ভারতীয় মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। হাসান-হোসেনের বিষাদময় কাহিনী বাংলাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম 'মহরম শরিফ' বা 'আত্মবিসর্জন' কাব্য; 'মহাশ্মশান' নহে। মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত। এক দিকে আহমদ শা-আবদালী ও অন্য দিকে বিপুল মহারাষ্ট্র শক্তি; এই যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়াই কবি মহাশ্মশান রচনা করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্য্যবীর্য্যের শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া ইহার নাম মহাশ্মশান।"

বাঁকিপুরের সদ্য অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আমরা বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যের প্রবর্ত্তক ত্রয়ের নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহাদের নাম প্রমদাচরণ সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

বসন্তকুমারী হোম

যে প্রাণধর্ম্মী সংস্কৃতি ভারতবর্ষে এখনও চলিতেছে, তার প্রতি বিরূপ হইয়া কেন আমাদের মধ্যে সন্ন্যাসীর প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল তাহা ভারত-ইতিহাসের অন্যতম রহস্য। বসন্তকুমারী হোম এই প্রাণধর্ম্মের সাধনে নিরত থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জীবনে এমন করিয়া পরকে আপন করিয়াছিলেন, দূরকে নিকটে আনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা কথার কথা নয়। ইহা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ, বংশগত ঐতিহ্য।

এই গুণের প্রকাশ পাইয়াছিল বসন্তকুমারীর পিতা কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের মধ্যে। এই লোকটি ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর শিষ্য; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। বোড়াল-মজিলপুর, জয়নগর, চিংড়িপোতা, হরিনাভি সমাজ একসূত্রে গ্রথিত ছিল। এই অঞ্চলকে নব্যবঙ্গের পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেইজন্য বসন্তকুমারী হোমের নিকট বসিলে কথাচ্ছলে তাঁহার নিকট অনেক তথ্য পাওয়া যাইত যাহা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও পাওয়া কঠিন। অনেক গবেষক তাঁর নিকট ঋণী। সেই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করা উচিত।

তাঁহার স্বামী গগনচন্দ্র হোম ছিলেন সুন্দরীমোহন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী (সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতির সহকর্ম্মী। শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাদের শিষ্যত্বে বরণ করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন অগ্নিসাক্ষী করিয়া তাহা জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁহারা পালন করিয়াছিলেন। অতিথিবৎসল বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

বসন্তকুমারী ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমরা শোক করিব না। তাঁহার পুত্রকন্যার উদ্দেশ্যে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

চারুচন্দ্র দত্ত

গত ৮ই মাঘ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কেন্দ্র পণ্ডিচারী নগরীতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া চারুচন্দ্র দত্ত পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বিপ্লবী যুগে অরবিন্দের সহকর্ম্মী, সাধনমার্গে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এই দুই ভাব ও কর্ম্মের সমন্বয় মূর্ত্তি দেখিয়াছি আমরা চারুচন্দ্রের জীবনে।

তাঁহার আর একটা পরিচয় ছিল। তিনি সাহিত্যরসিক, বাংলা ভাষায় তাঁহার আত্মচরিত "পুরানোকথা"র সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন মজলিসী লোক, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি যে প্রশংসা লাভ করেন তাহা অনেকের স্পৃহনীয়।

তাঁহার পিতা কালিকাদাস দত্ত কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। চারুচন্দ্রের জীবন-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কেন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয় বা রাজসম্মানের জন্য নয়, কিন্তু এই উচ্চপদের জোরেতে নানা গোপন সন্ধান লাভ করিয়া বিদেশী শাসনযন্ত্রকে বিকল করিতে পারিবেন এই ভরসায় চারুচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন। এই কুটিল পথে চলিবার সাহস বা শক্তি সকলের থাকে না। থাকিলেও বেশী দিন উচ্চপদ, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলে, কালে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। চারুচন্দ্র সেই ভাগ্যবানদের একজন যিনি দুর্গম পথে চলিয়াও কখনও প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। চারুচন্দ্র এই সবই হাসিমুখে সহ্য করিয়াছিলেন।

জীবনের সায়াহ্নে তিনি এই পথ অতিক্রম করিয়া বিপ্লবী যুগের সহকর্ম্মীর হাত ধরিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃততর লোকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মত অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যাতা খুব কমই দেখিয়াছি। 'দিব্য জীবন' (*Life Divine*) নামক পুস্তকের অনুবাদ তাঁহার নিদর্শন।

এই বাঙালী প্রধানের তিরোধানে আমাদের সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা অপূরণীয়। আমরা তাঁহার পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা

শোনা যাইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক পরিবর্তন আসন্ন, এবং সংস্কৃত বিভাগেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি এক জন সংস্কৃতানুরাগী ও আজীবন সংস্কৃতের ছাত্র; অবসরপ্রাপ্ত আশুতোষ সংস্কৃতাধ্যাপক ও সংস্কৃতবিভাগের অধিনেতা বলিয়া তাহার সহিত আমার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও আছে। তাই এই সময়ে ইহার সম্বন্ধে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমি কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষ ইহা এক বার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

সংস্কৃত মূলত যদিও এই ভারতের ভাষা, তথাপি আর ইহা নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। পৃথিবীতে অগ্রগামী দেশসমূহের অনেকের মধ্যে ইহা বর্তমানে সাদরে অধীত হইয়া থাকে, এবং ইহার বিবিধ বিষয়ে যে বিপুল আলোচনা ও অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা কোন অভিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ্ই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

শিক্ষাপদ্ধতি

বৎসর পঁয়ত্রিশ হইবে স্বর্গীয় মহাশয় আ শু তো ষ যখন এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন, স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, একমাত্র প্রাচীন বা নবীন পদ্ধতিতে কাজ করিলে চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়ই পদ্ধতিকে যথাযথ ভাবে স্থান দিতে হইবে। এইজন্য সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকিলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি যোগ করেন, এবং দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপককে নিযুক্ত করেন; প্রথম, প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত, ইঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন কতক ইংরেজীজ্ঞ অর্থাৎ সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ। ইঁহাদের ইংরেজী জানায় মনে করা হইয়াছিল যে, ইঁহারা বর্তমান বা নবীন পদ্ধতির সহিত পরিচিত আছেন, অথবা ক্রমে ক্রমে শীঘ্রই পরিচিত হইয়া উঠিবেন, অথবা এই পদ্ধতিতে উপলব্ধ তত্ত্বসমূহকে ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবেন। মনে হয় এই জন্যই প্রথম-প্রথম এই শ্রেণীর শিক্ষকগণের কাজ খুবই লঘু ছিল। শুনিয়াছি সপ্তাহে এক বা দুই ঘণ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে পড়াইতে হইত। মহাশয় আ শু তো ষে র অভিপ্রায় ছিল যে, প্রথমে শিক্ষকেরা নিজের প্রগাঢ় অধ্যয়নের দ্বারা নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া, বিশেষত বর্তমান পদ্ধতিতে ও গবেষণায় সংস্কৃত ও সংস্কৃত-সম্বদ্ধ অন্যান্য বিষয় অধিগত তত্ত্বসমূহ পরিচিত হইয়া ছাত্রগণকে যথোচিতভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

মহাশয় আ শু তো ষ এই ব্যবস্থা করিয়া মনে-মনে আশা করিয়াছিলেন যে, অক্সফোর্ড হইতেও ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়িবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবে। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ তো হয়ই নি, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

শিক্ষার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আমাদের ছাত্রগণকে সাধারণত বর্তমান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত করা হয় না। ইহার প্রধান কারণ, যে সকল শিক্ষক প্রধানভাবে এই বিভাগের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং মনে করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বর্তমান পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সেরূপ হইলেন না, বা সে বিষয়ে চেষ্টাও করিলেন না। ফলে দেখা গেল যে, প্রাচীন ও নবীন শিক্ষকগণের মধ্যে বস্তুত তেমন কোন ভেদ থাকিল না। আমার মনে হয়, ইঁহাদের অনেকেই এ প্রশ্নে একবারে উদাসীন। সত্য কথা বলিতে হইলে, বর্তমান পদ্ধতি থাকুক প্রাচীন পদ্ধতিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক অনুসরণ করা হয় না।

সংস্কৃতে অভিজ্ঞতার জন্য প্রাকৃত অপরিহার্য। প্রথম আরম্ভ হইতেই মহাশয় আ শু তো ষ সংস্কৃত বিভাগে প্রাকৃতের অধ্যয়ন প্রবর্তিত করেন। ঐ সময়েও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের কাব্যগত ও সাহিত্যিক উচ্চ উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা আলোচনা করিব। সম্প্রতি বহু স্থলেই, বহু টোলেই বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্গণের নিকটে প্রাকৃত অত্যন্ত অবজ্ঞাত হয়, কিন্তু প্রাচীন অধ্যাপকগণের নিকট এরূপ হইত না। মহাকবি প্র ব র সে নে র সে তু ব ন্ধ, এবং সা ত বা হ নে র গা থা স প্ত শ তী র প্রশংসা না করিয়া বা ণ ভ ট্ট নিজের হ র্ষ চ রি ত আরম্ভ করিতে পারেন নি। এ দুইখানিই প্রাকৃতে রচিত। সুপ্রসিদ্ধ সুবন্ধু বা স ব দ ত্তা য়, বাণভট্ট হ র্ষ চ রি তে, দণ্ডী কা ব্যা দ র্শে, ও অন্যান্য

দশরূপকে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহা পৈশাচী-নামক একরূপ প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত ইহার মূল আজ লুপ্ত, কিন্তু ইহার তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ আছে। যথা সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর, হেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, ও বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ। প্রাকৃতের জ্ঞান না থাকিলে পূর্বে কেহ সংস্কৃতবিদ্ বলিয়া গণ্য হইতেন না। অতি স্পষ্টতই দেখা যায় পূর্বে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতও অবশ্যপাঠ্য ছিল। সকলেই জানেন, সংস্কৃত নাটক বা দৃশ্য কাব্যগুলি কেবল সংস্কৃতেই নহে, কিন্তু অংশত প্রাকৃতে অথবা স্থানে স্থানে বিবিধ প্রাকৃতেও রচিত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্যার্ণব কর্ণধার" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি আঠারটি ভাষা জানিতেন, এই ভাষাগুলির মধ্যে একটি সংস্কৃত এবং অবশিষ্ট সতেরটি হইতেছে বিভিন্ন প্রাকৃত। বিশ্বনাথ ইহাকে কবি জনোচিতরূপে বর্ণনা করিয়া নিজেকে বলিয়াছেন "অষ্টাদশ ভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ।" তাঁহার পিতা ভাষার্ণবের রচয়িতা নানাবিধ প্রাকৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন ("সব্বভাসা চউর"—সর্বভাষা চতুর)। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-গণ প্রাকৃত ব্যাকরণও রচনা করিতেন। যেমন হেমচন্দ্র ক্রমদীশ্বর, ও পুরুষোত্তম। ইঁহাদের প্রাকৃত ব্যাকরণ এখনো প্রচলিত আছে, ছাপাও হইয়াছে।

আমাদের অলঙ্কার গ্রন্থগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রাকৃত না জানিলে অলঙ্কারও ভাল করিয়া জানা হয় না। ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণখানি দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কিছুদিন পূর্বেও এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

প্রাকৃতের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না। প্রাকৃত কিঞ্চিন্মাত্রও না জানিলে কেহ অতি বড় বৈদান্তিক বা মীমাংসক হইতে পারেন, কিন্তু হয় তো এ কথা শুনিয়া কেহ-কেহ বিস্মিত হইতে পারেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংস্কৃতবিদ্ সংস্কৃতবিদ্ই নহেন, কেননা এইরূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে বা যথার্থভাবে বহু কথাই ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। ইঁহারা অনেক সময়ে "আর্ষ প্রয়োগ" বা "ছান্দস" বলিয়া এই সব প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন।

অভিজ্ঞগণ জানেন যে, এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় বহু প্রাকৃত প্রভাব আছে, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। মহাকাব্যগুলিরও মধ্যে ইহা প্রচুর।

অযুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহের পাঠ

এই প্রসঙ্গে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক শ্রেণীতে আমাদের দৃশ্যকাব্যগুলিকে যে প্রণালীতে পড়ান হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। দেখিতে পাওয়া যাইবে, শিক্ষকেরা নাটকের মূল প্রাকৃত অংশ পাঠ করিয়া শিক্ষা দেন না, তাঁহারা ছাত্রগণকে সংস্কৃতের ছায়া শোনাইয়া থাকেন। ইহা স্পষ্টতই বহুস্থলে শিক্ষকের প্রাকৃতের প্রতি অবজ্ঞা সূচনা করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, যদিও ছাত্রগণ খুব ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যখন তাহারা ভবিষ্যতে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয় তখন ঐ বিষয়টিকে ভাল করিয়া পড়াইতে পারে না। এইরূপে এমন একটি ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যাহাতে মোটের উপর সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষতি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, যাহা যা তাহা যদি তা না থাকে, তবে তাহার নিজের গুণও থাকে না। দুধ যদি দুধ না থাকিয়া দই হয়, তবে উভয়েরই স্বাদ প্রভৃতি ভিন্ন হয়, দুধের স্বাদ দইএ থাকে না। এইরূপ প্রাকৃতকে যদি সংস্কৃতে পরিবর্তন করা হয় তবে প্রাকৃতের যাহা কিছু রমণীয়তা ও মাধুর্য সবই নষ্ট হইয়া যায়। এই গুণ কথায় বর্ণনা করা যায় না, অভিজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা অনুভব করিতে পারেন; যেমন দুধ, চিনি ও মধুর মাধুর্য কেমন ইহা কেহ কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, আস্বাদন করিয়াই বুঝিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে আমি একটিমাত্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঠকগণের অধিকাংশ প্রাকৃতের সহিত পরিচিত নহেন এই আশঙ্কায় আমি এখানে বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

> "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়মুখ চন্দা,
> জীবন যৌবন সফল মাননু দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।
> আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু আজু মঝু দেহ ভেল দেহ।
> আজু বিহি মোয়ে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহা।

ইহার সংস্কৃত ছায়া এই—

> অদ্য রজনী মহং ভাগেন প্রভাতমকারয়ং প্রৈক্ষে প্রিয়মুখ চন্দ্রম্।
> জীবনং যৌবনং সফলমমালয়ং দশ দিশো ভূতা নির্দ্বন্দ্বাঃ।
> অদ্য মম গেহং গেহমমানয়ম্ অদ্য মম দেহো ভূতো দেহঃ।
> অদ্য বিধির্মে'হনুকূলো ভূতস্ত্রুটিতঃ সর্ব'সন্দেহঃ।

পাঠকগণ বিদ্যাপতির মূল ও সংস্কৃত ছায়ার ভেদ নিজেই অনুভব করিয়া দেখুন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে সাধারণ চাষী স্ত্রী-পুরুষদের কথায় যে অতিগ্রাম্য ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের অতি উচ্চ ভাষা বসাইলে যে দুর্দশা হয়, সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের স্থানে সংস্কৃত

বসাইয়া পাঠ করিলে তাহাই হয়। পাঠকগণ এখন মূল ও ছায়ার ভেদ নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতের এই অবস্থার মধ্যে যখন দেখিতে পাই যে, সঙ্কলিত নূতন পাঠ্যসংক্ষেপে (Syllabus) প্রাকৃতকে সংস্কৃতের সমস্ত ছাত্রের জন্য অবশ্যপাঠ্য না করিয়া ঐ স্থানে ভারতীয় অর্থনীতিকে (general principles of Indian politics) বসান হইয়াছে, তখন নিতান্ত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। ইহা উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদেশেও এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রাকৃত অবশ্যপাঠ্য।

প্রাকৃতকে অবশ্যপাঠ্য না করায় আমাদের অধিকাংশ ছাত্রের নিকট ম হা ব স্তু, ল লি ত বি স্ত র, ইত্যাদি বহু-বহু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও অনুশাসন প্রভৃতি একবারে অবোধ্য থাকিয়া যায়। জৈনগণের আগমগুলিরও সম্বন্ধে এই কথা, কেননা এগুলিও প্রাকৃতে রচিত। অতএব এ ব্যবস্থা আমাদের নিতান্ত ক্ষতির জন্য, লাভ ইহাতে কিছুই নাই। তাই ইহা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। সকলে ইহা শান্ত ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বৈদিক সাহিত্য

ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সাহিত্য শিখাইবার বিধান করা হইয়াছে। প্রথম হইতেই ইহা আছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে এখান হইতে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যাঁহাকে বৈদিক পণ্ডিত বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় স ত্য ব্র ত সা ম শ্র মী মহাশয়ের পর বঙ্গদেশে আর কাহাকেও তাঁহার স্থানে দেখা গেল না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন ছাত্র নিতান্ত দুর্লভ, যে সংহিতা পাঠ হইতে পদপাঠ, বা পদপাঠ হইতে সংহিতাপাঠ করিতে পারে। অথবা যে ঋগ্বেদের এক পঙ্‌ক্তিও যথোচিত স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিতে পারে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ই ভারতের, বিষয়ও ভারতের নিজের, আর ব্যয়ও কিছু কম হয় না।

নবীন ব্যাখ্যা

আমরা ভারতীয়েরা নিজে বেদের কীরূপ ব্যাখ্যা করি তাহা প্রথমে আমাদিগকে অবশ্যই জানিতে হইবে। আমাদের ছাত্রেরা নিষ্ঠার সহিত ইহা করুক। কিন্তু তাহাদিগকে আরও কিছু করিতে হইবে, অন্যথা চলিবে না। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন কথা সম্বন্ধে নূতন কি বলিতেছেন সেই সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ হইয়া থাকিলে চলিবে না, চলিতে পারিবে না। কোন ব্যাখ্যাকে কেহ সত্য বলিয়া সব সময়ে গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কে কি বলেন তাহা প্রথমত জানিতে হইবে, তাহার পর তাহা গ্রহণ করিবেন, অথবা উপযুক্ত যুক্তির উপন্যাসে খণ্ডন করিবেন।

বৈদিক যজ্ঞের ভাব

সংস্কৃত বিভাগের সমস্ত ছাত্রেরই, বিশেষত বৈদিক বর্গের ছাত্রদের জন্য ঋগ্বেদের বহু অংশ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার সহিত সা য় না চা র্যে র ভাষ্যও পাঠ্য। ইহাতে নানা যাগযজ্ঞের কথা আছে। এই যাগযজ্ঞের সম্বন্ধে ছাত্রেরা যাহাতে একটা সাধারণ ভাব পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতকগুলি যজ্ঞিয়-পাত্র সংগৃহীত করা হইয়াছে, যাহাতে অধ্যাপক উহাদের সাহায্যে ছাত্রগণকে যতটা সম্ভব কতকগুলি ব্যাখ্যান দিতে পারেন। এই বিভাগে এইরূপ উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাখ্যান দেওয়া আর হয় না। যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অবিলম্বে ঐ যজ্ঞিয় পাত্রগুলিকে সংস্কৃত বিভাগ হইতে নৃতত্ত্ব বিভাগে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হইবে।

অবেস্তা

সংস্কৃত বিশেষত বৈদিক সংস্কৃত ও অবেস্তার পরস্পর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রগণ অবেস্তার ভাষার দিকে চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে অবেস্তার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বৈদিক (অর্থাৎ বি) বর্গে পাঠ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা গেল যে, পরিবর্তিত পাঠ্যসংক্ষেপে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেবল ছাত্রগণের প্রভূত ক্ষতি করা হইল। অন্যান্য ঘটনার সহিত ইহা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত বিভাগ বিপরীত গতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা ভারতীয় বা অভারতীয়, আর্য বা ম্লেচ্ছ, এইরূপ চিন্তা বা তদনুসারে কার্য কখনো শ্রেয়স্কর নহে, ইহা আত্মঘাতী। অন্তত আমি ইহা বুঝিতে পারি না ভাষা হিসাবে অবেস্তা পড়িলে কিরূপে তাহা সংস্কৃতের বা সংস্কৃত-ছাত্রের ক্ষতি করিতে পারে।

পাঠ্যসংক্ষেপ (Syllabus)

এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, বহু পরিবর্তন আবশ্যক

হইলেও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) বেদান্ত। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বেদান্তের যদিও বিবিধ সম্প্রদায় আছে, এবং তাহাদের সমস্তই অনুপেক্ষণীয়, তথাপি কেবল শ ঙ্ক র ও রা মা নু জে র ই মত আলোচ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ মাত্র নাই। ইহার ফলে এই হয় যে, ছাত্রেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের আলোচনা হইতে বঞ্চিত হয়।

(খ) বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়। বর্তমান ন্যায় বৈশেষিক-বর্গে অতি সুস্পষ্ট ত্রুটি এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়কে একবারেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ইহাদের নামও করা হয় নি অথচ ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে বৌদ্ধ ও জৈনদের দান সামান্য নহে। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, কোন ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় তর্ক-শাস্ত্র পড়িয়া ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানিবে না।

(গ) সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাঠ্য-সংক্ষেপে যদিও বড় বড় কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট অনেকেই জানেন যে, ব্যাকরণের পড়ান মোটেই সন্তোষাবহ নহে। যে প্রণালীতে ইহা পড়ান হয় তাহাতে ইহা সম্ভবও নহে। ইহাতে বহু বক্তব্য আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটি মাত্র কথা এখানে বলা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, আলোচ্য ত্রুটিটি ততটা আর কিছুতে নহে যতটা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে। অতএব কর্তৃপক্ষ ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, বর্তমান পাঠ্য স্থলে কা শি কা কে দিলে চলে কিনা। কা শি কা র সাহায্যে পা ণি নি র সূত্র পড়িলে ছাত্রেরা তাহার প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত হইতে পারিবে এবং ইহাতেই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহজে পা ণি নি ব্যা ক র ণ কে তাহারা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ইহাকে তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। কেননা ইহা কেবল ব্যাকরণ নহে, ইহা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি বিবিধ দুর্লভ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের আকর।

পাঠ্যসংক্ষেপ সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা যাইতে পারে। ইহা রচনা করিবার সময়ে পাঠ্য পুস্তকসমূহের তালিকা সঙ্কলন অপেক্ষা পাঠ্য বিষয়গুলিই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য মনে হয়। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই বেশী উপকার হইবে। বর্তমানে ইহা হয় না। ইহা বলা বাহুল্য যে, পাঠ্যসংক্ষেপ করিতে, বিশেষত দার্শনিক বিষয়সমূহের সম্বন্ধে যদি স্বর্গীয় মহাশয় ব্র জে ন্দ্র না থ শী লে র পুস্তিকা-খানিকে *Syllabus of Indian Philosophy in the University*) আদর্শরূপে অনুসরণ করা হয়, তবে প্রকৃত উপকার হইবে।

সংস্কৃত সম্পর্কে তিব্বতী ও চীনা

মহাশয় আ শু তো ষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ও চীনা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এক জন সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে আমি এখানে পুনর্বার তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। আমাদের সংস্কৃতের যে ধনকোশ নষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবশত আজ প্রধানত তিব্বতী ও চীনা ভাষাতে আছে, তাহার পুনরুদ্ধারের বীজ তিনি ইহার দ্বারা এখানে বপন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের এই কথা সাধারণত অনেকেই জানেন না। কিন্তু যদি কেহ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদে গ্রন্থসূচী (Bunio Nanjio's *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, Oxford, 1883) ও পি. কর্দের রচিত তিব্বতী ভাষায় প্রধানত সংস্কৃত হইতে অনূদিত বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের সূচী (P. Cordier's *Catalogue of the Tibetan Kanjur and Tanjur—Catalogue du fonds tebitan du la Bibliotheque Nationale*, Paris 1909, 1915) এই দুইখানি পুস্তকের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তবে অতি সহজেই এই বিষয়টি জানিতে পারিবেন। তিব্বতীতে যে কেবল বৌদ্ধ বা ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থেরই অনুবাদ হইয়াছে তাহা নহে, বহু-বহু অন্যান্য গ্রন্থকেও অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি। যথা মে ঘ দূ ত, কা ব্যা দ র্শ, পা ণি নি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যত দিন আমাদের লুপ্ত গ্রন্থসমূহ, যাহা তিব্বতী ও চীনায় এখনো পাওয়া যায়, পুনরুদ্ধৃত না হয়, বা অনুবাদ প্রভৃতির দ্বারা ইহার আলোচ্য বিষয়কে প্রকাশ করা না হয় কোন ভারতীয় তত দিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। এ কাজ খুব শক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু অসাধ্য নহে। বর্তমান পণ্ডিতগণের পরিশ্রম দেখাইতে পারিয়াছে যে, ইহা কতদূর সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এখানে ব সু ব ন্ধু কৃত অ ভি ধ র্ম কো শ কে পুসে সাহেব (Lois de la *Vallee Poussin*) প্রধানত তিব্বতী ও চীনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যেভাবে ফরাসী ভাষায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

অতএব ইহা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য যে, আমাদের লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পাঠশালা বা টোলের ছাত্রগণকে এরূপভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়া উৎসাহিত করা যাহাতে তাহারা ঐ কার্যে

প্রবৃত্ত হয়, আর তজ্জন্য সংস্কৃতের যোগে চীনা ও তিব্বতী অধ্যয়ন করিতে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যায়।

পুনর্বার আমি এখানে মহাশয় আ শু তো ষ কে স্মরণ করিতেছি, কেন না তিনিই নিজে এই জাতীয় কার্য প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ করেন। গত ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক লে ভি সাহেব (Prof- Sylvain Levi) শান্তিনিকেতনে অভ্যাগত (visiting) অধ্যাপকরূপে আগমন করেন। সেই সময়ে সেখানে বিশ্ব-ভারতী যথাবিধি স্থাপিত হয়। মহাশয় আ শু তো ষ তখন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়কে তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। ইনি ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করিতেন, অধ্যাপক লে ভি তাঁহাকে নিজের সঙ্গে স্বদেশে লইয়া যান এবং বিশেষ ভাবে চীন ভারতীয় বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করেন। মহাশয় আ শু তো ষ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার অধ্যয়ন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু সেখানে দুই-খানি চীন-ভারতীয় অভিধানের সংস্করণ করেন। এই দুইখানিই প্রধানত সংস্কৃত পাঠার্থী চীনা পাঠকদের জন্য। ইহাতে সংস্কৃত শব্দের চীনা অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতীয় পাঠকেরও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। এই পুস্তক দুইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বলিয়া প্যারিস হইতেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের একখানির নাম ফান-যু-ৎস্-মিঙ, ইহার রচয়িতা লি-য়েন। অপরখানির নাম ফান্-যু-ৎসিন্-ৎসেউ-বেন্। ইহার প্রণেতা য়ি-ৎসিং।

ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ আরও একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন করেন। *Le Canon Buddhique en (hine)*। ইহাতে চীনের বৌদ্ধ সাধকগণের বিবরণ আছে। ইহাও প্যারিস হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা এখানে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহের প্রাচীন অনুবাদ ও শত শত বৎসর ধরিয়া ঐ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা মনে করিতে পারি। ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু তথাপি ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি ইহা সেই সময়ে সম্ভব হইয়াছিল, আজকাল কেন তাহা না হইবে। চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা যদি সংস্কৃত শিখিয়া নিজ নিজ ভাষায় অত সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে পারেন, তবে বর্তমানে ভারতীয়েরা কেন সেইরূপই কাজ করিতে পারেন না।

ইহা বলাই বাহুল্য, এই কার্যে সরকারের মুক্ত হস্তে দান ও সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথা কোন বিশেষ চেষ্টা করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দিকে কোন অনুরাগ দেখা যায় না। কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন তখন এ অবস্থাকে আর দীর্ঘদিন থাকিতে দেওয়া যায় না।

তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

আমরা জানি, কিছু দিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বার তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই, ইহা ভাল। আমার মনে হয় প্রধানত ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য অথবা এইরূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গ যতক্ষণ চীনা ও তিব্বতী হইতে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহকে পুনরুদ্ধৃত করিতে না পারিতেছেন তত দিন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন না। সংস্কৃত বিভাগের ইহা একটা বিশেষ কার্য হওয়া উচিত।

সতর্কীকরণ

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সাংঘাই সংস্করণের চীনা ত্রিপিটিকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রন্থকে পোকা ও উই কাটিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। পরে আবার যখন দ্বারভাঙ্গা ভবনের এক অল্পালোক ঘরের মধ্যে রক্ষিত কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত (Xylographs) ও বহু হস্তলিখিত তিব্বতী গ্রন্থগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার জন্য আমাকে ভার দেওয়া হইয়াছিল, তখন সেগুলিকে ভাল অবস্থায় দেখা যায় নি।

এখানে ইহা বিশেষ ভাবে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের তিব্বতী গ্রন্থসংগ্রহটি অতি দুর্মূল্য ও অতি দুর্লভ, বিশেষত প্র জ্ঞা পা র মি তা কয়েকখানি পুস্তক। এগুলি সোনালী ও রূপালী কালিতে তদুচিত কাগজে লিখিত। এগুলি প্রদর্শনের বস্তু। দেখিলে চোখ সার্থক হয়। এগুলি একবার কোনরূপে নষ্ট হইলে পুনর্বার পাওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ শ র চ্চ ন্দ্র দা স মহাশয়ের সংগৃহীত তিব্বতী গ্রন্থগুলিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রহিয়াছে। মহাশয় আ শু তো ষ ই এসব সংগ্রহ করাইয়া-ছিলেন।

বিদ্যার রক্ষা

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিতে পারা যায়। ইহা এই যে, যদি কোন নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অতি-অবজ্ঞাত বিদ্যাকে কেহ বিদেশ হইতে উপার্জন করিয়া

স্বদেশে আনয়ন করে তবে যতদূর সম্ভব সর্ববিধ উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা উচিত, যাহাতে পুনর্বার কাহাকেও তাহার উপার্জনের জন্য দেশান্তরে গমন ও তাহাতে নানাবিধ ক্লেশ ও অর্থব্যয় বা কালক্ষয় না করিতে হয়, দেশের যে কেহ চাহে অনায়াসেই তাহা পাইতে পারে। বিদ্যার রক্ষা বলিতে, যে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জন করিয়া আনিয়াছেন তাঁহাকে এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাহাতে তিনি নিজের ছাত্রকে উপার্জিত বিদ্যা দান করিতে পারেন, এবং এই ছাত্রও নিজের ছাত্রকে ইহা অধ্যয়ন করাইতে পারেন, যাহাতে এইরূপে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সংস্কৃত বিভাগেরই একটি ভূতপূর্ব ছাত্র এইরূপ আছেন। ইনি সংস্কৃতে এম-এ, এবং সরকারী বৃত্তি লইয়া চীনে যান। দশ বৎসর চীনা শিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ইঁহার আছে। চীনা সংস্কৃতে ইনি কিছু কাজও করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে কাজে লাগাইলে লাভবান্ হইবেন।

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা সম্পর্কেও মহাশয় আ শু তো ষে র চিন্তা ও কার্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের অধ্যাপক য ম ক মি সো গে ন কে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ও জাপানী মূল অবলম্বনে কতকগুলি ব্যাখ্যান করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যানগুলি "*Systems of Buddhist Thoughts*" এই নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১২)।

তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ উৎসাহের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি তিব্বতী-সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেমন ডক্টর শ্রী অ মু কূ ল চ ন্দ্র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়ে র সম্পাদনায় দণ্ডীর কাব্যাদর্শ (মূল সংস্কৃত ও তাহার তিব্বতী অনুবাদ); শ্রী দু র্গা চ র ণ চ ট্টো পা ধ্যা য়ে র সম্পাদনায় জি তা রি র হে তু ত ত্ত্বো প দে শ (পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত ও তিব্বতী অনুবাদ); ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, ইহার অনেক পূর্বে মহাশয় আ শু তো ষে র চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরো দুইখানি তিব্বতী পুস্তক প্রকাশিত হয়। একখানি ব্যাকরণ, *A Grammar of the Tibetan Language* by H. B. Hanna, 1912), আর অপরখানি অভিধান, (*An English-Tibetan Dictionary* by Lama Dawasamdap Kazi, 1919).

ফরাসী ও জার্মান

ইহা অনেকেরই জানা যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় সংস্কৃতেও ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণের দান সাধারণ নহে। এইজন্য ঐ দুই ভাষা না জানিলে সংস্কৃতের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লাভ করা যায় না এবং তাহা না হইলে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আজ পর্যন্ত গবেষণার সংবাদ রাখিতে পারা যায় না, এবং তাহার অভাবে ঠিক কাজ চলে না। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ঐ দুইটি ভাষার, অন্তত তাহার অন্যতরটির অধ্যয়ন অবশ্যকর্তব্য। ইহাতে একটুও বিলম্ব করা উচিত নহে।

সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্য

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিবেন। সংস্কৃত বিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার জন্য বার্ষিক প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়। সম্প্রতি তো কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু কয়েক জন ছাত্রের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন এই বিভাগে আর কী কাজ হইয়াছে? শিক্ষকগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ অর্থের বিনিময়ে কী দান করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের সেখানে নিয়োগকে সমর্থন করিতে পারা যায়? সংস্কৃত বিভাগ এ পর্যন্ত এমন কি এক পৃষ্ঠাও দিতে পারিয়াছেন যাহা সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে হইতে পারে, যেমন জে ক ব সাহেবের প্রধান উ প নি ষ দ ও ভ গ ব দ্গী তা র শ ব্দ কো শ (*Concordance to the Pricipal Upanishads and Bhagavad Gita*) যাহা কেবল যান্ত্রিক কাজ? ম নি অ র সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ ও সংস্কৃতবিদ্গণের অপরিবর্জনীয় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান (*Sanskrit English Dictionary* by Monier Williams) প্রভৃতির ন্যায় পুস্তকের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। সাধারণে এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতে পারে।

প্রস্তাবিত ও আরব্ধ পুস্তক

কাহারো কাহারো ইহাও জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে যে, দ র্শ ন কো শ বা ভা র তী য় দ র্শ ন ম হা কো শে র কী হইল? ইহার পরিকল্পনা অধ্যাপক শ্রী রা ধা কৃ ষ্ণ ন্ স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষণ সমিতির (Council of the Post Graduate Teaching in Arts) তদানীন্তন অধিনেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে

অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা গৃহীতও হইয়াছিল। ঐ সময়ে অধ্যাপক রা ধা কৃ ষ্ণ ন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন—"যদি সম্পূর্ণ হয়, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে অমর করিয়া রাখিবে।" দুর্ভাগ্যবশত আরম্ভ করিয়াও কিছু দিন পরে ইহা ত্যাগ করা হইয়াছে। কেন?

আরো কয়খানি এইরূপ আরব্ধ উপযোগী গ্রন্থের পরিণাম এই প্রকার হইয়াছে, যথা সা ঙ্খ্য যো গ কো শ ও কা লি দা স কো শ অর্থাৎ কালিদাসের শব্দকোশ ও কালিদাস-অভিধান। এই সমস্ত কাজ চলিতেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ব ও বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রগণের একটি সমিতির পরিচালনায়। ইহার জন্য কোন পারশ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তথাপি ইহাদের কৃত কার্যের পরিমাণ ছিল প্রচুর। বিশেষরূপে ছাত্রেরাই ইহাতে উৎসাহ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এ কার্যও বেশী দূর অগ্রসর হইল না। কেন?

যে কয়টি কাজের উল্লেখ করা হইল যদি সেগুলি বস্তুত করার অনুপযুক্ত বলিয়াই কর্তৃপক্ষের মনে হইয়া থাকে তবে অন্য কোন উপযুক্ত কাজের পরিকল্পনা অনায়াসেই করিতে পারা যাইত, কিন্তু এ পর্যন্ত তো করা হইল না।

আরব্ধ আ শু তো ষ গ্র ন্থ মা লা র সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে কিছু শোনা যাইতেছে না। সংস্কৃত-পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আশা করি এই উভয়ই ঠিক চলিতেছে।

আমরা সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম, যাহাতে এই বিভাগের শিক্ষকগণের নিয়োগকে ন্যায্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারা যাইত। কিন্তু কোন শিক্ষক কোন উপযোগী ও তেমন উপাদেয় গ্রন্থ রচনা না করিলেও যদি তাঁহার অধ্যাপনা অসাধারণ হয় তবে তাঁহার নিয়োগ নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ শিক্ষকের লাভে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে গর্বিত ও গৌরবান্বিত মনে করিবেন। যা স্কে র ভাষায় তাঁহাকে আমরা নি ধি গো প বলিয়া মনে করি। কিন্তু এরূপ অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগে কয় জন?*

অত্যধিক শিক্ষক

যদিও সংস্কৃত বিভাগের পাঠ্যসংক্ষেপে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন নূতন বিষয় যোগ করা হয় নি, তথাপি কিছু দিন হইল, সবেতনে বা বিনা বেতনে কতকগুলি শিক্ষককে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? এই সমস্ত নবনিযুক্ত ও পূর্বনিযুক্ত শিক্ষকগণের এক সঙ্গে পড়াইবার ব্যবস্থার জন্য আরো কতকগুলি নূতন শ্রেণী খুলিবার প্রয়োজন স্বভাবতই তীব্রভাবে অনুভূত হয়, এবং এই জন্য এই বিভাগের চিরাচরিত প্রথাকে হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতি শনিবারেও পূর্ণ ছয় ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়।†

এক সময়ে যখন স্নাতকোত্তর সাহিত্যশিক্ষণ সমিতির অধিনেতা শ্রীযুক্ত শ্যা মা প্র সা দ মু খো পা ধ্যা য় মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, এই বিভাগে সপ্তাহে (অর্থাৎ পাঁচ দিনে) আঠার ঘণ্টা করিয়া পড়ান হইতেছে, তখন তিনি তীব্র ভাষায় নিজের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—"আপনারা কি ছাত্রগুলিকে বধ করিতে চাহেন? আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহারা স্নাতকোত্তর ছাত্র? ইহারা কেবল শিক্ষকেরই নিকটে কোন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবে না। ইহাদিগকে পুস্তকালয়ে নিজে-নিজেও অধ্যয়ন করিতে হইবে। কখন ইহারা ইহা করিবে?" মন্তব্য অনাবশ্যক।

পরিবর্তমান প্রয়োজন

এই বিভাগের বস্তুত প্রয়োজন যে কি তাহা নির্ণয় করা হয় শক্ত, কেননা ইহা সর্বদা পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। কোন পদে নিয়োগের জন্য এক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রার্থিগণকে আবেদন করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু নিয়োগ করা হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের জন্য। কয়েক বৎসর হইতে ইহাই এই বিভাগের ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ইহা সকলেরই জানা। কিন্তু কেন এমন হয়?

কয়েকটি সম্পাদনীয় প্রস্তাব

পূর্বে যে সমস্ত সংস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব হউক বা নাই হউক, কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, বর্তমান অবস্থায়, যখন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের অধ্যাপনার কোন ভেদ নাই তখন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য কেবল সংস্কৃত কলেজেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায় কিনা। যথা: বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক, সাঙ্খ্য-যোগ ও স্মৃতি-মীমাংসা।

এখন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ও বর্তমান বন্ধুগণ ধীর ও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন কিসে ইহার বস্তুত কল্যাণ হয়, এবং তাহাই করুন যাহাতে হয় "বিদ্যার অগ্রগতি" ("Advancement of Learning")। কেননা ইহাই হইতেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।

* ইংরেজীতে সেক্‌সপিয়রের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কীরূপ কাজ হইয়াছে পাঠকেরা মনে করিতে পারেন।

† পরে ছাত্রগণের গুরুতর আপত্তিতে শনিবারে পড়ান ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(দেওয়ান-ই-খাস, আকবর শাহের খাস দরবার। ডান দিকে শূন্য সিংহাসন। আশেপাশে সভাসদগণ। বাঁ-দিকে অপেক্ষাকৃত সামনে যুবরাজ সেলিম ও রাজকবি ফৈজী আসীন।)

ফৈজী। যাই বল, কাল কিন্তু জান্‌কী বাঈ আসর মাত করে দিয়েছিল। একেই বলি নাচ গান। নইলে চেঁচাতে আর হাত পা ছুঁড়তে কচি ছেলেও পারে—কি বল হে শাহজাদা? কিন্তু এত রাত হয়েছিল যে (গা মোড়া-মুড়ি দিয়া) এখনো যেন আমার আলিস্যি ভাঙ্গছে না।

সেলিম। যা' বললে ভাই। দিনকে রাত আর রাতকে দিন করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও আমার যেন আজ চোখ টেনে ধরছে। কিন্তু শাহেন-শার কড়া হুকুম, রোজ এই ইস্কুলে হাজ্‌রে-সই দিতেই হবে; তাই তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে চলে এলুম।

ফৈজী। (ঘড়ি দেখিয়া) খুব যে তাড়াতাড়ি করেছ—তা বলতে পারি নে। জাহাঁপনার আসবার সময় প্রায় হয়ে এল—বারটা বাজে। একে ত কাল শুতে দেরী হ'ল, তার উপর বাকি রাতটুকু কেবলি মাথায় ঘুরতে লাগল:

(গুন্‌ গুন্‌ করিয়া)

গরজত বরষত ভিগত আইলি,

তুঁহারে মিলন কো আপনে প্রেম পিয়রওয়া। (আরে হাঁ) কি সুন্দর গান, আর কি মিষ্টি গলা। কেবল যদি তার সঙ্গে চেহারাটির মিল থাকত! আমাদের জান্‌কী বাঈ একটু পশ্চিমে ঢলেছে—একটু মোটা হয়ে পড়েছে—না সেলিম?

সেলিম। তবু মরা হাতী লাখ টাকা! (হাসিয়া) ভালই হয়েছে, নইলে তেমন তেমন একজন তাজা সুন্দরী যদি সত্যি সত্যি বর্ষারাত্রে আমার দুয়োরগোড়ায় এসে ঐ গানটি গাইত, তা হলে তুমি কি করতে বলতে পারি নে—আমি ত সব ছেড়ে ছুঁড়ে বিবাগী হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তুম।

ফৈজী। তা হলে সে বেচারা যে আশ্রয়ের আশায় এসেছিল তাও পেত না। লাভের মধ্যে দু'জনকেই ভিজতে হ'ত, আর আমাকে করুণস্বরে গাইতে হ'ত:

এ কাঁহা যাতে হো—ভিজোগে।

সুখের বিষয়, গানের নায়িকা আজকালকার দিনে সশরীরে এসে হাজির হয় না। আর এলে তাকে দিয়ে ফেলবার মতও আমার কিছুই নেই—এক আমি নিজে ছাড়া। কিন্তু মেয়েরা উপরি পাওনাটাই কিছু বেশী পছন্দ করে—কি বল হে? ঐখানেই ত তোমাদের জিত—দেবারও যথেষ্ট আছে, নেবারও লোক অনেক। কাজেই আমরা গরীব বেচারারা মনের দুঃখে একলা ঘরে বসে বসে কবিতা লিখি।

সেলিম। অনেক আছে বটে, কিন্তু—লাখে ন মিল্‌ল এক।

(বাদ্যোদ্যম সহকারে আকবর বাদশাহ ও মন্ত্রী বীরবলের প্রবেশ এবং সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদনান্তর স্ব স্ব স্থানে উপবেশন।)

আকবর। বীরবলজী, আজ কি জরুরী আরজি বেশী কিছু আছে? কাল সারাদিন শিকারের পর প্রায় সারারাত নাচগান চলেছে—তার উপর আজ আর স্নানাহারের বেশী বেলা না করাই ভাল। বাদ্‌শাদেরও মাঝে মাঝে বিশ্রাম দরকার।

বীরবল। জাহাঁপনা, অর্থী প্রার্থীর অভাব কোনদিনই হয় না; তবে বেশীর ভাগ আরজি কাল শুনলেও চলতে পারে। কেবল দেওয়ান মাধব রাও কাবুল থেকে যে জরুরী চিঠি আর খাজনা পাঠিয়েছেন, সেগুলির ব্যবস্থা আজই করা বিশেষ আবশ্যক।

আকবর। সে চিঠি পড়ে দেখেছ কি? কাল পর্য্যন্ত তার জবাব অপেক্ষা করতে পারে না?

বীরবল। আজ্ঞে না, খোদাবন্দ্‌; চিঠির সঙ্গে কিছু জীবন্ত মালও পাঠিয়েছেন, যাকে ঠিক খাজনার সঙ্গে তোশা-খানায় চালান দেওয়া যায় না।

আকবর। কি রকম মাল? মানুষ না জন্তু? পোষা না বুনো?

বীরবল। হুজুর, মানুষও বটে, জন্তুও বটে—অর্থাৎ নারী। তবে একে যুবতী, তায় সুন্দরী—সুতরাং পোষ মানবে কি না, তা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক বলতে পারি নে।

আকবর। বল কি বীরবল? তা এতক্ষণ তুমি এ কথা আমাকে বল নি কেন? তাকে কি তুমি দেখেছ? তাকে কোথায় রেখেছ?

বীরবল। জাহাঁপনা, আপনার কাছে যে যা পাঠায়, সবই ত আগে আমার কাছে পেশ হয়ে তবে আপনার

দরবারে পৌছোয়। এ মেয়েটিকেও আমি দেখেছি। আর আমার এই বুড়ো চোখের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয় ত সে অপূর্ব্ব সুন্দরী—তেমন সুন্দরী ইতিপূর্ব্বে কখনও দিল্লী সহরে এসেছে কিনা সন্দেহ। আপনার হুকুমের অপেক্ষায় তাদের অন্দর মহলের সর্দ্দার সাহেবের জিম্মেয় রেখে এসেছি। এখন হুজুরের কি আজ্ঞা হয়?

(সভাস্থলে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ)

আকবর। তার সঙ্গে আর কে কে আছে? পাঠাবার উদ্দেশ্য মাধব রাও কিছু লিখেছেন?

বীরবল। লিখেছেন কাবুলের সহর-কোতোয়াল, আর এক জন সখীসহ মুন্সী মুহিউদ্দিনের কন্যাকে তিনি দিল্লী দেখতে পাঠাচ্ছেন; তাকে আপনার অন্দরমহলে বেগম-সাহিবারা কৃপাদৃষ্টিতে রাখলে তাঁরা সুখী হবেন, আর আপনিও তাকে দেখে খুশি হবেন।

আকবর। তাদের তিন জনকেই তবে দরবারে ডেকে পাঠাও। দেখছ না তোমার কথা শুনে সবাই অধীর হয়ে পড়েছে—মেয়েরা হিংসায়, আর পুরুষরা আনন্দে।

(বীরবলের প্রস্থান)

সেলিম। জাহাঁপনা, চাঁদ উঠলে যে সমুদ্রের ঢেউ চঞ্চল হয়ে উঠবে, এটাও ত স্বাভাবিক।

আকবর। আর চাঁদ উঠলে যে তারার দল ম্লান হয়ে পড়বে, এটাও ত স্বাভাবিক।

ফৈজী। শাহেন-শা সূর্য্যের মত চাঁদ তারা সকলকেই আপনার জ্যোতির অংশ বিতরণ করে তাদের স্ব স্ব কক্ষে চালিয়ে ও জ্বালিয়ে রেখেছেন।

আকবর। সাবাস ফৈজী, কথাটা বেশ ঘুরিয়ে নিয়েছ, নইলে আর কিসের সভাকবি? কথার জাল ফেলে মানুষ ধরাই ত তোমাদের পেশা। দেখ আবার নতুন আলোর ঝিলিক্ লেগে তোমার মনের মধ্যে নতুন কোন্ ভাবের ফোয়ারা খুলে যায়। কল্পনাকেও মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া চাই ত? নইলে রোজ যে সুন্দর মুখ দেখা যায়, নিত্য কি তাতে নেশা ধরে?

ফৈজী। হুজুর ঠিক কথাই বলেছেন। আপনার মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞান যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর।

আগে বীরবল, পরে লাল পেশোয়াজ-ওড়না পরিহিতা আয়েষা, পরে সবুজ পেশোয়াজ-ওড়না পরিহিতা রোশেনারা, শেষে ইলাহী বক্সের প্রবেশ। যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে আকবরের সামনে শেষোক্ত তিন জনে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। সেলিমের সামনে দিয়া যাইবার সময় আয়েষা মুহূর্ত্তকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দুই জনে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্যুৎকটাক্ষ হানিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না।)

(সভাস্থলের আলোড়ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল)।

আকবর। আমার প্রিয় সুহৃৎ মাধব রাওয়ের পত্রের মর্ম্ম অবগত হলুম। তোমাদের সকলকে দেখেও অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলুম। পথে নির্ব্বিঘ্নে এসেছ ত? কাবুল-রাজ্যের সব কুশল ত?

ইলাহী। (সেলামপূর্ব্বক) হুজুরের রাজ্য সর্ব্বত্রই নিরাপদ। দিনকতক হ'ল লাণ্ডিকোটাল থেকে একদল দস্যু কাবুল আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু বেটাদের আমরা এমনি শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে, সারা পথ আর কোন উপদ্রব করতে সাহস করে নি।

আকবর। সাবাস এই ত চাই। মাধব রাওয়ের যোগ্য হস্তে শাসন ভার দেওয়া অবধি দুর্দ্দান্ত সীমান্তপ্রদেশ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত আছি। কেবল নিয়মিত সময়ে নিয়মিত খাজনাটি আসে, আর কখনও কখনও সেই সঙ্গে কিছু উপরিলাভও হয়—যেমন আজ। বিবিজী, তোমরা বসো, কোন ভয় নেই। (উহারা বসিলে রোশেনারাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক)—তোমাকে যেন ইতিপূর্ব্বে দেখেছি মনে হচ্ছে?

রোশেনারা। (করজোড়ে) জাহাঁপনা, তিন বৎসর আগে নওরোজের কয় দিন আমি দিল্লীতে এসে বেগম যোধবাঈ সাহিবার মহলে ছিলুম। তাঁদের আদর যত্ন আর সে সময়ের উৎসব-আনন্দ আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

আকবর। তোমার সখীও সে আনন্দে বঞ্চিত হবেন না। আর তিনিও আশা করি, মাঝে মাঝে আমাদের দেখা দেবেন। তাঁকে দেখাই যে নয়নের এক উৎসব। বোধ হয় মনোরঞ্জনের বিদ্যাও তাঁর কিছু কিছু জানা আছে?

রোশেনারা। হুজুর, আমাদের গরীব কাবুল সহরে আপনাদের রাজধানীর বিলাসকলার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র কদাচ পৌছোয়। তবু আয়েষার গলা স্বভাবতঃ মিষ্টি বলে মুন্সীজী সাধ্যমত তাকে নিজে গান শিখিয়েছেন; আর দেওয়ানজীর বাড়ীর নাচের মজ্‌লিশে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তাই দেখে সে একটু আধটু বা শিখেছে।

আকবর। বিবিজীর নাম তবে আয়েষা? তোমার নাম ত মনে হচ্ছে রোশেনারা।

ফৈজী। (জোড়হস্তে)—গোস্তাকি মাফ করেন ত বলি খোদাবন্দ্, যে, এঁর নাম হওয়া উচিত ছিল আনারকলি। কেননা আনারের মতই এঁর গালেস,

ঠোঁটের, কাপড়ের রং ও রূপ, আনার কলির মতই ইনি লাজুক, নরম ও নবীন।

আকবর। (সহাস্যে)—তা বেশ ত, নতুন জায়গায় এসে ওঁর নতুন নামকরণ হোক, অবশ্য যদি ওঁর তাতে কোন আপত্তি না থাকে। কি বল বিবিজী? আনারকলি নামটিও বড় মিষ্টি, আর সত্যিই ঠিক তোমার সঙ্গে খাপ খায়। দেখ, তোমাকে দেখে আমাদের সভাকবির ভাবের উচ্ছ্বাস এরই মধ্যে উথলে উঠেছে।

ফৈজী। শুধু আমার একলার কেন হুজুর, ওঁর শুভাগমনে ফুলদানির ফুলসুদ্ধ তাজা হয়ে উঠেছে, ঘরের আলোর রোশনাই বেড়ে গেছে, আর বাতাসে সুবাস ভেসে আসছে। মানুষের মনের কথা আর কি বলব?

আকবর। ধীরে বন্ধু ধীরে, একেবারে অমন করে সব কবিতার মধু উজাড় করে ঢেলে দিও না। রোস, আগে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হোক। আনারকলি, তোমার নৃত্যগীতের একটু নমুনা পাব, এমন সৌভাগ্য কি আমাদের আজ হবে? না পথশ্রমে এখনও ক্লান্ত হয়ে রয়েছ?

আনারকলি। (উঠিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক)—হুজুরের দুর্লভ দর্শনেই আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে, আর আপনার ইচ্ছামাত্রই আমাদের পক্ষে মহা মান্য আদেশ। কিন্তু আপনাদের এই বিখ্যাত শহরের আমীর ওমরাহের চিত্তবিনোদন করতে পারি, এমন কোন শিক্ষাই আমি পাই নি। পাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়, সেই আমার ভয়।

আকবর। কোন ভয় নেই, আনারকলি, সুন্দরের সর্ব্বত্রই জয়। রোশেনারা, তোমার সখীকে অভয় দান কর। আর দেখ সেলিম, খাঁ সাহেবের কাছ থেকে বাঁয়া তবলা ও ঘুঙুর আনতে পাঠাও।

(সেলিম চোপদারকে হুকুম দিতে উঠিয়া গেল, পরে এমন স্থানে আসিয়া বসিল, যেখান হইতে আনারকলিকে ভাল করিয়া দেখা যায়।)

রোশেনারা। (জনান্তিকে)—আয়েষা, মনের জোর কর, দেখ যেন দিল্লীর কাছে কাবুলের মাথা নীচু না হয়। বাড়ীতে বাপমায়ের কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে নাচগান করতে, সেই ভাব মনে আনবার চেষ্টা কর।

আনারকলি। (ঘুঙুর পরিতে পরিতে) সেই চেষ্টাই ত করছি, কিন্তু এরা বাপ মায়ের দেওয়া নামটা পর্য্যন্ত যখন ভুলিয়ে দিলে, তখন মাথার ঠিক রাখা মুশকিল। যাক, যা জানি তাই ত করি, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।

(ফুলদানি হইতে একটি লাল গোলাপ তুলিয়া লইয়া নাচ ও গান)

সাকি লিয়ে সাগরে মুশকো বু হৈ,
কিসি মুগ্ধকী আনে কি আরজু হৈ।
গুলেস্তাঁ সে যাকে হর্ গুল কো দেখাওয়ে,
ন তেরে এ্যয়সে রঙ, ন তেরে এ্যয়সে বু হৈ।

(নৃত্য অন্তে আনারকলি বাদশাহকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সামনে জোড়হস্তে দাঁড়াইলে পর কিছুক্ষণ সভাগৃহ নিস্তব্ধ রহিল, পরে বাহবা ধ্বনির চোটে ভাঙিয়া পড়িল)

আকবর। আনারকলি, তুমি শুধু ওস্তাদী ঢঙ্ই শেখ নি, তাদের ছলাকলাও কিছু কিছু শিখেছ, নইলে এই সুন্দর নাচ দেখাতে এত বিনয় করছিলে? তোমার নাচের ভঙ্গীতে এখনও ছেলেমানুষি ভাব আছে, সেটা ভালই লাগে। কিন্তু জানকী বাঈয়ের কাছে আর বছরখানেক তালিম দিলে পর তুমি তাকেও হারিয়ে দেবে, তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। আজ তুমি আমাদের যে আনন্দ দিলে, তার বকশিশ স্বরূপ এই চুণীর কণ্ঠি আর এই পান নাও, লালে লাল মিলবে ভাল।

ইন্ লবে নাজুক পে সুবুখি পানকি আনে ত.দেও।
কৌড়ি কৌড়ি বিকে যাবে বুদক্সাঁকে চুণি॥

এখন যাও বিশ্রাম করগে। নইলে বাদশাসুদ্ধ কবি বনে গেলে রাজকার্য্য চলা দায় হবে। মেহের উন্নিসা, যোধবাঈ সাহিবার কাছে মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে তাঁকে বলো যে আমি পরে গিয়ে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। কোতোয়াল সাহেবেরও অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিও।

(একজন বর্ষীয়সী রমণীর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নভাবে আয়েষাদের লইয়া প্রস্থান।)

এবার তবে আমরা সভাভঙ্গ করি। বেলা যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু যে কারণে শীঘ্র ছুটি পেলুম না, তাতে বোধ হয় কারোই আপত্তি হয় নি।

(দলবলসহ প্রস্থান। ক্রমে ক্রমে সভাভঙ্গ।)

ফৈজী। কি শাহাজাদা, এত গোলমাল সোর সরাবতের মধ্যে তুমি চুপ করে রইলে যে? কেমন দেখলে বল; মনে ধরে?

সেলিম। (আবিষ্টভাবে)—আমার গানের নায়িকা সশরীরে দেখা দিয়েছেন, আজ আমি ধন্য। (আনারকলির হস্তচ্যুত গোলাপ কুড়াইয়া লইলেন।)

ফৈজী। আমাকে যা বলেছ বলেছ, অপরের কাছে কিন্তু এ রকম মনের কথা বেশী বলো না। জান ত দিল্লী

শহরে "প্রেম কি করানা সহেল বড়ানা" নয়। বাড়াবাড়ি করলে সশরীরে অন্যত্র যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

(হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য

(জ্যোৎস্নালোকিত অন্তঃপুর—উদ্যানের নিরালা স্থানে শ্বেত পাথরের ফোয়ারা। দূরে সানাইয়ে মৃদুস্বরে বেহাগ রাগিণী বাজিতেছে। এক দিক থেকে সেলিম, অপর দিক থেকে মেহের উন্নিসার প্রবেশ, এবং মূকাভিনয়ে প্রকাশ যেন সেলিম তাহাকে বলিতেছে প্রাসাদ হইতে কাহাকে সেখানে ডাকিয়া আনিতে; সে যেন প্রথমে নারাজী ভাব দেখাইল, পরে সেলিমের গলার স্বর্ণহারের প্রলোভন দেখাইবার পর নিমরাজীভাবে চলিয়া গেল। সেলিম ওঠা বসা, থমকিয়া দাঁড়ানো, পায়চারি করা প্রভৃতি নানারূপে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল, পরে—)

সেলিম। (বসিয়া পড়িয়া)—সে কি মনে করবে? সে কি আসবে? সে কি ভালবাসবে? (গুন গুন করিয়া গান)

বেহাগখাম্বাজ

আওয়ে বলমরাজ
বিন দেখে নহি পড়ত চৈন
সাগরি রয়ন মোহে তড়পত গুজরি,
পলক ন লাগি সারি রাত।
চাঁদ পিয়া বিন নিঁদ ন আওয়ে.
চুক পড়ি জনি তরসাঁউ।

(আবার উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে)—এমন অধীর আমি ত আর কখনো হই নি। এ কি নূতনের মোহ, না রূপের নেশা, না প্রথম প্রেমের কুহক-মায়া? যে শাহাজাদার একটি কৃপাকটাক্ষলাভের জন্য শত শত রমণী ভিখারিণী; সে কি না একজন সামান্য প্রজার মত একটি অপরিচিতা বালিকার প্রতীক্ষায় দীনভাবে দণ্ডায়মান। যার দর্শন-মাত্রেই আমি এমন আত্মহারা হয়েছি, সে কি আমার এ প্রেমের প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারবে?

(দূরে মেহের-উন্নিসার সঙ্গে আনারকলিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেলিম এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। মেহের উন্নিসা চুপি চুপি কি বলিয়া মাঝপথ হইতে ফিরিয়া গেল। আনারকলি একলা একটু অগ্রসর হইতেই সেলিমকে দেখিয়া সলজ্জভাবে গমনোদ্যত হইল।)

সেলিম। (অগ্রসর হইয়া গান)

ঠাড়ি রহে মেরে আঁখন আগে

(আনারকলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল)

সেলিম। আনারকলি, জান আমি কে?

আনার। (কম্পিত কণ্ঠে) জানি। শাহাজাদা।

সেলিম। এস, আমরা দু'জনে এখানে বসি। (তথা-করণ)। তোমাকে ডেকে এনেছি বলে ভয় করছে?

আনার। (অপেক্ষাকৃত ভরসাসহ) আফগান-রমণী ভয় কাকে বলে জানে না।

সেলিম। কাল নাচের আগে ভয় করে নি?

আনার। কাল ছিলুম বালিকা। আজ আমি রমণী।

সেলিম। এ পরিবর্ত্তন হঠাৎ কিসে হ'ল? কি করে বুঝলে?

আনার। কিসে হ'ল জানি নে; কিন্তু মনে বুঝছি, প্রাণে বুঝছি; সারা দেহে, সারা দুনিয়ায় বুঝছি।

সেলিম। তোমার কথা যেন আমার কানে গানের মত লাগছে। ঐ কথাই গান গেয়ে বলতে পার?

আনার। পারি, কিন্তু লজ্জা করে।

সেলিম। কিসের লজ্জা? এখানে আমি আর এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ছাড়া কেউ তোমার মনের কথা শুনতে পাবে না। তুমি নির্ভয়ে গাও, আমিও নিঃশব্দে শুনি।

আনার। (গান)

আজি হরষ সরসে কি জোয়ারা
প্রাণমে না মিলত কূল কিনারা।
গাও গাও সখি গৌরবগীত,
লীলাচপল রাগ ললিত ললিত।
কোকিল পঞ্চম করুণ কানাড়া,
গাও গাও মৃদু মধুর মল্লারা।
সরম কি বন্ধন খোলহ খোল,
মরম কি পাল তোলহ তোল,
প্রেমপবনমে ছোড়হু তরণী,
ভাসি চলি আও প্রাণমে হমারা।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ পরে) আনারকলি!

আনার। হুজুর!

সেলিম। তোমার কাছে আমি হুজুর নই, শুধু সেলিম। তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

আনার। মা বাপ ভাই বন্ধু—সকলেই আছেন।

সেলিম। বন্ধু ছাড়া, বন্ধুর বাড়া কেউ নেই?

আনার। আজ্ঞে না, হুজুর!

সেলিম। আবার হুজুর? বল সেলিম!

আনার। আর কেউ নেই, সেলিম সাহেব।

সেলিম। তুমি বলতে চাও তোমাদের দেশে এমন কোন ভাগ্যবান বীরপুরুষ নেই যার জিম্মায় তোমার হৃদয়খানি রেখে এসেছ?

আনার। আমার হৃদয় পিছিয়ে পড়ে নেই, তাকে আমার দূতস্বরূপ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি হজুর—সেলিম।

সেলিম। (হাসিয়া) তবে তুমি হৃদয়হীন?

আনার। (হাসিয়া) আমার এক সখী বলতেন, হৃদয়ের বদলে আমার বুকে একটা পাথর বসানো আছে।

সেলিম। পাথরও ত দামী হয়।

আনার। আমরা গরীব মানুষ, দামী পাথরের কি বুঝি?

সেলিম। যদি আমি বুঝিয়ে দিই? দেখি তোমার হাত (হাত বাড়াইয়া)।

আনার। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের কি সম্বন্ধ?

সেলিম। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেখই না পরীক্ষা করে।

(আনার তাহার হাতে হাত রাখিলে সেলিম নিজের আঙুল হইতে খুলিয়া চুণীর আংটি পরাইয়া) এই আংটি যখনি দেখবে, তখনি আমাকে মনে পড়বে। এখন সম্বন্ধটা বুঝলে ত?

আনার। বুঝলুম। কিন্তু আমার কোন স্মরণচিহ্নের দরকার নেই।

সেলিম। আনার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

আনার। আদেশ করুন।

সেলিম। তোমার হৃদয়-দূত কি নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়েছিল, না এই আংটির মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলে?

আনার। (নিরুত্তর)

সেলিম। তুমি ত তাকে কখনো দেখ নি; চিনলে কি করে?

আনার। ছবিতে দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি।

সেলিম। স্বপ্ন ভাল, না সত্য ভাল?

আনার। এক এক সময় মনে হয় আমার স্বপ্নই ভাল ছিল; কেননা তার সঙ্গে ছিল আশা।

সেলিম। আর সত্যের সঙ্গে কি আছে?

আনার। হয় দুরাশা, কিংবা নিরাশা, কে জানে!

সেলিম। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না, আনার আমার?

আনার। তোমাকে বিশ্বাস করেই ত বাপ মা, বাড়ী-ঘর, দেশ সব এক মুহূর্ত্তে ফেলে চলে এসেছি।

সেলিম। তবে কাকে সন্দেহ কর?

আনার। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদভরা লোক, এই প্রচণ্ড রাজদণ্ড, এই গোপন মন্ত্রণা, সবকিছুকেই।

সেলিম। তুমি এরই মধ্যে রাজপ্রাসাদের কি কুটিলতা জটিলতা দেখলে বল ত? তোমাকে কি কেউ অনাদর করেছে? তোমাকে কি কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারে?

আনার। না, আমাকে কেউ কিছু বলে নি। আর বেগম সাহিবাও আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেন। আমি খুব সুখেই আছি। কিন্তু এখানকার দেওয়ালগুলোসুদ্ধ যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়, এখানকার মানুষের মুখের হাসি-কথা আমাদের দেশের সরল হাসিকথা নয়, সেটুকু এক-দিনেই বুঝতে পেরেছি।

সেলিম। তবে তুমি সত্যই বালিকা নও। কিন্তু আনার, আমিও বালক নই। এই আংটি পরিয়ে তোমার হাতে হাত রেখে শপথ করে বলছি—

আনার। সেলিম, শপথে কাজ কি? আজ থাক্, আর একদিন হবে। আজ আমার জীবনের সর্ব্বপ্রথম পর্ব্বদিন, আজ কেবল আশা, কেবল আনন্দ, কেবল প্রেমের কথাই হোক্। হয়ত বেশী কথা বলবার সময় পাওয়া যাবে না। আজ আমার মনে হচ্ছে; অগর্ বেহস্ত অন্দর জমীনস্ত্ হমিনস্ত ও হমিনস্ত ও হমিনস্ত।

সেলিম। তবে বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করে আর একটা গান গাও, আমার বেহস্তের হুরী।

আনার। কি গাইব? তোমাদের সর্ব্বদা মজ্‌লিশী গান শোনা অভ্যাস; আমাদের পাহাড়ী গান কি তার মত হবে?

সেলিম। তার মত নয় বলেই ত শুনতে এত ভাল-বাসি। তোমাদের দেশের গজল গাও। কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দাও যে আমি দিল্লীর শাহাজাদা, যে আমার সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, জীবনের প্রত্যেক কাজের উপর সহস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ—যে আমার ভবিষ্যৎ গ্রাস করবার জন্য শূন্য সিংহাসহ হাঁ করে রয়েছে!

আনার। গান

কেয়ামুশ্কিলে দিল হারে, সনম জানে কি হাম জানে।
যিছি হায় ইশ্‌কি চৌসার, লগি হায় জানকি বাজি,
পড়া হায় চশম্‌কা পাশা, সনম জানে কি হাম জানে।
লগি হায় ইশ্‌কি বৈড়হি, দিলুঁ মৈ ইয়ারে কেঁউকর্।
কলিজা হায় জ্বল্‌তা হায়, সনম জানে কি হাম জানে।
ইধর পানি বরষতা হায়, উধর্ বিজলী চমকৃতি হায়,
এ কেলি দম্ উলজ্‌তা হায়, সনম জানে কি হাম জানে।

(দূর হইতে মেহের-উন্নিসা একটু গলায় ইঙ্গিত করিল)

সেলিম। (হাসিয়া) এরই মধ্যে অন্দরের দূতী এসে হাজির? যাও তবে। কিন্তু যাবার আগে আমার আংটির বদলে তোমার মাথার ঐ গোলাপ ফুলটি আমায় দিয়ে যাও আনার (আনারের তথাকরণ)—আর শপথ করে বলে

যাও যে তুমি রোজ ঠিক এই সময়ে এই ফোয়ারার কাছে এসে আমার জন্যে বসে থাকবে। আসবে ত নিশ্চয় আনার—আমার!

আনার। হাঁ, আসব নিশ্চয় সেলিম—সনম্!

(ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান)।

৩য় দৃশ্য

(বেগম যোধবাঈয়ের মহল। উপযুক্ত গৃহসজ্জা, মহামূল্য আস্তরণাদি। আনারকলি তাঁহার পদসেবা করিতেছে। সামনের দিকে রোশেনারা একদল মেয়ের সহিত ফুলের মালা গাঁথিতেছে। অন্য একদল জরির কাজ করিতেছে।)

যোধবাঈ। থাক আনারকলি, হয়েছে। সেই কখন থেকে পায়ে হাত বুলোচ্ছ, হাত ব্যথা হয়ে যাবে যে! তোমার হাতটি কিন্তু বেশ নরম, গায়ে দিলে আরাম হয়। যাও ওদের সঙ্গে না হয় ফুলের মালা গাঁথ গে।

আনার। (উঠিয়া রোশেনারার কাছে গিয়া)—তোরা কি করছিস ভাই?

রোশেনারা। এই এরা বলছে, আমাদের দেশের মত করে মালা গাঁথতে, কিন্তু আমার ঠিক হচ্ছে না। তোর মনে আছে ভাই?

আনার। আছে বই কি। আমাদের নানা রকম বিনি সুতোর হার করে। দেখি?

প্রথমা। তোদের দেশে কি সুতো পাওয়া যায় না? তবে সেলাই কিসে হয়?

আনার। হ্যাঁ, এক রকম মোটা রঙীন সুতো তৈরি হয়, তাই দিয়েই সব কাজ চলে।

দ্বিতীয়া। শুনলি ভাই, ওরা নাকি শুধু সুতো দিয়েই সেলাই করে। (হাসিয়া) কেন, সেখানে বুঝি জরি টরি তৈরি হয় না?

আনার। আমাদের গরীব দেশে জরি করেই বা কে, পরেই বা কে? তাই ত তোমাদের কাছে জরির কাজ শিখতে এসেছি।

দ্বিতীয়া। সেদিন যেরকম সেজেগুজে খাস দরবারে নাচলে গাইলে, তাতে শিক্ষার কিছু বাকি আছে বলে ত বোধ হয় না, কি বল জয়নাব?

প্রথমা। হ্যাঁ, আমাদের লজ্জাশিক্ষা পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ হয়, কাজেই চিরজীবন সেটা মনে থাকে। তবে ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রথা।

তৃতীয়া। কিন্তু যাই বল ভাই, মেয়েমানুষের একটু লজ্জাসরম থাকা ভাল। পুরুষ মানুষের সামনে ঐ বেহায়াপনাগুলো আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি নে।

রোশেনারা। কেন, কিসে তোমরা আমাদের এত নির্লজ্জ ঠাওরালে বল ত?

তৃতীয়া। তোমাকে ত কিছু বলছি নে বোন। তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন?

আনার। (ক্ষুব্ধভাবে)—কি করব, শাহেন্‌শা আদেশ করলেন, কাজেই যা জানি তাই করতে হ'ল।

দ্বিতীয়া। আহাহা যেন কচি খুকীটি! তবে মায়ের কোল ছেড়ে এত দূরে এলে কেন? আমরা কিন্তু ভাই অমন কলের পুতুল নই, যে দম দিলেই ঘুরব। তার চেয়ে আসল কথাটা বলেই ফেল না কেন, একঘর পুরুষ মানুষের সামনে রূপের ঠমক দেখাবার লোভ সামলাতে পারে নি?

প্রথমা। আঃ, কেন ভাই ছেলেমানুষকে জ্বালাতন করিস? এখনি গিয়ে বেগমসাহিবার কানে কথাটা তুলে দিয়ে সকলকে বকুনি খাওয়াবে 'খন।

আনার। (উঠিয়া সেলায়ের দলের কাছে গিয়া)—আমাকে জরির কাজ শেখাবে ভাই?

এক জন। আর শিখে কাজ নেই, যা বিদ্যে আছে তাই যথেষ্ট! এম্‌নিতেই বলে রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তার উপর—

আনার। (হাসিয়া)—আমার আবার দেমাক দেখলে কিসে?

অপরা। কেন, সারাদিনই ত আয়নায় মুখ দেখছ, দেখতে পাই। আমরা ত আর চোখ বুজে থাকি নে, কানও খোলা রাখি। তবে মুখটা বন্ধ রাখাই ভাল।—বড়লোকের কথায় গরীবের কাজ কি?

আনার। তোমাদের যে ভাই চারিদিকেই আয়না, মুখ না দেখে উপায় কি বল? ক্রমাগত নিজের ছায়া দেখতে দেখতে এক এক বার যেন আমার বিরক্ত ধরে যায় সত্যি!

প্রথম জন। দেখ আনারকলি, তোমার ভালর জন্যই বলছি; তুমি নতুন এসেছ, কিছু জান না, তাই মান না। আমাদের দেখতে ত কিছু বাকি নেই; অমন কত এসেছে, কত গেছে, কিন্তু আমরা রয়েই গেছি। সাবধান হয়ে চলো, নইলে মহা বিপদে পড়বে।

(আনারকলি অস্থিরভাবে এক কোণে একলা গিয়া বসিল। সাকিনা বেগমের প্রবেশ)

যোধবাঈ। এই যে সাকিনা, এস আমার কাছে এইখানে বস। (তথাকরণ) তোমাদের সেই বাঁদীটার

অবশেষে কি হ'ল বল দেখি? এই গোলকধাঁধার মধ্যে কেন যে ঐ কচি কচি সুন্দর মেয়েগুলোকে পাঠায়, তাই ভাবি। আমরাই বা কতদিকে নজর রাখি বল?

(আনারকলির উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ)

সাকিনা। আর হবে কি দিদি,—যা হয়ে থাকে, তাই। আজ সকালে সর্দ্দারনী তাকে ডাকতে গিয়ে দেখে, সে কাঠ হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। মেয়েটা মরে বাঁচল; নইলে তার কপালে আরও কত লাঞ্ছনাভোগ ছিল, তা কে বলতে পারে? তার বুড়ো বাপ মা ভোরবেলা থেকে অন্দরমহলের খিড়কি-দুয়োরে এসে এমন কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে, সারাদিন মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে তাই তোমার কাছে একটু বেড়াতে এলুম। (আনারকলিকে দেখিয়া) এটি যে নতুন মুখ দেখছি?

যোধবাঈ। হ্যাঁ, কাবুল থেকে দেওয়ান মাধব রাও ওকে দিল্লী দেখতে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি সুশীলা বলেই ত বোধ হয়। ওর উপর আমাদের কৃপাদৃষ্টি রাখতে তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।

সাকিনা। তা ত রাখব দিদি, কিন্তু দৃষ্টি যে অনেক রকমের আছে। ও দিল্লী দেখবে, না দিল্লী ওকে দেখবে, তাই ভাবছি। (হাসিয়া) যে দেখবে সেও পস্তাবে, যে না দেখবে সেও পস্তাবে।

যোধবাঈ। (হাসিয়া) ঠিক বলেছ ভাই। রূপ বড় জালা। যেমন জলে, তেমনি জ্বালায়। আমার এ আবার এক কাঁটা হয়েছে। এখন মা-বাপের গচ্ছিত ধন মা-বাপের হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। আনারকলি!

আনারকলি। (কাছে আসিয়া) জী হুজুর।

যোধবাঈ। ইনি আমার বোন সাকিনা বেগম, আদাব কর। (তথাকরণ)

সাকিনা। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনি মিষ্টি মুখ।

যোধবাঈ। নামটি আমাদের দেওয়া, কিন্তু মুখটি ওর পৈতৃক সম্পত্তি।

সাকিনা। আর কিছু সম্পত্তি আছে?

যোধবাঈ। বোধ হয় না। সে খোঁজ নেবার দরকারও নেই। তবে অনেক গুণ আছে; বেশ নাচতে গাইতে পারে।

সাকিনা। সত্যি নাকি? কৈ, আমাকে একটি গান গেয়ে শোনাও দেখি?

আনার। হুজুরাণীর মেহেরবাণী।

গান

জরা ওয়াসল্ পর্ হো ইসারা তোমারা,
অভি ফয়স্‌লা মামলা হমারা তোমারা।
গুনি হৈ আওর কিসীকে চাত্তে হ'
ও হুশ্‌ন্রন হমারা পেয়ারা তোমারা।

সাকিনা। আহা, গলাটিও যেন মধুঢালা। এরকম গান সারারাত বসে শোনা যায়। আশীর্ব্বাদ করি যেন এমন বরের হাতে পড়, যে আমারই মত গান শুনতে ভালবাসে। কিন্তু এখানে কাউকে যেন ইসারা টিশারা করো না, বুঝলে? তা হলে তুমিও বিপদে পড়বে, আর আমরাও লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, কি বল দিদি?

যোধবাঈ। বয়সটা যে বড় খারাপ সাকিনা, হাজার বোঝালেও বোঝে কৈ? ও জয়নাব, আজ সন্ধ্যাটা কি এই রকম চুপচাপ ভাবেই কাটিয়ে দিবি? নাচগান কিছু হবে না? কাবুলের কাছে দিল্লীকে হার মানতে হবে নাকি?

জয়নাব। আমরা ত হেরেই আছি; সেকথা পাঁচজনের কাছে জাহির করে, লাভ কি?

যোধবাঈ। অমনি তোদের অভিমান হ'ল বুঝি? ছিঃ; ওরা দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, ওদের সঙ্গে কোথায় তোরা খুশিমনে মিলে মিশে আমোদ আহ্লাদ করবি, না রেষারেষি রাগারাগি করছিস? নে, তোদের মালাগাঁথা ফুলতোলা রেখে, সেদিন মীরাবাঈয়ের যে নতুন গানটা শিখলি, সবাই মিলে একবার ভাও বাৎলে গা' দেখি? যতই দরবারী ওস্তাদী গান হোক না কেন, আমার কানে ভজনের মত অমন মিষ্টি আর কিছুই লাগে না, তা বলছি বাপু। গা' তোরা।

মেয়েরা সমস্বরে।

গান

শুনি ময় হরি আওন কি আওয়াজ।
মহল চড়ি চড়ি যাঁউ মোরে সজনী, কব্ আওয়ে মহারাজ।
দাছুর মোর পপিহা বোলৈ,
কোয়েলা মধুরে সাজ।
বরখে মেহরওয়া, মেহা বোলৈ,
দামিন্ ছোড়ি লাজ।
ধরতি রূপা নওবা নওয়া ধরিয়া,
পিয়া মিলনকি কাজ।
মীরা কি চিত্ত ধীরা ন মানে,
বেগি আয়ো মহারাজ।

৮র্থ দৃশ্য

(দেওয়ান-ই-আম, আকবর শাহের আম দরবার; আকবর ও বীরবল আসীন। দরবারগৃহ বিশেষ উৎসব-

সজ্জায় সজ্জিত। কিংখাব ও মখমলের আস্তরণ এবং পর্দা, পারস্য দেশের গালিচা, বোখারার পট্টবস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ খচিত পাত্র, ফুল এবং আতর গোলাপজলের ছড়াছড়ি, ছয়লাপ।)

আকবর। কি বীরবলজী, এমন আনন্দ-সন্ধ্যায় তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? ঘরে কিছু তকরার হয়েছে না কি? বল ত আমি মিটিয়ে ফেলি।

বীরবল। জাঁহাপনা, ঘরে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে আমার ঘরে নয়, আপনার ঘরে। কাজেই ভাবনাটা আমার কিছু বেশী।

আকবর। আমারই ঘরে গোলযোগ, অথচ আমি সে বিষয় কিছু জানবার আগেই তুমি জেনেছ—এ কি কখনও হতে পারে মন্ত্রীজী? আমি কি এতই অন্ধ, এতই অলস, এমনই বিলাসী?

বীরবল। শাহেনশার কর্ম্মকুশলতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। কিন্তু অনেক সময় বাইরের বড় বড় জিনিষ দেখতে দেখতে ঘরের ছোটখাটো জিনিষ চোখে পড়ে না। সেই জন্যই ঘরের ভার পুরুষরা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে।

আকবর। (ব্যস্তভাবে) কৈ, যোধবাঈ আমাকে সম্প্রতি কোন দুঃসংবাদ দিয়েছেন বলে ত মনে করতে পারছি নে?

বীরবল। খোদাবন্দ্, মেয়েরা মেয়েদের উপর দৃষ্টি রাখবার যত সুবিধে পান, বড় বড় ছেলেদের উপর—

আকবর। বড় ছেলে? তবে কি সেলিম কোন গোলমাল করেছে বলতে চাও? হতেই পারে না! সেলিম আমার সেরকম ছেলেই নয়; তার উপর আমিও তাকে কড়া রাশে মানুষ করেছি।

বীরবল। হুজুর, রাশ হাজার কড়া হলেও তেমন তেমন তেজী ঘোড়াকে সব সময়ে বাগ মানাতে পারে না। মনে রাখবেন, শাহাজাদা আর এখন বালক নয়।

আকবর। বালক ভিন্ন আর তাকে কি বলব বল? সারাদিন ত বাইরে বাইরে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে থাকে, বিষয়কর্ম্মে মোটে মন দেওয়াতে পারি নে। যেন ইস্কুল পালাতে পারলে বাঁচে। তার পর সেদিন পারস্য-রাজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ এসেছিল, সে একবার মেয়েটিকে দেখতে যেতে পর্য্যন্ত রাজী হ'ল না; যদিচ লোকে বলে তার তুল্য রূপসী হিন্দুস্থানে নেই। এতে কি পাকা বুদ্ধির প্রমাণ হয়?

বীরবল। হয়ত শাহাজাদা হাতের কাছে মনোমত রূপসী পেয়ে থাকবেন হুজুর। ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবে না যাওয়াই ত বুদ্ধিমানের কাজ।

আকবর। হাতের কাছে ত চিরদিনই রূপের রোশনাই বাঁধা রয়েছে, কিন্তু কখনও ত তাকে দু'দণ্ডের বেশী সেদিকে ফিরে তাকাতে দেখি নি। আজ হঠাৎ কি হ'ল?

বীরবল। এসব জিনিষ হঠাৎই হয় জাঁহাপনা—সুক্ষণে বা কুক্ষণে। এখন বুঝতে পারছি, আমরা এতদিন দুধ দিয়ে সাপ পুষেছি।

আকবর। বিষদাঁত তুলে ফেলতে কতক্ষণ? কিন্তু এ সাপিনীটি কে?

বীরবল। যত সহজ মনে করছেন, তত নয়। সেটি আমাদের নবীনা অতিথি।

আকবর। কে, আনারকলি? (উত্তেজিত)—এ্যা? অসম্ভব! সে যে নিতান্ত বালিকা! সে ত সারাদিনই অন্দরমহলে যোধবাঈয়ের কাছে থাকে শুনি।

বীরবল। সারাদিন সেখানে থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক অন্তঃপুর-উদ্যানের ফোয়ারার কাছে বসে থাকে এবং একলা থাকে না—একথা আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি।

আকবর। দেখ বীরবলজী, আমরা আজীবন রাজপ্রাসাদের দূষিত হাওয়ায় বাস করে মানুষকে কেবল সন্দেহ করতেই শিখেছি, বিশ্বাস করতে শিখি নি। আনারকলি একে সরলা বালিকা, তার উপর বন্ধুপ্রেরিত শরণাগত অতিথি—তার নামে হঠাৎ একটা কুৎসিত অপবাদ দেবার আগে ভাল করে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য কথাটা সত্য কি মিথ্যা।

বীরবল। হুজুর, মন্ত্রণা দেওয়াই আমার ব্যবসা; এই করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলুম। আমি কি আমার কর্ত্তব্য জানি নে, না হুজুরকে ছেলেমানুষ পেয়েছি, যে জুজুর ভয় দেখাব? স্বয়ং অন্দরমহলের সর্দ্দারই আমার সংবাদদাতা। বলেন ত আমার সাক্ষীসাবুদ তলব করি—

আকবর। (অস্থির ভাবে)—না, না, না, আজ থাক্, আর এক দিন হবে। এখনি সব লোকজন এসে পড়বে। আজকের দিনের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

বীরবল। হুজুর, রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল আমার সকলের আগে দেখতে হবে, তাই এই অসময়েও অপ্রিয় কথাটা তুলতে হ'ল, ক্ষমা করবেন। আজ আর কিছু বলব না, কেবল এই বিনীত নিবেদনটুকু করছি যে, নাচগানের সময় আনারকলির উপর আপনি একটু বিশেষ নজর রাখবেন।

(একে একে অতিথি-অভ্যাগতদের প্রবেশ ও যথোচিত অভিবাদনান্তে গালিচায় উপবেশন। যথাসময়ে নহবৎ

বাজিয়া উঠিলে গায়িকার দল সহ আনারকলি ও রোশেনারার প্রবেশ এবং সিংহাসনের বামপার্শ্বে উপবেশন। সেলিম, ফৈজী প্রভৃতি রাজপরিষদবর্গ সম্রাটের দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া বসিল। রাজকর্মচারিগণ আতর গোলাব তাম্বুলাদি বিতরণ করিতে লাগিল। নহবৎ থামিলে পর গায়িকার দল উঠিয়া বাদশার সিংহাসনের সামনে আসিয়া সঙ্গতসহ সভজী মোবারকবাদী গান ধরিল)।

সমস্বরে গায়িকাগণ। গান

সুগ্রই কানাড়া—ঝাঁপতাল

শুভ ঘড়ি শুভ দিন মুহুরত
বৈঠে তখত আজ দিল্লীপতি নর রে।
অচল কুমুসী ধরি, চহু চক ছব ছাড়ো,
নগ মোতি নগ হীরা ছত্রে জড়ে হঁ।
হুমায়ুঁ কি নন্দন, চর যুগ জীবে,
শাহানকে বাদশাহে আকবর রে।

(সভাস্থ লোকের বাহবা ধ্বনি করণান্তর কথার গুঞ্জন আরম্ভ। পরে বাদশা কথা কহিবামাত্র সকলে নিস্তব্ধ হইল।)

আকবর। বাহবা! বেশ, সুন্দর গান করেছ। মিঞা তানসেনের শিক্ষা দেখছি বৃথায় যায় নি। আনারকলি, এবার তোমার পালা। জানকী বাঈয়ের কাছে মাসখানেক তালিম দেবার পর কি রকম উন্নতি তোমার হয়েছে, আজ উৎসব-রজনীতে এই সমবেত সমঝদারদের সামনে তার পরিচয় দাও। দেখি শাগরেদ কেমন ওস্তাদের মান রাখে।

(আনারকলি ধীরে ধীরে উঠিয়া সলজ্জ ভাবে বাদশাহের সামনে আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল, পরে একটু ভাবিয়া নিম্নলিখিত গানসহ সুন্দর নৃত্য সুরু করিল।)

আনারকলি। নৃত্যসহ গীত

শুকবেলাওল—ঝাঁপতাল

শওদে মিলন দা, চাওয়ে নি সঁইয়ো ময়নো,
তেরে মিলন দা চাওয়ে নি সঁইয়ো (হাঁ)।
সোনি সোনি সুরত, মন পরবশ র ইয়ো।
ময়নো কি তপত বুঝাওয়ে উনিদা (হাঁ)।
যো লিখ্যা সোই পায়া নি সঁইয়ো।
কহে রঙ্গীরাম, রঙ্গী লাবে বনেরা।
ময়নো কি তপত বুঝাওয়ে উনিদা (হাঁ)।

(নাচিতে নাচিতে যখন সেলিমের সামনে আসিয়া পড়িল, তখন আনারকলি মুহূর্তের জন্য তার দিকে চোখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল ; সেলিমও তথৈবচ। দু'জনের এই গোপন দৃষ্টি ও হাস্যবিনিময় পার্শ্বস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাদশাহের নজরে পড়িল। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটি-পূর্বক সেলিমের ও বীরবলের দিকে চাহিলেন, তাহাতে সে

হস্তের ইঙ্গিতে বাজনদারদিগকে নিবৃত্ত করিল। হঠাৎ বাজনা থামিয়া যাওয়ায় আনারকলি অপ্রস্তুতভাবে নাচ থামাইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' রূপে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শাহাজাদাও পিতা এবং বীরবলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রমাদ গণিলেন। সভাস্থলে চাঞ্চল্য।)

বীরবল। অমাত্যগণ ও বন্ধুবর্গ, শাহেন শা কয়দিন অনবরত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থেকে বিশ্রামের অভাবে আজ হঠাৎ কিছু অসুস্থ বোধ করছেন। তাই তিনি আমাকে আপনাদের জানাতে বললেন যে, আজকের উৎসব এখন স্থগিত রইল। তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই এই আনন্দরজনীর অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হবে, এবং সেদিন তিনি নিষ্কণ্টকরূপে আপনাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পারবেন। এই আপাত-অশিষ্টতা এবং আশাভঙ্গ আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন, এই তাঁর বিশেষ অনুরোধ।

(বিস্মিত ও বিক্ষিপ্তভাবে সভাভঙ্গ। সেলিমকেও গমনোদ্যত দেখিয়া আকবর তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরবল ভিন্ন আর সকলের ক্রমে ক্রমে প্রস্থান।)

আকবর। (উত্তেজিত) সেলিম, এর মানে কি ?

সেলিম। কিসের মানে হুজুর ?

আকবর। (রাগতঃ) তুমি বেশ জান কি বলছি। আর আমার চোখে ধুলো দেবার বৃথা চেষ্টা না করে সত্য কথা বল, যদি ভাল চাও। এই অজ্ঞাতকুলশীল নির্লজ্জ বালিকার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

সেলিম। হুজুর, আমাকে যত খুশি গালমন্দ দিন, কিন্তু ভদ্রঘরের নিরপরাধ মেয়েকে অযথা কুকথা বলবার অধিকার আপনার নেই।

আকবর। আমার অধিকার-অনধিকার আমি বুঝব, তোমার কাছে তা শিখতে চাই নে। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এই অজানা বিদেশী মেয়েটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে ; না তুমি তার রূপে মোহিত হয়ে তার জাহান্নামে যাবার পথ পরিষ্কার করছ ? এ রোগ ত তোমার ছিল না !

সেলিম। (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতঃ) এ রোগ নরনারীর সেই চিরকেলে ভালোবাসা রোগ, কখন কাকে আচম্বিতে আক্রমণ করবে, তা কেউ আগে থাকতে বলতে পারে না। যদি ভালবাসা দোষ হয়, তবে আমি দোষী ; যদি সুন্দরকে পাবার ইচ্ছে দোষ হয়, তবে আমি দোষী ; নচেৎ নই।
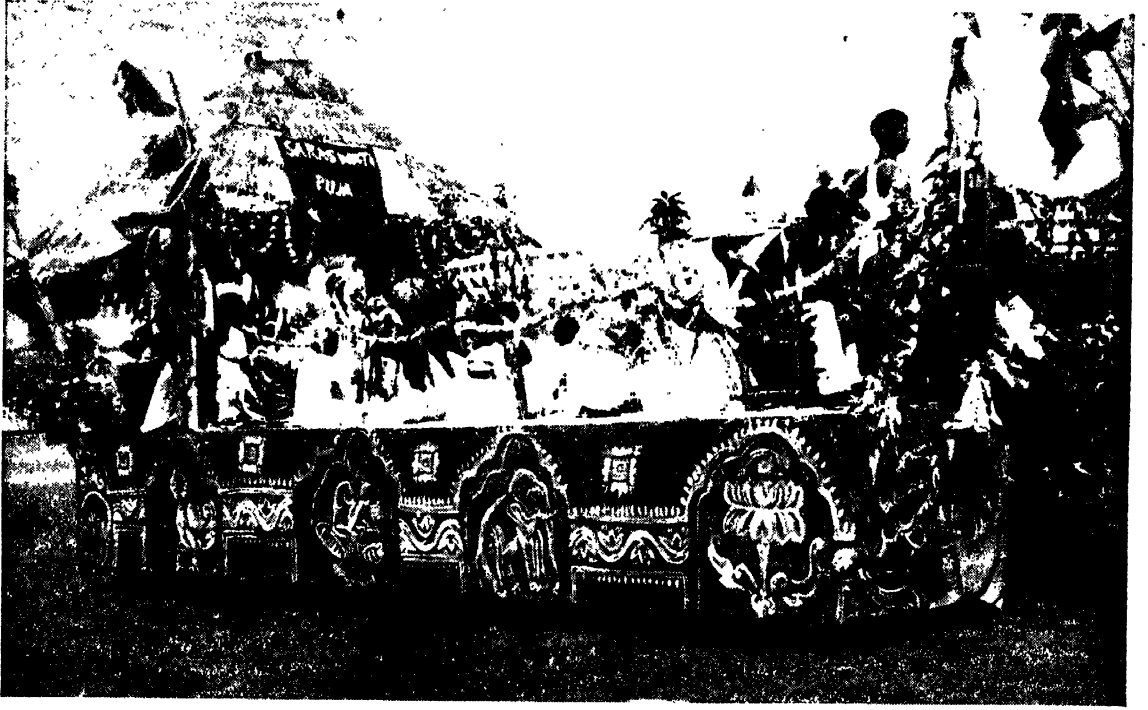
দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার সরস্বতী পূজানুষ্ঠান দৃশ্যের একটি অনুকৃতি

কোরিয়াস্থ ৬০তম ভারতীয় এম্বুলেন্স ইউনিটের মেডিক্যাল অফিসার সার্জেন্ট মুথু কৃষ্ণন ও কুশল কুলকর্ণী প্যারিসের এক অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন
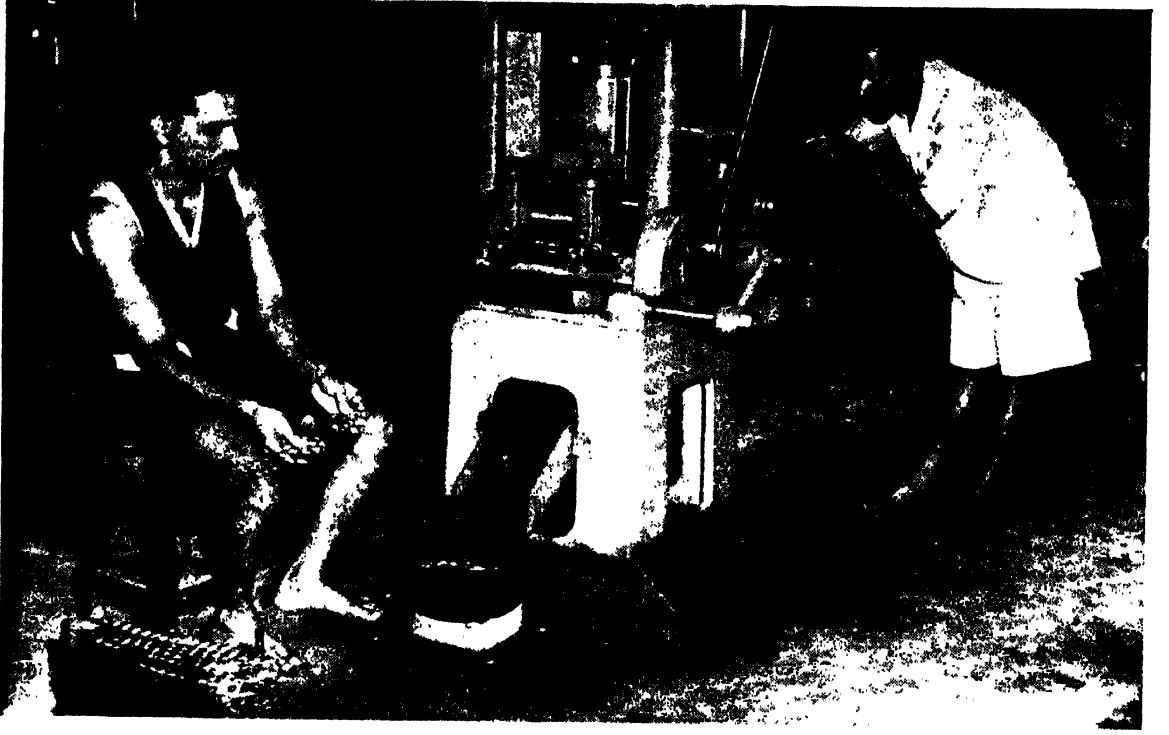
টাঁকশালে একটি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া ভারতীয় মুদ্রা নির্ম্মাণ

এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা—সিন্ত্রি 'ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরি'র 'বয়লার হাউসের' অভ্যন্তরস্থ চুল্লীসমূহ

আকবর। তুমি বেশ জান যে, এক জন ইতরশ্রেণীর রমণী কখনোই শাহাজাদার পাটরাণী হতে পারে না।

সেলিম। না, আমি সে কথা জানি নে, জানলেও মানি নে। একটা সল্‌মাচুম্‌কিপরা জরিজরাবৎমোড়া অচেনা পুতুল রাজকোষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড দিলেই আমার সম্মানিত বধূ হতে পারবে; আর আমি যাকে ভালবাসি, যাকে চাই, যার জন্ত রাজসিংহাসন রাজমর্য্যাদা সব ছাড়তে প্রস্তুত আছি, যে আমার জন্ত তার বাপ মা ভাই বন্ধু সব ছেড়ে এসেছে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেই আমাদের দু'জনকেই অপমানিত লাঞ্ছিত হতে হবে, এ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণ সমাজের নিষ্ঠুর বিধান হতে পারে, কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম কখনোই নয়।

আকবর। (অপেক্ষাকৃত নরমভাবে) সেলিম! রাজা-বাদশাদের জীবনের কোন্ নিয়মটাই বা স্বাভাবিক? এই যে আমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে বাধ্য হই; এই যে রাজকার্য্যের তাড়নায় নিজের পরিবারের সাহচর্য্য দু'দণ্ডের বেশী উপভোগ করতে পারি নে; এই যে প্রজাদের অভিযোগ শোনা, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবার জন্ত সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়, নিজের আরাম, নিজের অবসর কাকে বলে তা জানতেও পাই নে; একি খুব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? তবু ত আমাদের পিতৃপিতামহ এই মহৎ জীবনযাপন করে গেছেন, আর আমরাও আশা করি যে আমাদের পুত্র-পৌত্রগণ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে সেই গুরুভার বহন করবে। (কিয়ৎক্ষণ থামিয়া) আমিও এককালে যুবক ছিলুম, আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারি সেলিম; কিন্তু তুমি কি আমার কথা বোঝবার এতটুকুও চেষ্টা করবে না? তোমার পিতৃপুরুষের প্রতি ভক্তি, তোমার দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, তোমার বাপমা'র প্রতি ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা, সবই কি এই নতুন প্রেমের জোয়ারে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে গেছে?

সেলিম। (পিতার পায়ে পড়িয়া কাতরস্বরে) জাঁহাপনা, পিতা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের স্নেহমমতা কখনো ভুলব না, কিন্তু আজ আমি নিজেকেই ভুলেছি। আমি আপনাদের বংশের কুলাঙ্গার, আমি আপনাদের অযোগ্য কুপুত্র। আপনারা আমাকে ত্যাগ করুন, কিন্তু সে নিরপরাধ বালিকাকে ত্যাগ করতে আমায় আদেশ করবেন না। আপনাদের অন্যান্য পুত্র আছে, তারা আপনাদের মান রক্ষা করবে, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করবে। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে, এই ইন্দ্রপুরীতুল্য দিল্লী শহরে সেই অসহায় বালিকার সর্ব্বনাশ করবার লোক ঢের আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা করবার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সে যে সরল বিশ্বাসে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে বিশ্বাস যদি আজ আমি ভাঙি, তবে দিল্লীর তক্তে কেন, নরকেও আমার স্থান হবে না। আপনি ত পিতা, গুরু,—বলুন, এ কার্য্য কি ধর্ম্মসঙ্গত হবে—ন্যায়সঙ্গত হবে?

আকবর। (বিচলিতভাবে) সেলিম! ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের বিচার করতে কখনো শিখি নি; আমরা শিখেছি শুধু রাজকার্য্য, রাজকায়দা, রাজকীয়মর্য্যাদা, রাজদণ্ড, রাজ-কর্ত্তব্য। (ভাবিয়া) তুমি এখন যাও, একটু বিশ্রাম করগে। আমিও প্রবীণ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। যা স্থির হয় তোমাকে কাল জানাব। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, তার আগে তুমি ছলেবলেকৌশলে, কোন রকমেই আনারকলির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টামাত্র করবে না।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তাই হবে। কুক্ষণে আমাদের দেখা হয়েছিল, আর দেখা করে পাপের বোঝা বাড়াতে চাই নে। কিন্তু পরামর্শের সময় মনে রাখবেন যে, দুটি তরুণ প্রাণের সুখ দুঃখ আশা ভয় সবই আপনাদের বিচারের উপর চিরদিনের মত নির্ভর করছে। মনে রাখবেন আপনি আমার স্নেহময় পিতা, কেবল রাজ-নীতির কঠোর প্রতিমূর্ত্তি নয়। কুমন্ত্রণায় মানুষকে অমানুষ করে ফেলে। (বীরবলের প্রতি বিদ্বেষকটাক্ষ হানিয়া প্রস্থান। আকবরের মাথায় হাত দিয়া নীরবে অবস্থান।)

বীরবল। (হাসিয়া) শুনলেন ত খোদাবন্দ, আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণ! প্রবীণ শিক্ষকের প্রতি অর্ব্বাচীন ছাত্রের সম্মানের বহরটাও ত দেখলেন! যাকে জন্মাতে দেখলুম, মানুষ করলুম, সেও দুটো কড়া কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। আজীবন রাজসেবার এই ত যোগ্য পুরস্কার। নাবালক অবস্থাতেই যখন এই মতিগতি, তখন সিংহাসনে উঠলে না জানি কি মূর্ত্তি ধরবেন! সুখের বিষয়, তখন আমি আর রাজতরণীর কর্ণধার থাকব না।

আকবর। তুমি হাল না ধরলে এ নৌকো বানচাল হয়ে পড়বে বীরবল। এখনই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বীরবল। হুজুর, আমি যতদিন আছি সাধ্যমত আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করব না। কিন্তু আমাদের কাজ ত শুধু হিতোপদেশ দেওয়া, সে কথা শোনা-না-শোনা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছাধীন।

আকবর। তোমার মন্ত্রণা কি আমি কখনো অগ্রাহ্য করেছি বীরবলজী? আমি এতদিন যে-ভাবে চলেছি, সেই ভাবেই চিরদিন চলব। আমার প্রাণ থাকতে পিতৃ-

পিতামহের শুভ্র যশে কখনো কলঙ্ক স্পর্শ করতে দেব না। সেলিমের এই প্রথম প্রণয়, তাই সে এত অধীর হয়ে পড়েছে। দিনকতক দেখাশুনা বন্ধ থাকলেই এ মশ্‌গুল ভাবটা কেটে গিয়ে তার স্বাভাবিক বাধ্যতা ও প্রফুল্লতা ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে আনারকলিকে ফেরত ডাকে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া যাক, কি বল বীরবল ?

বীরবল। আপনি যতটা হালকাভাবে নিচ্ছেন হুজুর, আমি কিন্তু ঠিক তা পারছি নে। মিলনে বাধা পড়লে প্রেমিকরা খাইবর অপেক্ষা দুর্গম ব্যবধানও অনায়াসে লঙ্ঘন করে থাকে, ইতিহাসে তার বহু নজীর আছে। ও বিষবৃক্ষ নির্ম্মূল করাই ভাল। যেরকম বেগতিক দেখছি, প্রাণ থাকতে এ প্রেম যাবে না।

আকবর। (অবসন্নভাবে) তবে উপায় ?

বীরবল। জাহাঁপনা, আপনি যে এমন জ্ঞানী হয়েও আজ শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়েছেন, সে কেবল সন্তান-স্নেহের অন্ধ মায়ায়। আপনি যান, একটু নির্জ্জনে গিয়ে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করুন, তা হলে আপনার মনের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির স্থিরতা ফিরে আসবে। আপনার শুধু এক সন্তান নয়, সহস্র সন্তানের শুভাশুভ আপনার উপর নির্ভর করছে মনে রাখবেন। আমার উপর ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; এ বিশ্রী ব্যাপারের যথাযোগ্য তদন্ত ও বিচার করে তার ফলাফল আপনাকে অবিলম্বে জানাব। কেবল আপনি কোতোয়ালকে হুকুম পাঠিয়ে দিন যেন বিচার হওয়া পর্য্যন্ত আনারকলিকে কারাগারে বন্ধ রাখা হয়।

আকবর। বীরবল, তুমি শুধু আমার সুযোগ্য মন্ত্রী নও, আমার পরম সুহৃৎ ও যথার্থ হিতৈষী। তুমি ঠিকই বলেছ, সেলিমের অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছি। তুমি শীঘ্র এই অলক্ষণা কন্যার বিচারের ব্যবস্থা করে আমার মনে শান্তি দাও, ও বংশের মান রক্ষা কর।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চোখ

শ্রীকরুণাময় বসু

মনে নেই কবে যেন দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
সে কোন সাগর দ্বীপে বহুদিন আগে, আহা তাই হোক।
যেখানে উঠেছে ঝড়, যেখানে বেজেছে বাঁশি,
যেখানে লতায় ফুল কারে চেয়ে ওঠে নিশ্বাসি,—
সেখানে কি দেশ আছে, সেখানে কি আছে কোন দ্বীপ ;
পথ চেয়ে কারো চোখে জল আসে, আঁচলে কি ঢেকেছে প্রদীপ ?
কতো না গোধূলিকাল মেঘে মেঘে সোনালি রেখায়
লজ্জিত তুলির টানে বিচিত্রিতা যে ছবি আঁকায় ;
সেই সব মনে রাখা, চিরদিন ভালো লাগা রঙ
জীবনে বাজায় সুর গৌড়-সারঙ্‌।
হঠাৎ বন্যার বেগ : সাঁই সাঁই ওড়ে বালিয়াল,
যে নীড় ভেঙেছে ঝড়ে ওরে পাখী মিছে তুই খুঁজিয়া বেড়াস।
চিকণ ভুরুর নিচে দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
সে কোন সাগর দ্বীপে বহুদিন আগে আহা তাই হোক।

তারপর গেছে কতো কাল,
তোমার আমার মাঝে ইতিহাস কুয়াশায় করেছে আড়াল ;
তীরে বসে দেখেছিনু সাগরের ঢেউ উত্তাল,
তারপর গেছে কতো কাল।
পৃথিবীতে এলো গেল কতো জয়, কতো পরাজয়,
হাওয়ায় উড়ায়ে দেয় ইতিহাস কালের বলয়।
মনে হয় তুমি আমি কেউ নই, মোরা শুধু খেলার পুতুল,
লতারে কে চেনে বলো, মানুষেরা চেনে শুধু ফুল ;
তুমি আমি খেলার পুতুল।
সেদিন র'বো না মোরা, তবু এই চিরজীবী প্রেম
মানুষের জীবনে জীবনে চিরদিন রাখিয়া গেলেম।
বসন্ত আসে চিরদিন, কোথায় সে হয়েছে বিলীন
সেকালের বসন্তসেনা,
স্মরণের মণিহারে প্রেম শুধু গাঁথা র'বে, তুমি রহিবে না।
মনে নেই কবে যেন দেখেছিনু কালো দুটি চোখ,
যেখানে উষার আলো করে ঝলমল,
পাহাড়িয়া বুনো পথে নেমে আসে গোধূলি-আলোক।

যশোহরে নীল-আন্দোলন ও শিশিরকুমার ঘোষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া যশোহর ও নদীয়ায় নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। রায়তদের নামে মিথ্যা মামলা রুজু করা, ধানজমি নষ্ট করা, ঘরবাড়ী পোড়ান, গ্রামকে গ্রাম লুঠতরাজ, জমিদারির কাছারি আক্রমণ, নীলচাষীদের নীলের গুদামে আটক রাখা, নারীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার—একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। জেলায় শাসন-কর্তৃপক্ষ তথা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ইংরেজ কুঠীয়ালদের নানারূপে সাহায্য করিতেন। ১৮৬০ সনের ১১শ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর শাসকবর্গ চুক্তিভঙ্গের অছিলায় চাষীদের উপর জুলুম-জবরদস্তি চালাইতে থাকেন। শিশিরকুমার ঘোষ তখন মাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক। তিনি এই সময় যশোহরে শিক্ষকতা-কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মফস্বল হইতে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং "M.L.L."-স্বাক্ষরে কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশার্থ পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাদরে এ সমুদয় পত্রস্থ করিতেন। তিনি নীল-সম্পর্কিত বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশের জন্য ১৮৬০, ২৮শে এপ্রিল সংখ্যা হইতে "The Indigo Districts" নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খুলিয়াছিলেন। 'M.L.L.'-স্বাক্ষরে শিশিরকুমারের প্রথম পত্র বাহির হয় ১৮৬০, ৩১শে মার্চ্চ তারিখে। পরবর্ত্তী সকল পত্রই উক্ত বিভাগে স্থানলাভ করে। এই 'M.L.L.' যে শিশিরকুমার ঘোষ স্বয়ং সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে তিনটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করি। তৃতীয় প্রবন্ধে আমি 'M.L.L.'-স্বাক্ষরযুক্ত পত্র মূল ইংরেজীতে হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছি।* শিশিরকুমার এই সকল পত্র লিখিয়া কিরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিব।

শিশিরকুমারের উক্ত প্রথম পত্রে ৪৯ জন মোড়ল বা কৃষক-নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদ আছে। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্কীনারের নির্দ্দেশক্রমে সরকারী ঘোষণা শ্রবণের জন্য কালোপোলে আট-দশ হাজার নীলচাষী সমবেত হয়। এই ম্যাজিষ্ট্রেট-পুঙ্গব নীলকর-বন্ধু; উপস্থিত লোকজনকে নীলচাষে প্ররোচিত করিতেই প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে অসম্মত হইলে তাহাদের মধ্য হইতে ৪৯ জন নেতাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে স্কীনার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখেন এবং পরে যশোহর সদরে চালান দেন। সেখানেও নীল বুনিতে রাজী করাইবার জন্য তাহাদের শাসানো হয়, তাহাদের উপর কিছু কিছু অত্যাচারও যে না হইয়াছিল এমন নয়। অবশেষে পঁয়তাল্লিশ জন মোড়ল নীল বুনিবে বলিয়া একরার-নামা লিখিয়া দিলে তবে হাজত হইতে মুক্তি পায়। অন্য চারি জনকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী সরাসরি বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার জের যে আরও কিছুদিন চলিয়াছিল পরবর্ত্তী পত্রাবলী হইতে তাহা জানা যাইবে। স্কীনার নীলচাষীদের জব্দ করিবার জন্য সরকারে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, কালোপোলে তাহারা তাঁহাকে সরাসরি আক্রমণও করিয়াছিল।

যশোহর হইতে ১৮৬০, ৪ঠা এপ্রিল তারিখ সম্বলিত এবং "A Native" স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র ১৭ই এপ্রিল ১৮৬০ সংখ্যা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয়। এখানিও যে শিশিরকুমারেরই লিখিত এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই পত্রে কালোপোলের ঘটনার উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, সেখান হইতে নয় শত জন রায়ত প্রতীকার-মানসে কলিকাতায় গিয়াছে। এই সময় যশোহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অষ্টাশীটি গ্রাম নীলকরদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রামসমূহের অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা আর নীল বুনিবে না। পত্রখানির নিম্নলিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য:

> Is it that we are weak, wretched and poor—that we are their subjects—that we have no other resource than to suffer patiently whatever punishment our masters will please to inflict upon us, that they thus trample upon us, disregarding justice and the tenets of the Bible. How are we to impress upon the minds of the Government that the ryots have neither taken advances, nor drawn contracts? They will never believe it, for the Planters have convinced them otherwise. Woe to the Bengalee that they are sleeping in indolence. When their wretched countrymen are thus

---

* ১৩৪৫ সনের ২৬শে আষাঢ় 'রবিবারের যুগান্তরে' "পলুয়া-মাগুরার ঘোষ ভ্রাতৃগণ: শিশিরকুমার ঘোষ", কার্ত্তিক ১৩৫৬ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' "শিশিরকুমার ঘোষ" (পৃ. ২৮৭) এবং ১৯৫২, ২০শে জানুয়ারী তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী'তে "যশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা" শীর্ষক, বর্ত্তমান লেখকের প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য। শেষোক্ত প্রবন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' M.L.L.-স্বাক্ষরে প্রকাশিত প্রথম পত্রখানি ছাড়া আরও পাঁচখানি পত্রের প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

sacrificing their lives for their emancipation from Indigo-slavery; they are passing away their time in idle luxury. Rise, Rise, Ye countrymen—with supplicating hands, fall prostrate before the Governor, catch his feet, and do not let him go, unless he has granted your requests. Should the Governor or any other nobleman ever visit the moffusil—the uncontrolled authority of the Planters will make them compare the Sahebs of the moffusil to the Spaniards who once depopulated America.

২

শিশিরকুমারের 'M.L.L.'-স্বাক্ষরে দ্বিতীয় পত্রখানি 'যশোহর, ১৮ই জুন' তারিখ সম্বলিত। ২৩শে জুন ১৮৬০ সংখ্যার 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহা প্রকাশিত হয়। এখানি দৃঢ়-সঙ্কল্প নীলচাষীদের শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে নীলকর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ষড়যন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পত্রখানির মর্ম্ম এই :

"২৯শে ফাল্গুন লালমামুদ নামে পোয়ামারি কুঠীর জনৈক তাগিদার মোলোণীর নিকট পাঁচল্যার কতিপয় অধিবাসীর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করে। সে বলে যে, দেড় শত গরু দিয়া মাড়াইয়া বহু বিঘা জমির নীল তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল, দেখিতে পায়। সে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মহেশ চাটুয্যের নায়েব রতি মুখুয্যের অধীন প্রায় ষাট জন লোক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাকে ধরিয়া তাহারা মারধরও করে, কিন্তু শেষে সে কোনমতে পলাইতে সমর্থ হয়। মোলোণী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি করিলেন। ছয় জনকে ধরিয়া আনিয়া হাজতে (নীল-কুঠীর গুদামে) পুরা হইল। সেখানে তাহারা মাসখানেক থাকে। তারপর তাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সরকারী জেলে পাঠান হয়। ঐ কুঠীর তিন জন তাগিদার ঐ তাগিদারের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মোলোণী উহাদের সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাদীপক্ষের অপরাধ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হন এবং দুই দিনের মেয়াদে তাহাদের কুড়ি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বিচারাসনে, তখন পোয়ামারি কুঠীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মিথ সাহেব তাঁহার পার্শ্বে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে কখনও উপদেশ এবং মতবাদ দিতেছিলেন, কখনও বা তাঁহার উপর প্রশংসা-বাণী বর্ষণ করিতেছিলেন। বিবাদী ছয় জনই অভিযোগ অস্বীকার করে ও সাক্ষীসাবুদ আনিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, তাহারা অকুস্থলে ছিলই না। কিন্তু মোলাণী এই বলিয়া তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিলেন যে, তাহারা সকলেই নীলকরদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাই-য়াছে। তিনি তাগিদারদের কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, যদিও তাহারা নীলকরদের কর্ম্মচারী এবং কুঠীর প্রজা…। তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, ষাট জন লাঠিয়াল মিলিয়া এক জন লোককে আক্রমণ করিয়া মারপিট করিলেও সে প্রাণভয়ে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, আর দৈবাৎ তিন জন তাগিদার আসিয়া উপস্থিত হইল সশস্ত্র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত। এ মোকদ্দমার আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছে। এই আক্রমণকারী দলের নেতা এবং মামলার প্রধান বিবাদী রতি মুখুয্যেকে চার জন তাগিদারই সনাক্ত করিল। কিন্তু এক জন লেখাপড়া জানা লোককে অনর্থক সাজা দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া মুক্তি দেন। সাক্ষীরা একবাক্যে বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে রতি মুখুয্যেকে চিনিত ও লাঠিয়ালদের সর্দ্দারি করিতে তাঁহাকে ঐ দিন দেখে। কিন্তু অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, রতি মুখুয্যে ঠিক ঐ দিন ম্যাকলীন সাহেবের কাছে ছিলেন। মোলোণী ইহা বিশ্বাস না করিয়া পারেন নাই। যে-সব সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া এইরূপে ধরা পড়িল তাহাদের উপরে কিরূপে তিনি নির্ভর করিতে পারেন? বিবাদীপক্ষ প্রার্থনা জানান যেন ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়া ব্যাপারটির সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং এরূপ অনাচার আদৌ সংঘটিত হইয়াছে কিনা দেখেন। স্বয়ং অনুসন্ধান করিলে এই ব্যাপারের সত্য-মিথ্যা তিনি সহজেই জানিতে পারিবেন। সকলেই—তাঁহাদের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং নীলকর কেহই বাদ যান না—নিশ্চয়ই জানেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ জেলায় নব-নিযুক্ত জজ বেলী সাহেব এই মোকদ্দমাটির কিরূপ ফয়সলা করেন জানিবার জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া আছি। যদি এতগুলি লোকের উপরে ঐরূপ অন্যায় অবিচার করা হয় তাহা হইলে ইংরেজদের উন্নত এবং গুণান্বিত বলিয়া জাহির করার কোনও অধিকার নাই। উপরের বর্ণিত বিষয়গুলি সত্য এবং নথি হইতে প্রায় অনুবাদ করিয়া দিলাম; আপনি ইহার উপর নির্ভর করিতে পারেন।

"শ্যামচাঁদে"র* অবাধ প্রয়োগের জন্য লারমুর সাহেব সর্ব্বত্র কুখ্যাত। প্রজাদের সাম্প্রতিক ঘোঁট পাকানোর দরুন তিনি পাগলের মত হইয়াছেন। দুলাদী বিশ্বাসের বাড়ী পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। বিষহরি গ্রাম পোড়ানো হয় নাই, পূর্ব্বে তাড়াহুড়ার মধ্যে ভুল সংবাদ দিয়াছিলাম। লারমুর সাহেব বড়বাড়ী গ্রামটি একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিষহরি, কাঠুড়িয়া, রামকৃষ্ণপুরের মত বহু গ্রামের ধানক্ষেত নষ্ট করিয়া দিয়া সেই সেই জমিতে নীল বোনা হইয়াছে। হার্শেল মহোদয় উত্তর অঞ্চলের প্রজাদের লইয়া কি এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এদিকে নজর দিবার সময় পান না?

---

* চর্ম্মনির্ম্মিত চাবুক

পুনশ্চ—উক্ত চার জন ভাগিদার কি মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অপরাধে অপরাধী নয় ?"

৩

শিশিরকুমারের 'M. L. L.'-স্বাক্ষরিত তৃতীয় পত্রের তারিখ 'যশোহর, ২৮শে জুন ১৮৬০'। পরবর্ত্তী ৪ঠা জুলাইয়ের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অত্যাচার-হেতু নীলচাষীরা কিরূপ সংঘবদ্ধ হয় এই পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। আবার কুঠীয়াল-দ্বারা জমিদারের কাছারি আক্রমণ ও উভয় দলে এক ভীষণ সংঘর্ষের বিষয়ও ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পত্রখানি হইতে মূল বিষয়গুলির তাৎপর্য্য এখানে দেওয়া হইল :

"...নীলকরদের এখন কাজ হইল দূর দূর গ্রাম হইতে আগত দুর্ভাগা রায়তগণকে নূতন নীল-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করানো। কেনি সাহেবের লোকেরা ঔদ্ধত্যবশে এই রূপ করিয়া ফেলে। ইহার ফলে সাতাশটি গ্রামের চাষীরা তৎক্ষণাৎ কুঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের নীল বুনিতে এই বলিয়া রাজী করান যে, এবারে নীল বুনিলে পরে তিনি এইরূপ দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিবেন। চাষীরা তাহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিল ; কিন্তু কেনির মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপিয়া বসে, তিনি তাঁহার কথা রাখিলেন না। এক মাস পূর্ব্বে দুর্গাপুরের কয়েক জন লোক রামনগর কুঠীর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে এখানে আসিয়াছিল। এই ম্যানেজার নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করে এবং তাহাদের কয়েকজনকে গুদামে আটক রাখে। এই জেলার হৃদয়হীন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা না করিয়া, সরাসরি নদীয়ার লাসিংটন সাহেবের নিকট গিয়া আবেদন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্প্রতি (প্রায় নয় দিন পূর্ব্বে) বিজলী কুঠীর (যাহার মালিক মিয়ার্স) ওয়াস সাহেব উমেদপুর, কৃষ্ণপুর, পোয়ারা, বিট্টুদি, লক্ষণদি, আয়োকামদি প্রভৃতি গ্রামের জনকয়েক মোড়লকে ডাকিয়া আনিয়া ভয় দেখায় যে, যদি তাহারা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে গুদামে আটক করিয়া রাখা হইবে। তাহারা যেন চুক্তি করিতে অসম্মত না হয়। নীল-চাষীরা বাড়ী ফিরিয়া ইহার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আমীন ও তাগিদারদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলচাষীদের ঐহিক রক্ষাকর্ত্তারা অত্যাচারীদের দয়ার উপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্ত তাহারা সর্ব্বশেষে এই অমোঘ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

গত ২০শে জুন মল্লিকপুর গ্রামের জমিদার এবং মীরগঞ্জের ম্যাক্আর্থারের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মল্লিকপুর গ্রামের একটি সামান্ত অংশমাত্র সে ইজারা লইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, এই সূত্রে সমগ্র গ্রামের উপরই আধিপত্য করিতে পারিবে। কিন্তু গ্রামের জমিদার তাহার এই ইচ্ছায় বাধ সাধিলেন। ম্যাক্আর্থার এই বিঘ্ন দূর করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ দুই শত সশস্ত্র লাঠিয়ালসহ গিয়া ভদ্রলোকটির কাছারি-বাড়ী আক্রমণ করিল। এ প্রকার অতর্কিত আক্রমণের জন্ত রায়তেরা প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের মধ্যে চার জন ভীষণভাবে আহত হইল ; ইহাদের দুই জনকে কুঠীর লোকেরা গাপ্ করে ; অবশিষ্ট দুই জনকে এখানে (যশোহরে) পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই এক জন মারা যায়। ইহার পরেও নীলকরেরা আমাদিগকে অসৎ, এবং মিশনরীদের অপেক্ষা নিজেদের উৎকৃষ্টতর খ্রীষ্টান বলিতেও লজ্জানুভব করিতেছে না।

মল্লিকপুর ভয়ানকভাবে লুষ্ঠিতও হইয়াছে। স্কীনার এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন। অন্ততঃ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি এইরূপই বলিবেন, যদিও সেখানে যাইবার অন্ত কারণই বলবত্তর। মোল্লাপাড়ার মিঃ ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে মীরগঞ্জের ম্যাক্আর্থার-কন্তার শীঘ্রই বিবাহ হইবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটরা নিশ্চয়ই সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আমার স্মরণ হইতেছে, অনতিকালপূর্ব্বে স্কীনারের বিরুদ্ধে যশোহরের কয়েকজন রায়ত একটি আবেদনে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল যে, তিনি নীলকরদের সঙ্গে পানভোজন এবং অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি তখন ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, ছোটলাটও তাঁহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গত সোমবার ২৫শে জুন এই বিবাহ হইবার কথা ছিল। রবিবারে মোলোনী এবং সিবিল সার্জ্জন এই ফুর্ত্তিতে যোগদানের নিমিত্ত হন্তদন্ত হইয়া সেখানে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ-অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ায় তাঁহারা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়েন। অত্যন্ত ক্লিষ্ট চিত্তে মোলোনী সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্কীনার সাহেবের একই সময়ে 'রথ দেখা ও কলা বেচা' দুইটি উদ্দেশ্ত ছিল—হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করাও চলিবে, আবার বিবাহের চর্ব্ব্য-চোষ্যের আস্বাদও লওয়া যাইবে। বিবাদীপক্ষের অতিথির হস্তে এ ব্যাপারের কিরূপ নিষ্পত্তি হইবে তাহা বুঝা খুবই সোজা। সম্ভবতঃ ফরিয়াদীপক্ষ এবং তাহাদের সাক্ষীগণকে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সাবধান হওয়া উচিত, হেলিডে সাহেব কিন্তু আর বাংলার 'গবর্ণর' নন্।

আপনাকে একটি সুসংবাদও দিতেছি। কালোপোলের সেই কুখ্যাত 'হামলা', অর্থাৎ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্কীনারের হেপাজৎ হইতে হাজার হাজার রায়ত কর্ত্তৃক কয়েক জন কয়েদীকে ছিনাইয়া লওয়ার ব্যাপারটা জেলা জজ মিঃ বেলীর বিচারে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। বেলী সাহেব সবে

মাত্র ২১শে জুন এখানে আসিয়াছেন। বর্ত্তমান নীল-হাঙ্গামার উক্ত মিথ্যা হাম্‌লা লইয়া নীলকর ও তাহাদের বন্ধুরা বেশ একটা সোরগোল তুলিয়াছিল। এ ব্যাপারটি উপলক্ষ্য করিয়াই স্কীনার সাহেব এই সকল গ্রামবাসী 'বিদ্রোহী' হইয়াছে বলিয়া সরকারে রিপোর্ট করিয়াছিলেন এবং এই অছিলায় এখানে সৈন্যসামন্ত পাঠাইবার আকুল আবেদনও জানাইয়াছিলেন। হাম্‌লায় লিপ্ত সন্দেহে লোকেদের লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এবং সেনাদের যেখানে সেখানে গুলি ছোড়া এবং গর্দ্দান নেওয়ার অত্যাচার হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্ত যশোহরের অধিবাসীরা নীলকরদের সঙ্গে আপোষ করতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণের অভিযোগ হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই হাম্‌লার 'অভিনয়ে' নীলকরদের বড়ই সুবিধা হয়, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার একটা মস্ত বড় ছুতা পান। অন্যপক্ষে তাহারা নিরপরাধ রায়তগণকে কোনক্রমেই বাগ মানাইতে পারিতেন না। আমি রায়ের নকল পাঠাইতেছি। ইহা দীর্ঘ হইলেও সাধারণের নিকট পেশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মিঃ বেলী সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। সমগ্র জেলা তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রায়তদের যে কতখানি প্রিয় হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাকে এবং যিনি এমন এক জন সুবিচারক পাঠাইয়াছেন, উভয়কেই অশেষ ধন্যবাদ।"

কালোপোলের হাম্‌লা যে যশোহরের জেলা জজ বেলীর বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল, শিশিরকুমার উপরোক্ত পত্রেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পত্রের সংযোজনীস্বরূপ তিনি রায়ের নকল প্রেরণ করেন। ইহা পাঠে জানা যাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট যে চারি জনকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহাদের এক জনের শাস্তি তিনি বহাল রাখেন, অন্য তিন জন বেকসুর খালাস পায়। বেলীর রায় ম্যাজিষ্ট্রেটদের অবিমৃষ্যকারিতা ও নীলকরদের প্রতি তাঁহাদের পক্ষপাতিত্বের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ হইয়া আছে।

৪

'M.L.L.'-স্বাক্ষরিত শিশিরকুমারের চতুর্থ পত্রখানি নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার বিভিন্ন পত্রে যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। গোপনে গোপনে সরকার জেলা-শাসকদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিলেন। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা কে বা কাহারা তাঁহাদের এবম্প্রকার 'কীর্ত্তি'-কথা 'পেট্রিয়টে'-মারফত সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিতেছে তাহারও খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন। পত্রখানি যশোহর হইতে ২৫শে জুলাই প্রেরিত; পরবর্ত্তী ১লা আগষ্টের (১৮৬০) 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহা প্রকাশিত হয়। পত্রের মর্ম্ম এই :

"এখান হইতে লিখিত আমার পত্রসমূহে ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেআইনী কার্য্যকলাপের কথা প্রকাশিত হওয়ায়, কে তাঁহাদের এইরূপ বেগ দিতেছে তাহার অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে? স্কীনারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এই ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। কে কে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র গ্রাহক তাহার অনুসন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পাব্‌লিক লাইব্রেরী ব্যতীত আর কেহই এখানে 'পেট্রিয়টে'র গ্রাহক নহেন। এখন কি করা যাইবে? যাহা হউক, ইহার পরেই ঝিকরগাছার ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পত্র পাইয়া তাঁহারা কতকটা সোয়াস্তি পাইয়াছেন। নীলকরদেরই বন্ধু বরদাকান্ত রায় প্রমুখাৎ শুনিয়া নীলকর-বিরোধীদের অন্ততঃ তিন জন নাম তিনি পাঠাইয়াছেন। নামগুলি পাইয়া জেলা কর্ত্তৃপক্ষ যেন গিলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েক জন তাঁহাদের পরিচিত, কয়েকজন অপরিচিত। কিন্তু কে যে কাগজে লিখিতেছে তাহা কেমন করিয়া বাহির করিবেন? কিন্তু ইহাদের মধ্য হইতে আনন্দবাবু নাজির, বিষ্ণুবাবু পোষ্ট মাষ্টার, শিশিরবাবু শিক্ষক, কৃষ্ণবাবু, গিরীশবাবু এবং আর একজনকে তাঁহারা ঐ পত্রগুলির লেখক বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। মিঃ মোলোনী সন্দেহবশে আনন্দবাবুকে ভীষণ ভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। স্কীনারের নিশ্চিত ধারণা, শিশিরবাবুরই এই কাজ। আবার কৃষ্ণবাবুও যে না হইতে পারেন এমন নয়। তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান এবং নীল-বিরোধী মনোভাব সর্ব্বত্র বিদিত। পত্রলেখক যিনিই হউন, গিরীশবাবুও যে ইহার মধ্যে আছেন, এরূপ সন্দেহও তাঁহারা করিতেছেন। এইরূপ গুজব, আনন্দবাবুকে বরখাস্ত এবং শিশিরবাবু ও বিষ্ণুবাবুকে বেত্রাঘাত করা হইবে; আর কৃষ্ণবাবু ও গিরীশবাবুকে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি বর্ত্তমানে নিরাপদে আছি আর দূর হইতে তামাসা দেখিতেছি। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করা হইতেছে, গুজবও রটিতেছে। আমার সম্বন্ধে যখন এই সব শুনি তখন আরও কৌতুক অনুভব করি। মোলোনী অপেক্ষা অধিকতর অবিবেচক এবং হুজুগপ্রিয় (rash) স্কীনার সাহেব আগেকার ধারণা এখনও পোষণ করিতেছেন। তিনি শিশিরবাবু সম্পর্কে প্রত্যেকটি তথ্য, যেমন বাসস্থান প্রভৃতি টুকিয়া লইয়াছেন। আমি আত্মপ্রকাশ করিব না যতক্ষণ না দেখি যে, তাঁহারা উপরোক্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতিনিয়ত আমার ধরা পড়িবার আশঙ্কা

হইতেছে, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। কারণ তাঁহারা একাধিক বার ছোটলাটের অসন্তোষভাজন হইয়াছেন, এবং করলং কর্ত্তৃক বিবেচিত ভারতবর্ষের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১লা আগষ্ট একেবারে বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছেন। তথাপি আমার আশা আছে, জজ বেলী—যশোহরে এমন উৎকৃষ্ট জজ খুব কমই আসিয়াছেন—সর্ব্বশক্তিমান ম্যাজিষ্ট্রেটদের কোপ হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রায় প্রত্যহই উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। এইরূপ একটি কৈফিয়তে স্কীনার সাহেব স্বীকার করেন যে, হেলিডের পরামর্শ অনুসারে তিনি কিছু করিয়াছিলেন—তিনি তাঁকে স্পষ্ট করিয়াই এরূপ করিতে বলেন। এই কৈফিয়তের একটা খসড়া আমি দেখিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ইহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের অনুমতি দেন নাই।

মাগুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলর নীলকরদের বন্ধুরূপে আখ্যাত হইলেও এখন আর ওরূপ নহেন। গুজব এই যে, তিনি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। এতদিন জোরপূর্ব্বক দাবাইয়া রাখিলেও, রায়তেরা বর্ত্তমানে পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। নীল কাটিবার সময় উপস্থিত। বিভিন্ন স্থানের রায়তগণ এক আবেদনে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, গ্রামে বসিয়া নীল-গাঁটগুলির ওজন করিতে হইবে এবং কুঠীতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই দাম মিটাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ তাহাদের ধারণা, তাহারা মূল্যবাবদ এক কপর্দ্দকও পাইবে না। টেলর আবেদনে বর্ণিত বিষয়গুলির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া 'মাদাদ' ('Madads') দিতেছেন যাহাতে রায়তেরা কুঠিয়ালের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যকলাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

মীরগঞ্জ কুঠীতে বড়ই গোলমাল চলিতেছে। রায়তেরা খুবই উত্তেজিত। মল্লিকপুরের সংঘর্ষের ফলে এইরূপ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এই ব্যাপার গত মাসের ২০শে ঘটিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এটি ঘটিয়াছে ১৮ই জুলাই। স্কীনার স্বয়ং ইহার তদন্ত করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, 'মৃতদেহ এবং কতগুলি বহু সাক্ষীর বিবৃতির সঙ্গে মিলিয়া যাওয়ায় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটি সংঘর্ষ নিশ্চয়ই বাধিয়া যায়, আর যোজিয়ারের বাহবের কতগুলি হইতে প্রমাণিত হয় কুঠীর লোকজনও সশস্ত্র ছিল।' লোক গাপ্ করার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আহত লোকদের লইয়া যাওয়া সম্পর্কিত বিবৃতিগুলি এতই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলি বিশ্বাস্য নহে।' অকাট্য প্রমাণ থাকায় স্কীনার শেষে এই কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, 'প্রমাণিত হইল যে, মীরগঞ্জ কুঠী এবং মণ্ডলবাবুদের মধ্যে পাঁচুর বাড়ীতে বসিয়া, তাহাকে জোরপূর্ব্বক কুঠীতে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় একটা মারপিট হইয়াছে; এক পক্ষে পাঁচু শেখ, উজীর মহম্মদ ও বসীরুদ্দীন আজগর এবং অন্য পক্ষে সকরী আহত হইয়াছে; পাঁচু গুরুতর আঘাত পাইবার ফলে অব্যবহিত পরেই মারা যায়। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের আহত ব্যক্তিদের নিজ নিজ হেপাজতে রাখে। প্রতি দলে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ছিল। মণ্ডল-পক্ষীয় লোকেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ খুবই সামান্য, আর পাঁচু শেখকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াসে গ্রামবাসীরা যে বাধা দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া চলে না। জন ড্রাইভার এই সময় মীরগঞ্জে ছিলেন।'

স্কীনারের রিপোর্ট আদৌ নিখুঁত নয়, তথাপি ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, রায়তেরা শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। ঐ সময় জন ড্রাইভার কুঠীতে থাকায় এ বিষয়ে তাঁহার হাত না থাকিয়াই যায় না। তথাপি স্কীনার তাঁহাকে ইংরেজ বলিয়াই হয়ত রেহাই দিয়াছেন। নীলকরেরা হয়ত শপথ করিয়া বলিবেন, তাঁহারা বাংলাদেশের হিতৈষী বন্ধু, তাঁহাদের তরফে অত্যাচার খুব কমই হইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা কিন্তু ভুক্তভোগী এবং কখনও বলিতে ছাড়িব না যে, কোন দেশেই নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ন্যায় বিচার এরূপ ভাবে সেই সব লোকেদের দ্বারা পদ-দলিত হয় নাই, যাহারা নিজেদের সভ্যতা ও উন্নততর চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য খ্যাত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই নিরীহ জাতির নিকট কখনও অত্যাচারী বলিয়া মনে হইতেন না, যদি না নীলকরগণ বিদ্যমান থাকিত এবং যদি সিবিলিয়ানগণ যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেন।"

৫

শিশিরকুমার 'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'M.L.L.'-স্বাক্ষরিত পঞ্চম পত্র লেখেন যশোহর জেলার অন্তর্গত তারাগঞ্জ হইতে ২রা আগষ্ট তারিখে। 'পেট্রিয়টে' ৮ই আগষ্ট এখানি প্রকাশিত হয়। তারাগঞ্জ হইতে কেন পত্র লিখিতেছিলেন, তাঁহার উক্তি হইতেই সেকথা জানা যাইবে। এই পত্র পাঠে আরও জানা যায়, শোলকোপা, বিজলী, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার নীলচাষী রায়ত কুঠিয়ালদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কুঠিয়ালগণ জোরজবরদস্তি করিয়া নীল তুলিয়া আনিবার জন্য রিভলভার, অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছিল; গ্রামবাসীরাও বসিয়া নাই, তাহারাও বর্শা, লাঠি, গদা জোগাড় করিতেছে—প্রতিজ্ঞা, মূল্য না পাইয়া নীল ছাড়িয়া দিবে না। শতখানেক পুলিসও মোতায়েন হইয়াছিল।

ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের আচরণ কিরূপ জঘন্য হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখও এই পত্রখানিতে আছে। যশোহরের সিবিল সার্জন এলিয়ট সাহেব কারাগারে প্রায় পঁচিশ জন নীলচাষীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা আগামী বৎসর নীল বুনিবে, না আবার জেলে আসিবে।' নীলচাষীরা একবাক্যে বলে, 'না সাহেব, তোমরা যদি আমাদের গলা কাটিয়াও ফেল তথাপি নীল বুনিব না। ইহার ফলে আমরা যদি-বা কয়েকজন মারাও যাই, আমাদের দেশের লোকেরা তো সুখে দিন কাটাইতে পারিবে।' এই উত্তর পাইয়া সিবিল সার্জন এলিয়ট খুব রাগিয়া যান, এবং কাছে যে ক'জন দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার বেত্রদণ্ড দিয়া তাহাদিগকে পাঁচ-ছয় ঘা লাগাইয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে 'তুম্ লোক্ বদমাস' এরূপ গালি দিতেও ছাড়িলেন না। ইহার পর শিশিরকুমার যশোহর ত্যাগ করার কারণ সম্বন্ধে এই মর্ম্মে লেখেন :

"তিনি [কীনার] আমাদের যশোহর সংবাদদাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন! শিকড় শিশিরবাবুকে সন্দেহবশে জব্দ করিতে নানা ছল খুঁজিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করিয়াছেন। কীনার পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রামে চাপরাসী পাঠাইয়া চার জন চাষীকে ধরিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মুখ দিয়া তিনি এই কথা বলাইয়াছেন যে, শিশিরবাবুর পিতা তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধা দিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে, কীনার উক্ত চাষীগণকে কিছু দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। নায়েব-দারোগাকে ব্যাপারটি তদন্তের জন্য পাঠানো হইয়াছে। তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সে যেন ইহার যাথার্থ্যই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই সব নয়, কীনার প্রকাশ্যে বহু বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি উঁহাকে দেখিয়া লইবেন ('উস্‌কো দেখেগা')। দেখা যাক্, তিনি কিরূপে শাস্তি প্রদান করেন। যত জঘন্য লোকই হউক, শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ দিতে পারিলেই সে কীনারের নিকট খুবই সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়। দুঃখের সহিত বলিতেছি, আমার এমন নৈতিক সাহস নাই যে, এইরূপ 'ক্ষেপা' ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হই। ইনি যখনই আমার খোঁজ পাইবেন তখনই আমাকে নিশ্চিত ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। ("who is sure to ruin me as soon as he has found his man")। সম্ভবতঃ মিঃ কীনারের ভয় হইয়াছে পাছে কুখ্যাত হাম্‌লার ওজুহাতে কলিকাতা হইতে যে সকল সৈন্য আনাইয়াছিলেন তাহার খরচ তাঁহাকে বহন করিতে হয়— কারণ জেলা জজ বেলীর বিচারে ইহা তো মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

পরবর্ত্তী ২২শে আগষ্ট (১৮৬০) সংখ্যা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'M. L. L'.-স্বাক্ষরযুক্ত শিশিরকুমারের আর একখানি পত্র পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে ও পরে "from our Jessore Correspondent" রূপে আরও কয়েকখানি পত্র বাহির হইয়াছে। এসব পত্রপাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়, এগুলিও শিশিরকুমারের লিখিত। তিনি মফস্বলে বিভিন্ন স্থলে ভ্রমণ করিয়া 'পেট্রিয়টে' সংবাদ পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটদের চোখ এড়াইবার জন্য যশোহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্যও হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা নীলকর-সমাজের সঙ্গে যোগসাজশে প্রজাকুলের উপর কিরূপ উৎপীড়ন-নিপীড়নে লিপ্ত হইয়া পড়েন এই সকল পত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। আগামী সংখ্যায় এই পত্রগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করার বাসনা রহিল।

অন্ধ্রদেশে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গোদাবরী নদীর উপরকার সুবৃহৎ সাঁকো অতিক্রম করে মাদ্রাজ মেল এসে থামল ছোট একটি ষ্টেশনে—নাম কব্বুর।

মোটঘাটসহ ট্রেন থেকে নামতেই একজন প্রিয়দর্শন যুবক দ্রুতপদে কাছে এগিয়ে এসে ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি শ্রীভদ্র, কলকাতা থেকে আসছেন?" তাঁর কথার জবাব দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলাম—"শর্মাজী পাঠিয়েছেন আপনাকে?"

"হাঁ, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, চলুন আমার সঙ্গে।"

দু'জনে এক 'বটকায়' গিয়ে উঠলাম। বটকা হচ্ছে একটি মাত্র গরুদ্বারা চালিত এক প্রকার যানবিশেষ। কব্বুরের রাজপথের উপর দিয়ে আমাদের গোযান ধীরমন্থর গতিতে চলতে লাগল। এমনি ভাবে প্রায় আধ মাইলটাক চলবার পর বাজারে পৌঁছে ডান দিকে মোড় ফিরল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই একটি নাতিবৃহৎ সুরম্য অট্টালিকার সামনে এসে থামল।

ভানিয়াপেটা সম্মেলনে আদিবাসীদের সুতাকাটা প্রদর্শন

আমরা গাড়ী থেকে অবতরণ করতেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ক্ষীণকায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে আমাকে স্বাগত করলেন। পরনে তাঁর শুভ্র খদ্দরের ধুতি, আর একখানি চাদরে দেহের উত্তরার্দ্ধ আবৃত। ইনিই হচ্ছেন 'অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা'র কর্ম্মসচিব, অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত বিদ্বান শ্রীমত্তেশ্বর শর্ম্মা—এঁরই অতিথি হয়ে আমি কব্বুরে এসেছি।

শর্ম্মাজী আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বহির্বাটির একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। খানিক বাদে একজন স্বেচ্ছাসেবক আমার জন্যে কফি ও 'ইডলি' নিয়ে এল। ইডলি হচ্ছে চালের গুঁড়ো আর কলাই ডাল দিয়ে তৈরি একপ্রকার পিঠে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর শরীরটা একটু চাঙ্গা হলে পর শর্ম্মাজীর পুত্র চন্দ্রমূর্ত্তির সঙ্গে গোদাবরী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। গোদাবরী কব্বুরের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবহমান—শর্ম্মাজীর বাড়ী থেকে নদীতীর মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা।

নদীতটে প্রকাণ্ড এক মহীরুহের ঘন পত্রাচ্ছাদনের নীচে প্রাচীন আমলের এক দেবমন্দির। মন্দিরটি যেন মহাকালের মূক সাক্ষী—যুগযুগান্তর ধরে স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে নদীপরপারে আকাশ-বনানীর মিলন-লীলা প্রত্যক্ষ করছে।

বেশ কিছুক্ষণ নদীর ঘাটে কাটিয়ে আস্তানায় ফিরে এলে পর আমাকে সঁপে দেওয়া হ'ল লক্ষ্মীপতি রাও নামে একজন কর্ম্মীর জিম্মায়। তাঁরই উপর আমার আহারাদির ব্যবস্থা করবার ভার। লক্ষ্মীপতি রাও আমাকে নিয়ে গেলেন জনৈক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ-পরিচালিত, অনতিদূরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড হোটেলে—হোটেলটির আভিজাত্য আছে, হরিণ ভাতের শ্রীক্ষেত্র নয়।

শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক থালায় আহার্য্য পরিবেশন করা হ'ল। লক্ষ্মীপতি রাওয়ের নিকট শুনলাম যিনি ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করছেন তিনিই হোটেলের স্বত্বাধিকারী। ভদ্রলোক একাধারে হোটেলের মালিক, পাচক, পরিবেশক সবকিছু—সপরিবারে হোটেলেই বাস করেন। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন।

প্রচুর চাটনি এবং লঙ্কার গুঁড়ো সংযোগে "রসম" "সম্বর্" প্রভৃতি মদ্রদেশীয় খাদ্যবস্তু যা'হোক এক রকম করে যথাস্থানে চালিয়ে দিলাম। প্রচুর দধি, আম এবং ঘিও পাতে পড়েছিল। কিন্তু মুশকিলে পড়লাম 'বাবথাই' দিয়ে তৈরি জেলীর মত এক প্রকার খাদ্যবস্তু নিয়ে। তেলুগু ভাষায় ঝিঙেকে বলে বাবথাই। পরিবেশক বললেন যে, তাঁর স্ত্রী কিছুকাল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাংলা মুলুকে ছিলেন, তাই

তিনি বারবাই দিয়ে এই বাঙালী ধরণের রান্না শিখেছেন এবং বিশিষ্ট বাঙালী অতিথির জন্যে মধ্যে মধ্যে এই আহার্য্য প্রস্তুত করেছেন। কোন্ বঙ্গললনা এই মাদ্রাজী মহিলাটির বঙ্গদেশীয় পদ্ধতির রন্ধনবিদ্যার শিক্ষাদাত্রী তা জানি না।

একটি অন্ধ্রপল্লীর হাটের দৃশ্য

কিন্তু এই মদ্রবধূ যে এক নিরীহ বঙ্গীয় ভদ্র-সন্তানের উপর রন্ধনশিল্পের মারাত্মক 'এক্সপেরিমেন্ট' চালাবেন তা বোধ হয় তিনি ভাবতেও পারেন নি। বারবাই মুখে দিয়েই মুখটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল—মনে হ'ল যে ভোজনটাই মাটি—এই অপূর্ব্ব বস্তুটি আসলে প্রচুর তেঁতুল আর লঙ্কার সঙ্গে সিদ্ধ করে বাটা বিউলির মত। কালো কালো বীচি আর খোসা দেখে বুঝতে পারলাম, যে বিউলি পেকে ফুলে একেবারে পিণ্ডার আকার ধারণ করেছে তাই দিয়ে এ অভিনব বস্তু তৈরি, এদিকে ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন স্ত্রীর প্রশস্তি শুনবার জন্যে—ভেতরে পর্দার আড়ালে চুড়ির টুং-টাং শোনা যাচ্ছে। বললাম, "কি অপূর্ব্ব চীজই না হয়েছে, মনে হচ্ছে ঠিক দেশের রান্না খাচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশক অন্তঃপুরে গমন করলেন আর যবনিকার অন্তরালে চুড়িগুলো আরও একটু দ্রুততালে বেজে উঠল। ফলে যা অনিবার্য্য তাই ঘটল, অন্তঃপুর থেকে প্রেরিত দ্বিতীয় পালার বারবাই আমার পাত্রের মধ্যস্থলে পিরামিডের মত শোভা পেতে লাগল এবং নিঃশেষে তা আমাকে অবলীলাক্রমে উদরস্থ করতে হ'ল। এমনিভাবে সেদিনকার মত ভোজন-পর্ব্বের উপসংহার হ'ল বটে, কিন্তু মনে আশঙ্কা জেগে রইল যে রোজই না ভোজন-পাত্রে বারবাইয়ের আবির্ভাব এমনিতর বিপর্য্যয় ঘটায়।

৮ই জুন সকালে ৮টার সময় গোদাবরী নদীতীরস্থ বীরমন্দিরে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন হ'ল। এই সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যেই শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা কর্তৃক আহূত

বীরমন্দির অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। আমাদের মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে অন্ধ্রদেশের যে সকল বীরসন্তান জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দেশভক্ত' কোণ্ডাভেঙ্কটাপ্পায়া এর উদ্বোধন করেন এবং উক্ত দিবসেই এই মন্দিরে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার কার্য্যালয় খোলা হয়। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ হচ্ছে সেবার ভেতর দিয়ে দেশের অগণিত মূঢ় মূক জনগণের সঙ্গে যোগস্থাপন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে 'সভা'র কর্ম্মীদের উদ্যোগে অন্ধ্র-প্রদেশের ভাইজাগ, কৃষ্ণা, কুরনুল প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি 'শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু

অনকাপল্লী

এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু সমতল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ অন্ধ্রের এজেন্সী এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে যেভাবে এঁরা কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে আসছেন তা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অনুকরণযোগ্যও বটে। বিশাখাপত্তন জেলার মহুগোলা এবং অনন্তগিরি এজেন্সীর সমগ্র পার্ব্বত্য অঞ্চল জুড়ে এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার কর্ম্মীরা যখন প্রথম এই সকল আদিবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন, চরকায় সুতাকাটা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণ-কর্ম্মের সূচনা করেন তখন তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর আশীর্ব্বচন লাভ করতে সক্ষম হন। গান্ধীজী ১৯৪০-এর ২৫শে আগষ্টের 'হরিজন' পত্রিকায় আদিবাসীদের মধ্যে এঁদের এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানের প্রতি উচ্চস্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে 'মহুগোলা, আদিবাসী কল্যাণ সঙ্ঘে'র উদ্যোগে হদুমপেটা এবং কাদিয়াপেটায় যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

এসে পড়েছি—এবার বীরমন্দিরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কথা সুরু করি।

ওয়ালটেয়ারের একটি রাস্তা

শান্ত গম্ভীর পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের দ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল। গানটি গাইলে একটি আদিবাসী যুবক। সুদূর কাবিরাপেটার পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে সে এসেছে এই সম্মেলনে যোগদান করতে। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর বীরমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দুটি পতাকা উত্তোলিত হ'ল—ভারতের জাতীয় পতাকা এবং শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রতীক শ্রমিক পতাকা। শ্রমিক পতাকা নীল এবং জরদা এই দ্বিবর্ণরঞ্জিত। পতাকা উত্তোলনের পর সেই আদিবাসী যুবকটি কর্ত্তৃকই গীত হ'ল তেলুগু ভাষায় রচিত 'শ্রমিক সঙ্গীত'। তার শেষাংশটি এইরূপ:

'ভানিকি চৌড়ুগা, বাট্টি শ্রমিকুলা
দুষ্টে তিপেন্‌চেন'

অর্থাৎ—'শ্রমিকের যাত্রা কোন্ পথে?
বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে, ঐক্যের আর বিশ্বমৈত্রীর পথে।'

সঙ্গীত সমাপনান্তে সুরু হ'ল মন্দিরাভ্যন্তরে সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান। শুভ্র খদ্দর পরিহিত কর্ম্মীরা সার বেঁধে বসে নিবিষ্ট চিত্তে চরকায় সূতা কাটতে লাগলেন—তাঁদের নিষ্ঠার ভাবটি মনকে মুগ্ধ করল।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক দিকের আরও কতকগুলি ব্যাপার সমাধা হলে পর শ্রীমত্তের শর্ম্মা 'আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শ' সম্বন্ধে তাঁর মৌখিক ভাষণ দিলেন। এমন চমৎকার ভাষণ শোনা সৌভাগ্যের কথা। শ্রোতাদের মনকে তিনি এমন এক স্তরে নিয়ে গেলেন যেখানে দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন আগে মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেশের জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে "নিখিল শাস্ত্রসাগরের অগস্ত্য মুনি" আখ্যা দিয়েছিলেন। শর্ম্মাজীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমর্থিত শাস্ত্রব্যাখ্যান শুনে মনে হ'ল এই অভিধা এই জ্ঞান-তাপসের প্রতিও প্রযোজ্য।

পরদিন (১ই জুন) অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় বীর-মন্দিরে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হ'ল। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহিলাবৃন্দ, যুবক ও ছাত্রদের সমাবেশে বীরমন্দিরে আর তিলধারণের জায়গাটুকু পর্য্যন্ত রইল না। কৃষ্ণা জেলা প্রভৃতির ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থান থেকেও শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার শাখা-কেন্দ্রসমূহের বহু কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। সভার বিজ্ঞপ্তিপত্র তো প্রচারিত হয়েই ছিল, তার উপর ঢোল-শহরতেও সভার কথা প্রচার করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভাস্থলে বসে ঢোলের আওয়াজ আর ঘোষকের কণ্ঠস্বর কানে আসতে লাগল। শর্ম্মাজী

বিশাখাপত্তম—জেলেপল্লীর একাংশ

বললেন—"ভদ্রজী, বহু বৎসর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমাদের যৌবনকাল। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ উপলক্ষে আমরা যে সভার আয়োজন করি তার কথা এই লোকটিই ঢোল বাজিয়ে শহরময় ঘোষণা করেছিল।"

যথোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সভা আরম্ভ হ'ল। শর্ম্মাজী সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত আমার পরিচয়সাধন করিয়ে দিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে অনুরোধ করলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমার ভাষণটি ছিল দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ছিল শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণা এবং আমাদের আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আর দ্বিতীয় অংশে ছিল পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের কথা। সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলতে অনুরোধ করায় আমার ভাষণের দ্বিতীয় অংশটি পরে সংযোজিত করেছিলাম। সভায় একদিকে যেমন বহু শিক্ষিত লোকের, অন্যদিকে তেমনি স্বল্পশিক্ষিত এবং অনেক আদি-

খালীরও সমাগম হয়েছিল সকলের বোধসৌকর্য্যার্থে বীরমন্দিরের কর্মসচিব, স্থানীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ কে. ভি. এস. আপ্পারাও এম-এ আমার ভাষণ মুখে মুখে তেলুগু ভাষায় তর্জ্জমা করেন। আমার ভাষণের পর সভায় কতকগুলি বক্তৃতা হয়। স্থানীয় হিন্দী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী কে. এস. রমন্মার বক্তৃতা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়।

বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত একটি গরু
সহ জনৈক ভিক্ষার্থী

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল যে, আজ আর সভা-সমিতির হাঙ্গামা নেই, আজ আমি অনেকটা স্বাধীন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কতকটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলাম, গোদাবরীর তটভূমি যেন আমাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল—দুর্নিবার সে আকর্ষণ। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে উঠে ধর্ম্মশালার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে গোদাবরী নদীর তটাভিমুখে চলতে লাগলাম। অন্ধকার তখনও ভাল করে কাটে নি—রাস্তার দু'ধারের ইটের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীগুলি যেন স্বপ্নপুরীর মত রহস্যময়—রাত্রিশেষে অপরিচিত দেশের জনশূন্য অজানা রাস্তায় চলতে মনে বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগছিল। ক্রমে একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল—রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা জেগে উঠে ঘরের বারান্দা এবং প্রাঙ্গণ আল্‌পনা (মুগ্‌গু) দ্বারা চিত্রিত করতে লাগলেন। অন্ধ্রের মেয়েদের এটি হচ্ছে নিত্যকর্ম। ভোরবেলা প্রথমে এই কাজটি সেরে তার পর তাঁরা গৃহকর্ম্মে রত হন।

বীরমন্দির ছাড়িয়ে আন্দাজ কুড়ি ফুট উঁচু এক রাজপথের উপরে এসে উঠলাম—এই প্রশস্ত বর্ত্মটি গোদাবরী নদীর পশ্চিমধের সহিত সমান্তরাল ভাবে উত্তর-দক্ষিণে

রাজপথ থেকে নিম্নাবরোহণ করে গোদাবরীর তটসংলগ্ন সুদূরপ্রসারিত মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ালাম। সম্মুখে পুণ্য-প্রবাহিণী গোদাবরীর স্ফটিকস্বচ্ছ বারিরাশির অবাধ বিস্তার। ক্রমে ও-পারের বনশ্রেণীর উপরকার মেঘস্তূপ বিদীর্ণ করে জবাকুসুমসঙ্কাশ বালারুণ আকাশে উঠল, মেঘচ্ছায়ার প্রতিফলনে নদীর বারিরাশি হয়ে উঠল বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত। আলোর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপূর্ব্ব দিকে নীল আকাশের পটভূমিকায় ফুটে উঠতে লাগল সুনীল পাহাড়ের তরঙ্গায়িত রেখাসমূহের আদল। কোন্ মহান্ শিল্পী যেন বহু প্রযত্নে একখানি সুবিস্তীর্ণ নীল ক্যানভাসের উপর বিচিত্র বর্ণবিন্যাস ও নিপুণ রেখার প্রয়োগে অপরূপ রূপসৃষ্টি করে চলেছেন। প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, গোদাবরীর আলোকোজ্জ্বল বক্ষে একটি নূতন দিনের জন্মলীলা প্রত্যক্ষ করলাম—নদীর পুণ্য-সলিলে অবগাহন করে আমারও যেন হ'ল নবজন্মলাভ।

স্নানান্তে অদূরে নদীতটস্থ তরুমূলে গিয়ে বসলাম। ওপারের বালুচর থেকে রক্তের মত রাঙা লাল বালুকারাশি বোঝাই করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পালতোলা নৌকাগুলি গোদাবরীর বুকে পাড়ি জমিয়েছে। গোদাবরীর বদ্বীপ নদীর ঘাট থেকে অনতিদূরবর্ত্তী—নদীর প্রবাহ এখানে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। আন্দাজ আধ মাইলটাক দূরে 'গোদাবরী'র পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সাঁকো 'গোদাবরী ব্রিজ'। ক্রমে নদীর ঘাটে স্নানার্থী স্ত্রী-পুরুষের ভিড় হতে থাকে। মেয়েদের পায়ে মোটা রূপার খাড়ু, হাতে মাজাঘষা চকচকে ঝকঝকে জলের কলসী। একই ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি অবগাহন স্নান করেন—অযথা সঙ্কোচ নেই। গৌরকান্তি ব্রাহ্মণেরা একবুক জলে দাঁড়িয়ে নবোদিত সূর্য্যের পানে তাকিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করেন; তাঁদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি যেন নদীবক্ষ থেকে অনন্ত অম্বরাভিমুখে উত্থিত হতে থাকে। এখানকার এই পুণ্যপরিবেশে গোদাবরীর জলকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন ভারতের তপস্যাপূত জাতীয় জীবনের হৃৎস্পন্দনধ্বনি শুনতে পাই।

ঘাটের অনতিদূরে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ছোট জাল দিয়ে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ মাছ ধরছে। পুরুষদের পরনে নেংটি, মেয়েদের দেহে যে অপরিসর বস্ত্রখণ্ড জড়ানো লজ্জা নিবারণের পক্ষে তা সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। তাদের গায়ের রং মিশকালো—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এরা যে এদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী তা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না। আর্য্য ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা এবং অনার্য্য ভারতের অপরিসীম দীনতাকে এমন ভাবে প্রত্যক্ষ করবার এরূপ সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর জীবনে হয় নি। অন্ততঃ দু'হাজার বৎসর পাশাপাশি

মধ্যে যে কি দুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

এখান থেকে কয়েক রশি মাত্র ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন আমলের আর একটি মন্দির। এই মন্দিরটির নাম গৌতম মন্দির। কথিত আছে যে, এই কব্বুরই ছিল ঋষি গৌতমের তপস্তাভূমি। এখানেই গোদাবরী নদীর তীরে ছিল
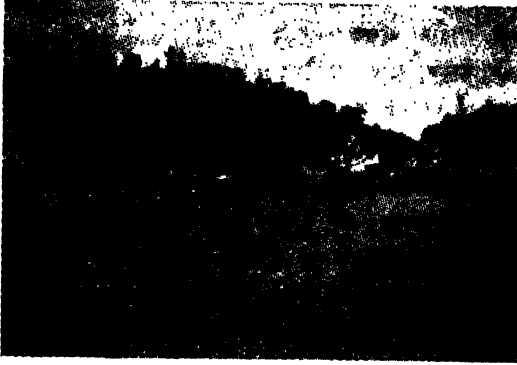
'বার্চ হিলে'র পাদদেশে বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের দৃশ্য

এই মহাতপা ঋষির আশ্রম। ভারতের এই বরণীয় ঋষির স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই সুদূর অতীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। গৌতমের সহিত জড়িত বহু কাহিনী এখনও কব্বুরে প্রচলিত আছে।

নদীতটে এক নিভৃত মনোরম স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত—দু'ধারে দু'সারি তালগাছ জায়গাটির শোভা বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়ে আছে। তপস্তার উপযুক্ত স্থান বটে। এখানে দু'দণ্ড বসতেই যেন মনের সকল চাঞ্চল্য দূর হয়ে গেল—মন ভরে উঠল একটা গভীর প্রশান্তিতে। মন্দিরের সম্মুখভাগস্থ আলিসার শীর্ষদেশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দীর্ঘ শ্মশ্রুবিমণ্ডিত ঋষি গৌতমের ধ্যানগম্ভীর প্রতিমূর্তি হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে দিলে। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম রশ্মিমালা মূর্ত্তিটির মস্তকে যেন স্বর্গের আশিস্‌ধারার মত অরুপণ দাক্ষিণ্যে ঝরে পড়ছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে আছে ঋষি গৌতমের শ্বেতবর্ণানুরঞ্জিত একটি প্রতিমূর্ত্তি, আর তার পাশেই একটি দেবমূর্ত্তির মস্তকোপরি একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সর্পমূর্ত্তি ফণা বিস্তার করে বিরাজমান। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তের প্রস্তরবেদিকার উপরে কণাধর একটি নাগমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মূর্ত্তি দক্ষিণ-ভারতে নাগপূজার বহুল প্রচলনের পরিচায়ক।

মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করে আস্তানায় ফিরে এসে বিশ্রামের আয়োজন করলাম।

বিকেলে লক্ষীপতি রাওয়ের সঙ্গে শহর দেখতে বের হওয়া গেল। শহরটি ছোট কিন্তু ঝকঝকে তকতকে—বেশীর ভাগই ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পাকাবাড়ী। প্রথমেই আমরা বাজারে এসে উপস্থিত হলাম। বাজারের ঠিক মাঝ-খানে একটি চালাঘরের নীচে স্বর্ণকান্তি পাকা আমের স্তূপ। এদেশের আম দেখতে যেমন নয়নলোভন তেমনি খেতেও অনুপম, আবার দামেও ঢের সস্তা। আমের নামই বা কেমন কবিত্বপূর্ণ—যেমন সুবর্ণরেখা। জাম এবং কলারও ছড়াছড়ি দেখলাম। জামগুলি বেশ পরিপুষ্ট আর নিটোল—জামকে এরা বলে জম্বু। কব্বুরের পানও অত্যন্ত মুখরোচক, পানকে এরা বলে তাম্বুল, চূণকে চূণম্। এখানকার স্থানের নাম, ফলের নাম ইত্যাদি সবকিছুতে সংস্কৃত শব্দের ছড়া-ছড়ি দেখে মন চলে যায় প্রাচীন ভারতে। শহরের উপকণ্ঠে 'জম্বু'-বন দেখে মেঘদূতে বর্ণিত, বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা, উপলবিষম জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত প্রবাহ রেবানদীর কথা স্মৃতিতে জাগে—মনে পড়ে মেঘের প্রতি যক্ষের উক্তি—

তস্তাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জ প্র'তহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ…ইত্যাদি।

বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ

বাজারে আর একটা জিনিষ দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। প্রত্যেক দোকানেই—তা সে যত ছোটই হোক্‌ না কেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একখানা বা একাধিক ছবি আছেই। নেতাজীকে অন্ধ্রদেশবাসীরা দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁর নাম তারা উচ্চারণ করে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে। অন্ধ্রদেশে নেতাজীর অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না।

এ ছাড়া কত রকমের মানুষ যে বাজারে নজরে পড়ে তার আর অন্ত নেই। গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ শহরের নরনারীর চাইতে আলাদা ধরণের। বাজারে সমাগত অনেক গ্রামবৃদ্ধের মাথায় পাগড়ি, কানে পিতলের আংটি, নাকে রিং। গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকের শাড়ী মালকোঁচা দিয়ে পরা। এটা সম্ভবতঃ মরাঠা-প্রভাবের ফল।

তরুণীদের সর্বাঙ্গে গহনাগাঁটির প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। তাদের নাকে নাকছাবি (মিরাট্টী পুলিয়া) এবং একপ্রকার রিং (মুদু পুড়ুকা), গলায় গিনিসোনার তৈরি কণ্ঠহার (মারু), আর প্রবালের মালা। বাজারে অনেক পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষও সওদা করতে এসেছে। কইয়া নামক পাহাড়ী মেয়েরা বেশ স্বাস্থ্যবতী, দৈহিক সৌষ্ঠবসম্পন্না এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—তাদের কর্ণভূষণে পুষ্পগুচ্ছ গোঁজা।

কভ্বূরে একজনও বাঙালী নেই। শহরের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তে একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ আছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্যাসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে নবদ্বীপের জনৈক বৈষ্ণব এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন—বর্ত্তমানে এই মঠাধীশ হচ্ছেন জনৈক উড়িষ্যা-দেশীয় বৈষ্ণব। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নাকি বর্ত্তমান লেখক ছাড়া কোন বাঙালী এখানে আসেন নি। তেলুগু আর ইংরেজী ভাষা ব্যতীত এখানে আর কোন ভাষা প্রচলিত নেই। এখানে সকল শ্রেণীর লোকই ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলতে পারে। সামান্য দোকানদারও কাজচালানো গোছের ইংরেজী জানে। সম্প্রতি এখানে হিন্দী ভাষা প্রচারের চেষ্টা চলছে।
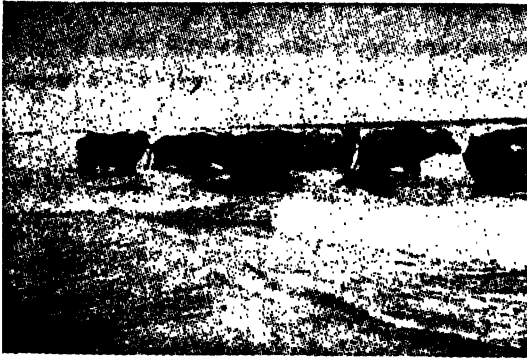
একপাল মহিষের সমুদ্র-স্নান

পরদিন বেলা ন'টার সময় লক্ষ্মীপতি রাওকে সঙ্গে নিয়ে রাজমহেন্দ্রীগামী ট্রেন ধরবার জন্য কভ্বূর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত অন্ধ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ট্রেন যথাসময়ে এসে ষ্টেশনে পৌঁছল এবং গোদাবরী নদীর পুলের উপর দিয়ে দু'তিন মিনিটের মধ্যে আমাদের ওপারের ষ্টেশনে নিয়ে গেল। ষ্টেশনের নাম গোদাবরী।

ষ্টেশনে নেমেই দেখি কয়েকজন রূপলাবণ্যবতী অন্ধ্র মহিলা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী ট্রেনের জন্যে বিশ্রান্তি-ভবনে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের লাবণ্যচ্ছটা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য চোখ ঝলসে দিলে। পরনে তাঁদের বিচিত্র বর্ণের শাড়ী, অলঙ্কৃত মস্তক বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত—তাঁদের কেশবিন্যাসের ভঙ্গী মনমাতিয়ান, পৃষ্ঠদেশে দোলায়মান সুদীর্ঘ সুচিক্কণ বিনুনিতে চম্পক এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পমাল্য জড়ানো, ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, চোখে কাজল, কটিতে কারুখচিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত নীবিবন্ধ। হঠাৎ যেন চমক লেগে যায়, মনে হয় অজন্তা গুহাচিত্রের কতকগুলি নারী-মূর্ত্তি কি কায়া পরিগ্রহ করে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

ষ্টেশন থেকে আমরা সরাসরি চলে গেলাম রাজমহেন্দ্রীর একটি প্রাচীন মন্দির দেখতে। মন্দিরের শীর্ষদেশে তম্বুরু, ভৈরব, নারদ, ব্যাস, তৃণীশ্বর এবং মন্ডেশ্বর এই ছয় জন ঋষির ধ্যানাসনে উপবিষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তম্বুরুর মুখ হুবহু ষাঁড়ের মুখের মত।

আরও কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরাদি দেখে শহরের বাজারের ভেতরে এক চক্কর ঘুরে আসা গেল। ষ্টেশনে ফেরবার পথে গোদাবরী নদীর তীরে এক গাছতলায় প্রকাণ্ড ভিড় দেখে এগিয়ে গিয়ে যে দৃশ্য নজরে পড়ল তাতে হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। গাছতলায় ধুনি জ্বালানো, তার এক পাশে তিনহাত লম্বা আর হাতখানেক চওড়া, বহুসংখ্যক লোহার পেরেক লাগানো একটা তক্তার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে নির্ব্বিকার ভাবে বসে আছে অস্থি-চর্ম্মসার জটাধারী এক পশ্চিমা সাধু। ধুনির অপর পার্শ্বে গৌরবর্ণ বিশালকায় নওজোয়ান আর এক সাধু গঞ্জিকার ধূমে দশদিক আচ্ছন্ন করে সম্ভবতঃ দশমহাবিদ্যার রূপদর্শনের প্রয়াস পাচ্ছে। আমি পেরেকগুলির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ গাঁজায় কল্‌কেতে ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদী একটা টান মেরে জোয়ান সাধুটি আমাকে চমকিত করে দিয়ে অপূর্ব্ব বাংলায় বললে, "ও মোশাই, ও বংগালী বাবু, এ লোকোল নয়, আসোল শরশয্যা, ও ভীষ্মজী আছে; বিসোয়াস না হোয় তো পেরেকমে হাথ্ লাগাইয়ে দেখুন।" শুনে কৌতূহল হ'ল—হাতের চেটো দিয়ে পেরেকগুলির উপরে সামান্য চাপ দিলাম। হাত টন্‌টন্ করে উঠল। সাধুজী তখন আমার মুখের পানে তাকিয়ে ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হেসে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, তিনি বহুবার কলিকাতায় গেছেন এবং সেই সুবাদেই বঙ্গভাষায় এতাদৃশ বাক্‌পটুতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ভীষ্মজীসুদ্ধ শরশয্যা কাঁধে করে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি কন্যাকুমারিকা থেকে এসেছেন। এখানে কি একটা যজ্ঞ হবে। তার পর যাবেন উত্তর-ভারতে। পেরেক-শয্যায় উপবিষ্ট সাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা প্রভুজী, আপনি কি চব্বিশ ঘণ্টা এই শরশয্যাতেই সুখাসীন থাকেন?" ভীষ্মজী জবাব দিলেন না, দন্তবিকাশ করলেন মাত্র। আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, এর মধ্যে আবার হাসিও আসে! জোয়ান সাধুজীর মুখে

আবার খই ফুটল, বললে, "তীর্থস্বামী মৌনী আছেন—কোথা বোলেন না। হাঁ মোশাই, তীর্থস্বামীকে ইসবে বোসতে গুতে সব কুছ কোরতে হয়।" মনে মনে বললাম, "আর তুমি ব্যাটা বদ্ধ দুর্য্যোধন। এই খেল দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে দুধ-ঘট আর 'রোটি রোটি রোটি' খেয়ে খাঁসে জলে 'পুরুষ্টু' হচ্ছ—আর তীর্থস্বামী যে অনাহারে আর শরশয্যার খোঁচায় ঢোটে দিন দিন চিমসে মেরে যাচ্ছে সে তো বেচারার চেহারাতেই সুপরিস্ফুট। অভিমন্যু লাভ না করা পর্য্যন্ত যে শরশয্যার হাত থেকে তীর্থস্বামীর নিষ্কৃতি নেই তা বুঝতে পারলাম। লোকটার উপর রাগ হ'ল। তার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে সাজোয়ান সাধুজীকে বললাম, "সাধুবাবা, তীর্থস্বামীকে একটু ভাল করে রসদ যুগিও, নইলে বেশীদিন এ খেল দেখাতে পারবে না।" সাধুজী জবাবে কি বললেন তা শুনবার আগ্রহ রইল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানেও যে একই নীতি—সেই দুর্ব্বলের উপর প্রবলের জবরদস্তি। এই ধর্মক্ষেত্র থেকে সরাসরি ষ্টেশনে এসে কভ্‌ভূরগামী ট্রেন ধরলাম।

কভ্‌ভূর থেকে ফেরবার দিন স্থানিক ধর্মরাজ্য সভার কর্মীরা আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বিশাখাপত্তম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বহু দিন ধরেই ছিল, তাই ওয়ালটেয়ারের টিকিট কাটলাম।

ট্রেন যখন গোদাবরী নদীর উপরকার পুলের উপর দিয়ে চলতে লাগল তখন কভ্‌ভূরকে শেষবারের মত একনজর দেখে নেবার জন্যে পেছন ফিরে তাকালাম। রোজকার মত নদীর ঘাটে পুণ্যকামীদের ভিড় জমেছে, নদীতীরে ঐ তো দাঁড়িয়ে সেই বিরাটকায় মহীরুহ যার স্নিগ্ধছায়াতলে বসে প্রত্যক্ষ করেছি প্রাচীন ভারতের বিরাট অধ্যাত্ম-মহিমাকে। মনে এমনি একটা অনির্দেশ্য বেদনাপূর্ণ অনুভূতি জাগল যেন কি এক অমূল্য সম্পদ গোদাবরী নদীর ঐ নির্জ্জন তটভূমিতে ফেলে রেখে যাচ্ছি।

ট্রেন ছুটেছে প্রবল বেগে—গোদাবরী চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'ধারে নূতন দৃশ্যপট। কোথাও লাল মাটির প্রান্তর, মাঝে হরিৎ শস্যক্ষেত্র; কোথাও মাইলের পর মাইল জুড়ে সারিবাঁধা সরল সমুন্নত তালীবন, কোথাও বা দূরপ্রসারী তালীবনের শেষপ্রান্তে আকাশছোঁয়া ধূসর পাহাড়, মাঝে মাঝে পাহাড়ের পাদদেশে তালপাতার ছাওয়া চূড়াকার চালাবিশিষ্ট পাহাড়ীদের কুঁড়েঘর, দূরের অনতিদূরবর্তী শস্যক্ষেত্রে মালকোঁচামারা, রঙীন শাড়ীপরা পাহাড়ী মেয়েরা ক্ষেত্র-কর্ম্মে রত। এমনি সব বিচিত্র দৃশ্য আর অনেকগুলো ষ্টেশন পিছনে ফেলে আমাদের ট্রেন বেলা বারোটায় এসে পৌছল ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে।

'বেদনী হোটেলে'র কথা জানা ছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে গাড়োয়ানকে সেই হোটেলেই নিয়ে যেতে বললাম। বিশাখাপত্তমের রাজপথের উপর দিয়ে অশ্বযান ছুটে চলল। সমুখে পেছনে—ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকাই নজরে পড়ে আকাশছোঁয়া পাহাড়শ্রেণী—দূরে ধার্ক হিলের পাদমূলে বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয় চকিতে দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

হোটেলে পৌছে খানিক বিশ্রাম করেই রওনা হলাম সমুদ্রতীরের উদ্দেশে—বালুবেলার উপর পা ছড়িয়ে বসলাম। সমুখে নীলকান্তমণিনীল সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গমালা প্রচণ্ড গর্জ্জনে ছুটে এসে তটভূমির সন্নিকটে শতধা ফেটে পড়ছে—বাম

বিশাখাপত্তনের সমুদ্রতীর—দূরে 'ডলফিনস নোজ পাহাড়'

দিকে দূর একটি শৈল একেবারে সমুদ্রগর্ভে নেমে এসেছে। সমুদ্র গর্জ্জনমুখর, পাহাড় চিরমৌন। সমুদ্রগর্ভোত্থিত এই পাহাড় কত যুগ-যুগান্ত ধরে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত বুক পেতে সহ্য করছে—কে জানে!

ক্রমে নৈশ-অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকায় চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মাঝদরিয়ায় জাহাজের বুকে বৈদ্যুতিক আলো যেন সমুদ্রতলবাসী কোন অতিকায় দৈত্যের রক্ত-চক্ষুর মত জ্বলতে থাকে। ধীরে ধীরে লোকের ভিড় কমে আসে। নির্জ্জন সমুদ্রতীরে বালুকা-শয্যায় সটান শুয়ে পড়ি—সমুদ্রের মহা-সঙ্গীতের গূঢ়ার্থ এবার যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। সমুদ্রবেলা সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হয়ে যায়। বালুশয্যা থেকে উঠে লোকালয়ের দিকে পা চালিয়ে দিই।

অভিসারিকা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজ এমন দিনে গো কাছে এসে দ্বারে দুরু দুরু বুকে থেকো না,
দ্বারে দ্বারে দুরু দুরু বুকে থেকো না।
ওই গুণ্ঠন তব লাজ আবরণে অভিসারক্ষণে রেখো না,
ওগো, অভিসারক্ষণে রেখো না।

অনুরাগে যদি ভরে ওঠে মন দিয়ে কেন তব বেদনা,
নীরবতা দিয়ে আপনারে ঢেকে ঘুমে জড়ায়ো না চেতনা।
ওই অধরের ভাষা চেপে রেখে আর
ব্যথা বহিও না প্রাণে অনিবার:
ফুরালো সময় দিন গুনিবার
মণিকা! ওগো স্বপন-পথের মণিকা!
আজ অমন করে ও চোখে চোখ তুলে নয়নে আনন ঢেকো না।
ওগো, নয়নে আনন ঢেকো না।

হরিণ-নয়না! আমারো নয়নে
পড়ে তব মন-ছায়া যে,
তুমি ভাবো বুঝি তুমি ছাড়া কেহ জানে না!
আশাপথ জুড়ি নিরবধি
রচে নয়নের মধুমায়া যে।
মনোহরণের যবনিকা তুলে মোর পানে মন টানে না!
নীল কাজলের রেখা দিয়ে কেন প্রণয়ের লেখা লেখো না!
কেন প্রণয়ের লেখা লেখো না!

বহে মদির বাতাস, রাতের অশ্রু ঝরে পড়ে ওগো ললনা,
তুমি ফুলডোরে বাঁধো পুলকের রাখী কেন লাজ এত বল না?
দূরে আনন বাদের বিদায়ের গানে
বেদনার সুরে যদি মন টানে,
সুর -গুলি শুধু গেঁথে রেখো তব প্রাণে
মণিকা! ওগো অচপল অভিসারিকা!
তুমি অমন করে গো মনের ছায়ায় ব্যথায় পরাণ রেখো না,
মোর ঘরে জ্বলে দীপ তুলে ধরো তারে দূরের সোহাগ মেখো না।

মহুয়া

শ্রীগোপাললাল দে

আবার এলো কি নব বসন্ত কাননের কোণে কোণে,
মহুয়ার ফুলে দোলা দিয়ে দুলে মধুকর গুঞ্জনে?
ওগো সুচরিতা, আজ একবার স্মৃতির দুয়ার খোলো,
তোমার আমার সেই পরিচয়! বুঝি বা পুরানো হোলো?
যেদিন তোমারে প্রথম হেরিনু শ্যামা সুন্দরী তনু,
নব বসন্তে ফুল-নির্ঝর ঝরায় পুষ্পধনু;
দূর বন হ'তে সুবাসিত বায়ু ভ্রমর-বিরুত সনে.
তোমারে আমারে ঘিরি ঘুরছিল বনানীর এক কোণে;
সারারাত শুধু অঘোর জোছনা শাখা-নীড়ে উঠে মাতি,
নারিকেল-শাখে বহু ইঙ্গিত; জেগে কেটে' যায় রাতি।
শুধু রস আস্বাদ,
মনে ভেবেছিনু এমনি কাটিবে, বিধি দিবে পরমাদ।

ভুল ভেঙে গেল রঙ না যেতেই, হেরিনু চকিতহত,
জীবনযুদ্ধে সখা-সখী কোথা? বিষম বিশিখাহত
হাল ছেড়ে দিই বারে বারে যত, তুমি তারে ধরো নিতি,
শ্লথ বন্ধন, কুণ্ঠিত হয় প্রীতি।
এমনি সে দশা; নব বসন্ত কত আসে ফিরে যায়,
ঝঞ্ঝা-পীড়িত ক্লান্ত কপোত দিশা খুঁজে নাহি পায়।
দিন যায় ক্ষীণ আশা,
মিলাইয়া দেখি অনেকখানি যে হারায়েছে ভালবাসা।

আজিকে আবার বনে বনান্তে চলিয়াছে কানাকানি,
পুষ্পলাবীরা আসিতেছে বুঝি? তারই চলে হাতছানি।
ওগো, ভেবে দেখ, কত নব কাননে,
অনন্ত কালে অনাদি জীবনে মিলনের জাল বুনে।
ঝিরি ঝিরি ঝরে রসনির্ঝরে 'ভুবন-ভোলা' সখী,
জোড়া জোড়া ঘুঘু শ্যামা খঞ্জনা অবারিত মাঠে হায়,
শিমুলে পলাশে কাঞ্চনাশোকে বসন্ত রঙে হাসে,
মহুয়া বনের নিমন্ত্রণের বাণী দিগন্তে ভাসে।
সারা রাত ফুলদোল,
মাদলের তালে বনবালাদলে নৃত্যের কলরোল।
হারাবার নয় আজিকার দিন, ভয়োনিমুক্তমন,
অমর যে প্রেম বারে বারে তার হউক উজ্জীবন।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

যেদিন কথা দেওয়ার কথা ছিল—তার আগেই দেখা করলে ত্রিলোচন সেনের সঙ্গে। বললে, আপনার কথায় আমি রাজী। কোথায় যেতে হবে—আর কবে যেতে হবে বলুন।

ত্রিলোচন সেন বিস্মিত মুখে প্রভাতের পানে খানিক চেয়ে রইলেন। এ যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। এই প্রভাতই না কিছুদিন আগে কঠিন মন নিয়ে এই বাড়ী ত্যাগ করে গিয়েছিল! এর মনে সেদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল দারিদ্র্যের পেষণে তা কি বাষ্প হয়ে গেল আজ? ও কি বেকার-জীবনের জ্বালা সর্ব্ব সত্তা দিয়ে অনুভব করছে? হয়ত মনে মনে বুঝছে বাংলাদেশের গৃহস্থঘরের ছেলের এ ছাড়া আর গতিই বা কি? কোনমতে একটা আশ্রয়—উদরপূর্ত্তির জন্য কিছু তণ্ডুলকণা—সারা জীবন অনায়াসে বিকিয়ে দেওয়া যায়…সেই নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছতায়। যাই হোক, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ করে ভেবে দেখেছ? ছ' মাস, ছ' মাসের জন্য শহর ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে তোমার অসুবিধা হবে না?

না—এমন আর অসুবিধা কি?—একটু হেসে বললে প্রভাত, অসুবিধা যা মনে করি তা একান্ত ভাবে মনেরই ব্যাপার বই তো নয়।

মানে? ত্রিলোচন সেন প্রতিপ্রশ্ন করলেন। একটু থেমে উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললেন, মনটাই কি আসল নয়? আমরা হিন্দুরা অবশ্য মনের ওপরেও একটা জিনিস মেনে থাকি।

সে জিনিস যাই হোক—দেহকে চালায় যে সকল ইন্দ্রিয় তার মধ্যে মনটাই হ'ল প্রধান। মনের ক্রিয়াতেই সুখ দুঃখ—লাভ লোকসান—ভাল মন্দ যা বলেন তাই।

বাঃ রে দার্শনিক—এমন নিস্পৃহ ভাবে যদি জিনিসটাকে দেখতে শেখ—তোমার দুঃখকষ্ট কিসের? তুমি তো—

কিন্তু আমি মনের তত্ত্বকথা শোনাতে আসি নি। এ বিষয়ে আমার জ্ঞানও কম।

যাই হোক—কথাটা বলেছ ঠিক। জ্ঞানের রাজত্বে মনকে এক পাশে সরিয়ে রাখা কঠিন। মনের যে ধারা আছে—চিন্তার সুতো ধরে সে ধারায় সর্ব্বক্ষণ চলছে সে। চলছেই চলছেই—ঠিকানায় পৌছল কিনা—আর ঠিকানাতেই যদি পৌছে গেল তো চলাটাই তার শেষ হয়ে গেল যে! তা হয় না।

প্রভাত চুপ করে রইল। মনের তত্ত্ব অনুসরণ করে উনি যে অধ্যায় গোলকধাঁধার সৃষ্টি করছেন—তা ওর ভাল লাগছে না। সাদা চোখে পৃথিবীকে যেটুকু দেখা যায় তারই মধ্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন কবি—অনিত্যতা আবিষ্কার করেন মায়াবাদী—সম্পদ আবিষ্কার করেন ভোগী। এক একটি দিকের দৃষ্টি দিয়ে—এক একজন মানুষ বিচার করেন পৃথিবীকে—আসলে পৃথিবী যা তাই। সে বললে, কবে শহর ছাড়তে হবে—

আচ্ছা সে খবর এক সপ্তাহের মধ্যে পাবে। বাস্তব জগতে ফিরে এলেন ত্রিলোচন সেন। কিন্তু একটি জিনিস সত্যিই অবাক লাগছে আমার। তুমি সত্যিই কি মনে প্রাণে—

না হলে আপনার কাছে এমনি এসেছি? আমি শহর থেকে বাইরে যেতে চাই—মুক্ত আলো হাওয়া—আর—

কথাটা সম্পূর্ণ করলে না প্রভাত। শহরের দূষিত বায়ুতে মন বিষিয়ে উঠছে—সুস্থ জীবনে শহর মারীভয় ছড়াচ্ছে—বহু দূরে নিরাপদ ব্যবধান সৃষ্টি না করলে—

ত্রিলোচন সেন বললেন, বেশ, চাকরি নেবার মুখে তোমার এ সন্দেহ ত হতে পারত যে—নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য—

প্রভাত হাসল, হতে পারে—কিন্তু তা ভাবব কেন—স্বার্থটা আমারও নেহাৎ কম নয়।

তোমার স্বার্থ?

কেন চাকরি! আজকালকার দিনে একটা চাকরি পাওয়া—

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ত্রিলোচন বললেন, তাই বল! কিন্তু দু'দিনে পাড়াগাঁ যদি একঘেয়ে হয়ে ওঠে—

সে.ত অনেক দূরের কথা। তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কি—

হাঁ—তৈরি হয়ে থেকো।

প্রভাত চলে যাবার উপক্রম করতেই তিনি বললেন, আজ বাড়ীর মধ্যে একবার আসবে কি?

বিশেষ দরকার আছে কি?

দরকার, না—হাঁ—শিপ্রার মা যেন কি বলবে বলছিল।

বেশ চলুন।

বিস্মিত হলেও মনে মনে পুলকিত হলেন ত্রিলোচন। প্রভাত সম্পূর্ণ বদলে গেল কি করে? সত্যিই কি শহর ওর ভাল লাগছে না?

যে ঘরে প্রথম দিন দেখেছিল সেজ জ্যেঠাইমাকে সেই ঘরেই এসে বসল প্রভাত।

সেই সুরেই আপাতত মগ্ন হয়ে গেল প্রভাত। সেই সুরের তীর বেয়ে গভীর রাত্রি বুঝি নিঃশেষিত হ'ল।

চোখ চাইলে প্রভাত। কোথায় সেই প্রাসাদ—কোথায় সেই কন্যা? তবে হাসির ধ্বনিটি শ্রুতিতে লেগে রয়েছে। লক্ষ্মী শিয়রে দাঁড়িয়ে অপরিমিত হাসছে। বলছে, মহাকালের মন্দিরের নীচের বইত যে নদী তারই নাম শুনলাম তোমার মুখে। ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কি সুন্দর দাদা।

পরিহাসে তরল নয় লক্ষ্মীর স্বর—অথচ দ্ব্যর্থবোধক এই উক্তির তাৎপর্য্য প্রভাত বুঝতে পারলে। দেয়াল থেকে নেমে এসেছিল ছবি—সাহিত্য নিয়ে করেছিল সওয়াল-জবাব। আত্মসচেতন প্রগল্‌ভা কিশোরীর অকুণ্ঠ সমালোচনা এতক্ষণ কোন জগতে নিয়ে গিয়েছিল প্রভাতকে? আশ্চর্য্য—স্বপ্ন-জগতের সেই মেয়েটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—না তার দু'পাশের ঘটনার স্রোতও গতিময় হয়ে বয়ে চলেছে? ওকি কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তার প্রাণরসধারা পান করছে না? ওর চেতন-লোকে পলাতক ঘটনা রেখা টেনে টেনে গড়ে তুলছে না কি স্মৃতির দেউল? সেই দেউলে বুদ্ধির দীপ জালিয়ে ও আরতি করছে জীবনের। অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সেও জড়ত্ব অর্জ্জন করে নি—ধ্বংসস্তূপে একটি শ্যামল অঙ্কুর প্রাণরসে সঞ্জীবিত—আলোক-পিপাসু অঙ্কুর, সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে দু'পাশে অবহেলায় ছড়িয়ে দিয়েও শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত। মেয়েটি সত্যই অনন্যা।

লক্ষ্মীর ঠেলা খেয়ে চমকে উঠল প্রভাত। ঘুমের ঘোর তার সর্ব্বাঙ্গে—বিছানা ছাড়তে চাইছে না দেহ!

লক্ষ্মীর স্বর তখনও কানে ভাসছে, সারারাত বুঝি ঘুমোও নি? কি যে এত ভাবনা তোমার!

সত্য—এ ভাবনার সঙ্গে প্রভাতের পরিচয়ও নূতন। এ ভাবনা জীবনের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে চায়—সমস্ত সমতার পারে উত্তীর্ণ করে দিতে চায় মানুষকে।

লোহার গরাদের বাইরে আকাশের টুকরোয় তখন বর্ণাভাস জেগেছে—একটু পরেই চড়া রোদে নীল আকাশ ধূসর হয়ে উঠবে। জীবন তখন বাস্তবের কঠিন স্পর্শে ভিন্ন অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হবে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে—নয়? প্রভাত আলস্য ভেঙে উঠে বসল।

লক্ষ্মী বললে, বাইরে একজন কে তোমায় ডাকছে! কি অদ্ভুত চেহারা তার!

শশী হাজরা হাত তুলে বললে, আধঘণ্টা ধরে ঠায় হত্যে দিচ্ছি। আজ পিতিজ্ঞে করে বেরিয়েছি বাড়ী থেকে—হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার!

কিছু দরকার আছে?

ওরা বলছেন আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বুঝতে পারলে না বাবা—ওই যে ম্যাকমার্কেটের। কিন্তু আমাকে কি তোমরা রেহাই দিতে পার না?

আজই—কে বললে?

কেন শশাঙ্কবাবু অমলবাবু সুবোধবাবু সবাই। সবাই নাকি ঠিকঠাক করেছে—ওদের বাড়ীতে কি গানবাজনা আছে—

না না, প্রভাত নিজের স্বরে নিজে চমকে উঠল। এমন উচ্চ রূঢ় স্বর তার কণ্ঠ থেকে বার হতে পারে!

তুমি কাঁপছ বাবা—একটু স্থির হও।

না হাজরা মশায়—আজ কিছুতেই ও কাজ হতে পারে না। আপনি বলুন গে ওদের—

আমার কথায় ওরা বিশ্বাস করবে কি—তুমি এসে বরং বলে যাও।

আচ্ছা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমি। আর ওবেলা দেখা করব ওদের সঙ্গে। একটু অপেক্ষা করুন আপনি।

চিঠি লিখে শশীর হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যান। অমলেন্দুকে বলবেন, ওবেলা যেন একটা মিটিং ডাকে—বুঝলেন?

আচ্ছা বাবা!

শশী চলে গেলে প্রভাত আপন মনে বললে, এ আমার দুর্ব্বলতা নয় কি? আপন মনেই আশ্বাস দিলে, হোক দুর্ব্বলতা—এতেও মানুষ সময়ে সময়ে আনন্দ পায়। একটি উৎসবের দিনে বিভ্রাট বাধানো ভদ্র রুচিতে বাধেই।

২৯

অনিমেষের বিদায়-অভিনন্দন সভায় সে যোগ দেবে না স্থির করলে। শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্কল্প বজায় রইল না। দীপা আর অনিমেষ দু'জনেই টেনে নিয়ে গেল। সভাটির উদ্যোগ-আয়োজন রাজসিক এবং রুচিসম্মত। বিত্তবানদের সবাইকে প্রভাত জানে না—দীপাদের বাড়ীতে ও দেখেছে—এ পরিবারের ছোট বড় সকলেরই রুচিজ্ঞান অদ্ভুত। মার্জ্জিত আচরণ—যুক্তি ও জ্ঞানাশ্রিত আলোচনা—সবটাতেই গুণীর সুরটা বজায় রাখা এ যেন ওদের স্বভাবগত। অভাবের অমাবস্যায় অন্ধকার যে পৃথিবী—ওরা তার বিপরীত মণ্ডলে বাস করে—চির পূর্ণিমালোকের অধিবাসী ওরা। ওদের গোত্রে প্রভাতের গোত্র মেলে না শুধু কোথায় যেন কোন তারে একটি সুরের সঙ্গতি আশ্চর্য্য রকমের রয়েছে। দৈনন্দিন আহার-বিহারের স্থূলক্ষেত্রের ঊর্দ্ধলোকে আলোধর্ম্মী যে মানসসত্তা অবসরক্ষণে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তারই সমভূমিতে ওদের মিতালি। এর জন্য বন্ধুদের পরিহাস সহ্য করতে হয়। আর মনে হয় সে পরিহাস কত স্থূল—বিবেচনাহীন! বাইরের প্রভেদটা মানুষের কত রকমের বাধা—

কিন্তু ভিতরে তার অসংখ্য সৃষ্টি—অসংখ্য বাসনার সে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ঝলমল করছে—অসংখ্য তন্ত্রীতে উঠছে সুরের তরঙ্গ, অসংখ্য আগন্তুক বৃত্তি পরিপূর্ণ করে রেখেছে সে পরিমণ্ডল। বাইরের সম্পদ, দারিদ্র্য, অহঙ্কার, আনন্দ, বুদ্ধি, বোধি সবই সেই অন্তর-উদ্ভূত সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রকাশ মাত্র।

একটির পর একটি অনুষ্ঠান প্রমোদ-সূচীকে অলঙ্কৃত করছে—সুর ছন্দ সঙ্গীত আবৃত্তি কথা সব মিলে—অখণ্ড আনন্দলোক ঘনীভূত হচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না—প্রচার-বাসনায় স্ফীত হয়ে উঠল কে—কোন মাল্যটিকে সুশোভন করবার জন্য নানা জাতীয় ফুল গ্রন্থিবদ্ধ হ'ল একটি স্বচ্ছ সুতায়।

প্রমোদ-সূচী ও আহার দুই-ই সমান তালে চলছে—এমন সময় বেয়ারা এসে জানালে অর্দ্ধেন্দু রায়কে—কে একজন বাইরে অপেক্ষা করছে তার জন্য। প্রমোদ-সূচীর মধ্যে তাঁকে আনা সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে না পেরে অর্দ্ধেন্দু রায় বললেন, বাইরের বৈঠকখানা খুলে বাবুকে বসাও গে—আমি যাচ্ছি।

সত্যিই তিনি উঠে বাইরে গেলেন। একে দুইয়ে অনেক-গুলি মিনিট ঘণ্টার অভিমুখে আবর্ত্তিত হ'ল—তিনি ফিরলেন না। উৎসব-মত্ত কারও চোখে পড়ল না তাঁর অনুপস্থিতি। দুটি প্রাণী শুধু এ সম্বন্ধে সজাগ রইল। দীপা বার দুই বাইরে উঁকি মেরে দেখে এল বাবা আসছেন কিনা—আর প্রভাত লক্ষ্য করলে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল গৃহকর্ত্তা অনুপস্থিত। কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে সে। কি জানি কি ঘটল—যে-কথা হয়েছিল কাল সন্ধ্যাবেলায় তারই সূত্র পৌঁছল কি প্রমোদ-বাসরে? উৎসবের দীপাবলী ম্লান হয়ে এল—হাসি আনন্দের কলরব কোন্ গৌরমণ্ডলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলে যেন!—ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দীপার কাছে এসে বললে, আসছি আমি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে অর্দ্ধেন্দু রায়কে দ্বারপথে দেখা গেল। এক ঘণ্টায় মানুষের এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তনও হয়! গৌরবর্ণের মাঝামাঝি গোছের মানুষটি সহজ ভদ্রতায় সকলেরই অন্তরঙ্গ বলে মনে হ'ত। তাঁর পাতলা ঠোঁটের অবিচ্ছেদ হাসিটি বাদ দিয়ে তাঁর মুখকে কল্পনা করাই যায় না অথচ সেই মুখ নিষ্করুণ গাম্ভীর্য্যে থম থম করছে। প্রমোদ-আসরের বাইরে যুদ্ধ-পীড়িত পৃথিবীতে এই মাত্র বজ্র-পতনের বিভীষিকা দেখে তিনি যেন ফিরে এসেছেন! তাঁর সৌম্য মুখে হয়তো বেদনার করুণ আভাস লেগে রয়েছে—তবু কুটিল দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে অপ্রত্যাশিত আঘাতজনিত ঘৃণা ও ক্রোধ—আর সেই কালি-মায় সুন্দর বা করুণ কোন কিছুর চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। প্রভাতকে হাত তুলে ইসারা করে পিছন ফিরলেন তিনি। মন্ত্র-বশীভূতের মত প্রভাত তাঁকে অনুসরণ করলে।

বাইরের ঘরের টেবিল ঘিরে দু'জনে মুখোমুখি বসলে। টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি। একটা পিতলের ছোট বুদ্ধ-মূর্ত্তি দিয়ে কাগজখানা চাপা রয়েছে—বাতাসে উড়ে না যায়। ঘরের জিনিষপত্রগুলি আশ্চর্য্য রকমে স্তব্ধ। খালি ক্লক-ঘড়িটা টকাটক শব্দে সেই নিস্তব্ধতার বুকে আঘাত করছে। সে আঘাত সময়ের বুকে বাজছে—বাজছে মানুষের বুকে।

প্রভাতের হৃৎপিণ্ডে সেই আঘাত এসে পড়ল—গলা শুকিয়ে গেল—অত্যন্ত তৃষ্ণা অনুভব করলে সে।

তার মুখের পানে চেয়ে অর্দ্ধেন্দু রায় বললেন, টেবিলের ওপর যা রয়েছে তার অর্থ সম্ভবতঃ তোমার অজানা নয়। কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে—পৃথিবীতে আশ্চর্য্য বলে কোন বস্তুই কি কল্পনা করতে পারা যায় না! মানুষের এক দণ্ডের বিশ্বাস পর-দণ্ডেই ভেঙে যায়।

প্রভাত কি বলতে গেল—তিনি বাধা দিয়ে গভীর কণ্ঠে বললেন, যা বলবে জানি। কিন্তু একদিন নয়, দু'দিন নয়—মাসের পর মাস মানুষের সঙ্গে মিশেও কি মানুষকে চিনতে পারা যায় না—না তাকে বিশ্বাস করাও মূর্খতা! জানি কারও সঙ্গে কারও নীতি মেলে না—কিন্তু নীতিতে না মিললেই তা যে দুর্নীতি হবে এ ধারণা কেমন করে জন্মায়—বলতে পার?

প্রভাত আর একবার চেষ্টা করলে কথা কইতে—অর্দ্ধেন্দু রায় উষ্ণ হয়ে উঠলেন। চাপা ভর্ৎসনায় কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাসঘাতক—প্রবঞ্চকের দল! পেছন থেকে ছুরি চালায় যারা তারা সৎ নয়—কাপুরুষ।

প্রভাত মরিয়া হয়ে বললে, আমার কথা যদি শোনেন—

কি শুনব? আমি ব্ল্যাক-মার্কেট করি—তোমরা সাধু, তাই ধরিয়ে দিতে চাও? তোমরা সস্তায় গান্ধীবাদের জিগীর তুলে দেশের বুকে নাম কিনতে চাও?

আপনি উত্তেজিত হয়েছেন।

আশ্চর্য্য কি! টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে তোমার ষড়যন্ত্রের রসদ। অথচ তোমাকে অবাধ অধিকার আমি দিয়েছিলাম অন্তঃপুরে ঢুকবার—আমার মেয়েকে মিশতে দিয়েছি সরল বিশ্বাসে—

আমায় বিশ্বাস করুন। প্রভাত মিনতি করলে।

অসম্ভব। আমার সর্ব্বনাশের জন্য ফাঁদ পেতে রেখে—

বিশ্বাস করুন—

না—না। ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠলেন অর্দ্ধেন্দু রায়। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমি নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না। হাতের কাছেই রয়েছে বন্দুক—তুমি চলে যাও—চলে যাও—

প্রভাত আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মনে হ'ল

গেছে সর্ব্বনাশ। ও কেন প্রতিবাদ করতে পারলে না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে—কেন ও প্রতিবাদ করতে পারলে না? কোন্‌খানে ওর দুর্ব্বলতা ওকে ভীরু করে তুললে! সেকি গোপনতা? যে মুহূর্তে ও অসত্যকে আবিষ্কার করেছিল সেই মুহূর্তে কেন সত্য আচরণের দ্বারা নিজেকে নির্ভীক করতে পারে নি? কিসের সৌজন্য—কেন দুর্ব্বলতা? হৃদয়ের গোপন কোণে সম্মান, অর্থ, সাহিত্য, রুচি কিংবা নারী—কোন্ আসক্তি ওকে কর্ত্তব্যবিমুখ ভীরু করে তুলেছিল? আর এই মুহূর্তেও সেই ভীরু মমত্ববোধে সে সত্য ভাষণ উচ্চারণ করতে পারলে না। বেত্রাহত কুকুরের মত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

উপরের ঘর থেকে নূপুর-নিক্কণের তালে উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি—ওকে পথের প্রান্তে ঠেলে দিয়ে গেল।

৩০

না—শহরে আর থাকা চলবে না। যে-কোন উপায়ে হোক দূরে পালাতে হবে। বহু দূরে—বাংলা থেকে যত দূরে হয়—তাও ভাল। আজই পাকা কথা দিয়ে আসবে ত্রিলোচন সেনকে। উনি কালই যেন ব্যবস্থা করে দেন—কলকাতার বাইরে ওঁর সেই মহালে থাকবার। সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিবেশে নিজেকে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাবে। কিসের ভয়ে সে সত্যকে অকপটে প্রকাশ করতে পারে না! সত্য-প্রকাশের বাধা কি অন্ন-দারিদ্র্যে—কোনমতে উদর-পূর্ত্তির উপায়চ্যুত হওয়ার আশঙ্কায়, না আজন্মসঞ্চিত স্নেহমমতার বন্ধন কাটিয়ে অনাত্মীয় জগতে অত্যন্ত একাকী হওয়ার দুঃসহ কল্পনায়? এভাবে ভয়ে ভয়ে সব দিক বাঁচিয়ে সত্যসাধক হওয়ার বড়াই তার সাজে না। কোন মানুষই ভয়ের সঙ্গে সত্যকে জড়িয়ে জীবনের সাধনায় জয়লাভ করতে পারেন নি।

প্রভাত।

কে? চমকে উঠে ও চাইলে—সামনে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু। ওর মুখও শুকনো।

ব্যাপার কি? তোর কি অসুখ করেছে!

শরীরটা ভাল নেই। একটু থেমে বললে, তা ছাড়া আমি ঠিক করেছি কালই কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাব।

কেন—কোন 'অফার' পেয়েছিস?

না—হাঁ—এক রকম তাই বটে! মোট কথা শহরের বাতাস আমার সহ্য হচ্ছে না—আমি বাইরে যেতে চাই। প্রভাতের কণ্ঠস্বরে কাকুতির রেশ।

অমলেন্দু বললে, যদি কেউ আমাদের বাস্তব-ভীরু বলে তাকে দোষ দেব না।

প্রভাত প্রতিবাদ করলে না—কেমন বিহ্বলের মত চেয়ে রইল অমলেন্দুর পানে।

অমলেন্দু ম্লান হেসে বললে, যে কথাটা আমি বলতে এসেছিলাম তা আগেই তুই বলে দিলি। মানে—আমিও বাইরে যাচ্ছি।

তুই-ও?—

উপায় কি—কাকা চিঠি লিখেছেন মীরাট থেকে—ওখানকার মিলিটারী অ্যাকাউণ্টস্-এ কয়েকটা পোষ্ট খালি হয়েছে নাকি!

চাকরি—

আমাদের মত মধ্যবিত্তেরা আর কি করবে। সহায় নেই অত পথ ধরব—সম্প্রতি সেই ব্যবসাতে নামব।

ইংরেজ সরকার যা শিখিয়েছেন দেড়শ' বছর ধরে তারই জাবর কেটে চলতে হবে আরও বেশ কিছুদিন।

প্রভাত ধীরে ধীরে বললে, জাতীয় সরকার হয়েছে, এবার শিক্ষার ধারা নিশ্চয় বদলাবে।

বদলাক্—আমরাও ততদিনে জীর্ণ হয়ে যাব যে শিক্ষা পেয়েছি তারই ভারে।

আমাদের বংশধর যারা আসবে—

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমি দেখি না প্রভাত—পৃথিবী আজ ভারি গোলমালের মধ্যে চলছে। এ যেন চলেছে পরীক্ষার যুগ—কবে ফললাভ হবে সে আশা অবশ্য পোষণ করা অন্যায় নয়, কিন্তু সেই আশার বর্ত্তমান দুঃখ কষ্টকে কিছু না বলাও তার চেয়ে কঠিন।

কিন্তু এই অস্থিরতা—বিশ্বাসহীনতা—আমাদের বেশ দুর্ব্বল করে দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রও দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। প্রভাত মন্তব্য করলে।

তবু ধৈর্য্য আমরা সঞ্চয় করতে পারছি না। এত বড় ট্রাজেডি হয়ত কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নি! একটু থেমে বললে, বিশ্বাস ভাঙ্গে কেন জানিস? যাকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াতে যাই—দেখি সেও পাঁক মাখা আশ্রয়—ত্যাগী বলে যার মহত্ত্বের পায়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিতে যাই, দেখি তার ত্যাগ ভোগের সুড়ঙ্গপথে গোপন সঞ্চয়ে মত্ত। অন্য দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়, কিন্তু তার আলো এত দূরে আছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

অমলেন্দুর আক্ষেপ প্রভাতের অন্তর স্পর্শ করলে। চঞ্চল দুনিয়ায় আজ আদর্শের সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট—তারই মাঝে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ব্যক্তি-পরিষদে আলোচনা প্রস্তাব যুক্তি তর্কে ঘোরালো হয়ে ওঠে—ছোটের গুরুত্বে আর বড়োর স্পর্দ্ধায় তা প্রকৃত কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই মতবাদের। বড় দুনিয়া আয়তন-বহুতায় দূর প্রতিবেশীকে করেছে নিকট—নৈকট্যের জন্য সন্দেহ অবিশ্বাস প্রবল হয়ে

উঠছে। স্রোতে ভাসতে ভাসতে মৃন্ময় কলস যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ধাতু-কলসের দিকে—ততই তার ভয় বাড়ছে—ততই সে চাইছে নিজের ভঙ্গপ্রবণতা পরিহার করে কোন শক্ত আবরণে ঢাকতে হতে। তার প্রস্তুতিতে ধাতু-কলসও দুর্ভেদ্য হবার সাধনায় মন দিয়েছে। যে দুর্ভেদ্য হতে পারবে এই প্রতিযোগিতায় জয় তার অনিবার্য্য। তাই মরণ ঠেকাতে সাংঘাতিক মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে ধন-জন-বিত্ত-বুদ্ধির প্রয়োগ চলছে পূর্ণমাত্রায়। এর শেষ ফল—মাটির কলসী ভাঙবে কি পিতলের কলসী জখম হবে তা নির্ণয় করা নয়—পৃথিবীর দুর্বিপাক যে বাড়বে—এ ত সুনিশ্চিত।

তারাক্রান্ত মনে দু'জনে বিপরীত পথ ধরলে। দু'জনেই বুঝলে সমিতির কথা তোলা নিরর্থক। সমিতি সৃষ্ট হয়েছিল যাদের অবসর ক্ষণে—তারা সময়ের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—আবার সময়ের স্রোতেই হয়তো নূতন তৃণগুচ্ছ ভেসে এসে সংলগ্ন হবে সমিতির প্রান্তে। পুরাতনের বিদায় ও নূতনের প্রকাশ দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের অস্তিত্ব। যারা আসে প্রয়োজনের তাগিদে তারা গৃহ নির্মাণ করে সম্বন্ধকে রূপ দেয়—সমাজ-সমিতিতে করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তাদেরই তৈরি নিয়ম-কানুনে জীবনযাত্রার পথ যতখানি সুগম হতে পারে সে চেষ্টার ত্রুটি হয় না। কিন্তু সময়ের স্রোত থামে না এক দণ্ডের জন্যে, আজকের নূতন কাল হয় পুরাতন—সেই কাল-আশ্রিত বিধি-নিয়ম আচার-অনুষ্ঠান সবই বাতিল হয়ে যায় নূতন জীবনের দাম নিরূপণে—নব পল্লোদ্গমে বৃক্ষ-বক্ষ থেকে খসে পড়ে যেমন পুরাতন পত্র। পাতা খসে গেলেও তার স্থিতি-চিহ্নের একটা নিদর্শন রয়ে যায় কিছুকালের জন্য—ক্রমে তাও যায় মিলিয়ে। তারপর তারা আশ্রয় পায় ইতিহাসের পাতায়। এক দিন কলকাতার যাদুঘর দেখতে দেখতে চার হাজার বছরের মিশরের মমি—তারও আগের মহেঞ্জোদারো হরাপ্পার মৃৎ-শিল্প, বৌদ্ধ যুগের শিলালেখ, স্থাপত্য,তক্ষণ-শিল্প এবং আরও পরের আর্য্য-সংস্কৃতির চিহ্নসমূহ ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীসমূহের নিদর্শন—এই সবের মধ্যে কালস্রোতের অব্যাহত ধারাটি তার চোখের সামনে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মাত্র চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মনুষ্য ও প্রাণীসমাজের বিবর্তন-ধারা—তাদের জীবনযাপন রীতির একটা অস্ফুট আভাস তাদের বাসনা-কামনার অতি ক্ষীণ একটু তরঙ্গ—চৈতন্যদ্বারে এমনি অতর্কিতে বিপুল কালের যাত্রাপথের ইঙ্গিত বয়ে আনে। বিপুলা পৃথিবীতে নিরবধি কালের লীলা এমনি অব্যাহত ভাবেই চলছে। তবু মানুষ নিজের কালটিকেই ভাবছে সর্বোত্তম—যারা গত হয়েছে তাদের চেয়ে সে সর্বাংশে যোগ্য—বিদ্যায় প্রতিভায় না হোক নিজ নিজ যুক্তিতে ত বটেই। আর তারই জন্য সকলকে ছাড়িয়ে নিজে বড় হবার বাসনা—অতি-সঞ্চয়ের নেশা—ঐশ্বর্য্যভোগের লালসা, প্রভুত্ব পরিচালনার গৌরব—এইগুলি ব্যক্তির জীবনে একমাত্র সাধনার বস্তু হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে দু'একজন একলা পথিক—মহামানব এই সত্যকে জীবনে এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ আয়োজন করছেন।

এঁরা চরম সঙ্কট মুহূর্তে যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বের কানে ভুলে যাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, মনে হয় মানুষের দুঃখনিশার অবসান হ'ল, দিগন্তের পারে নব ভানুর কিরণ-লেখায় সবকিছু কোমল ও মনোরম হয়ে উঠল…কিন্তু হায় সে শুধু স্বপ্ন মাত্রেই পর্যবসিত হয়।

চমকে উঠল প্রভাত। বাড়ীর দুয়ারে পা দিতেই কোলাহলটা প্রবল আকার ধারণ করল। যেন মায়ের আর্তনাদ—ভাইবোনেদের চাপা কান্না—প্রতিবেশীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের ছোট উঠান।

তাকে দেখে একজন সখেদে বলে উঠল, আহা—আর একটু আগে যদি আসতে? পাঁচ মিনিটও হয় নি হঠাৎ হার্ট ফেল হয়ে—

দুর্নিবার কালস্রোতে অনন্তও আজ ভেসে চলেছেন।

৩১

কালস্রোত চলেছে। বসে বসে আক্ষেপ করলে চলে না, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক কর্তব্যগুলিও আপন আপন দাবি নিয়ে সামনে এসে হাজির হয়। চোখের জল মুছে—ভাবনাকে পিছনে ঠেলে—দায়মুক্তির চেষ্টা আসে এগিয়ে। দাহকার্য্য শেষ করে সে ফিরে এল বাড়ীতে। শোকে স্তব্ধ বাড়ী; মা ভূমিশয্যায় পড়ে কাঁদছেন—অবোধ ভাই-বোনগুলি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। এত দিন পিতৃস্নেহ বলে কোন জিনিস অনুভব করে নি প্রভাত, বরং এর বিপরীতটাই ওকে সংসার সম্বন্ধে অন্যমনা করে তুলেছে। দরিদ্র সংসারে যদি ওরা নাই আসত কি ক্ষতি হ'ত জগতের? পিতার আকাঙ্ক্ষা ছেলে বড় হবে—বিদ্বান হবে—ধন আহরণ করবে—যশোমাল্য গলায় পরবে—বাবাকে দেবে নির্ভরতা। কর্তব্যের শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধবেন ছেলেকে যেন সে বেকার বসে না থাকে—যেন সে গুরুজনদের পোষণ করে—নিজের ইচ্ছায় অসংখ্য সূত্র দিয়ে ছেলের ইচ্ছায় গতিনিয়ন্ত্রণ চলে। এই স্বার্থপরতাকেও সে বহু বার প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষ করে পিছিয়ে উঠেছে—তাই সংসার সম্বন্ধে ওর মোহ তেমন প্রগাঢ়ও নয়। আর সেই কারণেই বাপের প্রতি ভীতি পোষণও করত না। না হোক—এই দণ্ডে মনে হচ্ছে একটা সহায় তার পাশ থেকে সরে গেল। পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করিতে হবে এবার।

কি করে চলবে সংসার—মায়ের এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর

দিতে পারে নি—কি করে দায়মুক্ত হবে সে সমস্তারও সমাধান করতে পারবে না ও। সামাজিক প্রথা ওকে নিষ্কৃতি দেবে না অসমর্থ বলে বেকার বলে। তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন করতেই হবে।

এতদিনের আশা ও কল্পনাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রভাত সামনে তাকালে। সংসারের কঠিনত্ব ওকে আঘাত করছে—ঘটনা-প্রবাহে ওকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবে এটি নিশ্চিত। বন্ধুর পৃথিবীতে যারা বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার দাবি নিয়ে এতকাল পাশে পাশে চলছিল—তাদের রূপের পরিবর্তন সুরু হয়েছে। ওকে একলা উত্তীর্ণ হতে হবে দুস্তর পারাবার।

বাপের আপিসে গেল—দিনপনেরর মাইনে বাবদ কিছু পাওনা ছিল সেটার তদ্বির করতে।

পিতার সহকর্মীরা সহানুভূতি দেখিয়ে উপদেশ দিলেন একবার কর্মকর্তার কাছে গিয়ে দুঃখের কাহিনী জানাতে। বাপের পদে না হোক যে-কোন একটি পদে হয়তো সে বহাল হয়ে যেতে পারবে। চাকরি ভিন্ন যখন অন্ত পন্থা নেই।

হেডক্লার্ক বললেন, আসছে সপ্তাহে একখানা দরখাস্ত নিয়ে এস—দেখি সায়েবকে বলে যদি কিছু করতে পারি।

শুনে ওর মনে আনন্দ হ'ল না। চাকরি না পেলেই বা কি ক্ষতি!

আপন মনে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনিতে সে মাথা তুলে চাইলে।

ও নিশ্চয় কবিতা লিখে আপিসের কর্ম্ম-সভায় আসে নি।

বললে, তুমি যে?

আসুন এদিকে। শুভঙ্কর ওকে বারান্দায় একধারে টেনে নিয়ে গেল। বললে চুপি চুপি, শুনলাম জনদশেক লোক নেবে—তাই একটা দরখাস্ত—

তুমি চাকরি করবে?

মাথা নীচু করে শুভঙ্কর বললে, কিছু উপার্জ্জন তো দরকার। কাগজে কবিতা বার হলে কেউ পারিশ্রমিক দেয় না।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—প্রভাত সামলে নিলে। প্রভাত বনেদি বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে—কেউ কোনদিন তা ভাবতে পারে না। নহিন কোচম্যান দারোয়ান—আমলা মুহুরি ও হুকুম বরদারে ঠাসা যে বাড়ী—সেই প্রাসাদের একটি উত্তরাধিকারী বশংবদ ভৃত্যের ভূমিকায় নামবে বলে উদ্যোগ-আয়োজন করছে! কবিতা লিখে টাকা রোজগার করবে—এই চিন্তাই বা আসে কেন শুভঙ্করের?

কিন্তু চাকরি করবে কেন? মূঢ়ের মত প্রশ্ন করলে সে।

এইটিই সোজা বলে মনে হচ্ছে—আর তো কিছু জানি না। ভাবুক গলায় শুভঙ্কর উত্তর দিলে।

তবু মূঢ়ের মত প্রশ্ন করলে প্রভাত, তোমাদের তো জমিজমার আয় আছে—

জমিজমা! একালে থাকবে কি কারও? পুরোনো বংশ—সবই প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো জানেন না—এককালে এই গলিটার সবই ছিল আমাদের—আজ বাড়ীখানা পর্য্যন্ত আমাদের নয়। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও বললে, ঋণের দায় যে কি ভয়ানক যদি জানতেন!

প্রভাত ম্লান হেসে বললে, জানি।

না—তেমনধারা জানেন না। বাইরের ঠাট বজার রেখে আত্মীয়স্বজন নিয়ে চলা—এইতেই ফতুর হয়ে গেলেন জ্যেঠামশাই। যে জমি আছে তাও গেল চলে। মহাজন তার টাকা ছাড়বেন কেন।

এমন অমুক মহাজন কেউ আছেন—

যে টাকা ধার দেয় সে টাকা আদায় করবার কৌশলও জানে—সাধারণ মানুষের চেয়ে বরং বেশীই জানে। আপনি হয় তো দেখেছেন গলিটা ক্রমে ক্রমে হাত বদল করছে। একদিন···

প্রভাতের দৃষ্টি খুলে গেল। চঞ্চলা লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তর্পণে সৌধ থেকে সৌধান্তরে চলেছেন তাঁর সোনার ঝাঁপি নিয়ে। মহালের সম্পদকে কারখানার সম্পদ গ্রাস করছে—কিন্তু তার গতি তেমন দ্রুত নয়। আজ পণ্যনিয়ন্ত্রণের সুবিধা নিয়ে ঘাটতি জিনিসকে কালোবাজারে চালান দিয়ে আর এক শ্রেণী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ এদেরই উপরে। পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্ত তারা অত্যন্ত উৎসাহী—বংশ-কৌলীন্ত রৌপ্য-কৌলীন্তে কিনতে চায় এরা। কিনছেও। ক্ষমতাশালী দেবতাকে তুষ্ট করবার মন্ত্র এরা জানে—আইনকে ফাঁকি দেবার কৌশলও এদের আয়ত্তে। এরাই আজ প্রভুত্বের জাল বিস্তার করে এই গলির সমস্ত সম্পদকে আত্মসাৎ করবে।

চলতে চলতে ও প্রশ্ন করলে, আর কবিতা লেখ না?

লিখি।

আশ্চর্য্য তো! কি তার বিষয়বস্তু? ওর কণ্ঠে কৌতূহল।

নানা বিষয়—যা আজকাল সবাইকে নাড়া দেয়—সবাই অনুভব করে।

দুঃখ? অভাব?

সে তো চিরকালের—তার একটা মানদণ্ড নেই যে মাপতে পারা যায়—কি চিনতে ভুল হয়! আর আমার যা দুঃখ আপনার তা নয়—

ঠিক বলেছ ভাই। তোমাদের বড় ঘরের মর্য্যাদা যেন সাধারণ ঘরের মত নয়—

কিন্তু বড় ঘরের মর্য্যাদা আর থাকছে কৈ—পৃথিবীতে সবাই সমান এই সত্যই তো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কি জানি—মানুষ যদি কাদার তাল হ'ত তো একটি ছাঁচে ফেলে এ সত্যের পরীক্ষা সম্ভব হ'ত। মানুষে মানুষে জ্ঞান বুদ্ধি ও নানান্ বিষয়ের এত তফাৎ যে সব মিলিয়ে একটি

সার্ব্বজনীন রূপ দেওয়া চলবে না। তফাৎ থাকবেই, না হলে জীবন-যুদ্ধের অর্থ কি!

জীবনে যে যুদ্ধ করতেই হবে তারই বা মানে কি?

কিন্তু যুদ্ধ না করলে জীবনের বিকাশ কোথায় তাই। আলোর উত্তাপ নিয়ে কুঁড়ির মধ্যে ফুল করে লড়াই ফুল হবার জন্য, তাই ফুল এত সুন্দর।

আপনি কবিতা লিখুন প্রভাতদা—চমৎকার উপমা দিয়েছেন।

এ যুগে উপমার ওপর শ্রদ্ধা নেই কারও—কেউ পড়বে না সে কবিতা।

কেন?

ফুলকে খুঁটিয়ে দেখার অবসর কোথায় মানুষের! উদ্বৃত্ত সময় না পেলে রসবোধ জাগে কি মনে? এই শহরে প্রকৃতির স্থান কোথায়—সবই তো ইঁট কাঠ লোহা সিমেন্টের কারবার। সে আবৃত্তি করলে:

'ইটের পরে ইট—হেথা মানুষ কীট।'

সত্যি প্রভাতদা—এ কথা ভাবলে ভারি কষ্ট হয় মনে। আমরা কোথায় চলেছি। রূপের জগৎ ছেড়ে কোন অসুন্দর জগতে!

শুভঙ্করের স্বর অশ্রু-আভাসে থম থম করছে। সে বেদনা প্রভাতের মনেও সঞ্চারিত হ'ল। বর্ত্তমানের অকলঙ্কিত দুটি ভাব-সমৃদ্ধ প্রাণ অতীতের স্মৃতি-সমুদ্রে ডুবে গেল।

গোলদীঘির বেঞ্চে এসে বসলে দু'জনে। এতক্ষণে আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে—গোলদীঘির বাঁধানো জলে ভাসছে তার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। প্রকৃতির সামান্য অংশ নীল সবুজ আর কালোর পরদায় ছড়িয়ে আছে। দীঘির চার পাশের সৌধ থেকে আলোর তীর প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করছে—ফিরিওয়ালার চীৎকার জীবনযাপনের কর্কশ রীতিকেই প্রকট করছে। সর্ব্বত্র চলছে শাসন। সত্যই জগৎ অসুন্দর।

প্রভাত বললে, চল উঠি।

শুভঙ্কর ওর অনুসরণ করলে। বাড়ীর কাছে এসে কোন কথা না বলে পরস্পর ভিন্ন পথ ধরলে। ওদের মনের দুঃখের আলোয় ওরা যেন গন্তব্য পথ খুঁজে পেয়েছে। কল্পনার চড়া রঙে সে পথের ধূলি নয় অপরূপ—আশার ঘন নীলে সে পথের আচ্ছাদনী নয় উত্তাপহর, আনন্দের লঘু বায়ুতে সে পথ সুরে ছন্দে লীলাপ্রমত্তও নয়। বর্ণহীন স্বাদহীন শোভাহীন পথ—চলার অনুরাগে তা অতিক্রমের উৎসাহ জাগে না—নিতান্ত না চললে নয়—তাই ক্লান্তিভরা দেহকে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

সেই পথে অনন্ত কালের যাত্রা হয়েছে সুরু।

প্রভাত বসে বসে ভাবছিল—গলায় মালা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন অর্দ্ধেন্দু রায়। ওর পাশে চৌকিতে এসে বসে বললেন, আমায় মাপ করো বাবা—কাল তোমাকে আঘাত করেছি।

কি জানি কেন—এই কথায় প্রভাতের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কোথায় চলে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অবোধ শিশুর মত ও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর কান্না দেখে অর্দ্ধেন্দুও সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। আর কি সান্ত্বনার কথাই বা বলবেন তিনি! জীবন ক্ষণভঙ্গুর—আত্মা মৃত্যুহীন—পরলোকে শান্তিতে বাস করার সুখ-কল্পনা এ সব তত্ত্ব দিয়ে শোককে নিবারণ করার মূঢ়তা তাঁর নাই। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—প্রভাতের শোকের জ্বালা তাঁর মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ পরে বললেন, কাল সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছিল, সত্য মিথ্যা বিচারবোধ হারিয়েছিলাম।

প্রভাত মাথা তুলে বললে, আপনি অন্যায় করেন নি—

নিশ্চয় অন্যায় করেছি। তিনি স্বরে জোর দিলেন। এক জনের কথায় সাক্ষ্যপ্রমাণ মেনে নিলাম যদি—কিন্তু বাবা, দোষ ত যার ছিদ্র খুঁজে হাজারটা লোক ঘুরছে—তার সন্দেহ সব সময় যুক্তির পথ ধরে চলে না।

প্রভাত বললে, কিন্তু আপনি যদি অন্যায় মুনাফা না করে থাকেন ত—সন্দেহ আসবে কেন?

এ যুগের এমন একটা ধারা—মুনাফার ন্যায্য অন্যায্য বলে কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই। সরকার বাজারদর বেঁধে দিতে পারেন নি—বেঁধে দিলেও আজকের দরের সঙ্গে কালকের দরের সামঞ্জস্য নেই। বাজারে জিনিসের সরবরাহ নেই—অথচ এমন কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যা না হলে জীবন-ধারণ করা চলে না লাভটা বেশী বলে তুমি না নাও—আমি নেব—আমি না নিই আর একজন নেবে। যত বেশী পারে নেবে। আমার সততায় বাজারদর একটুও নামবে না—অথচ আমার সততার সুযোগ নিয়ে আর একজন হবে বড়-লোক! নিজেকে এ ভাবে নির্ব্বোধ বানাতে পারে কি কেউ?

প্রভাত কথা কইলে না। এই মুহূর্ত্তে এসব নিয়ে তর্ক করতে ওর ভাল লাগছে না। কে ন্যায় পথে চলছে—কে করছে অন্যায়—তা নির্ণয় করবার ভার ও নয়।

অর্দ্ধেন্দু আর একটু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে ডান হাত রেখে বললেন, সে যাই হোক—শোকে এমন মুষড়ে পড়লে ত চলবে না। আমরা যখন রয়েছি—পকেটে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করে বললেন, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। সত্যি—যাঁরা তোমার দু'পাশে দিন-রাত্রির জন্য রয়েছেন—তাঁদের উপেক্ষা করা মানুষের ধর্ম্ম নয়।

তবু প্রভাত চুপ করে রইল। এমন সহানুভূতিশীল প্রতি-বেশী পেয়ে কার না চোখমুখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কে না বলে, আপনি যা করলেন, সে ঋণ... এই ঋণ-

স্বীকারের মধ্যেই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব নিহিত নয় কি ? কিন্তু ভাবলেশহীন প্রভাতের পানে চেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। সুকোমল বৃত্তিগুলি কি ওর অন্তরে দুঃখ-নিদাঘ-তাপে শুকিয়ে গেছে—না দারিদ্র্য নষ্ট করে দিয়েছে সেগুলিকে ? যাই হোক, খানিক ইতস্ততঃ করে ভারী মণিব্যাগটি পকেট থেকে বার করলেন—সেটা প্রভাতের সামনে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, টাকাটা মানুষের সব না হলেও—টাকায় অনেক জিনিস পাওয়া যায়। লৌকিকতা মুখের আশীর্ব্বাদের চেয়ে এই ভাবের নিরেট কিছু হলে—ব্যবহারিক জগতে···, বলে হো হো করে হাসলেন। হাসি থামলে বললেন, আমরা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব রাখি বলেই—টাকা-আনা-পাই-য়ের পাল্লায় সবকিছুকেই মেপে থাকি। অবশ্য এটা ঠিক রাস্তা নয়। বলতে বলতে দুখানা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে প্রভাতের সামনে রাখলেন। বললেন, এটা রেখে দাও—দরকার হলে আরও—

এক নিমিষে প্রভাতের উদাসীন অন্তরে আবার ভাবের জোয়ার এল। মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল—সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরে ফুটল দৃঢ়তা। এ আপনি করছেন কি ? উঠিয়ে নিন্—

না—না—আমি তোমার পিতৃতুল্য—আমাকে পর ভাব যদি—

মাপ করবেন। আপন হলে এ ভাবে অপমান করতে পারতেন না।

প্রভাতের দৃঢ় স্বর অর্দ্ধেন্দুকে রূঢ় আঘাত করলে। নিজেকে সামলে নেবার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না তিনি। তাঁর মনে হ'ল সুবিধা পেয়ে প্রভাত কালকের অপমানের প্রতিশোধ নিলে। প্রভাত সত্যিই প্রতিশোধ নিলে।

নোট দুখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। অন্তরাল থেকে লক্ষ্মী সব দেখছিল—উনি চলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে বললে, আচ্ছা দাদা—মানুষগুলো কি। টাকা থাকলেই কি তারা ভাবে দুনিয়াটা তাই দিয়ে কিনে নেয়া যায়।

প্রভাত ম্লান হেসে বললে, যায় লক্ষ্মী। চার দিকে যে সব ঘটছে—যা খবরের কাগজে ওঠে—আর যা লোকের মুখে মুখে রটে সবই হঠাৎ ঘটছে না যা সেইটাই একমাত্র জিনিষ নয়। ওসব এক একটা ফোঁড়ার মত—দূষিত রক্তের মধ্যে জমায় বিষটা—প্রকাশ পায় একটা।

উনি বুঝি ওই বাড়ীটার মালিক ? আঙুল দিয়ে লক্ষ্মী দীপাদের তিনতলা বাড়ীটা দেখালে।

হাঁ, অনিমেষ বলে যে ছেলেটি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসে তারই বাবা।

তা তোমাকে উনি টাকা দিতে আসেন কেন ?

আমাদের বাড়িটার দিকে কখনও ভাল করে তাকিয়েছিস ? ভাল করে এ বাড়িকে যদি দাঁড়াতে চান তো এক দিন ওদের যে সব প্রতিবেশীর মনে দয়া আছে তাঁরা এ ছাড়া আর কি করতে পারেন।

লক্ষ্মী রাগ করে বললে, ভারি তো প্রতিবেশী। টাকা থাকলেই বাহাদুরি নেবার লোভ হয়। আমার কি মনে হয় জান দাদা—ওই যে মেয়েটি যার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ও নিশ্চয় ওর বাবাকে বলেছে—

ও বলতে যাবে কেন—উনি নিজে কি—

না—না—ওই মেয়েটি নিশ্চয় বলেছে আমাদের অবস্থা খারাপ, টাকা দিলে আমাদের উপকার হবে—

থাক এসব অনুমান তর্ক। এ নিয়ে আলোচনা ভাল লাগছে না। আচ্ছা, লক্ষ্মী তুই দেখতো কাল গাওয়া ঘি আনতে হবে কি না। মটরের ডাল, সৈন্ধব নুন, মালসা এসব আছে তো ?

আছে। খালি এক বোঝা পাকাটি এনে দিও।

বৈকালে ত্রিলোচন সেন এলেন। বললেন, সবই কর্ম্মফল, কপালের লেখা। না হলে হঠাৎ এমন হবে কেন।

ওঁর খেদ প্রকাশকে বাধামুক্ত করবার জন্য প্রভাত নীরব হয়ে রইল।

ত্রিলোচন সেন বললেন, এই বিপদ না হলে কালই রওনা হয়ে যেতে পারতে। এখন মাসছয়েক হয়তো—

প্রভাত বললে, মাসছয়েক নয়—হয়তো কোন দিনই আপনার দয়া গ্রহণ করতে পারব না।

সে কি। কাজটা নেবে না ? প্রচণ্ড বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

না। প্রভাত মৃদু স্বরে বললে।

কিন্তু সংসার—

আমাকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে কোন মতে চলে।

কিন্তু চাকরির সামান্য আয়ে—পোষ্যও তো অনেকগুলি—সব কথা ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারলেন না তিনি।

সামান্য ভাবেই চলবে সংসার, এমন চলছেও তো অনেক।

না—না—, প্রবল প্রতিবাদ করলেন ত্রিলোচন সেন। আমরা থাকতে তোমাকে এমন কষ্ট করতে দেব না। না, কিছুতে নয়।

ওর মৃদু হাসির অন্তরালে কঠিন একটি প্রতিজ্ঞা যেন আত্ম-গোপন করে রয়েছে। মনে হয় সামান্য প্রতিবাদে তা উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু যুক্তির রাশি দিয়েও তা দূর করা সম্ভব নয়—এটি অনুভব করলেন ত্রিলোচন সেন। ওঁর মুখ পাংশু হয়ে গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দুঃখিত স্বরে বললেন, যা ভাল বোধ কর। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমায় আমি কি বোঝাবো বল।

তাঁর শ্লথ গতি দেখে মনে হ'ল—আশাহত হয়েছেন। দোরগোড়ায় গিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন প্রভাতের কাছে। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, সময় করে যদি পার তো একবার আমাদের বাড়ী যেও। নিপ্রার মা'র বুঝি কি

তৃতীয় বিগ্রহপালের নূতন তাম্রশাসন

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলার উত্তরাঞ্চলস্থিত বনগ্রাম কলাবতী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঘুঘুর ঝা মহাশয় মৃত্তিকার নিম্ন হইতে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে এই আবিষ্কারের সংবাদ জানিয়া আমি তাম্রলিপিখানি পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হই। কিছুকাল হইল বনগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ছেদী ঝা মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি ঐ তাম্রশাসন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। নবাবিষ্কৃত তাম্রলিপিখানি বাংলা ও বিহারের প্রাচীন ইতিহাসের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই লিপি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ সরকারী এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এখানে আমি সংক্ষেপে লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিতেছি।

তাম্রশাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয় নরপতি তৃতীয় বিগ্রহ-পাল কর্ত্তৃক কাঞ্চনপুরে অবস্থিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং শাসনোল্লিখিত ভূমি তীরভুক্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান তীরহুতে অবস্থিত ছিল। পালরাজগণের জয়স্কন্ধাবারগুলিকে তাঁহাদের সাময়িক রাজধানী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত তাম্রশাসনাদি হইতে নিম্নলিখিত পাল জয়স্কন্ধাবারের অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছিল—পাটলিপুত্র, মুদ্গগিরি, বটপর্ব্বত, সাহসগণ্ড, বিলাসপুর এবং রামাবতীনগর। কেহ কেহ হরধামা নামক অপর একটি পালজয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা বিলাসপুরের ভ্রান্ত পাঠমাত্র। তৃতীয় বিগ্রহপালের বর্ত্তমান বনগ্রামলিপি হইতে আমরা কাঞ্চনপুরনামক নূতন পালজয়স্কন্ধাবারের বিষয় অবগত হই-লাম। কাঞ্চনপুর বিহারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

বনগ্রামলিপি হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালের জনৈক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পুত্রের নাম জানা যায়। বলা হইয়াছে যে, উক্ত তাম্র-শাসনের দূতক ছিলেন রাজার পুত্র প্রহসিতরাজ। এই প্রহসিতরাজকে তদীয় পিতার মন্ত্রীরূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে। পালবংশীয় রাজগণের নামান্তে পাল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসিতরাজকে কেন প্রহসিত পাল বলা হয় নাই, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পালরাজগণের অবিবাহিতা প্রেয়সীদিগের গর্ভজাত পুত্রগণের এইরূপ নামকরণ হইত কিনা, তাহা বিবেচ্য।

বর্ত্তমান তাম্রশাসন তৃতীয় বিগ্রহপালের সপ্তদশ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তারিখটির অনেকখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বাংলার ইতিহাসবিষয়ক অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইতিহাসে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আনুমানিক ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পনর বৎসর তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল গণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষে আমগাছী তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার পরে তিনি কত বৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন, এতদিন তাহা নিশ্চিত জানিবার কোন উপায় ছিল না। পালবংশীয় তিন জন বিগ্রহপাল নামক নরপতির মধ্যে অন্ততঃ এক জন অন্যূন ছাব্বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ রাজা বিগ্রহপালের ষড়্‌বিংশ রাজ্যবর্ষে পঞ্চরক্ষানামক বৌদ্ধগ্রন্থের একখানি পুথি নকল করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই বিগ্রহপাল পালবংশীয় প্রথম বিগ্রহপাল হইতে পারেন না। কারণ তিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মাত্র অল্প কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কি তৃতীয় বিগ্রহপাল তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের কোন নির্দ্দিষ্ট রাজ্যবর্ষের উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই, তবু অনেকে ষড়্‌বিংশ বর্ষাধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদারের মতে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল আনুমানিক ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বনগ্রামলিপি হইতে জানা গেল যে, তৃতীয় বিগ্রহপাল অন্ততঃ সতর বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ষড়্‌বিংশ বর্ষাধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অল্প কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বনগ্রামলিপি হইতে জানা যায় যে, তীরভুক্তি অর্থাৎ উত্তর বিহার তৃতীয় বিগ্রহপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের সহিত বিহারের অধিকার লইয়া ত্রিপুরীর কলচুরিবংশীয় রাজগণের দীর্ঘকাল বিবাদ চলিয়াছিল। একখানি রামায়ণের পুথিতে দেখা যায় যে, ১০৭৬ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে তীরভুক্তি কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মুসলমান লেখক বৈহকীর বিবরণ অনুসারে ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে গাঙ্গেয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার ইতিমধ্যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী অঞ্চলে পালবংশীয় মহীপালের লেখ পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারেও মহীপালের কতকগুলি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণ (১০৪১-৭১ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর নিকটে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ১০৫১ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিও ঐ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কলচুরিবংশের লেখমালায় রাজা কর্ণকে গৌড়-বঙ্গের বিজেতারূপে উল্লিখিত দেখা যায়। দিগ্বিজয়ী কর্ণ যে

পালসৈন্য পরাভূত করিয়া বীরভূম জেলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, পাইকোড় লিপিতে তাহার প্রমাণ আছে। এদিকে তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মহীপালের পুত্র নয়পাল কর্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ বিহারে নয়পালের একখানি লিপিও পাওয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অনুসারে নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল কলচুরিরাজ কর্ণকে পরাজিত করিয়া তদীয় কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীরভুক্তিতে তৃতীয় বিগ্রহপালের অধিকার এই উক্তির সমর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সময়েও পাল-কলচুরি দ্বন্দ্বের অবসান হয় নাই। কারণ কর্ণের পুত্র যশঃকর্ণকে চম্পারণ্য (উত্তর-বিহারস্থিত চম্পারণ) বিদারণের দাবি করিতে দেখা যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগ্রাম তাম্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুইটি শ্লোকে রচিত একটি পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টটি এইরূপ :

ক্রোড়াঞ্চাদ্বিরিয়ায় কাচ্ছ ইতিরঃ সত্ব্রাহ্মণানাং স্থিতি
স্তস্মাদ্ গোহণকো দ্বিজোত্তম গৃহং বিশ্রামভূর্যজ্ঞনাম্।
আম্রাদিজহলেতি যত্র বিবদো যোগেশ্বরঃ যৎসুতঃ
খ্যাতস্তজ্জ ইতোপি নির্ম্মলযশা ঘণ্টীশনামাত্মজঃ।
যো গৌড়াধিপতেরসীমগুণভূ রাজ্ঞো বিধেয়ো দিশাং
ভূপালেষু বিধায় মৈত্রামসমং সন্তুষ্টচিত্তান্বিতঃ।
কৃত্বা শাসনমেতদাত্মহলতঃ কামপ্যবদ্যাস্থিতিং
বিশ্রামায় চ দীনদুঃখিতজনস্তাভূদিহৈবাশ্রমম্।

শাসনের মূলাংশে দেখা যায়, রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল কোলাঞ্চ বা ক্রোড়াঞ্চ দেশ বিনির্গত ইট্টাহাক বা ইটুহোক গ্রাম বাস্তব্য ঘণ্টুকশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে তীরভুক্তিস্থিত হোস্তেরবিষয়ান্তর্গত বসুকাবর্ত্ত গ্রামের কিয়দংশ দান করিতেছেন। কিন্তু উল্লিখিত পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ ভূমি প্রকৃতপক্ষে রাজার ঘণ্টীশ নামা জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী কর্তৃক তদীয় জাগীর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়া তীরভুক্তিতে বাস করিতেছিলেন। শাসনদাতা ব্রাহ্মণ ঘণ্টীশেরও একজন পূর্ব্বপুরুষ ঐরূপ কোলাঞ্চ হইতে আসিয়া তীরভুক্তিবাসী হইয়াছিলেন। কোলাঞ্চবিনির্গত কাচ্ছ; তৎপুত্র গোহণক; তাঁহার কন্যা ইচ্ছলা; তৎপুত্র বিবদ; তৎপুত্র যোগেশ্বর; তৎপুত্র ভুজ; তাঁহার পুত্র ছিলেন শাসনদাতা ঘণ্টীশ। এই পরিশিষ্ট হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্থানীয় তীরভুক্তিবাসী ব্রাহ্মণেরা কোলাঞ্চদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের দূর-সম্পর্কও সগৌরবে প্রচার করিতেন এবং ভূমিদানাদি দ্বারা কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তীরভুক্তিতে কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্য্যাদার এই আতিশয্যের সহিত মিথিলাদেশে কৌলীন্য এবং কুলপঞ্জিকা রাখিবার প্রথার উৎপত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কৌলীন্যপ্রথার জন্য বাংলাদেশ মিথিলার নিকট ঋণী। রিজলি কৃত *People of India*, 1915, p. 215; জয়কান্ত মিশ্র প্রণীত *History of Maithili Literature*, vol. I, pp. 26ff. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কিছুকাল পূর্ব্বে মিথিলার সরৌলী মূলগ্রামীয় ব্রাহ্মণের সহিত বাঙালী ব্রাহ্মণ-সমাজের গাঙ্গুলীর অভিন্নতা বিচার প্রসঙ্গে আমারও ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু উভয় দেশে কৌলীন্যের উৎপত্তি যে একই প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কোলাঞ্চদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বনগ্রাম লিপির সাক্ষ্য এবং উল্লিখিত কিংবদন্তী মিথিলা ও বাংলার কৌলীন্যের মধ্যে একটি যোগসূত্রের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নাই। ঠিক এইরূপ অপর একটি যোগসূত্রের সন্ধান দেয় আদিশূরের কাহিনী।

বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণেই কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণেরা বাংলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের যে বিবরণ দেখা যায়, উহা সর্ব্বাংশে পরস্পর-বিরোধী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৬২৫-২৬ দ্রষ্টব্য। এমন কি যে বৎসর কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণেরা বাংলায় উপস্থিত হন, উহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দের কথা বলা হইয়াছে। এই কিংবদন্তীসমূহ যে আদিশূরের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা ও বিহারে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, প্রাচীন বাংলায় শূরবংশের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু আদিশূর নামক কোন নরপতির অস্তিত্ব বাংলার কোন ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বভারতের একমাত্র ঐতিহাসিক আদিশূরের অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রমাণ মিথিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচী নামক গ্রন্থ ৮৯৮ সংবৎসরে রচিত হইয়াছিল। ইহা বিক্রমসংবৎ, শকাব্দ নহে। কারণ প্রাচীন মিথিলায় শকাব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল। সুতরাং ন্যায়সূচি ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়কণিকা সংজ্ঞক অপর একখানি গ্রন্থে আদিশূর নামক, গ্রন্থকারের জনৈক সমসাময়িক নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৫৭শ ভাগ, পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য। এই আদিশূর নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশীয় সম্রাটগণের সামন্তরূপে মিথিলা ও তন্নিকটবর্ত্তী বাংলার কিয়দংশ শাসন করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

খাদ্য উৎপাদনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন কৃষি ও খাদ্যসচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, যদিও কৃষিবিভাগ উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ, রাসায়নিক সার বিতরণ, উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রের সরবরাহ, বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন শস্যের চাষের প্রবর্তন, পোকামাকড়, রোগের আক্রমণ হইতে শস্যরক্ষা প্রভৃতি কাজে ব্রতী আছে, তথাপি এই সকল কাজের জন্য কৃষিবিভাগ কোনরূপ কৃতিত্ব দাবি করে না। কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা দেশের কৃষিপ্রণালীসমূহের স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতিসাধন হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিবিভাগ কোনকালেই উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত শ্রেণীর বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারিবে না। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম বাংলায় মোটামুটি তিন কোটি বিঘায় ধানের চাষ হয়। এই তিন কোটি বিঘা জমির জন্য মোটামুটি ৫০ লক্ষ মণ বীজের দরকার। কিন্তু কৃষিবিভাগের পক্ষে এই পরিমাণ বীজ সরবরাহ করা মোটেই সম্ভব নয়। সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতির কারখানায় যে পরিমাণ সার প্রস্তুত হইবে তাহাও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত তিনি দেন।

কিন্তু সমস্যার সমাধান কি—কৃষি ও খাদ্য সচিব এই প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন যে, এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং জনসাধারণের কৃষির প্রতি অতীতের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধন অত্যাবশ্যক এবং সরকারী কৃষিবিভাগ এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে; এই বিষয়ে কৃষিবিভাগের সফলতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে বলেন যে, কৃষি বিভাগের উৎসাহে ও প্রেরণায় কয়েক স্থানে সমবায় প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের প্রবর্তন হইয়াছে; পল্লী অঞ্চলে ঘাস, জঙ্গল, আবর্জনা, কচুরিপানা প্রভৃতির দ্বারা 'কমপোষ্ট' সার প্রস্তুতের প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কেননা তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছেন যে, এইরূপ কমপোষ্ট সার প্রয়োগের ফলে ধান এবং অন্যান্য শস্যের ফলন আশাতীত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে শস্যে ঔষধ ছিটানোর প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের যে কুসংস্কার ছিল তাহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে ও চেষ্টায় প্রায় ১৫০টি ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়াছে। কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতার প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ খুবই বর্দ্ধিত হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ কৃষি ও খাদ্য সচিব প্রদান করেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কৃষির উন্নতিসাধনের এবং অধিকতর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কেবল কৃষক সম্প্রদায়ের নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়েরও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। কৃষিকাজ যে হেয় নহে, শ্রেয়ঃ—এই কথাটি এখন সকল সম্প্রদায়কেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং কৃষি ও খাদ্য সচিব যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী-সাধনকে কৃষিবিভাগের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন ইহা খুবই আশ্বাসের কথা।

কিন্তু নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহার বিশেষ কোন ইঙ্গিত এখনও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে না। এই উদ্দেশ্যে যে দুই-একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে (যেমন 'ভূমি সেনা' গঠন), তাহা বেশীর ভাগ কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কৃষির প্রাধান্য ও গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বহু রকমের পূজা-পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হইত; অনেক গান, ছড়া প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, নানা উৎসবেরও ব্যবস্থা ছিল, এখন সেই সকল পূজা-পার্ব্বণ-উৎসব প্রভৃতি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রবাদবাক্য, গান, ছড়া প্রভৃতি বিস্মৃতির গহ্বরে চলিয়া গিয়াছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করিতে হইলে পুনরায় কৃষি-সম্পর্কীয় নানা উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে; গান, ছড়া প্রভৃতির প্রবর্তন করিতে হইবে; আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিমুখী করিতে পারিলেই কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। কাগজে-কলমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কৃষিমুখী করিবার অনেক ব্যবস্থার কথা শুনি; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় দেখিতে পাই না। নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির উপর অনেক সর্ত্তই আরোপ করিতেছেন যেমন পাকা পায়খানা, পাকা কুয়া, খেলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা, কিন্তু এই সকল সর্ত্তের মধ্যে উদ্যানরচনার উল্লেখ নাই। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে খেলার মাঠের তেমন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। খেলার মাঠের পরিবর্ত্তে 'উদ্যান'কে প্রাধান্য দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিমুখী করিবার অনেক ব্যবস্থাই আছে। অথচ সে সব দেশেও

অনেক প্রাচীন উৎসব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বালক-বালিকারা এখনও শস্যকর্ত্তনে তাহাদের অভিভাবকদের প্রচুর সাহায্য করে। বড় বড় ছেলেরা ট্রাক্টর চালায় এবং বালিকারা মাঠের কর্ম্মীদের জন্য খাদ্য ও ঠাণ্ডা চা লইয়া যায়। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে এই কার্য্যে বালক-বালিকাদের উৎসাহ দিবার জন্য প্রথমে চা পানের আয়োজন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু রকমের আমোদ-প্রমোদ, তামাশা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের কৃষকেরা একত্রিত হইয়া বৃহৎ ভোজেরও ব্যবস্থা করে। গ্রামের মাঠে প্রথমে ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয়। ছোট ছোট বালকদের জন্য দৌড় ও অন্যান্য খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকে, এবং প্রচুর পরিমাণে আইসক্রীম ও লেমোনেড সরবরাহ করা হয়। পরে বিদ্যালয়ে চায়ের ব্যবস্থা থাকে এবং এই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়গৃহ কলরবে মুখরিত করিয়া তোলে। এই রকম হাসি, কৌতুক, আমোদ, চীৎকার বিদ্যালয়ে আর কখনও দেখা যায় না। বিদ্যালয়ের দরজার উপরে শস্যের মালা ঝোলানো থাকে, শস্যের শীষ, লতা পাতা, ফুল প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়গৃহটি সুশোভিত করা হয়। বিদ্যালয়ের ব্ল্যাক বোর্ড, ডেস্ক প্রভৃতির স্থানে টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়। চারিদিকেই আপেল, পিয়ার, প্লাম প্রভৃতির ঝুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকদের পত্নী ও কন্যাগণ ছেলেদের যে যাহা চাহে খাইতে দেন। ইহার পরেও আবার খেলাধূলা, গানের আয়োজনও থাকে; যাদুকর নানাবিধ খেলা দেখায়, এই সময়ই "Harvest Home" (বাড়ীতে শস্য আনয়ন উৎসবের) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্মাদনা। শস্যকর্ত্তনের গান (Harvest hymn) গাওয়া হয়; এই গানটির প্রথম চার পংক্তি হইতেছে—

We have ploughed, we have sowed,
We have reaped, we have mowed,
We have brought home every load,
Hip, hip, hip, Harvest Home!

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যশস্য কর্ত্তনের সময় পল্লী অঞ্চলে এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা খুবই বাঞ্ছনীয় এবং এই উপলক্ষে বিদ্যালয়সমূহে দুই-এক দিন ছুটি দেওয়াও সঙ্গত। তবে ছুটিতে বিদ্যালয়ের দরজা জানালা বন্ধ থাকিবে না, শিক্ষকগণও অনুপস্থিত থাকিবেন না; ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া 'হারভেষ্ট হোম'-এর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়গৃহে কৃষিসম্পর্কীয় সিনেমা, নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়ও হইতে পারে।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শ্রীনীলরতন দাশ

ভারতগগনে যুগসঞ্চিত নিবিড় তিমির নাশি'
ভাস্করসম তোমার উদয়, হে তরুণ সন্ন্যাসী!
পূর্ব্ব-তোরণে শঙ্খাহরণ ডঙ্কা বাজালে যবে—
তন্দ্রা-অলস নেত্র মেলিয়া চমকি' চাহিল সবে।
রুদ্র আঘাতে সুপ্ত জাতিকে জাগালে দৃপ্ত তেজে,
নব চেতনার স্পন্দনধ্বনি বক্ষে উঠিল বেজে।

সম্মুখে হেরি' কোটি কোটি দীন দরিদ্র নারায়ণ
পতিতপাবন যজ্ঞের তুমি করেছিলে আয়োজন।
দুর্গতদের মুক্তির তরে জেলে দিলে হোমানল,
দীক্ষিত হলো সেবার মন্ত্রে নূতন কর্ম্মিদল।
'জীবে প্রেম করে' যে জন জগতে সেই ভজে ঈশ্বর—
এ বাণী আত্মভোলা এ জাতির পরশিল অন্তর।

বেদ বেদান্ত উপনিষদের গভীর মর্ম্মবাণী
তব সাধনায় প্রাচ্য-প্রতীচে হ'য়ে গেল জানাজানি।
ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মযোগের সাধিয়া সমন্বয়
ভারতাত্মার শাশ্বত বাণী ঘোষিলে জগৎময়।
ভিখারীর বেশে বিশ্ববিজয় করিয়া প্রতিভাবলে
ফিরিলে স্বদেশে তুমি রাজবেশে বিজয়মাল্য গলে!

তমোগুণে ভরা মৃতের মুলুকে অমৃত সৃষ্টি লাগি'
শক্তিসাধনা শিখালে সবারে, হে নবীন বৈরাগী!
নব্য যুগের মহাভারতের তুমি যে সব্যসাচী,
তব আহ্বানে ক্লৈব্য ত্যজিয়া নাচিয়া উঠিল প্রাচী।
ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃতী শিষ্য যোগ্যতম—
ভাব-জগতের বিপ্লবী বীর সন্ন্যাসী নমোনম!

শ্রীসুধীরকুমার সেন

কয়েকদিন ধরে মজা মন্দ হচ্ছে না। অবিনাশ পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, ভাল করে দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়, তার পর দৃষ্টিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করে যতদূর নজর যায় তাকিয়ে দেখে। পথের অপর পারে দেয়াল-সংলগ্ন প্ল্যাকার্ডের ছোট ছোট লেখাগুলো কষ্ট করে পড়ে। কখনও বা নিজের গলার কাছে, গালের উপরে চিমটি কাটে, যন্ত্রণায় দেহ আকুঞ্চিত হতে থাকে তবু ছাড়ে না, তার পর আবার পথ চলে।

কয়েক দিন ধরে অবিনাশের মনের মাঝে একটা অদ্ভুত সন্দেহ থেকে থেকে জেগে উঠছে। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছে যেন সে জেগে নেই—যেন এক ঘন অন্ধকার রাত্রে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে, তার চোখের সামনে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এসে এসে সরে যাচ্ছে, আর তারি সঙ্গে কতকগুলো আশাতীত অসম্ভাবিত আকস্মিকতা। বোধ হয় এ শুধু একটা রাতেরই স্বপ্ন।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবিনাশ চোখ বিস্ফারিত করে এদিক ওদিক তাকায়। চেনা মানুষগুলোর মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখে, চেনা জায়গার সামনে এসে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিশেষত্বগুলোকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে—যেগুলো অনেকবার দেখে দেখে তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কয়েক বার সে মালতীকে বলেছে, 'দেখ, মাঝে-মাঝে আমার মনে একটা অদ্ভুত সন্দেহ জাগছে। কখনও কখনও মনে হয় কি জানো? মনে হয় যে, আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই সব স্বপ্ন দেখছি—যেন সবই মিথ্যে।'

প্রত্যেক বারই মালতীর ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, অবিনাশ স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে সেই হাসি। নাঃ, মালতীর কাছে এই কথা বলতে গিয়ে সে নেহাত বোকাই বনেছে।

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, রাতের পর রাত, তবু অবিনাশের মন থেকে সন্দেহের ঘোর কাটল না, অথচ তারই জন্য তার কত না অক্লান্ত চেষ্টা। পকেট থেকে মুঠো মুঠো টাকা তুলে নিয়ে বিছানার উপর রেখেছে, একটা একটা করে গুনেছে, আবার সাজিয়েছে, আবার গুনেছে। সিন্দুকের একপাশে স্তূপীকৃত নোট—থরে থরে সাজান। নোটগুলো গোনা তার রোজকার কাজ। তার গোনা শেষ হলে মালতীকে দিয়ে গোনার হিসাবে কোন গরমিল ধরা পড়ে কিনা তাই পরখ করতে। নাঃ, স্বপ্ন কখনই নয়। তা হলে হুবহু এমন ভাবে কখনই মিলে যেত না.

বাড়ী থেকে বেরিয়েই রাজেন কয়ালের সঙ্গে দেখা। ছেলেবেলার বন্ধু—একসঙ্গে কম পক্ষে সাত-আট বছর স্কুলে পড়েছে, খেলেছে, বেড়িয়েছে। রাজেন বললে, 'প্রায় দু'যুগ পরে দেখা, চিনতে পারিস?'

চেনবার মত রাজেনের শরীরে কিছু নেই, তার বর্ত্তমান যেন নিষ্ঠুর ভাবে অতীতকে নির্ব্বাসন দিয়েছে। সেই কাঁচা সোনার মত রং, নধর দেহ, হাঁটলে মনে হ'ত যেন নেচে নেচে চলছে—আজকের এই রাজেনকে দেখলে কার মনে পড়বে ছেলেবেলার সেই রাজেন কয়ালের কথা! ময়লা কাপড়, জামাটা ছিঁড়ে নীচের দিকে নেমেছে, দাড়ি বোধ হয় সাত-আট দিন কামানো হয়নি, বগলে এক তাড়া নথিপত্র—সুরম্য অট্টালিকা হতশ্রী হলে যে রকম হয় ঠিক তারই মত তার অবস্থা! তবু চিনল তাকে অবিনাশ, বললে, প্রায় কুড়ি বছর পরে, ইস, কি হয়ে গেছিস তুই, কোথায় আছিস ভাই?'

'এই যে, এই বাড়ীটায়। নীচের তলায় দুখানা ঘর, তাই ভাড়া নিয়ে আছি।'

অবিনাশ বিস্মিত ভাবে বললে, 'কবে এলি, কৈ জানি না ত। এই গলিরই ও-মাথায় আমি থাকি, ওই যে লাল বাড়ীখানা—'

রাজেনের চক্ষু যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল, 'তা হলে তুই-ই সেই অবিনাশ চক্রবর্ত্তী! ওই বাড়ীতে থাকিস তুই! লটারিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা তা হলে তুই-ই—'

অবিনাশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চার দিক দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ ভাই, আমিই সেই অবিনাশ চক্রবর্ত্তী—'

তার পর তাকে যেন অন্যমনস্ক করবার জন্য বলে, 'সেই ছেলেবেলায় মনে আছে ত, এক দিন কি বলেছিলুম—'

রাজেন স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বল্‌ ত—কি বল্‌ ত—'

অবিনাশ হেসে বলতে লাগল, 'সেই যে বলতুম, বড় হয়ে যদি খুব বড়মানুষ হতে পারতাম, খু-উ-ব—'

রাজেন উল্লাসে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বলছিস সত্যি তুই। কিন্তু হ্যাঁ, মিলে গেছে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে—পঞ্চাশ হাজার! আচ্ছা এখন যাই ভাই, বেলা হয়ে গেল, আবার যেতেই কোর্টমুখো—'

দারিদ্র্যের এক বীভৎস মূর্ত্তি চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

ধরে চলেছে। মাঝখান দিয়ে ছুটেছে ট্রাম, বাস, মোটর। অবিনাশ একটা একটা করে মানুষ গোনে, তার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে যায়। তখন গাড়ীর নম্বর মুখস্থ করতে আরম্ভ করে। প্ল্যাকার্ডগুলোও পড়তে ভোলে না।

পরমুহূর্তেই হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যেন ভাবছিল, কি যেন মনের মধ্য থেকে হারিয়ে গেল, কিছুতেই আর তার উদ্দেশ পায় না।

স্বপ্ন ও সত্যের মাঝে এই যে অসংলগ্ন মুহূর্তগুলো—এরা যেন বেতালে পা ফেলে চলছে। চেতনা বুঝি দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তবু অবিনাশ চলে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

লালবাজারের পথে নিশাপতির সঙ্গে দেখা। লোকটা ফুটপাথের এক পাশে সযত্নে সজ্জিত কতকগুলো লটারির টিকিটের মাঝে কি যেন হাতড়াচ্ছে! নিশাপতি তা হলে আজও হাড়ে নি। এখনও আশা আছে!

অবিনাশকে দেখে নিশাপতি চট করে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'কেমন, বলিনি অবিনাশবাবু, লাগবে, একদিন না এক দিন লাগবেই—যাবে কোথা?'

আপিস থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরে নিশাপতি, ট্রামের ভাড়া আর জলখাবারের পয়সা বাঁচায়। সেই টাকা দিয়ে ক্রমাগত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লটারির টিকিট কিনে চলেছে—আশা এক দিন না এক দিন বরাত খুলবেই। মাঝে মাঝে পথের পাশে গণকের কাছে হাত দেখায়—সাধু-সন্ন্যাসী পেলে তাদের পেছনে লেগে থাকে। কে জানে, কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে অদৃষ্ট ফিরবে!

নিশাপতি উঠে দাঁড়াল। হাতে খানকতক সদ্য কেনা টিকিট। বুক-পকেটের ছেঁড়া জায়গা দিয়ে কতকগুলো টিকিটের কোণ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে সত্যিই নেশায় পেয়েছে!

নিশাপতি অবিনাশকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, 'আসুন অবিনাশবাবু, এক কাপ চা খেয়ে যান, অনেক দিন পরে দেখা—'

চায়ের দোকানের ছোকরাকে দু' কাপ চা দিতে বলে অবিনাশের কানের কাছে মুখ এনে নিশাপতি ফিস ফিস করে বললে, 'এবার বোধ হয় টেলিগ্রাম আসবে।'

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে বলল, 'কিসের?'

নিশাপতি মুচকি হেসে বলল, 'পেয়েছি।'

অবিনাশের বিস্ফারিত চোখ নামল না। নিশাপতি কি পাগল হয়ে গেল! 'কি বলছেন আপনি?'

চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে নিশাপতি ব্যাপারটা খুলে বললে। কাল রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে, সেই লেখানে তার নম্বর উঠেছে। একটা-না-একটা এবার লাগবেই—হয় প্রথম, নয় দ্বিতীয়, নিদেনপক্ষে তৃতীয়।

ও যেন এক স্বপ্নচারী, অবাস্তবের পথে চলতে চলতে এমনই হয়েছে যে স্বপ্ন থেকে আজ আর সে সত্যকে পৃথক করে চিনতে পারে না।

অবিনাশ উঠে পড়ল।...

কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? এই দুনিয়া জুড়াই ত স্বপ্নচারীর দল! এই ত সে নিজেই কয়েক দিন ধরে যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারপর যেদিন ছিঁড়বে এই স্বপ্নের জাল...

দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরল অবিনাশ। ট্রাম একটা যাচ্ছিল, লাফিয়ে উঠল।

ট্রাম ছুটেছে। বাড়ীর পর বাড়ী, গাড়ির পর গাড়ি, জনতা আলো—

জানালা দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে থাকে অবিনাশ, এই বস্তুর অরণ্যে কোথায় স্বপ্নের অবকাশ?

ট্রাম ছুটেছে, কেউ নামে, কেউ ওঠে।

এই—এই ত সেই গলি, এরই শেষ মাথায় তার বাড়ী।

লাফ দিয়ে নামল অবিনাশ। আর, তারপর এমন ভাবে হাঁটতে লাগল যেন একটা মুহূর্তের এদিক ওদিক হওয়ার উপরে তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে! বাড়ীর সামনে পৌঁছেই দরজায় ধাক্কার সঙ্গে তুমুল চিৎকার—'মালতী মালতী—'

দরজা খুলে যায়।

মালতীর চোখে মুখে বিস্ময়—কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য করবার অবকাশ অবিনাশের নেই। লাফাতে লাফাতে দু'তিন সিঁড়ি পার হয়ে সে উঠল দোতলায়। চাবি, চাবি কোথায় গেল? মালতী মালতী—

নাঃ থাক, দরকার নেই, চাবি সে পেয়েছে। মুহূর্তে অবিনাশ ঘরের কোণে গিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলল।

টাকা—টাকা—টাকা! তাড়ায় তাড়ায় নোট বাঁধা।

এক দুই তিন—

নাঃ ঠিকই আছে। মিথ্যা সন্দেহ!

নিদারুণ অবসাদে মাটির উপর বসে পড়ে অবিনাশ হাঁপাতে লাগল।

বিকেল থেকে কয়বার রাজেন এসে অবিনাশের বাড়ীতে তড়া মেড়ে ফিরে গেছে। রাস্তে পথে দেখা।

রাজেন টাকা চায়। একটা নয় দুটো নয়, এক হাজার! আপিসের মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করবে। টাকাগুলো মেরে দেবার কল্পি মন্দ করে নি! ঐ ত চেহারা, জোর না হয় বছরখানেক, কি দু'বছর, তার পর ত চক্ষু উল্টাবে,

টাকা শোধ করবে কে? ছেলেবেলায় বন্ধুত্বের দাবিতে অবিনাশকে কতুর করতে চায়।

হ্যাঁ, মানুষ বটে নিশাপতি! বলে, 'আপনার কাছে আসি, দু'দণ্ড বসি, তা বলে মনে করবেন না যে কোন্ দিন বুঝি দশটা টাকা ধার চেয়ে বসব। কখ্খনও নয়—রামঃ! আর আমারও ত এল বলে! কে জানে আজ রাত্রে টেলিগ্রাম হাতে পিয়ন-মহাপ্রভু উদয় হন নাকি! এই দেখুন না—

ত্রিপুরা লটারির টিকিট!—শূন্য মনিব্যাগটার মধ্যে নিশাপতি সেটাকে লক্ষ টাকার সরকারী কাগজের মত সযত্নে রেখে দিয়েছে! কে জানে, কোন্ মুহূর্তে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হয়!

হ্যাঁ, এমন বন্ধু পাওয়াই ত সুখ, একটুকু নীচতা নেই! সেও ত অবিনাশের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছে, বড় হয়ে একসঙ্গে লটারির টিকিট কিনেছে, ছেঁড়া কাপড়ে ছিন্ন জামা গায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, ভাঙা কাপে চা খেয়েছে। সুখদুঃখের বন্ধু নিশাপতি! কিন্তু কি উদার! মুখ ফুটে কখনও দুঃখের কথা বলে নি, কখনও অবিনাশের কাছে একটা টাকা ধার চায় নি। অচল, অটল ভাবে খালি টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করছে—তারও একদিন আসবে।

অপেক্ষা করার সময় ছিল না নিশাপতির—কোথাকার এক লটারির ফল নাকি বেরিয়েছে, ষাট হাজার টাকা ফার্স্ট প্রাইজ, কে জানে, দেরি হলে হয়ত আর টিকিট পাওয়া যাবে না। ছুটল নিশাপতি। সময় পেলে রাত্রে দেখা করবে।

রাত্রে নিশাপতি আসে নি, এসেছে আবার রাজেন কয়াল। স্ত্রীর অসুখ, মরমর—ডাক্তার আনে এমন পয়সা ঘরে নেই। ছেলেবেলার বন্ধু রাজেন কয়াল, আজ অবিনাশ না দেখলে কে তাকে দেখবে? যদি সে বেঁচে থাকে, আর কোন রকমে যদি চাকরিটা বজায় থাকে, তা হলে যে-করেই হোক সে তার দেনা শোধ করবে। বন্ধুত্বের অপমান সে জীবন থাকতে করতে পারবে না।

হঠাৎ অবিনাশের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। জিব কেটে বলে, সব টাকা ত ভাই ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিটে রেখে দিয়েছি, কি করব বল, পাঁচ বছর না হলে ত—

'ফিক্সড্ ডিপোজিট!' রাজেনের কণ্ঠস্বর যেন আর্ত চীৎকারের মত শোনাল, বুঝি তার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল।

দুনিয়া অন্ধকারই বটে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে অবিনাশ এই কথাই ভাবে। মানুষের জীবন! বুঝি এ অন্ধকার রাত্রির মতই শুধু! কোথাও মিল নেই, ছন্দ নেই, সামঞ্জস্য নেই! শুধু কতকগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার আবর্তন মাত্র।

ঘরের মধ্যে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর হলেও হতে পারত—কিন্তু ইঁদুর নয়, অবিনাশ দিব্যি করে বলতে পারে।

নিঃশব্দে বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে অবিনাশ আলায়, ঘরের মেঝের, কোণে, দরজা ও সিন্দুকটার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে। একটা বেড়াল জানালার দিকে ছুটে গেল।

ভোর থেকেই দরজায় ডাকাডাকি—চায়ের কাপটাও শেষ করতে পারে নি।

'আপনি ত এখন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, পাছে বেরিয়ে যান তাই ভোর হতে না হতেই এসে পড়েছি। এই দেখুন আমাদের প্রস্পেক্টাস, নতুন হলে কি হয়, পুরোদস্তুর বাবা! শুধু হজুরিমল ঝাঁঝারিয়ারই রয়েছে দু' লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট! শুনেছেন ত এস. ডি. জোন্সের নাম? মস্ত বড়লোক—লাখ লাখ টাকার মালিক—যুদ্ধের বাজারের টাকা ত! ব্যাঙ্ক খোলার দিন দরজা খোলার তর সয় না, ঝাঁঝারিয়ার রোলস, আর জোন্স সাহেবের ক্যাডিলাক এসে হাজির, কার টাকা আগে জমা হবে! বলুন ত মশাই, শনি আর লক্ষ্মী কাকে রেখে কাকে চটাই, নতুন ব্যাঙ্ক আমাদের!'

অবিনাশ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'তাই ত!

লোকটার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, বললে, 'কিন্তু তা বললে ত হবে না, জটিল সমস্যা মশায়, কিন্তু হয়ে গেল এক মিনিটে মীমাংসা! একেই বলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের মাথা। ঠিক হ'ল ঝাঁঝারিয়া আর জোন্সসাহেব, দু'জনেরই নাম প্রথম ডিপোজিটর হিসেবে ব্র্যাকেটে থাকবে—দু'লাখ দু'লাখ চার লাখ!'

অবিনাশ অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কিন্তু আমার টাকা—'

মুখের কথা লুফে নিয়ে লোকটা বললে, 'আর কোথায় রাখবেন বলুন? দুনিয়া ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মত এত 'সেফ্' অথচ 'এমন হাই ইণ্টারেষ্ট' আর কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটাকে বিদায় না করলেই নয়। অবিনাশ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা 'আপনাদের প্রস্পেক্টাসখানা রেখে যান, সময়মত পড়ে দেখব।'

'নিশ্চয়ই,' বলে লোকটা প্রস্পেক্টাস সমেত দিস্তাখানেক কাগজপত্র অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিলে। 'দেখবেন পড়ে সময়মত। পড়লেই বুঝবেন যে, শতরেকের সিন্দুক, আর ব্যবসায়ে লক্ষ্মী—দুটো ফল এক সঙ্গে পেতে হলে দুনিয়া ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এক এবং অদ্বিতীয়। আচ্ছা, মনে রাখবেন।'

নমস্কার করে লোকটা বিদায় নিলে।

তবু সন্দেহ যায় না। মনে হয়, এক দিন লটারির টিকিট কেনার পর যে রাত্রি এসেছিল, তা আর প্রভাত হয় নি।

দুঃস্বপ্নের শেষ আছে, সুখস্বপ্নের শেষ নেই। কত বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই মহারাত্রির স্বপ্নভঙ্গ কবে হবে কে জানে?

নিশাপতি আপিসে যাবার পথে দরজায় ডাক দিয়ে জানিয়ে যায় যে, টেলিগ্রাম এখনও আসে নি। বলে, 'কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, টাকাটা পেয়ে গেছি, সাড়ে বিরাশি হাজার। হায়, হায়, সুখের স্বপ্ন কি চট করেই না ভেঙে যায়।'

অবিনাশের বেলায়ই কি শুধু ব্যতিক্রম।

শুধু, এ কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা। স্বপ্ন যেখানে বাস্তবের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছে, অথবা বাস্তবকে যখন স্বপ্ন থেকে পৃথক করে চেনবার উপায় নেই, সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে মানুষ কত দিন বাঁচতে পারে? দারিদ্র্যের মধ্যে আশৈশব লালিত অবিনাশ জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো ছিল স্বপ্নহীন, চলার পথ ছিল রুক্ষ, অমসৃণ, বাস্তবের ধূলি-ধূসরিত। আজ লটারির টিকিটে টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কোন্ ছেদহীন স্বপ্ন এসে তার চোখে আর মনে বাসা বাঁধল। না, স্বপ্নই সত্য, সৌভাগ্য মিথ্যা; স্বপ্নভঙ্গে আবার যে অবিনাশ, সেই অবিনাশ।

রাজেন কয়ালের সঙ্গে ভোরবেলায় চায়ের দোকানে দেখা হতেই রাজেন গোড়াতেই বললে, 'কিছু মনে করিস নি ভাই অবিনাশ, সেদিন মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে টাকা চেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর ভেবে দেখলাম, তুই-ই বা দিবি কোত্থেকে, দিবিই বা কেন? তুইও ত আজীবন দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে ভগবানের ইচ্ছের মত সুখের মুখ দেখেছিস। না, টাকা তোর কাছে সত্যিই আর চাই না।

অবিনাশ বাক্‌শক্তিহীন নির্বোধের মত চায়ের কাপটা রাজেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ চা চেয়ে নিলে।

রাজেন চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'সেদিন তোর কাছে টাকা চাওয়ার পর নিজের মনেই অত্যন্ত লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে চেয়েছি তা না দেখলে তোরও বিশ্বাস হবে না।' তার পর অবিনাশের কানের কাছে মুখ এগিয়ে গলা নামিয়ে বলে, 'বউয়ের টি-বি। পাঁচটি ছেলেমেয়ে ভাই, সবগুলোই বলতে গেলে দুধের শিশু। দেখাশুনো করার একমাত্র লোক হচ্ছে আমার বিধবা বোন্—কিন্তু তার যা চেহারা, দেখলে মানুষ বলে কিছুতেই মনে হবে না। কি বলব ভাই তোকে, সমস্ত দিনটা যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে,—ঘোর দুঃস্বপ্ন।' তার পর চায়ের কাপটা টেবিলের উপরে সশব্দে নামিয়ে রেখে বলে, 'ওঃ! ভগবান যদি তাই

!'

রাজেন বিদায় নেয়।

'অবিনাশ আবার পথ চলে। তন্দ্রালু প্রভাত। আকাশ ছেয়ে কি কুয়াশা নেমেছে!...

শহরের ঘুম তখনও ভাল করে ভাঙে নি। হাতীবাগানের বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় নজরে পড়ে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষের দল, কঠোর শ্রমের পর তাঁদের মুখে কি গভীর প্রশান্তি। কাছেই ট্রামের মজুর, সমস্ত রাত জেগে লাইন মেরামত করেছে।

অবিনাশ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এক জন ঘুমের মধ্যে তার হাতখানা নাড়ছে, মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় সে কোন মধুর স্বপ্ন দেখছে, বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। অবিনাশও হয়ত ওরই মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে—যে স্বপ্নের শেষ নেই।

রাতে ঘুম নেই, অবিনাশ অন্ধকারে বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও ছাদে, আবার ফিরে আসে বারান্দায়, ঘরে। মাঝে মাঝে এসে বিছানায় শোয়, সিগারেট ধরাবার অছিলায় দেশলাই জ্বালিয়ে মালতীকে দেখে নেয়। আঃ কি অনায়াস নিদ্রা! মনে পড়ে যায়, অবিনাশও এক দিন এমনি ভাবে ঘুমাতে পারত—গভীর শান্তিদায়িনী নিদ্রা। সমস্ত দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, টাকার চিন্তা, আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ভাত খেলেই চোখ ভেঙে ঘুম আসত। ঢুলে ঢুলে অতি কষ্টে মেয়ের পড়া বলে দিত, ঘুমের ঝোঁকে অনেক দিন ভুলও বলে দিয়েছে। তার পর কোন রকমে বিছানায় গা ঢালতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে বেহুঁশ হয়ে পড়ত।

মনে পড়ে, এক দিন ছাদ দিয়ে চোর এসেছিল, মালতী সেদিন অনেক ঠেলাঠেলি করেও অবিনাশের ঘুম ভাঙাতে পারে নি। ঘুম যখন ভাঙল তখন চোর নীচের দরজা খুলে পালিয়ে গেছে। সেদিন নিদ্রায় ছেদ ছিল না, স্বপ্ন ছিল না, জীবনের রুক্ষ পথে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। মনে পড়ে, একদিন সে একখানা লটারির টিকিটও কিনেছিল। মনে আছে, সেই টিকিট নিয়ে মালতীর সঙ্গে সেদিন রাত্রে তার যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল, তার পরিণতিতে মালতী রাত্রে ভাত খায় নি। সে কাহিনী বেদনায় নিছক বাস্তব। কিন্তু তার পরই এল এমন এক দিন, যাকে সে সুদিন না দুর্দিন বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। দুপুরে, 'অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী' এই নামে একখানা টেলিগ্রাম এল। মালতী টেলিগ্রাম খোলে নি, সমস্ত দিন এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কেঁপেছিল শুধু। রাত্রে অবিনাশ বাড়ী ফিরে টেলিগ্রাম খুলল। তার টিকিটের নম্বর উঠেছে। সত্যি, না স্বপ্ন! কে জানে সেদিন থেকেই স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল নাকি! তার পর আর এক দিন খবর এল তার ঘোড়া 'কাট' হয়েছে। চেক এল পঞ্চাশ হাজার টাকা। শুধু আবছা একটা স্মৃতির মত মনে পড়ে।

ছেলেবেলায় রিপ্ ভ্যান উইংকলের গল্প পড়েছিল অবিনাশ— লোকটা এক ঘুমে নাকি কুড়ি বছর কাটিয়েছিল। কে জানে, সে নিজেও সেই রকম ঘুমেই কাটাচ্ছে নাকি !

বিছানা থেকে উঠল অবিনাশ, বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে কালো মেঘ এসে সমস্ত তারা ছেয়ে ফেলেছে। বাড়ীটার অন্ধকার থমথম করছে। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অবিনাশের একটা কথা মনে এল। আজ সকালেই রাজেন তাকে বলছিল, সমস্ত দিনটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। কে জানে, যে টাকা আজ তাকে স্বপ্নচারী করেছে, সেই টাকা হয়ত রাজেনের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দিতে পারে।

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এল অবিনাশ, পা টিপে টিপে এসে সিন্দুকের সামনে দাঁড়াল। তার পর কোমর থেকে চাবিটা বের করে সিন্দুক খুলে ফেলল। চাবি ঘোরানোর শব্দে মালতীর বুঝি একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, 'যাঃ যাঃ' শব্দ করে কল্পিত ইঁদুর তাড়িয়ে সে আবার পাশ ফিরে শুল।

নোটগুলো তেমনি সাজানো আছে, থরে থরে। অবিনাশ সেগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে পকেটে পুরতে লাগল। তার পর সে ঘর থেকে বারান্দায় এল, বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল, দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। গলির অন্ত প্রান্তে রাজেন করালের বাড়ি।

মাথায় বাতাস দিয়ে স্ত্রীকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাজেন রাত আন্দাজ একটায় সময়ে শুয়েছিল, জোর বোধ হয় এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। এত রাত্রে কে ডাকে ? ত্রস্ত পদে এসে দরজা খুলে বললে, 'কে অবিনাশ, এত রাত্রে ভাই ! কোন বিপদ-টিপদ হয় নি তো ?'

অবিনাশের কণ্ঠস্বর শান্ত। বললে, 'বিপদ কাটাতেই এসেছি আমি। এই টাকাগুলো তুই-ই নে রাজেন, যাকে আমি স্বপ্ন মনে করেছি, তোর কাছেই তার সত্যের যাচাই হোক।'

'টাকা !' রাজেন করাল স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'টাকা কিসের !' গরীব বন্ধুর সঙ্গে অবিনাশ দুপুররাত্রে তামাশা করতে এসেছে নাকি !

কিন্তু তামাশা নয়, অবিনাশের গলায় স্বরে তামাশার বাষ্পও নেই। স্থির কণ্ঠে সে বললে, 'আমার লটারির টাকা। নে ভাই, তাড়াতাড়ি ধর," বলে সে স্তম্ভিত রাজেনের দু'হাতের মধ্যে নোটের তাড়াগুলো গুঁজে দিতে লাগল।

অবিনাশের মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে কথা বেরুল। অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'এর মানে কি অবিনাশ ?'

অবিনাশ অবিচলিত স্বরে বলল, 'বললুম যে, এর মানে যাচাই করার ভার এখন তোর উপর দিয়ে আমি এই অনর্থের বোঝা থেকে খালাস হলাম। এত দিন এই চার পাশের দুনিয়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না ভাই, যেন ঘুমের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। কাল থেকে আমি আবার মানুষের মত চলে ফিরে বেড়াতে পারব। এই আমার পরম লাভ। আচ্ছা ভাই, আর রাত জাগিস নি, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় গিয়ে, আমিও বাড়ী গিয়ে একটু স্বস্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিই।'

বলে অবিনাশ আবার নিজের মনেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

এতটুকু

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমি চেয়েছিনু এতটুকু ঠাঁই তোমার নিরালা ঘরে,
কেহ থাকিবে না, কেহ শুনিবে না আমাদের আলাপন,
মিনিটে মিনিটে চলে যে সময় হেলায় আলস ভ'রে
তাই থেকে কিছু দাও দাও ব'লে করিয়াছি আলাতন।

বেশী কিছু নয় এক মুহূর্ত ; অখণ্ড অবসর
তোমার জীবনে ছেদে বিচ্ছেদে আনিত কি যন্ত্রণা ?
এতটুকু দিলে ভাণ্ডারে তব হ'ত কি আত্যন্তর
ক্ষয় ও ক্ষতির অঙ্ক কষিয়া কেবা দিত গঞ্জনা ?

আমি দেখেছিনু তোমার নয়নে আমার প্রদীপ জ্বলে,
আমার নয়নে বিশ্বভুবন আলো করা ওই রূপ,
দেখি একাকিনী বৈরাগিণীরে আমার হৃদয়-তলে,
আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে দহে কামনা-গন্ধ ধূপ।

তারি মাঝে আমি চেয়েছি তোমারে ক্ষণ অবসর মাঝে
সংসার হ'তে নিজেরে সরায়ে নির্জনে নিরালায়,
সেই মুহূর্ত জীবনে আমার কোটি যুগ হয়ে রাজে
এতটুকু পাওয়া তারই ছোঁয়া লাগি' আছি যে প্রতীক্ষায়।

আমার জীবনে সেই মুহূর্ত দাও দাও প্রিয়তমে
নদী-তরঙ্গ যাবেক আমূক সমুদ্র-সঙ্গমে।

সাহিত্য ও সমাজ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। সেদিক থেকে দুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতানুসারে, সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য-কারণ বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের স্থূল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কারবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবার-গোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, অতি স্থূল স্থূল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকতে হয়। এ অবশ্য সত্য যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-বৃন্দকে নিয়ে যখন এক একটি পরিবার গড়ে উঠে, তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটি ব্যক্তিত্বের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি বহুল পরিমাণে বিস্তৃততর, ব্যাপকতর হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ কিছু পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলে পরিবারের গঠন সম্ভব নয়।

একটি পরিবারে সর্ব-সাধারণ-শুভের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনেক পরিমাণেই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক সংস্থাপিত করতে হয়। এই ভাবে পরিবারে কেবলমাত্র শুষ্ক ব্যক্তিস্বার্থের স্থানে যৌথ-স্বার্থই হয়ে দাঁড়ায় প্রধানতর। একই ভাবে বিভিন্ন পরিবার-মণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিও হয়ে যায় পুনরায় বিস্তৃততর এবং সর্বজনীন-শুভের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। এরূপে সমাজে ব্যক্তির অপেক্ষা জাতি, স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা সমবায়, একের অপেক্ষা বহুর দাবিই হয়ত মুখ্যতর। তা সত্ত্বেও যে কোন স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমাজেই পরিবারের, তথা ব্যক্তির দাবি উপেক্ষিত হবার নয়—কারণ পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাদের বাদ দিয়ে নয়। সেজন্য পরিশেষে সামাজিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ব্যক্তিগত সমস্যা। সমাজের বিধিনিষেধ এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাতে তা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ হতে পারে, এবং পরিবারের অলিখিত আইন-কানুনগুলিও সর্বদাই এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাতে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। এরূপে বৃহত্তর পরিবারের এবং বৃহত্তম সমাজের ব্যক্তিই মূলকেন্দ্র—ব্যক্তিগত তথা-কথিত ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলিই সমাজের নিজস্ব সমস্যা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সমাজের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও সমুন্নতিই সমাজের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি। সেজন্য পূর্বেই যা বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাবনা, আদান-প্রদানই সমাজের উপজীব্য বিষয়।

কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের—কাব্য, দর্শন, ধর্মের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ জড় পৃথিবীতেই চিরকাল প্রোথিত—প্রাত্যহিক জীবনের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়, জন্ম মৃত্যু-বিবাহ, দাবি অধিকার-আইন প্রভৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপৃত। এই জগতের ঊর্ধ্বলোকে, অপার্থিব মানসলোকে, আনন্দময় অমৃতলোকে দৃষ্টিপাত করবার তার অবসর বা সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু সাহিত্যের চির-অম্লান শতদল প্রস্ফুটিত হয় সেই অপার্থিব মানসলোকেরই চিরশোভন মানসসরোবরে। নিদাঘদাহে যেমন শতদলের শত দলই শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে, বাস্তবতার প্রখর তাপে তেমনি সাহিত্যের প্রাণবস্তুও হয়ে যায় বিনষ্ট। সেজন্য সাহিত্যের কমলাসন থাকবে পাতা সেই অবাস্তব সৌন্দর্যলোকেই মাত্র যেখানে পৌঁছাতেই পারে না কোন পার্থিব শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না ধরণীর ধূলার মলিন ছায়া, যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায় জাগতিক বিবাদ-বিসম্বাদের কর্কশ কোলাহল। সেই দিক থেকে সাহিত্য এক অপার্থিব, অনুপম সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আনন্দের পূর্ণ দ্যোতক যার কণামাত্র এই অপূর্ণ জগতে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য স্বভাবতঃই সাহিত্য ইহ-জগতের, এই মর পার্থিব জগতের প্রতিচ্ছবি নয়, প্রতিচ্ছবি সে এক অপার্থিব মানসজগতের, এক অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যেরই মাত্র।

বাস্তবজগতের অনিবার্য কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত মানব সাময়িক শান্তি সন্ধান করে মনঃকল্পিত এক সু-উচ্চ জগতে—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। রক্তমাংস-গঠিত, জড়দেহেন্দ্রিয়বান্, এবং সেদিক থেকে পশুতুল্য, মানবের জীবনের অপর একটি দিকও আছে—আত্মার দিক, বিচার-বুদ্ধির দিক, নীতি-বিবেকের দিক—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। বাস্তব জগতের সঙ্গে নাড়ীর টানে আবদ্ধ থাকলেও মানব আদর্শবাদী, সত্য-সন্ধানী, পূর্ণতা-পিয়াসী—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। এরূপে

আদর্শ ও আনন্দ—যে আদর্শ বাস্তব জগতে চির-অপূর্ণ এবং যে আনন্দ "সর্বং দুঃখং দুঃখম্" সংসারে চির অপ্রাপ্য—সাহিত্য-সৌধের যুগল স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু সমাজের স্তম্ভ সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপে সমাজ ও সাহিত্যের মূলভিত্তি-গতই বিরোধ। সেজন্য সমাজের সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে আইন-কানুনের পুস্তক, বিধি-বিধানের ধারা; জাতি সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব; দেশ সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ভূগোল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কিন্তু এই সব হচ্ছে "বিবরণী" বা "কাহিনী"ই মাত্র, "সাহিত্য" নয়। সাহিত্য হচ্ছে লঘু দিক থেকে কাব্য প্রভৃতি, গুরু দিক থেকে দর্শন, ধর্ম আলোচনা প্রভৃতি। কাব্যের মাধ্যমে আমরা আস্বাদ পাই এক অনন্ত সৌন্দর্যলোকের এক অনাবিল আনন্দের পীযূষধারার; দর্শনের মাধ্যমে আমরা লাভ করি এক পরিপূর্ণ আদর্শলোকের শাশ্বত শান্তির অমূল্য কৌস্তভমণি। এরূপে আনন্দ ও শান্তিপ্রদায়ক সাহিত্য নিরানন্দ, অশান্তিসঙ্কুল জীবন, সমাজ ও জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। এই হ'ল সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে এক চরম মতবাদ।

দ্বিতীয় চরম মতবাদ হ'ল এই যে, সাহিত্য ও সমাজ কার্য-কারণরূপে অঙ্গাঙ্গী ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সমাজের প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ সবই বাস্তব, নগ্ন ও সাক্ষাৎ ভাবে অঙ্কিত হয় সাহিত্যেরই ছত্রে ছত্রে। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, রক্ত মাংসে গঠিত মানুষেরই সৃষ্টি, দেবতার নয়। মানুষের জীবনে অবশ্য দুটি দিক্ আছে সন্দেহ নেই—দৈহিক দিক, পার্থিব দিক, এবং আত্মিক দিক ও অপার্থিব দিক। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের দৈহিক, পার্থিব দিকটাই প্রধানতর ও ব্যাপকতর—তাকে পরিবর্জন বা অস্বীকার করে মানুষের মনুষ্যত্ব হয়ে পড়ে অর্থহীন। সেজন্য যে সাহিত্য মানুষের প্রাণের কথার বাহ্যিক অভিব্যক্তিই মাত্র, যে সাহিত্য মানুষের জীবনের মূলমন্ত্রের লিখনাত্মক রূপই মাত্র, সে সাহিত্য যে তার নিত্যনৈমিত্তিক ভাব-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ-আবেষ্টন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকবে, তাই বা কি করে সম্ভবপর হয়? যে কল্পলোকের নিরন্তর আনন্দ-নির্ঝর-ধারায় মানুষের কল্পনাবিলাসী, আকাশবিহারী মন বিলাস ও বিহার করতে উদ্‌গ্রীব, তা যতই সাময়িকভাবে সুমধুর হউক না কেন, পরিশেষে কেবলমাত্র "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু।" সেজন্য অবাস্তব, স্বপ্নবিলাসী, আকাশবিহারী সাহিত্যও হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অবাস্তব—শূন্য-গর্ভ বুদ্বুদেরই মত তার ক্ষণস্থায়ী অবাস্তব জীবন, মূল্যহীন অবস্থিতি। অতএব সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে না, বরং এই সবের জলন্ত, বাস্তব চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যের ধর্ম।

এরূপে দুটি চরম মতবাদ এক্ষেত্রে পাওয়া যায়—আদর্শ-বাদ ও বাস্তববাদ, কল্পনাবাদ ও কঠোর সত্যবাদ। প্রথমটিকে বলা চলে Idealism, দ্বিতীয়টিকে বলা চলে Realism। দর্শনে যেমন সাহিত্যেও ঠিক তেমনি এই দুটি বিপরীতধর্মী স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত দেখা যায়। মানুষের স্বীয় প্রকৃতিতেই যে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি নিহিত আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যুগে যুগে মানুষেরই হৃদয়োত্থ সৃষ্টি—দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, স্নায়ু, রক্তকণা সম্বলিত মনুষ্য-দেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও, কি এক অপূর্ব জৈবিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। অন্যথা, জীবনধারণই হয়ে ওঠে অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, মানসিক ভাব সম্বলিত মানবমনও কি এক আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। নতুবা, ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ, সমগ্র ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে কথার কথা।

এরূপে শুধু মানবের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাস কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যেও একের, বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মধ্যেও সমগ্রের আবিষ্কার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও সমুন্নতির কারণ।' এই সর্বজনীন, মঙ্গলজনক নিয়মের বশবর্তী মানব-মনও বিপরীতধর্মী ভাব-ভাবনার বিপরীতমুখী আকর্ষণে বিপরীত দিকে চালিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেও, পুনরায় তাদের মধ্যেই এক অপূর্ব সমতা, স্থিরতা ও স্থিতি লাভ করে। সেজন্য সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনগ্রন্থি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা মানুষের প্রকৃতি-গত, স্বভাবজ। এরূপে সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনের মতের অনুসন্ধান করাও মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম।

বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ঋষি এবং চরম বস্তুবাদী ভোগীর সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থিগণের সংখ্যা অধিক। মনুষ্যজীবনের এই সমন্বয়ের চিত্র মনুষ্যসৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়েও সমভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

তারই ফলে, উপরি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মধ্যেও

আমরা পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ— যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতা, আকাশ ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহমনের ঘটেছে এক অনুপম সংযোগ। এই ঐক্য মতানুসারে, পৃথিবীর মানুষ আমরা, দেহমনোবান্ জীব আমরা—এই মাটির পৃথিবীর বুকেই, এই ধরণীর ধূলিতলেই আমাদের সৃষ্টি ও স্থিতি। সেজন্ত এই মর জগৎকে, এই জড়দেহমনকে আমরা যে শুধু নিঃশব্দ অবজ্ঞাই করতে পারি না, তা নয়; উপরন্তু, এদের আমরা ভালও বাসি, এদের সঙ্গে আমাদের সত্তার যোগ শাশ্বত ও অচ্ছেদ্য। সেজন্ত আমাদেরই প্রাণের জিনিষ সাহিত্যে আমরা প্রকাশ করি, আমরা প্রতীক্ষা করি, এই জড়-জগতেরই সত্য, বাস্তব, জীবন্ত, জাগ্রত রূপটির, এই মর দেহমনেরই সুখদুঃখ, আশা-আশঙ্কা, আলোড়ন-বিলোড়নের মূর্ত, পূর্ণ, যথার্থ, অকৃত্রিম অভিব্যক্তির।

প্রথম চরম মতানুসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি স্বল্প-সংখ্যক তীক্ষ্ণধী দার্শনিকের এবং উদগ্র কল্পনাবিলাসী রসিকজনের আদরের বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে "সাহিত্য"-পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব, যার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য নভস্তলে, তা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি-কেও কত কাল, কত পরিমাণে প্রকৃত তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয়, সেইটাই চিন্তনীয়। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে এই একাকী, উদগ্র খেলায় স্বয়ং মনই অচিরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানববিদ্বেষী দার্শনিকপ্রবরের, ও lotus-eater বা দিবাস্বপ্নবিলাসী অলস, অকর্মণ্য জড়মানুষের। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এরূপ অবাস্তব সাহিত্য "সাহিত্য" নাম-ধারী হলেও সাহিত্য নয়। এরূপে একটি গণিতের জটিল তথ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক অথবা একটি ন্যায়দর্শনের পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ অন্যান্য দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান হলেও "সাহিত্য" সংজ্ঞালাভের উপযুক্ত নয় নিশ্চয়ই।

অপরপক্ষে সেই ভাবেই কেবলমাত্র অতি-বাস্তব রচনাও "সাহিত্য"-পদবাচ্য হতে পারে না। কেবল পার্থিবত্বের, কেবল বস্তুত্বের, কেবল জৈবভাবের অপরিসর গণ্ডিতেই কেবল যে মন বিচরণ করে ও আবদ্ধ হয়ে থাকে, সে মন ত জড়েরই তুল্য, সৃজনী শক্তি তার কই? সে মন কেবল লেখক, লিপিকর বা গ্রন্থকারই মাত্র—রচয়িতা, স্রষ্টা বা দ্রষ্টা নয়। কেবলই বাস্তব জিনিষের যথাযথ বিবরণ, কেবলই ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা, কেবলই সংসারের ক্লেশ-ক্লেদ-মলিনতার বীভৎস, নগ্ন চিত্রণ, কেবলই মানুষের জৈবিক বাসনা-কামনার নগ্ন প্রকটন—আর যাই হোক, "সাহিত্য" নয়। সেজন্ত সাধারণ পাঠ্য পুস্তক, ভূগোল, ইতিহাস, রোগমৃত্যু বিবরণী সম্বলিত চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতির বাৎসরিক অধিবেশন গ্রন্থ, কামবিজ্ঞান বা 'বটতলার' উপন্যাসাদি কখনই "সাহিত্য" মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। তথাকথিত "প্রগতিশীল", অত্যাধুনিক, "বাস্তববাদী" কবিদের রচনাও সাহিত্যের ভয়াবহ প্রেতাত্মাই মাত্র, "সাহিত্য" নয়। যথা, "ডাষ্ট-বিনে"র উদগ্র গন্ধে আকৃষ্ট, গলিত স্ফোটকাকীর্ণ, শীর্ণ পথের কুকুরের দুর্গন্ধময় মূষিক ভক্ষণ বা প্রায়নগ্ন, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ভিখারিণীদ্বয়ের উৎকুন ধ্বংসের বা গাত্রকণ্ডুয়নের বীভৎস চিত্র" আজ সাহিত্যের নামে সরস্বতীর পূত মন্দির-অলিন্দে প্রবেশের অনুমতিলাভ করেছে—সেটাই বিস্ময় ও দুঃখের কারণ। সাহিত্যে 'বীভৎস' ও 'ভয়ানক' রসের স্থান আছে, নিশ্চয়ই। কিন্তু তা "রসে" উন্নীত হয় তখনই যখন কেবল অবিমিশ্র, অত্যুগ্র বাস্তবতার শুষ্ক, কঠিন কঙ্করময় ধূলিকণায় লাগে কবিচিত্তের শীতল সঞ্জীবক বারি-ধারার অমৃতময় প্রলেপ। ধরণীর ধূলিপুঞ্জ আকাশের আশী-র্ধারায় স্নাত হয়ে সরস হলে তবেই হতে পারে কঠিন ভূমণ্ডলের বুক চিরে নবাঙ্কুরের শুভ বিকাশ। একই ভাবে এই মাটির পৃথিবীর ক্লেদ-কাঠিন্যের উপর কবি-মানসের সেই অলৌকিক নির্ঝরধারা-সম্পাতেই জাগ্রত হয়ে ওঠে সাহিত্য-কিশলয়ের প্রথম প্রাণের স্পন্দন।

সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র প্রক্রিয়া হ'ল এই—বাস্তব ও কল্পনার, বর্ত্তমান ও আদর্শের, জীবত্ব ও মনুষ্যত্বের এক অপূর্ব সংযোগ, সমন্বয় ও সম্পূর্তি। পঙ্ক থেকে পঙ্কজের, ধূলিকণা থেকে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তির মতই বিস্ময়কর এই পার্থিব বস্তু ও ভাব থেকে অপার্থিব আনন্দ-রসময় সাহিত্য সৃষ্টি। পঙ্কের শত গ্লানি ধন্য করে কোন্ মায়াবীর মায়া-স্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে সহস্র-দল-বিস্তারী সহস্রদল তার অপরূপ সৌন্দর্যে, সৌরভে, শুভ্রতায়। ধূলির শত মলিনতা সার্থক করে, কোন্ চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র কনকায়মান রূপ-মধুরিমা। একই ভাবে সাধারণ জগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক হাসি-কান্নার, মানব-মনের দৈনন্দিন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা, ঘাত-প্রতিঘাতের অতি তুচ্ছ, অবজ্ঞেয় চিত্রটিও যখন কবির প্রাণের রসে সিঞ্চিত হয়ে সহস্রদলের মতই বিকশিত হয়ে উঠে; দ্রষ্টার মরমী দৃষ্টির অরুণালোকসম্পাতে ইন্দ্রধনুর মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, তখনই হয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রকৃত সৃষ্টি। "সকল কাঁটা ধন্য করে" ফুল ফোটবার,—সকল ব্যথা রঙীন হয়ে" গোলাপ হয়ে উঠবার, সকল কুশ্রীতা, মলিনতা, প্রাত্যহি-

কতা ও সাধারণতার সাহিত্য-গৌরবে গরীয়ান্ হয়ে উঠবার এই ত অপূর্ব ইতিহাস।

এরূপে অসাধারণের অসাধারণত্বে নয়, সাধারণেরই অসাধারণত্বে সাহিত্য চির-গরীয়ান্। এই অসাধারণত্ব সম্পাদনের মন্ত্র-শক্তিতেই সাহিত্যিকের লেখন উন্নীত হয়, "রচনা" বা "সাহিত্যে" আমাদের লেখন পর্যবসিত হয় "বিবরণী" বা "কাহিনী"তেই মাত্র। বুদ্ধি-সর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট বস্তু-নিরপেক্ষ, শূন্যগর্ভ মনের আলোকই যথাসর্বস্ব; সাধারণ মানুষের নিকট মন-নিরপেক্ষ, আধার-বিহীন বস্তু-জাতের কঠোর উপস্থিতিই যথাসর্বস্ব। প্রথমটি 'Form without matter'; দ্বিতীয়টি 'Matter without form'। কিন্তু সাহিত্যিকের মনোহর্ম্যে হয়েছে 'Form" ও "Matter"-এর পরিপূর্ণ সঙ্গতি। বাহিরের বস্তুকে তিনি অন্তরের, অপূর্ব রূপান্তরীকরণ শক্তিতে নিজস্ব করে নিতে পারেন। এরূপে সমগ্র বিশ্বজগৎই সাহিত্যিকের মনোজগতে নবরূপে বিম্বিত হয়ে পুনরায় নবরূপে প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের স্বর্ণ-মুকুরে। সেজন্য প্রকৃত স্রষ্টৃরূপে সাহিত্যিক সত্যই বিশ্ব-প্রকৃতিকে বলতে পারেন:

"আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি, মম অসীম
গগনবিহারী।"

বস্তুতঃ সাহিত্যিকই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সর্বাপেক্ষা ধনী— সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই তাঁর একান্তই নিজস্ব ধন, মনের আগুনে রাঙা।

এরূপে নিপুণ শিল্পীর সামান্য কয়েকটি রেখায় যেমন সাধারণ বস্তুও হয়ে ওঠে এক অপূর্ব চিত্র, তেমনি প্রকৃত সাহিত্যিকের হাতে সাধারণ গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চিঠি-পত্র প্রভৃতি সবই হয়ে ওঠে এক অপরূপ সুন্দর "সাহিত্য"। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতএব সাহিত্য ও জীবন বা সাহিত্য ও সমাজ— অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত হয়েও অভিন্ন নয়।*

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের (পাটনা) মহিলা-শাখার সভা-নেত্রীর অভিভাষণের একাংশ।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৫

আমার একজন পাঠক-বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "বাঙালী" বলিতে তিনি কি বুঝিবেন? উত্তর দিয়াছিলাম যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যাহারা এই প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী আমি তাহাদেরই "বাঙালী" বলিয়া মনে করি। আর একজন পাঠক-বন্ধুর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা বণ্টনের বিষয়ে প্রদেশের প্রতিবর্গ মাইলের বসতির হার ও মোট জনসংখ্যা লইয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল। আমি প্রতি বর্গমাইলে বসতি-হারের উপর (মোট জনসংখ্যার উপর নহে) ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থবণ্টনের প্রস্তাব করিয়াছি। অন্যান্য পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা ও সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই লিখিলাম।

বিদেশী ও অপর প্রদেশবাসী ব্যবসায়ীদের সমকক্ষ হইতে হইলে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিজেদের যে সমস্ত দোষ ও ত্রুটি আছে তাহা সর্ব্বাগ্রে সংশোধন করিতে হইবে। অপর প্রদেশবাসীরা এখান হইতে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছেন এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া অন্যায়। ইহা উটপাখীর মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র মূলধন ও উচ্চশিক্ষা থাকিলেই যে শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা সম্ভব ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইহার জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম, চরিত্র ও সততা। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীর এই বিষয়ে দুর্ব্বলতা কতটুকু ও কোথায় তাহা পরে আলোচনা করিব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীর-শিল্প প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয় লিখিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কুটীর-শিল্প প্রসারের ব্যবস্থার জন্য একটি নূতন সংসদ গঠন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছুদিন পূর্ব্বে ঐরূপ একটি সংসদ গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ এই সংসদ কতদূর কি করিয়াছেন তাহার কোন বিশদ বিবরণ জানা নাই। দেশের বেকার-সমস্যা সমাধানে

করিবার পক্ষে কুটীর-শিল্প প্রসারণই অন্যতম উপায়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান যুক্তরাজ্য যুদ্ধের পর যখন বেকার-সমস্যা লইয়া বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া সেখানে বেকারের সংখ্যা অনেকটা কমাইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রমিক সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত *Labour Gazette* হইতে জানা যায় যে, তিনি বৃহত্তর শিল্পগুলির উৎপাদন নানা প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যতটা সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে কুটীরশিল্পের দ্বারা করিয়াছিলেন। ঐসব কুটীরশিল্পের দ্বারা বৃহত্তর কলকারখানার আবশ্যক বহুরকমের ছোট ছোট অংশ (Parts) ও সরঞ্জাম (Accessories), এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যন্তও ঐ ভাবে উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে।

কুটীরশিল্পের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। ইহার জন্য একসঙ্গে বেশী মূলধন লাগে না এবং বৃহত্তর শিল্পের ন্যায় শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও কম। তাহা ছাড়া এই শিল্প পরিচালনার জন্য উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিশেষ আবশ্যক হয় না। আর একটা সুবিধা এই যে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী বাজারে থাকে।

এই শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে:—(১) শিল্পগুলি প্রদেশবাসীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার অনুকূল হওয়া দরকার। (২) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি যতদূর সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং চারুকলা সম্পন্ন দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। (৩) যাহাতে মহাজনদের নিকট বেশী হারে টাকা ধার করিতে না হয় সেজন্য মূলধন সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার একটি সুচিন্তিত সরকারী পরিকল্পনার প্রয়োজন। নিউ-জিল্যাণ্ডের 'Poor Bank'-এর অনুকরণে প্রত্যেক মহকুমায় প্রদেশ-সরকারের তত্ত্বাবধানে লগ্নি প্রতিষ্ঠান (Credit Bank) স্থাপন করিতে হইবে। উপস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা চলিবে না। (৪) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সম্ভবপর সমমানের (standardised goods) হওয়া একান্ত আবশ্যক। (৫) গ্রামে ও পল্লীতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রসারণের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকারকে করিতে হইবে। (৬) বিভিন্ন কুটীরশিল্পের উপযোগী আধুনিক ছোট ছোট বৈদ্যুতিক ও হস্ত-পরিচালিত যন্ত্রপাতি প্রদেশ-সরকারকে বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া শিল্পগুলির মধ্যে বণ্টনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৭) লভ্যাংশের বেশীর ভাগ যাহাতে উৎপাদনকারীরা পায় তজ্জন্য প্রদেশ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ঐ সমস্ত শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির বিদেশে রপ্তানী করিয়া সরকার কর্তৃক উচিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা। (৮) আবশ্যক কাঁচামাল যাহাতে নিয়মিত ভাবে ও উচিত-মূল্যে শিল্পগুলি পায় এবং উহা কালোবাজারে কিনিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা; (৯) বিদেশ হইতে প্রদেশের উপযোগী নানা প্রকার কুটীরশিল্পে সুদক্ষ শিল্পীদের আনাইয়া একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি মহকুমায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের নানা রকমে কুটীর-শিল্পের শিক্ষা দিতে হইবে। স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু ও কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ মহাকুমায় কোন্ কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই স্থির করা আবশ্যক।

সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের দ্বারা ছোট ছোট শিল্প পরিচালনার জন্য একটি সরকারী শিল্পসাহায্য তহবিল স্থাপন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা যে একান্ত আবশ্যক ও খুবই সমীচীন তাহা লেখাই বাহুল্য; কিন্তু ঐ তহবিলের টাকা কাহারা বণ্টন করিবেন ও কাহাদের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহার উপরই ইহার উপ-কারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আশা করি, "ছ"-মার্কা সভ্যদের দ্বারা ঐ টাকা বণ্টনের ব্যবস্থা না হয় এবং আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে উহা বণ্টিত না হয় সেদিকে ডাঃ রায় নিশ্চয়ই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নচেৎ উপকারের অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘড়ি তৈরি শিল্পটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইটালিতে আমি দেখিয়াছি যে, নানা প্রকার লেস্ (Lace) তৈরি সেখানকার একটি প্রধান কুটীরশিল্প। আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে এই শিল্পটি অনায়াসে গড়িয়া উঠিলে বহু গৃহস্থের আয় যথেষ্ট বাড়িতে পারে। অবসর সময়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে ঐরূপ লেস তৈরি করিতে পারে। তবে ইচ্ছামত নমুনা অনুসারে উহা তৈরি করিলে চলিবে না। যদি সমবায় পদ্ধতিতে সুতা সরবরাহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মজুরীর হারে, বিদেশে ও প্রদেশে চাহিদা আছে এইরূপ নমুনামত লেস্ তৈরি করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বহু লক্ষ টাকার লেস, ফিতা ও ঐরূপ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রদেশবাসীরা লাভবান হইতে পারেন। ইহা ছাড়া চুরুট ও নানা প্রকার বোতাম তৈয়ারী, চীন ও জাপানের মত

চিত্রিত চীনামাটির বাসন ও চারুকলা, চীনামাটির পুতুল, রুমাল, নানারূপ সিল্কের বস্ত্র, মোজা, গেঞ্জি, জুতার ফিতা, লিখিবার নিব, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি বহুপ্রকারের কুটীরশিল্প বাংলা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। একথা লেখাই বাহুল্য যে, এই প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বেকার-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে, প্রদেশ-সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন প্রদেশকে বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অর্থ কমিশনের নিকট বাংলার বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীরশিল্প প্রসারণের বিশেষ দায়িত্বের বিষয় প্রদেশ-সরকারের জানান উচিত।

পাটকল, সুতাকল, কয়লার খনি ও চা-বাগান পশ্চিমবঙ্গের চারিটি বৃহত্তর উৎপাদন-শিল্প। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালীর স্থান কোথায় ও উহাদের সরকারী প্রকাশিত সংখ্যা কত তাহা নিম্নে দিতেছি :

শিল্পের নাম	মোট সংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
পাটকল	৮০	৪
সুতাকল	৪৪	৩০
কয়লার খনি	২৫৮	১০৫
চা-বাগান	৩৭৯ (অবিভক্ত বাংলা)	৩০৪

চা-বাগানের সংখ্যাগুলি অবিভক্ত বাংলার। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগানের সংখ্যা কত তাহা জানা নাই। যদিও উল্লিখিত ৩৭৯টি চা-বাগানের মধ্যে ৩০৪টি চা-বাগান বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত তথাপি এই ৩০৪টি বাঙালী পরিচালিত চা-বাগানের জমির পরিমাণ মোট চা-বাগানের জমির পরিমাণের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বাগানই ছোট ছোট। বাঙালীর পরিচালিত কয়লার খনি ও পাটকলের বাৎসরিক উৎপাদন যদি ধরা যায় তাহা হইলে ইহাদের সংখ্যার অনুপাতের হার বেশী হইলেও উৎপাদনের হার ঐ প্রকারই কম হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, বাঙালী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত (Public & Private Ltd. Co.s) তাহার অংশীদারদের মধ্যে কতগুলি বিদেশী ও কতগুলি অপর প্রদেশবাসী আছেন তাহার সংখ্যা ও তাহাদের দেয় শেয়ারের টাকার পরিমাণ জানা নাই। তবে অনুমান হয় ইহাও খুব কম হইবে না। এ কথা আরও বলা আবশ্যক যে, কয়লার খনিগুলিতেও বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম।

বহির্বাণিজ্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করে। কিছুদিন পূর্ব্বে রপ্তানী-বাণিজ্যে বাঙালীর অংশ কতটুকু তাহার মোটামুটি অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, রপ্তানী-বাণিজ্যে গত ১৯৪৯ সনে মোট ২৫১·৭৩ কোটি টাকার মধ্যে বাঙালীর অংশ ২·৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ১·১৪ মাত্র। ইদানীং ইহার পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়িতে পারে। কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে ইদানীং কয়েকটি বিশেষ দ্রব্য যাহা রপ্তানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে দিলাম :

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ১৩৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ১০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রপ্তানী করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে ৫৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ৬২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ৬৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার চা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু এই টাকার মধ্যে পাট উৎপাদনকারীদের অংশ যে খুবই কম তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ ইহার বেশীর ভাগ অংশ রপ্তানীকারী, পাটকলের অংশীদার ও অপর প্রদেশবাসী পাটের মহাজন ও শ্রমিকদের হাতে চলিয়া যায়। চা শিল্পক্ষেত্রের বেলায় পাটকলের ন্যায় না হইলেও ঐরূপ কতকটা বলা যাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার ভিন্ন অপর কেহ বিদেশে কোনরূপ কয়লা রপ্তানী করিতে পারেন না। কলিকাতা বন্দর হইতে গত ১৯৫১ সালে জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ৭,১৩,৮২১ টন কয়লা বিদেশে (পাকিস্থান ছাড়া) রপ্তানী করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে ইহার মূল্য ২,১৩,২৪,৪২২৲ টাকা হয়। ঐ কয় মাসে ২,১৫,৭৭০৲ টাকা মূল্যের ২,৪৬৫ টন হার্ড কোকও বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সমুদ্রপথে, রেল ও নদীপথে পাকিস্থানে মোটামুটি প্রতি মাসে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টন নানা রকমের কয়লা ভারত-সরকার চালান দেন। এই চালানী কয়লার উপর ভারত-সরকার কণ্ট্রোল দর অপেক্ষা ১১৲ টাকা টন প্রতি বেশী পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে আদায় করেন। এই সমস্ত রপ্তানী কয়লার মধ্যে কত টন পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে উহা মোট রপ্তানীর এক-তৃতীয়াংশ অনুমান করা যাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার পাট-শুল্কের ন্যায় বিদেশে রপ্তানী কয়লার উপর প্রতি টনে নিম্নলিখিত হারে

'সারচার্জ্জ' আদায় করিতেছেন। ইহার পরিমাণ বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা হইবে।

রপ্তানী কয়লার উপর 'সারচার্জ্জ'-এর হার প্রতি টনে :

অষ্ট্রেলিয়া	১৲
ব্রহ্মদেশ	৫৲
সিংহল	...
নিউজিল্যাণ্ড	২।৹
জাপান	২৲
মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ-পূর্ব্ব বন্দরসমূহ (ব্যাঙ্কক, সাইগণ প্রভৃতি), এডেন, পোর্ট সুদান, পূর্ব্ব-আফ্রিকার বন্দরসমূহ, ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্লণ্ড...	৩৲
উত্তর-ইউরোপীয় ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বন্দরসমূহ ...	৫৲

একথা সকলেই জানেন যে, কয়লা প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, কারণ কয়লা কাটিয়া লইলে আর পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সংকার যদি রপ্তানী কয়লার আদায়ী 'সারচার্জ্জ' এবং পাকিস্থানে চালানী কয়লার উপর লভ্যের অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি করেন তাহা হইলে উহা খুবই ন্যায়সঙ্গত হইবে। আমি যতদূর জানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট ঐরূপ কোন দাবি আজ পর্য্যন্ত পেশ করেন নাই। ক্রমশ

নিষ্কৃতি

সমারসেট্ মম্

অনুবাদক—শ্রীসব্যসাচী রায়

আমার অনেক দিনকার বিশ্বাস যে, কোন ভদ্রমহিলা যখন কোন পুরুষকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন, তখন তিলার্দ্ধ সময় নষ্ট না করে পলায়ন করা ছাড়া পুরুষের রক্ষা পাবার উপায় নেই। কিন্তু না, এই পন্থাও সব সময়ে ফল দেয় না। আমার এক বন্ধুকে জানি যার যখন হুঁশ হয়েছিল যে বিবাহরূপ অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত, তখন শুধু একটি টুথব্রাশ মাত্র সঙ্গে নিয়ে সেই মুহূর্ত্তে সে নিকটতম বন্দর থেকে জাহাজের একটা টিকিট কেটে সরে পড়েছিল। তার পর বৎসরখানেক নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার পর সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করল ; কারণ সে ভেবেছিল স্ত্রীজাতির মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব আছে এবং এক বছরের মধ্যে ভদ্রমহিলাটি নিশ্চয়ই তাকে একেবারে ভুলে যাবেন। কিন্তু জাহাজ থেকে সেই পুরাতন বন্দরে নামতেই যিনি সর্ব্বপ্রথম সোৎসাহে রুমাল নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি সেই ক্ষুদ্রদেহা মহিলাটি ছাড়া আর কেউ নন্, যাঁর কাছ থেকেই আমার বন্ধুটি পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি শুধু এক জনের কথাই জানি যে এরকম অবস্থায় পড়েও শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। তার নাম রজার চেয়ারিং। রুথ বারলোর সঙ্গে যখন সে প্রেমে পড়েছিল, তখন তার যৌবন অনেক দিন হ'ল অতিক্রান্ত হয়েছে, তা ছাড়া তার আগে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল, যাতে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রুথ বারলোর এমন একটি অস্ত্র ছিল (অথবা এটিকে অস্ত্র আখ্যা না দিয়ে ক্ষমতা বলব কি ?) যার জন্ত যাবতীয় পুরুষ মানুষই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে পড়তেন। এইজন্তই রজারও তার বিচারবুদ্ধি, সাবধানতা এবং জাগতিক অভিজ্ঞতা সব বিস্মৃত হয়েছিল।

রুথ বারলোর এই অস্ত্রটি ছিল অপরের মনে করুণা উদ্রেকের ক্ষমতা। শ্রীমতী বারলো দু'বার বিবাহ করেছিলেন এবং দু'বারই বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল গভীর, ভাসাভাসা এবং করুণ—যেন এই মুহূর্ত্তেই তার থেকে জল উপচে পড়বে। তাঁর চোখ দেখে মনে হ'ত যেন সংসার তাঁর পক্ষে একান্ত দুর্ব্বিষহ। তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে আপনার মনে স্বতঃই এই ভাবের উদয় হ'ত—আহা, বেচারীর দুঃখকষ্ট ওর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে! আপনি যদি রজার চেয়ারিং-এর মত শক্তসমর্থ, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ও তাঁর মত প্রচুর বিত্তবান হতেন, তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আপনার মনে এই ইচ্ছা হ'ত—জগতের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে ঐ অসহায়াকে আপনি আড়াল করে রাখেন। ঐ বড় বড় করুণ চোখ দুটি থেকে দুঃখের সমস্ত কালিমা মুছে ফেলতে পারলে, আঃ, কি মহৎ কাজই না করা হয়! রজারের কথাবার্ত্তা থেকে যা বুঝতাম, তাতে মনে হ'ত শ্রীমতী বারলোর সঙ্গে পৃথিবীর কেউই ভাল ব্যবহার করে নি। তিনি নাকি সেই রকম হতভাগিনীদের অন্যতমা যারা যখনই যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। বিবাহের পর তাঁর স্বামী তাঁকে মারধোর করত ; শেয়ার-বাজারে যে দালালকে দিয়ে তিনি কাজকারবার করতেন, সে নির্ঘাত তাঁকে ঠকাত। ঠাকুর চাকর যাদেরই তিনি রাখতেন, টের পাওয়া যেত যে, তারা পাঁড় মাতাল। যে কুকুরছানাকেই তিনি পুষতেন সেটি দু'দিন বাদেই মারা যেত।

রজার যেদিন আমাকে জানাল যে, অবশেষে সে শ্রীমতী বারলোকে বিবাহপ্রস্তাবে রাজী করাতে পেরেছে সেদিন আমি তাকে অভিনন্দন জানালাম—"আশা করি তোমাদের মধ্যে বেশ ভাবসাব হবে।"

সে বললে,"আন তো ও তোমাকে খানিকটা ভয় করে, ও মনে করে তোমার মধ্যে দয়ামায়া বিশেষ নেই।"

"আমার সম্পর্কে তাঁর এরকম ধারণা হবার হেতু?"

"তুমি ওকে পছন্দ কর তো?"

"নিশ্চয়ই, খুব পছন্দ করি।"

"আহা, বেচারীর জীবন বড়ই দুঃখে কেটেছে। আমার এত মায়া হয়, ওর জন্য।"

"তা ত বটেই।" আমি বললাম।—এ ছাড়া আর কি বলব? আমি জানতাম যে শ্রীমতী বারলো একটি বুদ্ধিহীনা অথচ কল্পীবাজ স্ত্রীলোক। আমার আরও ধারণা হয়েছিল যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি সর্ব্বদা চুড়সন্দ।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের কথা মনে আছে।

আমরা সবাই ব্রিজ খেলছিলাম। তিনি আমার 'পার্টনার' হয়েছিলেন। আমার সমস্ত ভাল ভাল হাতগুলি তিনি আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে বার বার মাটি করেছিলেন। আমি অবশ্য সাক্ষাৎ দেবদূতের মত ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু কারুর চোখে যদি জল ভরে উঠবার কারণ হয়ে থাকে তো সে আমারই, রুথ বারলোর নয়। তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার কাছে অনেকগুলি টাকা হেরে পরে একটি চেক পাঠিয়ে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনদিনই আর তা পাঠালেন না। অথচ পরে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই কেন যে তাঁর চোখে ওরকম আহত অভিমানের ভাব উথলে উঠেছে—যেন আমিই তাঁর প্রতি নিদারুণ দুর্ব্যবহার করেছি—তা আমার মাথায় কোনদিনই ঢোকে নি।

রজার শ্রীমতীর সঙ্গে নিজের বন্ধুবান্ধবের পরিচয় করিয়ে দিলে। তাঁকে অলঙ্কারাদি উপহার দিতে লাগল। তাঁকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়ানোও সুরু করল। অদূর ভবিষ্যতেই তাদের বিবাহ হবে একথা বিজ্ঞাপিতও হয়ে গেল। রজার নিজেকে খুব সুখী বোধ করছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে একটা খুব ভাল কাজই করতে যাচ্ছে এবং সেটা সম্পূর্ণ নিজের তাগিদেই। এ রকম অবস্থায় সে যে খুশির আধিক্যে মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি করে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তার পর হঠাৎ এক দিন তার টনক নড়ল। জানি না কি করে এবং কেন। শ্রীমতী রুথের প্রেম-কূজন যে তার কাছে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল তা মনে হয় না। কারণ শ্রীমতী রুথ কোন দিনই বিশেষ কথাবার্ত্তা কইতেন না। হয় ত তাঁর চোখের করুণ চাউনি আর রজারের হৃদয়ে তেমন মোচড় দিতে পারছিল না। রজারের চোখ খুললো এবং তার স্বাভাবিক বিচক্ষণতা ও সাংসারিক বুদ্ধি আবার ফিরে এল। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, শ্রীমতী রুথই তাকে গেঁথে তোলবার মতলব করেছেন। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সেও প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক সে কিছুতেই এটা ঘটতে দেবে না।

কিন্তু কি করা যায়? ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। এখন সে সাদা চোখে ভাল করেই বুঝতে পারল কোন ধাতুতে গড়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে। যদি সে সোজাসুজি ছাড়ান পাবার প্রস্তাব করে তা হলে রুথ নিঃসন্দেহে, তাঁর হৃদয়স্পর্শী করুণ চাহনির দ্বারা বেশ মোটা টাকা তাঁর মনোবেদনার সান্ত্বনা হিসাবে আদায় করবেন। তা ছাড়া কোন ভদ্রমহিলাকে এভাবে পরিত্যাগ করা বড়ই অশোভন। সমাজে বদনাম হয়।

রজার নিজের মনের কথা মনেই চেপে রাখল। ভাবে কিংবা ভাষায় কোন রকমেই সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হতে দিল না যে, রুথ বারলোর প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে। রুথের মনোরঞ্জনের দিকে সে সমান মনোযোগী হয়ে রইল। তাকে নিয়ে সে আগের মতই খেলাধুলা, সিনেমায় যাওয়া, ডিনার খাওয়া ইত্যাদি করতে থাকল। নিয়মিত সে তাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে যায় এবং সর্ব্বদাই সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার করে। কথা ছিল যে, সুবিধামত একটা বাড়ী পেলেই তারা বিয়েটা সেরে ফেলবে। এখন তারা দু'জনে মিলে বাড়ী খুঁজতে লেগে গেল। বাড়ীর এজেন্টরা অনেক বাড়ীরই খবর দিলে এবং রজার রুথকে নিয়ে সেগুলি দেখে বেড়াতে লাগল। মনের মত একটা বাড়ী পাওয়া সত্যিই বড় মুশকিল। রজার আরও এজেন্টদের কাছে লিখল। বাড়ীর পর বাড়ী তারা দেখে যেতে লাগল। বেশ ভাল করেই তারা দেখল—কয়লা রাখার কুঠরি থেকে সুরু করে চিলেকোঠার ঘর পর্য্যন্ত তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ী দেখল। বাড়ীগুলি হয় বেশী বড়, নয় খুবই ছোট মনে হয়—ঠিক পছন্দমত আর পাওয়াই যায় না। কখনও বা বাজার-হাট অত্যন্ত দূরে পড়ে, কখনও বা একেবারে বাজারের প্রায় মধ্যেই বাড়ী পাওয়া যায়। দুটোর কোনটাই সুবিধের ঠেকে না। কখনও দেখা যায় ভাড়া বড় বেশী পড়ছে, কখনও বা ভাড়া সস্তা হলেও দেখা যায় বাড়ীটি বেজায় ভাঙা-চোরা। কোন বাড়ীটাকে বড় বেশী চাপা মনে হয়, কোনটাকে বা মনে হয় যেন তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটার বড় বেশী অন্ধকার, কোনটা বড় বেশী ঠাণ্ডা। প্রত্যেক বাড়ী থেকেই রজার কোন না কোন খুঁত বার করবেই। রজারকে খুশী করা ছিল শক্ত; অবশ্য তার কারণও ছিল। তার প্রাণের

রুথকে ত সে একটা যা-তা বাড়ীতে রাখতে পারে না। মনের মত ও সর্ব্বোত্তম বাড়ীটি তার চাই-ই। অথচ সে রকম বাড়ী খুঁজে পাওয়া সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বাড়ী খোঁজা একটি জান-হয়রানকারী কাজ এবং শেষ পর্য্যন্ত রুথ খিটখিটে হয়ে পড়লেন। রজার তাকে আর একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে অনুরোধ করল। ঠিক তাদের মনের মত, প্রয়োজনমত বাড়ীটি নিশ্চয়ই কোথাও আশেপাশেই লুকিয়ে আছে; আর একটু অধ্যবসায়, আর একটু অপেক্ষা, তা হলেই নিশ্চয় তারা সেটি খুঁজে পাবে। শত শত বাড়ী এই ভাবে তারা দেখে বেড়াল, হাজার হাজার সিঁড়ি তারা ভাঙল, অসংখ্য রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর তারা পর্য্যবেক্ষণ করল। ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে রুথ শেষকালে এক দিন রজারকে বললেন, "দেখ, তুমি যদি শিগগীর একটা বাড়ী না ঠিক কর, আমাকে সমস্ত অবস্থাটা তা হলে আর একবার ভেবে দেখতে হবে। এ কি, এ রকম ভাবে চললে ত আমাদের কোন দিন বিয়েই হবে না।"

"আহা, ও কথা বলো না," রজার উত্তর দিলে, "আর একটু ধৈর্য্য ধর, প্লীজ। দেখ না, এইমাত্র এজেন্টদের কাছ থেকে আর একটা ফিরিস্তি পেয়েছি—অন্ততঃ গোটাবাটেক বাড়ীর খবর আছে এতে। এর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই—"

আবার সুরু হ'ল খোঁজাখুঁজি। বাড়ীর পর বাড়ী, আবার বাড়ী। দু'বছর এইভাবে কাটল। রুথ নির্ব্বাক ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের সেই করুণ চাউনি গেল বদলে, সেখানে নিরুদ্ধ আক্রোশের ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। মানুষের সহ্যের সীমা আছে। শ্রীমতী বারলো অসীম ধৈর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল।

"রজার, স্পষ্ট করে বল ত আমাকে বিয়ে করবার তোমার সত্যি কোন মতলব আছে কিনা?"—ওরকম শাণিত কণ্ঠস্বর বারলোর গলা দিয়ে এর আগে কখনও বেরোয় নি। রজারের মধুর, শান্ত, উত্তাপহীন স্বরের কিন্তু লেশমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না, বললে—"নিশ্চয়ই আছে, কি বলছ তুমি! যে মুহূর্ত্তে একটা মনের মত বাড়ী পাব সেই মুহূর্ত্তেই আমরা বিয়ে করব! ভাল কথা, এইমাত্র আর একটা বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি, মনে হচ্ছে এটা বোধ হয় যেমনটি চাই তেমনটি হবে।"

"আমার শরীর ভাল নেই। এইমাত্র আবার একটা বাড়ী দেখতে ছোটবার আমার আর ক্ষমতা নেই।"

"আহা, সত্যি তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তোমার উপর দিয়ে কি কম গেছে!"

রুথ বারলো শয্যা গ্রহণ করলেন। রজারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। রজারকে প্রত্যহ বাইরে থেকেই তত্ত্বাবধান করে ও ফুল পাঠিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। অবশ্য তাতে সে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করল না। রোজ রুথকে চিঠি লিখে জানাতে লাগল কখন, কোথায়, কি রকম বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তাহখানেক পরে সে এই চিঠিটি পেল:

রজার,

আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে সত্যি সত্যি মোটেই ভালবাস না। আমি একজনকে পেয়েছি যিনি আমার সমস্ত ভার নেবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। তাঁকেই আজ আমি বিয়ে করছি।

রুথ

বিশেষ লোক মারফত রজার অবিলম্বে জবাব পাঠাল:

রুথ,

তোমার চিঠি আমাকে চুরমার করে দিয়েছে। এ আঘাত আমি কোন দিনই কাটিয়ে উঠতে পারব না, কিন্তু তোমার সুখই আমার প্রথম ও প্রধান চিন্তা। এই সঙ্গে সাতখানি বাড়ীর ঠিকানা পাঠাচ্ছি। আজকের সকালের ডাকেই এগুলি এসেছে। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটিকে অন্ততঃ তোমার পছন্দ হবেই। ইতি

হতভাগ্য
রজার

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচারী বাসকালে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মাতা মৃণালিনী সম্বন্ধে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। মাতা মৃণালিনী সম্বন্ধে আমি সকল তথ্য অবগত হই বর্দ্ধমানের সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত থাকার সময়ে। বাঘা যতীনের মুখেই শুনি মাতা মৃণালিনীর কথা। ভূপালবাবু তখন তাঁহাকে স্বীয় গুরু মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্তানন্দ স্বামীর নিকট মাতা মৃণালিনী এই সময় যোগশিক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ডিব্রুগড়ে থাকিতেন। ১৯০৭ সনে শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি "পাগলামি"র কথা মাতা মৃণালিনীকে জানাইয়াছিলেন, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তিনি ডিব্রুগড়ে যোগশিক্ষায় নিরতা হইয়াছিলেন। পরে তিনি বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতা মৃণালিনীকে তাঁহার পাগলামির কথা শুনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ হইতে হয় বলিয়া পত্নীকে তদনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আমিই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মাতা মৃণালিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইতে বলি। শ্রীঅরবিন্দ তদুত্তরে বলেন, যদি তাঁহার পত্নী তাঁহার লিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ পাগলামির লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন, তবে পণ্ডিচারীতে আসিয়া মৃণালিনী দেবীর পক্ষে বাস করা দুঃসাধ্য হইবে না। আমি শ্রীঅরবিন্দের শ্রীমুখাৎ এই কথা পণ্ডিচারী হইতে শুনিয়া আসিয়া মাতা মৃণালিনীর ভ্রাতা শ্রীশিশিরকুমার বসুর সহিত সাক্ষাৎ করি। শিশিরবাবুর মুখে মাতা মৃণালিনী সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিচারী যাইতে সম্মত হন। কিন্তু ভবিতব্য তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তাঁহাকে পণ্ডিচারী প্রেরণ করার সকল আয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের কথা শ্রবণ করি। এই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দের নিকট পৌঁছিলে, তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসে অন্তরের বেদনাই নিঃসারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দেবী মৃণালিনীকে ধর্ম্ম-সঙ্গিনীরূপে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। মাতা মৃণালিনীরও শূন্য হৃদয় ভরিয়া দিবার অপেক্ষা সহিল না, অকালেই তিনি চির-প্রস্থান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অপাথিব-যোগশক্তিবলে সারা বিশ্বের মানব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙালী জাতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার স্বপ্নভূমির কেন্দ্র। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে বিশ্ববাসীকে অসাধারণ চরিত্রে উন্নীত করিয়া জগতে এক দিব্যজাতি-গঠনের ইচ্ছা (Will) করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমায় লিখিলেন—

"The attempt to apply knowledge and power to the events and happenings of the world without the necessary instrumentality of physical action. What I am attempting is to establish the normal working of the *shiddhis* in life."

অর্থাৎ, জ্ঞান এবং শক্তি জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনায় প্রয়োগ করিয়া, প্রয়োজনীয় দৈহিক সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীতে কার্য্য করিবার প্রয়াসই আমি করিতেছি। যৌগিক সিদ্ধিগুলিকে জীবনে সহজভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতেই আমি উদ্যত।

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য আরও লিখিলেন—

". . . that is, the perception of thoughts, feelings and happenings of other beings and in other places throughout the world without any use of information by speech or any other data."

অর্থাৎ, বাক্যে অথবা বাহিরের অন্য কোন প্রকার তথ্যের উপর ভিত্তি না করিয়া সারা বিশ্বের অপর সকল মানুষের এবং স্থানের চিন্তা, সংবেগ ও ঘটনার অনুভূতি লাভ।

দ্বিতীয়তঃ—

"The communication of the ideas and feelings . . . To others (individuals, groups, nations) by mere Transmission of will power."

অর্থাৎ, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই অপরের নিকট (ব্যষ্টি, সমষ্টি, অথবা জাতির) ভাব ও অনুভূতি জ্ঞাপন।

তৃতীয়তঃ—

"The silent compulsion on them to act according to these communicated ideas and feelings."

অর্থাৎ, অতঃপর এই সমস্ত সঞ্চারিত ভাব ও অনুভূতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্য নীরবতার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করা।

চতুর্থতঃ—

". . . the determination of events, actions and

results of actions throughout the world by pure silent will power."

অর্থাৎ, এমন কি তিনি চাহেন জগতের সকল ঘটনা, সকল কর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মফলও নিছক নীরব ইচ্ছা বা যোগশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

তিনি এই সকল কথা ধারাবাহিকভাবে আমায় লিখিতেন। ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্য্যায়ের কর্ম্মগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে গুছাইয়া লইতে না পারিলেও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র চতুর্থ পর্য্যায়ের বিষয়টি সংসিদ্ধ করিতে তিনি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা জানাইয়া লিখিলেন, যখন পূর্ণ সাফল্য আসিবে, আমি মনে করিব—

"I have got rid of the past *karman* in myself and others."

—আমি নিজেও যেমন প্রাক্তন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, তেমনি অপরকেও মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছি।

তিনি কোন দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে অনুভব করিলাম। তিনি অতঃপর যোগশক্তি প্রয়োগেই বিশ্বের যাহা সৎ, যাহা হিত, তাহাই সিদ্ধ করিবেন, বুঝিলাম। যৌগিক ক্রিয়াকর্ম্মের উপরও তাঁহার আস্থা কতখানি ছিল তাহাও তাঁহার পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিলেন—

"তুমি যে তান্ত্রিক সাধনা করিতেছ, তাহা দুঃসাহসিক কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমশঃ তোমার কর্ম্মে উন্নতি দেখিতেছি, তবুও সর্ব্বপ্রথমে মনে রাখিও প্রত্যেক কর্ম্মের সাধারণ লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি এবং ভুক্তি "which Tantrics in all ages have pursued" অর্থাৎ—ইহাই হইতেছে সাধকদের চিরন্তন রীতি। কিন্তু বিশেষ অবস্থা এবং কালের জন্য আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে। যে কর্ম্মের জন্য big Kriyas or numerous Kriyas are not always necessary—সর্ব্বদা বৃহৎ অথবা বহু ক্রিয়া এইজন্য প্রয়োজন হয় না। অতীতে যেরূপ নিখুঁত ভাবে কর্ম্মগুলিকে কার্য্যকরী করিয়াছ সেইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।

তোমার কর্ম্মসাফল্য নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর: Mantra & Tantra. Mantra the mental part, and Tantra the practical part. এই কর্ম্মের যে রাজসিক উত্তেজনা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে রাখিও, সর্ব্বদা Angarakshan is as important as Siddhis. দুঃখের বিষয় কলিযুগের তান্ত্রিকেরা সিদ্ধির মোহে অঙ্গরক্ষণ বিষয়ে অতিশয় উদাসীন। তাহারা সিদ্ধির দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়া Devils & Bhutas অর্থাৎ—ভূত ও প্রেতেরই শিকারে আসে। অঙ্গরক্ষণে প্রয়োজন, প্রথমতঃ, যথোপযুক্ত সিদ্ধ মন্ত্র এবং সিদ্ধ ক্রিয়ার সংযোগ। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বদা রাক্ষসদের কবলে না পড়িতে হয়, এইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা। আমি এই সকল কথা তোমাকে বলিতেছি এইজন্য যে, যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত না হও। মন্ত্র যতক্ষণ অন্তরের বস্তু না হয় ততক্ষণ কর্ম্মে বিরত হইয়া মৌন থাকাই ভাল। বেদ এবং তন্ত্র দুই স্বতন্ত্র বস্তু। বেদান্তের প্রচার এবং প্রসারতা তুমি নির্ব্বিবাদেই করিতে পার; কিন্তু তন্ত্র সম্বন্ধে সাধকের গোপনীয়তা প্রয়োজনীয়।"

তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা বৈপ্লবিক কর্ম্ম। বেদান্তের সাধনায় তিনি স্বয়ং যে স্থানে উঠিয়াছেন, আমাকেও সেই স্থানে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম আমার বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট গোপন রাখিয়া আমি তন্ত্রোক্ত কর্ম্মেই সহযাত্রীদের সহিত আগাইয়া চলিলাম। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিপ্লব-কর্ম্ম হইতে আমি যাহাতে নিরস্ত হই, সেই দিকেই আমায় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় মঁসিয়ে পল রিশার মাদাম রিশারের সহিত জাপান যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিলে "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আর্য্য পত্রিকার মধ্য দিয়াই বেদ উপনিষদের মূলতত্ত্ব ও ভারতের সাধন-বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধন কি ভাবে করিবেন, তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিলেন:

"In this review, my new theory of the Veda will appear, as also translation and explanation of the Upanisadas, a series of essays giving my system of Yoga, and a book of Vedantic philosophy (not Shankara's but Vedic Vedanta) giving the Upanisadic foundations of my theory of the ideal life towards which humanity must move."

অর্থাৎ, এই পত্রিকায় বেদ সম্বন্ধে আমার নূতন মত, উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, আমার পদ্ধতি অনুযায়ী যোগের ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিকতা প্রকাশ করিব। (শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ নহে), বৈদিক বেদান্তই এই কাগজে প্রচারিত হইবে। উপনিষদের ভিত্তিতে আমার এই আদর্শের পথেই মানবজাতি অবধারিত চলিবে। তিনি আরও বলিলেন—

"It will be the intellectual sides of my work for the world."

ইহাই জগতের জন্য আমার জ্ঞানমূলক কর্ম্মের দিক।

আর্য্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে আমায় লিখিলেন। আমি সাধ্যমত কিছু অর্থ তাঁহাকে

প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনই অর্থের দিক দেখিয়া চলিতেন। তাই আবার লিখিলেন—

"We shall have a sound financial foundation to start with."

পত্রিকাখানি তিনি ইংরেজী ভাষায় ১০০০ হাজার কপি এবং ফরাসী ভাষায় ৫০০ কপি প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার হিসাব মত বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে ফরাসী ও ইংরেজী সংস্করণ মিলিয়া অন্ততঃ ৪০০ কপি সংগ্রাহক যদি স্থির হয় তাহা হইলে ২৪০০৲ শত টাকায় কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। এই অবস্থায় আমি কত গ্রাহক করিতে পারি, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি দুই শত কপি আর্য্য বাংলাদেশে যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব, জানাইলাম। তদুত্তরে তিনি পুনরায় লিখিলেন—

"As to the review, I do not think we can dispense with the 200 subscribers whom you promise. The difficulty only is that, if there are political suspects amongst them, it will give the pilice a handle for connecting politics and the review and theirs frightening the public."

অর্থাৎ, তুমি পত্রিকার জন্য যে ২০০ জন গ্রাহক করিতে চাহিতেছ, তাহা আমি নাকচ করিতে চাহি না। মুশকিল এই যে, তাহাদের মধ্যে যদি সন্দেহভাজন রাজনৈতিক থাকে, তাহা হইলে পুলিস এই পত্রিকার সহিত রাজনীতিকে জড়াইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পত্রিকা সম্বন্ধে ভীতি-সঞ্চার করিবে।

"There should be no entanglement of this review in Indian politics or a false association created by the police, finding it in the house of some political suspects they search."

অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সহিত এই পত্রিকার কোন সংস্রব না থাকে, অথবা পুলিস এরূপ মিথ্যা সংস্রব সৃষ্টি না করে, ইহা বাঞ্ছনীয়। সন্দেহভাজন রাজনৈতিকদের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া এই পত্রিকা পাওয়া গেলে এইরূপ সংস্রব সৃষ্টি করা সম্ভব।

'আর্য্য' সম্বন্ধে আমায় এত সতর্ক করিতেন এইজন্য যে, আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যখন মিশিতাম, তখন তাঁহার কথাই প্রচার করিতাম। তৎকালে তাঁহার লিখিত, "Yoga and its objects" এবং 'যৌগিক সাধন' আদালতে বিপ্লবীদের বিচারকালে বহু সময় উপস্থিত করা হইত। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণের মন্ত্র এই যুগে আমি বিপ্লবীদের মধ্যেই প্রচার করিতাম। আমি যে ২০০ কপি আর্য্য প্রচারের ভার লইব বলিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি আরও লিখিলেন, "রাজনীতি এবং পত্রিকা একসঙ্গে থাকিলে জনসাধারণ ভয় পাইবে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আরও লিখিলেন, "তুমি যে গ্রাহক সংগ্রহ করিবে, তাহারা যেন mainly interested in Yoga—তাহারা যেন কেবলমাত্র যোগেরই অনুরাগী হয়। রাষ্ট্রচিন্তা তাহারা যেন পরিত্যাগ করে। তাহারা যেন পুলিসের ফাঁদে পা না দেয়।

God save us from all mysteries except those of Tantric Yoga.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঁসিয়ে পল রিশারের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লববাদীদের সঙ্গে একপ্রকার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি বিপ্লববাদ হইতে অপসৃত করিতে চাহিলেন। আমার প্রতি তাঁর এই অনুরাগের কারণ, সেই যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে লইয়া সাধনার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিয়াছি সেই স্মৃতি মুছিতে পারেন নাই বলিয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণের মানুষ বাছিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু সীমাহীন অনুরাগের বশেই তিনি আমাকে টানিয়া রাখিলেন। বিপ্লববাদ হইতে কেন তিনি আমায় সরিয়া আসিতে দাবি করেন, তাহা যুক্তি দ্বারাই তিনি প্রদর্শন করিলেন। এদিকে কিন্তু রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশ তলে তলে সেদিন বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় মুখরিত। এই অবস্থায় ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইলে যাঁহাদের শ্রীঅরবিন্দের নামে এই কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলিব, এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে সেদিন কি ভীষণ ভাবেই আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত। তিনি তাঁহার কর্ম্মপন্থাকে দুই ভাগে ছকিয়া লইয়াছেন। একটি আর্য্য পত্রিকার মধ্য দিয়া তাঁহার মিশন প্রচার; আর একটি তাঁর ভাষায়—

"The second part of my work is the practical, consisting in the practice of *yoga*, by an ever increasing number of young men all over Counry."

এইজন্য তিনি পুরাতন তন্ত্রের প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

"Do not let any add to it by associating Vedanta and Tantra together in an inexpressible fashion."

অর্থাৎ, বেদান্ত ও তন্ত্রকে যেন দুর্ব্বোধ্য ভাবে একত্র জড়াইয়া ফেলা না হয়। তিনি আরও বলিলেন, তান্ত্রিক কর্ম্মের ক্ষেত্র অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু বেদান্ত এমন

এক বস্তু, যাহার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত এবং সকল প্রকার মানুষই বহু ধারায় ইহা প্রকাশ করিতে পারিবে। স্মরণ রাখিও তন্ত্র বেদান্তের মত নহে। তন্ত্রের দ্বারা বস্তুতান্ত্রিক জয়লাভ হয়। যদিও বর্ত্তমানে ইহা ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে মানবজাতিই যোগলাভের সুযোগ পায়, তদনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে, তবুও আমার প্রশ্ন—এই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কি মনে কর আমাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? আমার মনে হয়, ইহা সম্ভব নহে। কারণ প্রথমতঃ, পুরাতন তন্ত্রবাদ বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ায় মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যসাধনে আর সহায় হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নূতন তন্ত্রবাদ গোড়ায় বিশুদ্ধ ভাবে আরম্ভ হইয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইলেও, পুরাতন অহঙ্কারের জের ইহার গতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর বৃহৎ কর্ম্মসিদ্ধির আশা একেবারেই ব্যাহত হইতেছে। অতএব আমাদের কার্য্য এখন এক নূতন পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পর্য্যায়ে আমাদের প্রয়োজন—অতঃপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া যাহাতে কর্ম্ম ভাগবত শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতায় হাতড়াইয়া না চলিয়া পূর্ণ চেতনার সহিত অগ্রসর হয়। অতঃপর কর্ম্ম হইবে ব্যর্থতা অথবা ভুলভ্রান্তিমুক্ত হইয়া নিছক ভাগবত প্রেরণারই প্রকাশ।

". . . with the full divine power working out its will conserved in its instrument."

কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সিদ্ধ হইবে? ইহার জন্য চাই ভারতবর্ষে অন্ততঃ এমন একজন মানুষ, যাঁহার ভিতর দিয়া ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। আমি দেখিতেছি আমার মধ্যেই এই শক্তি পূর্ণ সংবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে; অবশ্য এই গতির সংবেগ নির্ভর করিতেছে কতকটা আমার শরীর-মনের অশুদ্ধতা দূরীকরণের উপর এবং কতকটা আমার বন্ধুবর্গ ও উত্তর-সাধকদের দোষ-ত্রুটিগুলির বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উপর। আমাকে অধ্যাত্মভাবে এই সকলই বহন করিতে হইতেছে। ফলে আমার দ্রুত উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান পর্য্যায়ে সিদ্ধ হইবার জন্য অন্ততঃ কিছু সময় আমার প্রয়োজন। ইহা সিদ্ধ হইলে বাকীগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। অন্যথায় যে বীজ লইয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হইতেছি তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইবে, অথবা খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হইবে। এইজন্যই আমি যে তোমাকে বিপ্লবের কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি, তাহার প্রথম কারণ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে—

That is the first reason why I call you a *Halt*!

ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণবশতঃ আমি বিপ্লবের কর্ম্ম থামাইতে চাহিতেছি। তাহা হইতেছে—

"Others should receive the same power and light. In the measure that mine grows, theirs also will increase in power provided always they do not separate themselves from me by the *ahankar*."

অর্থাৎ, আমি চাহি আমার মতই শক্তি এবং আলো সকলে লাভ করুক। আমার মধ্যে শক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যদি তাহারা অহঙ্কারবশতঃ আমা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তদনুরূপ শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন শক্তিশালী সংহতি গড়িতে চাহিয়াছিলেন যে, সংহতি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন,

"The power that is developing, if it reaches consummation, will be able to accomplish its effects automatically by any method chosen."

অর্থাৎ, যে শক্তি আমি অর্জ্জন করিতেছি, যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে তাহা যে-কোন নির্দ্দিষ্ট পথেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কার্য্যক্ষম হইবে।

পূর্ব্বে যে বৈপ্লবিক কর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি শেষ হইয়াছে ধরিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নূতন করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য যন্ত্রের অন্বেষণে এই সময়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাকৃত শক্তির প্রবল বিরোধিতায় তিনি যে এই পরমাশক্তিকে আয়ত্ত করিবার পথে সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না, তাহা অতিশয় চিন্তার সহিত অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষভাবে আমাদের কর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলেন—

"It is specially in the field to which your *kriyas* have belonged and kindred fields that they are still too strong for me."

আমাদের কর্ম্ম তাঁহার নিকট অতিশয় বেদনাদায়ক বোধ হইল। তিনি চাহিয়াছিলেন সর্ব্বপ্রকার সংশয়মুক্ত হইয়া যাহাতে আমি দাঁড়াইতে পারি। তিনি মনে করিতেন, যে শক্তি তাঁহার মধ্যে অর্জ্জিত হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে প্রবুদ্ধ করিবে। এই শক্তি তিনি আমার মধ্যে ও আরও কয়েক জনের মধ্যে সঞ্চার করিয়া একটি শক্তিশালী

অধ্যাত্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবেন এবং এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কার্য্য করিবেন—তখনই কার্য্য দ্রুত ও সার্থক ভাবে সম্পন্ন হইবে,

"Then a rapid and successful *kriya* can be attempted."

কত ব্যথা ও দরদের সহিত তিনি বাঙালীকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার অর্জ্জিত যোগশক্তির সাহায্যে কর্ম্ম করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সেদিন সফল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেরণায় জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

লিভিংষ্টোন

শ্রীআদিনাথ সেন

প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক লোক স্কটলণ্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র গ্লাসগো শহর হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী ব্লাণ্টায়ার পল্লীতে ডেভিড লিভিংষ্টোনের জন্মস্থান দেখিতে গিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। লিভিংষ্টোন ছিলেন এক জন স্বার্থত্যাগী, জনকল্যাণকামী কর্ম্মঠ আদর্শ পুরুষ। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শুধু স্কটলণ্ড কেন যে-কোন দেশেই বিরল। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের স্মৃতিসমূহ স্মরণ করিয়া স্কটলণ্ডের অধিবাসীরা আজও অনুপ্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। যাঁহারা অনুসন্ধানী পর্য্যটক বা অগ্রগামী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি প্রসারের সহায়তা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

ব্রিটেনে বসবাস করা বহু আয়াসসাধ্য। জীবনযাপন সহজসাধ্য হইলে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টায় প্রেরণার অভাব হয়, যেমন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়া, লোকেদের অতিথি-সৎকারপরায়ণতা, সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়া থাকাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিলাতের অবস্থা অন্যরূপ হওয়ায় সেখানকার লোকদের কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী হইতে হইয়াছে। ব্রিটেনের প্রতিকূল অবস্থায় নিমিত্ত, অথবা বৈধ বা অবৈধভাবে নির্ব্বাসিত দেশত্যাগী অনেককে অষ্ট্রেলিয়ার অপরাধীনিবাস বা আমেরিকার 'পিউরিটান' উপনিবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় ব্রিটেনের অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

অবশ্য অনেকে ধর্ম্মপ্রচার ও সভ্যতা বিস্তারের অছুহাতে বিভিন্ন দেশে আধিপত্য-স্থাপন, বাণিজ্যবিস্তার ও পরোক্ষভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ স্বজাতির উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করা বা অন্য জাতির অনিষ্টসাধন বর্ত্তমানে বিশ্বের অশেষ অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের জাতির উন্নতির চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যদি অন্যের অপকার না হইয়া উপকার হয় তবেই তাহা শ্লাঘনীয়। এই নীতির অনুসরণ

লিভিংষ্টোন

করিয়াছিলেন বলিয়াই লিভিংষ্টোন সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র। অনবরত ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু ভগবানের উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া এই দেশপ্রেমিক অত্যাচারের প্রতিরোধে এবং নিরীহ নিষ্পেষিত মানবের কল্যাণচেষ্টায়, দুঃখ, কষ্ট, আপদ, বিপদ, ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। কালক্রমে ইঁহারা [illegible]

পশ্চিমের উচ্চভূমি হইতে সমতলে নামিয়া আসেন এবং ১৭৯১ সনে ব্লাণ্টায়ারে পৌছেন। লিভিংষ্টোনের মাতৃকুল

ব্লাণ্টায়ারে এই বাড়ীতে লিভিংষ্টোন জন্মগ্রহণ করেন

বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৮১৩ সনে লিভিংষ্টোনের জন্ম হয়। তাঁহার চরিত্রে মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক হইতে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ধর্ম্মভাব ইত্যাদির সমাবেশ হইয়াছিল। অল্পবয়সে দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে কারখানার কাজে ঢুকিতে হয়। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি পাঠে নিরত থাকিতেন।

বহু কষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লিভিংষ্টোন অসাহায্যে গ্লাসগোতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের কাজের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইল না। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচার-কার্য্যে যাইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মে। সৌভাগ্যক্রমে তথাকার ঔপনিবেশিক ডাঃ মোফাটের সহিত দেখা হওয়ায়, তাঁহারই আনুকূল্যে লিভিংষ্টোন আফ্রিকার উত্তরদিকস্থ উপনিবেশ কুরুমানে গিয়া পৌছেন (১৮৪১ সন)। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তের উপনিবেশগুলি অপেক্ষা উত্তর দিকে প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন অধিক মনে হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে

লিভিংষ্টোনের সাহসের পরিচয়ের মডেল—দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র হাতে লিভিংষ্টোন শত্রুদলের সম্মুখীন

উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি চার বৎসর উক্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ অবহেলা করিতেন না। ১৮৪৪ সনে তিনি ডাঃ মোফাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র তখন কালাহারী মরুভূমির উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহার স্ত্রীও সময় সময় স্বামীর সঙ্গিনী হইতেন। [illegible]

ভোগ করেন। অতঃপর তিনি পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া লিনিয়াণ্টি নামক স্থানে গিয়া পৌছেন। এই সময়ে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৮৫৪ সনে বিপৎসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া জাম্বেসী নদীর উপত্যকা হইয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ লোয়াণ্ডাতে গিয়া পৌছেন। এখানে শরীর সারিয়া উঠিলে পুনরায় নূতন দেশ আবিষ্কারের নিমিত্ত সদলবলে পূর্ব্বাভিমুখে রওনা হইলেন। নানা বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া জাম্বেসী হইয়া তিনি লিনিয়াণ্টিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতিকাল পরে জাম্বেসী উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া উত্তরে অবস্থিত একটি বিরাট জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। ইহাই ভিক্টোরিয়া ফল্‌স নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ৪০০০ মাইল পথের মধ্যে বেশীর ভাগই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া লিভিংষ্টোন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে পূর্ব্ব উপকূলে আসিয়া পৌছেন। লিভিংষ্টোন ১৮৫৬ সনে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই অভিযানে তিনি দাসপ্রথা বিলোপ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তখনকার দিনে আরব ও পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়িগণ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে বাহকের কাজ করাইত। স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করিয়া প্রথমে লিভিংষ্টোনের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করিত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইবার পর কোন কোন দলপতি ও তাহাদের অনুচরবর্গ অযাচিতভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে এবং তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টাও সংকল্পসাধনের পথে অগ্রসর হয়।

দেশে ফিরিয়া লিভিংষ্টোন তাঁহার এই পর্য্যটন-যোগ

বৎসরব্যাপী ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন। ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি বিপুল খ্যাতিলাভ করেন। অল্পদিন পরিবারবর্গের সহিত আনন্দে কাটিলে পর লিভিংষ্টোন গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কন্সাল নিযুক্ত হইয়া জাম্বেসী নদী ও তাহার শাখাপ্রশাখা আবিষ্কারের জন্ত প্রেরিত হন। লিভিংষ্টোনেরই আবেদনের ফলে অনতিকাল পরেই বিলাত হইতে বিশপ ম্যাকেঞ্জির অধীনে আর একটি অভিযাত্রী দল প্রেরিত হয়। ইহাদের অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া লিভিংষ্টোন ন্যায়াসা হ্রদের দিকে পর্য্যটনে যান। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বিশপ ও তাঁহার অনুচরেরা সকলেই জ্বরে মারা গিয়াছে। এই সময়ে অসুখে ভুগিয়া তাঁহার স্ত্রী গতাসু হন। লিভিংষ্টোন নিজেও জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এইবার তিনি কাজের নেশায় একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময়েই ন্যায়াসা হ্রদ আবিষ্কৃত হয় এবং ঐ অঞ্চলই দাসপ্রথার কেন্দ্রস্থল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ন্যায়াসা হ্রদে একটি জাহাজ রাখিতে পারিলে দাসপ্রথার বিলোপে সহায়তা হইবে, এই বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নিজের খরচে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া লিভিংষ্টোন সমুদ্রের উপকূলে একটি জাহাজ সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেটিকে দুস্তর জলপথে কোনপ্রকারেই ন্যায়াসা হ্রদে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। পাছে পর্ত্তুগীজদের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় লিভিংষ্টোন উক্ত জাহাজ নিজেই চালাইয়া ২৫০০ মাইল সমুদ্রপথ পার হইয়া বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। এখানে অল্পমূল্যে জাহাজটি বিক্রয় করেন এবং এখান হইতেই বিলাতে প্রত্যাগমন করেন।

দয়ার দৃষ্টান্তের মডেল—আরব-ব্যবসায়ীর হাত হইতে লিভিংষ্টোন কর্ত্তৃক একদল ক্রীতদাসের উদ্ধারসাধন

এই দ্বিতীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করিবার অল্পকাল পরেই নীল নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারের জন্ত রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির আনুকূল্যে লিভিংষ্টোন পুনরায় আফ্রিকায় যান। যথেষ্ট সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহার বাল্যবন্ধু মিঃ ইয়ং ও বোম্বাইয়ের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন। সাত বৎসরব্যাপী অভিযানের অবসান হয় তাঁহার মৃত্যুতে। প্রথমে কয়েক বৎসর তাঁহার কোন খবর না পাইয়া লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে আমেরিকা হইতে প্রেরিত ষ্টান্‌লি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু লিভিংষ্টোনকে ফিরাইয়া আনিতে তিনি সক্ষম হন নাই। লিভিংষ্টোন বলেন যে, তাঁহার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি কিছুকাল পরে খাদ্যসম্ভার, ঔষধপত্র, ৫৭ জন বাহক পাঠাইয়া দেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে টাঙ্গানাইকা ও ন্যায়াসা হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বহু দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে লিভিংষ্টোনের দিন কাটিতে থাকে। অবশেষে ১৮৭৩ সনে তিনি মারা যান। নয় মাস ঔষধ দ্বারা রক্ষিত তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্রোপকূলে আনা হয় এবং তথা হইতে বিলাতে ওয়েষ্টমিনষ্টার এবেতে সমাহিত হয়।

ব্লাণ্টায়ারে লিভিংষ্টোনের জন্মগৃহে তাঁহার সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত বহু দ্রব্য আহৃত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা বহু কক্ষে বিভক্ত। একটি কামরায় আছে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। আর একটি কক্ষে আছে লিভিংষ্টোনের লাইব্রেরী, হস্তলিপি, চিঠিপত্রাদি।

সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক লিভিংষ্টোন গ্যালারি, যাহাতে ছবি ও মডেলের (ট্যাব্লো) সাহায্যে তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেরণা, সত্য, ভক্তি, সাহস, দয়া, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং উৎসর্গ এই সব নামাঙ্কিত মডেলসমূহ আনুষঙ্গিক পটভূমিকায় উপযুক্ত আলোকসম্পাতে সুপরিস্ফুট হইয়া সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১২

সেই দিন বিকালের দিকে সতীন হরিনারায়ণের কাছে বিদায় চাহিল। জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হরিনারায়ণ ও জীবানন্দ উভয়েই আপত্তি করিয়া বলিলেন—বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। আর চার দিন পরে বিয়ে। বিয়েটা হয়ে গেলে যেও।

সতীন বলিল—আমার জরুরী কাজ আছে, নইলে থেকে যেতাম। আপনাদের কাছে একটু খুলেই বলছি। আমার গুরুদেবের আশ্রম মহারাষ্ট্রে। আজ ছয়-সাত বছর পরে সেখানে আমার ডাক পড়েছে। আমার এখানকার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। শীঘ্রই বাংলার আন্দোলন নূতন পথ ধরবে। আমি নূতন কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান করছিলাম এমন সময় ডাক এল। আর দেরি করতে পারছি না। ছুটি নিয়েছি বটে, কিন্তু চাকরি-স্থলে ফিরে আসতে পারব কিনা জানিনে। যাবার আগে একবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলাম। বেনুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, ইন্দ্রকে দেখে গেলাম।

হরিনারায়ণ বলিলেন—ভবিষ্যতে কি করবে স্থির করেছ?

সতীন ব'লল—কিছু দিন আগে স্থির করে'ছলাম, কোন জায়গায় একটা আশ্রম গড়ে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গুরুদেবের আদর্শ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের আদর্শ প্রচার করব। কিছু অর্থসংগ্রহও করেছিলাম। এই কাজ আপাততঃ বন্ধ রেখে মহারাষ্ট্রে যাচ্ছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন—তোমার লোকশিক্ষার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা স্থির হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। আমাকে একটু জানিও তখন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

সতীন বলিল—প্রয়োজন হলে জানাব। আপনারা ইন্দ্রের জন্ত উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি তাকে এমন কাজ দিয়ে যাব যাতে তার মনের চাঞ্চল্য দূর হয়।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার যতীন বাবু সতীনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আসিলেন। ইন্দ্রকে ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সতীন পথে বাহির হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা মুরলী বিলের ধারে মাঠের দিকে চলিল। মাঠে পৌছিয়া এক জায়গায় ঘাসের উপর সকলে বসিল। ইন্দ্র যতীনবাবুর খাতাখানি বাহির করিয়া উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িয়া শুনাইল। পড়া শেষ হইলে সে সতীনকে বলিল—মনে হচ্ছে একটা পথের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু হাতে-কলমে কি ভাবে কাজ করতে হবে বুঝতে পারছি নে। মনটাও সায় দিচ্ছে না।

উক্তিগুলি শুনিয়া সতীন দেখিল যে, এগুলিতে তাহার লোকশিক্ষা-আশ্রমের আদর্শের সমর্থন রহিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও কার্য্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া সে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিল, উহা ছাপাইবার সময় হয় নাই। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল এই পুস্তিকাখানি ইন্দ্রকে দিয়া যাইবে। নবশক্তি, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকার মন্তব্য শুনিয়া তাহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল। সে নিজের মনে বলিল, এই পথই ইন্দ্রের উপযুক্ত পথ। ইন্দ্রের হাতেই তাহার আদর্শের কার্য্যকারিতার পরীক্ষা হোক।

নিজের চিন্তার অনুসরণ করিয়া কতকটা যেন স্বগতোক্তির মত ইন্দ্র বলিল, মন্তব্যগুলিতে লোকসেবার আদর্শ প্রচার করা হয়েছে মনে হচ্ছে। লোকসেবা এর আগে কিছু কিছু করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের মাঝামাঝি সময়ে দেখেছি, যাদের কল্যাণ করতে গিয়েছি তারাই পুলিসের কাছে গোপনে খবর দিয়ে স্বদেশীওয়ালাদের ধরিয়ে দিয়েছে। লাঠি-সড়কি-খেলা, জিম্‌নাষ্টিকের বরাবর রেওয়াজ ছিল রাজনগরে। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে পাঁচটা ছেলেকে একত্র লাঠি খেলতে দেখলে গাঁয়ের কতকগুলো কিচেল লোক পিট পিট করে চেয়ে দেখে, তার পর পায়ে পায়ে থানায় খবর দিতে রওনা হয়। এদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না, করেও কোন লাভ নেই।

ধীর ভাবে সতীন ইন্দ্রের কথা শুনিল। তার পর ইন্দ্রকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে গিয়া বলিল, অত হতাশ হলে চলবে না রে। স্বদেশী আন্দোলন দেশে একটা প্রবল বন্যা এনেছিল। যারা দেশের মুক্তির জন্য আগে থেকে কাজ করছিল তারা এই ভাবের বন্যাকে কাজে লাগাবার জন্যে দেশের জনসাধারণকে মুক্তি আন্দোলনের সমর্থকরূপে পাবার চেষ্টা করল। সে চেষ্টা সফল হ'ল না। মুসলমানরা তফাতে সরে গেল। ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি প্রদেশে সাড়া জাগল, অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা স্বদেশী আন্দোলন ও তার বাণীকে উপেক্ষা করল, দেশপ্রেম ও জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের কাছে নূতন ও অবোধ্য জিনিস বলে মনে হ'ল। তারা ভাবল সমস্ত জিনিসটা বাঙালীর নিজের সমস্যা মাত্র। সরকার বাহাদুর খোশখেয়ালে বাংলা ভেঙে দুই খণ্ড করেছেন; তা মেনে না নিয়ে বাঙালীরা অন্য প্রদেশগুলোকে দলে টানতে চাইছে। তারা এগোল না। ফলে এত বড় আন্দোলনের যার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই দেখে আমাদের মধ্যে এক দল দেশপ্রেমিক যুবক একটা অপরিসর কিন্তু বিপজ্জনক পথে পা বাড়াতে এগিয়েছে। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য রক্তপাত নয়, তারা চায় আত্মাহুতি দিয়ে স্বদেশবাসীর উদা-

দীনতা দূর করতে। তারা দেশপ্রেমের আগুনে পুড়ে মরছে দেখে মোহগ্রস্ত দেশের লোক এগিয়ে আসবে এই তাদের আশা।

সতীন একটু থামিয়া ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। ইন্দ্র মাথা নীচু করিয়া তাহার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সতীন বলিল, আমার কথা বুঝতে পারছিস ভাই? না হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে? আসল কথা কি জানিস, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমরা খানিকটা এগিয়েছি, নূতন যে 'এক্সপেরিমেন্ট' (পরীক্ষা) হতে চলছে সেটা জাতিকে আরও খানিকটা এগিয়ে দেবে আশা করছি আমরা। আমাদের দরকার দেশের লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া। এজন্য তাদের মধ্যে খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে হবে। কি উপায়ে সেটা করা যেতে পারে তার নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে।

ইন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, কি রকম এক্সপেরিমেন্ট?

সতীন সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আমি তোকে যে নোট বইখানা দিচ্ছি তাতে সে কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের আগে আমার যা করবার ছিল করেছি, আন্দোলনের সময়ও করেছি। তার পর, নূতন উপায় সম্বন্ধে আমাদের ছেলেরা যে পরীক্ষা করতে চলেছে তার সম্পর্কে আমার যেটুকু সাধ্য তা করতে কসুর করি নি। এখন আমি অন্য পথে পা বাড়িয়েছি। অন্য পথ মানে নূতন কার্য্যক্ষেত্রের অনুসন্ধান। তুই তোর অবস্থা ও সাধ্যমত কাজ কর।

সতীন বাবুর খাতা থেকে ঐ অংশগুলো কপি করে রাখ্। আমি তোকে যে নোট বই দিলাম তাতে লোকশিক্ষার আদর্শ হাতেকলমে কি ভাবে কাজে পরিণত করতে হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ পাবি। কিছু দিন কাজ করে দেখ। যদি আন্তরিক ভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারিস মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না। এত বড় কর্ত্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে যে যার যতটুকু সাধ্য তাই করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। অবশেষে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে দেখিয়া সতীন বলিল, চল, এবার ওঠা যাক। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইন্দ্রের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও সতীন থাকিতে রাজী হইল না। হরিনারায়ণ ও জীবানন্দের কাছে সতীন যতখানি বলিয়াছিল তাহা অপেক্ষা আরও একটু বিস্তারিতভাবে নিজের উদ্দেশ্যের কথা ইন্দ্রের নিকট বলিতে হইল। সব কথা শুনিয়া ইন্দ্র আর বাধা দিতে পারিল না। শুধু বলিল, দেখুন সেই, আপনিও চলে গেলেন, প্রয়োজন হলে কার কাছে পরামর্শ চাইব?

সতীন সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিয়া বলিল, পরামর্শের জন্য খুব ভাল লোক পাচ্ছ ভাই, ভাবনা কি? তুমি আমার লক্ষ্মীদিদির পুরো পরিচয় এখনও পাও নি।

একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, কোন দিন ওকে অনাদর করো না, ওর মনে দুঃখ দিও না ভাই।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া সতীন চলিয়া গেল। যাইবার সময় যতীনবাবুকে বলিল, আপনি তৈরি থাকবেন যতীনবাবু, শীঘ্রই আপনার ডাক আসতে পারে।

যতীনবাবু বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি।

হরিনারায়ণ ও জীবানন্দ উভয়ের গৃহে বিষাদের ছায়া। হরিনারায়ণের গৃহ জরাক্রান্তীভূত। তিনি নিজে অসুস্থ, লাঠি ধরিয়া কোনমতে একটু-আধটু চলাফেরা করেন। জীবানন্দের ছেলে বিচারের প্রতীক্ষায় জেল-হাজতে। লক্ষ্মীর বিবাহ উপলক্ষে জীবানন্দ উকিলের দ্বারা দেবানন্দকে জামিনে খালাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দুই পরিবারে পরিব্যাপ্ত বিষাদের ছায়ার মধ্যে যতখানি সম্ভব জাঁকজমক বর্জ্জন করিয়া ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে সকলের অপেক্ষা বেশী উৎসাহ ও আনন্দ চিন্ময়ীর। লক্ষ্মীকে সে বাস্তবিক নিজের ভগ্নীর চেয়েও বেশী ভালবাসিত। টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে পিতৃগৃহে আসায় মৃন্ময়ী সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে জানিত তাহার ছোট বোন চিন্ময়ীর পীড়াপীড়িতে অসুস্থ পিতা বাধ্য হইয়া সম্মতি দিয়াছেন। পিতৃবংশের গৌরব এই ভাবে ক্ষুণ্ণ করায় সে চিন্ময়ীর উপর একটু রুষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতি তাহার মনে বিরূপ ভাব ছিল না। বংশগৌরবের ন্যূনতার ত্রুটিটুকু ছাড়িয়া দিলে রূপে গুণে সে ইন্দ্রের বৌ হইবার উপযুক্ত মেয়ে একথা বলিতেই হইবে।

বিবাহের পর দিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মী যখন বধূবেশে পাল্কী হইতে তাহাদের বাড়ীতে নামিল চিন্ময়ী তখন তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার কানে কানে বলিল, তোর শিবপূজো সার্থক হ'ল ভাই?

বধূবরণ শেষ হইলে নূতন বৌকে লইয়া সে পিতার ঘরে গেল। শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া উঠিলে চিন্ময়ী তাহার মাথায় কাপড় সরাইয়া দিল, পিতার পায়ের কাছে দু'জনে পাশাপাশি বসিল। হরিনারায়ণ দুই হাত উভয়ের মাথার রাখিয়া চোখ বুজিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর বলিলেন, ইন্দ্র কোথায় মা?

ইন্দ্র সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী মাথায় কাপড় দিতে যাইতেছিল, হরিনারায়ণ বলিলেন, থাক মা, আমার কাছে তোমাকে মাথায় কাপড় দিতে হবে না।

ইন্দ্র পিতাকে প্রণাম করিয়া বিছানার এক পাশে বসিল। হরিনারায়ণ তাহাকে মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চিন্ময়ী দেখিল এক ফোঁটা জল পিতার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

পর দিন দুপুরের দিকে জীবানন্দ বরিশাল হইতে উকিলের টেলিগ্রাম পাইয়া জানিলেন যে, দেবানন্দের ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উকিল লিখিয়াছেন, আপিল করা হইলে তাঁহাকে যেন টেলিগ্রামে জানানো হয়।

জীবানন্দ তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিলেন, আপিলের প্রয়োজন নাই।

টেলিগ্রামের কথা স্ত্রীকে জানাইয়া জীবানন্দ বলিলেন, খবরটা বাইরে যেন প্রচার না হয়। মেয়ের আজ ফুলশয্যা। পরে সবাই জানতে পারবে।

কিন্তু খবর গোপন রহিল না। বাড়ীতে পিয়নকে আসিতে দেখিয়া ও কিছুক্ষণ পরে মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আনন্দ ইন্দ্রদের বাড়ীতে গিয়া ইন্দ্র ও তাহার দিদিকে সে সংবাদ দিয়া আসিল। তাহারা অনুমান করিল দেবানন্দের কোন সংবাদ আসিয়াছে। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি জীবানন্দের কাছে আসিয়া ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। জীবানন্দকে বাধ্য হইয়া টেলিগ্রামের খবর বলিতে হইল। নিজে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন সেকথা আর ইন্দ্রকে জানাইলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, লক্ষ্মীকে আজ আর খবরটা জানিও না, সে মন খারাপ করবে।

ইন্দ্র বলিল, সে খবরের জন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে; কি করে তার কাছে গোপন রাখব ?

জীবানন্দ আর কিছু বলিলেন না। হিরণ্ময়ী জামাইকে ভিতরে লইয়া গিয়া কাছে বসাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, আমাকে কি আর বোঝাবেন ? বিকেলের দিকে গিয়ে ওকে একটু বুঝিয়ে আসবেন।

সে চলিয়া গেল।

ইন্দ্র ও লক্ষ্মী ছাড়া দেবানন্দের জেলের খবর ও-বাড়ীর আর কেহ জানিতে পারিল না।

লক্ষ্মীকে সংবাদ দিয়া ইন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল। দেবুদার ছয় মাস কারাদণ্ডের সংবাদে তাহার নিজের মন এমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল যে, লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা তাহার মনে রহিল না।

বাড়ীর বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সে যতীনবাবুর বাসায় উপস্থিত হইল। ভাবিল যদি যতীনবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া মনের ভার কিছু কমাইতে পারে।

যতীনবাবুর বাসায় গিয়া শুনিল, আগের দিন রাত্রে তিনি হঠাৎ বাহিরে কোথায় গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন কেহ বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল সতীনদা যতীনবাবুকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, শীঘ্র তাঁহার ডাক আসিতে পারে—ডাক তাহা হইলে আসিয়াছে ?

অনেক বিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া সে মায়েবের সঙ্গে কতকগুলি জরুরী বৈষয়িক ব্যাপারের পরামর্শে ব্যাপৃত হইল। পিতার আদেশে মায়েবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি সমস্তই এখন তাহাকে করিতে হয়।

এদিকে চিনি দুপুর হইতে দাদার ফুল-শয্যার আয়োজনে ব্যস্ত। দাদার বিবাহের সকল জিনিস ঘরে তালাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল। ঘর খুলিয়া নূতন বিছানাপত্র বাহির করিয়া খাটে পাতিল। ফুল আনাইয়া বিছানায় ছড়াইল। মায়ের আলমারী খুলিয়া রূপার ফুলদানি, চন্দনের বাটি, গোলাপপাশ, আতরদান, রেকাব, গেলাস বাহির করিল। গোলাপ জল, আতর, ধুপ ধুনোর গন্ধে ঘর সুবাসিত ; চাঁপা, গন্ধরাজ, বেলফুলের গন্ধে আমোদিত হইল। রূপার পিলসুজে তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া খাটের পাশে রাখিল। পাথরের টেবিলের উপর রূপার থালায় মিষ্টি সাজাইল, মায়ের বাপের বাড়ীর সোনার পানের ডিবা ভরিয়া পান রাখিল।

মায়ের শাড়ী ও গহনা দিয়া চিন্ময়ী লক্ষ্মীকে সাজাইতেছে এমন সময় ছোট মেয়েকে সঙ্গে লইয়া হিরণ্ময়ী আসিলেন। চিন্ময়ীর ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। তাহাকে ও মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মেয়ে-জামাইয়ের জন্ত যে নূতন শাড়ী ও কাপড় আনিয়াছিলেন তাহা চিন্ময়ীর হাতে দিয়া গেলেন।

লক্ষ্মীকে সাজাইয়া চিন্ময়ী তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি উঠাইল কেমন মানাইয়াছে দেখিবার জন্য। বলিল, আজকার মত দিন আর পাবি না জীবনে। কথাটা মনে রাখিস।

সাজানো শেষ হইলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহাকে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে আনিল। ঘরের এক পাশে গদী-আঁটা চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া বলিল—এখানে বোস। দাদা এসে হাত ধরে খাটে বসাবে। তুই বোস, আমি দাদাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। কি মজা হবে বল দেখি লক্ষ্মী, দাদা এর কিছু জানে না।

সে লক্ষ্মীর মাথার কাপড় একটু সরাইয়া দিল। বলিল—অত লম্বা ঘোমটা দিস্ না। চুপ করে এখানে বসে থাক। দাদাকে দেখেই গলে যাস্ নি। অনেক খোশামোদ করলে, আদর করলে তবে উঠবি। বুঝেছিস্ ?

ঘর হইতে বাহির হইয়া চিন্ময়ী দরজা ভেজাইয়া দিল। তারপর ঝিকে দিয়া ইন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইল। ইন্দ্র উপরে আসিলে চিন্ময়ী বলিল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। একটু কাজ আছে।

ইন্দ্র বলিল—কি কাজ রে চিনু যে এমন কড়া তলব করেছিস্।

ইন্দ্রের জন্ত যে নূতন কাপড় জামা প্রিয়রঞ্জনী দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া চিন্ময়ী বলিল, এইগুলো পরে ফেলুন দেখি।

ইন্দ্র—কেন রে, হঠাৎ এগুলো পরব কেন ?

চিন্ময়ী—আপনার শাশুড়ী দিয়েছেন আপনাকে পরতে। আজ পরতে হয়।

চিন্ময়ীর পীড়াপীড়িতে ইন্দ্রকে সেগুলি পরিতে হইল।

চিন্ময়ী বলিল, আসুন এদিকে।

ইন্দ্র চিন্ময়ীর সঙ্গে সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া একেবারে অবাক হইল। লক্ষ্মী বসিয়াছিল। ইন্দ্র ও চিন্ময়ীকে আসিতে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিন্ময়ী বলিল, আজ আপনার ফুলশয্যা। মনে ছিল না বুঝি ? আজ আর ঘর থেকে বেরুতে পাবেন না। আমি শেকল তুলে দিচ্ছি, কাল সকালে খুলে দেব।

ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্র বলিল, চিনু, একটু শোন এদিকে, ও চিনু···।

চিনু ততক্ষণ বাহিরে আসিয়া দরজার শিকল তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, কাল শুনব ছোড়দা।

ইন্দ্র চারদিকে চাহিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিল। ভাবিল চিনি যে এমন চমৎকার সাজাইতে পারে তাহা ত সে জানিত না। ভাবিল চিনির সুন্দর রুচি, সুন্দর সাজাইবার হাত। তাহার দৃষ্টি পড়িল লক্ষ্মীর উপর। লক্ষ্মী মাথা হেঁট করিয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ইন্দ্র দেখিল শাড়ীতে, অলঙ্কারে চন্দনে, প্রদীপ্ত রূপে রাজেন্দ্রাণীর মত দেখাইতেছে তাহাকে।

ইন্দ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিলেও লক্ষ্মী সে দৃষ্টির মাধুর্য্য অনুভব করিল। ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া গলায় শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া ইন্দ্রের পায়ের উপর সে মাথা রাখিল। লক্ষ্মী কতবার তাহাকে প্রণাম করিয়াছে, কিন্তু তাহার আজিকার প্রণতিটি ইন্দ্রের কাছে অভিনব বলিয়া মনে হইল, বড় ভাল লাগিল। দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইতেই ইন্দ্র দেখিল নববধূর চোখে অশ্রুর আভাস।

লক্ষ্মীর চোখে জল দেখিয়া সুসজ্জিত কক্ষ, পুষ্পাকীর্ণ শয্যা, আতর ও গোলাপজলের স্নিগ্ধ সুবাস অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের মন উতলা হইয়া বাহিরের নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ছুটিয়া চলিল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, অন্ধকারকক্ষের অপরিসর গবাক্ষপথে দূর আকাশে দীপ্তিমান ধ্রুবতারার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আশৈশব পরিচিত এক খানি মুখ।

কঠোর প্রয়াসে মনের ব্যাকুলতা দমন করিয়া ইন্দ্র লক্ষ্মীকে খাটে বসাইয়া দিয়ে তাহার পাশে বসিল। চিবুক ধরিয়া তাহার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইয়া পরম সান্ত্বনা ও স্নেহের স্বরে সে বলিল—

—তোমার চোখে জল কেন আমি জানি। দেবুদা যেখানে থাকুন, যে অবস্থায় থাকুন তাঁর আশীর্ব্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। আমি যে তাঁর হাতে গড়া মানুষ লক্ষ্মী!

লক্ষ্মীর চোখের জল উপচাইয়া পড়িতে স্বামীর বুকে সে মুখ লুকাইল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে। জীবানন্দ দরখাস্ত করিয়া ছুটির মেয়াদ বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, সে মেয়াদও শেষ হইয়া আসিল। নূতন জায়গায় তাঁহার বদলির আদেশ হইয়াছে। দিন চার-পাঁচ আগে হইতে তিনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

হরিনারায়ণের শরীর অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরে চলাফেরা করিতে পারেন, বৈষয়িক কাজকর্ম্মও কিছু কিছু দেখেন। জগদ্ধাত্রীর মৃত্যুর পরে সর্ব্বদা তাঁহার যে বিমর্ষ ভাব দেখা যাইত তাহা দূর হইয়াছে। মুখে একটা তৃপ্তি ও শান্তির ভাব আসিয়াছে। জীবানন্দকে তিনি বলেন, জীব, বৌমা আমার সংসারে শ্রী ও শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। জীবনে যত দুঃখ পেয়েছি তার দাগ বুক থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আর কিছু দিন যেন বেঁচে থাকি, নাতি নাতনীর মুখ দেখে, তাদের নিয়ে সুখে আহ্লাদে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেন মরি।

জীবানন্দের মুখে সন্তোষের হাসি ফুটিয়া উঠে। আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন, আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন দাদা।

হরিনারায়ণ বলেন, জীব, আমার মনে একটা ক্ষোভ রয়েছে দেবুর জন্ত। এই রাজনগরের মাটিতে ওর মত একটা ছেলে জন্মেছে বলে আমার মনে গর্ব্ব ছিল কত। জানি যে জেল থেকে বেরিয়ে ওর মনের গতি কোন্ দিকে যাবে। ও বেরুলে ওকে কলকাতা পাঠিও পড়াশোনা করবার জন্ত। একটা উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করো; কলকাতা পাঠাবার আগে বিয়ে দিয়ে দিও। এ রকম যে কত শক্ত বন্ধন তা আমার ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বুঝতে পারছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ আবার বলিলেন, প্রসন্ন যেয়াড়া হয়ে উঠলে আমার স্ত্রী তার বিয়ে দিতে বলে-ছিলেন। ছেলের উচ্ছৃংখল স্বভাবে রুষ্ট হয়ে আমি সেকথা কানে তুলি নি। হয়ত তাঁর কথা শুনলে ছেলেটা এভাবে ঘরছাড়া হ'ত না। ছেলেও চলে গেল, মনের কষ্টে স্ত্রীও গত হলেন।

একটু পরে হাসিয়া বলিলেন, ভাল কথা, ইন্দ্রের সেবাশ্রমের কথা শুনেছ ? অনেকগুলো টাকা আদায় করেছে আমার কাছ থেকে—তাঁতশালা, ডাক্তারখানা, নাইট স্কুল, ছেলেদের আশ্রম, আরও কি সব করবে বলে।

জীবানন্দ নূতন কর্মস্থলে রওনা হইয়া গেলেন। ঝিনুমণী যখন বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল নয়, আমিও চলি," জীবানন্দ তখন জবাবে বলিয়াছিলেন, আমার পুরোনো ঠাকুর চাকর নিয়ে যাব, অসুবিধে হবে না। তুমি আপাতত এখানে থাক ও-বাড়ীতে লক্ষ্মী একা পড়েছে ছোট ননদ চলে যাবার পর থেকে। অত লোকজন, ক্রিয়াকর্ম সব ভাল সামলাতে হয় মেয়েটাকে। দুটো কথা বলবার লোক নেই, হাঁফ ছাড়বার অবসর নেই। মাসখানেক পরে তুমি যেও।

ঝিনুমণী ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা ঠিক। বিয়ে হইয়াই অত বড় সংসারের ভার পড়িয়াছে মেয়ের ঘাড়ে, তার উপর অসুস্থ শ্বশুর। তিনি মাসখানেক থাকিয়া যাওয়াই স্থির করলেন।

জীবানন্দ চলিয়া যাইবার দিন সাতেক পরের কথা।

লক্ষ্মী থালায় দুধের বাটি, ফল, মিষ্টি আনিয়া শ্বশুরকে খাওয়াইতে বসিল। তাঁহার সকালবেলার আহার। খাওয়া শেষ হইলে সে থালা, বাটি ও রেকাবি তুলিয়া লইতেছিল, হরিনারায়ণ একটু অন্যমনস্কভাবে তাহার কাজ দেখিতেছিলেন। লক্ষ্মী বাসনপত্র তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, বৌমা, ওগুলো নামিয়ে রেখে একটু বসো। একটা কথা হঠাৎ মনে এল তোমাকে বলি।

লক্ষ্মী বাসনগুলি রাখিয়া শ্বশুরের পায়ের কাছে বসিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, বৌমা, তুমি ছেলেমানুষ এত বড় সংসারের ভার পড়েছে তোমার ওপর। ইন্দ্রও এখন ছেলেমানুষটিই রয়ে গেছে। ঐ বয়সে আমাকেও সংসারের ভার কাঁধে নিতে হয়েছিল। আমাকে সাহায্য করেছিলেন তোমার শাশুড়ী। তিনি সাহায্য না করলে কি হ'ত এই বিষয়-সম্পত্তির, এই সংসারেরই-বা কি গতি হ'ত ভাবতে পারি না। তোমাকে সেই কাজ করতে হবে বৌমা। এই পুরনো বনেদি পরিবারের সব বিধি-ব্যবস্থা যাতে বজায় থাকে, যারা তোমার মুখাপেক্ষী তারা যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে সেইটে তোমাকে দেখতে হবে।

হঠাৎ শ্বশুরের মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেও লক্ষ্মী অবনত মস্তকে তাঁহার উপদেশ শুনিল, বলিল, আমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা।

হরিনারায়ণ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করছি মা, আশীর্বাদ দিনরাতই করছি। আমার বড় আনন্দ তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়েছ।

লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসনগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

ঝিনুমণী পূজা-আহ্নিক সারিয়া উঠিলেন, এইবার রান্নাঘরে যাইবেন। ইন্দ্রদের বাড়ীর ঝি মুক্তীর মা হন্ত-দন্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া উঠান হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, অ মা-ঠাকরুণ, শিগ্‌গির আসেন।

তাহার চীৎকার শুনিয়া ঝিনুমণীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি হয়েছে রে মুক্তীর মা, অমন করে ডাকছিস্ কেন?

মুক্তীর মা বলিল, কর্তাবাবু পইড়্যা গিয়্যা অজ্ঞান হয়েচেন। আপনি শিগ্‌গির আসেন।

ঝিনুমণী চমকিয়া উঠিলেন। গায়ে একখান চাদর জড়াইয়া তিনি মুক্তীর মার সঙ্গে চলিলেন। মুক্তীর মার মুখে ঘটনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, হরিনারায়ণ জলযোগ শেষ করিয়া কাছারীবাড়ীর উঠানে পায়চারি করিতেছিলেন। তারপর একটু ক্লান্তিবোধ করিয়া তাঁহার ঘরে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ বৈঠকখানা দালানের সিঁড়িতে উঠিবার সময় কিভাবে পা হড়কাইয়া সিঁড়ির উপর পড়িয়া যান। পড়ার শব্দ পাইয়া কাছারিঘর হইতে ইন্দ্র, নায়েব, গোমস্তা ছুটিয়া আসিয়া ধরা-ধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসে। তখন হইতে তাঁহার জ্ঞান নাই। ডাক্তার ডাকিতে লোক গিয়াছে।

ঝিনুমণী হরিনারায়ণের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন বহু লোক জমা হইয়াছে সেখানে। ডাক্তার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে, ইন্দ্র পিতার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতেছে। লক্ষ্মী মাথায় কাপড় দিয়া শ্বশুরকে বাতাস করিতেছে। মমতা পিতার বুকে পুরাতন ঘি মালিশ করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, পড়িয়া গিয়া বুকে ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস উঠিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে হরিনারায়ণের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের সময় তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া লোকান্তরিতা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইল।

হরিনারায়ণ তাঁহার জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ রাজনগর ও নবীন রাজনগরের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কাল-প্রভাবে সেই সেতু জীর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইল। প্রাচীন রাজনগরের ইতিহাসের শেষ পাতায় বিরাম-চিহ্ন অঙ্কিত হইল।

ক্রমশঃ

নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীদাশরথি রায়

প্রভু বুদ্ধ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সেই লুম্বিনী উদ্যান তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চল আজিকার নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নেপাল তরাই নামে আখ্যাত। বর্ত্তমানের নেপাল তরাই অঞ্চলেই প্রভু বুদ্ধ জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের নেপাল উপত্যকায় আগমনে, তাঁহার পুণ্যপদস্পর্শে নেপাল যে কেবল ধন্যই হয়েছিল তাহাই নহে, এই সময় হইতেই নেপালের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয়। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্র মতে শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় জন বুদ্ধ নেপাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নেপালের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন নেপাল উপত্যকায় আগমন করেন তখন তথায় কিরাতবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কিরাতবংশীয় রাজগণ যদিও হিন্দু ছিলেন তথাপি তৎকালীন কিরাত-রাজ জিতেদস্তি যোগ্য আতিথেয়তা সহকারে প্রভুকে স্বাগত করেন। নেপাল উপত্যকার নামুরা নামক যে স্থানে প্রভু বুদ্ধ ব্যাঘ্রী জাতক প্রচার করিয়াছিলেন তথায় আজিও একটি চৈত্য বিদ্যমান। প্রভু বুদ্ধ নেপাল উপত্যকায় অতি অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রচারিত মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া তথাকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের যে বীজ তিনি নিজহস্তে বপন করিয়াছিলেন, তাহা কালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া তথাকার সহস্র সহস্র লোককে শান্তিচ্ছায়াতলে আশ্রয় দান করিয়াছে। ত্রিপিটক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমুদয় শাক্যই বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুখ্যাত রাজা বিড়ুডাভের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শাক্যই নেপালের বিভিন্ন দুর্গম স্থানে পলায়ন করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত এই সকল শাক্যই প্রভুর পরিনির্ব্বাণলাভের পরও নেপালের জনগণের নিকট তাঁহার প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করিতেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণলাভের পরবর্ত্তী কালে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও তথায় ইহার অভ্যুত্থান ও পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য এবং পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়। তবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪৯ অব্দে যে ঘটনায় নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিষয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এই সালে মহান্ সম্রাট অশোক নেপাল পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রথমেই লুম্বিনী তীর্থে গমন করেন। পুণ্যতীর্থ লুম্বিনীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য ফুল চন্দন ধূপ ধুনা গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী বহন করিয়া চারি দল সৈন্য সম্রাটের সহিত আগমন করিয়াছিল। সম্রাটের সহিত তাঁহার দীক্ষাগুরু ভিক্ষু উপগুপ্ত ও সম্রাট-কন্যা চারুমতীও নেপালে আগমন করেন।

নেপালের নামুরা চৈত্য।
এইস্থানে প্রভুবুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম ব্যাঘ্রীজাতক প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভূপুরাণ-বর্ণিত, সম্রাটের লুম্বিনীতীর্থ পরিদর্শন-কাহিনী বড়ই হৃদয়স্পর্শী। যাঁহার করুণাকণা লাভ করিয়া চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোকে রূপান্তরিত হন সেই প্রভু বুদ্ধ যেখানে প্রথম পদক্ষেপ* করিয়া ধরণী পবিত্র করিয়াছিলেন সেই পুণ্যতীর্থ লুম্বিনী পরিদর্শন-কালে অশোকের কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই উপগুপ্ত সসম্ভ্রমে দক্ষিণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাসম্রাট! এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে আমার প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা এই পুণ্যতীর্থে প্রভুর অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া তুমি এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ কর।" ভক্তিরসাপ্লুত অশোক গুরুর আদেশে তত্রস্থ অধিবাসীদের মধ্যে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণপূর্ব্বক তথায় এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া স্তম্ভগাত্রে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন :

"দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বিসতি বসাভিসিতেন
"অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে সাক্যমুনীতি

* বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব মায়াদেবীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক পদ পাদবিক্ষেপ করেন।

"দেবা বিপতাতি চা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে
"হিদ ভগবং জাতেতি লুম্মিনি গামে উবলিকে কটে
"অট ভাগিয়ে চ

উৎকীর্ণ লিপির অর্থ : দেবতাদের প্রিয়দর্শী অশোক বিশ বৎসর অভিষিক্ত হইবার পর এই স্থানে আসিয়া পূজা
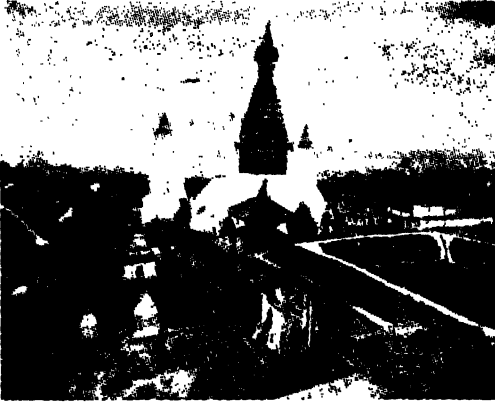
নেপালের স্বয়ম্ভুনাথের বৌদ্ধমন্দির

করিয়াছিলেন, কারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই স্থানে একটি অশ্বমূর্তিখোদিত প্রস্তর স্থাপন করেন এবং একটি স্তম্ভ নির্মিত করান, কারণ ভগবান এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লুম্বিনী গ্রামকে কর-রহিত করেন এবং (উৎপন্ন দ্রব্যের) এক-অষ্টমাংশ দিতে আদেশ দেন।

সম্রাট অশোক যে কেবল নেপালে তীর্থপর্য্যটনে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, নেপালের বহু অঞ্চল তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। অতএব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সম্রাট অশোকের অধীনে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। নেপালের বর্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় এক ক্রোশ দূরে "পাটন" বা "অশোক পাটন" নামক স্থানে অশোক এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট পাটনের কেন্দ্রস্থলে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন এবং এই কেন্দ্রস্থ স্তূপের পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করিয়া আরও চারিটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্তূপ পাঁচটি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাসম্রাট তাঁহার কন্যা চারুমতীকে পাটনের দেবপাল নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। চারুমতী পরবর্তীকালে ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করান। চারুমতী প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহারটি "চা বাহিল"† নামে খ্যাত। এইরূপে অশোকের মহতী প্রচেষ্টার ফলে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নেপালের তৎকালীন অধিবাসী নেওয়ারেরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

বৌদ্ধধর্মের যে গৌরবময় যুগ অশোকের সময় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ অভ্যুত্থান হয়। তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান প্রতিবেশী বঙ্গদেশ হইতে নেপাল তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রেরণালাভ করে। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মহাস্থবির নেপালে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শঙ্করাচার্য্য নামে খ্যাত মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার পথ ছিল নেপালের মধ্য দিয়া। শান্তরক্ষিত, কমলশীল, অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর নেপালের পথে তিব্বত গমন করিবার কালে কয়েক বৎসর নেপালে অবস্থান করেন। এই সকল তান্ত্রিক পণ্ডিত নেপালে তন্ত্রযান প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচার ও প্রভাবের ফলে নেপালের সেই গৌরবময় যুগ তন্ত্রযানের যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নেপালের ধর্মসম্পর্কিত ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের তুল্য। ভারতে প্রথমে ছিল হিন্দুধর্মের প্রভাব এবং হিন্দুধর্মের পরবর্তী যুগ হইতেছে বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগ ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের অবনতি হইয়া ভারতে পুনরায় হিন্দুধর্মের উত্থান হইয়াছিল। নেপালেও সেইরূপ প্রথম যুগে হিন্দুধর্মের ও পরে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পর ভারতে যেরূপ বৌদ্ধধর্মের শেষ রশ্মি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে নেপালে তেমনটি হয় নাই। একথা সত্য যে, নেপালের বর্তমান শাসকগণ হিন্দু এবং নেপাল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধানে শাসিত নেপালরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হয় নাই। আজ তথায় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি সগৌরবে বিরাজমান। খ্রীষ্টীয় ১৭৭৫ সালে গোরখা-রাজা পৃথ্বীনারায়ণ সমগ্র নেপাল জয় করিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করিবার পর নেপালে আর একজনও বৌদ্ধ রাজার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না; তথাপি আজও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা নেপালের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম্মসম্প্রদায়। নেপালের দক্ষিণ ভাগে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক, বাকী অন্যান্য স্থানে (পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর নেপালে) বৌদ্ধধর্ম্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

† চা-বাহিল শব্দ 'চারু বিহার'-এর অপভ্রংশ

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নেপালী বৌদ্ধগণ আজ যে ধর্ম আচরণ করে তাহা স্থবিরবাদ বা মহাযান কোন পর্য্যায়ে পড়ে না। নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে তাহার কারণ দর্শাইয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নেপালের আদিম অধিবাসী বৌদ্ধ নেওয়ারগণ বৌদ্ধধর্মের সরল অনাড়ম্বর পূজাপাঠে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া হিন্দুদের পূজার সাড়ম্বর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা একে একে হিন্দু-পূজাপদ্ধতির সমুদয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে, জাতি-ভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সংস্কার নেওয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বুদ্ধকে তাহারা ত্যাগ করিল না, কিন্তু মহাদেব, শীতলা, গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীকে পূজা না করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইবার সাহসও তাহাদের রহিল না। পার্থিব কল্যাণের লোভে নেপালী বৌদ্ধগণ তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃগণ পূজিত প্রায় সব কয়টি দেবদেবীকে বুদ্ধের সমগৌরব প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিল। অন্য দিকে আবার নেপালের হিন্দুগণ বুদ্ধকেও তাহাদের অন্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আজ তজ্জন্যই নেপালের বৌদ্ধমঠে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিসমূহ বৌদ্ধধর্মীদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আবার হিন্দু-মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে পূজিত হইতেছেন। হিন্দু পুরাণ 'নেপাল মাহাত্ম্যে' লিখিত আছে—"বুদ্ধের পূজা করা শিবপূজার তুল্য।" আবার বৌদ্ধশাস্ত্র স্বয়ম্ভূপুরাণ নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দুদেবতা পশু-পতিনাথ শিবের পূজা করার বিধান দিয়াছে।

অতএব নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, তথাকার হিন্দু বৌদ্ধকে আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধকে সহজে পৃথক করিয়া চেনা যায় "শিবমার্গী" ও বুদ্ধমার্গী" এই দুইটি বাক্যের দ্বারা। নেপালী বৌদ্ধগণ নিজেদের "বুদ্ধমার্গী" বলিয়া পরিচয় দেয় এবং হিন্দুদিগকে তাহারা "শিবমার্গী" বলিয়া উল্লেখ করে। অর্থাৎ, নেপালে যেন একটি ধর্মই বিদ্যমান যাহার দুইটি শাখা—এক "শিবমার্গী", অন্য "বুদ্ধমার্গী"।

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কিরূপ সমন্বয় হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেওয়া যাইতেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, একই দেবমূর্তিকে নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধরা বিভিন্ন নামে পূজা করিতেছে। নেপালী বৌদ্ধরা যাঁহাকে অবলোকিতেশ্বর বলিয়া পূজা করে—হিন্দুরা সেই মূর্তিকেই মহাদেব বলিয়া তাঁহার চরণে বিল্বদল দিয়া পূজা করিতেছে। মৎস্যেন্দ্র-নাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের জাগ্রত দেবতা। মৎস্যেন্দ্র-নাথ ভগবান বুদ্ধ পদ্মপাণির অবতার বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা নেপালে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্র-

নেপালের বৌদ্ধমন্দির বোধনাথ

দায়েরই একটি বিশেষ উৎসব। নেপালের প্রধানমন্ত্রীও এই রথ-যাত্রা উৎসবে যোগদান করেন। মহাকাল মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই পূজা দিয়া থাকেন। মন্দিরস্থিত মূর্তিটি নিঃসন্দেহ অমিতাভ বুদ্ধমূর্তি হইলেও হিন্দুরা ইঁহাকে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করে। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটি অতি প্রাচীন কীর্তি। কিন্তু এই মন্দিরে বৌদ্ধগণ শীতলা দেবীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির ও বোধমন্দির যদিও তিব্বতের দালাইলামার অধীন তথাপি এই দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের সংস্কারকার্য্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় করিয়া থাকেন। নেপালী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর সম্মুখে পশুবলি দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুমন্দিরে গিয়া তাহারা তথাকার দেবদেবীর উদ্দেশ্যে হিন্দুদের মতই পশুবলি প্রদান করে।

নেপালের বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সংমিশ্রিত ও বিকৃত রূপ দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, নেপালের বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে লোপ পাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত হইয়া নেপালের বৌদ্ধধর্ম এক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের এই মিশ্রিত রূপ দর্শন করিয়া অনেকে অবশ্য নেপালে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির আশঙ্কা করিয়া-

হেন কিন্তু তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। যত দিন স্বয়ম্ভূনাথ, বোধনাথ প্রভৃতি মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় প্রভুবুদ্ধের করুণাপূর্ণ আঁখি অঙ্কিত থাকিবে, যত দিন তাহা মাঝে মাঝে সংবৃত হইয়া নবরূপ ধারণ করিবে, যত দিন পৃথিবীর চল্লিশ কোটি বৌদ্ধ নরনারী লুম্বিনী, সারনাথ প্রভৃতির নাম স্মরণ রাখিবে, তত দিন নেপালে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি হইবে না।

'উর্ব্বশী' ও 'বিজয়িনী'

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্ব্বশী ও বিজয়িনী কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যে সৌন্দর্য্যবোধের তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বটি কবি কোন অভিনবত্বে আমাদের জ্ঞানগম্য করেন নাই, পরন্তু যে সত্য আমাদের মনোধর্ম্মে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, কবি তাঁহার রসচেতনায় তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কাছে নিবেদন করিয়াছেন। জীবন-ধর্ম্মের সহিত যোগ থাকায় তত্ত্ব বিষয়টি যেমন এক দিকে বিশ্বব্যাপী সত্যের মর্য্যাদা পাইয়াছে, অপর দিকে ইহা স্বতঃই কবিতার মধ্য দিয়া সহজ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

উর্ব্বশী কি, তাহা বলিতে গিয়া কবি প্রথমেই নেতিবাচক শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে পরিচয়গুলির মধ্যে আমরা প্রেমকে সৌন্দর্য্যকে সবচেয়ে নিবিড় ও গভীর ভাবে লাভ করিতে পারি, সে সকলের উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, উর্ব্বশীকে এ সকল পরিচয়ের মধ্যে বাঁধা যায় না, উর্ব্বশী এই নিবিড় আত্মীয়তার পরিচয়কে ছাড়াইয়া যায়। মাতা, কন্যা, বধূ প্রভৃতি যাহাদের আমরা পরিচয়ডোরে বাঁধি, তাঁহাদের আমরা একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করি। তাঁহারা একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া থাকে। কিন্তু উর্ব্বশী যেন আপনার একটি স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া জননীর স্নেহ, কন্যার সেবা, বধূর প্রেম এ সকলকে ছাড়াইয়া একটি মহাব্যাপ্তি লাভ করিয়া আছে। তাহাকে কোন বিশেষ পরিচয়ে ধরিতে গেলে তাহাকে যেন স্বরূপে ধরা যায় না। তাই উর্ব্বশীকে নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া কবি প্রথমে "ইহা নহে" "ইহা নহে" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ 'উর্ব্বশী' কবিতার মধ্যে উর্ব্বশী কি কবি তাহা আভাসে ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি শুধু উর্ব্বশীর প্রকৃতি, উর্ব্বশীর আবেদন ও তাহার ক্রিয়া বর্ণনা করিয়া উর্ব্বশী সম্বন্ধে একটি ধারণা দিতে চাহিয়াছেন মাত্র। কবিতাটি আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, বাস্তবিকপক্ষে নানা আভাসে, ইঙ্গিতে একটি ধারণামাত্র দেওয়া চলিতে পারে, উর্ব্বশী কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা সুকঠিন। ইহা জীবন-বোধের বিষয়, সৌভাগ্য থাকিলে ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহাকে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার।

এই উর্ব্বশীর প্রতিষ্ঠা কোথায়?—কবি বলিলেন,

> গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
> তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জাল সন্ধ্যা-দীপখানি
> দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
> স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
> স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।

কবি আমাদের জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত মধুরতম দুইটি পরিবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা কুটীর-খানিতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও শান্তি সন্নিবেশিত রহিয়াছে, আর প্রিয়মিলনাশ্বাসে প্রতিশ্রুত বাসর-শয্যাটি তাহার বিশেষ মোহমদিরতা লইয়া আমাদিগকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং আকাঙ্ক্ষিত এই পরিবেশের মধ্যে উর্ব্বশী ধরা দেয় না। জীবনে উর্ব্বশীর যখন আবির্ভাব হয় তখন সহসা আমাদের জীবনের সহিত তাহার নিগূঢ় সংযোগটি খুঁজিয়া পাই না, জীবনের মধ্যে তাহাকে সহজ পরিচয়ে মিলাইয়া লইতে পারি না। একটা অভাবনীয়তা লইয়া অপরিচিতার পরিচয়ে আমাদের চেতনাকে সে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন দেখি—

> উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা—
> তুমি অকুণ্ঠিতা।

জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ খুঁজিয়া পাই না। অথচ "উষার উদয়সম" এমনি সহজে এমনি মহিমায়, কোন আবরণ কোন কুণ্ঠা না রাখিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে যে, তাহাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের চেতনাকে এই উর্ব্বশী যখনই স্পর্শ করিয়া যায় তখনই তাহাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হয়। এ আত্ম-প্রকাশের ইতিহাস নাই, কোন ক্রমবিকাশের ধারা নাই, "বৃন্তহীন পুষ্পসম" এ আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

অথচ কবি জীবনের মধ্যে ইহার স্বীকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারিলেন না। তাহার জন্ত একটি লোকাতীত পট-ভূমিকা সৃষ্টি করিয়া উর্ব্বশীর আবির্ভাবটি বুঝাইতে চাহি-লেন। আমাদের পুরাণে যে উর্ব্বশীর আবির্ভাবের কথা বলা

হইয়াছে, কবি তাহার সহিত এই উর্ব্বশীর উপমা দিলেন। এখানে সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুরাণের উর্ব্বশী আর কবির উর্ব্বশী এক নয়। পুরাণের উর্ব্বশী একটি অলৌকিক কাহিনীর নায়িকামাত্র এবং কবির উর্ব্বশী সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব-স্বরূপা, ভাব-স্বরূপা। পুরাণের উর্ব্বশীর মধ্যে যদি এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে তাহা আমাদের দ্বারাই আরোপিত, পুরাণকার সে অর্থে উর্ব্বশীর পরিকল্পনা করেন নাই। কয়েকটি কারণে পুরাণের উর্ব্বশীর সহিত কবি এই উর্ব্বশীর উপমা দিয়াছেন। পুরাণের উর্ব্বশী কাহারও সহিত সম্পর্কিত নয়, তাহার মধ্যে সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, তাহার নৃত্যগীতে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রকাশ এবং তাহার এক হাতে সুধাপাত্র অন্য হাতে বিষ-ভাণ্ড। কিন্তু এই কারণগুলিও বাহ্য, মূল কারণটি হইল রসসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। ইহার কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।

কবি বলিতেছেন, উর্ব্বশী যখন আবির্ভূতা হয়, তখন সে আপনার মধ্যেই আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় লইয়া আসে। এক দিন এক অনুকূল মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন-সাগর মন্থিত করিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন আমাদের চেতনায় একটি নূতন বোধ জাগিয়া উঠে, তাহা উর্ব্বশী-বোধ বা সৌন্দর্য্য-বোধ। এই সৌন্দর্য্যকে আমরা উর্ব্বশীরূপে মূর্ত্ত দেখি, সেইরূপ আমাদের মধ্যে প্রথম যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি জাগাইয়া দিয়া যায়, তাহাতেই আমাদের চেতনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই উর্ব্বশীর এক হাতে রহিয়াছে সুধাপাত্র—সে আমাদিগকে আনন্দ দেয়, আমাদের প্রেমকে প্রবুদ্ধ করে। ইহাই তাহার সুধা। তাহার আর এক হাতে রহিয়াছে বিষভাণ্ড—তাহাকে লাভ করিতে আমরা বাসনা-ব্যাকুল হইয়া উঠি, বিক্ষুব্ধ হই, বেদনা পাই। ইহাই তাহার বিষ। এই হাসি-অশ্রু, পাওয়া-না-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, সুধা ও বিষের ক্রিয়া একই সঙ্গে চলিতে থাকে এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যবোধে লীলায়িত হইয়া উঠে। আমাদের চেতনাকে এই উর্ব্বশী যেদিন স্পর্শ করিয়া যায়, সেই দিনই তাহাকে প্রথম দেখি এবং পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখি। তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই, তাহা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পরিচিত হয় না—

"যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনগঠিতা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা,"

ই সৌন্দর্য্যবোধ বিশ্বের সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। তাইজন্য—

> যুগযুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
> হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী।

এই সৌন্দর্য্য-সত্তাকে মুনিগণ নিরঞ্জন মূর্ত্তিতে ধ্যান করেন, আর যখনই তাহাকে রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখেন, তখনই তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তখন রূপের মধ্যে তাঁহাদের আরাধ্যকে দেখিয়া তাঁহারা পূর্ব্বের তপস্যাকে তুচ্ছ করেন। সৌন্দর্য্য-সত্তার নিরঞ্জন মূর্ত্তি ঋষিদের ধ্যানের বিষয়, আর তার রঞ্জনমূর্ত্তি মানব-সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সৌন্দর্য্য-সত্তার এই রঞ্জনমূর্ত্তিকেই কবি উর্ব্বশী বলিয়াছেন, যে উর্ব্বশী ডান হাতে সুধাপাত্র ও বাম হাতে বিষভাণ্ড লইয়া একদা আমাদের জীবন-সাগর মথিত করিয়া আবির্ভূতা হয়। তাহার স্পর্শে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল হইয়া উঠে, রসিকচিত্তকে তাহা লুব্ধ করে, সঙ্গীতমুখর করে। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য লইয়া সেই আকুলাকুলা যখন মায়া বিস্তার করিয়া যায়, তখন নিখিল বিশ্ব তাহাকে অনুসরণ করে।

এই রঞ্জনমূর্ত্তিতে উর্ব্বশী যখন আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করে তখন তাহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য-স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়:

> সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
> হে বিলোলহিল্লোল উর্ব্বশী,
> ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল—
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল
> তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা
> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
> নাচে রক্তধারা
> দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
> অয়ি অসম্বৃতে।

এই সৌন্দর্য্য-স্ফুরণে পুরুষের চিত্ত, অর্থাৎ রসিকের চিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া সে আত্মহারা হইয়া যায়। এই যে বিশ্বজগতে বিভিন্ন রূপের মধ্যে কান্তির দ্যোতনা, ইহা উর্ব্বশীর বিভিন্ন প্রকাশলীলা মাত্র। এই বহুর মধ্যে কবি যে একক ভাব-মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহাই কবির উর্ব্বশী।

এইখানে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। কবি যদি বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য-সত্তাকে অরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে ইহা কাব্যের বিষয় না হইয়া দার্শনিক আলোচনায় পর্য্যবসিত হইত এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহা অদেহী, যাহা বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহাকেই রঞ্জনমূর্ত্তিতে পরিচিত করিতে চাহিয়া কবি এক দিকে যেমন বিষয়টিকে বোধের বিষয়, তথা কাব্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই ইহাকে আভাসে ইঙ্গিতে রাখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রঞ্জনমূর্ত্তিতে প্রকাশিত এই উর্ব্বশী কিরূপ? সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের যে আন্দোলন, দক্ষিণ বাতাসে শস্যশীর্ষের যে শিহরণ, নভস্তলে তারকার যে স্পন্দন, অস্তরবির বর্ণচ্ছটায় দিগন্তে সহসা যে সৌন্দর্য্যোদ্ভাসন,—ইহাদের মধ্যে উর্ব্বশীর রূপ-জ্যোতিটি বিকীর্ণ হইতেছে। এগুলির মধ্য দিয়া আমরা ক্ষণে ক্ষণে

উর্ব্বশীর আভাস পাই, এগুলি উর্ব্বশীর সত্তাকে প্রমাণিত করে, পরিচিত করে। কিন্তু উর্ব্বশীর স্বরূপ কি? এই খণ্ড বিভিন্ন সৌন্দর্য্য-উৎসগুলি হইতে যে লাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে তাহার সত্তা কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোন্ পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে বিকশিত, কোন্ সাধনায় তাহা লভ্য?

কবি একটি অনুচ্ছেদে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন। ইহাতেই বিষয়বস্তুটি ব্যক্ত হইয়াছে। কবির উত্তরটি জীবন-বোধ হইতে সঞ্জাত বলিয়া ইহা বুঝিবার জন্যও গভীর বোধের প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদটি গভীর অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা-ময়। যদি আমরা বোধ দিয়া এই উত্তরটি ধরিতে না পারি তবে বিচার-তর্কের দ্বারা কখনও ইহা বুঝিতে সক্ষম হইব না। কবিগুরু এখানে উত্তরটি আমাদের বোধের উপর ছাড়িয়া দিয়া সুমহান্ কবি-কৃতি দেখাইয়াছেন। বিষয়টি বুঝিবার পূর্ব্বে প্রশ্নগুলিকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া যাক্।

আমরা বিশ্বজগতে রূপের মধ্যে কান্তির যে প্রকাশ দেখি তাহা আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আমাদের চেতনার বিকাশে আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি গড়িয়া উঠে। যাহার চেতনার বিকাশ হয় নাই তাহার সৌন্দর্য্যবোধ নাই। সে বিশ্বজগতে রূপকে অতিশয় স্থূলভাবে দেখে, রূপের অন্তঃস্থিত কান্তিকে সে দেখিতে পায় না। রূপ হইল চোখের দেখা, কান্তি হইল মনের দেখা; এই মনোবিকাশ যাহার হয় নাই, পৃথিবী তাহার কাছে রূপের জড়পিণ্ড মাত্র। এক উচ্চতর মানসিকতায় আমাদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-বোধটি জাগিয়া উঠে। তখন আমরা বিভিন্ন রূপের মধ্যে কান্তির জোছনা দেখিতে পাই। উর্ব্বশীর আবির্ভাব আমাদের জীবনে এই সৌন্দর্য্য-বোধের আবির্ভাব। আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের চেতনাকে এক দিন সহসা স্পর্শ করিয়া যায়, আমরা রূপজগতে কান্তির মধ্যে জাগিয়া উঠি। তখন আমাদের নয়ন-সম্মুখে কান্তির দ্যুতি খেলিয়া যায় এবং বিশ্বজগৎ এই কান্তিতে পরিব্যাপ্ত দেখি। এখানে কান্তি একটা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া' হিসাবে আমাদের বোধে অনুভূত হয়, ইহা বিচার-বুদ্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—"এক হিসাবে সৌন্দর্য্যমাত্রই অ্যাবস্ট্রাক্ট; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস-সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্ব্বশী তাহারই প্রতীক। এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন ক'রে এই সৌন্দর্য্য, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহ আছে।"

উর্ব্বশী-কল্পনায় মধ্য দিয়া প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে চান। পৌরাণিক উর্ব্বশীর মধ্যে পুরাণকার এই তত্ত্বটি সন্নিবেশিত করেন নাই, রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীর মধ্য দিয়া সেই তত্ত্বটিকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। উর্ব্বশী যতক্ষণ পৌরাণিক উর্ব্বশী ততক্ষণ, "উর্ব্বশীতে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দেহধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়"। ততক্ষণ উর্ব্বশী নারীর দেহ—সৌন্দর্য্যেরই পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে দিয়া কান্তির উপযুক্ত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যদি 'বর্গীয়' মূর্ত্তিটির মধ্য দিয়া তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত না করিতেন তবে বিষয়টির কোন কাব্যস্ফূর্ত্তি থাকিত না। কাব্যের বিষয় আমাদের রসচেতনাকে স্পর্শ করিবার অপেক্ষা রাখে, নতুবা তাহা আমাদের বোধে সঞ্চারিত হয় না। পৌরাণিক উর্ব্বশীর উল্লেখমাত্রেই আমাদের রসলোকের ভূমি প্রস্তুত হইয়া যায়, আমাদের মন একটি মোহ, একটি বাসনার মধ্য দিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়ে—সক্রিয় হইয়া উঠে। আমাদের চিত্তকে এই সচেতনতা দিবার জন্যই কবি কৌশলে উর্ব্বশী-মূর্ত্তির আশ্রয় লইয়াছেন। এই যে সচেতনতা ইহা আমরা আমাদের জীবন-বোধ হইতে গ্রহণ করি। এই জীবন-বোধের ভূমিকায় কাব্যের রস আমাদের মধ্যে সহজে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই পৌরাণিক উর্ব্বশী-মূর্ত্তি যাহা কবি "নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক" বলিয়াছেন, ইহা কবির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

যদি কান্তিকে বুঝাইতে গিয়া কবি কান্তির আধারটিকেই বুঝাইতেন তাহা হইলে পৌরাণিক উর্ব্বশীর বর্ণনায় কবিতাটির সমাপ্তি ঘটিত, কিন্তু যে আধারের মধ্যে কান্তির প্রকাশ, সেই আধারই কান্তির চরম পরিচয় নয়। কারণ আধার সীমাবদ্ধ, কান্তি একটা অসীম ভাব-সত্তা। তাই কবি ইহাকে কোন সীমায় পরিচয়ে চরম করিয়া বাঁধিতে পারিলেন না। বলিলেন —নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ। আবার পৌরাণিক উর্ব্বশীমূর্ত্তি কবির উর্ব্বশীর কাল্পনিক আধার মাত্র। কিন্তু ঐ পৌরাণিক উর্ব্বশী-পাত্রের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যসত্তার প্রকাশ তাহা ত কোনও তনুর সীমায় বদ্ধ নহে, তাহার মধ্যে ত কোন স্থূলতা নাই—তাহাকে আমরা রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখি বটে, কিন্তু তার চরম সত্য ত রূপের মধ্যে নাই। রূপ তাহার প্রকাশের আধার মাত্র। আকাশের মাধ্যমে যেমন আলোর প্রকাশ, আলোর রহস্য আমরা জানি না; তেমনি রূপের মাধ্যমে কান্তির প্রকাশ, কান্তির রহস্য আমাদের অনধিগম্য। রূপের মধ্যে রহস্যময়তা নাই, রূপের মধ্যে কান্তির যে দ্যোতনা, তাহাতেই রহস্যময়তা রহিয়াছে। কান্তির এই রহস্যময়তার কথাই বলিতে গিয়া কবি দ্বিতীয় বার উর্ব্বশীর বর্ণনা করিলেন। ইহার সহিত প্রথম বর্ণনার বিরোধ রহিল না, পরন্তু পৌরাণিক উর্ব্বশীকেই কবি এই সংযোজনটুকুর দ্বারা আপনার উর্ব্বশী করিয়া লইলেন। সংযোজনাটুকু এইরূপ:

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার—
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী।

কবি বলিলেন, উর্ব্বশী যেখানে মূর্ত্তিমতী, সে স্থান আমাদের এই লৌকিক জগতে নয়, তাহার পরিবেশ অলৌকিক, তাহা স্বর্গের উদয়াচলে, তাহা আমাদের একটি কল্পনার রাজ্য। এই রহস্যলোকে রহস্যময়ী উর্ব্বশী মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি কিরূপ? তাহা তনু নয়, তাহা তনুর তনিমা, তাহার মধ্যে তনুর একটি সূক্ষ্ম ভাব যেন রহিয়াছে মাত্র, তনুর স্থূলতা নাই। আমরা রূপজগতে তনুর মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখি, তাই তনুর ভাবেই তাহাকে ধারণা করিতে পারি। উর্ব্বশীর মধ্যে তাই তনুর যেন ভাব রহিয়াছে—তনু নাই। তাহার চরণও যেন কল্পনায় আসে না, চরণ-শোণিমাটি আমরা অনুভব করিতে পারি মাত্র। উর্ব্বশীমূর্ত্তির এই দুইটি ইঙ্গিত মাত্র কবি দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক বর্ণনা তিনি দেন নাই। কারণ উর্ব্বশী বর্ণনার অতীত, কোন রূপের বর্ণনাতেই সেই ভাব-সত্তাটিকে ধরিতে পারা যায় না। আরও দুইটি কথা কবি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'মুক্তবেণী' ও 'বিবসনে'। মুক্তবেণী অর্থে বুঝায়, যে সৌন্দর্য্যোপকরণ দ্বারা এই সৌন্দর্য্য-সত্তা গঠিত, তাহা সহজ এবং মুক্ত। তাহাতে জটিলতা বা বদ্ধতা নাই। 'বিবসনা' কথায় বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ উন্মুক্ত, কোন আবরণে সে আপনাকে গোপন করে নাই।

এই তনিমা ও চরণ-শোণিমা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে? কবি বলিলেন, "জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা।" উর্ব্বশীর তনিমা বিশ্বের অশ্রুধারায় ধৌত, তাহার চরণ-শোণিমা নিখিলের হৃদিরক্তে আঁকা—আমাদের অশ্রু, আমাদের হৃদিরক্তই উর্ব্বশী-মূর্ত্তির উপাদান। অর্থাৎ, ইহা আমাদের বোধ-সঞ্জাত। রূপের মধ্যে সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ যখন দেখি তখন আমাদের অশ্রু রূপের মধ্য হইতে সেই রূপাতীতকে গড়িয়া তোলে, এই সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে আমাদের হৃদয় হইতে যত রক্ত ক্ষরিত হয় আমাদের কল্পলোকে ততই তাহার চরণখানি অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। আনন্দের বেদনায় আমাদের অশ্রুর নির্গমন, পাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় আমাদের হৃদিরক্তের ক্ষরণ। এই আনন্দ-বেদনাতেই যাহা দেহহীন সৌন্দর্য্য-সত্তামাত্র ছিল, তাহাতে যেন দেহের ভাব উপলব্ধি করি, এই হৃদিরক্তের ক্ষরণেই যেন তাহার চরণের আভাস পাই। এইরূপে আমাদের বোধের মধ্য দিয়া রূপনিরপেক্ষ একটি কান্তিমূর্ত্তি রঞ্জিত হইয়া উঠে। অরূপ সত্তাটি রূপের মধ্য দিয়া আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে এবং আমাদের বোধ তাহাকে একটি রূপের ভাবে কল্পলোকে মূর্ত্তিতে গড়িয়া তোলে। ইহাই উর্ব্বশীর রঞ্জনমূর্ত্তি। এই রঞ্জনমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার বিষয় নয়, বর্ণনা করিবার উপাদান ইহাতে নাই, শুধু যাহার অশ্রুধারায় ও হৃদিরক্তে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই একান্ত উপলব্ধির বিষয়; যাহারই বাসনা বিকশিত হইয়াছে, সে-ই এই উর্ব্বশীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের বিকশিত বাসনার কাছেই রূপসৌন্দর্য্য আপনাকে নিবেদন করে। সেই বিকশিত বাসনা-পদ্মের উপর উর্ব্বশী তাহার 'অতিলঘুভার' চরণখানি রাখিয়াছে। তাহার চরণ অতিলঘুভার, ইহাতে তনুর স্থূলতা নাই। আমাদের কল্পলোকে বাসনা-পদ্মের আসনে অশ্রু-ধারায় এবং হৃদয়ের রক্তক্ষরণে মূর্ত্তিমতী এই উর্ব্বশী বিরাজ করিতেছে—সে আমাদের নিত্য স্বপ্নসঙ্গিনী।

ইহার পর কবি বলিলেন, এই যে উর্ব্বশীবোধ, যাহা আমাদের জীবনে এক অনুকূল মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। যে রূপের মধ্যে একবার তাহার আবির্ভাব আর তাহাকে সেখানে খুঁজিয়া পাই না। সে আমাদের মধ্যে বিপুল আনন্দ, অপার বাসনা জাগাইয়া দিয়া যায়, কিন্তু তাহাকে আর খুঁজিয়া পাই না, রূপের মধ্যে তাহাকে পুনরায় ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসি। তাহারই বাসনায় বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিয়া ফিরি, একান্তভাবে তাহাকে আশা করি, কিন্তু তাহাকে পাই না। আমাদের সেই একান্ত বাঞ্ছিত উর্ব্বশীর সহিত একটি চিরকালের বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যায়। তাই জগতে রূপের মধ্যে যেখানে যত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, সে সবই সেই উর্ব্বশীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। খণ্ডিত সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অখণ্ড সৌন্দর্য্যের প্রতি তৃষ্ণার্ত্ত ব্যাকুল করিয়া রাখে। তাহাকে পাই না, কিন্তু তাহার জন্য আশা আমাদের জীবনের যাত্রা-টিকে গতিশীল করিয়া রাখে।

পরিশেষে উর্ব্বশী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির আলো-চনা করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful, এক ভাগে The Good পড়ে।' উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে, 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে' দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। উর্ব্বশী কবিতার আলোচনায় এই উক্তিটির তাৎপর্য্য সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য যখন ধরাছোঁয়ার অতীত একটা সত্তা তখন তাহার মধ্যে ভালমন্দ বিভাগ নাই। ভালমন্দ বিভাগ মনুষ্যকৃত আদর্শের অনুযায়ী। ভালর আদর্শে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহাই লক্ষ্মীরূপে আমাদের কল্পনায় মূর্ত্ত হইয়াছে।

রাছে। নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তা ভালমন্দ বিচারের অতীত। আমাদের জীবনে আগে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহার পর তাহাতে মঙ্গলাদর্শের প্রতিষ্ঠা। এই সৌন্দর্য্য-বোধে তাই ভালমন্দ, সুখদুঃখ, সুধা ও বিষ একত্র সমন্বিত হইয়া আছে। চিত্রার রবীন্দ্রনাথ যে উর্ব্বশীর কথা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা'র উর্ব্বশী ও লক্ষ্মীর একটা তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তখন উর্ব্বশীর এই পৌর্ব্বিকতা (priority) রক্ষা করেন নাই। তখন লক্ষ্মীর মানদণ্ডে উর্ব্বশীকে মাপিতে গিয়া উর্ব্বশীর অর্থ সংকীর্ণ করিয়াছেন। বলাকার রবীন্দ্রনাথ যে উর্ব্বশীর কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পুরাণের উর্ব্বশী—

একজন তপোভঙ্গ করি—
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি'—
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ এ উর্ব্বশী তারই প্রতীক। কিন্তু ইহার মধ্যে নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তার তত্ত্ব নাই। চিত্রার উর্ব্বশীর মধ্যেও এ গুণগুলি রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও অতিরিক্ত একটা ব্যাপকতা রহিয়াছে, তাহা সেই সংযোজনাটুকুর ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি।

তাহা হইলে বলাকার উর্ব্বশী যেমন নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক, চিত্রার উর্ব্বশী তত্ত্ব-স্বরূপা, ভাব-স্বরূপা বলিয়া তাহাকে কেবল মাত্র নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কবি কাব্যের প্রয়োজনে পৌরাণিক নারী-মূর্ত্তির সাহায্য লইয়াছেন। কোন পৌরাণিক পুরুষ-মূর্ত্তির কল্পনাতেও কবি কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতে পারিতেন, অন্ততঃ কোন পাঠিকা সেই ভাবে কবিতাটি বুঝিতে চাহিলে, তাহার কিছুমাত্র ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি তাহার মধ্য দিয়া একই তত্ত্বে গিয়া পৌঁছাইবেন।

বিজয়িনী কবিতাতেও কবি এই নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর পরিবেশে উর্ব্বশী-বোধের যে ভাবঘন ব্যঞ্জনাই সৃষ্টি হইতে পারে বিজয়িনী কবিতায় তাহারই কাব্যিক অনুবাদ দিয়াছেন। আমাদের জীবনে যে একটি অনুকূল মুহূর্ত্তে উর্ব্বশী-বোধ জাগিয়া উঠে, তেমনই একটি ক্ষণকে কবি এই কবিতায় ধরিয়াছেন। এখানেও কবি বিজয়িনীর কোন বর্ণনা দেন নাই—যে পরিবেশের মধ্যে বিজয়িনী আপনাকে প্রকাশ করে সেই পরিবেশের কথাই বলিয়াছেন। অথচ এত নৈপুণ্যের সহিত পরিবেশটি বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়িনীর রঞ্জিত মূর্ত্তি যেন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই।

উর্ব্বশী-বোধের সময় আমাদের জীবনে প্রথম যেমন প্রেমানুভূতির অনুকূল মুহূর্ত্তের আবির্ভাব হয়, বিজয়িনী যখন স্নানে আসিতেছিল, তখনও পৃথিবীতে একটি অনুকূল মুহূর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যে দিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সে দিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া—
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া—
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি।

উর্ব্বশী কবিতায় বক্তব্যটি রসোত্তীর্ণ করিবার জন্য কবি যেমন পৌরাণিক উর্ব্বশী-মূর্ত্তির সাহায্য লইয়াছেন, এখানেও তেমনি স্নানার্থিনীর উল্লেখ করিয়া আমাদের মনের রস-ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন। তরুণী নারীর স্নানলীলার উল্লেখে আমাদের চিত্ত যে সৌন্দর্য্য-রসে ও বাসনায় আপ্লুত হইয়া উঠে তাতেই কবির বক্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়। আমাদের চিত্তের এই ক্রিয়াটিতেই কবির বক্তব্যটি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয়িনী যে সৌন্দর্য্য-শ্রেষ্ঠা, সে যে আমাদের কামনা-বাসনার কেন্দ্র—কত সহজে, নিপুণতার সহিত কবি সেই সত্যটিকে আমাদের বোধগোচর করিয়া দিয়াছেন।

ইহার পর কবি প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করিয়াছেন। উর্ব্বশী-বোধের সময় আমরা পৃথিবীর যে নূতন, মধুর পরিবেশের মধ্যে, যে কান্তি-জগতের মধ্যে জাগিয়া উঠি, ইহা সেই পরিবেশ। ঐ অনুচ্ছেদটিতে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে কবি কান্তিময় পৃথিবীর পরিচয় দিয়াছেন। উর্ব্বশী-বোধের সময়েই রূপ-জগতের মধ্যে এই কান্তির জগৎটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য-বোধ যখন আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন বিশ্বে চতুর্দ্দিকে যেন মধুর রাগিণী ধ্বনিত হইতে দেখি; তখন পৃথিবীতে যে-সকল রূপবস্তুকে এক দিন সামান্য বলিয়া, সাধারণ বলিয়া দেখিতেছিলাম, তাহারা একটি নূতন পরিচয় লইয়া আসে, তাহাদের মধ্যে একটা তাৎপর্য্য, একটা সার্থকতা দেখিতে পাই। তখন সেই বসন্ত-দিনের প্রভাতটিতে শুধু স্থূল রূপই দেখি না, কত স্পন্দন-কম্পন, কত নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস, কত ভাব-আভাস ধরা পড়ে, এ সকলই রূপের অন্তঃস্থিত একটি ভাব-সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে। এই সৌন্দর্য্যবোধের পূর্ব্বে বসন্তকালে শুধু রূপই দেখিয়াছিলাম, এখন রূপের অন্তঃস্থিত ভাবের স্ফুরণ দেখিলাম। দেখিলাম ছায়া ও রৌদ্রকর, অরণ্যের সুপ্তি এবং পাতার মর্ম্মর; অর্থাৎ আলো এবং অন্ধকার, স্তব্ধতা এবং মুখরতা উভয়ের সহিত এই উপকরণগুলি মিশিয়া রূপ-জগতের মধ্যে যেন একটা ভাবের কাহিনী রচনা করিয়া চলিতেছে। আজ যেন আকাশের আলো বেদনার সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিতেছে। এমনই বিভিন্ন রূপবস্তু হইতে একটা ভাব, একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে এবং

সকলেই পরস্পরের সহিত একটি সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই পৃথিবীর পরিবেশে সুবিন্যস্ত হইয়া আছে। পুষ্পের নিঃশব্দ বৃন্তচ্যুতি, কোকিলের বিকল কাকলি, ঝিঁঝিঁর কল-নৃত্য, সারসের মধুর শ্রুতিভঙ্গিমা, বলাকার চঞ্চল গতি, বনগন্ধ-বহ শ্রান্ত বায়ুর উতল প্রবাহ—এ সকল বিভিন্ন রূপ যেন ছন্দমিল রক্ষা করিয়া একটি অর্থপূর্ণ সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে মদন-দেবতা যখন ভোগে বাঁধিতে গেল, তখন সে পরাস্ত হইল। এই বিজয়িনী ত ভোগের সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, এই সৌন্দর্য্যসত্তা যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ-মান—ভোগে ইহাকে সীমার মধ্যে চরম করিয়া পাইবে কেমন করিয়া। রূপের মধ্যে ইহার প্রকাশ দেখিয়া আমরা রূপকে ধরিতে চাই, ইহাতে শুধু রূপের দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া মরি মাত্র, কান্তিকে বাহুবন্ধনের মধ্যে ধরিতে পারি না। কান্তি আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া, আমাদিগকে বাসনা-চঞ্চল করিয়া তোলে, আমাদের মধ্যে অভিনব উপলব্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু কান্তিকে উপলব্ধিই করা যায়, তাহাকে ভোগ করা যায় না। ভোগের জন্য আমরা তাহার আধারটিকে মুঠির ভিতর চাপিয়া ধরি—বাসনা-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠি, আমাদের বোধটি ক্ষুণ্ণ হয়, কান্তি অন্তর্ধান করে। কান্তির সহিত আমরা এই উপলব্ধির সম্পর্কটি পাতাইতে পারি মাত্র—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের যেখানে প্রকাশ, অন্তরের স্বীকৃতি দ্বারা তাহাকে প্রণাম জানাইতে পারি মাত্র—ভোজ্য ও ভোক্তার সম্পর্ক সেখানে থাকিতে পারে না। ইহা একটি সূক্ষ্ম মানসিক ভোগ মাত্র, স্থূল দেহগত ভোগ নহে—দেহের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। মদন-দেবও সৌন্দর্য্য-সত্তার কাছে প্রণাম জানাইয়াছেন—ইহাই সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য-রসিকের যথার্থ সম্পর্ক। রূপের মাধ্যমে যেখানেই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মদন সেখানেই ভোগলিপ্স। কিন্তু যে কান্তি-সত্তা উপলব্ধির বিষয়, কবি মদনকেও সেখানে প্রণত করিয়াছেন।

ফাল্গুন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহান মোহন—পুষ্পাভরণে সজ্জা করিয়া এস,
বিচিত্রতার চিত্র-বিভবে চিত্ত ভরিয়া এস।
শীতের কুহেলি কাটিয়া গিয়াছে, আকাশ সুনির্ম্মল,
এস প্রফুল্ল ফাল্গুন, এস স্থলে জলে উচ্ছল।

কে জানে কখন বহিবে দখিনা অরণ্যাতের কূলে,
সারা অরণ্যে শিহর লাগিবে, ছন্দ উঠিবে দুলে,
হৃদয়-নদীতে কলধ্বনিতে বহিবে স্রোতের ধারা,
জাগিবে জীবন, চারি দিক পানে চাহিবে আত্মহারা।

তুমি কি আসিবে, চাহিবে আবার শ্যামল দু-আঁখি তুলে?
ভুলে-যাওয়া কথা কল-গুঞ্জনে বলিবে আবার ভুলে?
সুরের মতন শুনে যাব শুধু, কে করে অর্থ তার!
দূরের বন্ধু নিকটে আসিবে, ছাড়িয়া যাবে না আর।

মাঘী পূর্ণিমা এসে কবে বুঝি চ'লে গেছে নাহি জানি,
সেদিন কি-ভুলে চাহিনি উর্দ্ধে, শুনিনি তোমার বাণী।
সেই বঞ্চিত মুহূর্ত্তগুলি অঞ্চলে ভরি' অয়ি,
এস সুদূরের বেদনার পারে চঞ্চলা মায়াময়ী!

এল ফাল্গুন, ফুলে ফুলে তাই কুঞ্জ ভরিয়া গেল,
বিচলিত যত শুষ্ক পত্র শূন্যে ঝরিয়া গেল।
বনে বনে সুরু বাতুল বায়ুর ব্যাকুল আন্দোলন,
কোন্ দেবতার রাতুল চরণে জীবনের নিবেদন।

ফুল-ফোটানোর সঙ্গীতে মেলে ঝরা-পত্রের গান,
যাওয়া ও আসার পদধ্বনিতে এ-পথ স্পন্দমান।
এস অশান্ত, এস বসন্ত, এস তুমি, দ্বারে দ্বারে
জীবনের বীণা বাজিয়া উঠুক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে।

ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শ্রীহরিহর শেঠ

পঙ্গুরও যেমন গিরি লঙ্ঘনের সাধ হয়, বামনের যেমন চাঁদে হাত দিবার ইচ্ছা হয়, আজ কতকটা আমার দশাও তাহাই। আমাদের দেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রসেবা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি এবং সরকারের দশ কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম নির্ব্বাচন উপলক্ষে সর্ব্বত্র যাহা হইতেছে, সংবাদপত্র মারফত অনেক বিষয়—অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার যাহা অবগত হইতেছি, রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য, রাষ্ট্রের উন্নয়ন-জন্য দেশসেবক নেতা অ-নেতাদের যে অক্লান্ত ছুটাছুটি ও অমানুষিক পরিশ্রম করিতে দেখিতেছি ও হয়ত বা অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিতেছেন বলিয়া অনুভবে আসিতেছে, তাহাতে উহা সামান্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের একটা অতি বৃহৎ সংস্করণ ভিন্ন আমার দৃষ্টিতে ত আর তেমন বেশী কিছু ঠেকিতেছে না। অতিরিক্ত যাহা পাইতেছি, তাহা আর কিছুই নহে—দেশব্যাপী উৎসাহী বিত্তক ও কপট দেশসেবকদের মধ্যে দুর্নীতি, অসাধুতা সংস্পর্শহীন খাঁটি লোকদিগকে বাছিয়া লইবার জন্য আইন প্রণয়ন দ্বারা একটা নূতন ব্যবস্থা।

কোথায় মনে করিয়াছিলাম, আয়োজনের বিরাট ব্যবস্থা ভিন্ন বৃহৎ ব্যাপারে নূতন ও অসাধারণ কিছু দেখিব। গাড়ী মোটর দিয়া করিয়া নির্ব্বাচকদিগকে আনার সঙ্গে এবার হয়ত বা নবীনতর প্লেনের ব্যবহার বা ঐ মত কিছু কিছু দেখিতে পাইব। কিন্তু মুখের স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বা দলবিশেষের মধ্যে বা উদ্দেশে স্পষ্ট কথা-কাটাকাটি, সত্য মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি নানা রকমের প্রচারকার্য্য চলিতে পারিলেও নির্ব্বাচকদিগকে সপক্ষে ভোট দিবার জন্য কোন আকারে অর্থদান ত দূরের কথা, প্রার্থী বা প্রার্থীর হইয়া অপরেরও নির্ব্বাচনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা গাড়ী মোটর করিয়া ভোটারকে ভোটদান কেন্দ্রে আনাও নিষিদ্ধ। পাছে কেহ অসাধু উদ্দেশ্যে একাধিকবার ভোট দিতে চেষ্টা করেন এইজন্য দেবতা-দানব নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই দাগিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও নূতন দেখিতেছি।

এক দিকে এই নির্ব্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধুম—প্রার্থী বা প্রার্থীদলের কথা বা প্রতিশ্রুতিমত নির্ব্বাচনের পর দেশমাতাকে অপরূপ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করার কল্পনা, অন্য দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রদ্বয়ের অযাচিত সাহায্যদানের আগ্রহ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই উভয়ের সমন্বয়ে না জানি অচিরে আমরা দেশমাতৃকার কি অপরূপ রূপই না দেখিব।

রূপক ছাড়িয়া বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা দেখা যাইতেছে তাহার কথা ভাবিয়া আমি বড়ই গোলে পড়িয়াছি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত, কোন কোন রাষ্ট্রবিশেষকে তাহার আর্থিক সাহায্য দানে আগ্রহ এবং দেয় সাহায্যের পরিমাণের বহরও তদ্রূপ। ভারতের প্রতি তাহার দরদী হৃদয়ের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। আজ কিছু দিন হইতে সংবাদপত্র ও রেডিও মারফত মার্কিন সরকারের আর এক প্রস্থ ভারত-প্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল তাহা কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। একটি চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়াছে, ভারতবর্ষকে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য প্রদান করা হইবে। উদ্দেশ্য—ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করা। ইহা অবশ্য নিতান্ত একতরফা নহে। বর্ত্তমান ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কিছু থাকিবে না।

এই চুক্তির পর কয় দিন না যাইতেই পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভারতস্থিত রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোল্স বুঝিতে পারিয়াছেন, উক্ত সাহায্যই যথেষ্ট নহে। তিনি বলিয়াছেন—গত চারি বৎসরে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে; তবে মন্থর গতিতে। আগামী চারি বৎসর তাহার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটময় হইবে। মিঃ বোল্সের মনে হয় এজন্য ভারতকে আর্থিক সাহায্য করা একান্তই প্রয়োজন, ভারতের পক্ষে এই সাহায্য একরূপ অপরিহার্য্য এবং যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা করিতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য বিমানযোগে নিউইয়র্ক পৌঁছিয়াছেন এবং তথায় তিনি আগামী চারি বৎসরে ভারতকে এক শত কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া সুপারিশ করিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য হয়ত তাঁহাদের দরদী প্রাণ এই সাহায্যও না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিবে না।

পূর্ব্বের পঁচিশ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্যের চুক্তির উদ্দেশ্য বর্ণনায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-

সরকার এবং মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে সংযুক্ত ভাবে কাজ করিতে, আবার বিশ্বশান্তি নষ্ট হইতে পারে এরূপ কোন কারণ দেখা দিলে, ভারতবর্ষ সেই অবস্থা দূরীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা লেখা থাকিলেও নয়া দিল্লীর ঘোষণা হইতে জানা যায় চুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কোন সর্ত নাই। হয়ত এই নূতন সাহায্যও এই ভাবের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা-বিবর্জিত কোন সর্তে গৃহীত হইবে।

এই নূতন মার্কিনী সাহায্য সম্পর্কে একটা রফা না হইতেই, ভারতস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ এন. ভি. নোভিকোভ্ বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক বৈঠকে সুস্পষ্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষকে যে-কোন যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সাজসজ্জা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং এই সমস্ত যন্ত্রশিল্পের মূল্য ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় মুদ্রায় (টাকায়) কিংবা অন্য যে-কোন "দুর্লভ মুদ্রা"য় দিতে পারেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের দেশের যে-কোন মাল কিনিতে পারেন এবং তাঁহাদের যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাও তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে রাজী আছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ একথাও শুনাইয়াছেন যে, রাশিয়াতে বেকার-সমস্যা নাই। সোভিয়েট সমাজনীতি এমন যে, উহার মধ্যে আর্থিক সঙ্কটের কোন স্থান নাই, তাঁহাদের যুদ্ধের বদলে শান্তি ও নির্বিঘ্নতাই প্রয়োজন।

যখন ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কলকারখানা ও শ্রম-শিল্পের প্রসার করিতে গিয়া নানা রকম বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন, যখন তাঁহারা একমাত্র আমেরিকার মুখের দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে দিন গণনা করিতেছেন, তখন এই অযাচিত প্রস্তাব নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এক দিকে ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া ভারতের উন্নতির জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, অন্য দিকে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের দেশের দৈন্য কোথায় তাহা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন এবং তাহা ঘুচাইবার জন্য স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া শুভ প্রস্তাব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। চুক্তি যদি হয়, জানি না হয়ত বড়জোর ইহার মধ্যেও বিশ্বের শান্তিরক্ষাকল্পে ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

আপাততঃ এই সব সাহায্যের পরও আশু প্রয়োজনীয় আর একটি বড় সাহায্যের স্থান পড়িয়া থাকে। সেটি আমাদের কৃষির উন্নতি বিষয়। নূতন চীনের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি যে অনুকরণীয় একথা হয়ত অনেকে বলিবেন। চীনের সহিত ভারতের প্রীতির সম্পর্কও বহু শতাব্দীর। ভারতে অনাবাদী জমির অভাব নাই। কেজানে ভারতের দরদে মহাপ্রাণ চীনের হৃদয়ও না এই সময় কাঁদিয়া উঠে। চীনের অর্থবল কিরূপ জানি না, তাহার জনবল চির-প্রসিদ্ধ। ভারতে সোনা ফলাইয়া অন্নের অভাব মিটাইবার জন্য তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সাহায্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যুগে যে নিজ লোকবল লইয়া ভারতভূমে না আগাইয়া আসিবেন তাহা কে বলিতে পারে।

ভারতের অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিবার পর তাহার সংস্কৃতির উন্নতি ও দেশরক্ষার কথা আসে। এককালে যেমন ইংরেজ 'অসভ্য' 'বর্ব্বর' ভারতকে সভ্য শিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন, তেমনি আজ গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে রাশিয়া হয়ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাই-বেন, আর দেশরক্ষার্থ অস্ত্র দিয়া ভারতকে রণসজ্জায় সাজাইবার কার্য্যে আমেরিকা আত্মনিয়োগ করিবেন।

যদি সত্যই আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের ভারত-প্রীতি-বশতঃ ভারতের সমৃদ্ধির জন্য সহসা একযোগে সাহায্যের একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় তাহা হইলে এত সুখ কি পোড়া ভারতের ভাগ্যে সহিবে? তখন তাহার চাপে ভারতের কি দশা হইতে পারে তাহাই আজিকার ভাবনা।

চিত্রল জাহাজ

পশ্চিম সমুদ্র-বক্ষে

শ্রীশেফালী নন্দী, এম-এ

৩১শে আগষ্ট ১৯৫১ সন, সকালবেলার সোনালী সূর্য্য রাঙা আলো ছড়িয়ে দিলে আরব সাগরের বক্ষে—ব্রীড়াময়ী নববধূর মত রক্তিম হয়ে উঠল তার মুখ। আমাদের চিত্রল জাহাজ সাড়ে সাত শত যাত্রীসহ অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাল। পাড়ের দিকে একবার চোখ পড়ল—অনেকেই রুমাল নাড়ছে জাহাজের বক্ষ থেকে, কেউ বা চোখ মুছ্ছে, কেউবা বেদনা চেপে রেখে ম্লান হাসি হেসে প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ভারতের মাটি ছেড়ে আমরা অজানা সমুদ্রের বুকে ভাসলাম।

আরব সাগর পাড়ি দিতে এবার লাগল পাঁচ দিন। প্রথম দু'একদিন যাত্রীরা সবাই যেন আশ্চর্য্যরকম শান্ত, কারুরই মনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ছেড়ে এসেছে প্রিয়জন, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, স্বজনহীন প্রবাস আর দূর সমুদ্র-যাত্রা—এ সকল মিলে তাদের করে তুলেছিল বিষণ্ণ। নানা-দেশ থেকে এসেছে নানা ভাবাভাষীর দল, সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে পঞ্জাব গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ সন্তানদের। কেউ চলেছে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় মণিমাণিক্য আহরণ করতে, কেউ-বা চলেছে পশ্চিম হতে আলোক-রশ্মি নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিতে ভারতের বুকে।

উপকূলবর্ত্তী আরব সাগরের রং ম্লান। সাগর বলতে যে ছবি ভেসে উঠে আমাদের চোখে তার দর্শন পাই বেশ খানিকটা দূরে গেলে পর—যেখানে কূলের চিহ্নও নেই, সীমাহীন জলধি মিশে গেছে দূরে দিকচক্রবালে, ধূম্রায়মান মেঘের রেখা যেখানে এক হয়ে গিয়েছে প্রিয়ের আলিঙ্গনে। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে আমাদের দেখছে উড়ুক্কু মাছের দল। যেটুকু সামান্ত শক্তি আছে ওদের পাখায় তাই দিয়ে হাতখানেক লাফিয়ে বা উড়ে ওরা চেষ্টা করছে জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। যে সামান্ত ঢেউ উঠছে তাতেই যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ শয্যা নিয়েছে, আবার যখন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করলে তখন ধীরে সুস্থে অনেকেই এসে ডেকের ওপর বসল। যেদিকে তাকাই শুধু নীলের মেলা, অপরূপ রং এই নীল সাগরের—যে নীল পাই বাংলার আকাশে, যে নীল দেখি পুরীর সমুদ্রে, সেই নীলের বুক চিরে চলেছি আমরা। ক্রমশঃ সমুদ্রের রূপে মনে হচ্ছে বাংলার কোন শ্যামল প্রান্তরে নীল আকাশের নীচে বসে আছি। কিন্তু না আকাশ ত নীল নয়, এমন ধূসর আকাশ একমাত্র তখনই দেখা যায়, যখন বর্ষণমুখর প্রকৃতি ক্ষণিক বিশ্রামলাভের আশায় শুধু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রোষে গর্জ্জন করে ওঠে। আরবের উপকূলবর্ত্তী এ আকাশ যেন অভি-মানী মেয়ে, প্রিয়জনের অনাদরে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে পা ঝুলিয়ে, এই বুঝি গাল বেয়ে ঝরে অশ্রু।

আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একদিন দেখলাম ঠিক যেন একখানি পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশে মেঘের রং নেই, সূর্য্যের শেষ বিদায়কালীন রক্তাভা নেই,

কেবল সোনালী রঙের একটি গোলাকার বস্তুপিণ্ড ধীরে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতায়। আর একদিন দেখলাম অন্য রূপ। খানিকটা রক্তিম আভা ও মেঘের সংমিশ্রণে গলিত লাভার মত সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের কোলে।

জাহাজ হইতে এডেন বন্দর

আগামী কাল অর্থাৎ ৫ই সেপ্টেম্বর পৌছব আমরা এডেন বন্দরে। যাত্রীরা এবার বেশ প্রসন্ন চঞ্চল। বার বার জিজ্ঞাসা করছে, "কাল কখন পৌছব?" এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে ডাঙার জীব যাত্রীরা আবার কবে মাটির মুখ দেখবে। তারই জন্য একটা আকুতি—প্রাণ তাদের হাঁপিয়ে উঠেছে—প্রথম দফায় কি এত দীর্ঘ পাড়ি পোষায়? এইজন্যেই কি পান-কক্ষে যাত্রীর এত ভিড়? ঐ যে নিগ্রো ছেলেটি এত বেশী পরিমাণে পান করেছিল কি লাভ হ'ল তার? টাল সামলাতে না পেরে বেচারা অন্তিম শয্যা নিলে সাগরতলে। বিপদজ্ঞাপক তীব্র বাঁশী বাজিয়ে যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল কি ঘটেছে। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজিও চলল কিন্তু এই রাত্রে সাগরের কোন্ অতলে যে ছেলেটি সলিলসমাধি লাভ করেছে তার কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

ক্রেসেন্ট হোটেল, এডেন

অবশেষে এডেন বন্দরে এসে পৌছলাম। বন্দরটি কিন্তু দূর থেকেই বেশ দেখায়, যেন ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম। পাহাড়ের বুক চিরে যে বাড়ীগুলো উঠেছে সেগুলি যেন পটে আঁকা ছবির মত। প্রায় সব যাত্রীই নেমে গেল ছোট ছোট খেয়া নৌকায়। সকলেই চাইছে সস্তায় কিছু সওদা করতে, কারণ এডেনে বাণিজ্য-শুল্ক নেই বলে এখানকার জিনিষপত্র বেশ সস্তা। এখানে ভারতীয় ও বিলাতী উভয় রকম মুদ্রার ব্যবহারই চলে। যারা জাহাজ থেকে নামে নি তাদের কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ অনেকগুলি ভাসমান বিপণি এসে জাহাজের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। এদের যা আয় তার বেশীর ভাগই আসে যাত্রীদের কাছ থেকে।

যাত্রীরা যাতে প্রবাস-দুঃখ ভুলতে পারে তার জন্য হরেক-রকম আনন্দের ব্যবস্থা আছে। নানারকম খেলা, গীতকক্ষ, ধূমপান-গৃহ, তার উপর আছে পানকক্ষ। ক্রীড়াসমূহে প্রায় সকলেই যোগ দেয়। সব জিনিষই সাধারণ বাজারের তুলনায় ঢের সস্তা, তাই কারুরই বিশেষ অসুবিধা হয় না। সপ্তাহে দু-তিন বার সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থাও আছে।

জাহাজের ভারতীয় যাত্রীরা একদিন সর্ব্বজাতির লোকেদের সহযোগিতায় একটা গানের মজলিস বসাল, পর পর তিন দিন হ'ল এই অনুষ্ঠান। কারণ ডেকের উপর যতগুলি চেয়ার পাতা যায় তাতে মাত্র এক তৃতীয়াংশ যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা হয়। অনুষ্ঠানটি কিন্তু মোটামুটি মন্দ হয় নি। বাঙালীরা আবার আলাদা ভাবে আর একটা জলসার ব্যবস্থা করলেন। মহাসমারোহে "শেষ বর্ষণ আর শারদোৎসব" উদ্‌যাপিত হ'ল। নিস্তব্ধ রাত্রি—বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ, অতলান্তিকের বুকের উপর ভাসমান 'চিত্রলে'র বুকে সুদূর প্রবাস-যাত্রী বঙ্গ-সন্তানরা কবিগুরুর নাটিকের দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতি-গোচর রূপদান করছেন। অপূর্ব্ব
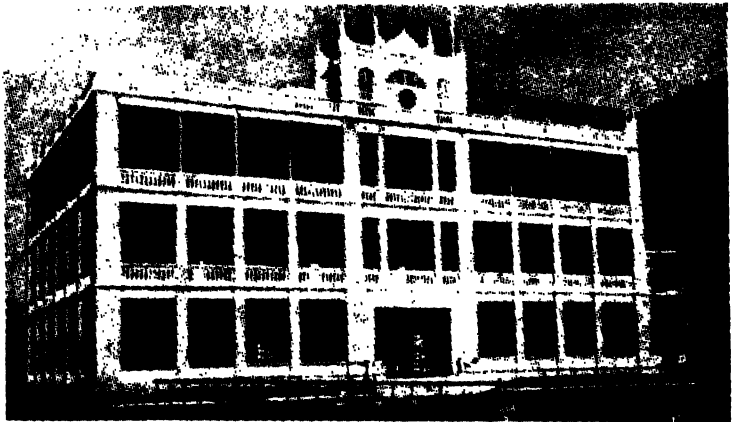
প্রবাহ, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার দল নির্ব্বাক, অবাঙালীরা ইংরেজী সারাংশ ও ভাবার্থের এবং অপরূপ সুরের সমন্বয়ে মুগ্ধ। সমাপ্তির সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনে শোনা গেল একটা কথা 'অপূর্ব্ব'।

সুয়েজখালের পার্শ্বের রাস্তা
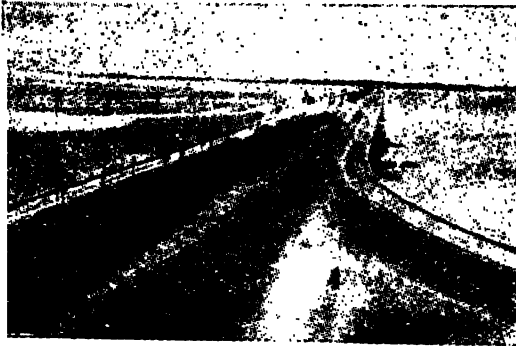
এবার আমরা লোহিত সাগরে। লোহিত সাগর কিন্তু মোটেই লোহিত নয়। রং তার মোটামুটি কৃষ্ণাভ, কিন্তু তার উষ্ণতা এত বেশী যে যাত্রীরা কেউই প্রায় কেবিন ফিরে যেতে চায় না। কেবিনের ভিতরেও প্রচুর হাওয়ার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাতেও গরম বিন্দুমাত্র কমে না। তিন দিন এ অবস্থায় তাপপ্রধান সমুদ্রের উপর দিয়ে আসার পর আমরা পৌঁছলাম সুয়েজ খালের মুখে। অপূর্ব্ব এর শোভা। দু'দিক দিয়ে পাহাড় আর পাহাড়, গ্রানাইট পাহাড়ের কোল দিয়ে চলে গিয়েছে সুন্দর ছোট সহর। সুয়েজ খালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে "ইণ্ডিয়া মেমোরিয়াল"। তারই পাশে বোধ হয় "ব্রিটিশ দূতাবাস" আর তার কাছে কাছে নানা দেশের পতাকাচিহ্নিত বিভিন্ন কোম্পানির ভবন। লেকের পাড় দিয়ে চলে গিয়েছে সহরের প্রধান রাস্তা, ঝকঝকে পীচের রাস্তার উপর আধুনিকতম মোটর-গাড়ীসমূহের সমাবেশ। রাস্তার দু' পাশে ঝাউ গাছের সারি। ভারি সুন্দর আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটি। বাড়ীর ছাদগুলো কোথাও কোথাও বা হলুদ, যেন মনে হয় সবুজ বনের ভিতর থেকে লাল হলদে সাদা কুটীরগুলো উঁকি মেরে আমাদের দেখছে। তার পরই আমরা এসে পড়লাম একটা লেকে—নাম "বিটার লেক"। সুয়েজের চার পাশের এবং অপর প্রান্তবর্ত্তী পোর্ট সৈয়দের কোনরূপ ছবি তোলা নিষেধ এবং আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ। যারা সুয়েজ বন্দর থেকে পিরামিড দেখতে গিয়েছিল তারাও ক্যামেরা সঙ্গে নিতে পারে নি। পিরামিডের পাশ দিয়েই চলে এলাম। কত না বিচিত্র গল্প এবং ঘটনা জড়িত আছে এগুলোর সঙ্গে, এদের দেখলে জীবনের নশ্বরতা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। জীবনকে বেঁধে রাখবার জন্য আয়োজনের সীমা নেই, কিন্তু সত্যিই কি সে চেষ্টা সফল হয়েছে?

৯ই সেপ্টেম্বর, রাত্রে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছে দেখি চারদিকে বিপণির সারি, আর বণিকসুলভ আহ্বানের আওয়াজে সে অঞ্চলটি মুখরিত। কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের 'ভিসা' দেওয়ার পর কেন জানি না সকলেই একটু শঙ্কাকুল চিত্তে পাড়ে নামল। বিশেষ দূরে যেতে কারুরই আগ্রহ দেখা গেল না। সাধারণ লোকের ব্যবহার খুব হৃদ্যতাপূর্ণও নয়, আবার বৈরিতাদ্যোতকও নয়। কিন্তু কি একটা অহৈতুকী ভীতি যেন যাত্রী আর পোর্ট সৈয়দবাসীদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। বেশী দরকষাকষি আর তর্ক বিতর্ক কেউই করতে চাইল না। সহরটা কিন্তু বেশ সুন্দর। যে-কোন বড় সহরের মত চওড়া রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি আর রাস্তার দু'ধারে দোকান, রেস্তোরাঁ আর বেশ বড় বড়

সুয়েজ বন্দর

বাড়ী। অবশ্য রাত বলে সবই আলোয় ঝলমল করছিল। এখানকার বিশেষ চিত্তাকর্ষক জিনিষ কিছু দেখলাম না, চামড়ার কাজ মন্দ নয়। অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে ছবি কিনল। রাত বারটায় আবার ভাসলাম ভূমধ্য সাগরের বুকে।

যাত্রীরা একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মাটির দর্শন আর বেশ কিছু দিন পাওয়া যাবে না। এবার একেবারে টিলবারী বন্দর।

এবার জলের রং নীলাভ সবুজ। প্রচণ্ড ঢেউ, অনেকেই শয্যা নিলে। কেবিনে কেবিনে ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায় কার কতটা ঠোঙার দরকার। যাঁরা সুস্থ তাঁদের কাছে ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর, যারা অসুস্থ তারা ভাবছে এখনই যদি এই, বিস্কে উপসাগরে না জানি কি হবে? এদিকে জাহাজে জ্বালানির অভাব দেখা দিলে। কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, জ্বালানি সংগ্রহের জন্য আমাদের জাহাজকে যেতে হবে জিব্রাল্টার প্রণালী

অতিক্রম করে আফ্রিকার উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত বন্দর সুয়েটায়। এ খবরে অনেকের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

যতই আমরা পশ্চিমাভিমুখে এগুতে লাগলাম ততই আমাদের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া হতে লাগল। কোন দিন বা এক ঘণ্টা, কোন দিন বা আধ ঘণ্টা। ভূমধ্য সাগরে সূর্য্য অস্ত গেল বেলা ৭টা ৩০ মিনিটে। ডেকের উপরে যাত্রীর ভিড়—রাত্রে সূর্য্যাস্ত দেখার জন্য অনেকেই ব্যাকুল।

সুয়েটা বন্দরের একটি দৃশ্য

১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রে একটা বুলেটিন বের করা হ'ল। তাতে ১৫ই সুয়েটায় নামবার জন্য সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আরও জানানো হ'ল সুয়েটাবাসীরা জামা-কাপড়ের সংক্ষিপ্তাকে পছন্দ করে না, অতএব কেউ যেন সংক্ষিপ্ত পোশাকে অথবা স্নানের পোশাকে তীরে না নামেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, 'ফ্যান্সি ড্রেস নাইট'—খাবার টেবিলে কর্তৃপক্ষ একটা করে কাগজের টুপি প্রত্যেককে পরিয়ে দিলেন, খাবার ঘরটি নানা রং-বেরঙের কাগজ আর বেলুন দিয়ে সাজান হ'ল। প্রতিটি যাত্রীর মাথায় একটা করে টুপি—খাবার টেবিলের দৃশ্যটি দেখবার মত। সন্ধ্যা ৭টা বাজতেই আরম্ভ হ'ল ছোট ছেলেমেয়েদের অপরূপ পোশাকের প্রদর্শন। একটি মেয়ে—বছর আটেক তার বয়স হবে, লম্বা পাজামা, পুরা আস্তিন জামা, কাঁধের উপর দিয়ে জড়ান উড়ুনা আর মাথায় পালক গোঁজা পুরো টুপী, পিঠে লেখা "Ready for ceuto" পেলে প্রথম পুরস্কার, আর দ্বিতীয় পুরস্কার পেলে "Scarecrow" একটি ছেলে—ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে মুখে রং মেখে আর একটি ছোট পাইপ মুখে নিয়ে তাকে সত্যিকারের খোড়ো মানুষের মতই দেখাচ্ছিল। অবশ্য বাচ্চারা, প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পুরস্কার পেলে এবার বড়দের প্রতিযোগিতার পালা, কার মাথায় কত রকম উদ্ভট কল্পনা খেলতে পারে তার নিদর্শন দেখতে পেলাম। প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তার সর্বাঙ্গে জড়ানো ছিল, পিয়ানোর স্বরলিপি।
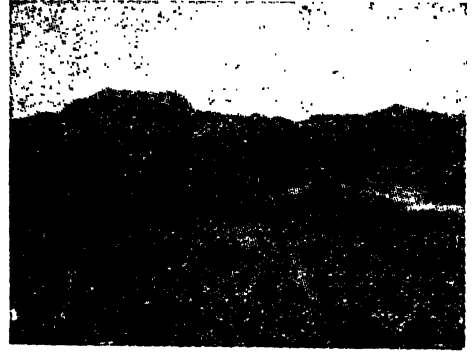
জাহাজ হইতে সুয়েটা বন্দর

১৫ই সেপ্টেম্বর আমরা পৌঁছলাম সুয়েটা বন্দরে। ১৯৩৯ সালের পর ভারতীয় যাত্রীবাহী আর কোন জাহাজ এ বন্দরে নোঙর করে নি। দূর থেকে লাল পাহাড় দেখে মনে হয় এ বুঝি সূর্য্যাস্তের রং, আসলে কিন্তু তা নয়। গ্র্যানাইট পাহাড় বলে তার রং লালচে বাদামী। পাহাড়ের কোলে সাগর—স্বচ্ছ তার বারিরাশি, একটি দুটি মালবাহী জাহাজ, ইতস্ততঃ ভাসমান ছোট ছোট খেয়া নৌকা, নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের বুকভরা গ্রাম—সূর্য্যালোকের বর্ণ-সমারোহ, সব মিলিয়ে যেন সে এক বিচিত্র রঙের মেলা। যে দিকে তাকাই দৃষ্টি যেন ফিরতে চায় না।

ছোট এই বন্দরটি বর্ত্তমানে স্পেনীয় সরকারের শাসনাধীন। এর রাস্তাঘাট সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিবাসীরা বেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ভারতবাসীদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল জেটীর উপর দাঁড়িয়ে। দু'জন পদস্থ অফিসার উঠে এলেন উপরে যাত্রীদের টাকা পয়সা লেন দেনের জন্য। বিলেতী বা ভারতীয় মুদ্রা এখানে অচল। ১১০ পেসেটা এক পাউণ্ডের সমান। প্রত্যেককেই পাউণ্ড ভাঙিয়ে দেওয়া হ'ল, আর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে বাড়তি বা অবশিষ্ট মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়ে পাউণ্ড নেবার কথা ঐ স্পেনীয় অফিসারদ্বয় বলে দিলেন। জেটীর বাইরে দাঁড়িয়েছিল মোটর বাস আর ট্যাক্সি। যাত্রীরা যার যেখানে খুশি বেড়াতে বেরুল। অনেকেরই লক্ষ্য দ্রাক্ষারসের আস্বাদ গ্রহণ, স্পেনীয় পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ আর তাদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ। এখানকার চামড়ার কাজ বেশ ভাল। অনেকেই জিনিস

কাঠের করতালের মত এক রকম যন্ত্র যা' নাকি ওরা ব্যবহার ক'রে গান বা নাচের সময় হাতের তালুর সাহায্যে তাল জ্ঞাপন করে—অনেকটা তুড়ি দেওয়ার মত শব্দ হয় তাতে। যে সকল সুয়েটাবাসী দাঁড়িয়েছিল পোতাশ্রয়ে তারা মহা কৌতূহলের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। আসল কারণ ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না—যাত্রীদের ভাষা জানতে চায়, যাত্রীরা একটু একটু করে আকার-ইঙ্গিতে কয়েকটা কথা ওদের সম্বন্ধে দিলে আর উদ্ধারও করলে ওদের দু' একটা কথা। হাসি ওদের স্বভাব। যারা সহরে গিয়েছিল—তারা ইতিমধ্যে ফিরে এল; তারা যে বর্ণনা দিলে তার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, এই ছোট সহরটির অধিবাসীদের ভদ্রতা, বন্ধুত্ব আর শ্রী-সৌষ্ঠবের তুলনা হয় না।

বাঙালী মেয়েদের শাড়ীর দিকে এরা এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে মনে হয়—ওরা যেন বলতে চায় এটা আবার কোন্ জাতীয় পোশাক। যেখানে দেখা গেছে গজদন্তের মত শুভ্রবর্ণা, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা সম্ভ্রান্ত মহিলারা এমনি পর্দানশীল যে, শুধু কথা বলার সময় মুখের আবরণটি ঈষৎ সরিয়ে থাকে, সেখানেই কিন্তু দোকান বাজারে মেয়েদের দেখে মনে হ'ল স্ত্রীজাতির এখানে প্রচুর স্বাধীনতা। এত ভিড়ের মাঝেও কুৎসিত চেহারা চোখে পড়ল না। পাথর কেটে তৈরি, পরিচ্ছন্ন পিচ্ ঢালা রাস্তাঘাট দেখে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। রাস্তার দক্ষিণ-অবলম্বী রীতি মনে করিয়ে দেয় আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে এসেছি। প্রত্যেকটি যাত্রী উপরে না উঠা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল আমাদের নবপরিচিত বন্ধুরা, শেষে স্মিতহাস্যে রুমাল নেড়ে বিদায় নিলে।

এবার আমরা অতলান্তিকের বুকের উপর। সীমাহীন আকাশ আর অন্তহীন জলধি মনে এনে দেয় অপূর্ব্ব প্রশান্তি। ঘনকৃষ্ণ বারিরাশি রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠে—মাঝে মাঝে সফেন তরঙ্গমালা জাহাজের গায়ে এসে প্রতিহত হয়। এই ত অতলান্তিকের প্রকৃত রূপ। তরঙ্গহীন সমুদ্র যেন নিষ্প্রাণ। এবার আমরা চলেছি পর্তুগালের উপকূল দিয়ে। অবশেষে আমরা বিস্কে উপসাগরে এসে পড়লাম। কিন্তু বিস্কে:ছিল আশাতীত রূপে শান্ত। চব্বিশ ঘণ্টার পর ধীরে ধীরে সমুদ্রের রং বদলে গেল। আগামী কাল আমরা যুক্ত-রাজ্যের-তীরভূমির দর্শনলাভ করব। যাত্রীরা এখন থেকেই তার তোড়জোড় করছে। রাত্রি প্রভাত হ'ল, ২১শে সেপ্টেম্বর জাহাজ এসে পৌছল টিলবারী বন্দরে তার গন্তব্য স্থলে।

দুঃখবাদী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

দিন যায়, দিন যাবে সে ত' জানি; মরবো না তবু মৃত্যু মম,
দণ্ডে দণ্ডে জীবনের রক্ত্ নিঃশেষ করি; চিত্তমম
হতাশায় যেন জড়ো হয় আর দিগন্তভরা শূন্যতাতে
বন্দী-জীবন কেঁদে কেঁদে মরে মৃত্যুর মহা আকাঙ্ক্ষাতে।
মরবো না তবু। তোমার চোখে যে দেখা বাকি আছে অবিশ্বাস,
দেখি নি যে আজও আত্মরতির শেষপ্রতারণা সর্ব্বনাশ;
পলে পলে যত সকরুলোপে দিনান্ত দেখে জমে আঁধার,
হৃদয়ের কথা পাথরের বুকে জলে নাম লেখে রিক্ততার।
বেঁচে থাকা এই; বিদ্রূপ মম, বিশীর্ণ দণ্ডে পাণ্ডু লেখ,
বাঁচি আকাশের ছায়াপথ তলে প্রত্যাশাকুল নির্নিমেষ,
ভরা বিকেলের রক্ত-আলোর বাঁকে জীবনের স্বপ্নগুলি,
জলে নাম লিখি, বালুসজ্জার শেষ কামনায় বিদায় ছুলি।
দিন যায়, তার ছায়ালোকে দেখি অনংশয়িত আত্মনাশে,
দেখি গোধূলির ছলনায় প্রিয়া, তোমার মৃত্যু নিরুচ্ছ্বাসে।

ফল্গুধারা

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

আমি রাত্রে শুই দেরিতে, সকালে উঠিও দেরিতে, ইহা আমার বরাবরের অভ্যাস। সেদিন ঘুম ভাঙিতেই কানে আসিল পিসীমার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের খন্‌খনে আওয়াজ। ইহা প্রায় নিত্যকারের ব্যাপার হইলেও একটু বিরক্তি যে আসিল না, তাহা নহে। পিসীমাই এ বাটির প্রতাপশালিনী বর্ষীয়সী কর্ত্রী। কিন্তু সেজন্য কোন অসুবিধা ছিল না। পরিবারের মধ্যে বাস করিতে হইলে কাহারও-না-কাহারও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেই হয়, আপত্তি করিলে শৃঙ্খলা থাকে না। সুতরাং সে দিক্ দিয়া আমাদের কোন অভিযোগ ছিল না, কিন্তু গোলযোগ বাধিয়াছে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের আচারহীনতা লইয়া। দুষ্ট ছেলেমেয়েরা সকাল হইতেই দল বাঁধিয়া চা, বিস্কুট, ডিম প্রভৃতি নিষিদ্ধ পানীয় ও খাদ্যগুলি গো-গ্রাসে গিলিবে···আচ্ছা তাহাতেও না হয় পিসীমার তেমন আপত্তি নাই। ছেলে-মানুষের অত বিচার করিতে গেলে চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দুরন্ত ছেলেমেয়েদের ম্লেচ্ছপনা করিবার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না? তাহারা কি না তাঁহার দ্বিতলস্থ কক্ষের সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বারান্দা ভরাইয়া ত্রিতলের পূজার ঘরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত স্থান জুড়িয়া যাহা খুশি খাইবে ও ভুক্তাবশেষ যথেচ্ছভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিবে? রাগ হইবার কথা নয়? একালের ছেলেমেয়েদের দুর্দান্ত স্বভাব ও নোংরামির তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে সমস্ত জায়গাটিতে গোবরজলের ছড়া দিয়া পথের উপরের ছেঁড়া পাতা ও কাগজের টুকরা, ডিমের ন্যাকড়া ও খড়কুটা একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া পথিপার্শ্বের নর্দমায় নিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের সদ্যস্নাতা সেকালের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

সেদিন শনিবার। কর্মস্থল হইতে সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতেছি, কাছাকাছি আসিয়াই শুনিলাম পিসীমার অত্যন্ত কণ্ঠের সুপরিচিত ঝঙ্কার। ব্যাপার যে গুরুতর কিছু নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বলিলাম, কি হ'ল পিসীমা? পিসীমা তখন রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এক নিমিষেই সুস্পষ্ট হইয়া গেল। মেজকাকার তিন বছরের ছেলে পিণ্টু পিসীমার অঞ্চলটি তার হাতের মুঠায় ধরিয়া তখন অপরূপ ভঙ্গীতে হুহু হুহু হাস্য করিতেছে। তাহার শুভ্র দন্তে, উজ্জ্বল চক্ষে, কোঁকড়া চুলে—কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নাই।

ব্যাপারটি এই। যথাকালে ও শুদ্ধাচারে পিসীমা হবিষ্যান্নের পাত্রটি উনান হইতে নামাইয়া ঘর হইতে হাত ধুইবার জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত পিণ্টু র পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন অপোগণ্ডটি তাঁহাকে দুইটি বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাকীমা বলিলেন, "ও ত দিগম্বর শিশু, দিদি, ওর পরণে ত কাপড়ের কোন বালাই নেই, ও ছুঁলে আর দোষ কি?" এই গা-জ্বালানে বেহিসাবী কথায় পিসীমা আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। কথাটা ওঁর হিসাব না করিয়া বলা ঠিক হইয়াছে কি? শিশু-দিগম্বর শুধুই যদি তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিত, তাহা হইলে কি তিনি অত রাগ করিতেন, না, রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিত? তাহা নহে। সে দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ধরিয়া আছে এবং সেই সঙ্গে বাম হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার ক্ষুদ্র একপাটি জুতাও ধরিয়া রহিয়াছে যে। সে বস্তুটির মোহ সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

আগে আগে দেখিয়াছি পিসীমা ছেলেদের ভালবাসিতেন বেশ। ইদানীং কেবল তাঁহার আচারপরায়ণতার উত্তাপে তাঁহার হৃদয়ের শিশুপ্রীতির রসটুকু যেন নিঃশেষে বিশুষ্ক হইয়া উঠিতেছে।

উচ্চকণ্ঠে অত্যন্ত সমালোচনায় মুখর বুলিগুলি আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

নিত্যকার অভ্যাসমত সেদিনও পিসীমা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নানাদি সাঙ্গ করিয়া ঠাকুরের 'বৈকালিকী' সমাপন করিতে মন্দিরে ঢুকিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় অনুরোধে টুনিকে বিশ্বাস করিয়া দূর্ব্বা কয়গাছি তুলিয়া আনিতে বলাই 'কাল' হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

টুনি আমাদের পাড়ার এক নমঃশূদ্রের মেয়ে—এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী। মধ্যে মধ্যে সে পিসীমার দুই একটা ফাই-ফরমাস খাটিয়া বেশ বর্ত্তিয়া যায়। অবশ্য, স্পর্শ-দোষে কদাপি দূষিত হয় না এইরূপ সনাতন ফরমায়েসই সে খাটিতে পায়। আজও সে দূর্ব্বা তুলিবার অনুমতি পাইয়া পরমাহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে বহির্ব্বাটিতে গিয়াছিল ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছিয়া বাছিয়া সতেজ দূর্ব্বাদলের নবর নবর ডগাগুলি তুলিয়া আনিয়া পিসীমার তুলসীর রেকাবীর একান্তে আলগোছে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু চঞ্চলমতি হতভাগী মেয়ে ত দুই চোখে দেখিয়া কোন কাজ করিবে না। দূর্ব্বা সে ভালই আনিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়াইয়া জীর্ণ-কাপড় থেকে খসে পড়া এক টুকরা সরু সূতাও যে আনিয়া দিয়াছে। এখন উহারই ফাঁক দিয়া কোন্ অজ্ঞাত অনাচার যে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল,

তাহাই ভাবিতে গিয়া পিসীমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে—"মা গো!" ব্রাহ্মণকন্যা ও নমঃশূদ্র-কন্যার ছোঁওয়া কাপড়ের সুতা যে একই কার্পাস তুলার তৈয়ারি এবং ভগবান্ শুধু মানুষের অন্তরের মিঠাটুকুই দেখেন, বাহিরের নয়—এমনিই কিছু বলিতে যাইব, এমন সময় দেখি, পিসীমা যেন তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে শাসন করিতে করিতে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নদীপথে চলিলেন।

দুর্জ্জয় শীতের সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। পূর্ণোদ্যমে একটি উপাদেয় আলোচনা চলিতেছিল। আচারহীনতার জন্য পিসীমার নিকট সদা-লাঞ্ছিতা এ বাড়ির ছোট বধূ ওরফে আমাদের আধুনিকা ছোট কাকিমা বলিতেছিলেন, "মরণ আর কি! খালি নাওয়া আর নাওয়া! স্বর্গ থেকে সোনার রথ নেমে আসবে ওঁকে তুলে নেবার জন্যে! হাতে হাজা, পায়ে হাজা—অরুচি আর কি! ভগবান্"...আর বলা হইল না। দেখিলাম, দ্বারপথে সদ্যস্নাতা পিসীমা গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরের কথা। শীত তখনও যাই-যাই করিয়াও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। হঠাৎ অসময়ে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবল বন্যা আসিয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইহা আপনারা কেহ কেহ হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আর যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে যথাযথ ব্যক্তিগণের নাম সংযোজিত করিয়া রিলিফ কার্য্যের কর্ম্মীদের সাহায্য করিবার জন্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে, হাণ্ডবিলের হরফে হরফে হৈ হৈ চলিতেছে। সর্ব্বকর্ম্মে, সকল সময়ে অগ্রণী ছেলের দল গলায় হারমনিয়ম ও মৃদঙ্গ ঝুলাইয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া নগরের পথে, গ্রামের পথে সমস্বরে সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে—"ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো।" রিলিফ কার্য্যের সুবিধার জন্য ছোট-বড় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি হইবে, তাহার উদ্যোগ চলিতেছে। নানাস্থান হইতে কর্ম্মীরা আসিয়া জুটিতেছেন। আমাদের সদর বাড়ির দুইখানি ঘরের মধ্যে বড় ঘরটি ও লম্বা দালানটি তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহা জ্যাঠামহাশয়ের সম্মতিক্রমেই হইয়াছে। কিন্তু পিসীমাকে না জানাইয়া বা তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করা এ বাড়ির রীতিও নহে এবং তাহা সম্ভবও নহে। সুতরাং মা, জ্যাঠাইমা—কাহাকেও লইয়া কাজ চলিবে না, পিসীমার দয়াভিক্ষা আমাদের করিতেই হইবে। "ইঁহারা ভদ্রসন্তান, দুর্গতদের সেবার ভার মাথায় লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন এবং জনসাধারণের সাহায্যভিক্ষা করিয়া দেশে দেশে ফিরিতেছেন"—ইত্যাদি বলিয়া আমি পিসীমার নিকট ইঁহাদের মহৎ প্রাণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। আশা হইল, নিরন্ন, বস্ত্রহীন নরনারীর দুর্দ্দশার ছবি পিসীমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছি। অতঃপর ভদ্রসন্তানগণের আতিথেয়তা স্বীকার করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ত্তে পিসীমার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সর্ত্তগুলি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল। সর্ত্তগুলি এইরূপ : (১) আহার্য্য গ্রহণকালে উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে অন্ন বা ব্যঞ্জনের কোন অংশ যেন আসনে পতিত না হয়। (২) বামহস্তে দৈবাৎ অন্নপাত্রের স্পর্শ ঘটিলে, সেই হস্ত যেন ভুলক্রমে নিজ পরিধেয়ে সংস্পৃষ্ট না হয়। (৩) প্রত্যুষে যেন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্যবিশেষটি সম্পন্ন করা হয় অথবা উক্ত কর্ম্মসম্পাদন শেষে পরিহিত বস্ত্রটিকে যেন রীতিমত সিক্ত করিয়া লওয়া হয়। চতুর্থ অথবা সর্ব্বশেষ সর্তটি হইতেছে এই যে, ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যেন কনুই পর্য্যন্ত হস্ত ও জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয় প্রক্ষালন করা হয়। অপরিহার্য্য এবং অনুপেক্ষণীয় এই সর্ত্তচতুষ্টয় আগন্তুকগণের শ্রুতিগোচরীভূত করা হইলে তাঁহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হাসি থামিলে এক জন বলিলেন, "আপনারা এই সকল নিয়ম মেনে চলেন ?" যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া বলিলাম, "এই সকল আচার পালন করা এ বাড়ির মজ্জাগত অভ্যাস। এগুলি পালন না করার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না। তাই বলে আপনারা ভাববেন না যেন, এগুলো মেনে চলতে আমাদের কোন কষ্ট হয়! না, আমাদের মোটেই কোন অসুবিধা হয় না।"

আচার-অনুষ্ঠানের জন্য মধ্যে মধ্যে মতভেদ হইতে থাকিলেও দেখিলাম, পিসীমার সহিত রিলিফের ছেলেদের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতেছে। বন্যা কমিয়া আসিল। ছেলেদের এখানকার কাজও প্রায় ফুরাইয়া গেল। এ অঞ্চলের যাঁহারা ভিক্ষা দিবার, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের বাড়িটিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য সারা হইয়াছে। তাঁহারা এখন অন্যত্র গিয়া ভিক্ষা করিতে চান। সুতরাং এইবার তাঁহাদের বিদায় দিবার পালা। পরদুঃখকাতর এই পরিচয়হীন পথের ছেলেগুলির জন্য হৃদয়ের একটি নিভৃতকক্ষে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের বিদায়বেলায় দেখি, পিসীমা অশ্রুসজলচক্ষে একটি ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া তাঁহার কল্যাণকামনা করিয়া বলিতেছেন, তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি বাবা, সে সব ভুলে যেও ; যদি কখনও এদিকে আস তো পিসীমার সঙ্গে দেখা করে যেও আবার।

বর্ষাশেষ। ম্যালেরিয়াটা এবার বেশ কায়েমীভাবেই চাপিয়া বসিয়াছে দেখিতেছি। বাড়ি বাড়ি অসুখ।

ছুটিয় যায়। হঠাৎ এক সময়ে বাড়ি ফিরিয়া দেখি, পিসীমার মূর্ত্তিমতী অনাচার আমাদের ছোট কাকিমা পিসীমার হবিষ্য রাঁধাইতেছেন। শুভ্র গরদের শাড়ীর উপর ভিজা চুলগুলি এলাইয়া দিয়াছেন—চুলের জলে পিঠের খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে—তাঁহার এইরূপ মূর্ত্তি সচরাচর দেখি না—সচরাচর কেন, কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যথেষ্ট কৌতুকবোধ করিলাম। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি বোধ করিলাম বিস্ময়। পিসীমার হবিষ্য রাঁধাইতেছেন আমাদের ছোট কাকিমা—যাঁহার হাতের ছোঁওয়া জল পান করিতে রুচি হয় না, তিনি? এ কি বিস্ময়! অচিন্তনীয় কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়াই মনে হইল!

ছোট কাকিমা ধীরে সুস্থে বলিলেন, দিদিমণি আজকাল সকল সময়েই ব্যস্ত থাকেন, সময়মত আসতে পারেন না, তাই আমিই দুটো ফুটিয়ে রাখি। না হলে যে তাঁর খাওয়াই হয় না, বাবা!

পিসীমা ব্যস্ত থাকেন? কিসে তাঁহার এত ব্যস্ততা—যার জন্য তাঁহার আজন্ম বদ্ধমূল সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলি উপেক্ষিত হইতেছে? সময়ে আসিতে পারেন না? কেন? কোথায় থাকেন তিনি? তবে কি আজকাল তাঁহার 'বাতিক' বাড়িয়া গিয়াছে? শুচিবায়ুগ্রস্ততা শুনিয়াছি ক্রমবর্দ্ধমান এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। তবে কি আজকাল তিনি নদীর ঘাটেই সারাদিন কাটাইতেছেন? এইরূপ বহু প্রশ্ন মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুতের মত আমার মাথায় খেলিয়া গেল। নিমেষমাত্র। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছোট কাকিমার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "দিদিমণি এখন কলুপাড়ায় গেছেন, সেখান থেকে যাবেন বাগদীবস্তিতে। ঘরে ঘরে অসুখ। কে তার মুখে জল দেয়, তার ঠিকানা নেই। তাই তিনি নিজের হাতে সেই সব অভাগার সেবার ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন।" আমাকে বলিতে বলিতে ছোট কাকিমার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সন্ধান লইয়া একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া-দেওয়া খোড়ো চালা। দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিলাম, পিসীমা সেই চির অস্পৃশ্যজাতির ছোট্ট একটি মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। অপর পার্শ্বে আর একটি বিছানায় আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া অস্ফুট স্বরে গোঁঙাইতেছে আর একজন। যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলাম, তেমনই নিঃশব্দে পিসীমার অলক্ষ্যে ফিরিয়া চলিলাম।

ধূসর সন্ধ্যা। ছায়ার মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিলেন ঐ আমার সন্ন্যাসিনী পিসীমা। আজ আর কোন বাধা নাই। ছুটিয়া চলিলাম তাঁহার ঘরে। তাঁহার পা দুইটির উপর আমার মাথা রাখিয়া বলিলাম, পিসীমা না জেনে অনেক অপরাধ করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তারপর কয়েক ফোঁটা অবোধ অশ্রু আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণ দুইটি সিক্ত করিল।

কুলজী গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই ছিল জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারতের ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা কৌতূহলী, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস তাঁহাদের নিকট একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় না হইয়া পারে না। দুঃখের বিষয়, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক আলোচনাকারীদের মনোযোগ এদিকে উপযুক্ত পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নাই। অধিকন্তু, দেশীয় সাহিত্যে এ বিষয় সম্পর্কে যে অমূল্য উপাদান পাওয়া যায়, ভারতের কোন প্রদেশেই তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যবহার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাংলা-সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায় তাহার পুরাপুরি সদ্ব্যবহার এখনও করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এবং অন্য কোন কোন স্থলে পুরাতন বাংলা-সাহিত্য হইতে দু'চারটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এমন একটি একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, যাহা সাহিত্যে প্রতিফলিত বৃহত্তর চিত্রের ঠিক বিপরীত।

যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে বাংলা-সাহিত্যের নানা বিভাগ হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া কোন বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে-সাহিত্যের বিশাল প্রাসাদের এক

নিভৃত ও উপেক্ষিত কোণ হইতে সামান্য কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষুদ্র একটি বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। কুলজী গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে সামান্য পরিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহার কথাই আমি বলিতেছি। সেকালের ঘটক মহাশয়দিগের রচিত কুলজী গ্রন্থগুলি হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের বংশপরিচয় পরিজ্ঞাপক হইলেও, ঐ শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যে দু'একটি ঘটনা অথবা লেখকগণের মন্তব্য দৃষ্ট হয়, তাহা সমসাময়িক অবস্থার একটা আংশিক ধারণা দিতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত লেখাগুলিতে তৎকালীন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী-মোগল শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্রব এবং এই সম্বন্ধে হিন্দু প্রজাসাধারণের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কুলজী রচয়িতারা তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদিগকে নিজেদের বিবরণ ও মন্তব্যের বাহিরে রাখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সেকালের ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত প্রজাসাধারণের যে সম্পর্ক ও তাঁহাদের প্রতি যে মনোভাবের সামান্য পরিচয় কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পুরাপুরি সৌহার্দ্দ ও প্রীতির জ্ঞাপক হইলে সকলেরই আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, কুলজী গ্রন্থে শাসক-শাসিতের প্রীতিমধুর সম্পর্কের পরিচয় এই ক্ষুদ্র লেখকের সংগৃহীত উপকরণগুলির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা সেকালের শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের ইতিহাস গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া এই সম্বন্ধীয় চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কুলজী গ্রন্থের এ বিষয়ে মিল দেখা যায় না। অথচ, বাংলা ভাষায় লিখিত এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজিকে সেকালের বাঙালীর মনের কথার অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও উপায় নাই। যাহা হউক, এখন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যাক্।

তুর্কী-মোগল শাসনের বিরুদ্ধে খেদোক্তি।

বিদেশী ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী তুরস্ক-মোগলাদি জাতীয় আক্রমণকারীরা হিন্দুরাজত্বের বিলোপ ঘটাইলে, হিন্দু-সমাজপতিগণ যেমন মনোবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, হিন্দুশাসনের অভাবে যে সামাজিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহাও তাঁহাদিগকে তেমনি উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করিয়াছিল। "গোষ্ঠীকথা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি ইহার প্রমাণ :—

হিন্দুর রাজত্বকালে সর্ব্বসুখ ছিল ভালে
দ্বিজাব্রাহ্মণ্য সর্ব্বপ্রধান।
হিন্দুধর্ম্ম অতমিত, অনাচার আবির্ভূত,
লক্ষীসরস্বতী অন্তর্ধান।
সদাচারশূন্য দেশ, ভিক্ষুক এক বেশ
অর্থের প্রতি একান্ত স্পৃহা।
স্ব-বৃত্তির লোভাপথে, দাসবিপ্র এক পথে
ধর্ম্মনাশে নাহি বলে আহা।
সবে যবন-বশীভূত, সদাচার বহির্ভূত,
নামেমাত্র কুলীন শ্রোত্রীয়।
কুলীনেতে কুলক্রিয়া, শ্রোত্রিয় শব্দের প্রিয়া,
বিদ্যাশূন্য সকল গোত্রীয়।
সংজ্ঞা আছে ভট্টাচার্য্য যবন কথাই বিচার্য্য,
রজতম বিশেষ প্রবল।
অর্থকাম পুরুষার্থ, অপবর্গ অযথার্থ,
ধর্ম্মকর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বল।

বিজেতার দাসত্বের প্রতি সমাজপতিগণের ঘৃণা।

ঘটক-কারিকার মতে, অহিন্দু শাসনের নিষ্পেষণে হিন্দু সমাজে বিপর্য্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার উপর, হিন্দু সমাজের অনেক ব্যক্তি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসকবর্গের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া স্বজাতিদ্রোহিতা এবং "দস্যুতা" (অত্যাচার) দ্বারা সেই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কুলজী-রচয়িতারা বলেন যে, এই শ্রেণীর হিন্দুরা "যবণের" (প্রভুগণের) প্রতি আনুগত্য দেখাইতে গিয়া "গো-ব্রাহ্মণ" হত্যায়ও পশ্চাৎপদ হইত না :—

কেহ কেহ যবনের, সুবিখ্যাত যবণের,
প্রধান অমাত্য কর্ম্মকর।
প্রধান দাসত্ব পেয়ে, বজায় সে রায় যেঁয়ে,
সেই ত অনর্থের আকর।
তাই বন্ধু রায় যেঁয়ে, দস্যুকার্য্যে দেশ ছেয়ে,
জলপথে স্থলপথে বীর।
পাতশার সৈন্যগণে, স্বেচ্ছামত রণস্থানে
গোব্রাহ্মণ হত্যাতেও সুস্থির। ইত্যাদি।

তুর্কী-মোগল শাসকদিগের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া যে সকল হিন্দু নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কুল-মর্য্যাদা নির্ণয়কারী ঘটকমহাশয়দিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর হিন্দুরা কুলপঞ্জী গ্রন্থে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাদের ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রভুর প্রদত্ত উপাধিসমূহ মর্য্যাদা অপেক্ষা অগৌরবের চিহ্ন বলিয়াই তখন বিবেচিত হইত। কুলজী-রচয়িতাদিগের মধ্যে "ধ্রুবানন্দ" সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দ্বারা রচিত বলিয়া কথিত নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য :—

অভিশাপে মহাপাপে যত পিরল্যের।
অদ্যকরে মাথামুড়া এই ত প্রভেদ॥
এই আজ্ঞা দেয় যারা তারা পিরালয়া।
যবন রাজের যত সংজ্ঞা পিরোদয়া॥
তাদের রাজত্বে খাসী খাঁ মজুমদার।
মল্লিক বিশ্বাস আর রায় সরকার॥
চৌধুরী মুন্সী বক্সী হাজরা তরফদার।
সমাদার রায় রেঁয়ে আর জোয়ারদার॥

* * *

পঞ্চানন দুলো কয় দাসত্বের কথা।
রায় রেঁয়ে কৌজদার অহঙ্কার বৃথা॥
সমাজের উচ্চস্থানে না বসিতে পাও।
রাজদর্বারে লোকের মাথামুড়াতে যাও॥ ইত্যাদি।

তুর্কী-মোগল শাসনের প্রথম দিকে হিন্দু-সমাজপতিগণ বিদেশী ও বিধর্মী শাসকগণের দাসত্বকারী ঐশ্বর্য্যশালী হিন্দুদিগকেও যে শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত সংস্রবশূন্য বিশুদ্ধ কিন্তু দরিদ্র হিন্দু অপেক্ষা অপবিত্র মনে করিতেন তাহার আর একটি প্রমাণ "মেলমালা" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের একটি শ্লোক এইরূপ :—

মহিন্তা জগদানন্দো দন্ধ বাটী গজেন্দ্রক:।
ভিভী শ্রী পরমানন্দস্ত্রয়ো রায়া: কুলান্তকা:॥

"সম্বন্ধ-নির্ণয়" রচয়িতা এই শ্লোকের উপর নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"এই তিন ব্যক্তিই (অর্থাৎ শ্লোকে উল্লিখিত জগদানন্দ, গজেন্দ্র এবং পরমানন্দ) আকবরের সময় রায় রেঁয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন। মুসলমানের দাসত্ব করিতেন বলিয়াই বিশেষ নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু অর্থবলে শ্রোত্রীকুলীন মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সমাজে উত্থিত হন।...সামাজিকগণ যবনের দাস অপেক্ষা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে অন্তঃশুদ্ধ জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য এই তিন রায় রেঁয়েকে অপবিত্র ও বিশেষরূপে কুলনাশক বলিয়া উল্লেখ করেন।"

এই প্রসঙ্গে, রাজপুতানার ইতিহাসের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মোগল সম্রাটের প্রিয় ও প্রধান সেবক মান-সিংহের সহিত একত্র ভোজনে আসীন হইতে পারেন নাই, বাংলার সেকালের সমাজপতিদের মধ্যেও কতকটা সেই মনোভাবই বিদ্যমান ছিল, যদিও তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাবে।

অবশ্য, একথাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, তুর্কী-মোগল শাসকদিগের সেবায় রত হিন্দুদিগের প্রতি সমাজের এই বিরূপ ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং ভিন্নধর্ম্মা-বলম্বী প্রভুর প্রদত্ত সেবকত্বসূচক উপাধিগুলি পরিণামে ঘৃণার ভাব মুক্ত হইয়া অন্যান্য উপাধি ও পদবীর মতই কেবল বংশচিহ্ন রূপে গৃহীত হইতে লাগিল।

যাহা হউক, এক্ষণে "মেল বন্ধন" এবং "লবণ দোষ" "যবন দোষ" প্রভৃতি ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখা যাক।

মেল বন্ধন।

আধুনিক হিন্দু সমাজে কোন ব্যাপারেই "মেলের" প্রশ্ন উঠে না। কদাচিৎ উঠিলেও উহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয় না। কিন্তু সেকালের বিবাহ ব্যাপারে "মেলের" প্রশ্ন খুব কঠোরতার সহিত বিবেচিত হইত। সে যুগের সামাজিক আবশ্যকতা হইতেই মেল বন্ধনের উৎপত্তি হইয়াছিল। "মেলে"র ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, অ-হিন্দু শাসন কালে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসক-বর্গের সহিত অবাঞ্ছিত সংসর্গের ফলে হিন্দু সমাজের কোন কোনস্থলে যে সকল "দোষ" ঘটিয়াছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করাই ছিল "মেল বন্ধনের" প্রকৃত উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে "মেল" হয়ত একটা নিছক খামখেয়ালী ব্যাপার। কিন্তু কুলজী গ্রন্থের বিবরণ দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তখন-কার সমাজপতিগণ তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত একটা সদুদ্দেশ্য লইয়াই (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "দোষ"গুলি যাহাতে সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রসারিত না হইয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে সেইজন্যই) "মেল" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "দোষ" যুক্ত বংশগুলিকে এক প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য "দোষ"শূন্য ঘরগুলিকেও নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে "মেলমালা" গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য :—

মেল কি পদার্থ হয় করহ শ্রবণ।
মহাভয়ানক রস যাহে আলম্বন॥
যে কালে লক্ষ্মণ সেন নীলাচলে চলে।
হিন্দুরাজ্য শেষ হৈল যবনের বলে॥
সেকালে দেশেতে বড় হল অত্যাচার।
কুলেরে রাখিব কিসে, জাতি রাখা ভার॥
জাতিগত, ধর্ম্মগত, কুলগত বাদ।
আর কি বলিব, মেলে এই অবসাদ॥
ধর্ম্মেতে তাচ্ছিল্য হলে, কিছু নাহি রয়।
অতপূর্ব্বা কয়ে কুল, আর বিপর্য্যয়॥
পর্য্যায় সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল।
নানাবিধ বিপর্য্যয় করিতে লাগিল॥
পৌণে ঐশ্বর্য্য দেখি পৌণ স্বীকারে।
বিবাহ করিতে চলে রায় রেঁয়ে ঘরে॥

এইরূপ ভিন্নমত বংশের করে গতি।
তারপর দেবীবর দুর্ব্বলী সন্ততি॥
সেই সব দোষ লয়ে করে এক ঠাঞি।
মলে মল গুণ করে, তার গুণ গাই॥

অহিন্দু শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত অবাঞ্ছিত সংসর্গের ফলে এবং তাহাদের দাসত্ব-গ্রহণকারী হিন্দুদের চরিত্র-ভ্রংশের পরিণামস্বরূপ সামাজিক বিপর্য্যয় রোধ করিবার জন্যই যে মেল-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা "সারাবলি কারিকা" গ্রন্থেও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে :

মেল বন্ধনের কিবা কব পরিপাটি।
লবণ যবনাদি দোষে আঁটা-আঁটি॥
রহিতা জগদানন্দ পোতারি গজেন্দ্র।
ভিংসাই পরমানন্দ, কষ্ট শ্রোত্রিয়েন্দ্র॥
যবনের দাসত্বে বলায় রায় রেঁয়ে।
করে জাতিবন্ধু দস্যুবৃত্তি, দেখ চেয়ে॥
অজ মিকর্ষা কুটুম্বে পাঠায় সঘরে।
সঘর নৈকষ্য খনি দেখে অসঘরে॥
দ্বিজে লুন ব্যবসায় ব্রাহ্মণ্য বিগত।
যবনের দাসত্বে যবনেই গণিত॥
কেহ অশ্রাব্য, অকথ্য, নীচ পরিবাদে।
পতিত, ত্যজ্য থাকে স্পর্দ্ধায় প্রমাদে॥
এইরূপে লোভী দ্বিজ ভ্রষ্ট হয় কাজে।
ক্রমে তেজে দলে উঠে মজায় সমাজে॥
ইহা দেখি দেবীবর নব্য কুল বাঁধে।
সমদোষী কুলীনেরে এক করে সাধে॥

"যবন দোষ"।

শাসক-সম্প্রদায়ের দাসত্বকেই প্রধানতঃ যেমন "লবণ দোষ" বলা হইত (কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বর্ত্তৃক লবণের ব্যবসায়কেও ঐরূপ দোষ বলিয়া ধরা হইত), তাঁহাদের সংস্রবে ভোজন অথবা হিন্দুনারীর সহিত তাঁহাদের অবাঞ্ছিত সংসর্গজনিত দোষকে তেমনি "যমন দোষ" বলা হইত। উভয় দোষই ভিন্নধর্ম্মী শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি শাসিত-সম্প্রদায়ের প্রতিকূল মনোভাবের প্রমাণ। পরাধীনতার গ্লানি এবং সময় সময় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ধর্ম্মের লাঞ্ছনাজনিত মনোবেদনাই যে এই প্রতিকূল ভাবের কারণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"যবন" সংস্রবজনিত "দোষ" সম্বন্ধে "মেলমালা" গ্রন্থে সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে :

হরিণ মেলেতে, দোষের জালেতে
বেড়িল কুলীন মীন।
নানা অপবাদে, করি অবসাদে,
বলেতে করিল ক্ষীণ॥
যেকালে পীরালি, ঘ্রাণে কতগুলি,
হইল বিকেরি দলে।
সেকালে যবন সংস্রবে ভোজন,
ভুলেতে গালি যে বলে॥
একি অসম্ভব, যে জাতি বিভব,
যতনেতে রাখা দায়।
যবন গমন, রহিল ব্রাহ্মণ,
তাহা কি সম্ভব পায়?

উদাহরণ।

হিন্দুনারীর "যবন"-সংসর্গের ফলে কোন কোন মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। যথা "শুভরাজখানী" মেল। "মেলমালা"য় ইহার যে বিবরণ আছে, "সম্বন্ধ-নির্ণয়"কার তাহার উপর এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

"যবন-নীতা কন্যা বিবাহে অ-কৃতপ্রায়শ্চিত্ত। বন্দ্য মকরন্দ বংশীয় মাধব শুভরাজ খাঁ প্রধান।" সময় সময় "যবন" দোষের মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলেও কোন কোন নিরপরাধ বংশের "দোষ" ঘটিত। ইহার একটি উদাহরণ "ধাঁধা" দোষ। কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা নদীতে জল আনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ "ধাঁধা" অর্থাৎ দমকা ঝড় আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ-কন্যা পথিপার্শ্বে অবস্থিত হাঁসাই থানাদার নামক মুসলমানের গোয়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ঝড় কমিলে কন্যা বাড়ী আসিল। বাড়ীর লোকেরা দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, ব্রাহ্মণ-কন্যা মুসলমানের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। সমবয়স্কারা এই ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করে। ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা অবাঞ্ছিত ভাবে পল্লবিত হইয়া সমাজে রাষ্ট্র হওয়াতে কন্যার বংশে "ধাঁধা" দোষ জন্মিল। অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত এই : অনূঢ়া কন্যা একাকিনী নদীতে গিয়া কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃত-দেহ জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। ইহা লইয়া যবন-সংসর্গের জনরব রটে। ফলে, কন্যার পিতৃকুলে "যবন" দোষ অর্শে।

হিন্দুনারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ কিংবা অপহরণের একটি দৃষ্টান্ত "সাহসখানী" দোষ। শাসক-সম্প্রদায়ের সাহস খাঁ (খান) নামক কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি সকন্যা ব্রাহ্মণীকে হরণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার বংশে "সাহসখানী" দোষ জন্মিল। এই সকল ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারের "দোষ" সত্ত্বেও সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে সমাজে কোন না-কোন প্রকারের স্থান দেওয়া হইত; আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট পত্রের মত লোকগুলিকে হিন্দু সমাজ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করা হইত না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে

রণ রাখা দরকার। তাহা এই যে, উপরি-বর্ণিত "দোষ"গুলি
ম্বন্ধে কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যেই মতভেদ থাকিতে পারে।
কান কোন ঘটক মহাশয়দের বিবরণে ভুলও থাকিতে
ারে। প্রত্যেক "দোষ" সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত
অনুসন্ধান এবং গবেষণা করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়
া। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের কোন ব্যক্তি কিংবা বংশ যেন
নে না করেন যে, এই সমস্ত মধ্যযুগীয় ব্যাপার তাঁহাদের
ম্মান অথবা অসম্মান ঘটাইতেছে। সেকালের হিন্দু-
সলমান সম্পর্কের সামান্য কিছু পরিচয় গ্রহণ করিবার
দ্দেশ্যেই ঐ বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে, সামাজিক
ান-মর্য্যাদার তারতম্য নির্দ্ধারণের জন্য নহে।

"পীরালি"।

"পীরালি" ব্রাহ্মণের উৎপত্তির যে ইতিহাস "নীলকণ্ঠের
ারিকা" নামক ঘটক-কুলজীতে লিখিত আছে (এই
ম্বন্ধে ভিন্ন ইতিহাসও আছে), তাহাতেও সেকালের ভিন্ন-
র্মী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত-সম্প্রদায়ের সামাজিক
ম্পর্কের একটি চিত্র পাওয়া যায় এবং ইহাকে তৎকালীন
াম্প্রদায়িক অবস্থার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে
লিয়া মনে হয় না। নীলকণ্ঠের বিবরণটি সংক্ষেপে এইরূপ:
াদশাহের নিয়োগপত্র পাইয়া খান জাহান আলী যশোরের
াসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর
াম মামুদ তাহির। অপর নাম পীর আলী। এই ব্যক্তি
র্ব্বে হিন্দু ছিলেন। কথিত হইত, তিনি মুসলমান নারীর
পে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মামুদ তাহির
েঙ্গুটিয়া পরগণার শাসনভার পাইয়াছিলেন। তাঁহার
ধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব নামক দুই
্রাহ্মণ ছিলেন। একদা কোন রোজার দিন মামুদ তাহির
ভাসদ সহ বসিয়া আছেন। প্রজারা নানা উপঢৌকন
ানিয়া হাজির করিতেছে। এক ব্যক্তি সুগন্ধ লেবু
ানিয়া ভেট দিল, চারিদিক গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল।
ামুদ তাহির "বাহবা, বাহবা" বলিয়া লেবুটি নাকের কাছে
রিলেন। কামদেব ও জয়দেব বলিয়া উঠিলেন: "হুজুর,
রেন কি? ঘ্রাণেতে অর্দ্ধ ভোজন। আপনার ত রোজা
ষ্ট হইল।" ব্রাহ্মণদ্বয় জানিতেন না এই কথার পরিণাম
রূপ সাংঘাতিক হইবে। কারিকার ভাষায়:

কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোঁহের মন কৈল স্থির॥
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির॥
দরবারে চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
নাত শত বকরি আর গোমাংস রন্ধন॥
পলাণ্ডু লশুন গন্ধে সভা ভরপুর।
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর॥
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে বলে কত পলাইল॥
কামদেব জয়দেব করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত্ত তাহির তখন॥
জারিজুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে॥
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি তো চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা॥
দুই জনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পীরালি হইল তারা হইল জাতি নষ্ট॥
কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ি গেল হাহাকার॥
পীরালি অখ্যাতি দিল ঘ্রাণমাত্র দোষ।
সর্ব্বদেশে রাষ্ট্র হল কুগ্রহের রোষ॥
সংসর্গে পড়িল যারা তারাও মজিল।
শুদ্ধ পীরালি দোষ বলি ঘটকে বুঝিল॥

উপসংহার

কুলজী গ্রন্থ হইতে সেকালের শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল। ঘটককারিকা কিংবা কুলজী গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। সবগুলি মুদ্রিতও হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও সকল গ্রন্থ সহজলভ্য নহে। এই জাতীয় সমুদয় গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে হয়ত আলোচ্য বিষয়ের আরও অনেক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসুগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিতে চাহিবেন, বাংলা-সাহিত্যের সকল স্তরের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহাদের উচিত। মধ্যযুগের শাসক-সম্প্রদায়ের লেখক দ্বারা ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থ অথবা ইউরোপীয় ইতিহাস-প্রণেতা ও ভ্রমণকারীর বিবরণ অপেক্ষা দেশীয় সাহিত্যেই যে এ দেশের প্রজাসাধারণের মনোভাবের অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইবে, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বলিয়া দিবার দরকার নাই। অবশ্য, যদি কেহ মনে করেন যে, কুলজী গ্রন্থসমূহে কেবল অলীক কল্পনাপ্রসূত গালগল্পের সমাবেশ আছে তো তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, কিছু ভুল কিংবা অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুলজী গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়, তাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

খ্রীষ্ট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

খ্রীষ্টান নহি প্রভু,
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অনুভব করি তবু।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই,
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমা-সুন্দর তোমার মূরতি
ভুলিতে পারি কি কভু?

২

ধর্ম্ম তোমার নিয়েছে যাহারা,
নিয়েছে তোমার চিনা,
সন্দেহ হয় আমার দয়াল,
তোমারে নিয়েছে কি না?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে?
মমতা-বিহীন করিতেছে দিন
বসুন্ধরাকে দীনা।

৩

অপ-বিচারেতে ফাঁসি দিল যারা
জাপান জার্ম্মানীতে,
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা
বড় করে ভাবে চিতে।
ইস্পাতে গড়া তাহাদের সব হৃদি,
ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি,
ধরাকে কলুষ কালিমায় চায়
কুৎসিত করে দিতে।

৪

তোমার আলোকে যাবে কি তাহারা
আঁধারের পথ বাহি'?
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে
তোমার সৃষ্টি দাহী।
কি শুভ্র বেশ পরেছে বর্ব্বরতা!
মুখেতে বিশ্বশান্তির বড় কথা,
মোহ আবিষ্ট, মদ-গর্ব্বিত—
স্পর্দ্ধার সীমা নাহি।

৫

তব প্রেম, ক্ষমা, শান্তি রাজ্যে
মেষ-পালকের দেশে,
মেষ কোথা? ক্রূর নেকড়ে ব্যাঘ্র
ভ্রমিছে ছদ্মবেশে।
রক্ত-পাগল, হীন, হিংস্র প্রাণ,
হে ত্রাণকর্ত্তা, তাহারা পাবে কি ত্রাণ?
তোমার জর্ডনে বিষ-বিসর্পী
কি নদী মিশিল এসে?

৬

অতীতে যাহারা কণ্টকহার
পরাইল তব শিরে,
কণ্টকিত কি করিতে ধরণী
তারাই এসেছে ফিরে?
কোনো অপরাধ সাধনে নহেক ভীত,
নহে প্রীতিকামী, স্বার্থলাভেই প্রীত,
করে সমারোহে হিংসার পূজা
দাঁড়ায়ে তোমারে ঘিরে

৭

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল তারা
হাসি' বিদ্রূপ-হাসি
'পরম-পিতা তো রক্ষিতে সুতে
আসিল না ভালবাসি?'
রস-বিগ্রহ, জীবন্ত মন্দির
ভাঙে যুগে যুগে দূতেরা দুষ্কৃতির,
লাঞ্ছনা মাঝে দেবতা উঠেন
নব রূপে উদ্ভাসি'।

৮

বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি
তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোজ্জ্বল পাষণ্ড দল
লুণ্ঠিত ধূলিম্লান।
তুমি জাগ্রত, হে অবিস্মরণীয়,
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ো,
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত্ত প্রেম,
গাহি তব জয়গান।

ভারতের নিকট মুক্তিকামী টিউনিসিয়ার আবেদন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

টিউনিসিয়ার ফ্রান্সের অধীনতাপাশ মুক্ত হইবার জন্য গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের নেতা সাংবাদিক এল হবিব বোর্জিবা ও বহু জাতীয়তাবাদীকে টিউনিসিয়ার অদূরে একটি দ্বীপে ফরাসী সরকার নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এই পত্রখানি বোর্জিবা মহোদয় ভারতের উদ্দেশে আরবি ভাষায় লিখিয়াছেন। উহার ইংরেজী অনুবাদ হইতে তাৎপর্য্য এখানে প্রদত্ত হইল :

“করাচীর বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন হইতে ইন্দোনেশিয়া যাইবার পথে যে ক’দিন ভারতরাষ্ট্রে কাটাইয়াছিলাম তাহা’ আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল বলিয়া মনে করি। এই সময় অনেক নূতন কথাও আমি শ্রবণ করি। ভারতবর্ষে—আমি শুনিলাম ইহা এখন শুধু ‘ভারত’ নামেই আখ্যাত, এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতা এবং পদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান বিপদে সাহায্য করিতে না পারিলেও আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন। করাচী গমনের পর ভারত সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহারও অনেকগুলি আমার নিকট ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দিল্লীতে আমি পণ্ডিত নেহ্‌রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি এশিয়ার মুসলমান, এবং স্বাধীন দেশসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি। সেখানে আমি শ্রীমেননের সঙ্গেও দেখা করিয়াছিলাম। তিনি পদাধিকার বলে সৎপরামর্শ দিবার যোগ্য ব্যক্তি। আমার দেশের মত পরপদদলিত এবং পররাষ্ট্র কর্ত্তৃক অবিশ্বাস্য কুকর্ম্মে জর্জ্জরিত দেশগুলিকে এইরূপ সৎ-পরামর্শ দিয়া তিনি ভারতের প্রতি তাহাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন।

কলিকাতায় আমি তৎকালীন গবর্ণর ডক্টর কাটজুর সঙ্গে আধঘণ্টাকাল কাটাই। এ সময়টির কথাও ভুলিতে পারিব না। আমার সোদরোপম ডক্টর জীলানি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। ডঃ জীলানি আমাদের উভয়ের মধ্যে দো-ভাষীর কার্য্য করেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে ডঃ কাটজুর মূল্যবান্ কথাগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমি আশা করি, ডঃ কাটজুর পরামর্শমত চলিতে সমর্থ হইয়াছি। মহাত্মা গান্ধীর মহৎ আদর্শে তিনি আমাকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এইভাবে চলিলে আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাফল্য-লাভ করিতে পারিব। ইহার পর হইতে, এই কথাগুলির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সেইমত কার্য্য করিয়া আসিতেছি। জীলানির মারফত কাটজু মহাশয়ের কথাগুলির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই উপদেশ অনুসারেই আমি আমাদের উৎপীড়ক রাষ্ট্র

এল্ হবিব বোর্জিবা

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আন্দোলন পরি-চালনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও ফ্রান্সের সঙ্গে আমি যথাসম্ভব ‘নরম’ ব্যবহার করিয়াছি। আপোষরফার মনোভাব লইয়াই আমি আমাদিগের দাবি অনেকটা লঘু করিয়া ‘ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত-শাসন’ পর্য্যন্ত নামাইয়াছি। আমার সহকর্ম্মীরা ইহাতে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন জানিয়াও আমি ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এইরূপ স্বল্প দাবিই করিয়াছিলাম।

আমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূল্যবান্ উপদেশগুলি এবং আন্তরিক সহানুভূতিও আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় ডঃ জীলানি উপস্থিত থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন এমন একজন লোক যিনি ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন। যাহা হউক, আমি ডাঃ রায়কে আমাদের জাতীয় দাবি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যেরূপ বলিয়াছিলাম, মনে হয় তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় মুসলমান নেতা মিঃ আমিরের একটি পার্টিতে প্রতিনিধিস্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে আমি সমর্থ হই। এবার আমার দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ডঃ এম্. সরকার। তিনি ফরাসী বেশ ভালই জানেন। এই দিনকার ব্যাপারটি আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি। আমি নিজে সাংবাদিক; একথা আমি এবং আমার দেশবাসীরা ভালই জানি যে, টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় সাংবাদিকদের যথা—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড','অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকগণ এবং 'মডার্ন রিভিয়ু'র শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থন ও সহানুভূতির উপর আমরা কতখানি নির্ভর করিতে পারি। ডঃ জীলানি আমাকে বলেন যে, 'মডার্ন রিভিয়ু' শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজী মাসিক।

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহ্‌রুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যাহা অর্জন করিয়াছে আমরাও ঠিক তাহাই চাই। আমরা ফরাসী অত্যাচারীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক। আমরা আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে কি করিতে পারি তাহা আমরাই বুঝিয়া লইব। আমরা আমাদের ভাগ্যবিধাতা কোন বিদেশীকে হইতে দিব না।

আমি নিশ্চিত জানি আমার এই আবেদন পণ্ডিত নেহরু, ডঃ কাটজু, ডাঃ রায় এবং সাংবাদিক-প্রধানদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। আমার সহকর্মিগণ এবং আমি ভারতরাষ্ট্রের বিপদের কথা সম্যক্ অবগত আছি। কিন্তু তাহার মহত্ত্বই এইখানে যে, নিজে শত বিপদের মধ্যে থাকিলেও অন্যদের বিপদেও যথোচিত সাহায্য করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না।

টিউনিসিয়া ভারতরাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্যপ্রার্থী। আমরা তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি না। মানবিকতার অধিকার যতটুকু তাহার বলেই আমরা তাহার দ্বারে উপস্থিত। দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।"

যখন রবো না আমি*

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

মরণে আমার কেঁদো না গো প্রিয়
 ফেলো না'কো ফোঁটা আঁখির জল,
সমাধি-শয়ন-শিয়রে আমার
 দিও না গো রাঙা গোলাপ-দল।
আমার লাগিয়া বিষাদ গাথায়
 গেয়ো না'কো কোন করুণ তান,
সয়োর-সারির-চাঁদোয়া দিও না
 সুশীতল ছায়া করিতে দান।
তার চেয়ে ঘন ঘাসের ছায়ায়
 এ দেহ আমার রহিবে ঢাকা,
বরষাধারায় ধোয়ানো সে তৃণ—
 শিশিরের মায়া বুকেতে আঁকা।
আমারে স্মরিলে সুখ যদি পাও
 স্মরিও—ব্যথায় ভরিও প্রাণ;—
ভুলে যাও যদি? তাতেই কি ক্ষতি?
 আমি রবো চির নিরভিমান।
তখনো চলিবে ধরণীর বুকে
 এই মত আলোছায়ার খেলা,
ব্যথায় গুমরি ডাকিবে চাতক
 আকাশে ভাসিবে মেঘের ভেলা।
আমি রহিব না, দেখিব না কিছু
 অনুভবাতীত হবে এ প্রাণ,
এত যে মায়ায় মোহিনী ধরা
 করিবে না মোরে হৃদয় দান।
চির-গোধূলির আঁধারে তখন
স্বপনের সম তোমার মুখ;
 হয়ত নয়নে ভাসিয়া উঠিবে—
না-ও যদি ওঠে তাতে কি দুখ!

---

* ক্রিশ্চিয়ানা রসেটির "Song" কবিতার ভাবানুবাদ।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

পূর্ব্ববৎসরের মত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবারেও জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রু এই সভায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কলিকাতা নগরীর সর্ব্বাগ্রগামী প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। শ্রীনেহ্‌রু সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে—ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীকেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। ভারতবর্ষে যে-সকল জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি সেগুলির প্রশংসা করেন এবং জাতিগঠনের জন্য ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁর মতে আগে স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয়লাভ করে তার পরে বৈজ্ঞানিকগণকে স্ব স্ব বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কাজে নামতে হবে এবং এরূপ বিজ্ঞানীদের দ্বারা দেশের লোকের দুঃখমোচন হবে।

সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট-ব্রিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পশ্চিম-জার্ম্মানী, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে প্রায় চল্লিশ জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভাপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বলেন—ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে শিল্প এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হতে পারে। তিনি প্রচলিত শিক্ষা এবং গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য মত প্রকাশ করেন এবং আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং নিখিল-ভারত যন্ত্র-বিজ্ঞান শিক্ষা-পরিষদকে এ বিষয় সচেতন হতে বলেন। তাঁর মতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত প্রথম শ্রেণীর কারখানাসমূহ রাখতে হবে যেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং প্রস্তুত করতে হবে। ঐ সকল কারখানায় কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যও তৈরি করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সভাপতি মহাশয় মৌলিক এবং ব্যবহারিক গবেষণার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা টানবার পক্ষপাতী নন্। তাঁর মতে সর্ব্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি ভারতবর্ষকে কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের উপদেশ দেন এবং অনুরূপ উপায়ে ইউরোপে যেমন উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বেড়েছে এদেশেও তা সম্ভব হতে পারে—ভরসা দেন। তিনি মৃত্তিকা সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধানকার্য্য চালানো এবং বিদেশ থেকে নূতন নূতন উদ্ভিদসমূহ আমদানী করে কৃষিকার্য্যে বা উদ্যান-রচনায় ব্যবহার করা, জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। পরিশেষে তিনি বৈজ্ঞানিকদের এদেশের কৃষকদের সহিত সহযোগিতা করতে আহ্বান করেন। তাঁর মতে কৃষকই হচ্ছে ফসল উৎপাদনের প্রধান কারিগর—বিজ্ঞানী এই কারিগরকে অবহেলা না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হতে পারবে। এরূপভাবে বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করলে অল্প সময়ের মধ্যে ফসল উৎপাদন উত্তম রূপে বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

অতঃপর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, গণিত, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখাসমূহের সভাপতিগণ স্ব স্ব অভিভাষণ যথাসময়ে পাঠ করেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সভায় মধ্যে সমবেত বৈজ্ঞানিকদের নবাবিষ্কৃত তথ্যসমূহ আলোচনা করতে নির্দেশ দেন।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর আর. ডি. দেশাই। তিনি তাঁর অভিভাষণে বৈজ্ঞানিক বেয়ার প্রবর্ত্তিত 'ষ্ট্রেন থিওরি' ও তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ সালে ভন বেয়ার এই থিওরি বা মতবাদ দ্বারা কার্ব্বন পরমাণুযোগে তিন হতে সাত পরমাণু-সংখ্যা বিশিষ্ট বলয়াকৃতি যৌগিক-পদার্থসমূহের গঠন ও স্থিতির সম্ভাব্যতা বুঝাবার চেষ্টা করেন। বলয়পরমাণুর ক্ষেত্রে এই মতবাদ ভালরূপ কাজ করেছে, কিন্তু যেখানে পরমাণুর সংখ্যা খুব বেশী দেখা গেছে সেখানে তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। চৌত্রিশটি পরমাণুসহযোগে কার্ব্বণ দ্বারা গঠিত যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ এবং কতিপয়ের গ্র্যাণ্ড থেকে নিস্কৃত মাস্কোন এই মতবাদের বিরুদ্ধতা ঘোষণা করেছে। বহু পরমাণুযুক্ত যৌগিক পদার্থগুলি যে পাঁচ বা ছয় পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থগুলিরই অনুরূপ স্থায়ী, রুজিকা প্রমুখ বিজ্ঞানী তাহা প্রমাণিত করেছেন। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে ইনগোল্ড ও থর্প বেয়ারের মতবাদ কিঞ্চিৎ সংশোধন করে আর একটা নূতন পরিকল্পনা (বাহবিচ্যুতি) পেশ করেন। যাহা হউক, বেয়ারের ষ্ট্রেন থিওরির প্রবর্ত্তনে বহু কার্ব্বণবলয়যুক্ত যৌগিক-পদার্থ সম্পর্কে গবেষণার অনেক সুবিধা হয়েছে। ডঃ দেশাই তাঁর এই মতামত সম্পর্কে নিজব

গবেষণালব্ধ দু'একটি মূল্যবান তথ্যের বিষয় বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষে রসায়নসম্পর্কীয় গবেষণার ক্রমোন্নতির বিষয় উল্লেখ করেন।

পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এস. রামচন্দ্র রাও। তিনি তাঁর অভিভাষণে স্ফটিকসমূহের চুম্বক-গুণাবলী সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন—চুম্বক-গুণের উপর ভিত্তি করে দ্রব্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ডায়াম্যাগনেটিক্‌স, প্যারাম্যাগনেটিক্‌স এবং ফেরোম্যাগনেটিক্‌স। চুম্বক প্রথম শ্রেণীর পদার্থসমূহকে বিকর্ষণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থকে ঈষৎ আকর্ষণ এবং শেষোক্ত শ্রেণীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে ফেরোম্যাগনেটিক্‌সগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। চুম্বকগুণযুক্ত পদার্থসমূহ রেডিও ও বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি নির্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এলনি, এলনিকো এবং এলকোমাক্‌স প্রভৃতি কয়েকটি মিশ্র ধাতু দ্বারা এই সমস্ত চুম্বক তৈরি হয়। এই সকল মিশ্র ধাতুর স্ফটিক অবয়ব দেখে তাদের চুম্বকগুণ পরীক্ষা করা হয়। স্ফটিক-পদার্থের বর্ণের সহিত উহার চুম্বকগুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইডের উপস্থিতিই উক্ত বর্ণ এবং চুম্বকগুণের জন্য দায়ী। 'এমেথিষ্ট' প্রস্তরের মধ্যে 'ফেরিক লৌহ' পাওয়া গেছে এবং উহাতে যে নীল রং দৃষ্ট হয় উক্ত 'ফেরিক' লৌহ বোধ হয় তার কারণ। কতকগুলি স্ফটিকের মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং ঐ সমস্ত স্ফটিকের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয়। ডক্টর রাও স্ফটিকসমূহের চুম্বক গুণ সম্পর্কে উপরোক্ত মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন এবং উক্ত বিষয়ে এখনও গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন শ্রীএস. রামানুজম্‌। তিনি ধান, ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ, ফল ও শাকসব্জী, উদ্ভিদ কোষসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহাদের প্রজননক্রিয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে তাহা বর্ণনা করেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ গবেষণার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ ভি. আর. খানোলকার। তিনি ক্যান্‌সার রোগ ও তাহার বিবিধ কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে এক বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—ক্যান্‌সার রোগের কারণ নির্ণয় এক জটিল সমস্যা। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই রোগের সঠিক কারণ দিতে অক্ষম। নির্দিষ্ট একটি মাছ, মোরগ, পশু এবং মানুষের এই রোগ হয়, অথচ একই শ্রেণীভুক্ত আর কারও হয় না—এই রহস্য ভেদ করবার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। জীবদেহের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম সেল বা কোষসমূহের ক্যান্‌সার সেলে পরিবর্তন হওয়া এক বিচিত্র ব্যাপার। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা চলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী ক্যান্‌সারের উৎপত্তির মূলে এক শ্রেণীর ভাইরাস এবং এমব্রাইয়ের কার্য্যকারিতার উল্লেখ করে গবেষণা করছেন। যাহা হউক, ডাঃ খানোলকারের মতে এখনও এই গবেষণা সম্পূর্ণ হয় নি।

গণিত-বিজ্ঞানের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর বি. বি. সেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বলেন—গণিতের প্রয়োগে ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেক সুবিধা হয়েছে। অনেক সময় গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে যে ফল পাওয়া গেছে তাতে শিল্প-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে ফলিত-বিজ্ঞান আরও বেশী করে গণিতের সাহায্য নেবে।

প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীবি. আর. শেষচর। তিনি তাঁর অভিভাষণে নিউক্লিক এসিডসমূহের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জীবদেহের গঠন প্রভৃতির জন্য মূলতঃ এই নিউক্লিক এসিডই দায়ী। তিনি আরও বলেন, জৈব এবং উদ্ভিজ্জ সেলসমূহে দুই শ্রেণীর নিউক্লিক এসিড বিদ্যমান—রাইবোজ এবং ডিসক্সিরাইবোজ। শেষোক্ত নিউক্লিক এসিডই জীবদেহের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকরী এবং যে কোন নূতন প্রাণীদেহ সৃষ্টির মূলেই এই উপাদানের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

খ্যাতনামা রাসায়নিক ডক্টর হল আরগট গাছড়া সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কৃত অনেক মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন। নিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক ডক্টর কেমস্‌ এন্টিবায়োটিক্‌স সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ভারতীয় 'মনাজাইট স্যাণ্ড'-এর বিবিধ শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন শাখাসমূহে বহু মূল্যবান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত ও সমালোচিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের একত্র সমাবেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কে সভাস্থলে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠানের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য জাতীয় সরকার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, বৈজ্ঞানিকদের উচিত যাতে সেগুলি সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

"জাহানারার আত্মকাহিনী"

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

"জাহানারার আত্মকাহিনী"র অনুবাদক শ্রীমাখনলাল শাস্ত্রী বাংলা-সাহিত্যে অপরিচিত ব্যক্তি নহেন। তিনি মিশরের অল্-আজহর মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, দরদী সাহিত্যিক এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক। সম্প্রতি তিনি "জাহানারার আত্মকাহিনী"* প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন (?) হইয়াছেন।

এই পুস্তকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মনে করিয়াই প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান লেখকের উপর সমালোচনার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সমালোচনার বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া চক্ষু স্থির; মন যুগপৎ আতঙ্ক ও সন্দেহে ভারাক্রান্ত হইল। এই পুস্তক কি অনুবাদ, না অপবাদ? অনুবাদক লিখিতেছেন, "জাহানারার আত্মজীবনী কাশ্মীর থেকে পারস্য-ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বাংলাভাষায় বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।" কোন পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিবার সময় পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা বহির একটা হদিস দেওয়া সমীচীন। কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মুখে এইরূপ কোন আত্মকাহিনীর কথা শুনি নাই। কোন ঐতিহাসিক পত্রিকায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না; অথচ 'ঐতিহাসিক' মাখনলাল শাস্ত্রী দাবি করেন, "জাহানারার করুণ কাহিনী মুঘলযুগের অপূর্ব্ব সম্পদ। এই কাহিনীতে আছে সৌন্দর্য্য ও বিভীষিকার অপরূপ সমন্বয়, মানবাত্মার শাশ্বত রূপ।" বৎসরাধিক কাল খোঁজ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, ঐ রকম ছাপা বহির অস্তিত্ব কাশ্মীরে নাই। আন্দ্রিয়া বুটেনশন্ কৃত ইংরেজী অনুবাদের নাম মাখনলাল চাপা দিয়াছেন। ইংরেজ-মহিলার বহির নাম "*The Life of a Mughal Princess*" (G. Routledge and Sons, London, 1931)।

ঐ ইংরেজী বহির সহিত অনুবাদ বহু পরিশ্রমে মিলাইয়া দেখিলাম, উক্ত ইংরেজ-মহিলার বহি-ই বাংলায় তর্জমা করা হইয়াছে। "বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত" করিবার ওজুহাতে অনুবাদক আসলের উপর রং কলাইয়া বিরূপ করিয়াছেন, দীর্ঘ ঐতিহাসিক (?) টীকাটিপ্পনী যোগ করিয়া একখানা পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ইতিহাসের মর্য্যাদা দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইংরেজ-মহিলার বহি নিছক ফাঁকিবাজী, ফার্সি বহি হইতে অনুবাদের দাবি কি তবে একটা স্বদেশী চাল? অনুবাদক যদি এই তথাকথিত পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা ফার্সি বহির রচনাশৈলী সপ্তদশ শতাব্দীর ফার্সি রচনা বলিয়া ঐতিহাসিক-গণের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন তবে নিন্দুকের মুখে চুণ-কালি পড়িবে, জাহানারা জাহান্নমে যাইবেন।

শাস্ত্রী মাখনলালের পুস্তক পড়িয়া মনে হইতেছে এই 'জাহানারার আত্মকাহিনী' বাবর জাহাঙ্গীরের তুযুক বা দিনচর্য্যা নহে; কোন্ অংশ কোন্ বৎসর লেখা হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই।

পুস্তকখানা আসলে ভ্রমণবৃত্তান্তকে রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ দেওয়ার প্রলোভনে লিখিত। কি ভাবে মোগল রাজকুমারীর আত্মকাহিনী তিনি আবিষ্কার করিলেন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, জাহানারার কবরের উপর সামান্য ঘাস দেখিয়া মেমসাহেবের ভাবাবেশ হইল, সম্রাট্-নন্দিনীর কেন এই দৈন্য? কেনই বা কবরের উপর খোদিত শেষ নিবেদনে এই হতাশার অভিরাম? আরও কিছু জানিবার জন্য তাঁহার দরদী প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।—আগ্রা দুর্গে বেড়াইবার সময় তিনি দেখিলেন মুসাম্মন বুরুজের এক শ্বেত প্রস্তরখণ্ড প্রায় পতনোন্মুখ; হাত বাড়াইতেই আসিয়া পড়িল এক পাণ্ডুলিপি, কিয়দংশ অস্পষ্ট ও ছিন্ন। লরেন্স বিনিয়ন মেমসাহেবের বহির ভূমিকা লিখিয়াছেন। উহাতে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা নাই; বহিখানা Dryden-কৃত *Aurangzib* নাটক অপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী বলিয়াই তিনি দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। লেখিকা তাঁহার বহি "India"-কে উৎসর্গ করিয়াছেন। আন্দ্রিয়ার এই মহান্ উদারতা মিস মেয়োর স্বগোত্রীয়ার উপযুক্তই বটে! জাহানারার মুখ দিয়া এই বিদেশিনী মহিলা আমাদিগকে যে সকল কথা শুনাইয়াছেন, তাহা সত্যের অপলাপ মাত্র এবং অত্যন্ত আপত্তিজনক।

মুখবন্ধে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া অনুবাদক এই মেকী জাহানারার আত্মকাহিনীকে বাবর ও জাহাঙ্গীরের দিনচর্য্যা এবং গুলবদন বেগমের ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমপর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। যে সমস্ত ঘটনা এই কল্পিতা জাহানারার মুখে শুনান হইয়াছে সেগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই; পাদটীকাগুলি বরং নিজের ঐতিহাসিক জ্ঞানপ্রচার এবং মূল লেখিকার পক্ষসমর্থনের জন্যই যোগ করা হইয়াছে।

---

* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃঃ ১৮৫; মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কিন্তু অনুবাদের দোহাই দিয়া ঐস্‌লামিক ইতিহাসের এক জন অধ্যাপক পুণ্যশীলা সুফী-সাধিকা শাহজাহান-দুহিতা জাহানারার নামে এই শ্রেণীর মুখরোচক মিথ্যা কুৎসা বাঙালী-সমাজে প্রচার করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। যে বহির নাম উল্লেখ করিতেও ঐতিহাসিকগণ কুণ্ঠা-বোধ করিয়াছেন, তাহার বাংলা ভাষায় অনুবাদ দ্বারা আর যাহাই হউক, বাঙালী পাঠকের ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই আমরা ইতিহাসের নামে এই মিথ্যা-প্রচারের মুখোস উন্মোচনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

আমরা এই বহির ভুলের কিঞ্চিৎ এক কিস্তি পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করিতেছি।

১। "জাহাঙ্গীরের মহিষী মানসিংহের ভগ্নী মানবাই" [মুখবন্ধ, পৃ. ৫]

প্রমাণ ? শাহজাহানের মাতার নাম মানমতি বা বালমতি পাওয়া যায় (B. P. Saxena : *History of Shahjahan*, p. 1)।

মানমতি সংক্ষেপে "মানবাই" হইতেও পারে। মান-সিংহের ভগ্নীর নাম আমরা কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে পাই নাই। "জগৎ গোঁসাইনী" উপাধি, নাম নহে। "গোঁসাইনী" ফার্সি, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী নহে; বাংলায় গোঁসাই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে। *Fuzuk-i-Jahangiri*-র মূল ফার্সি পাঠ গোসাইন্‌—ইহা শুদ্ধ হিন্দী।

২। "আফিমের বিষ" [পৃ. ৬, মূল poppy juice, p. 7]

এক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইলেও আফিম ও পোস্তদানা বিভিন্ন বস্তু। এক দীর্ঘ পাদটীকায় অনুবাদক লিখিয়াছেন, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী শাহজাদাগণকে "বরবাদার আফিমের জল পান করতে দেওয়া হত।" আমরা জানিতাম এইরূপ পানীয় নেশাখোরের অমৃত, রাজপুতানার অমল, সেযুগে হিন্দু মুসলমানের পক্ষে প্রায় সমান হালাল। মেম-সাহেব poppy juice বা পোস্ত-ভিজান জল ঠিকই লিখিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ফলাইয়া শুদ্ধকে অশুদ্ধ করিবার অধিকার অনুবাদকের আছে কি ?

৩। তাঁর [জাহানারার] জীবনীতে হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার বহু পরিচয় পাওয়া যায় (পাদটীকা ১০)।

—যথা ? দুই-একটা বহির নাম, কিংবা কোন সমসাময়িক ইতিহাসের নজীর উদ্ধৃত করিলে পাঠকবর্গ উপকৃত হইতেন।

৪। অনুবাদের নমুনা :—

"In my palace in Delhi I lived like the *dayfly* in the gardens of Shalimar, which seeks intoxication in the cups of flowers"……(p. 11)

"দিল্লীর প্রাসাদে শালিমার বাগে মধুমক্ষিকার মত উড়ে বেড়িয়েছি"……(পৃ. ১০)।

বিলাতী 'ডে-ফ্লাই' কি আমাদের মধুমক্ষিকা ? ইহার পরেই আসিতেছেন, "মণি-মাণিক্যোজ্জ্বল স্বর্ণরেণু পাখায় মেখে ……মক্ষিরাণী।" কালো মৌমাছির সোনালী পাখা কেহ দেখিয়াছেন কি ?

৫। "দূরে ঐ হ্রদের অপর প্রান্তে…" (পৃ. ১২ ; I know of a palace on a hill far away *above the lake*, p. 12)

দেখিতেছি মেম-সাহেবের "হ্রদ" অনুবাদে জমাট হইয়া পাথরের ছাদ হইয়া গিয়াছে, এবং উহার "ঐ শান্ত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে" সেই প্রাসাদ।

৬। পুনশ্চ—By the *Canal* of Firuz Shah—"ফিরোজশার পরিখার পাশে আমার উদ্যানবাটিকা" (পৃ. ১৩)।

ফিরোজশাহের পরিখা জাহানারার জন্মের পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল। এই কথা লেখিকা জানিতেন। অনুবাদক খাল এবং দুর্গপরিখার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই জানেন। দিল্লী

শহরের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমে লেখিকা কর্তৃক উল্লিখিত খালের খাত এখনও আছে, পরিখা কোথাও নাই।

৭। বীর পুট্টা (পৃঃ ২১, ২২)

অনুবাদের কৃপায় মহারাণা প্রতাপের প্রিয় অশ্ব "চেটক" চৈতক হইয়াছে। এইবার শ্রীযুত মাখনলাল শাস্ত্রীর বারকত দুই দুই বার আসিলেন বীর পুট্টা। ফার্সি বর্ণমালায় 'ট' নাই; পুট্টা হিন্দুস্থানী নয়। মেমসাহেব 'ত' বর্ণ স্থানে ট উচ্চারণ করেন; অনুবাদক মেমসাহেবের সুরে সুর বেমালুম মিলাইয়া ফেলিয়াছেন। এই কিশোর রাজপুত বীরের আসল নাম কি ছিল জানিতে হইলে কোন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস কিংবা ওঝা-কৃত 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭) অনুবাদক দেখিয়া লইতে পারিতেন।

৮। বেগম নূরজাহানের জেসেমিন প্রাসাদে আমার কক্ষে …(পৃঃ ৩৯, Eng. p 42)।

আগ্রাদুর্গে মুসাম্মন বরুজ অর্থাৎ মেমের "জেসেমিন" প্রাসাদের সহিত নূরজাহানের কি সম্পর্ক? উহা নির্ম্মিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বিধবা নূরজাহান বিধিবিড়ম্বনায় লাহোরে নির্ব্বাসিতা। এই কথা পাদটীকায় লিখিলে 'ইতিহাসজ্ঞ' অনুবাদকের মুখরক্ষা হইত।

৯। সেই বিরাট চীন বিটপীর তলায়…(পৃঃ ৪৫; the big *Chena*-tree)

"চীন" বৃক্ষ মহাচীনে থাকিতে পারে, ভারতবর্ষে কস্মিন-কালে ছিল না, এখনও নাই। মেমসাহেব নিশ্চয়ই ভূস্বর্গ কাশ্মীরে "চনার" বা চেনার গাছের সারি দেখিয়াছেন। দিল্লী আগ্রায় ঐ গাছ জন্মায় না। অনুবাদক বোধ হয় ঐ গাছের 'চীন' এই নামকরণ করিয়াছেন।

১০। "আমি অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণের মধ্য দিয়া মসজিদে প্রবেশ করলাম"—(পৃঃ ৭১; Through *horseshoe-gate* …p. 79)।

তত্র টীকা—"এই তোরণের মধ্য দিয়া সাতটি হস্তী পাশাপাশি প্রবেশ করতে পারে" (! !)

ঘোড়ার খুর এবং ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল (horse-shoe) কি একই বস্তু? মেমসাহেব সস্তা দরের গাইড-বুক পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শতাব্দীতে স্থানীয় নিরক্ষর লোকেরা বুলন্দদরওয়াজাকে নাল-দরওয়াজা বলে। এইজন্য তিনি কতকটা কসাই, কিন্তু অনুবাদক অর্থ করিয়াছেন ঠিক বিপরীত। Pointed arch, Horseshoe arch, semicircular arch ইত্যাদি খিলানের সংজ্ঞা। বুলন্দ-দরওয়াজার মধ্যে কোন "অশ্বক্ষুরাকৃতি" খিলান অনুবাদক কিংবা অন্য কেহ কি চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছেন? ঐ দরওয়াজার নির্ম্মাণ-শৈলী অর্দ্ধগম্বুজাকৃতি বা Semi-dome style। নীচে যে অংশে নিপদ্ কাঠের বিরাট পাল্লা বসান হইয়াছে উহা

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে:

মেয়াদী বীমায়— } ৮৲ টাকা
আজীবন বীমায়— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং সুদের হার অর্জ্জিত হার অপেক্ষা ½% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে সুদ অর্জ্জন, দুর্মূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ……	৭৩ কোটি	৯৬ লক্ষ	টাকার	উপর	
বীমা তহবিল …	১৫	„ ৯৭	„	„	„
প্রিমিয়ামের আয়	৩	„ ৪০	„	„	„
দাবী শোধ ……	৭	„ ২০	„	„	„

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

অনেকাংশে মুসলমানী Pointed arch-এর মত। তফকে অতর অনুবাদ করার এরূপ দৃষ্টান্ত আর কত দেখাইব। অনুবাদক ইহার সঙ্গে এক অভিনব টীকা জুড়িয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই লাল-দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া মসজিদে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, সাতটি হাতী চুমে থাকুক সাতটি পর্বত কিংবা সাতজন ছু ড়িওয়ালা লোকও পাশাপাশি ঢুকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ইহাকে লাল-দরওয়াজা কেন বলে সিক্রীর এক্কাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়। ঘোড়ার ব্যারাম হইলে তাহারা ঘোড়ার নাল কাঠের পাল্লায় মারিয়া দেয়।

১১। "তুর্কী-বেগমের প্রাসাদ এখনও জলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে; সেই অপ্সরা মহলে প্রত্যেকটি শ্বেত প্রস্তর যেন ক্ষোদিত গজদন্ত।" (পৃ: ৭৭; মূল···*Faery castle*···as if red *sandstone* were ivory, p. 86.)

ফতেপুর সিক্রীর খাস মহলের মধ্যে এই প্রাসাদের আশেপাশে জল কোথায়?

উর্বশী-তিলোত্তমার ডানা ছিল না; সুতরাং অপ্সরা "পরী" হইতে পারে না। মেমসাহেবের "পরীমহল" অপ্সরা-মহল হইল কেন? ঐ প্রাসাদের কোথাও শ্বেত প্রস্তর নাই। লাল বেলে পাথরকে সাদা করিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত এবং ইতিহাসকে অপমানিত করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

১২। বাদায়ুনী বলেন যে আকবরের বাসকক্ষের সম্মুখে একটি দোলনায় বসে সুফিগণ যোগাভ্যাস করতেন। [টীকা পৃ: ৯১]

ইহা কি লোকমুখে শুনিয়া লেখা হইয়াছে? বদায়ুনী এমন আজগুবি কথা লিখেন নাই। জিনিষটা দোলনা নয়, একটা দড়িবাঁধা ঝুড়ি। প্রতি রাত্রিতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ঝুড়িতে বসাইয়া উপরে শয়নকক্ষের বাহিরে ঐ ঝুড়ি বাঁধিয়া রাখা হইত। সুফিরা যোগভ্যাস করিতেন না, আকবরের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করিতেন।

১৩। সে পুত্র যোধাবাই প্রসব করেন সলিম চিশ্‌তীর ক্ষুদ্র কুটীরে [টীকা পৃ: ৯৬]

সলিমের মাতার নাম কোন ইতিহাসে লেখা আছে কি? যোধাবাই তথা সিক্রীর যোধবাই-মহল জনশ্রুতি, ইতিহাস নয়। প্রসবের পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী চিশ্‌তীর ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন না। চিশ্‌তীর বাটীর সংলগ্ন জমিতে উঁহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল সুরম্য রঙমহাল। ইহার ভগ্নাবশেষ এখন বিদ্যমান।

১৪। ছত্রেরা—ছত্রেরা মেমসাহেব-কল্পিত জাহানারার প্রথম প্রণয়ী। লেখিকা Explanations-এর মধ্যে তানসে নাসির-ই-খসরুর পরিচয় দিয়াছেন, অথচ ছত্রেরার কো পরিচয় দেন নাই। সিনেমার বহি ও নাটিকার ধাঁচে শ্রীযু মাখনলাল বাংলা অনুবাদে একটা পরিচয় লিখিয়াছেন। তি ছত্রেরাকে "বুন্দীরাজ" ছত্রসাল বুন্দেলা বলিয়াছেন। ছত্রসা বুন্দেলা "বুন্দীরাজ" নহেন, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওরছার রাজা মেমসাহেব-বর্ণিত জাহানারার লীলা অবসানের কয়েক বৎস পরে বুন্দেলা ছত্রসাল সাবালক হইয়াছিলেন। "বুন্দে বুন্দীরাজ" মোগল ইতিহাসে "সোনার পাথর-বাটি"। ইহা সন্ধান ঐতিহাসিক মাখনলাল কোথায় পাইলেন?

সামুগড়ের যুদ্ধে ছত্রেরা দেলাবত খাঁর সহিত লড়া করিয়া মরিলেন; পিতার সহিত আগ্রা দুর্গে বন্দী হইলে জাহানারা। কয়েক বৎসর পরে দারার ছিন্নমুণ্ড উপহারপা নজর পাঠাইয়াছেন শাহজাহানের কাছে শাহানশাহ আল গীর। তখন রাজকুমারীর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কি প্রেমের উন্মাদনায় প্রাণ কিশোরীর মত চঞ্চল। চারিদি স্মৃতির পাষাণ-প্রাচীর। অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে মুসাম্মন বুরুজে বসিয়া আছেন নীরবে একাকিনী মে সাহেবের কল্পিত জাহানারা, সামনে কাগজ-কলম। তি স্বগত বলিলেন, "আজ রজনীতে আমি যাব না সম্রাটে কাছে;···আমি যে আজি আমার দুঃখের কাহিনী আমাকে বলে যাব"—লেখিকা ইহাতেও সত্যকে বিকৃত করিয়া উদ্ভ কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

জাহানারার মিথ্যা অভিনয়ের ভূমিকায় নামিয়াছেন ম আন্ড্রিয়া, বক্তব্য বা প্রলাপ উত্তম ইংরেজী ভাষায় সপ্রতিভতা বলিয়া গিয়াছেন। বাংলা 'জাহানারার আত্মকাহিনী'ে গোয়ালার দুধ বলিলে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। গোয়ালা দু জল মিশায়, বোতলের কালি ঢালে না। আমাদের দুর্ভাগ পুস্তক-সমালোচনা করিতে বসিয়া মোগল ইতিহাসের দু বোধ রচনা করিয়া ফেলিয়াছি। মোগল যুগের ইতিহা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যে সকল পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাঁহারা বলিবেন—দুধের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয় নাই, পুস্ত খানির সর্ব্বত্র অজস্র ছড়ানো রহিয়াছে।

রাবণ বধ—কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃ. ৫+১৯+৫৪। মূল্য ২৷০ টাকা।

'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় উমেশ-চন্দ্র মজুমদারের নিকট সংরক্ষিত কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে বাছিয়া শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এই .খণ্ডিত নাটকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুই-চারিখানি গদ্যগ্রন্থের লেখক হইলেও মজুমদার মহাশয়ের গদ্যসাহিত্যে খ্যাতি নাই, তিনি যে আবার নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণের গোচর ছিল না। এই আবিষ্কারে কবির সাহিত্য-কীর্ত্তি যে বর্দ্ধিত হইল তাহা নহে; পুরাতন সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে রচিত এই নাটকখানি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি বিচিত্র নমুনা হিসাবে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করিবে এই মাত্র। ইহাতে লেখক আধুনিক সিনেমায় প্রযুক্ত "ফ্লাশ ব্যাক" পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছেন এবং সিনেমাসঙ্গত দৃশ্যপরিবর্ত্তনে স্থান ও কালের বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক আশ্চর্য্য দ্রুতগতির সঞ্চার করিয়াছেন। মাত্র ৫০।৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে সমগ্র রামায়ণের মূল দৃশ্যাবলী পাঠকের চোখের সামনে আবর্ত্তিত হয়, ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ঘটনা লইয়াই নাটক হয় না, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে চরিত্রগুলিরও বিকাশ ও পরিণতি প্রয়োজন। এই নাটকে তাহা হয় নাই, সুতরাং ইহা অভিনয়োপযোগী নহে। ভাষা ক্রিয়াপদে প্রধানতঃ চল্‌তি হইলেও অত্যন্ত দুরূহ বিশেষ্য বিশেষণে কণ্টকিত। মোটের উপর, এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতেই হইবে। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ মিত্র দীর্ঘ "সম্পাদকের নিবেদনে" নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন কবির জন্মের তারিখ সম্পর্কে জীবনীকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ১২৪৪ সন গ্রহণ না করিয়া ১২৪১ সন গ্রহণ করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কবি 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা সম্পাদন করিতেন এ খবরই বা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা যতদূর জানি হরিশ্চন্দ্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'রাবণ-বধ' গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন নাই, তাহা অমিত্রাক্ষর—গৈরিশী ছন্দে লিখিয়াছিলেন। দুঃখের সহিত শেষে একটি অনুযোগ না করিয়া পারিতেছি না, বইখানি অযত্ন-সম্পাদিত, বহু মুদ্রাকর প্রমাদে কণ্টকিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবর্ত্ত—শ্রীইন্দুভূষণ দাস। গণ-দীপায়ন পাবলিশার্স, ১৭০এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৪। দাম দুই টাকা।

একটি মন্দভাগ্য ছেলের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কাহিনী এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। নানা চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে আবর্ত্ত সৃষ্টির প্রয়াসও ইহাতে আছে—সে সব একান্তই বাহিরের দিক; নায়কের মনোজগতে এই বিপর্য্যয়ের ছাপ সামান্য মাত্রই পাওয়া যায়। গল্পটি আগাগোড়া সমতাযুক্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হইয়া বেশ খানিকটা দূরেই সরিয়া গিয়াছে। পরিশেষে অবশ্য সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা মিলিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছে।

সম্ভাব্য বাণীচিত্রের প্রভাবই এই ধরণের গল্প-রচনার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য যে সব বাণীচিত্র আমাদের বর্ত্তমানকে পীড়িত ও ভবিষ্যৎকে আশাশূন্য করিয়া তুলিতেছে—এটি তাহাদের সগোত্রীয় নহে। ইহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ যথেষ্ট ছিল—গল্পকে ছায়াছবির রাজ্যে ভিড়াইয়া দিবার তাড়াই সে সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছে।

আর্থিক লাভকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সাহিত্য-রচনাকে বিষম ব্যাধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আজকাল এই ব্যাধির প্রকোপটা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিষম ব্যাধিতে আক্রান্ত লেখকগণ কিভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাহার প্রমাণ।

আমি ছিলাম—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। উপন্যাস রচনায় তিনি গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই—কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই সব লইয়া এককালে বাদবিতণ্ডার অন্ত ছিল না। আজ পরিণত বয়সে তাঁহার রচনায় সে বিদ্রোহের সুর নাই, ভূয়োদর্শনে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহারই নিদর্শন। এটি উপন্যাস হইলেও অতীত স্মৃতি-উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়া বাস্তবকেই যেন নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহাকে জীবন-স্মৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী

Indian Constitutionএর বাংলা ব্যাখ্যা

...এই গ্রন্থটির অপরিসীম উপকারিতার কথা অস্বীকার করা যায় না। —**যুগান্তর**

...দেশের একটি প্রকৃত অভাব পূরণ করিয়াছেন... এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। —**দেশ**

...Written in a fascinating and chaste language......the author's approach and presentation......clear and vivid. —*Modern Review.*

দাম আড়াই টাকা, ডাকমাশুল আলাদা।

এবা পাবলিশিং কোম্পানী
১৯০সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিমিটেড
১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
ও অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়।

এ গল্পের নায়ক বামগ্রহের পাড়ে গিয়া পৃথিবীকে খানিকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াছে এবং বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা আত্মস্বরূপটি চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ধনজনসমৃদ্ধ সংসারে তাহার সঙ্গী কেহ নাই—কেহ তাহার সম্মান করে না, তাই অতীতকে অত্যন্ত স্নেহে, মমতায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিবার প্রয়াস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে গল্পের গ্রন্থি কিছু শিথিল হইলেও রসোপভোগ ব্যাহত হয় না। নায়কের অপূর্ণ ইচ্ছার পরিপূরক হিসাবে সুকুমার চরিত্রের অবতারণা। তাহার দেশপ্রীতি ও বলিষ্ঠ সমাজগঠনের প্রচেষ্টা সুচিত্রিত হইয়াছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠ চরিত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এক মমতাময়ী নারী—মণিকা। উভয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ ও দুঃখবরণের মহত্ত্বে কাহিনী হইয়াছে উজ্জ্বল।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

পূর্ণচ্ছেদ—শ্রীগিরি দেবী। বসেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

তিনটি নর-নারীর অন্তরে ভালবাসার আবির্ভাব ও দ্বন্দ্ব এবং আত্মত্যাগের উপর সেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার করুণ-কাহিনী এই উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। এই ধরণের কাহিনী দেশী-বিদেশী উভয় সাহিত্যেই প্রচুর আছে। লেখিকা প্রকাশভঙ্গীর কৌশলে পুরাতন গল্প নূতন রস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তেমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল না। তবে যাঁহারা শুধু সময় কাটাইবার জন্য গল্প পড়িতে ভালবাসেন—এই গল্প তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দাদূবাণী—শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার। বীণা লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থকার মধ্যযুগের বিখ্যাত সাধক দাদূর অমরবাণী হইতে বাছিয়া দেড় শতটি বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সরস। ইহার সাহায্যে পাঠক মূল শ্লোকগুলির রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

খুসির খেয়াল—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। ৮১।৩, হরিশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য আড়াই টাকা।

খেয়াল, সন্দেহ নাই। আধুনিকতার ঝলক দেওয়া কবিতার বই। কোথাও মনোবিজ্ঞানের ছায়া, কোথাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের চমক। ভাবুকতা নাই, ভাবালুতা আছে। যে যুগে শরীরের ক্লান্তি আর মনের অনুভূতি লোকে হাল্কা হাওয়ায় সঙ্গে শূন্যে উড়াইয়া দিতে চায়, হয়তো সেই যুগেরই উপযুক্ত ছড়া।

"জানালায় ভেসে আসে নাইটকুইনের গন্ধ—
এমারেলিন, পুর্ণিমা, প্রাতিস্নাতা।
দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিক—
পদ্মাপাড়ের (?) কুমিরের বাচ্চা।
মন্তব্য ছাড়াই।
ধরেছে চেপে টুঁটি

সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া
লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭
ফোন—সাউথ ৮৭১

যেন মুসোলিনী
আবিসিনিয়ার টুঁটি চেপে
গোঁফহীন গোঁফে দিচ্ছে চাড়া।"
কাব্যের টুঁটি কেহ চাপিয়া ধরে নাই তো?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঝড় (প্রথম খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

"ঝড়" এরেনবুর্গের 'ষ্টর্ম' নামক ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায় তাহারই পটভূমিকায় উপন্যাসখানি রচিত।

অতীত ও বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন যুদ্ধ দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। একটা সহজ সরল পথেই ছিল তাহার গতি, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। আজ ইহা শুধু একটি দল বা জাতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে পটভূমিকা এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক দিয়াই উপন্যাসাদিতে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে। উপন্যাসের ঘটনা স্বল্পপরিসর স্থানে আবদ্ধ নাই—বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। এরেনবুর্গ একথা শুধু অনুভবই করেন নাই, সে অনুভূতিকে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন "প্যারীর পতনে", আর তাঁর সে প্রয়াস পরিপূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছে "ঝড়"-এ। লেখক শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নজিরকেই একমাত্র উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি যেমন আধুনিক অভিনব সংগ্রামের জটিলতম রূপকে বুঝিতে পারিয়াছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তার দানবীয় বীভৎসতাকে। তিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন এবং অপরিসীম দরদ দিয়া প্রত্যেকটি মানুষকে চিত্রিত করিয়াছেন—কোথাও ন্যায্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই। এত বিচিত্র মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তিনি নিজের আসল সত্তাকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁর নিপুণ তুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন প্যারীর ভঙ্গুর সমাজকে, তেমনি লা'সিয়ে আর বার্টি, মাদো এবং লুই, নিভেল, ডুমা, কেলার, হিল্ডা, সার্জি ও সীপ প্রভৃতি সকলকেই লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছেন। পাত্রপাত্রীদের চিন্তাধারা সুখ-দুঃখ, প্রেমপ্রীতি, ঘর বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা—সে ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুন ব্যথা, কোনকিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নাই।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে যাঁহারা যত্নবান হইয়াছেন শ্রীঅশোক গুহ তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকখানিও নিপুণ অনুবাদক হিসাবে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তাঁহার ভাষা সহজ সরল অথচ বেগবতী, বলিবার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী—(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ১৭-বি, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৭ হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে ১।০, ১।০, ১৷০ ও ৷০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীচণ্ডীর চরিত-ত্রয়ের এবং অর্গলা, কীলক, কবচ ও বৈদিক দেবীসূক্তের সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবিশ্লেষণ-যুক্ত সরল ব্যাখ্যার সহিত ষট্‌চক্রভেদ-রহস্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীশ্রীজগন্মাতার লীলামাহাত্ম্য, তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন-পদ্ধতি, চণ্ডীপাঠের নিয়ম, অর্গলা, কীলক কবচ ও দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের আলোচনা এবং মূর্ত্তিপূজা-রহস্য বর্ণিত আছে।

তৃতীয় খণ্ডে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এবং সুবোধিনী নামক বিশেষ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে পাঠবিধি, বৈদিক রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তসহ ষড়ঙ্গ সপ্তশতী চণ্ডীর মূল সংস্কৃতশ্লোকাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এই চারি খণ্ড গ্রন্থে লেখক শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। চণ্ডীর বহুবিধ সংস্কৃত টীকা বা সাধনসমরাদি বৃহৎ বাংলা পুস্তকাবলীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করা সাধারণ পাঠকের দুঃসাধ্য ; কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনীর যথোচিত সংক্ষিপ্তসার পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেই বিশ্বজননীর অপার লীলামাধুরী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন। চতুর্থ খণ্ডে বৈদিক দেবীসূক্ত চণ্ডীপাঠের অন্তে পাঠারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বেই পাঠ্য বলিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল চণ্ডীতে নির্দ্দেশিত। শত বারাহী ও মরীচিতন্ত্রের বিধিবাক্য পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সূক্তাদি বিষয়েই প্রযোজ্য ; কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডীর মূল আকর ঋগ্বেদীয় সূক্তাদি বেদের প্রাচীনত্ব ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া অগ্রে পাঠই সমীচীন। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রের প্রসিদ্ধ মহাকালীর ধ্যানমন্ত্রেও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, শেষের দুইটি চরণকে পূর্ব্বাপর উন্টা করা হইয়াছে। ইহা যে ভুল তাহা মধ্যমচরিত্রের মহালক্ষ্মীর এবং উত্তরচরিত্রের মহাসরস্বতীর ধ্যানদ্বয় দৃষ্টেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শিবরাত্রি-পূজা ও কথা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমন্দির, ৮৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য দশ পয়সা।

গ্রন্থকার মূলত মূল্যে বিবিধ পূজা ও ব্রতকথা প্রকাশ করিয়া হিন্দু বাঙালী গৃহস্থের বিশেষ উপকারসাধন করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকের গোড়ার দিকে শিবরাত্রির পূজা সম্বন্ধে যে তত্ত্বালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এই পুস্তকে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে ব্রতকথা এবং লিঙ্গাষ্টকম্, শ্রীশ্রীউমানন্দভৈরবস্তোত্রম্, শ্রীশ্রীহর-গৌরী আরতি এই তিনটি সংস্কৃত স্তোত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র
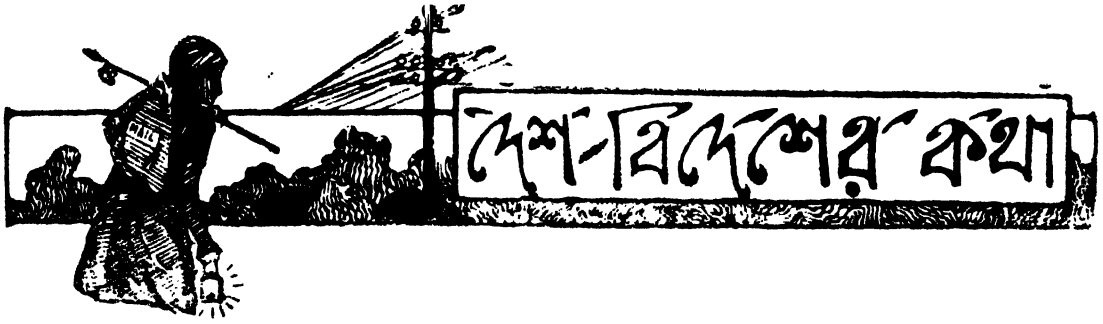
ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোর সম্মান লাভ

'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিত্তালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্ত 'সার যদুনাথ সরকার' পদক প্রদান করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক কানুনগোর গবেষণাও বিশেষ মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত ডিগ্‌গি, জয়পুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যাদি মোগল-রাজপুত ইতি-

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

হাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপর অভিনব আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধ্যাপক কানুনগো একজন শক্তিমান বাংলা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ-লেখক। তিনি শের শাহের ইতিহাস, জাঠদের ইতিহাস, দারা শোকোর ইতিহাস প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তকের প্রণেতা।

অধ্যাপক কানুনগো আচার্য্য যদুনাথের একজন পুরনো ও প্রিয় শিষ্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

সম্প্রতি সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয়ে ইহার সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্মধারা পর্য্যালোচনা করিয়া ১৯৪৯-৫০ সালের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন—

আলোচ্য বর্ষে ৬টি প্রচারক-দল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শ প্রচার করেন। সঙ্ঘ হইতে একটি সাংস্কৃতিক মিশন দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার করেন।

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রগুলিতে সঙ্ঘ আলোচ্য বর্ষে বহু তীর্থযাত্রীকে অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই বৎসর কুরুক্ষেত্রে একটি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘকর্তৃক ৫০টি প্রাথমিক বিত্তালয় এবং ১টি বিদ্যার্থী-ভবন পরিচালিত হইয়াছে। সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন ভাষায় জাতিগঠনমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ-সম্বলিত ৫০খানি পুস্তক, দুইখানি মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারে শরণার্থীদের জন্ত একটি বিদ্যালয় ও কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্ত শিল্পশিক্ষালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

এই বৎসর গয়া, কাশী, সাগর, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে বিভিন্ন মেলায় সেবাকার্য্য করা হইয়াছে। সঙ্ঘকর্তৃক আসামে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলেও সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে কলেরা- ও বসন্ত প্রতিষেধক টিকা এবং ইঞ্জেকসন দান, ৪০ সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাণাঘাটে প্রতীক্ষমাণ শরণার্থীদের জন্ত একটি সদাব্রত খোলা হয় এবং শিয়ালদহ, বনগাঁ, ডায়মণ্ড হারবারে শরণার্থী-শিবির পরিচালিত হয়। ডায়মণ্ড হারবারে একটি শিল্প-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাও এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য। তা' ছাড়া গয়া সেবাশ্রমেও এই বৎসর শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্যদান করা হয়। বহু লোককে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন, বৈদিক যজ্ঞ ও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

আয়ব্যয়ের হিসাব নিম্নলিখিত রূপ :

আয়—(সাধারণ তহবিল) ৪১৩,৪০৭৸০ ; ব্যয় ২৫৭০৭ টাকা, সাহায্য-ভাণ্ডারে আয়—১১৪৪৮৬৷/৩ এবং ব্যয়—৪১৫৪২৷৯ পাই।

প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তি

হাঁদি বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়কে ডক্টর অব সায়ান্স (আয়ুর্বেদ-

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
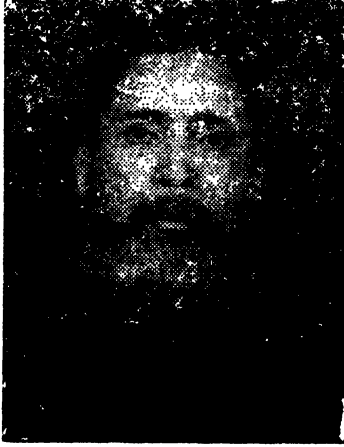
বৃহস্পতি) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "সায়াল অব পালস্"।

কবি ভুজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কবিবর ভুজঙ্গধর স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বসিরহাট টাউন হলে বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের একাদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিরাট স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ভুজঙ্গধর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে সমিতির একাদশবর্ষব্যাপী প্রচেষ্টার বিশদ বিবৃতি প্রদান করেন।

প্রায় পাঁচ শত নর-নারী কবির স্মৃতি-বাসরে উপস্থিত হইয়া নিজেদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবির বিভিন্ন কাব্যাবলী, অনুবাদ-সাহিত্য, পঞ্চদশী, গীতাকাব্য, মেঘদূত, চণ্ডীকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি এবং সামাজিক ও লোকসেবক হিসাবে তাঁহার উন্নত হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা, তাঁহার বিলাসব্যসনহীন নিরলস জীবনযাপন, ইংরেজী সাহিত্যের প্রাঞ্জল মর্ম্মানুবাদে নৈপুণ্য প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করিয়া শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি সার-গর্ভ ভাষণ দেন। শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল, মঃ খোদলাল, শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার দ্বারা ভুজঙ্গধরের স্মৃতির প্রতি

কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব ছিল—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে কবি ভুজঙ্গধরের একখানি তৈলচিত্র রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁহার কাব্যরাজি হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ আহরণ করিয়া একখানি সঞ্চয়ন-গ্রন্থ সঙ্কলনের কথা হয়। ভুজঙ্গধরের কবিতা হইতে সুরযোজনাপূর্ব্বক কয়েকটি সঙ্গীত গীত হয়। তাঁহার রচিত পদাবলীর কতকাংশ লইয়া কীর্ত্তনও করা হইয়াছিল।

চন্দ্রশেখর সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ সরকারী উকিল চন্দ্রশেখর সেন গত ১৭ই মাঘ ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-পরিজন চট্টগ্রামের সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগের পর তাঁহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সকল গুণ থাকিলে আইন-ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করা যায় চন্দ্রশেখরের তাহা পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি খেলাধুলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং গত তিন বৎসর যাবৎ মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বিনয়ী, সদালাপী, সকল সৎকার্য্যে উৎসাহী এই ব্যক্তির বিয়োগে বাঙালী সমাজের অনেকে ব্যথা অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রাবিত শোক লাভ হউক।

রমেশচন্দ্র চৌধুরী

অনুশীলন সমিতির আর এক জন বিশিষ্ট কর্মীর তিরোধানে আমরা আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। বিপ্লবী-জীবনের অনিয়ম ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য অকালে নষ্ট হইয়া যায়। ময়মনসিংহ—বাজিত-পুরের এক সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পরেই তিনি বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। রমেশচন্দ্রের পুত্র ও পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কিরণচন্দ্র ঘোষ

গত ২৬শে পৌষ ষ্টেটস্‌ম্যানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রিপোর্টার কিরণচন্দ্র ঘোষ ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপোর্টার হিসাবে উক্ত পত্রিকায় যোগদান করেন। পরে প্রধান রিপোর্টারের পদে উন্নীত হইয়া ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ঐ বৎসরই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাংবাদিক মহলে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ম্যাক্সিম লিটভিনফ

সোভিয়েট প্রচারপত্র "প্রাভদা" ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লিটভিনফ গত ১৭ই পৌষ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল :

তিনি ১৮৭৬ সালে বিয়েলষ্টকে জন্মগ্রহণ করেন। সতর বৎসর বয়সে তিনি স্বেচ্ছাসৈন্যরূপে সেনাদলে যোগদান করেন। সেনাদলে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। সেনাদল ত্যাগ করিয়া তিনি ফিরেতে সোস্তাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে উক্ত পার্টির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত লিটভিনফও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান। কিছুদিনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডই তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯০৩ সালে তিনি পুনরায় রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তদবধি রাশিয়াতেই ছিলেন।

পূর্ব্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিনি রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট তিনি যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা যদি গৃহীত হইত, তবে ইউরোপের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা অন্য পথে বহিয়া চলিত।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রিটেনে রুশ-দূত নিযুক্ত হন। কিন্তু এ সময় গ্রেট ব্রিটেন বিনা কারণে সোভিয়েট-রাষ্ট্র আক্রমণ করে। তার মধ্যে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। রাশিয়ায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণকে আটক করা হইলে প্রতিভূ হিসাবে মঁ: লিটভিনফকেও লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের শেষভাগে কূটনীতিক বন্দীগণকে মুক্তিদানের জন্য উভয় সরকারের মধ্যে একটি বুঝাপড়া হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৫ সালে মস্কোতে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাব বিশ্ববাসীর নিকট ব্যক্ত করেন।

১৯৩৯ সালের মে মাসে মঁ: লিটভিনফ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং মঁ: মলোটোভ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে তিনি আমেরিকায় সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত-পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ইহার পর তিনি সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত কার্য্যভার ত্যাগ করেন।

মঁ: লিটভিনফ ইংরেজ ব্যারিষ্টার স্যার সিডনী লো'র কন্যাকে বিবাহ করেন। "শান্তি অবিভাজ্য" কথাটি তাঁহারই রচিত।

লিটভিনফের সময়েই "জিনোভিয়েভের চিঠি" ব্রিটেনের প্রথম শ্রমিক সরকারকে ক্ষমতার আসন হইতে দূর করিতে সাহায্য করে। চার্চ্চিল এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। এই চিঠি জাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সেইরূপ ১৯৩২-৩৩ সালে মুদ্রাস্ফীতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে হয়। তদবধি চার্চ্চিল সোভিয়েটের বন্ধু হইয়া পড়েন ; হিটলারের ভয় তাঁহাকে পাইয়া বসে। তার পরের ঘটনাবলী ইতিহাসের অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল আজ দেখা দিতেছে।

লর্ড লিন্‌লিথগো

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্যতম বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ৬৪ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার নাম ব্রিটিশের অধীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মত দীর্ঘ (সাড়ে সাত বৎসরব্যাপী) শাসনকাল অনেক বড়লাটের ভাগ্যে ঘটে নাই। অধিকন্ত এই সময়ের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ক্রিপস মিশন, কংগ্রেসের দ্বারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড় আন্দোলন" (১৯৪২), ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তর ইত্যাদি ঘটনা লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর সময়ের।

তিনি "গো-দাম" একটা ফ্যাশনে পরিণত করেন। তাঁহার ফল একেবারে নিরর্থক হয় নাই। বলিতে গেলে ভাল-মন্দ মিশিয়া লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ব্রিটিশ চরিত্রের প্রতীক ছিলেন ; "জন বুল" ষাঁঢ় বা "বুল ডগ"—বাধা কুকুরের প্রকৃতি মানবদেহে প্রবেশ করিয়াছিল। আজ তিনি নিন্দা-প্রশংসার অতীত।
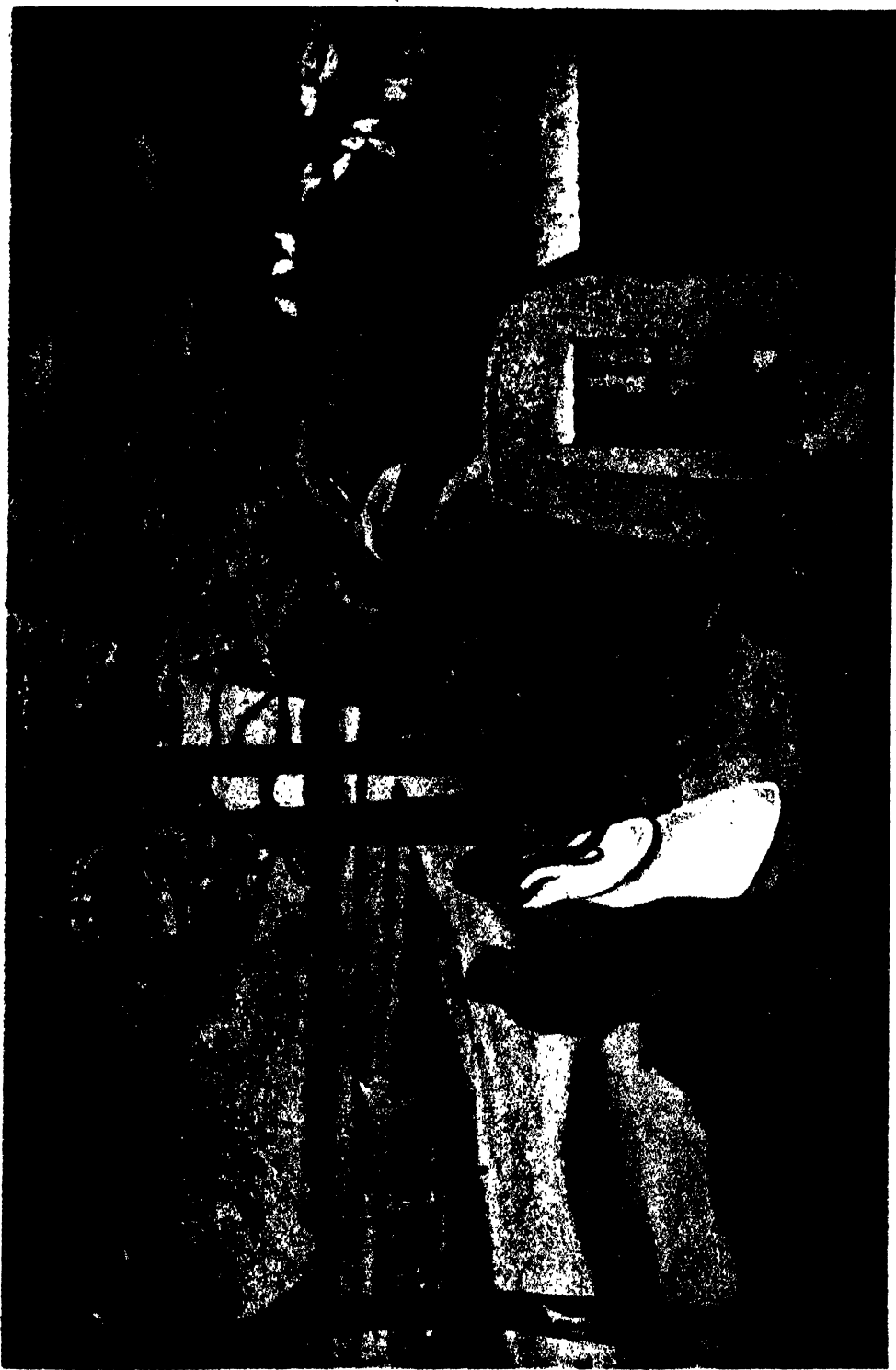
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঝড়

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

ফোর্ট উইলিয়মের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশী স্থাপিত
নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন শিবমন্দির

কলিকাতা বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রী৺ ভবতারিণী দেবীর লিপিহীন নবরত্ন
মন্দির। দুই পাশের অষ্টশালা ও সম্মুখের নাটমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে
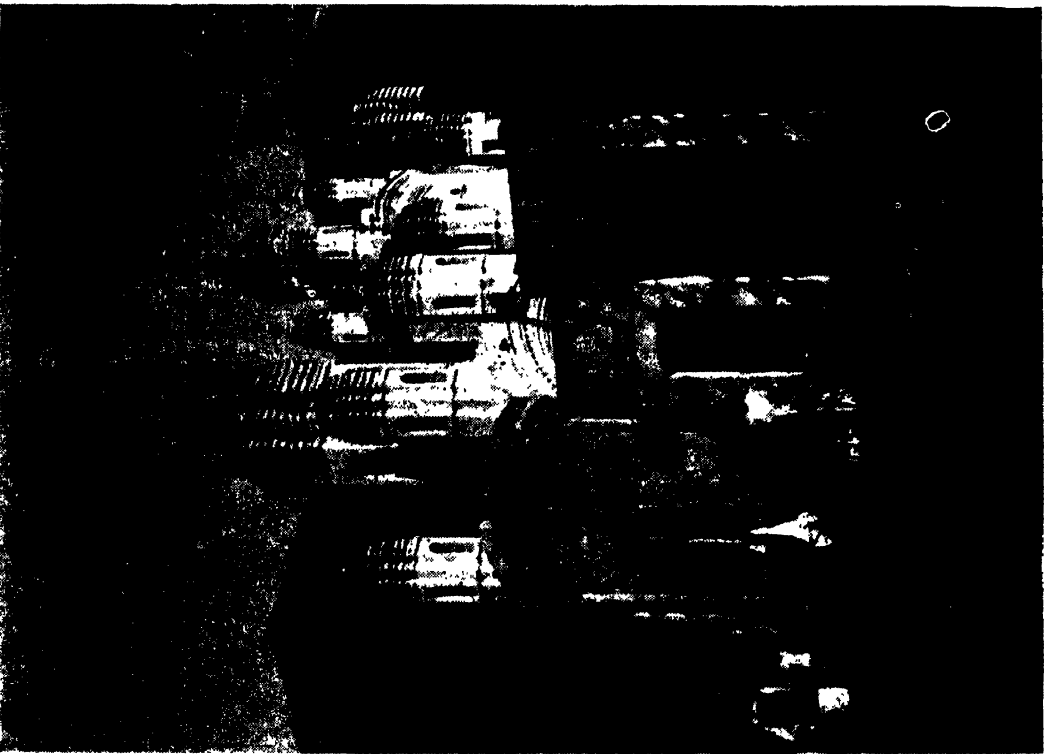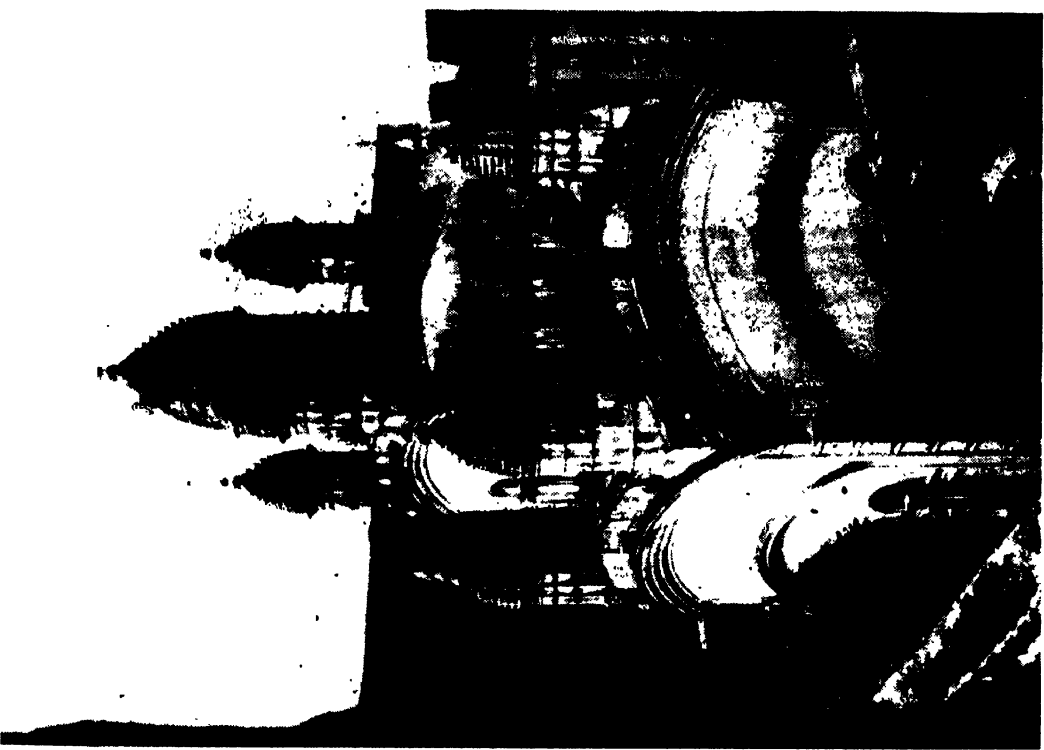
বিবিধ প্রসঙ্গ

নির্ব্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের রূপ

নির্ব্বাচন ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ একই কথা—একথা সম্পূর্ণ সত্যও নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। সুতরাং এই যে নির্ব্বাচনের পালা প্রায় শেষ হইয়া আসিল উহাতে পশ্চিম বাংলায়, তথা ভারতের আগামী পাঁচ বৎসরের ভাগ্যনির্ণয়ের ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার বিচার করা প্রয়োজন, কেননা আমরা বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের ধারায় নৌকায় বহর ভাসাইয়া চলিয়াছি। ঐ ধারা আমাদের কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, কোথায় কখন প্রবল বন্যাপ্রবাহে তরী টালমাটাল হইতে পারে, কাণ্ডারী যাহাদের নিযুক্ত করিলাম তাহাদেরই বা বড়ঝাপটা সামলাইবার ক্ষমতা কতটুকু—এ সকলই বিবেচনা করা প্রয়োজন। অনেকে বলিবেন, "যা হইবার তা ত হইয়াই গিয়াছে, এখন আগামী পাঁচ বৎসর নীরবে কপালে লেখার ফলাফল গ্রহণ করা ছাড়া কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই।"

এই নিরুদ্যম অদৃষ্টবাদের পথেই বাঙালী বর্ত্তমানে চলিতেছে এবং ঐ কারণেই সে আজ "গত গৌরব হৃত আসন নত মস্তক লাজে।" নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও নির্ব্বাচনের মধ্যে ঐ ভাবই তাহার ছিল, এবং যদি ভবিষ্যতেও ঐ ভাবই থাকে তবে বাঙালীর অদৃষ্টলিপিতে "সমাপ্ত" লিখিয়া উহাকে চিতায় সমর্পণ ভিন্ন আর কর্ত্তব্য কিছুই নাই। এবারের নির্ব্বাচনে বাঙালীর মনের যে চিত্র আমরা দেখিলাম তাহা এক দিকে নৈরাশ্যজনক, অন্য দিকে অদ্ভুত।

রূপকের ভাষা ছাড়িয়া স্পষ্ট কথায় বলিতে হয় এবারের নির্ব্বাচনে আমরা দেখিলাম বাঙালীর—বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর—মন হয় শিশুর ন্যায় অপরিণত, নয় "বাহাত্তুরে" প্রাপ্ত বৃদ্ধের ন্যায় জরাজীর্ণ ও শৈথিল্যপ্রাপ্ত। কেননা দেখিলাম বাঙালী নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য বুঝে নাই, নির্ব্বাচনের কার্য্যক্রম জানে না এবং ঐ ব্যাপারে তাহার যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের আহ্বান আছে সে বিষয়ে তাহার কোনও চেতনাই নাই। বাঙালী যে স্বাধীন সে কথাও সে ঠিক কতটা বুঝিয়াছে তাহা বুঝা গেল না, তবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তাহার যে কোনও দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিতের কথা বলিয়াছি তাহা রহিয়াছে বাঙালীর এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে। যদি ইহা জাতিগত "dementia praecox" হয় তবে সব শেষ। না হইলে ধন্বন্তরীর চিকিৎসায় যদি জরাভাব যায় তবে কিছু হইলেও হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষিত বাঙালী নির্ব্বাচক বুদ্ধিমত্তা হিসাবে বিদেশী নির্ব্বাচক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তবে এরকম অবস্থা হয় কেন?

এবারকার নির্ব্বাচনে শিক্ষিত বাঙালী পুরুষের মধ্যে শতকরা দশ জনও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমরা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলি নাই। কলিকাতায় যে সকল অঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের বাস সেখানকার, বর্দ্ধমান শহরের ও অন্যান্য তিন-চারটি কেন্দ্রের ভোট-ফল জানিবার পরে আমরা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এবং ঐ বিচার-ফল সুঠিক কিনা বুঝিবার জন্য নানা স্থানের অনেক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিয়াছি, তাহাতেও ঠিক ঐ হিসাবেই আসে।

প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলির পূর্ণ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, কেননা তাহার সম্যক্ বিচার বিরাট্ ব্যাপার। মাসিকপত্রের সম্পাদকীয়ের আয়তনে তাহার স্থানের একান্তই অভাব। তবুও কিছু বিচার করা প্রয়োজন।

এক স্থলে অধিকাংশ ভদ্রলোকই বলিলেন, "মশায় যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, ছলে-বলে-কৌশলে ভোট ভিক্ষা চলে, ভোট পেয়ে গেলেই তার পর সব কথা শেষ। যদি জেতে তবে নিজমূর্ত্তি ধরে, আর যদি হারে তবে ডুব মারে।" একথায় দেখিলাম উপস্থিত আট-দশ জন ভদ্রলোক সকলেই মোটামুটি একমত।

হয়ে গেছে, এখন যা হবার তাই হবে। আমি ভোট দি নাই মশায়, ওসব চ্যাংড়া ছেলে-ছোকরার ব্যাপারে কি ভদ্রলোকে যায়?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে নানা মুনির নানা মত পাওয়া গেল। মোটের উপর বুঝিলাম মনের মত লোক, যাহার কথায় বিশ্বাস করা যায় এ রকম, তাঁহাদের অধিকাংশের বিচারেই, প্রার্থীরূপে দাঁড়ায় নাই, সুতরাং তাঁহাদের ভোট দিবার স্পৃহাও হয় নাই। অন্য দিকে উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বা প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতার বিচার করা, এ দুই-ই তাঁহাদের মানসিক অবসাদের ভারে সম্ভব হয় নাই।

মানসিক অবসাদ, চিন্তা করার অনিচ্ছা এ তো আমাদের জাতিগত ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে। উপরন্ত আছে ভাবপ্রবণতা, চক্ষুলজ্জা এবং অযথা বিরাগ (prejudice)। এই সকলের প্রতিক্রিয়া ত ছিলই, আরও ছিল একটা অন্ধবিশ্বাস যে ভোট দিয়া প্রার্থীর মাথা ক্রয় করা যায়। ভোটদাতার মাথা ক্রয় বা বিক্রয় যে হয় সেকথা শিক্ষিত সমাজ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন, এবং বিচার করিলে বুঝিবেন যে, তাঁহারা ঘরে স্থাণুভাবে বসিয়া থাকিলে অপরে তাঁহাদের মাথা পরোক্ষভাবে বিক্রয় করিতে পারে বা প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদের ভোট ছদ্মরূপে দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু চিন্তা বা বিচার করিবার মত মহাপাতক করে কে?

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাগ আছে, অতএব কংগ্রেসের প্রার্থীকে ভোট দিব না এই বিচারে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন পন্থী অতি অযোগ্য লোকের নির্ব্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছেন অনেকে। এবারের নির্ব্বাচনে ঐ বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন দলের মধ্যে যোগ্যতর লোকেরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হারিয়াছে, অযোগ্য লোকই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিতিয়াছে। বস্তুতঃ এবারের নির্ব্বাচন জুয়াখেলার পর্য্যায়ে পড়িয়াছে।

কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আছে, তার মধ্যে অনেক কিছু সত্য এবং বেশ কিছু মিথ্যা। কিন্তু সে কারণে যোগ্য প্রার্থী, যাহার ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও জীবন পণ করিয়া দেশসেবার ইতিহাস কাহারও অপেক্ষা অধিক কম নহে, এবং এবারকার "ত্যাগী দেশসেবী" বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের অপেক্ষা, এবং উপরন্ত যাঁহার বিগত পাঁচ বৎসরের কার্য্যক্রমের পরিচয়ও অতি উজ্জ্বল, এ রকম কংগ্রেসপ্রার্থীও নীচ লোকের ষড়যন্ত্রে ও স্বল্পবুদ্ধি লোকের "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ" করার উৎসাহে, নিজের দেশে নাবাড় ভোটে হারিয়া গেলেন কিরূপে? সে অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেরা কি এতই অপদার্থ যে নিজের ও পুত্র-কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই? ভিন্ন পন্থীদের মধ্যেও যাঁহারা সোজা পথে নিজেদের কার্য্যের পরিচয়ে বা চরিত্রগুণে নির্ব্বাচকদিগের বিচার চাহিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই হারিয়াছেন। সেইজন্য হারার তালিকায় এমন বহু লোকের নাম পাওয়া যায় যাঁহাদের সমকক্ষ বিজেতাদিগের মধ্যে নাই, সে কংগ্রেস দলীয়ই হউন বা বামপন্থীই অথবা মধ্যপন্থী বা স্বতন্ত্রপ্রার্থীই হউন।

দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের উচিত ছিল নির্ব্বাচনে সক্রিয় ভাবে অংশ লওয়া। তাহা না করায় নীচ কন্দিবাজ, চতুর জুয়াড়ী ও কপট ভাগ্যান্বেষীর বরাত খুলিয়াছে। নির্ব্বাচনে সাধারণের বিচারে সহায়তা করা যাঁহাদের উচিত ছিল তাঁহারা সরিয়া যাইয়া অশিক্ষিত ও অবিবেচক নির্ব্বাচককে তুলিয়া দিয়াছেন উহাদের হাতে। সুতরাং জয় হইয়াছে টাকার জয় নয় হইয়াছে জুয়া ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জয়।

একজন বিজেতা চাষীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বাচিত হইলে কণ্ট্রোল তুলিয়া দিবেন যাহাতে চাষী চাল পঞ্চাশ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। বাম-পন্থীরা ভোটারগণকে বামপন্থীকে ভোট দিলেই হয় হইতে ত্রিশ বিঘা নিষ্কর কৃষি-জমি পাইবে এই ঢালা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একজন কংগ্রেসবিরোধী অবিবাহিত ব্যক্তি বস্তীর প্রচুর স্ত্রীভোট সংগ্রহ করিয়াছেন সঙ্গে শাঁখা-সিঁদুরযুক্তা এক স্ত্রীলোককে লইয়া, যে তার "স্বামী"কে জেল হইতে বাঁচাইতে চায় এই কথা প্রত্যেককে বলিয়াছে।

তাহার পর মেকী-ভোট ও মৃত লোকের ভোটে ত কেন্দ্র-গুলি ভরিয়াছে। উপরন্ত ভোটদান ও ভোট-গণনার মধ্যে অনেক দিন—ও রাত্রি—সময় থাকায় রক্ষকমহাশয়গণ বহুক্ষেত্রে ইচ্ছামত ভোট উড়াইয়া ভোজবাজীর খেলা দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই শেষের যাদুকরী ব্যাপার—যে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই—সকল পক্ষেরই চর অনুচরবর্গ সুবিধা অনুযায়ী করিয়াছে।

নির্ব্বাচনে জাল-জুয়াচুরি বিশ্বাসঘাতকতার কথা কত বলিব? এইমাত্র বলি যে, এবারের নির্ব্বাচন নীচতা, জুয়াচুরি ও কূটষড়যন্ত্রে পূর্ব্বেকার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।'

অথচ একথা সত্য নয় যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ ইচ্ছা থাকিলে ইহাকে অন্য রূপ দান করিতে পারিতেন না, এবং একথা আরও সত্য যে, সারা ভারতে যদি কোনও প্রদেশ থাকে যেখানকার ব্যবস্থা পরিবর্তে উপযুক্ত লোকের নিতান্ত প্রয়োজন তবে সে এই আমাদের "সমস্তাপূর্ণ" দুর্ভাগা পশ্চিম বাংলা, এবং সেই সঙ্গে বলি যে সারা ভারতে যদি অধম অবস্থা কাহারও থাকে তবে তাহা এই অভাগা বাঙালী জাতির।

নিজের প্রদেশে আমাদের কি অবস্থা সে কথা কি কোনও শিক্ষিত বাঙালীকে বলা প্রয়োজন? অন্য প্রদেশে তাহা কিরূপ তাহার পরিচয় কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলিতে পাওয়া যাইবে:

"দেশের বর্তমান শাসন-জীবনের অধীনে দেশের লোকের

যে অবস্থা চলিতেছে—তাহা আজ চারি বৎসর ধরিয়া জন-বিক্ষোভ ও আন্দোলনসমূহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সহিত মানভূমের বিশেষরূপের বিবিধ অত্যাচার ও অরাজকতার অব্যাহত ধারা সংযুক্ত। এই সমস্ত অন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাসমূহ আকস্মিকভাবে উত্থিত হইয়া দিনের পর দিন মানভূমকে আলোড়িত করিয়াছে—তাহারই পরবর্ত্তী অধ্যায়রূপে অনাচারের কতকগুলি সুচারু ব্যবস্থা ব্যবস্থিতরূপে মানভূমে কায়েমী ও স্বাভাবিক ধারায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। মানভূমের চতুর্দ্দিক দেখিয়া, গ্রামাঞ্চলসমূহে ঘুরিয়া প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, জীবনধারার সমস্ত বিভাগে অনাচার করিবার সমস্ত উপায়গুলি এমন স্বাভাবিকভাবে কায়েমী আসন জমাইয়া লইতেছে যে, প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনযাত্রার উৎপাতের ধারা অব্যাহত চলিয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ নাই, সুবিচারের কোনও আশা নাই, কাহাকেও দুঃখ, অসুবিধা জানাইবার, বলিবারও পথ নাই; কারণ শুনিবার কেহ নাই।

"সমগ্র জেলার অবস্থার দিকে তাকাইয়া এই এক ধারা দেখিতেছি। জেলার খাদ্যের ব্যবস্থা—জেলার বস্ত্র, জঙ্গল, বাজার ও বণ্টনের ব্যবস্থা—জেলার শিক্ষা, শাসন, আইন আদালত, অধিকার ও অপরিহার্য্য সরবরাহসমূহের ব্যবস্থা—সকল বিভাগে, সকল বিষয়ে এক ব্যবস্থিত অত্যাচার, অনাচার ও শোষণ মানুষের জীবনকে নিত্য উত্যক্ত ও দুর্ব্বিষহ করিতেছে।...

"তাহার পর শিক্ষা-বিভাগ। ইহা জাতীয় কর্ম্মের এক মহান্ অঙ্গ—জাতীয় অগ্রগতির আশা ও ভবিষ্যৎ রূপ এই শিক্ষা লইয়া কাটকা-বাজারের খেলা ও অনাচার চলিতেছে। শিক্ষা বস্তুটির নাম উঠিয়া গিয়াছে, ইহা আজ রেকগ্নিশন, বিল, গ্র্যাণ্ট,এলাওয়েন্স, মিনিটিয়্যাল, ভিজিটিং রিপোর্টের কারসাজীর বাজার—প্রাদেশিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থিত আখড়া-ক্ষেত্র। ঘুষ, উৎপাত, অনাচার ও বিভাগীয় অব্যবহার প্রতিযোগিতার এই ক্ষেত্র কাহাকেও পিছাইয়া নাই। বহু বাংলা স্কুলের মঞ্জুরী (রেকগ্নিশন) উঠিয়া গিয়াছে, বহু শিক্ষকের ন্যায্য পাওনা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, বহু তথাকথিত হিন্দী-স্কুল মিথ্যা নাম বহনের জন্য কৃপার অজস্র আনুকূল্য লাভ করিতেছে। ইহার মাঝে পড়িয়া জাতীয় শিক্ষার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু এই দুষ্ট চক্র এক সূক্ষ্ম নিয়মিত ধারায় আবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে—দেখিবার কেহ নাই।

"এই সকলের মধ্যে জন-জীবন গঠনের ও তাহার অগ্রগতি প্রচেষ্টার ক্ষেত্র কিভাবে চলিতেছে তাহাও দেখিবার। আমগ্রামদের জন্য, জন-জীবনের বিকাশের জন্য পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি ব্যবস্থার যে প্রশংসা দেশে করা হয়, সেই পঞ্চায়েৎ কর্মব্যবস্থা এখানে জনজীবন বিঘ্নপূর্ণ করিবার জন্য। জনগণের অধিকারকে বঞ্চিত করিয়া, সুবিধামত কিছু কিছু গ্রামে সরকার দ্বারা নিয়োজিত তাঁবেদার পঞ্চায়েৎ করা হইতেছে—এবং তাহারা সরকারের হিন্দী প্রচার ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের সহায়তায় নিয়োজিত থাকিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধনে অনাচারের রাজত্ব সৃষ্টি করিতেছে। একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করিবার কথা—সমস্ত মানভূমে যে সমস্ত লোক অবাঞ্ছিত বলিয়া বহু বিখ্যাত, সেই লোকগুলিই আজ বাছাই করিয়া সরকারের বে-সরকারী নিজস্ব লোকরূপে নিযুক্ত। ইহারা জেলার সর্ব্বত্র ভীতি প্রদর্শন করিয়া, শোষণ করিয়া, আত্মগৌরব করিয়া জনগণের ক্ষতি করিয়া বেড়াইতেছে—ইঁহাদের অন্যায়ের প্রতিকার চাহিলে সরকার কর্ত্তৃক ইঁহারাই তদন্ত, মীমাংসা ও প্রতিকারের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন—ইহাই অবস্থা।"

মানভূমের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "মুক্তি"র ১৯শে ও ২৬শে ফাল্গুন সংখ্যা হইতে উপরোক্ত অংশগুলি গৃহীত। বলা বাহুল্য, যে যে অঞ্চলে এইরূপ স্বৈরাচার চলিতেছে তাহার অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী এবং সেই কারণেই তাহাদের উপর, বিনা প্রতিকারে এবং বিনা ভয়ে, অত্যাচারীর দল হিংসাত্মক কাজ চালাইতেছে। বাঙালীর দুঃখে বাঙালীই বিচলিত হয় না, সুতরাং প্রতিকার হইবে কি ভাবে? যদি আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিত তবে কেন্দ্রে এরূপ লোককে পাঠাইতে আমরা চেষ্টিত হইতাম যাহার হাতে পায়ে "পার্টির" শিকল বাঁধা নাই, যাহার মুখে বাধের বন্ধন নাই, চোখে "প্রাদেশিকতা মহাপাপ" এই শব্দযুক্ত ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হয় নাই।

বাংলার কংগ্রেস ত অতি হীন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এবং যত দিন শ্রীমান্ অতুল্য ঘোষ প্রমুখ "নেতা" বঙ্গীয় প্রাদেশিক চক্রান্ত-চক্রের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকিবেন তত দিন ঐ হীন অবস্থা যাইবার নয়। আজ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জিতিয়াছে বলিয়া "নেতা"গণ উল্লাসে অধীর। কিন্তু সেদিন দূরে নাই যখন লক্ষাভাগের পালা বসিবে এবং তখনই হইবে পরীক্ষা।

ডাক্তার রায়ের যোগ্যতম তিন জন সহকর্ম্মীই নির্ব্বাচনে ছাঁটাই হইয়াছেন। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অযোগ্যতম, একজন সাক্ষীগোপাল, অন্য জন সৎ ও যোগ্য, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম। কংগ্রেস দলে যে ১৫০ জনের মধ্যে ডাক্তার রায়কে মন্ত্রী খুঁজিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞাত রত্ন থাকিতে পারে না একথা আমরা বলি না, এবং লোভ দেখাইলে বিপক্ষ দলের মধ্য হইতে লোক আসিতে পারে না এ কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাপূর্ণ প্রদেশে রাষ্ট্রচালনার যোগ্যতা অর্জ্জন করা সহজ নয়; বুদ্ধি, বিচার ও সততা তো চাই-ই, আরও চাই অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যক্ষমতা। ঐরূপ গুণযুক্ত মন্ত্রী কিভাবে সংগৃহীত হয় তাহা দ্রষ্টব্য।

ভারত সরকারের বাজেট

ডঃ চিন্তামন দেশমুখ পার্লামেন্টে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তাহা পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই বাজেটে ও দেশমুখের বক্তৃতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

বিগত বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেশমুখ বলেন যে, সাধারণভাবে দেশের আর্থিক অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি সবগুলিই ইহার জন্য দায়ী। মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপে মুদ্রাস্ফীতি এবং স্বল্প উৎপাদনকেই তিনি দায়ী করিয়াছেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে; ইহা ব্যতীত অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলেও দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি কোরিয়ার যুদ্ধ আন্তর্জাতিক পটভূমিতে যে পরিবর্তন আনয়ন করে তাহার প্রভাবে ভারতের দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং দেশমুখের মতে ভারতের ইহাতে করণীয় কিছু ছিল না বলিয়াই মূল্যহ্রাসের কথা আসে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকিলে, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অবলম্বনে যে আমাদের সরকারের পক্ষে হাত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? এই মূল্যবৃদ্ধি যে বহুলাংশে আমাদের সরকার গৃহীত কয়েকটি নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে মূল্যহ্রাসের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের অনুকরণে ডিভ্যালুয়েশন করার জন্যই যে আমাদের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা আজ আর কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে।

এই মূল্যহ্রাসের জন্য সরকার হইতে মুদ্রাস্ফীতিকে দাবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালের বাড়তি বাজেট এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। রপ্তানী শুল্ক বাড়াইয়া ও নূতন শুল্ক বসাইয়া সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত গম বাজারে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের হাত হইতে সরকারী কোষাগারে টাকা চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৩ হইতে ৩৷০ ভাগে তুলিয়া ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণও হ্রাস করা হইয়াছে, ফলে সমগ্র ভাবে দেশে টাকার সরবরাহ কমান সম্ভব হইয়াছে।

কৃষি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ হইলেও অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্যাভাব রহিয়াই গিয়াছে। কচ্ছ, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং ইহার জন্য বহু খাদ্য আমদানী করিতে হইবে বলিয়া অর্থসচিব বক্তৃতায় বলিয়াছেন। এখানে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করা প্রয়োজন। কংগ্রেস রাষ্ট্র-পরিচালনভার গ্রহণ করার পর হইতেই কেবল অজন্মা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কথা শুনা যাইতেছে, প্রকৃতি কি কেবল দুর্ভাগা ভারতের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করিতেছে, না পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একাধিকবার হানা দিয়াছে? প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি ভারতে বা পৃথিবীতে নূতন?

বহির্বাণিজ্যে আমাদের চলতি বৎসরে বিস্তর লোকসান হইয়াছে। স্যর চিন্তামন দেশমুখ স্বীকার করিয়াছেন যে, ডিভ্যালুয়েশন দ্বারা আমরা রপ্তানি বাড়াইতে আশানুরূপ পারি নাই এবং যেটুকু ফল পাওয়ার আশা ছিল তাহাও প্রচুর খাদ্য ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে কতক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

ভারতের কলকারখানার অবস্থা এখনও এমন নয় যে, বিদেশে রপ্তানি উত্তরোত্তর বাড়াইতে পারে। কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চট ও থলিয়া। কিন্তু পাটের জন্য চটকলকে কিছু অংশে পাকিস্থানের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পর্কটা প্রায়ই অনিশ্চিত। পাকিস্থান ডিভ্যালুয়েশন না করায় কাঁচা পাটের দাম মিটাইতেই বাড়তি মূল্য বাবদ লাভের কিছু অংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেশমুখ বলেন, ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেনের নিকট আমাদের ৭৮১ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা ছিল। দেশমুখ ছয় বৎসরের জন্য উহার একাংশ বার্ষিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকার কিস্তিতে তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেশমুখ কয়েক সপ্তাহ আগে লণ্ডনে কমনওয়েলথ অর্থসচিবের গোপন সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ভারতের প্রতিনিধি রূপে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং ব্লক সমগ্রভাবে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সহিত, অর্থাৎ ষ্টার্লিং ব্লকের বহির্ভূত অঞ্চলের সহিত দেনাপাওনা স্থির করিবে। অর্থাৎ ব্রিটেনের ঘাটতি মিটানোর দায়িত্ব একা ব্রিটেন না লইয়া সমগ্র ষ্টার্লিং ব্লকের ঘাড়ে তাহা চাপান হইল। ভারতবর্ষের বাড়তি হইলে ব্রিটেন তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের ঘাটতির একটা অংশ ষ্টার্লিং ব্লকের দেশ হিসাবে ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারিবে।

ডলারের ব্যবস্থা কিছু দুর্ব্বোধ্য। আমাদের ৩৫ কোটি টাকার ডলার ব্রিটেনে জমা আছে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে "নেট" ৭ কোটি টাকা মূল্যের ডলার আমাদের লইতে হইতে পারে। অন্যদিকে একথাও বলা হইতেছে, ঐ হিসাব ছাড়াও বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে দেশের কৃষি, রেল এবং বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য ৩১ কোটি টাকা ঋণ লইতে হইয়াছে। এই ডলারের চাপ আমাদের বাড়িতেছে না কমিতেছে তাহা বুঝা যায় না।

রাজস্ব ব্যাপারে চলতি বৎসরের বাজেটে (১৯৫১-৫২) ২৬ কোটি টাকা বাড়তি হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত বাড়তি হইয়াছে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। তৎসত্ত্বেও আগামী বৎসরের বাড়তি ধরা হইয়াছে ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের হিসাবে আগামী বৎসরের আয় অনুমান করিলে ইহা আরও অধিক হইত। দেশমুখ বলিতেছেন—বাড়তিটা illusory অর্থাৎ ভুয়ো। সুতরাং এই illusory বা ভুয়ো আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাক্স কমানো যায় না। কারণ আমদানী শুল্ক ৫১ কোটি টাকা এবং রপ্তানী শুল্ক ২৬ কোটি টাকা যে বেশী আদায় হইয়াছে তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না। ১৯৫০-৫১ সালে আমদানী শুল্ক আদায় হইয়াছে ১০৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। তথাপি ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আমদানী শুল্ক কমাইয়া ১৩ কোটি ধরা হইল। ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশে বহু দ্রব্যের চাহিদা রহিয়াছে, আমদানী লাইসেন্স না কমাইলে মাল আসিবে এবং শুল্ক সমান থাকিবে। আমদানী শুল্ক বেশী আদায় হইয়াছে পেট্রল, লুব্রিকেটিং তেল, মদ, মোটর গাড়ী, রং, যন্ত্রপাতি, লোহা, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সুপারি প্রভৃতির উপর। ইহাদের কোনটির আমদানী হঠাৎ কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা অর্থসচিব জানান নাই। রপ্তানী শুল্ক আদায় বেশী হইয়াছে চট, তুলা, কাপড়, ম্যাঙ্গানিজ এবং তৈলবীজ হইতে। তুলার অভাবে আমাদের কাপড় হয় না, কিন্তু তুলা রপ্তানীর শুল্কই আদায় হইয়াছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কাপড় রপ্তানীতে ১৯৫০-৫১ সালে শুল্ক আসিয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা, এ বৎসরে (১৯৫১-৫২) দেশমুখ মহাশয় আদায় করিয়াছেন ৩ কোটি ২৫ লক্ষ, এবং আগামী বৎসরের জন্য হিসাব ধরিয়াছেন আড়াই কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত কাপড়ের উপর এক্সাইজ ট্যাক্স চাপাইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশে কাপড়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদেশে কাপড় রপ্তানী করিয়া মাত্র তিন কোটি টাকা আদায় করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু দেশবাসীর নিকট হইতে লইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা, আগামী বৎসরেও ইহাই ধরা হইয়াছে। তথাপি বাড়তি হিসাবটা illusory হইল কেন?

দেশের গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে এক্সাইজ ট্যাক্স আদায় করেন নিম্নলিখিত পরিমাণ—

দেশলাই	৮ কোটি	৫০ লক্ষ	টাকা
তামাক	৩৫ "		"
কাপড়	১৭ "		"

মূল্যহ্রাস

বিশ্বব্যাপী মূল্যহ্রাসের বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা চলিতেছে। পণ্যমূল্য কত দূর পর্য্যন্ত কমিবে অথবা কোথায় গিয়া স্থির হইবে তাহা সঠিক অনুমান করিবার সময় এখনও আসে নাই সত্য, তবে মূল্যহ্রাসের কারণ এখন অনেকটা বুঝা যাইতেছে। চার্চ্চিল-ট্রুম্যান আলোচনা হইতে ইহার সূত্রপাত। ধীরে ধীরে বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চার্চ্চিল ট্রুম্যানকে কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, সোভিয়েটের পশ্চিমমুখী অভিযান বন্ধ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-ইউরোপেই বাধা দিতে হইবে, সোভিয়েট রাশিয়া যাহাতে আটলাণ্টিকের তীরে পৌঁছিতে না পারে তাহা করিতে হইবে। ইহার জন্য বিশেষভাবে ব্রিটেনকে ও ফ্রান্সকে শক্তিশালী করা দরকার। ব্রিটেন ৪৭০ কোটি পাউণ্ডের যে সশস্ত্রীকরণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সাধ্য বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নাই। আমেরিকা Stock Pile আরম্ভ করায় ফলে বিশ্বের বাজারে যুদ্ধোপকরণ এবং রপ্তানী দ্রব্যাদির কাঁচা মালের দাম এত চড়িয়া গিয়াছে যে, ব্রিটেনের পক্ষে ঐ দামে জিনিষপত্র ক্রয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাহার পক্ষে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের সাধ্যমত বর্ত্তমান অবস্থায় যেটুকু অস্ত্রসজ্জা সম্ভব তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার উপায় থাকিতেছে না। উপরন্তু তাহার কলকারখানার কাঁচা মাল পাইতেছে না। ট্রুম্যান এই অবস্থার গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং Stock Pile বন্ধ করিয়া মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্মত হন যাহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইলে কাঁচা মাল কিনিয়া নিজেদের অর্থনৈতিক মান রক্ষা করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে সক্ষম হয়।

চার্চ্চিল দেশে ফিরিবার পর ষ্টার্লিংকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া দেন এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ঋণদান কমাইয়াছেন। ইহার ফলে ব্রিটেনের টাকার বাজারে ঋণপ্রাপ্তি কঠিন হয় এবং ফলে বড় বড় ব্যবসাদারদের পক্ষে আসল ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। ওদিকে আমেরিকা মাল কেনা কমাইয়া দেয়। এই দুই কারণের জন্য দ্রব্যমূল্য কমিতে আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধোপকরণ ও কাঁচা মালের বাজারে, অর্থাৎ চট, লোহা, টিন, তৈলবীজ প্রভৃতির বাজারে মন্দা দেখা দেয়। আমেরিকা মাল কিনিতেছে না এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের বিক্রেতা ও উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং ফলে মূল্য আরও কমিতে থাকে। যথা, নারিকেল-তেল Stock Pile এর একটা উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেন শুকনা নারিকেল ক্রয় কমাইবা মাত্র সিংহলের নারিকেলের দর পড়িয়া যায়, তখন কোচিন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। এই ভাবে বাজার নামাইয়া ব্রিটেন তার নিজের প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন।

এদিকে ভারতেও ব্যাঙ্ক রেট বাড়িল ও ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ-দান সংকোচ করার ইঙ্গিত দেওয়া হইল। ইহার ফলে বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসাদারের টাকার বিষম টান পড়িল।

চট, তুলা ও তৈলবীজ ভারতের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্যের অন্যতম এবং তিনটিতেই অসম্ভব রকমে কাটকা চলিতে থাকে। পাট ও চট বিষয়ে ভারতবর্ষের যে একচেটিয়া সুবিধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারত-বিভাগের ফলে কাঁচা পাট পাকিস্থানে বেশী গিয়াছে। ভারতে পাট উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু ভাল পাট এখনও জন্মায় শুধু পাকিস্থানে। চটকল এক ভারত ও ডাণ্ডি ভিন্ন আর কোথাও বেশী ছিল না। ভারতেই ছিল বেশী। এখন ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের চটকল কাজ বাড়াইতেছে। কিন্তু ইউরোপের তাঁতে উৎকৃষ্ট চট ভিন্ন মোটা চট ও থলিয়া তৈরি হয় না। ভারতবর্ষের চটকল এই গুলি তৈরি করে। পাকিস্থানের উৎকৃষ্ট পাটই ইউরোপে চালান যায়, কিন্তু মোটা পাট ভারতে ভিন্ন বিক্রয় হইবার উপায় নাই। এই ভাবে পাটের ব্যবসা ভারতবর্ষ, পাকিস্থান ও ইউরোপ এই তিন স্থানে ভাগ হইয়া যাওয়ায় পাট-ব্যবসায় জটিলতা দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানের পাটের বৃহত্তম ক্রেতা ভারতবর্ষ। ইউরোপের চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। ইহাতেই পাকিস্থান ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়াছে। পাকিস্থানী টাকার দর এত পড়িয়া যাওয়ার ইহাই কারণ।

তুলার ফসল এবার পৃথিবীর সব দেশে ভাল হইয়াছে। ফলে দাম কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাজারে তুলার অন্যতম ক্রেতা। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের কাটকাবাজার বিশ্ববিখ্যাত। এবার সেখানেও দাম পড়িয়া যাওয়ায় কাটকা-বাজারে এবং খোলাবাজারে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। তুলার মূল্য হ্রাসেও পাকিস্থান খুব আঘাত পাইয়াছে। পাকিস্থানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের পণ্য মাত্র তিনটি—পাট, তুলা ও চামড়া। চামড়ার বাজার এখনও টিকিয়া আছে, পাট ও তুলার বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। তুলা-ব্যবসায়ীদের বাঁচাইবার জন্য পাকিস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক চেষ্টা করিতেছে।

পাট, চট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির দাম পড়িয়া যাওয়ায় যাহারা মাল মজুত করিয়াছিল তাহারা বিষম বিপদে পড়িয়াছে। ব্যাঙ্কের ও বাজারের দেনার চাপে তাহারা পড়তি দামেই মাল বেচিয়া দিয়া দেনা মিটাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে না কুলাইলে সোনা বাহির করিতেছে। ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে ইহারা ব্যাঙ্কে নিজের টাকা রাখে না, নোটের বাণ্ডিল রাখিতেও ভয় পায়, সুতরাং ইহারা এত দিন সঞ্চিত অর্থ সোনায় ও কাঁচামালে রাখিয়াছে। এবার সেই সোনাই বাহির হইতেছে। একবারে বাজারে বহু সোনা আসিয়া পড়ায় সোনার বাজারও হু হু করিয়া নামিতেছে।

পড়তির মুখে বাজার বন্ধ করিয়া দিয়া সামলাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু এই চেষ্টা স্থায়ী হইতে পারে না। বাজার খুলিলেই আবার পড়তি আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে একটা কথা, এই মূল্যহ্রাসে বিশেষ ভাবে মজুতদার ও চোরাকারবারীরাই আঘাত পাইতেছে বেশী। সাধারণ ক্রেতা-দের এখনও ভয়ের কারণ ঘটে নাই। কৃষিজাত পণ্যের দর উৎপাদনের ব্যয়ের নীচে নামিবার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না, তবে এই ভাবে চলিতে থাকিলে তাহা ঘটা আশ্চর্য্য নয়। সে বিষয়ে এখন হইতেই গবর্ণমেণ্টের সতর্ক হওয়া উচিত।

ভারত সরকারের কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মহাতব এযাবৎ মুখ খুলিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ব্রিটেনের ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্ক রেটও বাড়ান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে কতটা ভাল হইয়াছে তাহা বুঝা যায় নাই। ব্রিটেনে আবার ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়াছে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও উহার অনুসরণ করিতে ভরসা পায় নাই। ভারতে মূল্যহ্রাসের প্রতিক্রিয়া কোথায় গিয়া আবার দাঁড়াইবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় ফিনান্স বিভাগকে কোথায় গিয়া বাধা দিয়া মোড় ঘুরাইতে হইবে তাহা সমস্ত বাজারের স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম আরম্ভ হওয়ার আগে সঠিক ধরা যাইবে না। তবে একথা এখন স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, মূল্য-হ্রাসের কর্ত্তা ভারত সরকার নহেন, সুতরাং তাহা রোধ করাও তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে নাই। দেশের বাণিজ্য যেখানে বিদেশের মুখাপেক্ষী সেখানে ভারত সরকারের কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা-মত মূল্যের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। মূল্যবৃদ্ধির বেলায় ভারত সরকার যেরূপ অসহায় ছিলেন, মূল্যহ্রাসেও তাই। কাজেই দ্রব্যমূল্য পতনের জন্য তাঁহারা যে আত্মপ্রসাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভুয়া।

তবে বাজারে এখন হ্রাসের অবস্থা চলিয়াছে। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে—যথা সরিষার তেলে—কাঁচা মাল অপেক্ষা তৈয়ারী মালের দর অনেক নামিয়াছে। এইরূপ হ্রাস রোধে ভারত সরকার অনেক কিছু করিতে পারেন। তাহাতে বাজারের উঠা-নামা কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

কোম্পানী আইন কমিটি

ভারতীয় কোম্পানী আইন কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্টে ম্যানেজিং এজেন্সি বিষয়ে যে সুস্পষ্ট প্রতিবিধান আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বস্তু। পৃথিবীর কোন দেশেই এই জিনিষ নাই। ম্যানেজিং এজেন্সির মধ্যে কোম্পানী পরিচালনের দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি, লাভ হিসাবপত্র ডিরেক্টরদের হাতে রাখার ক্ষমতা এবং

বিভিন্ন কোম্পানীতে একই ব্যক্তির ডিরেক্টর থাকা (Interlocking directorship) এই কয়টি সর্ব্বপ্রধান দোষ। Interlocking Directorship-এর অপরিহার্য্য অঙ্গ Inter-investment of funds। কোম্পানী আইনের ১৯০৬ সালের সংশোধনে এই দোষ দূর করিবার জন্য কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টরা নিজেদের গ্রুপ ব্যাঙ্ক গঠন করিয়া আইনের এই ধারা এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে ম্যানেজিং এজেন্সি তুলিয়া দেওয়া দরকার। কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের পরে এ আই সি-সির অধিবেশন এই প্রস্তাব পাসও করিয়াছিল, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ম্যানেজিং এজেন্সি স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। কোম্পানী আইন কমিটিও ম্যানেজিং এজেন্সি তুলিয়া দেওয়ার সুপারিশ করিতে ভরসা পান নাই।

কাঁচামাল ক্রয় ও শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য কয়েকটি ধাপে নিজেদের কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি অনেক টাকা করে। যেমন কোন কয়লা কোম্পানীর কয়লা সেই কোম্পানী নিজে বিক্রয় করিতে পারে না, তার ম্যানেজিং এজেণ্ট বিক্রয় করে। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট ১৮ টাকায় নিজের অধীনস্থ কোম্পানীর নিকট হইতে সমস্ত কয়লা কিনিয়া লইয়া বাজারে উহা ২০ টাকায় বিক্রয় করিলে কোম্পানীর অংশীদারদের তাহাতে বাধা দেওয়ার কোন উপায় নাই। কোম্পানী যে কয়লা বাজারে নিজে ২০ টাকায় বিক্রয় করিতে পারে, ম্যানেজিং এজেণ্টের জন্য তাহা ১৮ টাকার বেশী দর করিবার কোন উপায় নাই।

ইহা তো আইনসঙ্গত আদায়, বে-আইনি আদায়ই বেশী চলে। মাল ক্রয় প্রথম ধাপে বাজার হইতে ১৮ টাকায় ম্যানেজিং এজেণ্টদের এক নম্বর কোম্পানী করে, দ্বিতীয় ধাপে কোম্পানী হইতে ২নং কোম্পানী ২০ টাকায় মাল কেনে, তৃতীয় ধাপে মূল কোম্পানী ২নং কোম্পানী হইতে ২২ টাকায় মাল ক্রয় করে। ইহাতে কোম্পানীর ক্রয় বাজার দর হইতে অনর্থক ৪ টাকা বেশী দর হয়। ১নং ও ২নং কোম্পানীর মালিক বা অংশীদারেরা ম্যানেজিং এজেণ্টদের বেনামদার, ইহাদের মারফত বাড়তি টাকাটা উহাদের পকেটে আসে। কেশোরাম কটন মিলে এই ব্যাপারই সেলট্যাক্সের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার নির্ম্মল রায় ধরিয়াছিলেন। সম্প্রতি ম্যাকলিয়ড কোম্পানীতেও ইহাই ধরা পড়িয়াছে। ঐ কোম্পানীর দুই জন শক্তিশালী ডিরেক্টরকে এইরূপ কার্য্যকলাপের জন্য দোষ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতারোধ করা হইতেছে শোনা যায়।

Interlocking Directorship-এর ক্ষেত্রে যতটা কড়াকড়ি করা উচিত ছিল কোম্পানী আইন কমিটি তাহাও করিতে ভরসা পান নাই।

ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি এতদিন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিচালিত হইত। ইহাতে এদের যতটা দায়িত্ব ছিল, স্বাধীনতার পরে ম্যানেজিং এজেন্সিগুলিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়া তাহাও এড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির ক্ষমতা ষোল আনা বজায় রহিয়াছে, কিন্তু দায়িত্ব অনেক হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ইহাদের উৎপন্ন মালের ক্রেতা এবং ইহাদের অধীনস্থ কোম্পানীর অংশীদার।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে বাংলাভাষা আন্দোলন

পূর্ব্ব পাকিস্থানের ভাষা-আন্দোলন অতি তীব্র এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই আন্দোলনে যাহারা লড়িতেছে, এবং যাহারা প্রচার করিতেছে তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান। আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে এবং বর্ত্তমানের তীব্র রূপ ধারণের পূর্ব্বে বহু দিন যাবৎ খবরের কাগজে ও সভা-সমিতিতে মাতৃভাষার বিনাশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছে পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাংলাভাষী শিক্ষিত মুসলমান।

পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার বোধ হয় ভাবেন নাই যে, এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও প্রচণ্ড রূপ গ্রহণ করিবে, অথবা হয়ত করাচীর কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন নাই যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের মনের কথা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এরূপ তেজের সহিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। সেইজন্য প্রথমে এই সকল প্রতিবাদ তাচ্ছিল্যের সহিত অবহেলা করায় এই আন্দোলন উত্তরোত্তর প্রবল হইয়াছে ও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাঁহাদের মাতৃভাষার অপমান মায়ের অপমানেরই মত। এই অপমানের ফলেই শিক্ষিত মুসলমান রুখিয়া উঠিয়া সক্রিয় ভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। ফলে পাকিস্থান সরকার প্রমাদ গণিতেছেন।

ব্যাপার এই অবস্থায় গড়াইয়া আসিবার পর তাহাকে সামলাইবার জন্য যে অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার রূপ ও কৌশল দুই-ই বাঙালী হিন্দুর কাছে সুপরিচিত। সেই চেষ্টা সম্বন্ধে কলিকাতার "যুগান্তর" নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

"পূর্ব্ববঙ্গ আনসারবাহিনীর প্রধান পরিচালক মিঃ এইচ. এম. দোহা ময়মনসিংহে এক আনসার সমাবেশে বলেন যে, ১৯৫০ সালের পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া

বর্ত্তমানে পাকিস্থানে যাতায়াত করে, তাহারাই পাকিস্থানের পরম শত্রু। শত্রুদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত আনসারদের সতর্ক থাকিতে বলিয়া মিঃ দোহা জানান যে, ভাষা আন্দোলন ভারতীয় এজেন্টদের সৃষ্টি; ভিতর হইতে পাকিস্থানকে ধ্বংস করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত। তিনি আনসারদের উভয় দিকে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সন্দেহভাজন মনে হইলে পুলিসের হাতে অর্পণ করিতে বলেন। মিঃ দোহা আরও বলেন যে, পাকিস্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী অনুগত হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধান পাক সরকারের 'পবিত্র দায়িত্ব'। পাক সরকার এই পবিত্র দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিতেছেন তাহা পূর্ব্ববঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদের অজানা নহে। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু সদস্যগণ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাই উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পাকিস্থান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ধরকে নির্দ্দিষ্ট কোন কারণ না দেখাইয়া কিম্বা আদালতে প্রমাণযোগ্য কোন অভিযোগ না করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু হিন্দু অধ্যাপককে পাক-নিরাপত্তা আইনে—যাহাকে সাধারণ লোক বে-আইনী আইন নামে অভিহিত করিয়া থাকে—কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন তাহাদের নিজস্ব আন্দোলন। এই আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁহারা বে-পরোয়াভাবে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং ব্যাপারটাকে বাহিরের ব্যক্তিদের কাজ বলিয়া বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা চালানো হইতেছে ও এই সুযোগে হিন্দু নেতা, অধ্যাপক প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্তায় পাক সরকারের বিশ্বস্ত ও অনুগত নেতাও পূর্ব্ববঙ্গ কর্ত্তৃপক্ষের এই আচরণের প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নাশের এই প্রত্যক্ষ অভিযান সত্ত্বেও সর্দ্দজ-চর্ম্মাবৃত নেকড়ে বাঘের ন্তায় মিঃ দোহা পাকিস্থানের স্থায়ী বাসিন্দা, অনুগত হিন্দুদের নিরাপত্তা-বিধানের পবিত্র দায়িত্বের বুলি আওড়াইতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের আনসার-নায়ক দোহা সাহেব তাঁহার বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম হইতে যে কোন পূর্ব্ববঙ্গে গমনকারীকে খানাতল্লাস করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুলিসের হাতে দিতে বলিয়াছেন। ধরিয়া আনিতে বলিলে যাহারা বাঁধিয়া আনে, তাহাদের প্রতি এই নির্দেশ কিভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহা কাহারও অজানা নহে। ইহা যে ভাষা-আন্দোলন চাপা দিবার হীন কৌশলমাত্র তাহাও বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে। কিন্তু অন্ত দিকে ইহার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী বলিয়াই আমরা ইহার আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ মিঃ দোহার উক্তি যদি সরকারী উক্তি হয়, তাহা হইলে উহা নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি-বিরোধী। আমাদের ভারত সরকার এই ব্যাপারে কি পন্থা অবলম্বন করিবেন, আমরা এখানে তাহা জানিতে চাই।"

হাবড়া উদ্বাস্তু-কলোনী

শ্রীঅতুল্য ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি একখানি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করেন; তাহার নাম "জনসেবক"। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার পত্রিকায় যে সব মন্তব্য ও পত্রাবলী প্রকাশিত হয়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার পরামর্শদাতারা একেবারে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিবেন না, এবং প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে তৎসম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্বও আছে।

এই সব কথা বলিলাম গত ১৬ই ফাল্গুন পত্রিকায় প্রকাশিত হাবড়া কলোনীর অধিবাসীবৃন্দের সুখ-দুঃখের বিবরণ পাঠ করিয়া। শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায় লিখিতেছেন:

"সরকারী প্রচেষ্টায় হাবড়ায় বাস্তুত্যাগীদের জন্তে যে জনপদ গড়ে উঠেছে, সেটা দেখবার সৌভাগ্য হ'ল সেদিন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ নিয়ে গর্ব্ব করতে পারেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এতে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ নির্ভর করছে জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সরকারী আনুষঙ্গিক কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর।

আমরা লক্ষ্য করলাম, কতকগুলি বাড়ী দখল নেবার পর কিছু সংখ্যক লোক দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, সাধারণতঃ পানীয় জলের প্রশ্ন এবং স্থানীয় জীবিকা-নির্ব্বাহের সমস্তাই স্থানত্যাগ করার কারণ।

স্থানীয় লোকদের জীবিকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ বেকার যুবকরা অন্নসংস্থানের অন্ত কোন উপায় না পেয়ে কেউ কেউ চুরি-ডাকাতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাই বা ক'রবে পারে?

যত দিন না কোন অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তত দিন অন্ততঃ কলকাতা দমদম ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ক'রে এ বিষয়ের আংশিক সমাধান করা দরকার।

কলোনী থেকে নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন দুই মাইল থেকে তিন মাইল। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সাইকেল-রিক্সা ঐ পথের জন্তে।৵০ থেকে ৸০ আনা নেয়। সাধারণ লোকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে সরকারী বাস অনধিক /১০ ভাড়ায় চালু করা দরকার হাবড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

শুনলাম, কলোনী থেকে কিছু দিনের মধ্যেই একটা বাস যাবে ডালহৌসী পর্য্যন্ত। কিন্তু বা' ভাড়া ঠিক হবে, তা বোধ

হয় সাধারণের নাগালের বাইরেই রাবে। এ সমস্ত দূরবর্তী পথের চাকুরীজীবীদের স্বার্থে রেলের সস্তা ভাড়ায় মাহলী টিকিটের বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় কিছুটা সুবিধা হবে। ট্রেন চলাচলেরও কিছু সুবিধা হওয়া দরকার। ১০টার যাদের অফিস, তারা মাত্র একটি ৮টার ট্রেনের সুবিধা পেতে পারেন, যেটা শিয়ালদাতে ৯-২৫-এ পৌঁছায়। আরও দু'টি ট্রেন দেওয়া উচিত, যা সাধারণভাবে ৯-৩০ থেকে ৯-৪৫-এর মধ্যে শিয়ালদহে যাবে। এই দুটি ট্রেন প্রত্যেক ষ্টেশনে না থেমে হাওড়া-গুমা-বারাসত-মধ্যমগ্রাম-দমদম জংশন ধরে শিয়ালদহে পৌঁছলে সময় অনেক ক'মে যাবে।

কলিকাতার উপর থেকে জনতার চাপ কমাতে হলে এ সমস্ত কলোনীগুলোকে প্রাণবান করে তোলার প্রয়োজন স্বীকার না ক'রে উপায় নাই। হাবড়া কলোনী নির্মাণ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা বলে তার সাফল্যের উপর প্রধান-মন্ত্রীর কথামত ৬৪টি জনপদ গড়ে তোলার সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।"

বুনিয়াদি শিক্ষার সংগঠন

গত আশ্বিন মাসের "শিক্ষাব্রতী" পত্রিকায় শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এই বিষয়ের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাব ও প্রণালী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনুরূপ প্রবন্ধ হইতে অনেক সময় আমরা "প্রবাসী" পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া থাকি ও মন্তব্যও করি। সাধারণতঃ শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব আমরা পছন্দ করি না। রাষ্ট্রের পক্ষে ভূমিদান করিয়া অথবা মাসিক বা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য করিয়া ব্যক্তিকে বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ঠেকিয়া শিখিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, তাহা যত মহৎই হউক বা তাহাদের কর্মকর্তা যত সৎই হউন না, ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। তার ফল সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

অথচ, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি লোকের এক দুর্বার আকর্ষণ আছে; মহৎ লোকের পায়ের ধূলা লইবার জন্য বা তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিবার জন্য কিম্বা তাঁহাদের দেবতার পদে উন্নীত করিবার জন্য সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে যেরূপ ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়, তাহা দেখিয়া মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তককে আমরা ফুলের মালায় ঢাকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছি, অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছি। বুনিয়াদি শিক্ষা এই মনোভাব দূর করিতে পারিলে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিবে। এই অন্তরঙ্গ ভাবের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা উচিত।

বহিরঙ্গের কৌশল সম্বন্ধে অনিলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

"(ক) প্রথমতঃ, গ্রামের উপাদানে আদর্শ গৃহনির্মাণ করতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের বেলায় এ কথাটা আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। বুনিয়াদী শিক্ষার মারফতে গ্রামের সামনে যে আদর্শ রাখতে হবে তা এমন হওয়া চাই যা গ্রামের দীনতম ব্যক্তিও গ্রহণ করতে পারে। গান্ধীজীর চিন্তাধারায় যে সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনা পাই এটি তার একটি মূল কথা। গ্রামের সামনে গ্রামের লোকের পক্ষে সহজসাধ্য কোন আদর্শ দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে বুঝতে হবে গ্রামকে দেবার মত এবিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুই নেই। ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি ছাড়া যদি আদর্শ গৃহনির্মাণ সম্ভব না হয় তবে গ্রামকে আদর্শ গৃহনির্মাণের শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হবে।

আর একটা দিক থেকেও বর্তমান অবস্থায় স্থায়ী ঘরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নে। কাঁচা ঘর-বাড়ীর পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য, পাকা বাড়ীর বেলায় তা নয়। আজ বুনিয়াদী শিক্ষা যে কোঠায় আছে তাতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য কোন্ শ্রেণীর কি পরিমাণের ঘরবাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তার কোন চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় নি। সে ক্ষেত্রে বিরাট প্রারম্ভিক ব্যয়ে পাকা ঘরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নে। কি বিদ্যালয়, কি শিক্ষকের বাসগৃহ আজ তাই কাঁচা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করি। সত্যই যদি কোন দিন মনে হয় পাকা ঘর কাঁচা ঘরের চাইতে উৎকৃষ্টতর এবং যদি তা দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলা যায় তবে সেদিন হয়ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করা চলতে পারে। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র সমাজের সামনে তুলে ধরবে এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার একটি মূলকথা। গৃহনির্মাণের বেলাতেও আমরা যেন বিস্মৃত না হই পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার কথা।

গ্রামে মুক্ত আলো-বাতাস এবং জলের অভাব থাকার কথা নয়। শহরের মত কলের ধোঁয়া, বিরাট প্রাসাদের সর্ব্বোন্নত চূড়া বাতাসকে আবিল ও আলোকে ব্যাহত করে না। কিন্তু অজ্ঞতার ফলে আমরা গ্রামের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছি।

পরিবেশকে এই ক্লেদাক্ততা থেকে রক্ষা করা হবে শিক্ষা-কর্মীর অন্যতম প্রধান কাজ। আজ মানুষের মলমূত্র গ্রামের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। খোলা মাঠে আমরা মলমূত্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত। ফলে এর সারাংশটুকু সূর্য্যের তাপে নষ্ট হয়ে যায় আর এর ভেতরকার বীজাণুগুলি সহজেই ছড়াবার সুযোগ পায়। অতি কম খরচেই পায়খানা তৈরী করা চলতে পারে। বাঁশ ও খেজুর বা তালপাতা দিয়ে আবরণ বেড়া

তৈরী করে পায়খানা যেন্না চলতে পারে এবং এক জায়গায় মালা কাটার হাম ভর্তি হয়ে গেলে খেতাগুলি খুলে দিয়ে নূতন পায়খানা তৈরী করা যায়। বাঁশের চাচ কিংবা বাঁশ দিয়ে খুলেও এ রকম খেয়া করা চলতে পারে।"

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সমগ্র ভারতের বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি পাঁচদফা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। রাজ্য সরকারসমূহের মতামত জানিবার জন্য এবং তাহাদের সহযোগিতার জন্য উহা প্রত্যেক রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কাজের জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত সরকার প্রারম্ভিক এক কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা কলেজের শিক্ষকদিগের শিক্ষাদানের জন্য একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হইবে। শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষালয় থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য একটি বুনিয়াদী শিক্ষা-কলেজ এবং সেই সঙ্গে দুইটি নিম্ন-মানের বুনিয়াদী শিক্ষালয় থাকিবে। ইহা ছাড়াও থাকিবে পাঁচটি সুপরিকল্পিত বারোয়ারী কেন্দ্র, পল্লীনেতাদের শিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ, একটি গ্রন্থাগার এবং নির্ব্বাচিত অঞ্চলের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী-শিক্ষালয়গুলির উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা। এইরূপ এক-একটি অঞ্চলে প্রায় এক শতটি গ্রাম থাকিবে। পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হইল প্রাথমিক শ্রেণী হইতে স্নাতকোত্তর বিভাগ পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ কার্য্যকরী করা। ব্যয়ের কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন, তাহা রাজ্য সরকারসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করা হইবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় দফায় নির্ব্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উন্নয়ন করা হইবে এবং সেখানে উন্নত ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে। শিক্ষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা করিয়া উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা থাকিবে। দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করিতে পারে, সেজন্য যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা এবং তাহার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দ্বিতীয় দফার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তৃতীয় দফার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের ও প্রাপ্ত-বয়স্কদের উপযোগী পুস্তকাদি রচনা এবং অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা থাকিবে। চিত্র ও বক্তৃতার সাহায্যে শিক্ষাদানের বিষয়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের কার্য্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুস্তকাগার প্রভৃতিকে সাহায্যদান, বারোয়ারী কেন্দ্র, যুবক-যুবতী কর্ত্তৃক পরিচালিত দলল-কেন্দ্র প্রভৃতির উন্নয়ন চতুর্থ দফার কর্ম্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ইহার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম দফায় অপরাধপ্রবণ তরুণদের শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গিয়া যতদূর সম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য রাজ্য-সরকারসমূহকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সম্ভব সেখানে পুরাতন গৃহাদি কাজে লাগাইতে হইবে। আগামী ১লা মার্চ্চের মধ্যে রাজ্য-সরকার-সমূহকে মতামত জানাইতে বলা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ও ১৬ই মার্চ্চ তারিখে নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক বসিতেছে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর যাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

১৯৩৭ সাল হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার মাহাত্ম্য স্থানে অস্থানে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্টের পর আশা করা গিয়াছিল যে, নূতন সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে ভারত সরকার ইংরেজ আমলের "লাল ফিতার ও বিশেষজ্ঞ"গণের হাতে নিজেদের সমর্পণ করিবেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। প্রথমাবধি পুরাতন কর্ম্মচারী-মণ্ডলী বুনিয়াদি শিক্ষাকে গান্ধীজীর অগণিত খেয়ালের মধ্যে একটি নূতন খেয়াল বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। তার পর এই নূতন শিক্ষার জন্য যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাঁহাদের তাহা নাই। ডাইনীর হাতে সন্তান সমর্পণ করিলে শিশুর যে অবস্থা হয়, তাহাই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অনেকে বলিতে পারেন। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত প্রাইমারী ও বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইল। সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বোধ হয় একজন বেসরকারী সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন প্রায় স্বাধীন

প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান উন্নতি করিয়াছে সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষার জন্ত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হউক। সে প্রস্তাবে প্রায় সকলেই এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান চালাইবার মত যেরূপ লোকের প্রয়োজন তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে। রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এরূপ প্রশ্ন করিতেন না!

তার পর প্রায় বার মাস পর রিপোর্ট ত সম্পূর্ণ হইল। সভাপতি মহাশয় তাহার খসড়া করিয়া প্রায় প্রতিটি শব্দ কমিটির সভ্যগণের আলোচনার বিষয় করিলেন। কিন্ত সরকারী দপ্তর তাহাদের মনোমত সংশোধন বা বিকৃত করিয়া রিপোর্টটি যখন উপস্থিত করিলেন, তখন সময় নাই বলিয়া তাহা যথোসম্ভব: করিয়া শেষ করা হইল।

একটি বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী জেলায় জেলায় ইন্‌সপেক্টর, মহকুমা-মহকুমায় সাব-ইন্‌সপেক্টর প্রভৃতি সরকারী দপ্তরমত সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অর্থের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। বরাদ্দ ৩ কোটি হইতে ১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। সরকারের নিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম।

তবে কি বলিব যে, বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে? তাহা হয় নাই। কারণ অজ্ঞাত লোক—নর-নারী, নিষ্ঠার সঙ্গে নূতন মানুষ সৃষ্টি করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাধনা করিতেছেন। সরকার তাঁহাদের জানিলেও সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেন না। তাঁহারাই বুনিয়াদি শিক্ষার ধারক, তাহার সেবক।

ডাকাত সর্দ্দার ভুপৎ

গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সৌরাষ্ট্রের বারওয়ালা-নিবাসী ভুপৎ নামীয় দস্যু সর্দার সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত চিত্রল গ্রাম হইতে সম্প্রতি নাগপুর হইয়া আসামে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভুপৎ ৬০টি ডাকাতি করিয়াছে এবং ৮১ জনকে হত্যা করিয়াছে।

নেপালের বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে. আই. সিংহের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে সে আসাম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিব্বত যাওয়ার চেষ্টায় আছে। বিশেষ আসামেই নাকি ভুপৎ তিব্বত অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, নাগপুরের কতিপয় মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের অনুরোধে কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের পুলিস এই ডাকাত সর্দারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত, ভুপৎ বিপদের আঁচ পাইয়া পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকার তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ ইহা অস্বীকার করে।

ভুপৎ এবং তাহার সঙ্গীদের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। তাহার দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছে—কাটি রাযোজা বাসিয়া এবং আহের দেবায়েৎ জেঠা। এক সংঘর্ষে আহের দেবায়েৎ জেঠার মৃত্যু হয়। সৌরাষ্ট্রের জায়গিরদার ও প্রাক্তন রাজা-মহারাজারা নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভুপৎকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। পঞ্জাব সরকার ভুপৎ এবং তাহার চার-পাঁচ জন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করার কাজে সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট পুলিস কর্মচারী অশ্বিনীকুমারকে সৌরাষ্ট্রে পাঠান। এ সম্পর্কে ভবনগরের মহারাজার ভাই কুমার নির্মলকুমারের এবং ঢোলের ঠাকুরের গেপ্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পরমুহূর্তে পালিয়াটানার মহারাজার রাজকোট সফরের উপর বিলক্ষণ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

মধ্যপ্রদেশে ভুপতের অনুচরের সংখ্যা কমপক্ষে আট শত। ইহাদের অর্দ্ধেকেরও বেশী কম্যুনিষ্ট। তাহার নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র সর্ব্বত্র দাঙ্গা ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য পূর্ব্বেই নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

পাগাড়োর বর্ত্তমান পীর ভুপতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পাগাড়োর পীরের উদ্দেশ্য হইতেছে মধ্যপ্রদেশকে "কাসিম রেজভী"র দ্বিতীয় হায়দরাবাদে পরিণত করা।

ভুপতের বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র। তাহার মুখের উপরের পংক্তির একটি দাঁত ভাঙা। সর্ব্বদা সে সশস্ত্র থাকে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ভুপৎ অত্যন্ত হৃদয়হীন। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা কিন্ত অন্য সাক্ষ্য দেয়:

একদিন সৌরাষ্ট্রের কোন এক গ্রামে নিসাহরাম নামীয় তাহার এক শত্রুর গৃহে তাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হানা দেয়। এমন সময় সাহরামের পত্নী দরজায় আসিয়া ভুপতের গতিপথে বাধা দেয় এবং বলে যে, তাহাকে (সাহরামের পত্নীকে) হত্যা না করিয়া ভুপৎ (সাহরামের) ঘরে ঢুকিতে পারিবে না। ভুপতের চিত্ত বিচলিত হয়। সে লজ্জায় মাথা নত করে এবং তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে। সাহরামের জীবন রক্ষা পায়।

সৌরাষ্ট্র ত্যাগের পূর্ব্বে ভুপৎ তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য খবর দেয় স্ত্রী কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু

লইয়া সাক্ষাৎ করে। বিদায় লওয়ার সময় সে স্ত্রীকে এই মর্মে উপদেশ দেয় যে, যত বিপদই ঘটুক, সে যেন তাহার স্বামীর অচল আনুগত্য রাখে। তাহার স্ত্রীর এবং ছেলের ভরণ-পোষণের জন্য সে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। বিদায়গ্রহণকালে যুগপৎ স্ত্রীকে নিজের গুপ্তধনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে।

এই ডাকাত সর্দারের বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় সে একজন রাজনৈতিক কর্মী। ডাঃ কে. আই. সিংহকেও ডাকাত-সর্দার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। এরূপ বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখি না। বরং তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত। আর একটা কথা জানা প্রয়োজন, কাথিওয়ার সৌরাষ্ট্রই বা কেন এরূপভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-রাজড়ারা যদি রাজনীতিতে যোগদান করিতে চান, তবে "পেন্‌সনভোগী" বলিয়া তাঁহাদের বারণ করা হইতেছে কেন? শ্রীচিন্তামন দেশমুখও ত পেন্‌সনভোগী, তিনি ত আমাদের আর্থিক জগতের নিয়ামক।

ভূমিদান যজ্ঞের সূত্রপাত

গত ৩রা কাত্তনের "হরিজন" পত্রিকায় বিনোবা ভাবের তেলেঙ্গানা সভা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে

"ঐ গ্রামের প্রধান সমস্যা হইল ভূমিসমস্যা। সকলের মুখেই এক কথা, চাষের জন্য আমরা জমি চাই। গ্রামের মোট জমির পরিমাণ ৭,৫০০ বিঘা। জনসংখ্যা ৩,০০০, অর্থাৎ জন প্রতি দুই বিঘার উপর জমি। বর্তমানে সমস্ত হরিজনই জমিতে শ্রম করে ও তাহার পরিবর্তে উৎপন্নের ১।২০ ভাগ ফসল ও একটি কম্বল ও একজোড়া জুতা পায়।

বিনোবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের কত বিঘা জমির প্রয়োজন। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর তাহারা জানাইল ১২০ বিঘা শুকনো ও ১২০ বিঘা ভিজা জমিই যথেষ্ট।

ইহা যথেষ্ট কিনা বিনোবা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা সমবায়ে চাষ করিবে, না ব্যক্তিগতভাবে করিবে? তাহারা সমবায়ে চাষ করিতে ইচ্ছুক। তৎপর বিনোবা তাহাদের একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিতে বলিলেন এবং জানাইলেন যে তিনি তাহাদের জন্য চেষ্টা করিবেন। অন্যান্য গ্রামবাসিগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:

যদি সরকার জমি না দিতে পারে, তাহা হইলে আপনারা কি কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন?

শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডী দাঁড়াইয়া উঠিয়া জানাইলেন—আমার পিতার ইচ্ছা ছিল ইহাদের কিছু জমি দান করিবেন। আমি আমার ও ভায়েদের পক্ষ হইতে তিন শত বিঘা জমি দান করিতেছি।

ইহাই প্রথম ভূমিদান এবং এইভাবে এই যজ্ঞের সূত্রপাত হইল।

ঐদিন আরও একটি কাজের সূত্রপাত হইল। বিনোবাজী হরিজনদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের মধ্যে কতজন পানে আসক্ত? উত্তর হইল সকলে। "আপনারা সত্য বলিয়াছেন, ভালই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে কতদিন লাগিবে।

হরিজন-সর্দার বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিলেন। অল্প পরেই তিনি সভাস্থলে দাঁড়াইলেন। সকলে উৎসুক আগ্রহে তাহার দিকে তাকাইল।

মহারাজ, আমরা আজ হইতেই মদপান বন্ধ করা স্থির করিলাম।

একজন চিৎকার করিয়া বলিলেন, উহাদের দিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করাইয়া লওয়া হউক।

বিনোবা তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, মদপান একটি অভ্যাসের ব্যাপার। উহা ধীরে ধীরে দূর হইবে। উহারা যদি নিজেদের কথা রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় সমস্যা হইল তাঁতীদের লইয়া। তাহারা যথেষ্ট সূতা পায় না বলিয়া অভিযোগ করিল; মাসে মাত্র আধ সের সূতা পায়। উহাতে এক সপ্তাহের কাজ চলে। তিন সপ্তাহ বসিয়া থাকিতে হয়। তাহারা বিনোবাজীকে বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অধিক পরিমাণে সূতা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

ইহা ত একটি সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যা।

তাহা হইলে আমরা কি করিব? তাঁতীরা বিনোবাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, মিল যখন ছিল না—তখন কি আমাদের দেশে তাঁতী ছিল না? তাহারা কি বসিয়া থাকিত, না লোকে উলঙ্গ থাকিত? আবার দেখুন, আপনারা নিজেরাই নিজেদের তৈয়ারী কাপড় ব্যবহার করেন না। কৃষক কি ধান চাষ করিয়া, চাউল কিনিয়া খায়? আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ নষ্ট করিতেছেন। বিনোবাজী নিজের ধুতি চাদর ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখুন কি সুন্দর কাপড়—সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈয়ারী হইয়াছে।

তাঁতীরা বলিল, এখানে তুলা জন্মায় না। বিনোবাজী বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু তুলা কি এখানে কখনই জন্মিত না? আপনারা যদি তুলা চাষ ছাড়িয়া দিয়া থাকেন তবে এখন উহা পুনরায় সুরু করুন। এই সমস্যা কেবলমাত্র এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতব্যাপী এই সমস্যা। আমি শুনিয়াছি তুলা চাষ করিলে সরকার রাজস্ব আদায় করিবে না। যতদিন চাষ না হয় আপনারা তুলা কিনিতে পারেন। কাপড় কেনা অপেক্ষা তুলা কেনা ভাল।

পাঁচটা পর্য্যন্ত নানা লোক ও দল তাহাদের সমস্যা লইয়া আসিতে লাগিল। বাসস্থানের বিপরীত দিকে এক নিম ও আম গাছের ছায়ায় সভা বসিল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেকে আসিয়াছিল। বিনোবা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার তেলুগু গীতা আবৃত্তি করিলেন।

বিনোবা বলিলেন যে, বর্তমান ভারতে ধনীগণ কর্তৃক অনেক জমি অধিকার করিয়া রাখা অসম্ভব। তিনি গ্রামশিল্প রক্ষণ ও মদ্যপান নিবারণের উপরও জোর দিলেন। গ্রামের দারিদ্র্য ও তাঁতীদের সূতার সমস্যা মিটিবে না, যদি-না তাঁহারা নিজেরা তুলা উৎপাদন করিয়া সূতা কাটিয়া গ্রামে জুগাইবার ব্যবস্থা করেন এবং যথাসম্ভব অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন করাইয়া লন। মদ্যপান বন্ধ না করিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।

যে জমি পাওয়া গিয়াছে তাহা বণ্টনের জন্য পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি করা হইল। উহাতে হরিজনদের দুই জন প্রতিনিধি, এক জন গ্রামের মাতব্বর, অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীভেঙ্কটেশ রেড্ডী ও দাতা রামচন্দ্র রেড্ডী এই পাঁচ জনকে লইয়া কমিটি গঠিত হইল। জানা গেল রামচন্দ্র রেড্ডীর ভগ্নীর সহিত হায়দরাবাদের কম্যুনিষ্ট নেতা নারায়ণ রেড্ডীর বিবাহ হইয়াছে এবং উভয়েই গোঁড়া কম্যুনিষ্ট।

এই অশান্ত এবং কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত অঞ্চলেও বহু লোক বিনোবাজীর সহিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহ লইয়া আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকলেই সমস্ত যুগে মানিয়া চলিয়াছে। আমাদের তাঁতীর নিকট হইতেই কাপড় কিনিতে হইবে আর গ্রামের তেলীর নিকট হইতে তৈল কিনিতে হইবে। এইরূপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম টিকিয়া থাকিবে। আজকাল লোকে শেষ পর্য্যন্ত সংসারে জড়িত থাকিতে চায়।

যুবজনের সেবামণ্ডল

আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত দুইখানি প্রচারপত্র পাইয়াছি। এই মণ্ডল (Indian Youth Service) গত ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র-বৈশাখ (মে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ছিলেন। সহকারী সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে মহারাণী সুচারু দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীহীরালাল বসু পাশ্চাত্য দেশীয় কোয়েকার সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বন্ধুমণ্ডলী সেবা প্রতিষ্ঠানের (Friends Service Unit) একজন বিশিষ্ট সহায়ক। বিশ্বব্যাপী শান্তির বার্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে যে সব প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, হীরালাল বসু তাহার প্রত্যেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রচারপত্রে যে সব কার্য্যবিবরণী পাওয়া যায়, তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। সম্পাদক মহাশয় বিবরণীতে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে পাঠচক্র বসে। ৫-৩০ হইতে ৭-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত তাহার কাজ চলে। নানাবিধ আলোচনা হয় এবং এরূপ ভাব-বিনিময়ের সাহায্যে অনেক সময়কে যাপন করা যায়। খাদ্যসমস্যার বিষয়, দেখা যায়, আলোচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের নবজাগরণ ও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির সমন্বয় চেষ্টা যুগে যুগে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই পাঠচক্রের বিবরণীতে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা আরও হওয়া উচিত ছিল। এখনও সে চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে।

গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের (democracy ও totalitarianism) বিরোধের ভাসাভাসা আলোচনা নিরর্থক। এই দুই মতবাদ দুইটি বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীশ্বরবাদও একটা ধর্ম্ম। এই বিষয়ে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিতে পারিলে কেবল কাঁদা ছ'জনেরই সার হইবে। আমেরিকা ও সোভিয়েট তাহাই করিতেছে। সেইরূপ নানা সমস্যার আলোচনা করিতে হইবে।

অসংখ্য সেবামণ্ডলের মধ্যে এই সঙ্ঘেরও স্থান আছে। এই সমালোচনা করিলাম সঙ্ঘের সফলতা কামনা করি বলিয়াই।

ভারত-ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত করিবার জন্ত লেডি মাউণ্টব্যাটেন গত ছয় বৎসর যাবৎ অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। পৃথিবীর হাটে-বাজারে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের উত্তরাধিকারী বলিলে অন্যায় হইবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে বিশ্ববিধানের অঙ্গ এই নীতি স্বীকার করিয়া রুজভেল্ট চলিয়া গিয়াছেন। ক্র্যাফ, জনসন, ফিলিফস এবং এখন বোলস—এই কূটনীতিবিদ্‌গণ এই কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই কাজে হাত না দিলে কখনই তাহা সার্থক হইতে পারে না। সেইজন্ত এখন লেডি মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রীরূপে প্রতি ছয় মাসে ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান ঘুরিয়া থাকেন। মিসেস্ রুজভেল্টও সেই উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতেছেন।

তিনি করাচী গিয়াছিলেন; দিল্লী লাহোর কলিকাতা নাগপুর গিয়াছেন। প্রায় প্রতি সভায় এই দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র দৃঢ় করিবার জন্ত নানা উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

ঐ যোগসূত্র দৃঢ় করিতে হইলে প্রথমে কর্তব্য এই দুই দেশের মধ্যে অজ্ঞানতাপ্রসূত নানা ভুল ধারণা দূর করা এবং একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় সাম্যের ভিত্তিতে স্থাপন করা। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে যে শোষক ও শোষিত সম্পর্ক ছিল সে কথা ভারতবাসীর ভুলিতে আরও কয়েক যুগ লাগিবে। মার্কিন রাষ্ট্র সম্পর্কেও সেই আশঙ্কা আছে এবং ঐ আশঙ্কার মূলে বাস্তব যে কিছু নাই তাহাও নহে। সে ভয়-ভাবনা দূর করিতে হইলে দুই দিকেরই দোষত্রুটি খোলাখুলি বলা প্রয়োজন। সে আলোচনা সরকারী কর্মচারী বা রাষ্ট্রের উচ্চ অধিকারীর মধ্যে হইতে পারে না। পারে শ্রীযুক্তা রুজভেল্ট প্রমুখ প্রতিপত্তিযুক্তা প্রভাবশালিনী মহিলা বা অনুরূপ সজ্জনের দ্বারা। পৃথিবীতে আমরা কাহারও শত্রুতা চাহি না সত্য, কিন্তু বন্ধুত্ব চাহি না একথা ঠিক নয়। সুতরাং বন্ধুভাবে কেহ আসিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা প্রয়োজন।

মাহিষ্য জাতির পরিচয়

"মাহিষ্য-সমাজ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। গত এক সংখ্যায় "মাহিষ্য জাতির পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেওয়া হইয়াছে। তার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

বাংলাদেশে দুই প্রকার কৈবর্ত্ত জাতি আছে। একটি আর্য্য, উচ্চ হিন্দু জাতি ও বিশুদ্ধ, অন্যটি তালিকাভুক্ত জাতি। একটি মাহিষ্য, অন্যটি মার্গব ; একটি দ্বিজবর্ণা, অন্যটি শূদ্রবর্ণা ; একটি আচরণীয়, অন্যটি অনাচরণীয়। আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতির পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্যা এবং ইঁহারা কৃষিজীবী ; সুতরাং জন্মতঃ কর্ম্মতঃ ও ধর্ম্মতঃ ইহারা বিশুদ্ধ ; এইজন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয়গণ আবহমান কাল ইঁহাদের জল পান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদেরই নামান্তর মাহিষ্য। তালিকাভুক্ত কৈবর্ত্তজাতি নৌকর্ম্মজীবী ও মৎস্য-ব্যবসায়ী ; ইহারা প্রথম প্রকারের কৈবর্ত্ত হইতে জন্মতঃ কর্ম্মতঃ ও ধর্ম্মতঃ পৃথক— ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয়গণ ইঁহাদের জল পান করেন না—ইহাদের নামান্তর জালিক—ইহারা মাহিষ্য নহে পরন্তু মার্গব দাশ। মনুসংহিতায় এই দ্বিতীয় প্রকারের কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এইরূপ পাওয়া যায় :

> নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
> কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ ॥ ১০।৩৪ ॥

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে জাত নিষাদ পুরুষের ঔরসে শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে জাত অয়োগব জাতীয়া স্ত্রীতে নৌকর্ম্মজীবী মার্গব জাতির উৎপত্তি হয়—মার্গবের অপর নাম দাশ—আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত এইরূপ নামেও ডাকিয়া থাকে। (মনূক্ত মার্গব জাতি বাংলাদেশে মালো নামেও পরিচিত, মালো ও জেলে কৈবর্ত্ত একই জাতি, বিভিন্ন পরিচয় মাত্র— বিশ্বকোষ ও সমস্ত নির্ণয়ের পরিশিষ্টেও এইরূপ উল্লেখ আছে।)

এই শ্লোকে দুইটি কথা লিখিত হইয়াছে :

(১) নিষাদ হইতে অয়োগবীতে জাত জাতির একটি শাস্ত্রোক্ত নাম "মার্গব", অপর শাস্ত্রোক্ত নাম "দাশ"।

এশিয়াটিক সোসাইটির কোন এক সংখ্যায় (১৮৭৭ খ্রীঃ ১ম খণ্ড) যবদ্বীপের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল—"যবদ্বীপের ক্ষত্রিয়গণ মাহিষ বা কেবো" অর্থাৎ মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত ছিল। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—মাহিষ্য =মহী-লো-ক=মহিষ শক্তির প্রতীক।

চাষী কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য পিতৃমাতৃ সাম্যে একই জাতি— শাস্ত্রভেদে নামভেদ মাত্র। কিন্তু জালিক কৈবর্ত্ত বিভিন্ন পিতামাতার উৎপন্ন বলিয়া মাহিষ্য নহে। চাষী কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য উভয়ের জাতীয় বৃত্তি একই। ঔশানস ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে ও বৈশ্য ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানের মাহিষ্য কি কৈবর্ত্ত কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ নাই—উহাদের বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বৈশ্যবৃত্তি। আবহমান কাল চাষী কৈবর্ত্ত জাতিও এই বৃত্তিতে অনুরক্ত রহিয়াছে।

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ"

এই মনু-বচন অনুসারে পিতৃমাতৃ সাম্যে ও বৃত্তিসাম্য অনুসারে চাষী কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য জাতি অভিন্ন।

বাংলা ও আসামে চাষী কৈবর্ত্ত ও দাস, উড়িষ্যার খণ্ডাইত, রাজপুতনায় বহু, রাজপুতনা ও ইটোয়া অঞ্চলে মাহেশ্রী (মাহেশ্বরী) এবং ভারতের কতিপয় স্থানে ক্ষত্রিয় রাজপুত জাতিগুলি ভারতের বিরাট মাহিষ্য জাতির এক এক শাখা বলিলে চলে। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, নর্ম্মদা নদীর তীরদেশে এই জাতির প্রাথমিক আবাসভূমি ছিল। এই স্থান সম্ভবতঃ কিম্বর্ত্তদেশ। সরযূতট হইতেও দিগ্বিজয়ী মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ মধ্যভারতে গমন করিয়াছিলেন। মাহিষ্য জাতির একতম প্রাচীন কেন্দ্রভূমি মাহিষ্মতী সম্বন্ধে মিঃ রাইস্ এবং মিঃ ফ্লিট্ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন (এপ্রিল ১৯১০)। নর্ম্মদা ও সরযূতট হইতে মধ্য ভারতের অধিত্যকায় পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া তাঁহারা কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।...

হে অনাদি অতীত, কথা কও

কবির এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বর্তমানের "আর্য্য" (সাপ্তাহিক) গত ২২শে ফাল্গুন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

"ঘুমিয়ে আছে গ্রাম" প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি তুলিয়া দিলাম। গ্রামের নাম আকা; তার "সাত দেউলের" ইতিকথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন :

"এ গ্রামের কোনও হদিশ মেলে না ইতিহাসের পাতায়। লোক-প্রবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাত-দেউলের লৌকিক ইতিহাস। প্রবাদ আছে সাত-দেউল গুপ্তযুগের। দেউলের শিল্প-চাতুর্য্যে প্রকাশমান হয়ে আছে গুপ্ত সম্রাটদের শিল্প-পোষকতার সুমহান নিদর্শন।

গগনচুম্বী মিনারের উদ্ধত স্পর্দ্ধায় সাত-দেউল আজ আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বিলীয়মান নৃপতিবংশের কীর্ত্তি-যশোগাথার স্থাপত্য সাক্ষ্যরূপে একটা মাত্র আজ তার দেউল দাঁড়িয়ে আছে। কালের প্রহরী হয়ে আছে দাঁড়িয়ে; গল্প আছে : সাত ভাই মাতৃঋণ শোধ করতে তৈরী করেছিল এ সাত-দেউল। কে জানে কি সে মাতৃঋণ! কেউ-বা বলে : হিন্দু রাজা শালিবাহন ছিলেন আকাপুরের নরপতি। সম্ভবতঃ, আকাপুরই ছিল তাঁর রাজধানী। আকাপুর, হ্যাচরা, সালমুলা, নীরাপাড়া, আদমপুর ছিল তাঁর রাজ্যের চৌহুদ্দি। শালি-বাহন রাজার রাজ্যের শেষ নির্দ্দেশ আকাপুরের পূর্ব্ব প্রান্তের সালমূলা জনপদের শিবানী মন্দির।

দেউলের ভাস্কর্য্যশিল্পের ভাব-ভঙ্গিমায় কোণারক আর ভুবনেশ্বরের শিল্প-বৈভবের প্রভাব রয়েছে প্রচুর। দেউলের ইটগুলো সরু ও লম্বা। লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ও বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষও রয়েছে এখানে। দেউলের গঠন-ভঙ্গিমা শিব-মন্দিরের মত, তার চূড়াগুলো খিলেনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেউলের গায়ে দেব-দেবীর মূর্ত্তি, শিল্পীর পরিভাষায় একে বলে 'টেরাকোটা' (terra-cota) অর্থাৎ মাটির মূর্ত্তি গড়ে তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ালে দেওয়া হয় গেঁথে। এখানে যে সব মূর্ত্তি রয়েছে তার রূপ এত অদ্ভুত। ঐতিহাসিক স্মৃতি-ভারে জড়িত রয়েছে সে মূর্ত্তির বিকৃতরূপ-বৈকল্য। নাক কান চোখ হাত মুখ পা এদের সব কাটা। লোকশ্রুতি যে, কালা-পাহাড় যখন হিন্দু দেব-দেবীমূর্ত্তি ধ্বংস করতে সুরু করে তখন এখানেও তার স্রোত এসে পৌঁছে। মূর্ত্তিগুলোর ভাঙা খোঁচা ভাব তারই ফল।

দেউলের চারধারে এখন ঘন জঙ্গল। মন্দিরের মধ্যে যে দেবতা আছেন তিনি পান না কোন পূজা। পুকুর কাটার সময়, বাড়ীর ভিৎ খোঁড়ার কালে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের হয় আত্মপ্রকাশ। এই জনপদ গড়ে উঠবার কালে তিন-চার ফুট মাটির ভেতরে পুকুরের পৈঁঠা, হাতী বাঁধার শিকল ও পুকুরের হদিশ মেলে। শ্রমিকদের মনে জেগে ওঠে গুপ্তধনের রূপকথা কাহিনী।

এ গ্রাম তৈরী হয়ে উঠেছে এক নদীগর্ভের বুকের উপর। ১৯৪৩ সালের বানে দামোদর তার গতি দেয় এই পথে। মনে হয় দামোদরের প্রাচীন মরে যাওয়া বুকে পত্তন হয়েছে এই নবীন গ্রাম্য সভ্যতা, আর তারও আগে এরই বুকে স্থাপনা হয়েছিল শালিবাহনের রাজধানী।

গ্রামের কিছু দূর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল বেহুলা বা বকুলা নদী। পায়ে চলার পথের সঙ্গে সে এখন গেছে মিশে। একশ' বছর আগে এক ক্লান্ত পথিক শ্রান্তি বিনোদনের জন্য ঠাঁই নিয়েছিল সাত-দেউলের পাশে। সেখানে বসে একটা কাঠি দিয়ে সে আপন মনে মাটির বুকে লিখে চলছিল জীবনের অবোধ্য এক বারতা। ধুলোর একটু নীচে সে দেখল সোনার মোহর। আকবরের সময়ে যে আস্রফী চলতি ছিল, এ স্বর্ণ মোহর তারই অনুরূপ।

...সাত-আট বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাত-দেউলের খোঁজ নিতে আসা হয়। তাঁরা নিয়ে যান এক বিষ্ণু মূর্ত্তি। গ্রামের বিদ্যোৎসাহীরা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।..."

এই বর্ণনা কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার বিদ্বান ও পণ্ডিতবৃন্দের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। "আর্য্যে"র "দশের কথা" চুটকি কথায় তাঁহাদের পরিচয় পাই। বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। তাহাদেরই এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। সকল বিষয়ে কলিকাতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতীতকে কথা কহাইতে হয় কি করিয়া তাহা জানিতেন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, হর প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ এবং জানেন আচার্য্য যদুনাথ ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ। এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

ন্যুট হ্যামসুন

৯২ বৎসর বয়সে জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক নরওয়ের ন্যুট হ্যামসুন পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মর-জগতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘুচিল। কিন্তু ভাবের রাজ্যে লোকের মনে তাঁহার স্থান অটুট হইয়া থাকিবে, যতদিন বঞ্চিত ও ক্ষুধার্ত্তের সমস্যা বিশ্বসংসারকে বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ করিতে থাকিবে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাহিত্যিকজীবন সুরু হয়। চাষার ছেলে, চাষার রক্ত তাঁহার ধমনীতে। সে রক্তের টান তাঁহাকে জমির দিকে টানিয়া লইয়া আসে মার্কিন মুলুকের যান-চালকের অবস্থা হইতে। "হাঙ্গার" ('ক্ষুধা') তাঁহার প্রথম পুস্তক। কোন প্রকাশক তাহা লইতে দ্বিধাবোধ করিত; অজ্ঞাতনামা ও অখ্যাতনামা একজন লেখকের প্রথম বই প্রকাশ করিবার সাহস সকলের থাকে না। কোন সাময়িকপত্রে দেখিয়াছি যে, এক জন প্রকাশক অত্যন্ত তাচ্ছিল্য সহকারে ঐ "ক্ষুধা" বইখানি রাখিয়া যাইতে বলিলেন, এবং তাচ্ছিল্য-

সহকারে সেদিন দোকানে কারুকার্য শেষ হইলে তাহা হাতে লইলেন। একটি দরিদ্র অঞ্চলের হোটেলের বর্ণনা ছিল তাহাতে। বই পড়িয়া প্রকাশক হ্যাট হামসুনের কুটিরে ছুটিয়া গেলেন এবং কিছু অগ্রিম টাকা দিয়া বই প্রকাশের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন।

তার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে আসিল বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এবং বিপুল অর্থোপার্জ্জন। কিন্তু তাঁহার পরিবার-পরিজনকে লইয়া তিনি কৃষক-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ম্যারী আণ্ডারসেন, দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা দেখি নাই। তাহা অনেকটা ছিল প্রকৃতি-পূজা (Pantheism) যাহা খ্রীষ্টীয় সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দা করা হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কালীকান্ত শিরোমণি

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার উনশিয়া গ্রামের বিখ্যাত বৈয়াকরণ পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি গত ১৭ই ফাল্গুন তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গা-লাভ করিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয় বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থবল না থাকিলেও তিনি বহু ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া বিদ্যাদান ও অন্নদান করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহার এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফলে তিনি দেশস্থ আবালবৃদ্ধ নরনারীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসরাধিক কাল ধরিয়া তিনি কোটালীপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্থান সৃষ্ট হইবার পর তিনি দেশত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া পুনরায় 'আর্য্য বিদ্যালয়' নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন ও সংস্কৃত ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঋষিতুল্য জীবনযাপন করিতেন, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ও সদাচারী ব্যক্তি এই যুগে দুর্লভ। শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ও পরোপকারী ছিলেন।

তিনি স্ত্রী, কনিষ্ঠ পুত্র, এক কন্যা ও বহু পৌত্রপৌত্রী এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। অগণিত ফরিদপুরবাসী তাঁহার তিরোধানে আত্মীয়স্বজনবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিবেন। আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অমিয়কুমার গাঙ্গুলী

"অমৃতবাজার" ও "যুগান্তর" পত্রিকার দিল্লীর সংবাদদাতা, তরুণ সাংবাদিক অমিয়কুমার গাঙ্গুলীর মৃত্যুসংবাদে সংবাদপত্র-সেবীমাত্রেই বিশেষ দুঃখ অনুভব করিবেন। দিল্লীর ইউ-নাইটেড প্রেসের রিপোর্টাররূপে এই তরুণ সাংবাদিক প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অমায়িক, মিষ্টভাষী, সদাপ্রফুল্ল এই যুবকের সহিত যাঁহারই পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছে, তিনিই তাঁহার আচরণে মুগ্ধ হইয়াছেন। নিখিল-ভারত সাংবাদিক ফেডারেশন গঠিত হইবার পরে এই তরুণ যুবককে দিল্লীর সাংবাদিকগণ সম্পাদক পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে বরণ করিয়াছিলেন। ভারতের সাংবাদিকদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে, বিভিন্ন প্রদেশে সাংবাদিক সঙ্ঘ গঠন করিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না।

রোগের অবস্থা কঠিন হইয়া উঠিলে তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে ভারতের এক জন কৃতী সাংবাদিকের দেহাবসান ঘটিল। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালী-নাথ রায় প্রভৃতি সাংবাদিকগণ যে ঐতিহ্য প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অমিয়কুমার তাহার উত্তরাধিকারী। নূতন যুগে এরূপ লোকের প্রয়োজন যখন সর্ব্বাধিক তখনই ভগবান তাঁহাকে তাঁহার পদপ্রান্তে লইয়া গেলেন।

অবনীমোহন রায়

গত ২১শে ফাল্গুন জয়পুরিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অবনীমোহন রায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক বয়সে তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার পুত্র-পরিবার বিপন্ন হইলেন। মধ্যবিত্তের ও জনসাধারণের উপার্জ্জনক্ষম লোকের অকালমৃত্যুতে কত সংসার যে ভাঙিয়া পড়ে, তাহা সুবিদিত।

অবনীমোহনের শোকার্ত্ত পরিবারের উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

প্রাচীন ভারতে আর্য সভ্যতার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সভ্যতা বলিতে কি বুঝায় প্রথমে তাহার আলোচনা দরকার। কি দেখিলে আমরা বুঝিব এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য? ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, যে জাতি অধিক সাবান ব্যবহার করে তাহারাই সভ্যতার অধিক উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত ও মানুষ' গল্পে সভ্য ভব্য নব্য ভূত লুল্লু বলিয়াছিল যে, সে সাবান মাখিতেছে, তাহাকে দেখিলে লোকে এখন কোন বিলাতী 'লার্ডে'র ছেলে বলিয়া মনে করিবে। কাহারও মতে সংবাদপত্রের সংখ্যার উপর সভ্যতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। এটম বোমা তৈয়ারি করিতে পারিলে কি অধিক সভ্য হয়? পোশাক কি সভ্যতার পরিচায়ক? সুদৃশ্য পরিচ্ছদধারী চুরুটসেবী চার্চিল সাহেব কি অর্দ্ধনগ্ন গান্ধীর অপেক্ষা অধিক সুসভ্য? সর্বভূতে সমদর্শী কৌপীন পরিহিত যোগী ভোগবিলাসে নিমজ্জিত ধনী ব্যক্তির অপেক্ষা কি কম সভ্য? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

সভ্যতার মান। সভ্যতার কোন একটি বিশেষ মাপ-কাঠি নাই। এক জাতি অন্য জাতির অপেক্ষা কতক বিষয়ে বেশী সভ্য এবং অপর বিষয়ে কম সভ্য হইতে পারে। আবার সুসভ্য জাতির মধ্যেও সময় সময় অসভ্যতা প্রকাশ পায়। কোন জাতির সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের সেই জাতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের খবর জানা দরকার। তাহাদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রাবিধি, ব্যক্তিগত নৈতিক ধর্ম, গার্হস্থ্য সম্পর্ক, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, সমাজধর্ম, শিল্পাদির অবস্থা, রাজধর্ম, যুদ্ধপ্রবণতা ও যুদ্ধকালীন নীতি, গ্রাম নগর যানবাহন ইত্যাদির অবস্থা কিরূপ জানিয়া সমগ্রভাবে সভ্যতার বিচার করিতে হয়। লোকের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যতার বহিঃ-প্রকাশ। সাবান ব্যবহার শারীরিক পরিচ্ছন্নতার নির্দেশক; খবরের কাগজের সংখ্যা দেখিয়া জাতির শিক্ষা বিস্তারের পরিমাপ করা যাইতে পারে; সুদৃশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ সুরুচির পরিচায়ক; এটম বোমার দ্বারা বুঝা যায় জাতি বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলনে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, ইত্যাদি। মানবের নৈতিক ধর্ম সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ। নীতিবিরোধী যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অপর জাতির উপর অন্যায় কর্তৃত্ব সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়া ধরা হয়। অপর পক্ষে যে জাতি বিজ্ঞানের চর্চা করে না, ঐহিক সুখ-সাধনে তৎপর নহে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, রোগ-প্রতিষেধক উপায় জানে না তাহার নীতিবোধ ও পারত্রিক ধর্মজ্ঞান চরমে উঠিলেও তাহাকে সভ্য বলা চলিবে না। সকল বিষয়ে সুসমঞ্জস প্রচিতিই (development) প্রকৃত সভ্যতা। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতে কি প্রকার সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মান কিরূপ ছিল বুঝা সম্ভবপর হইবে।

প্রত্নবিদ্যা। কোন জাতির অতি প্রাচীন সভ্যতা কি প্রকার ছিল জানিবার জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্নবিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। ক্রীট, ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা এই প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে। পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ম নগরীর অনষ্ট ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা পুরাতন রোমক জাতির জীবন-যাত্রা-প্রণালী অবগত হইয়াছি। প্রাচীন মিশরীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধীয় বহু তথ্য তাহাদের রাজাদের পুরাতন সুরক্ষিত কবর আবিষ্কার করিয়া আমরা উদ্ধার করিয়াছি। ভারতে মোহন-জ-দরো খননের দ্বারা তত্রস্থ অধিবাসীদের অনেক পুরাকীর্তি জানিতে পারা গিয়াছে। আরও নানা স্থান খনন করিলে হয়ত প্রাচীন ভারতের অনেক কথাই জানা যাইবে কিন্তু প্রত্নবিদ্যার সাহায্য না লইয়াও ভারতের অতি প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভবপর। বেদ ও পুরাণের মধ্যেই এই ইতবৃত্ত নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে সুলিখিত ইতবৃত্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীন ইতবৃত্ত। পুরাণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 'হিষ্টরি'। পুরাণের প্রামাণিকতা 'পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যে সকল কালনির্দেশ আছে তাহা এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

বৈদিককাল। বৈদিক ঋষিদের ও বেদসূক্তে উল্লিখিত নৃপতিদের কাল আলোচনা করিলে দেখা যায় মনু, যম যমীর সূক্তগুলি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। অবশ্য বেদে আরও অতি পুরাতন ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৈবস্বত মনুর পূর্বে কোন সূক্ত রচিত হইয়াছিল বলিয়া

মনে হয় না। ৩৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদ সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল। অসিত ও দেবল ঋষি সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন সূত্রকারদিগের মধ্যে দুই জন। বৈদিককাল বলিতে এই দীর্ঘ ২৪০০ বৎসরব্যাপী সময় বুঝায়। বেদসূক্তগুলি সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব।

পুরাকালে ঋষিগণ ও রাজন্যবর্গ নানা যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতার আবাহন করিয়া তাঁহাদিগকে সোমরস নিবেদন করা হইত। এই উপলক্ষে ঋত্বিকগণ যে মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহাই বেদে সংগৃহীত হইয়াছে। অনুমান হয় বাল্মীকি বেদমন্ত্রগুলিকে প্রথমে যজুস্, ঋক্ ও সাম এই তিন ভাগে ভাগ করেন। বাল্মীকিকাল ২১০০ খ্রী-পূর্বাব্দ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে মন্ত্রগুলির গদ্যভাগ যজুস্, ছন্দোময় পদ্যভাগ ঋক্ এবং যে মন্ত্রগুলি গান করা হইত তাহাই সাম। যজুর্বেদের কোন কোন মন্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্বে অথর্ববেদ বলিয়া কোন পৃথক বেদ ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের কতকগুলি সূক্ত পৃথক করিয়া তাহার নাম দেন অথর্ববেদ। এইরূপে তিন বেদ অর্থাৎ ত্রয়ী কালক্রমে চারিবেদ হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাল ১৪৭০ খ্রী-পূর্বাব্দ।

বেদে পুরাবৃত্ত। বেদ ধর্ম পুস্তক, তাহা ইতবৃত্ত নহে। বেদ হইতে ইতবৃত্ত অনুমান করিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বেদে রাজাদের যুদ্ধকথা, আর্য ও দাসদিগের মধ্যে বিবাদ, তৎকালীন শিল্পাদির অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল উক্তি হইতে দীর্ঘ বৈদিককালের সভ্যতার ইতবৃত্ত সংকলন করা যায়। বেদপাঠে দেখা যায় যে, পুরাকালে ভারতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্পের প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। গো, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, কুকুর প্রভৃতি পশুপালন করা হইত। নাপিতে মস্তক মুণ্ডন করিত, শিল্পীরা বস্ত্র বয়ন করিত, মেষলোম হইতে পশমী কাপড়ও তৈয়ারি হইত, লোকে নৌকা করিয়া দুস্তর নদী পার হইত, ধাতব দ্রব্যের বহুল ব্যবহার ছিল, স্যাকরায় স্বর্ণালংকার তৈয়ারি করিত, রথ ইত্যাদি কাঠের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সুদক্ষ ছুতার মিস্ত্রি ছিল, রথকে মজবুত করিবার জন্য তাহা গোচর্মের দ্বারা আবৃত করা হইত, রথে ঘোড়া বা বলদ জোতা হইত। বলদ-বাহিত যুদ্ধরথে চড়িয়া মুদ্গল রাজার স্ত্রী ইন্দ্রসেনা অতি কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ধনুর্বাণ ব্যতীত বর্শা তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধাতব শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গত্রাণ ব্যবহৃত হইত। বেদে কৃত্রিম লৌহ নির্মিত পদেরও উল্লেখ আছে। খেলা হিসাবে ঘোড়দৌড় হইত। এখনকার সভ্যজাতির মত ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরা হইত কিনা তাহার উল্লেখ নাই, তবে বাজি রাখিয়া পাশা খেলার বিবরণ পাওয়া যায়। বেদসূক্তে জুয়াড়ির নানা দুর্ভোগের বর্ণনা আছে।

পুরুষে অনেক সময় বহু বিবাহ করিত। এখনকার মত তখনও অসৎ পুরুষ ও অসতী স্ত্রীলোক দেখা যাইত। ঋষিরা যজ্ঞে প্রচুর স্বর্ণ, গো, অশ্ব, দাস ও দাসী উপহার পাইতেন। গোধনের খুব গৌরব ছিল। চৌরভয় ও রাক্ষসের অর্থাৎ লুঠপাটকারী দস্যুদের উৎপাত ছিল। দস্যুদল সাধারণত বনে থাকিত। বনে অনেক সময় দাবানল জ্বলিতে দেখা যাইত।* লোকে আগুন লাগাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিত। বেদে বাসস্থানের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে যজ্ঞশালার বিবরণ আছে এবং এক যায়গায় বহু স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার কথা আছে, অসুরদিগের লৌহময় পুরীর উল্লেখ আছে। বিদ্যার বিশেষ আদর ছিল। বেদে অনেক গভীর জ্ঞানের কথা আছে। কাব্য হিসাবে অনেক সূক্ত অতি উৎকৃষ্ট। ছন্দোবদ্ধ, ভাবগম্ভীর ঋক্‌সূক্তগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের রচয়িতা ঋষিগণের বিদ্যা ও জ্ঞান কত উচ্চস্তরের ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদ্ চাষার গান মাত্র। এই ধারণা কেবল পল্লবগ্রাহী হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেই সম্ভবপর। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, যাহার পুরাণ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার নিকট বেদ প্রহৃত হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করেন। পুরাণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদের নানা প্রকার কদর্থ করিয়া থাকেন। পুরাণার্থবিৎ শ্রদ্ধালু জনের নিকটেই বেদ স্বীয় মর্ম উদ্ঘাটিত করেন।

পুরাণ। বেদপাঠে যেটুকু ইতবৃত্ত অনুমান করা যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বৈদিককালে ভারতীয়গণের সভ্যতা উচ্চাঙ্গের ছিল। এ সভ্যতা কিছু এক দিনেই গড়িয়া উঠে নাই, বেদের পূর্বকাল হইতেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই সভ্যতা বিস্তারের ইতবৃত্ত পুরাণ হইতে সহজেই পাওয়া যায়। পুরাণ বেদেরও বহু পূর্ববর্তী। সৌভাগ্যের বিষয় পুরাণে ভারতীয় পুরাবৃত্তের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে।—

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ ॥বায়ু ১।৩১॥

অর্থাৎ, সর্বশাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক স্মৃত হইল, অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদ সকল বিনিঃসৃত হইল। পুরাণে ৫৯৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহারও পরবর্তীকাল পর্যন্ত অখণ্ড ধারায় ভারতের ইতবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। কালে কালে পুরাণকারগণ পুরাণকে স্বকালাবধিক করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের অন্তর্গত। অনেকে বৈদিক কাল ও পৌরাণিক কালে পার্থক্য দেখেন। তাঁহারা মনে করেন, বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের পূর্ববর্তী। এ ধারণা নিতান্ত ভুল। বৈদিক কাল প্রায় ২৪০০ বৎসর ব্যাপী এবং ইহা দীর্ঘতর ৬৪০০ বৎসরের পৌরাণিক কালের অন্তর্ভুক্ত। পুরাণে বেদের পূর্ববর্তী প্রায় ২০০০ বৎসরের ইতবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। বৈদিক সময় সভ্যতা এইরূপ ছিল এবং পৌরাণিক কালে এইপ্রকার ছিল এই ধরণের উক্তির কোন মূল্য নাই। অবশ্য যে উক্তি কালনির্দেশসহ করা হয় তাহার গুরুত্ব বিচার করা যায়। আমি ভারতীয় সভ্যতার যে বিবরণ দিতেছি তাহা বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংকলিত।

ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব। যাঁহাদিগকে আর্য বলা হয় তাঁহারা ভারতে কবে প্রথম আসেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায় না। তবে আর্যেরা মধ্য এশিয়ার পূর্ব তুর্কীস্থান অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ হইতে প্রথম কাশ্মীরে আসেন একথা অনুমান করা যায়। পরে তাঁহারা পঞ্জাব ও বিন্ধ্যাচলের উত্তর প্রদেশ ক্রমে অধিকার করেন। অল্প সময়ের মধ্যে আর্যেরা দক্ষিণাপথেও রাজ্যবিস্তার করেন। ইলাবৃত বর্ষ, কাশ্মীর, বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ যথাক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত এবং পাতাল নামে পুরাণে পরিচিত আছে। ইলাবৃত বর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তর ভারত, দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্তলোক অথবা ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন নামেও পরিচিত ছিল। দেবলোক হইতে দেবগণ প্রথমে যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁহারা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গাধিপতির সাধারণ নাম। ভারতে ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হইল প্রজাপতি এবং তৎপরে মনু। প্রথমে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছিলেন। তখনকার প্রজাপতিদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইঁহাদের অধীনে প্রজা বৃদ্ধি পাইল না। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ইন্দ্রের প্রতিভূ হইলেন। ইনিই প্রথম মনু। ইঁহার প্রকৃত নাম বিরাজ। বিরাজ মনু প্রজাদিগের পালনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার কাল ৫৭৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরগণ ১০০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল রাজার ন্যায় প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সময় প্রজা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতে ২০০০ বৎসরকাল পর্যন্ত পুরাণমতে সত্যযুগ। সত্যযুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, লোকে যদৃচ্ছা চলিত। আইন-কানুন না থাকায় কোনও কাজই মানবধর্মবিগর্হিত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্যই বলা হয় যে, সত্যযুগে ধর্ম পরিপূর্ণ বা চতুষ্পাদ ছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর পাঁচ পুরুষ পরবর্তী প্রজাপতির নাম ভরত। ইঁহার নাম হইতেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। ভরতের কাল ৫৮৩৭ খ্রী-পূর্বাব্দ। বিরাজ মনুর বংশেই আনুমানিক ৫১৬১ খ্রী পূর্বাব্দে ধ্রুব আবির্ভূত হন। পুরাণের কৃপায় ইঁহার নাম অদ্যাবধি কীর্তিত হইতেছে। আনুমানিক ৪৯১৯ খ্রী-পূর্বাব্দে স্বায়ম্ভুব বংশে বেণ নামক এক প্রজাপতি হন। ইনি ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি রূপে ঘোষণা করেন। ইহার ফলে তাঁহার ঋষিদের সহিত কলহ হয় ও তিনি নিহত হন। তখন অরাজক অবস্থা উপস্থিত হয়। বিন্ধ্য শৈলবাসী নিষাদগণ দেশ অধিকার করে। নিষাদগণ ভারতের এক আদি জাতি। তাহারা হ্রস্বকায়, তাহাদের বর্ণ পোড়া কাঠের ন্যায় ও মুখ খর্বাকার। নিষাদগণ প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুঠপাট করিতে লাগিল। রাজ্যের অরাজক অবস্থা দূর করিবার জন্য ঋষিরা পৃথুকে বেণের স্থলাভিষিক্ত করিলেন। পৃথুর নামানুযায়ী ভূমণ্ডলের নাম পৃথিবী হয়। পৃথুই ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজা। তিনি কবচ ও ধনুর্ধারণ করিয়া নিষাদদিগকে বশে আনিলেন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। ইতবৃত্ত প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনিই প্রথম সূত ও মাগধ নিয়োগ করিলেন। পৃথুর রাজ্যকালে প্রজাগণের প্রথমত কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা প্রচুর গো-দুগ্ধ পাইত এবং একপ্রকার বৃক্ষ হইতে মিষ্ট রস আহরণ করিত। এই রসকে অমাক্ষিক মধু বলা হইয়াছে। প্রজাগণ বৃক্ষের ফলফুল হইতে অলংকার প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিত এবং বৃক্ষই তাহাদের পরিধান যোগাইত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা বল্কল পরিত। প্রথমত বৃক্ষের আশ্রয়েই তাহারা বসবাস করিত, ক্রমে বৃক্ষশাখা বিস্তারের অনুকরণে তাহারা কুটীর প্রস্তুত করিতে শিখিল। অধিক অমাক্ষিক মধু আহরণের ফলে মধু বৃক্ষগুলি নষ্ট হইয়া গেল। তখন প্রজাগণ পৃথুর নিকট গিয়া বলিল, 'অরাজক অবস্থায় ধরিত্রী সকল ওষধি অর্থাৎ খাদ্যশস্য গ্রাস করিয়াছে তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রজাপাল নিরূপিত করিয়াছেন, তুমি ক্ষুধার্ত প্রজাগণকে রক্ষা কর'।

অনন্তর পৃথু নানা স্থান হইতে খাদ্যশস্যের বীজ সংগ্রহ করাইলেন, জমি হইতে প্রস্তরাদি অপসারিত করাইয়া কৃষিকার্যের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত করাইলেন, গো রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং বণিক-পথ নির্মাণ করাইলেন। তিনি নগর ও গ্রামের প্রবিভাগ প্রবর্তন করিলেন। ভূমির যে যে স্থান সম ছিল রাজা

সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। পুরাণে আছে, পৃথুর পূর্বে এ সকল কিছুই ছিল না, বৈণ্য অর্থাৎ বেণপুত্র পৃথু হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। এত পরিশ্রম করিয়া পৃথু যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করিলেন তাঁহার মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহা লোপ পায়। পুনরায় প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময় পৃথিবী কুশ তৃণে আবৃত হইয়া গিয়াছিল এবং অরণ্যানী সমস্ত ভূমি গ্রাস করিয়াছিল। অনুমান হয় বৃহৎ প্লাবনের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। অতঃপর নদী-তীরবর্তী দেশ হইতে দশ জন প্রচেতা নামধারী ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিসংযোগে বনের বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন। তাঁহারা মারিষা নাম্নী এক বন্যজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলেন। দশ জন প্রচেতাই মারিষার স্বামী হইলেন।

প্রচেতাগণের দক্ষ নামে এক পুত্র হয়। দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজাগণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনুমান হয় তখন প্রজাগণ পৃথক্ পৃথক্ দলে বাস করিত। হর্যশ্ব নামে প্রায় ৫০০০ ব্যক্তির একটি দল উত্তম বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া নষ্ট হইয়া গেল। 'নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না সেইরূপ তাহারা অদ্যাপি নিবর্তিত হন নাই।' দক্ষের হর্যশ্ব নামক প্রজাগণ নিরুদ্দিষ্ট হইলে শবলাশ্ব নামক ১০০০ ব্যক্তির আর একটি দল পুনরায় এইরূপই বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া লোপ পাইল। ভারতের কোন কোন প্রদেশে রোগে, আদিম জাতির উৎপাতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এইরূপ অনেক দল লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষের কাল ৩৮৮৯ খ্রী-পূর্বাব্দ। দক্ষের সময় হইতে ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবন হয়। দেবলোক বা ইলাবৃত বর্ষ হইতে যে সভ্যতা ভারতে আসিয়াছিল তাহাই এই সময় হইতে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আজ পর্যন্ত অখণ্ড ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রথম যখন ইউরোপীয়গণ আমেরিকায় যান তখন তাঁহাদের সভ্যতার মান অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে তাহা স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া আধুনিক আমেরিকান সভ্যতার রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রকার ইলাবৃত বর্ষের সভ্যতা ভারতে আসিয়া প্রথমত প্রায় লোপ পাইয়াও পরে নবকলেবরে উত্থিত হইয়াছে।

বৈবস্বত মনুকাল। বিবিধ ধর্মবিধি প্রবর্ত্তন। দক্ষের কন্যা অদিতির এক পুত্রের নাম বিবস্বান। বিবস্বান অতি তেজস্বী এবং পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ঋগ্বেদে তাঁহাকে গন্ধর্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি পার্বত্য প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বৈবস্বত। ইনি মনু অর্থাৎ ভারতীয়দিগের প্রজাপালক নৃপতি হন। বৈবস্বত মনুর কাল ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দ। এই সময়টা ভারতীয় সভ্যতার এক অতি গৌরবোজ্জ্বল যুগ। বৈবস্বত মনু ত্রেতা যুগের প্রথম দিকে আবির্ভূত হন। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভ ৩৭৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে। বৈবস্বতের সময় সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজ-সংস্কার, দণ্ডবিধি প্রবর্তন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন ধারার সূত্রপাত হয়। এই সময় যজ্ঞানুষ্ঠানও প্রচলিত হয়, অনেক বিদ্বান ব্যক্তির সহযোগিতা ব্যতীত সর্ববিষয়ে এরূপ আমূল সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, প্রচেতা, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ এবং অজ্ঞাত-নামা আরও অনেকে বৈবস্বত নৃপতিকে তাঁহার মহৎ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, পাষণ্ডগণের ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যাবতীয় আচার-ব্যবহার বিচার করিয়া বিধিস্থাপনা করিলেন। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম বিভাগ এই সময় প্রথম প্রবর্তিত হয়। যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া থাকিবেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন, যাঁহারা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও প্রজাপালন করিতেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বৈশ্য হইলেন এবং এই তিন বর্ণের পরি-চারকেরা শূদ্র হইলেন। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও পরি-ব্রাজক এই চারি আশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য নিরূপিত হইল। জাতকর্মাদি সংস্কার, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্রের কর্তব্য, চতুর্বর্ণের বিবাহ, বিবাহের প্রকারভেদ, অতিথি-সৎকার, শ্রাদ্ধাদি, বিভিন্ন প্রকারের জীবিকার উপায়, খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়, অশৌচ ব্যবস্থা, কাষ্ঠ বস্ত্র ধাতব দ্রব্যাদির শোধন-ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের ধর্মোপায়, বানপ্রস্থ যতি পরিব্রাজকের ধর্ম, রাজধর্ম রাজ্যশাসন ও যুদ্ধাদির নিয়ম, ঋণদান, সাক্ষ্য, দণ্ডাদির ব্যবস্থা, চৌর্য নিবারণ ইত্যাদি যতপ্রকার কর্ম সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যক তাহা সমস্তই বিধিনিষেধের নিয়মাধীন করা হইল। পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধনেরও উপদেশ লিখিত হইল। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মাবলী সংহিতাকারে একত্রে গ্রথিত হইয়া মনুসংহিতা বা মানব ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত হইল। কালে কালে এই ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগধর্মানুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইউরোপে দণ্ডনীতি নেপোলিয়নের সময় প্রথম বিধিবদ্ধ করা হয় কিন্তু ভারতীয় দণ্ডনীতি বহু যুগ হইল ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই ধর্মশাস্ত্র এখনও হিন্দুদিগের জীবনযাত্রা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থ্যধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম, যুদ্ধনীতি প্রভৃতির মান কত উন্নত ছিল তাহা বিভিন্ন পুরাণে এতৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়িলে জানা যাইবে। বলা

বাহুল্য, এই সকল প্রবন্ধের মূল উৎস আদি মনুস্মৃতি। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় মনীষীদের এখন পর্যন্ত পুরাণের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে সময় লাগিয়াছিল। সকল ব্যাপারে বিনয় বা নিয়মানুবর্তিতা সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ। যে জাতি যথেচ্ছাচারী তাহাকে সভ্য বলা যায় না। প্রাচীন হিন্দুর বিনয় এক প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কিন্তু মনুস্মৃতি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকল লোকে নিয়মানুবর্তী হয় নাই। বিধিসমূহ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু সময় লাগিয়াছিল। কালে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে রাখিবার জন্য বহু নূতন নূতন বিধি প্রবর্তিত করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং মনুকন্যা ইলা বুধের সহিত বিবাহিত হইলেও সুদ্যুম্ন রাজার সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন। মনুপুত্র পৃষধ্র আচার-ব্যবহারের দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর পৌত্র নাভাগ এক বৈশ্যকন্যার প্রেমে পড়িয়া পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে বিবাহ করিয়া বৈশ্য হইয়া যান। তিনি বৈশ্য হইয়া রাজাদেশে প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন স্বীয় বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেন। তিনি নিজ পিতাকে সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলে নাভাগ বলিলেন, 'আমি পিতার আজ্ঞানুসারে যে রাজ্য একবার পরিত্যাগ করিয়াছি তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিব না। আমি বৈশ্য বৃত্তিতেই অবস্থিত থাকিয়া তোমাকে কর প্রদান করিব। তুমি এই রাজ্য ভোগ কর অথবা ইচ্ছা হইলে পরিত্যাগও করিতে পার।' লোকে যাহাতে নিজ নিজ বর্ণমর্যাদা অতিক্রম না করে পরবর্তীকালের রাজগণ সে বিষয়ে খর দৃষ্টি রাখিতেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, দ্রোণ ও কৃপ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই সমাজ হইতে চ্যুত হন নাই। মনুর সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসরকাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন যাযাবর দস্যুদল দেখা যাইত। দস্যুদলপতিরা প্রায়ই নিজেদের দেশে রাজার মত প্রজাপালন করিত। তাহারা অপরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করিত। পররাজ্য আক্রমণে তাহারা অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় লইত। রাবণ এইরূপই একজন দস্যুরাজ বা রাক্ষসপতি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যার প্রসার। বৈবস্বত মনুকালে জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময় পূর্বপরিচিত জ্যোতিষ্কগণের নূতন করিয়া নামকরণ হয়। বৈবস্বত-পিতা বিবস্বানের নামানুযায়ী সূর্যের নাম হইল, ধর্মপুত্র সোমের নামে চন্দ্র পরিচিত হইল, ভৃগুপুত্রের নামানুযায়ী শুক্রগ্রহের নাম হইল। সেইরূপ বুধ, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে গ্রহগণ নাম পাইল। তখনকার দিনে উত্তর দিক উচ্চ দিক বলিয়া কল্পিত হইত। সর্বোচ্চে অবস্থিত নক্ষত্রের নাম ধ্রুবের নামানুযায়ী ধ্রুব হইল। অনুমান হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌর্বাপর্য অনুসারে সর্বোর্ধ্ব ধ্রুব হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের নামকরণ হইয়াছিল। পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতি ঋষির নামানুযায়ী সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারকাদের নামকরণ হইয়াছিল। দক্ষ কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া ব্যক্তিগণের নাম অনুসারে ২৭ নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর দৌহিত্রের নামে চন্দ্রসূর্যগ্রাসকারী ছায়া রাহু নাম পাইল। রাহু যে বাস্তবিক মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া তাহা জানা ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ॥ ৫৮।৬৩॥ পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার তাহাও জানা ছিল। চান্দ্র, সৌর্য, সাবন ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাস এবং পাঁচ বৎসরের লৌকিক যুগ নির্ণীত হইল। দীর্ঘতরকাল পরিমাপের জন্য ১০০০ যুগ অর্থাৎ ৫০০০ বৎসরের কল্প নির্দিষ্ট হইল। কল্পের অন্তর্বিভাগ হিসাবে প্রতি ৭১ যুগের অর্থাৎ ৩৫৫ বৎসরের 'মনুকাল' কল্পিত হইল। 'মনু' ১৪টি। এই কালের সহিত ১৫টি ২ বৎসরের সন্ধি স্থির করিয়া তাহা ৫০০০ বৎসরের কল্পের সহিত খাপ খাওয়ান হইল। ১৪মনু + ১৫সন্ধি = ১৪ × ৩৫৫ + ১৫ × ২ = ৪৯৭০ বৎসর + ৩০ বৎসর = ৫০০০ বৎসর। স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি বিন্দু স্থির করিয়া 'মনু' কালের সাহায্যে ইতবৃত্তীয় উদ্দেশ্যে কাল গণনা হইত। পরে আরও নানা প্রকার যুগের দ্বারা কালমাপনা প্রবর্তিত হয়। গ্রহাদির নামকরণ ও যে সকল জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় তথ্য বলা হইল তাহা ৩৭০০ খ্রী-পূর্বাব্দের পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

শিক্ষা। শিক্ষা ও ভাষাকে সভ্যতার মানদণ্ড মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রম কাল উপনয়নের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া, ২৪ এমন কি ৩৬ বয়স পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহেই থাকিতে হইত। আশ্রমের স্থান লোক-কোলাহল হইতে দূরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্ট হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিকেই আশ্রমধর্ম পালন করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর সমস্ত সময়ই লেখাপড়া,

বিনয়, সদাচার ও ধর্মাচরণ শিক্ষায় কাটিত। তাহাকে কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইত। সর্বপ্রকার আলস্য ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া গুরুসেবা ও গুরুর সাংসারিক কার্যে সহায়তা করিতে হইত। পরিধেয় ও বিছানাপত্রের সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িতে হইত। গোচারণ, কাষ্ঠাদি আহরণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য ও গুরুর জন্য ভিক্ষা করিতে হইত। মোটকথা, ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থাকিয়া শিষ্যের সর্বপ্রকার কায়িক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইত। সব কাজেই, এমন কি ভিক্ষা করাতেও, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। এখনকার মত অবিনীত ছাত্র তখন প্রায়ই দেখা যাইত না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কলহ হইত। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গুরুর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। নগর হইতে দূরে আশ্রম থাকায় ব্রহ্মচারীর কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ ঘটিত না। ছাত্রেরা একমনে লেখাপড়া করিত। গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের সামর্থ্যমত গুরুদক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যাইত। গুরু-গৃহে থাকাকালীন শিষ্যরা গুরুর পরিবারভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইত এবং তাহাদের নিজেদের কিছুই খরচ করিতে হইত না, সেইজন্য আশ্রম ছাড়িবার সময় শিষ্যরা গুরুদক্ষিণা হিসাবে সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিত। শিষ্য অসমর্থ হইলে অন্তত পক্ষে তাহাকে ছত্র ও পাদুকা দিতে হইত। কোন কোন শিষ্য বিবাহাদি না করিয়া আজীবন-কাল গুরুগৃহে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। আবার কেহ কেহ এক গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অপর গুরুর নিকট নূতন বিষয়ে শিক্ষার জন্য যাইত। তখনকার দিনে সাধারণত এই কয়টি বিদ্যা শিখান হইত—ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, বেদান্ত, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব বেদ অর্থাৎ সঙ্গীত শাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র অর্থাৎ ধনরত্নাদি পরীক্ষা বিষয়ক শাস্ত্র, নিমিত্ত বিদ্যা অর্থাৎ নানা লক্ষণ বিচার করিয়া বিপদের সম্ভাবনা অনুমান; মৃত্যু, অগ্নিদাহ, প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনা এবং যুদ্ধের ফলাফল অনুমান ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত, অর্থ-শাস্ত্র, গণিত, ভূতবিদ্যা, সর্প ও দেবজন বিদ্যা অর্থাৎ দেবতা মানব সর্প প্রভৃতি জাতির নৃতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান, পর্বতাদির সংস্থান অর্থাৎ ভূগোল, বাস্তুশাস্ত্র অর্থাৎ মন্দির বাসস্থান নগর গ্রাম প্রভৃতি নির্মাণ, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যার বহু পুঁথি ছিল এবং এই পুঁথি ব্রহ্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষায় লিখিত পুঁথি একত্রিত করিলে তাহার অর্ধেকও হইবে না।

গুরুগৃহে পাঠের সুবিধা এই যে দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের যত গভীর অনুশীলন তথায় সম্ভবপর সাধারণ বিদ্যালয়ে বা কলেজে তাহা নহে। অপর পক্ষে বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য প্রয়োগশালার আবশ্যক হওয়ায় এখনকার ব্যবস্থাই প্রশস্ততর। প্রয়োগশালা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সেই সময়কার কোন জাতি বিজ্ঞানে ভারতীয়দের মত অগ্রসর হইতে পারে নাই। আধুনিককালে অন্যান্য সভ্যজাতির তুলনায় ভারত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পিছাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অনধিকারীর শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্য প্রকার ছিল। স্ত্রী এবং শূদ্রের আশ্রমধর্ম নাই। অনেক সময় গুরুকন্যাগণ অন্যান্য শিষ্যের সহিত পাঠ লইতেন এবং পিতৃগৃহে থাকিয়াই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেন। সাধারণ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের অবশ্য এই সুবিধা ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ভিতর অনেকেও যে নানা বিদ্যা অর্জন করিতেন, তাহার প্রচুর উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বহু স্ত্রী-ঋষির সূক্ত আছে। কোন কোন পুরাণকার অনার্যা স্ত্রীলোক। পুরাণে মদালসা নাম্নী এক ধর্মশাস্ত্র পারদর্শিনী সুশিক্ষিতা রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ শিক্ষার সুযোগ মিলিত না তাহাদের এবং শূদ্রদের জন্য নানাপ্রকার লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয় লোকও যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। লোকশিক্ষার ব্যবস্থায় অক্ষর পরিচয় হইত না বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইত না। প্রাচীন কালে নানা প্রকার ব্রত, পার্বণ এবং দানবিধি প্রচলিত ছিল। লোকে পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান, উপাখ্যান শ্রবণ করিত। রাজগণের নিয়মিত পুরাণ শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকের ও শূদ্রদিগের এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন বাধা ছিল না। ব্রত, পার্বণ ও তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়া অনেক জ্যোতিষিক, ভৌগোলিক ও ইতবৃত্তীয় তথ্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এই সকল ব্রত ও উপবাসময় বিবিধ দানধর্মকে 'ধর্ম, অর্থ এবং কাম-সাধক' বিবরণ বলা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে যে নানাবিধ ব্রতের বিবরণ দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলেই আমার উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে। পুরাণ, আখ্যান প্রভৃতি শ্রবণে লোকের ইতবৃত্তীয় কৌতূহল ও ধর্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইত। তাহা ছাড়া লোকে ইহাতে সমাজনীতি, স্বাস্থ্য-

নীতি, সদাচার প্রভৃতিরও শিক্ষা পাইত। আধুনিককালেও লোকশিক্ষার জন্য কথকতা প্রভৃতি অল্পস্বল্প প্রচলন আছে। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠও অনেক লোকে শুনিয়া থাকেন। আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণ এখনও অন্য দেশের নিম্ন শ্রেণীর লেখাপড়া জানা সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত ছিল। এক প্রাকৃত অপরটি সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি জাত অর্থাৎ কেহই ইহার সৃষ্টি করে নাই। মানুষ স্বভাবত মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া যে ভাষা শিক্ষা করে তাহাই প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা প্রদেশ অনুসারে ভিন্ন প্রকারের হয়। প্রাকৃত শব্দের আদিম অর্থ অনুসারে বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া, তামিল, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষা প্রাকৃত। একই প্রাকৃত ভাষার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। পূর্ববঙ্গের বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বিভিন্ন। প্রাকৃত ভাষা বলিতে আজকাল একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষা বুঝায়। পুরাকালে প্রাকৃত শব্দের এই সঙ্কীর্ণ অর্থ ছিল না। আমি প্রাকৃত শব্দটি পুরাতন অর্থেই ব্যবহার করিব। একই প্রদেশের স্থানভেদে প্রাকৃতিক ভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সেই প্রদেশের লেখ্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় এবং প্রদেশবাসী সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সেই ভাষা সহজে বুঝিতে পারেন। প্রাকৃত ভাষার কিছু সংস্কার করিয়া লেখ্য ভাষা গঠিত হয়। এই সংস্কার স্বাভাবিক কতকগুলি নিয়মের বশেই হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে একথা সত্য কিন্তু যে সংস্কারের ফলে ইহা এক পূর্ণাবয়ব ভাষার রূপ পাইয়াছে তাহা অতি সুদূরপ্রসারী এবং সুপরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুসারে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের বর্ণবিন্যাস ও শব্দ, সন্ধি ও সমাস গঠন ও ইহার ব্যাকরণ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অপর সকল ভাষাতেই বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত হইয়া আছে। উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগও অন্য ভাষায় দেখা যায় না। সংস্কৃতের শব্দ-সম্পদও অতুলনীয়; এই ভাষায় ১,৮০,০০০এর উপর শব্দ আছে। যে কোন জটিল ভাব সংস্কৃতে প্রকাশ করা যায়। এক বা একাধিক প্রাকৃত ভাষার আমূল-সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, এইজন্যই ইহার নাম সংস্কৃত। এই ভাষা কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারিতেন। এখন যেমন লেখ্য বাংলা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির কথ্য হইয়াছে পুরাকালে সেইরূপ অনেকেই সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতেন। ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন। অপর পক্ষে স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাকৃতে কথা বলিতেন। প্রাকৃত হইতে অনেক শব্দ যেমন সংস্কৃতে আসিয়াছিল সেরূপ সংস্কৃত হইতেও নানা শব্দ পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষা-গুলিকে পুষ্ট করিয়াছে। বাংলা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতে এখনও সংস্কৃত হইতে শব্দ দোহন চলিতেছে।

সংস্কৃত ভাষা মূলত বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের ভাষা ছিল বলিয়া ইহাকে ব্রাহ্মী ভাষাও বলা হইত। সংস্কৃত ভাষার আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। পরে দেবনাগরী লিপির চলন হয়। সংস্কৃত কোন প্রাদেশিক ভাষা না হওয়ায় বিদ্বানগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ইহা ভারতের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই ভাষা সৃষ্ট হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখিতে লাগিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল বিদ্যার গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত। সংস্কৃত কেবল যে রাষ্ট্র-পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে। অনেক কবি ও বিদ্বান ইহাতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত কাব্য প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারতের মত বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় নাই। যাঁহার বক্তব্য সকল প্রদেশের লোককে শুনাইবার দরকার হইত তিনিই সংস্কৃতে লিখিতেন। এই ভাষার দ্বারা সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের আচরণে ও শিক্ষার ধারায় যে মূল ঐক্য দেখা যায় তাহা এই সংস্কৃতের প্রভাবেই। সংস্কৃতের মত এক কৃত্রিম ভাষা যে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা পরম আশ্চর্যের বিষয়। যাঁহারা এই ভাষা আবিষ্কার ও প্রচলন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দূরদৃষ্টি প্রশংসার অতীত। পৃথিবীতে সংস্কৃতের ন্যায় আরও একটি কৃত্রিম ভাষা প্রচলিত আছে তাহার নাম এস্‌পার‍্যান্টো (Esperanto)। ইহা আধুনিককালে সৃষ্ট হইয়াছে। এস্‌পার‍্যান্টো পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন করিবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। কাহার দ্বারা এবং কবে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন হয় তাহার কোন যথাযথ সন্ধান পাওয়া যায় না তবে এ ভাষা যে খুবই পুরাতন সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার ন্যায় ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই। যাঁহারা ইহাকে চালাইয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাকে পূর্ণাবয়ব ভাষারূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত না থাকায় তাহার কোন ঐতিহ্য ছিল না সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার ইচ্ছামত গঠনে কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। স্রষ্টা ইহার যে রূপ দিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। কালে সকল ভাষাই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয় কিন্তু সংস্কৃতের বেলায় সে কথা খাটে না। বৈদিক ভাষা ও সাধারণ সংস্কৃতের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু উভয়ই কৃত্রিম ও সমকালীন। বৈদিক ভাষা সাধারণ সংস্কৃতের প্রকারভেদ মাত্র। ঋগ্বেদে এক স্থানে ॥১০ম।৭১।২-৩॥ উল্লেখ আছে যে, ঋষিরা কোন এক সময়ে ভাষাকে চালুনির দ্বারা ছাতু ছাঁকার ন্যায় ছাঁকিয়াছিলেন। ইহাতে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে 'ভদ্রালক্ষ্মী আসিয়াছিল এবং সপ্তছন্দ তাহার চারদিকে নৃত্য করিয়াছিল। এ ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে নাই। পরে সেই ভাষাকে আহরণ করিয়া বিদ্বানগণ নানা বিদ্যা-মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন।' ভাষা সংস্কারের কথার উল্লেখ ঋগ্বেদের এই সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "এক সময় বেদ ভাষা-সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। পরে সেই ভাষার প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণ সংসাধিত হইল, তাহা 'ব্যাকৃতা' ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। এই মহৎ কার্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়াছেন। তদবধি 'ব্যাকৃত' বাক্য ঋষিদের মুখে অভ্যুদিত হইতেছে" ॥উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদ প্রবেশিকা, ১৭৮পৃ॥ তৈত্তিরীয় সংহিতায় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুতের কাহিনী বলা হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় কৃত্রিম ভাষা চালাইতে বিদ্বানগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও প্রবল রাজশক্তির আশ্রয়ও আবশ্যক হইয়াছিল অনুমান করা যায়। বৈবস্বত মনুকালে পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক বিষয়ে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। হয়ত সংস্কৃত ভাষা সেই সময়-কার সৃষ্টি। ঋগ্বেদে ঋষিরা অনেক সমসাময়িক ব্যক্তিদের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের অথবা সেই ঋষিগণের কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ সাহায্যে যথাযথ পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, ইহারা বৈবস্বত মনুর পরবর্তী। বৈবস্বত মনুকাল ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দ। ঋগ্বেদের কেবল এক স্থানে ॥১০ম।১৪৮॥ বেণপুত্র পৃথুর রচিত স্তবের উল্লেখ আছে। পৃথু বৈবস্বত মনুর পূর্ববর্তী। অনুমান হয়, পৃথুর স্তবের ভাষা পরিবর্তিত করিয়া কোন ঋষি তাহা ইন্দ্রস্তব রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। পৃথুর স্তবের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে 'বেণের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে'। ঋগ্বেদের একই স্তব যে বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কখন কখন তাঁহারা স্তোত্রগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতেন। ৮ম।৯।১০ শ্লোকে শশকর্ণ ঋষি বলিতেছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়, কক্ষিবান ঋষি যেরূপ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপ ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা, যেরূপ বেণের পুত্র পৃথু যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ সকল যজ্ঞে ঋষিরা নূতন স্তব তৈয়ারী করিতেন না। পুরাতন স্তোত্রই অনেক সময় গীত হইত। আবার একাধিক ঋষি একই সূক্ত হয়ত কখনও ব্যবহার করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১ম।১০০, ৮ম।১, ৮ম।১০২, ৯ম।১০৮, ১০ম।১৩৭ ইত্যাদি সূক্তগুলি দেখিলেই এই কথার পোষকতা পাওয়া যাইবে। বৈবস্বত মনুর বহু পূর্বকাল হইতেই যে যজ্ঞ প্রচলিত ছিল এবং ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নামে স্তব পাঠ হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এই সময়ের সূক্ত সকল বেদে আহরণ করা হয় নাই। হয়ত প্রাকৃত ভাষায় এই সব স্তব রচিত হইত। বেদের আহাব ও নিবিদ্ মন্ত্রগুলি অতি প্রাচীন; এগুলির ভাষা কোন পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না।

সভ্যতা সম্বন্ধীয় কতিপয় তথ্য। বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের কাল পর্যন্ত ভারতে যে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহার সমগ্র বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন পুরাণগুলি পাঠ করিলে এ তথ্য সহজেই পাওয়া যাইবে। এখানে মাত্র কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক কথা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীন কালে ভারতে কার্পাস, মসিনার ছাল, রেশম, পশম ইত্যাদি হইতে অনেকপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারী হইত। রঙ্কু মৃগের চামড়া হইতে এক প্রকার অতিশয় কোমল শয্যার আস্তরণ প্রস্তুত হইত। ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা বল্কল পরিধান করিতেন। তখন চক্রবর্তী সম্রাট্ খুব কমই ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজারা রাজত্ব করিতেন। রাজধর্ম আলোচনায় দেখা যায় যে, রাজারা প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের বনাম রাজা। এ গুণ না থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে। রাজপিতাও অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাঁহার শাস্তি হইত, এমন কি প্রাণদণ্ডও দেওয়া হইত। রাজপুত্রের বেলাও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। রাজা নিজেকে প্রজাদের বেতনভুক্ ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। কোন কোন রাজার আমলে শস্ত্র আইন

(arms act) প্রচলিত ছিল। চক্রবর্তী রাজা কার্তবীর্যার্জুন আদেশ প্রচার করেন, 'অদ্যাবধি আমি ভিন্ন যে অস্ত্র গ্রহণ করিবে সেই পরহিংসারত বা দস্যু বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে আমার বধ্য হইবে'। তিনিই একমাত্র গ্রামপালক, পশুপালক, ক্ষেত্রপালক, ব্রাহ্মণপালক, তপস্বীরক্ষক ও অর্থপালক হইলেন। তাঁহার সময়ে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি যাইত না। মনুসংহিতায় আছে, অপরের তৃণ, শাক, মৃত্তিকা, ফুল ও জল না বলিয়া লইলেও তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হইবে না। তখন বোধ হয় এই সব দ্রব্যের খুবই প্রাচুর্য ছিল। পরবর্তীকালে এই সকল দ্রব্য বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করা নরকপ্রদ দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

তখনকার দিনেও প্রজা এবং পশু গণনা হইত ও রাজা তাহার হিসাব রাখিতেন। সর্প, পশু ও পক্ষীকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাইবে না এইরূপ উপদেশ আছে। রোমে গ্লাডিয়েটারদের যুদ্ধ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে নিষেধ সত্ত্বেও মুরগী ও বুলবুলের লড়াই পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কৃষ্ণের সময় ক্রীড়াচ্ছলে যে মল্লযুদ্ধ হইত তাহাতেও অনেক সময় প্রাণহানি ঘটিত। মল, মূত্র, রক্ত, থুথু, বিষ ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্যযুক্ত বস্ত্র জলাশয়ে প্রক্ষালন করা নিষেধ ছিল। অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র, জুতা বা খড়ম পরা দূষণীয় গণ্য হইত। যে খাদ্যের উপর কেহ হাঁচিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিবার আদেশ আছে। গণান্ন অর্থাৎ বহু লোকের জন্য যে অন্ন পাক করা হয় তাহা গ্রহণীয় নহে। হোটেলের অন্ন গণান্ন। গৃহকর্তা নিজ ভৃত্যের সহিত একত্রে খাইবেন ইহাই গার্হস্থ্য ধর্মের উপদেশ। এখনও উত্তর-প্রদেশে কোন কোন পরিবারের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। রোগবহুল গ্রাম পরিত্যাগ করা বিহিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি কুটুম্ব পালন না করিয়া দান করে, তাহার দান অসিদ্ধ। পুরাণে আছে যে, স্ত্রীকে হাঁচিতে, হাই তুলিতে বা যদৃচ্ছা ভাবে বসিয়া থাকা অবস্থায় দেখিবে না।

খনিত্রের উপদেশ। প্রাচীন ভারতের সুমহান্ ঐতিহ্য আজও আমাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই ঐতিহ্য স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। অতি পুরাকালে খনিত্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কাল ৩৬৮৩ খ্রী-পূর্বাব্দ। তিনি এক ধর্মশাসন প্রবর্তন করেন। রাজা খনিত্রের ধর্মশাসন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি :

'সকল প্রাণী আনন্দ উপভোগ করুক। বিজন স্থানেও তাহারা স্নেহযুক্ত হউক, সর্বভূতের মঙ্গল হউক এবং সকলেই নিরাতঙ্কতা লাভ করুক। প্রাণিগণের ব্যাধি বিনষ্ট হউক। কাহারও যেন মনঃকষ্ট না হয় এবং সকল প্রাণী সকলের প্রতি মিত্রভাব প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল ও পরস্পরের প্রীতি, সকল বর্ণের সমৃদ্ধি এবং সর্বকর্মের সিদ্ধি হউক। হে জনগণ, তোমাদের সর্বভূতে সর্বদা মঙ্গল বুদ্ধি হউক, তোমরা যেরূপ নিজের ও পুত্রগণের হিতকামনা করিয়া থাক, সেইরূপ সর্বভূতের হিতকারী হও। ইহাতেই তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। কে কাহার নিকট অপরাধী হয়? কোন মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কাহারও অহিত করিলে তাহার নিজেরই অহিত হইয়া থাকে, কারণ কর্মফল কর্তারই উপভোগ্য। হে মনুষ্যগণ, তোমরা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও। হে বুধগণ, তোমরা লৌকিক পাপে প্রবৃত্ত হইও না। এইরূপ করিলে তোমরা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। যে আমাকে আজ স্নেহ করিতেছে, পৃথিবীতে সর্বদা তাহার মঙ্গল হউক, যে আমাকে দ্বেষ করিতেছে সেও সর্বদা মঙ্গল উপভোগ করুক।'

নববসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত আসিল আজি আমের মুকুলে।
সাজিয়াছে বনভূমি পুষ্পিত শিমুলে।
সজিনার শুভ্র হাতে প্রণয় মধুপা ;
দিক হতে দিগন্তরে সঙ্গীতের সুধা
আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে ছড়ায় কোকিল।
নিখিলের অবরুদ্ধ হৃদয়ের খিল
নিমেষে খুলিল আজি কোন্ যাদুকর।
মর্মরধ্বনিতে সারা অরণ্য মুখর।

তোমরা আসিবে যারা শতবর্ষ পরে—
এমনি বসন্ত-দিনে বনের মর্মরে
পুলকে চঞ্চল হবে তোমাদেরও প্রাণ।
সেদিনও আমের বনে কোকিলের গান
এমনি উঠিবে বাজি। মানুষের হিয়া
যুগে যুগে একই সুরে উঠিছে কাঁপিয়া।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(কাজী সাহেবের আদালত। পুঁথিপত্র সহ কাজী সাহেব উচ্চ মঞ্চে আসীন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে মামলৎদার, পেশকার, সেরেস্তাদার, নাজির ইত্যাদি ঘিরিয়া বসিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই চাপরাশী দণ্ডায়মান)।

এক জন চাপরাশী। (বাহিরে গিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক) হুজুর বীরবল মন্ত্রীজী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কাজী। তাঁকে সম্মানপূর্ব্বক ভিতরে নিয়ে এস আর তোমরা সকলে বাইরে অপেক্ষা করো—দেখ যেন কেউ এখন এখানে না আসে।

(বীরবলের প্রবেশ ও কর্ম্মচারিগণের প্রস্থান)।

কাজী। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক, মন্ত্রীজী। আজ আমার কি সুপ্রভাত! (নিজপার্শ্বে বীরবলকে বসাইলেন।)

বীরবল। সু কি কু, সে আপনার মর্জ্জির উপর নির্ভর। আমি ত আপনাকে সৎপরামর্শ দিতেই এসেছি; তবে নেওয়া-না-নেওয়া সে আপনার হাত।

কাজী। আমরা রাজভৃত্য, রাজমন্ত্রীর পরামর্শ রাজারই আদেশ বলে গণ্য এবং মান্য করি। ধর্ম্মের অবিরোধী যা বলবেন তাই করতে প্রস্তুত আছি।

বীরবল। দেখুন কাজী সাহেব, আদালত ও মস্‌জিদ ঠিক এক স্থান নয়। মন্দির মস্‌জিদে লোকে যায় পরমার্থ-সিদ্ধির জন্য; কিন্তু আদালতে আসে স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

কাজী। তা ত বটেই, তবে সে স্বার্থ যাতে ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ হয়, তাই দেখবার জন্যই ত আমাদের এ জায়গায় বসানো হয়েছে মন্ত্রীজী?

বীরবল। শাস্ত্রীয় অর্থে ধর্ম্ম মানে আইন। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, সকলে একই আইনের একই অর্থ করে? বা একই পাপে একই দণ্ড হয়?

কাজী। তা কেমন করে বলব হুজুর? নিজ নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা ন্যায়সঙ্গত ও আইনসম্মত বলে বোধ করি, সেইরূপ রায় দেবার চেষ্টা করি, এই মাত্র বলতে পারি। কিন্তু আইন সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে বোধ হয়, হুজুরের কোন উদ্দেশ্য আছে।

বীরবল। তা নইলে কি ভিজে খস্‌খসের চিক-ঢাকা ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের অত্যন্ত দিবানিদ্রার সুখশয্যা ছেড়ে, এই গ্রীষ্মকালের দিনদুপুরের রোদ ও ধুলা উপভোগ করবার জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি! আপনি বিষয়ী লোক, এক আঁচড়েই সব বুঝতে পারেন। তাই আর বৃথা আপনার অমূল্য সময় নষ্ট না করে, আসল প্রস্তাবে আসা যাক্। আজ খোদ্ রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বিশেষ মামলা রুজু করা হয়েছে, তা আপনি অবগত আছেন নিশ্চয়?

কাজী। হাঁ, আপনি যখন এলেন, আমি তারই কাগজ-পত্র উল্টে পাল্টে দেখছিলুম।

বীরবল। তার থেকে কি সার সংগ্রহ করলেন জানতে পারি কি?

কাজী। আনারকলি নামে একটি আফগান মেয়ে কাবুলের রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে মাসাবধি বেগমসাহিবাদের আশ্রয়ে থাকে। মেয়েটি বড় আনন্দময়ী ও অনিন্দ্যসুন্দরী; মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর কাছে বেড়াতে আসত। তার মোহিনী রূপ দেখে—

বীরবল। কাজীসাহেব, রূপে মোহিত হবার দিন আপনারও নেই, আমারও নেই। কাজের কথা আর কিছু থাকে ত শীঘ্র বলে ফেলুন। কবিদের পক্ষে কাল নিরবধি হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সময় সীমাবদ্ধ।

কাজী। বাচালতা মাপ করবেন হুজুর; তাকে দেখলে আমার একটি মৃতা কন্যার কথা মনে পড়ে। আরজিতে লেখা রয়েছে যে মেয়েটি নীচবংশের হয়েও শাহাজাদার প্রতি চোখ তুলতে সাহস করেছে, এবং সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার অন্তঃপুর-উদ্যানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এমন কি, সে এতই দুর্ব্বিনীতা যে, গত উৎসব রজনীতে শাহেন-শা'র চোখের সামনে শাহাজাদার সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টিবিনিময় করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অসমাপ্ত উৎসব বন্ধ করেন, এবং এই গুরুতর অপরাধের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ রাখতে আদেশ করেন।

বীরবল। আমি এই শোচনীয় দুর্ঘটনার এক জন প্রত্যক্ষদর্শী। সবই যথাযথ লেখা হয়েছে। এখন আপনি এই গর্হিত আচরণের কি দণ্ড আইনসঙ্গত মনে করেন?

কাজী। অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতাপ্রসূত দুষ্কর্ম্মকে আইন সর্ব্বদাই ক্ষমার চক্ষে দেখতে প্রস্তুত। এস্থলে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের প্রয়োজন হবে না।

বীরবল। একে আপনি বলতে চান লঘু পাপ? যে শাহাজাদা দু'দিন পরে দিল্লীর তক্তে বসবেন, তাঁকে কুহক-জালে জড়িত করে তাঁর মহৎ বংশে কলঙ্ক লেপন করবার দুরভিসন্ধি ত আমার মতে সামান্য বালিকার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, এবং কঠিনতম দণ্ডের যোগ্য।

কাজী। হুজুর, আইন রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ মানে না। এই সরলা বালিকা শাহাজাদাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় ছিল, কিংবা তার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তিনিই নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার চেষ্টায় ছিলেন, তার প্রমাণ কি আছে? অনুমান ত প্রমাণ নয়।

বীরবল। আচ্ছা বেশ, আপনি আপনার পুঁথিনথি সাক্ষীসাবুদ নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হোন, আমিও উপস্থিত থাকি। কিন্তু নিজের স্ত্রীপুত্রের প্রতি মায়া বেশী, না এই অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি দরদ বেশী, তাও এই সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে, সেকথা মনে রাখবেন।

কাজী। তথাস্তু। চাপরাশী!

চাপরাশী। জী হুজুর!

কাজী। আসামী আনারকলিকে হাজির করে—আদালতের কর্ম্মচারীদেরও ডাকো।

(অল্পক্ষণ পরে চাপরাশী কর্ত্তৃক আনীতা, মলিনবস্ত্র পরিহিতা, ম্লানমুখী আনারকলির প্রবেশ, পশ্চাতে রোশেনারা ও ইলাহীবক্স। আনারকলি কাজীসাহেব ও বীরবলকে অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে দাঁড়াইল, অন্যেরা চাপরাশীর ইঙ্গিতে বসিল। কর্ম্মচারিগণ একে একে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল)। (কাজী আনারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন) সত্য কথা যদি বল ত কোন ভয় নেই। তোমার নাম কি?

আনার। আয়েষা খাতুন।

কাজী। তবে তোমাকে আনারকলি বলে ডাকে কেন?

আনার। এখানে এসে আমার ঐ নতুন নামকরণ হয়েছিল।

কাজী। এ নাম দিলে কে?

আনার। রাজসভার একজন, তিনি কে, আমি ঠিক জানি নে।

বীরবল। (জনান্তিকে) কিন্তু আমি জানি। তিনি হচ্ছেন রাজকবি ফৈজী। (হাসিয়া) ছেলেবুড়ো সেদিন সকলেই অল্পবিস্তর ঘায়েল হয়ে পড়েছিল; আমি বলি নি যে, আপনি মেয়েটিকে যত অবলা সরলা ঠাওরেছেন, সে ঠিক তা নয়?

কাজী। তোমার বাপের নাম কি, দেশ কোথায়, বয়স কত?

আনার। আমি কাবুলের মুন্সী মহিউদ্দিনের মেয়ে, আমার বয়স ষোল।

কাজী। তোমার সঙ্গে কে কে এসেছেন?

আনার। এই ইনি, আমাদের শহর-কোতোয়াল ইলাহীবক্স সাহেব; আর ইনি, আমাদের কাজীসাহেবের মেয়ে রোশেনারা।

কাজী। রোশেনারা, তুমি বলতে পার তোমার সখীর উপযুক্ত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এতদিন বিবাহ হয় নি কেন?

রোশেনারা। হুজুর, মা-বাবা বিয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, আয়েষাই কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় নি।

কাজী। কেন? কোন গোপন কারণ ছিল কি? সব কথা খুলে না বললে সুবিচার হওয়া শক্ত মনে রেখো।

বীরবল। যে রকম দেখছি, একটি নয়, খুব সম্ভব অনেকগুলি গোপন কারণ ছিল। স্বাধীন জেনানা হতে পেলে অন্তঃপুরের গারদে কে বন্ধ থাকতে চায় বল?

ইলাহী। (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া) আয়েষা খাতুনের নামে কাবুলে কোন দিন কোন কলঙ্কের লেশমাত্র স্পর্শ করে নি। এখানে যে নরাধম তাঁর পবিত্র নামে আভাসে-ইঙ্গিতে অপযশ আরোপ করতে সাহস করবে, তার জন্য এই তরবারি মুক্ত রয়েছে, সাবধান!

বীরবল। (হাসিয়া) ভেবেছিলাম কাবুল জঙ্গলী অসভ্য দেশ, কিন্তু সেখানেও দেখছি নাটুকে ভাবভঙ্গী বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। গোপন কারণগুলির মধ্যে একটি যে সশরীরে এখানে উপস্থিত আছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকেও সাবধান করে দিচ্ছি যে, একাধিক বার এ রকম অনাহূত সাক্ষ্য দিলে তাঁকে কারাগারের ভিতরে একেবারে গোপন থাকতে হবে; তখন সাক্ষ্য ও সাক্ষাৎ দু-ই বন্ধ হবে।...কাজীসাহেব, এরকম আর কত প্রমাণ পেলে তবে আপনার বিশ্বাস হবে যে, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই?

কাজী। শাস্ত্রবচন মানতে হলে ত রাজপুরুষকেও বিশ্বাস করা চলে না, হুজুর। আচ্ছা রোশেনারা, তোমার বন্ধুর এই বয়সে এমন অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পার কি?

রোশেনারা। বাড়ীতে তার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কখনো আলোচনা হয় নি হুজুর, কি করে বলব?

কাজী। শুধু মুখের আলোচনায় মনোভাব প্রকাশ হয় না, ভাবে হয়, কাজে হয়। এখানে এসে অবধি তোমার সখীর ভাবে কোন বৈলক্ষণ্য, কাজে কোন অমনোযোগ প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমরা ত সারাদিন এক সঙ্গেই থাকতে?

রোশেনারা। হাঁ হুজুর, কেবল সন্ধ্যাবেলা বেগমসাহিবা আমাকে মাঝে মাঝে শহর দেখতে পাঠাতেন, তখন ও একলাই তাঁর কাছে থাকত।

কাজী। তোমরা ত দু'জনেই দিল্লী দেখতে এসেছ শুনতে পাই; তবে আয়েষা বিবি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন না কেন?

রোশেনারা। সে সময়টা ওর প্রায়ই মাথা ধরত, তাই যেতে চাইত না; বাপের বড় আদুরে মেয়ে বলে কেউ ওকে জোর করে কিছু বলে না।

বীরবল। (জনান্তিকে) আদর দিয়ে দিয়ে যে মেয়ের মাথাটি খাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাজী। আয়েষা, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি কি সারা সন্ধ্যা বেগম-সাহিবার কাছে বসে থাকতে?

আনার। না হুজুর। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে অন্দরের বাগানে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিতেন।

কাজী। কার সঙ্গে পাঠাতেন?

আনার। সর্দারনী মেহের-উন্নিসার সঙ্গে।

কাজী। তিনি কি বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন?

আনার। না, কখন কখনও গৃহকাজে অন্দরে চলে যেতেন।

কাজী। তখন কি তুমি একলাই বাগানে বসে থাকতে?

আনার। (ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ, বসে থাকতাম, কিংবা বেড়াতাম, কিংবা গান করতাম।

কাজী। তোমার বাবা তোমাকে গানবাজনা লেখা-পড়া শিখিয়েছেন শুনেছি। ভাল নাচতে পার, সেকথাও কানে এসেছে—যদিও চোখে দেখবার সৌভাগ্য বোধ করি, কখনও হবে না।

বীরবল। কাজীসাহেব, বাজে কথায় আসল কাজ চাপা দেবেন না। নিজের ও পরের সর্বনাশ করবার জন্য যে কয়টি বিদ্যা জানা আবশ্যক, তার কোনটিই মুন্সীসাহেব আদরের মেয়েকে শেখাতে বাকি রাখেন নি, সে বিষয় আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি।

কাজী। যখন বাগানে বসে থাকতে, সেখানে আর কেউ আসতেন কি? সত্য বল।

আনার। (নত শিরে অস্ফুট স্বরে) হাঁ, কখনও কখনও আর একজন বেড়াতে আসতেন।

বীরবল। (হাসিয়া) সান্ধ্য বায়ুসেবনটা দেখছি সংক্রামক, তবে সকলের পক্ষে সমান স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে।

কাজী। আয়েষা, লজ্জা করো না, ভয় পেয়ো না, মিথ্যা বলো না। তোমার সাক্ষ্যের উপর রাজবংশের মান ও তোমার জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করছে মনে রেখো। এ গুপ্তপ্রেমে কেউ লইয়েছিল, না তুমি কি আপনি উপযাচিকা হয়েছিলে?

আনার। আমার মনই আমাকে এ কাজে লইয়েছে, আর কেউ নয়।

বীরবল। যা হোক, মেয়েটা যেমনই হোক, সত্য কথা বলে দেখে সন্তুষ্ট হলাম। মিথ্যা ত স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ বা রক্ষাকবচ, যাই বল। কিন্তু ওর আর একটি অঙ্গের ভূষণ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। (জনান্তিকে কাজীসাহেবের সহিত কথা।)

কাজী। আয়েষা খাতুন, তোমার হাতের ঐ আংটিটি একবার দেখতে পারি কি? (আনার আংটি খুলিয়া দিল, তাহা দেখিয়া ও বীরবলকে দেখাইয়া) যিনি আসতেন, তিনিই কি এই আংটি তোমাকে দিয়েছেন? (আংটি ফেরত দিলেন।)

আনার। (নিরুত্তর)

বীরবল। মৌনই সম্মতির লক্ষণ। (হাসিয়া) একেই বলে হাতে হাতে প্রমাণ, বা বমাল গ্রেপ্তার! এর পরেও যদি আমাদের কথায় আপনি অবিশ্বাস করেন কাজীসাহেব, তা হলে কিন্তু আমি নাচার। বিশ্বাস না করবারও একটা সীমা আছে।

কাজী। (আসামীদের প্রতি) আচ্ছা, এখন তোমরা যেতে পার। চাপরাশী, আসামীর সাজা হওয়া পর্য্যন্ত ফের কয়েদ করে রাখ।

চাপরাশী। যো হুকুম হুজুর। (আসামীদের লইয়া প্রস্থান।)

বীরবল। এখন কি রায় দিতে আজ্ঞা হয়, কাজী-সাহেব? মনের মত প্রমাণ পেলেন ত, না আরও কিছু চাই?

কাজী। প্রমাণে যা বলে, মন যে তাতে সায় দিতে চায় না।

বীরবল। বিচারকের নিজের মন বলে কিছু নেই, সে আইনের মুখপাত্র মাত্র। এ স্থলে আইন-ই-আকবরীতে কি দণ্ডের বিধি আছে, সেই হচ্ছে কথা। আসামী নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই?

কাজী। (উত্তেজিত ভাবে) ধিক্ এই আইন, ধিক্ এই ঘৃণ্য ব্যবসা, ধিক্ এই পুণ্যের মুখোস পরে পরের দোষ বিচার করতে বসবার অভিনয়। আজ যদি ঈশ্বর স্বয়ং সত্যই

এই ধর্ম্মাধিকরণে বসতেন, তা হলে আপনি আমি এই বিচারাসনে না বসে ঐ কাঠগড়ায় দাঁড়াতাম তা আপনি বেশ জানেন। এটাও আপনি বেশ জানেন যে, আজ ঐ নিরপরাধ, অসহায়া বালিকাকে আমরা দুই বুড়ো মিলে মিথ্যা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করেছি,—তার যা শাস্তি হবার তা আগামই দিয়ে দিয়েছি। তবু তাকে আরও শাস্তি দিতে হবে?—তা দেব, ভাল করেই দেব। তাকে জীয়ন্তে গোর দেবার বিধান দেব—হা হা!—যার চেয়ে কঠিন দণ্ড আমাদের আইনে নেই। কিন্তু আমাকে আজ থেকে অবসর দিতে আজ্ঞা হোক হুজুর। আর যে ক'দিন বাঁচি, দেখি যদি গরীবের সঙ্গে গরীব হয়ে থেকে এ নৃশংস পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। (তাড়াতাড়ি একটা কাগজে কি লিখিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন।)

২য় দৃশ্য

(প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রোশেনারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে এবং আনারকলি পায়চারি করিতে করিতে মাঝে মাঝে জানালায় মুখ বাড়াইয়া কি দেখিতেছে।)

আনার। ইলাহীবক্স ত এখনও এল না রোশেনারা? তাকে কখন পাঠিয়েছ?

রোশেনারা। অনেকক্ষণ, প্রায় দু' ঘণ্টা হবে। এই এল বলে। একটু স্থির হয়ে বস।

আনার। স্থির? আমি ত স্থির হয়েই আছি, তোমরাই অস্থির হচ্ছ। আমার মনও স্থির, শরীরও স্থির হয়ে আসছে, সময়ও চলছে না; ঘড়ির দম ফুরিয়ে এসেছে। কেবল একটিমাত্র আশা ধরে এখনও বেঁচে রয়েছি।

রোশেনারা। আয়েষা, বোন্ আমার, অমন বুড়ো মানুষের মত কথা তোমার মুখে যে শুনতে পারি নে—চুপ কর দোহাই তোমার! এই কি আমাদের সেই ছটফটে মেয়ে, যার হাসি কথা সর্ব্বদা ফোয়ারার মত ঠিকরে পড়ত? সে আয়েষা কোথায় গেল? আমি তার বাপমায়ের কাছে গিয়ে কি জবাবদিহি করব? তাঁরা যে তাকে আমার জিম্মায় এই বিদেশে পাঠিয়েছিলেন—এই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় বিদেশে! কেন মরতে এই নরকে এসেছিলে আয়েষা?

আনার। যে জন্যে এসেছিলাম, আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে রোশেনারা; পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু মেটে নি—বোধ হয় এ পৃথিবীতে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মেটে না বলে। কিন্তু যেটুকু পেয়েছি, তাই নিয়েই হাসিমুখে পরপারে যেতে পারব।

রোশেনারা। কি পেয়েছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমাদের যা দিয়ে গেলে, সে যে বড় ভয়ানক জিনিস। এ আফশোষ, এ অপমান, এ লজ্জা, দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? কেবলই মনে হচ্ছে কোন্ মুখে দেশে ফিরে যাব? গিয়ে তাঁদের কি বলব?

আনার। মাকে বলো তাঁর দুষ্টু মেয়েটি শেষ পর্য্যন্ত তেমনি অবাধ্যই রইল, কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল না। আর বাবাকে (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া··· পরে মুখ তুলিয়া), বাবাকে বলো তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, নিজেকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে যেন আমাকে ক্ষমা করেন। বলো আমি কাবুলের মান রেখেছি, মরতে ভয় পাই নি। আর—(আবার জানালায় মুখ বাড়াইয়া) ঐ যে ইলাহীবক্স আসছে।

(ম্লান মুখে ইলাহী প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইলেন)

আনার। (উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে) তবে তোমার যাওয়া বৃথা হয়েছে?

ইলাহী। (নত মুখে) হাঁ। শাহাজাদার সঙ্গে তোমার একটি বার শেষ দেখা করবার প্রার্থনা বাদশাহ কিছুতেই মঞ্জুর করলেন না।

(আনার হতাশভাবে বসিয়া পড়িল)

আমি বাদশাহের যত খয়ের-খাঁর নাম শুনেছি, একে একে সকলের কাছেই গিয়ে করজোড়ে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছি, তাই এত দেরি হ'ল। শুনলাম যে শাহাজাদাও পাগলের মত দিবারাত্র ছুটাছুটি করে এই নৃশংস দণ্ড রহিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না। এমন কি, তিনি নিজেই নজরবন্দী হয়ে রয়েছেন। তাঁর স্নেহময় পিতা এ বিষয়ে একেবারে বজ্রের মত কঠিন ও ভীষণ, কারও সাধ্য নেই তাঁর কাছে এগোয়। (সকলে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে কাতর উচ্ছ্বাসে) আয়েষা, আয়েষা! তুমি কখনও আমার কোন কথা রাখ নি। আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে এই শেষ অনুরোধ করছি, শুনবে না কি? চল, এই রাক্ষসপুরী থেকে আজ রাত্রেই আমরা তিন জনে পালিয়ে যাই। এখানকার সকলেই প্রলোভনের বশ, তা আমি এই অল্প দিনে বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে এই তলোয়ার ছাড়া আর কোন মূল্যবান জিনিষ নেই। কিন্তু তোমার ঐ মহামূল্য আংটিটী দিলে নিশ্চয় রাত্রের প্রহরীরা দ্বার খুলে দেবে, আর ছদ্মবেশে একবার শহরের সিংহদরওয়াজা পার হতে পারলে তার পরে আমার ঘোড়া

ছুটিয়ে আমি শীঘ্রই তোমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পারব।

(করযোড়ে) আয়েষা, এই বয়সে কি তোমার নিজের প্রাণের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই ? তোমার বাপ-মা, তোমার শৈশবসঙ্গীদের প্রতি একটুও দয়া নেই।

আনার। ইলাহী, অনেক কষ্টে মন বেঁধেছি, আবার আমাকে অস্থির করে তুলো না। যার জন্য এ জীবন, তাঁকেই যখন পাব না, তখন সে জীবনের উপর আমার আর তিলমাত্র মায়া নেই। সব মায়াই ত্যাগ করেছি, কেবল এই দুটি জিনিসের (হাতের আংটি ও বুকে-ঝোলানো ছবি দেখাইয়া) মায়া এখনও ছাড়তে পারি নি। এ দুটি আমার নশ্বর দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ হবে, পরলোকে আমার অবিনশ্বর প্রেমের সাক্ষ্য দেবে।

ইলাহী। আয়েষা, পুরুষমানুষ হয়ে আমি ভেঙে পড়ছি, আর তুমি এই সেদিনকার কচি মেয়ে, কোথা থেকে মনে এমন অমানুষিক বল পেলে, তাই ভাবছি। আগে তোমাকে মানবী ভেবে আপন করতে চেয়েছি, কিন্তু আজ তোমাকে দেবী বলে পুজো করতে ইচ্ছে করছে।

আনার। ইলাহী, আমি সামান্য মানবী মাত্র, কেবল প্রেমের বলে মনে এমন অসামান্য বল পেয়েছি। (কিয়ৎ-ক্ষণ থামিয়া) ইলাহী, মৃত্যুর মুখে সামাজিক লজ্জাসরম. সঙ্কোচ-দ্বিধা জীর্ণ বস্ত্রের মত আপনিই খসে পড়ে যায়। আমি জানি তুমি বহুকাল থেকে আমার অনুরক্ত ভক্ত, যদিও মুখ ফুটে কখনও সেকথা আমাকে বল নি। আমি তোমার নিষ্ঠার উপযুক্ত প্রতিদান কোন দিন দিতে পারি নি, পারবও না। কিন্তু এত দিনে তার মর্যাদা বুঝতে পেরেছি। তোমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব না ইলাহী, ক্ষমা কর ;—আমি ভীরুর মত রাতারাতি এখান থেকে পালাতেও পারব না, আর প্রাণ থাকতে এ আংটিও (ঠোঁটে ঠেকাইল) আর কারও হাতে দিতে পারব না। কিন্তু ছোট বোনের প্রথম ও শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে ভাই, রোশেনারা, এদিকে এস ত ভাই ! (তথাকরণ) আমি জানি তোমার মন ইলাহীর প্রতি অনুকূল। যথার্থ বীরপুরুষের হাতে আত্ম-সমর্পণ করাতেই নারীজীবনের সার্থকতা। ইলাহী, যা পাও নি তার জন্য জীবনকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে, যে প্রেম ও সেবা তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাকে নম্র চিত্তে গ্রহণ কর ভাই, তোমাদের দু'জনেরই জন্ম সার্থক হোক। পরস্পরের হাতে হাত মিলাইয়া)

আজ আমি ধর্ম্মসাক্ষী করে তোমাদের যে পবিত্র বন্ধনে বাঁধলাম, দেশে গিয়ে তাকে সমাজের সাক্ষাতে পূর্ণ করো, তা হলেই আমার আত্মা শান্তি পাবে জেনো।

(হাত ছাড়িয়া ও ছাড়াইয়া)

আজ বড় বেশী বকছি—চিরকালই বেশী বকতাম। আজ চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ হবার আগে (হাসিয়া) বোধ হয় সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিচ্ছি।

(পূর্ব্ববৎ হাল্‌কা ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া)

ইলাহী, রোশেনারা, আজ আমাদের শেষ দেখা। শুনছি এরা কাল আমাকে লাহোরে পাঠিয়ে দেবে। (একটু থামিয়া) মোতিদিদিকে বল তার কথাই ফলেছে, পতঙ্গ আলোর বেশী কাছে উড়তে গিয়ে পুড়ে মরেছে। কিন্তু সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। যখন আর তা পাবার আশা নেই, তখন মরণই তার পরম বন্ধু।

(রঙ্গমঞ্চের আলো ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে হইতে শেষে একেবারে নিবিয়া গেল।)

৩য় দৃশ্য

(লাহোর শহরের উপান্তে আনারকলির সুন্দর কবর সামনে ভূলুণ্ঠিত সেলিম। প্রদীপ হস্তে সখীগণ ধীরে ধীরে কবর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গাহিতেছে :)

গজল

ক্যা ক্যা পরী জমান থে, আয়ে চলে গয়ে।
তার উস্‌কো দেখনে কি ন লায়ে, চলে গয়ে ।।ধ্রু।
আদম রহা ন কোই, ন পয়ঘর রহা ইহাঁ।
আয়ে জমীপে ওয়েতি সমায়ে, চলে গয়ে ।।ধ্রু।
দারা রহা, ন জম, ন সেকন্দর শা বাদশা।
তক্তে জমীপে শয়কড়ো আয়ে, চলে গয়ে ।।ধ্রু।

সমাপ্ত

আমার দেশ

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

নব্য বাংলা যে নৈয়ায়িকের দেশ এটা সর্ব্ববাদিসম্মত। এ-দেশে নানা বিষয়ে নানান্ মত আজ নূতন নয়। মতামতের ভাঙা-গড়ার জন্যে, বিশেষ করে এই দেশটাকেই ভারতের ভাগ্যবিধাতা, সুদূর অতীত যুগ থেকে, সুনির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন। একে একে আর্য্য ও অনার্য্যের, জৈন-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যের, মোগল ও পাঠানের, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষ এবং সমন্বয় চূড়ান্তভাবে এই দেশের মাটিতেই হয়ে গিয়েছে। নবাবী অরাজকতায় অসহিষ্ণু হয়ে এই দেশেরই কতিপয় ধুরন্ধর বিদেশী বণিকের হাতে এদেশের শাসনদণ্ড তুলে দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আবার বৈদেশিক শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ ভারতের ঐকান্তিক বিদ্রোহের বীজও যে এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম উপ্ত এবং অঙ্কুরিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোন তর্কের অবকাশ নাই।

এদেশে ভাঙা-গড়ার এই যে প্রবণতা, স্থিতি এবং প্রগতির এই যে দ্বন্দ্ব, এটা মোটেই আকস্মিক নয়। বাংলার মাটি, বাংলার বায়ুতেই এ প্রাণ পেয়েছে, আর বাংলার জল, বাংলার ফল থেকেই যুগে যুগে এ রস আহরণ করেছে। বাংলার কবি তাই নিঃসঙ্কোচে, বোধ হয় গোপন পুলকের সঙ্গেই, বলতে পেরেছিলেন: "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাই জগৎকে শিখিয়ে গেছেন, "যত মত তত পথ।" বহু মত আর বহু পথ বাংলার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম যে এদেশে একান্তই অভাবনীয় তা তো "পলাশীর যুদ্ধে"র কবি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বহু পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন। তাঁর উক্তি "স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়, তথাপি বাঙালী নাহি হবে একমত।"

যদিও বাংলার মাটিতে, পূর্ব্বে কিংবা পশ্চিমে, কোথাও স্বর্গ নেমে আসবার আশু সম্ভাবনা আদৌ দেখা যাচ্ছে না; আর মর্ত্ত্যলোক হতেও স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করবার কোনো জরুরি ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা, ঢাকা কিংবা কলিকাতা, কোথাও গৃহীত হয়েছে বলে আজও জানা যায় নাই, তবুও কিন্তু সর্ব্বত্র একটা বিষয়ে সমস্ত বাঙালী একমত হতে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। বিষয়টা হচ্ছে বাংলার অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতা—এর বিভিন্ন অংশের অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য অঙ্গাঙ্গি ঘনিষ্ঠতা। অনায়াসলব্ধ এবং আজন্মসেবিত আকাশ-বাতাসের মত যে দেশাত্মবোধ ছিল আমাদের অবচেতন মনে বিলীন, দেশের অতি অল্পসংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতের মনের যা ছিল বিলাস মাত্র, দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গে তা আজ অবস্থার চাপে ক্রমশঃ গভীর দাগ কেটে উৎকীর্ণ হচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই মনে। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা আর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রকৃতির সেই অমোঘ কার্য্যক্রমকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ব্যাহত করতে বা স্থগিত রাখতে পারবে এমনটি মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণই নাই। অবস্থার বিপাকে স্রোতের জলে বহু আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাতে করে তার সমুদ্রাভিমুখী গতি কখনও চিরতরে অবরুদ্ধ হয় না।

বাংলার দুর্দ্দশা আজ চরমে উঠেছে। যে বাংলা ধন-ধান্যে শুধু স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠিতই ছিল না, উপরন্তু বিপুল শিল্পসম্ভারের বহির্ব্বাণিজ্যে সমস্ত ভারতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এক দিন, আজ তার গৃহে গৃহে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব নিত্যব্যবহার্য্য তেল-নুন-লকড়িরও একান্ত অভাব। আমাদের এ দৈন্য মোটেই সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। এর উৎসের অনুসন্ধান করতে হলে বাংলার ইতিহাসের ধারায় উজান বয়ে অনেকটা দূরে যেতে হবে।

দেশজোড়া এই দৈন্য যে আমাদের কত গভীর—এর নগ্ন প্রকাশ যে কত লজ্জাকর, কত নির্ম্মম, কত আত্মঘাতী তার পরিচয় আমরা ক্রমাগত পেয়ে আসছি আমাদের স্বরাজের সম্ভাবনা এবং তার প্রতিষ্ঠার পরে থেকেই। পরাধীনতার নাগপাশে আড়ষ্ট এবং আবিষ্ট অবস্থায় দৈন্যের বেদনা আমাদের যতটা ছিল আক্ষেপ ততটা ছিল না। পাশমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে—শতশোহথ সহস্রশঃ—বহুভাবে, বহুরূপে।

আমাদের ধর্ম্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতার উগ্র তাণ্ডব, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে পরপীড়নের প্রয়াস, এমনি-ধারা আরও অনেক পাপ সেই দৈন্যেরই বিকার। এদের উৎপত্তি এবং প্রসার যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ঐ ব্যাপক এবং উৎকট দৈন্য থেকেই প্রধানতঃ সম্ভব হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রায় দুই শতাব্দীর একটানা শোষণের ফলে এই একান্ত লক্ষ্মীহীন দেশে কলিরাজ ধীরে ধীরে তাঁর সিংহাসনখানি কায়েম করে নিয়েছেন। দেশব্যাপী দৈন্যের সঙ্গে বিদেশী-শাসকের ভেদনীতি আর আমাদের অজ্ঞতা সম্মিলিত হয়ে দেশে যে ব্রাহ্মস্পর্শের সৃষ্টি করেছিল তাতে করে এ অকল্যাণ অনিবার্য্য হয়েই পড়েছিল। যত দিন রাজতক্তে ইংরেজ

সমাসীন ছিল তত দিন ভদ্রতার খাতিরেই হোক অথবা তাদের ১২৪ ধারার ভয়েই হোক কলিরাজ ছিলেন প্রচ্ছন্ন। আজ তাঁর সার্ব্বভৌম আধিপত্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট—বাংলার সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বাঙালীর ঘর ভেঙেছে, ভাইবোনেরা পৃথক হয়েছে; বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর মনের মত ভালবাসা সবই আজ বিপন্ন এবং বিকৃত হতে চলেছে।

বাংলার স্বভাবধর্ম্মের একান্ত বিরোধী এই সব পরিণতি এবং সম্ভাবনা। এ দেশের অভিব্যক্তির ধারায় এদের বিশেষ কোন স্থান নাই। ভাগীরথীর প্রবাহকে ঐরাবত পথভ্রষ্ট করতে পারে নি; জহ্নুমুনিও তাকে গ্রাস করতে পারেন নি। ক্রমোন্নতির পথে আজ হোক, কাল হোক বাংলাও ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে এ সব পাপ এবং লজ্জা। ভাবী ইতিহাসে এদের কথাও বর্গীর হাঙ্গামা বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতই বাংলার অন্যতম দুঃস্বপ্নের পর্য্যায়ে পড়বে। বর্ত্তমানের দুর্ভোগ আমাদের যতই হোক না, একথা জানা দরকার যে, এ পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কাজেই অ-চিরস্থায়ী। কলিরাজের প্রতাপ যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, বাংলার ভাগ্যবিধাতা বলে তাকে মনে করাটা চড়নদারকে ঘোড়ার মালিক বলে মনে করার মতই ভ্রমাত্মক হবে।

২

বাংলার মাটি আর বাংলার মনের পরিণতির একটা বিশেষ ধারা আছে। বাংলার কবি বলেছেন, সদ্যস্নাতা, সিক্তবসনা জননী ভারতবর্ষ সুনীল জলধি হতে বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে অভ্যুত্থিতা হয়েছেন। কাব্য হিসাবে তাঁর বর্ণনা অনবদ্য, তাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ও রকম হয় নি মোটেই। ভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্ট হয়েছে।

যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমি আদৌ সিন্ধু-শীকরসিক্ত হয় নি। উত্তরে ছিল তার সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মেখলা। ভারতের সেই আদিম বাস্তভিটা—দাক্ষিণাত্যের ত্রিভুজাকৃতি মালভূমি—ভূ-সৃষ্টির আদি থেকে নিথর নিষ্কম্প ভাবে অপেক্ষা করছিল সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ভারতের উত্তরার্দ্ধের অভ্যুদয়ের আশায়। কোটি কোটি বর্ষের প্রতীক্ষায় তার তৃষিত তাপিত বক্ষ ভেদ করে উঠেছিল নিদারুণ আগ্নেয়োদ্গার। জমাটবাঁধা তার 'লাভা'র পুরু আস্তরণ প্রসারিত রয়েছে সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী ভূখণ্ডে—আধুনিক মধ্যভারত থেকে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত।

তার পরে বিপুল আলোড়নে প্রলয়পয়োধি মথিত করে অভ্যুত্থিত হল হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ প্রাকার। এর দুই প্রান্তে ভারতের দুই সীমান্ত প্রদেশ। হিমালয় দিলে ভারতভূমির উত্তরের সীমারেখা টেনে। সেই থেকে উত্তর-এশিয়ার শুষ্ক শীতল বায়ুপ্রবাহের দক্ষিণমুখী অভিযান বন্ধ হয়ে গেল। আর দক্ষিণের বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বাতাসেরও উত্তরের নিরুদ্দেশ যাত্রার পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

ভারতের অভিব্যক্তির কিন্তু তখনও পরিসমাপ্তি হয় নি। উত্তরের পার্ব্বত্য ভূমি আর দক্ষিণের মালভূমির মাঝখানে ছিল পূর্ব্ব-পশ্চিমব্যাপী সমুদ্রের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। বর্ত্তমানের আরব-সাগর আর বঙ্গোপসাগরে ছিল তখন একাকার। প্রকৃতির সৃজনীশক্তির প্রভাবে কালে এ ব্যবধানও অন্তর্হিত হ'ল। উত্তরের হিমালয় আর দক্ষিণের মালভূমি ধৌত হয়ে রাশি রাশি পলিমাটি এসে ভরাট করে দিলে এই নিম্নভূমি। ফলে লবণাক্ত বিপুল সমুদ্র পর্য্যবসিত হ'ল গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-সরস্বতী আদি পূতসলিলা স্রোতস্বিনী-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমিতে। একে একে রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি গঠিত হ'ল।

সর্ব্বশেষে বিশ্বকর্ম্মার ভারত-সৃষ্টি যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হ'ল বঙ্গমাতার আবির্ভাবে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র উভয়ে মিলে নগরাজ হিমালয়ের পূত রেণুকণা তিলে তিলে আহরণ করে এনে দশভুজা শতভুজা হয়ে অঞ্জলি দিয়েছে ভারতের এই প্রান্তদেশে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পায়ে। তাঁর প্রসন্ন হাসির সঙ্গেই ফুটে উঠেছে এই বাংলাদেশ।

জীব-অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয়িত ভাবে দেখিয়েছেন মানুষ এসেছে সর্ব্বশেষে এই পৃথিবীতে। আর ভারতের ভূ-প্রকৃতির গঠন-বিন্যাসের ব্যাপারে বাংলাদেশের স্থান যে সর্ব্বশেষে, বিশ্বকর্ম্মা যে ভারতের আর আর সব জায়গায় হাত পাকিয়ে সর্ব্বশেষে গড়েছেন বাংলাদেশকে সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ। বাংলার কবি তাঁর জন্মভূমিকে যখন "সকল দেশের সেরা" বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তাঁর কবি-প্রতিভা শুদ্ধমাত্র সত্যকেই আলোকিত করেছে, কোন কল্পলোকের সৃষ্টি করে নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতমালার উচ্চতম অংশ রয়েছে বাংলার উত্তরে। আর দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগরের জলরাশি। পূর্ব্ব, পশ্চিম উভয় সীমান্তপ্রসারী পর্ব্বতমালা আর সাগরবেলায় এমন সমান্তরাল সন্নিবেশ, ভূপ্রকৃতির এমন মণিকাঞ্চন যোগ খুব কম দেশের ভাগ্যেই ঘটেছে। বাংলার যত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—এর গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, শরতের 'হাসি, এর বর্ষার ঘনঘটা, হেমন্তের অপরূপ শোভা—সবারই মূলে রয়েছে উত্তরের হিমাচল আর

দক্ষিণের চলোর্মি—এই দুয়ের অনুপম যোগাযোগ। এদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফলকেই বৈশিষ্ট্য দেয় নাই; বাংলার মনোজগতেও এই কোমল-কঠোরের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ওতপ্রোতভাবে, যার ফলে বাঙালী—বাঙালী।

পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অধিবাসীদের দেহমনকে যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে একথা মানব-সভ্যতার শৈশবে যেমন সত্য ছিল আজও তেমনই আছে। জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতিতে আত্মহারা হয়ে আমরা মনে করি—জড়প্রকৃতির পরাজয়ের উপরেই বুঝি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। মানবশিশু হাঁটতে শিখে যদি মনে করে সে মাধ্যাকর্ষণ জয় করেছে; অথবা গোবৎস যদি মনে করে মাতৃস্তনে আঘাত করেই সে দুধ আনছে তা হলে তাদের সেই মনোভাবের মধ্যে যতটুকু সত্য ধরা দেয়, আমাদের দাবির মূল্যও ঠিক ততটুকুই।

আসলে মানুষ প্রকৃতির হাতে গড়া, প্রকৃতির পাঠশালায় পড়া। কাজেই ভূপৃষ্ঠে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বভাবতঃই বিভিন্ন হয়েছে। মেরুপ্রদেশের এস্কিমো আর সাহারার বেদুইন এদের পার্থক্য চিরন্তন। পার্থক্য শুধু অস্থিমজ্জাগত নয়, মনবুদ্ধিও এদের স্বতন্ত্র।

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলা যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এটা ত প্রত্যক্ষ সত্য। এদেশে শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, অন্নচিন্তার তীব্রতাও ছিল না। স্বভাবতঃই এদেশের অধিবাসীদের মনের গতি আর হাতের কাজ দুই-ই বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে চিরকাল। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির প্রতি অঞ্চলে, প্রতি জনপদে সহজেই বাংলার বিচিত্র ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট এবং প্রচারিত হতে পেরেছে নানা ভাবে, নানা আকারে। ফলে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য-বোধ গড়ে উঠেছে। জাতিবর্ণসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীর মনের উপরে তার স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে আজ একথা সহসা প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু এর সঙ্গে তথাকথিত প্রাদেশিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এ হ'ল অতি অন্তরঙ্গ বস্তু, আর প্রাদেশিকতা হ'ল নিতান্ত বাহ্য। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অহঙ্কারের, সহজ শৌচের সঙ্গে শুচিবাইয়ের অথবা আগুনের সঙ্গে আগুনের ধোঁয়ার যে পার্থক্য এ দুই বস্তুর মধ্যেও ঠিক সেই রকমের পার্থক্য রয়েছে। স্বার্থপরতা খারাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বার্থবোধ শুধু অপরিহার্য্য নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর বাংলাদেশে এ প্রয়োজনীয়তা আজকার দিনে যত বেশী, ততটা এর বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের কোন দিনেও হয় নাই।

৬

বাঙালীর স্বার্থবোধ আজ নানা কারণে বিক্ষিপ্ত। বহু সাধনা আর প্রভূত ত্যাগের পরে দেশে যখন স্বাধীনতা এল, আমরা তখন তার পূর্ণ স্বাদ থেকে হলাম বঞ্চিত। কারণ সেই সঙ্গে আমাদের দেশ হ'ল দ্বিখণ্ডিত।

এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী যে কে তা বলা যেমন শক্ত, এর কারণ যে কি তা বলা ঠিক তেমনই সহজ। দেশ-বিভাগের মূলে রয়েছে আমাদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ। আমরা যারা অন্তরে এই অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেছি, অথবা জ্ঞানে-অজ্ঞানে এর পোষকতা করেছি তারা সবাই এ দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। বিদেশীর ভেদনীতির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলে আমাদের দায়িত্বের মাত্রা একটুও কমবে না। বিদেশী তার সাম্রাজ্য রাখবার চরম চেষ্টায় যা কর্ত্তব্য মনে করেছে নিখুঁত ভাবে তা করেছে। তার পাল্টা আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে কি করেছি?

বিদেশীর প্ররোচনায় আমরা ভুলে গেলাম—জাতীয় স্বার্থ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, ভুলে গেলাম—জন্মভূমির প্রতি সবারই কর্ত্তব্য রয়েছে, জন্মভূমির উপরে সবারই সমান অধিকার। স্বাধীনতার উষা আচ্ছন্ন হয়ে গেল সাম্প্রদায়িকতার কুয়াশায়। স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা ছিল দর্শক, সাম্প্রদায়িকতার যজ্ঞে তারাই হ'ল হোতা। বিদেশীর দোর্দ্দণ্ড শাসনের অস্ত হতে না হতেই সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ে দেশ গেল ছেয়ে।

এমনধারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অরাজকতারই স্বদেশী সংস্করণ। একে একে কলিকাতায় ও নোয়াখালিতে, বিহার ও পঞ্জাবে আমরা সাম্প্রদায়িকতার নামে অরাজকতার তাণ্ডবলীলাই দেখেছি। রাষ্ট্রশক্তি দুর্ব্বল হলে, অশিক্ষিত দৈন্যপীড়িত দেশে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক মনোভাব যখন দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও সংক্রামিত হয় তখনই দেশের সত্যিকারের বিপদ। সে বিপদ আমাদের আজও কাটে নি।

রাষ্ট্রশক্তির দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথে অরাজকতার প্লাবন বাংলাদেশের পক্ষে মোটেই নূতন নয়। রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের সময়ে এদেশে এইটাই নিয়ম। গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে, পালবংশের অভ্যুদয়ের আগে সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলায় চলেছিল মাৎস্যন্যায়। মাৎস্যন্যায় মানে "মৎস্যের তুল্য

পরস্পর হনন, অরাজকতা ও নরহত্যা"। এক বছর দু' বছর নয়, এক শ' বছর ধরে. সেই যুগের সোনার বাংলায় যা হয়েছিল তার আভিধানিক অর্থ ত বলেইছি; ব্যবহারিক অর্থের আভাসমাত্রও নিশ্চয় নোয়াখালির অত্যাচারের অত্যুক্তিকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে যাবে।

পাঠান রাজত্বের শেষের দিকে, মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কামরূপ থেকে কাশী পর্য্যন্ত কালাপাহাড়ী তাণ্ডবে যা হয়েছিল তার জোড়া ইতিহাসে দুর্লভ। সে ধর্ম্মদ্বেষীর অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তার পর মোগল রাজত্বের শেষে, কোম্পানির আমলের আগে এসেছিল এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা। তার জীবন্ত চিত্র ভুক্তভোগী বাঙালী কবি গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এঁকে গিয়েছেন। দু'শ বছর পরে আজ বাঙালী সে কাহিনী ভুলে গিয়েছে। শুধু ঘুমপাড়ানী ছড়াতেই তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু রয়ে গেছে। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, ভুলে যাওয়াই উচিত। জাতীয় জীবনে ওগুলো সত্য নয়, নিতান্তই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু যখন ঘটেছিল তখন ভুক্তভোগী বাঙালী নর-নারীর কাছে সে হাঙ্গামা মোটেই স্বপ্ন ছিল না। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র কয়েক পংক্তি পড়লেই পাঠক এর বীভৎসতা আর বর্ব্বরতা উপলব্ধি করতে পারবেন:

"মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা-রূপা লুঠে নেয়, আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে, কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধয়ে পরাণ।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়।
এক জন ছাড়ে তবে আর জনা ধরে।
.........তারা ত্রাহি শব্দ করে।
এই মত বরগী কত পাপকর্ম্ম করিয়া।
সেই সব স্ত্রীলোককে যত দেয় সব ছাড়িয়া।
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়।
বড় বড় ঘরে আসিয়া আগুন লাগায়।
কাহুকে বাঁধে বরগী দিয়া পিঠ-মোড়া।
চিৎ করি মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া।
"রূপী দেহ, রূপী দেহ" বোলে বার বার।
রূপী না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
কাহুকে ধরিয়া বরগী পুখরে ডুবায়।
কারুর হইয়া তবে কার প্রাণ যায়।"

এসব কবির অত্যুক্তি নয়। কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও বর্গীর হাঙ্গামায় বাঙালী নর-নারীর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখে তাঁর সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রচম্পূ'তে লিখেছেন:

"মারাঠারা কৃপার কৃপণ, গর্ভবতী এবং শিশু, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলে, সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণে নিপুণ, তাহারা বাংলার জনপদে যেন ছোট প্রলয় ঘটাইল, সমস্ত ধন এবং সাধ্বী স্ত্রীলোক হরণ করিল।"

এক আধ বছর নয়, বছরের পর বছর—দশ দশ বৎসর এমনিধারা অমানুষিক অত্যাচারের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল এ দেশের উপর দিয়ে।

এর প্রায় পিঠাপিঠিই এল এদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এরও মূলে রয়েছে অরাজকতা। সেদিনকার সে অরাজকতার নগ্নরূপ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন 'আনন্দ মঠে':

"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য-কুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লিখে। বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

বাঙালীর সেদিনকার দুর্দ্দশার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তাতে কল্পনার অতিরঞ্জন নাই—আছে ঐতিহাসিকের সহানুভূতি আর সমীক্ষা। সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্রের প্রমাণপুঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে সে দুর্দ্দশার সংক্ষিপ্তসার তিনি যা দিয়েছেন তা এই:

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তার পরে ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পরে স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেক পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল; যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকেও দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে এক বার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।"

যা হয়েছিল সেটা সত্যই মন্বন্তর। এর ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাণ হারাল। বাংলার জমিদার সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হ'ল; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হ'ল। বাংলার গৌরব শক্তিমান কৃষককুল মজুরে পরিণত হ'ল, সুজলা সুফলা বাংলার মাটির এক-তৃতীয়াংশ চাষবাসের অভাবে জঙ্গলে ভরে উঠল। এক-আধ বছরের অনাবৃষ্টিতে বা অজন্মায় এমনটা হয় নাই। এর মূলে ছিল বহুবর্ষব্যাপী অরাজকতা, শোষণ আর অবাধ লুণ্ঠন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এসেছিল বাংলায় ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে; বাংলায় আর এক ভয়ানক মন্বন্তর এল ১৯৪৩ সালে—ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্ত হবার অব্যবহিত পূর্বে। এই দুই মন্বন্তরের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি থাকলেও এদের হেতুর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই অরাজকতা আর শোষণ দুই-ই চরমে উঠেছিল। যাদের হাতে ছিল শাসনযন্ত্র তারা জনকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সেকালেও দ্বিধা করে নি, একালেও নয়। সেবারও দুর্ভিক্ষের দরুন রাজস্ব আদায়ে কসুর হয়নি, এবারও সারা দেশ যখন প্রপীড়িত, তখনও সমানে বাংলার বন্দর থেকে চাল রপ্তানী হয়েছে—আরব, ইরাক, সিংহল ও আফ্রিকায়। প্রজাকে বঞ্চিত করে তারই শ্রমলব্ধ খাদ্য সংগৃহীত হয়েছে সঞ্চিত হয়েছে, বিদেশী সৈন্যের রসদ বলে। কত না তার নষ্ট হয়েছে, কত না হয়েছে চুরি। এ অন্যায় অরাজকতার যারা প্রতিবাদ করত, প্রাণ দিয়ে এ লুণ্ঠন যারা প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হতে পারত, বিদেশী সরকার আগেই তাদের অবরুদ্ধ করেছিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ফলে অনশন-মৃত্যুতে পল্লী উজাড় হয়েছে, শহরের হাসপাতালে হয়েছে স্থানাভাব, রাজধানীর পথে পথে অনশন-জীর্ণ মৃতদেহের ছড়াছড়ি গিয়েছে।

এ দুর্ভোগের অন্ত হতে না হতেই দেশে এল সাম্প্রদায়িক হানাহানি। মূলতঃ এ হানাহানি যে বুভুক্ষুর কাড়াকাড়ি তাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে 'সুশৃঙ্খল' কুশাসনের অবাধ শোষণের ফলে দেশে এল মন্বন্তর, তারই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রেরণা এবং প্ররোচনায় হ'ল সাম্প্রদায়িকতার জন্ম, বৃদ্ধি। এদেশে এ উপসর্গ চিরস্থায়ী হবে এমন মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ভেঙেছে; বিদেশীর যথেচ্ছ শোষণও বন্ধ হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক বাংলা নিজেকে ফিরে পাবেই। আজকার এ আত্মঘাতী মনোভাব তখন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে—এ সুনিশ্চিত। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে আজ যাঁরা দিগ্বিদিক ভুলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছেন, আর যাঁরা চোরের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন, অতীতের জ্ঞান আর ভবিষ্যতের দৃষ্টি দুই-ই তাঁদের সমান আচ্ছন্ন।

৪

কিন্তু কেন এমনধারা দুর্গতি বাঙালীর যুগে যুগে? কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। নিতান্ত কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যেও যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তারও একটা না একটা প্রচ্ছন্ন কারণ থাকেই। ভূমিকম্প যে এমন একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাও দৈবাৎ হয় না। মাটির নীচেকার তাপ আর চাপের বকেয়া হিসাবের বোঝাপড়ার ফলেই নাকি তা হয়। আমাদেরও অমনিধারা বকেয়া হিসাবের জবাবদিহি, আর তহবিল তছরুপের দণ্ড দিতে হয়েছে নানান্ রকমের দুর্গতির মারফত—জাতীয় বিবর্ত্তনের বাঁকে বাঁকে। ধরিত্রীর ইতিহাসে ভূমিকম্প নিরর্থক নয়। পৃথিবীর ব্যবস্থিতিতে ওরও প্রয়োজন আছে। বাংলার ইতিহাসের ঐ যে বড় বড় দুর্ভোগগুলো, যারা কিনা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আমাদের সবাইকেই পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়ে গিয়েছে, সেগুলোও সার্থক হবে, যখন বাঙালী ওদের প্রকৃত ইঙ্গিত অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে।

চিরকাল প্রকৃতি এদেশের প্রতি সদয়। জীবিকা এখানে এতই সহজলভ্য যে, অতীতে বাঙালী কখনো জাতীয় স্বার্থের জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে নাই। মুষ্টিমেয় বিদেশী যখন মারাঠার আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে দুর্গ নির্ম্মাণ করল, বহু যোজনপ্রসারী পরিখা খনন করল, তখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী, বর্দ্ধমানরাজ বিষ্ণুপুররাজ থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় ভূস্বামী সবাই অসহায়ভাবে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। বছরের পর বছর অত্যাচরিত, অপমানিত হয়েও শিক্ষা হ'ল না কারুরই।

শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব এদেশে ছিল না, কিন্তু সংহতির আর সমবেত চেষ্টার অভাব এদেশে চিরকাল। বারো ভূঁইয়ার কেউই কম ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সম্মিলিত হয়ে বাংলার বিপুল সমৃদ্ধি আর গণশক্তিকে কার্য্যকরী করবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

বাংলার অনতিদূর অতীতের সমৃদ্ধি কেমন ছিল? আর তার কি ব্যবহার হ'ত সেকালে? ১৭০৬ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান-নাজিম হয়ে ঢাকায় এসে প্রথম পুণ্যাহের পরেই দুই শ' গরুর গাড়ী বোঝাই করে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নগদ টাকা পাঠিয়েছিলেন দিল্লীতে। এ ছাড়াও 'জায়গিরীর ও খাসনবিশির টাকা' স্বতন্ত্র পাঠিয়েছিলেন। আর পাঠিয়েছিলেন—"হস্তী, টাঙ্গন ও গুঞ্জ

নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্ব, মহিষ, হরিণ, রাজপাখী, জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) বয়ন করা পাদশাহের ব্যবহার্য্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, গণ্ডার-চর্ম্মের ঢাল, শ্রীহট্টের মাদুর (স্বর্ণ ও গজদন্তের), মৃগনাভি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বাংলার চাল সেকালে নদী-পথে পাটনায়, আর সমুদ্র-পথে করমণ্ডল উপকূলের বহু বন্দরে, সিংহলে, মালদ্বীপে প্রেরিত হ'ত। বাংলার চিনি গোলকুণ্ডায়, কর্ণাটে, আরবে, ইরাণে ইরাকে যেত। সূতী আর রেশমী কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হ'ত বিদেশে।

এত যে ঐশ্বর্য্য, এমন যে সমৃদ্ধি এর কতটুকু অংশ পেয়েছে বাংলার কৃষক, বাংলার কারিগর? বাদ্শা-বেগম-নবাব-নাজিম-আমীর-ওমরাহ্দের বিলাস-ব্যসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে, রাজা-মহারাজা-জমিদার-তালুকদার এঁদের রাজসিক জীবনযাত্রা আর দোল-দুর্গোৎসবের খরচ জুগিয়ে যা থাকত তার বেশীর ভাগই খুব সম্ভব যেত সওদাগরের সিন্ধুকে, আর শেঠের কুঠিতে। বাংলার যারা যথার্থ ধন উৎপাদন করত তাদের অনেকের দুয়ারেই খুব সম্ভব হাতী বাঁধা থাকত না। আর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালীর উন্নয়ন—এ সব নিয়েও কেউ যে বিশেষ মাথা ঘামাত এমনও মনে হয় না। টাকায় আট মণ চাল—তারা দু'বেলা আঁচাতে পেরেই মহাসুখে ছিল। তাদের পেটে ভাত ছিল, গায়েও জোর ছিল। ডাক পড়লে ঢাল-সড়কি, লাঠি-সোঁটা নিয়ে রাজার কাজ হাঁসিল করত তারা, নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে। কোন উচ্চতর ঐহিক আদর্শের সন্ধান কেউ তাদের দেয় নি।

শাস্ত্রে লেখে—দেবতার দানে সমৃদ্ধ হয়ে যে দেবতাকে তার ভাগ দেয় না সে চোর। বাংলার সেকালের বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণীর প্রায় সবাইকেই স্বচ্ছন্দে ঐ দলে ফেলা যায়। আর তাদের যুগসঞ্চিত সেই পাপের দণ্ড তাদের সঙ্গে সমস্ত দেশকেই ভোগ করতে হয়েছে। বর্গীর হাঙ্গামায় তার আরম্ভ, আর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তার পরিণতি—১৭৪২ থেকে ১৭৭০।

তারপরে এদেশে এল ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজের আমলে অবস্থার উন্নতি ত হ'লই না বরং আরও দ্রুত অবনতিই হতে লাগল। শিক্ষিত-সমাজের মন হ'ল গ্রাম হতে বহির্মুখী; আর লক্ষ্য হ'ল 'যেমন তেমন চাকরি দুধ ভাত'। শ্রমবিমুখ বাঙালী সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের আশায় ছুটল শহরে, রাজধানীতে—সরকারী শাসন আর শোষণের সহযোগিতায়। বংশপরম্পরায় সৃষ্টি হতে লাগল মেজো খাঁ আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গার্হস্থ্য সংস্করণ। কৃষি আর শিল্প রইল অবজ্ঞাত হয়ে; সর্ব্ববিষয়ে হয়ে পড়লাম আমরা পরমুখাপেক্ষী। ধনরত্ন যত ছিল, বিদেশীর যাদুমন্ত্রবলে সব ত উড়ে গেলই; বিল বাঁওড় জলা দীঘি সব গেল মজে, নদীনালা গেল শুকিয়ে; আর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম সব ভরে গেল জঙ্গলে।

এমনি করে শুধু গণদেবতার কাছেই নয়, ধরিত্রী দেবতার কাছেও আমরা অপরাধী হয়ে গেলাম। যে-দেশের প্রকৃতির সুষমা আর ভূমির উর্ব্বরতা চিরদিনই বিদেশীর বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে; যেদেশে সুদূর অতীত যুগের কোন ভগীরথের বহু বর্ষব্যাপী তপস্যায় গঙ্গার দুই পাশে, রাজমহল থেকে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত খনিত হয়েছিল অগণিত সুদূরপ্রসারী খাল; যেদেশের শস্য আর কৃষি-শিল্পসম্ভার অসংখ্য বাণিজ্যতরীতে বাহিত হয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলে যেত দেশ-বিদেশে—বছরের পর বছর, সেদেশ আজ সকল রকমে কাঙাল হয়েছে।

এর দায়িত্ব সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ আমাদের সবারই। বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীতে যখন অষ্ট্রেলিয়ার অনুর্ব্বর মরু, শস্য-শূন্য প্রান্তর আর ফলহীন বনভূমি বিদেশীর অক্লান্ত চেষ্টায় সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে, ঠিক সমসময়েই ভারতের তথা জগতের সমৃদ্ধতম প্রদেশ এই সোনার বাংলা তার অধিবাসীদের ঔদাসীন্যে দুর্দ্দশার প্রায় অন্তিম প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে এই পতিত দেশকে সমৃদ্ধির পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এ কাজে রাজনীতির মন্ত্রের চাইতে কর্ম্মযজ্ঞের সাধনা আর ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য তার রাজনীতি থেকে আসে নি, এসেছে তার শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত কর্ম্মের ফলে। সেখানে মানুষের যুগ-যুগ ব্যাপী চেষ্টায় সহস্র সহস্র যোজনপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী পরিণত হয়েছে রম্য উপবনে; ধূম্র 'প্রেইরি'র তৃণভূমি পরিণত হয়েছে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, আর ঊষর-প্রান্তরে ফুটে উঠেছে শুভ্র কার্পাসের রাশি। সেখানে আহারনিদ্রা ভুলে, শীতাতপ অগ্রাহ্য করে মানুষ দুরধিগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘুরে মরেছে বছরের পর বছর খনিজের সন্ধানে। তাদের সেই অদম্য অধ্যবসায় আর বিপুল ত্যাগের ফলে সেদিনকার শ্রীহীন পর্ব্বত আজ লক্ষ্মীর পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। কূলপ্লাবী দুর্দ্দান্ত নদীর তাণ্ডবে তারা ছন্দ-যোজনা করে মহাদেশের মাঝখানে সমৃদ্ধ বন্দরের সৃষ্টি করেছে। জীবদেহে শিরা-উপশিরার বিন্যাসের মত ঐ বিস্তীর্ণ দেশে প্রসারিত হয়েছে সর্ব্বত্র রাস্তাঘাট, রেলপথ। আটলাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই

অখ্যাত অজ্ঞাত ভূখণ্ড মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য্যে সভ্যতার আলোকে আজ ঝলমল করছে।

সহস্র সহস্র বর্ষের প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারে গর্ব্বিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বোধ করি এমনধারা ব্যাপক ভাবে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান কোন দিনই হয় নাই। সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়া অবশ্য রাজ্যে রাজ্যে হানা দিয়েছে; কিন্তু সভ্যতার অভিযান খুব সম্ভব রাজ-সিংহাসন ছেড়ে বেশী দূর যায় নাই। বিংশ শতাব্দীর দীপ্ত মধ্যাহ্নেও এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। পূর্ব্বে নিউ-ইয়র্ক আর পশ্চিমে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো এই দুই মহানগরীর মাঝে, আমেরিকার বুকে গড়ে উঠেছে অগণিত নগর, অসংখ্য কৃষিক্ষেত্র, শিল্পকেন্দ্র, শিক্ষায়তন, স্বাস্থ্যনিবাস। আর, কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই মহানগরীর মাঝে ভারতের বুকে হাজার মাইল জুড়ে কি আছে? আছে, ময়ূরভঞ্জ-কিওঞ্ঝোর-বোনাই, কাঁকের, বস্তর-হায়দরাবাদ-রাজ্যের অযত্নবর্দ্ধিত জঙ্গল; তার মাঝে মাঝে আছে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম আর ততোধিক ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র।

কাজেই আজকের দিনে স্বাধীন ভারতে রাজনীতির চর্চ্চার দিক থেকে গঠনমূলক কাজের দিকে শিক্ষিত সমাজের মনের মোড় ফেরান একান্তই দরকার। এদিকে আমাদের যা কাজ তা মুখের কথায় বা কাগজে-কলমে হবে না। এ কাজ হাতে-হাতিয়ারে মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের করতে হবে।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বাংলায় এই গঠনমূলক কাজের পরিপন্থী খুব সম্ভব হবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উভয় রাষ্ট্রকে সদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করবে না; তবুও একথা সুনিশ্চিত যে, জাতীয় স্বার্থবুদ্ধিই উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে বিপদের পথ থেকে সম্পদের অভিমুখে পরিচালিত করবে।

ইংরেজের অধীনতার যুগের কথা বাদ দিলে, সমস্ত বাংলা এক রাষ্ট্রের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে একতাবদ্ধ খুব বেশী দিন কখনও থেকেছে বলে মনে হয় না। প্রাচীনকালে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হ'ত। পাঠান আমলেও 'গৌড়-মণ্ডল' প্রায়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হ'ত। মোগল আমলের পূর্ব্বাহ্নেও বাংলার বার-ভুঁইয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভূম্যধিকারীই ছিলেন। এঁরা ছিলেন নিজ নিজ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি। এমনধারা রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বঙ্গের সামগ্রিক কৃষ্টি ও সমৃদ্ধিকে বিন্দু-মাত্রও ব্যাহত করে নাই।

চৈতন্যদেব যখন ভক্তির মন্ত্রে, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে এদেশের কোটি কোটি নর-নারীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, প্রেমের বন্যায় সমস্ত দেশকে প্লাবিত করেছিলেন তখন এ-দেশের রাজশক্তি ছিল মুসলমানের, আর বিচার ছিল কাজীর। নদীয়ায় কাজী-নিমাই সংবাদের উপসংহারে কাজী বলছেন নিমাইকে:

> "গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
> দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।
> নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
> সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
> ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
> মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা)

পাঁচ শ' বছর আগে এই ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মনোভাব। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও ঠিক এমনি-ধারাই ছিল। আর বছর পাঁচেক পরে আবার ঐ মনো-ভাবই এদেশে ফিরে আসতে বাধ্য। কারণ তৃতীয় পক্ষ তার ভেদনীতিসহ অপসারিত হয়েছে।

উভয় বঙ্গের মধ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা যাঁরা কালে অকালে অহরহ দেখছেন বা দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলি প্রজাতান্ত্রিক দেশে আজকার দিনে, সত্যিকারের জনমতকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত হওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে এবং খুব সম্ভব অচিরে তা অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে। আর বাংলাদেশ ত স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়।

যশোহরের নীল-আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখি। নীল-আন্দোলনের সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষের যোগাযোগের বিষয় কতকটা জানা থাকিলেও ইহা যে কত ঘনিষ্ঠ, গভীর ও ব্যাপক ছিল ১৮৬০ সনের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত পত্রাবলী হইতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত উক্ত সনের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ফাইল হইতে 'M. L. L.' স্বাক্ষরযুক্ত ছয়খানি পত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করার সৌভাগ্য আমার হয়। প্রথম পত্রখানি ব্যতীত আর সমুদয়ই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সম্বলিত, তন্মধ্যে এই কথা কয়টিও আছে—"from our Jessore correspondent"। এই ধরণের ভূমিকায় স্বাক্ষরবিহীন এমন কয়েকখানি পত্রেরও সন্ধান পাই যেগুলি 'M.L.L.' তথা শিশিরকুমার ঘোষেরই লেখা বলিয়া বুঝা যায়। এই পত্রগুলির পরিচিতিস্বরূপ আমি "যশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি এবং গত ডিসেম্বর মাসের (১৯৫১) মাঝামাঝি "আনন্দ-বাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনী"তে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। এই প্রবন্ধটি পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারী সংখ্যায় উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রবন্ধে 'M.L.L.' স্বাক্ষরের প্রথম পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত করি। উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত অন্যান্য পত্রের প্রকাশের তারিখও আমি ইহাতে দিয়াছিলাম। এখন, মূল আলোচনায় আসা যাক্।

গত সংখ্যায় যশোহরে নীল-আন্দোলন সম্পর্কে শিশির-কুমার ঘোষের 'M.L.L.' স্বাক্ষরযুক্ত কয়েকখানি পত্র হইতে তথ্যাদি প্রদান করিয়াছি। উহাতে আরও বলিয়াছি যে, 'M.L.L.' স্বাক্ষর ছাড়া এমন কয়েকখানি পত্রও পাইয়াছি যাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-বলে শিশিরকুমারের লিখিত বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। এরূপ পত্র হইতেও কিছু কিছু তথ্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছি। এখানে ঐ স্বাক্ষরযুক্ত এবং স্বাক্ষরবিহীন কতকগুলি পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিব। নীলকর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের যোগসাজসে প্রজাকুল কিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এ সমুদয় হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

'M.L.L.' স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন "from our Jessore correspondent" ভূমিকাযুক্ত একখানি পত্র ১৫ই আগষ্ট, ১৮৬০ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষাংশে সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া লেখা হয়, "You know this hand, please give the above a place in the Indigo districts columns." অর্থাৎ, "এ হস্তাক্ষর আপনার জানা, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে 'ইণ্ডিগো ডিষ্ট্রিক্ট্‌স' স্তম্ভে স্থান দিবেন।" ইহা হইতে বুঝা যায়, পত্র-খানি নিশ্চিত শিশিরকুমারের লিখিত। ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য এই :

"বর্ত্তমান ঋতুতে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটগণের গতিবিধি বড়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা বন্ধু নীলকরদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তই সমস্ত সময় ও মনোযোগ নিয়োজিত করিতেছেন। এক দিকে যখন তাঁহারা কুঠীতে মূল্য না লইয়াই নীলগাছ পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত প্রজাদের বাধ্য করিতেছেন, অন্ত দিকে তখন কুঠীর দুর্বৃত্তেরা তাঁহাদের নাকের ডগার উপরই ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। এই [আগষ্ট] মাসের ৬ই মধ্যাহ্নে মাগুরার অন্তর্গত ঝিনাইদহ থানার জোয়াদা গ্রামে আসরৎ কাজীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। টাকাকড়ি, সোনারূপা এবং অন্তান্ত বিস্তর জিনিষপত্র ডাকাতেরা লইয়া যায়। বাড়ীর লোকেদের উপর তাহারা উৎপাতও করে, কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় কোন প্রাণ-হানি হয় নাই।

শুনিতেছি মিঃ স্কীনার সত্তর জন পুলিস লইয়া মাগুরায় গিয়াছেন রায়তদের নীলগাছ কাটিতে বাধ্য করিবার জন্ত। স্কীনার ও টেলরের উপর ছোটলাট বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। টেলর বর্ত্তমানে মাগুরার মহকুমা হাকিম। খবর পাইলাম কুঠী-ওয়ালারা 'নারকীয় আইনে'র নীলগাছ নষ্ট করার ধারায় ফেলিয়া রায়তদের বিরুদ্ধে পুনরায় মিথ্যা মামলা রুজু করিতেছে। স্কীনার ও টেলরের পক্ষপাতিত্ব সকলেই জানেন। তাঁহাদের বিচারে প্রজাদের দুর্গতির আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না।...নীল-ঘটিত মামলাগুলির কি বিচার হয় দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। আমি যদি আপনাকে সংবাদ সরবরাহ করিতে না-ও পারি, আমার বন্ধু এম-এল-এল নিশ্চয়ই আপনাকে সকল সংবাদ দিবেন।"

জেলা-কর্ত্তৃপক্ষের আরও কতকগুলি অনাচারের বিষয় এই পত্রে উল্লিখিত হয়। নীলকরদের সঙ্গে তাঁহাদের আহার ও বাস এবং নানা আমোদ-প্রমোদে যোগদান, একজন নিরক্ষর জমাদারের বেতন-বৃদ্ধি, ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে নীলকর ওট্‌সের গোমস্তাকে তলব করায় ঝিনাইদহের দারোগার সাময়িক কর্ম্মচ্যুতি কালোপোলের মিথ্যা-প্রমাণিত 'হামলা'য় স্কীনারের সাহায্যকারী প্রসন্ন দারোগার পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পত্র-লেখক কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যাপারটি জেলা জজের বিচারে যখন মিথ্যাই প্রমাণিত হইয়াছে তখন দারোগা-পুঙ্গবকে এরূপ ভাবে সম্মানিত করা ন্যায়ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

২

শিশিরকুমারের M.L.L. স্বাক্ষরিত ষষ্ঠ পত্রখানিতে (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২২শে আগষ্ট) তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৮ই আগষ্ট। তবে ইহা পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি তখন মফস্বলে দুর্গত রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পল্লী-অঞ্চলে নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী এই পত্রখানিতে আছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকরদের যে তখন বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। পত্রখানির প্রথমে শিশিকুমার নিজের সম্বন্ধে এই মর্ম্মে লেখেন: "মিঃ স্কীনারের কঠোর সন্ধানী-দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে আমি অনবরত স্থান বদলাইতেছি। আমাকে এখন একজন 'ফেরারী' বলিলেও হয়। আমি মিঃ মোলোনীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকল নীল অঞ্চলে ঘুরিতেছি। বর্ত্তমানে হাজরাপুর কুঠীর সন্নিকটে আছি। মোলোনী সাহেব ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের অধীন একশত জন সিপাহী লইয়া প্রথমে ঝিনাইদহ, সেখান হইতে মাগুরা এবং এখন, যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে, তদীয় বন্ধু বিজলী কুঠীর ওমানের সঙ্গে রহিয়াছেন।"

ইহার পর শিশিরকুমার নীলকরদের অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ব্যক্ত করেন। ইহারও কতকটা এখানে প্রদত্ত হইল:

"বড়ই দুঃখের বিষয় নীল কমিশন এ জেলায় আগমনের সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে আসিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন—এ জেলার রায়তেরা সুখী ও সম্পৎশালী এই মর্ম্মে মিঃ কয়লং যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কতখানি সত্য। এই উক্তির মত লজ্জাকর মিথ্যা আর নাই। কমিশনের সম্মুখে অত্যাচারের শতাংশও বর্ণিত হয় নাই। এখনও নীল অঞ্চলে গৃহদাহ, লুঠতরাজ প্রভৃতির অবশেষ দৃষ্টিগোচর হইবে। আরও দেখা যাইবে—নারীদের উপর কুঠিয়ালদের অত্যাচার করায় দরুন কত পরিবার সমাজচ্যুত হইয়াছে, নীলকরদের অদম্য অর্থ-ক্ষুধা মিটাইবার নিমিত্ত কত ধনী ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এটি অতি সত্য কথা যে, পুরুষের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীগণকে দিয়া নীলক্ষেতের মাটি ভাঙানো হইয়াছে। কুলীর অভাবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে খাটাইতেও তাহারা দ্বিধা করে নাই। পুরুষদের নীল চাষ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে নীলকুঠীর গুদামে আটক রাখিয়া নিরতিশয় দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি যে গ্রাম হইতে এই পত্র লিখিতেছি সেই গ্রামের রামতনু অধিকারী নামক এক ব্যক্তিকে তাহার বাড়ীতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে হাজরাপুর কুঠীর সাহেব ওট্স আক্রমণ করে। রামতনু পলাইয়া যায়, কিন্তু বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহার অনুসরণ করিতে পারে নাই। লাঠিয়ালদের কোপ পড়িল বাড়ী ও আসবাবপত্রের উপর। তাহারা বাড়ীটি ধূলিসাৎ করে, আর আসবাবপত্র লুঠ করিয়া লইয়া যায়। বাড়ীর স্ত্রীলোকদের গ্রেপ্তার করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখে। অবশিষ্ট কাহিনী লিখিতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। এই লোকটিকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে। রামতনু ওট্সের বিরুদ্ধে স্কীনারের আদালতে মামলা রুজু করে (শুনিতেছি, স্কীনার ওট্সের আত্মীয়), কিন্তু স্কীনার তৎক্ষণাৎ ইহা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। আর একটি সম্মানিত পরিবার—লাউডাঙার সাহাগণ কয়েক মাস পূর্ব্বে ওট্সের হস্তে অনুরূপ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদেরও ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয় ও শেষে পোড়াইয়া দেওয়া হয়, স্কীনারের আদালতে মামলা রুজু হইলে তিনি এটিও ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। এইরূপ বহু ঘটনা ঘটিয়াছে…আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাহা লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে নীলচাষের ক্ষতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এ অঞ্চলে ধনী-দরিদ্র, পাপী-পুণ্যাত্মা এমন লোক নাই যাহারা নীলচাষের দরুন ছাড়াও কোন-না-কোন রকম নির্যাতন ভোগ করে নাই।…

ইতিপূর্ব্বে ওট্স সাহেবের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাখরি, পানামি, শ্রীরামপুর, বোগ্রু, রামচন্দ্রপুর, হরিশঙ্করপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি একতাবদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নীল বুনিবার সময় এইরূপ আক্রমণ সুনিশ্চিত। আমি শুধু কয়েকটি বড় বড় গ্রামের নাম করিলাম, বহু ছোট ছোট গ্রামেও বিষম উত্তেজনা দেখা যাইতেছে।… ওট্সের কথা ছাড়িয়া এখন বিজলী কুঠীর ওমান সাহেবের কথা কিছু লিখিতেছি।

নীলচাষী ও জনসাধারণ ওমান সাহেবকে নীলকরদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার কুঠী এবার প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, যদি-না মোলোনী তাহার সাহায্যার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাহার দেওয়ান ঈশানচন্দ্র হুকুম জারি করে যে, গ্রামগুলির সকল বাঁশঝাড় কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং স্ত্রীলোকগণকে কুঠীতে ধরিয়া আনিতে হইবে যদি নীলচাষীরা নীল কাটিতে অস্বীকার করে। শত শত লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়া বাঁশগুলি কাটিয়া ফেলা হইল, কিন্তু হুকুমের দ্বিতীয় অংশ কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা পাওয়া গেল। যাহারা দোমনা ছিল তাহারাও নীলকরের বিরুদ্ধে যোগ দিল। মিঃ

টেলরের বিচারে ঈশানচন্দ্রের তিন মাস কারাদণ্ড ও এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। শোলকোপা প্রামটি বাংলাদেশের একটি খুব বড় গ্রাম। এখানকার পুরুষ অধিবাসীর সংখ্যাই আট হাজারের উপর। ইহাদের অধিকাংশ দীর্ঘশ্মশ্রু মুসলমান। বিটুদি, উবেদপুর প্রভৃতি গ্রাম কম বড় নহে। ওমান সাহেবকে এইরূপ আঠাশটি যোদ্ধার সঙ্গে বুঝিতে হইতেছে।...

মীরগঞ্জ কুঠীতেও গোলমাল চলিতেছে। চাষীদের ক্রোধ একটুকুও হ্রাস পায় নাই। শুনব, বিয়াল্লিশ জন সিপাহী সেখানে পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে সঠিক বলিতে পারিতেছি না।...মিঃ স্কীনার শিশিরবাবুকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে যাইতেছেন; কিন্তু আমি পুনরায় বলি তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, হ্যালিডে সাহেব এখন আর বাংলাদেশ শাসন করিতেছেন না।"

৩

শিশিরকুমার বর্ষাকালে যশোহরের উত্তরে মাগুরা মহকুমা অঞ্চলে ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ও তাঁহার সহকারীদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমটি হইল, 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র যশোহর সংবাদদাতা সন্দেহে জেলা-কর্তৃপক্ষ অনবরত তাঁহাকে নানা ভাবে মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইতে চেষ্টিত ছিলেন। এজন্য তাঁহার দূরে দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। তবে দ্বিতীয় কারণই মুখ্য। এই সময় জেলা-কর্তৃপক্ষ মফস্বলে গিয়া 'বিদ্রোহী' প্রজাদের দিয়া নীলগাছ কাটাইবার জন্য বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় লইতেছিলেন। বহির্জগতের নিকট সে সমুদয় ফাঁস করিয়া দেওয়া ছিল শিশিরকুমারের অভিপ্রায়। তিনি নিদারুণ বর্ষার মধ্যেও—যখন উত্তর অঞ্চল সুবৃহৎ হ্রদে বা ছোটখাটো সাগরে পরিণত হইয়াছে তখন জীবন বিপন্ন করিয়াও নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও নীলকরদের ক্রিয়াকলাপের বিষয় জানিয়া লইয়া 'পেট্রিয়টে' প্রকাশ করিতেছিলেন। ১৮৬০, ৫ই সেপ্টেম্বরের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যে পত্রখানি বাহির হয় তাহা পাঠে জানা যায়, প্রচুর বারিপাত হেতু শিশিরকুমার শোলকোপায় যাইতে পারিতেছেন না। সেখানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ নীলকর এবং রায়তদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ আসন্ন। এ বিষয়ের উল্লেখের পরে শিশিরকুমার এই মর্ম্মে লেখেন:

"শোলকোপা-কুঠীর ওমান সাহেব কয়েক শত লাঠিয়াল যোগাড় করিয়াছেন। অবশ্য, তিনি তাহাদের মিতলতার ও গোলাগুলি দ্বারা সজ্জিত করিবেন। ইহা অনেকটা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তো পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ওমান সাহেব গত কয়েক মাস ধরিয়াই গোলাবারুদ বন্দুক সংগ্রহ করিতেছেন, অছিলা—আত্মরক্ষা। এ সুযোগ হয়ত তিনি ছাড়িবেন না। এই সংঘর্ষ যদি সত্যই বাধে তাহা হইলে ইহা মারাত্মক রকমের হইবে। হাজার হাজার সশস্ত্র লাঠিয়াল এক দিকে, অন্য দিকে দশ হাজার মুসলমান—যাহারা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এক বার এই আসন্ন সংঘর্ষ প্রতিরোধে তৎপর হউন না?"

ইহার পরে শিশিরকুমার লেখেন যে, তিনি সদর যশোহর হইতে এখন চল্লিশ মাইল দূরে রহিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ২রা সেপ্টেম্বর যশোহর ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াও তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছিলেন। জেলা-কর্তৃপক্ষ নীলকরদের কতখানি সহায় হইয়াছেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এই পত্রে শিশিরকুমার দারোগা কর্তৃক সম্প্রাপ্ত একখানা পরওয়ানারও উল্লেখ করেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই: "যখনই নীলকরদের নিকট হইতে আবেদন আসিবে যে, রায়তেরা সংঘবদ্ধ ভাবে নীলকরদের জব্দ করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হেথা-সেথা বিচরণ করিতেছে তখনই যেন তাহাদের বেআইনী জনতা বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।" শিশিরকুমার লেখেন, "এরূপ পরওয়ানা গত ১২ই মার্চ্চও একবার দেওয়া হয়। এখন পরওয়ানা পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য—যে সকল রায়ত নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে না, সরকারী সহায়তায় তাহাদের আটক করিয়া রাখা।"

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্কীনারের কীর্ত্তিকাহিনীর কথাও শিশিরকুমার এই পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ওমান সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা। ওমানের বিরুদ্ধে গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতির যে সব অভিযোগ আসে তাহা তিনি নির্লজ্জ ভাবে ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। মুল্লিকপুরের সংঘর্ষকে—যাহাতে এক জন নিহত ও চারি জন গুরুতররূপে আহত হয় আর দুই জনকে একেবারে গাপ্ করিয়া ফেলা হয়—স্কীনার একটা সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। একদিন দুই শত মোড়ল (গ্রাম্য নেতা) তাঁহার নিকট আবেদন লইয়া গেলে তিনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। আবার আবেদনকারীদের কারাগারে পুরিয়া রাখার কথা বলিয়াও ভয় দেখান। কালোপোলের মিথ্যা হাম্লা লইয়া কতই না জাঁক করা হইল। কুঠীয়াল চার্ডন সাহেব একে একে নাম করিয়া দেখাইয়া দিলে মিঃ স্কীনার ঊনপঞ্চাশজন নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে চালান দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার লেখেন:

"এহেন স্কীনারকে ছোটলাট বাহাদুর মিঃ গ্রাণ্ট কতকাল আর এখানে বহাল রাখিবেন? মহাশয় গ্রাণ্ট কি যশোহরের কুড়ি লক্ষ অধিবাসীর মঙ্গল চান না? তাঁহার কি এই অভিমত যে, এক জন শ্বেতাঙ্গের জন্ত লক্ষ লক্ষ কৃষকার নিপীড়িত হইবে?"

৪

পরবর্ত্তী পত্রে শিশিরকুমার ঘোষ নীলকরদের 'নগদ রূপেয়া'র মহিমার কথা ব্যক্ত করেন। এ পত্রখানি বাহির হয় ১৮৬০, ৩রা অক্টোবরের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—কিরূপ লাভজনকভাবে টাকার ব্যবহার করিতে হয় তাহা কেহ জানে তো এই নীলকরেরা। মামলাগুলিতে তাঁহাদের জয়লাভের মূলে রহিয়াছে এই টাকা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের চক্ষে ধুলা দেওয়া, নিপীড়িতদের প্রতিশোধ লইতে অনিচ্ছা, গবর্ণরদের মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা, পুলিসকে পোষ মানানো, জমিদারদের দমন করা, রায়তদের ঘাড় মট্‌কাইয়া দেওয়া—এ সমুদয়েরই মূলে রহিয়াছে এ যুগের যাদু—রূপেয়া। নীলকরেরা টাকার 'সদ্ব্যবহার' করিতে খুব ভাল করিয়াই জানে। উৎকোচ, উপঢৌকন যে আকারেই দরকার হউক, কুঠীর সিন্দুক অমনি খুলিয়া যায়। গরিব চাপরাশী, সুপুষ্ট সেরেস্তাদার বা অভিজাত সিবিলিয়ান—যখন যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, কুঠীয়াল সাহেব তখনই তাহা সরবরাহ করিতে মুক্তহস্ত। নীলকুঠীর সাহেবেরা আগে হইতেই তাহাদের টাকা জোগাইতে থাকে, কারণ কখন যে তাহাদের সাহায্য দরকার হইবে তাহা তো আর জানা নাই। যে-কোন সময় নরহত্যা বা অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, কাজেই পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের হাত করিয়া রাখা আবশ্যক। যেমন, মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া রাখে।

ইহার পর শিশিরকুমার সাধুহাটি গ্রাম সম্পর্কে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। কালোপোলের কুখ্যাত প্রসন্ন দারোগার অনুরোধক্রমে স্কীনার এই গ্রামে এক দল পুলিস মোতায়েন রাখেন এই ওজুহাতে যে, সিন্দুর কুঠী এবং সাধুহাটি গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। শিশিরকুমার বলেন, সাধুহাটির মথুর আচার্য্য নামে একজন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কুঠীয়াল সাহেব জরিমানা প্রভৃতি বাবদে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দোহন করে। ইহার পর মথুর আর এরূপ দাসত্ব স্বীকার না করিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে কুঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। নীলকর তাঁহাদের জব্দ করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করে, যশোহর আদালতেও বহু মামলা রুজু হয়; কিন্তু যখন দেখিল কিছুতেই গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ তাহাদের নেতা মথুর আচার্য্যকে জব্দ করিতে পারা গেল না তখন অন্ত উপায় ধরিল। নীলকর ভাবিল, এক দল পুলিস যদি এখানে স্থিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের উৎপাতে গ্রামবাসীরা শায়েস্তা হইবে এবং নীলকুঠীর বশ্যতা স্বীকার করিবে। প্রসন্ন দারোগাকে দিয়া পুলিস আনাইবার চেষ্টার ইহাই নিগূঢ় কারণ। স্কীনার অনেকবার উপরওয়ালার দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়াছেন। এবারে পুলিস স্থাপনের ঝুঁকি নিজে না রাখিয়া নদীয়া বিভাগের কমিশনার মিঃ লাসিংটনের নিকট কাগজপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৫

'হিন্দু পেট্রিয়টে' শিশিরকুমারের শেষ পত্র বাহির হয় ১৮৬০, ১৭শে ডিসেম্বর তারিখে। পত্রখানিতে এই বলিয়া আক্ষেপ করা হয় যে, যশোহরের রায়তগণ পুনরায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। নীলকরেরা যে এক বিঘা জমিতেও নূতন করিয়া নীলচাষ করাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু অন্ত দশ রকম উপায়ে তাহারা অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে। তাহাদের নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা পূর্ব্বগামীদেরও ছাড়াইয়া যায়। যে-সব ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম প্রথম প্রজাদের সপক্ষ ছিলেন তাঁহারাও কিরূপে নীলকরদের বন্ধু হইয়া উঠেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার উক্ত পত্রে এইরূপ দিয়াছেন:

"আমরা মাগুরায় মিঃ টেলরের আগমনে প্রথমে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিবার পরই তাঁহার অপক্ষপাত ও ভাষ্য ব্যবহারের পরিচয় পাই। এরূপ লোক প্রেরণের জন্ত ছোটলাট বাহাদুরকে বিশেষ ধন্যবাদও দি' এবং আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হই। কিন্তু দুঃখই যাহাদের ললাটলিখন তাহাদের ছোটলাট বাহাদুর কি করিবেন? নচেৎ এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমরা একজন মাত্র লোকের অনাচারের বিরুদ্ধে এমন করিয়া কাঁদিয়া মরিব কেন? যে দেশে যখন অন্যায় আচরণের জন্ত রাজরাজড়া পর্য্যন্ত সিংহাসনচ্যুত হন সেই সময় আমরা এক জন সামান্ত পুলিস কর্ম্মচারীর সম্মুখে হাবা-বোবা হইয়া থাকি কেন?

ন'হাটার মিঃ সভির বাড়ীতে টেলরকে দলে টানিবার জন্ত এক জবর সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ওয়াস, ডুয়ান্ত সভি এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। গত ৯ই ভাদ্র [২৪শে আগষ্ট '৬০] এই সভা হয়। ইহার পর অবধি টেলরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। টেলর সাহেব সেরেস্তাদার মদন লাহিড়ীকে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করেন—ছোটলাট কর্ত্তৃক ধরা না পড়িয়া, নীলকরদের সাহায্য করিবার সম্পূর্ণ নিরাপদ উপায় কি আছে।

বন্ধুর দাক্তিটিকে সুধাইলেই ইহার সত্যতা নির্ণীত হইবে। তার মাসের ঐ সমরীর সভার দিন হইতে মিঃ টেলর প্রায়ই চার-পাঁচ জন নীলকর পরিবৃত হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছেন। তাঁহার গৃহ একটি রীতিমত নীলকর সভার ("Planter's Association") পরিণত হইয়াছে। প্রায়ই তিনি এই সকল বন্ধুর সঙ্গে খানাপিনা করিতে যান। তখন অবশ্য তাঁহার ঘর খালি থাকে।"

শিশিরকুমার ইহার পর বলেন যে, রায়তেরা নদীয়া বিভাগের কমিশনারের নিকট টেলর ও নীলকরদের যোগসাজসে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিষয় জানাইয়া বাংলায় এক দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে। সভি, ওমান, ডুরাণ্ড প্রমুখ নীলকরদের ইঙ্গিত মাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট টেলর রায়তদের গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিতেছিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন :

"চুক্তিভঙ্গ আইনের মেয়াদ (মাত্র ছয় মাস) ফুরাইবার উপক্রম হইলে নীলকরেরা তাড়াতাড়ি রায়তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে কতকগুলি মামলা রুজু করেন, আর মিঃ টেলর ইহার প্রত্যেকটিতেই রায়তদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার এজলাসে ৪র্থ আইন অনুসারেও বহু মামলা রুজু হয়, ইহার প্রত্যেকটিতেই মিঃ টেলর নীলকরদের অনুকূলে ডিক্রী দেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ন্যায়পরায়ণ জেলা জজ মিঃ বেলী শেষ পর্য্যন্ত সুবিচার করিবেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রথম মামলায় মিঃ টেলরের রায় বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই মামলায় রায়তেরা হাজার বিঘা জমি হইতে বেদখল হইয়াছিল। ছোটলাটের খুবই সুনাম শুনিতে পাই। তিনিও কি অবশেষে বদলাইয়া গিয়াছেন, না বিভিন্ন নীল-অঞ্চল হইতে যে ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা তাঁহার একার পক্ষে অসম্ভব? মিঃ টেলরের জুড়ি মিঃ কল্‌কন সম্বন্ধে কিছু লিখিবার এখন সময় নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ জেলায় এই রকম দুই জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাহাল রাখিয়া আমাদিগকে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে নাকি যে, আমরা একটি ভিন্ন জাতি এবং স্বাধীন জাতির ন্যায় ব্যবহার আমরা কাহারও নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি না? উপরোক্ত রায়তদের কয়েক জনকে ছয় মাসের জেল দেওয়া হইয়াছে। এক শত টাকা জরিমানা দিলে 'আসামী'রা সশ্রম দণ্ড হইতে রেহাই পাইতে পারে।"

১৮৬০ সনের শেষ দিকে এরূপ অত্যাচার-অনাচার চলিলেও, এই বৎসরের নীলকরদের দৌরাত্ম্যের বিষয় নীল কমিশনের সম্মুখে, বিশেষতঃ সংবাদপত্র মারফত যেরূপ সর্ব্বত্র জানাজানি হইল তাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা আর রহিল না। ইহার পরেও বহু বৎসর নীলচাষ বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল, নীলকরের অত্যাচারও কম-বেশী নানা স্থানে চলে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বগৌরব ও প্রতিপত্তি কখনও ফিরিয়া পায় নাই। প্রজাকুল নীলকর সমাজের দৌরাত্ম্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়াই ঐরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এই সংঘবদ্ধ প্রয়াস বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অভিনব। নীলকরদের ও জেলা-শাসকগণের ব্যাপক অত্যাচার-উৎপীড়নে বাঙালীজাতির অসাড় দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। প্রায় পনর বৎসর পরে ১৮৭৪, ২২শে মে সংখ্যা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ইংরেজী স্তম্ভে (তখন 'পত্রিকা'র ইংরেজী বাংলা দুই অংশ ছিল) শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৬০ সনের নীল-হাঙ্গামা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

"It was the indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revolution it will be to free the nation from the death grips of the all-powerful police and district Magistrates. Nothing like oppression! It was the oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by indigo planters which at least roused the half-dead Bengalee and infused spark in his cold frame."*

অর্থাৎ, 'নীল-হাঙ্গামাই সর্ব্বপ্রথম এদেশীয়দিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিতে শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ ইংরেজদের আগমনের পরে বাংলাদেশে ইহাই প্রথম বিপ্লব। দ্বিতীয় বার যখন বিপ্লব দেখা দিবে তখন পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারিব। অত্যাচারের মত কিছুই নহে! অত্যাচারের ফলে ইংলণ্ডে সেই গৌরবময় বিপ্লব আসিয়াছিল; বাংলাদেশেও নীলকরদের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের দরুন অর্দ্ধমৃত বাঙালী জাতি গা-ঝাড়া দিয়া উঠে এবং তাহার অসাড় দেহে আবার চেতনার সঞ্চার হয়।'

---

* কার্ত্তিক ১৩৫৬ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' উদ্ধৃত। এই সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' হইতে বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত ছয়টি প্রবন্ধে শিশিরকুমার ঘোষ সম্বন্ধে প্রথম যুগের 'অমৃত বাজার পত্রিকা', স্থির সৌদামিনীর স্মৃতিলিপি (এখনও অপ্রকাশিত), শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রমুখ সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচনা ও উক্তি এবং শিশিরকুমারের নিজস্ব গ্রন্থাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া আমি আলোচনা করি। —লেখক
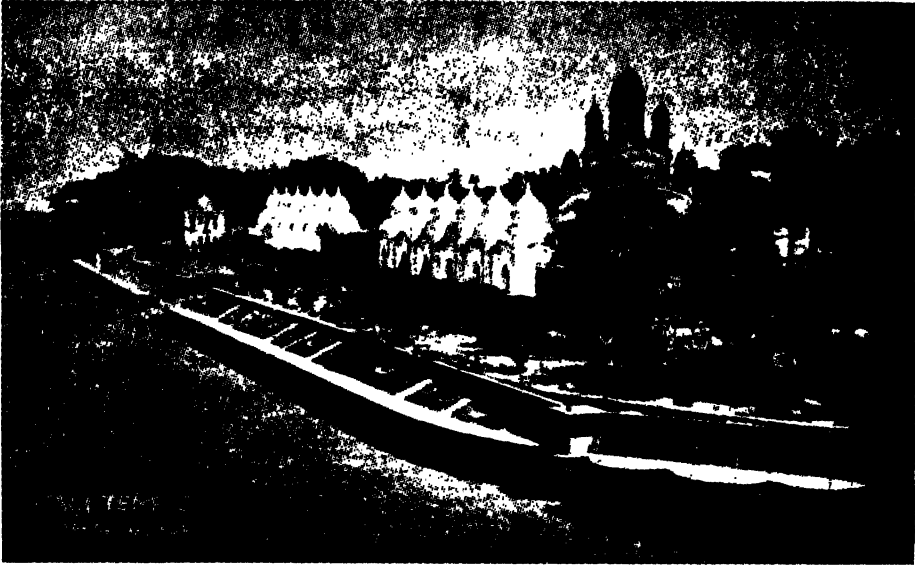
১২৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত পরমহংসদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন কালীমন্দির, অষ্টশাল ও দ্বাদশ শিবালয়

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

গ্রাম হিসাবে কলিকাতা নূতন নহে। এখানকার ঘোষাল বংশের ইতিহাসপ্রসঙ্গে কুলগ্রন্থে আট শত বৎসরাধিক প্রাচীন এই গ্রামটির উল্লেখ আছে।* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায়।† এখানে নগর গড়িয়া উঠে প্রায় দুই শত ষাট বৎসর পূর্ব্ব হইতে; কিন্তু নগর পত্তনের অনেক আগেই এখানে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখানকার বাঙালী জাতির প্রাচীন মন্দিরগুলিতে প্রধানতঃ তিনটি মূল রীতি দেখা যায়—(ক) নিজস্ব, (খ) মিশ্র, (গ) বৈদেশিক। এই মূল রীতিত্রয়ের সমগ্র উপবি-ভাগগুলি এখানে দেখা যায় না। এখানকার মন্দিরগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাদের গাত্রে অলঙ্করণ-বাহুল্য কিংবা পুত্তলিকাবিন্যাস বিরল। নিজস্ব রীতির ত্রিচূড় অষ্টশাল মন্দিরই এখানে বেশী। মিশ্ররীতির পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। একরত্ন বা আলগোছ টুঙ্গী নাই। বৈদেশিক রীতির মধ্যে উত্তর ভারতীয় ও বিলাতী পদ্ধতির দুই-একটি আছে। উৎকলীয় আদৌ ছিল না। বর্ত্তমানে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি খাঁটি উৎকলীয় রীতির মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমার আলোচনা বেশীর ভাগ মধ্য এবং উত্তর কলিকাতার প্রাচীন ও লিপিযুক্ত মন্দিরগুলিতেই নিবদ্ধ

শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের লেনে কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। উহা অষ্টশাল রীতির ত্রিচূড় ও আমলাযুক্ত একটি বিরাট মন্দির। মধ্যে তিনটি কক্ষের কেন্দ্রস্থটিতে বিশাল শিবলিঙ্গ ও পার্শ্বের দুইটির উত্তরস্থটিতে ধাতুময়ী দশভুজা দুর্গা এবং দক্ষিণ দিকস্থটিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে। দুই পাশের কক্ষ দুইটির দ্বারের উপর তিনটি আধুনিক লিপি ও মধ্যের শিবগৃহের দ্বারশীর্ষে প্রাচীন লিপি বর্ত্তমান। লিপিটি ধাতুফলকে উৎকীর্ণ;

* "পশুপতির সন্তানগণ কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কলিকাতাকে আমরা অনেক প্রাচীন গ্রাম বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। অন্ততঃ ন্যূনকল্পে আট শত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন"।—সম্বন্ধ নির্ণয় চতুর্থ পরিশিষ্ট পৃ. ২১। এই পশুপতি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম বাৎস গোত্রীয় ছান্দড় হইতে অষ্টম পুরুষ।

† "কালীঘাটা মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান, দুই কূলে বসাইল হাট। পাষাণে রচিত ঘাট, দুই কূলে যাত্রী ঠাট, কিঙ্করে বসায় নানা ঘাট।"—ভাগীরথীর তটবর্ণন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। পৃ. ২৯৫। বঙ্গবাসী সংস্করণ।

ইহার শেষভাগ আবৃত থাকায় পড়িতে পারা যায় নাই। লিপিটি এই :

শ্রীশ্রী৺রামেশ্বর ৺মন্দিরে প্রতিষ্ঠা সন ১০৬১ তাং ৩১শে চৈত্র শ্রীনন্দরাম সেন দাস সাং দীর্ঘ গঙ্গা হাং সাং সুতানটী সভাবাজার। শ্রী৺তুলসী মঞ্চে প্রতিষ্ঠা উক্ত ঠাকুর বাটী সন ১২৬১ সাল ৩১শে চৈত্র তস্য প্রপৌত্র শ্রীজগচন্দ্র সেন দাস প্রসিদ্ধ হাল কলিকাতা সভাবাজার। শ্রীশ্রী৺সীতানবমী ব্রত স্থাপন (নীচের দুই লাইন পড়া গেল না।)*

নন্দরাম সেকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন। মন্দিরের নিকট দশ বিঘা জমির উপর তাঁহার সাততলা বিরাট ভবন ছিল। সেকালের কলিকাতায় "নন্দরাম সেনের বাড়ী" একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার অন্যতম বংশধর শ্রীকমলাকান্ত সেন নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটে বাস করেন।

বহুবাজারে ১৮নং কেনডারডাইন লেনে মিশ্ররীতির তিনটি মন্দির আছে। মাঝেরটি নবরত্ন। পাশের দুইটি পঞ্চরত্ন। মন্দির তিনটির চূড়াগুলি বহু খাঁজযুক্ত। তিনটিই শিবমন্দির। পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন শিবমন্দির বাংলায় খুব কমই আছে। এই কলিকাতাতেই মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড সংযোগের নিকট আর একটি নবরত্ন শিবমন্দির অবস্থিত। মেদিনীপুরের কানাসোল গ্রামের ঝাড়েশ্বরের মন্দিরটিও নবরত্ন। শিবমন্দির প্রধানতঃ অষ্টশালই দেখা যায়, এইগুলি তাহার ব্যতিক্রম।

উক্ত মন্দির তিনটি ফোর্ট উইলিয়মের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশী নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাদের সম্মুখে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জলাশয়টি ভরাট করাইয়া বস্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি হইতে স্থানটির নামও মন্দিরতলা হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে কষ্টিপ্রস্তরের সুঠাম ৩৮´ বেধ ও ৫৯´ উচ্চতার শিবলিঙ্গত্রয় বর্ত্তমান। পাকড়াশী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও জামাতা ফুলিয়া মুখুটিবংশীয় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর ৬১-এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এল, মহাশয় মন্দিরগুলি সংস্কার করাইয়া উহাদের পশ্চিমেরটির গাত্রে নিম্নের লিপিযুক্ত মর্ম্মর-ফলক স্থাপন করেন।

"In 1765 this Navaratna Temple of Maheswaram has been founded by Dewan Trilokram Pakrasy, the ancestor of the present *Sevait* Satish Mukhopadhyaya, B.L., of 61 Wellington Street, Calcutta, who repaired the temple."

পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান রাজ্যপালের সহিত উক্ত মুখোপাধ্যায় বংশের সম্পর্ক আছে।

৩১.২নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে ৺নীলমণি বিদ্যালঙ্কার ৺নীলকণ্ঠ শিবালয় সন ১১৭৮ সালে স্থাপন করেন। প্রাচীন মন্দির এখন লুপ্ত। নূতন মন্দিরটি ছাদযুক্ত গৃহ।

শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দুর্গামণ্ডপের পশ্চিমে যে নবরত্ন মন্দির আছে তাহাতে বঙ্গীয় মিশ্র, মিশরীয় ও তুরস্কীয় রীতির বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। চূড়াগুলি কতকটা পিরামিডের ধরণের, উহাদের শীর্ষে তুরস্কদেশীয় খাঁজকাটা ক্ষুদ্র গম্বুজ, উপরের চক্রগুলি ষট্‌কোণ। মন্দিরগাত্রে কতকগুলি ফলকে মিশরীয় স্ফিংস্ ধরণের পুত্তলিকা আছে, কিন্তু ইহাতে কোন লিপি নাই। বর্ত্তমান রাজবংশধরগণের কেহ কেহ মনে করেন উহা রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। রাজা বাহাদুরের জন্ম ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ও মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইহা হইতে মন্দিরের বয়স কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত রাজবংশীয়গণ মন্দিরে মিশরীয় প্রভাব স্বীকার করেন। এইরূপ আর একটি মন্দির চিৎপুরে সিদ্ধেশ্বরীতলার পশ্চিমে আছে। উহাতে ঐ সকল মিশ্রণের সহিত জোড়বাংলা বা বিশাল ধরণের ছাদও বর্ত্তমান।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের শেষাংশের প্রাচীন মসজিদটির উত্তরে ৺মদনমোহন দত্তের পুত্রগণ প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ অষ্টশাল মন্দির অবস্থিত। ইহার শিবলিঙ্গ কলিকাতার মধ্যে বৃহত্তম। মন্দিরটির পশ্চিম দ্বারের শীর্ষে কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত নিম্নোক্ত সংস্কৃত লিপি আছে। লিপিটি বঙ্গাক্ষরে, অক্ষরগুলি সেকেলে হস্তলিপির ধাঁচের :

"অকোষধীশ ধরণীধরলিতঃশ্মি।
প্রখ্যাত শাক সময়ে পিতুরাজ্ঞয়ৈতৎ।
সংস্থাপিতং মদনমোহন দত্ত-
পুত্রৈর্দুর্গেশ্বরাখ্য শিবলিঙ্গমভূৎ সুসৌধে।

মর্ম্ম :—পিতা মদনমোহন দত্তের আদেশে তাঁহার পুত্রগণ ১৭১৬ শকাব্দায় উত্তম সৌধে দুর্গেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। লিঙ্গে পাদপীঠে "শ্রীরসিকলাল দাস দত্তঃ শ্রীহরলাল দাস দত্ত সন ১২০১ সাল" ও "শ্রীগদাধর দাস ভাস্করঃ" নামগুলি উৎকীর্ণ আছে। এই বিশাল লিঙ্গের স্থপতি যে একজন বাঙালী ইহা গৌরবের বিষয়। নিকটে মদনমোহন দত্ত লেন। ইনি হাটখোলার দত্তবংশীয় প্রসিদ্ধ জাহাজ-ব্যবসায়ী ছিলেন। খ্যাতনামা রামদুলাল

---

* পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি-এ, মহাশয় এক সময় লেখককে বলিয়াছিলেন, ঐ মন্দিরলিপিতে ভুল আছে। নন্দরামের দুই শত বৎসর পরে তাঁহার প্রপৌত্রের সময় দেখিয়া লিপি অভ্রান্ত নহে বলিয়া মনে হয়।

সরকার ইঁহারই প্রসাদে লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি-বলে ব্যবসায় চালাইয়া পরে বিরাট ধনী হইয়াছিলেন। মন্দিরচূড়া হইতে একটি বৃহৎ শৃঙ্খল লম্বমান।

স্ফূর্তিবাগান মন্দির স্ট্রীটের যে মন্দিরটির শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইবার পর ১৯২৬ সালে কলিকাতার কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহা আধুনিক উত্তর-ভারতীয় রীতিতে নির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত লিপিটি এই :

শকাব্দা ১৭২৫।
শাকে বাণ যুগাদ্রিচন্দ্র গণিতে মেষোনবিংশে দিনে।
বারেন্দুমিদুস্তত বিপ্রকুলজঃ সৌম্যং দশম্যাং তিথৌ।
শ্রীশ্যামাভিধকো দদৌ সুরধুনী ক্ষেত্রোপকণ্ঠে শিব।
শ্রীত্যৈ পুণ্যবতো মুদা স্বরিতয়োঃ পিত্রোঃ স্বয়ংবল্লভঃ।

লিপিপ্রস্তরে উৎকীর্ণ। মর্ম্ম :—শ্রীশ্যামা নামক ব্রাহ্মণ-পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় মাতা ও পিতার প্রী‌তির জন্য গঙ্গাতীরে ১৭২৫ শকাব্দার বৈশাখ মাসের ঊনিশে মঙ্গলবার দশমী তিথিতে শিব স্থাপন করেন। নূতন মন্দিরটি ছোটেলাল কানোড়িয়ার ধর্ম্মপত্নী শ্রীজানকীবাঈ সন ১৩৩২, ৬ই কার্ত্তিক প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠন্‌ঠনিয়া কালীমন্দিরের পাশে পশ্চিম দিকে যে অষ্টশাল শিবমন্দিরটি আছে, উহার অস্পষ্ট লিপি :

শ্রীমন্দিরে সমস্থাপি শ্রীমৎ পুষ্পীশ্বরঃ শিবঃ।
মন্দিরে শ্রীপ্রিয়াদাতা শকাব্দে হস্তিযুগে বসৌ। (?)
শকাব্দা ১৭২৮। সন ১২১৩ সাল, ১ বৈশাখ।

মর্ম্ম :—শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রিয়া দাসী উক্ত শকে শ্রীমৎ পুষ্পীশ্বর শিবস্থাপন করেন। নিকটে শ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার মন্দির শঙ্কর ঘোষ কর্ত্তৃক ১২১০ সালে নির্ম্মিত হয়। উহাতে বাংলা ভাষায় "শ্রীশ্রীদুর্গা। শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে" দুই পংক্তিতে লিখিত আছে।

কিছু দূরে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিব-মন্দিরে ঐরূপ বাংলা পদ্যাংশ :

"৺শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণজীউর শ্রীচরণ ভরসা।
শ্রীমধুসূদন সেনের হৃদয় মাঝে হর বিরাজে।
সন ১২৫৩ সাল।"

গড়পারের একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের ১২৫৭ সাল লিখিত। ঐরূপ বেথুন রো'র কালীমন্দিরে বাংলা পদ্য :

"শ্রীশ্রীনিস্তারিণী জয়তি।
কালিকে চরমকালে ভব রাঙ্গা পায়।
ঈশ্বরের মন-প্রাণ সকলি মিলায়।
শকাব্দা ১৭৮৭, সন ১২৭২ সাল।"

মন্দিরটি নবরত্ন; সোপানে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নাম ক্ষোদিত। প্রধান ফটকের দুই পার্শ্বে অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় অবস্থিত।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ও সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের সংযোগস্থলের ৺কেদারনাথ শিবের অষ্টশাল সন ১২৭৫ সালের ২রা মাঘ নির্ম্মিত।
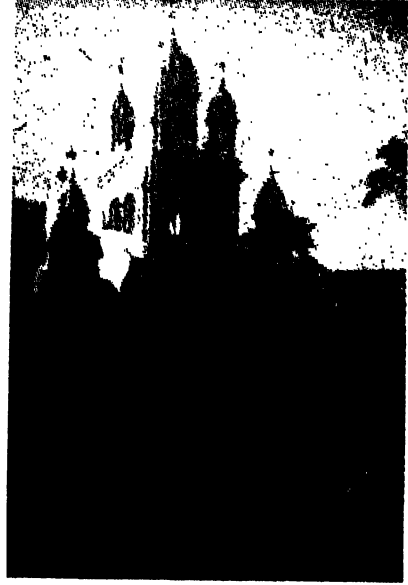
কলিকাতা বলরাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী মন্দির-সহ দুইটি অষ্টশাল শিবমন্দির [ফটো—পিছন দিক হইতে

কৈলাস বসু স্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের লিপি :

"মহেশ্বর মহেশোঽহং তৎপদাকাঙ্ক্ষিণা সদা।
প্রতিষ্ঠিতঃ শ্রীমহেশচন্দ্র সেনেন ভক্তিতঃ।

সন ১২৯০ সাল। মহেশ-পদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীমহেশ সেন কর্ত্তৃক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত।

শ্যামবাজার বলরাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ লিপিহীন নবরত্ন কালী-মন্দির ও অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় এবং নাট্যমন্দির উক্ত বলরাম ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র, দেওয়ান তুলসীরাম ঘোষের পৌত্র হরপ্রসাদ ঘোষের সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক সন ১২৯৫ সালের ৫ই বৈশাখ, বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবরত্ন মধ্যে হরপ্রসাদ কর্ত্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট তৈলচিত্রানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ শ্রীভবতারিণী দক্ষিণা কালীমূর্ত্তি কষ্টিপাথরে ও মহাকাল মর্ম্মরে নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত। ঐ সঙ্গে শ্রীধর শালগ্রামও আছেন। অষ্টশাল দুইটিতে শ্রী৺হরপ্রসন্ন ও শ্রী৺হরেশ্বর লিঙ্গদ্বয় বর্ত্তমান। হরপ্রসাদ অকালে পরলোকগমন করিলে তাঁহার পত্নী দয়াময়ী দাসী ও পুত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ সুঠাম মূর্ত্তি ও মন্দির বঙ্গে বিরল। সারদাপ্রসাদের পুত্র শ্রীভূপেন্দ্র

নাথ ঘোষ পৈতৃক রীতি অনুযায়ী দেবসেবায় যত্নশীল। মন্দিরগুলি তাঁহারা সংস্কার করাইয়াছেন।

পটলডাঙ্গা বেনিয়াটোলার প্রাচীন অষ্টশাল শিবমন্দির

বহুবাজার কপালীটোলার কালীমন্দির অষ্টশাল ও উচ্চ পীঠের উপর গঠিত। উহার লিপি :

"শ্রীশ্রীকালীমাতা জয়তি।
সেবায়ৎ শ্রীরাজকৃষ্ণ দাস ও ৺রামকৃষ্ণ দাস।
২৯শে ফাল্গুন সন ১২৯৬ সাল।"

পটলডাঙ্গা, বেনিয়াটোলার প্রাচীন অষ্টশালের পুরাতন দুইটি লিপির ফলক আচ্ছাদিতপ্রায় হইয়া দুষ্পাঠ্য হইয়াছে। নিম্নফলকের "শ্রীযুত জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ও শ্রীরমাকান্ত" নামগুলি কষ্টে পড়া যায়। এই শিবমন্দিরের কুট্টিমে যে আধুনিক মর্ম্মর-ফলক আছে তাহার লিপি :—৺সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিনী বাং ১৩৫১। শক ১৮৬৬ বিঃ সঃ ২০০১। ইং মে ১৯৪৪-এ সংস্কার করেন। অপর কোন মন্দিরে এরূপ সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার হয় নাই। মন্দিরের বর্ত্তমান মালিক বেনিয়াটোলা নিবাসী শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেবতার বহু অলৌকিক কাহিনী অবগত আছেন।

কলিকাতার নানাস্থানে যুগ্ম বা ততোধিক শিবমন্দির আছে। উহাদের কোনটিতেই লিপি দেখি নাই। আহিরীটোলার প্রাচীন অষ্টশালের লিপি বর্ত্তমান বিদেশী মালিকের কৃতিত্বে আবৃত। শোভাবাজারের গঙ্গার নিকটে একটি প্রাচীন সু-উচ্চ, থাঁজযুক্ত নবরত্ন আছে। উহাতে কোন দেবতা বা লিপি নাই। বাগবাজারের মোড়ের অষ্টশালগুলিও প্রাচীন। জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ মন্দিরটি পাইকপাড়া রাজবংশের লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। নগরের সকল মন্দিরের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

মন্দিরের মত কলিকাতার বহু প্রাচীন চকমিলান বাটীর উত্তর বা পূর্ব্বাংশে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। এরূপ মণ্ডপযুক্ত চকমিলান প্রাসাদের চারিদিকের দুই তলেরই অলিন্দে যুগ্ম স্তম্ভশ্রেণী থাকে। মণ্ডপে উঠিবার সোপান কোথাও মধ্যস্থলে গোলাকার, কোথাও বা সমগ্র মণ্ডপব্যাপী চতুষ্কোণ। মণ্ডপের কুট্টিমে দুই সারি স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভ আবার বহু ক্ষুদ্র স্তম্ভের সমষ্টি। কুট্টিমের মধ্যস্থলে উত্তর বা পূর্ব্বপ্রান্তে দেবতার বেদী। দুই তলেই দুই পাশে চারিটি বাতায়ন ও দ্বারযুক্ত কক্ষ। নীচের দক্ষিণের বা পূর্ব্বেরটিতে দেবীর বোধন হয়। অন্য দিকেরটি পূজকের বাসা বা ভাণ্ডার রূপে ব্যবহৃত। দ্বিতলের বাতায়ন হইতে ললনাগণ পূজা দেখেন। কোন কোন মণ্ডপের নিম্নাংশেও কয়েকটি কক্ষ থাকে। ছাদের কার্ণিসের কড়ির প্রান্তে সূক্ষ্ম দারুশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। ইহাই বাংলার প্রাচীন সৌধনির্ম্মাণ রীতি। কোন কোন মণ্ডপে লিপিও আছে। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে প্রিন্স দ্বারকানাথের বসতবাটীর মণ্ডপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমলে "ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি বৈদিক বচনসমূহ উৎকীর্ণ হইয়াছে। তদবধি এখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মে ব্রহ্মোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। ১১ই মাঘ এখানকার প্রাঙ্গণেই মাঘোৎসব হয়। দ্বারকানাথের আমলে মণ্ডপে সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হইত।

১০নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের মিত্রবাটীর মণ্ডপে নিম্নোক্ত লিপিটি আছে :

"আর্য্যমিত্রেণ মিত্রেণ রাধাকৃষ্ণেন যা পুরা। প্রবর্ত্তিতা মহাপূজা শারদীয়াত্র মণ্ডপে। অবিচ্ছিন্না চ যা তস্য পুত্র পৌত্রাদিভিঃ কৃতা। জগদম্বা প্রসাদেন প্রাপ্তা সাস্ত শতং সমাঃ। ১৮৩১ শকাব্দাঃ।

মর্ম্ম :—রাধাকৃষ্ণ মিত্র যে দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন, তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ কর্ত্তৃক চলিয়া বিশ্বমাতার কৃপায় ১৮৩১ শকে শতবর্ষ পূর্ণ করিল। এই মিত্রবংশ ধনকুবের রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ জামাতার ধারা।

উত্তর কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরগুলিও প্রাচীন রীতির। উহার নিকটে আরও এক স্থানে দ্বাদশ শিবালয়াদি আছে।

মহানগরীর এই সকল মন্দির ও মণ্ডপ বাঙালীর প্রাণের দেবতার পীঠ। এগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কল্যাণকর রুচির পরিচয় বহন করিতেছে। বর্ত্তমান পরিবেশে এগুলির উপযোগিতা অনুধাবন করা কঠিন। জাতি আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠুক।

পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের উপার্জ্জনের পথ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা শহরের উপর ছোট-বড় অনেক মহিলা-সমিতি বা মহিলা-পরিষদ আছে। ইহাদের কোন শাখা-প্রশাখা পল্লী অঞ্চলে আছে কিনা জানি না এবং যদি থাকে তাহারা পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কি ভাবে চেষ্টা করিতেছে অথবা তাঁহাদের কি ভাবে সাহায্য করিতেছে সে সম্বন্ধে নিজের কোন জ্ঞান নাই।

বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখন সেখানকার মহিলা-সমিতির কার্য্যাবলীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ফরিদপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (অধুনা স্বর্গত) মিঃ জে. এন. রায়ের পত্নী শ্রীমতী কনকলতা রায় এই মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা ছিলেন; ইনি পরলোকগত ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যা।

ফরিদপুর এবং অন্যান্য বহু জেলার পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ পুরাতন কাপড় দ্বারা যে সকল কাঁথা প্রস্তুত করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকল কাঁথা পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণের "শিল্পীমনে"র যথেষ্ট পরিচয় দেয়। পুরাতন কাপড়ের পাড়ের সুতার সাহায্যেই এই সকল কাঁথা প্রস্তুত হয়। কাঁথাগুলির উপর নানা রঙের নানা রকমের চিত্র থাকে। অনেক সময়ে দূর হইতে কোন কোন কাঁথাকে 'শাল' বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল কাঁথা দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং দেশ-বিদেশের বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলের "কাঁথা-শিল্পে"র কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পল্লী অঞ্চলের বহু শিল্পকলা যেমন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে "কাঁথা-শিল্প"ও সেই অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

এই সকল কাঁথা দেখিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়ের মনে হয় যে, যে সকল স্ত্রীলোক এইরূপ কাঁথা প্রস্তুত করিতে পারেন তাঁহারা অনায়াসেই নূতন কাপড় এবং নূতন সুতার সাহায্যে নানা রকম ডিজাইনের 'বেড কভার' (বিছানার ঢাকনি), 'টেবিল ক্লথ' (টেবিলের ঢাকনি) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। ফরিদপুরের মহিলা সমিতির কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রধান কাজ ছিল—পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ স্ত্রীলোকগণকে 'বেড্ কভার', 'টেবিল ক্লথ' প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করা। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার এ. টি. ওয়েষ্টন শ্রীমতী কনকলতা রায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরিদপুর মহিলা সমিতির অধীনে এক জন মুসলমান যুবক নিযুক্ত হয়। ইহার নাম ছিল মকবুল মৃধা। শিল্প-বিভাগ হইতে ইনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন। আমার উপর পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ স্ত্রীলোক নির্ব্বাচনের ভার ছিল।

শ্রীমতী কনকলতা রায় নূতন কাপড়, নানা রঙের নূতন সুতা এবং নানারকমের 'ডিজাইন' আঁকিয়া মকবুলকে দিতেন। 'বেড কভার' বা 'টেবিল ক্লথের' কি 'সাইজ' হইবে, প্রত্যেকটি কি 'ডিজাইনের' হইবে ইত্যাদি তিনি মকবুলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন। পল্লী-অঞ্চলের নির্ব্বাচিত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে মকবুল কাজ বণ্টন করিয়া দিতেন এবং বণ্টনের সময় কি ভাবে কাজ হইবে তাহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া বলিতেন। স্ত্রীলোকগণ যখন কাজ করিতেন, মকবুল যাইয়া দেখিতেন কাজ ঠিকভাবে হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকের কাজ শেষ হইলে মকবুল তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়কে দিতেন। তখন তিনি প্রত্যেক কাজে কত কাপড় লাগিয়াছে, কত সুতা লাগিয়াছে এবং প্রত্যেককে কাজের জন্য কি পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহা হিসাব করিয়া প্রত্যেক জিনিষের (বেড্ কভার বা টেবিল ক্লথ) মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেন। এই সকল জিনিষ কলিকাতায় হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনে প্রেরিত হইত এবং তাহারাই উহার প্রধান বিক্রেতা ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী কনকলতা রায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বহু জিনিষ নিজে বিক্রয় করিতেন। যে সকল উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী ফরিদপুরে যাইতেন তাঁহারাও শ্রীমতী কনকলতা রায়ের নিকট হইতে না কিনিয়া পারিতেন না। এই কাজের ফলে ফরিদপুর শহরের নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলের প্রায় দুই শত জন দুঃস্থ স্ত্রীলোক মাসিক দশ টাকা বিশ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ যাহা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ শ্রীমতী কনকলতা রায়ের ফরিদপুর হইতে চলিয়া আসিবার পর ফরিদপুর মহিলা সমিতির মৃত্যু ঘটে। আবার প্রায় দুই শত জন স্ত্রীলোককে দুঃখকষ্টের জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।

এইরূপ কত রকমের কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া পল্লী-অঞ্চলের কত দুঃস্থ স্ত্রীলোককে স্বাবলম্বিনী করিয়া তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারা যায়। কিন্তু করে কে? আমরা বড় বড় পরিকল্পনা লইয়াই ব্যস্ত; ছোট ছোট পরিকল্পনায় আমাদের যে মন উঠে না।

জরা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরাও বিপুল সম্ভাবনায় ভরা।
তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।
শক্তি তখনো ধরে—
স্মৃতির কোমল স্বর্ণে সে পুনঃ
নব মৌচাক গড়ে।

২

জরাই করায় সর্ব্বারম্ভ ত্যাগী,
মানুষকে করে চকোরের সুখভাগী।
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্ম্মে ও ফলে ছুঁয়ে নাই অধিকার।
পাষাণ হইয়া এ থাকায় আছে সুখ
রামচন্দ্রের পেতে পারে পদযুগ।
দেবীকে রাখে না দূরে—
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে।

৩

করে তনু হতে অর্দ্ধমুক্ত মন—
অনাস্বাদিত রসের আস্বাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি'
নিশীথ-রাতের সূর্য্যোদয়ের লাগি।
এই জীবনের জরা অজ্ঞাতবাস,
অভিষেকের সে এনে দেয় আশ্বাস।
শোষ্যা সে নয় নয়,
বিশীর্ণা রেবা প্রত্যাসন্ন
মুক্তির কথা কয়।

৪

গুটি কেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি,
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রস্তুতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
সুধার তৃষ্ণা করে তারে চঞ্চল।
সদাগর তার কমায় পণ্যভার
তুফানের পথে পাড়ি তার নৌকার।
ভাবে সে ক্ষণে ক্ষণ—
ভরা গঙ্গার তরঙ্গে সব
রূপের নিরঞ্জন।

মায়ের কোল

শ্রীকালিদাস রায়

বহু সঙ্গী মিলে হেথা করিলাম নানা রঙ্গে খেলা।
পশ্চিমে ঢলেছে সূর্য্য, ঝিকিমিকি বেলা।
পাখীরা গাহিছে গাছে দিনান্তের গান।
বধূরা 'জলকে চলে', মাঠ হ'তে ফিরিছে কৃষাণ।
ঘরমুখো গরুগুলি, শূন্য হ'ল মাঠ,
থেমে আসে কোলাহল, ভেঙ্গে যায় গ্রামান্তের হাট।
হেলাভরে করি খেলা, এবে ক্ষণে ক্ষণে
মা'র কথা পড়ে শুধু মনে।

সঙ্গীরা সবাই নাই, অনেকেই ফিরিয়াছে ঘরে,
মার কোলে বসি তারা বুঝি গল্প করে।
ক্লান্ত হ'ল দেহ-মন। মন আর লাগাতে না পারি,
তবু খেলে যাই কেন? জিতিনাকো শুধু যাই হারি।
ধরিয়া রেখেছে মোরে নূতন খেলুরা অকারণে।
মার মুখ পড়ে শুধু মনে।

অনেকে ফিরেছে ঘরে। এসেছে নূতন সব সাথী,
সাধ যায় তাহাদের সাথে রই মাতি।
রোদের নাইক তেজ, ঝিকিমিকি বেলা,
আজিকার মত তবে সাঙ্গ হোক খেলা।
খেলা ভালো লেগেছিল, খেলা মোর মনটি ভুলালো।
তবু ভাবি এর চেয়ে মায়ের কোলটি আরো ভাল।
মোর পথপানে চেয়ে আছে মা যে তৃষিত নয়নে,
মায়ের কোলটি পড়ে মনে।

নিউ জারসীর, ওয়েষ্ট অরেঞ্জ-এ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত, প্রথম চলচ্চিত্র ষ্টুডিও

ঃ১৫ খ্রীষ্টাব্দের, নির্ব্বাক চলচ্চিত্রের যুগের একটি ষ্টুডিও
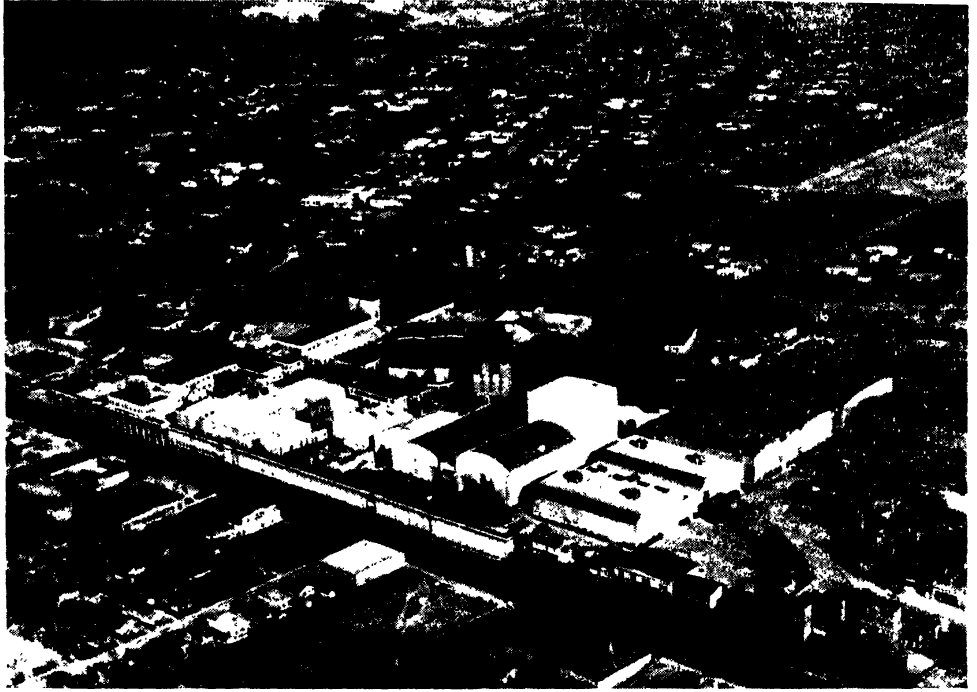
এরোপ্লেন হইতে ক্যালিফোর্ণিয়ার কালভার সিটির মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার ষ্টুডিওর দৃশ্য

আধুনিক চলচ্চিত্রের ফিল্ম তোলার দৃশ্য

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৩

পরের দিন বাইরের ঘরে বসে প্রভাত ফর্দ্দ তৈরি করছিল—একখানি রিকশার টুং টুাং আওয়াজ তার কানে এল। গাড়ীটা ওদের দরজায় এসে থামল। কৌতূহলী প্রভাত মুখ তুলে দেখলে এক অবগুণ্ঠনবতী বর্ষীয়সী ওদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছেন। বেশ দোহারা চেহারার গৌরবর্ণ এক মহিলা—পায়ের গতির সঙ্গে কিছু আভিজাত্য বহন করে চলেছেন। পরিচিত কোন আত্মীয়ার সঙ্গে ওঁর সাদৃশ্য প্রভাতের মনে জাগছে না—অথচ উনি শোকে সহানুভূতি দেখাতে এসেছেন—এটি নিশ্চিত। অনতিবিলম্বে লক্ষ্মী এসে সন্দেহভঞ্জন করলে। বললে, দাদা—মেজ জ্যেঠাইমা এসেছেন। বড়বাড়ীর মেজ জ্যেঠাইমা।

এঁ্যা! প্রভাতের বিস্ময় কাটলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা ভাল আসন পেতে দে—আর—,আর যে কি করা উচিত প্রভাত ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ওর আনন্দকে ছাপিয়ে লজ্জাটা প্রবল হয়ে উঠল। যে সঙ্কোচবশে অনিমেষকে কোন দিন বাড়ীর মধ্যে আহ্বান করতে পারে নি তারই আঘাতে সে বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। কেন এলেন মেজ জ্যেঠাইমা?

একটু পরেই মেজ জ্যেঠাইমা এ ঘরে এলেন। বললেন, এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন বাবা? এ ত আমার খাতির কুড়োবার জায়গা নয়—লৌকিকতা করতেও আসি নি।

তবু আপনি এসেছেন—। কৃতজ্ঞতায় প্রভাতের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হ'ল—চোখের কোল হ'ল বাষ্পাচ্ছন্ন।

মেজ জ্যেঠাইমা বললেন, না এসে যে পারলাম না বাবা। আমরা প্রতিবেশী—পরস্পরের বিপদে আপদে যদি সাহায্য না করি তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? বস তুমি—স্থির হও।

দু' চোখের বাষ্প তরল হয়ে গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। প্রভাত উঠে এসে প্রণামের ভঙ্গী করতেই উনি বললেন, অশৌচে প্রণাম করতে নেই—এমনিতেই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি। এখন আর সব চিন্তা রেখে কি করে দায় উদ্ধার হবে সেই কথা ভাব। অবশ্য উপায় একটা করবেনই ভগবান।

আমি একটা কাজ সেরে আসব মেজ জ্যেঠাইমা, লক্ষ্মী বললে।

সে কি রে—আমি কি এখনই যাচ্ছি যে, ঠাকুর দেখার মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি অবাক হয়ে।—পরে প্রভাতের পানে চেয়ে বললেন, একটি অনুরোধ তোমাকে আমি করব বাবা, বল রাখবে?

বলুন।

মানে আর বুঝে শ্রাদ্ধে খরচ করবে। লোকের কথায় নেচে দানসাগর, বৃষোৎসর্গ করবে না বল।

দানসাগর? সে সাধ্য আমার কোথায়? কোন রকমে তিল-কাঞ্চন সেরে দায়মুক্ত হতে চাই।

বেশ ত—কিছু কম লোক খাওয়ালে বা খাট পালং দান না করলে, কি বৃষ না দাগলে পূর্ব্বপুরুষেরা কিছু কম উঁচুতে উঠবেন না। আমি শুনেছি—মানুষের নিজের কর্ম্ম অনুসারে যে ফল ভোগ করতে হয় তারই জের শুধু সঙ্গে যায়। নইলে যতই সোনা উৎসর্গের আড়ম্বর কর না কেন—এমন কোন যন্ত্র নেই যা মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে তুলতে পারে।

জানি মেজ জ্যেঠাইমা—আসল জিনিস হ'ল শ্রদ্ধা-ভক্তি যা মানুষকে বহু থেকে একের আশ্রয়ে নিয়ে যায়—ক্রমে সেই একও বাকি থাকে না। যাই হোক—সে সব বড় সাধনার কথা আমরা আলোচনা করতে পারি না—কেননা আমরা বুঝি অল্পই।

লক্ষ্মী বললে, আচ্ছা মেজ জ্যেঠাইমা—এ জন্মের কর্ম্ম আর এক জন্মে কেন মানুষ ভোগ করে? দেহটা ধ্বংস হলেও—

মেজ জ্যেঠাইমা হেসে বললেন, এ ত আমার কথা নয় মা, —যাঁরা অনেক জানেন, অনেক বোঝেন—পণ্ডিত আর ধার্ম্মিক মানুষ—ঋষি যাঁরা—তাঁরাই বলেন, দেহটা খোলস মাত্র—আত্মা অবিনশ্বর—বার বার কর্ম্ম অনুসারে আত্মা সেই খোলস বদলায়। গীতায়ও ত বলেছে—জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরিধানের মত আত্মা নিয়তই খোল বদল করছেন।

কিন্তু আত্মাকে ত দেখা যায় না।

দেখা ত অনেক জিনিসই যায় না—তাতেই কি মেনে নেওয়া যায় জিনিসটি নেই? আচ্ছা বল ত বাতাসের কি রূপ? আবার এমন অনেক জিনিস দেখেছ—যার রূপ বলতে পার না তুমি।

কিন্তু বাতাসকেও অনুভব করা যায়।

আত্মাকে অনুভব করা যায়, সে অনুভূতি তোমার আমার হয়ত আসে না, কিন্তু যাঁরা পরাবিদ্যার পণ্ডিত—তাঁরা জানেন এ সব।

আমি শুনেছি এই আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হয় না, আগুনে পোড়ে না, বাতাসে বিকৃত হয় না। পদ্মপাতায় যেমন জলের দাগ লাগে না—কিছুই তাতে লেগে থাকে না। তবে কেমন করে জন্মান্তরের কর্ম্মফল সে বয়ে নিয়ে যায়—আর যে স্মৃতি, যে বাসনা এক জন্মে তার কর্ম্মের ফল ভাবী

করে তা জন্মান্তর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে? প্রভাত প্রশ্ন করলে।

মেজ জ্যেঠাইমা বললেন, সেকথা কি আমিই বুঝিয়ে বলতে পারি? তবে যেমন শুনেছি—কথক ঠাকুরের মুখে—সেই মত বলছি শোন। এক দিন কর্ম্ম আর কর্ম্মফল নিয়ে কথা হচ্ছিল। জন্মান্তরের বাসনা কেমন করে আত্মাকে আশ্রয় করে জীবকে সেই কর্ম্মফল ভোগ করায় তারই কথা হচ্ছিল। কথক ঠাকুর বলেছিলেন, দেহ নষ্ট হলেও বাসনা নষ্ট হয় না। এর একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি শোন। যেমন ধর, একটা রুমালে কয়েকটা গোলাপ ফুল মুড়ে নিয়ে এসেছ। দু'দিন পরে ফুলগুলি শুকিয়ে গেলে যখন ফেলে দিলে রুমাল থেকে—তখন ফুল রইল না তো? কিন্তু গন্ধও কি লেগে রইল না সেখানে? তেমনি বাসনা, ওই গন্ধের মত।

প্রভাত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু আত্মা কি করে নবজন্ম গ্রহণ করেন? তিনি তো আকারহীন কোন পদার্থ—

আমাদের দেহটা পঞ্চভূতে গড়া মান তো? বেশ। এখন কথা হচ্ছে এই আধারে আত্মা কি করে আসেন? আমাদের শাস্ত্রে বলে—দেহ ক্ষয় হলে আত্মা ব্যোম আশ্রয় করে। ব্যোমে জল-সঞ্চারী মেঘের সঙ্গে মিশে বৃষ্টিধারায় সে নেমে আসে পৃথিবীতে। সেই মাটিতে দেহ ধারণোপযোগী শস্য জন্মায়। শস্যাঙ্কুরে আশ্রয় নেয় আত্মা—সেই শস্য-কণা মানুষের রক্ত মাংস মজ্জাদি পোষণ করে।

লক্ষ্মী খুশী-উপচানো স্বরে বললে, বাঃ সুন্দর তো! আমায় এই রকম কথা কিছু শোনাবেন মেজ জ্যেঠাইমা।

সব কথা সব সময়ে কি ভাল লাগে না। মনের অবস্থায় কথা কখনও কান দিয়ে মনের মধ্যে পৌঁছয়, কখনও বা আর এক কান দিয়ে বার হয়ে যায়। জ্ঞানীরা বলেন, কিছুই নাকি নষ্ট হয় না পৃথিবীতে। সিপ্রা সেদিন কি একটা বই থেকে পড়ে শোনালে—আশ্চর্য্য কথা। নাকি আজ অবধি পৃথিবীতে যত দেশের যত মানুষ জন্মেছে—তারা যত কথা বলেছে—যত কেঁদেছে, হেসেছে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে—সবই পৃথিবীর বায়ুস্তরে রেকর্ড করা রয়েছে। যেমন কথা বা গানের ধ্বনিতে রেকর্ড তৈরী হয় আমরা গ্রামোফোনে তা অবিকল শুনি। তেমনি শক্তিমান যন্ত্র তৈরি হলে ইতিহাসের অনেক সত্য আমরা বুঝতে পারব। যাই হোক—কর্ম্ম অনুসারে যে ফল এ তো আমরা হাতে হাতে দেখছি!—মেজ-জ্যেঠাইমা হাসলেন। একটু থেমে বললেন, আমাদের বাড়ীটাকেই দেখ না।

আপনি তো কত বোঝেন—আপনি কেন—

ঠেকাতে পারি না। কেমন করে পারব না—কর্ম্মফল খণ্ডন করার সাধ্য তো আমার নেই। যাঁরা বাসনার বশে অলক্ষ্মীর সেবা করলেন—তাঁরা লক্ষ্মীর প্রসন্নতা আশা করবেন কোন মুখে? আমাদের বড় হলঘরে তো গেছ—ওই ঘরেই লক্ষ্মী-বিদায়ের বাজনা প্রথম বেজেছিল। সেই সর্ব্বনাশা ধ্বনি আমি চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারি নি। কেন জান?

খানিক চুপ করে মেজ জ্যেঠাইমা কি যেন ভেবে নিলেন। পরে বললেন, শুনেছ তো ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গল্প। পথ ভুলে ক'জন মেছুনি এক দিন এক বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল রাত্রিকালে। সে বাগানে নানা জাতীয় ফুলের গাছ—রাত্রিকালে সেই সব ফুল ফুটে এমন গন্ধ বার হচ্ছিল যাতে করে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় নন্দনকাননের মধ্যেই বুঝি এসে গেলাম। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত মেছুনিরা ঘুমুতে পারে নি সেই সুন্দর গন্ধে। ওদের মাছের চুবড়িতে ছিল আঁসটে-গন্ধওয়ালা ন্যাকড়া—তাই শিয়রে রেখে তবে তারা ঘুমোতে পারে। আমাদের বাড়ীটাতেও···আচ্ছা আর এক দিন বলব সে কথা। আজ অনেক বকেছি—এখন উঠি, কেমন?

উঠবেন! প্রভাত যেন বাস্তব জগতে ফিরে এল। আরও কিছু বলুন না এই রকম কথা—ভারি ভাল লাগছে।

পাগল ছেলে! এ সব গল্প বেশী শোনে না।

কেন—বেশী শুনলে সংসার ভাল লাগবে না?

না বাবা—শ্মশান-বৈরাগ্য আর আসল বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ সে আমি জানি। তবে যখন কোন কিছুই ভাল লাগছে না—সংসারে টানাটানি—উপার্জ্জন কম—জীবনের সাধ-আশা মনে হচ্ছে, সবই নষ্ট হয়ে গেল—তখন এ সব কথা শোনাতেও অকল্যাণ হয়। এসব কথা শুনলে কেমন একটা আলস্য যেন মনকে ভরিয়ে তোলে—কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় সংসারের বাইরে, সবাইকে ফেলে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা—এইটে প্রবল হয়ে ওঠে। এ ভাব সন্ন্যাসের মত—কিন্তু সন্ন্যাসীর নয়। এই কাজ থেকে, কর্ত্তব্য থেকে পালানোর ভাবটাই মানুষকে নষ্ট করে দেয়।

তা হলে দুঃখ ভোগ করাটাই বুঝি—

কিসের দুঃখ? যত দিন যাবে বুঝবে—দুঃখ স্থায়ী নয়—যেমন নদীর জল বয়ে চলেছে তেমনি দুঃখের স্রোত। যখন ঢেউ লাগে তখনই তা বুঝি—যখন ঢেউ চলে যায় তখন আনন্দ হয়। যেমন অন্ধকার মানে একেবারে আলোর অভাব নয়, কিছু কম আলো; তেমনি দুঃখ মানেও সাগর-পরিমাণ দুঃখ নয়—কিছু কম সুখ। আসলে সুখ বা দুঃখ ওই জলের স্রোত—এক জায়গায় কখনও থাকে না।

লক্ষ্মী বললে, ঠিক বলেছেন জ্যেঠাইমা—কাজ করতেই হয়। পিঁপড়েকে দেখ—মৌমাছিকে দেখ—পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ার—

দেখ প্রভাত, মেয়ে আমার কত বোঝে। দুঃখের জঞ্জাল ঠেলে ফেলা যায় শুধু কাজের হাতিয়ার দিয়ে। মেয়েদের

কাজ তাই অফুরন্ত—আপারও অবশ্য শেষ নেই। আমরা যদি ভেঙে পড়তাম—তা হলে হা-অন্নের সংসারে লক্ষ্মী-পুজোর আয়োজন করত কারা! আচ্ছা, উঠলাম।

প্রভাত বললে, একটা কথার উত্তর দিয়ে যান। আমাদের শাস্ত্র কি বলে মৃত্যু সম্বন্ধে। কোথায় যায় মানুষ—

এক দিন নচিকেতা এই প্রশ্ন করেছিলেন যমরাজকে।

কি উত্তর দিয়েছিলেন যমরাজ?

মৃত্যুর দেবতা তিনি—তিনি শুধু জানেন এই তাঁর কর্ত্তব্য। যে দেবতা সব কিছু সৃষ্টি করেন—যে দেবতা পালন করেন—যিনি ধ্বংস করেন—তাঁরাও নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে যান শুধু। কেন সৃষ্টি স্থিতি, কেনই বা লয়—এই জ্ঞানের অধিকারী মাত্র এক জন—নিয়ামক শুধু তিনিই—সেই পরম পুরুষকে জানবার জন্যই কর্ম্ম ভক্তি বা জ্ঞানমার্গের তপস্যা।

কেউ জেনেছেন তাঁকে?

জেনেছেন বৈ কি—কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি বা প্রকাশ করার ক্ষমতা কৈ—যে তাঁকে জানতে পারব বা জানাতে পারব।

ওসব কথা থাক প্রভাত। তোমাদের অঙ্ক কষার যেমন নিয়ম আছে এসব আলোচনারও তেমনি নিয়ম আছে। এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনো না থাকলে—

তা হলে আমাদের এই শিক্ষা কিছুই নয় বলছেন?

তাই কি বললাম, তুমি সাহিত্যের ছাত্র হয়ে যদি বিজ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝতে পার, যদি দর্শন তোমার কাছে শক্ত ঠেকে সে দোষ নিশ্চয় তোমার সাহিত্য-শিক্ষার নয়।

সে ঠিক—যার যা লাইন—

শিক্ষার কথায় একটা কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে ওদেশের কোন সায়েব নাকি বেড়াতে এসেছিলেন আমাদের দেশে। তিনি শুনেছেন এ দেশে শিক্ষার প্রসার নেই—বিশেষ করে মেয়েরা সবাই প্রায় অশিক্ষিত। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার কৌতূহল নিয়ে সায়েব গেলেন এক গরীব কেরাণীর ঘরে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে আশ্চর্য্য হলেন। তার পর তিনি চিঠি লিখলেন তাঁর স্ত্রীকে—তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, যা শুনে এসেছি এতকাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, তা সম্পূর্ণ ভুল বলেই মনে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কি একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে—মস্ত বড় একটি সংসার চালাচ্ছে কি সুন্দর ভাবে। মেয়েটির মা শয্যাগত রোগী—বাপ করেন আপিসে চাকরি। আরও দুটি ছোট ভাই-বোন তাদের খাওয়ানো আদর আব্দার মেটানো এ-সবও আছে। আশ্চর্য্যের কথা—ওইটুকু ছোট মেয়ে বাপকে আপিসের খাবার দিলে। ছোট ভাই-বোন দুটিকে নাওয়ালে, খাওয়ালে—মাকে পথ্য দিলে। যেমন যন্ত্র চলে নিখুঁত—তেমনি অনায়াসে একটি দিন সুশৃঙ্খলায় চালালে সংসার। তুমি কি এখনও বলবে, এ মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা নেই? বই পড়ে নি বলে সে সংসার চালনার দায়িত্ব বহন করতে পারে না? এমন সম্পূর্ণ শিক্ষা আমাদের দেশে ত চোখে পড়ে নি—যে শিক্ষায় সংসার চলে এমন অনায়াসে। বলতে বলতে উনি সদর-দরজায় এলেন। হেসে বললেন, তাই বলে মনে করো না আমি বই পড়ার নিন্দে করছি, শিক্ষার যে আর একটা দিক আছে—যেটা জীবন-যাপনের পক্ষে বেশী দরকারী সেইটিকে বাদ দেওয়া যায় না—শুধু তাই বলছি।

উনি চলে গেলে প্রভাত লক্ষ্মীর পানে চেয়ে হাসল। বললে, কথাটা আমাদের পক্ষেও খাটে—কি বলিস?

সন্ধ্যাবেলায় তক্তপোষে বসে বসে প্রভাত ঐ সব কথাই ভাবছিল। শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তার অর্থ আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে। মন থেকে অনেকখানি গ্লানিও গেছে মুছে। জীবনে নানান সমস্যা আছে,—ঘটনার চাপে গ্রন্থিবদ্ধ হয় সেই সব সমস্যা—তাদের ছায়ায় পথ হয়ে যায় অন্ধকার—সরল পথ বহু শাখা-বাহু মেলে বিভ্রান্ত করে পথিককে।...

টুং টুং টুং। একখানা রিক্সা যেন অদূরে থামল। প্রভাতের চিন্তাভঙ্গ হ'ল। জানালা দিয়ে দেখলে একখানা রিক্সা থামল গিয়ে তেতলা বাড়ীটার সামনে। রিক্সা থেকে নামলেন স্থূল-বপু দীর্ঘকায় এক মানুষ। অত্যন্ত বিস্ময়ে প্রভাত লাফিয়ে উঠল তক্তপোষ থেকে। এ মানুষকে যে প্রভাত ভাল করেই চেনে! অভিজাত-গর্ব্বী বংশ-কৌলীন্য-গৌরব-পুষ্ট ইনি কেন এসেছেন—কাঞ্চন-কুলীন অর্দ্ধেন্দু রায়ের কাছে! এ কি নিমন্ত্রণের ব্যাপার অথবা—? কৌতূহলী হয়ে পুরো আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল প্রভাত। আধ ঘণ্টা আগে যেমন শ্লথ ভঙ্গিতে ও-বাড়ীতে ঢুকেছিলেন ত্রিলোচন সেন তেমনি ক্লান্ত পা টেনে বেরিয়ে এলেন। অর্দ্ধেন্দু রায় উজ্জ্বল হাসির দ্বারা ওঁকে প্রত্যুদ্গমন করেছিলেন—বিদায়ও দিলেন উজ্জ্বল হাসি দিয়ে। ত্রিলোচন সেনের মুখখানা দেখা গেল না, রিক্সা ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটিকে বহন করে টুং টুং শব্দে ফিরে চলল।

৩৪

ডিসেম্বর প্রায় শেষ হয়ে এল। আর একটা দিন মাত্র বাকি। সকালটা কেমন শ্রীহীন লাগছে। কাল হয়তো সে স্বপ্নই দেখেছে, কিন্তু তা সুখ-স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন নয়। তারই মনের চিন্তা নানা গলি ঘুঁজি দিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছবার জন্য প্রাণপণ করেছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে মরেছে সে। এত সঙ্কীর্ণ তার জগৎ! গলির এ প্রান্তে একটি আধুনিক সৌধ আর মাঝখানে একটি পুরাকালের প্রাসাদ—বন্দীশালার দু' প্রান্তে দুটি কটক—দুটিই রুদ্ধ। মাথার উপরে আকাশ নেই—পায়ের তলায় মাটি নেই—চারিদিকে আছে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আজকের সকালটা পর্য্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে।

এখনও কেউ ওঠেন নি। কলে জল এসেছে—তার ধারার

খোয়া ওঠা রোয়ের পরে হড় হড় শব্দ উঠছে—কি বিশ্রী শব্দ! কলটা বন্ধ করে ও পথে বেরিয়ে পড়ল। শীতের সকাল—গলিটা এখনও নিযুপ্ত। বন্ধ জানালার ফাঁকে আলোর রেখা—একটা তরল ধোঁয়ার চাদর, শীতেরই বাষ্প যেন—গলিটা সেই চাদর মুড়ি দিয়ে আলস্য উপভোগ করছে। প্রভাত বার দুই গলিটা পরিক্রমা করলে। গলিটা ক্রমাগত পাশ ফিরেছে। কোন বাড়ীর অঠরে কচি ছেলের কান্না, কোনটায় বা বুড়ো মানুষের কাসি—কোনটায় প্রভাত—স্তোত্র পাঠে স্মরণীয়া পঞ্চকন্যা ও পঞ্চ পুণ্যশ্লোকের নাম ধ্বনিত হয়ে উঠল। এখনি কল-তলায় বাসনের ও বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে ঝি-এর কড়া-মাজার কর্কশ ধ্বনি উঠবে। কয়লা-ভাঙার শব্দে—আর উনুনে আঁচ দেওয়ার ধোঁয়ার ঘন জালে গলিটা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে।

গলির ও-মোড় থেকে বেরুলেন এক ভদ্রলোক—সর্ব্বাঙ্গ তাঁর আলোয়ানে ঢাকা। মাথার উপরে আলোয়ানটা ঘোমটার মত রয়েছে—চলার সঙ্গে সঙ্গে খসে খসে পড়ছে মাথা থেকে—বাম হাত দিয়ে আবার সেটা উঠিয়ে দিচ্ছেন। চলতে চলতে তিনি প্রভাতের সামনে এসে পড়লেন। প্রভাতকে দেখেই চমকে উঠলেন এবং আলোয়ানটাকে টেনে নাক পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলে পাশ কাটাতে চাইলেন।

প্রভাত তাঁকে চিনতে পেরে ডাকলে, এত ভোরে কোথায় চলেছেন হাজরা মশায়?

কে—প্রভাত? আর যাব কোথায় বাবা—রোজ প্রাতঃ-স্নান সেরে তবে দোকানে গিয়ে বসি। নইলে যে কাজের চাপ—নাওয়ার সময় ত থাকে না। হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ—

একটু দাঁড়াবেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

না বাবা—ওবেলা বরং আসব তোমাদের সমিতি-ঘরে, সেই সময় শুধিয়ো। এখন বেলা হয়ে গেলে—গোবিন্দ—গোবিন্দ। হন্ হন্ করে তিনি চলে গেলেন। প্রভাত অবাক হয়ে ওঁর গমনপথের পানে চেয়ে রইল। সে বেশ বুঝলে—হাজরা মশায় ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। উনি যে আর সমিতি-ঘরে আসবেন না এটি নিশ্চিত। কেন? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত এই রহস্যের উপর আলোকপাত হ'ল। অর্দ্ধেন্দুর হাতে তার লেখা চিঠিখানির আবির্ভাব···ঠিক ঠিক সমস্ত ব্যাপারটাই দিনের আলোর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরাই সমাজের শিরোভূষণ—সর্ব্বজনমান্য। সেকালের পল্লীসমাজ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন—এখনকার সমাজপতিরা বেশবদল করেছেন। তাঁরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাতির ব্যবস্থা করেন না—শহরের সবচেয়ে চওড়া সড়কে দাঁড়িয়ে রৌপ্যদণ্ড হেলিয়ে পথ-নির্দ্দেশ করেন। আইনের ধারা ওই রৌপ্যদণ্ডের স্পর্শে নানান অর্থে প্রযুক্ত হয়। সামান্য দোষীর দণ্ড শাসন-বিধানে আছে—অসামান্য দোষের শাস্তি দেবার বিধান আইনে নেই, কারণ যে ধরণের অপরাধ আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা আইনে ছিল অকল্পিত।

দীপাদের বাড়ীর দরজা খুলে কে যেন বার হ'ল। এদিক পানে সে ফিরে চাইল কিনা কে জানে, কিন্তু এদিকে না এগিয়ে সে বিপরীত পথে চলতে লাগল। মনে হ'ল দীপাই যেন। তেমনি শুধু ভঙ্গিমায় ও পথ চলছে—গায়ের জামা কোটটা অত্যন্ত পরিচিত।

আশ্চর্য্য! এই দু'দিনে পৃথিবী কি হঠাৎ বদলে গেল! দীপাও তাকে সম্ভাষণ করলে না? ও কি ধরে নিয়েছে—প্রভাত ওর বাবাকে অপদস্থ করবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করছে! আশ্চর্য্য কি। অসম ক্ষেত্রের জানা-চেনা—সামান্য কুয়াশায় এমনি সহসাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। অনিমেষও থাকলে কি করত, কে জানে!

যাক পুরাতন পৃথিবী এমনি করেই মুছে যাক। তার শোভা, সম্পদ, আনন্দ, আশা—স্মৃতিতে বা অন্তরে জাগিয়ে রেখে কি লাভ! স্মৃতিতে শুধু দুঃখের দাহন। শেষ হোক সে দহন।

মা বললেন, দাদাটা কি করে উদ্ধার হবি ভাবছিস বাবা?

প্রভাত বললে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নি মা।

আমার গলার হার আছে—সাড়ে তিন ভরি সোনা। এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম—শত অভাবেও বার করি নি। সেইটে বেচে—

প্রভাত অপরাধীর মত মায়ের পানে তাকালে। ওর মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায়। পিতৃদায় উদ্ধারের পৌরুষ ওর কোথায় রইল? সত্য পালনের দৃঢ়তা—কারও কাছে মাথা হেঁট না করার সঙ্কল্প—অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার উৎসাহ—বিন্দুমাত্রও ত অবশিষ্ট নেই। ও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—ভীরু—অসতোপায়—আত্মচিন্তাজর্জ্জর—লক্ষ কোটি বিন্দুর মধ্যে জ্যোতিহীন একটি বিন্দু—জন্ম ও মৃত্যুর চক্রপথে—উদয়-বিলয়ের মুহূর্ত্তে সামান্যতম দাগ কাটতে পারে না। সেই ভাল—লক্ষ কোটির মধ্যে আত্মগোপন করেই বাংলার সংসার পরিপুষ্ট করবে।

লক্ষ্মী বললে, বড়দাকে এ সব কথা এখন বলে লাভ কি? চেষ্টা করলে বাবার আপিসে ওর চাকরি একটা হবেই।

মৃন্ময়ী বললেন, সে আর ক'টা টাকা—

লক্ষ্মী বললে, আমিও কাজ করব মা।

মাকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে ও হেসে বললে, আপিসের চাকরি নয়,—এই গেরস্ত বাড়ীর জামা ইজের সেলাই—কাপড়ে চাদরে ফুল তোলা—

আর আমি বসে বসে তোদের অন্ন ধ্বংস করব?···

বাঃ রে—তা কেন? তুমিও কাজ করবে—দাদা বড়দা খবরের কাগজ কিনে আনবে—তুমি ঠোঙা বানাবে

বসে বসে। হেসে খেলে আট আনা পয়সা দিন আনবে।

সেই লক্ষ্মী—এতও ভাবতে পারে? পাকা সংসারীর মত উপায় বার করছে সংসার চালনার। ও কবে শিখলে এই সব? বীণার মত অর্গান সামনে নিয়ে সঙ্গীত-সাধনা—অথবা চায়ের টেবিলে রাজনীতি, সমাজনীতির তর্কজাল-বিস্তার—মোটর-বিহারের পথে দেশ-বিদেশের ভূগোল ইতিহাস রাষ্ট্রতন্ত্রের অবতারণা—সঙ্গীত-কলা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের সুষ্ঠু আলোচনা—এ সব কি ওর জীবনে নিষিদ্ধ বস্তু হয়েই রইল! ও কি এমনি করেই অকাল-গৃহিণীত্বের উত্তাপে স্বাভাবিক জীবন-বিকাশের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে না?

কিন্তু প্রভাতেরও যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। যে জমিতে আশ্রয় পেয়ে বৃক্ষের অঙ্কুর মাথা তুলেছে—সেই জমির সারে ও সেচে তাকে বাঁচিয়ে—বাড়িয়ে তোলার দায়িত্বই না সর্ব্ব-প্রথম! তার পর তার সবুজ পাতা ফুলের কুঁড়ি ফলের শোভা এই সব নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে।

আগে জীবন—তার পর রুচি সংস্কৃতি উচ্চাশা।

নিজের ঘরে ঢুকে প্রভাত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে চারি-দিকে চাইলে। কড়িকাঠ থেকে দেয়াল—ঘরের আসবাব-পত্র, বই রাখা ছোট বাখারির র‍্যাক—আধ ময়লা বিছানার ওয়াড়—তুলো-বের-করা বালিশ—ঘরের কোণে চালের জালা—আমাদের পেতে, হুঁকো আর তামাক রাখার টিন। দুটি পড়ল দেয়ালের গায়ে—রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী আর বিদ্যাসাগর। কি নির্ভীক প্রশান্ত মুখ—বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি—জ্ঞান-ভাস্বর প্রশস্ত ললাট—দৃঢ়সঙ্কল্প-আশ্রয়ী—পাতলা অধরোষ্ঠ। সাধারণ ঘরের ছেলে সব—যুগ ও জীবনকে উজ্জ্বল করেই প্রতিভাসিত হন নি—সমস্ত কালের ঊর্দ্ধে রয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। সেই কাল—সে কালের জীবন—তপস্যা—সমস্তই বুঝি স্বতন্ত্র ছিল। দুঃখ ছিল—দুঃখের কুৎসিত সর্ব্বগ্রাসী গ্লানি হয় ত ছিল না। সেদিন পৃথিবী নানামুখী সমস্যা ও আবর্ত্তে ছিল না লক্ষ্যহারা—সনাতন সত্যের রূপটি এমন সর্ব্বাত্মক ছলনার ধোঁয়ায় আবৃত হয়ে যায় নি। আজ কুয়াশা-মলিন জগতে যদি ওঁরা থাকতেন···সে ভালই হয়েছে—আজিকার এই সংঘাত-সঙ্কুল স্বার্থকলুষিত ক্ষুদ্র সীমাঘেরা পৃথিবীকে দেখেন নি ওঁরা। ভালই হয়েছে—ওঁদের কালের দুঃসহ বেদনা—স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে কি মর্ম্মান্তিক হয়ে মনের ধারে আশ্রয় নিয়েছে—তা অনুভব করতে হয় নি ওঁদের। শেষ হয়ে গেছে ওঁদের যুগ—বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ, সংগ্রাম-পর্ব্বের সুবর্ণযুগ। ওঁরা কোন প্রেরণাই দিতে পারবেন না একালের-স্রোতে-ভাসা খড়-কুটোদের—স্রোতে ঘুরে-পড়া বেতসলতাদের। ওঁদের সামনে রেখে মিথ্যা আশার প্রলুব্ধ হওয়া কেন আর।

তক্তপোষের উপর উঠে একে একে ছবিগুলি নামিয়ে দিলে প্রভাত। এই ঘরে ওঁদের আর মানায় না—এই কারা-গারে কোন্ স্বাধীনতার বাণী বহন করে ছবিতে মানুষের উপাস্য হয়ে থাকবেন! মধ্যবিত্তের জীবনে অভিশাপ নেমেছে—মধ্যবিত্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—গণতন্ত্রের যুগে মধ্যবিত্তের কোন প্রয়োজন নেই।

তক্তপোষে বসে বইয়ের র‍্যাক থেকে একখানি সাদা কাগজ টেনে নিলে প্রভাত। কলম নিয়ে অতঃপর সে লিখতে বসল। সে লেখা কোন কৌতূহলী পাঠকের চিত্তবিনোদন করবে না।

সে লেখার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নেই—সে লেখার জীবন-তত্ত্বের বিশ্লেষণও কেউ আশা করবে না। অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি আর অশরীরী ভাব দিয়ে তার ভাষাকে রহস্যময় ও ফেনিল করে তোলার চেষ্টাও সে করছে না। অত্যন্ত স্থূল সাহিত্যরসবর্জ্জিত এক আবেদন-পত্রের খসড়া তৈরি করছে সে। অনুভিক্ষার আবেদন—অত্যন্ত দীন প্রার্থনার বশম্বদ ভৃত্যের আকুতি ফুটিয়ে সে চাইছে নিজে বাঁচতে—আশ্রিত প্রাণীগুলিকে বাঁচাতে। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার ছেলে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে আর লোকের মুখে শুনে যাকে আয়ত্ত করবার আশায় ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে প্রাসাদের দুয়ারে ও কারখানায়—সেই বৃত্তি আয়ত্ত করবার জন্য ওর সর্ব্বস্ব পণ রইল আজ। চাকরি—চাকরি—চাকরি চাই।

ঘরে অন্ধকার নেমেছে—রেডিওটা কোথায় যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। ওকি—কিসের কোলাহল? রেডিয়োতে অস্বাভাবিক কোলাহল—অনেক অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর—চাপা কান্নার গুঞ্জন—

উঠে ও জানালার ধারে এল। ঘোষণা চলছে:

আজ অপরাহ্ণে প্রার্থনাসভার যাবার মুখে মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। আজ অপরাহ্ণে—

বার বার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের ঘোষণা।

পৃথিবীতে অন্ধকার নামছে—সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে তার পরিধি। হিংসা, লোভ, অসত্য, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মোটা মোটা লোহার গরাদগুলি কারাগৃহের সীমানা নির্দ্দেশ করে স্পষ্টতর হচ্ছে; সেই সঙ্কীর্ণ ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে মানুষ?

৩৫

শোক যত প্রচণ্ডই হোক—জীবন-গতিকে আলোড়িত করে খানিকক্ষণের জন্য; ক্রমে তার তীব্রতা হ্রাস হয়ে আসে। ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে কিছু দিনের জন্য প্রতিধ্বনিত হ'ল আর্ত্তরোদন ধ্বনি—তার পর তার তীব্রতা কমতে লাগল।···পিতৃবিয়োগের তীব্রতা সহসা নূতন করে

অনুভব করলে প্রভাত—পিতৃরাষ্ট্রের বুকে এই শক্তিশেলের আঘাত···তবু জাহুয়ারি গিয়ে ফেব্রুয়ারি পড়ল—ফেব্রুয়ারিও একে ছুঁইয়ে এগুতে লাগল। সংসার মানুষকে ধরে রাখতে পারে না—ধরে রাখতে পারে না তার স্মৃতিকে। শুধু যে মানুষগুলি মহত্ত্বের প্রভাবে জড়তা পরিহার করে চৈতন্যের অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা 'হায় হায়' করতে লাগল। তার পর এক দিন···

মুণ্ডিতমস্তক প্রভাত পকেটে চাকরির আবেদনপত্রখানি নিয়ে আপিসের উদ্দেশে রওনা হ'ল। যেতে যেতে ফুটপাতে দেখলে নানান বয়সের ফিরিওয়ালা জীবনধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় কত জিনিস সাজিয়ে—ক্রেতা আকর্ষণের জন্য চীৎকার করছে। থমকে দাঁড়াল সে। পৃথিবীতে এরাও রয়েছে সমাজের নিম্নস্তরে—জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত কিন্তু বিব্রত নয়। এদের পৃথিবীটা প্রভাতদের মত কি? নিশ্চয় তা নয়। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা এরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পায় এবং যে-কোন উপায়ে উপার্জ্জন করে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়—অন্নময় কোষের রক্ষণ-কার্য্যই কি জীবনধারণের সর্ব্বোত্তম সমাধান। যে চিত্ত জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয় নি—যে আলোকে আত্মসাৎ করে জাগে নি রসসঙ্কল্পের আনন্দ এবং সেই মহৎ আনন্দ জগতের বস্তুর উপকরণ নিয়ে—জগদতীত কল্পনা ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনায় বহু ধারায় নিজেকে প্রসারিত করে দিতে পারে নি, সেই তুচ্ছ নশ্বর জীবনের আদর্শ তো সকলের নয়। তবু প্রাথমিক ক্ষেত্রে এদের সহজ জীবনীশক্তির বিকাশ প্রভাতকে লুব্ধ করছে। ওর পায়ে যদি আজ অর্থকৃচ্ছ্রতার ভারি পাথরটা বাঁধা না থাকত। যদি ওর মাথায় না চাপত অসহায় মা, বোন, ভাইয়ের দায়িত্ব।

প্রভাত পা চালিয়ে দিলে। খালি চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা। এ-ও তো বিলাস মাত্র—সামনে চলার পথে বাধা। সে যা হতে পারে নি—কল্পনায় তা টেনে এনে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা শুধু। সে তো অনেক কিছু ভাবতে পারে। তার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র-গৌরব তাকে যে-কোন সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার চারপাশে যারা ভিড় জমিয়ে আছে তারা সবাই মহৎ নয়, বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান বা চরিত্রবান নয়—অথচ তাদের মোটরের ধূলা-কাদা মেখে নিত্য তাকে পথ চলতে হচ্ছে। তারা কৃপার চক্ষে দেখে তাকে—ঘৃণা করে তার দারিদ্র্যকে। তাদেরই বাড়ীতে মায়ের শেষ সম্বল হারগাছি বাঁধা দিয়ে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার হয়েছে সে। যে উপার্জ্জন করে সংসারের অভাব পূর্ণ করতে পারে না, তার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বীরত্ব চরিত্রখ্যাতি সবই মিথ্যা। ওই একটি মাত্র মানদণ্ড আছে যাতে মানুষকে যাচাই করে নেয় সমাজ। গোলাপফুলের সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধ্যে প্রীত হন দেবতারা, কিন্তু মাটির আশ্রয়ে আশ্রিত না হলে তার রূপ-রস-গন্ধময় প্রাণ-লীলার মহিমা অনুভব করতেন কোন্ দেবতা?

আরও দ্রুত চলতে লাগল প্রভাত। পথ জনসঙ্কুল—মানুষের জমাটবাঁধা লাইন এগিয়ে চলেছে একই দিকে। মাঝে মাঝে বড় রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিসের সঙ্কেতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং সেই অবসরে তার গতির বেগটা চোখে পড়ছে। এই অসংখ্য মানুষ যাত্রা করেছে মাটির আশ্রয়-সন্ধানে। মাটির রসে শাখা পত্র ফুল ফলে পূর্ণ-বিকশিত হবার বাসনা তাদের মনে। এই তো জীবন। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের সময়টুকু। প্রাণী বা পদার্থকে ঘিরে চৈতন্যের ক্ষণকালীন প্রবাহ—মাটির প্রদীপে তেল-সলিতার উপকরণে অগ্নি উৎপাদনের রহস্য। একটানা স্রোত পথে পথে ভেঙে পড়ছে বহু ধারায় রূপান্তরিত হয়ে—বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তরে মিশিয়ে যাচ্ছে। লালদীঘির চারি ধারের বিরাটকায় সৌধ-দৈত্যেরা আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় গ্রাস করছে এই ধারাগুলি।···

প্রভাতের পিতৃবন্ধু বললেন, দরখাস্ত এনেছ? দাও। দরখাস্তের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। একটু হেসে বললেন, আমরা যে স্বাধীন হয়েছি তা এর শেষ লাইনেই জানতে পারছি। নয় কি? বলে সেখানটায় আঙুল রাখলেন।

প্রভাত কিছু বুঝতে পারলে না।

তিনি হাসলেন শব্দ করে, এখন 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' অর্থাৎ বশম্বদ ভৃত্য বললে ভুল হবে। লিখতে হবে—'ইওরস্ ফেথ্‌ফুলি' অর্থাৎ আপনার বিশ্বস্ত বুঝলে? এটা কারেক্‌সন্ করে দাও।

প্রভাত আদেশ পালন করলে। লোহার গেটের মাথায় জুঁই ফুলের ঝাড়টিকে মনে পড়ল। মিষ্টগন্ধী কোমল সুন্দর ফুল—কিন্তু যাকে অবলম্বন করে ওর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ—

দরখাস্ত নিয়ে বড়বাবু চলে গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'ল প্রভাতকে। একটি ঘণ্টায় এই অভিনব জগতের কিছু আভাস পেলে ও। এই জগৎ যে জীবনধারণের গ্লানিমুক্ত নয়—তা বুঝলে।

বড়বাবু ফিরে এলেন হাসিমুখে। বললেন, লাকি চ্যাপ, চল—সায়েব তোমায় ডাকছেন। বোধ করি কালই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়ে যাবে। বাড়ী গিয়ে মাকে বলবে—যেন ঠাকুর-দেবতার পুজো মানত করেন—আর ফেরবার পথে ফিরিঙ্গী-কালীকে প্রণাম করে যেও।···

সত্যিই চাকরিটা হয়ে গেল। পাঁচটার পর জনতার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে ও বাড়ী ফিরলে। মনে মনে কৃতজ্ঞ হ'ল—কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দেবতা বিশেষের উপর নয়—সমস্ত পৃথিবীর উপর। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলে—এই পথেই

উন্নতি করতে হবে। এই মাটি থেকে রস শোষণ করে ও শুধু বাঁচবে না—সমৃদ্ধ হবে। অর্থের শাখায় ফুটবে গৌরবের ফুল—যশের সৌরভে সে ফুল দূরান্তরের লোকের প্রশংসা, প্রীতি আকর্ষণ করবে এবং সেই ফুল এক সময়ে জন-শ্রদ্ধার উত্তাপে পরিণত হবে আত্মতৃপ্তির সুপক্ক ফলে।

গেল—গেল—গেল! মোড়ের মাথায় দুখানা গাড়ীতে সংঘর্ষ হয়ে গেল—দু'ভাগে বিভক্ত জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। এ-ও নিত্যকার ব্যাপার। বেশীর ভাগ লোকই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করে আবার লাইন রচনা করলে—ওদের দাঁড়াবার সময় নেই। দুর্ঘটনা জীবনে হয়ত ঘটে নি—কিন্তু চার পাশে ঘটছে অসংখ্য বার। যারা দুর্ঘটনার পড়ে জীবন দিয়েছে কিংবা অঙ্গহানির দরুন অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ অনেকখানি—এই দশটা-পাঁচটা-পথ-চলিয়ে দলের। পিতৃ মাতৃহারা ছেলেরা আপিসে ভিক্ষা করতে এলে—এদের অনেকেই অম্লান বদনে বলে, মাপ কর। আমাদেরই বলে কে দেয়!

আজই এমন ঘটনা ঘটেছে আপিসে। পথে ঘটল দুর্ঘটনা, জীবনের পদে পদে এই দুর্ভোগ! মনে বেদনা জমলে সহজে বার হতে চায় না—আনন্দকে বহু সাধ্যসাধনায় আয়োজন করে আনতে হয়।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে বসল প্রভাত। মায়ের মুখে আশ্বস্ত ভাব দেখেছে—ছোট ভাইয়েরা আনন্দ প্রকাশ করেছে। লক্ষ্মী হেসে বলেছে মাকে, বড়দা যাবার সময় আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম যে, চাকরি হবে না!

প্রভাত উৎসাহিত বোধ করছে না—চাকরিলাভের তৃপ্তিতে ওর এতটুকু আনন্দ নেই। ওর মনে হচ্ছে পৃথিবী আর বাইরে ছড়িয়ে নেই—এই ঘরেতেই গুটিয়ে এল। জানালা দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে বাঁধা যে ক'টি নক্ষত্র তাই জগতের সীমা, ওর পরিচয়ের পরিধি। যে কয়টি মানুষ আজ আশা আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাদের চারিদিকে ওকে ঘুরতে হবে দিনের পর দিন। মনে হতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। না—না—না—এভাবে সঙ্কীর্ণ হয়ে ও বাঁচতে চায় না—বাঁচতে পারবে না। ওর চাই বাইরের বিস্তৃত পৃথিবী—অদূরবর্ত আকাশ—সংখ্যাহীন নক্ষত্র—যাদের মৃত্তিকায় কল্পনায় সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যে জীবন হবে রসগ্রাহী বিস্তীর্ণ বেগবান ও আনন্দময়।

প্রভাত দা!...

কে?—

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর ডাকলে। ওর চুল উস্কখুস্ক—মুখ শুকনো। ওকি চাকরি পেয়ে ওর কল্পনার পৃথিবীকে হারিয়েছে—প্রভাতের মত?

এস—ঘরে এস।

শুভঙ্কর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে ঘরের মধ্যে এল।

বসো।—

না—বিছানার ওপর বসব না। অশৌচ কিনা।

ওর খালি পায়ের পানে চেয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে, কে মারা গেলেন?

মেজ জ্যেঠামশাই।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়—হ্যাঁ—হঠাৎই। একটা ঢোক গিলে শুভঙ্কর বললে, আপনাকে ত পর মনে হয় না—শুনুন। তবু খানিক ইতস্তত: করে সে মাথা নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওঁর মৃত্যু ত স্বাভাবিক নয়—উনি আত্মহত্যা করেছেন।

আত্মহত্যা! প্রভাত ভীষণ ভাবে চমকে উঠল।

হাঁ—জানেন ত—দেনার দায়ে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি আর ত কিছুই নেই। আঘাত সইতে পারলেন না...অশ্রু-বাষ্পে ওর স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

প্রভাত কোন প্রশ্ন না করে সেই বেদনাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

বাইরে গ্যাসের আলো জ্বলল—ঘরের মধ্যকার অন্ধকার সে আলোয় ঈষৎ তরল হ'ল মাত্র। কারও মন থেকে অন্ধকার মুছে গেল না।

বহুক্ষণ পরে শুভঙ্কর বললে, আপনি যাবেন কি একবার? মেজ জ্যেঠাইমা বলছিলেন...

লাজুক শুভঙ্কর কথা শেষ না করে উত্তর-প্রত্যাশায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই অন্ধকার ঘরে। তার পর ধীরে ধীরে চলে গেল।

৩৬

হলঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে মেজজ্যেঠাইমা বসে ছিলেন। তখনও অপরাহ্নের আলো আকাশ থেকে মুছে যায় নি; ঘরের মধ্যে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই ঘরটি আকারেও যেমন ছোট সজ্জাতেও তেমনি রিক্ত। ছোটমত একটা তক্তপোষ ছাড়া ঘরে দ্বিতীয় আসবাব নেই। দেয়ালে একখানিও ছবি নেই, পলস্তারা ওঠা বর্ণহীন দেয়াল। কড়ি-কাঠের আলকাতরা ধুসর হয়ে এসেছে—সেখানে আলোর ফানুস ঝুলছে না। দীপ জ্বালানোর কোন ব্যবস্থাই এ ঘরে নেই। তক্তপোষটাও নগ্ন—একটা সতরঞ্চ পেতে তক্তার ফাঁকগুলিকে অদৃশ্য করার আয়োজনও কেউ করেন নি। সদ্য শোকস্তব্ধ বাড়ীটার প্রতীক যেন এই সর্ব্বরিক্ত ঘরখানি, আর সেই ঘরের মেঝের বসে শুভ্রবসনা মেজ জ্যেঠাইমা—

প্রভাত তাঁর অদূরে মেঝের উপর বসল।

মেজ জ্যেঠাইমা বললেন, সবই ত শুনেছ। কর্ম্মফল কেউ খণ্ডন করতে পারেন নি আজ পর্য্যন্ত।

তিনি চুপ করলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন না, সম্ভবতঃ চোখের জলও নয়। তরল অন্ধকারে তাঁর শুভ্রবেশার দেহটি সামান্য নড়ে উঠল শুধু। এই একটুখানি চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে বহু দুঃখ-বেদনাকে যেন বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

প্রভাত বললে, আপনি অনেক জানেন, আপনাকে আমি—

সব জেনেও মনের দুরন্তপনা থামানো যায় না বাবা। এমনি মায়া মহামায়ার। যাক, তোমাকে কেন ডেকেছি শোন। আমরা আর ক'টা দিন মাত্র এখানে আছি। ওঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে শহর ছেড়ে বাইরে যাব।

বেশ ত, কিছু দিনের জন্য—

কিছু দিনের জন্য নয় বাবা—বেশ কিছু দিনের জন্য। হয়তো···কিন্তু আমরা যদি না-ই ফিরি তাতেও দুঃখ নেই। এই বাড়ীর দু' একটি জিনিষ তোমার জিম্মায় রেখে যাব—

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বললে, কিন্তু আমার যে বলবার আছে জ্যেঠাইমা। আমি যদি আপনাকে না যেতে দিই এই বাড়ী থেকে?

তা তো তুমি পারবে না বাবা।—মেজ জ্যেঠাইমার মুখে ম্লান হাসি। একটু থেমে বললেন, বোধ করি সব কথা শোন নি তুমি। আর শোনাবোর নেইও বিশেষ কিছু। নদীর জল যেমন নীচু জায়গা পেলে নেমে যায় তেমনি নাবাল জমিতে পা ফেলে এ বাড়ীর লক্ষ্মীও আজ চলে গেছেন। এ বাড়ীতে আমরা থাকব কোন্ অধিকারে?

কিন্তু কোথায় যাবেন? শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে প্রভাত।

ভগবান দয়া করে মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই রেখেছেন—সেইখানেই যাব।

তবু আমি যদি না যেতে দিই আপনাদের?

প্রভাতের উজ্জ্বল চোখের পানে চেয়ে মেজ জ্যেঠাইমা বিস্মিত হলেন। বললেন, তুমি একথা বলছ কেন বাবা?

কেন—আপনিও তা জানেন। এক দিন আপনাদের কাছে আসতে চেয়েছিলাম। বলেছিলেন, এখন নয়। আজও কি বলবেন—

না—আজ সেকথা বলব না। সেদিন তোমার দিকটাই দেখেছিলাম বাবা—আজ আমার দিকটাতেও তুমি ভাল করে দেখ। তা হলেই কোথায় ভুল—কোথায় অসঙ্গতি বুঝতে পারবে।

না—কোথাও এর ভুল নেই। আমার অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, তবু—

অবস্থার কথা আমি বলিনি, মান-সম্ভ্রম রাখার কথাও নয়—তবু একটা কথা ভুলে যেয়ো না যে, যে-কোন ভাল জিনিষ পেতে হলে তপস্যাও করতে হয় তেমনি কঠিন। উমা অপর্ণা হয়েছিলেন বলেই শিবকে পেয়েছিলেন।

কিসের তপস্যা?

—সিপ্রার তপস্যা সবে আরম্ভ হ'ল—

না—না মেজ জ্যেঠাইমা—প্রভাত আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

কেন নয়? চিরকাল বড়-বাড়ীর কোলে মুখ লুকিয়ে রইল যে, মান-সম্ভ্রমের কাচের ঘরে রঙীন বাতি জ্বালিয়ে—পয়ার ছন্দের মিল পড়লে সুর করে—বাইরের পৃথিবী কেমন সে খবর সে নেবে না? পথে যে কত কাদা তার হিসেব রাখবে না? তার শিক্ষা শেষ না হলে তোমাকে লাভ করার যোগ্যতা সে পাবে কেমন করে! না বাবা, আজ নয়—সংসারে মানুষকে টানলেই সে সংসার তরে ওঠে না—সুখেরও হয় না। যে সংসারের যে সুর সেই সুরের পরিচয় যে নিতেই হয়। না নিলে জীবন সুখের হয় না—সংসারে শান্তি থাকে না।

শুভ বর, তবু প্রভাতের মনে হ'ল সমস্ত মন জুড়ে যা রয়েছে তা এই প্রাসাদের কোন অংশে বুঝি নেই!

মাথা নীচু করে প্রভাত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাড়ীতে সুমরমী তখন চীৎকার করছেন; আর পারি না বাপু, চিরকালই কি ভূতের ব্যাগার খাটবো! চাকরি হ'ল এইবার বিয়ে-থা করে সংসারী হ'। আমার ছুটি যে সংসার থেকে।

এই সংসার! এখানে আসবার জন্যও তপস্যা করতে হয়।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটতে-না-ফুটতে মিলিয়ে গেল। সত্যই ত সংসারে আশ্রয় নেবার জন্য তপস্যা করতেই হয়। লক্ষ্মী আর সিপ্রা যেমন এক নয়—তেমনি ওই প্রাসাদের গোত্রে এই গৃহের গোত্রও মিলবে না। ওখানে ভাঙা-চোরার মধ্যে যে গ্লানি এখনও লেগে রয়েছে তাকে তপস্যার দ্বারা নিঃশেষে মুছে না ফেললে এখানকার অগৌরব বইতে পারবে কেন সিপ্রা!···এই ভাঙা-কলতলা, অপরিসর উঠান, সঙ্কীর্ণ আকাশ, তিন দিকের দেয়াল-ঘাঁটা স্যাঁতসেঁতে ঘর আর তেল-নুন লকড়ির আলাপ···। আশ্রয় নেবার অছিলায় সিপ্রাকে এই কারাগারে বন্দী করার ব্যবস্থা কি সাহসে যে করলে প্রভাত।

বহুক্ষণ ঘুম এল না। কেমন যেন অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করতে লাগল প্রভাত।

চোখের উপর আলোর স্পর্শ—কোমল নয় তীব্রই। সে আলো পথেরই। কিন্তু চোখ চাইলেই সামনের তিনতলা বাড়ীর তেতলার ঘরটাই নজরে পড়বে। ও-ঘরে সারা রাত ধরে কোমল নীল আলো জ্বলে, সারা রাত ধরে আকাশ ঘরে আসে কত স্বপ্ন আর ঐশ্বর্য্যের সম্ভার—কত কল্পনার স্বর্গ তাতে আর গড়ে। ও-জগৎ প্রভাতদের নয়—ওকে সামনে রেখে নিদ্রা যাওয়াও কি কঠিন!

চোখ না চেয়েই প্রভাত জানালার কাছে উঠে এল এবং জানালাটা বন্ধ করেই আবার শুয়ে পড়ল।

সকালে কিন্তু জানালাটা খুলতেই হ'ল। তারপর সারাদিন সংসারের কাজ ও নিজের চিন্তার সঙ্গে সামনের তিনতলা বাড়ীটাও কখন মিশে গেল আশ্চর্য্যভাবে। সন্ধ্যাবেলায় কর্ম্ম-শ্রান্ত হয়ে ঘরে আসতেই মনে হ'ল জানালার বাইরে প্রভাতের জীবনেরই একটি অংশ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিট্‌কে পড়েছে। বিশ্রাম-মুহূর্ত্তে সেই অংশটা বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে ওকে উত্যক্ত ও উত্তেজিত করে তুলবে। সুতরাং জানালাটা বন্ধ করে দিতেই হবে।

প্রদীপ-হাতে লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে এল। প্রভাতকে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, ওমা, এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? খাবে দাবে না? আজ সন্ধ্যে দিতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বলতে বলতে ও এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। প্রদীপটি উঁচু করে ধরে বারকয়েক আন্দোলিত করে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম জানালে। কার উদ্দেশে প্রণাম জানালে লক্ষ্মী?

কৌতূহলী প্রভাত জানালা থেকে সরে এসে লক্ষ্মীর পিছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। যা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধে সে সরিয়ে রেখেছিল, এই যুগ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা যাদের নাই বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল, সেই সব প্রতিভাশালী কর্ম্মবীর বরেণ্য মানুষের ছবি আবার দেয়ালের গায়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে। শুধু টাঙিয়েই দেয় নি—ঝেড়ে মুছে পরিপাটি করে সেগুলিকে নূতন রূপ দিয়েছে অনুজ্জ্বল। প্রদীপের আন্দোলিত আলোয় মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব হয়ে উঠল।

প্রদীপ পিলসুজের উপর রেখে লক্ষ্মী প্রভাতের পানে ফিরে বললে, ছবিগুলো ভাল করে বাঁধিয়ে দাও যদি তা হলে ধুলো আর পোকায় নষ্ট করতে পারে না।

আসছে মাসে মাইনে পেলে বাঁধিয়ে দেব—কি বলিস? প্রভাত প্রসন্ন হাস্যে জবাব দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের মনে হ'ল—এই দুর্দশাগ্রস্ত ক্ষুদ্র ঘরে চারিদিকের দেয়াল থাকবে, জীর্ণ লোহার গরাদে দেওয়া একটি মাত্র জানালাও থাকবে—আর সে জানালাটা বন্ধ করা চলবে না এবং দেয়ালের গায়ে থাকবে ওই ছবিগুলি। সকালে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ও সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে লক্ষ্মীর মত কল্যাণী মেয়েরা এই ঘরের অন্ধকারকে ও অশুভকে মুছে নেবার সাধনাও করবে প্রত্যহ। মন্দ কি, যুগ-যুগান্তর ধরে চলুক না এই জয়-পরাজয়ের খেলা—জীবন-লীলার প্রবাহ; অশুভ থেকে শুভে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃত লোকে উত্তরণের সাধনা।

সমাপ্ত

দ্বিপ্রহর

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জানালার পারে হাতছানি দেয় দ্বিপ্রহর,
    চোখেতে চলেছে দুপুরের রোদে ঘুম ঢোলাই।
লোনা দেওয়ালের গর্ত্তেতে ঢোকে বুনো-ভ্রমর,
    ভ্রমরের এই গান থেকে দেখি রক্ষা নাই।

খাঁ খাঁ করে মাঠ, খটখটে ঘাট, শীতাভ ঘাস—
    শীতাভ সে-ঘাস ছেড়ে ছায়া খোঁজে গরু-মানুষ,
ঘূর্ণি-হাওয়ায় ধূলিদের ওঠে নাভিশ্বাস,
    রোদের নেশায় ঝরা-পাতা যায় কতো সে দূর?

ঘুমে কি পড়েছে বহু দূরে বন কাঠ-চাপায়?
    শেয়াল-কাঁটায় বনে বনে কাঁপে হলদে ফুল।
বরফে বরফে অবশ অঙ্গ পান-পাতায়,
    পান-পাতাগুলি ঘুমে যে পড়েছে—নেইক ভুল।

আকন্দ-বন ছাড়ায়ে ওদিকে ঘুঘুর ডাক,
    ঘুঘু ডেকে ফেরে—কণ্ঠেতে তার বিবাগী-সুর!
খেঁকো কুকুরের কত ঠোকরায় ধূর্ত্ত কাক;
    গর্ত্তে ঝিমায় ধান-চোর যতো ক্ষেত-ইঁদুর!
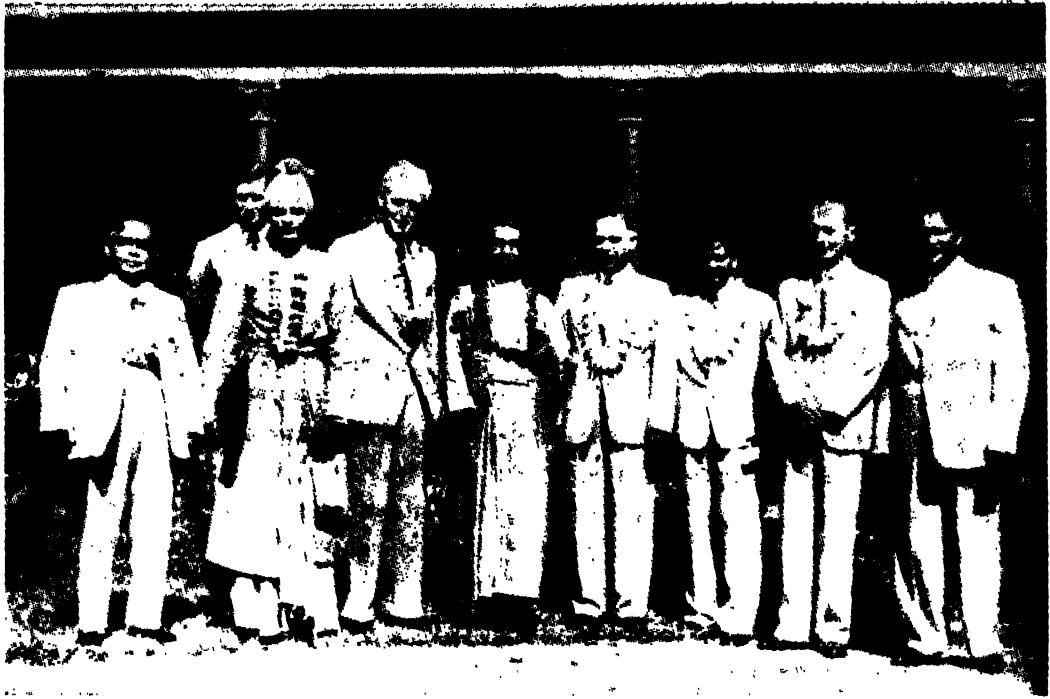
দক্ষিণ আমেরিকার ওর্ড চাউনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক-দলের সংবর্দ্ধনা।
বাম হইতে দক্ষিণে—ডাঃ জে, বি, সিংহ (প্রথম), ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (দ্বিতীয়), ব্রিটিশ গিনির গবর্ণর স্যার চার্লস উলী (তৃতীয়), স্বামী অদ্বৈতানন্দজী (চতুর্থ) প্রভৃতি

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

ব্রহ্মচারী রমেশ

ভারতের বাহিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য প্রভৃতিতে লিপ্ত ভারতবাসীর যে একটি মোটামুটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলেই ভারতীয়েরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেখানকার ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহাদের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ব্রহ্মদেশ	১,০০,০০০
সিংহল ও মালয়	৭৫,০০০
মরিশস ও দক্ষিণ-আফ্রিকা	২,৫০,০০০
ক্যারেবিয়ান অঞ্চল	৫,০০,০০০
ত্রিনিদাদ	২,০০,০০০
ব্রিটিশ গিনি	১,৫০,০০০
ডাচ গিনি	৬০,০০০
জামাইকা	২০,০০০
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	১,৩০,০০০

[illegible] রাষ্ট্রসমূহে ৫০%, যুক্তরাষ্ট্রে ৪০% এবং বাকী ১০% লোক অন্যান্য রাষ্ট্রে বাস করে। প্রবাসে ঐ সকল ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে তাহারা ক্রমশঃ নিজ নিজ আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে সেজন্য তাহাদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহাদের ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আজ আসিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক দূতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের সনাতন আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এশিয়ার বহু অঞ্চলে তাঁহার নিদর্শন আছে। কেবল এশিয়ার নহে, ইহার বাহিরেও অন্যান্য দেশে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যাদির বিস্তারলাভ ঘটিয়াছিল।

কাল-প্রবাহে ভারতের প্রচারকার্য্য ব্যাহত হয়। সাংস্কৃতিক দূতের পরিবর্তে হাজার হাজার ভারতবাসী শ্রমিকরূপে গত শতাব্দীর প্রথম হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত হইতে থাকে। ইহার ফলে আজ আফ্রিকা, ফিজি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মরিশস, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে
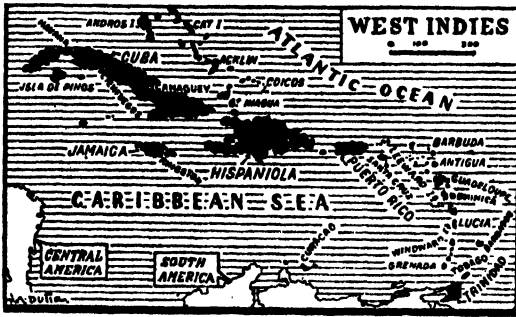
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

বহু ভারতীয়কে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতে দেখি। এই সকল ভারতীয় নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের মহান্ ঐতিহ্য ভুলিতে বসিয়াছে। তাহাদের ভিতর অতীতের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের জন্য বর্ত্তমানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বহির্ভারতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে আমরা গত শ্রাবণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রবাসীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সঙ্ঘ হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন বৎসরাধিক কাল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গিনিতে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা সম্বন্ধে নানা ভাবে প্রচারকার্য্য করেন। তাঁহাদের প্রচারে প্রবাসী ভারতীয়-দের মধ্যে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট মিশনের প্রচারকার্য্য যাহাতে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তদুদ্দেশ্যে পত্রও লিখিয়াছেন।

সঙ্ঘের এই সাংস্কৃতিক মিশন গত ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৫১ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বত্রিশটি শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা ৩৬১টি জনসভায় ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ১৪৯টি বৈদিক যজ্ঞ, ১১৩টি ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ অনুষ্ঠান, ১১টি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, বৈদিক প্রার্থনা, তুলসীদাসের রামায়ণ, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুস্তক সঙ্ঘ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ভারতীয়-গণ তাহাদের মাতৃভাষা (হিন্দী) প্রায়ই ভুলিতে বসিয়াছে। তাই মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত মিশনের প্রচেষ্টায় তথায় পাঁচটি হিন্দী পাঠশালা খোলা হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে আটটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের ভিতর দিয়া এই গঠনমূলক কাজ খুবই সময়োপযোগী। এই বিষয়ে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ১৩৫৮ সালের ৫ই ভাদ্র সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে :

"পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদে ভারতীয় হিন্দু শ্রমিকগণ চাঁদা তুলিয়া কয়েকটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের প্রেরণাতেই ত্রিনিদাদের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দুগণ তাহাদের সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার এই উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় ইউরোপীয় এবং নিগ্রো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বদেশভূমি হইতে বহু দূরে এক দ্বীপদেশে অবস্থান করিয়াও দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিক তাহার সংস্কৃতির প্রতি যে মমতা ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাতে শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্বই নহে, দরিদ্র ভারতীয় শ্রমজীবীর সাংস্কৃতিক মহত্ত্বও প্রমাণিত হইতেছে।"

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম অবতরণ-কেন্দ্র—প্রীন্স টাউনের একটি অট্টালিকা

মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই এক দিন ভারতের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি এমনই সুন্দররূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল যে, তাহার পরিচয়ে আজিও বিস্ময়ে

অভিভূত হইতে হয়। তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশন মন্দির প্রতিষ্ঠায় এত যত্নশীল, ত্রিনিদাদে আগমনের পর মিশনের উদ্যোগে একটি মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বৈদিক শান্তি-যজ্ঞ, বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভজন-কীর্তন প্রভৃতিরও আয়োজন হইয়াছিল। ত্রিনিদাদে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "প্রবাসী ভারতীয়গণকে লক্ষ্য করিয়াই জগতের অন্যান্য জাতিগুলি ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিচার করিবে। সুতরাং প্রবাসী ভারতীয়গণের চরিত্রবত্তা, আদর্শ জীবন-যাপন-প্রণালী যেন সকলকে মুগ্ধ করে। ভারত এক দিন তাহার মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে জগৎপূজ্য হইয়াছিল। স্বাধীনতার পর জগতে পুনরায় সেই অধ্যাত্ম-বাদের প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে।"

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ব্যাপক প্রচারের জন্য সচেষ্ট। সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক প্রচার ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জনগণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে; তাঁহারা অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী ও নিগ্রো নেতা ডাঃ এফ. এ. ফ্রিচলো মিশনের প্রচারকার্য্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন,

"Hindu religion and culture have always been characterised by its liberal Catholic outlook and as such Indian Cultural propaganda conducted by the Bharat Sevasram Sangha would not only be beneficial to the Hindus of the colony, but it is sure to bring about a general welllbeing of all peope irrespective of caste, creed or coour."

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই প্রচারক দল ভারত হইতে ১২০০০ মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ভাবধারা প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্বেকার ইতিহাস জানিতে পারিলে, এরূপ প্রচারের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিশনের অন্যতম প্রচারক ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ ভারতীয়গণের ঐদেশে গমন, স্থায়ীভাবে বসবাস এবং তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কতকটা দিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিনিদাদে গান্ধী স্মৃতি-মন্দির ও শিবালয়

১৮৪৫ হইতে ১৯১৭ সনের মধ্যবর্ত্তী সময় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৭ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাসত্বপ্রথার বিলোপ হইলে বিভিন্ন রাজ্য হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে শ্রমিকসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ব্রিটিশ) উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়গণ প্রেরিত হইতে থাকে। ঐ সময় তাহারা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ভিতর দিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তাহাদের দেশ-ত্যাগের পর সুদূর প্রবাসে উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস বড়ই করুণ। ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় ঐ দূরদেশে গমন করে নাই। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহের এক একটি সংস্থা (Recruitment bureau) গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সমগ্র দেশে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শ্রমিক সংগ্রহকারী সংস্থাগুলি ইহার সুযোগ বিশেষভাবে গ্রহণ করে। তাহারা নানারূপ প্রলোভনে ভুলাইয়া ভারতীয় শ্রমিকগণকে বিদেশে পাঠায়। তাহাদিগকে বহির্ভারতে প্রেরণের সময় পথিমধ্যে তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত না। এই প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগামী জাহাজে খাদ্যাভাবে ও আধি-ব্যাধিতে শতকরা পনর জন শ্রমিক ইহলীলা সংবরণ করে।

পথে এইরূপ অসহনীয় দুঃখভোগের পর কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহাদিগকে বহুবিধ অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। কর্ম্মে নিয়োগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে একজন কঠোর তত্ত্বাবধায়কের অধীনে থাকিতে হইত। তাহাদিগকে সাধারণতঃ ইক্ষুক্ষেত্রে ও জলপাই, কোকো, বাদাম প্রভৃতির জঙ্গলে শ্রমিকের কার্য্যে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। কর্ম্মে

নিয়োগের পর শ্রমিকগণকে যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত তাহা অতীব বেদনাদায়ক। তাহাদের বাসস্থানগুলি বসবাসের উপযোগী ছিল না। ১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রশস্ত ব্যারাকগুলিকে ১৫.১৬টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া যতদূর

স্বামী অদ্বৈতানন্দজী কর্তৃক ত্রিনিদাদে একটি হিন্দু-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

সম্ভব শ্রমিকে পরিপূর্ণ করা হইত। ঐ বদ্ধ গৃহগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকগণ কয়েদীর ন্যায় জীবন যাপন করিত। তাহাদের সাত দিনের মধ্যে এক দিনও কর্মে বিরতি থাকিত না। প্রতিদিন ছয়-সাত আনা পারিশ্রমিকে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। চিকিৎসার বালাই ছিল না। অসুস্থতানিবন্ধন কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিয়া কৈফিয়ৎ দিতে বিলম্ব হইলে তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে বেত্রাঘাত করা হইত।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সকল শ্রমিককে পঞ্চবার্ষিক চুক্তিতে (অর্থাৎ, 'পাঁচ বৎসর পরে বিনা খরচে তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দেওয়া হইবে') লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে, চুক্তির সর্ত্ত পালন করা দূরে থাকুক, তাহাদের সামান্যতম দাবিগুলি পূরণেও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। কখনও কখনও আবেদন-নিবেদনের পর তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দান করা হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও অনেকে স্বদেশে ফিরিতে ভরসা পাইত না, কারণ সমুদ্রপথে তাহাদের অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতে হইত। ইহার পর তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করে যেন তাহাদিগকে পৃথক ভাবে থাকিবার সুযোগ দান করা হয়। ফলে তাহারা পৃথকভাবে বসবাসের জন্ত জমি পায়। তাহাতে সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবার ব্যবস্থাও করা হয়। কৃষিই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা হইল। স্থায়ী ভাবে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে ত্রিনিদাদে নবনির্ম্মিত একটি হিন্দু-মন্দির

তাহাদের ছিল না; ঐ পুনর্বাসনকে তাহারা সাময়িক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। সুযোগ পাইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে এই আশা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহাদের সমস্ত ইচ্ছাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্ত পরে ঐ দূর প্রবাসকেই ভারতীয়েরা স্থায়ী বাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করে। পুরুষানুক্রমে ঐ সুদূর প্রবাসেই তাহারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। তাহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ দ্বীপদেশ ক্রমশঃ শস্যশ্যামল জনপদে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে এই উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্থিক সচ্ছলতা, বৃত্তির বিভিন্নতা এবং শিক্ষা ও পরিবেশের জন্য তাহারা তিনটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে উকিল, ব্যারিষ্টার, চিকিৎসক, বড় বড় শিল্পপতি; দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষেতের মালিক, সরকারী চাকুরিয়া এবং তৃতীয় শ্রেণীতে অশিক্ষিত শ্রমিক। শেষোক্ত শ্রেণীই—প্রবাসী ভারতীয়। কৃষিই ইহাদের একমাত্র সম্বল। তাহারা শস্যক্ষেত্রে শ্রমিক যোগায়, উপনিবেশের উন্নতি

ত্রিনিদাদে হিন্দু-মন্দির

সমৃদ্ধিতে তাহাদের দান প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহাদের জীবন-যাত্রার মান অতি নিম্নে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ত্রিনিদাদের অধিবাসী সাড়ে সাত লক্ষ। তাহাদের জন্য একটিও উচ্চ ইংরেজী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই। ঐ স্থানে ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দুর বাস। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলনের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান একটিও ঐ স্থানে দেখা যায় না। শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত হইলেও আজ তাহাদিগের মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। তাহারা বর্ত্তমানে নিজেদের স্বাধীন ভারতের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তাহারা নূতন আলোকের সন্ধান লাভ করিবে।

শতাধিক বৎসরের মধ্যে এখানকার ভারতীয়গণের সামাজিক জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহারা পাশ্চাত্য ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় রীতি-নীতিও তাহারা ভুলিতে বসিয়াছে। কয়েক জন করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এক-একটি কলোনীতে থাকেন; তাহাদের চেষ্টায় কোনও কোনও স্থানে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। কোনও কোনও স্থানে শিব-পূজা, মহাবীর পূজা, গীতা ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। দুই এক স্থানে শিবমন্দির ছাড়া ধর্ম্মীয় অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি-গোচর হয় না। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ এবং শ্রেণী-বিভাগও আছে। সনাতনী হিন্দু, আর্য্যসমাজী, কবীরপন্থী প্রভৃতিই প্রধান। সনাতনীগণ ছুঁৎমার্গকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে এবং আর্য্যসমাজীগণ মূর্ত্তি পূজার বিরোধী। সেইজন্য কোনও প্রচারককে ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও হিন্দু ধর্ম্মের আসল বৈশিষ্ট্য প্রচারের সময় ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

বিদেশে হিন্দুদের সংগঠনী প্রতিভা বস্তুগত হইতে পারে নাই। যদি তাহারা অনৈক্য পার্থক্য ভুলিয়া সংঘবদ্ধ না হয়, তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক যাহার মাধ্যমে ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, ছাত্রাবাস ও জনহিতকর সংস্থানসমূহ গড়িয়া উঠিবে। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক ভাবধারায় ঐগুলিকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রচারক প্রেরণ করা দরকার। ত্রিনিদাদে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক দলের পক্ষ হইতে প্রেরিত এক পত্রে জানা গেল যে, ঐ স্থানে ভারতীয় ভাষায় কোনও সংবাদপত্র নাই। সেইজন্য পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাকে দৃঢ় করিবার জন্য হিন্দী ভাষায় পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহা দ্বারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের পথ সুগম হইবে।

সঙ্ঘের প্রচারকদল বহির্ভারতে হিন্দু—তথা ভারতীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যদিও হিন্দুগণ আপনাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে; যদিও তাহারা মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে তবুও এই প্রচারক দলের প্রচারের ফলে বহির্ভারতে হিন্দুদের ভিতর একটি জাগরণ আসিয়াছে। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় প্রেম, মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সঙ্ঘের প্রচারকগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের হিন্দু তথা ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহারা এই প্রচারক দলকে বহির্ভারতে স্থায়ীভাবে প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবার জন্য সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ এবং ভারত-সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রায় এক বৎসর অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে সন্ন্যাসিগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ২২টি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ত্রিনিদাদে প্রধান কেন্দ্রের ভার স্বামী পূর্ণানন্দের উপর অর্পিত হইয়াছে। কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত পূজা, আরতি, বৈদিক সন্ধ্যা, যজ্ঞ, ভজনকীর্ত্তন, হিন্দী পাঠ-

শালা নিয়মিত চলিতেছে। স্বামীজী ঐ স্থানে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্বামীজী লিখিয়াছেন, "প্রচারের জন্ত একটি মোটর পাইয়াছি। ৪ মাসে সর্ব্বাধিক ৮০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ

ত্রিনিদাদে ভারতীয় শ্রমিকের কুটীর

করিয়া দূর দূর গ্রামে গিয়া ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, গীতাব্যাখ্যা, শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও উৎসাহদান, স্থানীয় ধর্ম-সংসদে সাপ্তাহিক প্রার্থনা-সভা পরিচালনা, যজ্ঞ, পূজা, আরতি সম্পন্ন করা ও করান, আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দী স্কুলগুলি পরিদর্শন, বৈদিক সন্ধ্যা শিক্ষাদান, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা বা সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমবেত সম্মেলনে সমালোচনার যথাযথ মীমাংসা, আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন ও কার্য্যাবলী সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার পরামর্শ দিতেছি। হিন্দী স্কুলগুলি যাহাতে ভালভাবে চলে, সেই দিকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। এক একটি জেলা ধরিয়া ঘরে ঘরে যাহাতে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় যাহাতে গৃহের সকলে প্রার্থনায় যোগদান করে, সেই দিকে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতেছি। হিন্দী স্কুলের শিক্ষকগণের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া স্কুলগুলিতে একটি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার ও ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে হিন্দীভাষা এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যপাঠ্য ভাষারূপে গৃহীত হয়।..."

সঙ্ঘের সন্ন্যাসী প্রচারকগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ সফলতার সহিত প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ব্রিটিশ গিনিতে (দক্ষিণ আমেরিকা) গমন করেন। সেই স্থানেও তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভ্যগণ এটকিনসন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিলে প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ জন গুচ, সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য মাননীয় ডাঃ জে. বি. সিংহ, ইন্ডোগায়েনিজ গুড্উইল সার্ভিসের সভাপতি মিঃ জে. প্রভুদাস, কেন্দ্রীয় সংবর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি মি. এস. পি. সিংহ, সম্পাদক মিঃ দীনদয়াল সিংহ প্রমুখ সহস্র জন বিশিষ্ট ভারতীয় তাঁহাদিগকে

ত্রিনিদাদে কোকোর বাগানে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিক

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমানঘাঁটি হইতে একুশ মাইল দূরবর্ত্তী জর্জ টাউন শহরে সকলগণ নীত হন। শহরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বেতারকেন্দ্র হইতে মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয় এবং প্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে মিশনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রদেশের সর্ব্বত্র ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বেতারকেন্দ্র হইতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

ব্রিটিশ গিনিতে প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয় প্রবাসী স্থায়ীভাবে বাস করে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা এক লক্ষ একুশ হাজার। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের চিনির কলগুলিতে শ্রমিক হিসাবে আগমন করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ইহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান হইতে তিন শত ভারতীয় স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে। বহুদিন মাতৃভূমি হইতে দূরে থাকার ফলে প্রবাসী ভারতীয়গণ নিজেদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ। পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য আবহাওয়ার ভিতর থাকিতে থাকিতে ব্রিটিশ গিনির প্রায় বাইশ হাজার হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) মধ্যাহ্নে ব্রিটিশ গিনির গবর্ণর স্যার চার্লস উলী মিশনের সভ্যগণকে এক সংবর্দ্ধনা-সভায় আপ্যায়িত করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হলে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে উহাঁর পৌরোহিত্যে

এক বিরাট জনসভায় মিশনকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভ্যগণের পরিচয় প্রদান করিয়া ব্যারিষ্টার সুগ্রীব সিং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, "কেবলমাত্র প্রবাসী ভারতীয়গণই বহির্ভারতে এই

ত্রিনিদাদে আর্য্যসমাজ মন্দির

সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের জন্য সঙ্ঘের নিকট ঋণী থাকিবে না,—জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ও সঙ্ঘের নিকট সম ভাবে ঋণী থাকিবে।" সভাপতি স্যার চার্লস উলী মিশনকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন, "আজিকার স্মৃতি আমার দীর্ঘকাল সিংহলে অবস্থানের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। আমি সেখানে ভারতীয় সন্ন্যাসীর যে উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় পাইয়াছি তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ভারতের নিকট চিরঋণী থাকিব। এই জাতীয় প্রচারক প্রেরণের জন্য ভারতের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এই জাতীয় সাংস্কৃতিক মিশন—যাহার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্, তদ্দ্বারা কেবল এখানকার ভারতবাসীর নহে, অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রভূত কল্যাণ হইবে। প্রেম ও মৈত্রীই ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে বিশ্বের আধুনিক দুরূহ সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।" পরিশেষে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক-দলকে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

পোর্ট অব স্পেনের মেয়র মিঃ আর. বি. গজরাজ জনসাধারণের পক্ষ হইতে মিশনকে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া বলেন, "আজ দক্ষিণ আমেরিকা ভারতের সংস্কৃতির প্রচারকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। কেননা ভারতীয় সন্ন্যাসীর পদার্পণ এই দেশে ইহাই প্রথম।" সংবর্দ্ধনার উত্তরদান-প্রসঙ্গে মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বলেন, "মিশনকে সম্মানিত করিবার জন্য আপনাদের যে আকুল আগ্রহ, তাহা ভারতের সনাতন আদর্শ, তথা সভ্যতার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ হইতে এত দূরে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াও ভারতের সংস্কৃতিকে ধরিয়া থাকিবার জন্য আপনারা যে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী হিন্দুর নিকট আদর্শরূপে প্রতিভাত হইবে।" প্রবাসী ভারতীয়গণের দায়িত্ব, তথা কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলেন, "বিদেশে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশকে মাতৃভূমিরূপে মান্য করিয়া তাহার উন্নতি-প্রগতির সহিত নিজেকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিলেও ভারতমাতাকে বিস্মৃত হইলে নিদারুণ কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করা হইবে। বিদেশে ভারতীয়গণকে দেখিয়াই বিজাতীয়গণ ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ ও সভ্যতার বিচার করিবে।"

স্থানীয় সরকারের শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য ডাঃ জে. বি. সিংহ সম্মেলনে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আদর্শ, তথা সংস্কৃতি মিশনের দ্বারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে নৈতিক ও ধর্ম্মীয় জাগরণ আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। জনসভায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

মিশনের সদস্যগণ চারি মাসকাল দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ গিনিতে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শসমূহ প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে সকল শ্রেণীর নর-নারীর মধ্যে অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই মিশনের নিকট হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও ভাবধারা জানিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। মিশনের প্রচারকগণ ব্রিটিশ গিনির প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভারতের পথে নিউইয়র্ক হইয়া লণ্ডন শহরে পৌঁছিয়াছেন। ত্রিনিদাদের বিমানঘাঁটিতে সদস্যগণকে বিপুল সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বহুদূর হইতে শত শত প্রবাসী ভারতীয়—সদস্যগণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য সমবেত হইয়াছিল। স্বামীজী তাহাদিগকে মাতৃভূমির মহান্ আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রক্ষা করিবার আবেদন জানাইয়া ভাষণ দেন। স্বামীজী পুনরায় বিদেশে মিশন প্রেরণ করিবার আশ্বাস তাহাদিগকে প্রদান করেন। মিশনের প্রচারের প্রভাব প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে এমনভাবে পড়িয়াছিল যে, বিদায়কালে তাহারা অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই।

জানুয়ারীর (১৯৫২) প্রথম সপ্তাহে মিশন লণ্ডন নগরীতে অবতরণ করেন। লণ্ডনেও তাঁহারা অভ্যর্থিত হন। ডাঃ থাকর ও ডাঃ কুমুটি তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের এবং অবস্থানের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় ছাত্র-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সুরজভান মিশ্র এবং নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ডাঃ কৃষ্ণধন কুমরিয়া কর্তৃক মিশনের সদস্যগণ সংবর্দ্ধিত হন। ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী স্থানীয় ভারতীয় ছাত্রগণের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মিশনের সভ্যগণ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ ব্যুরো, হাউস ক্রিসেণ্ট, চিসউইক, আর্লকোর্ট প্রভৃতি ভারতীয় এবং

মিশ্র ছাত্রনিবাসগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। লণ্ডন শহরে মিশনের সদস্যগণ বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভাসমিতি, ধর্ম্মালোচনা, ছাত্র-সমাজে নৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। ২০শে জানুয়ারী মিশনের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ ব্যুরো হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ছাত্রগণের এক সম্মেলনে মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী 'আদর্শ ছাত্র-জীবন' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

লণ্ডন শহরে প্রচাররত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের চিঠিপত্রাদি হইতে ঐ স্থানের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত হইতে আগত ছাত্রগণ ব্যতীত শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই স্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশী, তন্মধ্যে বাঙালী, মাদ্রাজী ও পঞ্জাবীই প্রধান। অল্পসংখ্যক গুজরাটী এবং সিন্ধীও আছেন। ব্যবসায়ী, অধ্যাপক এবং বে-সামরিক কর্ম্মচারী ছাড়াও প্রায় ছয় শত হিন্দু চিকিৎসক আছেন। আর্থিক অবস্থা প্রায় সকলেরই সচ্ছল। লণ্ডনে হিন্দুর সামাজিক তথা ধর্ম্মীয় দুরবস্থার প্রতি যে-কোন ধর্ম্মপ্রচারকের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়।

এখানে অল্পসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানের বাস। তাঁহারা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চারিটি মসজিদ পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে এই মসজিদগুলিতে তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। অল্পসংখ্যক শিখও তাঁহাদের গুরুদ্বারে সমবেত হন। কিন্তু হিন্দুর কোন মিলনের স্থান নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহাদি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের যাজক আছেন; কিন্তু হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কোন পুরোহিত নাই।

বহুসংখ্যক হিন্দু শ্বেতাঙ্গ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দুরহিয়াছেন। হিন্দু সমাজে ঐ নবাগতা শ্বেতাঙ্গ রমণীগণ যদিও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীলা তথাপি তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের মহান্ বাণী শুনাইবার মত কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই তাহাদের সন্তানসন্ততি হিন্দুধর্মের কোন শিক্ষা না পাইয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে।

হিন্দু এসোসিয়েশন নামে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার কর্তৃপক্ষ অনেক দিন হইতেই একটি হিন্দু মন্দির অথবা মিলনকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারকগণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। প্রচারকগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় লণ্ডনের হিন্দুদের মিলন-কেন্দ্ররূপে ব্যবহারযোগ্য একটি ভবনের জন্য উপযুক্ত চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই উহার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

যদিও বিদেশে বহুসংখ্যক হিন্দু একত্রে বাস করেন তথাপি ধর্ম্ম তথা সংস্কৃতির প্রচারের অভাবে শত শত হিন্দু ধর্ম্মান্তর

স্বামী অদ্বৈতানন্দজী কর্তৃক ত্রিনিদাদে একটি মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

গ্রহণ করিতেছে। বহির্ভারতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক কোটি হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ভারতরাষ্ট্র হইতে তাহাদের সামাজিক তথা ধর্ম্মীয় সত্তা রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিবেও না। তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে এই সমস্ত দেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসী হিন্দুগণের ধর্ম্মীয় চেতনা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বর্ত্তমানে এই প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই প্রচারকার্য্যকে ব্যাপকভাবে পরিচালনের জন্য উহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রস্বরূপ কলিকাতায় "ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সঙ্ঘের পরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধান বনাম পাট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নূতন সেন্সাস প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলার লোক-বল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। তবে বাংলার মন্ত্রী-মহোদয়গণের বিবৃতি থেকে মনে হয়, পশ্চিম বাংলার আনুমানিক লোকসংখ্যা এখন আড়াই কোটি। ১৯৩১-৪১ দশকে লোকবৃদ্ধির হার ধরে হিসাব করলেও এ অনুমানই সঠিক বলে মনে হয়। ১৯৪১-এর পর লোকসংখ্যা শতকরা দুই জন করে বছরে বেড়েছে ধরলে পাওয়া যায় :

বর্ষ	লোকসংখ্যা
১৯৪১	২,১১,৯৬,০০০
১৯৪৭	২,৩৭,৪০,০০০
১৯৪৯	২,৪৫,৮৭,০০০
১৯৫০	২,৫০,১১,০০০

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলার সমস্যা হ'ল ন্যূনকল্পে আড়াই কোটি লোকের খাওয়া-পরার সংস্থান করা।

১৯৪১-এর সেন্সাস অনুযায়ী ভারত ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই লোকের বসতি সর্ব্বাপেক্ষা ঘন। পশ্চিম বাংলার পরই যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের স্থান—

রাজ্য		প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
আসাম	...	১৪৭
পশ্চিম বাংলা	...	৭৫১
বিহার	...	৫২১
উড়িষ্যা	...	২৭১
মধ্য প্রদেশ	...	১৭১
যুক্ত প্রদেশ	...	৫১৮
মাদ্রাজ	...	৩৯১
বোম্বাই	...	২৭০
পূর্ব্ব পঞ্জাব	...	৪০৮
ভারত ইউনিয়ন	...	৩৬৭

স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর 'প্রদেশ'গুলির নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'রাজ্য' এবং তাদের পরিধিও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যের পরিধিই বিস্তারলাভ করেছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার পরিধির ইতর-বিশেষ কিছুই হয় নি বলা চলে—মাত্র কোচবিহার রাজ্যের ১৩০০ বর্গমাইল সংযুক্ত হয়েছে (এই আলোচনায় কোচবিহারের কথা ধরা হয় নি)। পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যাও কিছু কিছু বেড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু লোকের চাপ যে সেই অনুপাতে অত্যধিক হয়েছে তা মনে হয় না। ১৯৫১ সনের সেন্সাসই সে প্রশ্নের জবাব দেবে। পশ্চিম বাংলার কথা আলাদা। ১৯৪১ সনের তুলনায় লোকের চাপ পশ্চিম বাংলায় যে বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। লোকসংখ্যা আড়াই কোটি ধরে হিসাব করলে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬০। লোকসংখ্যার গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে এতেও বোঝা যায় না। সেজন্য দেখার প্রয়োজন লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য (কর্ষিত ও পতিত) জমির পরিমাণ কিরূপ। এই ভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সতের জন লোককে নির্ভর করতে হয় মাত্র দশ একর জমির উপর। যে দেশে (বিশেষতঃ যে দেশ কৃষিপ্রধান) মাত্র এক একর জমির উপর একাধিক লোককে নির্ভর করতে হয়, সে দেশে লোকবসতি-সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যা যে সঙ্কটজনক হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অনুসন্ধানের ফলে অধ্যাপক মহলানবিশ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রতি সপ্তাহে বাংলার অধিবাসী গড়ে ৩'৫৮ সের খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। গবর্ণমেন্টের খাদ্যনীতি এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বীকার করে নি', অর্থাৎ, যদি ধরে নেওয়া যায় যে মাথা-পিছু গড়ে—সাড়ে চার মণ (অথবা সপ্তাহে সাড়ে তিন সের) চাল প্রয়োজন, তা হলে পশ্চিম বাংলায় ২,৫০,১১,০০০ অধিবাসীর জন্য বছরে প্রয়োজন হবে ১১,২৫,৫১,০০০ মণ (বা ৪১,৬৯,০০০ টন) চাল। কিন্তু লোকসংখ্যা আড়াই কোটির বেশী হলে এতেও কুলাবে না। পশ্চিম বাংলায় ২,৩৫,০০,০০০ একর ভূমির মধ্যে মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ চলতে পারে। ১,৪১,০০,০০০ একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ একর জমি চাষ-যোগ্য হলেও পতিত। একর-প্রতি উৎপাদন-হার ৮০৬ পাউণ্ড ধরে কর্ষণযোগ্য (কর্ষিত ও পতিত) ১৪১ লক্ষ একর জমিতে একমাত্র ধানই চাষ করা হয়েছে যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হলেও মোট ৫১ লক্ষ টনের বেশী চাল আমরা পাই না। এই ফসল পেলে পশ্চিম বাংলার চাহিদা কোন রকমে মিটতে পারে। কিন্তু একমাত্র ধান বোনাও চলে না বা সব পতিত জমি এখনই ধানচাষে লাগান যায় না। ধান বোনা হয় গড়ে ১ কোটি একর জমিতে এবং তা থেকে পাওয়া যেতে পারে (৮০৬ পাউণ্ড উৎপাদন হার ধরে) ৩৬ লক্ষ টন চাল অথচ আমাদের প্রয়োজন ন্যূনকল্পে ৪১,৫৯,০০০ টন চালের

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে কতকটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পতিত জমি উদ্ধার করে যে বিশেষ সুরাহা হবে তাও মনে হয় না, কেননা কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ পশ্চিম বাংলায় সামান্য—মাত্র বিশ লক্ষ একর। অধিকাংশ পতিত জমিই হচ্ছে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দার্জ্জিলিং জেলায়। ল্যাণ্ড কমিটির মতে—

জেলা	শতকরা কত জমি পতিত কিন্তু কর্ষণযোগ্য
বীরভূম	৮·০
বর্দ্ধমান	৬·৬
বাঁকুড়া	১৫·১
হুগলী	৬·৩
হাওড়া	৬·৩
মেদিনীপুর	১১·১
মুর্শিদাবাদ	১২·৫
নদীয়া	১৪·৬
২৪ পরগণা	৪·৪
দার্জ্জিলিং	১১·২
জলপাইগুড়ি	৬·৮
দিনাজপুর	১৪·৩
মালদহ	৮·৯

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চাষযোগ্য সব জমিতেই প্রায় চাষ করা হয়। সুতরাং পতিত জমিকে চাষে লাগিয়ে ফসল বাড়ানোর কল্পনা অবাস্তব। সেচের ব্যবস্থা, নালার সংস্কার এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতিরোধের উপায় না করা পর্য্যন্ত পতিত জমি উদ্ধারের কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে। তা ছাড়া বর্তমান পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্টের অর্থসঙ্গতির কথাও ভাবতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে জমির উদ্ধার-সাধনের অর্থই হ'ল ব্যয়বাহুল্য এবং তাও সহজসাধ্য হয় যদি নাকি একসঙ্গে একটানা বিস্তৃত জমি পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলায় যে পতিত জমি রয়েছে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; ১০০ একর ব্লক-ওয়ালা পতিত জমির পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগেরও কম। গবর্ণমেণ্টের বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হলে হয়ত পতিত জমির কতক পরিমাণ উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তার পূর্ব্বে নয়। পক্ষান্তরে নদ-নদী মজে যাওয়ার ফলে কর্ষিত জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই কমে আসছে; নদীর জল জমাট হয়ে আসায় জলপ্লাবনের প্রাদুর্ভাবও বেড়েই চলেছে। আর আছে প্রকৃতির খেয়াল। তাই ফসল না বেড়ে ক্রমশঃই কমে আসছে। আরও দেখছি নদীগুলির দুই কূলে বহুই শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে, চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ততই বেড়ে যাচ্ছে—

জেলা	কর্ষণের অযোগ্য জমি: ফ্লাড্ সার্ভে	কর্ষণের অযোগ্য জমি: সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট	− হ্রাস ও + বৃদ্ধি
বর্দ্ধমান	৩১৪,৪২৬·০৫	৩০১,৯৯৫·০০	+ ১২,৪৩১·০৫
হুগলী সদর	৪২,২০৯·৬৯	৪২,০৯৬·৫৪	+ ১১৩·১৫
শ্রীরামপুর	৪২,৪৮৬·৩১	৩৮,৯১১·৪৫	+ ৩,৫৭৪·৮৬
হাওড়া	৬৬,০৬৭·২২	৬৩,৯৩৬·৮৫	+ ২,১৩০·৩৭
মেদিনীপুর	৫৯৭,৬৬৪·৫৯	৫৩৩,০৮৫·৪৭	+ ৬৪,৫৭৯·১২
ব্যারাকপুর	২১,৮৭১·৩০	১৭,৪৮০·৫৩	+ ৪,৩৯০·৭৭
বারাসত	৩৮,৩৪৬·৫৯	৩৩,৫১০·২২	+ ৪,৮৩৬·৩৭
ডায়মণ্ড-হারবার	১০২,২৭৮·০৫	৯৯,৫৮৪·৩৯	+ ২,৬৯৩·৬৬

উপরের হিসাবগুলি পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত মিঃ ইসাকের রিপোর্ট হতে নেওয়া। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কর্ষিত জমি—কর্ষণের অযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। অন্য দিকে বাংলা-বিভাগের পর বাস্তুহারাদের আগমনের ফলে নানা নগর গড়ে উঠছে। গবর্ণমেণ্টের 'স্যাটেলাইট' টাউন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে আরও কিছু চাষের জমি নষ্ট হবার সম্ভাবনা। অতএব ঝোঁক যা দেখছি তা চাষের জমি বাড়ার দিকে নয়, কমে আসার দিকেই এবং বাংলাদেশে চাষের জমি হ্রাস পাওয়ার অর্থই হ'ল ধানের জমির হ্রাস, সুতরাং পশ্চিম বাংলার প্রধান সমস্যাই হ'ল ধান চাষের জমির সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন।

পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হ'ল পাট। বাংলা-বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় পাটের চাষ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—

বর্ষ	পাটচাষের জমির পরিমাণ
১৯৪৩-৪৪	২৪০·৫ সহস্র একর
১৯৪৪-৪৫	১৯৩·৫ ,, ,,
১৯৪৫-৪৬	২০২·৮ ,, ,,
১৯৪৬-৪৭	১৫২·০ ,, ,,
১৯৪৭-৪৮	২৬৬·৪ ,, ,,
১৯৪৮-৪৯	৩৪৯·৯ ,, ,,
১৯৪৯-৫০	৪৯৮·০ ,, ,,
১৯৫০-৫১	৬৫০·৭ ,, ,,

ধানের প্রধান প্রতিযোগী হ'ল পাট; তাই পাটচাষ বাড়লে ধানের জমি হ্রাস পায়। পতিত জমিতে চাষ করার ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পেলেও, কিছু পরিমাণ ধান-জমিতেও যে পাটচাষ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলার খাদ্য-সচিব স্বীকার করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার পাটচাষ খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সহায়ক না হয়ে, প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন এবং গবর্ণমেণ্টের খাদ্য-সংগ্রহ নীতি ধানচাষীকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি; পাটচাষই তার কাছে

অধিকতর লোভনীয় মনে হয়েছে। অন্য দিকে আছে পাট-কলওয়ালাদের বিপুল অভিযান। 'জুট মিলস্ এসোসিয়েশন' তাদের বিপুল অর্থশক্তি দিয়ে পশ্চিম বাংলায় পাটচাষ বাড়ানোর সপক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছিল তাতে আমরাও যোগ দিয়েছি; 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জ্জনের দোহাই দিয়ে গবর্ণমেণ্টও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আজ তারই ফলে হয়েছে ধানের ক্ষেতে পাটের আবির্ভাব। খাদ্য আমদানীর জন্য চাই 'ফরেন এক্সচেঞ্জ', আর পাট বেচে পাই 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' এবং পাটের ব্যাপকতার অর্থ হ'ল খাদ্য-উৎপাদন হ্রাস। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াল, পাটচাষের ফলে খাদ্যের অভাব হ'ল তীব্রতর এবং সেই খাদ্যাভাব মেটাতে বেচতে হল পাট।

'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জ্জন তখনই হয় সার্থক যখন ঐ অর্জ্জিত টাকার বদলে এমন সব পণ্য আমদানী করা যায় যা দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়ক হয়, অর্থাৎ যদি ভোগ্য-পণ্য আমদানী না করে উৎপাদন-সহায়ক পণ্য (যাকে বলে প্রোডাকশন্ গুড্ স্) আমদানী করা যায় তবেই 'ফরেন এক্সচেঞ্জে'র সদ্ব্যয় হয়। ভারতের পক্ষে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জ্জনের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল পাট বা পাটজ পণ্য রপ্তানী। পাট ও পাটজ পণ্যের প্রধান কেন্দ্র হ'ল পশ্চিম বাংলা। ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানী করে ভারত যে টাকা উপার্জ্জন করেছে তার একটা নগণ্য অংশ ব্যয় হয়েছে খাদ্যশস্য আমদানী করতে।

দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে রপ্তানিকারক দেশগুলির চড়া দর হাঁকাও কিছু বিচিত্র নয়।

বাংলার অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, পশ্চিম বাংলার পাট-শিল্পই হয়ে উঠেছে বাংলার আর্থিক বিপর্য্যয়ের অন্যতম প্রধান হেতু। যে শিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ও লক্ষ লক্ষ লোক খাটছে, সেই শিল্প দেশের অর্থনীতিকে বিপর্য্যস্ত করছে একথা সহজে মন মানতে চায় না—সুতরাং কথাটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। বাংলার অর্থনীতিতে পাট-শিল্পের দাম কতটুকু? পাটশিল্পে বহু লক্ষ টাকা মুনাফা হলেও বাঙালী পাটচাষীর অবস্থা কি খুব সচ্ছল? পাটশিল্পে লাভের ষোল আনাই যায় 'মিড্ লম্যান' (ফড়িয়া) আর পাট-কলওয়ালাদের ঘরে। চাষী পাট উৎপাদন করতে যে অমানুষিক পরিশ্রম করে তার বদলে পাট বেচে যা পায় তাতে সে 'সাবসিষ্টেন্স লেভেলের' উপরে উঠতে পারে না; পাটের বদলে অপর কোন ফসল চাষ করলে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমে ঐ 'সাবসিষ্টেন্স লেভেলের' উপযুক্ত উপার্জ্জন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সেদিক থেকে পাট-চাষের ফলে পশ্চিম বাংলা যে বিশেষ লাভবান হয়েছে তা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাট-কলগুলি পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত হলেও তাদের মালিক প্রায় ষোল আনাই বাংলার বাইরের লোক। কেরাণী-শ্রেণীর কিছু লোক বাদ দিলে শ্রমিক শ্রেণীর অন্যূন অর্দ্ধেকাংশ বাংলার বাইরের লোক এবং এরা যা উপার্জ্জন করে তাও চলে যায় বাংলার

বর্ষ	কাঁচা পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানি	শস্য ডাল, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যপণ্য আমদানী	রপ্তানীর শতকরা হিসাবে আমদানী
১৯৪০-৪১	৫৩,২৩,০৬,০০০ টাকা	১৪,৩৪,৮৫,০০০ টাকা	২৭
১৯৪১-৪২	৬৪,৩১,২৭,০০০ ,,	১৫,০২,০৩,০০০ ,,	২৩
১৯৪২-৪৩	৪৫,৪২,৫০,০০০ ,,	৩০,৮৫,০০০ ,,	১-এর কম
১৯৪৮-৪৯	১,৭০,৫১,৫০,০০০ ,,	৮৭,৩০,৫২,০০০ ,,	৫১
১৯৪৯-৫০	১,৪৩,৭২,১৭,০০০ ,,	৯৯,৫৩,৯৯,০০০ ,,	৬৯
১৯৫০-৫১	১,১৩,৯৪,৬৬,০০০ ,,	৮০,২৬,৪৮,০০০ ,,	৭১

১৯৪০-৪১-এ মাত্র শতকরা ২৭ টাকার খাদ্যশস্য (অর্থাৎ ভোগ্য-পণ্য) আমদানী করলেও ১৯৫০-৫১-তে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭১ টাকায়। তা হলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর পাট ও পাটজ পণ্য বেচে যা 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জ্জন করা হয়েছে তার প্রায় সবটাই আমরা খেয়ে শেষ করে দিয়েছি। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' অধিকতর পরিমাণে উপার্জ্জনের প্রয়াসে পাট রপ্তানির প্রতি যত অধিক নজর দেওয়া হবে, ধান উৎপাদনের পরিমাণ ততই হ্রাস পেতে থাকার কথা, অর্থাৎ যে পথে আমরা চলেছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; পক্ষান্তরে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের এই

বাইরে। সুতরাং বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধিতে তাদের দান নগণ্য।

এ কথার প্রাদেশিকতার বিভীষিকা কেউ কেউ দেখলেও এখানে শুধু দেখাতে চেয়েছি বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাট-শিল্পের স্থান কোথায়। তা হলে কি পাটশিল্পের কোন দামই নেই বাংলার অর্থনীতিতে? আছে বৈকি! ট্যাক্স ও শুল্ক বাবদ থেকে যা আদায় হয় তার একটা সামান্য অংশ পশ্চিম বাংলা সরকার পান। পাট বিক্রয় করে সেল-ট্যাক্স বাবদ পশ্চিম পাটশিল্প বাংলা সরকার পান আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা। শুল্ক হিসাবে পাট ও পাটজ পণ্য থেকে আদায় হয় বছরে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টাকা; অথচ তা থেকে পশ্চিম বাংলায় বরাদ্দ

মাত্র ১০৫ লক্ষ টাকা। আর ইন্‌কাম ট্যাক্স বাবদ পশ্চিম বাংলা-সরকার পান প্রায় ৬ কোটি টাকা। ইন্‌কাম ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ পাট ও পাটজ পণ্য থেকে যা আদায় হয় তার একটা নগণ্য অংশ এই ৬ কোটি টাকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পাট ও পাটজ শিল্প থেকে পশ্চিম বাংলার পাওনা মোটামুটি একুনে প্রায় দুই কোটি টাকা। পশ্চিম-বাংলার শুধু খাত খাতেই যেখানে ২৫ কোটি টাকার উপর সেখানে তার সবচেয়ে বড় আয়ের পথ থেকে তার প্রাপ্য মাত্র দু' কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা স্থানীয় অধিবাসী-দের খাত থেকে বঞ্চিত করে পাট বেচে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জ্জন করছে সারা ভারতের খাত-সমতা সমাধানের জন্ত। আর এই স্বার্থত্যাগের জন্ত সে পাচ্ছে পাটশিল্প থেকে আন্দাজ দু' কোটি টাকা মাত্র। পাটশুল্ক নিয়ে পশ্চিম বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা এ থেকেই বুঝা যাবে। খাত ঘাটতির জন্ত প্রতি বৎসর যে পরিমাণ খাতশস্ত পশ্চিম বাংলাকে আমদানী করতে হচ্ছে বাংলা এবং ভারতের বাইরে থেকে, তার মূল্যও সঙ্কুলান হয় না পাটশিল্প থেকে পাওয়া এই দু' কোটি টাকা দিয়ে।

সুষমা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

১

শৈলেশ অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্ত বারে বাড়ী ফিরে যে আনন্দ সে পায়, আজ তার কণামাত্রও পেলে না। পদ্মপুকুরের পদ্মগুলো যেন তাদের সৌন্দর্য্য হারিয়ে ফেলেছে, গ্রামের নিকটের শালবনের সে আকর্ষণ-শক্তি আজ আর নেই।

সুষমা কিনা বিয়ে করলে জগদীশকে। জগদীশ, যার বয়স চল্লিশের কোঠায় এসে পড়েছে, মাথাভরা যার টাক, নিত্য গোঁফদাড়ি না কামালে যার মুখ কাঁচাপাকা গোঁফদাড়িতে বিসদৃশ মনে হয়, সেই বিগতযৌবন বিগতসৌন্দর্য্য জগদীশকে কিনা সুষমার মত মেয়ে বিয়ে করলে! অথচ সুষমার সৌন্দর্য্যের সীমা নেই—সে শিক্ষিতা, সে আধুনিকা। দোষের মধ্যে তার মা-বাপ নেই, সে মামার ঘরে মানুষ। অর্থের অভাবেই যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে, তা বুঝতে অবশ্য শৈলেশের বাকি নেই। কিন্তু সুষমা তো আপত্তি করতে পারত। বলতে পারত, "আমি বিয়ে করব না।" শৈলেশের সঙ্গে তো তার সেই কথাই হয়েছিল। সুষমা বলেছিল, "আমি তোমার; তোমার ছাড়া আর কারো হব না।" শৈলেশও বলেছিল, "পড়াশুনো শেষ করে অর্থ উপার্জ্জন করি। তার পর তোমায় বিয়ে করা কে ঠেকায়। যদি না দিতে চায়, জোর করে নিয়ে চলে যাব। যাবে ত আমার সঙ্গে?" সুষমা রাজী হয়েছিল, বলেছিল, "ভালবাসা যায় এক জনকে। যাকে ভালবাসা যায় তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করাও যায় না। যে মেয়ে এক জনকে ভালবেসে আর এক জনকে বিয়ে করে তাকে আমি অসতী বলতে কুণ্ঠিত হব না।" সেই সুষমা সব কথা ভুলে বিয়ে করলে জগদীশকে। শৈলেশের মনে হ'ল আর এখানে থাকা চলে না। আজই সে চলে যাবে কর্ম্মস্থলে। যেখানে সুষমা সেখানে তার স্থান নেই।

সুষমার মামা হরিমোহন ছিলেন মফস্বল শহরের এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। শৈলেশ সেই কলেজেই পড়ত। এক গ্রামে বাড়ী বলে হরিমোহনের অন্তঃপুরে তার ছিল অবাধ গতি। সুষমাকে সে-ই তার স্কুলে পৌঁছে দিয়ে কলেজে যেত, ছুটির পর আবার তাকে স্কুল থেকে বাসায় পৌঁছে দিত। তাদের বাসায় বৈকালিক জলযোগ অন্তে সুষমার সঙ্গে এ-ও-তা নিয়ে আলোচনা সেরে একেবারে রাত্রে সে হোস্টেলে ফিরত। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা সুষমাকে পড়াতেও হ'ত। এ সুযোগে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা হ'ল তা একমাত্র হরিমোহনের মত লোকই উপেক্ষা করতে পারেন। শৈলেশ ছিল আবার কবি। তার লেখা মাঝে মাঝে দু'একটা আধুনিক কাগজে প্রকাশিতও হ'ত। তার লেখার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। নিজের লেখার সূত্র ধরে সুষমার সঙ্গে শৈলেশের আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। শৈলেশ যত সব তরুণ সাহিত্যিকের লেখা এনে দিত সুষমার হাতে, সুষমা সে সব গোগ্রাসে গিলত। তার পর দু'জনের আলোচনা সুরু হ'ত। এই সময়েই প্রেম সম্বন্ধে সুষমা একটা ধারণা করে নিয়েছিল এবং শৈলেশের প্রেম-নিবেদনের উত্তরে সে তার মতামত প্রকাশও করেছিল।

সুষমা ম্যাট্রিক পাস করে যখন কলেজে ভর্তি হ'ল তখন শৈলেশের কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করেও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হতে পারল না। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তাকে যেতে হ'ল কলকাতায় এম-এ. পড়তে। ছুটিতে গ্রামে এসে দু'জনার দেখা হ'ত, কথাবার্ত্তা হ'ত; কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাটা আগের মত জমত না। তার

পর শৈলেশের পড়া শেষ হ'ল, সুষমাও আই-এ পাস করে গ্রামে এসে বাস করতে লাগল। কিন্তু শৈলেশের অদৃষ্টে গ্রামে বাস করা ঘটল না। চাকরি পেয়ে সে কলকাতাতেই থেকে গেল। সওদাগরি আপিস, ছুটি নেই বললেই হয়। তাই উভয়ের দেখাশোনাও হয়ে গেল বন্ধ। শৈলেশের সংসারেও এক বিধবা পিসীমা ছাড়া আর কেউ ছিল না যে, তাকে আসবার জন্ত তাগিদ দেয়। এক ছিল সুষমার তাগিদ—সে তার মনে। সুষমাকে পেতে হলেও চাই অর্থ, চাই কিছু সঞ্চয়। প্রেমের নীড় বাঁধতে গেলেও চাই নীড়বাঁধার উপকরণ। সুষমার মামা তো তার ডিগ্রী দেখেই তার হাতে তাকে সমর্পণ করবেন না। তাই দু'চার দিনের ছুটিতে বৃথা রেল কোম্পানীকে টাকা না দিয়ে শৈলেশ কলকাতাতেই থেকে যেত এবং মনে মনে ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনার জাল বুনত।

ইতিমধ্যে সুষমাদের সংসারে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সদরের বন্ধে সুষমার মামা বাড়ী এসে বিধবা স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও অনূঢ়া সুষমাকে রেখে হঠাৎ মারা গেলেন। মরবার সময় তিনি এক কীর্ত্তি করে গেলেন। হরিমোহনের মধুর স্বভাব এবং গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের জন্ত গ্রামে তাঁর যেসব ভক্ত জুটেছিল জগদীশ তাদের এক জন। কয়েক মাস জগদীশের পত্নী-বিয়োগ হয়েছিল। হরিমোহনের সঙ্গে আলোচনা করে সে শোকে সান্ত্বনালাভ করত। তাই তাঁর কাছে সে প্রায়ই আসত। হরিমোহনের মৃত্যুশয্যার পাশে সেও ছিল। হরিমোহন হঠাৎ তার হাত দুটি ধরে বললেন, "বাবা, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। সুষমার বিয়ের জন্ত কিছু রেখে যেতে পারলাম না। বড় ভাল মেয়ে, ওকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। যদি গ্রহণ করলে, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।" মুমূর্ষু মাতুলের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সুষমা বিমূঢ় হয়ে গেল। নিজেকে সামলে সে কিছু বলবার আগেই জগদীশ তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বললে, "সুষমাকে আমি এই গ্রহণ করলাম। ওর জন্ত আপনার চিন্তা নেই।" মৃত্যুপথযাত্রীর পাণ্ডুর মুখ ক্ষণিকের জন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন; তার পর যে চোখ মুদলেন, তা আর খুললেন না। শৈলেশ এত সব কথা জানত না। তার পর হয়ে গেল সুষমার সঙ্গে জগদীশের বিবাহ। বিবাহের আগে সুষমা অনেক বার মনে করেছে জগদীশকে সব কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করে। কিন্তু রমণীর দুর্জ্জয় লজ্জা এসে তাকে বাধা দিলে। সে কিছুই বলতে পারল না। কৈশোরের কল্পনা আর যৌবনে বাস্তব রূপ পেলে না।

দুই

পিসীমা শৈলেশের জন্ত পরিপাটি করে রাঁধছিলেন। শৈলেশ রান্নাঘরে গিয়ে তাকে বললে, "পিসীমা আজ বিকালের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।" পিসীমা বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কিরে! কত কাল পরে এই কাল রাতে এসেছিস আর আজ বিকেলেই চলে যাবি? দু'দিন থাক। তার পর কাল তোকে ওরা আশীর্ব্বাদ করতে আসবে।" 'আশীর্ব্বাদ' আর 'ওরা' কথা দুটো তার কানে গেল কিনা সে-ই জানে। অথবা তার মনের অবস্থা এমন নয় যে, সে ও দুটো কথার মর্ম পরিগ্রহ করতে পারে। সে হন্ হন্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। কোথায় যাবে তার কিছু স্থিরতা নেই, সে অন্যমনস্কভাবে সামনের পথ দিয়ে হেঁটে চলল। কিছু দূর এসে তার খেয়াল হ'ল সে জগদীশের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই জগদীশের বাড়ীর সদরদরজা। একটু ইতস্ততঃ করে শৈলেশ সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলে।

জগদীশ অবস্থাপন্ন লোক। গৃহের চারি দিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মধ্যে সুবৃহৎ অঙ্গনের অনেকটা স্থান জুড়ে বড় বড় সাত-আটটা ধানের মরাই। তার পর বসবাসের দালানঘর। জগদীশ গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কৃষির আয় থেকেই তার সংসার বেশ চলে যেতে পারে, পরের চাকরি করার দরকার হয় না। কিন্তু জগদীশ তার ক্ষেতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি বড় করে যত আনন্দ পায় স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের মানুষ করতেও ঠিক ততই আনন্দ পায়। শিক্ষকতা তার পেশা নয়, নেশা। শৈলেশ জগদীশের সদর দরজায় পা দিতেই একেবারে জগদীশের সামনে পড়ে গেল। জগদীশ তেল মেখে কাঁধে গামছা নিয়ে বেরিয়েছিল স্নান করতে, আর তার সঙ্গে মাঠে আকের ক্ষেতে জলধরানো ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার তদ্বির করতে। আজ রবিবার। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। শৈলেশকে দেখেই সে একমুখ হেসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "আরে, শৈলেশ যে? এস, এস, তার পর ভাল ছিলে ত? শুনেছি যে তুমি এসেছ। কাল আমি যেতাম তোমার ওখানে।" বলে সে শৈলেশের হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। মরাইগুলো পার হয়েই ঘরের বারান্দায় উঠে ডাকল, "ওগো, কে এসেছে দেখ।"

সুষমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শৈলেশকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তের জন্ত তার গণ্ডে একটা লোহিতাভা এসেই মিলিয়ে গেল। সে নিজেকে সংযত করে বললে, কে শৈলেশ-দা, ভাল ছিলে ত? শৈলেশের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। সে মুখ তুলে সুষমার দিকে চাইতে পারল না। ঘাড় নেড়ে সুষমার কথার জবাব দিলে। জগদীশ বললে, তেল মেখে ফেলেছি। তা না হলে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে গল্প করেই যেতাম। আজ আবার আকের ক্ষেতে জল ধরানো হচ্ছে। আমি না কাছে থাকলে ভাল করে চারায় জল দেবে না। তুমি ততক্ষণ গল্প কর, আমি খুব তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করব।"

সুষমা শৈলেশকে জগদীশের পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বললে, চা খাবে এখন? শৈলেশের বুক দুরু দুরু করতে সুরু করেছে। সে যেন তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুষমা এখান থেকে চলে গেলেই যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কোন রকমে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, তা দিতে পার। সুষমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুষমা তার দিকে পিছন ফিরতেই শৈলেশ তার উপর দৃষ্টি ফেলল। এ সে স্কুল কলেজে পড়া চঞ্চল মেয়ে সুষমা নয়,—এ জগদীশের গৃহিণী, ধীর স্থির সুষমা। শৈলেশের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল। একটু পরেই সুষমা চা নিয়ে এল। শৈলেশ তখন অনেকটা সামলে উঠেছে, সুষমার দিকে মুখ তুলে চাইতেও পারল। বাঃ, সুষমার গায়ের রঙ ত বেশ উজ্জ্বল হয়েছে, দেখতে ঠিক আগের মতই আছে, তেমনি কচি, তেমনি মিষ্টি। সুষমা ফিক করে হেসে বললে, কি দেখছ?

শৈলেশের মুখও খুলে গেল, বললে, তোমার সৌন্দর্য্য।

সুষমা বললে, ভেবেছিলাম তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু ছাড় নি দেখছি—

শৈলেশ মুখ আঁধার করে বললে, কখনও যেন না ছাড়ি। কিন্তু তুমি যে কখনও আমার কবিতা লেখা নিয়ে ঠাট্টা করবে, তা কল্পনাও করি নি—শেষের কথার মধ্যে একটা ব্যথার সুর বঙ্কৃত হ'ল।

সুষমা কিন্তু আদৌ লজ্জিত বা ব্যথিত হ'ল না। তেমনি হাসিমুখে বললে, কল্পনা আর বাস্তবে অনেক তফাৎ আছে শৈলেশদা। জগৎটা কাব্য নয়।

শৈলেশ বিরস মুখে বললে, সে তুমি যখন বিয়ে করেছ তখনই তখনই বুঝেছি—

সুষমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের চাঞ্চল্য দমন করে সে বললে, মেয়েদের বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় কি? বিয়ে করাতে আর কি দোষ হয়েছে?

শৈলেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তোমার মনে আছে কি না জানিনা—কিন্তু আমার বেশ মনে আছে: তুমি বলেছিলে একজনকে ভালবেসে যে আর একজনকে বিয়ে করে সে অসতী।

সুষমার তর্ক করতে শেখা শৈলেশের কাছেই। সে অকুণ্ঠিত ভাবেই বললে, কিন্তু অপরিণত বয়সে কি বলেছি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। তা ছাড়া ভালবাসা সম্বন্ধে আমি জানতাম কি। কতকগুলো বাজে গল্প উপন্যাস পড়ে, আর তোমার সঙ্গে কাব্য আলোচনা করে প্রেম সম্বন্ধে সে বয়সে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তা আমি ঠিক বলে মনে করি না—

শৈলেশ বেদনায় নির্ব্বাক হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বেদনার স্থান অধিকার করলে ক্রোধ, একটা নিষ্ফল আক্রোশও বলা যেতে পারে। সে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললে, তা হলে আমাকে তুমি কখনও ভালবাস নি। ভালবেসেছ, ঐ বিগত-যৌবন, মোটাবয়ে, টাকমাথা, টাকাওয়ালা জগদীশকে—

সুষমা সংযত কণ্ঠে বললে, "দেখ, আমার স্বামী সম্বন্ধে তুমি একটু সম্মান করে কথা বলো। কেন তাঁকে ভালবাসব না, কিসের অভাব তাঁর? তিনি শিক্ষিত ভদ্র, সম্পত্তিশালী—আর রূপ-যৌবনের কথা বলছ? দেহ ও মনের যে রূপ থাকলে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে পারে সে রূপ তাঁর আছে।"—বলে একটু থেমে আবার সে বলে চলল, "আর যৌবন? মানুষের যৌবনের বিচার সব সময় বয়স দিয়েই হয় না। যৌবনের যে শক্তি থাকলে জীবনকে উপভোগ করা যায়, কর্ম্মে উৎসাহ জন্মে সে শক্তি তাঁর যথেষ্ট আছে। আর, আমার বয়সও ত নেহাৎ কম হয় নি—"

অতিআধুনিক তরুণ সাহিত্যিক এবার অকৃত্রিম বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল। কয়েক মাস বিবাহিত জীবন যাপন করে সুষমার মত মেয়ের যে এমন পরিবর্ত্তন হতে পারে, তার চিন্তাধারা যে এমনি ভিন্নমুখী হতে পারে, তা সে ধারণাও করতে পারে নি। সত্যিই বাস্তব আর কল্পনার অনেক তফাৎ।

এই সময় ষোল-সতের বছরের একটি তরুণী একটা ডিসে করে কয়েক খিলি পান নিয়ে সারা দেহে মাধুর্য্যের লজ্জা জড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকল, সুষমা বললে, শৈলেশদাকে পানগুলো দে—

মেয়েটি কম্পিত হস্তে শৈলেশের দিকে পানের ডিসটা এগিয়ে দিলে। শৈলেশ দুটো পান তুলে নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'মাধুরী না? ঈস্, মস্ত বড় হয়ে গেছে যে?' মাধুরী জগদীশের বোন। সে মুখে লজ্জার আবির মেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুষমা হেঁকে বলে দিলে, "উনুনে ডালে চাপিয়ে এসেছি। হয়ে গেলে নামিয়ে দিস্—" তার পর শৈলেশের দিকে চেয়ে কোন ভূমিকা না করেই বললে, "মাধুরীকে বিয়ে করবে?" শৈলেশ উত্তেজিত হয়ে বললে, "দেখ সুষমা, এতক্ষণ যা বললে সব সহ্য করলাম। কিন্তু আমাকে এমনধারা অপমান করবার কারণ কি, তা আমায় বলবে—"

সুষমা ভালমানুষের মত বললে, "বা রে! এটাতে আবার অপমানের কি আছে? মাধুরী বেশ মেয়ে, আমার থেকে ঢের বেশী সুন্দরী। তোমার সঙ্গে মানাবে ভাল।"

শৈলেশ গোঁ হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না। সুষমা একটু এগিয়ে এসে শৈলেশের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললে, "সত্যি বলছি, ওকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। আমার এ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।" সুষমার কণ্ঠে যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তাতে শৈলেশের অন্তর আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সে সুষমার চোখে নিজের

দৃষ্টি স্থাপন করে বললে, "সত্যি বলছ তুমি, আমার সঙ্গে পরিহাস করছ না? তুমি বলছ, আমি মাধুরীকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে?"

সুষমা হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দমন করবার চেষ্টা করে বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই আমি সুখী হব।"

শৈলেশ আর একবার সুষমার দিকে তাকাল। তার পর ধীরস্থির কণ্ঠে বললে, "বেশ এতে যদি তুমি সত্যিই সুখী হও তা হলে মাধুরীকে আমি বিয়ে করব। তোমাকে কথা দিলাম।" এক মুহূর্ত নীরবতার পর আবার বললে, "কেমন, সুখী হলে তুমি?"

সুষমা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সুদক্ষা অভিনেত্রীর মত মুখে একমুখ হাসি টেনে সে উত্তর করলে, "না রে! সুখী হব না! মরছা আইবুড়ো বোন নিয়ে দাদার যে কি দুর্ভাবনা তার তুমি কি বুঝবে। তোমার মত সৎপাত্র বিয়ে করতে রাজী হয়েছে জানলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। অনেক দিন পরে রাতে তাঁর সুনিদ্রা হবে।" শৈলেশের মনে এই একটু আগে যে ঈষৎ রঙের আভা দেখা দিয়েছিল তা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। "ও সেই জন্য—" বলে সে উঠে দাঁড়াল, সুষমাকে আর কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুষমা অপলক দৃষ্টিতে তার গমনশীল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই জগদীশ ফিরল, বললে, "কি গো, শৈলেশ চলে গেছে? হ'ল বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা?"

সুষমা হেসে বললে, "এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাজী হয়েছে। আমাকে ঘটক-বিদায় কি দেবে বল?"

"এই যে দিই—" বলে জগদীশ সুষমার দিকে এগিয়ে যেতেই সুষমা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে শৈলেশ বাড়ী গিয়ে পিসীমাকে বললে, "পিসীমা, আজ আর আমার যাওয়া হ'ল না। তুমি আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলে, ও পাড়ায় জগদীশের বোনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে পার—"

পিসীমা আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, "কথাবার্ত্তা আর চালাতে হবে না, ও ঠিক হয়েই আছে। কাল যে ওরা আশীর্ব্বাদ করতে আসছে।"

শৈলেশ আশা করেছিল, বাসরঘরে সে একবার সুষমার সাক্ষাৎ পাবে। কিন্তু সারাদিন খেটে সুষমার নাকি শরীর ভাল নেই। কন্যাসম্প্রদানের পর সে সেই যে নিজের শোবার ঘরে ঢুকেছে, আর বার হয় নি।

তাজমহল

শ্রীনীলরতন দাশ

প্রেমবিহ্বল বিরহ-পাগল ওগো সম্রাট্‌-কবি,
মর্ম্ম নিঙাড়ি রক্তে রচিলে কার মর্ম্মর-ছবি?
তোমার মানসী স্বর্গ-সীতা কি মহীয়সী নিরুপমা—
পাথরে পাথরে রূপায়িত হলো মুরতি তিলোত্তমা?
হেরি প্রেয়সীর করুণ আঁখির একটি বিন্দু বারি
রুদ্ধ করিতে কালের দুয়ার রচিলে সমাধি তারি।
মমতাজ লাগি' মমতার গড়া পাষাণের মায়াপুরী,
ইন্দ্রধনুর বর্ণে বর্ণে চলে সেথা লুকোচুরি।
প্রেমের পূজারী ফেলিল নীরবে বিরহের আঁখিজল,
অশ্রু-নদীর সলিলে ফুটিল শত শ্বেত-শতদল।
পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল হেথায় অপ্সরা উর্ব্বশী,
অপলক চোখে তারে চেয়ে দেখে গ্রহ-তারা-রবি-শশী।

এ যে কবিকের বিরহ-কাব্য রচিত প্রিয়ার দুখে—
মিটায় বিরহী-চিত্তের ক্ষুধা সুধাসম যুগে যুগে।
যমুনার কূলে মর্ম্মরে গাঁথা এ যেন শোকের গীতা,
চিরবিরহের সাগরবেলায় জ্বলিছে প্রেমের চিতা।
সতী-শব নিয়ে করিয়া ধারণ শুভ্র গিরির মত
শিলাময় যেন হয়েছেন শিব হেথা তপস্যা-রত।

ওগো মহারাজ, তুমি নাই আজ, আছে তব ইতিহাস;
পাষাণে পাষাণে জমিতেছে তব বুকের দীর্ঘশ্বাস।
বিরহ-কাতর তোমার হিয়ার 'অশান্ত ক্রন্দন'—
মৌন পাষাণ কারাগার-মাঝে লভিয়াছে বন্ধন।
তাই তব প্রেম-বিরহ যে বাজে নিখিলের বুকে বুকে,—
বিশ্ব যে হায় আজো শোকময় তোমার বিরহ দুখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

বঙ্কিমের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'সাহিত্যে কর্ম্মযোগী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপন্যাস ও সমালোচনা-সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, গুরুগম্ভীর গবেষণা এবং লঘু হাস্য ও ব্যঙ্গরচনা—সর্ব্বত্রই বঙ্কিম তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়—'বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।' বঙ্কিমের এই বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; ইহার স্বল্প-পরিসর পরিধির মধ্যে উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু' একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি? 'উত্তর চরিতে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম কাব্যের উদ্দেশ্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, 'কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা…সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।' উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম এই উভয় উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহা গৌণ উদ্দেশ্য তাহাই কেমন করিয়া ধীরে ধীরে মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল, বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উদ্দেশ্য ও ভাবধারার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 'দুর্গেশনন্দিনী','কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রথম পর্য্যায়ের উপন্যাস। এই সময় বঙ্কিমের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। আয়েষার সংযম, মৃণালিনীর পতিভক্তি, কপালকুণ্ডলার সারল্য, মনোরমার সরলতা, সংযম ও নিষ্ঠা। সপত্নী-কন্যার প্রতি বিমলার মাতৃস্নেহ এবং বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিক পতিভক্তি, জগৎ সিংহের পুরুষোচিত বীরত্ব ও ঔদার্য্য, নবকুমারের পরোপকার-প্রবৃত্তি, পক্ষান্তরে কতলু খাঁ ও পশুপতির শোচনীয় জীবনাবসান পরোক্ষে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু এ সকল স্থলে উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য একেবারেই অন্তরালে রহিয়াছে এবং আখ্যায়িকার মাধ্যমে বঙ্কিম কোন বিশিষ্ট-বাণী প্রচার করেন নাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আখ্যায়িকার পরিবেশন-গুণে কোন বিশিষ্ট বাণী নহে—মানব-জীবনের প্রতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের প্রথম পর্য্যায়ের উপন্যাসে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কি? বঙ্কিম অদৃষ্টবাদী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে থাকিয়া এক অদৃশ্য মহাশক্তি মানব-জীবনের উপর দুর্জ্ঞের প্রভাব বিস্তার করে। এই সত্য প্রথম হইতেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ের তিনখানা উপন্যাসেই ('দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'তে অদৃষ্ট গণনার ভিতর দিয়া এবং 'কপালকুণ্ডলা'র সূক্ষ্মতর এবং শ্রেষ্ঠতর উপায়ে) তিনি এই অদৃশ্য মহাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই রহস্যময় বিরাট শক্তি মানবের ক্ষুদ্র শক্তিকে উপহাস করিয়া, কখন কখনও ইহার গতিরোধ-প্রয়াসী অসহায় অজ্ঞ মানবকে অলক্ষ্যে দুর্ব্বার বেগে নিজ নিজ নির্দ্ধারিত ভাগ্যপথে চালিত করিতেছে, কোথাও একটুকু নড়-চড় হইবার উপায় নাই। বঙ্কিম ইহার কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; মানবের অদৃষ্টের নিয়ন্তা সহানুভূতিহীন, বিচারহীন অন্ধ শক্তি।

কিন্তু বঙ্কিম এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিয়তিকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বময় নীতির রাজত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কতলু খাঁ এবং পশুপতির জীবনের পরিণতিতে ইহার আভাস থাকিলেও 'বিষবৃক্ষ' হইতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই সময় হইতেই বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন ধারার সূচনা এবং এই উপন্যাসে যাহা নীতির নিয়ম, ক্রমে ভগবদ্ভক্তি বিকাশের সঙ্গে তাহাই ঐশী বিধানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' পাশাপাশি নিয়তি ও নীতির বিধান লক্ষ্য করা যায়। কপালকুণ্ডলা মনোরমার ন্যায় কুন্দও ভাগ্যহতা; পক্ষান্তরে নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও হীরা নিজ নিজ জীবনে রোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিয়াছে। এই উপন্যাসে অসংযমের দুঃখময় পরিণতির ভিতর দিয়া বঙ্কিম এই সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সুখ নাই এবং ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংযমশিক্ষা। ইহাই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসের বিশিষ্ট বাণী।

'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনাকাল হিসাবে দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের স্থান স্বতন্ত্র। হাল্‌কা গল্পের মাধ্যমে 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন এ স্থলে বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' নীতিবেত্তা বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট এবং এই উপন্যাসে

শৈবলিনীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরিকল্পনার পশ্চাতে রহিয়াছে অসংযম-অসহিষ্ণু বঙ্কিমের কঠিন অনুশাসন। এ-ক্ষেত্রে রামানন্দ স্বামী বঙ্কিমের নীতিপ্রচারের মুখপাত্রস্বরূপ।

'চন্দ্রশেখরে'র গৌণ উদ্দেশ্য সাধারণভাবে নীতিশিক্ষা দান নহে; এই উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই 'চন্দ্রশেখরে'র বিশিষ্ট সুর এবং পরবর্তী উপন্যাস 'রজনী'তেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের প্রতি রামানন্দ স্বামীর উপদেশ (চন্দ্রশেখর ৩।১) এবং 'রজনী'তে সন্ন্যাসী-ঠাকুর ও শচীন্দ্রের প্রশ্নোত্তর (রজনী ৩।৬) 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র গুরু-শিষ্য-সংবাদ স্মরণ করাইয়া দেয়।

বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন।* এই সময় তিনি পাশ্চাত্ত্য নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়-বাদী দার্শনিকগণের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু 'প্রথম জীবন' অনির্দিষ্টকাল এবং বঙ্কিমের কোন উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে 'নাস্তিক্যপন্থী' নহে। তাহা হইলেও 'চন্দ্রশেখরে'র পূর্ব্বে তাঁহার অপর কোন উপন্যাসে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন নাই।

নাস্তিক বঙ্কিমের মনে কবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল তাহার পূর্ণ ইতিহাস আজ হয়ত জানিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমানুজ পূর্ণ-চন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :

'[বঙ্কিম] যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুকাল চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবারে, রবিবারে কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম শিক্ষা হইল।...তাঁহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব।...

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়া থাকাকালেই পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে [১৮৮১ খ্রীঃ]। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন, তাহাই হিন্দুধর্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই উদ্দেশ্য থাকিত।'†

শচীশচন্দ্রের লিখিত বিবরণ এইরূপ : '১২৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরেজী ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন।...এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়...। ১২৮৩ সালের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হয়...ধর্ম্মভাবের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তার পর দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগাক্রান্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় মধুর্কোমলতায় বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইল।'*

পূর্ণচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র উভয়ের মতে হুগলী বদলী হইবার পর হইতে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' এবং 'রজনী' উভয় উপন্যাসই তৎপূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। শচীশচন্দ্র যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহার সন তারিখ দেন নাই; কিন্তু তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার হিসাবমত প্রথমোক্ত ঘটনা ১২৮৩ সালের দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা এবং শেষোক্ত ঘটনা ঐ সালের শেষের দিকে ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে,† অর্থাৎ ১২৬৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে। সুতরাং ১২৮৩ সালের পূর্ব্বে প্রথমোক্ত ঘটনা সম্ভব হইলেও, দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা হয় ত ইহার পরের কথা। সুতরাং শচীশচন্দ্রের হিসাবে কোথাও কিছু গরমিল হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই উভয় ঘটনার পূর্ব্বেই 'চন্দ্রশেখর' সম্পূর্ণ এবং 'রজনী' অন্ততঃ আংশিক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ 'চন্দ্রশেখর' 'বঙ্গদর্শনে' সম্পূর্ণ হইয়াছে বঙ্কিমের দ্বিতীয় বার বিবাহের কিঞ্চিদধিক চৌদ্দ বৎসর পরে ১২৮১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যা হইতেই 'রজনী' প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবেও এই উভয় উপন্যাসের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বঙ্কিমের ধর্মমত এই সময় পর্য্যন্ত দানা বাঁধিয়া উঠে নাই একথা সত্য; কিন্তু তিনি সংশয় কাটাইয়া কঠিন মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছেন।

যাঁহারা ঈশ্বরাভিপ্রেত জীবনযাপন করেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের শক্তি সম্বন্ধেও বঙ্কিম সচেতন হইয়াছেন। প্রথম

---

* ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম ', ১৭১ পৃ.।

† 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম শিক্ষা'—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ৯৩-৪ পৃ.

* বঙ্কিম-জীবনী, ১৩৩-৪ পৃঃ।

† ঐ ১১৩ পৃঃ।

পর্য্যায়ের উপন্যাসে এবং 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর চিত্রে মানুষ নিয়তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। শেষোক্ত উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও (নিয়তি না হইলেও) প্রবৃত্তির সম্মুখে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। 'চন্দ্রশেখরে' এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্রণ লক্ষণীয়। এই উপন্যাসে ভাগ্যহতা দলনীর পার্শ্বে দেখিতে পাই রামানন্দ স্বামীকে, যিনি সাধনা দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনানুরূপ শৈবলিনী ও শৈবলিনী ও প্রতাপের উপর সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'রজনী'তে সন্ন্যাসীঠাকুর রামানন্দ স্বামীর ন্যায় অতিমানব নহেন, কিন্তু তিনিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বঙ্কিমের ভাবধারার ক্রমাভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

পরবর্ত্তী উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও 'বিষবৃক্ষে'র ন্যায় অসংযমের কুফল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে বঙ্কিম প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তার উপর একখানি জোর দেন নাই, গোবিন্দলাল কতকটা স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথও গোবিন্দলালের চরিত্রাঙ্কনে এই মৌলিক পার্থক্য পরোক্ষে এবং অস্পষ্টভাবে হইলেও, মানুষের শক্তিতে বঙ্কিমের ক্রমবর্দ্ধমান প্রত্যয়ের অন্যতম নিদর্শন এবং 'পরিশিষ্টে' সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্র শুধু নীতিবেত্তা বঙ্কিমের নহে, বিশেষ করিয়া ভগবদ্ভক্ত বঙ্কিমের পরিচয় দেয়। 'রজনী'তে সর্ব্বত্যাগী অমরনাথের চিত্রে যাহার ক্ষীণ আভাস, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথম সংস্করণে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি গোবিন্দলালের মৃত্যুতে এবং ১৮৯২ সালের চতুর্থ সংস্করণে, অর্থাৎ 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র পরবর্ত্তীকালে তাঁহার এই নূতন পরিণতি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই তিনটি উপন্যাসের ভাবধারার সাদৃশ্যের ইহাই মূল কারণ।

'রাজসিংহ' দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের জয়-পরাজয়ের মধ্যে বঙ্কিম ঐশী নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তিনি ইহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (রাজসিংহ—উপসংহার)। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণতালাভ করিয়াছে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে 'সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধারে'র পরিকল্পনায়। যিনি ভক্ত তাঁহার 'সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণ অনুশীলিত', সুতরাং তিনি দক্ষ; তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত, সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি 'নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে' সমর্থ হয়েন—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম এই চিত্রটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। 'সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ১১ দ্রষ্টব্য)। অথচ তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কালবৈশাখীর ঝড় প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে এবং দেবী চৌধুরাণী যেভাবে ইহাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'র বঙ্কিম প্রকৃতিকে নিয়োজিত করিয়াছেন নির্দ্দয় ধ্বংসকার্য্যে। এ ক্ষেত্রে সেই প্রকৃতিকেই তিনি ভক্তের উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাও গূঢ়ার্থপূর্ণ। 'সীতারাম' উপন্যাসেও আখ্যায়িকার পরিবেশন গুণে মনে হয় যেন চরম সঙ্কটকালে সীতারামের প্রার্থনায় সাড়া দিয়াই 'নিরুপায়ের উপায়' তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যার সম্মানরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (সীতারাম ৩।২১-২৩ দ্রষ্টব্য)।

ঐশী শক্তি এবং ঐশী বিধানকে প্রাধান্য দিতে গিয়া বঙ্কিম কোন কোন উপন্যাসে নিয়তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে (দলনী ও নবাবের জীবনে) তিনি নিয়তিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটি ক্ষেত্রে (চঞ্চলকুমারীর জীবনে) নিয়তির প্রভাব একেবারেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু কোন সময়েই বঙ্কিম নিয়তিকে অস্বীকার করেন নাই। (চঞ্চলকুমারীর ক্ষেত্রেও অদৃষ্ট গণনা অন্ততঃ ব্যর্থ হয় নাই) এবং তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারামে' শ্রীর অদৃষ্ট গণনার ভিতর দিয়া তিনি নিয়তিকে পুরাপুরি প্রাধান্য দিয়াছেন।

প্রথম পর্য্যায়ের উপন্যাসে এবং পরবর্ত্তীকালেও যে সকল উপন্যাসে নিয়তির পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্য-শক্তির বিরাট অপচয় পাঠককে বিস্ময়বিমূঢ় করে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা কি? তাঁহাদের এবং মনোরমা, কুন্দ ও দলনীর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পশ্চাতে বিশ্বস্রষ্টার কোন্ সে নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে? পাঠকের মনের এই সকল এবং অনুরূপ প্রশ্নের সহজ বিচারবুদ্ধিপ্রসূত কোন সদুত্তর নাই। যে সকল স্থলে নিয়তির পরিকল্পনা নাই, সে সকল স্থলেও যে কোথাও কোথাও করুণ ট্র্যাজেডির চিত্র পাওয়া যায় না তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ প্রতাপ ও শ্রমরের মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি অমূল্য জীবনের পরিণতি যতই দুঃখের হউক, ইঁহাদের আত্মত্যাগ নিরর্থক নহে, ব্যর্থতার মধ্যেও ইঁহাদের জীবনে পরম সার্থকতা রহিয়াছে। নিয়তি ও ঐশী বিধানের পরিকল্পনায় এই মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবের অদৃষ্টের মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিতে গিয়া বঙ্কিম কখন কখনও নিয়তির অনতিক্রমণীয়তার সহিত ঐশী বিধানের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। 'রাজসিংহে' নবাবের মৃত্যু শুধু নিয়তির বিধান নহে; নবাব রূপের মোহে প্রেমাস্পদার উপর যে অত্যাচার করিল, দলিত, লাঞ্ছিত ভালবাসা তাহার প্রতিশোধ লইল। প্রকৃতির নিয়মে

ইহাই অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধি (nemesis), ইহাই ঐশী বিধান। 'সীতারামে' তোরাব খাঁর আক্রমণ হইতে নগর-রক্ষা ব্যাপারে বঙ্কিম পুরুষকার, নিয়তি* এবং ঈশ্বরের মঙ্গল-বিধানের সুন্দর সমন্বয়সাধন করিয়াছেন এবং একই উপন্যাসে গঙ্গারামের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এমনিভাবে শুধু শ্রীর অদৃষ্ট-গণনাই সফল হয় নাই; বঙ্কিম দেখাইতেছেন যে, সীতারাম ক্ষমা করিলেও বিধাতার ন্যায় বিচারে গঙ্গারাম অব্যাহতি পায় নাই; পরন্তু ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া জয়ন্তীর সাহায্যে রাজকার্য্যে শ্রী যে অনুচিত হস্তক্ষেপ করিলেন,† ভ্রাতার মৃত্যুর নিমিত্তরূপিণী হইয়া তাঁহাকে তাহার শাস্তি পাইতে হইল। কিন্তু বঙ্কিমের ধর্ম্মানুভূতি যাহাই বলুক, বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধ জীবনে মানবের অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় রহস্য কোন বাঁধাধরা নৈতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত এই কারণেই তিনি কখনও পৃথক পৃথক ভাবে নিয়তি বা ঐশী বিধানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কখনও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, কখনও দার্শনিকের উচ্চাসন হইতে প্রচার করিয়াছেন, 'সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখ দুঃখের কোন বাহিক অস্তিত্ব নাই।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ২। 'চন্দ্রশেখরে' রামানন্দ স্বামীর মুখেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাই। চন্দ্রশেখর ৬।১)।

'আনন্দমঠ' হইতে বঙ্কিমের উপন্যাসে নূতন সুর লক্ষ্য করা যায়। ইহাই তৃতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসের বিশিষ্ট সুর। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' তৃতীয় যুগের 'ত্রয়ী'। জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব যেমন বুঝিয়াছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি যাহা বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—'ত্রয়ী'তে তাহারই মর্ম্মকথা তিনি যথাযোগ্য কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণার ভিতর দিয়া সাধারণ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন, 'ভগবদ্গীতার যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ১১)। তাঁহারই ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, 'ধর্ম্মতত্ত্বে' যাহা উপদেশ, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' তাহাই 'উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত'। এই 'ত্রয়ী'তে বঙ্কিম প্রধানতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম জীবনে বঙ্কিম যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অগস্ত কোমৎ (Augusto Comte) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে ভগবদ্ভক্ত বঙ্কিম এই পাশ্চাত্য মনীষীর মতবাদের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া* গীতার বাণী অবলম্বনে ধর্ম্মের এমন এক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে। এই ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব। শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জনী—এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির 'উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যে' ইহার পূর্ণ বিকাশ। ইহা অনুশীলনসাপেক্ষ এবং অনুশীলনতত্ত্বের মূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা তাহাদের এইরূপ অনুশীলন করিতে হইবে যাহাতে কোন বৃত্তি অপর কোন বৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অনুচিত ও অসঙ্গত বৃদ্ধি না পাইতে পারে। কিন্তু বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যের মাপকাঠি কি? বঙ্কিম বলেন, যখন সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে, অর্থাৎ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া মানুষ তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তখনই বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য সাধিত হইল বুঝিতে হইবে। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব, ইহাই ভক্তি।† 'ত্রয়ী'তে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত সত্য এই ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

'আনন্দমঠে'র স্বল্প-পরিসর 'উপক্রমণিকা' বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এই উপক্রমণিকার বাণী সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে সন্তান-সম্প্রদায়ের কার্য্য ও আদর্শের বিচার করিতে

*। সন্ন্যাসী স্বামী শ্রীর ভাগ্য গণনা করিয়া বলিয়াছেন, "তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে।…সময় উপস্থিত হইলে স্বামী সন্দর্শনে গমন করিও।" (সীতারাম ১।১৩)। ইহার বৎসরখানেক পরে তাঁহারই নির্দ্দেশে জয়ন্তী ও শ্রী ভৈরবী বেশে তৎপ্রদত্ত মন্ত্রপূত (?) ত্রিশূল হস্তে সীতারামের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। (সীতারাম ২।৮)। চন্দ্রচূড় স্বামী তৎকর্ত্তৃক শ্রীর অদৃষ্ট গণনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই যথাযোগ্য নির্দ্দেশ দিয়া থাকিবেন এবং পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ইহাই শ্রীর 'পরম পুণ্যে'র সময় এবং জয়ন্তীর আনুকূল্যে এই সময় পরোক্ষে তিনি সীতারামের যে সাহায্য করিলেন তাহাই তাঁহার 'পরম পুণ্য'।

† গঙ্গারামের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা ব্যাপারে শ্রীর যে পরোক্ষ হাত রহিয়াছে, তাঁহার কর্ত্তব্যত্যাগ সম্বন্ধে সীতারামের জেরায় উত্তরে তিনি এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। (সীতারাম ৩।৭)।

* ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম কোমতের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (ধর্ম্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র খ) কোমৎ বলেন,

'Religion in itself expresses the State of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made to converge towards one common purpose.'

বঙ্কিম ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী কোমৎ ঈশ্বরের স্থানে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার Cultus of Humanity প্রচার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, গীতার বাণীপুষ্ট বঙ্কিম ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহার মতে বৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরমুখী করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' ১।১, ৩৫-৪০ পৃ. দ্রষ্টব্য)

† 'যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।' এবং 'ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ২১)।

হইবে। সত্যানন্দ ঠাকুর (সন্তান-সম্প্রদায়ের ইনিই শক্তির উৎস) সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রীতি বঙ্কিমের দেশপ্রীতির পরিচয় দেয়, কিন্তু অন্যান্ত প্রীতিবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি তাঁহার দেশপ্রীতিকে ঈশ্বরমুখী করিতে শিক্ষালাভ করেন নাই। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও সাধনার এই অসম্পূর্ণতার জন্যই জয়ের মুহূর্তে তাঁহার নিকট বিসর্জ্জনের আহ্বান আসিল। কারণ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য 'জীবনসর্ব্বস্ব' পণই যথেষ্ট নহে, ইহার জন্য চাই ভক্তি।

ভক্তিতত্ত্বের দিক দিয়া 'আনন্দমঠে'র যেখানে পরিসমাপ্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'র সেখানে আরম্ভ। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম ভক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন, 'দেবী চৌধুরাণী'তে 'প্রফুল্লে'র চরিত্রে তিনি ভক্তির আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন; প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনায় অর্থাৎ ভক্তির প্রতীক। দেহী মাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ,

> নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
>
> ভগবদ্গীতা ৩।৫

অর্থাৎ, 'কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।' অথচ বিষয়ের ধ্যান বিনাশের হেতু :

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
>
> ভগবদ্গীতা ২.৬২,৬৩।

সীতারামের চরিত্রে ইহাই বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য।

তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?

> যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
>
> ভগবদ্গীতা ৩।৯

অর্থাৎ—যজ্ঞার্থ, অর্থাৎ 'ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনমাত্র', সুতরাং অনুষ্ঠেয় নহে। 'যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৪)। ইহাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়। ইহাই কর্ম্মসন্ন্যাস, ইহাই ভক্তি এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইহাই প্রফুল্লের জীবন-বাণী।

প্রফুল্লের জীবন কর্ম্মের ভিতর দিয়া পূর্ণতা লাভ করিল এবং তাঁহার অনাসক্ত মনের সোনার কাঠির স্পর্শে ব্রজেশ্বরের সংসারের জড়তা ঘুচিল। পক্ষান্তরে, কর্ম্মত্যাগের অভিমানের ফলে শ্রীর নিষ্কাম সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এবং শ্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এক দিকে সীতারামের আসক্তি, অপর দিকে শ্রীর অনাসক্তির বিকার—উভয় মিলিয়া সীতারামের জীবনের ব্রত ব্যর্থ করিয়া দিল। নিষ্কাম সাধনার ব্যাখ্যা হিসাবে 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'র পরিপূরক : 'দেবী চৌধুরাণী'তে নিষ্কাম সাধনার প্রণালী ও পরিণতি এবং 'সীতারামে' এই সাধনার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ যত বড় জিনিষ হউক, আর্টের বিচারে ইহা উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য। 'শ্রী'তে প্রকৃতপক্ষে এই গৌণ উদ্দেশ্যই মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির অনুকূল নহে। তাহা হইলেও মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, গীতার সারতত্ত্ব সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের চরিত্র-সৃষ্টি ও প্রতিবেশ-পরিকল্পনা সুদক্ষ শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

উজ্জীবন

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

বিদীর্ণ হৃদয় দিয়ে আলো আমি আশার উন্মুখ।
প্রবল বন্যার মাঝে অনির্ব্বাণ দীপখানি হাতে
এখনো চলেছি পথ। কতবার অন্ধকার রাতে
হারিয়েছি দিক। তবু বেঁধেছি সাহসে ভগ্ন বুক।

সহস্র-সমস্যা-ঘেরা জীবনের নাহি কোন খাদ।
কোনমতে দুই হাতে পথ কেটে কেটে অগ্রসর।
তবুও পথের হবে শেষ। লাখ লখ কণ্ঠস্বর—
মুক্তি-মুগ্ধ মানবের জানিয়ে সে জয়ের সংবাদ।

"এ জীবন মহাসত্য—তার লয় নাই—নাই ক্ষয়।"
আমি তো চলেছি গেয়ে জীবনের এই জয়গান।
শোষিত লাঞ্ছিত মূক কবরের যুগ-বন্দী প্রাণ
নতুন আলোয় যেন পুনরুজ্জীবিত যাতে হয় :
দিকে দিকে পথে পথে সাগরে বন্দরে সগৌরবে।
নতুন যুগের ধ্বজা যাতে ওরা আপন নিতবে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

১৮৬৯-১৯১২

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক 'দেশের কথা'র রচয়িতা সখারাম গণেশ দেউস্করকে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একদা বাংলা-সাহিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার অগ্নিগর্ভ রচনাবলী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মর্ম্মমূলেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিবাসী ত্রিবেদী, শুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধিধারী কণৌজিয়া ব্রাহ্মণ এবং সিংহ-উপাধিধারী রাজপুতদের ন্যায় সখারামও ছিলেন জাতিতে অবাঙালী। কিন্তু বাংলা দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির সহিত একাত্ম হইয়া যান। বস্তুতঃ এই দারিদ্র্যব্রতধারী মরাঠী ব্রাহ্মণ যে-ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম : বিদ্যাশিক্ষা

সখারাম গণেশ দেউস্কর মহারাষ্ট্রের এক বিত্তানুরাগী ব্রাহ্মণ-পরিবারের কৃতী সন্তান। ইঁহাদের আদি নিবাস—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্তী দেউস্ গ্রাম। সখারামের পিতামহ সদাশিব, শ্যালকের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বৈদ্যনাথের নিকটস্থ করো গ্রাম প্রাপ্ত হন। "করো গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিধোড়ের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন। ১৯২৬ সংবতের পৌষ মাসে শুক্লা-চতুর্দ্দশী তিথিতে (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯) তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বাঙ্গলা দেশে বিখ্যাত ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন।"

সখারাম গণেশ দেউস্কর—এই নামের মধ্যেই তাঁহার নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁহার নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউস্কর। সখারামের জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। সারা জীবনই প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছিল। এই দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয় তাঁহার শৈশবেই—সখারামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার মাতা লোকান্তরিতা হন। সাধ্বী পত্নীর মৃত্যুর পর সখারামের পিতা আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সখারামই ছিলেন—একপত্নীব্রত পুত্রবৎসল পিতার নয়নের মণিস্বরূপ।

পত্নীবিয়োগের পর সখারামের পিতা নিজের এক ভগিনীর উপর এই মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পণ করেন। সখারামের এই পিতৃস্বসা যেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী ও বিদ্যানুরাগিণী, তেমনই গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। "তাঁহার মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার ছিল। তাঁহারই যত্নে, উপদেশে, পরিশ্রমে সখারামের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।" এই পুণ্যবতী মহিলার আদর্শ ও শিক্ষাদান সখারামের উত্তর-জীবনে পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইনি শিশু সখারামের হৃদয়ে মরাঠী-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে উক্ত সাহিত্যের রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পদ-বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সখারাম শৈশবাবধিই বাঙালী শিশুদের মত বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। সখারামের পিতা যে কাশীতে অল্প কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে কথা আগেই বলিয়াছি। পুত্রকেও বাল্যকালেই ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

কিছু কাল বেদ অধ্যয়নের পর সখারামকে দেওঘর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। মাইকেলের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তখন এই স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহার শিক্ষার গুণে সখারাম বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। বাংলা ভাষার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মরাঠী ভাষা এবং সাহিত্যও সযত্নে আয়ত্ত করিতে সুরু করেন। যোগীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটির মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই উদ্দীপ্ত হইল তাহা নহে, বাল্য- বয়সেই বাংলা রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি হইল। ইতিহাসচর্চ্চায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সখারাম নানা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ লিখিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। এই তরুণ লেখকের রচনাবলী তখনকার প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিক-

পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' লেখা বাহির হওয়া কম কথা ছিল না। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন লেখকেরা বাংলা-সাহিত্যের আসরে জাতে উঠিতেন, একথা বলিলে কিছু মাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। সমাজপতির সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া সখারামের রচনা যে খাঁটি সোনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায়, অনুশীলন দ্বারা রচনার কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশাত্মবোধের বীজও দেওঘরে এই সুযোগ্য শিক্ষকের প্রযত্নে ছাত্র-জীবনেই সখারামের হৃদয়ে উপ্ত হয়।

কর্ম্মজীবন

পারিবারিক অভাব-অনটনের দরুন সখারামকে অল্প বয়সেই জীবিকার সংস্থানের জন্য মনোযোগী হইতে হইল, তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল সামান্য শিক্ষাব্রতীরূপে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে সখারাম মাসিক ১৫৲ বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েও তিনি অবসরকালে রচনাচর্চ্চা করিতেন, 'হিতবাদী'তে নিয়মিত ভাবে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত; একবার সখারাম তাঁহার একটি রচনায় বৈদ্যনাথের তদানীন্তন মহকুমা হাকিমের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য উদঘাটিত করেন। 'হিতবাদী'র উক্ত প্রবন্ধের লেখক যে সখারাম, বিশেষ কোন সূত্রে তাহা অবগত হইয়া হাকিম-পুঙ্গব তাঁহার উপর ভয়ানক রুষ্ট হইলেন। ঐ হাকিম ছিলেন দেওঘর বিদ্যালয়ের স্কুল-কমিটির সভাপতি। সখারামকে শায়েস্তা করিবার জন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহার প্রতিকূলতায় সখারাম কর্ম্মচ্যুত ত হইলেনই, এমন কি দেওঘরে বাস করাও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি ১৮৯৭ সনে সপরিবারে দেওঘর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেওঘর পরিত্যাগ কিন্তু সখারামের পক্ষে শাপে বর হইল। দেওঘরের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে কলিকাতার বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া তিনি নিজের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন 'হিতবাদী'র সম্পাদক; তিনিই এই সময়ে বিপন্ন সখারামের সহায়ক হইলেন। সখারাম মাসিক ৩০৲ বেতনে 'হিতবাদী'র প্রুফ-সংশোধকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে অচিরাৎ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্রমশঃ কাব্যবিশারদের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৯০৭ সনে পীড়িত কালীপ্রসন্ন যখন স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপানে যাত্রা করেন, সেই সময়ে সখারামের সবল হস্তেই তিনি 'হিতবাদী'র পরিচালন-ভার ন্যস্ত করিয়া যান। স্বদেশ-প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে কাব্যবিশারদের মৃত্যু হইলে (৪ জুলাই ১৯০৭), 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন; তাঁহার বেতন হয় মাসিক ৭০ টাকা।

ইহার চার পাঁচ মাস পরেই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশন কিরূপে লোকমান্য তিলকের অনুগামীদের দ্বারা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়, সে কাহিনী সুবিদিত। যেদিন এই কাণ্ড হয়, সেই দিনই সুরাট হইতে হিতবাদীর স্বত্বাধিকারিগণ তিলকের বিরুদ্ধে হিতবাদীতে লিখিবার জন্ত সখারামকে তার করেন। তার পাইয়া তেজস্বী মরাঠা ব্রাহ্মণ সখারামের আত্মমর্য্যাদাবোধ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিলকের নিকট তিনি স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিলক ছিলেন তাঁহার গুরু। সেই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্ত লেখনী ধারণ!—এ কথা চিন্তা করিতেই তাঁহার সমস্ত অন্তর কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় অনুরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় তাহাও স্বীকার, তবু এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না। তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবার-পরিজনের অন্নসংস্থানের কথা—সকলই ভুলিয়া গেলেন; সখারাম এক কথায় 'হিতবাদী'র চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনায় সখারাম স্ব-মতের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা সাংবাদিক জগতে বিরল। বাস্তবিকই "মতের স্বাতন্ত্র্যে তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল। জীবিকার জন্ত তিনি পরমতের অনুবর্ত্তন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই।"

ইতিহাসে সখারামের গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সারা জীবন প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ইতিহাসের চর্চ্চায় রত ছিলেন। 'হিতবাদী'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার অল্প দিন পরেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুল—জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

দেশ-সেবা

মহারাষ্ট্রের সন্তান হইয়া সখারাম বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে আপন জন বলিয়া মনে করিতেন। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত ছিল তাঁহার নাড়ীর যোগ; বাঙালীদের তিনি স্বজন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার

অনুরাগ ছিল গভীর। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন—বাঙালীর সর্ব্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। সখারাম 'যুগান্তরে'ও মাঝে মাঝে লিখিতেন। এই দলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্গদেশে ১৯০২ সনে সর্ব্বপ্রথম শিবাজী-মহোৎসবের সূচনা হয়।

জীবন-সায়াহ্নে

দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল সখারামের নিত্য সহচর। একে ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে আবার পুত্র ও পত্নী—উভয়েই তাঁহার মায়া কাটাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন তাহাদের বিয়োগ-ব্যথা সখারামকে সহ্য করিতে হইল না,—১৯১২ সনের ২৩এ নবেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯, কার্ত্তিক-শুক্লাচতুর্দ্দশী) দেওঘরের করো গ্রামের বাড়ীতে তিনি অকালে দেহরক্ষা করিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন সখারামের একজন গুণ-গ্রাহী। সখারামের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া সুরেশচন্দ্র যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেন একেবারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই কথাগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ইহজগতে নাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদ-পত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সখারাম বাবু কর্ম্মী ছিলেন—ইনি কর্ম্ম করিতেন, কিন্ত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।...

সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চির-জীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান্ কর্ম্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তি দান করুন।" ('বসুমতী' হইতে ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' উদ্ধৃত)"

রচনাবলী

সখারাম তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের স্বল্প অবসরটুকু বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতেন। তাঁহার রচনার মারফতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস—'দেশের কথা' সমধিক প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকখানি এদেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিলে তেজস্বী সখারাম গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মামলা শুনানির পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সখারামের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে উদ্ধৃত সাল-তারিখযুক্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **এটা কোন্ যুগ?**। ১৮ ভাদ্র ১২৯৯ (২-৯-১৮৯২)। পৃ. ২৪+১ শুদ্ধিপত্র।

"যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার।" "'এটা কোন্ যুগ?' (প্রথম প্রস্তাব) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের এই প্রথম প্রস্তাবটি গত বৎসরের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবটি সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংপ্রতি তাহা পুনঃ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।...বৈদ্যনাথ দেওঘর ১২৯৯ সাল শ্রাবণ।"

২। **মহামতি রানাডে।** ? (২৩ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ ৩৬।

"এই প্রস্তাবের অধিকাংশ পূর্ব্বে প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

৩। **ঝান্সীর রাজকুমার।** ১৩০৮ সাল (২১ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৬০।

"এই কাহিনীর সংগ্রহে আমার শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক সুহৃৎ সাতারা-রাজের পারসীনবীশ শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের রচিত 'মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনচরিত' নামক উৎকৃষ্ট মারাঠী গ্রন্থ হইতে আমি অশেষ সাহায্য পাইয়াছি।"

৪। **বাজী রাও।** ১৩০৮ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৬২।

"রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে বি, এ, (ডেক্যান কলেজ), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ প্রয়োজন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত চেষ্টায়

মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত দুর্লভ প্রাচীন কাগজপত্র সংগৃহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।"

৫। **আনন্দী বাঈ**। ? (২৫ মার্চ ১৯০৩)। পৃ. ৯১.÷৵০।

"শ্রীমতী কাশী বাঈ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আনন্দী বাঈর যে অতি প্রকাণ্ড—রয়াল আট পেজী ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। উহার সারসংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'সখী' পত্রিকায় [১৩০৭, মাঘ-চৈত্র ; ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়] আমি ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন ও সংশোধনানন্তর তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।"

৬। **শিবাজীর মহত্ব**। আষাঢ় ১৩১০ (জুলাই ১৯০৩)। পৃ. ২০।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত। ইহা প্রথমে "কলিকাতা ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত" হয়।

৭। **দেশের কথা** ঃ

১ম ভাগ। ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪)। পৃ.৩৪২।

পরিশিষ্ট ভাগ। (২৩ অক্টোবর ১৯০৭) পৃ. ৭১।

"জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে 'দেশের কথা' প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্বী সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরোজী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি,আই,ই, ভারতের দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তকের রচনায় তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থত্রয়—মিঃ ডিগ্বীর *The Prosperous British India*, শ্রীযুক্ত নৌরোজীর *Poverty and un-British rule in British India* এবং দত্ত মহাশয়ের *The Economic History of British India* প্রত্যেক ভারতসন্তানের অবশ্যপাঠ্য। অনেকেই এই সকল গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অনেকে এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন না। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা যাহাতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারেন তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারি রিপোর্ট ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।"—ভূমিকা।

৮। **কৃষকের সর্ব্বনাশ**। ইং ১৯০৪ (২৮ জুলাই)। পৃ. ৯৭-১৪৪।

"দেশের কথা হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

৯। **শিবাজীর দীক্ষা**। ভাদ্র ১৩১১ (৭-৯-১৯০৪)। পৃ. ৪০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "শিবাজী উৎসব" কবিতা নহে। শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত।

১০। **শিবাজী**। বৈশাখ ১৩১৩ (?-৬-১৯০৬)। পৃ. ২৪।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে···বিনামূল্যে বিতরিত।

১১। **তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত**। আশ্বিন ১৩১৫ (৪-১০-১৯০৮) পৃ. ২১০+৪০।

১২। **বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?** আশ্বিন ১৩১৭ (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ১২৪।

'ধ্বংসোন্মুখ জাতি'র প্রতিবাদ। "কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।"

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ— মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় সখারামের এমন অনেক প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :

১২৯৮, আশ্বিন-পৌষ	'বেদব্যাস'	কৃষ্ণাবতার কোন্ যুগে ?
১২৯৯, বৈশাখ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব
ভাদ্র-আশ্বিন	'প্রতিভা'	জয়দ্রথ বধ(সমালোচনা); শাস্ত্রের অদ্ভুত অনুবাদ
অগ্র., চৈত্র	'সাহিত্য'	পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ
ফাল্গুন	ঐ	বাজীরাও ও মস্তানী
১৩০০, আষাঢ়, ভাদ্র	'সাহিত্য'	ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজ
ভাদ্র	'ভারতী'	যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কাল
পৌষ	'সাহিত্য'	প্রাচীন মহারাষ্ট্র
মাঘ	'ভারতী'	শঙ্করাচার্য্য
১৩০১, বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	পূজায় আলোচনা
মাঘ	'বমণী'	মনুপ্রোক্ত সনাতন ধর্ম্ম
ফাল্গুন	ঐ	শিবাজীর স্বার্থত্যাগ
১৩০২, বৈশাখ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
শ্রাবণ-আশ্বিন	ঐ	নারায়ণ রাওএর বধ
আশ্বিন	ঐ	আফজল খাঁর অভিযান
অগ্রহায়ণ	'ভারতী'	বৈদিক আলোচনা
১৩০৩, আষাঢ়	'ভারতী'	পুরাণপাঠ (শাস্ত্রীয় বিচার)

সন ও মাস	পত্রিকা	প্রবন্ধ
১৩০৪, বৈশাখ	'ভারতী'	বাবুকেশর (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা)
পৌষ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ
১৩০৫, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, চৈত্র	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
অগ্র., ফাল্গুন	'সাহিত্য'	সমর্থ রামদাস স্বামী
১৩০৬, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
ভাদ্র	'ভারতী'	কিষ্কিন্ধ্যা
আশ্বিন	'সাহিত্য'	আওরঙ্গজেবের ধর্মভাব
চৈত্র	'ভারতী'	বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য
১৩০৭, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়
আষাঢ়	'সাহিত্য-সংহিতা'	ভাস্করাচার্য্য
শ্রাবণ	ঐ	ব্রহ্মদেশের আচার ব্যবহার
কার্ত্তিক	'সাহিত্য'	ঐতিহাসিক কাগজপত্র
মাঘ	'ভারতী'	ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা
১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ	'প্রদীপ'	গ্রীকজাতির স্বাধীনতা-লাভ
ভাদ্র, পৌষ	'সাহিত্য-সংহিতা'	অন্ধ্র সাহিত্য
১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	ভারতে আরাবী
শ্রাবণ-অগ্র.	'প্রদীপ'	ভূষণ
১৩১২, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	শিবাজী প্রসঙ্গ
১৩১৩, ভাদ্র	'সাহিত্য'	বোপদেবের পরিচয়
১৩১৫, ফাল্গুন	'সাহিত্য'	রাজা কৃষ্ণরাও ঘটাওকর
চৈত্র	'বঙ্গদর্শন'	প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
১৩১৬, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার
ফাল্গুন	'বঙ্গদর্শন'	গুজরাটে মহারাষ্ট্র অধিকার
১৩১৭, বৈশাখ-আষাঢ়	'বঙ্গদর্শন'	ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ
১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	পৃথ্বীরাজ-রাসো
আষাঢ়	ঐ	ভারতে শক-শোণিত
মাঘ	ঐ	মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত

রচনার নিদর্শন

প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা, প্রসাদগুণ ইত্যাদি যে সকল গুণে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়, সখারামের রচনাবলীতে তাহা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দেশের কথা' হইতে উদ্ধৃত রচনাংশসমূহে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনের —ইংরাজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রধানতম সুফল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে-দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অনুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সুফললাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু সুফল-লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্রত্য প্রজা-সমাজের নিম্নতর পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথেচ্ছাচার রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আমা-দিগের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়, এতদুপলক্ষে যদি সমগ্র সমাজ আমূল আলোড়িত হয়, রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রার্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর অনু-মোদিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অতল পর্য্যন্ত মর্ম্মবেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্দ্ধনশীল দুঃখদারিদ্র্যের কথা, আমাদের শোচনীয় অধোগতির কথা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, কংগ্রেসের প্রতি সকলের অনুরাগ-বর্দ্ধনপূর্ব্বক এই শুভানুষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর অবশ্যকর্ত্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের এই কর্ত্তব্যতার স্কন্ধে গ্রহণ করা উচিত। ১৮৩৩ সালের পার্লা-মেন্টের প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সুশাসনের আশ্বাস

পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবনতির খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। বৃটিশ ভারতের সকল প্রজা, অতি নিম্ন-শ্রেণীর প্রজা পর্য্যন্ত, যাহাতে আমাদের রাজদত্ত প্রকৃত অধিকারের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের পূর্ণফললাভের জন্য যাহাতে সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক সুসন্তানকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার জন্যই এত দিন আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বহুদিন পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।......বাঙ্গালায় ছয় কোটী ষাটি লক্ষ (এক্ষণ প্রায় ৮ লক্ষ) লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই। [বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সাল অগ্রহায়ণ সংখ্যা—"লোক-শিক্ষা" প্রবন্ধ]

"এক্ষণে যাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকার-প্রার্থনায় সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সুমহান্ পবিত্র কর্ত্তব্য-সাধনে উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা দেশের শত্রু ও সমাজের শত্রু বলিয়া চিরকাল সুধী-সমাজের ঘৃণার ভাজন হইবেন।

"বৃদ্ধ ভারতহিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির বিগত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

'তোমরা কি মুহূর্ত্তের জন্য মনে কল্পনা কর যে, কোন রাজ-শক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তিপ্রিয় শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের হিসাবে তোমাদের সহস্র দাবী থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কি সে সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে রাজার স্বদেশবাসিগণ উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন, রাজা কি তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি স্বপ্নেও ভাব যে, উদারনীতিক অথবা যে কোন গবর্ণমেণ্টই হউক, শুদ্ধ ন্যায়ের অনুরোধে তোমাদিগের দুঃখ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন? এরূপ অলীক চিন্তায় আত্ম-বঞ্চনা করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রান্ত ভাবে, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের মাত্রা অধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গবর্ণ-মেণ্টকে যদি ক্রমাগত উত্যক্ত ও জ্বালাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনের সুফলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু তোমরা যেরূপ ঔদাসীন্য সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোমাদিগের অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কর, ভারতে সংবৎসর-ব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, বিলাতের প্রত্যেক নগর ও গ্রাম তোমাদিগের প্রার্থনায় ধ্বনিতে মুখরিত কর, কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহা ধরিয়াছ, তাহা কিছুতেই ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে না। জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কার্য্য দ্বারা আপনাদিগের যোগ্যতা প্রতিপাদন কর। দেখিবে, গ্রীষ্মাগমে তুষারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে।

'ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের দোষ কীর্ত্তন করিতে দেখি। গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা নিজে কর্ত্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্ব্বস্ব-পণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে না, শুদ্ধ গবর্ণ-মেণ্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্র-দায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, শঠতা ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সংসাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অনন্যচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। নচেৎ এক্ষণে তোমাদিগের আন্দোলনে যেরূপ একা-গ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা থাকিলে কিছুই লাভ হইবে না।

'আবার বলি, গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিলে, তোমাদের নিজের দোষ চাপা পড়িবে না; অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তোমাদের গবর্ণমেণ্টও আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্দ্ধ অধিকার প্রদান করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর প্রদত্ত অধিকারের সঙ্কোচে প্রয়াস পাইবেন। যে দেশে প্রজাশক্তি হীনবল, সে দেশে রাজশক্তির

এইরূপ ব্যবহার ঘটিয়াই থাকে। রাজশক্তির এরূপ অত্যাচার-নিবারণে প্রজাসাধারণের সর্ব্বদা চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ প্রজাদিগের—রাজার নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও।'

"ফলতঃ আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সায় পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে! অন্নপূর্ণার সন্তানদিগের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর ঔদাস্য প্রকাশের সময় নাই। ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বদ্ধ-পরিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। মিঃ ডিগবী বলিয়াছেন,—

"*India is not far from collapse.*" ('দেশের কথা,' পৃ. ২৮৫-৯১)

নর্ম্মদাতীরের ওঙ্কার মান্ধাতা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

গ্রীষ্মের এক মনোরম প্রভাতে আমরা নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত "ওঙ্কার মান্ধাতা" দেখতে রওনা হলাম। খাণ্ডোয়া আসার পর থেকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রায় ৪৮ মাইল দূরবর্ত্তী ওঙ্কার মান্ধাতা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেই থেকে সেখানকার মন্দিরের বিষয়ে হিন্দী ও ইংরেজী পুস্তক হতে নানা কাহিনী ও জনপ্রবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। এক দিন সে স্থান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসে গেল। একজন উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী আমাদের অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নর্ম্মদাতীরস্থ এই প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করা। তাঁরই জন্যে হঠাৎ এই যাত্রার আয়োজন হ'ল।

নর্ম্মদার তীরে যে সকল দেব-মন্দির ও তীর্থস্থান আছে, তার মধ্যে মধ্য-প্রদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত এই "ওঙ্কার মান্ধাতা" এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বহুদূর থেকে যাত্রীরা তীর্থদর্শন করতে আসে। তারা খাণ্ডোয়া থেকে ইন্দোর লাইন ধরে ট্রেনে পরবর্ত্তী ষ্টেশন মোরটক্কাতে নামে ও সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে, বাসে বা পদব্রজে মান্ধাতা পৌঁছে। তা ছাড়া খাণ্ডোয়া থেকে সারাদিন মোটর সার্ভিসও চলে। আমরা একখানা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করেছিলাম।

আমাদের মোটর নিমেষে শহরের জনাকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে বাইরের নির্জ্জন পথ ধরল। দু'ধারে কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কোথাও বা পতিত অনুর্ব্বর জমি, মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলছিল। রাস্তার পাশে একটা-দুটো গ্রাম, তারপর খানিকটা জঙ্গল, আবার গ্রাম আবার জঙ্গল—এভাবে সমস্ত পথটা মান্ধাতা পর্য্যন্ত চলে গেছে। কোন কোন গ্রাম বেশ শ্রীসম্পন্ন, আবার কোন কোন গ্রাম নিতান্তই ছোট। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সামনেই বেশ বড় বাঁধানো এক একটা ইঁদারা আছে, আর তার পাড়ে রংবেরঙের ঘাঘরা-পরা বহু গ্রাম্য বধূর ভিড়। তাদের কেউ বা বসে বসে পিতলের ঘড়াকে ঘসে সোনার মত ঝকঝকে করে তুলছে, কেউ-বা দড়ি দিয়ে টেনে ইঁদারা থেকে জল তুলছে, কেউ-বা মাথায় জলভরা গাগর নিয়ে মন্দ-গতিতে ঘরে ফিরে চলছে। স্বামীজী শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে বললেন, পথে পূর্ণকুম্ভা নারী দেখলে যাত্রা শুভ হয়।

এক এক স্থানে মোটর ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। কোথাও বা এক দিকে গভীর খাদ, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্য, কোথাও বা অরণ্যের স্থানে স্থানে পলাশ-ফুল ফুটে বন আলো করে আছে। কোথাও বা শালের বড় বড় পাতা শুকিয়ে হাওয়ার ধরে এধার-ওধার ছিটিয়ে আছে, দেবদারু, খয়ের প্রভৃতি নানা জঙ্গলী গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত-সূর্য্যের সোনালী আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রকৃতির মনোরম পরি-বেশের মধ্য দিয়ে তিন ঘণ্টা চলে আমরা মান্ধাতা পৌঁছলাম। স্বামীজী দূর থেকে সর্ব্বপ্রথম সেই মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ও আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। আমরা আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। উপর থেকে ধাপে ধাপে উপলময় সোপান ও রাস্তা অতিক্রম করে বহু নীচে নামলাম। দু'ধারে ছোট ছোট দোকান; তাতে হালুইকররা বসে ফুলুরী, জিলিপি, লুচি এসব ভেজে স্তূপীকৃত করেছে।

যাত্রীরা স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে পুজো সমাপন করে ফের-বার পথে এসব দিয়ে জলযোগ করে, কাজেই দোকানীদের এতে প্রচুর অর্থাগম হয়।

নীচে নেমে নর্ম্মদাতীরে দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্য দেখে চোখ

ডুবিয়ে গেল। কি মনোরম এই পার্ব্বত্য স্থান! নিয়ে স্বচ্ছ-সলিলা নর্ম্মদা বয়ে যাচ্ছে, অপর পাড়ে "ওঙ্কার মান্ধাতা"র মন্দির-শিখর অতি উঁচে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দু'দিক থেকে গাঢ় সবুজ পাথরের গাঁথুনি উঠেছে। সারি সারি দোকানপাট, ঘর-দুয়ার মন্দির স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সাজানো আছে, আর পাশে দাঁড়িয়ে মান্ধাতার রাজপ্রাসাদ। সরু পাথরের রাস্তা এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গেছে। নর্ম্মদাতীরে পাহাড়ের উপর সে সঙ্কীর্ণ রাস্তা, আর চুনকাম করা সাদা বাড়ীগুলি অতি সুদৃশ্য দেখাচ্ছিল।

ভারতের পুণ্যতোয়া নদীগুলির মধ্যে এই নর্ম্মদা একটি। সাধারণতঃ যাত্রীরা উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইলেও মধ্যপ্রদেশে নর্ম্মদাকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। কিংবদন্তী আছে যে, নর্ম্মদা গঙ্গার চেয়েও পবিত্র, এমন কি গঙ্গাও বৎসরে একবার কৃষ্ণবর্ণ গাভীর মূর্ত্তিতে এসে নর্ম্মদায় অবগাহন করে পাপক্ষালন করেন ও শুদ্ধ হয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে স্বস্থানে ফিরে যান। এরূপ বলা হয়, গঙ্গাস্নানে যে পাপ নাশ হয়ে থাকে নর্ম্মদা-দর্শনেই সেই পাপ দূর হয়ে যায়।

নর্ম্মদা ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে, তার উৎপত্তি ও বিলয় সহজেই লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সে কারণে নর্ম্মদার তীর্থযাত্রীরা শুধু নর্ম্মদায় অবগাহন করেই তৃপ্ত হন না, কেহ কেহ নর্ম্মদাকে পরিক্রমাও করে। তারা এই পুণ্যতোয়া নদীর উৎপত্তি-স্থান অমর কণ্টক থেকে বিলয়স্থল ভরোচ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ভরোচ থেকে অমরকণ্টক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে ও মনে করে এরূপ প্রদক্ষিণ দ্বারা শ্রেষ্ঠফল লাভ হয়। সাধারণতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল অতি দুর্গম। সুদূর হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গাযমুনার উৎপত্তি-স্থলের সন্ধান কম লোকেই রাখে। কিন্তু দেশের মধ্যবর্ত্তীস্থলে যে সকল নদীর উৎপত্তি, তাদের উৎপত্তিস্থল সাধারণ লোকেরা শুধু যে খুঁজে বের করেছে তা নয় যেস্থান থেকে নদীর ধারা আরম্ভ হয়েছে, সেটিকে চিহ্নিত করে আশপাশে মন্দির তৈরি করে তাকে তীর্থস্থলে পরিণত করেছে।

এই নর্ম্মদা রেবা রাজ্যস্থ সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর শিখর অমরকণ্টক থেকে নির্গত হয়ে মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশের ভিতর দিয়ে আট শত মাইল প্রবাহিত হয়ে আরবসাগর-সংলগ্ন কাম্বে উপসাগরে পতিত হয়েছে। নর্ম্মদা অমরকণ্টক-শিখরের যে স্থান থেকে অবরোহণ করেছে সেই স্থানটিকে লোকেরা নর্ম্মদাকুণ্ড নাম দিয়েছে এবং তার পাশে কয়েকটি মন্দিরও তৈরি করে রেখেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে নদীটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক ভাগ অমরকণ্টক থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, লোকেরা তার নাম "কপিলধারা" দিয়েছে। জনশ্রুতি, এখানে মন্দিরে যে পদচিহ্ন দেখা যায় তা কপিলমুনির। সেখান থেকে নদীটি বহু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জব্বলপুর সহরের উপকণ্ঠে এসে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করেছে। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে জলধারা নিয়ে পতিত হয়ে একটি মনোরম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার নাম "ধুঁয়াধারা"। তার পর নর্ম্মদা দু' মাইল পর্য্যন্ত মর্ম্মর-প্রস্তরের ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে। সে স্থানটিকে "মার্ব্বেল রকস্" বলা হয়। এর

নর্ম্মদাতীরে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির

দৃশ্য অতি মনোরম। দেশ-বিদেশের বহু দর্শক এই মার্ব্বেল রকস্ দেখতে যায়। জ্যোৎস্না রাত্রে এই স্থানের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। নর্ম্মদার প্রসার সেখানে মাত্র বিশ গজ, সেখান থেকে নির্গত হয়ে নর্ম্মদা সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিকে উর্ব্বরা জমিতে পরিণত করে দুই শত মাইল প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে এসেছে যেখানে সাতপুরা পর্ব্বত ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের ব্যবধান অতি সামান্য।

এক স্থানে নদীটি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে পতিত হয়ে দুইটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার একটি মান্ধারে ও অন্যটি পুনাশাতে। নর্ম্মদা মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে যতদূর প্রবাহিত হয়েছে, ততদূর পর্য্যন্ত তার তলদেশ প্রস্তরময়। মধ্যপ্রদেশ থেকে নদীটি ইন্দোর রাজ্য ও মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে এক শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে। নর্ম্মদাতীরে হোলকার বংশের রাজধানী প্রাচীন নগর "মণ্ডলেশ্বর" অবস্থিত। সেখানে রাণী অহল্যাবাঈ বহু মন্দির, স্নানের ঘাট ইত্যাদি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। অহল্যাবাঈয়ের সমাধি মঠও সেখানে আছে।

গঙ্গাতীরে যেরূপ বড় বড় সহর আছে, নর্ম্মদাতীরে তদনুরূপ বিশেষ কিছু নেই, সেকারণে নর্ম্মদার জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। গ্রীষ্মকালে নর্ম্মদা বহু দূর অবধি শুকিয়ে যাওয়ায় দরুণ অপরিসর হয়ে যায়, বড় বড় বালুচরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষায় পর্ব্বত-চূড়া থেকে জলপ্রবাহ যখন নেমে আসে, তখন নদীটি বিপুল জলোচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়।

অমরকণ্টকের নর্ম্মদাকুণ্ডের কিছুদূরে একটি দেবালয় আছে, তার নাম "নর্ম্মদামাঈকা মন্দির", এবং তার কিছুদূরেই আর একটি শিবমন্দির আছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার যাত্রী

শিবরাত্রির সময় নর্ম্মদাকুণ্ডে স্নান করে এই শিবমন্দিরে পূজো দিতে আসে। নর্ম্মদা সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে, শিবের দেহ থেকে নর্ম্মদার উৎপত্তি, তাই নর্ম্মদা শিবকন্যা। সে কারণে নর্ম্মদাকুণ্ডে স্নান করে শিবলিঙ্গকে বিল্বপত্র দিয়ে যে পূজো করবে, শিবের বরে তারই মুক্তিলাভ হবে।

নর্ম্মদাতীরে সিদ্ধনাথের মন্দির

লোকেরা বলে যে, সময় সময় এই কুণ্ডের জল দুধে পরিণত হয় এবং কুণ্ডের মধ্যস্থিত যেসব প্রস্তরখণ্ড আছে, সেসব শিব-লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কলিযুগের পূর্ব্বে মৈকাল দেব নামে এক জন রাজা ছিলেন। তাঁর নর্ম্মদা নাম্নী একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। তার হেমলা ও বিমলা বলে দুটি সহচরী ছিল। নর্ম্মদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বড় অনুরাগিণী ছিলেন, তাই মৈকাল দেবকন্যার জন্য একটি অতি রমণীয় উদ্যান তৈরি করিয়ে দেন।

নর্ম্মদা অধিকাংশ সময়ই সহচরীদের সঙ্গে উদ্যানে থাকতে ভালবাসতেন। এক দিন নর্ম্মদা তাঁর দুই সহচরীসহ উদ্যানে বসে আছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এক রাজপুত্র, নাম "সোনাভদ্র", সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নর্ম্মদার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সে উদ্যানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রকে পতিরূপে বরণ করতে স্বীকৃত হলেন এবং সেই অঙ্গীকারের সাক্ষ্যস্বরূপ দু'জনে মিলে একটি অতি সুরভিপুষ্পবৃক্ষ রোপণ করলেন। তারা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হলেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিরকাল অনুরক্ত থাকবেন —নর্ম্মদা বা রাজপুত্র অন্য কারও সঙ্গে পরিণয়বন্ধে আবদ্ধ হবেন না। আর তাদের সেই অম্লান প্রেম এই সুগন্ধি পুষ্পের মতই জগতে সৌরভ বিতরণ করবে।

এর পর অনেক দিন চলে গেল, অপর এক রাজপুত্র নর্ম্মদার পাণিপ্রার্থী হয়ে এলেন। রাজা তাকেই রাজকন্যার পাত্ররূপে মনোনীত করলেন, শুভবিবাহের দিন ধার্য্য হ'ল। তিনি কন্যার মতামত গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে করলেন না। রাজ্যে খুব উৎসবের ঘটা। সেদিন তরুণী নর্ম্মদার শুভ বিবাহ, এমন সময় সন্ন্যাসী-রাজপুত্র সে রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহ-সাজে সজ্জিতা নর্ম্মদাকে ও তার দুই সখীকে শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করে দিলেন। নর্ম্মদা নদী ও অমরকণ্টকের নিকটবর্ত্তী দুটি উপনদী নাকি রাজকন্যা ও তার সখী দু'জনের রূপান্তর।

অমরকণ্টকের এক মাইল উত্তরে নর্ম্মদার একটি শাখা চলে গেছে, তার নাম "সমেমরা"। "সমেমরা" একটি দর্শনীয় স্থান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এই নদীর অনতি-দূরে একটি উদ্যান আছে, সেই উদ্যানকে উপরোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত রাজকন্যা নর্ম্মদার উদ্যান বলা হয়। এই উদ্যানটিতেই নর্ম্মদা ও সন্ন্যাসী-রাজপুত্র সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। এখনও সে জাতীয় বৃক্ষ সেই উদ্যানে জন্মে থাকে এবং চক্ষুপীড়া উপশমের জন্য তার পুষ্প ব্যবহৃত হয়। এই উদ্যানের কিছু দূরেই চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী বিল আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে পৌরাণিক কাহিনীতে উক্ত নর্ম্মদার পিতা রাজা মৈকাল দেবের রাজপ্রাসাদ এখনও সেই বিলের অপর পারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। কিন্তু কোন দর্শকই নাকি সে স্থানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে নি।

আমরা নর্ম্মদার স্বচ্ছ শীতল জলে আনন্দে স্নান করতে লাগলাম। নদীর পুণ্যসলিলে অবগাহনে শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। নর্ম্মদার জল দু'হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন বিবাহসাজে সজ্জিতা তরুণী নর্ম্মদার মূর্ত্তি। মনে হ'ল এইরূপ কাহিনীর স্রষ্টাদের কল্পনা কি মনোরম, কি বিচিত্র।

স্নানান্তে আমরা ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলাম। নদীর এপার থেকে ওপারে খেয়া নৌকায় বসে পার হয়ে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে যেতে হয়। এই মন্দিরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপে বহু মন্দির আছে। এগুলো শিবপুরী, ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিনপুরীর চারদিকে নদীটি এ ভাবে প্রবাহিত হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন ওঁ এই অক্ষরের আকারে তা ঘিরিয়ে আছে, তাই মান্ধাতার অপর নাম "ওঙ্কার মান্ধাতা"। দ্বীপটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা, দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী একটি উপত্যকা দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব দিকে নদী থেকে ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু পর্ব্বতমালা উঠে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমতল জমিতে মিশে গেছে। মান্ধাতার বিপরীত দিকে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীর পর্ব্বত-সমাকীর্ণ। দু'পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে গভীরসলিলা নর্ম্মদা বয়ে গেছে। নদীর স্বচ্ছ জলে নানা আকারের ছোট বড় বহু মাছ জলে ভাসছে। এগুলো

মন্দিরের আশ্রিত, এদের ধরা নিষেধ। সব যাত্রীই ছোলা ভাজা মটর ভাজা কিনে নেয়, আর জলে একটা ছুটো করে ছাড়তে থাকে। শত শত মাছ মাথা বের করে তা খেতে আসে। দ্রুতগতিতে এরা জলের উপর চলাফেরা করে, মানুষকে ভয় করে না। কি সুন্দর নর্মদার স্বচ্ছ জলে মাছের এই খেলা।

নর্মদার দক্ষিণ তীরে অমরেশ্বরের মন্দির। এ মন্দিরে ইন্দোর রাজ্য হতে আগত বাইশ জন ব্রাহ্মণ দৈনিক শিবপূজা করেন। ত্রিশ হাজার শিবলিঙ্গ মাটি দিয়ে তৈরি করে পূজা অন্তে নদীতে বিসর্জন করা ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ। অমরেশ্বরের মন্দিরের কাছেই বীরেশ্বরের মন্দির—তার প্রবেশ-দ্বার অতি সুন্দর। বিষ্ণুপুরীতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত। সিদ্ধনাথের মন্দির দ্বীপের সমুদয় মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি পাহাড়ের পূর্ব্ব কিনারে অবস্থিত। খুব উঁচু উঁচু স্তম্ভ মন্দিরটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেই স্তম্ভগুলিতে ও মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগাত্রে বহু হস্তীমূর্ত্তি খোদিত আছে। হস্তী মূর্ত্তিগুলি বড় সুন্দর ভাবে খোদাই করা। অধিকাংশই যুদ্ধের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কোনটার পায়ের নীচে শায়িত মনুষ্যমূর্ত্তি। মন্দির জীর্ণদশায় পতিত হওয়ায় কতকগুলি মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হয়। তার মধ্যে দুয়টি নাগপুর মিউজিয়মে রাখা হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দু'পাশে আঠারটি স্তম্ভ এবং তার উপর ছাদ। এই স্তম্ভগুলি প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচু এবং সেগুলোতে বহু কারুকার্য্য আছে। মন্দিরটি অতীত অবস্থায় খুব সুদৃশ্য ও বিরাট ছিল সন্দেহ নেই। বর্ত্তমানে মন্দিরের ছাদ ও চূড়া ধ্বসে গেছে এবং অনেক স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ইংরেজ সরকার তার কতক জীর্ণসংস্কার করে উপরে সাধারণ একটি ছাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

দ্বীপের উত্তর কোণে একটি পুরানো মন্দির আছে, তার নাম সোমনাথ। মন্দিরে কালো পাথরে তৈরি সুবিশাল এক শিবলিঙ্গ, বাইরেও ঠিক এই রকম নন্দী বা ষাঁড়ের কৃষ্ণমূর্ত্তি। কিংবদন্তী আছে যে এই বিরাট শিবলিঙ্গ শ্বেত পাথরে তৈরি হ'ল। দর্শক পরজন্মে কি হবে জানবার ইচ্ছে নিয়ে মূর্ত্তির দিকে চাইলেই নাকি তা তার চোখের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে উঠত। একবার বাদশা আওরঙ্গজেব এই মন্দিরে আসেন ও এই কথা শুনে মূর্ত্তির দিকে চেয়ে নিজে ভবিষ্যৎ জন্মে কি হবেন তা দেখতে চান। তিনি তখন দেখতে পেলেন এক রুদ্র-মূর্ত্তি। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি সেই বিরাট মহাকালের মূর্ত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেন। সেই থেকেই ঐ শ্বেতমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে।

এ সব মন্দির দেখে আমরা সেই বিখ্যাত ভৈরবশিলা দেখতে গেলাম, যেখানে বহু পূর্ব্বে নরবলি হ'ত। বিষ্ণুমন্দির ও জৈন মন্দিরের মধ্যে একটি নালা আছে, তার নাম রাবণ-নালা। সেই নালার তীরে এক বিরাট রাক্ষসে মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির দশটি বাহু, লম্বায় মূর্ত্তিটি দশ ফুট। কেউ কেউ বলেন, ইহা রামের শত্রু রাবণের মূর্ত্তি, আবার কারও কারও মতে

নর্মদা মধ্যস্থ দ্বীপের ওপর মন্দিরসমূহ

ভৈরবের পত্নী মহাকালীর এই মূর্ত্তি। মূর্ত্তির গলদেশে সাপের হার, হাতে তলোয়ার ও নরমুণ্ড। মূর্ত্তির শূন্য উদর মনুষ্যরক্তে পূর্ণ হবার জন্য উদ্যত। আর সেই উদরের উপর বক্র এক বৃশ্চিকমূর্ত্তি।

মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সেই বিখ্যাত পর্ব্বতশৃঙ্গ যা থেকে ভৈরবের ভক্তরা লাফিয়ে নীচে শিলাময় পাদদেশে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে রাক্ষুসী মহাকালীর রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করত। ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভরত সিং মান্ধাতা দখল করেন তখন সেই মহাকালী ও ভৈরবের পূজারী মাত্র এক জনই ছিলেন। অন্যেরা ভয়ে পূজায় কার্য্যে অগ্রসর হ'ত না। সেই পূজারীর নাম ছিল গোঁসাই দরিয়ানাথ। কঠোর তপস্যাবলে দরিয়ানাথ সেই মহাকালীকে ভূনিম্নস্থ এক গহ্বরে আবদ্ধ করে রাখেন ও সেখানে অপর এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন। দরিয়ানাথের পূজায় কালী সন্তুষ্ট হন। ভৈরবের কাছে দরিয়ানাথ মানত করেন ও প্রতিশ্রুতি দেন—প্রতি বৎসর মধ্যে মধ্যে তিনি নরবলির ব্যবস্থা করে ভৈরব ও মহাকালীর রক্তপিপাসার উপশম করবেন কিন্তু তার সর্ত্ত এই যে, তাঁরা যাত্রীদের প্রাণ হরণ করে যখন খুসী নিজেদের উদরপূর্ত্তি করতে পারবেন না।

এই নরবলিপ্রথা যখন প্রচলিত ছিল তখন মান্ধাতা দ্বীপ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল, সুতরাং তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। ১৮২৪ সনে একজন ইংরেজ শাসনকর্ত্তা এই "ভৈরব-শিলা"র নরবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

"যেদিন নরবলির উৎসব হবে, সেদিন আমি খুব ভোরে উঠে ভৈরবের প্রতীক মূর্ত্তির কাছে গেলাম। সে একটা কালো

প্রস্তরখণ্ড, তাতে লাল সিঁদুর মাখানো আছে। যে ভক্ত ভৈরবের নিকট আত্মবলি দিবে, সে এই শিলার উপর লাফিয়ে পড়ত। কিছুক্ষণ পর বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সেই ভক্ত এল, যে আজ নিজের প্রাণ বলি দিবে। সে পাথরের প্রতীকের কাছে দ্রুতপদে উপস্থিত হ'ল, তার চোখে মুখে একটা দুরন্ত উল্লাস। আমি কিছু পরে তার কাছে গেলাম, ও তাকে অনেক বুঝিয়ে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। বাকী জীবন আমি তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমার সঙ্গে নৌকা ছিল, আমি তাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনতার নিকট থেকে দূরে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সব অনুরোধ ব্যর্থ হ'ল; সে দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলে যে, ভৈরবের বলি বন্ধ করা মনুষ্যশক্তির অতীত। দেখলাম এই অবস্থায় বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সে যখন ভৈরবমূর্তির সম্মুখীন হ'ল, তখন তার ভিতরের কুসংস্কারগুলি প্রবল শক্তি ধারণ করল। চারদিক থেকে বর্বর জনতা চেঁচিয়ে আর হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে লাগল। সে তার দৃপ্ত অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে আমার কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে। সে ভৈরবের সামনে নারকেল উৎসর্গ করে নৈবেদ্য দিলে। তার পর একটা শুকনো লাউ বের করে তা থেকে তার সঞ্চিত অর্থ সেখানকার পূজারিণীর সামনে ঢেলে দিল। পূজারিণী একটা নারকেলের মালায় কারণ এনে তাকে পান করতে দিল। কারণ দেবার পূর্ব্বে নিজের ছেলেকে খানিকটা খাইয়ে দেখাল যে তাতে বিষাক্ত পদার্থ কিছু নেই। কারণের কতকটা মূর্তির উপর ঢেলে দিয়ে ভক্তটি কারণ পান করলে।

"পূজারিণী ভক্তকে তার হাতের রূপোর আংটিগুলি খুলে দিয়ে দিতে বললে। আংটি খুলে দেবার সময় লোকটির চোখে মুখে গভীর ধৈর্য্য দেখা গেল। সে তার প্রথম আংটি খুলে নিজের মুখে রেখে দিল, তার পর একে একে দু'হাতের আংটিগুলি খুলে পূজারিণীকে দিলে। জনতার মধ্য থেকে একটি লোককে খুঁজে বের করে বললে তার শেষ আংটি তাকে দেওয়া হোক; এই লোকটি তার সঙ্গে উজ্জয়িনী থেকে এসেছিল। এই সময় দেখা গেল অনেক লোক তাদের হাতের রূপার বাজু, গয়না, সুপারি ইত্যাদি তার হাত দিয়ে স্পর্শ করাতে চায়। সে স্থির চিত্তে তাদের জিনিষগুলি নিয়ে মুখে রেখে আবার তাদের ফিরিয়ে দিল। অবশেষে পূজারিণী তাকে একটা পান খেতে দিলে। সে পান নিয়ে দৃঢ় পাদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলে।

"চারদিকে জনতা হাততালি দিয়ে উঠল। সে যখন পাহাড়ে চড়ছিল, তখন মাঝে মাঝে লতাগুল্মে তার দেহ ঢেকে যাচ্ছিল। অবশেষে সে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াল। যদিও সে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান, তবু তার দেহ ঋজু, ভঙ্গি বীরত্বব্যঞ্জক। কিছু সময় সে আবেগের সহিত দু'বাহু দোলাতে লাগল, মনে হ'ল মন্ত্র উচ্চারণ করছে, তার পর স্থির হ'ল। দু'হাত জোড় করে জনতাকে বিদায় অভিবাদন জানাল। তার পর তার কোমরের থলি থেকে নারকেল, আয়না, ছুরি, চুণ ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু পিছু হটল, পরমুহূর্তেই একান্ত পৌরুষের সহিত পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিল। সামনে পা রেখে সে প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়তে লাগল এবং অর্দ্ধ পথে একটা টিলার চূড়ায় লেগে মাথা নীচু হয়ে পা উল্টে গেল এবং সেই অবস্থায় ৯০ ফুট নীচে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে। এই যুবকের ভিতর যা বিশ্বাস ও শৌর্য্য ছিল, তা এ ভাবে ধ্বংস না করে সে তা জগতের বড় কাজে লাগাতে পারত।"

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে মান্ধাতায় বাৎসরিক মেলা বসত। প্রায় ২৫।৩০ হাজার যাত্রী জমায়েৎ হ'ত। আর এই সময়ই হ'ত নরবলির আয়োজন। ১৮২৪ সালের পর যখন মান্ধাতা ইংরেজের অধীনে আসে তখন নরবলি বন্ধ হয়। সাধারণতঃ এই মেলায় সমস্ত নজর মান্ধাতার রাজারই প্রাপ্য, কিন্তু পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী ভীল-পরিবারের লোকেরা চার দিন মেলায় নজর যা পায়ে লুঠ করে নিত। এর ফলে প্রকাশ্যে রাজার ভৃত্যদের ও ভীলদের মধ্যে খুব যুদ্ধ লেগে যেত। মেলার বহু পূর্ব্ব থেকেই দু'দল যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকত। উভয়পক্ষের লোকেরাই নাকি বেশ লম্বা লম্বা নখ রাখত যাতে নজর ও নৈবেদ্য কেড়ে নিতে পারে।

মান্ধাতা এখন একটি ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা হাজারও নয়, কিন্তু এককালে ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বর্ত্তমান মান্ধাতার রাজা জাতে "ভীলালা।" এই রাজারা চৌহান রাজপুত ভরত সিংহের বংশধর, ইনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভীল সর্দারের কবল থেকে মান্ধাতা অধিকার করেন। দরিয়ানাথ গোঁসাইয়ের আমন্ত্রণে চৌহান ভরত সিংহ এসে নাথু ভীলকে হত্যা করেন ও তার কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজপুতরা ক্রমে রক্তপিপাসু ভৈরবের ভক্ত এই পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাদের বংশধরেরাই বর্ত্তমানে ভীলালা নামে পরিচিত। ভীল খাঁটি পার্ব্বত্য জাতি, কিন্তু ভীলালা হচ্ছে রাজপুত ও পার্ব্বত্য ভীলের সংমিশ্রণ।

সমুদয় মন্দির দর্শন করে মহাদেবের পূজা দিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম এবং নদীর বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। অপরাহ্ণ সূর্য্যের রক্তিম আভায় নীল আকাশের সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মদার নীল জলও রাঙা হয়ে উঠল। আমরা মুগ্ধ হয়ে এই স্থানের অপরূপ শোভা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হ'ল ভারতের দেবস্থানগুলো কি সুন্দর প্রাকৃতিক পরি-

দেশের মধ্যে অবস্থিত। এক দিকে মানুষের মহৎ-হস্তনির্মিত নানা কারুকার্য্যপূর্ণ মন্দির, দেবমূর্তি, সৌধ যেরূপ মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি—গহন কান্তার ধূসর পর্ব্বতমালা, সলিলবিপুলা স্রোতস্বিনী মনকে মুগ্ধ করে দেয়।

ছেলেমেয়েরা মাছের জন্য ছোলা মটর ভাজা কিনে নিয়েছিল, ওগুলো মুঠো মুঠো করে জলে ছুঁড়তে লাগল। স্বামীজীও শিশুদের একজন হয়ে গেলেন, তিনিও পরমানন্দে নিজের খাবার থেকে টুকরো টুকরো করে মাছগুলোকে খাওয়াতে লাগলেন। দল বেঁধে সারি সারি ছোট বড় নানা আকারের মাছ জলের উপর মাথা তুলে ওগুলো খেতে এল। মাঝে মাঝে দু'একটা মাছ জলের উপর ভেসে ডিগবাজী খেয়ে নীচে তলিয়ে যেতে লাগল। দিনান্তের আভায় তাদের আঁশগুলো রূপার মত ঝিকমিক করে উঠছিল। শিশুরা মাছদের নানা রকম খাবার দিয়ে ও তাদের খেলা দেখে বিশেষ কৌতুক ও তৃপ্তি বোধ করলে। একদল ডুবরী ছেলেমেয়ে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের বিচিত্র বেশভূষা ও কুচকুচে কালো দেহের সবল গঠন দেখে মনে হ'ল, এরা বোধ হয় ভৈরব শিলার যে পাহাড়ী ভীলরা আত্মবিসর্জন দিত তাদেরই বংশধর। তারা গ্রাম্য হিন্দীতে আমাদের বলতে লাগল, "তোমরা জলে পয়সা ছুঁড়ে দাও, আমরা তুলে আনব।" আমরা কৌতূহলী হয়ে পয়সা নদীতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব মেরে সে পয়সাগুলো খুঁজে বের করে আনতে লাগল। নদীর স্বচ্ছ জল এদের দৌরাত্ম্যে তীরের কাছে ঘোলা হয়ে উঠল। নদীতীরে বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা খাণ্ডোয়া ফিরবার উদ্যোগ করলাম।

আবার সেই পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চলতে সুরু করল। গাড়ীর দোলায় ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রা আসতে লাগল। আর সেই তন্দ্রাজড়িত চোখে চিত্রের মত ভেসে উঠল—নর্ম্মদাতীরে সু-উচ্চ ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী নর্ম্মদা, সেই বিভীষিকাময় ভৈরব শিলা, এমনি আরও কত বিচিত্র ছবি। মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কোন্ এক অজানা রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে তন্দ্রা ছুটে গেল, জেগে দেখলাম খাণ্ডোয়া পৌঁছে গেছি। স্বপ্ন রাজ্য ছেড়ে বাস্তব জগতে এসে পৌঁছলাম।

আশা

শ্রীআর্য্য চক্রবর্ত্তী

সঘন আকাশ নীল অঞ্জন মোহ
গোধূলি লগ্নে রাত্রির সমারোহ,
শঙ্কা-আকুল হংসবলাকা চলে
দ্রুত পাখা মেলে দখিন্ বিলের জলে,
ব্যর্থ রজনী, বন্ধ্যা প্রতিশ্রুতি,
সেতারের সুরে সকরুণ বিস্মৃতি।

মেঘ ডম্বরু কাল চৈত্রের পথে,
ঘূর্ণিত করে কৃষ্ণচূড়ার শাখা,
বিদ্যুৎ-কণা ভীরু বধূটির মুখে,
চোখের দুটি কালো পর্দায় ঢাকা;
উৎসুক চোখ কোনো বাধা নাহি মোছে,
ঘনমেঘের দৃষ্টি কাহার খোঁজে।

জলতরঙ্গ ঝিরিঝিরি বর্ষণে
পাগল হাওয়ায় এলোমেলো আসাগোনা,
ক্লান্ত শয়নে দীর্ঘ প্রহর গোনা:
তাদা স্বপ্নের প্রান্তি রিক্ত মনে।
নিশীথ আঁধারে রূপালি ঘণ্টা বাজে
আসন্ন ঊষা নূতন আলোর সাজে।

টমাস আল্‌ভা এডিসন ও চলচ্চিত্র শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বর্তমান যুগে যে সকল আবিষ্কার দ্বারা মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, যে গুলির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে অনেকগুলিরই আবিষ্কর্তা বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস আল্‌ভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)। চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্ভাবনের জন্য সভ্য জগৎ বিশেষ ভাবে তাঁহারই নিকট ঋণী।

১৮৮৯ সনে এডিসন কর্তৃক প্রথম তাঁহার চলমান ক্রিয়াশীল চিত্র এবং তাহার অনতিকাল পরে 'এডিসন কিনেটো স্কোপ' উদ্ভাবিত হয়। প্রথম চলচ্চিত্র ষ্টুডিয়োও এডিসনেরই আবিষ্কার এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন কোম্পানীর জন্য ফিল্মে চলচ্চিত্র তুলিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

টমাস আল্‌ভা এডিসন

তাঁহার অন্যান্য যে-সমস্ত আবিষ্কার দ্বারা পরোক্ষভাবে ফিল্ম-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে সেগুলি হইতেছে—টেলিফোনে বার্তা প্রেরণাদির পদ্ধতির উন্নতিবিধান, ফনোগ্রাফ, ইন্‌কেনডিসেন্ট ল্যাম্প (ভাস্বর প্রদীপ), ইলেক্ট্রিক ডায়নামো, কিনেটোগ্রাফিক ক্যামেরা এবং চলচ্চিত্রের ক্যামেরার জন্য ফটোগ্রাফিক ফিল্ম।

প্রথম দশ বৎসর চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র ৫০ ফুট দীর্ঘ ফিল্মস্বত্বে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপ এবং স্থানীয় সাময়িক ঘটনাদি প্রদর্শিত হইত। পরে, এডিসন কোম্পানির উদ্যোগে প্রযোজিত "দি লাইফ অব এন আমেরিকান ফায়ারম্যান" (একজন আমেরিকান ফায়ারম্যানের জীবন) এবং "দি ট্রেন রবারি" (ট্রেনে ডাকাতি) এই দুইটি ছবির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীমূলক চিত্রের প্রবর্তন হয়।

১৯০৯ সালে চলচ্চিত্রের ডিরেক্টরদের অগ্রণী ডেভিড মার্ক গ্রিফিথ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলের সম্বৎসরব্যাপী চমৎকার আলো এবং প্রীতিকর আবহাওয়াযুক্ত পরিবেশে ফিল্মে চলচ্চিত্র তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানিসহ তথায় গমন করেন। সেখানে হলিউড এবং ইহার পারিপার্শ্বিকে এই নূতন আর্টের মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট মার্কিন শিল্প ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

১৯২৭ সন পর্য্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল শুধুমাত্র মূক ছায়াচিত্র। কিন্তু অবশেষে টেলিফোন এবং বেতারে বাক্যালাপ ও কথ-

শব্দবাহী সলসমন্বিত এডিসন "পিপহোল" কিনেটোস্কোপ যন্ত্র সাদির যে সমস্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে চলচ্চিত্র শিল্পেও সেগুলির প্রবর্তন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। ১৯২৭ সনে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র "জাজ সিঙ্গার" নির্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক, ডিরেক্টর, অভিনেতা সকলেই স্ব স্ব মূল টেকনিক বা কলা-কৌশল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত ইহাতে সাফল্যলাভ করিলেন। অচিরাৎ সংলাপ সঙ্গীত এবং শব্দের "এফেক্ট" চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এমনি ভাবে মৌন ছবিগুলি মুখর হইয়া উঠিল—চলমান মূক ছায়াচিত্র পরিণত হইল সবাক চলচ্চিত্রে।
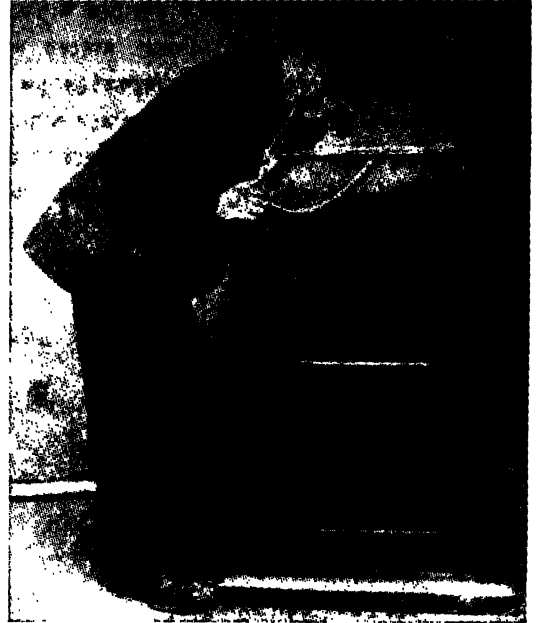
বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৬

অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় হেতু পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই আজ বেকারসমস্যা ও তাহার ফলে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা জাতীয় জীবনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই কুটীরশিল্পের প্রসার কমিয়াছে ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের অবনতিও ঘটিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, যন্ত্র-চালিত বৃহৎ কারখানায় কুটীরশিল্প অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিল্পী অধিক উৎপাদন করে। এদেশে যখন বৃহৎ শিল্প ও কারখানা বিশেষ ছিল না তখন দেশের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এখনকার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কারণ সেই সময় দেশের আর্থিক কাঠামো গ্রাম্য অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সাধারণতঃ গ্রাম ছাড়িয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য লোকেদের শহরে ও শিল্পকেন্দ্রে যাইতে হইত না।

আমাদের দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় শতকরা নব্বই জন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে। যে কয় মাস কৃষিক্ষেত্রে কোন কাজ থাকে না সেই কয় মাস বিনা উপার্জ্জনে তাহাদের দিন কাটাইতে হয় অথবা উপার্জ্জনের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয়। সেই সময় নিজ গ্রামে থাকিয়া তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের পক্ষে একমাত্র কুটীরশিল্পই বিশেষ উপযোগী।

সর্ব্বপ্রথম জাপানই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে কুটীরশিল্পের উপকারিতা বুঝিয়া একই সঙ্গে তাহার বৃহৎ কারখানাগুলি ও কুটীরশিল্পসমূহ সুন্দরভাবে সুপরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিয়াছিল। জাপানে প্রস্তুত প্রত্যেক জিনিসই বিশ্বের বাজারে এত সস্তাদরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে যে, তাহাতে যুক্তরাজ্যের, যুক্তরাষ্ট্রের, এমন কি জার্ম্মানীর বড় বড় শিল্পপতিরাও ব্যবসাক্ষেত্রে জাপানের প্রতিযোগিতা কি করিয়া রোধ করিবে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাপান তাহার বৃহত্তম কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের অনেক অংশ নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত কুটীরশিল্পগুলির দ্বারা অল্পখরচায় তৈরি করাইয়া দেশ-বিদেশে সস্তাদরে মাল চালান দিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে তাহার বৃহৎ ও কুটীরশিল্পে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সকল দেশের বাজারে নানারূপ রেশম, দেশলাই, ঘড়ি, এবং সাবান ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ভাবে জাপান তাহার জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো যে কিরূপ সবল করিয়াছিল তাহা সুবিদিত। সকল ক্ষেত্রেই যে উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন খরচ কমাইতে পারা যায় তাহা ঠিক নয়। ইহার দ্বারা অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের শ্রমিক সরকার নিজেদের দেশের বেকারসমস্যা ঐরূপ মিশ্র উৎপাদনের দ্বারাই সমাধান করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছিলেন। যাঁহাদের ধারণা যে যান্ত্রিক শিল্পের প্রসার ভিন্ন এবং যান্ত্রিক যুগে কুটীরশিল্পের দ্বারা দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারা যাইবে না তাহাদের অবগতির জন্য আমি ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার হইতে প্রকাশিত ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক সংখ্যানুপাতসহ মোট কারখানার সংখ্যা নিম্নে দিলাম :

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ শ্রমিক ও কারখানার সংখ্যা :

শ্রমিক সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা	মোট শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)
১১-২৪	১৫,৬৪০	২৬২
২৫-৪৯	১২,৭৩০	৪৪৬
৫০-৯৯	৯,৭১০	৬৮৩
১০০-২৪৯	৭,৮১০	১২১২
২৫০-৪৯৯	২,৯২০	১০১৭
৫০০-৯৯৯	১৩৩০	৯০৮
১০০০-১৯৯৯	৫৯০	৮০১
২০০০-৪৯৯৯	২৫০	৭৪৩
৫০০০ ও ঊর্দ্ধে	৬০	৪৩৮

বৃহৎ ও ছোট ছোট কুটীরশিল্পগুলি হইতে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশ যে কতটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা উপরে প্রদত্ত বিবরণী হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশের ছোট ছোট শহরগুলির ও পল্লী-অঞ্চলের উন্নতি-সাধন না হইলে কুটীরশিল্পের প্রসার সম্ভবপর নয়; কারণ ঐ সব স্থানের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা না থাকিলে যথেষ্টসংখ্যক শিল্পী পাওয়া কঠিন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি নূতন

শহর (Township) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহা যে কতটা সাফল্য অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। আশঙ্কা হয় বহু অর্থব্যয়ে তৈরি ঐ সব পরিকল্পনার খসড়াগুলি শেষ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তরেই থাকিয়া যাইবে। মাত্র কয়েকটি আদর্শ নগর তৈরি করিলে প্রদেশের জনসাধারণের কি বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য ইহার দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি বাস্তুহারাদের মধ্যে জমি বিতরণের বিষয়ে কয়েকটি কথা প্রদেশ-সরকারের গোচরে আনিতেছি। শুনিয়াছি যে, অনেক শক্তিশালী ধনী ও মতলববাজ লোক বাস্তুহারাদের নামে ভাল ভাল জমি প্রদেশ-সরকার কর্তৃক বণ্টন করাইয়া পরে কিছু বেশী মূল্য দিয়া তাহাদের নিকট হইতে স্বনামে ও বেনামে হস্তান্তর করিয়া লইয়াছেন ও এখনও লইবার চেষ্টা করিতেছেন। একথা সত্য হউক আর নাই হউক, প্রদেশ-সরকার কর্ত্তৃক বাস্তুহারাদের মধ্যে জমি বণ্টনের এইরূপ একটা সর্ত্ত থাকা উচিত যে, যাহাদের মধ্যে ঐ সমস্ত জমি বণ্টন করা হইবে তাঁহারা অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্ব্বে উহা দান, বিক্রয়, লীজ, বন্ধক দেওয়া অথবা কোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি তাহা করেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত জমি উচিত মূল্যে প্রদেশ-সরকারকেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ সর্ত্ত থাকিলে মতলববাজ লোকেরা সহজে বাস্তুহারাদিগকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সরকার কর্ত্তৃক বণ্টিত জমি লইতে পারিবেন না।

যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দিয়া কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এক্ট-এর অনুকরণে একটি 'রুর‍্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট এক্ট' পাশ করেন তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। যেরূপ ভাবে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এই শহরের উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং শহরটিকে চতুর্দ্দিকে যেরূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে ঠিক সেইভাবেই ঐ এক্ট অনুসারে প্রত্যেক জেলাকে অথবা কতিপয় জেলা একত্র করিয়া কয়েকটি ট্রাষ্ট গঠনের ব্যবস্থা করিলে প্রদেশের ছোট বড় শহরগুলির ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির দ্রুত উন্নতিবিধান করিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ-সরকারকে প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির জন্য কোনও ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যে প্রকারে তাহার ব্যয়ভার বহন করে ঠিক সেই পদ্ধতিতে ঐ ট্রাষ্টগুলির আয়ের ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জেলার ছোট-বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লী-উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপন, রাস্তা তৈরি, মধ্যবিত্তদের বাসের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর কার্য্য ঐ ট্রাষ্ট অথবা ট্রাষ্টগুলির কর্ম্মসূচী হইবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার অথবা ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, স্থানীয় বার এসোসিয়েশনগুলির সভাপতি, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ হইতে মনোনীত কয়েকজন সভ্য, সরকার হইতে মনোনীত কতিপয় সভ্য এবং বেসরকারী অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের লইয়া ঐ সকল ট্রাষ্ট গঠন করিলে ভাল হয়। ট্রাষ্টের ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী হওয়া দরকার যাহাতে সকল রকম জনহিতকর কার্য্য ট্রাষ্টগুলি সম্পন্ন করিতে পারে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের যেরূপ 'ডিবেঞ্চার' দ্বারা টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা আছে সেইরূপ ক্ষমতা প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির থাকা দরকার। ইহার দ্বারা স্থানীয় পুঁজিপতিরা ঐ সমস্ত ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া একই সঙ্গে ট্রাষ্টগুলির আর্থিক অবস্থা দৃঢ় করিতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ট্রাষ্টের সভ্য-সংখ্যা যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত, নচেৎ ঐগুলি কার্য্যকরী হইবে না, কেবল রাজনৈতিক দলাদলির মঞ্চ হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রস্তাবিত ট্রাষ্ট ছাড়া, আসানসোলের খনি অঞ্চলে যেরূপ হেল্‌থ্‌ বোর্ড আছে ও যেভাবে উহা কার্য্য করিতেছে, বেঙ্গল মাইনিং সেটেল্‌মেণ্ট এক্টের অনুকরণে প্রত্যেক জেলায় সেইরূপ একটি করিয়া হেল্‌থ বোর্ড স্থাপন করা আবশ্যক। যদি জেলাগুলিতে রুর‍্যাল ইম্প্রুভমেণ্ট এণ্ড ডেভেল্প্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট এবং হেল্‌থ বোর্ডগুলি পাশাপাশি কার্য্য করে তাহা হইলে অচিরেই প্রদেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সকল দিক হইতে উন্নত হইবে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং কলিকাতা করপোরেশন যেমন একই স্থানে নিজ নিজ কার্য্য চালাইতেছে, ঠিক সেইভাবেই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ঐ সমস্ত ট্রাষ্টের সঙ্গে কার্য্য করিতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন উপস্থিত জেলা-বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ডগুলির দ্বারা জনসাধারণের অর্থক্ষয় ছাড়া বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না।

প্রদেশ-সরকার যদি ঐ সঙ্গে তাঁহাদের ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মারফত পল্লী অঞ্চলে সাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলার সদর রাস্তাগুলিতে (Trunk

Road) বৈদ্যুতিক ট্রামওয়ের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে প্রদেশের বহু স্থানে অনেক ছোট বড় শহর আপন হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য একটি গরীব ব্যাঙ্কের কথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। উহা নিউ সাউথ ওয়েলস্ সরকার-পরিচালিত রুয়াল ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্ নামে পরিচিত (ভুলক্রমে নিউজিল্যাণ্ড বলিয়া লেখা হইয়াছিল)। অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি শহরে ইহার প্রধান আপিস এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৬১½ লক্ষ পাউণ্ডের উপর অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি টাকা এবং সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪½ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৬ কোটি টাকা মোটামুটি ছিল। ঐ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে। একটি সরকারী এজেন্সি বিভাগ ও অপরটি সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার উপর শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় ও ব্যাঙ্ক লগ্নি টাকার উপর শতকরা ৪ হইতে ৪½ টাকা হারে সুদ গ্রহণ করে। কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নের উপযোগী পুস্তক প্রকাশ, ফিল্ম তৈরি, পড়িবার জন্য বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। তিন জন কমিশনার ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করেন ও অনেকগুলি অভিজ্ঞ ভ্যালুয়ার আছেন যাঁহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের জমি উন্নয়ন ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য ঋণ দিবার পূর্ব্বে আবেদনকারীর কার্য্যদক্ষতা বিচার এবং জমি ও সম্পত্তির মূল্য ইত্যাদি স্থির করিয়া দেন। ব্যাঙ্ক ছোট ছোট চাষের উপযুক্ত জমি একত্রীকরণের জন্য (amalgamation of small holdings) টাকা ধার দিয়া কৃষকদের বিশেষ উৎসাহপ্রদান করিয়া থাকেন। গরু, মেষ, মুরগী ইত্যাদি নানাপ্রকারের পশু-পালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করাইয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের বৃত্তি দিয়া ব্যাঙ্ক বিদেশে পাঠায় এবং তাহাদের ঐসব বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ও বহু জনহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত সাধারণকে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও এই ব্যাঙ্কে আছে। ব্যাঙ্ক নিজ কর্ম্মচারীদের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে ও ঐজন্য বৃত্তি দিয়া থাকে। ইহার সরকারী বিভাগের টাকা প্রদেশ-সরকার দিয়া থাকেন, সাধারণ বিভাগের টাকার জন্য সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করা হয়। প্রদেশের ও প্রদেশবাসীর যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এবং মহাজনের নিকট হইতে কৃষিজীবী, শিল্পী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের টাকা ধার করিতে না হয় ইহাই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ-সরকারের সাহায্যে ঐরূপ একটি রুয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। আমার মনে হয়, যদি ঐ ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের শতকরা ২০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখিয়া বাকী শতকরা ৮০৲ টাকার অর্দ্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৪০৲ টাকা অংশীদারদের মধ্যে নগদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট শতকরা ৪০৲ টাকার দ্বারা ব্যাঙ্ক অথবা প্রদেশ-সরকার কর্ত্তৃক জমি সংগ্রহ করিয়া প্রতি ছয় মাস অন্তর অথবা প্রতি বৎসর অংশীদারদের মধ্যে ১০ বিঘা, ২৫ বিঘা, ৫০ বিঘা ও ১০০ বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি কিংবা বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া লটারি দ্বারা পুরস্কার-প্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার খরিদ করিবার আগ্রহ বেশী হইবে। উক্ত লটারিতে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম উঠিবে তাহাদের নিজ নিজ নির্ব্বাচিত গ্রামে ঐরূপ জমি বিতরণের ও গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ব্যাঙ্কগুলির করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত 'রুয়াল ব্যাঙ্ক' যাহাতে যে-কোনও স্মৃতি তহবিল অথবা জনহিতকর ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টীস্বরূপ কার্য্য করিতে পারে, আইনসঙ্গতভাবে সেইরূপ ক্ষমতা ঐ ব্যাঙ্কের থাকা দরকার। আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় ও ছোট-খাটো স্মৃতি তহবিল এবং জনহিতকর ট্রাষ্ট আছে— ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে। যদি ঐ সমস্ত স্মৃতি-তহবিলের এবং ট্রাষ্ট ফণ্ডের টাকায় প্রস্তাবিত রুয়াল ব্যাঙ্কের অংশ খরিদ করা যায়, অথবা দীর্ঘকাল মেয়াদে কতকাংশ অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে স্মৃতিমন্দির, স্মৃতিমূর্ত্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ অপেক্ষা ইহাতে দেশের ও দশের অনেক বেশী কল্যাণসাধন হইবে। মনীষী ব্যক্তিগণের স্মৃতিরক্ষার ইহা অপেক্ষা মহৎ উপায় আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভাণ্ডার ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাদত্ত দানের দ্বারা মঠ ও মন্দির তৈরি করা অপেক্ষা জনহিততর কার্য্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠ-মন্দির চলি-

ভেবে, এবেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার আশ্রয় স্থান আপনি রচনা করিবে না ?"

যদি প্রস্তাবিত 'রুর‍্যাল ব্যাঙ্কে'র পল্লী উন্নয়ন ফণ্ডে আমাদের সমাজ ঐরূপ স্বেচ্ছাদত্ত দানের টাকা জমা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বাংলা ও বাঙালী যথার্থই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিবেন।

ভুল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

শাশুড়ী অন্নপূর্ণা সকালবেলা গেছিলেন পাশের বাড়ীতে তাঁর কুলীদিদির সঙ্গে কোথায় ভাল তেল পাওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে কথা বলতে, তখন পুত্রবধূ সুষমা রান্নাঘরেই ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন অপ্রসন্নচিত্তে ফিরে এলেন তখন দেখেন রান্নাঘরে কেউ নেই, একেবারে খোলা, শুধু একধারে ভাতের হাঁড়িটি সোঁ-সোঁ করছে। দেখে ত মনটা গেল আরও বিগড়ে। কথা আরম্ভ হয়েছিল তেল নিয়ে এবং জিনিষটি পিচ্ছিল বলেই হোক বা যে কারণেই হোক সেটার মাধ্যমে বাজারের সমস্ত জিনিষের ভালমন্দ আলোচনা হয়ে গেছে; এবং আজকে আর কাউকে বলে দিতে হবে না যে জিনিষের ভালমন্দ ছুটো দিক আর নাই, এখন সব মন্দসর্ব্বস্ব। বাজারের জিনিষ ত আছেই—তার উপর ঘরের এই মানুষগুলিও···

—বলি ও বৌ, কানের মাথা খেয়ে বসে আছ নাকি!

এটা অবশ্য অন্নপূর্ণার চালাকি। প্রথম বারের ডাকেই কেউ আর কথা বলে না। কিন্তু উপায় কৈ, যা দরাজ গলা তাঁর তাতে বাড়ীর লোক দূরের কথা সমস্ত পাড়ার লোক শুনতে পাবে অথচ মাথা খাওয়ার মত মুখরোচক শব্দটাও প্রয়োগ করতে হয়!

সুষমা ঘরের ভেতরে এক কোণে তার ছোট্ট ক্যাশবাক্সটার সামনে বসে একটা ছোট্ট কাপড়ে লতাপাতাওয়ালা কয়েকটি ফুল তুলছিল। শাশুড়ীর হুঙ্কারে তার ত্রস্তচকিত হাত হতে ফ্রেমটা পড়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি 'যাই মা' বলে জিনিষগুলোকে কোনরকমে সামলে রেখে একরকম দৌড়ে বাইরে এসে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াল। বয়স তার ষোল-সতেরো হবে, বয়সের তুলনায় চোখমুখের চেহারা আরও কচি-কচি মনে হয় এবং চলাফেরা ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় বহুদিন থেকে সে ভালরকম অভ্যস্ত।

শাশুড়ী তেলের ভালমন্দ পরীক্ষা করার মত মুখভঙ্গী করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনভ্যস্তবেশা বধূর আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করতে করতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?

সুষমা লুটানো আঁচলটা এক হাতে গুছিয়ে তুলতে তুলতে ও অন্য হাতে দাওয়ার একটি খুঁটিকে নাকীবালার ভঙ্গীতে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দেয়—না ত।

অন্নপূর্ণা আরও জ্বলে ওঠেন—না! না! না! খুব কথা শিখেছ যা হোক। বলি এদিকে ত চোখের মাথা খেয়ে ছুটো দরজাই খোলা রেখে বসে আছ, কুকুরে যে সব খেয়ে গেল।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরের মেটে বারান্দায়। এ কথায় সুষমা ভীষণ বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করে কিন্তু অন্নপূর্ণা এমনভাবে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন যে তিনি একটু সরে না দাঁড়ালে যাওয়াও যায় না।

অন্নপূর্ণা সরবার একটুও চেষ্টা না করে বরং সুষমার এই বিপন্ন ভাবটা উপভোগ করতে করতে নির্ব্বিকার চিত্তে বললেন, থাক, এখন আর লোককে ডেকেছেকে কাজ দেখাতে হবে না, খুব হয়েছে। আর না খেলেও, খেতেই বা কতক্ষণ! আর ইস্কুলের ভাত কখন হবে শুনি, ওরা কি আজ না খেয়েই যাবে নাকি ?

সুষমা প্রায় অস্ফুটস্বরে জবাব দেয়—আজ যে রবিবার মা।

অন্নপূর্ণার আর সহ্য হয় না, একেবারে বাগড়ার সুরে বলে ফেলেন—বন্দি যা হোক তর্ক শিখেছিলে বৌমা। তাই হোক, ওই করেই আজ পেট ভরুক।—বলতে বলতে তিনি রান্নাঘরের দোরগোড়া ছেড়ে শোবার ঘরের বারান্দার দিকে উঠে যান।

সুষমা এবার অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেবল ঘন ঘন শাশুড়ীর গতিপথের দিকে তাকায় আর আঁচলটাকে এলোমেলোভাবে নিজের হাতের ওপর জড়ায়। কি মারাত্মক ভুল!

ঠিক তাই হ'ল। শোবার ঘর থেকে যথাসময় ডাক আসে—বৌমা এদিকে এস। স্বরটি এবার কঠিন কিন্তু শান্ত, মনে হয় বক্তা এবার বলবার মত সঠিক কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন।

সুষমা গিয়ে ঘরে দাঁড়ায়, দেখে শাশুড়ীর হাতে সেই

ফ্রেমটি। তিনি বার বার করে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন, মুখখানা মোটেই প্রসন্ন নয়। সুষমার পদশব্দে মুখ তুলে তিনি তার পানে কিছুক্ষণ অদ্ভুত ভঙ্গীতে চেয়ে রইলেন, তার পরে হঠাৎ একটা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার মত করে বললেন—আচ্ছা বৌমা, বাড়ীখানা কার বলতে পার?

এর একমাত্র উত্তর হয়, আপনার—সুতরাং সুষমা কিছুই বলে না।

—বাড়ী আমার একার নয়, তোমাদের সকলের, কিন্তু বলতে পার আমি একাই বা কেন তোমাদের পেছনে ভূতের মত খেটে মরি আর এদিকে তোমরাই বা কেন নবাবের মত ফুল লতা পাতা দিয়ে সময় কাটাবে। কেন? জবাব দাও, চুপ করে থেক না।

কিন্তু চুপ করে থাকাটাই ত এর একমাত্র উত্তর, সুতরাং সুষমা নতমুখে চুপ করে থাকে। শুধু এক বার এক মুহূর্তের জন্ত সে অত্যন্ত আড়চোখে দেখে নেয় শাশুড়ীর হাতে তার অমন সাধের সেলাইটির কি দশা হ'ল।

ওই চোরা চাউনিটুকুই যথেষ্ট। অন্নপূর্ণা ফ্রেমশুদ্ধ সেলাইটিকে এক হাতে কঠিন পুলিসী ভঙ্গিতে ধরে বললেন—কথা ত এদিকে বার হয় না, কিন্তু কাজের বেলায় হাজার রকমের অকাজ করতে শিখেছ। কেন, এইটে দিয়ে কার কতটুকু উপকার হবে শুনি? আর গেরস্তর বাড়ী, এ কি এই রকম বিবিপনা করার জায়গা নাকি। না ছোট খুকিটির মত খেলবারই সময় আছে? তুমি না ঘরের বৌ, গেরস্ত বাড়ীর ভালমন্দ কিসে হয় সেটুকু বোঝ না?

প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে ফ্রেমটি অন্নপূর্ণার হাতে এক ধাপ করে বেশী নিপীড়িত হচ্ছিল, ওদিকে সুষমার অবস্থাও তেমনি। তার কাণ দিয়ে শাশুড়ীর কথাগুলি বিশেষ যাচ্ছিল না, সে শুধু সেলাইটির অবস্থা নিয়ে বিব্রত ছিল। শেষের প্রশ্নে যখন সেটির ওপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ল তখন সে আর পারল না, এক রকম আঁতকে উঠে শাশুড়ীর দিকে দু' পা এগিয়ে এসে বলে ফেলল—ওটা…ওটা…

হাঁ ওটা তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু! যাও আর সং হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, রান্না দেখ গিয়ে। আর মনে রাখবে এ সব খেলার সময় তোমার আর নেই। যাও। বলতে বলতে অন্নপূর্ণা নিজেই সেলাই সমেত দ্রুতপদে নিজের পূজার ছোট ঘরটিতে চলে গেলেন। সুষমা কিছুক্ষণ পাথর হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, সেলাইটি যে চিরদিনের মত তার হাত ছাড়া হয়ে গেল সে বুঝতে পারল, কিন্তু তার অবশ মন শুধু দুটো কথাই বার বার অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল—ওটা… ওটা…ওটা…

যার কোন মাথামুণ্ডু সত্যিই নাই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এর বেশী বলাই বা যায় কেমন করে। বৌ হয়ে শাশুড়ীকে ত আর বলা যায় না যে ওটা আমার স্বামীর জন্ত রুমাল করছিলাম, বিশেষ করে যখন মোটে এক বছর বিয়ে হয়েছে। সে-ও গেরস্ত বাড়ীর মেয়ে অর্থাৎ যে সব বাড়ীতে এ রকম সৌখীন সেলাইয়ের বিশেষ চর্চা নাই, সেখানে সেলাই হয় কাঁথা থেকে আরম্ভ করে খুব জোর আসন পর্য্যন্ত, শাশুড়ীর ভাষায় যাতে কারও কোন উপকার হয় সেই রকম। কিন্তু সুষমা বেশ ছোট বয়সেই এই সেলাইটা কোন সূত্রে কার কাছে শিখে ফেলেছিল, কিন্তু সে এমন লাজুক যে বিয়ের পরে পুরো একটি বছর লেগেছিল তার স্বামী শক্তিময়ের এটা আবিষ্কার করতে। তার পরেই তার এই অনুরোধ বা আবদার যাই বল। সুষমা শাশুড়ীর ভাবগতিক প্রথম হতেই চিনেছে। কারণ গরীব ঘরের মেয়ে সে এবং বকুনি খেয়েই মানুষ। তাই সেলাইয়ের সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সে অত্যন্ত সন্তর্পণে বার করেছিল এবং একটু একটু করে এই এক সপ্তাহে সে এতটুকু তুলেছে। আর মোটে দু'দিন, আসছে শনিবার শক্তিময় বাড়ী আসবে…তখন…?

সুষমা ইতিমধ্যে এসে চুপ করে উনুনগোড়ায় বসে পড়েছিল, কিন্তু রান্নার কোন জিনিষ তার চোখেই পড়ছিল না। হঠাৎ ফেনশুদ্ধ ভাত উথলে পড়ার শব্দে সে সচকিত হয়ে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি ঘটি হতে হাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দিয়ে আবার চুপ করে বসে পড়ে। ওঘরে শাশুড়ীর হাঁড়িকুঁড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় কোথায় কতটুকু কি ভাবে আছে দেখছেন।

শক্তিময় কাজ করে কলিকাতায়। সাধারণ গরীব গেরস্ত ঘরের ছেলে—কি প্রকার বিদ্যা ও চাকুরি সংগ্রহ করতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতা হতে এ গ্রামটা মাইল চল্লিশেরও ওপর, সুতরাং ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা সম্ভব হলেও শক্তিময় পারে না, তার শরীর খুব ভাল নয়। সম্প্রতি তার একজন পরিচিত লোক কলিকাতায় একটি বিড়ির দোকান করেছে, সেইখানেই সে থাকার একটু জায়গা পেয়েছে। দিনে আপিসে কাজকর্ম আর রাত্রে দোকানের হিসেবপত্র দেখা—এই রকম করে কোন রকমে চলে যায়। বাড়ীতে তার মা, বৌ ও ছোট দুটি ভাই, স্কুলে পড়ে। বাড়ীতে তাকে কিছু কিছু পাঠাতেই হয়, অন্তত: ভাই দুটোর স্কুলের মাইনে আর মাঝে মাঝে বই টই এটা সেটা কেনার জন্ত কিছু। এই হ'ল সুষমার স্বামী আর এই ঘরের সে বড় বৌ সুতরাং তাদের ঘরের কাজই হ'ল আলাদা এবং সেটি একমাত্র খাদ্যের সংস্থান করা। কোথায় কতটুকু কি ভাবে আছে সেটি দেখে চেকে গুছিয়ে তোলা।

তবু ত মাঝে মাঝে এই অকাজের নেশা সমস্ত প্রয়োজন-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে জেগে ওঠে, নইলে শক্তিময় বলবে কেন—

বৌ, তা হলে কথা রইল ওই রকম একটা ফুল তুলে রাখবে। দেখ তখন মজা, কেমন আমি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব, এ রকম বৌ কার আছে দেখব তখন, হ্যাঁ।

সুষমার সারা অন্তর ভরে উঠেছিল কিন্তু সেও হাসে নি। কথা হচ্ছিল গত রবিবার শেষ রাত্রির দিকে বিছানায় শুয়ে। এখুনি শক্তিময় উঠে ষ্টেশনের পথে রওনা হবে। সুষমা অনেকখানি সঙ্কোচ জোর করে কাটিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল— তুমি আমাকে বৌ বলবে না বল।

শক্তিময় গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, হঠাৎ এ কথায় একটু বিস্মিত হয়ে কিন্তু তখুনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সুষমাকে একেবারে বুকের মাঝে টেনে এনে একটা মজার জিনিষ পেয়েছে সেই ভাবে হাসতে হাসতে বললে—বাঃ রে তা হলে তুমি কার বৌ শুনি ?

না…না…তা…ওরা…সুষমা অন্ধকারের মধ্যেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সে হয় ত বলতে চায় তার অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে এই নাম ডাকটা শুনেছে এবং সেটা কত ভাল লাগে।

শক্তিময় তাকে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে—না, না, না, এ ছাড়া কি আর কথা শেখনি বৌ …খুড়ি…সুষমা, সুষি আমার সুষি। হ'ল ?

সুষমার জীবনে এই যেন প্রথম নামকরণ হ'ল, সে লজ্জায় পালাবার পথ পায় না, স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলে—ছাড়। যাবে, তোমার জিনিষগুলো বেঁধে দিতে হবে না ?

শক্তিময় বাহুবন্ধন একটুও আলগা না করে ছেলেমানুষি ঢঙে মাথা নেড়ে বলে—কি হবে! আমার জিনিষ বাঁধাই আছে।…

এ শনিবার সে বাড়ী আসে নি কিন্তু লিখেছে আসছে শনিবার আসবেই। তখন ? তখন সে তাকে কি দিবে ?

ভাতের সময় হয়ে এল, সুষমা হাঁড়িটা নামাবার উদ্যোগ করতে থাকে। ভিজে ন্যাকড়া সমেত হাত' দুটো তার যন্ত্র-চালিতের মত হাঁড়ির ধারে বসে যায়। কিন্তু হাঁড়ি তার চোখে পড়ে না, ও যেন ফ্রেমশুদ্ধ সেলাইয়ের কাপড়টা! সুষমা অত্যন্ত অভ্যমনস্কভাবে হাঁড়িটা যথাস্থানে নামিয়ে মাড় গালতে বসে যায়।

ভুল করেছে তার স্বামী। এরকম বৌ ঘরে ঘরেই আছে, এ নিয়ে গর্ব্ব করার কিছু নাই, শুধু আছে দুর্ব্বলতার লজ্জা। সুষমা জোর করে হাঁড়িটাকে একরকম শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

তার পর দুপুরবেলা। খাওয়াদাওয়ার পাট অনেকক্ষণ চুকে গেছে। অন্নপূর্ণা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় মাদুর পেতে কাঁথা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন, সুষমা শোবার ঘরে ক্যাম্বিসের সামনে ঠিক সেই জায়গাটিতে বসে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে যেখানে বাঁশটা এসে পুঁই-মাচার কাছে মিলে গিয়েছে সেই কোণে অত্যন্ত লুকানো-সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে একটি অপরাজিতা লতা তার গুটিকয়েক ফুল নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে বাইরের আলোর মধ্যে মেলে ধরছে, সুষমার দৃষ্টি ঠিক সেইটির উপর নিবদ্ধ। ও লতাটি সে মণ্টুকে দিয়ে যোগাড় করে কত যত্নে লাগিয়েছে, কতদিন তার ভয় হয়েছে শাশুড়ী পুঁইডাঁটা ছিঁড়তে গিয়ে লতাশুদ্ধ টেনে উপড়ে না ফেলেন। আজ সেই লতা পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে জেগে উঠছে, সুষমার বড় প্রিয় ফুল ওটা, কেবল ফুলটা নয়, ওর লতাপাতা সমস্ত সবটা নিয়ে। সে স্বামীকে একবার সলজ্জ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কোন্ ফুল ভাল লাগে ?

সাত দিন আগের সেই রাত্রিশেষ। শক্তিময় একটু ভেবে নিয়ে হেসে বলেছিল—আমি ভাল চিনি না, তোমার যেটা ভাল লাগে সেইটিই। তবে সবচেয়ে ভাল আমার এই লজ্জাবতী লতা…বলতে বলতে নিবিড় আবেগে…

বৌদি! ও বৌদি! কোথা হতে ছুটতে ছুটতে এসে মণ্টু পিছন থেকে তার ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে সুষমার চোখ দুটো চেপে ধরে এবং নিজের চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় বড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—জান বৌদি কি এনেছি ? বল দেখি, তবে বুঝি!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো ভিজে মনে হওয়ায় সে চমকে ওঠে এবং বৌদির মুখটা যতটা সম্ভব নিজের দিকে ঘুরিয়ে এনে হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বলে—কাঁদ কেন বৌদি ? কি হয়েছে তোমার ? জ্বর ?

সুষমা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ দুটো মুছে মণ্টুকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—দূর বোকা, জ্বর হবে কেন। বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, চোখে কি একটা পড়ল এখুনি। আচ্ছা কই কি এনেছিস দেখি ? চকোলেট বুঝি ?

মণ্টু বৌদির কাছে প্রায়ই দু'এক পয়সা করে যোগাড় করে কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপরের মত সেটা একা নিজের ভোগে না লাগিয়ে মাঝে মাঝে বৌদিকেও কিছু ভাগ এনে দেয়। সুতরাং এতে নতুন অনুমান করার কিছু নাই।

মণ্টু কিন্তু একটুও দমল না, সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্যাণ্টের পকেটটা চেপে ধরে বলল—হ'ল না। আবার বল।

—তবে বুঝি গাছে ফুল ধরতে লেগেছে ? বলতে বলতে সুষমা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তার কপাল থেকে এলো-মেলো চুলগুলো উপর দিকে গুছিয়ে তুলতে থাকে। হঠাৎ তার কপালের এককোণে দেখে একটা ছোট চির ও একটু রক্তচিহ্ন।

মণ্টু সেটা বুঝতে পেরে বলল—ও কিছু নয়, একটু ফকি লেগেছিল। পারলে না ত, বেশ তবে এই দেখ—বলে সে পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড স্থলপদ্ম বার করল, করে সেটা সুষমার সামনে রেখে হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে বৌদির গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রায় তার কাণে কাণে বলল—ওটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে, এবার আমারটা করবে ত ?

সুষমা ফুলটা দেখেই চমকে উঠেছিল। মণ্টু তার চুরি-করা সেলাইয়ের অত্যন্ত মনোযোগী সাথী, রোজ ইস্কুল যাবার আগে এবং ইস্কুল থেকে এসে তার একবার খোঁজ নেওয়া চাই, কতদূর হ'ল এবং রবিবার দিন এই সময়টা (এইটেই একমাত্র সুষমার চুরির সময়) সে বৌদির কাছে বসে তার কাজ দেখে। পরশু বিকেলেও তাদের মধ্যে চুপি চুপি এই নিয়ে কথা হয়েছিল। সুষমা যে লতাপাতা-ওয়ালা ছোট ছোট ফুল তুলছে সে মণ্টুর মোটেই পছন্দ নয়, সে বলে ফুল এমন হবে যা দূর থেকে দেখা যাবে ও দেখান যাবে। ফুলের মত ফুল, সে কোন্‌টা ? সুষমা অনেক ভেবে উত্তর দিয়েছিল সে রকম বড় ফুল হ'ল স্থলপদ্ম, তবে খুব কম দেখা যায়। তাই বুঝি ! তা হলে এটা কি ?

মণ্টু মহানন্দে বৌদির গলা হতে একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্থলপদ্মটা একেবারে তার মুখের সামনে উঁচিয়ে আনে এবং বিজয়গর্ব্বে বলে—দেখলে ত ? আচ্ছা, তোমার ফ্রেম কই বৌদি, আমারটা এবার আরম্ভ করবে ত ?

শেষের কথাটা বড় লাজুক লাজুক শোনায়। কিন্তু পরক্ষণেই মণ্টু কি একটা ভেবে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং বেশ স্পষ্ট গলায় বলে- আর দেখো তখন আমার মজাটা হ্যাঁ। আমি ত ওদের বলেই রেখেছি, তখন দেখব এমন বৌদি ওদের কার আছে, এমন বড় ফুল ওদের কার কাছে থাকে। জানো, স্বপন বলছিল—

সেই একই কথা ! সুষমা আর সইতে পারে না, মণ্টুকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলে—কিন্তু সেলাই ত আমি জানি না লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

—জানো না ! আদর খেতে খেতে বড় বড় চোখ করে মণ্টু বৌদির দিকে মুখ তোলে।

—না রে।

—বাঃ, ওই যে হচ্ছিল। ওটা কোথায় দেখি—বলতে বলতে মণ্টু এদিক ওদিক তাকায়, তার একটু বিশ্বাসও হয় না।

—ওটা ভুল হচ্ছিল ভাই, ওতে হবে না।

—বাঃ বেশ সুন্দর ফুল উঠছিল ত। মণ্টুর কণ্ঠস্বরে এবার উদ্বেগ প্রকাশ পায়।

শিশুর এই প্রশংসাও আজ সুষমা সইতে পারে না, সারা অন্তর তার কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর নয়। সে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলল—উঠছিল ত। কিন্তু কি রকম করে সব খুলে গেল, বোধ হয় কোথাও আলগা থেকে যাচ্ছে।

এর উত্তরে মণ্টু সহসা আর কিছু বলতে পারে না, একটু চিন্তিত-বিষণ্ণ ভাবে চুপ করে থাকে। সুষমা তার মনের ভাব বোঝে, নিজেকে সামলে নিয়ে ফুলটা এতক্ষণে আদর করে নিজের হাতে তুলে নেয় এবং অন্য হাতে মণ্টুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার সুরে বলে—তার কি হয়েছে। আবার ত মনে আসবে, তখন হবে। কি বল ?

মণ্টু নিজের দিকটা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে, তার মনে পড়ে বৌদির দিকটা, সেও তেমনি সুষমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তাই বুঝি তুমি কাঁদছিলে বৌদি ! দূর, তাতে কান্নার কি আছে ? আমি ত কত ভুলি—বলতে বলতে তার হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে যায়, সে আবার বলে—হ্যাঁ জানো বৌদি, স্বপন কাল বলছিল যে ওদের বাড়ীতে একটা খুব ভাল বিলেতী ফুল এসেছে, আমাকে একটা ভাল দেবে বলেছে।

কিন্তু স্বপন ও কথা মোটেই বলে নি। সে যা বলেছিল তা কেউ জানলো না।

একটা ছড়া

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

২১শে বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। স্বর্গীয় রামানন্দবাবু তখন বড় কাতর, শয্যাশায়ী। ঐ সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবী ও জামাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের কাছে রাজা বসন্ত রায় রোডে থাকিতেন। আমি প্রায়ই তখন তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। ঐ দিনেও গিয়াছিলাম। সেদিন একটু ভাল ছিলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে নিম্নলিখিত ছড়াটা আমাকে লিখিয়া লইতে বলিয়া মন্তব্য করিলেন—তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় রোগশয্যায় নিজের কন্যাকে ইহা শিখাইয়াছিলেন। মনে হয় ইহার মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক কথা আছে। ছড়াটি এই :

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে
তার মাকে ধরে নিয়ে গেল
জামান ফকিরে।

পিসিমা কাঁদে মাসিমা কাঁদে
চালে নাচে ফিঙ্গে।
পুঁটি মাছটি গান করছে
নেউলে বাজায় শিঙ্গে।

রন্তিদেব

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে) রন্তিদেবের কথা ক্ষুদ্র হইলেও অতি উপাদেয়। ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই ইহার মহিমার গান করা হইয়া থাকে ("রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে," ৯,২১,২)। ভাগবতকার কেন এরূপ বলিয়াছেন, পাঠকগণ নিজেই তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমি কেবল কথাটা তুলিয়া দিতেছি।

পুরাকালে পুরুবংশে রন্তিদেব নামে এক অতি দয়ালু ও দাতা রাজা ছিলেন। শিবি ও হরিশ্চন্দ্র হইতে তিনি কম ছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। যাহা পাইতেন তাহাতেই তাঁহার চলিত, তাহাই তিনি দান করিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সপরিবারে কষ্ট পাইতে হইত। তিনি একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি দান করা পরিত্যাগ করেন নি। যাহা পাইতেন, কেহ চাহিলে তাহাই তিনি দান করিতেন, নিজের বলিয়া কিছুই রাখিতেন না, তাহাতে তাঁহার খাওয়া হউক আর নাই হউক।

একদিন তাঁহার আহারের কিছুই নাই। সপরিবারে কষ্ট পাইতেছেন। এইরূপে তাঁহার ৪৮ দিন কাটিয়া গেল। এমন কি পান করিবার উপযুক্ত জলও তাঁহার ছিল না। দৈববশে পরদিন প্রাতে কিছু ভাল খাদ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে তিনি সপরিবারে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর তাঁহার কাঁপিতেছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা সকলেরই মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেন ("হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্")। তিনি অতি শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত ঐ লব্ধ খাদ্য হইতেই সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে রাজা যখন অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে যাইবেন, তখন আর একটি অতিথি উপস্থিত হইল। এ ছিল শূদ্র। রাজা ইহাকেও হরি মনে করিয়া অবশিষ্ট খাদ্য হইতে খাওয়াইলেন। এই অতিথি গেলে আর একটি নিকৃষ্ট জাতীয় অতিথি উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কতকগুলি কুকুর। সে বলিল 'মহারাজ, এই কুকুরগুলি ও আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, অন্নদান করুন।' রাজা বহুমান ও সৎকার করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই দিয়া সেই অতিথিকেও নমস্কার করিলেন।

তখন রাজার নিকটে কেবল একটুমাত্র জল আছে, যা একজনের মাত্র কোনরূপে চলিতে পারে। রাজা তাহাই পান করিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময়ে একটি চণ্ডাল উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি এক অমঙ্গল ব্যক্তি। আমাকে একটু জল দিন।' তাহার ঐ করুণাপূর্ণ কথায় রাজা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া যে কথা বলিলেন ভাগবতকার তাহা অমৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ("ইদমাহামৃতং বচঃ।" সেই কথাটি এই (৯,২১,১২)

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিসিদ্ধি মপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যে ঽখিল দেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

অর্থাৎ—ঈশ্বরের কাছে আমি পরমগতি প্রার্থনা করি না, অণিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি চাই না, আমার পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাহি না, আমি চাই, আমি যেন সমস্ত জীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুঃখকে পাই, যাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে।১

১। এই কথাটাই অন্ত এক জায়গায় আছে, যাহা অনেকে আরো অনেক সহজে মনে রাখিতে পারেন—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্॥"

অর্থাৎ, আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাই না, আমি চাই দুঃখতপ্ত জীবগণের দুঃখের নাশকে।

গান

রচনা—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পুরিয়া—তেতালা)

এসেছি প্রভু তোমার মন্দিরে দরশন দাও হে
শ্যাম-সুন্দর আজি শুনিব বাঁশী প্রাণ ভরে।
তোমার অরূপ রাশি ত্রিভুবনে বিকাশে
গোপেশ যাচে রাতুল চরণে রাখ মোরে॥

0 ১ ২´ ৩
{ হ্মা না ধা হ্মা | গা ঋা ন্া ঋা | গা ঃ ঋা গা | ঋা ঃ সা ঃ | }
{ এ সে ছি প্র ভু তো মা৹ র ম - ০ ন্দি রে - ০ - }

0 ১ ২´ ৩
ন্া ঋা ন্া ধ্া | হ্মা্ ধ্া সা সা | সা ঃ ঃ সা | সন্া ঋা সা সা |
দ র শ ন দা ০ ও হে শ্যা - - ম সু০ ০ ন্দ র

0 ১ ২´ ৩
সা - হ্মা হ্মা হ্মা | গা ঋা গা গা | গহ্মা ধনা ঋ্ঁা না | ধহ্মা ধা হ্মা গা ।।
আ ০ জি শু নি ব বাঁ শী প্রা০ ০০ ০ ণ ভ০ ০ ০ রে

0 ১ ২´ ৩
{ গা গা গা গা | হ্মা ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | না ঋ্ঁা র্সা ঃ |
{ তো মা র অ রূ প রা শি ত্রি ভু ব নে বি কা শে -

0 ১ ২´ ৩
না ঋ্ঁা র্গা ঋ্ঁা | র্সা না ঋ্ঁা র্সা | ধা না ঋ্ঁা না | ধহ্মা ধা হ্মা গা ॥
গো পে শ যা চে রা তু ল চ র ণে রা খ০ ০ মো রে

আলাপী তান :—

0 ১ ২´ ৩
১। ন্া - ঋা - ন্া - গা | ঃ ঃ ঃ ঃ | হ্মাঃ নঃ ধা হ্মা | গা ঋা গা ঃ |
আ ০ ০ ০ - - - - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ -

0 ১ ২´ ৩
২। ঋ্ঁা - না - ধা - হ্মা | ধা হ্মা গা ঃ | গা হ্মা না ধা | হ্মাধা গহ্মা ঋা গা |
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ - ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

বোলতান :—

0 ১ ২´ ৩
৩। গহ্মা ধনা র্সধা নর্সা | ধনা ঋ্ঁর্সা নধা হ্মাগা | হ্মাধা নঋ্ঁা নধা হ্মাগা | হ্মাধা নধা হ্মাগা ঋগা |
এ০ ০০ ০সে ০০ ছি০ ০০ ০০ ০০ প্র০ ০০ ০০ ০০ ভু০ ০০ ০০ ০০

আশতান :—

২´ ৩
৪। নঋা গঋা ধনা র্সর্সা | র্সনা ধঋা গঋা গা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২´ ৩
৫। ঋর্সা নধা র্সনা ধঋা | ধনা ঋধা ঋগা ঋগা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

আশ ও কম্পনযুক্ত তান :—

২´ ৩
৬। ঋর্ঋা র্সনা র্সর্সা নধা | ননা ধঋা গঋা গা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

আশতান :—

0 ১ ২´ ৩
৭। নঋা গঋা গঋা গঋা | ধঋা ধনা ধনা ঋর্না | ধঋা গঋা ধনা ঋর্না | ধঋা গধা ঋগা ঋগা
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

আশ ও কম্পনযুক্ত তান :—

0 ১ ২´ ৩
৮। নঋা গগা ঋগা ঋসা | ঋগা ঋঋা গঋা গঋা | গঋা ধধা ঋধা ঋগা | ঋধা ননা ধনা ধঋা
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

0 ১ ২´ ৩
ধনা র্সর্সা নসা নধা | ঋধা ননা ধঋা গঋা | ধধা ঋগা ঋগা ঋঋা | গঋা নঋা গগা ঋগা
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরার তান :—

0 ১ ২´ ৩
৯। গঋা ধনা র্সা । | । । । । | নর্ঋা র্গা র্ঋা র্সা | নর্ঋা র্সনা ধঋা গা
আ০ ০০ ০ - - - - - ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০

বাট :—

0 ১ ২´ ৩
১০। গঋা ধনা র্সর্সা র্সর্সা | নধা র্সনা ঋা গা | গঋা ধনা র্সনা ধঋা | গঋা ধঋা গা ঋসা ।।।।
এসে ছিপ্র ভুতো মার ম০ ০ন্দি রে ০ দর শন দা০ ওহে শ্যা০ ০ম সু ন্দর

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

সে অনেক কথা, প্রায় ১২ বৎসরের ইতিহাস। অতিশয় দীর্ঘ এবং বিচিত্র ঘটনাবহুল। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন, যে আশঙ্কার কথা "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় "নবসজ্ঞে"র উদ্ধৃত প্রবন্ধ লইয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ পত্ররাজি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হইতেও মুক্তি পাইব।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রকাশ্যভাবে গিয়া উপস্থিত হই। তৎপূর্ব্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর "রয়েল ক্লেমেন্সি" ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই অধিকাংশ রাজবন্দী মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই বারীন্দ্রকুমার, হৃষিকেশ, উল্লাসকর প্রভৃতি মুক্তি পাইয়া আন্দামান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা লাভ করেন। আমাকেও আহ্বান দিয়া তিনি এই সময়ে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

"I have thought to delay your visit for a short time, until I saw my way more clearly on certain important matters, but I now believe that is not necessary and it will be as well for you to come as soon as it may be."

অর্থাৎ, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে আমার পথের স্পষ্টতা না দেখা পর্য্যন্ত তোমায় এখানে আসিতে বিলম্ব করিতে হইবে; কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, আর তাহার প্রয়োজন নাই; তোমার সুবিধামত যত শীঘ্র হয় আসিতে পার।

তাঁহার পত্র পাইয়া আমি তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। এই সময়ে তাঁহার কিছু ভাবান্তর নজরে পড়িল। তিনি যথারীতি দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা কেহই আর সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আমাকেই থাকিতে হয়। তারপর মীরা দেবী আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীঅরবিন্দ ঊর্দ্ধের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন। আমরা উভয়েই নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করি। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিয়া উঠিলে মঁসিয়ে রিশার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। মঁসিয়ে রিশার এই সময়ে তাঁহার রচিত একখানি ফরাসী গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা লইতেন। ইহাই "আর্য্য" পত্রিকায় "Eternal Wisdom" নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইত।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে টাইপ-রাইটার লইয়া দীর্ঘ সময় কার্য্যতৎপর দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শরীর অধিকতর কৃশ হইয়াছিল। মীরা দেবীর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তিনি আমাদের একদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "যে গরুর দুধ শ্রীঅরবিন্দ পান করেন, সেই গাভীটির নিশ্চয়ই ক্ষয়-রোগ হইয়াছে। ঐ গরুর দুগ্ধপান তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে।"

এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব মীরা দেবীই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ইহাতে প্রীতি অনুভব করিলাম। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ইহার পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, শ্রীঅরবিন্দ রুক্ষ-মাথা'য় স্নান সারিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একটা আয়নায় ভাঙ্গা চিরুণীর সাহায্যে কেশ আঁচড়াইয়া লইতেন। তারপর তিনি ভোজন-পাত্রের সম্মুখে বসিতেন। আমি বসিয়া বসিয়া মাছি তাড়াইতাম। শ্রীঅরবিন্দ কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেন। আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিতাম। মীরা দেবীর তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণের পর হইতে তাঁহার প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, অপরাহ্ণ ও নৈশভোজনের সুব্যবস্থা হইল। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা শিবের মত, নিজের সুখের দিকে কোন দৃষ্টিই তাঁহার থাকিত না। মীরা দেবীর যত্নে শ্রীঅরবিন্দের শ্রী ফিরিল।

এই সময়ে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে আমরা মঁসিয়ে রিশারের বাড়ী যাইয়া রাত্রি-ভোজন সমাপ্ত করিতাম। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মীরা দেবীর অন্তর তখন এমনই ভরিয়া উঠিতেছিল যে, মঁসিয়ে রিশার তাহা লক্ষ্য করিয়া অভিভূতের ন্যায় আমাদের কাছে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "আমি ক্রমেই মীরার মন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। মীরার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছেন শ্রীঅরবিন্দ।"

এক দিন অপরাহ্ণে আমরা তিন জনেই ধ্যানমগ্ন। ধ্যান-শেষে মীরা দেবী ও আমি ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়ের কথা প্রসন্ন মুখে শ্রীঅরবিন্দ

শুনিতে লাগিলেন। মীরা দেবী বলিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরলোকের অপার্থিব দৃশ্যের কথা। তাঁহার অসাধারণ দর্শনের কথা আমি বিস্মিত হইয়া শুনিলাম। আমার ধ্যান জাগ্রত শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া। তাঁহার রজতশুভ্র শ্মশ্রু ও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার চিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি মাদাম মীরার অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা শুনিয়া যুগপৎ পুলকে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এইরূপ ধ্যানের শেষে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "মতি! তুমি, আমি"—তারপর হস্ত-প্রসারণ করিয়া মীরা দেবীকে দেখাইয়া বলিলেন, "আর এই নারী আমরা তিন জনে সঙ্ঘ।" তারপর শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশচ্ছলে বলিলেন, "এই তিন জনেই আমরা জগতের পরিবর্ত্তন আনিব।" সেদিন আমি মীরা দেবীকে নূতন চক্ষে দেখিলাম। তিনিও যেন আমায় বড় আপন করিয়া লইলেন। কিন্তু এক দিনের কথায় সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সেদিন আমার এক বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মীরা দেবী শ্রীঅরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, পরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত আপনি কি সম্বন্ধ অনুভব করেন?" আমি হাসিয়াই বলিলাম—"আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ ভগ্নীত্বের। আমরা উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষিত।" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—"না! না! I like to be Mother."

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! আমি কি ভাবে মীরা দেবীকে মাতৃত্বে বরণ করিয়া লইব, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তন্ত্র-সহজিয়ার সাধনার আত্মশক্তি মহামায়ার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্মপত্নী মৃণালিনী দেবীকে আমি স্বাভাবিক গুরুশক্তি স্বরূপেই অধ্যাত্ম-মাতৃত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতা মৃণালিনী পরলোকগমন করিলে, আমাদের তাঁতশালার নাম রাখিয়াছিলাম "মৃণালিনী বস্ত্র বয়ন কার্য্যালয়।" মীরা দেবীর মাতৃত্বের দাবী আমার অস্বস্তিকর মনে হইল। এই দিন হইতেই মীরা দেবীর সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি হইতেছিল, বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার উপর আঘাত পড়িতে সুরু করিল। বিশেষতঃ এক রাত্রির ঘটনা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে আর যেন নিরাময় হওয়ার কোনই আশা রহিল না।

এত দিন আমাদের রাত্রির অধিবেশন-চক্র দ্বিতলের বারান্দায় হইত। অকস্মাৎ তাহা নিম্নতলে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, আমার চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। আপন অন্তরের অনুভূতি দিয়া স্থির করিয়া লইলাম—শ্রীঅরবিন্দের আরোহণ-যুগ শেষ হওয়ায় অতঃপর তাঁহার অবতরণের পালাই সুরু হইয়াছে এবং তাহারই লক্ষণস্বরূপ তিনি নিম্নতলে চক্রানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। তথায় গিয়া উপবেশন করিতেই, শ্রীঅরবিন্দের মুখে নানা অশরীরী আত্মার বাণী প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকজন অপরিচিত আত্মার কথা আমরা নীরবে শুনিবার পর, শুনিলাম—রাজা রামমোহন রায়ের আত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁর মুখে অনেক অধ্যাত্মযোগের কথা আমরা শ্রবণ করিলাম। সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। ইহার পর আসিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীঅরবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন আত্মচেতনায়। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পরে তিনি বলিলেন, "আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর নূতন সমাজ, নূতন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কর্ম্ম হইবে উপর হইতে।" তারপর তিনি মাথার উপর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ হাত উঠাইয়া বলিলেন, "এই বিজ্ঞানভূমি হইতেই সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে।" পরিশেষে আমার দিকে চাহিয়া করুণার্দ্র চক্ষে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সে আমার কথা বুঝিবে; কিন্তু he puts a wall between him & me." অর্থাৎ, সে আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীর রাখিয়া দিতেছে।" আমার মনে হইল, এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেও, ইহা যেন মীরা দেবীরই অনুভূতির প্রতিধ্বনি। কারণ শ্রীঅরবিন্দ যে সঙ্ঘের এষণা পাইয়াছিলেন, সেখানে মাদাম মীরা ও আমার মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের কথা ছিল। আমি তাঁহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই কি শ্রীঅরবিন্দের মুখে এইরূপ পরুষ বাক্য উচ্চারিত হইল। আমি সেই পত্রে কিরূপ অভিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা "জীবনসঙ্গিনী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই সে কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর এই প্রসঙ্গ লইয়া অবশ্য কোনই আলোচনা করেন নাই। ইহার পরেও মাদাম মীরার সহিতও আমার হৃদয়সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। সেবার বিদায়কালে শ্রীঅরবিন্দ যেমন আমায় বুকে ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি মীরা দেবীরও হস্ত ধরিয়া ভগ্নীত্বের স্নেহ-রসায়নে নিজেকে অভিষিক্ত করিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়াছি। মঁসিয়ে রিশার আমাদের এই বিদায়কালীন দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে-চোখে এই আভাসই যেন দেখা দিয়াছিল।

মঁশিয়ে রিশার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই চন্দননগরে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত

হন। তখন তাঁর মুখেই মাদাম মীরার সহিত তাঁর চির-বিচ্ছেদ হইয়াছে, শুনিলাম। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—মাদাম মীরা এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের নিকটই বাস করেন।

মঁসিয়ে রিশারের মর্ম্মপীড়া দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। আমার গৃহদেবীও অতি সতর্কতার সহিত মঁসিয়ে রিশারের চিত্তক্লেশ-নিবারণের প্রয়াস করিলেন। মাদাম মীরা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কি ভাবে অন্তরলোকে এক দিব্যপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি সেই কিশোর বয়সেই স্বতঃই "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন এবং পরে ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামীর সহিত কি ভাবে পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার হয় ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট "কৃষ্ণ" বলিয়াই চিনিতে পারেন এই সকল কথা বিশদভাবে লিখিয়া পণ্ডিচারী হইতে আসিবার সময়ে আমার হাতে একটি নিবন্ধ দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে মীরা দেবীর ছবির সহিত "প্রবর্ত্তকে" তাহা প্রকাশ করি। ঐ ছবি ও লেখা আমার গৃহে মঁসিয়ে রিশার হঠাৎ দেখিতে পাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। আমার মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সেই যে বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না। শুনিয়াছি তিনি চন্দননগর হইতে শান্তিনিকেতন হইয়া সবরমতীতে কিছুদিন ছিলেন, তারপর প্যারিস যাত্রা করেন।

পণ্ডিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ পত্রে তাঁহার আদর্শের মর্ম্মবাণী লিখিয়া আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখিলেন:

"Our first object shall be to declare this ideal, insist on the spiritual change as the first necessary and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle"

অর্থাৎ, আমাদের প্রথম কর্ম্ম হইবে এই আদর্শের ঘোষণা করা, অধ্যাত্ম পরিবর্ত্তনের উপরে জোর দিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। এবং যাহারা অকপটে ইহা স্বীকার করিবে ও ইহা সিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইবে, তাহাদের একত্র করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ম্ম—এই নীতির উপর শুধু ব্যক্তিজীবন গড়িয়া তোলা নয়, পরন্তু একটা সঙ্ঘজীবনও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

চন্দননগর হইতে আমাদের প্রকাশিত *Standard-bearer* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে আদর্শের কথা চমৎকার যুক্তি ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ ভাষায় ঘোষণা করিলেন তাহাতেও এই আশার বাণীই ফুটিয়া উঠিল। ইহারই শেষাংশে ছিল:

"It is with confident trust in the spirit that inspires us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born amidst the chaos of a world in dissolution and of the future India, the greater India of the re-birth that is to rejuvenate the mighty outworn body of the ancient Mother."

অর্থাৎ, যে ভাবশক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাহারই উপর সুদৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া, আমরা সেই নূতন মানব জাতির পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলীয়মান জগতের প্রলয়-বেদনায় নবজন্মেরই তপস্যা করিতেছে। আর সেই ভবিষ্যভারত, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদের এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীর্ণদেহ নবমূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহারও প্রবর্ত্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।

এই সঙ্ঘ-সৃষ্টির প্রেরণাটিকেই চন্দননগরে রূপায়িত করিতে গেলে, তিনি উৎসাহ দিয়াই আমায় আবার লিখিলেন:

"The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and you at the centre and it has assumed a body and temperament, which is the result of this organisation."

অর্থাৎ, চন্দননগরে আমার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ও তোমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে—এইরূপ সংগঠনের ফলে উহার একটি আকৃতি ও প্রকৃতিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও দেশের অন্যান্য কর্ম্ম-ধারার সহিত তাহার পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন:

"Our whole principle is different and you have to insist on our principle in all that you say or do. Moreover, you have got a clear form for your work in association and that form as well as the spirit you must maintain, any loosening of it or compromise would mean confusion and an impairing of the force that is working in your Samgha."

অর্থাৎ, আমাদের মূল তত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক। তুমি যাহা বলিবে ও করিবে, তাহা এই মূল তত্ত্বের উপর জোর দিয়াই তোমাকে করিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার জন্য সঙ্ঘরূপ যে স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, সেই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়াই তোমায় চলিতে হইবে। ইহা কোনরূপে যদি শিথিল হয় অথবা কিছুর সহিত যদি আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে ও যে শক্তি তোমার সঙ্ঘে লীলায়িত হইতেছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে।

পত্র শেষে এই দুই ছত্র আমায় পুনরায় উন্মাদের ন্যায় পণ্ডিচারীর পথে ছুটাইল:

"Meanwhile your visit may help to get things into preparatory line both in the motor-power and in the outward determination."

অর্থাৎ, ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের বিদ্যুৎ-যন্ত্র ও বহির্মুখী সত্তর নিরূপণের সকল ব্যাপারকে পরিণতির দিকে আনিতেই সহায়তা করিতে পারে।

এবার তাঁর পত্রে আমার সস্ত্রীক পণ্ডিচারী গমনের অনুমোদন ও দীর্ঘ দিন তথায় থাকার নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁর কথার অনুসরণ করিলাম ও ১৯২১ সনের জুন মাসে উভয়ে পণ্ডিচারীতে গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে গেলে আমার সঙ্গে আমার পত্নীও তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতা হইলেন। প্রণাম করিতে তিনি একপ্রকার ধ্যানস্থা হইয়াই পড়িলেন ও তদবস্থায় শ্রীঅরবিন্দও দীর্ঘক্ষণ মুদিত নয়নে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের চরণধূলি লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, আমার হাতে এক তাড়া নোট দিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য যে নূতন বাড়ী লওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ীতে গিয়া আমাদের উঠিতে বলিলেন।

মীরা দেবীর সন্ধান লইতে গিয়া অবগত হইলাম যে, তিনি উপরেই আছেন—যে ঘরখানিতে গত দুই বার পণ্ডিচারীতে আসিয়া আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, সেখানেই তিনি এখন থাকেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব্ববেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিধানে লালপেড়ে শাড়ী, চরণ-যুগল অলক্তরঞ্জিত—ভারতীয় মাতৃমূর্ত্তির ন্যায়। আমি তাঁহাকে প্রণাম জানাইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—আমার পত্নী মীরা দেবীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে প্রণাম করিতে বলিলাম। তিনি তবুও স্থির দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রণাম করিলেন না।

আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। মাদাম মীরা দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আমি নূতন বাসা-বাটীতে উপস্থিত হইয়াই আমার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি মীরা দেবীকে প্রণাম করিলে না কেন?" বারবার প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোনই উত্তর পাইলাম না। আমি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম বর্ষীয়া বালিকা বধূকে ঘরে আনিয়াছিলাম, কথায় কথায় আমার শাসন অধিকমাত্রায় হইত। আমি ক্রোধ ভরে আবার বলিলাম, "মাদাম মীরাকে প্রণাম না করিয়া অতিশয় গর্হিত কর্ম করিয়াছ!"

তিনি উন্নত শিরে বলিলেন, "তোমার মাথা শ্রীঅরবিন্দের চরণে নত হইলে, আমিও চেতনাহারার ন্যায় তাঁহার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু এখানে তোমার প্রণতি আমার ভাল লাগে নাই।" আমি পরুষকণ্ঠে "কেন? কেন?" বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলাম। তিনি মাথার সিন্দুর দেখাইয়া বলিলেন, "আমি মঁসিয়ে রিশারের দুঃখ দেখিয়াছি। যে নারী পতিত্যাগিনী, তাহার স্বামী সৌভাগ্যহীন হয়। তাহার চরণে মাথা নত করিয়া এই পবিত্র সিন্দুর আমি ম্লান করিতে পারিব না।"

তখনই বুঝিলাম—আমার পণ্ডিচারী আসা ব্যর্থ হইবে। মীরা দেবীকে মা বলিতে হইলে. গৃহদেবীকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু কেমন মনে হইল—তিনি আমার অপরিত্যজ্যা।

প্রতিদিন প্রভাতে সস্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া বসি। তাঁর মুখে অনর্গল উপদেশবাণী শ্রবণ করি। আমার পত্নী ধরিয়া বসিলেন, আমাদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন নিমন্ত্রণে খাইতে হইবে। তিনি নিজেই বলিলেন,"চন্দননগরে অবস্থানকালে অতি সন্তর্পণে আপনার আহারের ব্যবস্থা করেছি। আজ আপনাকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাবার ইচ্ছা হয়েছে।"

শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হবে, হবে, তোমার ইচ্ছা সফল হবে।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "কবে হবে?"

শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, "কালই।"

পরদিন আসিল। পর-পর কয়েকদিন চলিয়া গেলেও শ্রীঅরবিন্দের খাওয়া ঘটিল না। আমার পত্নী নিরতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। ষোড়শোপচারে শ্রীঅরবিন্দের পূজা দিবার প্রেরণা তাঁহার ব্যর্থ হইল। তিনি তবুও আশা ছাড়িলেন না। কথায়-কথায় একদিন তিনি আবার শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন, "আপনি অন্যত্র গিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষায় অসমর্থ, কিন্তু আমি যদি কিছু খাবার পাঠাই, আপনি খাইবেন ত?"

শ্রীঅরবিন্দ সহাস্যে বলিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিমন্ত্রণ-রক্ষার আমার অনেক বাধা আছে, খাবার পাঠাইও, খাইব।"

অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে আমার স্ত্রী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কি জন্য তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি খাইতে দেওয়া হয় নাই, ইহাও যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রু-সাগর উথলিয়া উঠিল। তাঁহার ব্যথায় ভার বহিয়া পণ্ডিচারীতে বাস করিতে আমিও যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। নানা উৎপাতে আমারও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু

শ্রীঅরবিন্দের প্রেমে ও স্নেহে অভিভূত হইয়া আমি তবুও দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

ঠিক এই সময়ে চন্দননগর হইতে তার পাইলাম—"Won't Kakima come, strong Sangha need." মধ্যের কথাটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝিলাম, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন চায়। আমার পত্নীও বলিলেন, "আমি তোমার বাধা হইয়া এখানে থাকিতে চাহি না। আমায় পাঠাইয়া দাও, যোগ-সিদ্ধ হইলে তুমি চন্দননগরে ফিরিও।"

শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলাম, তিনি আমার পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তিটির যোগের সিদ্ধি তুমি ভিন্ন অন্যে আনিবে না, তোমার যাওয়া বন্ধ থাকিবে।"

ইহার উপর আর কথা নাই। নানা নির্যাতন সহিয়া আমাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তারপর ঐ আগষ্টে শ্রীমান অরুণচন্দ্র আবার তারে জানাইল, "সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র আপনি আসুন।" টেলিগ্রামের শেষ কথা—"Our victory is here."—আমাদের সাফল্য এইখানেই।

শ্রীঅরবিন্দকে এই তার দেখাইলাম। তিনি কোন দিন কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেন না; কিন্তু এই টেলিগ্রামের উত্তর দিতে তিনি নিজেই আদেশ করিলেন, "Write a big 'No' there."—এখানে লিখে দাও একটা প্রকাণ্ড 'না'।

তার পরদিন আবার অরুণ তার করিল—"ফিরিয়া আসুন, অন্যথা eternal separation অর্থাৎ চিরবিচ্ছেদ। এই "separation" শব্দের অর্থ যদি সঙ্ঘ হইতে বিদায় মনে হইত, আমি ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। এমন ঘটনা আমার জীবনে বহু ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি এই শব্দের অর্থ মৃত্যুই বুঝিলাম। আমি তিন দিন একাগ্রচিত্তে ভাবিলাম। তারপর কে যেন আমায় জোর করিয়াই লিখাইয়া লইল—"অরো! আমি চলিলাম, আজ হইতে আপনার সঙ্গে হইল আমার eternal separation।

নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করিয়াই পণ্ডিচারীর সহিত আমার বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। আমার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য। আমি এসে অবধি দেখছি, অরবিন্দ তোমার আপনজন, কিন্তু তোমার সাধনার স্থান এ নয়।"

আমি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় ১০ই আগষ্ট তারিখের প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত স্বরে "আর প্রয়োজন নাই," এই কথা বলিয়াই নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমার পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী অপসৃত হইতে চাহিল। আমি টলিতে টলিতে বাসায় ফিরিলাম। তাঁহার বাণী আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল—"আর প্রয়োজন নাই।" কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা কি সত্যই ছিন্ন হইল? সারাদিন চিন্তা করিলাম। আমার মনে হইল শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধ মর্ত্ত্যবাসীর চক্ষে হয়তো চির-বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্তরতম অন্তর-যোগ কোন দিন ছিন্ন হইবে না। সে সাধ্য আমারও নাই; শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। আমি এই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আবার শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, "চলুন, আপনার ঘরে চলুন।"

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "না, না।"

আমি তবুও জিদ ধরিয়া বলিলাম, "আসুন, আপনার ঘরে।" এতক্ষণ তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রু যেন অন্তরের ক্ষোভে ও অভিমানে কম্পিত হইতেছিল। অকস্মাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন তিনি প্রসন্ন হইলেন—শিবের ন্যায় শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

তিনি শয্যাগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাঁর চরণে প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভবিতব্য রুদ্র-বীণায় বুঝি সুর বাঁধিয়াছিল।

আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম—বিদায়, আজ আমি চির-বিদায় লইতেছি।

চারি চক্ষে অশ্রুত নির্ঝর ঝরিল। আমিও কাঁদিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। তিনি আমায় আবার বুকে তুলিয়া বলিলেন—"একনিষ্ঠ হও। তোমার মধ্যে সত্য ও আলো আবির্ভূত হোক।"

শ্রীঅরবিন্দের মুখের এই শেষ আশীর্ব্বাণী মাথায় বহিয়াই সেদিন পণ্ডিচারী হইতে ফিরিয়াছি। আজও সেই স্মৃতি বুকে রাখিয়াই কঠোর কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া চলিয়াছি। তারপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগের কথা বুকে বজ্রের মতই বিদ্ধ হইয়াছে। আমার কাহিনীর শেষ এইখানেই করিতে হইবে।

একণে "প্রবাসী" সম্পাদকের প্রশ্নোত্তরে আমার কি বলিবার আছে সেইটুকুই অতি সংক্ষেপে বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিব।

ভারতের অধ্যাত্মেতিহাসে সাধনায় নারীবিগ্রহের দৃষ্টান্ত আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় উৎসর্গের দেবীমূর্ত্তি প্রত্যেক নরনারীর শ্রদ্ধা পাইয়াছেন—মাতৃরূপে অধ্যাত্ম

সংঘ্য ও প্রতিষ্ঠানের পূজ্যা ও অধিনেত্রীরূপে কেহ কেহ বরণীয়াও হইয়াছেন। অধ্যাত্মানুভূতির আগুনে কি নর, কি নারী, কাহারও পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি-সংস্কার থাকে না, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া তাহাকে নবজীবনের আস্বাদ দান করে। এই দিব্যজীবনেরই কষ্টিপাথরে সাধনার আশ্রয় নিরূপণ না করিলে, দিগ্‌ভ্রান্ত জাতির জীবন সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিধাতার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু এইখানে আর একটি জিনিসও বুঝিবার আছে। নরনারীর সম্বন্ধে যে অমৃতধারা, তাহা ভারতের সাধনায় কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতের গুরু চৈতন্য যেখানে অধ্যাত্ম লক্ষ্যের সন্ধানে সর্ব্বহারা হইয়াই ছুটিয়াছে, সেখানেও পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত সমাজের নিত্য বিধানকে অতিক্রম করিলেও দূরে রাখিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করে নাই। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণপ্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিস্বরূপ মহাধর্ম্মগুরুগণ প্রবল ধর্ম্মাকর্ষণে বা বিশেষ প্রয়োজনে ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রাকৃত সঙ্গ ত্যাগ করিলেও, কোথাও অধ্যাত্ম সম্বন্ধ বর্জ্জন করেন নাই। তাই গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদামাণকে ভারতের সাধননিষ্ঠ নর-নারী বা তত্তৎ সাধনগোষ্ঠীকুল কেহই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—সাধনার জন্যই গুরুশক্তিরূপে তাঁহাদের আজ পর্য্যন্ত পূজার যোগ্য অর্ঘ্য দিয়াই আসিতেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম স্বভাবতঃই আমাদের অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টি করে—আর প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারতের অন্তর্দৃষ্টিবান্ সাধন-প্রাণ হইতে আশঙ্কা-সংশয়ের ছায়াও মুছিবার নয়। ভগ্নী নিবেদিতার ন্যায় একনিষ্ঠা মহানারীও মনে-প্রাণে অন্তরাত্মায় ভারতের তত্ত্বে দীক্ষিতা, অবগাহিতা ও উৎসর্গীকৃতা হইয়াও, ভারতীয় দেহ বা রক্তধারার অভাব কি মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন—ভারতের এই দ্বিধার মর্ম্ম কি। শ্রীমতী মীরা দেবীর উৎসর্গ ও যোগ্যতার কথা আমি কোনদিন অস্বীকার করি নাই—তাঁর অলৌকিক প্রতিভা ও সাধনার মহিমা ষোল আনা স্বীকার করিয়াও আমি উদাত্ত কণ্ঠে এই কথাই বলিয়া যাইব—শ্রীঅরবিন্দের গুরুমহিমা যে ভারত স্বীকার করিবে, সেই ভারত মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তাঁহার পুণ্যাস্থি ও ভস্মকণা ভারতের সপ্তসরিদ্বরার জলে বিসর্জ্জন দিয়া, সপ্তসাগরকে তীর্থে পরিণত করিয়া যে গৌরব অনুভব করিবে অথবা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত যোগিদেহ পদ্মাসনে বসাইয়া মন্ত্রোচ্চারণে স্থলে বা জলে সমাহিত করার যে সনাতন ভারতীয় বিধান, তাহারই অনুবর্ত্তনে যে সুখ ও সান্ত্বনা পাইব, তাহা মীরা দেবীর নির্দ্দেশমত শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাযোগীর দেহ কফিন-শয়নে কবরস্থ করিলে ভারত কখনও অনুভব করিবে না—করিতে পারে না।

আমি এইজন্যই আর্ত্তকণ্ঠে আরও বলিব—শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার ঋষিরূপে, ভারত-প্রতিভার সিদ্ধ বাণীমূর্ত্তিরূপে চিরদিনই আমাদের ও প্রত্যেক ভারতবাসীর পূজ্য ও অনুসরণীয় রহিবেন—শ্রীঅরবিন্দের ঈশ্বরত্ব ও নিরঞ্জনত্ব তাঁর অতীন্দ্রিয় ও অতিমানস যে "বিন্দু-নাদ-কলাতীতং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং" অপ্রাকৃত গুরুকায় ও গুরুস্বরূপ, তাহাও আমাদের নিত্য স্বীকার্য্য ও নিত্যারাধ্য হইবে। মীরা দেবীর উৎসর্গসিদ্ধ জীবনের অবদানও ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত বহুদিন স্মরণ করিবে ও বহন করিবে, কিন্তু আর্য্যভারতের গুরুশক্তি ও মাতৃশক্তি যিনি হইবেন, তাঁহাকে ভারতীয় রক্তধারা ও ভারতীয় সতীবিভূতি অঙ্গে লেপন করিয়াই আবির্ভূতা হইতে হইবে।

ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক সংস্কৃতিকে বিদায় দিয়া বা কণামাত্র অবজ্ঞা করিয়া যে অভিনব নীতির প্রবর্ত্তন অথবা বিশ্বমিলনের চেষ্টা ও আয়োজন, তাহার পশ্চাতে যত বড় শক্তিশালী মহাপুরুষেরই সমর্থন থাকুক, বুদ্ধকে মাথায় রাখিয়া তাঁহার বৌদ্ধবাদ ও সংহতির বিদায়ের ন্যায়ই, ভারতাত্মার অস্বীকারেই কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। মহাভারতের সংগঠনে তাহা প্রধান ও কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে কখনও সার্থক সহায় হইবে না।

স্কুলে ছেলেদের স্বাস্থ্য

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

আমি শিক্ষক। পঁচিশ বৎসর হইল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি সাত-আট বৎসর পূর্ব্বেও স্কুলে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতাম, দেখিতাম ছেলেরা যখন অষ্টম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উঠিয়াছে তখন তাহারা বেশ একটু বলশালী হইয়াছে। এখন আর সেটি দেখিতে পাই না। এখন দেখি—ছেলেরা পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীতে যেমন ছিল, নবম-দশম শ্রেণীতেও ঠিক তেমনই রহিয়াছে; একটুও বাড়ে নাই। অস্থের পড়ার মত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান ছেলে স্কুলে এখন আর একটিও দেখিতে পাই না।

একে ত দেহের এইরূপ অবস্থা—তাহার উপর সকলকেই প্রায় সারা বৎসরই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে দেখি। তাহারও

দেহে রক্ত নাই, মুখে প্রফুল্লতা নাই, চোখে জীবনের জ্যোতি নাই। এই সব ছেলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্কুলে তিন-চার রকমের ব্যবস্থা আছে। পেটের ভাত জীর্ণ হইতে না হইতে তাহাদিগকে অখাদ্য টিফিন দেওয়া; গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে দাঁড় করাইয়াও তাহাদিগকে ড্রিল করান; ফুটবল, ক্রিকেট খেলান; তাহাদের রক্তহীন দেহে বৎসরে দু'চারবার অন্ততঃ কলেরা বসন্তের টিকা দেওয়া। ঘরে বসিয়া বুঝি—ইহাতে বলবান ছেলেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে—স্কুলে বসিয়া বুঝিতে পাই না।

ইহার উপর ছেলেদের পুস্তকের বোঝা তাহাদের দেহের ওজনের অপেক্ষাও বেশী। তাহা ছাড়া বছরে তিনবার পরীক্ষা, স্কুল স্পোর্টস্, ইন্টার স্কুল স্পোর্টস্, লীগ, হকি—কত কি, স্মরণ করিতেও পীড়া বোধ হয়। সর্ব্বোপরি ভয়াবহ ব্যাপার—এই সব ছেলের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি। শহরের সিনেমা-গুলি এই অধোগতির পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতেছে। ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে আজকাল বীভৎস ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদিগকে পাস করাইবে না। ডিপার্টমেণ্ট ইহাদের স্কুল তুলিয়া দিবে। ইহাদের কিছু আসে যায় না। ইহারা কারিগরী বিদ্যা শিখিবে না। ইহারা চাষ করিতে পারিবে না। ইহারা কি করিবে তাহা জানে না। ইহারা কি চায়—তাহাও ইহারা বলিতে পারে না। আমি শিক্ষক, আমি জানি ইহারা খাদ্য চায়। সকলেই বলিবেন—ইহা-দিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

ইহাদিগকে কাহারা গুলি করিয়া মারিতে চায়? ইহাদের উপর কেন এত জুলুম! ইহাদিগকে খাটিয়া খাইতে বলিবার কাহার অধিকার? সন্তানের ক্ষুধা কাহারা বুঝিবেন? সন্তান খাদ্য চাহিলে কোন্ পিতামাতা তাহাকে খাটিয়া খাইতে বলিবেন? জাতীয় সরকারের অসংখ্য বিভাগের কি প্রয়োজন? এই সব বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা দেশের ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। তাঁহাদের খাদ্যের বড় প্রয়োজন। তাঁহা-দের বসন-ভূষণের আশু প্রয়োজন! দেশের ছাত্রদল সে প্রয়োজন মিটাইবে না। অবিলম্বে সমস্ত বিভাগ তুলিয়া দিয়া তাঁহারা চাষে নামুন। সম্মুখে বর্ষা।

স্কুলের পরিদর্শক আছেন। প্রতি বৎসর একবার করিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। স্বাধীনতা-লাভের পর তাহাও না আসিলে চলে দেখিতেছি। তাঁহারা আসিয়া স্কুলের হিসাব-পত্র দেখেন। ক্লাসে গিয়া—শিক্ষক পড়াইতে থাকিলে ছাত্র-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন, ছাত্রেরা পড়া বলিতে থাকিলে শিক্ষককে পড়াইতে বলেন। স্কুল কমিটির মেম্বরগণ ঘরে বসিয়া সংবাদ রাখেন—কোন্ শিক্ষক কয়টি টিউশনি করিতে-ছেন, কোন্ শিক্ষকের কবে স্কুলে পৌঁছিতে দু'মিনিট বিলম্ব হইতেছে। প্রধান শিক্ষক তদারক করেন—শিক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছেন কিনা। কোন্ ছেলে কতটুকু দুধ খাইতে পাইতেছে; কোন্ ছেলে মাত্র চারিটি ভাত খাইয়া স্কুলে আসিতে পাইতেছে না, কোন্ ছেলে চারিটি ভাত পাইতেছে ত একটু ডাল পাইতেছে না, কোন্ ছেলের একটি করিয়া ছিন্ন হাফ প্যাণ্ট হাফ সার্ট বৈ দুইটি করিয়া নাই; এ সব সংবাদ কাহাকেও লইতে দেখি নাই। ছেলেদের শীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া কাহারও মুখমণ্ডলে বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল দেখিলাম না। আমার পুত্র আছে, কন্যা আছে। আমি তাহাদের খাওয়া-পরার কথা আগে ভাবি। আমি বলি—আগে তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, লেখাপড়া পরে হইবে। এই সব ছেলে আগে চারিটি খাইয়া-দাইয়া বাঁচিয়া থাকুক, লেখাপড়া তাহাদের পরে হইবে—ইহা বলিবার কি আজ বঙ্গদেশে কেহ নাই?

চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার এক সরকারী অনাথ আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে অনাথ ছেলেমেয়েদের চারি বেলা খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। দুধ, ঘি, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী, ভাত, ডাল, রুটি প্রচুর। সকলেরই গোলগাল চেহারা। কাহারও হাড় বা শিরা বাহির হইয়া নাই। আমার আগেকার সহকর্ম্মী দু'একজন সেখানে চাকরি করিতেছেন দেখিলাম। তাঁহাদেরও খাইয়া-দাইয়া সুপুষ্ট চেহারা হইয়া গিয়াছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা না হইতেই ধোপার বাড়ী যায়। সেখানে ডাক্তার আছে, মেয়ে ডাক্তার আছে, ডিস্পেন্সারি আছে। সেখানে তাঁত আছে, তাঁতি দিয়া কাপড় বুনান হয়। আরও কত কি আছে সেখানে। আমাদের সব স্কুলে নাই কেন? অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যয় করিবার নিমিত্ত এত অর্থ তো সরকার পাইয়া থাকেন। এই অর্থ যাঁহাদের নিকট হইতে আদায় হয় আমাদের স্কুলের ছেলেরা তাঁহাদের সন্তান। আমাদের স্কুলের ছেলেরা একবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সেভ সজ প্যাণ্টের কাপড়ের জন্য তাহাদিগকে খালি পেটে, শুষ্ক মুখে কণ্ট্রোল আপিসে ছুটিতে হয়। কণ্ট্রোল অফিসার ধমকাইয়া তাড়াইয়া দেন।

খাদ্য ইহাদের চাই। প্রচুর খাদ্য চাই। খাদ্যে ইহা-দিগকে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। ছেলে ইচ্ছামত খাইবে; হাঁসের মত খাইবে, ফেলাইবে, ছড়াইবে—তবে তাহারা সুস্থ-সবল থাকিবে। আমার ধারণা ছিল দুর্ব্বল ছেলেকে অধিক খাদ্য দিলে তাঁহার ক্ষতি করা হয়। এখন সে ধারণা গিয়াছে। আমার বলবান ছেলেও মারা গিয়াছে। আবার এমন ছেলে—যাহার প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয় করিয়াছি সেও ঝোঁক করিয়া খাইয়া-দাইয়া, এমন কি রোগে কুপথ্য করিয়াও সুস্থ-সবল হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ছেলের ক্ষুধা নাই অথচ তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইলেই তাহার ক্ষতি করা হয়।

দুর্বল পিতামাতার দুর্বল ছেলেও অধিক খাদ্য পাইলে হৃষ্ট-পুষ্ট সবল হয়। বহু দিন হইতেই বাঙালীর খাদ্য নাই। প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন 'খাদ্য চাই' 'খাদ্য চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। আজ বাঙালী মাত্রেই দুর্বল। বাঙালীর ছেলেরাও দুর্বল। দুর্বল পিতামাতার দুর্বল ছেলেমেয়ে বলিয়া আজও যাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চান, আমি বলি তাঁহারাই সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁহারা জাতির শত্রু। কোথায় কিসের দিকে দৃষ্টি দিয়া, কি দেখিয়া তাঁহারা বাঙালীর কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেছেন? আজীবন বাঙালীর সহস্র সহস্র ছেলের মাঝে থাকিয়া, আজিও বাঙালীর সহস্র সহস্র ছেলের মৃত্যুমলিন মুখের দিকে চাহিয়া আমি দেখিতেছি বাঙালী ডুবিয়াছে। নিতান্ত দরিদ্র পিতা-মাতাও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন, আজীবন দেখিয়াছি। আজ বাঙালীর ছেলেমেয়েদের খাদ্য নাই। বাঙালী মরিয়াছে।

বাঙালীর খাদ্য নাই—ইহা সত্য। অধিক খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে—ইহাও সত্য। কিন্তু বাঙালীর ছেলেমেয়েদের প্রচুর খাদ্য দিবার মত খাদ্য বাংলাদেশে নাই—ইহা সত্য নয়। বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখের গ্রাস কাহারা কাড়িয়া খাইতেছে? স্কুলের ছেলেমেয়েরাই যদি না খাইতে পাইয়া মরিল তবে শিক্ষা-সংস্কারের কি প্রয়োজন? কিসের জন্যই বা শিক্ষাদপ্তর, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবিভাগ? ছেলেদের বেতন বাড়াইয়া, শিক্ষকের বেতন ষাট টাকা, মাগ্‌গি ভাতা পাঁচ টাকার ব্যবস্থা করিয়া, সরকারী স্কুল, বেসরকারী স্কুলের প্রভেদ রাখিয়া, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিপূর্ব্বক, আপনা হইতে বহু স্কুল উঠিয়া যাইবার—সাহায্যের দাবি ফেলিলেই কিছু জাতিগঠন হইল না। শিক্ষকের ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সরকারের দরদ আমরা কতকটা বুঝিয়া লইয়াছি।

শিক্ষকদের খাদ্যের কথা ভাবিতে গিয়া সকলেই অনেক কটূক্তি করিলেন—শুনিলাম। শিক্ষকদের পেট ভরিয়াছে। এখন শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার পালা চলিয়াছে। ইহাতেও শিক্ষকেরা কৃতজ্ঞ। শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিতে সকলেই চায়। নিরক্ষর ব্যক্তিও নিজেকে কম জ্ঞানী মনে করে না। ইহা স্বাভাবিক। একটা মাকড়সার নিকট হইতেও শিক্ষকেরা শিক্ষালাভ করিতে প্রস্তুত। সবই চলিতে থাকুক। কিন্তু অবিলম্বে যে সকলের—স্কুলের ছেলেদের উপর দরদের প্রয়োজন, পুত্রকন্যার প্রতি পিতামাতার যেরূপ দরদ থাকে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর যাঁহাদের দরদ নাই তাঁহাদের শিক্ষা বিভাগে থাকা উচিত নয়। পিতা-মাতা প্রভৃতি পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া তাহাদের শরীরের গ্লানি বুঝেন। শিক্ষার গলদ বুঝেন না।

যাঁহারা বলেন, চাকরী না পাইয়া লোকে শিক্ষকতা গ্রহণ করে, তাঁহারা ভুল বলেন। চাকরী না পাইয়া যাঁহারা শিক্ষকতা গ্রহণ করেন তাঁহারা শিক্ষাবিভাগে বেশী দিন থাকিতে পারেন না। দশ বৎসর শিক্ষকতা করিলে মানুষ অপদার্থ হইয়া যায় যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শিক্ষকের দায়িত্বের কথা বুঝেন না। শিক্ষকতা করা সহজ নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিতে হইবে; চিরদারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে; অপমান, লাঞ্ছনা অঙ্গের আভরণ হইবে; অবজ্ঞা সর্ব্বদা চারিদিকে উদ্যত রহিবে; সমাজের কোনও অংশে তাঁহাদের এতটুকু স্থান রহিবে না; রাজ্যের কোনও কার্য্যে তাঁহাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে না; আজীবন জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে বসিয়া তাঁহাদিগকে উপলখণ্ড কুড়াইতে হইবে; সেকি সহজ কথা। অশিক্ষককে ট্রেনিং দিয়া সুশিক্ষক করা যায় না, বৃদ্ধ শিক্ষককে অবসর দিয়াও শিক্ষার উন্নতি হয় না। শিক্ষার উন্নতি কিসে হয় শিক্ষকেরা জানেন। আজীবন শিশুর মধ্যে থাকিয়া যাঁহাদিগকে শিশু হইয়া যাইতে হয় তাঁহারা জাতিগঠন করিতে জানেন না ত কাহারা জানেন? সে সব প্রশ্নই আজ শিক্ষকদিগের নিকট বড় প্রশ্ন নয়। শিক্ষকদিগের খাদ্যাভাবের প্রশ্নও আজ আর তাঁহাদের নিকট বড় প্রশ্ন নয়। ছাত্রদিগের জীবনের প্রশ্নই আজ তাঁহাদের নিকট সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। জাতি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে সাবধান হইতে হইবে।

আমি সরকারী স্কুলের শিক্ষক নই। সরকারী স্কুলের শিক্ষকেরা হয়ত ইহার বিপরীত বলিবেন। সরকারী স্কুলের সবই ঠিক থাকিতে হইবে। সরকারী স্কুলের ছাত্রেরাও নাকি বড় লোকের ছেলে। বড়লোক বাঙালীই বা আজ কে আছেন? খাদ্যই বা কোথায়? বাংলাদেশের স্কুলের ছাত্র-মাত্রেই সব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে। বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ডুবিতেছে। বাঙালীর স্কুলের ছেলেমেয়েরাও মরিতে বসিয়াছে—ইহার প্রতিকার চাই।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১

জেলের মেয়াদ শেষ হইবার কয়েকদিন আগে দেবানন্দ স্থির করিয়াছিল জেল হইতে বাহির হইয়া সে রাজনগর যাইবে। তাহার আবাল্য বন্ধু ইন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়াতে তাহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহাদের দুই জনকে দেখিবার জন্ত।

ছাড়া পাইবার দুই দিন আগে পিতার পত্র আসিল। পত্রে তিনি তাহাকে সোজা তাঁহার কর্মস্থানে চলিয়া আসিবার জন্ত লিখিয়াছেন। অগত্যা মনের ইচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে পিতার কর্মস্থানে রওনা হইতে হইল।

দেবানন্দ আসিয়া পৌঁছিল। তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী জেল-প্রত্যাগত পুত্রের গা হইতে জামা খুলিয়া লইয়া জীবানন্দ অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন। পিতার মুখের ভাব দেখিয়া দেবানন্দ মনে মনে হাসিয়া বলিল—আমি জেলে ভালই ছিলাম বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন—চেহারা দেখে কেমন ছিলে কিছু বুঝতে পারছি। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম কর। তার পর কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হবে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা, পরীক্ষার জন্ত তৈরি হতে হবে।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল রাজনগরে যাইবার কথা পিতাকে এখনই বলিবে কিনা।

জীবানন্দ বলিলেন—তুমি এত দিন যে সকল কারণে পড়াশুনোর অবহেলা করেছ সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলা নিরর্থক। ক্ষতি যা হবার হয়েছে। তবে সর্ব্বদা একটা কথা মনে রেখ। তোমাকে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে হবে। ইন্দ্রের মত তোমার বিস্তৃত জমিদারী নেই যে বসে খাবে। এজন্ত তোমার কাজের স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত করতে হবে।

পিতা ইন্দ্রের কথা তোলায় সুযোগ পাইয়া দেবানন্দ বলিল, কলকাতা যদি যেতে হয়—আমি কয়েকটা দিন রাজনগরে কেন ঘুরে আসি না বাবা? মা কি আমার কথা কিছু লেখেন নি?

জীবানন্দ পুত্রকে এখন রাজনগরে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহার স্ত্রী হিরণ্ময়ী লিখিয়াছিলেন—"দেবু শীঘ্র খালাস হবে। সে যেন একবার রাজনগরে আসে। তাকে দেখবার জন্ত আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।—উত্তরে জীবানন্দ সংক্ষেপে জানাইলেন—দেবু পরে রাজনগরে যাবে। ইন্দ্রকে সংসারে আটকাবার জন্ত অনেক কষ্টে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে দেবুকে রাজনগরে পাঠাতে চাই না এখন। কি জানি তার সংস্পর্শে ইন্দ্র যদি আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার বাপ মা নেই, কে তাকে ঠেকাবে? সংসারে মন বসুক ওর, পরে দেবু রাজনগরে যাবে।

পুত্রের কাছে এত কথা না ভাঙিয়া তিনি বলিলেন—তা লিখেছেন। আমি জানিয়েছি এখন আর রাজনগরে গিয়ে দেবুর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। একেবারে পরীক্ষা দিয়ে যাবে।

দেবানন্দ নিরাশ হইল, কিন্তু পিতার কথার প্রতিবাদ করিল না।

ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্ত ও কলেজে স্থান পাওয়া যাইবে কিনা জানিবার জন্ত কলিকাতায় পত্র লেখা হইল। সাত আট দিন লাগিল উত্তর আসিতে। উত্তর আসিলে স্থির হইল দেবানন্দ কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবে এবং হষ্টেলে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

শিয়ালদহে পৌঁছিয়া ষ্টেশনের বাহিরে যাইবার পথে পিছন হইতে হঠাৎ কে দেবানন্দকে জড়াইয়া ধরিল।

চমকিয়া দেবানন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র বলিল—তুই কোথায় চলেছিস দেবু?

দেবানন্দ—তুই যাচ্ছিস কোথায়?

মহেন্দ্র বলিল যে, সে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পটলডাঙ্গার কলেজ হষ্টেলে স্থান পাইয়াছে। তাহার এক আত্মীয় সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেবানন্দ হষ্টেলে থাকিবে শুনিয়া মহেন্দ্র তাহাকে ছাড়িল না। বলিল, চল, আমার হষ্টেলে উঠবি। তিন মাস জেল খেটেছিস, রায় বাহাদুরের ছেলে হলেও সরকারী কলেজে জায়গা পাবি না, কেন মিছিমিছি ঘুরে মরবি? তার চেয়ে আমার কলেজে ভর্ত্তি হবে যা। তা হলে দু'জন এক সঙ্গে থাকতে পারব।

কুলির মাথায় মোটঘাট চাপাইয়া দুই বন্ধু পটলডাঙ্গার মহেন্দ্রের হষ্টেলে গিয়া উঠিল।

সেই দিনই দুপুরে দেবানন্দ কলেজে ভর্ত্তি হইল। হষ্টেলের একটি ঘরে দুইটি সীট খালি ছিল। সেখানে তাহারা স্থান পাইল।

হষ্টেলের যে ঘরটিকে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র অধিকার করিল, সে ঘরে ভবেশ বলিয়া একটি ছেলে থাকিত। ভবেশ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে বড়লোকের ছেলে, অত্যন্ত বাবু-মানুষ। তাহার দুই মামা কলিকাতায় থাকেন। একজন

ব্যারিষ্টার ও অন্যজন ডাক্তার। হষ্টেলে তাহার যথেষ্ট খাতির। কলেজেও তাহার প্রতিপত্তি আছে ভাল বক্তা ও ছাত্রনেতা বলিয়া। হষ্টেলের সকলে জানিত বি-এ পাস করিয়া সে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাতে যাইবে।

আলাপ হইবার পরে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র শুনিয়া আনন্দিত হইল যে ভবেশ এন্টি-সারকুলার সোসাইটির ভলান্টিয়ার হইয়া কনফারেন্সের সময় বরিশাল গিয়াছিল। তিন জনের মধ্যে শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

দেবানন্দ ভবেশের যত ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইতে লাগিল তত মুগ্ধ হইল। পাঠ্য পুস্তকে বিশেষ অনুরক্তি না থাকিলেও ভবেশ নানা রকমের বই, বেশীর ভাগ ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়িত। সে বড় বড় নেতাদের সঙ্গে মিশিত, বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিত, এন্টি-সারকুলার সোসাইটির জন্য বহু পরিশ্রম করিত। তাহার সমস্ত কাজের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর ছিল যে দেবানন্দের তাহাকে বড় ভাল লাগিল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল কতকটা স্নেহপ্রবণ অগ্রজ ও অনুগত ছোট ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের মত।

কলিকাতায় আসিয়া দেবানন্দ বাংলার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে স্থান লাভ করিল। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা তখন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় উদ্বেল। পার্কে পার্কে প্রতিদিন সভা চলিতেছে। সভায় স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হইতেছে, দুর্দান্ত দমননীতির প্রতিবাদ করিতেছেন বড় বড় নেতারা। সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন গরম গরম প্রবন্ধ, দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতি ও দমননীতির সংবাদ পরিবেশন করিতেছে। সহরের বুদ্ধিজীবী-সমাজে, ছাত্রমহলে উত্তেজনার স্রোত বহিতেছে।

দেবানন্দ কয়েকদিন পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বক্তৃতা শুনিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার সময় হষ্টেলে ফিরিলে তর্কবিতর্ক সুরু হইল। অন্য ঘর হইতে ছেলেরা আসিয়া ভবেশের ঘরে বসিত ও আলোচনায় যোগ দিত। কিছু কাল এই ভাবে চলিবার পর দেবানন্দের খানিকটা বিরক্তি ধরিয়া আসিল। সে ভাবিল —এখানে দেখছি ছেলেরা সবাই কেবল লম্বা-চওড়া কথা বলে, কাজ কেহ করে না এক ভবেশ-দা ছাড়া। বক্তৃতায় প্রত্যেকটি ছেলে যেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির, বিপিনচন্দ্র পালের ক্ষুদ্র এক একটি সংস্করণ। কিন্তু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ত কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। সান্ধ্য আড্ডা ও তর্কবিতর্কের জন্য পড়াশুনা করা হয় না।

আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সে ভবেশকে বলিল, ভবেশ-দা, রোজ বক্তৃতার চোটে আমার হাঁফ ধরে গেছে। সন্ধ্যাবেলার আড্ডাটা বন্ধ করুন।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—চট করে বন্ধ করা যাবে না, তবে আমি চেষ্টা করব। এবার চল একদিন এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভায় নিয়ে যাই।

ভবেশের সঙ্গে সোসাইটির সভায় কয়েক দিন ঘুরিয়া সোসাইটির কাজের ধারা সে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার মন সন্তুষ্ট হয় নাই। সে ভাবিল বরিশাল কনফারেন্সের পরেও এই ধরণের কাজে কিছু ফল হইবে বলিয়া ইঁহারা এখনও বিশ্বাস রাখেন। আশ্চর্য্য বটে! ভবেশ তাহার মনের ভাব কিছু বুঝিল। কয়েক দিন পরে সে বলিল—দেখ, ছেলেদের তর্ক-বিতর্ক রোজ শুনছ, এবার বড় দলের মাঝে নেতৃস্থানীয়দের আলোচনা একটু শোনা ভাল। কাল আমার ছোট মামা ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ীতে যাবার কথা আছে। আমার সঙ্গে যাবে?

ব্যারিষ্টারের কথা শুনিয়া দেবানন্দ যাইতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, তাঁদের অপরিচিত। আমাকে বাদ দিন ভবেশ-দা।

ভবেশ ছাড়িল না। বলিল—এত সঙ্কোচ কিসের? কি ধরণের আলাপ হয় তাঁদের মধ্যে চুপ করে শুনে যাবে। আমার মামা মিঃ রায় অনেক কাগজে ইংরেজীতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন। ছাত্রমহলে তাঁর কিছু প্রতিপত্তি আছে। ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে তিনি উৎসুক।...

ভবেশের অনুরোধে দেবানন্দকে তাহার সঙ্গে চক্রবেড়ে রোডে মিঃ রায়ের গৃহে যাইতে হইল।

ফটক, লন ও গাড়ীবারান্দাওয়ালা বৃহৎ অট্টালিকা। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী। আর্দালী, বয়, বাবুর্চি, খানসামা, আয়া সবই যথারীতি আছে—ইংরেজী কায়দায় ডাইনিং রুম, ড্রয়িং রুম, বিলিয়ার্ড রুম, টেনিস লন, ব্রেক-ফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার সে গৃহের ব্যবস্থা। স্বদেশী রীতির মধ্যে প্রণামটার চল আছে। পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরিহিত মোটা চুরুট হাতে ব্যারিষ্টার সাহেবকে দেবানন্দ বন্ধুর ইঙ্গিতে প্রণাম করিল। ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কে ভবেশ?" ভবেশ বলিল—"আমার বন্ধু সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র, নূতন এসেছে। এর বাবা রায়বাহাদুর, পুলিসের ডি-এস-পি।"

"তাই নাকি? বেশ, বেশ। ভেতরে আলাপ করিয়ে দিও। ভেরী গ্ল্যাড টু মিট ইউ (তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে ভারি খুশি হলাম)। তোমার বাবা রায়বাহাদুর ডি-এস-পি? বেশ, বেশ। বোস! বোস!"

বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন—বাবুকো সেলাম দো।

ভবেশ দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। মিঃ রায় বলিলেন—বাই দি বাই, ওহে ভবেশ,

আজকের বেঙ্গলী ও ইণ্ডিয়ান মিররে আমার দুটো আর্টিকেল বেরিয়েছে। কলেজে তোমার বন্ধুদের পড়ে শুনিও।

ভবেশ বলিল—আচ্ছা।

দেবানন্দকে লইয়া ভবেশ উপরে উঠিল। পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি, মাঝখানে কার্পেট বিছানো। সিঁড়ির মাথায় বছর পনেরর একটি সুশ্রী, তাম্রবর্ণ মেয়ে বিনুনি দোলাইয়া কি একটা গানের সুর ভাঁজিতেছিল। ভবেশের সঙ্গে অপরিচিত একটি ছেলেকে উপরে আসিতে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে উঠিয়া ভবেশ বলিল—গুড মর্ণিং কিটি। মামী-মা কোথায় রে? কিটি বলিল, গুড মর্ণিং।—কুঁচকানো ভ্রূর নীচের চোখ ঘুরাইয়া ইঙ্গিতে সে যে প্রশ্ন করিল, তার মানে এ আবার কোন আপদটিকে নিয়ে এসেছ? ভবেশ এই ইঙ্গিতের জবাব না দিয়া দেবানন্দকে লইয়া ড্রইংরুমে বসাইল।

দেবানন্দ এই প্রথম তখনকার দিনের বিত্তশালী ব্যারিষ্টারের বাসভবনের ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। ঘরের আসবাব ও সাজাইবার কায়দা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার ঠিক সম্মুখে দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং। অন্য দিকের দেয়ালে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের ছবি। ঘরের কোণগুলিতে কাল পাথরের তেপায়ার উপরে রূপালি ফ্রেমে বাঁধা ছোট ছোট ছবি, অনেকগুলি বিলাতী দৃশ্যের, কতকগুলি পরিবারের লোকজনের।

তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ভবেশ অন্য কক্ষে গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে এক জন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে লইয়া সে ঘরে ঢুকিল। বলিল—দেবানন্দ, মামী-মাকে প্রণাম কর। দেবানন্দ প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাবা রায় বাহাদুর ডি-এস-পি? বিলাত গেলে তুমি এস. পি. হতে পারবে। তোমাকে দেখে ত বেশ চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে বলে মনে হয়। আমার বাবাও রায় বাহাদুর, তিনি একজিকিউটিভ সার্ভিসে ছিলেন। আমার দুই ভাই, এক জন জুডিশিয়াল সার্ভিসে, এক জন খাটালের এস. ডি. ও.। গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসে যাবে, না ভবেশের মত ব্যারিষ্টারী পড়বার ইচ্ছে তোমার? তোমার বাবা যদি রাজী হন এক-এ পাশ করেও যেতে পার। উনি গ্রেজ ইনের নামকরা ছাত্র ছিলেন, সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

দেবানন্দ দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। তিনি বলিলেন—বোস, দাঁড়িয়ে কেন? ওরে কিটি শোন দেখি।

কিটি ভ্রূ কুঁচকাইয়া এক হাতে বিনুনি টানিতে টানিতে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া মিসেস রায় বলিলেন—কি অসভ্যতা হচ্ছে কিটি, বিনুনি ছেড়ে দাও। চোখ মিটমিট করছ কেন? সভ্য হয়ে বস এখানে। ভবেশদাদার নূতন বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ কর। এর বাবা গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসের লোক, রায় বাহাদুর। ইচ্ছে করলে ছেলেকে বিলেত পাঠাতে পারেন।

কিটি বলিল—তুমি বিলেত যাবে সত্যি? টেবিলে খেতে জান? না এখনও হাত দিয়ে মেখে খাও?

ভবেশ—আমি ত হষ্টেলে হাত দিয়ে মেখে ডাল-ভাত খাই কিটি।

কিটি—তোমার কথা আলাদা। তুমি খাঁটি বড় লোক। তা ছাড়া সত্যি সত্যি বিলেত যাচ্ছ।—দেবানন্দের দিকে ফিরিয়া সে বলিল—তোমাদের বাড়ীতে বাবুর্চি আয়া আছে।

দেবানন্দ কিটির বয়সের মেয়ের এই ধরণের কথাবার্তায় কৌতুক বোধ করিতেছিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—আমরা বাবুর্চির হাতে খাই না।

কিটি দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—বাবুর্চির হাতে খাও না? এঃ, বলছ কি গো। ওমা, মা, শুনছ—

কিটির মা অন্যত্র গিয়াছিলেন। কিটির বক্তব্য শেষ হইল না।

দেবানন্দ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। সে ভবেশকে বলিল—আপনি বোধ হয় এবেলা এখানে থাকবেন। আমি হষ্টেলে ফিরি?

কিটি এক লাফে উঠিয়া দেবানন্দের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—রাগ হ'ল বুঝি? বস, বস, মা তোমাকে না খাইয়ে যেতে দেবেন ভেবেছ? বাবুর্চির রান্না নয়, মিষ্টি খেতে দেবেন। তোমরা মিষ্টি খেতে খুব ভালবাস, না? আমরা খাই কেক, পুডিং, স্যাণ্ডউইচ। হাজার চাইলেও মা আধখানার বেশী রসগোল্লা দেবেন না আমাকে। বিলিটা ফাঁক পেলেই রসগোল্লা চুরি করে খেয়ে নেয়। বিলিকে জান? আমার ছোট ভাই।

বয় আসিয়া জানাইল মেমসাহেব খানা-কামরায় ডাকিতেছেন।

জলযোগ সারিয়া হষ্টেলে ফিরিবার সময়ে দেবানন্দ ভবেশকে বলিল—কই, আপনার মামার বাড়ীতে রাজনীতি চর্চ্চা ত শুনলাম না।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—রাজনীতি চর্চ্চা হয় সন্ধ্যার পরে। আর এক দিন তোমাকে নিয়ে যাব, তখন শুনবে—আজ শুধু পরিচয় করিয়ে দিলাম। সান্ধ্য আড্ডায় অনেকে আসেন। খুব তর্ক-বিতর্ক হয়, তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কোন কোন দিন।

ভবেশ জানিত সন্ধ্যার পরে এই আড্ডার শেষের দিকে উপস্থিত সকলের মেজাজ কোমল ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে। মিঃ রায় নিজে কথাবার্তা কম বলেন যতক্ষণ পলিটিক্যাল আলোচনা চলে। শেষের দিকে আলোচনা রাজনীতি ছাড়িয়া ঘরোয়া হইয়া উঠে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতা, নাচ, গল্প, শিকার, এডভেঞ্চার

ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য ইত্যাদি আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। দলের মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু খবর রাখেন। তিনি জয়দেব ও ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করেন, সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে শ্লোক পর্য্যন্ত মুখস্থ বলেন। ভবেশ আড্ডার শেষের দিকে বড় থাকে নাই। সে শুনিয়াছে এই সময়ে আড্ডা খুব জমিয়া উঠে।

২

কয়েকদিন পরে বিকালের দিকে ভবেশ দেবানন্দকে বলিল—আজ চক্রবেড়ে যাচ্ছি। তুই যাবি ?

দেবানন্দ—আজ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন নাকি গোলদীঘিতে বক্তৃতা দেবেন। সেখানে যাবার ইচ্ছে আছে।

ভবেশ—বক্তৃতা রোজ হচ্ছে, গেলেই হ'ল। আজ মামাবাবুর ওখানেও সভা আছে। ছোট লাট—ভূপেন বোস, জে চৌধুরী ও সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে ডেকে নাকি ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে খুব ধমকেছেন, ভজব রটেছে। কি ব্যাপার হয়েছে শোনবার ইচ্ছে আছে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতা দেবানন্দের মনে খোঁচাইতেছিল। তাহার মনে হইল একটা কৃত্রিম, আলাদা জগতে উহারা বাস করে। সে জগতের সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ নাই। সে যাইবার উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

ভবেশ—আজকের দিন চল্। তোকে নিয়ে যাবার জন্যে কিটি আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। না নিয়ে গেলে খেয়ে ফেলবে। বাইরে থেকে দেখতে ওর ধরণ-ধারণ ওরকম হলেও ওর মনটা খুব ভাল।

কিটির আগ্রহের কথা শুনিয়া দেবানন্দ একটু আশ্চর্য্য হইল, কথাটা সে বিশ্বাস করিল না।

ভবেশ নিজের মনে বলিয়া চলিল—মেম গভর্ণেসের কাছে পড়ে, বাবুর্চ্চির রান্না অখাদ্য খায়, আবার কার কাছে নাকি শিবপূজো শিখেছে। ও একটা অদ্ভুত মেয়ে ওদের সার্কেলে। ওর স্বদেশী গান শোনাব একদিন। বেশ ভাল গাইতে পারে।

ভবেশ এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করিবার পর দেবানন্দকে রাজী হইতে হইল। কিটির শিবপূজা করিবার কথা শুনিয়া তাহার লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িল। কিটিকে শিবপূজা করিতে শিখাইল কে ?

চক্রবেড়ে পৌঁছিতে ভবেশদের একটু দেরী হইয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেবের নীচের বসিবার ঘরে তখন আসর জাঁকিয়া উঠিয়াছে। দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভবেশ ঘরের এককোণে দুইখানা চেয়ার অধিকার করিল। কেহ তাহাদের লক্ষ্য করিল না।

আলোচনা চলিতেছিল স্বদেশী আন্দোলনের অবস্থা সম্বন্ধে।

মিঃ রায় বলিলেন—মাড়োয়ারী চেম্বার ম্যাঞ্চেষ্টারে টেলিগ্রাম করেছে বিলাতী কাপড় বিক্রী হচ্ছে না, তারা কনট্রাক্ট করতে পারবে না। ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে তাদের সদুপদেশ দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে তার করা হয়েছে, আবার চেষ্টা হচ্ছে দেশী মিলগুলোর সব কাপড় কিনে ফেলে যাতে বাজার হাতের মধ্যে আনা যায়।

মিঃ গাঙ্গুলী—আর একটা চেষ্টাও হচ্ছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে দেশী মিলের ছাপ দিয়ে মাড়োয়ারীদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। তারা দেশী বলে সেই কাপড় চালাচ্ছে। ব্যাপার ধরা পড়াতে হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে।

মিঃ গোহ—ইংলিসম্যান গবর্ণমেণ্টকে বলেছে, ষ্ট্রাইক এট দি রুট অব দি এজিটেশন (আন্দোলনের গোড়ায় আঘাত কর)। আবার ভয় দেখিয়েছে, আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল বলে।

মিঃ মিটার হাতের সিগারেট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—উঁহু, হ'ল বলে নয়, হয়েছে। কলকাতায় ইউরোপীয়ানরা সেবর-র‍্যাটলিং (তরোয়াল ঘুরাইতে) আরম্ভ করেছে। বলেছে পঞ্চাশ বছর তরবারি খাপবদ্ধ, ছিল এবার খাপ থেকে বের করতে হবে।

মিঃ গোহ—শুনলাম ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মার্চ্চেণ্টরা আপিসের কেরাণীদের স্যাক (বরখাস্ত) করবে বলে ভয় দেখিয়েছে।

মিঃ মিটার—ছোটলাট ফ্রেজারের মিটিংএ কি হ'ল শুনেছেন ?

মিঃ রায়—মিটিং হ'ল কোথায় ? মিঃ বসুকে ছোটলাট বললেন আপনি ও আপনার বন্ধুরা মিলে ছাত্রদের খেপিয়ে তুলছেন কেন ? মিঃ বসু বললেন—আমরা কিছু করি নি, ছাত্রদের খেপিয়েছে গবর্ণমেণ্ট। ছোটলাট বললেন, কড়া রিপ্রেসিভ মেজার (উগ্র দমননীতি) দিয়ে তিনি সবাইকে ঠিক করবেন। মিঃ বসু আর কোন কথা না বলে চলে এলেন।

মিঃ মিটার—মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জিও পুলিশ কমিশনারকে ঠিক এই কথা বলেছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী—আজ 'বারে' শুনলাম পুলিশ কমিশনারের ইঙ্গিতে করপোরেশন নূতন বাই-ল (উপবিধি) পাশ করছে পাবলিক স্কোয়ার ও পার্কে মিটিং বন্ধ করবার জন্য।

মিঃ ডাটা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—করুক, আমরা ফুট-পাথে মিটিং করব। এ বাই-ল পাশ করানো বড় সহজ হবে না।

মিঃ গোহ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পেডলারের জারাজারি সারকুলারের কথা তুলিলেন। বলিলেন, ক্লৈব্য বইয়ের

মধ্যে দিয়ে রাজভক্তি শেখবার নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ পেডলার। শুনছি ছাত্র ও মাষ্টারদের বয়কট মিটিংএ যাওয়া নিষিদ্ধ করে নূতন একটা সারকুলার বেরুচ্ছে।

মিঃ ভাটা—মিটিংএ যাওয়া বন্ধ করে সারকুলার বের করলে সব ছেলে রাজভক্ত হয়ে যাবে। দি আইডিয়া! শুনছি ওনং ওয়ার্ডের স্কুল-কলেজের ছেলেরা মিলে সেদিন এক-রাশ বিলিতী কাপড় ও চিনি কিনে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

মিঃ গোহ—ইংলিশম্যান বলেছে, মুসলমান ও মাড়োয়ারীরা বাঙালীদের উপর ভারি চটে গিয়েছে এই স্বদেশী আন্দোলন চালাবার জন্তে।

মিঃ মিটার—সব মুসলমান চটে নি। 'পার্টিশন (দেশবিভাগ) আর স্বদেশী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি দল দেখা যাচ্ছে। এক দল খোলাখুলি বলছেন লর্ড কার্জন মুসলমানপ্রধান নূতন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করে মুসলমানদের উপকার করেছেন। কিন্তু তাঁদেরই আর এক দল বলছেন, পার্টিশন মুসলমানদের ক্ষতি করবে, গোটা বাঙালী জাতকে দুর্ব্বল করবে। এঁরা স্বদেশীর সমর্থন করছেন। একটা দল বলছেন, শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমানেরা চাকুরি পাচ্ছিল না। পার্টিশনের ফলে মুসলমান-দের চাকুরির সুবিধে হবে। মোসলেম কাগজখানা খোলা-খুলি বলছে যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের শত্রু, তবু মুসল-মানদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া দরকার নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবার জন্তে।

দেবানন্দ মনোযোগ দিয়া এই আলোচনা শুনিতেছিল। আলোচনা তাহার মন্দ লাগিতেছিল না, কিন্তু সে ভাবিতেছিল —ইঁহারা নিজেরা কি করিতেছেন সে বিষয়ে ত কিছুই বলিতে-ছেন না। তাহার ভাব দেখিয়া ভবেশ উঠিবার ইঙ্গিত করিল। সে উঠিতেছিল, মিঃ গোহর কথা শুনিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মিঃ গোহ—"সোনার বাংলা" লিফলেট নিয়ে 'পায়োনীয়র' 'ইংলিশম্যান' ও বাকী এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো খুব শাসাতে আরম্ভ করেছে বাঙালীদের। সেদিন খোলাখুলি বলছে—এটা এংলো-ইণ্ডিয়ান কমিটিনিটির কীর্ত্তি।

মিঃ মিটার—"গিভ দি ডগ এ ব্যাড নেম বিফোর বিটিং ইট" —ইংরেজের এটা চিরকালের অভ্যাস। এদিকে আবার এজেণ্ট প্রোভোকেটিওর দল সম্প্রতি কাজে নেমেছে। আমার এক আত্মীয় বললেন, সেদিন গোল দীঘিতে ইউরোপীয়ান পোশাকে একজন লোক ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছে—ইংরেজরা আমাদের শত্রু, তাদের মার। তাদের তাড়িয়ে দাও এ দেশ থেকে। —কাছেই পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। এতে সহজেই লোকের সন্দেহ হয়। যে-কোন ছুতোয় একটা গোল-মাল বাধিয়ে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কড়া দমননীতি চালাতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করতে চায় এংলো-ইণ্ডিয়ানরা।

মিঃ গাঙ্গুলী—একটা মজার ব্যাপার বলছি শুনুন। বিহারে স্বদেশী প্রচার করবার জন্তে বাঙালী ছেলেরা একটা নূতন ট্যাকটিক্স (কৌশল) নিয়েছে। রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে কাগজের একটা স্লিপ লোকের হাতে দিয়ে বাঙালী ছেলেরা সরে পড়ে। স্লিপে লেখা থাকে—স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করুন। তার নীচে ইনষ্ট্রাকশন (উপদেশ), "এই স্লিপের সাতখানা কপি করে আপনার সাত জন বন্ধুর মধ্যে বিতরণ করুন। না করলে এক লক্ষ গো ও ব্রাহ্মণ বধের পাপ আপনাকে লাগবে।" স্বদেশীর জন্ত যাদের কোন উৎসাহ নেই, পাপের ভয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশী প্রচারের কাজ করে থাকে। আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছে বটে!

মিঃ গাঙ্গুলীর গল্প শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন।

পর্দা সরাইয়া সৌম্যমূর্ত্তি, ফিটফাট সাহেবি পোশাক-পরা, হাতে সিগার একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, গুড ইভনিং স্যার, গুড ইভনিং অল অব ইউ।

ভবেশ নিম্নস্বরে দেবানন্দকে বলিল, ইনিই ডক্টর চক্রবর্ত্তী যার কথা তোকে একদিন বলেছিলাম।

দেবানন্দের মনে পড়িল ভবেশ একদিন তাহার মামার বন্ধু ব্যারিষ্টার ডক্টর চক্রবর্ত্তীর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিয়াছিল, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সমব্যবসায়ীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার বাচাল স্পষ্টবাদিতার জন্য একটু ভয়ও করেন।

ডঃ চক্রবর্ত্তী আসন গ্রহণ করিলে ভবেশ দেবানন্দসহ তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, নমস্কার স্যর, কেমন আছেন?

ডঃ চক্রবর্ত্তী বাঁ হাতে সিগার মুখ হইতে সরাইয়া করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, কে ভবেশ। খবর ভাল ত?

ভবেশ দেবানন্দের পরিচয় করিয়া দিয়া বলিল, আমার বন্ধু, ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট (তোখোড় ছাত্র) ও একটিভ (সক্রিয়) স্বদেশীওয়ালা।

ডঃ চক্রবর্ত্তী—ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ (তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি খুশী হলাম)। বসো তোমরা।

ভবেশ ও দেবানন্দ দুইখানা চেয়ার ডঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে সরাইয়া লইয়া বসিল।

মিঃ ভাটা ও মিঃ গাঙ্গুলী বরিশালে ছাত্রদিগকে বেত্র-প্রহারের কথা বলিতেছিলেন।

মিঃ ভাটা বলিলেন—ইংরেজরা নিজেদের সভ্য জাত বলে গর্ব্ব করে। বরিশালের মত এট্রোশাস (অত্যাচারমূলক) ব্যাপারের কথা কেউ কখনও শুনেছে?

মিঃ গাঙ্গুলী—গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজের বন্দে মাতরমের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে। বন্দে মাতরম্ মানে মাইণ্ড এণ্ড বীট, বাঁধো আর মারো।

ডঃ চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভেরি গুড ট্রান্সলেশান আই মাষ্ট সে (এ কথা বলতেই হবে যে ভারি চমৎকার অনুবাদ হয়েছে)। বাইও এণ্ড বীট। পাছে আমরা তাদের মার লাগাই সেই ভয়ে তারা আগে থেকে আমাদের মার লাগাতে সুরু করেছে।

ফুলারের এণ্টি-স্বদেশী সারকুলারের কথা উঠিল। মিঃ ভাটী বলিলেন, স্কুলের ছেলেরা স্বদেশী মিটিংএ যোগ দিলে মাষ্টারদের স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হবে। দি কাদি আইডিয়া। পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে মাষ্টাররা স্পাইগিরি করুক আর কি!

ডঃ চক্রবর্ত্তী—দেতার ফিয়ার! পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ফুলার ও লায়ন, পশ্চিমবঙ্গে ফ্রেজার ও কার্লাইল আর গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ায় হারবার্ট রিজলে—দে আর ডুইং এ গুড টীম ওয়ার্ক (এরা একসঙ্গে বেশ কাজ করছে)। এদের সঙ্গে আছে মধ্যী-স্থানীয় দল, বরিশাল ও রংপুরের এমার্সন, মৈমনসিংহের ক্লিম্পসন ও ক্লার্ক। এখানে কার্লাইল ফর্মান জারি করছে স্কুল-কলেজের মাষ্টার ও অধ্যাপকদের উপর, ওখানে করছে ফুলার ও লায়ন।

ডঃ চক্রবর্ত্তী হাতের সিগার এস-ট্রেতে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা স্বদেশী আন্দোলন করে ইংরেজের ভাত মারবার জন্য হাত বাড়িয়েছ। তোমাদের নিজি কাগজগুলো বলছে, স্বদেশী মানে "রিভাইভ্যাল অব ইণ্ডিজেনাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ" (দিশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন), এটা ত এণ্টি-ব্রিটিশ আন্দোলন নয়। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত স্বদেশীর সাহায্য করা। তাই শুনে লর্ড মিণ্টো বললেন, স্বদেশীর উপর আমার বড় সিম্প্যাথি (দরদ)। ব্যস, কিন্তু ফুলারও বলে উঠলেন—আমারও।

তিনি এস-ট্রের উপর হইতে সিগারটি তুলিয়া লইলেন। অন্যমনস্কভাবে কয়েকবার সিগারটি টানিলেন। আবার উহা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, পার্টিশনের বিরুদ্ধে আবেদন, নিবেদন, সভা-সমিতি চলল। ইংরেজ মনে করল, বাঙালীবাবুর দল একটা আর্টিফিসিয়াল (কৃত্রিম) আন্দোলন পাকিয়ে তুলছে। সভা-সমিতি করে যখন কিছু হ'ল না তখন বয়কট ও স্বদেশী আরম্ভ হ'ল। ইংরেজ শাসকেরা অপেক্ষা করতে লাগল। আন্দোলন যত দেশময় ছড়াতে লাগল তত তাদের ভ্রূ কুঞ্চিত ও চক্ষু রক্তবর্ণ হতে লাগল। ইতিহাসে ভীরু ও অকর্ম্মণ্য বলে বর্ণিত বাঙালী যদি ইংরেজের ব্যবসাকে আঘাত করবে তবে তারা এদেশে এসেছে কেন? কিসের জন্য পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসীদের সঙ্গে এত লড়াই করে তাদের হাত থেকে ভারতীয় বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়েছে?

ডক্টর চক্রবর্ত্তী একটু চুপ করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তারপর আবার সুরু করিলেন—ইংরেজ এদেশের বাণিজ্যে একচেটে অধিকার লাভ করবার জন্য রাজ্য বিস্তার করেছে। এদেশের বস্ত্র-শিল্প, নৌ-শিল্প ধ্বংস করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ করে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য করায়ত্ত করেছে। আজ বিলিতী পণ্য বর্জ্জন করে ইংরেজের এত সাধের বাণিজ্যে আঘাত করতে বাঙালী বদ্ধপরিকর! এটা কি বরদাস্ত করা যায়।...বয়কট বন্ধ করবার জন্য আইন পাস করতে হয় মাস লেগে যাবে। এ হয় মানে ইংলিশ ট্রেড উড বি ডেড (ইংরেজের বাণিজ্য খতম হয়ে যাবে)। তাই ফুলার কর্ম্মচারীদের উপদেশ দিয়েছে "hammer them until they come to their senses." (সুবুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙালীদের হাতুড়ী পেটা করতে থাক)। এই ত সবে কলির সন্ধ্যা।

ডঃ চক্রবর্ত্তী আবার সিগার ধরাইলেন। ঘরের সকলে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি হাসিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ডোণ্ট গেট ডাজি মাই ফ্রেণ্ডস। (ঘাবড়ে যেও না) তিনি মিঃ রায়ের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। মিঃ রায় ডাকিলেন—বোয়! বোয়!

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

উপরে উঠিবার সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিয়া ভবেশ ডাকিল, কিটি! কিটি!

সিঁড়ির পাশের ঘরে কিটি তখন মেম গভর্নেসের কাছে পড়িতেছিল। ভবেশের ডাক শুনিয়া—"প্লিজ এক্সকিউজ মি" (আমায় মাপ করুন) বলিয়া ঘর হইতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। ভবেশের সঙ্গে দেবানন্দকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার একটু লজ্জা হইল। ইহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কিটির লজ্জা নূতন জিনিস। ভবেশ উহা লক্ষ্য করিল। কিটি বড় চালাক মেয়ে। নিজের লজ্জিত ভাব ঢাকিবার জন্য তখনই সে কলরব করিয়া উঠিল। বলিল, গুড ইভনিং ভবেশ-দা, গুড ইভনিং ভবেশদার ফ্রেণ্ড (বন্ধু)। ভবেশ-দা, এই তোমার বিকেলে আসা? জান না এখন গল্প করতে বসলে গভর্নেস মার কাছে লাগাবে—কিটি নটি গার্ল (কিটি দুষ্টু মেয়ে)। গল্প পেলে আর পড়াতে মন দেয় না।

ভবেশ—দেরী হয়ে গেল রে। নীচে আলোচনা শুনছিলাম।

কিটি অভিমান করিল। বলিল, ঐ ছাই আলোচনা শুনতে গিয়ে ঘড়ি ধরে আমার পড়বার সময়টিতে ওপরে এলে?

ভবেশ—তুই পড় গিয়ে। আমরা এখন যাই। আসছে রবিবার আসব।

কিটি—রবিবার সকালে এখানে খাবে ভবেশ-দা? আমি মাকে বলে রাখব? কিন্তু—

ভবেশ তাহার ইতস্ততঃ করিবার কারণ বুঝিল। সে দেবানন্দকে খাইতে বলিতে চাহে। তাহাদের বাড়ীর বাবুর্চির রান্না দেবানন্দ খাইবে কিনা তাহার সন্দেহ হইল। দেবানন্দ খাইবে না ভবেশ জানিত। তাই বলিল—সকালে ত আসতে পারব না কিটি। অনেক কাজ আছে। বিকেলের দিকে আসব।

কিটি নিজের বিনুনি টানিতে টানিতে বলিল—তুমি একাই আসবে ত ভবেশ-দা?

ভবেশ হাসিল। বলিল—দেবানন্দের সেদিন বিডন স্কোয়ারের মিটিঙে বক্তৃতা দেবার কথা আছে। ও ত আসতে পারবে না।

কিটি দুই চোখ কপালে তুলিয়া দেবানন্দের কাছে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল—মিটিঙে মিঃ ভাটার মত স্পীচ দেবে তুমি? স্পীচ দিতে পার তুমি?

একটু থামিয়া কিটি আবার বলিল, আচ্ছা তা হলে শনিবার এস ভবেশ-দা। আমি একটা নূতন স্বদেশী গান শিখেছি, তোমাদের শোনাব।

ভবেশ—আচ্ছা দেখব। দেবুর সম্বন্ধে সময় হয় না আবার।

কিটি—ওঁর বুঝি ভাল লাগে না আমাদের বাড়ী আসতে?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—সেকথা ওকেই জিজ্ঞেস কর্ না।

কিটির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বলিল—আমার বয়ে গেছে জিজ্ঞেস করতে। ভাল লাগে না—আমি কি বুঝি না?

কিটির এই অভিমান দেবানন্দের ভাল লাগিল। কোন কথা না বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

হষ্টেলে ফিরিবার পথে ডক্টর চক্রবর্তীর সম্বন্ধে আলাপ হইল দুই জনের মধ্যে। ভবেশ বলিল—ডক্টর চক্রবর্তী অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার সাধারণ কথাবার্তার রস আছে, কিন্তু এই রস অনেক সময়ে তিক্ত-মধুর। অনেকের তাই অপছন্দ। এক বার তাঁকে উত্তেজিত করতে পারলে জানবার মত অনেক কথা অনর্গল তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

দেবানন্দ—বাঙালীদের কি কি দোষের কথা তিনি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—তুই লক্ষ্য করেছিস দেখছি। ডক্টর চক্রবর্তী বলেন কতগুলো জিনিস বাঙালীকে ডুবিয়ে রেখেছে। সুবিধে পেলেই তিনি সেগুলোকে আক্রমণ করেন।

ভবেশ—বাঙালী জাতির স্বভাবগত ত্রুটি সম্বন্ধে ডক্টর চক্রবর্তীর অভিমত দেবানন্দকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিল।

বাড়ী ফিরিয়া সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেবানন্দের ঘুম আসিল না। এলোমেলোভাবে ডক্টর চক্রবর্তীর বক্তৃতার কথা ভাবিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সে শুনিল কিটি বলিতেছে—এ বাড়ী আসতে ওঁর বুঝি ভাল লাগে না? নিজের মনে উত্তর হইল—কিটি আছে, তাকেই ভাল লাগে।

ক্রমশঃ

দ্রষ্টব্য:—এখানি নূতন উপন্যাস। গত সংখ্যায় ভ্রমক্রমে 'ক্রমশঃ' ছাপা হইয়াছে।—সম্পাদক, 'প্রবাসী'

প্রভাত

শ্রীসুধীর গুপ্ত

স্মৃতির সায়রে তব ওগো মহাকবি,
অবগাহি' উঠিলাম এ শুভ প্রভাতে;
মুগ্ধ হোলো মোর মন; রবি-রশ্মি-পাতে
হেরিলাম বিশ্বলোকে নন্দনের ছবি।
নারিকেল-সুপারির শোভন শাখায়
আলো-ছায়া মায়া বোনে; নদীজল-ধারা
বাজাইয়া 'নায়ে'র স্নিগ্ধ একতারা
গ্রাম-প্রান্ত উদাসিয়া প্রবাহিয়া যায়;
পাখীরা কূজন করে; অলস আহ্লাদ
অতীতের 'আরণ্যক' জীবনের স্বাদ
ঘনাইয়া আনে মনে; হে মহিমময়,
জীবনে—জগতে জানি রয়েছে সন্তাত
অন্ধকার—অবিচার; তবু এ প্রভাত
সমস্ত ছাপায়ে প্রাণে জাগায় বিস্ময়।

ভারতীয় দর্শন মহাসভা—পুণা অধিবেশন

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ্-ডি

ভারতীয় দর্শন মহাসভার ষড়বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী পুণাতে হইয়া গিয়াছে। অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ফার্গুসন কলেজের ওয়াদিয়া মন্দিরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনের কার্য সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সঙ্গীতকলানিধি শ্রীকৃষ্ণরাও ফুলম্ব্রিকর উদ্বোধন-সঙ্গীত ও উপাসনা সমাপন করিবার পর পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর এম. আর. জয়াকর মহাসভার প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরে মহাসভার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক এস. এ. নিকম দেশবিদেশের দর্শনানুরাগী মনীষীদের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী এন. ভি. গ্যাডগিল মহোদয় সভার বরেণ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির উপাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীপ্রতাপ শেঠজী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলে পর তিনি এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 'জগতের পুনর্গঠনে দর্শনের দান' বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান হতাশা ও দুরবস্থার কথা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে সব বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয় তাহার উল্লেখ করেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে এ সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তিনি দার্শনিকদের নিকট আবেদন জানান। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মজগতে যে সব বিরুদ্ধ মত ও পথ আজ মানুষের মনকে আন্দোলিত ও বহুধাবিভক্ত করিয়াছে তাহাদের সমন্বয়-সাধন এবং এক উদার মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন—দার্শনিকগণ তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কর্ম দ্বারা এই গুরুকর্তব্য পালন করিতে পারিবেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় 'মানবীয় ব্যক্তিত্ব' (Human Personality) সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। অবশেষে মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া সকলকে ধন্যবাদ দেন।

প্রথম দিনের অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মানুষের স্বরূপের প্রত্যয় ও শিক্ষার দার্শনিক তত্ত্ব' বিষয়ে এক আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে ইউনেসকো'র (unesco) পক্ষ হইতে মিঃ জ্যাকেস হাবে এবং ভারতীয় দর্শন মহাসভার পক্ষ হইতে মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, ডাঃ ইন্দ্র সেন, জে এন চাব, মহাদেবন, অধ্যাপক ওয়াদিয়া, বর্তমান লেখক প্রভৃতি যোগদান করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা মানুষের শিক্ষাদীক্ষায় তাহার আধ্যাত্মিক স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক ওয়াদিয়া এস পি কলেজে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন' (The Philosophy of a Secular State) সম্বন্ধে জনসাধারণের উপযোগী একটি বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে 'দর্শনের ইতিহাস শাখা'র সভাপতি অধ্যাপক আর. রামানুজাচারী এবং ন্যায় ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য দুইটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহার পর 'অস্তিত্ববাদকে দর্শন বলা যায় কি না' (Is Existentialism Philosophy?) এই সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা হয়। ইহাতে ডঃ রাসবিহারী দাস, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, এস. এ. নিকম তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন এবং অপরাপর প্রতিনিধিরা আলোচনায় যোগদান করেন। বৈকালে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনের ইতিহাস এবং ন্যায় ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখাগুলির পৃথক্ অধিবেশন হয়। এগুলিতে দর্শনের অনেক নূতন তথ্য বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। তাহার পর এস পি কলেজে সাধারণের জন্য 'দর্শন ও জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ডঃ কল্যাণী মল্লিক, মহাদেবন, মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রভৃতি প্রতিনিধিরা এ সকল বক্তৃতা দেন। এইদিনকার দুইটি প্রমোদ-অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। তাহার একটি হইতেছে স্থানীয় শরীরচর্চা কলেজে মহারাষ্ট্র মণ্ডলের সভ্যদের ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রদর্শন। ইহাতে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকা হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরা যে ক্রীড়ানৈপুণ্য ও ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা দর্শকদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল। রাত্রিতে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য ও গীতের সঙ্গে নাটকাকারে উপনিষদের ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ এবং সোক্রেটিস ও ক্রিটোর কথোপকথন উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করে।

শেষ দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে 'মনোবিজ্ঞান শাখা'র সভাপতি ডঃ বি. এল. আত্রেয় এবং 'সমাজবিজ্ঞান শাখা'র সভাপতি অধ্যাপক এস. ভি. দাণ্ডেকর তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর এক বিতর্ক-সভায় 'নিরীশ্বর ধর্ম সম্ভব কি না?' এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। ইহাতে অধ্যাপক আর. পি. সিং, এম. আর. কুলকার্ণী প্রভৃতি যোগদান করেন। বৈকালে পূর্ব্বদিনের মত শাখাসভাগুলির অধিবেশনে অনেক

তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। তাহার পর শ্রীমতী প্রেমলীলাবাঈ ভি-ঠাকরসী তাঁহার বাসভবনে "পর্ণকুটিরে" মহাসভার প্রতিনিধিদের এক প্রীতিভোজে আদর-আপ্যায়ন করেন। সর্ব্বলোকবরেণ্য ভারত-পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি-বিজড়িত এই মনোরম "পর্ণকুটীর" দর্শনে সকলের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় এস পি কলেজে 'এক বিশ্বজনীন দর্শনের সম্ভাব্যতা' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা হয়। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, অধ্যাপক বি. এল. আত্রেয়, ডঃ মহাদেবন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ দর্শনের বীজ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বেদ ও উপনিষদে নিহিত আছে। বৈদিক ঋষি মানব-সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগে উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছিলেন—'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। ইহাই দর্শননিচয়ের মহাসমন্বয়ের মহামন্ত্র এবং এক উদার বিশ্বজনীন দার্শনিক মতবাদের মূল সূত্র।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ভারতীয় দর্শন মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে মহীশূরে হইবে। দর্শন মহাসভার রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কথা

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত অন্যতম। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যত দূর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল আর কাহারও সময়েই ততদূর ছিল না। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্যাদির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, এই কারণেই তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের অনেক দাবিদারকে বঞ্চিত করিয়া সমুদ্রগুপ্তকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বস্তুতঃ তিনি সম্রাট হইবার পূর্ব্বেই কোতবংশীয় কোন নৃপতিকে এবং অচ্যুত ও নাগসেনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁহার দিগ্বিজয়-বর্ণনা আরম্ভের পূর্ব্বেই 'উপরোক্ত নৃপতিদিগকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন' ইহা লিপিবদ্ধ করিবার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নহে—'উপরোক্ত নৃপতিদিগকে তিনি সম্রাট হইবার পূর্ব্বেই (অর্থাৎ তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়) এবং মহেন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিদের, সম্রাট হইবার পর পরাস্ত করিয়াছিলেন' ইহা বুঝান ছাড়া। দাক্ষিণাত্যের বিজিত নরপতিগণের মধ্যেই ত কোতবংশীয় নরপতির নাম উল্লেখ করা চলিত। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এখনও কোতজাতির অস্তিত্ব আছে। (*Indian Antiquary* vol. III.) উত্তরাপথের বিজিত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে হরিষেণ তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে পারিতেন। পূর্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী অঞ্চলে কোতনামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা ঐ অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন। *Journal of Bihar and Orissa Research Society*-র এক সংখ্যায় কোতবংশীয়েরা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের পরাস্ত করিয়া পাটলিপুত্র অধিকার করেন, এইরূপ লিখিত হয়। *Journal of Indian History*-র একটি সংখ্যাতেও ইহার সমর্থক মত আছে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই মতকে যদি মানিতেই হয় তাহা হইলে বরং পুষ্পপুরকে কান্যকুব্জের সমার্থক ধরিয়া লওয়াই (হিউয়েন সাঙের মতে) ভাল; কারণ তাহা হইলে মুদ্রার প্রাপ্তিস্থানের সহিত পুষ্পপুরের (কোতবংশীয়ের রাজধানীর) স্থানগত বৈষম্য থাকে না। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস নাটকের সাক্ষ্য অনুযায়ী পুষ্পপুরকে পাটলিপুত্র ধরাই ভাল ("তিদীঅোধি অমচ্চরক্খসস্স হুদীঅং বিঅ হিঅঅং পুপ্ফউরবাসী মণিআরসেট্‌ঠি চন্দনদাসোণাম"—মুদ্রারাক্ষস প্রথমাঙ্ক)। তাহা হইলে তিনি পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিবার সময়ে কোতনৃপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন—এই মতটিই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেন যে নিম্নলিখিত কথাটি বলিতেছেন, বিশেষ বুঝা গেল না। তিনি বলিতেছেন "পুষ্পপুর may denote পাটলিপুত্র; but then we can hardly be definite about its connection with Samudragupta's victory over the three kings."

বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলার অন্তর্গত সোপারা নামক স্থানের কাছাকাছি একটি শিলালিপিতে কোত জাতির উল্লেখ আছে; এবং সাহারাণপুরের কাদস মুদ্রার কাদর উল্লেখ আছে। ডঃ ইন্দ্রাজীর মতে, এই দুই স্থানের যে-কোন একটিতে কোতজাতির অবস্থিতি ছিল; কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ পুষ্পাহ্বয়—হয় পাটলিপুত্র না হয় কান্যকুব্জ, এই দুইটির কোনটিই সাহারাণপুর বা সোপারার নিকটবর্ত্তী নহে। কোতবংশীয় নৃপতিবৃন্দ যেখানেই রাজত্ব করুন না কেন, উত্তরাপথের বা দক্ষিণাপথের কিংবা প্রত্যন্ত নরপতি-

দিগের মধ্যে তাঁহাদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলিত, হরিষেণ ইচ্ছা করিয়াই তাহা করেন নাই। উহাদের মধ্যেই যদি কোতকুলজ প্রভৃতি নৃপতির নামোল্লেখ করিতেন তাহা হইলে সমুদ্রগুপ্ত যে সিংহাসনাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই ইঁহাদের জয় করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইত না। বস্তুতঃ কোন কারণ ব্যতিরেকেই যে অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া 'সমুদ্রগুপ্তই সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে' ইহা ঘোষণা করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা চন্দ্রগুপ্তের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা ছাড়া, শৌর্য্যবীর্য্যাদির কথা বাদ দিলে অন্য সকল উত্তরাধিকারীই ত সমুদ্রগুপ্তের সমকক্ষ ছিলেন, তুল্য কুলজ কথাটির লক্ষ্যার্থ ত তাহাই। সুতরাং অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকেই সম্রাট করা হইল কেন? তিনি যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা ন্যায্য অধিকারী ছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরং তাহার বিপরীত প্রমাণই আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। তিনি রাজা হইলে অন্যান্য ভ্রাতার মুখমণ্ডল ম্লান হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। যে ন্যায্য অধিকারী নহে তাহার সিংহাসনপ্রাপ্তি দর্শনে অন্য সকলের মনে অবশ্যই ক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে, চন্দ্রগুপ্তের এই অন্যায় আচরণের কারণ কি? নিশ্চয়ই তিনি সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রম দর্শনে বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 'কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমুদ্রগুপ্ত কখন পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "বীর্য্যোত্তপ্তাশ্চ কেচিচ্ছরণমুপগতা যস্য বৃত্তে প্রণামে" বা 'সংগ্রামেষু স্বভুজবিজিতা নিত্যমুচ্চাপকারাঃ,"

এলাহাবাদ প্রশস্তির এই কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চন্দ্রগুপ্তের জীবদ্দশায় সমুদ্রগুপ্তের বিপুল পরাক্রম চন্দ্রগুপ্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বস্তুতঃ উপরোক্ত বাক্যগুলি "একেন যেন ক্ষণাদুন্মূল্যাচ্যুত নাগসেন গ * * * * * দণ্ডৈর্গ্রাহয়তৈব কোতকুলজং পুষ্পাহ্বয়ে ক্রীড়তা" এই পরবর্তী বাক্যের ভূমিকা বা জ্ঞাপক মাত্র ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কুমার অবস্থায় যদি তিনি অচ্যুত ও নাগসেনকে পরাভূত করিয়া থাকেন তাহা হইলে পরবর্তী কালে আবার তিনি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন কেমন করিয়া? এই নাগসেন ও অচ্যুত যে উত্তরাপথের বিজিত নাগসেন ও অচ্যুত হইতে ভিন্ন এইসম্পর্কে তো কোন প্রমাণ নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমে পরাভূত হইয়া আবার হয়তো তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই জন্যই পরবর্তীকালে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণাপথের নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগক স্ব স্ব সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অথচ আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিবৃন্দের রাজ্য স্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে তো এই ব্যবহার-বৈষম্য শোভা পায় না। ইহার হেতুস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, হয়ত তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া উত্তরাপথের নৃপতিবৃন্দকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া তিনি উত্তরাপথ স্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হেতুটি 'পরাক্রমাঙ্ক', 'অশ্বমেধপরাক্রম', 'কৃতান্তপরশু-সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা' সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় কারণটি এই হইতে পারে যে, কোনও কারণে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের কোন কোন নরপতির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজাকেও বিশ্বাস না করিয়া সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি কারণে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনের এক অধ্যায়ের নূতন আলোচনার সূত্রপাত করিতেছে মাত্র; এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রঘুনাথ দত্ত

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্ত মহাশয় গত ২০শে ফাল্গুন কলিকাতায় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার কাগজের ব্যবসায় বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাহারাও তাঁহার অভাব গভীরভাবে অনুভব করিবেন।

রঘুনাথ দত্ত

রঘুনাথ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে বেনিয়াটোলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত ভোলানাথ দত্ত ১৩৪, পুরাতন চীনাবাজারে যে কাগজের দোকান চালাইতেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না।

১৯০৪ সনে স্বদেশী যুগে দোকানে কাজের চাপ বৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার পিতার আদেশক্রমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে সুযোগ্য সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি তাঁহার দক্ষতা ও কর্মকুশলতার দ্বারা মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স নামক কাগজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। ১৯০৮ সনে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির গুরুদায়িত্বভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি হাতে-কলমে নির্ভরযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়া নিজ অধ্যবসায় ও কর্মনিপুণতার দ্বারা শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯১০ সনে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান তাঁহার এই কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহের নিকট বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের দুরভিসন্ধি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং পরেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু রঘুনাথ সততার সহিত ও নির্ভীকভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার উন্নতিসাধন করেন। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি, সততা ও কুশলতার সাফল্যের এক সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি ঘোষণা করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতি ও সুযশ পরিব্যাপ্ত হয়। দত্ত মহাশয়ের সকল প্রচেষ্টা কেবল যে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই নিহিত ছিল তাহা নহে, অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর সুনাম বৃদ্ধি করিতেও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন।

তিনি রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স ও শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার, ক্যাম্পবেল হাসপাতাল, অবিনাশ স্মৃতি প্রভৃতি ভবন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, কে. এন. পাল কোম্পানী, হুগলী ইঙ্ক কোম্পানী, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ষ্টেশনারী ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড, বার্ম্মা সাইন্স এণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী প্রভৃতি বহু ব্যবসায়ী ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নিঃস্বার্থভাবে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানকে এবং দুঃস্থ ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অগ্নিযুগে বিপ্লবীদের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলেও গোপনে অর্থ ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করিয়া দেশের ও দশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রতিষ্ঠানটির প্রতিও রঘুনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। বহু সময় বহু ব্যাপারে তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও উদারতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য-সেবীদেরও তিনি নানাভাবে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

যাঁদের দেখেছি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য তিন টাকা।

জীবন-চরিত, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা বাংলা-সাহিত্যের একটা অঙ্গ হিসাবে বহুদিন থেকে স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু ঐ তিনটির সংমিশ্রণে সাহিত্যের পাত্রে নূতন রসের পরিবেশন হেমেন্দ্রবাবুর রসালো ও নিপুণ লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। হেমেন্দ্রবাবুর পুস্তকে আমরা যে শুধু সাহিত্যের ও নাট্যের ক্ষেত্রে মহারথীদিগের নূতন চিত্র, নূতন পরিচয় পাই তাহা নয়, সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের কয়েক জনেরও সুন্দর আলেখ্য এই স্মৃতিচিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

এই বইয়ে যেমন একদিকে দেখি শরৎ চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রকে, তেমনই অন্যদিকে আমাদের সামনে একেবারে জীবন্ত হয়ে দাঁড়ান। ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, গায়ক জমীরুদ্দীন, খেলোয়াড় শিবদাস ও অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এবং বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল পরিচয় পাই বাংলার চিত্রকলার পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ এক জনের, যাঁর কথা বাংলার লোকে ভুলতে বসেছে—তিনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক কথায় বলতে গেলে, হেমেন্দ্রবাবু বাংলার বিগত গৌরবময় যুগের স্মারক স্তম্ভগুলির পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর এই লেখার মধ্যে দিয়ে তবে ইতিহাস ও ঘটনার শুকনো শস্যকে তাঁর একান্ত নিজস্ব রসাস্বাদ ক্ষমতার গুণে, ভাষার ও ভাবের ক্ষীরমধু যোগে, পরমান্নে পরিণত করেছেন তিনি। পাঠক সকল দিক দিয়েই তৃপ্ত হবেন।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মন—শ্রীজীবনময় রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক উৎসর্গে লিখিতেছেন, 'পরাধীনতার তীব্র জ্বালা যাদের প্রাণ অগ্নিময় করে তুলেছিল,...সেই সব মৃত্যুঞ্জয় ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।' সুতরাং বোঝাই যায় যে, উপন্যাস হইলেও বইখানি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আংশিক চিত্র। গল্পটি প্রধানতঃ প্রেমের গল্প, তবে নায়ক-নায়িকারা বা উপনায়ক-নায়িকারা কেহ কেহ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত জড়িত। অনেকগুলি পুরুষ ও নারীর জীবনের জটিল সমস্যা লইয়া গল্পাংশ রচিত। লেখক পাঠকদের কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত

অদ্বিতীয়
লিভার টনিক
"কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়ায় নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্য্যেও সহায়তা করে। "কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়ায় অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটী অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।
কুমারেশ
লিভারকে সুস্থ ও সতেজ রাখে—
QUMARESH
ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া * হাওড়া

জাগ্রত রাখিতে পারিয়াছেন—ইহা তাঁহার কৃতিত্বের কথা। ঘটনাপরম্পরা সাজাইবার ও সাধারণ চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাঁহার ভাষা বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছন্দগতি; যদিও কথ্যভাষায় গল্পটি লেখা, তবু ভাষার আভিজাত্য আছে। আজকাল অনেক আধুনিক লেখকের লেখায় ভাষা গ্রাম্যতা এমন কি ইতরতা দোষদুষ্ট হইতে দেখা যায়, বর্ত্তমান লেখকের লেখায় সুমার্জ্জিত শ্রীতে তাহার কোন স্পর্শ নাই। নারীচরিত্রগুলির মধ্যে অগ্নিযুগের সীমার চরিত্র যদিও অন্য সকলের চেয়ে ছোট তবু মানুষের মন সে-ই সকলের অপেক্ষা বেশী টানে। বইখানিতে যেখানেই লেখক কালিকলমে ছবি আঁকিয়াছেন, সেখানেই তাহা তাঁহার হাতের টানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তা সে বাঙালী বধূ মালতীর ছবিই হউক কি বুড়ী ঠিকা ঝিরই ছবিই হউক। বনজঙ্গলও তাঁহার হাতের স্পর্শে প্রাণ পাইয়াছে। বইটির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা আর পাঁচ জন লেখকের লেখার মত গতানুগতিক পন্থায় লিখিত নহে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশান্তা দেবী

গান্ধী ও ষ্টালিন—লুই ফিসার। অনুবাদক—শ্রীকমলা দত্ত। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ২৮২। মূল্য চার টাকা।

বিখ্যাত মার্কিন লেখক লুই ফিসারের নাম এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত নহে। মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও সাধনার আদর্শ তাঁহাকে ভারতবর্ষে টানিয়া আনিয়াছিল। এই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বর্ত্তমান সমস্যাবহুল পৃথিবীর অনেক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। জগতে আজ বিভিন্ন বিপরীতমুখী চিন্তা ও কর্ম্মধারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কোনটা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে শুভ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিণাম বিবেচনা করিয়া সুধী ব্যক্তিরা এগুলিকে ত্যাগ করিয়া আপাতকঠোর দুর্গম পথেই চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ভালমন্দ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের নিরিখেই নিরূপিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-কল্যাণ ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণেরই পূর্ণতামাত্র।

এই অনুবাদ-গ্রন্থ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে বর্ত্তমান জগতের এক বা একাধিক সমস্যা লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা, জাতীয়তা এবং বিশ্বশান্তি এই আলোচনার মুখ্য বিষয়। গান্ধী ও ষ্টালিন বর্ত্তমান যুগের এই দুই বিরাট পুরুষের আদর্শ এবং কর্ম্মপদ্ধতি, বিচারের মানদণ্ড ও দূরদৃষ্টির মধ্যে যে কি বিরাট পার্থক্য, লেখকের আলোচনায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক জন ক্ষীণকায় হইয়াও বিরাট নৈতিক ও আত্মিক শক্তির অধিকারী, আর একজন বাহ্যতঃ মহাশক্তিশালী হইয়াও নীতির মানদণ্ডে কতই না দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিভাত হন—সকলকে দাবাইয়া বড় হইবার কি বিরামহীন চেষ্টা তাঁহার। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের আদর্শের সঙ্গে রুশীয় আদর্শের পার্থক্য কোন্‌খানে লেখক তাহা অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইতিহাসের নানা কালের নানা দেশের মনীষিগণের প্রচারিত উচ্চ

আদর্শকে রূপদানের অক্ষমতাই আজ রুশ কম্যুনিজমের জন্ম দিয়াছে। ঐ সকল আদর্শ আংশিকভাবেও সফল হইলে, বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রুশীয় প্রতিক্রিয়াশীল নৈতিক ভিত্তিহীন আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি একনায়কত্বের সহিত ভাঙিয়া পড়িবে। লেখকের মতে হিটলার ও ষ্টালিনের নীতির মধ্যে শ্রেয় কোনটিই নহে—তা একই মিথ্যার দুইটি দিক মাত্র। ইঁহারা উভয়েই পাশব শক্তির অন্ধ উপাসক, ব্যক্তিস্বাধীনতা উভয়ের নিকট মূল্যহীন, উভয়ই নিজেকে, নিজের জাতিকে, নিজের চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে জোর করিয়া জগতের সকলের উপর চাপাইয়া দিতে ব্যগ্র। আর মহাত্মা গান্ধীর নিরলস সাধনা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য। সত্য তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কাম্য—ইহাই সকলকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারিবে। এ জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা গান্ধীজীর নিকট খুবই পবিত্র, জাতির স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তির ইহাই উৎস। ফ্যাসীবাদী কিংবা কম্যুনিষ্ট এই দৃষ্টিভঙ্গীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

এই পুস্তকে সোভিয়েট ও হিটলারী আদর্শের বিশ্লেষণ পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। বর্ত্তমান জগতে গান্ধীবাদের সার্থকতা কোথায় তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে। অথচ লেখক বৈদান্তিক হিন্দু নহেন, খাঁটি আমেরিকান, সোভিয়েটেরও শত্রু নহেন। পুস্তকের অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কোণার্ক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। কুড়িটি কবিতায় বইখানি সম্পূর্ণ। জন্মান্তর, ধর্ম্মপদ, কোণার্ক সূর্য্যমন্দির, শূদ্রবেদী, লিয়াখিয়া—এই পাঁচটি দর্ঘ গদ্যকবিতা কোণার্ক-সম্পর্কিত। অবশিষ্ট কবিতাগুলি নাতিদীর্ঘ এবং ছন্দে রচিত।

'কোণার্ক সূর্য্য-মন্দিরে' পাই—

"চিরন্তনী মানুষের এই আলোক-সাধনা,
'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।
এই বাণী মানুষের অন্তরাত্মার চিরকালের বাণী।"

'শবরী'তে আছে,

'ধীরে ধীরে নীল মায়া উঠিল দুলিয়া,
ধীরে তার অভিনব হ'ল রূপান্তর...
তাপসী শবরবালা উঠিল শিহরি
আনন্দ-জাগ্রত তনু। সম্মুখে শ্রীরাম
সুনীল নীরদ-রূপ নয়নাভিরাম।
তপস্যা সার্থক আজি।'

'প্রেম' চতুর্দ্দশপদী কবিতা,

'এই তো প্রেমের রীতি,—সুধাবিষে ভরা
এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে?'

'অন্তরে' আছে,

'দুঃখের ভূমিকা 'পরে মানব-জীবন
শোভিছে নিকষশায়ী কনক-লিখন।'

'লিয়াখিয়া'য় পাই,

'সোনার আলোক ঝলে ভরা বুকে তার,
খেয়ালি জোয়ার তার, সোনালি জোয়ার।...
লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।
যাহারে সে খুঁজেছিল পেয়েছে কি তারে?'

শেষদান, অপর্ণা, বুদ্ধদেব, ময়ূরাক্ষী, ধর্ম্মপদ প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠকের মনে রেখাপাত করে। কবিতাগুলির মধ্যে আকর্ষণ আছে। ছন্দ সাবলীল। "কোণার্ক" কাব্যামোদী পাঠকের চিত্তকে নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যুগবহ্নি—শ্রীগৌতম সেন। পূর্ব্বাচল পাবলিশার্স, ২৪, ভবানীচরণ দত্ত লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৫২, মূল্য দুই টাকা।

আজিকার দিনে দুনিয়ার প্রতিটি দেশের সমাজে যে ভাঙাচোরা চলিতেছে সেই পরিবেশে উপন্যাসের কাহিনী-অংশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ডায়াপেপসিন
DIA PEPSIN
পরিপূর্ণভাবে খাদ্য হজম করিতে সাহায্য করে
ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জ্জি
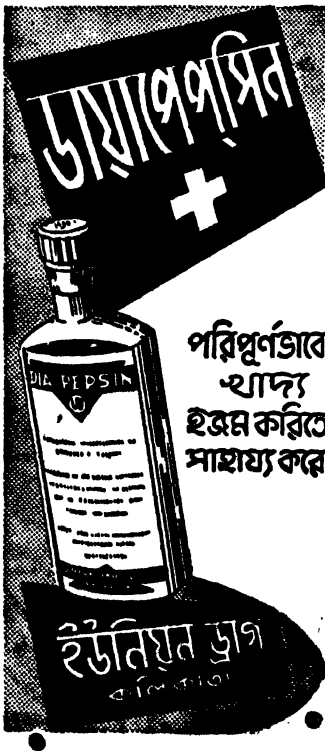
হিন্দু নারীকে লাইন বাঁধিয়া কণ্ট্রোলের দোকানে দাঁড়াইতে হয় এই বিষয় লইয়া গল্পের সূচনা—ইন্দ্রজিৎ এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গল্পের পরিণতির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু যখন ধনী-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী আবর্তিত হইতে লাগিল তখন দেখি, একটা অস্বাভাবিকত্ব যেন সকল পাত্র-পাত্রীকে পাইয়া বসিয়াছে। বিলাত-ফেরত অজিত দাম্ভিক ধনী যুবক তাহাকে বরং কতকটা বুঝা যায়, কিন্তু সুজাতার উদ্ভট আচরণের অর্থ কি? হঠাৎ একটি বাঙালী মেয়ে এরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল কেন? এরূপ প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণকে ফুটাইয়া তোলাই আজকাল অনেক সাহিত্য-সেবীর উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের লেখকও দেখিতেছি এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন।

পুস্তকখানিতে লেখকের আশাপ্রদীপ্ত মনোভাবেরও পরিচয় পাই—তাহারই দ্যোতক এই বইয়ের প্রচ্ছদপট। আগুন পূর্ণতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই অগ্নিদাহের পরই একটা কিছু গড়িয়া উঠিবে—এই ভাঙাগড়াই ইতিহাসের টানাপোড়েন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বেদান্ত দর্শন (১ম খণ্ড চতুঃসূত্রী)—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ২১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।
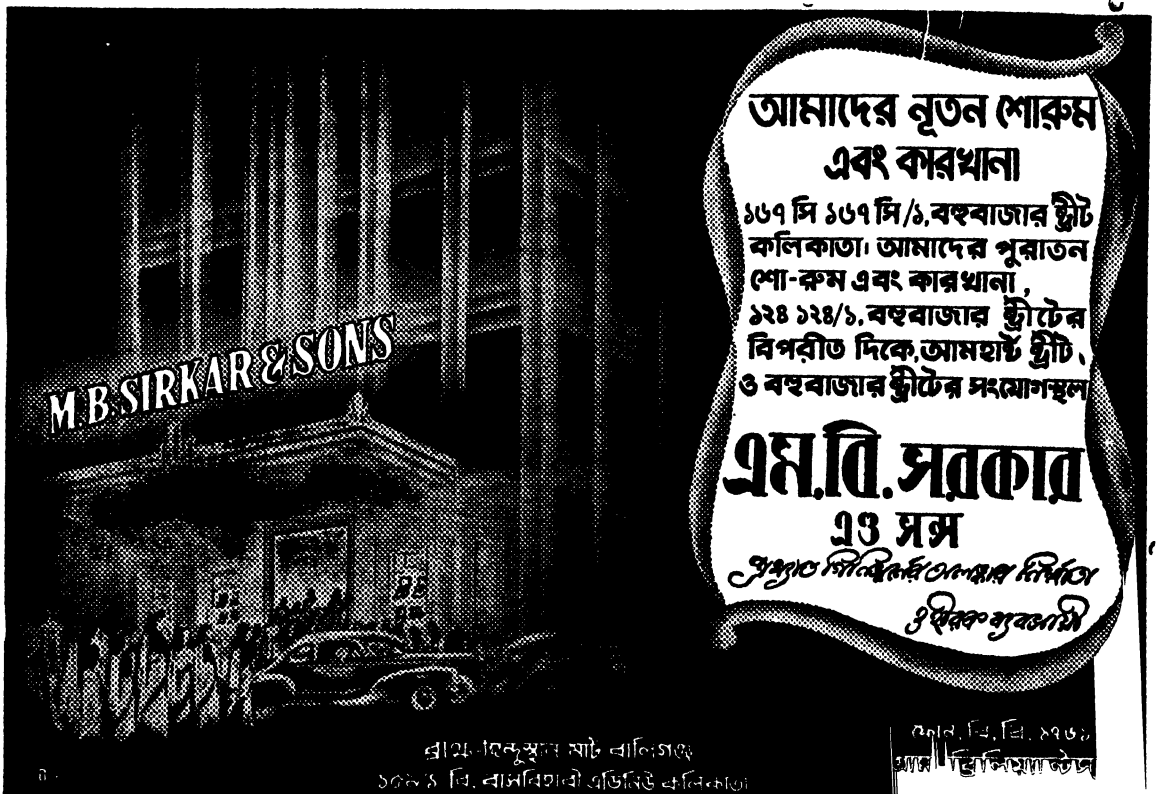
ব্যাস-রচিত "ব্রহ্মসূত্রে"র উপর শঙ্করাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে তাহাই বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বপ্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ। ইহার প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিগত শতকের শেষভাগে। কিন্তু উক্ত অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদমাত্র ও প্রাঞ্জল নহে। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদ হয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরীর সহযোগিতায়।

সমালোচ্য গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রের উপর বিস্তৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শঙ্কর-ভাষ্যের উপর রামানন্দ সরস্বতী-কৃত 'রত্নপ্রভা' টীকাও ইহাতে সানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতী তীর্থের "বৈয়াসিক ন্যায়মালা" অনুবাদসহ থাকায় পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভাষ্যানুবাদ ব্যতীত "ভাবদীপিকা" নামক স্বকৃত ব্যাখ্যায় অনুবাদক বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী', আনন্দগিরির 'ন্যায়নির্ণয়' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাবলীর সারাংশ দিয়াছেন। সাধারণতঃ অনুবাদ মূলানুগ ও সাবলীল, ব্যাখ্যা সহজবোধ্য, সারগর্ভ, তবে স্থানে স্থানে প্রাঞ্জলতার অভাব দৃষ্ট হয়। এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বাংলা বেদান্ত-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার দাবি রাখে। ইহা দ্বারা পাঠক-পাঠিকা বেদান্ত দর্শনের দুর্বোধ্য তত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতাপাঠের ভূমিকা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা-৩১, চাকুরিয়া—১নং রথীন্দ্র ব্যানার্জী লেনস্থ 'রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান' হইতে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪+৯৬ পৃঃ। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

মেয়াদী বীমায়— } ৮৲ টাকা
আজীবন বীমায়— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং সুদের হার অর্জ্জিত হার অপেক্ষা ½% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে সুদ অর্জন, দুর্মূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা	৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ	টাকার উপর
বীমা তহবিল ...	১৫ „ ৯৭ „	„ „
প্রিমিয়ামের আয়	৩ „ ৪০ „	„ „
দাবী শোধ	৭ „ ২০ „	„ „

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ইহার উদ্বোধন হয়। এই উৎসবের প্রবর্ত্তক কেদারমোহন সা শ্রীরামপুরে দেবালয়, ধর্ম্মশালা, এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড কর্ত্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্রুত পঠন পুস্তক বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। বোর্ড-কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণই প্রামাণিক বিধায় ইহা পঠন-পাঠনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "পালামৌ" যে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে দ্বিমত নাই। পরিষদের সুষ্ঠু ও সুসম্পাদিত সংস্করণটি গ্রহণ করায় মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে কুমারী বনলতা বেরা, এম-এ, আইন-পরীক্ষায় এল্-এল্-বি উপাধি পাইয়াছেন। ইনি মেদিনীপুরের বিশিষ্ট জমিদার ও এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ বেরার দ্বিতীয়া কন্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনের ও মেদিনীপুর সম্মিলনীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বেরার ভগ্নী।

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ, ডিপ-লিব, ভারত-সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া, কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন ব্যবস্থানুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ায় লাইব্রেরী সেমিনারে যোগদানের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে সিডনী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র এবং ভারতের গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও শিল্প সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট লেখক।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ
"ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২৷৹ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭
ফোন—সাউথ ৮৮১

পূর্ব্ব-আফ্রিকার নাইরোবিতে ভারতীয় কমিশনারের সেক্রেটারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মেলন

নাইরোবিতে প্রীতিসম্মেলন

গত ২৬শে জানুয়ারী, ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার ভারতীয় কমিশনারের প্রথম সেক্রেটারী—নাইরোবিতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রায় দেড় হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব

এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম হায়দরাবাদে প্রবাসী বাঙালী সমিতি কর্তৃক বিপুল সমারোহে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রবাসী বাঙালী-সমাজ ছাড়া স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীঅবনীশ চৌধুরী স্বহস্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন এবং শ্রীপ্রমোদলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়।

১১ই অক্টোবর শ্রীসনৎকুমার মণ্ডলের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, নাট্যাভিনয় ইত্যাদিতে সভাগৃহ আনন্দমুখর হইয়া উঠে। শ্রীপুষ্পরেণু দাস ও শ্রীবাসন্তিকা বসু অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শক-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। শ্রীনিরঞ্জন সাহা ও শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের উভয়কে রৌপ্যপদক ও রৌপ্যনির্ম্মিত 'কাপ' উপহার প্রদান করেন।

ললিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয় গত ২৩শে ফাল্গুন স্বীয় বালীগঞ্জস্থ ভবনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতে ফটো এন্‌গ্রেভিং ক্ষেত্রে অগ্রদূত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (ইউ. রায় কোং) সহকারী হিসাবে তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি

স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্লক প্রস্তুতকারক এবং চিত্র-মুদ্রাকররূপে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত আট জন বঙ্গ-মনীষীর পরিচয়-সম্বলিত চিত্র-পুস্তক একদা সুধীসমাজের নিকট বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ললিতমোহন গুপ্ত

তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং আদর-আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ প্রীত হইতেন। সাহিত্য এবং সাহিত্যসেবীদের প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কিরূপ সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম, কর্ম্মপটুতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাবলে ব্লক-প্রস্তুতি ও চিত্র-মুদ্রণ ব্যাপারে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা অনেক কথাই শুনিয়াছি। এরূপ একজন বিশেষজ্ঞের মৃত্যুতে বাঙালীমাত্রেই দুঃখ অনুভব করিবেন।

ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দাস
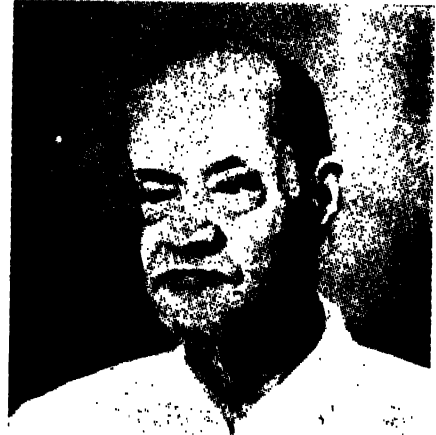
লক্ষ্ণৌ শহরের খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দাস সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার দাস ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১ই অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০ সনে আমেরিকায় গিয়া তিনি সেখানকার হ্যানিম্যান মেডিক্যা

গিরিশচন্দ্র দাস

কলেজে ভর্ত্তি হন এবং যথাসময়ে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। লক্ষ্ণৌ শহরে একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি উদারহৃদয় এবং বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

CHATTERJEE'S

PICTURE ALBUMS

IMPORTANT FOR THE CULTURED

The Renaissance of Indian Art has now become an accomplished fact. Even the Western World of Art has given recognition to it.

Price Rs. 4 each number. Postage extra.

On'y a few sets Nos. 10 to 17 are available

CHATTERJEE'S Albums are of Great Value : Historical and Artistic

---

THE ARTISTS REPRESENTED IN THIS SERIES INCLUDE

Abanindranath Tagore—The Master

Nandalal Bose—Acharya, Kalabhavan, Santiniketan

Gaganendranath Tagore—The Master and Creator of a school

Asit Haldar—Principal, Government School of Arts and Crafts Lucknow

Abdur Rahman Chughtai—The foremost Musalman Painter

Samarendranath Gupta—Principal, Mayo School of Art, Lahore

Sarada Ukil—The famous painter of Delhi

Mukul De—Principal, Government School of Art, Calcutta

Surendranath Kar—Kalabhavan, Santiniketan

Bireswar Sen—School of Arts and Crafts, Lucknow

Deviprasad Ray Chowdhury—Principal, Government School of Arts and Crafts, Madras

Kshitindranath Majumdar—Indian Society of Oriental Arts

Surendranath Ganguli

Upendra Kishore Ray Chowdhuri

THE MODERN REVIEW OFFICE
120-2, Upper Circular Road, Calcutta

BOOKS AVAILABLE

	Rs.	As.
Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (*No. 1, to 9 out of Stock*) each No. at Rs. 4	32	0
History of Orissa Vols. I & II —R. D. Banerji (Each)	25	0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12	0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5	0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4	8
Evolution & Religion— ditto	3	0
Origin and Character of the Bible ditto	3	0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2	0
Prayag or Allahabad—(*Illustrated*)	3	0
The Knight Errant (*Novel*)—Sita Devi	3	8
The Garden Creeper (*Illust. Novel*)— Santa Devi & Sita Devi	3	8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3	0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3	8
India And A New Civilization— ditto	4	0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (*Illust.*)—P. N. Roy	4	8
Story of Satara (*Illust. History*) —Major B. D. Basu	10	0
My Sojourn in England— ditto	2	0
History of the British Occupation in India —[*An epitome of Major Basu's first book in the list.*]—N. Kasturi	3	0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6	0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0	8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0	4

Postage Extra.

The Modern Review Office
120-2, Upper Circular Road, CALCUTTA

- এবার পূজার আনন্দে যে বইগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় -

রাশিয়ার রাজদূত—২৷৷০

পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস জুলে ভার্ণের 'মাইকেল ষ্ট্রগফ' গ্রন্থের প্রথম বাঙ্লা অনুবাদ। এ বইটি পৃথিবীর ১২টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। একমাত্র বাইবেল ভিন্ন আর কোন বই এত ভাষায় অনূদিত হয় নি। প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত।

ডাক্তারের দিগ্বিজয়—২৷৷০

হিউ লাফটিং লিখিত পৃথিবীবিখ্যাত হাসির গল্পের বই 'ষ্টোরি অব ডক্টর ডুলিট্‌ল্'এর মনোরম অনুবাদ। পশু-পক্ষীর ডাক্তার ডুলিট্‌লের আফ্রিকায় অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনীটি পড়ে ছেলে বুড়ো সকলেই মজা পাবেন। পাতায় পাতায় ছবি।

রাশিয়ার সেরা গল্প—৩৲

রাশিয়ার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের পৃথিবীবিখ্যাত গল্পগুলির অনুবাদ ক'রে সযত্নে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

কয়েকটি বিদেশী গল্প—২৸০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাছাই করা কয়েকটি গল্পের মনোরম অনুবাদ। এই বইখানা পড়লে বিভিন্ন দেশের অন্তরের স্বরটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হবে তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মাধ্যমে। এ অনুবাদ পড়ে মনে হবে যেন নূতন সৃষ্টি।

জীবনের বসন্ত—২৸০

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

আপনি নিশ্চয়ই প্রেমের গল্প ভালবাসেন? কে না ভালবাসে। আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম কোণটিতে মধুরতম আঘাত হানতে এ গল্পের আর জুড়ি নেই। এ বইখানির প্রতিটি গল্পে আপনি পাবেন সেই মধুর রসের সন্ধান, যা আপনাকে করে তুলবে সরস ও সজীব।

আমাদের নূতন বই :—

THIS EUROPE

Girija Mookerjee Rs. 7

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—২৲

নরেন রায়

বাংলার ভুলে যাওয়া যুগের এক অগ্নিময় কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে।

রূপকথা—২৲

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

গ্রীক উপকথার দেবদেবীদের নিয়ে রচিত কয়েক সরস গল্প, কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গ অতুলনীয়, সিলোফেন পেপারে মোড়া লাইনো টাইে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবা পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার।

সৃষ্টি ও সভ্যতা—২৷৷০

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

সৃষ্টির একেবারে গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত এর বিবর্তনে ইতিহাস অতি সুন্দর ভাবে সরস করে গল্পের মতন বর্ হয়েছে। লাইনো টাইপে ছাপা শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ আসাম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য প্রথ শ্রেণীর পুস্তকরূপে অনুমোদিত।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কয়েকখানি বই

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—১০৲

(তিন খণ্ড একত্রে বাঁধানো)

সবলতা ও দুর্বলতা—৸০

রাজনীতি—২৲

এ ছাড়া আরও কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বই যা অনেকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না, তার পুরোনো কয়েকখানা করে সংগ্রহ করা গেছে

দুর্গোৎসবতত্ত্ব	৷৷০
মাহম্ন স্তোত্র	৷০
অর্ঘ্য	৷৵০
পরাধীনের মুক্তি	১৲
চলার পথ	৷৷০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশাবলী	৸
চন্দ্রগুপ্ত	৷৷০
দীপশিখা (উপন্যাস)	২৲

সরস্বতী লাইব্রেরী, সি১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২ অথবা :—
আমাদের খুচরা বিক্রয়-কেন্দ্র :—৬নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করুন।

উৎকৃষ্ট জিনিষ সর্ব্বদাই অতি বিশুদ্ধ হয়

গ্ল্যাক্সো সর্ব্বাংশে ত্রুটীহীন শিশু-খাদ্য—ঠিকমত সমন্বিত ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্ল্যাক্সো হানিকর বীজাণু-রহিত ও সেই কারণে সাধারণ দুধ ব্যবহারে যে সব রোগ সচরাচর সংক্রামিত হওয়া সম্ভব তা থেকে নিরাপদ রাখে। ভিটামিন 'ডি' খনিজ লৌহযুক্ত হওয়ার দরুণ ইহা রক্তহীনতা ও বালাস্থি-বিকৃতি রোগ (রিকেটস) থেকে রক্ষা ক'রে। গ্ল্যাক্সো খেতে দিলে আপনার শিশু সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে উঠবে।

গ্ল্যাক্সো শিশুদের জন্য অতি বিশুদ্ধ দুগ্ধ-খাদ্য

Copyright

L.A.J. (G)

গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরিস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই • কলিকাতা •